সুলতান মাহমুদ গজনবীর ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস

# ভারত অভিযান

# ভারত অভিযান - ১

# ভারত অভিযান

(প্রথম খণ্ড)

এনায়েতুল্লাহ

অনুবাদ
শহীদুল ইসলাম

এদারায়ে কোরআন
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

# উৎসর্গ

মাতৃত্বের সুখানুভূতি বুঝে ওঠার আগেই কোলজুড়ে আসা ফুটফুটে ছেলেটি নাড়ির বাঁধন ছিঁড়ে চলে গেলো জান্নাতের শিশুকাননে।

ছেলে হবে দীনের সৈনিক, দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে দেবে উজাড় করে, মায়ের সেই শাশ্বত স্বপ্ন রয়ে গেলো অধরা।

রাব্বুল আ'লামীন তাকে বীরক সন্তানের গর্বিতা মা হিসেবে কবুল করুন।

—অনুবাদক

# প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে এদেশে উর্দুভাষী ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ'র পরিচয় দেয়ার নিষ্প্রয়োজন, তদ্রূপ বিশিষ্ট লেখক গবেষক ও অনুবাদক শহীদুল ইসলাম-এরও বিশেষ পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নেই।

ইসলামী উপন্যাসের রুচিবান পাঠক মাত্রই তাঁর অনুবাদ ও লেখার সাথে পরিচিত। কালজয়ী ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ-এর অন্যতম কীর্তি সুলতান মাহমূদ গজনবীর ভারত অভিযান সিরিজ এর এটি প্রথম খণ্ড। পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমরা এটিকে সার্বিক সুন্দর করার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। পাঠক পাঠিকা মহলে এ সিরিজ আদৃত হলেই আমাদের প্রয়াস স্বার্থক হবে বলে আমি মনে করছি।

—প্রকাশক

# লেখকের কথা

"মাহমূদ গজনবীর ভারত অভিযান" সিরিজের এটি প্রথম খণ্ড। উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতান মাহমূদ গজনবী সতের বার ভারত অভিযান পরিচালনাকারী মহানায়ক হিসেবে খ্যাত। সুলতান মাহমূদকে আরো খ্যাতি দিয়েছে পৌত্তলিক ভারতের অন্যতম দু' ঐতিহাসিক মন্দির সোমনাথ ও থানেশ্বরীতে আক্রমণকারী হিসেবে। ঐসব মন্দিরের মূর্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন মাহমূদ। কিন্তু উপমহাদেশের পাঠ্যপুস্তকে এবং ইতিহাসে মাহমূদের কীর্তির চেয়ে দুষ্কৃতির চিত্রই বেশী লিখিত হয়েছে। হিন্দু ও ইংরেজদের রচিত এসব ইতিহাসে এই মহানায়কের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে তাঁর সুখ্যাতি চাপা পড়ে গেছে। মুসলিম বিদ্বেষের ভাবাদর্শে রচিত ইতিহাস এবং পরবর্তীতে সেইসব অপইতিহাসের ভিত্তিতে প্রণীত মুসলিম লেখকরাও মাহমূদের জীবনকর্ম যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের বোঝার উপায় নেই, তিনি যে প্রকৃতই একজন নিবেদিতপ্রাণ ইসলামের সৈনিক ছিলেন, ইসলামের বিধি-বিধান তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। জাতিশত্রুদের প্রতিহত করে খাঁটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও দৃঢ় করণের জন্যেই নিবেদিত ছিল তার সকল প্রয়াস। অপলেখকদের রচিত ইতিহাস পড়লে মনে হয়, সুলতান মাহমূদ ছিলেন লুটেরা, আগ্রাসী ও হিংস্র। বারবার তিনি ভারতের মন্দিরগুলোতে আক্রমণ করে সোনা-দানা, মণি-মুক্তা লুট করে গজনী নিয়ে যেতেন। ভারতের মানুষের উন্নতি কিংবা ভারত কেন্দ্রিক মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা তার কখনো ছিলো না। যদি তৎকালীন ভারতের নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য করা এবং পৌত্তলিকতা দূর করে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার একান্তই ইচ্ছা তাঁর থাকতো, তবে তিনি কেন মোগলদের মতো ভারতে বসতি গেড়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতেন না? ইত্যাকার বহু কলঙ্ক এঁটে তার চরিত্রকে কলুষিত করা হয়েছে।

মাহমূদ কেন বার বার ভারতে অভিযান চালাতেন? মন্দিরগুলো কেন তার টার্গেট ছিল? সফল বিজয়ের পড়ও কেন তাকে বার বার ফিরে যেতে হতো গজনী? ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জবাব; ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ সৈনিক সুলতান মাহমূদকে তুলে ধরার জন্যে আমার এই প্রয়াস। নির্ভরযোগ্য দলিলাদি ও বিশুদ্ধ ইতিহাস ঘেটে আমি এই বইয়ে মাহমূদের

প্রকৃত জীবন চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রকৃত পক্ষে সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর মতোই মাহমূদকেও স্বজাতির গাদ্দার এবং বিধর্মী পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে একই সাথে লড়াই করতে হয়েছে। যতো বার তিনি ভারত অভিযান চালিয়েছেন, অভিযান শেষ হতে না হতেই খবর আসতো, সুযোগ সন্ধানী সাম্রাজ্যলোভী প্রতিবেশী মুসলিম শাসকরা গজনী আক্রমণ করছে। কেন্দ্রের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বাধ্য হয়েই মাহমূদকে গজনী ফিরে যেতে হতো। একপেশে ইতিহাসে লেখা হয়েছে, সুলতান মাহমূদ সতের বার ভারত অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু একথা বলা হয়নি, হিন্দু রাজা-মহারাজারা মাহমূদকে উৎখাত করার জন্যে কতো শত বার গজনীর দিকে আগ্রাসন চালিয়ে ছিল।

সুলতান মাহমূদের বারবার ভারত অভিযান ছিল মূলত শত্রুদের দমিয়ে রাখার এক কৌশল। তিনি যদি এদের দমিয়ে রাখতে ব্যর্থ হতেন, তবে হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকতাবাদ সাগর পাড়ি দিয়ে আরব পর্যন্ত বিস্তৃত হতো।

মাহমূদের পিতা সুবক্তগীন তাকে অসীয়ত করে গিয়েছিলেন, "বেটা! ভারতের রাজাদের কখনও স্বস্তিতে থাকতে দিবে না। এরা গজনী সালাতানাতকে উৎখাত করে পৌত্তলিকতার সয়লাবে কাবাকেও ভাসাতে চায়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময়ের মত ভারতীয় মুসলমানদেরকে হিন্দুরা জোর জবরদস্তি হিন্দু বানাচ্ছে। এদের ঈমান রক্ষার্থে তোমাকে পৌত্তলিকতার দুর্গ গুড়িয়ে দিতে হবে। ভারতের অগণিত নির্যাতিত বনি আদমকে আযাদ করতে হবে, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।"

আলবিরুনী, ফিরিশ্‌তা, গারদিজী, উতবী, বাইহাকীর মতো বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ তৎকালীন সবচেয়ে বড় বুযুর্গ ও ওলী শাইখ আবুল হাসান কিরখানীর মুরীদ ছিলেন। তিনি বিজয়ী এলাকায় তার হেদায়েত মতো পুরোপুরি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি নিজে কিরখানীর দরবারে যেতেন। কখনও তিনি তাঁর পীরকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠাননি। উপরন্তু তিনি ছদ্মবেশে পীর সাহেবের দরবারে গিয়ে ইসলাহ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি আত্মপরিচয় গোপন করে কখনও নিজেকে সুলতানের দূত হিসেবে পরিচয় দিতেন। একবার তো আবুল হাসান কিরখানী মজলিসে বলেই ফেললেন, "আমার একথা ভাবতে ভালো লাগে যে, গজনীর সুলতানের দূত সুলতান নিজেই হয়ে থাবেন। এটা প্রকৃতই মুসলমানের আলামত।"

মাহমূদ কুরআন, হাদীস ও দীনি ইলম প্রচারে খুবই যত্নবান ছিলেন। তাঁর দরবারে আলেমদের যথাযথ মর্যাদা ছিল। সব সময় তার বাহিনীতে শত্রু পক্ষের চেয়ে সৈন্যবল কম হতো কিন্তু তিনি সব সময়ই বিজয়ী হতেন। বহুবার এমন হয়েছে যে, তার পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ময়দানে দু'রাকাত নামায আদায় করে মোনাজাত করতেন এবং চিৎকার করে বলতেন, "আমি বিজয়ের আশ্বাস পেয়েছি, বিজয় আমাদেরই হবে।" বাস্তবেও তাই হয়েছে।

অনেকেই সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী আর সুলতান মাহমূদকে একই চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বীর সেনানী মনে করেন। অবশ্য তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একই ছিল। তাদের মাঝে শুধু ক্ষেত্র ও প্রতিপক্ষের পার্থক্য ছিল। আইয়ুবীর প্রতিপক্ষ ছিল ইহুদী ও খৃষ্টশক্তি আর মাহমূদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল হিন্দু পৌত্তলিক রাজন্যবর্গ। ইহুদী ও খৃষ্টানরা সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর সেনাদের ঘায়েল করতো প্রশিক্ষিত সুন্দরী রমণী ব্যবহার করে নারী গোয়েন্দা দিয়ে আর এর বিপরীতে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে এরা ব্যবহার করতো শয়তানী যাদু। তবে ইহুদী-খৃষ্টানদের চেয়ে হিন্দুদের গোয়েন্দা তৎপরতা ছিল দুর্বল কিন্তু সুলতানের গোয়েন্দারা ছিল তৎপর ও চৌকস।

তবে একথা বলতেই হবে, সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর গোয়েন্দারা যেমন দৃঢ়চিত্ত ও লক্ষ্য অর্জনে অবিচল ছিল, মাহমূদের গোয়েন্দারা ছিল নৈতিক দিক দিয়ে ততোটাই দুর্বল। এদের অনেকেই হিন্দু নারী ও যাদুর ফাঁদে আটতে যেতো। অথবা হিন্দুস্তানের মুসলিম নামের কুলাঙ্গররা এদের ধরিয়ে দিতো। তারপরও সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর চেয়ে সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা কার্যক্রম ছিল বেশি ফলদায়ক।

ইতিহাসকে পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য, বিশেষ করে তরুণদের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশনের জন্যে গল্পের মতো করে রচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থ। বাস্তবে এর সবটুকুই সত্যিকার ইতিহাসের নির্যাস। আশা করি আমাদের নতুন প্রজন্ম ও তরুণরা এই সিরিজ পড়ে শত্রু-মিত্রের পার্থক্য, এদের আচরণ ও স্বভাব জেনে এবং আত্মপরিচয়ে বলীয়ান হয়ে পূর্বসূরীদের পথে চলার দিশা পাবে।

এনায়েতুল্লাহ
লাহোর।

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

৯৭১ সালের পয়লা নভেম্বর, ৩৫৭ হিজরী সনের দশই মুহররম। সেদিন মানবেতিহাসে সূচিত হলো এক নতুন অধ্যায়। জন্ম নিলো এমন এক কালজয়ী মহাপুরুষ, যার নাম শুনলে হাজার বছর পরে আজো মূর্তিপূজারী হিন্দুদের গা কাঁটা দেয়। কল্‌জে কেঁপে ওঠে। সেই মহাপুরুষের নাম সুলতান মাহমূদ গযনবী। ইতিহাসে যিনি আখ্যা পেয়েছেন 'মূর্তি সংহারক' নামে।

হাজার বছর পেরিয়ে গেছে। এরই মধ্যে পৃথিবীতে ঘটে গেছে কতো ঘটনা, কতো বিবর্তন। কতো রাজা, মহারাজা, দুঃশাসন, সুশাসন দেখেছে প্রাচ্য এশিয়ার জমিন। এখানকার মাটিতে কতো বনি আদমের খুন মিশে আছে তার ইয়ত্তা নেই। কতো আদম সন্তান, এক আল্লাহর ইবাদতকারী বহু দেবতাপূজারী মূর্তিপূজকের নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট হয়েছে এরও নেই সঠিক পরিসংখ্যান। কিন্তু একটি কথা ইতিহাসের পাতায় চির সমুজ্জ্বল— মূর্তি ভাঙ্গার ইতিহাস। পৌত্তলিকদের মনগড়া দেবদেবীর মিথ্যা স্বর্গ ভেঙ্গেচুরে মহাজগতের সত্য ও প্রকৃত স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। একবার দু'বার নয়, পরাজয়-পরাভবকে দু'পায়ে দলে সতের বার ভারতের মূর্তিপূজারী পৌত্তলিক প্রভুদের সৃষ্ট সাম্রাজ্য খান খান করে ধুলায় মিশিয়ে দেয়ার ইতিহাস। সেই কালজয়ী ইতিহাসেরই জনক সুলতান মাহমূদ।

সুলতান মাহমূদ ইতিহাসের এক জীবন্ত কিংবদন্তী। এখনও জীবন্ত তাঁর কর্মকৃতি। বেঈমানদের কাছে মাহমূদ গযনবী হিংস্র, সন্ত্রাসী, খুনী, অত্যাচারী কিন্তু মুসলমানদের কাছে সুলতান মাহমূদ মর্দে মুজাহিদ, মহানায়ক, ভারতীয় মজলুম মুসলমানদের ত্রাণকর্তা, মূর্তিবিনাশী।

আজ থেকে হাজার বছর আগে। মহাভারত জুড়ে ছিল মূর্তি ও মূর্তিপূজারীদের একচ্ছত্র রাজত্ব। মানুষ ছিল মানুষের দাস। মানুষের উপর প্রভুত্ব করতো মানুষ। মানুষের হাতে তৈরি মূর্তি-পদতলে জীবন দিতো মানুষ।

আজ ভারতের মন্দিরে মন্দিরে শোভিত যে মূর্তি, সেসব কাদা মাটির মূর্তিকে ভেঙ্গেচুরে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে সুলতান মাহমূদ সেই সময়ের

পরাজিত পূজারীদের বলেছিলেন, "কাদা-মাটির এসব ভূত ও মূর্তি মানুষের প্রভু হতে পারে না, যদি তোমাদের মাটির ওইসব দেবদেবীর কোন ক্ষমতা থাকে তবে বলো, নিজেদের ক্ষত-বিক্ষত টুকরোগুলোকে পুনর্গঠিত করে আমাকে এভাবে টুকরো টুকরো করে ফেলুক।"

পারেনি। ধ্বংসাবশেষ থেকে দুমড়ানো মুচড়ানো মূর্তির টুকরো আর জোড়া লাগেনি। মাটিতে মিশে যাওয়া দেবদেবীরা খাড়া হয়ে রুখতে পারেনি মূর্তিসংহারী মাহমূদকে। সুলতান মাহমূদের বিজয়ী সৈনিকেরা কাদা-মাটির মূর্তির উপর দিয়ে তাদের ঘোড়া হাকিয়ে দিলো। সোমনাথ থানেশ্বরের বিশালকায় মূর্তিগুলো মাহমূদ গযনবীর অশ্ববাহিনীর খুরাঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো, পদাতিক বাহিনীর পদতলে পৃষ্ঠ হয়ে মাটির সাথে মিশে গেলো। প্রতিরোধ করবে তো দূরে থাক আত্মরক্ষাও করতে ব্যর্থ হলো। সে সময়ের ব্রাহ্মণেরা দেবতাদের অক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছিল, স্বীকার করেছিল এক আল্লাহ্র বড়ত্ব, মেনে নিয়েছিল এক আল্লাহ্র গোলাম মাহমূদ গযনবীর বশ্যতা। অতঃপর পেরিয়ে গেল অনেক দিন।

এক সময় অতীত হয়ে গেলেন মাহমূদ গযনবী। ভারতের মন্দিরে মন্দিরে আবারো শুরু হলো শঙ্খধ্বনি, শুরু হলো গীত-ভজন। মন্দিরের শূন্য বেদীতে পুনঃস্থাপিত হলো আরো বিশাল বিরাটাকার পাথর-কংক্রীটের শক্ত মূর্তি। ব্রাহ্মণরা নতুন উদ্যোগে পুনরোদ্যমে শুরু করলো ভগঃভজনা। ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ গুঁড়িয়ে দিয়ে হিন্দু-তপস্বীরা মূর্তিসংহারের প্রতিশোধ নিলো; জানিয়ে দিলো, সন্ন্যাসীরা মূর্তিনাশীদের প্রতিশোধ নিয়েছে, মুসলমানদের ইবাদতখানা মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে সেখানে মূর্তি স্থাপন করেছে। তারা মুসলমানদের শক্তি, বীরত্ব, কীর্তি গাঁথার ইতিহাসকে মুছে দিয়েছে।

বিগত হাজার বছরে মুসলমানরা ভারতের পৌত্তলিকদের কাছেই শুধু আত্মবিসর্জন দেয়নি, পৃথিবীর যে সব ভূখণ্ডে মুসলমানরা ছিল দণ্ডমুণ্ডের মালিক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিধর্মীদের কাছে এসবের কর্তৃত্ব চলে গেছে। মুসলমানরা হারিয়েছে ঈমানী শক্তি, জাতীয়তা বোধ, বিস্মৃত হয়েছে নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিশ্বনবীর দেয়া শিক্ষা থেকে দূরে সরে পড়েছে। পরিণতিতে ভিমরুলের মতো চতুর্দিক থেকে হামলে পড়েছে বেঈমানেরা, সম্বিত হারানো ব্যাঘ্রের মতো মুসলিম নওজোয়ানরা দংশিত হয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রহিত হয়ে গেছে নিজেদের সৃষ্ট তুফানে। এখন মুসলমানদের অবস্থা টালমাটাল।

পুনরায় ভারতে ফিরে এসেছে পৌত্তলিকতার জৌলুস। গযনবী যেসব দেবালয় ধ্বংস করেছিলেন সেগুলো এখন আগের চেয়ে আরো বেশি জমজমাট। আধুনিকতার রঙিন ফানুসে উজ্জ্বলতার মূর্তিগুলো যেন পরিহাস করে বলছে, মুসলমানদের খোদা এখন আর নেই, এখন আর নেই মূর্তিসংহারী কোন মাহমূদ। ওরা সব মরে গেছে।

মিথ্যার ভূত ধ্বংসকারীদের চারিত্রিক রূপ কেমন হয়ে থাকে, আর ইসলামের শিকড় কীভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে কেটে দেয়া হয়, সেই সব জিজ্ঞাসার জবাব এবং অজানা অধ্যায়গুলোর চাপা পড়া ভয়ঙ্কর সব ঈমান কেনাবেচার উপাখ্যান জানতে হলে ফিরে তাকাতে হবে অতীতের দিকে, উন্মোচন করতে হবে ইতিহাসের ভাগাড় ঘেঁটে প্রকৃত সত্যকে, ঐতিহাসিকের দৃষ্টি যেখানে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে। সমকালীন শাসকদের তৈরি কঠিন প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে কোন পর্যবেক্ষকের সন্ধানী দৃষ্টিও নাগাল পায়নি প্রকৃত সত্যের, অন্ধকার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এই প্রকৃত সত্য ইতিহাস, চেপে রাখা ইতিহাস।

সত্য চাপা পড়ার কারণে মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামী বীর সেনাদের কীর্তি বদলে গেছে, সত্যের পতাকাবাহীরা কথিত ইতিহাসে আখ্যা পেয়েছেন খলনায়ক আর খলনায়কদের দেয়া হয়েছে মহানায়কের আসন। সত্য-মিথ্যার আলো-আঁধারে মিশ্রিত ইতিহাসের জঞ্জাল যাচাই করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করা যে কঠিন তা আন্দাজ করা যায় এ থেকেই যে, সুলতান মাহমূদ গযনবীকে সমকালীন প্রখ্যাত দুই মুসলিম ইতিহাসবিদও চিত্রিত করেছেন এভাবে :

"মাহমূদ গযনবী ছিলেন সোনা-দানা ও সম্পদ প্রাচুর্যের প্রত্যাশী। মন্দির ও মূর্তি ধ্বংসে তার বেশি আগ্রহের কারণ ছিল সেগুলোর ভেতরের মণি-মুক্তা, সোনা-দানা কব্জা করা"। অথচ অনেক হিন্দু ইতিহাসবিদও অকপটে বলেছেন যে, "মাহমূদ গযনবীর মণি-মুক্তা, সোনার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তিনি সোমনাথের মূর্তিগুলোকে আট আটটি টুকরো করে বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন, তার সৈনিকেরা এগুলোকে পায়ে পিষে ফেলেছিলো, মূর্তির গায়ে কিংবা মন্দিরের কোথাও সোনা-দানা, মণি-মুক্তা গচ্ছিত রয়েছে কি-না অথবা মূর্তির গায়ে অলঙ্কার জড়ানো ছিল কি না এসবের প্রতি তাদের আদৌ ভ্রূক্ষেপ ছিল না। মাটি ও পাথরের তৈরি এসব মূর্তির প্রতি মাহমূদ ও তাঁর সৈনিকের ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা। এগুলোর প্রতি আগ্রহভরে তাকানো, এসব থেকে সোনা-দানা খুলে নেয়ার কথা প্রকৃতপক্ষে মাহমূদের প্রতি আরোপিত চরম অপবাদ।"

মিথ্যা গুজবে ভর করে চলে। মিথ্যা ধ্বংসকারীদের সন্তানেরাই যখন গুজবকে সত্য বলে স্বীকার করে নেয়, পূর্বপুরুষদের প্রতি তাকায় সংশয় ও সন্দেহভরা দৃষ্টিতে, তখন সত্যের ভিত কেঁপে ওঠে, সত্যের শিকড় মূল থেকে ছিন্ন হতে থাকে, সত্যাশ্রয়ীরা আখ্যা পায় অত্যাচারীরূপে।

সেই ইতিহাসের অন্ধকারেই আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি, যদিও সত্যের নাগাল পাওয়া কঠিন। তবে ইতিহাসের দিক-নির্দেশনা চিহ্নগুলোকে অবলম্বন করে সামনে অগ্রসর হলে অবশ্যই সত্যের নাগাল পাওয়া যাবে, বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো সত্যের উপাদানগুলো একত্রিত করতে পুরো ঘটনা পূর্বাপর বেরিয়ে আসবে, খসে পড়বে মিথ্যার পলেস্তরা। তখন মাটিচাপা সত্য জীবন্ত হয়ে দেখা দেবে। একটু অনুসন্ধান করলেই বোঝা যায়, ইতিহাসকে মিথ্যার আবর্জনা দিয়ে চেপে রাখা যায় না, কীর্তিকে কলমের খোঁচায় মিটিয়ে দেয়া যায় না, জীবনত্যাগী শহীদ ও মজলুমদের আর্তনাদ ভুলে থাকা যায় না। কান পেতে শুনলে মাটি সত্য কথা বলে, সত্যাশ্রয়ীদের রক্তের উষ্ণতা অনুভব করা যায়, মজলুমের আহাজারি আজো ইথারে ভেসে বেড়ায়। এ সবকিছু অনুধাবন ও উদ্ধার করার জন্যে দরকার ঈমানদীপ্ত অনুভূতি, আল্লাহ্র দরবারে সিজদাবনত হৃদয়। ইথারে ভাসমান সেসব ঈমানদীপ্ত বীর সেনানীদের ঈমান জাগানিয়া তকবীর ধ্বনি, বেঈমানদের প্রতি তেজদীপ্ত-হুংকার ও তরবারীর ঝনঝনানি হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে থাকতে হবে হৃদয় খাঁচায় হেরার নূরের জ্যোতি। হৃদয়ে ঈমানের দ্যুতিহীন আল্লাহ্র অভিশপ্ত সে সব মানব-পশুদের দলে থেকে মুমিন ও বেঈমানদের মধ্যে পার্থক্য পরখ করা অসম্ভব। যেহেতু আল্লাহ্ নিজেই ওইসব মিথ্যাবাদীদের আখ্যা দিয়েছেন পশুদের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে। ঘোষণা করেছেন, "যারা সত্য বিমুখ ওদের কানে সীসা ঢেলে দেয়া হয়েছে, ওদের অনুভূতিকে ভোঁতা করে দেয়া হয়েছে, ওরা দুনিয়াতেও ঘৃণিত অপমানিত আর আখেরাতেও ওদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। মহান আল্লাহ্ ভালো জানেন, আখেরাতের শাস্তি কতো যন্ত্রণাদায়ক।"

৯৪০ সালের দু'চার বছর আগে বা পরের ঘটনা। ন্যায় ও ইনসাফের প্রতীক ইরানের বাদশাহ নওশেরোয়ার শাসন অতীত হয়ে গেছে। ইরানের ক্ষমতার সিংহাসনে যারা আসীন হয়েছে ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি তাদের চরম অনাগ্রহ। তারা ক্ষমতাপ্রিয়, ভোগ ও বিলাস-ব্যসনে মনোযোগী। তারা নিজেদের মনে করতো দেশের মালিক-মোখতার আর সাধারণ জনগণকে ভাবতো তাদের প্রজা-দাসানুদাস। প্রজাদের বেলায় ন্যায় ও আদল-ইনসাফের নীতিবাক্য তারা ছিঁড়ে ফেলে মানুষকে গোলাম-বাঁদীতে পরিণত করার সব ধরনের ব্যবস্থাই রপ্ত করেছিল। তাদের নীতি ছিল, প্রজাদের ভুখা রাখো, ওদের মুখ বন্ধ করে দাও,

সত্যকে গলা টিপে মেরে ফেলো। সুবিচার ও রাজ সুবিধা ওদের দাও যারা শাসকদের গুণ গায়, রাজ্য জুড়ে তোষামুদে তৈরি কর। মোসাহেব ও তোষামোদকারীদের মধ্য থেকে উজির নাজির বানাও। প্রজাদের অবস্থা এমন করে রাখো, যাতে মানুষ কুকুরের মুখ থেকে হাড্ডি ছিনিয়ে নিয়ে সন্তানের আহার যোগাতে বাধ্য হয়। ইরানের শাসকেরা বাদশাহ্ নওশেরোয়ার বপিত ইনসাফের বৃক্ষকে উপড়ে ফেলে দিয়ে ইরান থেকে ইনসাফ ও সুশাসন বিদায় করে ন্যায় ইনসাফের প্রতীক নওশেরোয়ার বংশধরদেরকেও ইরান ত্যাগ করতে বাধ্য করে। জুলুম ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নওশেরোয়ার অধঃস্তন পুরুষেরা ইরান ছেড়ে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ল। ক্ষমতার মসনদ থেকে ছিটকে পড়ে নওশেরোয়ার বংশধরেরা জীবন বাঁচানোর তাকিদে যে দিকে পারল বেরিয়ে পড়ল। জীবন-জীবিকার যাতনা ও দুর্ভোগ তাদের স্থান থেকে স্থানান্তরে যাযাবরে পরিণত করলো।

যারা ছিল ন্যায়ের ঝাণ্ডাবাহী, তারা অন্যায় ও জুলুমের যন্ত্রণায় দূর দেশে পাড়ি জমাল। তাদের বয়স্করা দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছিল। শিশুরা বড় হতে লাগল অতি কষ্টে। আর এ দুরবস্থার মধ্যেই নওশেরোয়ার বংশে আরো নতুন নতুন শিশুর জন্ম হতে থাকল।

এই বংশের এক টগবগে যুবক কিবারুল হাকাম বিন কিরার আরসালান। মাঝারী গড়ন, দীপ্তিময় চেহারা— চেহারায় উচ্চ বংশের ছাপ পরিস্ফুট কিন্তু দারিদ্র্যের মলিনতায় বংশীয় আভিজাত্যের পেলবতা দূরীভূত।

বুখারার এক মেঠো পথে নতুন ঠিকানার উদ্দেশে চলছে যুবক। ক্লান্ত শ্রান্ত কিরার আল হাকাম একটি গাছের ছায়ায় বসে পড়ল। জায়গাটি জঙ্গলাকীর্ণ, ঝোপঝাড়ে ভরপুর। কানে ভেসে আসছে ছোট শিশু-কিশোরদের হৈ চৈ। আল হাকামের দৃঢ় বিশ্বাস, ওপাশে হয়তো কোন যাযাবর দল তাঁবু ফেলেছে। ক্লান্ত আল হাকাম মাথার নীচে কাঁধের পুটলিটা রেখে শুয়ে পড়ল।

কচি শিশুরা হৈ চৈ, খেলাধুলা ও দৌড়-ঝাপে মগ্ন হয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। এলাকাটা নীরব নিস্তব্ধ। দুপুর গড়িয়ে তখন পড়ন্ত বেলা। গুন গুন একটি মিষ্টি আওয়াজ আল হাকামকে মুগ্ধ করল। তখনও সে বুঝে উঠতে পারছিল না, আওয়াজটা কোত্থেকে আসছে, এটি কিসের আওয়াজ! কিন্তু তার মনের কোণে আওয়াজটা হঠাৎই কেমন যেন নাড়া দিল। গভীরভাবে কান পেতে বুঝতে চেষ্টা করল আল হাকাম। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠলো গুঞ্জরণ। আর কিছু নয়, তিলাওয়াত। কোন নারী কণ্ঠের আওয়াজ। গভীর মনোনিবেশে মনের মাধুরী

মিশিয়ে তিলাওয়াত করছে কোন নারী। আওয়াজের ধরন থেকেই আল হাকাম বুঝতে পারলো, এটা বয়স্ক নারী কণ্ঠ নয়, কোন কিশোরী-যুবতীর কণ্ঠ। বেশ সুন্দর। পড়ন্ত বেলায় এই বিজন এলাকায় কিশোরীর তিলাওয়াত অপেক্ষাকৃত দূর থেকেও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে আল হাকাম।

আল হাকাম আর শুয়ে থাকতে পারল না। শরীরের ক্লান্তি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। বেশ ফুরফুরে লাগছে তার। তাড়াতাড়ি হেঁটে ঝোপঝাড়ের এপাশটা ঘুরে আওয়াজটার দিকে এগিয়ে দেখল, তিন-চারটে ছেড়া ফাড়া কাপড়ের তাঁবু টাঙ্গানো। কাছেই একটি কিশোরী কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন। কণ্ঠ যেমন মধুর, কিশোরী দেখতেও তেমনটি হৃদয়কাড়া। তাঁবু থেকে একটু দূরে দুই বুড়ো বসে রশি পাকাচ্ছে। তাঁবুর অন্য পাশে ক'জন মহিলা আর কয়েকটি ছোট শিশু। কজন শক্ত সামর্থ্য পুরুষও আছে।

কিরার আল হাকামকে আসতে দেখে সবাই তার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। লম্বা লম্বা পা ফেলে আল হাকাম তাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

"আপনাদের এ মেয়েটি একটি আয়াত ভুল পড়েছে"। বুড়োদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলল আল হাকাম।

"আপনারা অনুমতি দিলে আমি তার ভুল শুধরে দিতে পারি।"

"ও কি ভুল শুদ্ধ পড়েছে আমরা শুনিনি। কাজে ব্যস্ত ছিলাম।" বলল এক বুড়ো।

"আপনাদের শোনা উচিত। কোত্থেকে এসেছেন আপনারা?" জিজ্ঞেস করল আল হাকাম

"আমরা তুর্কী। তুর্কী মুসলমান।" এক বুড়ো বলল।

তা তো আপনাদের দেখেই আমি বুঝতে পারছি আপনারা মুসলমান। ঠিক আছে আমি আগে ওর ভুলটা শুধরে দেই।

ধীর পায়ে এগিয়ে তেলায়াতকারী কিশোরীটির কাছে গিয়ে বসল আল হাকাম। অজ্ঞাত কেউ কাছে বসছে ঠাহর করে কিশোরী মুখ ফেরাল এবং কুরআন শরীফ পড়া বন্ধ করে দিল। অচেনা পুরুষকে কাছে বসতে দেখে সে জিজ্ঞাসুনেত্রে বুড়োদের দিকে তাকাল। তার চোখের চাওনিতে অপার জিজ্ঞাসা, কে এই পুরুষ এভাবে তার কাছে এসে আসন গ্রহণ করল?

আল হাকাম কোন ভণিতা না করেই বলল, "কুরআন শরীফ খোল। তুমি এক জায়গায় ভুল পড়ছিলে"। কিশোরী সে আয়াত থেকে আবার তিলাওয়াত করেও ভুল পড়ল।

আল হাকাম তার ভুল শুধরে দিলো। নিজের ভুল ধরতে পেলে কৃতজ্ঞচিত্ত দৃষ্টিতে কিশোরী আল হাকামের মুখের দিকে তাকাল।

এই আয়াতের অর্থ জানো?

কিছু কিছু বুঝি, পরিষ্কার না, লাজনম্র ভাষায় বলল কিশোরী। আমাদের সাথে এক বুযুর্গ ব্যক্তি থাকতেন। তিনি আমাকে কুরআন শরীফ পড়িয়েছেন, অর্থও শিখাতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সাপের দংশনে তিনি মারা গেছেন। এখন আমি কিছু কিছু অর্থ বুঝি কিন্তু সব আয়াতের অর্থ বুঝি না।

আমার কাছে শোন! আমি তোমাকে অর্থ বলে দিচ্ছি :

"ইবরাহীমকে স্মরণ কর, নিশ্চয়ই তিনি সত্য নবী ছিলেন। তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, আপনি এমন সব জিনিসের পূজা করেন, যেগুলো কোন কিছু শুনতে পারে না। আমার কাছে এমন তথ্য আছে যা আপনার জানা নেই। আপনি আমার কথা মানুন, আমি আপনাকে সঠিক পথের সন্ধান দিব।"

আল হাকাম কিশোরীকে পঠিত আয়াতের অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার পর বলল, সামনের আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

"অতঃপর ইবরাহীম যখন ওসব মূর্তি ও মূর্তিপূজারীদের থেকে ভিন্ন হয়ে গেলেন, তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব দান করেছি এবং সবাইকে নবী বানিয়েছি।"

তুমি জানো, এখানে আল্লাহ্ তায়ালা কোন্ ঘটনা বললেন? ওরা মূর্তি পূজা করতো আর ওই সব মাটির মূর্তির কাছে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রার্থনা করতো। তুমি তো জানো, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।

আল হাকাম কিশোরীকে বলছিল, যেসব মূর্তি কিছু বলতে পারে না, শুনতে পারে না, কিছু করতে পারে না পৌত্তলিকরা সে সবের পূজা করে, আসলে সবই ওদের হাতে তৈরি মাটির পুতুল।

আল হাকামের মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল কিশোরী, আর তন্ময় হয়ে শুনছিল তার কথা। মুখে কোন শব্দ ছিল না। তার হৃদয় মনে অনাবিল আনন্দের ঢেউ তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। গোত্রের অন্যান্য পুরুষও ইতোমধ্যে আল হাকামের পাশে এসে বসে গেল।

হঠাৎ গমনোদ্যত হলো আল হাকাম। পা বাড়াল চলে যাওয়ার জন্য। বুড়োরা তাকে থামাল। কিশোরীর কাছ থেকে একটু দূরে বড়দের আগের জায়গায় গিয়ে বসল সে।

তুমি কে? কোথা থেকে এসেছো? কোথায় যাবে? জিজ্ঞেস করল এক বুড়ো।

ইরানের মাটি আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। বলল আল হাকাম। যাদের বাপ-দাদা ন্যায়-ইনসাফের দ্বারা ইরানের মানুষকে দিয়েছিল সীমাহীন মর্যাদা, যারা মানুষের জন্য ইরানকে পরিণত করেছিল সুখের ঠিকানা, তাদের সন্তানেরা আজ জঙ্গলের জীবজন্তুর মতো বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা তো কোন কীট-পতঙ্গ ছিলাম না যে, পেটের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে ঝাড়জঙ্গলে বসবাস করবো, কিন্তু তিন চার পুরুষ যাবত আমাদের তাই করতে হচ্ছে। জালেমদের অত্যাচার ও জুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের খান্দান যাযাবরে পরিণত হয়েছে। যেদিকে যখন মন চায় সে দিকে চলতে থাকে।

তুমি কি বলতে চাচ্ছো, তুমি ন্যায় শাসক নওশেরোয়ার বংশধর? বলল এক বুড়ো।

আমাদের বাপ-দাদার মুখে তার অনেক কিচ্ছা-কাহিনী শুনেছি, কিন্তু আমাদের কাছে ওই সব কাহিনী রূপকথার গল্পের মতো মনে হয়।

আচ্ছা, তোমরা কোথায় তাঁবু ফেলেছো? জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রশ্ন করল অপর বুড়ো।

'আমি একা'। বলল আল হাকাম।

ছোটবেলা থেকেই কুরআন শরীফের সাথে আমি জীবনের অধিকাংশ সময় মসজিদেই কাটিয়েছি।

তোমার কথা দারুণ সুন্দর। বলল এক বুড়ো। যদি থাকতে চাও আমাদের সাথে থাকতে পারো, আর যেতে চাইলেও অন্তত একদিন আমাদের এখানে আতিথ্য গ্রহণ করো।

আজ রাতটা এখানেই থেকে যাওয়ার চিন্তা করল আল হাকাম। খুব একটা জ্ঞান-গরীমাওয়ালা লোক নয় আল হাকাম, কিন্তু যাযাবরদের কাছে আল হাকামকে মনে হলো বুযুর্গ লোক। থেকে যাওয়ার প্রস্তাবে রাজী হওয়ার পর তার পাশে দাঁড়ালো সবাই।

আল হাকামের কথা সবাইকে রূপকথার গল্পের মতো স্বপ্নালোকে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই বিকেল থেকে রাত অবধি একনাগাড়ে তার কথাই শুনছিল তাঁবুর সব লোক।

রাত যখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গভীর হতে থাকল, একজন দু'জন করে উঠতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত যুবক, পৌঢ়, শিশু-কিশোর, মহিলা সবাই তাঁবুতে চলে

গেল। বুড়ো দু'জন খোলা আকাশের নীচে বিছানা পেতে আল হাকামের কাছেই শুয়ে পড়ল। নানা কথার ফাঁকে দু'বুড়ো জোর দিয়ে বলল :

'তুমি আমাদের সাথে থাক।'

আল হাকাম ভাবছিল, ওরা কেন তাকে তাদের সাথে থাকতে বলছে। আল হাকামের মনের কোণে কিশোরীর শান্ত সৌম্য কান্তিময় চেহারা উঁকি মারল। কিন্তু বেশি ভাবনায় না গিয়ে সরাসরি বুড়োদের জিজ্ঞেস করে বসল আল হাকাম:

"আমার দ্বারা কি আপনাদের কোন কাজ হবে?"

আমাদের গোত্রে পুরুষ কম, মহিলা বেশি। পুরুষ বেশি থাকতে সুবিধা। আমাদের নানাবিধ ভয়। জঙ্গলের হিংস্র জীব-জন্তুই নয় এর চেয়েও হিংস্র মানুষ-লুটেরা, ডাকুদের ভয়টা বেশি। ওই যে মেয়েটা, ওকে নিয়ে আমাদের ভীষণ দুশ্চিন্তা। আমাদের দলে কোন অবিবাহিত পুরুষ নেই। বড়দের সবার বউ আছে, আর বাকীরা ছোট। এই মেয়েটার জন্য কোন বর পাওয়া যাচ্ছে না। ওটা আমাদের ঘাড়ে কঠিন দায়িত্বের বোঝা হয়ে আছে। বলল এক বুড়ো।

'ওকে তো তুমি দেখেছো, ওর কুরআন পড়া শুনেই তো তুমি এদিকে এলে। ওর রূপও হয়তো দেখে থাকবে তুমি। তুমি আমাদের সাথে থাক, আর ওই মেয়েটাকে বিয়ে কর।' বলল অপর বুড়ো।

'আমি ছাড়া আর কোন মানুষ কি আপনারা পাননি? আর কোন মানুষের কাছে কেন ওকে বিয়ে দেননি? নাকি আমিই আপনাদের কাছে আসা প্রথম পুরুষ ব্যক্তি?'

অনেক লোকই এসেছে। ওকে নিয়ে কাড়াকাড়িও হয়েছে বেশ। কিন্তু ওদের সবাই ব্যবসায়ী। মেয়েটাকে কিনে নিতে চাইলো। কে কার চেয়ে বেশি দেবে এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ওকে নিয়ে বিবাদও পর্যাপ্ত হয়ে গেছে। আমরা একবার ব্যবসায়ীদের হাতে ওকে তুলে দেয়ার চিন্তাও করেছিলাম। কিন্তু মেয়েটা বড়ই জেদি। এমন করলে সে আত্মহত্যা করবে বলে হুমকি দিল। এরপর এ সিদ্ধান্ত বাদ দিলাম।

সেই সময় অবাধে নারী কেনা-বেচা হতো। ধনাঢ্য ও আমীর-উমরা পছন্দমতো নারীদের টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করে নিজেদের হেরেম গুলজার করতো। ইরানী বেদুঈন ও যাযাবর মেয়েদের অঙ্গসৌষ্ঠব, রূপলাবণ্য, সৌন্দর্য কিংবদন্তিতুল্য। এ জন্য এ ধরনের যাযাবর গোত্রে নারীলোভীরা মেয়ের তালাশ করতো। মেয়ে বেচা-কেনা করা বেদুঈন ও যাযাবর গোত্রের মধ্যে কোন দোষণীয় ছিল না। অনেকটাই রেওয়াজে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। রীতিমতো মানুষ

কেনা-বেচার হাট বসতো। ওসব হাটে সব ধরনের নারী-পুরুষ বেচা-কেনা হতো। যুবতী নারী ও বালক-বালিকাদের সরবরাহ আসত ডাকাতদের কাছ থেকে। ওরা মুসাফিরদের আক্রমণ করে ধন-সম্পদ ও ছোট ছেলে-মেয়ে ও যুবতী মেয়েদের অপহরণ করে বাজারে এনে বিক্রি করে দিতো। ওসব হাটের সুন্দরী যুবতী-কিশোরীদের কদর ছিল বেশি। অধিকাংশ আমীর ক্ষমতাবান লোকেরা সুন্দরী মেয়েদের চড়া দামে খরিদ করে নিজেদের হেরেমের শোভা বর্ধনা করতো। শরিফ মেহমানদের মনোরঞ্জন, আপ্যায়ন ও নিজেদের সেবা-যত্নের কাজে, আত্মদৈহিক মনোরঞ্জনে ব্যবহার করা হতো এদের। ক্ষমতার মসনদে থাকা লোকদেরকেও স্বার্থান্বেষী মহল সুন্দরী যুবতী উপঢৌকন দিতো।

কোন যাযাবর বেদুঈন মেয়ে বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এমন তো শুনিনি। আপনারা ওর কথা মেনে নিলেন কেন?

ও এমন সব কথা বলে যে, এতে আমাদের ভয় হয়। বলল এক বুড়ো।

তুমি হয়তো জানো, আমাদের মতো ছন্নছাড়া মানুষের মধ্যে ধর্ম-কর্ম তেমন থাকে না। কোন মানুষ যদি সুন্দরী মেয়েকে চড়া দামে বিক্রি করে দিতে পারে, নিজ স্ত্রীকেও বেশি টাকা পেয়ে তালাক দিতে পারে, তার আর ধর্ম থাকে! কিন্তু আমরা মুসলমান। ধর্ম-কর্ম ঠিকমতো পালন না করলেও খোদার ভয় তো আছে। আমরা কুরআন কিতাব ভয় করি। মরণেরও ভয় আছে। এই মেয়েটা কুরআন পড়ে। ও আমাদের বলেছে, সে নাকি সাদা শুভ্র দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখেছে। তিনি তাকে বলেছেন, "তুমি কখনও কোন ব্যক্তির কেনা দাসী হবে না। তুমি বিয়ে করে কারো স্ত্রী হবে। তোমার পেটে এমন এক সন্তান জন্ম নেবে যে পথ ভোলা বিভ্রান্ত মানুষকে ধর্মের সঠিক পথ দেখাবে, দুঃখী মানুষের সেবা করবে।"

ওকি প্রায়ই এমন স্বপ্ন দেখে? আমিও মাঝে মধ্যে এ ধরনের স্বপ্ন দেখি। বলল আল হাকাম।

দুই চাঁদ আগের ঘটনা। আমরা মেয়েটিকে বিক্রি করে দিয়েছিলাম। ক্রেতার হাতে পুরো দাম ছিল না। আমরা মেয়েটির বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা দাবী করেছিলাম। বিক্রির কথা শুনে মেয়েটি বলছিল, আমি পালিয়ে যাব।

ওর পালানোর কথা শুনে রাতে ওর তাঁবুর বাইরে দু'জনকে পাহারা দিতে বললাম। ওর পালানোর পথ আটকে দেয়ার কথা শুনে বলল, "আমার উদর থেকে কোন হারামজাদার জন্ম হবে না। জীবন থাকতে আমি তা হতে দেবো না। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।"

মধ্যরাতে মেঘের গর্জনে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রচণ্ড ঝড় আর ভারী বর্ষণে আমাদের সব তাঁবু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। বিজলি আর আকাশের ভয়ঙ্কর গর্জনে আমরা ভড়কে গেলাম। বিজলির ঝলকানি আর মেঘের গর্জনে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠতে লাগল। হঠাৎ করে বিজলি থেমে গিয়ে ঘন অন্ধকার নেমে এলো। আমরা নিজের হাতটাও ঠাহর করতে পারছিলাম না। ভয়ে আতঙ্কে ছোট ছেলে-মেয়ে, নারী-শিশু চিৎকার জুড়ে দিল। কোলের বাচ্চাগুলোকে বড়রা বুকে চেপে ধরে জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করল। কিন্তু আকাশের বিকট গর্জন আর ঝড়ের তাণ্ডবে বড়রাও ভয়ে কাঁপছিল। বিজলির এককটা ঝলকানিতে মৃত্যুর সাক্ষাত পাচ্ছিলাম আমরা। অথচ এই মেয়েটি ছিল সম্পূর্ণ নির্বিকার নিরুদ্বিগ্ন। আমরা যখন জীবন বাঁচানোর কোন আশ্রয় পাচ্ছিলাম না, সে তখন একটি তাঁবু ধরে অবিচল বসেছিল। এমন সময় একটি গাছের ডাল এসে আমাদের সামনে ভেঙে পড়ল। মৃত্যু আশঙ্কায় সবাই এক সাথে চিৎকার করে উঠল। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে মরণ থেকে লুকাতে চাচ্ছিল। কিন্তু এই মেয়েটি নির্ভয়ে চিৎকার করে বলছিল, 'কেউ আযান দাও আর বাকীরা যে যেখানে আছো সে জায়গায় লুটিয়ে পড়।' তিনজন ওর কথামতো আযান দিতে শুরু করল। বাকীরা প্রলয়ঙ্করী ঝড়-বৃষ্টিতে কাদা-পানির মধ্যেই সে জায়গায় লুটিয়ে পড়লো। আর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা...।

অনেকক্ষণ পর তুফান থামল। এর চেয়েও তীব্র তুফানের মুখোমুখি আমরা হয়েছি কিন্তু এমন আতঙ্কিত হইনি কখনো। মাথার উপরে আসমান ও পায়ের নীচে মাটি, এই তো আমাদের ঠিকানা। আসমান তার অফুরন্ত নেয়ামত দিয়ে আমাদের প্রাণ বাঁচাতে সহযোগিতা করে আবার কখনো আমাদের উপর দুর্ভোগও চাপিয়ে দেয়। আসমান-জমিনের আপতিত এসব সুখ-দুঃখ মিলিয়েই আমরা বেঁচে আছি। এসবে কখনও ভীত হই না, কিন্তু ওই রাতের ঝড়-বৃষ্টি ছিল ভয়ঙ্কর, তার চিত্র ছিল ভয়াল। আমরা সেই ঝড়কে এই মেয়ের অভিশাপ মনে করছিলাম।

রাত পোহাল। সবাই তখনও কাঁপছে। ভয়ে-আতঙ্কে সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়েছে, কারো মুখে রা' করার হিম্মতটুকু ছিল না। এই মেয়েটি আমাদেরকে চোখ উল্টে উল্টে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু দূরে সরে গেল। আমরাও লজ্জায় ওর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। ওর হুঁশিয়ারী আমাদের কানে বাজছিলো : 'আমার উদরে কখনও হারাম সন্তান আসবে না, এর অপচেষ্টা করলে তোমরা সব ধ্বংস হয়ে যাবে।' তখনও সে কুরআন শরীফ বুকে চেপে রেখেছিল আর অনুচ্চস্বরে কি যেন পড়ছিলো...।

আমরা ছেঁড়া-ফাড়া তাঁবুগুলো আর বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র একত্র করে শুকানোর ব্যবস্থা করলাম। বেলা চড়লে দুই অশ্বারোহী এসে হাজির হলো। তারা আমাদের প্রত্যাশিত স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে এলো। মুদ্রা ভর্তি থলে আমাদের পায়ের কাছে ছুঁড়ে মেরে বলল, "এই দিনারগুলো নাও আর মেয়েটিকে আমাদের হাতে তুলে দাও।"

আমি থলেটি তুলে এক অশ্বারোহীর হাতে দিয়ে বললাম, "তোমরা দিনার নিয়ে চলে যাও, আমি মেয়ে দিতে পারব না।"

অপর আরোহী আরো দু'টি দিনার আমার পায়ের দিকে ছুঁড়ে বলল, "আরও চাইলে বল। যা চাও তাই দেবো তবুও মেয়েটিকে আমাদের দিতেই হবে।" কিন্তু মেয়েকে তাদের হাতে না দিয়ে ফিরিয়ে দিলাম।

"ও কার মেয়ে?"

"মেয়েটি আমার ভাতিজী, এতীম। " শ্বেতশ্মশ্রুধারী বুড়ো বলল।

আল হাকাম দু'হাত দেখিয়ে বলল, আমার হাত খালি, মেয়ের দাম দেয়ার মতো কিছুই আমার হাতে নেই। আপনারা কি আল্লাহ্র ওয়াস্তে বিনা দামে আমাকে মেয়ে দেবেন?

আমাদের সাথে তোমাকে থাকতে হবে। প্রতি রাতেই ডাকাতের আক্রমণাশঙ্কা থাকে। তুমি থাকলে পুরুষের সংখ্যা বাড়বে। পুরুষের সংখ্যা বেশি থাকলে ভয় কম থাকে। এই মেয়েটাকে যে কত লুকিয়ে-ছাপিয়ে এ পর্যন্ত রেখেছি তা বলে শেষ করা যাবে না। ভারী গলায় বলল পক্বকেশী বুড়ো।

বুড়োর প্রস্তাবে সম্মত হলো আল হাকাম। সেই মেয়েটির সাথে বিয়ে হয়ে গেল আল হাকামের। বেদুইন যাযাবরদের বিয়ে। কোন আয়োজন প্রস্তুতি নেই। বড়দের সিদ্ধান্ত আর পাত্রের আগ্রহ এই যথেষ্ট। অধিকাংশ যাযাবর মেয়েদের সতীচ্ছেদ ঘটে বিয়ে ছাড়াই। হয়তো ডাকাতের হাতে, না হয় কোন বেশি দামের ক্রেতার শয্যায়। বিবাহকালীন ধুমধাম আহার আয়োজনও ওদের সমাজে নেই।

"আমার জীবন ও স্বাধীনতার বিনিময়ে তোমাকে পেলাম। তোমাকে দাসী করার পথ বন্ধ করে নিজে গোলাম হয়ে গেলাম।" প্রথম রাতেই স্ত্রীকে বলল আল হাকাম।

"আমি বন্দীদশায় থাকার মানুষ নই। তোমার প্রেমে দিওয়ানা হয়ে গেছি একথাও ঠিক নয়। তোমার চাচা তোমার আদি-অন্ত সব কাহিনী আমাকে শুনিয়ে তোমাকে বিয়ে করে এখানে থাকতে প্রস্তাব করলো, তাৎক্ষণিক তোমার ইজ্জত

ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি মমত্ববোধ আমাকে রাজী হতে বাধ্য করেছে। যদি কখনও আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই তুমি আমার সাথে যাবে?"

"আমি আল্লাহ্‌র নামে আপনাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমার জীবন-মরণ আপনার হাতে। এরা আর আমাকে বন্দী করে রাখতে পারবে না। আপনাকে প্রথম দেখাতেই আমার মন বলছিল, এই লোক যদি তোমাকে বিয়ে করতে চায় তাহলে তুমি গ্রহণ করতে পার।"

শুনেছি, এক শ্বেতশুভ্র-শ্মশ্রুধারী লোক নাকি তোমাকে স্বপ্নে বলেছিল যে, এমন এক সন্তান তুমি জন্ম দেবে যে পথভোলা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথের দিশা দেবে।

সে খিলখিলিয়ে হেঁসে উঠল। বললো, এটা আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। আকাঙ্ক্ষাটা এমনভাবে আমার মধ্যে শিকড় গেড়েছিল যে, আমি নিজের কানে শুনতে পেতাম, "তোমার কোলে এমন শিশু জন্ম নেবে যে সত্যের পথে এতো খ্যাতি অর্জন করবে পৃথিবীর মানুষ তাকে চিরকাল স্মরণ রাখবে।"

তুমি জানো না, হত-দরিদ্র ঘরের সন্তানেরা মিথ্যা বিনাশী হয় না, পেট পূজারীই হয়ে থাকে। এটা তোমার অলীক আকাঙ্ক্ষা। এই অসম্ভব কল্পনা ছেড়ে নিজে সত্য পথের উপর থাকো এটাই যথেষ্ট। আমাদের সন্তান আমাদের মতোই যাযাবর হবে, নয়তো কোন আমীরের ঘরে নোংরা কাজের চাকর হবে।

"আমি কি অবাস্তব কল্পনা করছি? আমার এই আকাঙ্ক্ষা কি অসম্ভব?"

"যে আকাঙ্ক্ষা অবাস্তব, তা কল্পনা হয়ে মানুষের মনে সুখ দেয়।" বলল আল হাকাম।

"সেদিন আপনি আমার ভুল শুধরে দেয়ার জন্যে এসেছিলেন। আপনি আমাকে আয়াতের তরজমায় বলেছিলেন, 'ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, আপনি কেন মূর্তিপূজা করেন, যেগুলো কিছু শোনে না, বলতে পারে না, করতে পারে না, আপনি আমার সাথে আসুন, আমি আপনাকে সত্য পথ দেখাব।' সে কথাগুলো আমার হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল। এরপর আমি কুরআন পড়তে বসলেই আমার কানে শুধু একথাই বাজে– তুমি এক ইবরাহীমকে জন্ম দেবে। আমি রাতে নূরানী চেহারার এক সৌম্য কান্তিময় ব্যক্তিকে দেখেছি, তিনি আপনার মতোই আমার ভুল শুধরে সেই আয়াতটিই পড়াচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, সুন্দর ফুটফুটে অথচ নির্বোধ সন্তান হলে তুমি বেশি খুশি হবে না কদাকার কিন্তু বুদ্ধিমান সন্তান পেলে সুখী হবে? আমি সেই বুযুর্গ ব্যক্তিকে বলেছি, আমি ইবরাহীমের মতো এমন সত্যের বাহক সন্তান চাই যাঁর পিতা

বিপথে থাকলেও পিতাকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করবে না। আর মেয়ে হলে যাতে এমন কদাকার হয় যে, কোন ডাকাতের দৃষ্টি ওর প্রতি না পড়ে, কেউ ওকে কিনে নিতে না চায়।"

"তোমার মধ্যে তোমার গোত্রের রীতিনীতি বিরোধী স্বভাব কি করে এলো? যাযাবরদের মেয়েরা তো বিক্রি হতে অপছন্দ করে না।"

"জানি না আমার মধ্যে কীভাবে এ আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিলো যে, 'তুমি বিয়ে করে একজন পুরুষের স্ত্রী হিসেবে থাকবে।' একথা আমাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি। আমার কল্পনাই আমার কানে বাজতো। হৃদয়ের একথা শুনতে শুনতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, আমার আকাঙ্ক্ষা সফল হবে।"

"তোমার অনাগত সন্তান বড় হয়ে বিখ্যাত হবে এমন অলীক কল্পনা মন থেকে দূর কর। এ স্বপ্ন তোমার মাথা খারাপ করে ফেলবে।" বলল আল হাকাম।

বংশ ধ্বংসের ভয় ও রাতের প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি, আকাশের গর্জন কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু দুই অশ্বারোহী দিনার ভর্তি থলে নিয়ে এসে ঠিকই কিশোরীর জন্য সাক্ষাত আপদ হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছিল। আকস্মিক এই ঝড়-বৃষ্টি, আকাশের গর্জন অসহায়-অবলা এক কিশোরীর সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক কিশোরীর মান রক্ষায় এগুলো বেশ কাজ করেছে। আল হাকাম বাস্তববাদী মানুষ। সে এগুলোকে অলৌকিক কিছু মনে করেনি, ভিত্তিহীনও ভাবেনি। তবে যে বিষয়টি তাকে নাড়া দিয়েছে তা হলো, এ কিশোরী সত্যিকার অর্থে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র মনের অধিকারিণী। ওর দৈহিক রূপলাবণ্যের চেয়েও আত্মিক সৌন্দর্য অনেক বেশি।

বিয়ে করে আল হাকামও যাযাবরদের সাথে মিশে গেল। কেটে গেল অনেক দিন। দু'বছরের মাথায় তাদের একটি ছেলে জন্ম নিল। আল হাকাম ছেলের নাম রাখল "সুবক্তগীন"। ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার স্ত্রীর স্বপ্ন আরো দৃঢ় হলো। তার বিশ্বাস, এই ছেলে বিখ্যাত হবে। আল হাকাম তার স্ত্রীর কথা শুনে সময় সময় হাসতো। একদিন স্ত্রী আল হাকামকে জিজ্ঞেস করল, "এই ছিন্নমূল যাযাবর জীবন কি এখন আর আপনার বিরক্তিকর লাগে না?"

"আমার মধ্যে এ জীবন নিয়ে এখন আর কোন অস্বস্তি নেই। কিন্তু আমার ছেলেকে আমি এই জংলী জীবন থেকে দূরে নিয়ে যাবো। জীবন নিয়ে পালিয়ে বেড়ানো কি কোন সভ্য মানুষের জীবন হতে পারে?" বলল আল হাকাম।

“আমার বিশ্বাস ছিল, এ আশাও এখন আমার পূর্ণ হবে যে, আমার কোলের সন্তান লেখাপড়া শেখার মতো জায়গায় পৌঁছতে পারবে। অবশ্য আমি তোমার মতো দুনিয়ার কোথায় কি আছে জানি না।” বলল হাকামের স্ত্রী।

“কোন আমীর-শরীফ লোকের ঘরে মজদুরী তো মিলতেই পারে। খোদার জগত তো আর ছোট্ট নয়। যে আল্লাহ্ তোমাকে বাচ্চা দিয়েছেন তিনি তার রিযিকের ব্যবস্থা করেই রেখেছেন।” বলল আল হাকাম।

“লুকিয়ে ছাপিয়ে আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে।” বলল আল হাকামের স্ত্রী। এই গোত্রের লোকেরা তোমাকে এমনিতে যেতে দেবে না। কারণ, তুমি টাকা ছাড়াই বিয়ে করেছো, এর বিনিময়ে তোমাকে পেয়ে ওদের শক্তি বেড়েছিল অনেক। আমি তোমাকে একটা ফন্দির কথা বলি, “আগামীকাল আমরা লাকড়ি কুড়াতে বের হয়ে আর ফিরে আসবো না।”

স্ত্রীর কথামতো পরদিন তারা গোত্রের অন্যদের মত কাঠ কুড়ানোর কথা বলে ছেলেকে সাথে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। ছেলের বয়স তখন ছয় মাস মাত্র।

দুপুর গড়িয়ে গেল। তখনও তাদের তাঁবুতে ফেরার নাম নেই। বুড়োদের সন্দেহ হলো। শক্ত সামর্থ্য দুই ব্যক্তি ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওদের খোঁজে। বুড়োদের সন্দেহ ছিল বিবিধ। আল হাকামের পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তো ছিলই তার চেয়ে বেশি ছিল সুন্দরী ওই যুবতী অপহরণের শিকার হওয়ার। তারা আশঙ্কা করছিল, না জানি কোন ডাকাতের পাল্লায় পড়ল কিনা ওরা। দৈবাৎ এক পথিক সন্ধানী-অশ্বারোহীদের বললো, এক যুবককে সুন্দরী যুবতী ও একটি শিশুকে নিয়ে সে নদীর দিকে যেতে দেখেছে।

সন্ধানকারীরা পথিকের কথা মতো ওদিকেই ঘোড়া হাকিয়ে দিল, তাদের সন্দেহ ছিল, আল হাকাম হয়তো তাদের মেয়েটিকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আল হাকাম ও তার স্ত্রী হেঁটে যাচ্ছিল। পথ ছিল অসমতল এবড়ো থেবড়ো। তারা যে পথে যাচ্ছিল তার পাশেই ছিল নদী। হঠাৎ পিছন থেকে ঘোড়ার আওয়াজ শোনা গেল। পিছন ফিরে দেখলো, দুই অশ্বারোহী তাদের দিকেই ধেয়ে আসছে। একটু অগ্রসর হলেই আল হাকাম তাদের চিনে ফেলল। আরোহীরা খাপ থেকে তরবারী বের করে আক্রমণোদ্যত হয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। আল হাকাম নিরস্ত্র ছিল। এটা ছিল আল হাকামের মারাত্মক ভুল যে সে কোন অস্ত্র সাথে রাখেনি। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হতাশার দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল।

"নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়।" বলল তার স্ত্রী।

"অনেক গভীর তীব্র স্রোত, ওরা তো ঘোড়া নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেবে।" বললো আল হাকাম।

"আমি তোমাকে বলছি, তুমি নদীতে ঝাঁপ দাও! বাচ্চাকে তুমি বাঁচাও, ওকে ছাড়া আমি সাঁতরাতে পারব।" স্ত্রী কথাগুলো এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলল যেন সে আল্লাহ্‌র নির্দেশে বলছে।

"বেশি কিছু চিন্তা-ভাবনার অবকাশ ছিল না। আল হাকাম স্ত্রীর কোল থেকে সুবক্তগীনকে নিয়ে এক হাতে ওকে ধরে নদীতে ঝাঁপ দিল। এক হাতে সাঁতরাচ্ছিল আল হাকাম। স্ত্রীও তার সাথে সাথেই সাঁতরে ওর পাশাপাশি থাকতে চেষ্টা করছিল। নদী ওই দিকেই প্রবাহিত হচ্ছিল যে দিকে যাত্রা করেছিল তারা। সন্ধানী অশ্বারোহীরা এদের নদীতে ঝাঁপ দিতে দেখে তীরে ঘোড়া থামাল এবং চিৎকার করে ওদের হুঁশিয়ার করল। কিন্তু ততক্ষণে ওরা নদীর মাঝামাঝি চলে গেছে। ভাগ্যক্রমে নদীর ওপারে গভীরতা কম ছিল। এক পা আর এক হাতে সাঁতরাতে সাঁতরাতে অবশ হয়ে আসছিল আল হাকামের হাত-পা। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে নিজেকে ও শিশুকে পানির উপর ভাসিয়ে রাখছিল। এক পর্যায়ে অবস্থা এমন হলো যে, আল হাকাম আর সাঁতরাতে পারছিল না। তার পা সোজা পানির তলদেশে তলিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সে প্রাণপণ বাচ্চাকে ঊর্ধ্বে তুলে রাখতে শরীরের শেষ শক্তিটুকু প্রয়োগ করলেও বাচ্চা আর নিজের জীবনের আশঙ্কা দেখা দিল। প্রায় তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো আল হাকামের। হঠাৎ তার পা মাটি স্পর্শ করল। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। শুকুর আল্লাহ্‌র। নদীর কূল যেন তাদের বাঁচাতে এগিয়ে এলো। গলা পানিতে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে দেখলো সে। এখনো অনেক দূরে। তলিয়ে যাচ্ছে, আবার হাত-পা ছুঁড়ে এগুতে চাচ্ছে। চিৎকার করে বলল আল হাকাম, "দাঁড়িয়ে যাও ওখানে, ওখানে পানি কম।" কিন্তু ওর কানে যাচ্ছিল না সেই ডাক। আল হাকামও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, স্রোতের তীব্রতায় শক্ত করে দাঁড়ানো অসম্ভব। আল হাকাম তবুও আগালো স্ত্রীর দিকে। ধরে ফেলল ওর চুলে, টান দিয়ে সোজা করতেই স্ত্রীর পা মাটি স্পর্শ করল। সেও দাঁড়াল। স্বপ্নে দেখার মতো তাকাল বাচ্চা ও হাকামের দিকে। যেন মরতে মরতে বেঁচে গেল। মুখে কোন কথা উচ্চারণ করা সম্ভব হলো না। নদীর এপারে এসে গেছে তারা। এখন আর পাকড়াও হবার ভয় নেই। পানি থেকে তীরে এসে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল স্ত্রী। আল হাকামও ছেলেটিকে কোলে শুইয়ে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল। ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত উভয়ে। শরীরে হাঁটার মতো শক্তি তাদের নেই।

অনেকক্ষণ বিশ্রাম করে তীর থেকে অদূরে শহরের দিকে তারা অগ্রসর হল। পৌছল শহরে। এখানকার লোকগুলো তাদের দিকে তাকাচ্ছিল চিড়িয়াখানার আজব চিড়িয়া দেখার মতো। বেশভূষায় এরা এ শহরে নবাগত, তাই দেখছিল সবাই। অনুন্নত কাপড়ে আচ্ছাদিত আল হাকামের স্ত্রী। তার রূপই ছিল এদের দৃষ্টি কাড়ার বড় কারণ। স্বামী-স্ত্রী হাঁটছিল লক্ষ্যহীন গন্তব্যে। গলির যুবক পুরুষেরা রূপসী এই যুবতী ও শিশুসহ আল হাকামের দিকে তাকিয়ে ঈর্ষান্বিত হচ্ছিল ক্ষণিকেই। চোখ ফেরাতে পারছিল না আল হাকামের স্ত্রী থেকে অনেক কামুক পুরুষ।

আল হাকামের স্ত্রীর সৌন্দর্য তাৎক্ষণিক তাদের ফায়দা দিল। এক ধনাঢ্য ব্যক্তির আস্তাবলের নওকরী পেয়ে গেল আল হাকাম। আস্তাবলের পাশেই একটি ঝুপড়িতে থাকতে দিল তাদের। স্ত্রী ঝুপড়িতেই কোলের ছেলে নিয়ে সংসারের গোড়াপত্তন করল।

বেশি দিন আর ঝুপড়িতে থাকা হলো না হাকাম পত্নীর। ডাক এলো মহল থেকে। তাকে নিয়োগ দেয়া হলো মহলের পরিচারিকার পদে। পরদিন যখন আমীরের মহলে হাকামের স্ত্রী কাজের জন্য উপস্থিত হলো, তাকে এগিয়ে এসে নিয়ে গেল এক বয়স্কা মহিলা। মহিলা তাকে গোসল করাল এবং খুব দামী জরিদার শাহী জামা পরিয়ে দিল। জামার নক্শা-ই বলে দেয় এটা মামুলী পরিধেয় বস্ত্র নয়। এটা এমনভাবে ডিজাইন করা আর কাপড় এত পাতলা যে, শরীরের ভাঁজগুলো দেখা যায়। হাতে বাজু, গলা, বুকের অর্ধাংশ খোলা থাকে। হাকাম পত্নীর এসব কাপড় পরতে ভালো লাগছিল না। যাযাবর হলেও শরীর ঢেকে রাখতে অভ্যস্ত ছিল হাকামের স্ত্রী।

মহিলাটা তাকে বোঝাল, আমাদের মালিক নোংরামি পছন্দ করেন না, তিনি পরিপাটি দেখতে অভ্যস্ত। এগুলোতে সেজে থাকলে তোমাকে দেখে খুশি হবেন। কাপড় গায়ে জড়িয়ে তাকে একটি আরশীর সামনে নেয়া হলো। আরশীতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেই নিজের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল। নিজেকে শাহজাদী মনে হতে লাগল। তার চুল আঁচড়ে দেয়া হল। ছড়িয়ে দেয়া হল পিঠের উপর। মহিলা তার সারা শরীরে মনমাতানো সুগন্ধি ছিটিয়ে দিল। নতুন এই সাজে আল হাকামের স্ত্রীকে পরীর মতো মনে হচ্ছিল।

দেরী না করে মহিলা তাকে নিয়ে গেল মনিবের সামনে। বিশাল এক সুসজ্জিত ঘর। মেঝেতে এমন কার্পেট, সাজানো ঘর, ঝলমলে আলো দেখেনি জীবনে যাযাবর যুবতী। আমীর উমারার জীবন-জীবিকার গল্পেই যা শুনেছে।

আল হাকামের স্ত্রীকে দেখে আমীরের দৃষ্টি ওর শরীরেই আটকে রইল। ভূতে পাওয়ার মতো ওর দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘক্ষণ। জ্বলজ্বল করে উঠল তার চোখ। নেশাগ্রস্তের মতো কণ্ঠে মহিলাকে বলল, তুমি যাও! মহিলা চলে গেল।

আমীর আল হাকামের স্ত্রীকে কাছে ডাকল। বসতে বলল। কিন্তু যুবতী বসল না। আমীর দাঁড়িয়ে তার দুই বাজু ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করল, কিন্তু যুবতী মোচড় দিয়ে দূরে সরে গেল। তার বুঝতে বাকি রইল না, পরিচারিকার কাজের কথা বলে আসলে তাকে কেন আমীরের কাছে নিয়ে আসা হয়েছে।

শুনেছি তুমি যাযাবর মেয়ে। এখন তো দেখছি, তুমি নিজেকে শাহজাদী মনে করছো। দেখ আমি তোমার উপর কোন হুকুম চালাব না। তোমাকে উপযুক্ত এনাম দিব, আমার হেরেমে শাহজাদী হয়ে থাকবে।

একথা শুনে যুবতী দরজার কাছে সরে গেল। আমীরের চেহারা আগুনের মতো লাল হয়ে উঠল।

"আমি সোনার দিনার ভর্তি থলিতে লাথি মেরে এখানে ফেরার হয়েছি। নিজেকে নিলামে বিক্রি করতে ইচ্ছুক নই। তা না হলে বিয়ে করে স্বামী নিয়ে নদী সাঁতরে কেন পালিয়ে এসেছি নিজের গোত্র ছেড়ে। আমার স্বামীকে তোমার দশ মেয়ে দিলেও আমি তোমার কাছে যেতে পারব না।"

"স্বামী থেকে হাত ধুয়ে ফেল লাড়কী। বাচ্চার মমত্বও ভুলে যাও। এসো, আমার কাছে এসো।"

তুফানের মতো দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলো হাকামের স্ত্রী। সোজা চলে গেল সেই ঘরে যেখানে ওর পরিধেয় কাপড়গুলো ফেলে এসেছিল।

রাগে গর্জে উঠল আমীর। ডাকল বয়স্ক মহিলাকে। দৌড়ে এলো বয়স্কা মহিলা, আরো এক সেবিকা এবং হেরেমের দু' নারী। তারা মনিবের রাগত চেহারা দেখে হতভম্ব।

"হারামজাদী! শরমালে ভিন্ন কথা ছিল, কিন্তু ও আমাকে অপমান করে বেরিয়ে গেল।"

আমরা ওকে চুল ধরে নিয়ে আসছি। বলল এক খাদেমা।

'না। এই যাযাবর ভিখারিনীকে আমি এমন কঠিন শাস্তি দেবো, যা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বহুদিন।' আমীর দু'জন বিশেষ প্রহরীকে ডেকে বলল, 'আমার আস্তাবলের পাশের ঝুপড়িতে যে হতভাগা থাকে ওকে আজ রাতে হত্যা করে ওর স্ত্রীকে আমার কাছে নিয়ে আসবে, আর ওদের কোলের বাচ্চাটিকে বিক্রি করে দেবে।'

হেরেমের মেয়েরা পরস্পর চোখাচোখি করল। উভয়েই নির্বিকার। মনিব ক্ষোভে জ্বলছে।

"কোন শাহজাদী হলে না হয় এমন দেমাগ সহ্য করা যেতো। হতভাগী এক যাযাবর ভিখারিনীর এতো স্পর্ধা? যাও, সবাই এখান থেকে চলে যাও।"

গভীর রাতে আল হাকামকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে অপহরণ করার চক্রান্ত করা হলো। বেলা অস্ত যাওয়ার পর আল হাকাম তার ঝুপড়িতে এলো। স্ত্রী নিজের কাপড়েই। আমীরের রক্ষিতা যে পোশাক তাকে পরিয়েছিল তা খুলে ছুঁড়ে ফেলে এসেছিল সে।

ভাবছিল আজকে তার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া চক্রান্তের কথা তার স্বামীকে বলবে কি-না। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সে নিয়ে ফেলেছে, আর এক মুহূর্তও এখানে থাকবে না। স্বামীকে নানাভাবে সে এখানে না থাকার বিষয়টি বোঝাতে পেরেছিল। কিন্তু ঘূর্ণাক্ষরেও তার এই ব্যাপারটি জানা ছিল না যে, আজই সে স্বামীকে জীবিত দেখছে, তার কলিজার টুকরো সন্তানকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার চক্রান্ত করা হয়েছে, তার ইজ্জত-সম্ভ্রম লুটে নেয়ার ষড়যন্ত্র পাকা হয়ে গেছে।

সে স্বামীর সাথে যাবতীয় কথা শেষ করে তার সামনে খানা পরিবেশন করল। ঠিক এ সময় ঝুপড়িতে এক অপরিচিতা মহিলা প্রবেশ করল। সে প্রবেশ করেই ঝুপড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি খানা শেষ করে ছেলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে এখনই শহর ছেড়ে পালিয়ে যাও, কোথাও দাঁড়াবে না।"

এই মহিলা ছিল আমীরের বিশেষ আস্থাভাজন দুই রক্ষিতার একজন। সে আমীরের চিৎকার শুনে খাস কামরায় প্রবেশ করে আল হাকামকে হত্যা ও তার স্ত্রীকে অপহরণের চক্রান্ত শুনে ফেলেছিল। সে আল হাকামের স্ত্রীকে এক ঝলক দেখেও ছিল। নিষ্পাপ এই মেয়েটির সম্ভ্রম ও তার নিরপরাধ স্বামী-সন্তানের জীবন বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নিল সে। আরো একজনকে সাথে নিল। নিজেদের দুরন্ত স্বপ্নময় কৈশোরের কথা মনে পড়ল ওদের। তাদেরও স্বপ্ন ছিল বিয়ে করে স্বামী সংসার নিয়ে সুখের ঘর বাঁধবে। কিন্তু টাকার বিনিময়ে এই লম্পট আমীর তাদেরকে চার দেয়ালের ভেতর যৌনদাসীতে পরিণত করেছিল। নিজেদের রূপ-যৌবন ও তারুণ্যের বিনিময়ে ওরা ভোগ করছিল বিলাসী জীবন। বিলাস উপকরণ ও ভোগ্য-পণ্যের অভাব নেই এখানে।

আমীরের হেরেমে ওরা দু'জন নিজেদের ধূর্তামি, চাতুরীপনা ও কূটকৌশলে আমীরের নষ্ট জগতকে আরো সমৃদ্ধ করেছিল। নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিল

আমীরের ঘনিষ্ঠজন ও আস্থাভাজনরূপে। নিজেদের ধর্মীয় জীবন ও নারীত্বকে বিলিয়ে দিয়েছে এরা। হেরেমের চক্রান্ত আর কূটচালে ওরা সিদ্ধহস্ত। স্বয়ং আমীর ছিল ওদের হাতের পুতুল। কিন্তু নারীত্বের ঐশ্বরিক চেতনা আর স্বামীর সংসার নিয়ে সুখময় জীবনের স্বপ্নটা যে মাঝে মধ্যে তাদের কাঁদাত না তা নয়। মানুষের সহজাত পবিত্র সত্তাকে কখনো ছাইচাপা দিয়ে রাখা যায় না। ওরা যখন দেখল, একটি নিরপরাধ যুবতী, দুগ্ধপোষ্য নিষ্পাপ সন্তান ও বিদেশ-বিভূঁইয়ে অসহায় গরীব এক সৎ পুরুষ এক লম্পট আমীরের লাম্পট্যের শিকারে খুন হতে চলছে, তখন তাদের মধ্যে নিজেদের স্বপ্নময় যৌবনকে পঙ্কিলতায় ডুবিয়ে দেয়ার প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু প্রতিশোধের ব্যবস্থা করতে না পারলেও তারা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলো, এদের জীবন বাঁচাবেই।

আল্লাহ্ তায়ালা রহমতের ছায়া বিস্তার করে আল হাকামের স্ত্রীকে সকল কলঙ্ক থেকে পবিত্র রেখেছিলেন। হাজারো বিপদের পরও এই যাযাবর মেয়েটির চরিত্রে সামান্যতম পাপের আঁচড় পড়তে পারেনি। নিজেরা আকণ্ঠ পাপে ডুবে থেকেও এই দু'মহিলাকে আল্লাহ্ তায়ালা আল হাকামের স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষায় উসিলা বানিয়ে দিলেন। হয়তো এটা ছিল আল হাকামের স্ত্রীর পবিত্রতার পুরস্কার।

"আমার পক্ষে বেশিক্ষণ এখানে থাকা সম্ভব নয়, আর এর চেয়ে বেশি কিছু বলাও সম্ভব নয়। তুমি এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাও, এটাই আমার প্রত্যাশা।" এই বলে মহিলা বেরিয়ে গেল।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্ময়াবিষ্ট নেত্রে স্ত্রীর প্রতি তাকাল আল হাকাম। দিনের বেলায় আমীরের বাড়িতে যা ঘটেছিল স্বামীকে বলল হাকামের স্ত্রী। চিন্তায় পড়ে গেল হাকাম। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। স্ত্রী তাকে তাড়া দিল, ওঠ! আগে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু আল হাকামের মধ্যে পালানোর তাড়া নেই। সে বলল, এই মেয়েলোকটি মনে হয় আমীর বাড়ির সেবিকা। কেন সে আমাদের এখনই চলে যেতে বলল? আমি আমীরের সাথে দেখা করব। কিন্তু স্ত্রী তাকে সাথে নিয়ে ঝুপড়ি ছেড়ে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে জিদ ধরল। বলল, এখানে আর এক মুহূর্ত থাকাও নিরাপদ নয়।

যে ঘাতককে নির্দেশ করা হয়েছিল আল হাকামকে খুন আর স্ত্রীকে অপহরণ করতে তারা তখন মদের হাড়ি নিয়ে বেহিসেবে গিলছে। তাদের হাতে উন্নত হাতিয়ার। ছিন্নমূল এক হতদরিদ্রকে খুন করে তার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে আসা এদের জন্যে মামুলী ব্যাপার। সন্ধ্যার আগেই তারা ঝুপড়িটা ভালো করে পরখ করে এসেছিল। কোন বাধা-বিপত্তি, আইন-কানুনের ভয় ছিল না তাদের। তারা এই ভেবে উৎফুল্ল ছিল, একটা পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ হয়েছে।

এরা মদপান শেষ করে আল হাকামের ঝুপড়ির দিকে রওয়ানা হল। ঠাট্টা-বিদ্রূপ, আনন্দ-উল্লাস করে তারা আল হাকামের ঝুপড়ির কাছে গেল। ঝুপড়ির দরজা বন্ধ ছিল। একজন অপরজনকে বলল, তুমি মহিলাকে ধরে ফেলবে। আমি মরদটাকে সাইজ করবো।

বন্ধ দরজা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। ওরা গর্জে উঠল। কে আছিস, বের হ! কিন্তু নিস্তব্ধ। ওদের হুংকার ওদের কানেই ধ্বনিত হলো। অন্ধকারে হাতড়ে খোঁজাখুঁজি করল, কোন মানুষজন পেলো না। ঝুপড়ি ভুল হয়েছে ভেবে ওরা সেখান থেকে অন্য ঝুপড়ির খোঁজে বেরিয়ে গেল।

ততক্ষণে আল হাকাম স্ত্রী-সন্তান নিয়ে শহরের বাইরে চলে এসেছে।

"আমাদের জন্য আল্লাহ্র জমিনও বুঝি সংকীর্ণ হয়ে গেছে।" হতাশ কণ্ঠে বলল আল হাকাম।

"অধৈর্য হয়ো না সুবক্তগীনের বাপ। তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর আর না কর কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা এমন কোন পাপতো করিনি যে জন্যে আমাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, আমি সেই কাঙ্ক্ষিত সন্তানকেই ভূমিষ্ঠ করেছি যার ইশারা আমি পেয়েছিলাম।"

"তুমি একটি বদ্ধপাগল। তোমার জন্যে-ই আমাদের এই শাস্তি।" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল আল হাকাম। "সম্পূর্ণ একটা ভ্রান্ত বিশ্বাসে লিপ্ত রয়েছ তুমি। বিরাট ওলী-বুযুর্গ জন্ম দিয়ে ফেলেছো, এই বিশ্বাস দেমাগ থেকে দূর না করলে তোমার কপালে দুর্ভোগ শেষ হবে না। কুরআন শরীফকে তাবীজ মনে করো না। তোমাকে বিয়ে করাটাই আমার ভুল হয়েছে। গরীবের বউ অসুন্দর হলেই শান্তিতে থাকা যায়। এখন আমি তোমাকে পাহারা দেব না পেটের আহার যোগাব?"

"আমার হেফাযত আমিই করবো, তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। তুমি কুরআন পড়তে জান, অর্থ বোঝ, এরপরও মুখে এমন কথা কিভাবে উচ্চারণ কর!"

স্ত্রীর জবাবে কোন কথা বলল না আল হাকাম। রাগে-ক্ষোভে, নিঃশব্দে ভাগ্যের মুণ্ডপাত করছিল আল হাকাম। ইসলাম ও আল্লাহ্র রহমত থেকে সে এখন নিরাশ।

চল ফিরে যাই।

কোথায়?

তোমাদের কবিলায়। হয়তো ওখানে, নয়তো আশেপাশেই পাওয়া যাবে তাদের। বলল হাকাম।

"ওখানে না গিয়ে বরং ঘোড়াওয়ালা মনিবের কাছেই চল। আমার শরীর বিক্রি করে তোমাকে কাড়ি কাড়ি টাকা এনে দেবো। তুমি আরাম বিছানায় শুয়ে শুয়ে খাবে আর আত্মপ্রসাদে মেতে থাকবে এই ভেবে, বউটা আমার সুযোগ্যই বটে! শুনি, কোন ধাতের পুরুষ তুমি? দেখো, আমি আমার ছেলেকে তোমার মতো কাপুরুষ হতে দেবো না।" ক্ষুব্ধ বাঘিনীর মতো ক্ষীপ্ত কণ্ঠে বলল স্ত্রী।

"আগে তোমার ছেলে বাঁচুক সেই দু'আ কর। তারপর না হয় শাহনশাহ বানাবে।" তিরস্কারের সুরে বলল আল হাকাম।

"আমার ছেলে বেঁচে থাকবে। দেখো, একদিন ইবরাহীমের মতো তোমাকে বলবে, আব্বু, আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি তা তোমাকে দেওয়া হয়নি। তুমি আমার হেদায়েত মতো চলো, আমি তোমাকে কামিয়াবির পথ দেখাব।"

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক ধরনের আদর্শিক লড়াই শুরু হয়ে গেল। পুরুষালী উদ্বেগ আর হতাশা হাকামকে কাবু করে ফেলেছিল। সেই সাথে স্ত্রীর মধ্যে বিরাজ করছিল নিজের স্বপ্নের প্রতি অবিচল আস্থা। স্বামীর বিরূপতায় ও স্বপ্ন পূরণের বিঘ্নতায় হতাশা তাকে বিব্রত করছিল, কিন্তু পূর্বাপর ঘটনা তাকে নিজের আত্মবিশ্বাসে আরো অবিচল করেছিল। ফলে দু'জনের দুই মেরুকরণে লাগামহীন হয়ে পড়েছিল ভাষা। পরস্পর বিতর্কের মাঝে পথ চলছিল তারা। এক পর্যায়ে চুপ হয়ে গেল আল হাকাম।

সেই রাত থেকে আবার তারা যাযাবর জীবনে ফিরে আসে। ব্যতিক্রম এতটুকু যে, আগে তারা থাকতো লোকালয় থেকে দূরে আর এখন থাকে লোকালয়ে। শহরের উপকণ্ঠে এখানে সেখানে। শহরে এটা ওটা করে পানাহার যোগাতে আল হাকামের তেমন কোন বেগ পেতে হয় না। দিন কোনমতে চলে যায়।

দুই বছর এক শহরে থাকার পর আল হাকাম অন্য এক শহরে পাড়ি জমাল। স্ত্রী তার কাছে বায়না ধরল, এখন আর ভবঘুরের মতো এখানে ওখানে থাকা নয়, কোথাও স্থায়ী ডেরা তোলো। ছেলেকে কোন মসজিদে পড়তে দিতে হবে, নয়তো ওরও আমাদের মতো এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে জীবন কাটাতে হবে।

বছর খানিক আগেই আল হাকাম ও তার স্ত্রী ছেলেকে কুরআন শরীফ পড়াতে শুরু করেছিল। মা লক্ষ্য করছিল, তার ছেলে অন্য যাযাবর শিশুদের চেয়ে ভিন্ন। সে অন্য শিশুদের থেকে আলাদা চরিত্রের। কেমন যেন গম্ভীর, ভাবুক, কথা

বলে বুদ্ধিদীপ্ত। অন্য বাচ্চাদের মতো বাজে জিনিসের বায়না ধরে না, কোন জিনিসের জন্য জেদাজেদি করে না। মা এও লক্ষ্য করেছে, তার ছেলে পড়ালেখার প্রতি খুব মনোযোগী। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তার পছন্দ।

এক পর্যায়ে মায়ের সে আশা পূর্ণ হল। আল হাকাম এখন মনস্থির করল, এখানে কিছুদিন থাকবে। ছেলেকে নিয়ে মসজিদের ইমাম সাহেবের নিকট গেলে ইমাম সাহেব ছেলেকে মক্তবে ভর্তি করে নিলেন। ছেলেকে ইমাম সাহেব ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করায় আল হাকাম ও তার স্ত্রী ইমাম সাহেবের যথাসাধ্য সেবাযত্ন করতে লাগল।

প্রথম দিনের সবকে এ ইমাম সাহেব বুঝতে পারলেন, এই ছেলে অন্য দশটি ছেলের চেয়ে ভিন্ন। একেবারে প্রাথমিক স্তরের পড়া সে বাবা-মায়ের কাছেই শিখে ফেলেছিল। সাধারণত পাঁচ-ছয় বছরের শিশুদের যে ধরনের জ্ঞান থাকে এ ছেলের তার চেয়েও অনেক বেশি মেধা ও প্রজ্ঞা তিনি দেখতে পেলেন। তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসিয়ে দিলেন। সেখানেও সে অন্যদের তুলনায় এমন কৃতিত্ব দেখাল যে, ইমাম সাহেব ভাবলেন, এ বাচ্চা অসাধারণ, অনন্য। এখানে শিশু সুবক্তগীন প্রায় চার বছর লেখাপড়া করল।

সুবক্তগীনের বয়স এখন দশ-এগারো। এর মধ্যে সে কুরআন শরীফ তরজমা ও তফসীরসহ পড়ে ফেলেছে। বেশ ক'টি হাদীসের কিতাবও সে ইমাম সাহেবের বিশেষ তত্ত্বাবধানে এরই মধ্যে পড়েছে। সুবক্তগীনের জ্ঞান-পিপাসা উস্তাদের জ্ঞান পরিধিকেও ছাড়িয়ে যেতে চায়। উস্তাদের কাছে সে এমন এমন জটিল সমস্যা তুলে ধরে যেগুলোর সমাধানে উস্তাদেরও হিমশিম খেতে হয়। এমন এমন জ্ঞানগর্ভ প্রশ্ন করে যা তাকে পেরেশান করে তোলে। উস্তাদ বুঝতে পারলেন, এর জ্ঞান-পিপাসা মিটানোর জন্য একে নিজের কাছে না রেখে বড় জ্ঞানীর নিকট কিংবা বড় প্রতিষ্ঠানে পাঠানো দরকার। সুবক্তগীন একদিন উস্তাদকে প্রশ্ন করে, 'উস্তাদজী! আমল ছাড়া এল্‌ম কি পূর্ণতা পায়? তরবারীর জোরে আল্লাহ্‌র রাসূল (স.)-এর পয়গামের প্রসার ঘটানো কি জায়েয? আমি যদি সারা দুনিয়াতে কুরআন-হাদীসের পয়গাম ছড়িয়ে দিতে চাই তবে এর পদ্ধতি কি হওয়া উচিত?' এ ধরনের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হাজারো প্রশ্নের মুখোমুখি হতে লাগলেন সুবক্তগীনের উস্তাদ। শিষ্যের ভবিষ্যত নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। অনেক ভেবে-চিন্তে একদিন আল হাকামকে ডেকে তিনি বললেন, তুমি ছেলেকে বুখারা নিয়ে যাও। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেমের ঠিকানা দিয়ে বললেন, তোমার ছেলের মধ্যে আমি এলেমের যে তৃষ্ণা দেখেছি, তা নিবারণ করতে না পারলে ও পাগল হয়ে যাবে।

শুধু জ্ঞান-পিপাসাই নয় ওর মধ্যে আমি সুপ্ত যে বীরত্বের লক্ষণ দেখছি, ওকে যদি সমর বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তবে এই ছেলে একদিন বিখ্যাত হবে। বর্তমানে চতুর্দিকে যুদ্ধ বিগ্রহ চলছে। মুসলমান রাজা-বাদশাহরা পারস্পরিক হানাহানিতে লিপ্ত রয়েছে। এর সুযোগে কাফের-বেঈমানেরা মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে গোলামে পরিণত করছে। এই ছেলে এসব নিয়ে গভীর চিন্তা করে। সাধারণত গরীবের ঘরে এমন মন-মানসিকতার ছেলে-মেয়ে জন্ম নেয় না। বড় কিছুর আশা করাও গরীবের সন্তানের জন্য মানায় না। তবুও যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয়, কোন সুযোগ পায় তবে এই ছেলে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শাসন কায়েম করে ক্ষান্ত হবে। মুশকিল হলো, ওর মধ্যে দারুণ নীতিবোধ কাজ করে। নীতি-আদর্শের উপর অটল থেকে জীবনে বড় কিছু করা বড়ই কঠিন, তবে নীতিবানের দ্বারাই বড় কিছু হওয়া সম্ভব। সুবক্তগীন এমন এমন নীতি-আদর্শের কথা বলে যা কখনও আমি তাকে বলিনি। হয়ত ওকে ওর জীবনে বহু ঝড়-তুফান মোকাবেলা করতে হবে।

'নীতি-নৈতিকতার কথা ওকে আমি বলেছি'— বলল আল হাকাম। আমার এলেম কালাম বেশি নেই। তবে আমি ন্যায়ের প্রতীক নওশেরোয়ার অধঃস্তন বংশধর। আমি বাপ-দাদা ও মুরব্বীদের কাছে যেসব ন্যায়নীতি ও ইনসাফের কথা শুনেছি, সে সব আমি ছেলেকে বলেছি। তাছাড়া বাড়িতে সারাক্ষণ ওকে কুরআন-কিতাব নিয়ে পড়তে দেখেছি। কিতাবাদি থেকেও সে আদর্শ বাণীগুলো রপ্ত করেছে।

"তুমি একে বুখারায় নিয়ে যাও! আমি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি। ওখানে তোমার ভালো কর্মসংস্থানও হয়ে যেতে পারে। আর হ্যাঁ! একা যেয়ো না। ওই পথটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। পথে ডাকাত, লুটেরাদের খুবই উৎপাত। তোমার তেমন কোন সহায়-সম্পদ না থাকলেও তোমার স্ত্রীই বড় রত্ন। এমন যেন না হয় যে, এই বিদূষী মহিলাকে জীবনের জন্যে হারিয়ে ফেল। তাছাড়া এ ধরনের শিশু-কিশোররাও খুব বেশি অপহরণের শিকার হয়। কাজেই কোন বণিক দলের সঙ্গী হবে। কিছুদিন অপেক্ষা কর, বড় কোন কাফেলা ওই দিকে গেলে আমিই তোমাকে খবর দেব।" বললেন মসজিদের ইমাম।

ওই যুগে দূরের কোন সফরে ডাকাত-লুটেরাদের থেকে আত্মরক্ষার জন্যে দল বেঁধে লোকজন সফর করতো। এক দু'জনকে পেলেই ডাকাত-লুটেরা দল সর্বস্ব লুটে নিত। কখনও পুরো কাফেলা আক্রমণ করতো ডাকাতেরা। অস্ত্রের মুখে ছেলে-মেয়ে ও নারীদের অপহরণ করে গোলাম দাসী হিসেবে বাজারে বিক্রি করে দিত।

যাদের দায়িত্ব ছিল লুটেরা-ডাকাতদের আক্রমণ-অত্যাচার থেকে নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করা, সেসব আমীর-উমরারা ডাকাতদের কাছ থেকে সুন্দরী মেয়ে ও ছোট শিশুদের দাস-দাসী হিসেবে কিনে নিতো। এতে ডাকাত লুটেরারা উৎসাহ পেত। ইমাম সাহেবের আশঙ্কা ছিল যথার্থ। আল-হাকামের স্ত্রী যেমন ছিল সুন্দরী, তার ছেলে সুবক্তগীনের ছিল বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। তার চেয়েও বড় কথা, ইমাম সাহেব বুঝেছিলেন, এই ছেলের মা কোন সাধারণ যাযাবর মহিলা নয়, তার ভেতরে অবশ্যই অসাধারণ গুণ রয়েছে যা অন্য মহিলাদের নেই। ভালো মা ছাড়া এ ধরনের শিশু জন্ম নিতে পারে না। সুবক্তগীনের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই ইমাম সাহেব আল-হাকামকে সতর্ক করেছিলেন। ইমাম সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন, ওর বাবার চেয়ে ওর মায়ের অবদান বিশেষ গুরুত্ব রাখে এক্ষেত্রে।

স্থানীয় কোন কাফেলার যাত্রা-সংবাদ দীর্ঘ দিনেও পাওয়া গেল না। একদিন দেখা গেল, তিনশ' জনের এক বিরাট কাফেলা নারী-শিশু ও বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে সমরকন্দ-বুখারার দিকে যাচ্ছে। কাফেলার অধিকাংশ তলোক সওদাগর মনে হল। ছেলের ভবিষ্যতের দিকে খেয়াল করে আল-হাকাম সওদাগর কাফেলার সাথে মিলে অভিষ্ট লক্ষ্যে যাত্রা করল। সারা দিন বিরামহীন চলল কাফেলা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে একটি ময়দানে কাফেলা যাত্রা বিরতি করল। তাঁবু ফেলে রান্না-বান্না হল। ক্লান্ত-শ্রান্ত যাত্রীরা যে যার মতো গা এলিয়ে দিল ঘুমের কোলে। কয়েকজন তাঁবুর আশে-পাশে পাহারায় নিযুক্ত হল। তাদের হাতে তীর-ধনুক, ঢাল-তরবারী। তখন রাত প্রায় অর্ধেক পেরিয়ে গেছে। হঠাৎ প্রহরীদের কানে ভেসে এলো অশ্বখুরের আওয়াজ। সতর্ক প্রহরীরা ধনুকে তীর যোজনা করল। ক্রমেই আওয়াজ নিকটতর হচ্ছিলো। এক সময় মনে হলো, এক বিশাল সৈন্যবাহিনী এই দিকে ধেয়ে আসছে, হয়তো কোন দিকে যুদ্ধ যাত্রা করেছে কোন সৈন্যদল। আগন্তুকদের সংখ্যাধিক্য আন্দাজ করে প্রহরীরা কাফেলার শক্ত-সামর্থ্য কয়েকজনকে জাগিয়ে দিল। অন্যেরা তখনও ঘুমে অচেতন। জাগিয়ে তোলা ব্যক্তিদের মধ্যে আল-হাকামও ছিল। ভাবসাব দেখে প্রহরীরা নিশ্চিত হলো, আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। সৈন্যদল হলেও এরা বণিক কাফেলার মাল-সামান হস্তগত করবে, আর ডাকাত হলে তো সবই লুটে নেবে। ওরা সংখ্যায় বহু। তাই তারা অশ্বারোহী দলের আক্রমণ আশঙ্কায় কাফেলার নিরাপত্তা নিয়ে ভীষণ চিন্তিত হলো।

দেখতে দেখতে এক বিশাল বাহিনী মশাল জ্বালিয়ে দ্রুত বেগে অগ্রসর হচ্ছে তাঁবুর দিকে। তাঁবুর পাশে এসেই ডাকাত দল মশালগুলোকে তাঁবুতে ধরিয়ে

দিল। বীভৎস ডাক-চিৎকার শুরু করল। ডাকাতেরা ওদের ঘোড়াগুলোকে এভাবে বিক্ষিপ্ত হাঁকাতে শুরু করল যে, তাঁবুর লোকেরা ঘুম থেকে উঠে কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই ওদের ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হতে লাগল। মহিলা ও শিশুরা আর্তচিৎকার দিয়ে যে যেদিকে পারল দৌড়াতে লাগল। মহিলারা কোলের বাচ্চাকে বুকে চেপে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু ডাকাতদের তীব্র আক্রমণে কারো পক্ষেই নিরাপদ স্থানে যাওয়া সম্ভব হলো না।

আল-হাকাম ঘটনার আকস্মিকতায় স্ত্রীকে বগলদাবা করে টেনে একটা ঝোপের আড়ালে নিতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর মনে পড়ল, তাদের কলিজার টুকরো সুবক্তগীন তাদের সাথে নেই। স্ত্রী চিৎকার শুরু করল ছেলের জন্যে। আল-হাকাম ওকে অনেক কষ্টে বুঝাল যে, তুমি চেঁচালে ডাকাত তোমাকে নিয়ে যাবে। স্ত্রীকে আড়ালে রেখে নিরস্ত্র হাকাম বেরিয়ে পড়ল ছেলের খোঁজে। এদিকে তখন ডাকাত দল ঘোড়া থেকে নেমে দু'হাতে ধন-সম্পদ লুটে মেয়ে ও শিশুদের বেঁধে এক জায়গায় জড় করছে। কাফেলার লোকদের আর্তচিৎকার, মহিলাদের ক্রন্দকনরোল আর শিশুদের আর্তনাদে ময়দানে কেয়ামত নেমে এসেছে। ডাকাতদের প্রতিরোধ করার সামর্থ্য তাদের নেই। তীব্র আক্রমণে প্রহরীদলের সবাই নিহত হয়েছে। নিহত হয়েছে প্রতিরোধকারীরাও। পুরো কাফেলা এখন ডাকাতদের কব্জায়। সব মাল-সামান, নারী-শিশু, উট, ঘোড়া ডাকাতরা নিয়ে চলে গেল।

রাত পোহালো। আহতদের যারা আড়ালে গিয়ে কোন মতে প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিল তাদেরও আর বাঁচার আশা রইল না। রক্ত আর লাশে একাকার। কোন সক্ষম পুরুষকেই ডাকাতরা প্রাণে বাঁচতে দেয়নি। যেসব মহিলা ও শিশু ওদের নির্দেশমতো দাসত্ব বরণে গড়িমসি করেছে, সময় ব্যয় না করে হিংস্র জানোয়ারগুলো তাদেরও হত্যা করেছে। সকাল বেলা আল-হাকামের স্ত্রী স্বামী-সন্তানের জন্যে পাগলের মত চিৎকার করে ময়দান জুড়ে খুঁজতে থাকে, কিন্তু সে প্রিয় সন্তানটিকে খুঁজে পেল না। স্বামীকে পেল, সেও আর জীবিত নয় মৃত। আল-হাকামের দেহ তরবারীর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছিল ডাকাতেরা। তার সারাদেহ রক্তে ডুবে গিয়েছিল। বোঝা যাচ্ছিল, সে অনেক লড়াই করেছে, ডাকাতদের উপর্যুপরি আক্রমণে তার মৃত্যু হয়েছে।

সুবক্তগীনের মা ময়দানের সব লাশ ওলট-পালট করে দেখছিল, আর যাকেই পাচ্ছিল বলছিল, তোমরা কি আমার মানিক সুবক্তগীনকে দেখেছ? ও খুব সুন্দর। কাফেলায় আমার ছেলের মতো এতো সুন্দর আর বাচ্চা ছিল না। লাশের পর

লাশ ওলট-পালট করে স্বামীহারা স্ত্রী একমাত্র সন্তানের দেখা না পেয়ে পাগল হয়ে গেল।

বালিয়াড়ীর আড়ালে, ঝোপ ঝাড়ের ভেতর, টিলার চূড়ায় আর ময়দানে হাকামের স্ত্রী সন্তানের খোঁজে পাগলিনীর মতো দৌড়াচ্ছে। ডাকাতদের রেখে যাওয়া তাঁবু আর বিক্ষিপ্ত মাল-সামান ও প্রতিটি লাশকে বারবার ওলট-পালট করে দেখল, কিন্তু সুবক্তগীনকে পেল না। টিলায় চড়ে গলা চড়িয়ে ডাকল, সুবক্তগীন! বাবা, আমার কাছে আয়! বাবা সুবক্তগীন! আমার কোলে আয়। সুবক্তগীন! সুবক্তগীন! সুবক্তগীন!

লুটন্ত কাফেলার যারা বেঁচে ছিল, তারা সাক্ষাত মরণ থেকে রক্ষা পেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত জীবনটা টেনে হেঁচড়ে কোন মতে লোকালয়ে ফিরে চলল। দেখতে দেখতে ময়দান জনশূন্য হয়ে গেল। শিয়াল, শকুন আর হিংস্র হায়েনাদের খোরাক হল মৃতদেহগুলো। আধমরা মানুষগুলোর ওপরও হুমড়ি খেয়ে পড়ল শেয়াল শকুনের দল। তখনও আল-হাকামের স্ত্রী ময়দান, বালিয়াড়ী ও ঝোপ ঝাড়ে তার সন্তানটিকে তালাশ করছিল। ডাকছিল— সুবক্তগীন! বাবা সুবক্তগীন। আমি এখানে, আয় বাবা সুবক্তগীন! আয় সুবক্তগীন!

বেশ কিছুদিন পর্যন্ত যতো কাফেলা, ডাকাতদল, সৈন্যবাহিনী এ পথে গিয়েছে একটি নারীকণ্ঠের আর্তনাদ আর সুবক্তগীন সুবক্তগীন ডাক তারা সকলেই শুনেছে। অনেকেই এই আওয়াজ নিয়ে নানা রূপকথার জন্ম দিয়েছে, আবার অনেকে এটাকে মনে করেছে কোন প্রেতাত্মার ডাক। দেখা গেলো, এই ডাকের ভয়ে এ পথে লোকের চলাফেরাই বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষ প্রেতাত্মার ভয়ে এ পথ এড়িয়ে অন্য পথে গেছে। কেউ সাহস পাচ্ছে না এ পথে চলতে। যদিও সুবক্তগীনকে ডাকা কোন নারীকণ্ঠ এখন আর ঐ টিলা থেকে ভেসে আসছে না। তবুও টিলার দিকে ভয়ে কেউ তাকাচ্ছেও না। আল-হাকাম নিহত হয়েছে। যদি সে জীবিত থাকত তাহলে এই মুহূর্তে স্ত্রীকে টেনে হেঁচড়ে নিরাপদে কোথাও নিয়ে যেত আর বলতো, আমি যা বলেছিলাম তা বুঝতে চাইছিলে না যে, গরীবের ছেলে সত্যের পূজারী হয় না, পেট পূজারী হয়। তোমার কল্পনার শ্বেত-শ্মশ্রুধারী লোকের সেই ঘটনা বাস্তব নয় অলীক, কল্পনা, অবাস্তব স্বপ্ন। ভোগ-বিলাসিতা, ধন-সম্পদ, মিথ্যা আর প্রতারণার যেখানে দাপট সেখানে সত্য ও ন্যায়নীতির মৃত্যু ঘটতে বাধ্য। আজ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকের পরিবর্তে পাষণ্ড, বেঈমান-বদমায়েশরাই সুখ্যাতি পাচ্ছে। সুবক্তগীনের মা! কুরআনের ইঙ্গিত আমাদের মতো ভবঘুরের সন্তানের ভাগ্যে ফলে না। সাধ হোক আর আকাঙ্ক্ষা

হোক, কল্পনা হোক আর বাস্তবই হোক। জনমানবহীন বিজন প্রান্তরে আল-হাকামের স্ত্রীর সুবক্তগীন, সুবক্তগীন আওয়াজ আর কেউ শুনল না। ইতিহাসের পাতা থেকে অন্ধকারে চলে গেল সুবক্তগীনের মায়ের অহাজারি ও কান্না।

ইসলাম মানুষকে দাসী-বাঁদীতে রূপান্তরের ব্যাপারটি প্রায় বিলুপ্তির নিকট নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু খেলাফতে রাশেদার পর রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার আশ্রয়ে গোলাম-বাঁদীর বেচা-কেনা আবার জমে উঠল। বাদশাহ, শাহানশাহ ও সম্রাটরা ভোগ আহ্লাদে ডুবে গেল। মুসলিম শাসকদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র বেড়ে গেল। রাজতন্ত্রের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কবলে খেলাফত ভেঙ্গে খান খান হল। নামে মাত্র একজন খলিফা রইল। প্রকৃত খেলাফতের কিছুই অবশিষ্ট রইল না। রাষ্ট্র পরিচালিত হতে লাগল আমীর উমারার ইচ্ছেমত। আমীর শ্রেণীর হেরেমগুলো গোলাম-বাদীতে ভরে গেল। আরাম-আয়েশ ভোগ-বিলাসিতার আয়োজনে শাসক শ্রেণীর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। দাস-দাসীরা পরিগণিত হলো আভিজাত্যের প্রতীকস্বরূপ।

বুখারার এক মাঠ লোকে লোকারণ্য। অসংখ্য মানুষের ভীড়। হাঁক ডাক হচ্ছে। ডাক উঠছে। মানুষের মেলা। বনি আদম কেনাবেচার হাট। দলবেঁধে ছেলে-মেয়ে, তরুণ-তরুণী ও মহিলাদের সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়েছে। নিলাম হচ্ছে কয়েকটি কাঠের মাচাং-এ। উপরে তাঁবু টানানো? । একটি মাচাং-এ কয়েকটি তরুণী। আনকোরা। ডাক উঠছে,...ইনটেক, কুমারী, সম্পূর্ণ অব্যবহৃত। সরাসরি ঘর থেকে নিয়ে আসা। উমদা তমাল দাম কম। মাত্র প্রতিটি একশ' দিনার। কে আছো বল....একশ' একশ' একশ'। দু'কিশোরীর কাঁধে হাত রেখে হাঁক ছাড়ল এক বিক্রেতা।

এই কিশোরী দল এখানে বিক্রিপণ্য। কাফেলা লুটের শিকার। উঁকি ঝুঁকি দিয়ে ওদের শরীর আর চেহারা পরখ করছে ক্রেতাদল। আমির-উমরার হেরেমের রক্ষিতা, আদম ব্যাপারী ও মেয়েদের ফেরীওয়ালা, যারা ওদের নাচ-গান শিখিয়ে বাজারে বাজারে ব্যবসা করে এমন লোকেরা এখানকার ক্রেতা।

একটু দূরে একটি টিলাসদৃশ জায়গায় আরেকটি জটলা। ওখানে বালক, শিশু আর পুরুষদের হাট। ক্রেতারা গরু-ছাগলের মতো ওদের নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখছে। অপেক্ষাকৃত কমবয়সী বালকদের দাম বেশি। দশ বারো বছরের কয়েকটি বালক অঝোর ধারায় অবিরাম কাঁদছে। একটি ছেলে ওদের ব্যতিক্রম।

অন্যেরা কাঁদলেও তার মধ্যে কোন ভাবান্তর নেই। নিরুদ্বেগ, গম্ভীর। এসব বালককে বণিক কাফেলা থেকে অপহরণ করা হয়েছে– যে কাফেলার সাথে আল-হাকাম তাঁর স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বুখারার পথ ধরেছিল। নিরুদ্বেগ বালকটিই সুবক্তগীন। দেখতে সে অন্য বালকদের মতো ফর্সা না হলেও প্রাণবন্ত। সুস্থ সবল চেহারায় তার আভিজাত্যের ছাপ।

ক্রেতাদের মধ্যে হাজী নসর-এর প্রতিনিধিও উপস্থিত। হাজী নসর বুখারার উপকণ্ঠের এক জমিদার লোক। সে তার প্রতিনিধিদের বলেছিল, বয়স্ক গোলামের চেয়ে তার দরকার কমবয়েসী কয়েকটি বালক। যাদের তিনি নিজের মতো করে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলবেন, আস্থাভাজন হিসেবে নিজের বিশেষ কাজে ব্যবহার করবেন। সুবক্তগীনকে দেখে হাজী নসরের প্রতিনিধিদের পছন্দ হলো। তাকে খবর দিলো। হাজী নসর এসে বালকদের কান্না দেখে হতাশ হলেন, কিন্তু নির্বিকার শান্ত-সুবক্তগীনের চেহারায় তার দৃষ্টি আটকে গেল। রাশভারী গলায় তিনি বললেন, এসব বালকদের সামলানো সহজ ব্যাপার নয়। তবে একে নিয়ে নাও। সুবক্তগীনের প্রতি অঙ্গুলি ইশারা করে বললেন তিনি। দাম মিটিয়ে সুবক্তগীনসহ আরো ক'টি বালককে টেনে নিয়ে এলো হাজীর লোকেরা।

ঘরে এসে সুবক্তগীনকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন হাজী নসর, তোমার কী নাম?

সুবক্তগীন।

তোমার মা-বাবা কি জীবিত?

জানি না। আমরা তাঁবুতে ঘুমিয়ে ছিলাম। ডাকাতরা তাঁবু আক্রমণ করল, আমি দৌড়ে পালাতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু এক লোক আমাকে ধরে অনেক লোকের সাথে একত্র করে হাত-পা রশিতে বেঁধে ফেলল। এরপর এখানে নিয়ে এল। আব্বু-আম্মু কোথায় আমি জানি না।

তোমার আব্বু কি কাজ করত?

আমীরদের ঘরে কাজ করতো।

তুমি কাঁদছো না কেন?

এর উত্তর দেয়ার আগে আমি জানতে চাই, আপনার ধর্ম কি?

আমি মুসলমান। আমি হাজী। বললেন হাজী নসর।

তাহলে আমার নয় আপনার রোদন করা উচিত।

আপনার হজ অর্থহীন। আমাকে আব্বু বলেছিলেন, কুরআনের নির্দেশ হলো, কোন মানুষ কোন মানুষকে গোলাম বানাতে পারে না। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস

করছেন, আমি কাঁদছি না কেন? আমি বুঝতে পারছি না এ অবস্থায় আমি কাঁদবো না হাসবো। আমার বয়স আপনার মতো হলে হয়তো এ কথার সঠিক জবাব আমি দিতে পারতাম।

হাজী নসর অবাক হয়ে গেলেন সুবক্তগীনের জবাব শুনে। এতটুকু বালকের মুখে এ ধরনের বিজ্ঞোচিত জবাব আর পাল্টা প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন এমনটি তিনি কল্পনাও করেননি।

এ ধরনের কথা তোমাকে কে শিখিয়েছে?

আমার এক উস্তাদ আমাকে কুরআন-হাদীস পড়িয়েছেন। তিনি যে মসজিদের ইমাম ছিলেন, সেই ঠিকানা এবং বুখারায় পাঠানোর জন্যে লেখা তার চিঠির কথাও সে বলল। আরো বলল, তার বাবা নওশেরোয়ার বংশধর। সে তার বাবার মুখে ন্যায় ও ইনসাফের বহু কাহিনী শুনেছে। শুনেছে, তাদের পূর্ব পুরুষদের বহু কীর্তি-কাহিনী। এও বলল, আমার আম্মা প্রায়ই স্বপ্ন দেখতেন, তাকে শ্বেতশুভ্র এক দাড়ি-ওয়ালা বুযুর্গ ব্যক্তি বললেন, তুমি এমন এক ছেলের জন্ম দেবে যে বড় হয়ে অন্যায় রোধ করবে, আর দুনিয়াতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। বুযুর্গ এ কথাও বলতেন, সেই ছেলে যদি আমি নাও হই তবে আমার বংশে এমন ছেলে অবশ্যই জন্ম নেবে।

তুমিও তোমার মায়ের স্বপ্নে বিশ্বাস কর?

মায়ের কথায় কিভাবে বিশ্বাস করব। গোলাম দাসীদের আবার আত্মবিশ্বাস ও ঈমান-আকীদা থাকে নাকি? আপনি কি আমাকে জানোয়ারের মতো মনে করে টাকার বিনিময়ে কিনে আনেন নি? যারা কেনা গোলাম তাদের নিজস্ব চিন্তা ও বিশ্বাসের কোন মূল্য আছে কি?

তোমরা যদিও আমার কেনা গোলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে জীব-জন্তুর মতো রাখবো না। তোমাদেরকে আমি মানুষের মতো করেই গড়ে তুলব। হাজী নসর বললেন।

তুমি কোন কাজ জান?

আমাকে আব্বু-আম্মু বুখারায় নিয়ে আসছিলেন পড়ালেখার জন্যে। বলল সুবক্তগীন।

আমি তোমাদেরকে আমার ছেলেদের গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দিচ্ছি।

তুমি তার সেবাযত্ন করবে, আর লেখাপড়া করতে চাইলে তাও করতে পারবে।

সুবক্তগীন রচিত 'পান্দে নামা' নামক একটি পুস্তক থেকে জানা যায়, সুবক্তগীন তিন বছরকাল হাজী নসর-এর বন্দী দশায় ছিলেন। কিন্তু সেখানে দৃশ্যত গোলাম হলেও তার জীবন গঠনে হাজী নসর-এর পৃষ্ঠপোষকতা ছিল কল্যাণকামী অভিভাবকের মত। হাজী নসর অধিকাংশ সময় সফরে কাটাতেন। ইতিহাস এ ব্যাপারে নীরব যে, প্রকৃতপক্ষে হাজী নসর কোন আমীর শাসক ছিলেন না, শুধু ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তবে একথা বোঝা যায়, হাজী নসর অন্যদের তুলনায় অনেকটা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

সুবক্তগীন গৃহশিক্ষকের হাতে ন্যস্ত হলেও গৃহশিক্ষক প্রথমে তাকে গোলামের চেয়ে বেশি কিছু মনে করেন নি। কিন্তু প্রথম দিনেই সুবক্তগীন গৃহ শিক্ষককে বুঝিয়ে দিন, সে জন্মসূত্রে গোলাম নয়, ভাগ্য বিড়ম্বিত এক বালক। দুর্ভাগ্যক্রমে সে এখানে ভৃত্যে পরিণত হয়েছে।

হাজী নসরের এক ছেলে কুরআন শরীফ ভুল পড়ছিল। সুবক্তগীন তার ভুল নিজে না শুধরিয়ে গৃহশিক্ষকের কাছে গিয়ে বলল, সাহেবজাদা ভুল পড়ছে। গৃহশিক্ষক সুবক্তগীনের উপস্থিতবুদ্ধি ও বিদ্যা দেখে বিস্মিত হলেন এই ভেবে যে, এই পুঁচকে ভৃত্য কুরআন শরীফের ভুলও ধরতে পারে! তিনি সুবক্তগীনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কুরআন শরীফ পড়া কোথায়, কার কাছে শিখেছ? জবাবে সুবক্তগীন গৃহশিক্ষককে তার মা-বাবা, উস্তাদ এবং তার অপহরণের সব ইতিবৃত্তই শোনাল। গৃহশিক্ষক সুবক্তগীনের আচরণ ও কথাবার্তায় মুগ্ধ হলেন এবং তার প্রতি একটু বেশি মনোযোগী হয়ে পড়লেন। কিন্তু হাজী নসর এদের এতটুকুই লেখাপড়া শিখাতে ইচ্ছুক ছিলেন যতটুকু করলে সৈনিক ও সিপাহী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এদের জন্য এর বেশি শিক্ষাকে তিনি নিজের জন্যে ক্ষতিকর ভাবছিলেন।

নিজ সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারেও হাজী সাহেবের একটা সীমা নির্ধারিত ছিল। যতটুকু লেখাপড়া করলে ধর্মের জরুরী জ্ঞান লাভ করা যায় আর যে সব কলাকৌশল রপ্ত করলে তেজস্বী অশ্বারোহী, বীর সেনাপতি আর বাহাদুর যোদ্ধা হওয়া সম্ভব ছেলেদেরকে তিনি এই পরিমাণ যুদ্ধকৌশল ও বিদ্যা শেখানোর জন্যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন গৃহশিক্ষকের উপর। কিন্তু হাজী নসর-এর ছেলেদের কেউই সুবক্তগীনের মতো দূরদর্শী এবং মেধাবী ছিল না। যুদ্ধ বিদ্যা, তীর চালানো, ঘোড় সওয়ার কি পুঁথি-পুস্তক কোন ব্যাপারেই খুব একটা আগ্রহ ছিল না হাজীপুত্রদের মধ্যে। পক্ষান্তরে কিছু দেখে, কিছু শুনে এবং কিছুটা নির্দেশনা পেয়েই সুবক্তগীন দ্রুত যুদ্ধ কৌশল, ঘোড় সওয়ার ও তীর ধনুক-তরবারী চালনায় সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠছিল।

গৃহশিক্ষক যেমন সুবক্তগীনের প্রতি ঝুঁকে পড়লেন, অন্য ছেলেরাও সুবক্তগীনের প্রতি সশ্রদ্ধ ছিল। সে কথা বলতো সহাস্যবদনে। কখনো কাউকে কটাক্ষ করে কথা বলতো না। তার আচরণ ও মার্জিত ব্যবহার শিক্ষককে তার প্রতি মনোযোগী করে তুললো। শিক্ষক তার অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য উজাড় করে দিয়ে তাকে জ্ঞানের রাজ্যে ডুবিয়ে দিতে লাগলেন। মাত্র তিন বছরে হাজী নসরের আশ্রয়ে পরিপূর্ণ যোদ্ধায় পরিণত হয় সুবক্তগীন। শিক্ষক তাকে ইসলামী ইতিহাস ও ঐতিহ্যেরও শিক্ষা দেন। অপরদিকে আয়েশী হাজীপুত্ররা সুবক্তগীনের কৃতিত্বে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হয়ে ভোগ-বিলাসিতায় তলিয়ে যেতে থাকে।

দীর্ঘ সফর থেকে ফিরে হাজী নসর যখন সুবক্তগীনকে দেখলেন, তখন মনে হলো তিনি অন্য কাউকে দেখছেন। কৈশোর পেরিয়ে সে তখন পূর্ণ স্বাস্থ্যবান সুঠাম যুবকে পরিণত হয়েছে। একদিন হাজী নসর সুবক্তগীনের যুদ্ধকৌশল, তীরন্দাজী ও অশ্বারোহণ দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন। সুবক্তগীনের সমর নৈপুণ্যে হাজী নসর তাকে তার নিজস্ব রক্ষী বাহিনীর দলনেতা এবং গোলামদের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সুবক্তগীন হাজী নসর-এর ডান হাতে পরিণত হল।

সে সময় আলপ্তগীন বুখারার গভর্ণর ছিলেন। তুর্কী খেলাফতের মসনদে দ্বিতীয় আব্দুল মালেক সমাসীন। হাজী নসর আলপ্তগীনের খুব প্রিয়ভাজন ছিলেন। এক তথ্য মতে ৯৫৭ সাল মোতাবেক ৩৪৮ হিজরীতে একদিন হাজী নসর আলপ্তগীনের সাথে মোলাকাত করতে গেলেন। সে সময় সুবক্তগীনও সাথে ছিল। তখন সুবক্তগীনের বয়স বিশ-একুশ বছর। ইতিহাসে হয়তো এটাই প্রথম ঘটনা যে, কোন যাযাবরের অপহৃত ছেলে গোলাম হিসেবে বিক্রি হওয়ার পরও বুখারার গভর্ণর হাউজে প্রবেশাধিকার পেল। সাক্ষাতের পর আলপ্তগীন হাজী নসরকে বললেন, আপনি এই গোলামকে আমার হাওলা করে দিন। আলপ্তগীন বিভিন্ন সূত্রে হাজী নসর আশ্রিত সুবক্তগীনের কর্মকুশলতার সংবাদ আগেই পেয়েছিলেন। সাক্ষাতে সুবক্তগীনকে দেখেই তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন, এই যুবকের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া আলপ্তগীনের কন্যা ছাড়া প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো কোন যোগ্য উত্তরাধিকারও তার নেই। তিনি মনে মনে এমন যোগ্য এক উত্তরসূরি খুঁজছিলেন।

কিন্তু এমন দামী রত্ন হাজী নসর হাতছাড়া করতে কোন মতেই রাজী ছিলেন না। অনেক বলা কওয়ার পর অভাবনীয় উচ্চমূল্যের প্রস্তাব দিলে হাজী নসর সুবক্তগীনকে হস্তান্তর করতে সম্মত হলেন।

সে সময় আলপ্তগীন, সুবক্তগীন ধরনের নাম সাধারণত তুর্কীরা রাখতো। সুবক্তগীনের মা তুর্কী হওয়ার কারণে ছেলের নাম তুর্কী ধাঁচে রেখেছিল। সে সময় তুরস্কের শাসন ক্ষমতা ছিল অমুসলিমদের হাতে। শাসকদের অত্যাচার-উৎপীড়নে মুসলমানরা তুরস্ক ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছিল। দেশ ছাড়াদের মধ্যে সুবক্তগীনের মায়ের বাপ-দাদাও ছিল।

দৈহিক সৌন্দর্য আর মেধা-মননে তুর্কীরা ছিল অন্যদের তুলনায় আকর্ষণীয়। এ জন্য ডাকাত ও লুটেরাদের হাতে বন্দী হয়ে যে সব তুর্কী বিক্রির জন্য হাটে উঠত তাদের দাম অন্যদের চেয়ে বেশি হতো। বলখ, গজনী, বুখারা ও আশ-পাশের এলাকায় বহু তুর্কী গোলাম-বাঁদী পাওয়া যেতো। দেশ জুড়ে এদের গোলামীর সুখ্যাতি ছিল। এরা খুবই বিনয়ী, অনুগত ও বিশ্বস্ত। মুনিবের স্বার্থ রক্ষায় এরা অতুলনীয়।

তুমি কি সে সব গোলাম বংশের, যাদের বেলায় এই অঞ্চলের বেশ সুখ্যাতি রয়েছে? আলপ্তগীন সুবক্তগীনকে জিজ্ঞেস করলেন।

সুবক্তগীন তখন তার দরবারে মাথা নীচু করে ক্রীতদাস হিসেবে দণ্ডায়মান। মনিবের প্রশ্নের জবাবে নিরুত্তর।

তুমি আমাকে তোমার আদব-আখলাক দিয়ে বুঝাতে চাচ্ছো যে, তুমি গোলাম হিসেবে খুবই বিশ্বস্ত হবে, তাই না?

আলপ্তগীন ধীর পায়ে গোলামের কাছে এসে পিঠে আলতো চপেটাঘাত করে জোর গলায় বললেন, বেটা! মাথা উপরে উঠাও, বুকটান করে দাঁড়াও, আমার চোখে চোখ রেখে দেখ, আমিও তুর্কী, তুমিও তুর্কী।

সুবক্তগীন মাথা তুলে মনিবের দিকে তাকাল। মনিব তাকে নিজের কাছে বসিয়ে বললেন, তুমি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি সৎ ও কৌশলী যোদ্ধা। আসলে মানুষ শুধু জ্ঞানের দ্বারা আলেম হতে পারে না, শুধু আমল দ্বারাও পূর্ণ মানুষ হতে পারে না। মানব জীবনে ইলম ও আমলের সমন্বয় থাকতে হয়। আরো একটা ব্যাপার আছে, ইলম থাকা সত্ত্বেও আমল বিশুদ্ধ হয় না যতক্ষণ না সে ব্যক্তি কোন বুযুর্গ ব্যক্তির নির্দেশনামতো নিজেকে গঠন করে। তোমার সৌভাগ্য যে তুমি জন্মসূত্রে ধর্মীয় চেতনা পেয়েছ আর দু'জন বুযুর্গ ব্যক্তির সংস্পর্শে দীক্ষা নিয়েছ। তোমার মধ্যে ইলম ও আমলের সমন্বয় ঘটেছে। এটা বড় গুণ।

আমার মধ্যে এমন কোন গুণ নেই যা দেখে বুখারার গভর্ণর মুগ্ধ হতে পারেন। বলল সুবক্তগীন।

এটাই তো তোমার বড় গুণ যে, তুমি একই সাথে তুর্কী ও গোলাম। তোমার মত আমিও তুর্কী এবং গোলাম ছিলাম। ছোটবেলায় আমাকেও এমন কঠিন দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে যেমন কঠিন গোলামীর জীবন তুমি বয়ে চলেছ। তবে তুমি জন্মসূত্রে মুসলিম আর আমার মা-বাবা ছিলেন অমুসলিম। আমি গোলাম অবস্থায় মুসলমান হয়েছি। আমি দীর্ঘদিন একজন বুযুর্গ ব্যক্তির মুখে ইসলামের নীতি ও আদর্শের কথা শুনেছি। ইসলামের কথা শুনে শুনে আমার মন সত্যধর্ম গ্রহণের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। একদিন সেই বুযুর্গের হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলাম।

ইসলাম বলে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই। কেউ কারো প্রভু অথবা গোলাম নয়, টাকায় বিক্রি হওয়ার পণ্য নয় মানুষ। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করবে মানুষ। নিজের মর্জি মতো মানুষের উপর প্রভুত্ব করার অধিকার কোন শাসকের নেই। শাসকরা প্রভু নয় সেবক। আমি যদি মুসলমান না হতাম, আমার মনে যদি ইলম ও আমলের তৃষ্ণা সৃষ্টি না হতো, তাহলে হয়তো আজো গোলামই রয়ে যেতাম, এ সম্মান ও ক্ষমতার আসন পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হতো না আমার।

সুবক্তগীন বললো, আমার আম্মু আমাকে বলতেন, তুমি বড় হলে অনেক সুনাম কুড়াবে। তোমার তরবারীর আঘাতে মিথ্যা অপসারিত হবে। তিনি আমাকে কুরআনের সেই আয়াত সম্পর্কে বলতেন যা হযরত ইবরাহীম তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, "আপনি এই সব জড় পদার্থের পূজা করেন যেগুলো শোনে না, বলতে পারে না, কিছু করতে পারে না। আপনি আমার সাথে আসুন। আমি আপনাকে সঠিক পথে নিয়ে যাব।" আর আমার মা আমাকে বলতেন, "তুমি সে সব মূর্তি পূজারীদের সেই পবিত্র মা'বুদের পথ দেখাবে যিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর বান্দা ও রাসূল (স.)।" আমার মা'র এসব কথা শুনে আব্বা বলতেন, "তোমার মা'র আকীদা সঠিক কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা অলীক। কারণ, গরীবের সন্তান সুখ্যাতি পায় না, ওদের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা, বীরত্ব থাকে না, তারা হয় পরমুখাপেক্ষী ও কাপুরুষ। সুখ্যাতি অর্জন করতে হলে বীরত্ব, সত্যনিষ্ঠ হতে হয় এবং শাসক রাজা-বাদশাহদের সাথে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হতে হয়। ন্যায় নিষ্ঠা দিয়ে মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে হয় কিন্তু গরীবের সন্তনদের চরিত্রে এসব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটে না, ঘটাতেই পারে না, সৎ গুণাবলী অর্জনের সুযোগই তারা পায় না।"

আলপ্তগীন বললেন, তবে আমি বিশ্বাস করি, গরীবের সন্তানও বড় হতে পারে। কেন পারবে না, আরবের বেদুইন উট ও মেষ রাখালরা যদি সত্যের

আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আধা পৃথিবীর রাজত্ব করতে পারে তাহলে তুমি কেন পারবে না? বুঝতে হবে, যাযাবরের সন্তানরা এবং গোলাম হওয়ার পরও তুমি এখন আমার সাথে পাশাপাশি বসে আছ। কোন জাত-গোলাম এমনটি স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। আমার মনে হয়, তোমার মায়ের স্বপ্ন সফল হবে। তোমার বিশ্বাস, আস্থা ও কর্মনিষ্ঠা তোমাকে এ পর্যায়ে উন্নীত করেছে। আমি তোমার মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। তুমি যদি চেষ্টা কর তবে জীবনে উন্নতি করতে পারবে অবশ্যই।

আমার নিজের জন্যে কোন চাহিদা নেই। কোন পদ-পদবীর আগ্রহ আমার নেই। তবে আমি অবশ্যই একটা কিছু প্রত্যাশা করি, কিন্তু সেটা কি তা বুঝাতে পারবো না। বলল সুবক্তগীন।

হেসে ফেটে পড়লেন আলপ্তগীন। বললেন, এমন অবস্থা আমারো গেছে। আমিও বুঝে উঠতে পারতাম না আমার কি করা উচিত। সময়ই আমাকে বলে দিয়েছে আমার কি করণীয় ও কর্তব্য। তুমিও অচিরেই বুঝতে পারবে, কি তুমি চাও, কি তোমাকে করতে হবে। আজ থেকে তুমি নিজেকে আর গোলাম মনে করো না। এখন থেকে তুমি স্বাধীন। শুধু স্বাধীন নও, আমার প্রশাসনের একজন সম্মানিত জিম্মাদার ব্যক্তি।

সুবক্তগীনের হৃদয়ে ছিল এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। মিথ্যাকে দূর করে সত্যের বিজয় কেতন উড়ানো, মানুষের বিশ্বাসের নোংরামি দূর করে তাদের সঠিক পথের দিশা দেয়া এবং সুন্দরের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা তার হৃদয়ে যেন অগ্ন্যুৎপাত ঘটাতে চাইত কিন্তু পরিস্থিতি তাকে দমিয়ে রাখতো। এতটুকু সে বুঝতো, একটি নির্ভেজাল, সুন্দর, সত্য দিন দিন তার মধ্যে পুষ্ট হচ্ছে, বেড়ে উঠছে। তারুণ্য যৌবনের তাড়না তার মাঝে ছিল না এমন নয়, কিন্তু তা কখনও তাকে আদর্শচ্যুত করতে পারত না। সে প্রচণ্ডভাবে অনুভব করছে, বিপ্লব তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এক যুদ্ধ-বিজয় তার হৃদয়ে তোলপাড় শুরু করে দিয়েছে।

পরদিন পড়ন্ত বিকেলে আস্তাবল থেকে একটি তাজী ঘোড়া নিয়ে ভ্রমণের জন্যে বেরিয়ে গেল। শহর থেকে বেরিয়ে সুবক্তগীন ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল এবং জোরছে ঘোড়া ছুটাল। ধুলি উড়িয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল সওয়ারী। হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো নারী কণ্ঠে আর্তনাদ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, এক সওয়ারী ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাচ্ছে, লাগামহীন ঘোড়া ছুটছে, ঝুলে রয়েছে মহিলা আরোহী। সুবক্তগীন বুঝতে পারল, ঘোড়ার জীন ঢিলে হওয়ায় সওয়ারী এদিক

সেদিক হেলে পড়ছিল। ঘোড়া এই সুযোগে সওয়ারীকে ফেলে দিয়েছে। মগড়া স্বভাবের ঘোড়া সাধারণত এমনটিই করে থাকে অথবা সওয়ারী এদিক ওদিক হেলে পড়ার কারণে ঘোড়া ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সওয়ারী ফেলে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে এ কাণ্ড করেছে। সুবক্তগীন তার ঘোড়া মহিলার দিকে ছুটাল।

ঘোড়াটি এলোপাতাড়ি দৌড়াচ্ছিল। মহিলা শুধু চিৎকারই করছিল আর বলছিল, রিকাব থেকে অমার পা ছাড়িয়ে দাও, লাগামটা ছিঁড়ে ফেল, কিন্তু ভড়কে যাওয়া ঘোড়া ওর পিছনে অন্য সওয়ারীর আগমনে বেসামাল হয়ে এদিকে ওদিকে এঁকে বেঁকে প্রাণপণে পলায়নের চেষ্টায় দ্রুত গতিতে দৌড়াতে শুরু করল। পাশেই ছিল বহতা নদী। দিকভ্রান্ত ঘোড়া শেষ পর্যন্ত নদীর দিকেই ধাবিত হল। সুবক্তগীন নিজের ঘোড়াকে আরো তীব্র বেগে ছুটাল। বিদ্যুত গতিতে তার ঘোড়া পলায়নপর ঘোড়াকে তাড়িয়ে ছুটল। এক পর্যায়ে সুবক্তগীনের ঘোড়া মহিলার ঘোড়ার গতিরোধ করতে আগে বেড়ে পথ রোধ করতে চাইল। সুবক্তগীন তখন লক্ষ্য করল, এতো সাধারণ কোন মহিলা নয়। এতো আমীর বা রাজকন্যা হবে। উদ্ভিন্ন যৌবনা, উর্বষী তরুণী। মাথার চুল এলোমেলো হয়ে তার মুখ ঢেকে ফেলেছে, ওড়না রেকাব আর লাগামে পেঁচিয়ে বেচারীর দুর্দশা আরো বাড়িয়েছে। সুবক্তগীন চকিতে হাত বাড়িয়ে রেকাবে আটকে যাওয়া তরণীর পা ছাড়িয়ে দিল এবং ত্বরিৎ গতিতে তরুণীর ঘোড়ার লাগাম ওর মুখের কাছ থেকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিল। তরুণীকে সে নির্দেশের সুরে বলল, তুমি লাফ দিয়ে আমার ঘোড়ায় উঠে আস। মুখের কথা শেষ না হতেই সে নিজের ঘোড়া থেকে নেমে ওই ঘোড়াটাকে বাগে আনার চেষ্টা করল। ইত্যবসরে তরুণীর ঘোড়া হেচকা টান মেরে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। টানের তীব্রতা সামলাতে না পেরে তরুণীও ছিটকে পড়ল পানিতে।

পাহাড়ী নদী। প্রচণ্ড স্রোত। তরুণী পানিতে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে সাঁতরাবার চেষ্টা করছিল। ঘোড়া ওকে ফেলে থমকে দাঁড়ায়। সুবক্তগীন পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তরুণীকে উদ্ধার করতে। তার ধারণা ছিল তরুণী হয়তো সাঁতরে উঠতে পারবে না। সে তরুণীকে নিজের কাঁধে তুলে তীরে রাখা ঘোড়া দু'টিকে ধরে একসাথে এনে দাঁড় করাল। এমন দুরবস্থার শিকার হয়ে যে কোন তরুণীর ঘাবড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু তরুণী ভীত হওয়া তো দূরে থাক সুবক্তগীনের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।

তুমি বোকা না দুঃসাহসী! আজ তোমার মৃত্যু অবধারিত ছিল। বলল সুবক্তগীন।

আমি এমন বাপের বেটি যিনি বোকা নন সাহসী। বলল তরুণী। আমি বুখারার শাসক আলপ্তগীনের কন্যা। চলো, তোমাকে পুরস্কার দেবো। তুমি আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছো।

না, আমার এই পুরস্কারই যথেষ্ট যে, আমার শুভাকাঙ্ক্ষীর কন্যাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছি। আমি তোমার ঘোড়ার জীন বেঁধে দিচ্ছি।

তরুণী আর সুবক্তগীনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান তেমন নয়। উভয়েই তরুণ। টগবগে যুবক-যুবতী। তরুণী প্রাণোচ্ছল, সুদর্শনা, পটলচেরা চাহনী, মসৃণ ত্বক ও লাবণ্যময় চেহারার অধিকারিণী। সুবক্তগীনের গায়ের রং পোড়ানো তামাটে হলেও তার দেহের গড়ন পৌরুষদীপ্ত, সুঠাম ও আকর্ষণীয়। উভয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পাশাপাশি বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছে। পথে যেতে যেতে তরুণী যুবককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল, কি তার পরিচয়, তার ঠিকানা কোথায়। সুবক্তগীন তার জীবন ও এখানে আগমন বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে তরুণীকে বলল।

রাতে আব্বা তোমার কথাই বাড়িতে আলোচনা করেছিলেন। তিনি হয়তো সেনাবাহিনীতে তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দান করবেন।

নিজের সেনা বাহিনী! সেনাবাহিনী তার হয় কি করে, সেনাবাহিনী তো থাকে কেন্দ্রীয় শাসকের অধীনে!

তোমার কথা ঠিক, কিন্তু আব্বা হয়তো অন্য কিছু ভাবছেন। তিনি হয়তো হুকুমত নিজের কব্জায় নিতে চাচ্ছেন। এ জন্য বুখারাতে যে সেনা ইউনিট রয়েছে এদের মধ্যে নিজস্ব লোকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় শাসন এখন শিথিল হয়ে গেছে, তারা আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসে ডুবে আছে। এরা ধর্ম সম্পর্কে কটুক্তি করছে, ধর্ম সম্পর্কে এদের অনাস্থা মাত্রা ছড়িয়ে গেছে। তিনি এই জমিনে প্রকৃত ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় একান্ত আগ্রহী। গত রাতে তোমার সম্পর্কে তিনি বলছিলেন, যুবকটি খুবই বুদ্ধিদীপ্ত ও কুশলী।

বাড়ির সদর গেটে উচ্চ পদবীর এক লোককে তারা অতিক্রম করছিল। লোকটি তরুণী ও সুবক্তগীনকে গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিল। তরুণী ও সুবক্তগীন উভয়ের কাপড় ভেজা, তখনো কাপড় থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে। তরুণীর ভেজা কাপড় সেঁটে গিয়েছিল গায়ের সাথে। তার নারী অঙ্গগুলো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে সিক্ত বসনে। মাথার চুলগুলো ছড়ানো পিঠে-কাঁধে। তার চেহারা রক্তিম। রাগে গড়গড় করছিল লোকটি। চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। উভয়ে লোকটির কাছে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল।

কোথা থেকে আসা হচ্ছে? ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তরুণীর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল লোকটি। এই ছোকড়া কে?

হু, আপনি কে যে একেবারে হাকিমের মতো জেরা শুরু করেছেন? তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিল তরুণী। আমার ঘোড়া বেসামাল হয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, রেকাবীতে পা আটকে আমি পড়ে গিয়েছিলাম। এ লোক আমাকে উদ্ধার করেছে। বুঝলেন হাকিম সাহেব! কিছুটা তাচ্ছিল্য বর্ষণ করে তরুণী সুবক্তগীনের বাজু ধরে তাকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

এ লোক কে? তরুণীকে জিজ্ঞেস করল সুবক্তগীন। আমার বাগদত্তা। এখন থেকেই আমার উপর তিনি কর্তৃত্ব চালাতে চাচ্ছেন, কথায় কথায় হুকুম করেন, আগ বেড়ে খবরদারী চালান। কিছুটা শ্লেষমাখা কণ্ঠে বলল তরুণী। তুমি একে পাত্তা দিও না, ভয় করারও কিছু নেই।

হঠাৎ তরুণী সুবক্তগীনের বাজু ধরে বলল, তোমার কি স্ত্রী আছে, তুমি কি বিবাহিত?

না।

কোন মেয়েকে কি তোমার পছন্দ হয়নি? কারো সাথে কি তোমার ভাব নেই?

না। মেয়েদের প্রতি আমি কখনও দৃষ্টি দেই নি। এই সুযোগও আমার নেই।

তরুণী আবেগপ্রবণ হয়ে বলল, আমাকে কি তোমার ভালো লাগছে না? নিরুত্তর সুবক্তগীন। তরুণীর কথায় সে দৃষ্টি অবনত করে ফেলল।

হু, তুমি আমাকে বেহায়া মনে করছো, তাই না? বলো, বলো সুবক্তগীন! যদি তুমি আমাকে বেহায়া ও বখাটে মেয়ে ভেবে থাকো তাহলে আর কখনও তোমার দৃষ্টিসীমায় আসবো না।

তোমাকে ভাল লাগা না লাগার কি আছে, তুমি তো আরেকজনের বাগদত্তা!

এটা আমার পারিবারিক পছন্দ। ওই না-মরদটাকে আমি একদম সহ্য করতে পারি না। সে আমাকে দাসী বানাতে চায়। সে আমাকে ঘোড়-সওয়ারী হতে বারণ করে। সে চায়, আমি শুধু তার হেরেমের শোভা বর্ধন করি। চার দেয়ালের ভেতরে আবদ্ধ হয়ে থাকি। ওসব আমার অসহ্য। আমি চাই এমন লোক যে তোমার মতো সুপুরুষ, যে আমার পাশাপাশি ঘোড়া দৌড়াবে, নদীতে ঝাঁপ দেবে। ওসব আয়েশী রাজা-বাদশাহদের বুঝিয়ে দিতে চাই, নারী শুধু হেরেমের শোভা বর্ধনের উপকরণ নয়, নারীর দেহ শুধু পুরুষের কামরিপু

চরিতার্থ করার ক্ষেত্র নয়। তারা নারীকে ভোগের দাসী বানিয়ে নিজেরা মদে ডুবে থেকে ইসলামের অপমান করছে। আমি বুঝিয়ে দেব, ইসলাম নারীকে দিয়েছে মাতৃত্বের সম্মান, স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের অধিকার। সমাজ-সংসারে নারীরও দায়িত্ব আছে। সেও দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে ভাববার দাবিদার। আমি ওদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই, হেরেমের বাইরে বের হলেই নারী নষ্ট হয়ে যায় না, এতে নারীর শাশ্বত সত্তার পবিত্রতাও নষ্ট হয় না। ওরা চায়, নারীরা হেরেম নামের জিন্দান খানায় বাইজী হয়ে বহু পুরুষের ভোগের সামগ্রী হোক। ওদের ধারণা, নারী হলো শুধুই ভোগের বস্তু। তারা মনে করে, কর্তৃত্ব আর বীরত্বের তকমা গলায় বেঁধে দাস-দাসী ও বাইজীর আসর জমানোই হলো বীরত্ব। নারীও যে সত্যিকার অর্থে বীরত্বপূর্ণ কাজ করতে পারে, পারে ইসলামের সেবায় নিজেকে উজাড় করে দীনের স্তম্ভকে শক্তিশালী করতে তা ওরা ভুলে গেছে। আজ মুসলিম নেতৃবর্গ ইজ্জত নয় জিল্লতির জীবন যাপন করছে। কেন, এর কারণও ওরা খুঁজে দেখতে চাচ্ছে না। মু'মেন নারী যে বিরাট শক্তির আধার তা নতুন করে ওদের আমি জানিয়ে দিতে চাই।

সুবক্তগীন! মদে-মাতাল ওসব শাসকের হেমেরে কখনও বীরপুরুষ জন্ম নিতে পারে না, ওদের ঘরে কাপুরুষই বেড়ে ওঠে। ইসলামের পতাকা বহন করার হিম্মত ওদের হয় না। ওদের জন্মই ইসলাম অবমাননার কারণ। আমি এমন সন্তানের মা হতে চাই, যে ইসলামের খাদেম হবে, ইসলামকে পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করবে। শুধু আলেম ও মুবাল্লিগের বেশে নয় বিজয়ী বীরের বেশে। কূটনীতিতে সে সফল হবে, যার তরবারীতে শক্তি বেশি থাকবে। একনাগাড়ে কথাগুলো বলে ক্ষোভে উত্তেজনায় হাঁফাতে লাগল তরুণী।

আমার মাও তোমার মতোই স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্নের ছেলে দাস হিসেবে আদম বাজারে বিক্রি হয়ে গেছে।

ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী তোমার মতো গোলাম আর আমার আব্বুর মতো আদর্শবান দাসরাই হতে পারে। কেন, আমার আব্বু তোমাকে বলেননি যে, তিনিও তোমার মতোই আদম বাজারে দাস হিসেবেই বিক্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের কর্মনিষ্ঠা ও সততার জোরে আজ তাঁর অবস্থান এবং মর্যাদা দেখো। দেখো তাঁর কর্মতৎপরতা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা।

তোমাকে কে বললো যে, তোমার গর্ভে যে ছেলের জন্ম হবে সে বাহাদুর আর দীনের সিপাহসালার হবে। এটা তোমার তারুণ্যের আবেগ, যৌবনের আকাঙ্ক্ষা।

এটা আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, দীর্ঘ দিনের লালিত বাসনা। এটা আমার অস্তিত্বের চাওয়া, আমার নারী মনের আর্তি। আমার এই আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধকে তুমি যৌবনের আবেগ, শব্দের ব্যঞ্জনা আর খেয়ালীপনা মনে করো না সুবক্তগীন! হ্যাঁ। তুমি আমার ভালবাসাকে উপেক্ষা করতে পারো, কিন্তু আমার ইচ্ছা ও পবিত্র আকাঙ্ক্ষাকে অপমান করো না। আমি ওই গবেটটাকে কিছুতেই স্বামীত্বে বরণ করতে পারবো না। আবেগ ও উত্তেজনায় কথাগুলো বলতে বলতে কেঁদে ফেলল তরুণী।

সুবক্তগীন ওখান থেকে বেরিয়ে এলো। মনের মধ্যে তার তুমুল ঝড়। জীবনের গতি সম্পর্কে এখনও সে স্থির নয়। বুঝে উঠতে পারছিল না, আশৈশব লালিত তার আকাঙ্ক্ষা ও মায়ের স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করবে কিনা। এমন সময় এই তরুণীর কথা তার হৃদয়ে চেপে থাকা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাকে আরো তীব্র করে তুলল। সুবক্তগীন কল্পনাও করতে পারেনি, কোন রাজ হেরেমে এমন ঈমানদীপ্ত তরুণী থাকতে পারে, ইসলামী ঈমান আকীদার দুর্গরূপী এমন মেয়েও জগতে আছে।

বহুদিন পরে তার সুপ্ত বেদনা আবার উথলে উঠল, স্মৃতিগুলো ভাস্বর হয়ে দৃশ্যমান হতে থাকল। জীবনে মা ছাড়া তার অনুভবে কোন নারীর অস্তিত্ব নেই। মনে পড়ে গেল, ছোটবেলায় মায়ের কোলের উষ্ণতা পেলে প্রশান্তিতে ভরে যেতো তার দেহমন। মা তাকে পরম স্নেহে বুকে জড়িয়ে ঘুম পড়াতেন, কোলে নিয়ে আদর করতেন, তার স্বপ্নের কথা বলতেন, খ্যাতিমান হওয়ার সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাতেন। আর আজ এই তরুণী তার মায়ের স্বপ্নেরই পুনরাবৃত্তি করছে। একই আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে ওর কণ্ঠে।

অথচ সে এই যুবতীকে যখন পিঠে করে নদী থেকে উদ্ধার করেছিল, তখন তরুণী তার গলা জড়িয়ে ধরেছিল দু'হাতে, তার ভেজা বসন লেপ্টে গিয়ে শরীরের ভাঁজ ও নারী- চিহ্নগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। কিন্তু একটি বিপদাপন্ন তরুণীকে উদ্ধারের ব্রত ভিন্ন কিছুই তখন ভাবতে পারেনি সুবক্তগীন। তরুণীর তপ্তশ্বাস ও হৃদয় মোহিনী হাসিও তার মধ্যে কোন তারল্যের উদ্ভব ঘটাতে পারেনি। কিন্তু এখন কী হলো, সব কিছুই যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। অজানা ভবিষ্যত, আবাল্য স্বপ্ন, মায়ের সাধ আর তরুণীর নিবেদনে কেমন যেন উদভ্রান্ত করে তুলছে তাকে প্রতিক্ষণ। প্রচণ্ড এক আলোড়ন অনুভব করছে মনের মধ্যে সুবক্তগীন। তরুণীর কথাগুলো বারবার কানে বাজছে তার। সে ঠিকই বলেছে, সম্পদ ও ক্ষমতার সুযোগে আমীর-উমারার হেরেমগুলো জাহান্নামে পরিণত

হয়েছে। যে নারী ছিল প্রশান্তির আধার, তাদের আজ শারীরিক উত্তেজনা উপশমের উপাদানে পরিণত করা হয়েছে।

পুরুষ আজ আর এক নারীতে তৃপ্ত নয়। ধৈর্য, স্থিরতা, নীতি, আদর্শ, বীরত্ব, বাহাদুরী সবই শাসক শ্রেণীর লোকেরা মদ আর নারী ভোগে খুইয়ে ফেলেছে। শুধু নারীসঙ্গ ভোগের জন্যে মুসলিম সমাজের মাথাগুলো রাজা-বাদশাহকে তোষামোদ করে দামী উপঢৌকন দেয়, শাসকদের মধ্যে বিরোধ বাধায়, নিজের জাতি-ধর্মের ইজ্জত হুরমত ধুলায় লুটিয়ে দিয়ে ঈমানের সওদা করে। তারপরও যখন স্বস্তি পায় না, নিশ্চিত করতে পারে না দূরাকাঙ্ক্ষা, তখন কওম ও জাতির সর্বনাশ করতে গিয়ে দুশমনদের ভূতখানায় হাজিরা দিয়ে স্বস্তি আর সুখ নিশ্চিত করে। অধঃপতনের এসব কিছুর শুরুটা নারীর থেকেই ঘটে। মুসলিম মাতৃত্বকে হত্যা করে পুরুষের ঔরসকে কলঙ্কিত করে আমীর-উমরা শ্রেণী শুধু নিজেদের অস্তিত্বের ভিতে ধস্ই নামায় না, মাযহাব ও মিল্লাতের ভিত্তিকেও গুঁড়িয়ে দেয়। আমিও কি সে পথেই অগ্রসর হচ্ছি? অবশ্য ভোগবাদীরা সমূলে ধ্বংস করতে চাচ্ছে এই শক্তিটাকে।

"নারী কোন সৌন্দর্য বর্ধনকারী বিলাস সামগ্রী নয়, নারী নির্মলতার প্রতিচ্ছবি, অফুরন্ত জীবনী শক্তির আধার।" তরুণীর আবেগাপ্লুত এই কথাগুলো তোলপাড় সৃষ্টি করে সুবক্তগীনের মনে।

সুবক্তগীনের মনে পড়ল তার মায়ের স্মৃতি। এক আমীর বহু মূল্য, বিলাস-ব্যসন ও মণি-মুক্তার টোপ দিয়ে তার মাকে খরিদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার পূতঃপবিত্র মা সোনাদানা মণিমুক্তা আর বিলাস ব্যসনকে লাথি মেরে ঝুপড়িতে ফিরে এসেছিলেন ভিখারিণীর বেশে। নিজের আদর্শ ও পবিত্রতা রক্ষায়, ইসলাম ও ঈমানের শুভ্রতা রক্ষায় সর্বস্ব ফেলে পথে নেমেছিলেন স্বামীকে নিয়ে। তবুও নিজের বিশ্বাস ও পবিত্রতাকে কলঙ্কিত হতে দেননি। জাগতিক সুখের সওদা করেননি ঈমানের রত্ন দিয়ে। আলপ্তগীনের মেয়ের মতো তার মাও চেয়েছিলেন এক বাহাদুর সন্তানের মা হতে। রক্ষিতা হতে চাননি কারো। তার মনে বাবার মতোই সংশয় দোলা দিল, "মেয়েরা কি তাহলে এমন স্বপ্নবিলাসী, কল্পনাপ্রবণই হয়ে থাকে?" পরক্ষণেই মনে পড়ল উস্তাদজীর কথা। উস্তাদজী বলেছিলেন, "ন্যায় ও আদর্শের প্রতীক নওশেরোয়াও মায়ের উদরেই জন্ম লাভ করেছেন। নারীকে যদি তামাশা আর ভোগের পণ্য বানিয়ে ফেলা হয় তবে তাদের গর্ভে আর জন্ম নেবে না তারেক, মুসা ও নওশেরোয়া।"

গভর্ণর হাউজ থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে অধমুখে আস্তাবলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ইত্যাকার ভাবনায় ডুবে যায় সুবক্তগীন। সেই সাথে তরুণীর প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করল মনের গহীনে। মনে মনে বলল, অনন্য এই তরুণী। ওর সাথে অন্য হেরেমের অন্য ললনাদের তুলনাই অর্থহীন। তরুণী তাকে বলেছে, সে আবার আমার সাথে দেখা করতে অবশ্যই আসবে। এসব কথা ভেবে তরুণীর মধ্যে কেমন যেন আস্থা অনুভব করল সুবক্তগীন।

এই দাঁড়াও!

আধো প্রেম, আধো সংকট, আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলতে দুলতে আনমনে হাঁটছিল সুবক্তগীন। জগতের অন্য কিছুর প্রতি খেয়ালই ছিল না তার। হঠাৎ কর্কশ ডাকে সম্বিত ফিরে দেখল, তরুণীর বাগদত্তা দ্রুত পায়ে তার দিকে আসছে। সে দাঁড়াল।

রক্তচক্ষু আগন্তুকের। গর্জে উঠে সুবক্তগীনের উদ্দেশে বলল, হাজী নসর-এর বিক্রিত গোলামকে যেন আর কোনদিন শাহজাদীর আঙ্গিনা মাড়াতে না দেখি। তুমি যদি বুখারার শাসনকর্তার মেয়েকে নদী থেকে উদ্ধার করেও থাকো, সেটা তোমার আহামরি কোন বাহাদুরি নয়। এ ছিল তোমার কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন না করলে বরঞ্চ আমরা তোমাকে জেলখানায় আটকে না খাইয়ে হত্যা করতাম। এ কাজের জন্যে পুরস্কারের যোগ্য নও তুমি।

আমি গোলাম নই, স্বাধীন। বরঞ্চ গোলাম আপনি। খুব মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল সুবক্তগীন।

অ্যা! এত স্পর্ধা! ছোট মুখে বড় কথা! শুনে রাখ, আর কোনদিন অনুমতি ছাড়া আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিতে পারবে না! ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল তরুণীর বাদগত্তা।

তুমি তো নসরের গোলাম– বলল সুবক্তগীন।

তোর দেহ থেকে মাথা কেটে ফেলব! কোমরে বাঁধা তরবারী কোষমুক্ত করে বাঘের মতো গর্জে উঠল ভাটাপড়া যৌবনের অধিকারী পৌঢ়-প্রায় লোকটি।

সুবক্তগীনের কোমরেও খঞ্জর ছিল। সে ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে কোমর থেকে খঞ্জর বের করে বলল, দেড়হাত লম্বা তরবারী যদি আধহাত খঞ্জর দিয়ে আমার পায়ের নীচে না ফেলতে পারি, তবে তোমার তরবারীর নীচে মাথা পেতে দেবো। আমার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে দিও আপত্তি নেই, কিন্তু এর আগে তোমার বাগদত্তা শাহজাদীকে জিজ্ঞেস করে এসো যে, সে তোমাকে ভালোবাসে, না ঘৃণা করে!

লোকটি সুবক্তগীনের সাহস ও আত্মবল পরখ করল। কিছুক্ষণ দূর থেকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে রাগে গড় গড় করে তরবারী কোষবদ্ধ করে স্থান ত্যাগ করল। সুবক্তগীন পুনরায় খঞ্জর কোমরে গুঁজে ঘোড়ায় চড়ে আস্তাবলের দিকে চলে গেল।

তখন সন্ধ্যার আঁধার চতুর্দিকে ছেয়ে গেছে। আস্তাবলে ঘোড়া রেখে মাত্র নিজের থাকার ঘরে প্রবেশ করেছে সুবক্তগীন। তখনই এক লোক খবর দিল, গভর্ণর আপনাকে তলব করেছেন। ভেজা কাপড়েই গভর্ণর হাউজের দিকে রওয়ানা হল সুবক্তগীন।

আবু ইসহাকের সাথে কি নিয়ে ঝগড়া করলে? জিজ্ঞেস করলেন গভর্ণর আলপ্তগীন।

সুবক্তগীন তাকে ঘটনা বিস্তারিত বলল। একথাও বললো, যা তার মেয়ে তার উদ্দেশ্যে বলেছে। সুবক্তগীনের অকপট ও অকৃত্রিম বক্তব্য ভাল লাগল গভর্ণরের কাছে।

আমার একটা অনুরোধ জাঁহাপনা। আপনার আদুরে মেয়েকে আমার মতো হতচ্ছাড়ার হাতে তুলে না দেওয়াই ভাল। কিন্তু আমি আপনাকে করজোড়ে নিবেদন করছি, ওই লোকের হাতে ওকে সোপর্দ করা মোটেই ঠিক হবে না। গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন গভর্ণর। অনেকক্ষণ নীরব থেকে বললেন, এখন তুমি গিয়ে আরাম কর সুবক্তগীন। পরে তোমাকে ডাকব।

জাঁহাপনা! আপনি অসন্তুষ্ট হলেও আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করার মত কোন অপরাধ আমি করিনি। মিথ্যা কথা আমি কখনো বলি না।

আলপ্তগীন মুচকি হেসে তাকে চলে যাওয়ার জন্যে ইশারা করলেন। সুবক্তগীন গভর্ণর হাউজ থেকে নিজের থাকার ঘরে চলে এল।

পরদিন আলপ্তগীনের কন্যা প্রতিদিনের মতো ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সুবক্তগীনও আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে নদীর তীরের দিকে চলল। প্রথম দিকে দু'জন দু'দিকেই ঘোড়া দৌড়াল। অনেক দূর গিয়ে উভয়ে নদীর তীরের দিকে গতি ঘুরিয়ে দিল। নদীর তীরে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে এসে উভয়ে মুখোমুখি হল এবং ঘোড়া থেকে নেমে নদীর তীরের সবুজ ঘাসের উপর গিয়ে বসল।

ওই গবেটটা আমার কাছে গিয়েছিল। বাগদত্তা সম্পর্কে বলল তরুণী। খুব রেগে ছিল। আমাকে বলল, 'আমি সেনাবাহিনীর কমান্ডার। তুমি একটি

গোলামের সাথে আমার সম্পর্কে কটুক্তি করে বলেছো, তুমি আমাকে পছন্দ করো না। আমাকে এমন অপদস্ত করার হেতু কি?' সে প্রথমে আমাকে খুব ধমকালো, পরে আবার হাতজোড় করে মিন মিন করতে লাগল। আমি ওকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি, 'পিতার মর্যাদা রক্ষার খাতিরে আমি তোমার বাগদত্তা হতে রাজী হয়েছিলাম। তাকে বললাম, এ ব্যাপারে তুমি আব্বার সাথে কথা বল।'

রাতে আব্বা আমাকে একাকী ডেকে বললেন, সুবক্তগীন আমার কাছে তোমাদের পূর্বাপর সব ঘটনা বলে দিয়েছে। আব্বা তোমার অকপট সত্যবাদিতায় দারুণ খুশি হয়েছেন। তোমার সাহসী উচ্চারণের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমি আব্বাকে বলে দিয়েছি, এই বাগদত্তা আমার একদম সহ্য হয় না। অবশ্য সে খুব বড় অফিসার। মনে হয় আজ দিনের কোন এক সময় সে আব্বার সাথে এ নিয়ে কথাও বলেছে।

সুবক্তগীন তরুণীকে গভীরভাবে দেখছিল। গতকালের চেয়ে আজ তাকে আরো বেশি সুন্দরী মনে হচ্ছিল। তরুণী সুবক্তগীনের হাত তার হাতে নিয়ে খেলছিল আর সুবক্তগীনও গভীর দৃষ্টিতে তাকে পরখ করছিল। তারা পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিল। তরুণী তার শরীর ঘেঁষে বসে চোখে চোখ রেখে অনর্গল কথা বলছিল। সুবক্তগীন তরুণীর কথা ও রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বলল, "তোমাকে দেখলে, তোমার কথা শুনলে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে।"

"তোমার ছেলেও এই কথাই বলবে।" বলে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল তরুণী।

সূর্য নদীর ওপারের টিলার আড়ালে শেষ আলো বিকিরণ করে ডুবে যাচ্ছে। পশ্চিমাকাশে সূর্যের লালিমা ঘন অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। আর এপারে দু' যুবক-যুবতী হাতে হাতে ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনছে।

মাসখানিক পেরিয়ে গেছে। এরই মধ্যে আলপ্তগীনের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিল সুবক্তগীন। আলপ্তগীন তাকে একান্ত সচিবের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে বললেন, "মুসলিম জাতির চেতনা নষ্ট হয়ে গেছে। শাসকশ্রেণী আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতায় আকণ্ঠ ডুবে আছে। রাজ্যগুলো প্রতিদিন টুকরো টুকরো হচ্ছে। বেঈমান আমীররা প্রধান শাসককে ভোগবাদে নিমজ্জিত করে বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করছে জাতির মাঝে। আমাদের নেতারা বেঈমানদের দেয়া পুরিয়া গিলে পরস্পর খুনোখুনিতে লিপ্ত হয়েছে। যে খেলাফত ছিলো মুসলমানের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র তা এখন খেয়ালী রাজার সিংহাসনে পরিণত হয়েছে। সুলতান আব্দুল মালেক আমাদের কেন্দ্রীয় শাসক। তিনি বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন।

অথচ তার সিংহাসন নিয়ে উত্তরাধিকারদের মধ্যে এখনই বিবাদ শুরু হয়ে গেছে। আমরা চাচ্ছি, সুলতানের অবর্তমানে তার কনিষ্ঠ ছেলেকে সিংহাসনে বসাব। কিন্তু বড় সাহেবজাদা আমীর মনসুর তা কখনও হতে দিতে চাইবেন না। এই ফাঁকে আমি গজনীকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা ঘোষণা করব।"

আপনার সেনাবাহিনী বিশেষ করে যারা বুখারায় আছেন তারা আপনার সহযোগিতা করবে? জানতে চাইলো সুবক্তগীন।

এখানকার সেনাপতি কেন্দ্রের চেয়ে বেশি আমার অনুগত। কেন্দ্রের প্রতি সে খুবই ক্ষুব্ধ। আমার নির্দেশ পালনে সে গর্ববোধ করে, আমার নীতি-আদর্শের প্রতি সেনাপতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। আমি আশা করি, গজনীকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এ অঞ্চলের ছোট ছোট রাজ্যগুলো একত্রিত করে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হবো। আমরা যদি এটা করে যেতে না পারি তাহলে আমার ভয় হয়, টুকরো টুকরো মুসলিম রাজ্যগুলো কাফেরদের চক্রান্তে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে। ওদের বিজয় স্রোতে মদ, নারী আর বিলাসিতায় আচ্ছন্ন মুসলিম আমীররা খড়কুটোর ন্যায় ভেসে যাবে। এই জমিন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে মুসলিম শাসনের নাম নিশানা। আমি শুনতে পেলাম, হিন্দুস্তানের মহারাজা খায়বার গিরিপথ দিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করার পাঁয়তারা করছে।

গজনীর তখত উল্টে ফেলার কাজটা আমাকে সোপর্দ করতে পারেন। এজন্য তেমন কোন সৈন্য সমাবেশের দরকার হবে না। মনসুর ও মনসুর-এর সহযোগী শাসকদের গ্রেফতার করাও তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক দিকগুলো আরো গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। সম্ভাবনা ও আশংকাগুলো চিহ্নিত করে সামনে এগুতে হবে আমাদের। বললো সুবক্তগীন।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সুবক্তগীন আরো বলল, "এখনও উপযুক্ত সময় হয়নি। এ ধরনের পরিকল্পনার সফলতা অনেকখানি নির্ভর করে গোপনীয়তার উপর। আপনার মেয়ের মুখে আপনার পরিকল্পনার কথা আমি শুনেছি। অথচ এ সব ব্যাপার তাদের জানার কথা নয়। আপনাকে আরো গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে এবং সতর্ক হতে হবে। আপনার পরিকল্পনা যদি প্রকাশ না পায়, আর অন্যদের তৎপরতার আগাম খবর যদি আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, তাহলে যুদ্ধের অর্ধেক বিজয় এমনিতেই হয়ে যায়।"

আলপ্তগীনের দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস ছিল যে, সুবক্তগীন যোগ্য সালার ও বুদ্ধিদীপ্ত যুবক। কিন্তু সে এতোটা দূরদর্শী তা আগে অনুধাবন করতে পারেননি। যুদ্ধ পরিকল্পনায় তার ভুলগুলো সুবক্তগীন এমন সরল ও সুনিপুণভাবে বুঝিয়ে দিল, যার ফলে আলপ্তগীন আস্থার সাথে যুদ্ধকৌশল নির্ধারণের কাজ তার উপর ন্যস্ত করলেন। কিন্তু সুবক্তগীন তার অদক্ষতা ও অনভিজ্ঞতার কথা সামনে তুলে ধরে বলল, পরিকল্পনা আপনি করুন, আমি নিজেকে এ কাজে উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত আছি।

দীর্ঘ পর্যালোচনার পর নতুন একটি রণকৌশল চূড়ান্ত করা হলো। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রাখার ব্যাপারটি আবারো আলপ্তগীনকে স্মরণ করিয়ে দিল সুবক্তগীন।

ওদিকে যখন গজনীকে ইসলামী সালতানাতের কেন্দ্র বানানোর পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলো, এদিকে তখন সুবক্তগীনকে হত্যার পরিকল্পনাও পাকা হয়ে গেছে। এ পরিকল্পনার নায়ক আলপ্তগীনের কন্যার বাগদত্তা আবু ইসহাক। এরা রাতে একটি সামরিক মহড়ার পরিকল্পনা করল। অশ্বারোহী বাহিনীর একটি সামরিক মহড়ায় সুবক্তগীনকে দাওয়াত দেয়া হল। আবু ইসহাক নিজেও সেই মহড়ায় অংশ গ্রহণ করবে।

অনেকগুলো রথ-গাড়ীতে ঘোড়া জুড়ে দেয়া হল। আবু ইসহাক ও সুবক্তগীনের জন্য বরাদ্দ করা হলো প্রথম সারির বিশটি রথের দু'টি। মহড়া শুরু হল। বাতাসের বেগে তাজী ঘোড়া রথ নিয়ে দৌড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ পর আবু ইসহাক সুবক্তগীনের রথকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে তার রথ এগিয়ে নিল। সুবক্তগীন লক্ষ্য করল, আবু ইসহাক উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাকে একদিকে চেপে রাখতে চাচ্ছে, আর বারবার সে সামনের দিকে তাকিয়ে কি যেন পরখ করছে। রথের ঘোড়া দৌড়াচ্ছে ঊর্ধশ্বাসে। ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে ভেবে সুবক্তগীন তার ঘোড়া আগ বাড়িয়ে আবু ইসহাকের রথকে ঠেলে সোজা চলতে তৎপর হলো। সাধারণ দর্শকরা একে দুই বড় কর্মকর্তার লড়াই ভেবে চিৎকার করে ময়দান মুখরিত করে তুলল। সারা ময়দান জুড়ে বিশেষ মহড়া দেখার জন্যে অসংখ্য লোক সমাগম হল। সকলের মুখে উল্লাস ও হর্ষধ্বনি। সারা ময়দান অসংখ্য মশালে উদ্ভাসিত, উৎসব মুখর।

সুবক্তগীন অবস্থাদৃষ্টে বুঝে ফেলল, আবু ইসহাকের দৃষ্টি মহড়ায় বিজয়ী হওয়ার চেয়ে তাকে এক পাশে রাখার প্রতি নিবদ্ধ। সুবক্তগীন তার রথ নিয়ে আবু ইসহাকের রথের আগে আগে দৌড়াতে লাগল। আবু ইসহাকের গতিপথ

ঠেলে সোজা চালাতে বাধ্য করছিল। এক পর্যায়ে আবু ইসহাক ঘোড়াতে আঘাত করার হান্টার দিয়ে সুবক্তগীনের মাথা লক্ষ্য করে আঘাত করল, কিন্তু সুবক্তগীনের রথ তখন আবু ইসহাকের রথ ঠেলে আগে চলে গেছে। হান্টার লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আবু ইসহাক চিৎকার দিয়ে বলল, খোদার কসম! তুমি এদিক থেকে সরে যাও! সুবক্তগীন তার ঘোড়াকে দূতগতিতে অপরদিকে ঘুরিয়ে নিল। ইত্যবসরে আবু ইসহাকের ঘোড়া জমিনে ধসে গেল। রথ ছিঁড়ে উপরে উঠে উল্টে জমিনে আছড়ে পড়ে অগ্রভাগ ধসে গেছে। আবু ইসহাক তাল সামলাতে না পেরে শূন্যে উঠে গিয়ে উল্টে যাওয়া রথের নীচে চাপা পড়ল। দ্রুত পিছনে ছুটে আসা রথগুলোকে চালকেরা সামলাতে পারল না। সেগুলো আবু ইসহাকের উল্টে যাওয়া রথকে মাড়িয়ে চলে গেল। আবু ইসহাক রথের চাপে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিল। সে আর দাঁড়াতে পারল না। ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হল। সুবক্তগীন নিজের রথকে ঘুরিয়ে যাত্রাস্থলে ফিরে এলো। উৎসব মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেল, নেমে এলো বিষাদের ছায়া। হাহাকার বয়ে গেল সবার মুখে। কী হলো? কী হলো?

সবাই দৌড়ে গেল অকুস্থলে। রথের চাকা ও ঘোড়ার খুরের আঘাতে নিহত হল আবু ইসহাক। দেখা গেল, আবু ইসহাকের ঘোড়া গভীর গর্তে ধসে গেছে। উপরে বড় বড় গাছের পাটাতন। অথচ গতকাল পর্যন্ত কেউ কোন গর্ত এখানে দেখেনি। হঠাৎ গর্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। দুর্ঘটনার তদন্ত তখনই শুরু হয়ে গেল। কিভাবে এখানে গভীর গর্ত হল, কি আছে এই দুর্ঘটনার অন্তরালে?

আলপ্তগীন জলদগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, এই গর্ত ও দুর্ঘটনার কারণ অবশ্যই খুঁজে বের করা হবে। কেউ যদি এই গর্তের উৎস সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করে, তবে তাকে রাজকীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হবে।

পরদিন বেলা ডোবার আগেই রহস্য বেরিয়ে পড়ল। জানা গেলো, এই রাতের মহড়ার আয়োজক যেমন আবু ইসহাক, গর্তের নায়কও সে। আবু ইসহাক তার এক বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে সুবক্তগীনকে মহড়ায় অংশ গ্রহণে সম্মত করিয়েছিল, আর অতি সংগোপনে রাতের আঁধারে বিশাল গর্ত খুঁড়ে মাঠে মাটি ছড়িয়ে গর্তের উপরিভাগে গাছের পাটাতন দিয়ে তাজা ঘাস ও মাটি দিয়ে তা ঢেকে দেয়া হয়েছিল। যাতে কেউ গর্তের অস্তিত্ব ঠাহর করতে না পারে। জায়গাটি নিজে চেনার জন্যে একটি আলামত রেখেছিল আবু ইসহাক। এজন্যই দৌড় শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই সে সুবক্তগীনের রথকে ঠেলে গর্তে ফেলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু বিচক্ষণ সুবক্তগীন আবু ইসহাকের চক্রান্তের আশঙ্কা আঁচ

করে আগাগোড়া দৌড়ের মধ্যে থেকেও নিজেকে সচেতন রেখেছিল সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যে। দুর্ভাগ্যবশত নিজের খনন করা গর্তে আবু ইসহাক নিজেই কুপোকাত হল। আবু ইসহাক তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বলেছিল, মহড়ার মোড়কে সুবক্তগীনকে হত্যা করে সে আলপ্তগীনের কন্যাকে বিয়ে করবে। পথের কাঁটা সরিয়ে দেয়ার জন্যেই আবু ইসহাক আয়োজন করেছিল ষড়যন্ত্রের এই সামরিক মহড়া। কিন্তু নিজের পাতা ফাঁদে নিজেই ফেঁসে গেল।

"আল্লাহ তোমার দ্বারা বড় কোন কাজ নেবেন, এজন্যই নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তোমাকে।" বললেন আলপ্তগীন। আমি তোমাকে ওয়াদা দিচ্ছি যে, আমার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্যে তুমি যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলে সে অনুযায়ী এখনি কাজ শুরু করতে হবে। তুমিই আমার মেয়ের জামাতা হবে, এজন্যে আমি গর্বিত।"

এ ঘটনার প্রায় এক বছর পর গজনীর শাসক আব্দুল মালেক মৃত্যুবরণ করলেন। আলপ্তগীন প্রাণান্ত চেষ্টা করেও আব্দুল মালেকের কনিষ্ঠ পুত্রকে গদীনশীন করাতে ব্যর্থ হলেন। বড় ভাই মনসুরের বর্তমানে বাস্তবায়িত হলো না তার এই স্বপ্ন। দু'দিন পর সুবক্তগীন তিনশ' নির্বাচিত অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে গজনী উপস্থিত হল। সে দৃশ্যত ভাব দেখাল যে, তারা বুখারার গভর্ণরের পক্ষ থেকে নতুন গদীনশীনকে মোবারকবাদ জানাতে এসেছে। কিন্তু রাজপ্রাসাদে ঢুকেই তারা মনসুরকে গ্রেফতার করল। আর তার সাথীরা পূর্ব নির্দেশনা মতো প্রতিরক্ষা বাহিনীর চৌকিগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গজনী বাহিনীকে নিরস্ত্র করে ফেলল। পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্রুত বেগে আলপ্তগীন শহরের প্রধান প্রধান স্থাপনাগুলো দখল করে নিলেন। তিনি অগ্রভাবে সুবক্তগীনকে পাঠিয়ে বেশি সংখ্যক সৈন্য নিয়ে শহরের বাইরে অপেক্ষমান ছিলেন, যাতে প্রথম অপারেশনের পর দ্বিতীয় পর্যায় দ্রুততার সাথে সমাধা করা যায়। হাটে-বাজারে, অলি-গলিতে প্রচার করা হলো, "জালেমদের শাসন শেষ, এখন থেকে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক শাসন চলবে। আমরা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধানমতো শাসন কাজ চালাব"। প্রথম দিন থেকেই ইসলামী অনুশাসন চালু করা হল। দিন যত যেতে লাগল, মানুষ দেখতে পেল, সত্যিকার অর্থেই জুলুম ও নিপীড়নের পরিবর্তে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মানুষের মন থেকে জুলুম-অত্যাচারের আতঙ্ক দূর হয়ে গেছে। শাসকদের প্রতি মানুষের মনে ঘৃণার বদলে শ্রদ্ধা জন্মাতে শুরু করেছে। গজনীর অধিবাসীরা নতুন শাসকদের মোবারকবাদ জানাল হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা উজাড় করে।

ঐতিহাসিকদের মতে ৯৬২ ইংরেজী মোতাবেক ৬৫১ হিজরী সনে আলপ্তগীন গজনীর শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি সুবক্তগীনকে প্রধান উজীর নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু অল্পদিন পর তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে গেল। পরের বছরই তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর পর ছেলে ইসহাক পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু পিতার মতো ন্যায় ও ইনসাফের পরিবর্তে সে মোসাহেব ও তোষামোদকারীদের বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করে। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী তাকে দিয়ে সুবিধাজনক সব নির্দেশ জারী করিয়ে নিতে থাকলে দেশে আবার অশান্তি দেখা দেয়। জনগণ আবার নতুন হয়রানির কবলে পড়ে।

সুবক্তগীনকে আবার দুঃসাহসী ভূমিকা নিতে হয়। তিনি বাধ্য হয়ে নীতি ও আদর্শচ্যুত শাসক ইসহাককে বন্দী করে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করেন। দেশের মানুষ যখন শুনল, বিপথগামী ইসহাককে বন্দী করে আমীরুল উমারা সুবক্তগীন ক্ষমতাসীন হয়েছেন তখন তারা স্বস্তিবোধ করে এবং শান্তির আশায় আশ্বস্ত হয়।

ইসহাককে ক্ষমতাচ্যুত করাটা সুবক্তগীনের জন্যে ছিল কঠিন বিষয়। এই সুকঠিন ও অসম্ভব কাজটিকেই তিনি সম্ভব করতে পেরেছিলেন মানুষের ভালোবাসা ও আস্থার জোরে।

তাঁর উন্নত চরিত্র, ন্যায় নিষ্ঠা ও সদাচারে সেনাবাহিনীর সিপাই থেকে সালার পর্যন্ত সবাই ছিল তার প্রতি সশ্রদ্ধ ও অনুগত। ন্যায় বিচার ও সততার দ্বারা সাধারণ নাগরিকের হৃদয়ের মণিকোঠায় নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন সুবক্তগীন। নাগরিকরা তার শাসনে নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করার অধিকার পেয়েছিল। যার ফলে তার প্রতিটি হুকুম ও নির্দেশ বাস্তবায়নে সাধারণ মানুষ নিজেদের উৎসর্গ করে দিয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যে আশপাশের রাজ্যগুলোকে নিজের কব্জায় নিতে সক্ষম হয়েছিলেন সুবক্তগীন। গঠন করতে পেরেছিলেন এক জীবনবাজী সেনাবাহিনী। গজনীর অবস্থা কিছুটা স্থিতিতে এনেই তিনি মনোযোগী হয়েছিলেন হিন্দু শাসিত অত্যাচরিত ভারতীয়দের প্রতি।

এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন সুবক্তগীন, তার ঘরের ছাদ ভেদ করে একটি গাছ বেড়ে উঠছে। বাড়তে বাড়তে গাছটি এমন বিশাল ও বিস্তৃত হলো অর্ধেক পৃথিবী সেই গাছের ছায়া ঢেকে নিলো।

স্বপ্ন দেখে খুব বিচলিত হলেন সুবক্তগীন। স্ত্রীকে বললেন স্বপ্নের কথা। স্ত্রী নীরবে শুনলেন, কোন মন্তব্য করলেন না। এ দিনই তার ঘরে জন্ম নিল প্রথম সন্তান; স্বপ্নের সুবিস্তৃত মহীরুহ। পুত্রের আগমনে তার উৎকণ্ঠা দূর হয়ে গেল। এবার স্ত্রী তাকে বললেন, আপনার দেখা স্বপ্ন আপনার চোখের সামনে বাস্তব হয়ে

দেখা দিয়েছে। আমি সেই পুত্রটি প্রসব করেছি যে পৃথিবী থেকে মিথ্যা দূর করবে। আজ মুহররম মাসের দশ তারিখ। আল্লাহর ইঙ্গিত অনুধাবন করে আমাদের তাঁর দরবারে অবনত মস্তকে বিগলিত হৃদয়ে শুকরিয়া জ্ঞাপন করা উচিত।

সুবক্তগীন ছেলের নাম রাখলেন মাহমূদ। দেখতে তার ছেলে খুব একটা হৃদয়গ্রাহী চেহারার অধিকারী না হলেও পিতার সব চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা-আগ্রহের কেন্দ্র ছিল এই সন্তান।

অতি শৈশবে-ই পিতা ছেলেকে কুরআন শরীফ হিফ্য করালেন। বার বছরের মধ্যে জরুরী কিতাবাদির ইলম শেখার পর্ব শেষ করিয়ে ফেললেন। পনের বছরে পদার্পণ করলে সুবক্তগীন ছেলেকে হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠিয়ে বললেন, "তোমাকে মূর্তিসংহারী হতে হবে।"

গজনীর শহরতলী থেকে একটু দূরে মাঠের মধ্যে একটি মনোরম বাগান। বাগানের মাঝখানে এক দৃষ্টিনন্দিত বালাখানা। বাগানের মনোহারী গাছগাছালি, রঙ বেরঙের হাজারো ফল-ফুলের সমারোহ আর এর পরিপাটি সাজানো গোছানো পরিবেশ বহুদূর থেকেই মানুষের নজর কাড়ে। প্রথমেই তারা ভাবত আলীশান এ কাজ কোন সাধারণ জমিদারের নয়। অবশ্য কোন শাহজাদা কিংবা উজির গড়ে তুলেছে এ বাগান ও সুরম্য সৌধ। অথচ কিছুদিন আগেও জায়গাটা ছিল ধূ ধূ প্রান্তর, ছিল গাছপালা শূন্য। গজনীর মানুষ দল বেঁধে এই বাগান ও বালাখানা দেখতে যেতো, পথিকরা এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতো, পথিক এখানে এসে থমকে দাঁড়াতো। দর্শকদের মুখে সুবক্তগীনের পুত্র মাহমূদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন শুনে জনতা তার প্রতি আরো সশ্রদ্ধ হতো।

এই বাগান বাড়ি, অবকাশ কেন্দ্র মাহমূদ তার বাবা সুবক্তগীনের অজ্ঞাতে তার মায়ের অনুমতি নিয়ে গড়ে তুলেছিল। মাহমূদ ছিল তার মা-বাবার কদাকার ও বেঢপ চেহারার কাঙ্ক্ষিত পুত্র। মাহমূদের তুলনায় তার ছোট ভাই দৈহিকভাবে ছিল দারুণ আকর্ষণীয়। কয়েক বছর আগে মাহমূদ যখন মাকে বলেছিল, সে একটি মনোরম বাগানবাড়ি বানাচ্ছে, একথা শুনে মা তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে কেঁদে ফেলেছিলেন।

মায়ের চোখে পানি দেখে মাহমূদ বলল, মা আমি যদি একথা বলে আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে আমাকে মাফ করে দিন। আমি আর বাগানবাড়ি বানাচ্ছি না।

না বেটা! বাগানবাড়ি তোমাকে আমিই বানিয়ে দেব। তাহলে আপনার চোখে পানি কেন?

বেটা! আমার মনে পড়ছে সেই স্মৃতি। তোমার বাবার সাথে তখন আমার বিয়ে হয়নি। আমি ছিলাম এক বড় কর্মকর্তার বাগদত্তা। কিন্তু তোমার বাবার প্রতি আমার মনে প্রচণ্ড টান অনুভব করছিলাম। আমি তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। আমি বাগদত্তাকে এজন্য পছন্দ করতে পারছিলাম না, সে আমাকে হেরেমের চার দেয়ালে বন্দী রাখতে চেয়েছিল। সে হেরেমের সৌন্দর্য বর্ধনের সামগ্রী মনে করতো নারীকে। আমার ঘুরে বেড়ান, ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া ও সাঁতার কাটায়ও তার ছিলো চরম আপত্তি। আমি নিজেকে হেরেমের শোভা করে রাখতে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি তোমার আব্বাকে বলেছিলাম, আমি এমন স্বামী চাই, যে আমার সাথে ঘোড়া দৌড়াবে, নদীতে সাঁতার কাটবে।

আমি তোমার আব্বুকে বলেছিলাম, হেরেমের রক্ষিতা-নারীদের গর্ভজাত সন্তান কখনো ইসলামের প্রহরী হয় না। আমি এমন ছেলের মা হতে চাই, যে সুদূর ভারত পর্যন্ত ইসলামের পয়গাম প্রচার ও ইসলামী সালতানাত সম্প্রসারিত করবে। মুবাল্লিগের বেশে নয় বিজয়ী সুলতান বাহাদুর হিসেবে, শুধু কূটনীতির বলে নয় তরবারীর জোরে। তোমার আব্বু হেসে বলেছিলেন, "তোমার মতো আমার আম্মুও এ কথাই বলতেন, কিন্তু আমি তো দাস-দাসীর হাটে বিক্রি হওয়া এক গোলাম।" তোমার আব্বুকে আমি বলেছিলাম, "ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী তোমার মতো কর্তব্যনিষ্ঠ গোলামরাই হতে পারে। দৌলতওয়ালা আমীর-উমারা শ্রেণী ইসলামের রক্ষক হবে তো দূরে থাক ইসলামকে তারা ডুবাচ্ছে। দেখ না, আমার আব্বাও তোমার মত হাটে গোলাম হিসেবে বিক্রি হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের কর্মনিষ্ঠা ও চেষ্টায় আজ বুখারার শাসক পদটি অলঙ্কৃত করে আছেন। আরো একটি কথা আমি তোমার আব্বুকে বলেছিলাম। বলেছিলাম, আমি যে মহানায়কের কথা ভাবি, সেই সন্তান তোমার ঔরসে আমার গর্ভে সঞ্চারিত হোক, তা আমি একান্তভাবে কামনা করি। আমি সেই কাঙ্ক্ষিত সন্তানের গর্বিত মা হতে চাচ্ছি। তোমার আব্বুর প্রতি আমার এই আকর্ষণ ও ভালবাসায় বিন্দুমাত্র যৌবনের তাড়না আর কৈশোরের উন্মাদনা ছিল না। ছিল নির্ভেজাল পবিত্র আকাঙ্ক্ষার হৃদয়তন্ত্রী ছেঁড়া যন্ত্রণার জীবন্ত ছবি আঁকার এক বিনীত নিবেদন। আমার মনের গহীনে আশৈশব লালিত স্বপ্নের বাস্তবচিত্র দেখতে মনটা বেকারার ছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় ও তোমার আব্বার দূরদর্শিতায় আমার সাথে তার বিয়ের সব বাধা অল্পতে দূর হয়ে যায়। দাসের হাটে বিক্রিত গোলাম সুবক্তগীন একদিন গজনীর সুলতান হিসেবে আমার আব্বার স্থলাভিষিক্ত হলেন।

তোমার আব্বুকে আল্লাহ তা'আলা বিস্ময়কর এক স্বপ্ন দেখালেন। এর পরদিনই তুমি জন্মগ্রহণ করলে। আমি তাকে বললাম, আপনার গতকালের স্বপ্নের ব্যাখ্যা আজ মূর্তি না হয়ে আমার কোলে ঘুমিয়ে আছে। সেদিন ছিল আশুরা। দশই মুহররম। তোমার আব্বুকে আমি বললাম, আজ দশই মহররম, ইতিহাসের বহু শ্রেষ্ঠ ঘটনা আজ ঘটেছে। আমার এই ছেলের জীবন-কাহিনীও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি সেই বাহাদুর কাঙ্ক্ষিত ছেলের জন্ম দিয়েছি, যে পৃথিবীতে ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করবে, বাতিল ধ্বংস করবে, মূর্তিসংহারী হবে।"

"মা! এসব কাহিনী এর আগেও আপনি আমাকে শুনিয়েছেন কিন্তু আজ আপনি এত আবেগাপ্লুত কেন?"

"বাবা আমার চোখ থেকে আজ পানি ঝরছে এই আশঙ্কা করে যে, তোমার মন যেন বিলাস-ব্যসন, আরাম-আয়েশ, সুন্দর বাগান আর অট্টালিকার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে। তুমি শাহজাদা হলেও আমি চাই, তোমার আকর্ষণ থাকবে ময়দানে, যুদ্ধে, পাহাড়-মরুর কঠিন রণক্ষেত্রে। আমি তোমাকে এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, প্রাসাদ সরগরম ও সুসজ্জিত করার জন্যে তোমার জন্ম নয়। তুমি দুনিয়াতে এসেছো ময়দানে লড়াই করতে। বাগানবাড়ি গড়ে তোলায় আপত্তি নেই। আমি তার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ভবিষ্যতে যুদ্ধ শেষে যখন ক্লান্ত হয়ে গজনী ফিরবে তখন এখানে তুমি আরাম করবে। আমার কাম্য এটাই।

মায়ের অনুমতি ও সহায়তায় বাগাবাড়ি তৈরি শুরু করে দিল মাহমূদ। বিভিন্ন এলাকা থেকে অট্টালিকা ও বাগান তৈরির অভিজ্ঞ লোকদের আনা হল। দ্রুতগতিতে শেষ করা হলো অবকাশ যাপন কেন্দ্রের কাজ। রাজা জয়পাল যখন গজনী আক্রমণ করতে এল তখন বাগান বাড়ির মনোরম দৃশ্য ও সুরম্য অট্টালিকার চারড়াপাশে বাহারী রঙের ফুলের সমারোহ ও সবুজের মেলা তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। পাঞ্জাবের রাজা জয়পাল গজনী আক্রমণ করে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হল। সুবক্তগীনের বাহিনী আগাম খবর পেয়ে শহরের বাইরেই রাজার বাহিনীকে মোকাবেলায় বাধ্য করে। জয়পালের বাহিনী গজনী অবরোধের সময়টুকুও পায়নি। জয়পালের সাথে সুরতান সুবক্তগীনের কঠিন লড়াই হল। কিন্তু জানবাজ সুবক্তগীনের সেনাবাহিনী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে জয়পালের বিশাল সমর সজ্জাকে গুঁড়িয়ে দেয়। ডজন ডজন হাতি, হাজারো অশ্বারোহী-যোদ্ধা ও তোপ কামানের সহযোগিতা নিয়েও গজনীর সুবক্তগীনের রণকৌশলের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পালাতে বাধ্য হয় জয়পাল।

সুবক্তগীনের আশাতীত এ বিজয়ে এতো বিপুল পরিমাণ মালে গনীমত হস্তগত হয় যে, জয়পালের রেখে যাওয়া হাতি, অসংখ্য ঘোড়া ও মাল-আসবাব গোছাতে পনের দিনেরও বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। বিজয়ী সুবক্তগীন যুদ্ধ শেষে গজনী ফিরে এলে মাহমূদ তাকে জানাল তার অবকাশ কেন্দ্রের কাজ শেষ হয়েছে। মনোরম বাগান বাড়ি দেখে আপনি অবশ্যই মুগ্ধ হবেন। আব্বু, আপনি কি একবার বাগান-বাড়িটি দেখতে যাবেন? আরজ করল মাহমূদ।

মাহমূদের মা সুবক্তগীনকে বাগানবাড়ি সম্পর্কে আগেই অবহিত করেছিলেন। পিতা ভেবেছিলেন, খেয়ালের বশে ছেলে হয়তো কিছু গাছগাছালি রোপণ করে ওখানে একটি ছোট্ট ঘর তৈরি করেছে। কিন্তু মাহমূদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাগান দেখতে গিয়ে তিনিও বিস্মিত হলেন। সুরম্য অট্টালিকা আর রাজসিক উদ্যানের কারুকার্য ও বিন্যাস মাহমূদের উন্নত কর্মকুশলতার স্বাক্ষর বহন করছিল। মুগ্ধ হলেন সুলতান সুবক্তগীন। ছেলের উদ্দেশে বললেন—

"মাহমূদ! তোমার এই উদ্যান, মহল ও আয়োজন মোবারক হোক। স্থাপত্যকলায় তোমার রুচি ও দক্ষতা প্রশংসার যোগ্য। তোমার এ কাজ এক শাহজাদার পরিচয় বহন করছে, কিন্তু মনে রেখো, তুমি শুধু একজন শাহজাদা নও। তোমাকে আমি ইসলামের তরে নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক হিসেবে দেখতে চাই। তুমি মা'মুলী কোন রাজকুমারও নও, এক মুসলিম যোদ্ধার ঔরসজাত সন্তান। তুমি ভুলে যেয়ো না, প্রকৃতপক্ষে তুমি নগণ্য এক গোলামের ছেলে। আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে তোমার বাবাকে গজনীর সালতানাতের আসনে অভিষিক্ত করেছেন। সেই সাথে জন্মসূত্রে এক মহান দায়িত্ব আমাকে বহন করতে হচ্ছে, যা আমার বাবার সাথে বিয়ে হওয়ার অনেক আগে থেকেই আমার মা বহন করছিলেন। এ গুরুদায়িত্ব জাগতিক সবকিছুর চেয়ে আমার কাছে বেশি প্রিয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ যে, আল্লাহ তা'আলা এই মহান কর্তব্য পালনের দায়িত্ব আমার ও আমার উত্তরসূরিদের কাঁধে ন্যস্ত করেছেন। তোমার মা ও আমার মুখে বহুবার তুমি শুনেছো যে, তোমার জন্ম অন্য সাধারণ শাহজাদাদের মতো আদৌ মা'মুলী নয়। তোমার জন্মের ইঙ্গিত তোমার দাদু ও তোমার দাদী বহু পূর্বে আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তিন পুরুষ ধরে আমার বাপ-দাদা তোমার আগমন আকাঙ্ক্ষায় ধীর অপেক্ষায় সময় কাটিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস ও আশা, তুমি মূর্তিসংহারীরূপে ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী শাসক হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি বয়ে আনবে।"

আব্বু! আপনি বলছেন যে, এই সুরম্য অট্টালিকা আর হৃদয়কাড়া বাগানবাড়ি তৈরি করা আমার উচিত হয়নি! একটু ম্লান মুখে বলল মাহমূদ।

না মাহমূদ! এই বাগানবাড়ি তৈরি করা তোমার উচিত, কি উচিত নয়, সে ভিন্ন কথা। আমি তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি, যে কোন সম্পদশালী লোকের পক্ষেই এমন প্রাসাদ ও উদ্যান তৈরি খুব সহজ, কিন্তু তোমার কাঁধে যে গুরু দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে তা যে কারো পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। রাজা-বাদশা ও শাহজাদারা উঁচু প্রাসাদ, মহল, অট্টালিকা ও স্মৃতিস্মারক এ জন্যই তো তৈরি করে যে, মানুষ তাদের দীর্ঘদিন মনে রাখবে। কিন্তু মনে রেখো, ইট-পাথরের এসব দালান-কোঠা চিরস্থায়ী নয়। মাটির উপরে নয়, মানুষের হৃদয়ে এমন স্মৃতি সৌধ নির্মাণ কর যার জন্য মানুষ তোমাকে অনাদিকাল স্মরণ করবে। ইতিহাসের পাতায় তোমার কীর্তি চিরদিন জীবন্ত হয়ে বিরাজ করবে। চার দেয়ালে ও ইটপাথরের দালানে নিজের জীবনকে আবদ্ধ করো না। নিজের মেধা ও কর্ম দিয়ে ইতিহাসের পাতা দখল কর। নিজের নাম এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত কর যা কোনদিন ম্লান হবে না, রঙ হারাবে না, নষ্ট হবে না। মানুষ তোমাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে চিরকাল।

মাহমূদ! সম্পদের প্রাচুর্য, সুন্দরী নারী আর সুরম্য প্রাসাদ সৎ নেতৃত্বের জন্যে বড় বাধা। মানুষের বড় দুর্বলতা, এসবের মধ্যে কেউ নিজেকে আটকে ফেললে সে ভোগ-বিলাসিতার শিকলে বাঁধা পড়ে যায়, সে শয়তানের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। এখন তুমি পূর্ণ যুবক। তারুণ্য ও যৌবনের মিলন মোহনায় তুমি উপনীত। এ এক কঠিন ক্রান্তিকাল। অধিকাংশ মানুষ এই সময়ে লক্ষ্যচ্যুত হয়, জীবন ও কর্মের পরিণতি ভুলে যায়। তুমিও যদি এ সময়ে আরাম আয়েশ, রঙিন স্বপ্ন ও বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দাও, ভোগের গভীরে নিজেকে তলিয়ে দাও, তবে সেখান থেকে ফিরে আসা আর সম্ভব নয়। বিলাসী শরীরের তন্ত্রীগুলো মরে যায়, এই মরা মানুষ দিয়ে কি পৃথিবীর ইতিহাস গড়া যায়? এজন্য প্রয়োজন ত্যাগী মানুষ। জীবন্ত মানুষ। তোমাকে আমি আদর্শ মানুষরূপে দেখতে চাই।

এ সব কথা শুনে মাহমূদ বললো, আব্বু! আপনি আমাকে ওই বাগান বাড়িতে আর দেখবেন না। আমি আমার পূর্বসূরিদের উত্তরাধিকার কখনও বিস্মৃত হব না। আমার হৃদয়ে এ কথা গেঁথে নিয়েছি, আমি ময়দানের লোক, রণাঙ্গনের লড়াকু সৈনিক, যুদ্ধক্ষেত্র আমার আসল ঠিকানা।

তুমি যদি ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করতে গিয়ে লড়াই করে শাহাদাত বরণ কর, তবে আমি তোমার তৈরি উদ্যানে তোমাকে সমাহিত করবো, তোমার

কবরের চারপাশে বাহারী রঙের অগণন ফুলের সমারোহ ঘটাবো। এই বাহারী বাগানে চিরসুখে শুয়ে থাকবে। এ বাগান হবে তোমার চির সুখনিদ্রার ঠিকানা।

পিতার উপদেশ ও অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছিলেন শাহজাদা। সুবক্তগীনের কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছিল তার জীবনে। সতের বার ভারত আক্রমণের স্মৃতিবাহক সতেরো স্তম্ভের এখন আর কোন খোঁজ নেই। সুলতান মাহমূদের বাগান বাড়িরও কোন হদিস নেই। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় জীবন্ত হয় আছে সুলতান মাহমূদ ও তার ঐতিহাসিক ভারত অভিযান। এখনও পৌত্তলিক হিন্দুদের কাছে, মূর্তিপূজারীদের কাছে সুলতান মহাতঙ্ক, মূর্তিসংহারী, বিজয়ী অবয়ব। পৃথিবীর মানুষ তাকে স্মরণ করবে চিরকাল।

কিছুদিন আগে রাজা জয়পাল যখন পেশোয়ার হয়ে গজনীর দিকে যাচ্ছিল, তখন তার রাজকীয় জৌলুস ও জাঁকজমক দেখে পাহাড়-নদীও যেন কুর্নিশ করে তার চলার পথ করে দিতো। সাধারণ মানুষ জয়পালের হস্তিবাহিনী ও বিশাল অশ্বারোহী সৈন্যদের দেখে ভয়ে দূরে চলে যেতো। আর আজ গজনী থেকে পালিয়ে আসা রাজাকে দেখে পেশোয়ারের প্রজারা বিস্মিত হলো। তারা চিনতেই পারছিল না, এ লোক কি তাদের রাজা না এটা রাজার প্রেতাত্মা!

রাজার বিশাল সামরিক বাহিনী বিক্ষিপ্ত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে বেহাল অবস্থায় ফিরে আসে। যে সব হাতি রণসাজে মাথা উঁচু করে যুদ্ধযাত্রা করছিল, সেগুলোর মাথা ছিল ক্ষত বিক্ষত অবনমিত। এদের চলার গতি দেখে মনে হচ্ছিল, এরা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাবে এখনই।

পেশোয়ারের রাজপ্রাসাদে রাজাকে অভ্যর্থনা জানাতে নাকারা বেজে উঠল। দুই সারিতে নিরাপত্তা রক্ষীরা দাঁড়িয়ে গেল দু'পাশে। রাজা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, এসব বাদ্য-বাজনা বন্ধ কর। একান্ত রক্ষীদের একজনকে বলল, "পণ্ডিত দু'টোকে এক্ষুনি আমার সামনে হাজির কর।"

পেশোয়ার রাজমহলে নেমে এলো মৃত্যুর বিভীষিকা। রাজমহলের বাসিন্দারা যেন সব মৃতবৎ। কারো মুখে টু শব্দটি নেই। মাত্র দু'তিনজন হাঁক ডাক করছিল, "পণ্ডিত কোথায়, কোথায় পণ্ডিত মহারাজঃ"

রাজা একটি বদ্ধ কক্ষে রাগে, ক্ষোভে, অপমানে, আত্মগ্লানিতে টলছিল। নিজের উরুতে নিজেই থাপ্পড় মারছিল আর দু'হাত কচলাচ্ছিল। কখন দু'পণ্ডিত তার খাস কামরায় প্রবেশ করে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছে সে দিকে তার বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই।

সবচেয়ে বড় পণ্ডিত বাটাণ্ডায় থাকতো। রাজা যখন গজনী আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয় তখন পণ্ডিত মহারাজও লাহোর আগমন করে। এই পণ্ডিতই রাজাকে গজনী অভিযানের শুভক্ষণ বলে দিয়েছিল। পণ্ডিতরা রাজাকে এই নিশ্চয়তাও দিয়েছিল যে, পৃথিবীর কোন শক্তি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না, রাজার বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

"মহারাজ! আমরা আপনার দরবারে হাজির হয়েছি"– বলল বড় পণ্ডিত। চকিতে রাজা ঘুরে দাঁড়াল। তার চেহারা অপমান, ব্যর্থতা আর ক্ষোভে পাণ্ডুর, গোস্বায় তার চোখ দু'টি দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। সত্য আর মিথ্যার দোলাচলে দোদুল্যমান রাজার মন।

"তোমরা মিথ্যা বলেছিলে, না যে পুঁথি দেখে তোমরা শুভ দিন নির্ধারণ করেছিল ওগুলোতে মিথ্যা লেখা হয়েছে?" গম্ভীর আওয়াজে পণ্ডিতদের জিজ্ঞেস করল রাজা।

আমরাও মিথ্যা বলিনি, পুঁথির কথাও মিথ্যা নয়। তারকা কখনও মিথ্যা নির্দেশ দেয় না মহারাজ! এক পণ্ডিত বলল। আমরা আপনাকে এখনো শুভক্ষণটা হিসেব কষে দেখাতে পারব।

"তোমরা লক্ষবার হিসাব করোগে! কিন্তু আমার সামনে চরম অবমাননাকর পরাজয়ের বাস্তবতা বিদ্যমান। আমি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছি। ধ্বংস হয়ে গেছে আমার সেনাবাহিনী।"

"তোমাদের ওসব ভবিষ্যদ্বাণীর কি হলো? তোমরাই আমাকে উদ্বুদ্ধ করে বলেছিলে, শুভ এই অভিযান। তোমরাই তো শোনালে আমাকে দেবতার আশীর্বাদের দৈববাণী। তোমরাই পণ্ডিতদের সাথে নিয়ে যেতে বলেছিলে এবং উপদেশ করেছিলে, লড়াই শুরু করার আগে এই মূর্তি আর কৃষ্ণ দেবতাকে সিপাইদের সামনে রেখে পূজা-অর্চনা করে লড়াই শুরু করতে। এসব করলে আমার সৈনিকরা পাহাড় ধসিয়ে দিতে সক্ষম হবে। তোমাদের কথামতো সব আয়োজনই আমি করেছিলাম। লড়াই শুরু করার আগে মূর্তি আর দেবতাদের পূজা-অর্চনা শুরু হলো, কিন্তু তা শেষ না হতেই মুসলিম সৈন্যরা আমাদের উপর ঝড়ের বেগে হামলা করল। প্রচণ্ড তুফানের মতো এসে ওরা সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে ফেলল, আমরা খড়কুটোর মতো পিষ্ট হতে লাগলাম। ওরা আমাদের দেবতা, অবতার আর মূর্তিগুলোকে ভেঙেচুরে মাটিতে মিশিয়ে দিল। তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দেখে এসো, আমাদের দেবমূর্তিকে মুসলমানরা কিভাবে পায়ে পিষে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে!

তোমরা হয়তো মনে করবে, ওরা বিশাল বাহিনী নিয়ে আমাদের ওপর হামলা করেছে। না, রাতের বেলায় আমরা যখন সৈনিকদের সামনে কৃষ্ণ আর দেবমূর্তি রেখে প্রার্থনা শুরু করেছি, পণ্ডিতরা শ্লোক গাইতে শুরু করেছে, এ সময় মাত্র শতাধিক মুসলিম আমাদের সৈনিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবকিছু তছনছ করে দিল। এরপর দিনের বেলায় আর আমরা শত্রু সৈন্যদের মোকাবেলায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলাম না। আমার সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। পণ্ডিতরা পালিয়ে গেল। সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আমিও পালিয়ে আসতে বাধ্য হলাম। অথচ আমার বাহিনীতে তিন লাখের বেশি সৈন্য ছিল। ওরা ছিল আমাদের এক চতুর্থাংশেরও কম।"

"আমরা আবার হিসাব কষে বলব মহারাজ। মনে হয় তারায় তারায় সংঘর্ষ হয়ে গেছে।"

রাজা জয়পালের ক্ষোভ তখন চরমে। চরম অপমান, লজ্জা, তিক্ত পরাজয়ের বাস্তবতা তার সামনে। আর ওসব পণ্ডিত ব্যস্ত রয়েছে তাদের জ্যোতিষীপনার সত্যতা প্রমাণে। রাজা তিন লাখের বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে পুরো আফগানিস্তানকে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গজনী বিজয়ের আশায় অভিযান চালিয়েছিল। তার স্বপ্ন ছিল মহাভারতের সীমানার মধ্যে সে হিন্দুকুশ পর্বতমালাকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। কিন্তু রূঢ় বাস্তবতা হলো, বিরাট সেনাবাহিনীকে সে সুবক্তগীনের মর্জি আর কৃপার সামনে ত্যাগ করে এসেছে। নিজের অবস্থাও ছিল শোচনীয়। পেশোয়ার পৌঁছার আগ পর্যন্ত পিছন ফিরে দেখার সাহসটুকু সে হারিয়ে ফেলেছিলো। তার জন্যে আরো বিপর্যয়কর বিষয় হলো, সে শুধু তার নিজের সৈন্য নিয়ে গজনী যায়নি, বিজয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আশ-পাশের আরো পাঁচ-ছয়টি রাজ্যের সৈন্যদেরকেও সঙ্গী করেছিল। সে সব রাজার কাছে মুখ রক্ষার কিছুই আর জয়পালের অবশিষ্ট থাকলো না।

এছাড়া তৎকালীন ভারতে রেওয়াজ ছিল, কোন রাজা যদি পরপর দু'বার শত্রু বাহিনীর কাছে পরাজিত হয় তবে তাকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হতো। রাজা জয়পালের পরাজয়ের সংখ্যা সেই মাত্রা অতিক্রম করে ফেলেছে। এখন তার পক্ষে সিংহাসনে টিকে থাকার প্রশ্নটিই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। অন্যান্য রাজারা চাপ দিলে ছেলের হাতে রাজক্ষমতা ত্যাগ করা ছাড়া তার কোন উপায় নেই। জয়পালের ছেলে আনন্দ পাল তখনও কিশোর। সুবক্তগীন যেমন মাহমূদকে যুদ্ধকৌশলে দক্ষরূপে গড়ে তুলেছিলেন তেমনি আনন্দপালকেও রণবিদ্যার বহু কৌশল রপ্ত করিয়েছিলেন। কিন্তু আনন্দপালের রাজ্যপাট সামলানোর মতো বয়স

হয়নি। আনন্দপালের হাতে রাজ্যপাট ন্যস্ত করে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়ার সময় এখনো আসেনি। উপরন্তু অন্য রাজারা তাদের বিপুল সৈন্য ও রসদ ক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ দাবী করে বলতে পারে, এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সিংহাসন ও রাজ্য আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। এসব চিন্তায় রাজা জয়পালের মাথা বিগড়ে যাওয়ার উপক্রম। এমতাবস্থায় যখন পণ্ডিতেরা পরাজয়ের কারণ নির্ণয়ের জন্যে আবার তারার অবস্থান হিসেব করে কোথায় ভুল হয়েছে তা খতিয়ে দেখার কথা বলল তখন ক্ষোভে-অপমানে রাজা কাঁপতে শুরু করল।

"আমি তোমাদের পরিষ্কার বলছি যে, মুসলমানরা তোমাদের মতো যুদ্ধের গনা শুনে আসেনি। ওরা তারার গতিপথ দেখে গণক-জ্যোতিষীদের কথামতো বিজয়ের শুভ-অশুভ যাত্রা দেখে আসেনি। আমাদের হাতে মুসলিম সৈন্য খুব কমই বন্দী হয়ে এসেছে। তন্মধ্যে দু'জন অফিসার রয়েছে। এদেরকে তোমরা দেখ, ওরা তোমাদের মতো মুসলিম মৌলভীদের কোন বিজয়-আশ্বাস নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল কি? আমার তো সন্দেহ হয়– মুসলমানদের কথা সত্য মনে হয়। ওরা বলে— কাদামাটি আর পাথরের তৈরি এসব দেবতা মিথ্যা; আর ওরা যে খোদার ইবাদত করে তাই সত্য।"

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ মহারাজ! মুসলমান ম্লেচ্ছ। ওদের নাম উচ্চারণ করাও অশূচি। আপনার পরাজয়ের কারণে দেবতাদের মিথ্যা আখ্যা দেয়া মহাপাপ হবে। এই পরাজয়ের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। পরাজয়ের কারণ এই নয় যে, মুসলমানদের ধর্ম সত্য, আমাদের দেব-দেবীরা ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।"

কারো ঘরে ডাকাত পড়লে সেই ঘর উজাড় হয়ে যায়। বলল অপর পণ্ডিত। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ডাকাতদের খোদা সত্য আর লুণ্ঠিতদের খোদা মিথ্যা।

"আমি তো আমার ধর্মকে সত্য জেনেই মুসলমানদের দেশে এই সত্য ধর্মকে বিস্তৃত করতে চেয়েছিলাম। দেবতারা আমাকে কেন সহায়তা করল না? মুসলমানরা আমাদের দেবতাদেরকে টুকরো টুকরো করে উপহাসে মেতে উঠল। এসব কি সহ্য করার মত?" বলল রাজা জয়পাল।

"মহারাজ! আমাদেরকে আবার যাচাই করে দেখার সুযোগ দিন।"

আমি আবার তোমাদের গণনা যাচাই করে দেখার সুযোগ দিচ্ছি। একথা বলে রাজা জয়পাল গমনোদ্যত পণ্ডিতদের বলল, তোমরা একটু বস। আমি মুসলিম কয়েদীদেরকে তোমাদের সামনে হাজির করছি। রাজা তার খাস কামরায় ঝুলানো ঘণ্টা বাজাল। এক দারোয়ান ভেতরে প্রবেশ করলে রাজা

দু'তিনজন সিনিয়র জেনারেলের নাম বলে দারোয়ানকে হুকুম দিলেন বিশেষ কামরায় বন্দী দু'জন কয়েদীকে নিয়ে জেনারেলদের এখানে হাজির হতে বল।

রাজা জয়পাল সিংহাসনে সমাসীন। দরবারের দস্তুর মতো দুই পণ্ডিত রাজার ডানপাশে এবং তাদের পাশে দুই জেনারেলকে বসানো হল।

সুদর্শন, সুগঠিত দেহ, দীর্ঘকায় দু'জন বন্দীকে ভেতরে আনা হল। তাদের হাতে হাতকড়া, পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী বাঁধা। কয়েদী হলেও তাদের চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ পরিস্ফুট। তারা নিরুদ্বিগ্ন। কোন ধরনের ভীতির ছাপ নেই তাদের চেহারায়। কেননা তারা বিজয়ে গর্বিত, তারা সুলতান সুবক্তগীনের বাহিনীর সৈনিক। পদবীতে কমান্ডার। তারা শেষ যুদ্ধে রাতের আঁধারে দুঃসাহসী গেরিলা হামলা করে শত্রুপক্ষের ব্যূহে ঢুকে পড়ে গ্রেফতার হয়েছিল। এদের সেনারা শত্রুপক্ষের বহু ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছিল বটে, কিন্তু তাদেরও কুরবানী দিতে হয়েছে প্রচুর।

রাজা জয়পালের দরবারের এক লোক গজনীর ভাষা জানতো। রাজা তার সহায়তায় বন্দীদের সাথে কথা বলল, "আমি তোমাদের কাছে যুদ্ধের কোন গোপন কৌশলের কথা জিজ্ঞেস করব না। তোমরা শুধু আমাকে একথা বলবে, যুদ্ধ যাত্রার আগে সুলতানকে কোনদিন যাত্রা করলে শুভ হবে, তারার অবস্থান শুনে তোমাদের মৌলভী কিংবা জ্যোতিষীরা কি এরূপ কিছু বলে?"

"না, আমাদের ধর্মীয় গুরুরা এসব কিছু বলেন না।" বলল নেজাম আউরিজী নামের বন্দী কমান্ডার।

"আমরা ধর্মের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের মোকাবেলায় লড়াই করি। আমাদের শত্রু আপনারা, খৃষ্টান ও ইহুদীরা। আমাদের স্বধর্মীয় লোকদের মধ্যেও আমাদের শত্রু রয়েছে। আমরা যে যুদ্ধ করি আমাদের দৃষ্টিতে এটিকে জেহাদ বলা হয়। আমরা রাজ্যের পরিধি বিস্তারের জন্যে যুদ্ধ করি না, আমরা আল্লাহর জন্য আল্লাহর সত্য ধর্মের বিজয়ের লক্ষ্যে যুদ্ধ করি। যুদ্ধ যাত্রা কিংবা যুদ্ধ শুরুর জন্যে বিশেষ কোন ক্ষণ বা দিনের জন্যে আমরা অপেক্ষা করি না। প্রত্যেক দিন বা সকল মহূর্তকেই আমরা শুভ মনে করি। দিন হোক রাত হোক, ঝড়-বাদল, শীত-গ্রীষ্ম সবই আল্লাহর। এই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা যুদ্ধ করি। অপারেশনে নেমে পড়ি। আল্লাহর প্রতিটি দিন ও মুহূর্ত শুভ ও সুন্দর। এটাই আমাদের বিশ্বাস।"

তোমাদের মসজিদগুলোতে কি তোমাদের মৌলভী ও ইমাম সাহবেরা তোমাদের জন্যে বিশেষ কোন দু'আর আয়োজন করে?

প্রত্যেকেই জিহাদে গমনকারীদের জন্যে দু'আ করে।

আমাদের ছোট-বড় ছেলে-বুড়ো সবাই সব সময় আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলতে পারে। বলল নিজাম আউরিজী।

আচ্ছা! তোমরা কি জান তোমাদের বিজয়ের রহস্য কি? তোমরা কি আমার সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে আগে জানতে? জিজ্ঞেস করল রাজা।

আপনার সৈন্য সংখ্যার ব্যাপারটি জানা-না জানার বিষয়টি আমাদের সুলতান এবং সেনাপতিদের দায়িত্ব। ওসব নিয়ে আমরা ভাবি না। আমাদের সাফল্যের রহস্য হলো আমরা যুদ্ধ করি আল্লাহর জন্যে। আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হই বাঁচার জন্যে নয় শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

তা আমি জানি। বলল রাজা। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, আমার বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে তোমরা এতো অল্পসংখ্যক লোক কিভাবে বিজয়ী হলে? তোমাদের যুদ্ধের কৌশল কি?

এটা একান্তই গোপনীয় বিষয়। এ ব্যাপারে আমি যেমন আপনাকে কিছু বলতে পারব না, আমার সাথীও আপনাকে কিছু বলতে পারবে না। তবে একথা বলতে পারি, আল্লাহর উপর ঈমানদার কোন ব্যক্তি তারার গতিবিধিতে বিশ্বাস করে না। যতক্ষণ ঈমান মজবুত থাকে, ততক্ষণ মু'মেন আকাশের বিজলীর ন্যায় দুর্বার গতিতে সামনে এগিয়ে চলে। আমাদের উলামায়ে কেরাম বলেছেন, হিন্দু ও পৌত্তলিকরা কাদামাটি ও পাথরের মূর্তির পূজা করে। ওদের বিশ্বাস দুর্বল এবং অক্ষম ওদের দেবদেবীরা। আমরা আপনাকে বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছি, হাতে গড়া কাদা-মাটি ও পাথরের দেবদেবী প্রকৃত খোদার সাথে টক্কর দিলে ধুলোর সাথে মিশে যায়। আপনি কি দেখেননি, আপনার সৈনিকরা সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল বহু দেবদেবী, সে সব কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি? আপনার একজন সৈন্যও কি অক্ষত ফিরে আসতে পেরেছে?

এই ম্লেচ্ছ আমাদের দেবদেবীকে অপমান করছে মহারাজ! রাগতস্বরে বলল এক পণ্ডিত।

এই গবেট এখনও বুঝতে পারছে না যে, সে আমাদের বন্দী, বলল রাজা। এরা তাদের কঠিন পরিণতি সম্পর্কে বেখবর। এরা যদি যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে আমাকে ওদের গোপন রহস্য প্রকাশ না করে তাহলে আমি ওদের চামড়া তুলে ফেলব। তখন দেখবে, যন্ত্রণায় গড়গড় করে সব বলে দেবে।

আমাদের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে জানতে হলে আপনাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে মহারাজ! বলল অপর বন্দী। আমাদের হত্যা করেও আপনি রহস্য জানতে পারবেন না এবং আপনার লজ্জাকর পরাজয়কেও বিজয়ে পরিণত করতে সক্ষম হবে না।

এদের নিয়ে যাও! শিকলে বেঁধে রাখো। আর অন্যগুলোকে হত্যা করে ফেল। রাজা হুকুম দিল।

উভয় কয়েদীকে খাস কামরা থেকে নিয়ে গেল প্রহরী। রাজা পণ্ডিতদের উদ্দেশে বলল, আমি পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করতে চাই। তোমরা জেনে শুনে জলদি বল এ কাজ কিভাবে করা সম্ভব।

পণ্ডিতরা চলে যাওয়ার পর রাজা জয়পাল তার দুই জেনারেলকে বলল, এ দুই কয়েদীকে লাহোর নিয়ে যাবো। আগামীকাল এখান থেকে আমরা রওয়ানা হব। এদেরকে নেয়ার ব্যবস্থা কর।

এদের কাছ থেকে আপনি কি রহস্য জানতে চান মহারাজ! জিজ্ঞেস করল এক জেনারেল।

আমাদেরকে পরাজয়ের রহস্য আবিষ্কার করতে হবে। সুবক্তগীন আমাদের রণপ্রস্তুতি আর আক্রমণের খবর আগেই জেনে ফেলেছিল। আগাম খবর নিয়ে মুসলমানরা ওঁত পেতে রাতের আঁধারে আমাদের সৈনিকদের মনোবল ভেঙে দিয়েছে। পাহাড়ের আড়ালে ওদের সৈনিকরা আগে থেকে ওঁত পেতেছিল আর রাতে গেরিলা হামলা করেছিল। সুবক্তগীনের গুপ্ত বাহিনী গেরিলা হামলার জন্যে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। তখন আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত।

যুদ্ধের রহস্য উন্মোচন করতে হলে আপনাকে আগে খোঁজ নিতে হবে, আমাদের যাত্রা ও প্রস্তুতির খবর কিভাবে গজনী পৌঁছল। সুবক্তগীনের গোয়েন্দারা আমাদের আশেপাশে ঘাপটি মেরে আছে। এদের খুঁজে বের করার ব্যবস্থা আগে করতে হবে মহারাজ!

রাজা জয়পাল বার্ধক্যে উপনীত। উপরন্তু উপর্যুপরি পরাজয়ের গ্লানিতে তার দেমাগ বিগড়ে গিয়েছিল। অন্য কারো কথা বা পরামর্শ শোনার মতো মানসিকতা তার ছিল না। রাজা পরাজয়ের কারণ নিজে যা বুঝতে পেরেছিল সেরূপ প্রতিকার ব্যবস্থা নিচ্ছিল। কিন্তু পরাজয়ের কারণ যে তার ধারণা ভিন্ন অন্য কিছু, হতে পারে এটা তাকে বোঝানোর ক্ষমতা কারো ছিল না। নেজাম আউরিজী যখন বলল, তাকে হত্যা করলেও যুদ্ধের রহস্য সে ফাঁস করবে না, এরপর রাজা এদের

মুখ থেকে রহস্য উদঘাটনের ফন্দি আঁটতে লাগল। যে করেই হোক রহস্য সে এদের মুখ থেকে বের করবেই।

লাহোরের সবচেয়ে বড় মন্দিরের প্রধান মূর্তি সরস্বতির সামনে আতর, গোলাব, ধূপ, লোবান, আগরবাতি জ্বালিয়ে একান্ত মনে পূজায় বসেছে পণ্ডিত। মন্দিরের ভেতর-বাহির ধুয়ে মুছে ঝকমকে করা হয়েছে। আলোকমালায় গোটা মন্দির ঝলমল করছে। আজ মন্দিরে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বিশ-পঁচিশটি কুমারী মন্দিরের ভেতরে ফুলের ডালি নিয়ে দাঁড়ানো। এরা বিশেষভাবে তৈরি পোশাকে সজ্জিত হয়ে মন্দিরের প্রবেশ পথে দু'সারিতে দাঁড়িয়েছে। মন্দিরের সদর দরজার সামনে রাজার বিশেষ নিরাপত্তা অফিসাররা টহল দিচ্ছে। ইত্যবসরে ঘোষণা শোনা গেল, মহারাজের সওয়ারী আসছে।

রাজার আগমনী সংবাদে বাদক দল বিশেষ সঙ্গীতের তুফান তুললো। বাজনার তালে তালে নেচে উঠল তরুণী দল। গোটা এলাকা হারিয়ে গেল কান ফাটা ঢাকঢোল আর বাদ্যযন্ত্রের শব্দে। রাজা সদর গেটে এলে কুমারীরা কুর্নিশ করে গমন পথে তার পদতলে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দিল। তাজা ফুলের পাপড়ি মাড়িয়ে তরুণীদের বেষ্টনী পেরিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করল রাজা। প্রবেশ করল বিশেষ এক কক্ষে। যেখানে পণ্ডিত মহারাজ তন্ত্রমন্ত্র জপছিল। এক পণ্ডিত তাকে কুর্নিশ করে মাথায় তিলক পরিয়ে দিল। অন্য পণ্ডিতেরা ঘটি, শাঁখা বাজাতে শুরু করল। রাজা জয়পাল দু'হাত জোর করে সরস্বতীর পা ছুঁয়ে চোখে-মুখে হাত বুলাল। আর শপথ করল, যে করেই হোক সে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবেই নেবে। প্রতিজ্ঞা করল মূর্তির সামনে, 'পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করে সুদূর বুখারা পর্যন্ত আমি দেব-দেবীর ডঙ্কা বাজাব। ইসলামের সূতিকাগার পর্যন্ত আমি সনাতন ধর্মের সীমানা বিস্তৃত করে ক্ষ্যান্ত হব। দেবদেবীদের মর্যাদা বুলন্দ করতে ব্যর্থ হলে যুদ্ধেই আমি প্রাণ ত্যাগ করব।"

রাজার প্রার্থনা শেষ হলে শুরু হল পণ্ডিতদের পালা। পণ্ডিতেরা ওদের নিজস্ব সংস্কৃত ভাষায় অনেক কিছু বলল, যা অন্যদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। ঘণ্টা আর শাঁখা ধ্বনি আরো তীব্র হল। হঠাৎ ভীষণ গর্জন শোনা গেল— যেন আসমান ভেঙে পড়েছে। বাইরে যেন রাতের আঁধার নেমেছে। পরপর কয়েকবার গর্জন শোনা গেল। পণ্ডিতেরা পরস্পর চোখাচোখি করল, বুড়ো রাজা পণ্ডিতদের কাতর অবস্থা আর ভুবন কাঁপানো গর্জনে ভয়ে কেঁপে উঠল। তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বড় পণ্ডিত দেবতার সামনে আরো জোরে জোরে মন্ত্র পড়ছে আর রোদন করছে। বাইরে নেমে এলো গভীর অন্ধকার। শুরু হল চেঁচামেচি, হাঁকডাক আর চিৎকার।

মহারাজ! দেবতা খুব নাখোশ হয়েছে। গজনীর যুদ্ধে দেবদেবীদের অপমান করা হয়েছে। এই অপমান দেবতা কখনও ক্ষমা করবে না। রাজার সামনে দু'হাঁটু গেড়ে নীচু গলায় বলল বড় পণ্ডিত।

এ সময় হঠাৎ আকাশে এমন বিকট বিজলী-গর্জন শুরু হলো যে, মন্দির কেঁপে উঠল, মূর্তিগুলো নড়ে গেল।

রাজা কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে উঠল, পণ্ডিত!

জ্বী মহারাজ!

দেবী মা কি চায়? কতো মানুষের বলি চায় দেবী? যতো নরবলি চায় বলুক, আমি দেবীর পদতলে হাজারো নরবলী দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করব।

এ সময় রাজা জয়পাল, পণ্ডিত ও মন্দিরের সেবায়েতদের মধ্যে আকাশের অবিরাম বিকট গর্জন আর বিজলীর ভয়াবহ ঝলকানিতে ধুকপুকানি শুরু হয়েছে। ভিতরে ভিতরে ভয়ে সবার বুক শুকিয়ে গেছে।

মন্দিরের অনতিদূরে মুসলমান কৃষকরা নির্বিঘ্নে ক্ষেতে কাজ করছিল। তাদের খুশি দেখে কে। দীর্ঘদিন পর কাঙ্ক্ষিত মুষলধারার বৃষ্টিতে আনন্দ উচ্ছ্বাসে তারা বলাবলি করছিল, "এবার ফসল ভালো হবে, আল্লাহ্ রহম করেছেন। ভাইয়েরা! বাড়ি গিয়ে সবাই নফল নামায পড়ো, শুকরিয়া আদায় করো।" মুসলিম কৃষকদের আনন্দ উল্লাস আর হর্ষধ্বনি মন্দির থেকেও শোনা যাচ্ছিল।

মুসলমানদের জন্যে যা ছিল আল্লাহর দয়া মন্দিরের মূর্তিপূজকদের বিবেচনায় তা ছিল দেবতার ক্রোধ, ভগবানের গযব। মুসলমানরা ভারী বর্ষণ-বৃষ্টিকে আল্লাহর রহমত ভেবে শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে নফল নামায পড়ার জন্যে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছে। মুসলমান শিশুরা বৃষ্টিতে ভিজে কাদা-পানিতে খেলতে নেমেছে, হৈ চৈ, চেঁচামেচি করে উল্লাস করছে। অপর পক্ষে রহমতের এই বারিধারা ও মেঘের গর্জনে মন্দিরের পূজারী ও রাজার চেহারা মলিন হয়ে গেছে। গযবের আশঙ্কায় মন্দিরের সর্বত্র ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে।

বড় পণ্ডিত হাতজোড় করে বড় দেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছিল, এদিকে রাজাও ভগবানের শাস্তি আশঙ্কায় কাতর। বাইরে সারি বেঁধে দাঁড়ানো যুবতীরা দ্বিতীয়বার আকাশের গর্জনে ভীত হয়ে দৌড়ে মন্দিরে এসে কাঁপতে শুরু করেছে।

দীর্ঘক্ষণ পর এক পণ্ডিত মুখ তুলে বলল, মহারাজ! এক কুমারীর বলিদান!

মাত্র একটি?

জ্বী মহারাজ! মাত্র একটি কুমারী হলেই চলবে। বলল পণ্ডিত।

কোন মুসলমান কুমারীকে ধরে এনে এক্ষণই আমার সামনে বলি দিয়ে দাও। হুকুম করল রাজা।

না-না মহারাজ! ভগবান কোন ম্লেচ্ছ বলিদান গ্রহণ করবেন না। খাঁটি বামুন কুমারী চাই।

রাজা জয়পালের দৃষ্টি পড়ল পাশে দাঁড়ানো কুমারীদের প্রতি। এরা সবাই মন্দিরের চিরকুমারী! সেবায়েত এই চিরকুমারীরাই একটু আগে তার গমন পথে ফুল ছিটিয়ে দিচ্ছিল।

এরাও তো কুমারী। এদের একজনকে বলিদানের জন্য রেখে দিন। পণ্ডিতের উদ্দেশে বলল রাজা।

রাজার কথা শুনে মেয়েরা পরস্পর চোখাচোখি করল এবং বাঁকা ঠোঁটে হাসল। পরক্ষণেই তাদের এই আচরণে পণ্ডিতদের ক্রোধাগ্নি আঁচ করতে পেরে দমে গেল সবাই। পণ্ডিতরা একটু চুপসে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা ইতস্তত হল। কারণ, এই মেয়েরা জনসাধারণের দৃষ্টিতে খুবই সম্মানের পাত্রী, মন্দিরের সেবাদাসী, দেব-দেবীর জন্য উৎসর্গিত চিরকুমারী। মন্দিরে এদের অবাধ যাতায়াত। একাকী অথবা জোড়ায় জোড়ায় দল বেঁধে যখন ইচ্ছে এদের জন্যে মন্দিরে গমনাগমনে কোন বিধিনিষেধ নেই। বাইরের মানুষ এদেরকে সতি-সাধ্বী ভেবে ইজ্জত করলেও মন্দিরের পণ্ডিত আর ওরা জানে, তারা কোন ধরনের কুমারী। বারবার তাদের বাঁকা দৃষ্টি পণ্ডিতদের বিব্রত করছিল এবং তা কুমারীদল ও পণ্ডিতদের মাঝে এক জটিল সম্পর্কের ইংগিত বহন করছিল।

রাজা জয়পাল তন্মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির বাজু ধরে পণ্ডিতকে বলল, একে বলিদান করুন।

'আমি আপনার পায়ে জীবনোৎসর্গ করতে প্রস্তুত মহারাজ' স্বগতোক্তি করল মেয়েটি। আমি দেবীর পদতলে জীবন উৎসর্গ করবো তাতে আপত্তির কী আছে! কিন্তু মহারাজ! আমি যে কুমারী নই।

তোমার বিয়ে হয়েছে, তবে মন্দিরে এলে কেন?

"আমি কারো বিবাহিতা স্ত্রী নই মহারাজ। এই মন্দিরের দাসী। কিন্তু পণ্ডিতজী আমার সতীত্ব...। অপকটে বললো মেয়েটি।

বলিদানের জন্যে একটা বিশেষ ধরনের দৈহিক গড়ন, অঙ্গসৌষ্ঠব আর কুমারী নারী দরকার মহারাজ! মেয়েটির কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল বড় পণ্ডিত। এই গুণ এখানকার কুমারীদের মাঝে অনুপস্থিত। বলিদানের জন্যে

উপযুক্ত মেয়ে আমরা খুঁজে নেব, এজন্য আপনি নিশ্চিত থাকুন। সেই কুমারীকে আমরা এই চাঁদের পূর্ণিমা থেকে আগামী চাঁদের পূর্ণিমা পর্যন্ত আমাদের হেফাযতে রাখব। ওকে বিশেষ ধরনের খানা, বিশেষ পোশাক পরাতে হবে এবং বিশেষ ধরনের তা'লিম দিতে হবে। সে নিজে থেকেই বলি হওয়ার জন্য আর্জি পেশ করতে থাকবে। সে আপনার আকাঙ্ক্ষা সফলের জন্য আশীর্বাদ করবে। তাকে এখানে নয় একটা বিশেষ স্থানে নিয়ে বলীদান করা হবে মহারাজ!

এ কাজ খুব জলদি হওয়া দরকার। বলল রাজা।

আপনি বলিদানের ইচ্ছে ব্যক্ত করার সাথে সাথেই দেবতা খুশি হয়ে গেছেন। তার রাগ কমে গেছে। দেখলেন না, আপনি বলিদানের কথা বলার সাথে সাথে দেবতা শান্ত-নিরব। বন্ধ হয়ে গেছে গর্জন। থেমে গেছে ঝড়। আকাশ একেবারে পরিষ্কার।

রাজা জয়পাল মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল। বলি হওয়ার ভয়ে মেয়েদের চেহারা পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করেছিল। এরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পণ্ডিতের কথায় অন্য কুমারী বলিদানে রাজা সম্মতি দিল। এরা রাজার কথায় আশঙ্কা করছিল, না জানি তাদের মধ্যে কাউকে আবার বলিদানের শিকার হতে হয়।

আজ তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, কেন আমরা তোমাদের কুমারীত্ব নষ্ট করেছি। না হয় আজ তোমাদেরই বলি হতে হতো। নির্লজ্জের মত বলল বড় পণ্ডিত। কুমারীত্ব নষ্ট না করলে একের পর এক তোমাদেরকেই বলিদান বরণ করতে হতো। তোমরা তোমাদের শরীর বলিদান করে জীবন দান থেকে মুক্তি লাভ করেছো। বড় পণ্ডিত কুমারীদের উদ্দেশে এমন গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলছিল, যেন সে বেদ পুরানের কোন শ্লোক আবৃত্তি করছিল।

রাজা জয়পালের বহর ভারী বর্ষণের ফলে কাদা-মাটির মধ্য দিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে রওয়ানা হল। রাজার প্রস্থানে তার রক্ষী-প্রহরী সৈন্যরা মন্দির এলাকা ত্যাগ করল। বড় পণ্ডিত কুমারীদের পিছনের কামরায় চলে যেতে নির্দেশ দিয়ে নিজেও সেই কামরায় প্রবেশ করল। সদর গেট বন্ধ করে দেয়া হল।

রাজা যখন মন্দিরে গেলো তখন গজনীর দুই বন্দীকে রাজপ্রাসাদে আনা হল। রাজার হুকুম ছিল এখানে এদের হাজির করার। রাজার ফেরায় বিলম্ব দেখে একটি ঘরে তাদের বসিয়ে দেয়া হল। রাজার হুকুম ছিল, ওদেরকে কয়েদখানায় নিম্নমানের আহার না দিয়ে ভাল আহার দেবে, আরাম বিছানার ব্যবস্থা করবে।

রাজার চেষ্টা ছিল ওদের প্রতি একটু সদয় ব্যবহার করে মুসলিমদের যুদ্ধ জয়ের গোপন রহস্য উদ্ধার করার। কারণ, রাজার কাছে তাদের যুদ্ধ কৌশলের রহস্য বলতে এরা অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

রাজা তার জেনারেলদের বলেছিল, বন্দীদেরকে আরাম-আয়েশে রেখে তাদের মন জয় করার মাধ্যমে রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করতে হবে। তাতেও যদি কাজ না হয় তবে কঠিন শাস্তি দিয়ে ওদের পেট থেকে রহস্য বের করে আনতে হবে।

তাদের জন্যে যখন আহার আনা হল তখন তারা বলল, এই খাবার কে রেঁধেছে? তাদের বলা হল, রাজ মহলের বাবুর্চিরা পাকিয়েছে এই খাবার। তারা বলল, তারা কোন হিন্দুর পাকানো খাবার খাবে না। তাদেরকে কোন মুসলমানের রান্না করা খাবার দেয়া হোক এবং খাবার কোন মুসলমানকে দিয়ে পাঠানো হোক। রাজার যেহেতু নির্দেশ ছিল মেহমানের মতো এই দুই বন্দীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার, তাই রাজমহলের খানা ফিরিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পর এক মুসলমানকে দিয়ে খাবার পাঠানো হল। বন্দীরা যখন নিশ্চিত হল, খানাবাহক প্রকৃতই মুসলমান তখন আগ্রহভরে আহার করল।

ওরা যখন আহার করছিল, তখন পাহারাদার সিপাই ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার পাশে চলে গিয়েছিল। এরা শিকলে বাঁধা, তাই পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল না। আহার বহনকারী মুসলমান কর্মচারী আহাররত বন্দীদের পাশে বসল। সে আড়চোখে দেখে নিল, প্রহরী ঘরের বাইরে চলে গেছে। সে নীচু স্বরে ফারসীতে বলল, তোমাদের খুব আদর-যত্ন করা হচ্ছে এই ভেবে তোমরা খুশি হয়ে যেয়ো না। এমন ব্যবস্থা ওসব বন্দীর বেলায়ই নেয়া হয় যাদের কাছে দামী কোন রহস্য থাকে।

উভয় বন্দী গভীরভাবে ওকে দেখল।

খানাবাহক বলল, আমার দিকে তাকিয়ো না, খানার দিকে চোখ রেখে নিঃশব্দে কথা বলো। এরা দেখলে সন্দেহ করবে, আমি তোমাদের লোক। যদি তোমাদের কাছে সত্যিই কোন রহস্য থাকে তবে তা কখনও প্রকাশ করো না, কিন্তু ওদের লোভ দেখাবে। ওদের ধোঁকা দিয়ে আস্থা অর্জন করো, যাতে ওরা তোমাদের পায়ের ডাণ্ডাবেড়ি ও কোমরের শিকল খুলে দেয়। সুযোগ পেলেই আমি তোমাদের পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবো। দেখো কোন প্রলোভনে পড়ে গোপন তথ্য ফাঁস করো না যেন। তাহলে তোমরা ফেঁসে যাবে। একবার

ফেঁসে গেলে আর রক্ষা পাবে না। এমন কঠিন শাস্তি দেবে পরাণ ঠোঁটের সাথে ঝুলে থাকবে। মরেও মরবে না।

এরা যখন কথা বলছিল তখন বাইরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির শব্দে এদের কথার আওয়াজ বাইরে যাচ্ছিল না। বৃষ্টি থামতেই রাজা প্রাসাদে এলো এবং এদের ভিতরে নিয়ে বলল, আমি তোমাদের কাছ থেকে সুবক্তগীনের যুদ্ধ জয়ের রহস্য জানতে চাচ্ছি!

"আমরা পরাজয় চিনি না। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে নতি স্বীকার করি না। আপনি ও আপনার জাতির লোকেরা মুসলমানদের ধোঁকা দেয়া ও প্রতারণা করাকে নেক কাজ মনে করেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাকে মনে করেন বুদ্ধিমত্তা। এই ধূর্তামি আমরা জানি না। শিকলে বাঁধা অবস্থায় যদি আমরা আপনাকে রহস্য বলে দেই তবে এর অর্থ দাঁড়ায় গ্রেফতারীর যন্ত্রণায় আমরা কওমের সাথে বেঈমানী করেছি। বন্দী অবস্থায় আমরা আপনার সাথে কোন কথা বলতে পারব না।"

"রাজা শ্লেষ মাখা স্বরে বললো, তাহলে কি আমি তোমাদের অতিথি করে রাখবো?"

যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। শিকলে বন্দী থেকে আমরাই কি আপনাকে বন্ধু ভাবতে পারি? বলল এক বন্দী কাসেম বলখী। আপনি আমাদের ঊর্ধ্বতন নেতৃস্থানীয় লোকদের কয়েদখানায় হত্যা করেছেন, আমাদের সুলতানের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। আমাদের মুখ থেকে রহস্য জেনে যাওয়ার পর আমাদের সাথেও এমন ব্যবহার করবেন না এর নিশ্চয়তা কি?

আমরা আপনাকে বলতে পারি, যতো বেশি সৈন্য নিয়েই আপনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন না কেন পরাজয় আপনার হবেই। অবশ্য আমরাই কেবল আপনাকে বলতে পারি বিজয়ের রহস্য কি। কিভাবে আমাদের পরাজিত করা সম্ভব।

আমি তোমাদের ডাণ্ডাবেড়ি ও শিকল খুলে দিচ্ছি। তোমাদেরকে কয়েদখানার বাইরে রাখার ব্যবস্থা করছি।

"আমরা যদি রহস্যের কথা আপনাকে বলি আপনি কি আমাদের ছেড়ে দেবেন? গজনী পর্যন্ত যেতে আমাদের বাহনের ব্যবস্থা করবেন?" প্রশ্ন করল নিজাম।

"তোমরা যা চাইবে তাই দেব, নিশ্চিন্ত থাক।"

আমরা এ ব্যাপারে কয়েক দিন চিন্তা করব। এরপর বলব। পরখ করে নেব, এই সময়ের মধ্যে আমাদের সাথে আপনি কেমন আচরণ করেন। কারাগারের বাইরে আর ভিতরে আপনি আমাদের যেখানেই রাখেন আমরা পালিয়ে আর কোথায় যাব! একটা ব্যাপারে আপনি খেয়াল রাখবেন, আমরা মুসলমানের রান্না করা খাবার ছাড়া আহার করব না, আজও এক মুসলমানের রান্না করা খাবার আমাদের দেয়া হয়েছে। আমাদের আবদারে এক মুসলমান কর্মচারী খাবার দিয়ে গেছে আমাদেরকে।

পরাজয়ের গ্লানিতে বিপর্যস্ত রাজা বন্দীদের শর্ত মেনে নিল। হুকুম করল, আজ যে মুসলমান কর্মচারী বন্দীদের খাবার নিয়ে এসেছিল একেই তাদের তদারকিতে নিযুক্ত করা হোক।

বন্দীদের ভিন্ন ভিন্ন দু'টি ঘরে রাখা হল। তাদের থাকার ঘরে মেহমানদের মতোই আহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হল। তবে তারা জানতে পারেনি যে, তাদের ঘরের বাইরে সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একাধারে কয়েক সপ্তাহ ধরে সকল মন্দির ও শহরে-বাজারে প্রচার করা হচ্ছে, মুসলমানরা এদেশে আক্রমণ করতে ধেয়ে আসছে। এরা কোন মন্দির ও পণ্ডিতকে জীবিত রাখবে না। কোন নারীর সতীত্বকেও অক্ষত রাখবে না। মুসলিম সেনাদের প্রতি হিন্দু প্রজাদের ঘৃণা বাড়ানোর জন্যে বোঝানো হল, বাপ-দাদার ধর্ম, নিজেদের মন্দির ও ধর্মগুরু বিশেষ করে মা-বোনদের ইজ্জত বাঁচানোর তাগিদে তাদের সরকারী কোষাগারে অকাতরে অর্থ-কড়ি দেয়া জরুরী। প্রতিটি মন্দির থেকে প্রচার করা হচ্ছে, মুসলিম আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে না পারলে হিন্দুদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। অপপ্রচারে কাজ হলো। প্রজাসাধারণ তাদের সম্পদের সিংহভাগ অকাতরে রাজকোষে ঢেলে দিল।

লাহোরের সবচেয়ে বড় মন্দির থেকে ঘোষণা করা হল, এখন বেশি করে প্রজাদের উচিত, মন্দিরে হাজির হয়ে ভগবানের ভজনা করা। সেই সাথে প্রত্যেকের কুমারী কন্যা-বোনদের নিয়মিত মন্দিরে নিয়ে আসা। কুমারীদের ভজনায় দেবতা বেশি খুশি হয়ে থাকেন।

পণ্ডিতরা একথাও প্রচার করল যে, মহারাজা এখন সৈন্যবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত। তিনি দ্রুত মুসলমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করবেন, যাতে মুসলমানরা লাহোর আক্রমণের অবকাশই না পায়। তাই প্রজাদের উচিত এই কঠিন সময়ে বেশি করে মন্দিরের পূজা-অর্চনায় শরীক হওয়া এবং যথাসম্ভব

রাজাকে সাহায্য করা। রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বার্থেই এখন ভজনা ও অর্থ সাহায্য উভয়টাই রাজার জরুরী।

মন্দিরের প্রচারণায় সুফল ফলল। হিন্দু প্রজারা কুমারী মেয়েদের মন্দিরে পাঠাতে শুরু করল। বড় পণ্ডিত কুমারীদের পূজা-অর্চনা পরিচালনা করতো। কিভাবে দেবতাদের সামনে হাতজোড় করে পূজো দেবে তা তদারকি করতো। আর কুমারীদের নিরীক্ষণ করতো। কারণ, তার একজন কুমারীকে দেবতার পদতলে বলিদানের জন্যে বাছাই করা জরুরী।

গজনীর দুই বন্দীর খোঁজ নেয়ার অবকাশ রাজার আর হল না। প্রতিবেশী রাজ্যের রাজারা সবাই লাহোর এসে হাজির হল। তারা প্রত্যেকে জয়পালের গজনী আক্রমণে সৈন্য ও রসদ দিয়ে সাহায্য করেছিল। এতে দিল্লী, কনৌজ, গোয়ালীয়রের রাজার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। টানা কয়েকদিন পরাজয় ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্ক হল। কিন্তু মুসলমানদের পুনরায় হামলা করে কিভাবে গজনী দখল করা যায় তর্ক-বিতর্ক এ পর্যায়ে আটকে রইল। পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানে কিংবা পুনর্বার সহযোগিতা না করার কথা কেউই উচ্চারণ করল না।

আমরা গজনী দখল করতে পারলে ওখান থেকে আরব পর্যন্ত আক্রমণের পথ খুলে যাবে। বলল কালিঞ্জরের মহারাজা। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এ প্রতিজ্ঞা বদ্ধমূল হওয়া উচিত যে, বিশাল মহাভারতের স্বপ্ন আমাদের বাস্তবায়ন করতেই হবে। মহাভারতের সীমানা ফোরাত ও দজলা পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে। এ কাজ আমরা না করতে পারলে আরব এলাকা খৃষ্টানদের দখলে চলে যাবে। আমার কাছে খবর এসেছে, মুসলমান রাজারা একে অন্যের বিরুদ্ধে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে। এর অন্তরালে প্রধান ভূমিকা রাখছে খৃষ্টান গোয়েন্দারা। তারা মুসলিম আমীর-উমারাকে সুন্দরী মেয়ে ও মদের ঢোপ গিলিয়ে ওদের অন্দর মহল পর্যন্ত নিজেদের কজায় নিয়ে নিয়েছে।

আমাদেরও এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। বলল রাজা জয়পাল। মুসলমানদেরকে আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, যুদ্ধবিদ্যায় আমরা কত পারদর্শী। তবে এ মুহূর্তে আমাদের সৈনিকদের মধ্যে মুসলিম যোদ্ধাদের প্রতি প্রচণ্ড ভীতি রয়েছে। এরা মনে করে মুসলিম যোদ্ধারা দুঃসাহসী ও ভয়ঙ্কর। কখনো ওদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। এই ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে জনসাধারণের মাঝেও। তাই দ্রুত সুলতান সুবক্তগীনের সৈন্যদের পরাজিত করে আমাদের সৈন্য ও প্রজাদের মন থেকে এই আতঙ্ক দূর করতে হবে। গজনী আমাদের

দখলে চলে আসলে ওখান থেকে আমরা খৃষ্টানদের কৌশল অবলম্বন করে সহজে কাজ করতে পারব।

আমাদের মেয়েরা ইহুদী ও খৃস্টান মেয়েদের তুলনায় বেশি সুন্দরী ও মেধাবী। বলল কনৌজের মহারাজ। আমাদের শত্রুদের পরাস্ত করতে, দেব-দেবীদের আদর্শ প্রচার ও প্রসারিত করতে, সর্বোপরি আমাদের প্রধান শত্রু মুসলমানদের ধর্মকে বিকৃত করার কাজে হাজারো মেয়েকে আমরা বলি দিতে প্রস্তুত রযেছি। আমাদের যে মেয়েরা স্বামীর মৃত্যুতে জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিতে পারে তারা নিজের ধর্ম ও জাতির কল্যাণে জীবন দিতে মোটেও দ্বিধা করবে না। বস্তুত এ কাজে জীবন দেয়ার দরকার হবে না, সম্ভ্রমের বিনিময়ে মুসলিম সৈনিক ও নেতাদের ভেড়া বানানোর খুবই সহজ কাজ। এটা আমাদের মেয়েরা সানন্দে করবে।

আমি একটি কুমারী বলিদান করছি। বলল জয়পাল। অন্য রাজারা রাজা জয়পালের পরাজয়ে ক্ষতিপূরণের দাবী না তুলে নতুন করে তারই নেতৃত্বে গজনী আক্রমণের ফয়সালা করে চলে গেল। জয়পাল সুবক্তগীনের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে রাতদিন নতুন সৈন্য সংগ্রহ, তাদের ট্রেনিং ও রসদ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে গেল।

মন্দিরে মন্দিরে পণ্ডিতেরা সাধারণ মানুষকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত ও ক্ষুব্ধ করে তুলতে বিরামহীন কাজ করে চললো।

আর এদিকে নিজেরা মুসলিম সুলতানকে ধ্বংসের আয়োজনে পুরোদমে লেগে পড়ল। গজনীর আশপাশে মুসলিম রাজারা একজোট হয়ে একের পর এক সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। অথচ যদি তিন লাখ হিন্দু বাহিনীর হাতে সুলতান সুবক্তগীন পরাজিত হতেন, তাহলে অন্য ছোট ছোট মুসলিম রাজ্যগুলো জয়পালের সৈন্য-স্রোতের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে যেতো। সুলতান শুধু নিজের অধিকৃত রাজ্যই রক্ষা করেননি, তিনি জীবনবাজি রেখে ইসলাম ও অন্যান্য ছোট ছোট রাজ্যের মুসলমানদের ঈমান, ইজ্জত, জীবন ও জমিন রক্ষা করেছেন। তবুও কেউ তার সহযোগী হল না। সবাই তার ওপর বিরূপ। তার ছেলে মাহমূদ একমাত্র তার সহযোগী।

সুলতান সুবক্তগীন হিন্দুস্তানের জায়গায় জায়গায় গড়ে তুলেছিলেন নিবিড় গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক। হিন্দু রাজা-মহারাজাদের মতি-গতির খবর এরা তাকে খুব দ্রুত সরবরাহ করত। সুবক্তগীন এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন, জয়পাল আবার আক্রমণ করবে তার উপর। অবশ্য তিনি ধারণা করেছিলেন, এতো ক্ষয়ক্ষতি ও লোকবল হারিয়ে রাজা খুব তাড়াতাড়ি হামলা করার হয়তো সাহস পাবে না।

এদিকে তার নিজের সৈন্যবাহিনীর অবস্থাও ছিল শোচনীয়। বিশাল বাহিনীকে অল্পসংখ্যক সৈন্য দিয়ে মোকাবেলা করতে গিয়ে তারও বহু জানবাজ যোদ্ধা হারাতে হয়েছে। শুধু জয়পালের আক্রমণ আশঙ্কাই নয় আরো বহুবিধ সমস্যায় পতিত হয়েছিলেন সুবক্তগীন। প্রায় সকল প্রতিবেশী মুসলিম রাজা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র শানাচ্ছিল। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি দু'ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিলেন। সকল প্রতিবেশী মুসলিম রাজ্যে দূত পাঠালেন, তারা যেন সবাই হিন্দু আগ্রাসন মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। কিন্তু কেউ তার প্রস্তাবে সাড়া দিল না। সুলতান সুবক্তগীনের দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল, পেশোয়ারের উত্তর-পশ্চিমের ছোট ছোট দুর্গগুলোর নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়া। তিনি সুনির্বাচিত ও দক্ষ কিছু সৈনিক নিয়ে এ অঞ্চলের আফগান ও খিলজী বংশজাত লোক অধ্যুষিত দুর্গগুলো দখল করে নেন। বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদেরও যুদ্ধের জন্য প্রভাবিত করেন। আলেম-উলামার দ্বারা ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার করে এ অঞ্চলের সবাইকে ইসলামের পতাকা তলে সমবেত করতে সক্ষম হলেন।

আফগানী ও খিলজীদের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী ছিল না। তারা সুবক্তগীনের সাথে সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করল এবং তাদের প্রচুর সংখ্যক যুবককে সুবক্তগীনের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করাল।

এভাবে কেটে গেল আরো সময়। মাহমূদের বয়স এখন তেইশ বছর। সুলতান সুবক্তগীন তাকে খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। তখন মুসলিম সালতানাতের অন্যান্য অংশে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল। বুখারার বাদশাহ আবুল মনসুরের ইন্তেকালে তার ছেলে নূহ মসনদে আসীন হলে ফায়েক নামক এক হাকিম বিদ্রোহ করল। নূহের সৈন্যরা সুলতান সুবক্তগীনের কাছে সহযোগিতার আবেদন জানাল। সুলতান সুবক্তগীন নিজে নূহের সাথে দেখা করে তার জন্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন।

সুবক্তগীনের নিজের রাজ্যেই বিদ্রোহ দেখা দিল। আমীর বু আলী হাসান খোরাসানের কিছু অংশ দখল করে নিল। সে বিদ্রোহী ফায়েককে আশ্রয় দিল। সুলতান সমঝোতা চুক্তির পয়গাম পাঠালেন কিন্তু আলী হাসান কোন পাত্তাই দিল না। ওদের শিকড় উপড়ে ফেলা ছাড়া সুলতানের আর বিকল্প কোন পথ রইল না। বিদ্রোহী মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা ছাড়া তার আর উপায় রইল না। এদিকে বু আলী হাসান ও অন্যদের পর্দার আড়ালে থেকে খৃস্টানরা সার্বিক সহযোগিতা ও উস্কানী দিচ্ছিল। এরা বিধর্মীদের উস্কানিতে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে

আত্মগর্ভে বুঁদ হয়ে পড়েছিল। শেষতক সুলতান সৈন্য নিয়ে বলখ পৌঁছলেন, এদিকে নূহও তার সৈন্য নিয়ে সুলতানের সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন।

ফায়েক ও আলী হাসান জুরজানের শাসক ফখরুদ্দৌলাকে দলে ভিড়িয়ে নিল। ফখরুদ্দৌলার দারা নামের এক সেনাপতি ছিল। তার বীরত্বের কীর্তিগাঁথা দূর পর্যন্ত মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো।

এসব রাজা তাদের বাহিনী নিয়ে হেরাত পর্যন্ত অগ্রসর হল। সুলতান সুবক্তগীন ও তার বাহিনী হেরাতের একটি ময়দানে উপনীত হলেন। তার কাছে যুদ্ধের জন্য এ স্থানটি ছিল খুবই যুৎসই। এই শক্ত প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় সুলতানের সহযোগী একমাত্র বাদশাহ নূহ। সে কিশোর ও অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে আমীর ফায়েক তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এই আশায় যে, সে ভীত হয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে। সুলতানের বড় শক্তি শাহজাদা মাহমূদ এখন কৈশোর পেরিয়ে এক টগবগে যুবক। ওদিকে সারা হিন্দুস্থানের রাজা-মহারাজারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানতে প্রস্তুত। এদিকে নিজ ভূমিতে ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে মুসলিম সেনারা পরস্পরের মুখোমুখি। একজন অপর জনের রক্তপিপাসু। এমন কঠিন সময়ে সুলতান সুবক্তগীন যখন যুবক মাহমূদ আর তরুণ নূহের দিকে তাকালেন তখন তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল।

"আব্বা আপনার চোখে পানি!" বিস্ময়মাখা প্রশ্ন মাহমূদের।

"ইসলামের কফিনের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ঝরানো ছাড়া আর কি করার আছে মাহমূদ!" ধরা গলায় বললেন সুলতান সুবক্তগীন।

"মুসলমানরা যখন ঐক্যবদ্ধ ছিল ইউরোপ-কুফরীস্তানেও তারা ইসলামের বিজয় কেতন উড়াতে সক্ষম হয়েছিল। মুসলমানদের অনৈক্যের কারণে ইউরোপ থেকে আজ ইসলাম নির্বাসিত। হিন্দুস্থানেও ইসলামের ঝাণ্ডা আজ ভূলুণ্ঠিত। বহু মুসলিম দেশ খৃস্টানরা দখল করে নিয়েছে, আরো দখলের চেষ্টা করছে। অপরদিকে হিন্দুরাও আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে। তোমাদের দেখে আমার চোখে পানি এসে গেছে এই ভেবে যে, আমরা তো পরস্পর লড়াই করে একদিন শেষ হয়ে যাবো, সন্তানদের জন্যে কি রেখে যাচ্ছি! আমরা তো তোমাদের জন্য পতিত এক ইসলামী সালতানাত রেখে যাচ্ছি। ক্ষমতার লোভ, গৃহবিবাদ আর ঈমান কেনাবেচার বাজার আজ সরগরম। ঐ সব ঈমান বিক্রেতা, ক্ষমতালিপ্সুর সন্তানেরা ক্ষমতার লোভে ইসলামের শত্রুদের হাতে নিজের ঈমান-ইজ্জত বিক্রি করতে মোটেও দ্বিধা করবে না। কুফরীস্তানের মূর্তি ভাঙা ছিল আমার দায়িত্ব। বাতিল বিরোধী সংগ্রামের দায়িত্ব তোমাদের হাতে সোপর্দ করতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু আমার মুসলিম ভাইয়েরা– আমরা যারা একই খোদা, একই কা'বা, একই কুরআনের আদর্শে চলি– একই রাসূল (স.)-এর আনুগত্য করি তারাই আজ আল্লাহর পথ ভুলে বসেছি। বাবা! মুসলিম মিল্লাতের ভবিষ্যত অন্ধকার। ক্ষমতা ও মসনদের লোভ আর মদ ও মেয়েতে ডুবে গিয়ে ওরা মুসলিম জাহানকে টুকরো টুকরো করছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, প্রত্যেক মুসলিম রাজ্যে অবিশ্বাস, বিবাদ, প্রতারণা কিভাবে বিস্তার ঘটেছে। বর্তমান মুসলমানরা দৃশ্যত ঐক্যবদ্ধ হলেও এদের মনে প্রতারণার বীজ সুপ্ত রয়েছে। একে অন্যের প্রতি এরা ভীষণ অসহিষ্ণু। এরা মতভিন্নতাকেও মনে করে শত্রুতা। এরা শুভাকাঙ্ক্ষীকেও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। আমাদের উঁচু মহল থেকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নির্বাসিত হয়ে গেছে। খেলাফত আছে নামে মাত্র।" দীর্ঘক্ষণ কথা বলে সুলতান নীরব হয়ে গেলেন। এরপর মাথা উঁচু করে বললেন, "মাহমূদ ও নূহ! তোমাদের বাহিনীকে আমার সামনে এনে দাঁড় করাও।"

মাহমূদ ও নূহের সৈন্যরা সুবক্তগীনের সামনে এসে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে। সুবক্তগীন নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আছেন। সুবক্তগীন যেখানে দাঁড়ানো সে জায়গাটি একটি টিলার মতো। সেখান থেকে আমীর ফায়েক, আলী হাসান ও ফখরুদ্দৌলার বাহিনীর তাঁবু দৃশ্যমান। সুবক্তগীন চোখ বুলালেন নূহ ও মাহমূদের বাহিনীর প্রতি। অনুক্ত যন্ত্রণায় তাঁর বুক ভারী হয়ে উঠল। তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে সৈনিকদের প্রতি উচ্চ আওয়াজে বলতে লাগলেন–

"আল্লাহর সিপাহীগণ! আমি তোমাদের মত একই ধর্মের অনুসারী, একই বেশ-ভূষায় সজ্জিত আরেকটি বাহিনী দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা আমাদের প্রতিপক্ষ। তোমরা আর ওরা যদি এক হয়ে যাও, পরস্পর শত্রুতা পরিহার করে ঐক্য গড়ে তোল তাহলে ইসলামের ঝাণ্ডা আবার তারেক বিন যিয়াদ ও মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজিত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ তোমাদের ও ওদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। শত্রু ও চক্রান্তকারীরা আমাদেরকে পরস্পর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের জন্যে জীবনত্যাগী আর ওরা সিংহাসন ও ক্ষমতার পূজারী। তারা দীন, ঈমান, ইজ্জত ও হুরমতকে নিলাম করে দিয়েছে। হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকরা আমাদের উপর দু'বার হামলা করেছে, তোমরা ওদের তুলনায় অনেক কম লোকবল নিয়েও তাদের পরাজিত করেছো। বলতে পারো, কোন শক্তিবলে তোমরা এতো বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলে? সেই শক্তি হলো তোমরা আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর নাম বুলন্দ করার লক্ষ্যে মরণপণ যুদ্ধ করেছো। আর তারা ক্ষমতা, মসনদ ও তাগুতের জন্যে জীবনবাজি যুদ্ধ করেছে। আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমরা

শাহাদাতের আশায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে, তাই বিজয় তোমাদের পদচুম্বন করেছিলো।

এখন আমাদের প্রতিপক্ষে যারা দাঁড়িয়েছে এরা পৌত্তলিকদের মতোই খোদাদ্রোহী ও আল্লাহর দুশমন। এরা আল্লাহর দুশমনদেরই সহায়তা করছে; আমাদের নিঃশেষ করে ওরা আমাদের চিরশত্রু ও ইসলামের দুশমনদের শক্তি বৃদ্ধি করতে চাচ্ছে। তোমরা ওদের মুখে 'নারায়ে তাকবীর' শুনে বিভ্রান্ত হয়ে তরবারী কোষবদ্ধ করে ঘোড়ার গতি ঘুরিয়ে নেবে না। তোমরা এই প্রতারক-শত্রুদের দ্বারা বিভ্রান্ত হলে এই ভূখণ্ড থেকে ইসলাম চিরতরে বিদায় নেবে। এরা শয়তানের দোসর। এরা চাঁদ-তারা খচিত ঝাণ্ডা বহন করছে তোমাদের ধোঁকা দিতে। চেনা শত্রুদের আগে ছদ্মবেশী এই শত্রুদের নিঃশেষ করতে হবে। এরা ঘরের শত্রু বিভীষণ, ভাইয়ের বেশে হন্তারক, শত্রুপক্ষের ক্রীড়নক।

আমি ওদেরকে এই যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার জন্যে চেষ্টা কম করিনি, কিন্তু তারা আমার বিনীত প্রস্তাব ও জাতির কল্যাণের কথা মোটেও বিবেচনা করল না। আমি আমার কোন ছেলের মৃত্যু মেনে নিতে পারি, কিন্তু ধর্মের অপমান সহ্য করা অসম্ভব। ইসলামের শক্তি অজেয় রাখতে আমরা জীবন বিলিয়ে দেব, কিন্তু শত্রুদের দূরাশা পূরণ করতে দেবো না।

আল্লাহর সৈনিকগণ! ইসলামের সৈনিকেরা রাজত্বের জন্যে লড়াই করে না, ইসলামের সৈনিকরা আল্লাহর হুকুমত মজবুত এবং গোমরাহ মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের শামিয়ানার নীচে একত্রিত করতে জীবনপণ জিহাদে অবতীর্ণ হয়। তোমরা কি ভুলে গেছো মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো কাফেরদের কব্জায় চলে যাওয়ার পর সে সব মা-বোনের কথা, যাদের ইজ্জত নিয়ে বেঈমানেরা উল্লাস করেছিল? তোমরা কি চাও ওরা আমাদের কন্যাদের উপর নারকীয় বর্বরতা চালাক? অথচ তোমাদের বিপরীতে যেসব মুসলিম নামের কাপুরুষ আমীর-উমারা যুদ্ধসাজে সজ্জিত তারা নিজ কন্যাদের ইজ্জত বেঈমানদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। যারা স্ত্রী-কন্যার ইজ্জত-সম্ভ্রমের মূল্য দেয় না, তাদের কাছে ইসলাম ও ধর্মের মর্যাদা আর জাতির কল্যাণের আশা করা দুরাশা নয় কি? ইসলামের পরাজয় ও মর্যাদাহানিতে ওদের কিছুই যায় আসে না।"

আবেগ, উত্তেজনায় সুলতান সুবক্তগীনের ভাষণ আরো জোরালো ও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠছিল। তার অগ্নিঝরা বক্তৃতা শুনে নূহ ও মাহমূদের সৈনিকরা প্রতিপক্ষের প্রতি ক্ষোভে টগবগ করছিল। যোদ্ধাদের শরীরের রক্তে যেন আগুন

ধরে গিয়েছিল প্রতিপক্ষের সবকিছু তছনছ করে দিতে। কিন্তু যোদ্ধাদের এই উজ্জীবন ও উত্তেজনায় সুলতানের মধ্যে কোন আশার সঞ্চার করল না। তার মলিন চেহারার কালিমা দূর হল না। তার চেহারা তখনও দুঃখে কাতর, বিষাদে ভারাক্রান্ত। দীর্ঘ বক্তৃতার পর তিনি সৈনিকদের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের পর লড়াইয়ের কৌশল বলে দিলেন। সুবক্তগীন ও নূহ অবস্থান নিলেন বাহিনীর মাঝখানে। প্রতিপক্ষে দারা নামের এক বিখ্যাত যোদ্ধা রয়েছে। নিজ রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়েও বহু দূর-দূরত্ব পর্যন্ত মুখে মুখে ফেরে তার বাহাদুরি ও বীরত্বের কাহিনী। সে যখন সুলতানের বাহিনীকে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে দেখল, সাথে সাথে নিজ দলের সৈনিকদের সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিল। দারা জানতো, সে যদি সুলতানকে আগে আক্রমণের সুযোগ দেয় তবে বিজয়ী হওয়া কঠিন। একটু সুযোগ পেলেই সুলতানের বাহিনী সব তছনছ করে দেবে। সুলতানের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা ছিল। দারা ছিল সদা সজাগ ও সতর্ক ব্যক্তিত্ব।

এক অভিনব কৌশল করল দারা। সে মাঝের সৈনিকদের স্থিতাবস্থায় রেখে অনেক ঘুরপথে এসে সুলতানের বাহিনীর দুই প্রান্তবাহুতে আক্রমণ করে বসল। দারার এই আক্রমণ ছিল ধারণাতীত এবং প্রচণ্ড।

সুলতানের জন্যে দারার এই চাল ছিল একেবারেই আন্দাজের বাইরে। আকস্মিক এই আক্রমণে সুলতানের বাহিনী বেঘোরে প্রাণ দিতে লাগল এবং ভড়কে গেল। দারার সেনাশক্তিও প্রচুর। তদুপরি সে নির্বাচিত ও দক্ষ বিপুল সৈন্য রেখেছিল মধ্যভাগে। সে জানতো, প্রতিপক্ষের দু'বাহু একই সাথে আক্রমণের শিকার হলে সুলতানকে দু'দিকেই সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। এতে মধ্যভাগের প্রতিরক্ষা ব্যূহ দুর্বল হয়ে পড়বে, আর এ সুযোগে সে প্রচণ্ড আক্রমণ করে বিজয় ছিনিয়ে নেবে।

সুলতানকে দারার কৌশলের ফাঁদেই পড়তে হলো। পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠল। তখন তিনি মধ্যভাগের রিজার্ভ সৈন্যদের প্রান্ত বাহুকে শক্তিশালী করার নির্দেশ দিলেন। ফলে তার রক্ষণভাগ দুর্বল হয়ে পড়ল। তিনি দিব্যি দেখতে পেলেন, মধ্যভাগেও আক্রমণ অত্যাসন্ন। তিনি মাহমূদ ও নূহকে বললেন, বেটা! হয়তো আজই আমার জীবনের শেষ যুদ্ধ, তোমরা সচেতন থাকো, অগ্রপশ্চাতে খেয়াল রেখো। যুদ্ধের গতি এখন শত্রুদের অনুকূলে। একটু অসতর্কতা বিরাট অঘটন ঘটাতে পারে।

সেই যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফেরেশতা লিখেছেন, সুলতানের দৃষ্টিতে যখন পরাজয়ের ক্ষণ ঘনিয়ে আসছিল তখন ধূলি উড়িয়ে প্রচণ্ড বেগে একজন

অশ্বারোহী সুলতানের দিকে অগ্রসর হতে দেখা গেল। শত্রুসৈন্যদের ব্যূহ থেকে আসতে দেখলেও তার তরবারী ছিল কোষবদ্ধ, ঢালটি পিছনে বাঁধা ছিলো। আগন্তুকের অবস্থা বলে দিচ্ছিল, সে কোন প্রস্তাব নিয়ে আসছে। দূত বা বার্তাবাহক হয়তো হবে।

সে সুলতানের কাছে এলে সবাই বিস্ময়ে হতবাক। এতো কোন সাধারণ দূত বা বার্তাবাহক নয়— শত্রুপক্ষের সেনাপতি দারা নিজে হাজির। দারা সুলতানের কাছে এসে সামরিক অভিবাদন ও সালাম দিয়ে নিজের ঢাল-তরবারী সুলতানের পায়ের কাছে ফেলে দিল।

দারা বলল, সম্মানিত সুলতান! আমি ইসলাম-দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত, আপন ভাইদের বিরুদ্ধে আমি তরবারী চালাতে অক্ষম। আমি আমার দেহরক্ষীসহ সব অনুগত সৈন্যদের নিয়ে আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। আমি যাদের সেনাপতি আজ তারা ক্ষমতার জন্যে লড়াই করছে। আমি সারাজীবন ইসলামের জন্যে জিহাদ করেছি। আমি আমার সারাজীবনের অর্জিত জিহাদের সওয়াব ও পুণ্য নষ্ট করতে চাই না। আমাকে আপনার বাহিনীতে জায়গা দিয়ে আল্লাহর দরবারে আনুগত্য প্রকাশের সুযোগ দিন, সুলতান!

দারা তার সাথে আসা বাহিনীকে নির্দেশ দিল, তোমরা আবার ঘুরে ক্ষমতালিপ্সু আমীর ফায়েক ও তার দোসরদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করো। দারা শুধু নির্দেশ দিয়ে ক্ষান্ত হলো না, ত্যাজ্য বাহিনীর উপর পাল্টা আক্রমণ হানতে অনুসারীদের নিজে কমান্ড দিয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেল। সুলতান সুবক্তগীন তার সকল রিজার্ভ সৈনিকদের দু'ভাগে বিভক্ত করে দুই প্রান্তবাহিনীকে সহযোগিতার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। মাহমূদকে দিলেন এক বাহুর কমান্ডিংয়ের দায়িত্ব। নূহকে নিজের কাছে রাখলেন। সম্মুখ যুদ্ধে অনভিজ্ঞ নূহকে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তিনি তার কোন বিপদ দেখতে চাননি।

অপরাধী কখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। কৃত অপরাধ অপরাধীকে তাড়া করে বেড়ায়। সত্যের মুখোমুখি হওয়ার মতো মনোবল অপরাধীর থাকে না। আমীর ফায়েক ও বু আলী হাসান তার সৈন্যদের সুলতান সুবক্তগীন ও দারার দয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে জীবন নিয়ে পালিয়ে গেল। তাদের সাথে কিছু সৈন্যও পালাতে সক্ষম হল। এরা এতই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, দৌড়িয়ে সুদূর জুরজানে গিয়ে থামল। জুরজানের বাদশাহ ফখরুদ্দৌলা তাদের আশ্রয় দিল। সেনাপতি দারার ঈমান ও আবেগ ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছিল। তিনি ইসলামের গাদ্দারদের জুরজান পর্যন্ত তাড়া করার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছিলেন, কিন্তু

সুলতান সুবক্তগীন তাকে এই বলে নিবৃত্ত করলেন, তিনি এই গৃহযুদ্ধকে আর বিস্তৃত করতে আগ্রহী নন বরং তিনি তাদেরকে সমঝোতার জন্যে আহ্বান করতে চান। দারার মতো মাহমূদও গাদ্দারদেরকে তাড়া করে অগ্নিপ্রতিশোধ স্পৃহা নিবৃত্ত করতে উদ্যত ছিলেন। ছদ্মবেশী দুশমনকে নিশ্চিহ্ন না করে ক্ষান্ত হতে তার টগবগে তারুণ্য ও উদ্দীপিত ঈমান সায় দিচ্ছিল না, তবুও পিতার আদেশ অম্লান বদনে মেনে নিল।

সুলতান সকল সৈনিককে একত্রিত করে নূহকে তার সৈন্যসহ বুখারায় ফিরে যেতে বললেন। মাহমূদ তার নিয়ন্ত্রিত বাহিনী নিয়ে নিশাপুর রওয়ানা হলেন। সুলতান রওয়ানা হলেন গজনীর পথে। সেনাপতি দারাকে তিনি নিজের সঙ্গী করে নিলেন।

মাহমূদ নিশাপুর পৌছে নিঃশ্বাস নেয়ার আগেই তার এক সীমান্ত সেনা-দূত হন্তদন্ত হয়ে তাকে খবর দিল, ফখরুদ্দৌলার সাহায্যপুষ্ট হয়ে আমীর ফায়েক ও বু আলী হাসান যুদ্ধসাজে নিশাপুরের দিকে এগিয়ে আসছে। ফখরুদ্দৌলা পূর্ব থেকেই সুলতান সুবক্তগীনের যুদ্ধ-পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখছিল। যখন সে সংবাদ পেল, সুলতান অধিকাংশ সৈন্য সাথে নিয়ে গজনী গেছেন এবং মাহমূদের কাছে মাত্র কিছুসংখ্যক সৈন্য রয়ে গেছে। সে তখন মাহমূদের বাহিনীর উপর আক্রমণকে সুযোগ মনে করল। অকস্মাৎ প্রচণ্ড আক্রমণ করে বসল।

মাহমূদ সেই দূতকে দ্রুত সুলতানকে সংবাদ জানাতে পাঠিয়ে দিয়ে সৈন্যের কমান্ড নিজ হাতে নিয়ে ময়দানের দিকে অগ্রসর হলেন। ততক্ষণে প্রতিপক্ষের সৈন্যে ময়দান ছেয়ে গেছে। মাহমূদের বাহিনীকে ঘিরে ফেলে প্রতিপক্ষ। মাহমূদের দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি ও যুদ্ধের অবসাদ দূর হওয়াতো দূরে থাক যাত্রা শেষ করার সুযোগটুকুও তার হয়নি। তার সৈন্য সংখ্যা প্রতিপক্ষের তুলনায় অতি নগণ্য। মাহমূদ প্রতিপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়াতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। মাহমূদ পশ্চাদপসারণের চিন্তা করলেন। কিন্তু পিছনে ফেরারও তেমন সুযোগ নেই। শত্রুবাহিনীর ঘেরাও ছিল খুব মজবুত। বাহ্যত মাহমূদ ছিলেন মৃত্যু ও বন্দী হওয়ার মুখোমুখি।

মাহমূদের সংবাদবাহী দুই দূত উল্কার বেগে সুলতানের উদ্দেশে ছুটে চলে। মাহমূদের ভাগ্য সুলতানের সাহায্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর হয়ে আছে। কিন্তু পথ ছিল যেমন দুর্গম তেমনই দীর্ঘ।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, পরদিন আলী হাসান ও আমীর ফায়েক দেখল, তাদের পিছনের আগমন পথে ধূলি উড়ছে। তারা ভাবল, হয়ত ফখরুদ্দৌলা

তাদের জন্য আরো সাপোর্ট বাহিনী পাঠিয়েছে। তারা এখন নিশাপুরের সর্বত্র ছড়িয়ে যাবে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তাদের আকাঙ্ক্ষা দুরাশায় পরিণত হলো। তারা দেখল, সুলতান সুবক্তগীনের সৈন্য দুই দিক থেকে তাদের বাহিনীকে ঘিরে ফেলেছে। তারা ধারণাই করতে পারেনি যে, সুলতান সুবক্তগীন এতো দ্রুত মাহমূদের সাহায্যে এত দূর পৌঁছে যাবেন। সুলতান ও দারা তাদের বাহিনীকে দুই বাহুতে প্রলম্বিত করে শত্রুদের ঘিরে ফেললেন। বিদ্রোহীরা যখন দেখল, তাদের পশ্চাদপসারণের পথ রুদ্ধ, তখন তারা নিজ বাহিনীকে একত্রিত করে সুবক্তগীনের মধ্য বাহিনীতে আক্রমণ করে বসল। পশ্চাদপসারণরত মাহমূদ ঘুরে প্রচণ্ড আক্রমণে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

যুবক মাহমূদ এমনিতেই গাদ্দারদের প্রতি রাগে ফুঁসছিলেন। কিন্তু মুখোমুখি হওয়ার মতো অবস্থা তার ছিল না। তিনি সুলতানের আগমন প্রত্যাশায় কালক্ষেপণের জন্যে শুরু থেকে বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখার লক্ষ্যে পশ্চাদপসারণের কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দেখলেন, প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত গতিতে সুলতান বাহিনী নিয়ে শত্রুপক্ষকে ঘিরে ফেলেছেন, তখন তার ক্ষোভ ও প্রতিশোধের আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎগিরণ করতে শুরু করল। তিনি শত্রু বাহিনীর উপর ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শত্রুবাহিনী তার অল্প সংখ্যক সৈন্যের আক্রমণেই ধরাশায়ী হয়ে গেল। কিন্তু কুচক্রী আমীর ফায়েক ও বু আলী হাসান কোন ফাঁকে পালিয়ে গেল কেউ টের পেল না। তাদের সৈন্যরা কচুকাটা হল। সাপের উদ্যত মাথা নীচু হয়ে গেল। এক বিশাল বিজয় সুবক্তগীনের পদচুম্বন করল।

এদিকে লাহোরের রাজা-মহারাজারা মিত্রবাহিনী প্রস্তুতিতে রাতদিন জোরদার তৎপরতায় ব্যস্ত। তারা গজনী, বুখারা, বলখ, খোরাসান দখল করার স্বপ্নে বিভোর। এবার শুধু সরকারী সেনারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে না, হিন্দু প্রজা সাধারণ নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল পৌত্তলিক ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে লিপ্ত। নিজেদের ঘরে রক্ষিত সোনা-গহনা, উপার্জিত পুঁজি-পাট্টা, মাল-আসবাব, রসদ উপকরণ যে যা পারল সবই সুলতান সুবক্তগীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বিলিয়ে দিল। হিন্দু পণ্ডিত-পুরোহিতেরা নাগরিকদের মনে মুসলিম বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। পুরোহিতরা সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে এই ধারণা জন্মাতে সক্ষম হয়েছিল, এখনই মুসলমানদের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ওদের রাজ্য দখল করতে না পারলে ভবিষ্যতে ভারতে কোন হিন্দুর অস্তিত্বই থাকবে না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুধু রাজা-মহারাজাদের কর্তব্য নয়, প্রত্যেক হিন্দুর ধর্মীয় দায়িত্ব।

অপরদিকে ইসলামী ভূখণ্ডে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরস্পর খুনোখুনিতে লিপ্ত মুসলিম নেতৃত্ব। ক্ষমতালিপ্সু মুসলিম আমীরেরা মুসলিম রাজ্যগুলোকে টুকরো টুকরো করে পরস্পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নিজেদের অমিয় শক্তি ক্ষয়ে লিপ্ত।

পেশোয়ার, লাহোর ও রাটান্ডায় সুলতানের গোয়েন্দারা জীবনবাজি রেখে রাজা-মহারাজাদের প্রতিটি পরিকল্পনা ও কার্যক্রম যথাসময়ে সুলতানকে অবহিত করছিল। তাদের ত্যাগ, বীরত্ব, সাহস ও দায়িত্ববোধের পরাকাষ্ঠা আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। এরা ছিল গুমনাম আত্মপরিচয় গোপনকারী ছদ্মবেশী– যারা কর্তব্য পালনের স্বার্থে নিজেদের নাম পর্যন্ত বদলে ফেলত। কিন্তু এদের অমূল্য অবদানকে ম্লান করে দিচ্ছিল হাতেগোনা কিছু সংখ্যক বেঈমান।

সুবক্তগীন রণক্লান্ত সৈনিকদের অবকাশ ও নিজেও কিছুটা বিশ্রামের জন্যে নিশাপুর থেকে বলখ চলে গেলেন। এরই মধ্যে তিনি নতুন সৈন্য ভর্তি ও সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু লাগাতার যুদ্ধ আর প্রশাসনিক কাজের মধ্যে ডুবে থাকায় নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দেয়ার অবকাশ তার হয়নি। ইতোমধ্যে বার্ধক্য ও রোগ তার শরীরে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। চিকিৎসকরা তাকে দীর্ঘ বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন। চিকিৎসকরা তাকে যতো দ্রুত সম্ভব সুস্থ করে তুলতে চেষ্টা করছিলেন। অপরদিকে অসুস্থতা তার চেয়েও বেশি দ্রুত বেগে বাড়তে শুরু করল। এক পর্যায়ে তিনি গজনী চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং গজনীর উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাকে যাত্রা বিরতি করতে হলো। তার পক্ষে আর পথচলা সম্ভব হলো না। একদিন সুলতান সুবক্তগীন শাইখ আবুল ফাতাহকে অসুখের প্রচণ্ডতায় বলছিলেন, "আমরা অসুস্থ হলে সুস্থ হওয়ার জন্যে চিকিৎসা করি, এক সময় সুস্থও হই। আবার অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হই, আবার চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হই। কিন্তু একদিন এমন আসে যখন আর সুস্থতা ফিরে আসে না। দুনিয়ার কোন চিকিৎসাই মৃত্যু থেকে মানুষকে রেহাই দিতে পারে না। কসাইরা যেমন খুব যত্ন করে খাসিকে ঘাস-পানি দেয়। খাসি কসাইয়ের আদর-যত্নে ভাবতে থাকে, সে চিরদিনই এমন আদর-যত্নেই থাকবে। কিন্তু হঠাৎ কসাই খাসির গলায় ছুরি চালিয়ে নিমিষে তার সকল আদর-যত্নের অবসান ঘটায়। মৃত্যুও কসাইয়ের মতো। যতো আরাম-আয়েশেই আমরা এখন থাকি না কেন, একদিন এই নির্মম মৃত্যু আমাদের জীবন কেড়ে নেবে, মৃত্যু থেকে কারো রেহাই নেই।" সমকালীন বুযুর্গ শাইখ আবুল ফাতাহকে একথা বলার ঠিক চল্লিশ দিন পর হঠাৎ সুলতানের অসুখ খুব বেড়ে গেল। তিনি কিছু বলার জন্য চোখের ইশারায় নির্ভরযোগ্য লোক খুঁজছিলেন, তার বাকশক্তি রহিত

হয়ে আসছিল। নিরাপত্তারক্ষীর কমান্ডার তার সামনে এগিয়ে গেলে তিনি বলেন, "মাহমূদকে বলবে, তোমাকে মূর্তিসংহারী হতে হবে। তাকে কর্তব্য ও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হবে।" একথা বলে তিনি নীরব হয়ে গেলেন। পরক্ষণেই তাঁর দেহ নিথর হয়ে গেল। মৃত্যুবরণ করলেন সুবক্তগীন।

সময়টি ছিল ৯৯৭ সালের আগস্ট মোতাবেক ৩৮৭ হিজরী সনের শা'বান। ৫৬ বছর বয়সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন সুলতান সুবক্তগীন। ছিন্নমূল যাযাবর পুত্র, দাসের হাটে বিক্রিত গোলাম ইসলামি ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করে, মূর্তিসংহারী বিশ্বখ্যাত সন্তান জীবন্ত কীর্তি রেখে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। ইতিহাস তাকে চিরদিন সত্যের পূজারী ও মিথ্যার বিরুদ্ধে অকুতোভয় বীর যোদ্ধা হিসেবে স্মরণ করবে।

মাহমূদ পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে পিতার শিয়রে হাজির হলেন। মৃতদেহ নিয়ে গেলেন গজনী। সেখানে কাফন ও জানাযা শেষে তাঁকে কবরে সমাহিত করলেন। মাত্র ২৩ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুতে তাকেই কাঁধে তুলে নিতে হলো রাজ্যপাটের গুরুদায়িত্ব।

## অভিন্ন ঔরসের দুই গর্ভজাত : দুই পথ

সুলতান সুবক্তগীনের মৃত্যুর পর মাহমূদ পিতার দাফন কাফন সেরে পুনরায় নিশাপুর চলে গেলেন। পিতার অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন মাহমূদ। তাছাড়া তাদের মোকাবেলায় চতুর্দিকের রণপ্রস্তুতি সম্পর্কেও জ্ঞাত ছিলেন তিনি। পিতার রেখে যাওয়া মিশন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পিতৃহারা শোককে তিনি শক্তিতে পরিণত করতে সৈন্যবাহিনীর প্রতি নজর দিলেন। গজনী গিয়ে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের রুটিন ওয়ার্ক করাটাকে তিনি গৌণ মনে করলেন। তার বিশ্বাস ছিল, প্রশাসনিক যন্ত্র ঠিকমতই কাজ করবে। কেননা তার পিতার জীবদ্দশায় প্রশাসনের কোথাও উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ঘটতে তিনি দেখেননি। তাই রাজধানীতে গিয়ে রাজকীয় আয়েশে বিভোর হওয়ার কথা তার চিন্তায় মোটেও স্থান পায়নি। তার মনে হয়নি, কারো পক্ষ থেকে প্রশাসনে কোন ঝামেলা কিংবা অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। গজনী যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিলেন মাহমূদ।

মাহমূদ ছোটবেলা থেকেই বিলাস বিমুখ। পরিশ্রমী, সত্যাশ্রয়ী। মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন মাহমূদ।

সমকালীন বিখ্যাত সূফী ও বুযুর্গ আবুল হাসান খারকানীর প্রিয়ভাজন মুরীদ ছিলেন মাহমূদ। আবু সাঈদ আব্দুল মালেক নামের একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ আলেম ব্যক্তির সাথেও তাঁর হৃদ্যতা ছিল। তিনি প্রায়ই কিরখানীর দরবারে উপস্থিত হতেন উপদেশ ও নসীহত নিতে। আর আবু সাঈদ প্রায়ই মাহমূদ-এর সাক্ষাতে আসতেন। বস্তুত আলেম, বুযুর্গ ও আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিদের সংশ্রব ও সান্নিধ্য তিনি পছন্দ করতেন। তার সময়ে অস্থিরতার মধ্যেও ইলম্ ও জ্ঞানের চর্চায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অবারিত। ইলম্ তথা কুরআন-হাদীস-ফেকাহ্ ও ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুন চর্চায় তাঁর সাহায্য ছিল মুক্তহস্ত। তাঁর দরবারে সর্বক্ষণ জ্ঞানী-গুণী ও আলেম-বুযুর্গ ব্যক্তিদের সরব পদচারণা ছিল। তাদের যথার্থ মর্যাদা ও সম্মান করা হতো। মাহমূদ কোন বুযুর্গ আলেমের সম্মানে সিংহাসন ছেড়ে রাস্তায় এসে তাকে স্বাগত জানাতেন।

পিতৃবিয়োগে শোকাতুর হওয়ার অবকাশ হয়নি মাহমূদের। রাজা জয়পাল ও জয়পালের প্রতিশোধ গ্রহণে মাহমূদ ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি জানেন, মূর্তিপূজারীরা শেষ লড়াইয়ে সকল শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাকে প্রতিরোধ ব্যবস্থায় মনোযোগী হতে হল। তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। তিনি ভাবতেও পারেননি যে, তোষামোদ ও মোসাহেব গোষ্ঠী সালতানাতের ভিত্ কুরেকুরে ঘুণ পোকার মতো খেয়ে ফেলছে। তারা ভেতর থেকে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে গজনীর সুলতানী, আর রাজকোষ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি যখন খবর পেলেন, গজনীর ক্ষমতায় এখন মাহমূদের বৈমাত্রেয় ভাই ইসমাঈল সমাসীন এবং সে নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেছে আর মোসাহেবদের জন্য সে রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, রাষ্ট্রের সম্পদ তারা দু'হাতে লুটে নিচ্ছে। তখন পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। এক গোয়েন্দা তাকে এ সংবাদ জানিয়েছিল।

ইসমাঈল ছিলেন সুলতান সুবক্তগীনের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। সুবক্তগীনের মৃত্যুশয্যায় পাশে ছিলেন দ্বিতীয় স্ত্রী। অন্তিম মুহূর্তে আপন পুত্রের পক্ষে সুলতানীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির উইলে সুলতানের দস্তখত করিয়ে নিয়েছিলেন দ্বিতীয় স্ত্রী। মাহমূদ পিতার দাফন কাফন সেরে নিশাপুর চলে গেলে সুলতানের দ্বিতীয় স্ত্রী উইলপত্র দেখিয়ে কতিপয় মোসাহেব, আমলা ও স্বার্থপর শ্রেণীর যোগসাজশে মাহমূদকে অবহিত না করেই ইসমাঈলকে সুলতানের আসনে বসিয়ে দেয়া হল। উইলপত্রে সুলতানের মোহরাংকিত প্রমাণ ও স্বাক্ষর দেখে অনেকেই অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ দ্বিতীয় পুত্রকে সুলতানের উত্তরাধিকার

হিসেবে বিনা বাধায় মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের অজ্ঞতার পর্দা উন্মোচিত হতে বেশি দিন লাগেনি। কিছুদিনের মধ্যেই স্বরূপে আবির্ভূত হল ইসমাঈল।

প্রমাণ হয়ে গেল, একই পিতার ঔরসজাত হলেও দু'মায়ের গর্ভজাত দু'ভাইয়ের মত ও পথ ভিন্ন। ভিন্ন তাদের দৃষ্টি, রুচি এবং লক্ষ্য।

একদিকে মাহমূদ পিতার পদাংক অনুসরণ করে হিন্দুস্তান আক্রমণ ও হিন্দু আগ্রাসন প্রতিরোধে সৈন্যবাহিনী তৈরিতে রাত-দিন ব্যস্ত আর অপরদিকে ইসমাঈল বলখে তখতে আসীন হয়ে অভিষেক অনুষ্ঠানের ধুমধামে ব্যস্ত, মোসাহেবদের নিয়ে ভোগবিলাসে নিমজ্জিত।

সুলতান আলী মাকাম! গজনী থেকে আগত এক প্রবীণ গোয়েন্দা অফিসারের সম্বোধন।

খবর কি জনাব! গজনী থেকে কি জরুরী কোন খবর নিয়ে এসেছেন? আগন্তুককে জিজ্ঞেস করলেন মাহমূদ।

জ্বী হ্যাঁ! আমি গজনী থেকে জরুরী সংবাদ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আমাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে আপনি রাত-দিন যুদ্ধ প্রস্তুতিতে লিপ্ত রয়েছেন। ওরা আমাদের দেশ কব্জা করতে চায়, আমাদের ধ্বংস করতে চায়, কিন্তু এখন আর হিন্দুস্তানের রাজাদের হামলা করার দরকার হবে না, আমরাই আমাদের ধ্বংসের সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ফেলেছি। আপনি আর আপনার মরহুম পিতা হিন্দুদের নাকানি চুবানি খাইয়েছেন। ওরা এখন প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে। জাতি এখন কঠিন সন্ধিক্ষণ অতিবাহিত করছে।

অথচ ইন্তেকালের আগে আপনার পিতা নিজেই আমাদের সালতানাত ধ্বংসের সব ব্যবস্থা করে গেছেন।

"আপনাকে মরহুম সুলতানের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে আমি সুলতান বলে সম্বোধন করেছি, কিন্তু আপনি জানেন না, আমাদের সুলতান আপনি নন আপনার বৈমাত্রেয় ভাই ইসমাঈল এখন গদীনসীন। আমি আপনাদের একজন নগণ্য খাদেম। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমার নাক গলানো হয়তো অনুচিত। কে ক্ষমতায় আসীন হলো, ছোট ভাই না বড় ভাই তা মনোনীত করার দায়িত্ব হয়তো আমার কর্তব্যের আওতা বহির্ভূত। কিন্তু দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, যে দরবারে আগে সেনাপতি ও জেনারেলগণ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুলতানের দিক-নির্দেশনা ও শলা-পরামর্শের জন্য আসতেন, বর্তমানে সেই নিবেদিতপ্রাণ সেনাপতি জেনারেলদের স্থান দখল করেছে মোসাহেব, চাটুকার ও স্বার্থান্বেষী আমলাশ্রেণী। আপনার পিতার সময় থেকে হক ও সত্যের পথের যাত্রী

এবং বিশ্বস্ত খাদেম হিসেবে বলছি, জানি না আপনার ছোট ভাইয়ের মূল পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টা কে, তবে এতটুকু বুঝতে পেরেছি যে, তার ঘাড়ে চেপে বসেছে স্তাবক, স্তুতিবাজ ও কুচক্রীমহল। ধান্ধাবাজ ও স্বার্থান্বেষী মহল এখন দরবারের গুরুত্বপূর্ণ পদে, কর্তব্যপরায়ণ ও যোগ্য লোকদের পরিবর্তে ধূর্ত ফাঁকিবাজরা পাচ্ছে পদোন্নতি, সৈনিকদের বেতন দ্বিগুণ করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর কমান্ডিং পদে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। আমাকে ট্রেজারীর এক বিশ্বস্ত কর্মকর্তা বলেছে, রাজকোষ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।"

অনাকাঙ্ক্ষিত সংবাদের ভয়াবহতা ও গুরুত্ব মাহমূদের মাথায় যেন আসমান ধসিয়ে দিল। তিনি প্রবীণ এই কর্মকর্তাকে দিক নির্দেশনা এবং আরো গভীরের বাস্তবচিত্র সংগ্রহ করে দ্রুত সংবাদ প্রেরণের নির্দেশ দিয়ে গজনী যেতে বললেন। নিজে দ্রুত হাজির হলেন মায়ের কাছে। ঘটনার ইতিবৃত্ত তাকে শোনালেন। মাহমূদ বললেন, "মা! গজনী ত্যাগ করাই আমার উচিত হয়নি। কিন্তু মসনদের লালসা আমার মনে ছিল না, আমি তো সুলতানীর গদি দখলের চেয়ে জাতির মর্যাদা ও নিরাপত্তা বিধান গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছি।"

"না মাহমূদ! গজনী যাওয়া তোমার ঠিক হবে না। তোমার ভাই তোমাকে হত্যাও করতে পারে। ক্ষমতার লালসা আর নেতৃত্বের মোহ মানুষকে অন্ধ, উন্মত্ত করে তোলে। একথাও ভেবে দেখো, সেও তোমার পিতার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। তুমি তাকে সুলতান হিসেবে থাকতে দাও, তবে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নিজের হাতে রাখ।"

"সে যদি সালতানাতের দায়িত্ব পালনের যোগ্য হতো তাহলে আমি এতো পেরেশান হতাম না। মা! আপনি কি জানেন না, সে কত দুর্বল চরিত্রের মানুষ! আমাকে আমার পীর ও মুর্শিদ বলেছেন, অযোগ্য ও অপরিণামদর্শী নেতৃত্বের পাপের সাজা গোটা জাতিকে ভুগতে হয়। আমি সুলতান হতে চাই না মা! কিন্তু সালতানাতকে আমার বাঁচাতে হবে। আমার দেশকে একটি ইসলামী অপরাজেয় দুর্গে পরিণত করে হিন্দুস্তানের ভূতখানাগুলোতে ইসলামের আলো পৌঁছাতে হবে।

আমার ভাই কল্যাণকামী ও বুদ্ধিমান হলে তার অভিষেক অনুষ্ঠানে অবশ্যই আমাকে দাওয়াত জানাত। সে আমাকে দাওয়াত দেওয়া তো দূরের কথা এ সংবাদ আমার জানার সব পথও বন্ধ করে দিয়েছে। তাতেই বোঝা যায়, তার উদ্দেশ্য সৎ নয়। আমাকে গজনী যেতেই হবে। আমার কাছে সংবাদ এসেছে, এ মুহূর্তে ইসমাঈল গজনী নয় বলখে রয়েছে।"

"তুমি তাকে এ মর্মে খবর পাঠাও– তুমি জানতে চাও, তুমি যে সংবাদ পেয়েছো তা সঠিক কি-না। অভিষেক অনুষ্ঠানে তোমাকে দাওয়াত না দেয়ার কারণ কি।" বললেন মাহমূদের মা। এরপর জবাবের অপেক্ষা কর।

"মাহমূদের দূত যখন ইসমাঈলকে তার পয়গাম পৌঁছাল তখন তিনি বলখে অবস্থানরত। ইসমাঈল পয়গাম লেখা কাগজটি না খুলেই তার এক অনুগতের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, পড়ে শোনাও, আমার ভাই কি লিখেছে!"

নির্দেশ পেয়ে ইসমাঈলের অমাত্য কাগজ খুলে উচ্চকণ্ঠে পড়তে লাগল, 'প্রিয় ভাই!' এতটুকু শুনে ইসমাঈল ক্ষোভে উরুতে থাপ্পড় মেরে বলল, 'অ্যা! সে আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করল! সুলতান বলেনি?'

না! জিল্লে এলাহী! বলল-অমাত্য।

এই হতশ্রী চেহারাধারীর এতো বড় স্পর্ধা! ধৃষ্টতা!

এই অপমানের জন্যে তার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত, সুলতান আলী মাকাম! বলল এক অনুগত অমাত্য।

"এমন গোস্তাখির জন্য তার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া অপরিহার্য।"

আল্লাহ ও রাসূলের পরেই সুলতানের মর্যাদা। জিল্লে এলাহীর সওয়ারী যে পথে যায় মানুষ সম্মানে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়, শত্রু আপনার নাম শুনে কাঁপতে থাকে।

"হু, সামনে পড়" বলল ইসমাঈল। মাহমূদ লিখেছে, "এ ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই যে, তুমি সালতানাতের মসনদে বসেছো। আল্লাহ তোমার এ মর্যাদাকে মোবারক করুন। কিন্তু সালতানাতের যে সব সমস্যা ও ঝুঁকি রয়েছে, দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার পর যে সব কর্তব্য অবশ্যম্ভাবী কাঁধে বর্তায়, হয়তো তুমি সে সম্পর্কে অবহিত নও। যদি অবগত হতে তবে মসনদকে ফুলশয্যা মনে করে আরাম-আয়েশে ডুবে যেতে না। সবার আগেই আমার কাছে আসতে, না হয় আমাকে ডেকে নিতে। তুমি যদি আমাকে যোগ্য মনে করতে, তাহলে একই পিতার সন্তান হিসেবে আমাকে অবশ্যই তোমার অভিষেক অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিতে। অথচ তুমি মসনদে বসে অভিষেক অনুষ্ঠান করেছো, সবই আমার অজ্ঞাতে। এতে করে আমার সন্দেহ হয়, হয়তো তোমার মধ্যে কোন দুরাকাঙ্ক্ষা রয়েছে অথবা তোমার দরবারের কুচক্রীরা তোমার মধ্যে দুরাকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছে। ওরাই তোমাকে বিভ্রান্ত করেছে। তুমি তো জানো যে, সালতানাতের অভ্যন্তরেও আমাদের দুশমনরা ঘাপটি মেরে রয়েছে। তোমার সামনেই তাদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছে। হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকরা আমাদের উপর দু'বার আক্রমণ করেছে, পুনরায় আক্রমণ চালানোর পায়তারা করছে। এই ক্রান্তিকালে আমাদের উচিত হবে না, মোসাহেব ও চাটুকারদের মুখে নিজেদের স্তুতি ও প্রশংসা শোনা। এ মুহূর্তে আমাদের ময়দানের তাঁবুতে থাকা কর্তব্য।

তুমি যদি মনে কর, সালতানাতের কাজকর্ম চালাতে সক্ষম হবে, তবে আমি যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখছি। যুদ্ধপ্রস্তুতির দিকে বেশি মনোযোগ দেয়া সময়ের দাবী। তোমাকে আমি এই শর্তে সুলতানী দায়িত্ব অর্পণ করতে পারি, তুমি ভালো-মন্দ, দোস্ত-দুশমন, সৎ-অসতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সচেষ্ট হবে। কিন্তু আমার ধারণা, তুমি এখনও সে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারনি। তুমি অযোগ্য লোকদের পদোন্নতি দিয়েছো শুধু চাটুকারিতার যোগ্যতা বিবেচনা করে। তুমি সেনাবাহিনীর বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দিয়ে রাজকোষের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করেছো। তুমি ভুলেই গেছো যে, আমাদের উপরেও এক খলীফা রয়েছে, তুমি শুধু একটি ইসলামী রাজ্যের সুলতান মাত্র।

আমার একটি পরামর্শ মেনে নাও। তাহলে আমি মরহুম আব্বাজানের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হবো। তুমি যদি নিজেকে সুলতানীর যোগ্য মনে কর, তবে বলখ ও খোরাসানের দায়িত্ব আমি তোমার হাতে ন্যস্ত করতে পারি কিন্তু তোমাকে কেন্দ্রের আসন ত্যাগ করতে হবে। আশা করি তুমি আমার কথার গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হবে।"

ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী ভাই

মাহমূদ।

হুকুমবরদার যখন এই কথাগুলো পড়ছিল, ইসমাঈল ক্ষোভে টলছিল। পড়া শেষ হলে সে থেমে দরবারী পরামর্শদাতাদের দিকে তাকাল।

জিল্লে এলাহী! আমরা আপনার এই অপমান সহ্য করতে পারি না। বলল উজীরে আজম।

আপনি যদি শাসকের যোগ্য না হন তবে আর কে? বলল অপর অমাত্য।

ইসমাঈলের সকল দরবারী মাহমূদের বিরুদ্ধে ইসমাঈলকে উত্তেজিত করার জন্য যা যা বলা দরকার তা-ই বলল।

অবশ্য এদের সবাইকে ইসমাঈল পদোন্নতি দিয়ে নিজের উপদেষ্টা, উজীর, নাজির ইত্যাদি পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। এদের সম্পর্কেই মাহমূদ ইসমাঈলকে সতর্ক করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু ইসমাঈল তার বড় ভাইয়ের পয়গামকে গোপনে একাকী পড়ার প্রয়োজনই বোধ করেনি। দরবারী উমেদাররা চিঠির ভাষা অনুধাবন করে ইসমাঈলকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে তীব্র তোষামোদের ঝড়ে উত্তেজিত করে তুললো।

আপনার ভাই সৈনিকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধিতে আপত্তি করেছে। অথচ আপনার এই মহানুভবতায় গোটা বাহিনী আপনার ভক্ত হয়ে গেছে। আপনার একটু ইঙ্গিতে সারা ফৌজ জীবন দিতে প্রস্তুত রয়েছে। বলল উজীরে আ'লা।

আপনার বড় ভাই পয়গামে লিখেছে, সালতানাতের ভেতরে দুশমন রয়েছে এবং হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকরাও আমাদের দুশমন। জিল্লে এলাহী! শপথ করে বলতে পারি, দেশের অভ্যন্তরে আমাদের কোন দুশমন নেই। আপনার আব্বা যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শত্রু বানিয়েছেন এতে আপনার বড় ভাইয়ের মুখ্য ভূমিকা ছিল। সে চায় ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে নিজের কব্জায় নিয়ে নিতে। হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকরা আমাদের শত্রু হবে কেন? আমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়ালে নিশ্চয়ই তারা আমাদের বন্ধুতে পরিণত হবে। কেন আমরা যুদ্ধ বিগ্রহের পথে অগ্রসর হব? এতে ক্ষতি ছাড়া লাভ কি?

উজীরের সমর্থনে আরো কিছু মুখের হু হ্যাঁ রব শোনা গেল। কিন্তু এক বৃদ্ধলোক আগাগোড়াই নীরব ছিলেন। তিনি নীরবে ইসমাঈল এবং অমাত্যবর্গের নির্লজ্জ চাটুকারিতা দেখছিলেন। উজীর যখন বলল, "যুদ্ধ বিগ্রহের পথে কেন অগ্রসর হব?" তখন বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন–

"যে নিজের ইজ্জত, মর্যাদা ও ঈমান বিক্রি করে দেয় তার আবার শত্রুর সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার দরকার কি?" গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বৃদ্ধ বললেন, 'ইসমাঈল বিন সুবক্তগীন! তোমার জন্ম হতে আমি দেখেছি, আমার চোখের সামনে তুমি ছোট থেকে বড় হয়েছ। তুমি এখনও ছোট এবং যেসব ঈমান বিক্রেতাদের খেলার ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছ, তারা তোমাকে পুতুল সুলতান বানিয়েছে। এরা দুনিয়ার মোহে অন্ধ হয়ে গেছে, তোমাকেও অন্ধ বানাতে চাচ্ছে। তুমি নিজে সালতানাতের সিংহাসন জবর দখলে নিয়েছ, তোমাকে কেউ সুলতানী সোপর্দ করেনি। জাতিও তোমাকে সুলতান হিসেবে বরণ করেনি। আল্লাহর পক্ষ থেকেও মনোনীত নও তুমি। তোমার মধ্যে যদি জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে থাকে, সেই বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে আস্তিনে মুখ রেখে বল, সত্যিকার অর্থে কি তুমি

সুলতানী মসনদের জন্যে যোগ্য? তোমার ভাই ঠিকই লিখেছেন, সে সব লোকদের জন্য তুমি প্রসন্ন যারা তোষামুদে ও চাটুকার, এরা তোমাকে ধ্বংসের শেষপ্রান্তে নিয়ে যাবে। এরা নিজের উদরপূর্তির জন্যে রাষ্ট্রীয় কোষাগার উজাড় করছে, এরা তোমাকে আজন্ম শত্রু হিন্দুস্তানের ভূতপূজারীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের পরামর্শ দিচ্ছে। এরা চায়, যুদ্ধ না করে আরামে জীবন কাটাতে।" কথাগুলো তীব্র আক্রোশে বলে হাঁফাতে লাগলেন বৃদ্ধ। এই বৃদ্ধ লোকটি ছিলেন কোষাগারের প্রধান কর্মকর্তা ফররুখ জ্যাদ ইবরাহীম।

"সুলতান আলী মাকাম! এই বৃদ্ধ অকর্মণ্য হয়ে গেছে। তার মাথা ঠিক নেই। যেখানেই যায় এমন অলক্ষুণে বকতে শুরু করে। তাকে টাকা-পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দেয়া উচিত।" বলল উজীর।

"একে নিয়ে যাও!" গর্জে বলল ইসমাঈল।

ইসমাঈলের হুকুমে কয়েক অমাত্য বৃদ্ধের উপর হামলে পড়ল। তারা বয়োজ্যেষ্ঠ এই প্রবীণকে টেনে হেঁচড়ে দরবার থেকে বের করে দিল। বৃদ্ধের কণ্ঠে শোনা গেল, "ক্ষমতার লিপ্সায় যেখানে ভাই ভাইয়ের দুশমন হয় রহমত সেখান থেকে বিদায় নেয়। মিথ্যার পরাজয় ও সত্যের জয় হবেই।"

মাহমূদ নিশাপুরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন ইসমাঈলের কাছে প্রেরিত পয়গামের উত্তরের জন্যে। দূতের আনা জবাবপত্র পড়ে তার অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। ইসমাঈলের জবাব ছিল সংক্ষিপ্ত। ইসমাঈল লিখেছিল, "আমাকে আব্বা সালতানাতের দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন। সে পিতৃদত্ত দায়িত্ব অন্য কাউকে অর্পণ করবে না। এবারের গোস্তাখি ক্ষমা করা হল। আগামীতে সুলতানের বিরুদ্ধে এমন অবমাননাকর কিছু করলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।"

ইতি

সুলতান গজনী

ইসমাঈল।

মাহমূদ তার মা ও মামা বু আজীজ ও ছোট ভাই নাসিরুদ্দীন ইউসুফকে ডেকে পরিস্থিতি অবহিত করে বললেন, আপনারা ইসমাঈলকে জানেন, সে আমার পয়গামের যে লিখিত জবাব দিয়েছে তা তার কথা নয়। এমন কথা বলার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি তার নেই। দূত আমাকে বলেছে, আমার চিঠি বলখ দরবারে প্রকাশ্যে পড়া হয়েছে এবং চরম অবমাননাকর হাসি-ঠাট্টা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হয়েছে আমার চিঠি নিয়ে। এরা ফররুখ জাদ ইবরাহীমের মতো বিশ্বস্ত ও প্রবীণ

কর্মকর্তাকে সত্য বলার অপরাধে টেনে হেঁচড়ে অপমান করে দরবার থেকে বের করে দিয়েছে। তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করেছে। অথচ আব্বাজানও তাকে সম্মান করতেন। এর অর্থ হলো, গজনীর কেন্দ্রীয় প্রশাসন থেকে ইনসাফের জায়গায় এখন জুলুম ঠাঁই করে নিয়েছে। আমি কোন দরবারী লোকের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেই না। আমার বড় উপদেষ্টা আপনারা। আমাদের সবার দেহে একই রক্ত প্রবাহিত। একই চেতনার ধারক-বাহক আমরা। আমার সন্দেহ হয়, ইসমাঈলের রক্তে কোন বদকারের মিশ্রণ রয়েছে।

"ও যদি আমার গর্ভজাত সন্তান হতো তাহলে ক্ষমতালিপ্সুদের পরামর্শ না শুনে আল্লাহর নির্দেশমতো চলতো। ইসমাঈল তোমার বাবার ঔরসজাত হলেও ওর মা ওর মধ্যে ক্ষমতার লোভ ও নেতৃত্বের খাহেশ পয়দা করেছে।" বললেন বেগম সুবক্তগীন। তিনি আরো বললেন, 'মাহমূদ! আমি তোমার দুধের দাবী সে দিন ত্যাগ করব যেদিন তুমি হিন্দুস্তানে অভিযান চালিয়ে জালেমদের ধ্বংস করবে। আগ্রাসী হিন্দুদের পরাজিত করে ইট-পাথরের মূর্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে ধুলায় মিশিয়ে দেবে।'

"মা! আমাদের অধিকাংশ সৈনিক এখন ইসমাঈলের অধীনে রয়েছে। সৈনিকদের বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দিয়ে সব সৈনিককে তার ভক্ত বানিয়ে নিয়েছে। সন্ধি-সমঝোতার পথও বন্ধ করে দিয়েছে। মা! আপনি কি আমাকে অনুমতি দেবেন, যে অল্প সংখ্যক সৈন্য আমার অধীনে রয়েছে তাদের নিয়ে আমি বলখ আক্রমণ করি?"

'এছাড়া আর কোন উপায় নেই'। বললেন মাহমূদের মামা বু আজীজ। তবে তোমার সৈন্য স্বল্পতা একটা বড় সমস্যা। হামলার আগে দেখে নেয়া দরকার গজনী ও বলখের সৈন্যরা কার প্রতি অনুগত ও সহনশীল!'

'আমার হাতে যাচাই বাছাই করা ও কালক্ষেপণের সময় নেই, মামা! হিন্দুস্তান থেকে যে সব খবর পাচ্ছি তা খুবই ভয়াবহ। হিন্দুস্তানের সৈন্যদের সাথে সে দেশের সাধারণ নাগরিকরা পর্যন্ত আমাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছে। তৈরি হচ্ছে গণবাহিনী। মন্দিরগুলোতে পণ্ডিত-পুরোহিতেরা গজনী দখলের জন্য নাগরিকদের সর্বক্ষণ উদ্বুদ্ধ করছে। কথা চালিয়ে আর দূতিয়ালি করে সময় নষ্ট করার অবকাশ আমার নেই।'

"আহ্, মামা! এ মুহূর্তে আমাদের হিন্দুস্তানের পথে থাকা উচিত ছিল। দুর্ভাগ্য আমাদের, এই জাতির, আমার আব্বার মতো বীর শাসককেও স্বজাতির গাদ্দারদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করতে করতে কবরের পথে যাত্রা করতে হলো।

সীমানার বাইরে নজর দেয়ার সুযোগ তাঁর হলো না। তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো না। আমাকেও পিতার মতই গৃহযুদ্ধের ফাঁদে পড়তে হলো!"

'বেটা! ক্ষমতালিপ্সুদের পরাজয় অনিবার্য। এতে কোন সন্দেহ নেই, ইসমাঈল সালতানাতের ভীষণ ক্ষতি করেছে। দেশ আমাদের রক্ষা করতেই হবে। অল্পসংখ্যক সৈনিক যা-ই আছে এদের ব্যবহার করা ছাড়া আমাদের বিকল্প পথ নেই'। বললেন মামা।

বলখে ইসমাঈলের কাছে খবর পৌঁছল মাহমূদ নিশাপুর থেকে সৈন্য নিয়ে গজনীর পথে রওয়ানা হয়েছে। নিশাপুরের তুলনায় বলখের অবস্থান গজনীর কাছে। ইসমাঈল তার সেনাপতি, কমান্ডার ও অমাত্যবর্গকে ডেকে বলল, 'আমার ভাই বিদ্রোহ করে গজনীর পথে সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হয়ে এগিয়ে আসছে। সে গজনী দখল করতে চাচ্ছে। আমি সৈনিকদের বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দেয়ায় সে খুব ক্ষুব্ধ। সে গজনীর সেনাবাহিনীকে গোলাম বানিয়ে রাখতে চাচ্ছে। সকল সৈনিকের একথা জানিয়ে দাও এবং সকলে যুদ্ধের জন্যে তৈরি হও।'

ইসমাঈলের অমাত্যবর্গ এই উদ্দেশ্যেই সেনাবাহিনীর বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দিয়েছিল যে, এভাবে সৈনিকদের কব্জা করে তাদেরকে সালাতানাতের শত্রু দমনের চেয়ে ইসমাঈলের ব্যক্তি-শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহী করতে পারবে। উজীর ও অন্যান্য স্বার্থান্বেষী মহল সাধারণ নাগরিক ও সৈনিকদের মধ্যে প্রচার করল, মাহমূদ গজনী কর্তৃত্ব নিজের অধীনে নিয়ে হিন্দুস্তান আক্রমণ করতে চাচ্ছে। হিন্দুস্তান আক্রমণ করে সে তথাকার সোনা-দানা, মণি-মুক্তা দিয়ে নিজের কোষাগার বোঝাই করতে চায়। মাহমূদের অধীনে কোন সৈনিকের জীবন আর নিরাপদ নয়।

ইসমাঈলের সৈন্যরা গজনীর কাছে মাহমূদের সেনা অবস্থানের কাছে পৌঁছে গেল। মাহমূদের বড় দুর্বলতা ছিল, তার সৈন্য সংখ্যা অল্প। তাছাড়া মাহমূদের ইচ্ছে ছিল, ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে লোকক্ষয় না করে সমঝোতার মাধ্যমে উদ্ভূত পরিস্থিতির মীমাংসা করা। মাহমূদ ইসমাঈলের কাছে এই প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠালেন, লড়াই ত্যাগ করে দু'জনের মধ্যে একটা আপোস-রফার জন্যে উভয়ের একান্ত মোলাকাত হওয়া দরকার। গৃহযুদ্ধের দ্বারা শত্রুরাই বেশি উপকৃত হবে। আল্লাহ না করুন, আমাদের যুদ্ধকালে যদি দুশমনরা রাজধানী আক্রমণ করে বসে তবে তো দেশটাই শত্রুর দখলে চলে যাবে। এমতাবস্থায় রাজত্ব নিয়ে ভ্রাতৃঘাতী লড়াই অর্থহীন। আমাদের উচিত, পারস্পরিক এ ভ্রাতৃঘাতী লড়াই এড়িয়ে যাওয়া।

"আমি কেন তার কাছে যাব, সে একজন বিদ্রোহী। ওকে গ্রেফতার করে আমি বিদ্রোহের অপরাধে এমন মর্মন্তুদ শাস্তি দেবো, ভবিষ্যতে আমার দেশে কেউ বিদ্রোহের দুঃসাহস দেখাবে না।" দূতের পয়গামের জবাবে বলল ইসমাঈল।

'তিনি উভয়ের কল্যাণার্থে-ই এই প্রস্তাব করেছেন এবং আমাকে এই অধিকার দেয়া হয়েছে যে, আপনাদের সাক্ষাতের জন্যে আমি আপনাকে উৎসাহিত করব।' আমাকে বার্তাবাহক হিসেবে নয় দূত করে পাঠানো হয়েছে। বলল মাহমূদের দূত। "আপনি তাকিয়ে দেখুন! গৃহযুদ্ধের দ্বারা আমাদের ক্ষতি ছাড়া কি উপকার হবে? গৃহযুদ্ধ এ দেশের রেওয়াজে পরিণত হতে যাচ্ছে। আজ এক বাপের দু'ছেলে ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ের মুখোমুখি। এই উন্মত্ত খুন পিপাসা আমাদের ধ্বংস ত্বরান্বিত করছে বৈ কি! আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, গভীরভাবে মাহমূদের প্রস্তাব চিন্তা করে দেখুন। তার এই প্রস্তাবের মধ্যে কোন কুটিলতা নেই।" বলল মাহমূদের দূত।

"হু", আমি তার সমঝোতা-প্রস্তাবের রহস্য ভাল করে জানি। তার সৈন্য সংখ্যা সীমিত এজন্য সে সন্ধি প্রস্তাব পাঠিয়েছে, নয়তো সে সন্ধি প্রস্তাব কেন পাঠাবে? সে তো নিশ্চিত পরাজয় ও মৃত্যুর বিভীষিকা দিব্যি দেখতে পাচ্ছে। আমি তার সৈন্য পিষে ফেলব আর তাকে বন্দী করে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করবো। যাও, তাকে গিয়ে বল, আমার আর তার সৈনিকদের মোলাকাত হবে ময়দানে, আমার সাথে তার মোলাকাত নয়।"

দূত তার ঘোড়ায় এক লাফে চড়ে ইসমাঈলের উদ্দেশে বলল, ক্ষমতার লালসা আর মসনদের আকাঙ্ক্ষা বহু ক্ষমতাবান রাজা-মহারাজাকেও পরাজয়ের তকমা পরিয়েছে। মনে রাখা উচিত, অহঙ্কারীর পতন অনিবার্য— একথা বলেই সে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল।

পিতার মতো ময়দানে দু'রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করে মোনাজাত করলেন মাহমূদ। বললেন, "আয় প্রভু! আমি যদি ভ্রান্তপথে থাকি তবে এখনই আমাকে ধসিয়ে দিন, আর যদি আমি সঠিক পথে থাকি, আপনার কাছে যদি আমার আকাঙ্ক্ষা গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, আমি যদি দুনিয়ার যশ-খ্যাতি ও ক্ষমতার লোভে এখানে না এসে থাকি, হিন্দুস্তানের ভূতখানাগুলোতে ইসলামের আলো পৌছানোর আকাঙ্ক্ষা যদি আমার সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে পথের সকল বাধা দূর করার তৌফিক দিন। আমার ভাই

আমার পথে বড় বাধা, এ বাধা আমাকে অপসারণ করার শক্তি দিন। যাতে আমি অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারি।”

“আয় আল্লাহ! মুহম্মদ বিন কাসিম ভারতের মাটিতে ইসলামের যে চেরাগ জ্বালিয়েছিলেন তা আজ নিভে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আমি নিজের রক্ত দিয়ে বিন কাসিমের জ্বালানো প্রদীপ প্রত্যুজ্জ্বল করতে চাচ্ছি। আপনি আমাকে আপনার পথে কবুল করুন, আমাকে কামিয়াব করুন!”

মাহমূদ নিজের সিপাহসালার, কমান্ডার ও কর্মকর্তাদের ডেকে বললেন, “দৃশ্যত দু'ভাই আজ পরস্পরের শত্রু। একে অন্যের রক্তপিপাসু। বিষয়টা মূলত এমন নয়। প্রত্যেক সিপাহীর হৃদয়ে একথা গেঁথে নাও, তোমরা কোন ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হচ্ছো না, ইসলাম ও জাতির বেঈমান-বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছো। প্রতিপক্ষে তোমাদের ভাই-চাচা, মামা-ভাতিজা অনেকেই থাকতে পারে, তোমরা ওদের আক্রমণের আগে বলবে, বদর যুদ্ধে আপন ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে চাচা ভাতিজার বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করেছে। সেই লড়াইয়ে সত্যের পক্ষে ছিলেন আমাদের নবীজী (সা.)। আর মিথ্যার পক্ষে ছিল আবু জাহেল বাহিনী। সেদিন মাত্র তিনশ' তেরো জন মুজাহিদ এক হাজার কাফির সেনাকে পরাজিত করেছিল। আজ তোমরা সত্যের পক্ষে আর ওরা মিথ্যার পতাকাতলে। আমরা ইসলামের ঝাণ্ডা কুফরীস্থান পর্যন্ত উড়াতে চাচ্ছি। ওরা চাচ্ছে ইসলামের অগ্রযাত্রা রুদ্ধ করে বিজয়ের ঝাণ্ডা ভূলুণ্ঠিত করতে। ইসলামের জন্যে, সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্যে রাসূল (সা.) আত্মীয়তা পরিহার করে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম বীরদর্পে তাঁর কমান্ডে সামনে এগিয়ে গেছেন। ফলে আজ আমরা আল্লাহর নাম নিতে পারছি, নিজেদের মুসলিম হিসেবে ভাগ্যবান ভাবতে পারছি। সংখ্যাধিক্য ও আসবাবের ঘাটতি সত্ত্বেও সত্যাশ্রয়ীরা চিরদিন বিজয়ী হয়েছে, আজও আমরাই জয়ী হব-ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। তিনি আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা পূর্ণ করবেন অবশ্যই।”

মাহমূদ কমান্ডারদের বললেন, ‘তোমরা অধীনস্ত প্রত্যেক সৈনিকের মধ্যে এ ঈমানী শক্তি উজ্জীবিত কর। সাহসে ভরে দাও তাদের হৃদয়-বুক।’

মাহমূদ সেনাপতিকে ও কমান্ডারদের যুদ্ধ কৌশল বলে দিয়ে নিবৃত্ত হলেন। সেনা স্বল্পতা তাকে পেরেশান করছিল। এতো অল্পসংখ্যক সৈনিক নিয়ে সম্মুখ

যুদ্ধে পেরে ওঠা মুশকিল। তাই তিনি নতুন রণকৌশলের উপর মনোযোগী হলেন।

তিনি একটি উঁচু ভূমিতে দাঁড়িয়ে ইসমাঈলের সেনাবাহিনীর দিকে তাকালেন। বুকের মধ্যে অনুভূত হলো হাতুড়ির-আঘাত। ইসমাঈলের বিশাল বাহিনী রণসাজে সজ্জিত। প্রায় শ' তিনেক হবে তার জঙ্গী হাতি। হাতির শূড়গুলো লোহার খোলে ঢাকা। এই হাতিগুলো রাজা জয়পালকে পরাজিত করে তার আব্বা লাভ করেছিলেন। সবগুলো ছিল গজনীতে।

রাজা জয়পাল যখন ইসমাঈলের চেয়েও বিশাল বাহিনী নিয়ে সুবক্তগীনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তখন তার বাহিনীতে এমন জঙ্গী হাতির সংখ্যা হাজারেরও বেশি ছিল। কিন্তু মাহমূদ সেদিন সেই বিশাল বাহিনী কিংবা হাতিবহর দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। কারণ, সেই বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার নৈতিক শক্তি ছিল অত্যুচ্চ, মনোবল ছিল আকাশচুম্বি, আল্লাহর বিশেষ রহমতের আশা ছিল। কিন্তু আজ নিজ ভাই ও জাতির বিরুদ্ধে তাকে লড়তে হচ্ছে। দুঃখে ও যন্ত্রণায় কেঁপে উঠল মাহমূদের হৃদয়। ইসমাঈলের সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠল মাহমূদের মন। এরাতো তার শত্রু নয়। তাঁরই পিতার সযত্নে গড়া সৈনিক দল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যাদের কাছে মাহমূদ ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় ও ভবিষ্যতের কাণ্ডারী- ভাইয়ের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত ও ক্ষমতার লোভ আর কুচক্রীদের প্ররোচনায় তারাই আজ মাহমূদের বিরুদ্ধে উদ্যত খড়গ হাতে দণ্ডায়মান।

মাহমূদ আশঙ্কা করছিলেন, এরা তো তার মরহুম পিতার যুদ্ধ চাল সম্পর্কে অবগত। এরা যুদ্ধের ময়দানে মরতে ও মারতে অভ্যস্ত। এরা মাহমূদের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে জ্ঞাত। আজ এরাই তার প্রতিপক্ষ। শুধুমাত্র বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দেয়ার কারণে এরা আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে যুদ্ধ করতে। অবশ্য মাহমূদ মনে মনে এই ভেবে আশ্বস্ত হলেন, তিনি দেখলেন, আজ এদের মধ্যে পূর্বের জাতিত্ববোধ ও কওমী মর্যাদার উত্তাপ নেই, এরা এখন টাকায় বিক্রিত। আগের মনোবল এদের অন্তর থেকে দূরীভূত। কিন্তু মাহমূদের সৈন্য-স্বল্পতা এতই প্রকট যে, তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা ও আশা নিজ সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তেই উবে গেল। হতাশা তাঁকে গ্রাস করতে চাইল। তবুও তিনি দমলেন না।

সৈন্যদেরকে চারভাগে ভাগ করলেন মাহমূদ। বেশি সংখ্যক নিজের কমান্ডে রিজার্ভ রাখলেন। দু' অংশকে দু' প্রান্তে ছড়িয়ে দিলেন এবং চতুর্থ অংশকে শত্রু সেনাদের মুখোমুখি দাঁড় করালেন।

তিনি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, গেরিলা আক্রমণের কৌশল-ই এ যুদ্ধে তাকে প্রয়োগ করতে হবে। মুখোমুখি যুদ্ধ করার জন্যে ন্যূনতম সেনাবল তাঁর নেই। তিনি কমান্ডারদের বলে দিলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে তোমরা দুশমনকে তোমাদের দিকে অগ্রসর হতে আকৃষ্ট করে ছড়িয়ে পড়বে, যাতে ইসমাঈলের সৈন্যরা ব্যূহ ভেঙ্গে সামনে এগিয়ে আসে।

জায়গাটিতে ছোট ছোট টিলা ছিল অনেক। মাহমূদ এগুলোর সুবিধা নিতে চাচ্ছিলেন। এজন্যই তিনি কমান্ডারদের বললেন, তোমরা প্রতিপক্ষের সৈন্যদের বিক্ষিপ্ত করে টিলাগুলোর আড়ালে চলে যাবে, যাতে উভয় পক্ষের মধ্যে টিলা আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। যেন ওরা টিলার প্রান্ত ঘুরে তোমাদের দিকে ধাবিত হয়।

রাতের গুপ্ত হামলার সুযোগ এক্ষেত্রে নেই। এ কাজে উভয় বাহিনী সিদ্ধহস্ত। রাতের আক্রমণ প্রতি আক্রমণের কৌশল তাদের সবার জানা আছে। এজন্য উভয় বাহিনী তাঁবুর ভিতরে-বাইরে বহু দূর পর্যন্ত বড় বড় মশাল জ্বালিয়ে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা করেছিল। ফলে কারো পক্ষে রাত্রিকালীন আক্রমণের খুব বেশি সুযোগ নেই।

মাহমূদ তাঁবু থেকে বের হবেন, ঠিক এ সময় তাঁর মা সামনে এসে দাঁড়ালেন। মা'কে দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন মাহমূদ। পায়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বললেন, "মা! আব্বুর আত্মা আমাকে অভিশাপ দেবে না তো? আব্বুর ইন্তেকালের পর আমি জীবনের প্রথম যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছি। আব্বুকে ছাড়া এটাই আমার প্রথম যুদ্ধ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আমার প্রথম এই যুদ্ধটি আমি ভাইয়ের বিরুদ্ধে করতে বাধ্য। মা! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি কখনও এ যুদ্ধে জড়াতে চাইনি। কারণ, হয়ত ভবিষ্যত প্রজন্ম আমাকে বলবে, সুবক্তগীনপুত্র মাহমূদ ক্ষমতার জন্যে ভাইয়ের মোকাবেলায় লড়াই করে নিহত হয়েছিল।"

"বেটা! এখন এসব বাজে চিন্তা করো না। রক্ত দূষিত হয়ে গেলে দৃষ্টিও দূষিত হয়ে যায়। তোমার ভাইয়ের রক্তে ক্ষমতা ও ভোগবাদের নেশা। এখন এসব নিয়ে ভেবো না। মাথা থেকে এসব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দাও। যে সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি তা-ই কর। গত রাত আমি আল্লাহর দরবারে সেজদায় কাটিয়েছি। যাও বেটা! আমি তোমাকে দুআ দিচ্ছি। মায়ের দু'আয় তুমিই বিজয়ী হবে–ইনশাআল্লাহ।"

ইসমাঈল বিপুল সৈন্য সম্ভারে গর্বিত এবং বেপরোয়া ছিল। সে আগ বেড়ে আক্রমণের হুকুম দিল। মাহমূদের নির্দেশ মতো তীরন্দাজরা তীর বৃষ্টি বর্ষণ

করতে লাগল হাতির দিকে! প্রতিপক্ষের বেশি দম্ভ ছিল হাতি নিয়ে। হাতি যখন মাহমূদ বাহিনীর নিক্ষিপ্ত তীর ও বর্শার আঘাতে আহত হতে লাগলো তখন যুদ্ধের ধারা বদলে গেল। ইসমাঈলের সৈন্যদের আহত ও ভীত হাতির ভয়াবহ পদদলনের বাস্তব ধারণা ছিল না। আহত হাতি চিৎকার দিয়ে নিজ বাহিনীর জন্যে বিপদ ডেকে আনল। আহত হাতির দিগ্বিদিক ছোটাছুটিতে অশ্ববাহিনীর ঘোড়াগুলোও বিক্ষিপ্ত ছোটাছুটি শুরু করল।

মাহমূদ উঁচু টিলা থেকে দেখছিলেন, তাঁর নির্দেশনামতো সৈনিকেরা অধিকাংশ হাতি আহত করে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। তবুও ইসমাঈল বাহিনীর অগ্রযাত্রা ঠেকানো সম্ভব হচ্ছিল না। তারা হাতির উপর নির্ভর না করে অগ্রাভিযান আরো তীব্র করল। মাহমূদের নির্দেশমতো তার সৈনিকেরাও এক জায়গায় স্থির না থেকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। তবুও শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তাদের অবস্থান ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসছিল। মাহমূদ দেখছিলেন, তার সৈনিকদের পশ্চাদপসারণ ছাড়া উপায় নেই। দৃশ্যত মাহমূদের পক্ষে ময়দানে টিকে থাকা আর সম্ভব নয়।

ইত্যবসরে ইসমাঈল মাহমূদকে জীবিত গ্রেফতার করতে তার বাহিনীকে নির্দেশ দেয়। এ ঘোষণায় উভয় পক্ষে 'নারায়ে তাকবীর' ধ্বনি উচ্চকিত হয়। একই পতাকা বহন করছিল উভয় দল। মাহমূদ বাহিনীর তাকবীর ধ্বনি ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছিল। ঘোরতর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল উভয় পক্ষ। দ্রুত লাশের স্তূপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

মাহমূদকে জীবিত কয়েদ করার জন্যে কমান্ডারদের নির্দেশ দিল ইসমাঈল। উভয় বাহিনী মরণপণ আক্রমণ প্রতিআক্রমণ চালাল। নারায়ে তাকবীরের আওয়াজ আর অস্ত্রের ঝনঝনানিতে ময়দান কেঁপে উঠছে। একই পতাকা উভয় বাহিনীর হাতে। ঝাণ্ডাবরদারদের পোশাক আর অস্ত্র ও সাজসজ্জার ব্যবধান ছাড়া চেনার উপায় ছিল না। প্রতিপক্ষকে মাহমূদ-বাহিনীর বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নকরণের চালও কোনই কাজ দিল না। মাহমূদের মুষ্টিমেয় সৈন্য একই জায়গায় জমা হয়ে প্রতিরোধ করছিল।

ইসমাঈলের সৈন্যরা তখন লড়ছিল তাদের আভিজাত্য বজায় রাখতে এবং বিজয়ের জন্যে। আর মাহমূদ-বাহিনী লড়ছে নিশ্চিত মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে প্রাণ বাঁচাতে। লাশের পর লাশ পড়ে ময়দান ভরে উঠেছে। যুদ্ধের তীব্রতা তখন তুঙ্গে। মাহমূদ দেখছিলেন, তার বাহিনী দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

নিজের সৈন্যদের বাঁচানোর তাকিদে মাহমূদ ইসমাঈল বাহিনীর উভয় বাহুতে আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দিলেন। বললেন, আক্রমণ করেই তারা যেন আরো ডানে এবং বামে সরে আসে। এ চাল কিছুটা ফলপ্রসূ হলো। ইসমাঈল বাহিনী ডান ও বামদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। মাহমূদের কথামতো তার দু' বাহুর সৈন্যরা হঠাৎ আক্রমণ করে আবার ডানে-বামে সরে যেতো। এবার মাহমূদ তাঁর মুখোমুখি লড়াইরত সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন তোমরা পিছনের দিকে সরতে থাক। পশ্চাদপসারণ করতে গিয়ে মাহমূদ বাহিনীর বহু সদস্য হতাহত হলো। কিন্তু তারপরও প্রায় বেষ্টনির মধ্যে পড়ে যাওয়া সৈন্যদের অধিকাংশই পিছনে চলে আসতে সক্ষম হল।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। দিনের শেষ আলো ছড়িয়ে আকাশ রাঙিয়ে বিদায় নিচ্ছে আজকের সূর্য। মাহমূদ দেখতে পেলেন, প্রতিপক্ষের সৈন্যবাহিনীর প্রায় মাঝখানে হাতির উপরে রাজকীয় আসনে উপবেশন করে ইসমাঈল কমান্ড দিচ্ছে। মাহমূদ আরো দেখলেন, ইসমাঈলের সৈন্যরা বিক্ষিপ্তভাবে সারা ময়দানে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি প্রথমে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি সন্ধ্যার আগেই যুদ্ধের পরিণতি টানার সংকল্প করলেন। তীরন্দাজ সৈন্যদেরকে টিলাগুলোর শীর্ষে অবস্থান নিতে এবং তার নিরাপত্তারক্ষীদের আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন। সমরবিশারদদের দৃষ্টিতে মাহমূদের এ সিদ্ধান্ত চরম আত্মঘাতী ছিল।

নিজের জীবন ও অবশিষ্ট সৈন্যদের প্রাণঘাতী ফয়সালা নিলেন মাহমূদ। মাহমূদের রক্ষীদল ছিল অক্লান্ত। এখনো তাদের মোকাবেলায় নামানো হয়নি। এবার তারা দুশমনের মধ্যভাগে বিজলীর তীব্রতা নিয়ে আক্রমণ শানাল। মাহমূদ নিজেই তাদের কমান্ড দিচ্ছিলেন। তাঁর প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল বেশি এবং তারা তখনও ছিল রিজার্ভ। তিনি তীরন্দাজদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা টিলার উপরে অবস্থান নাও এবং তোমাদের আয়ত্তের ভিতরে শত্রু পৌঁছামাত্রই ওদের নিশানা বানাও। লক্ষণীয় বিষয় হলো, মাহমূদের রক্ষী বাহিনীর মোকাবেলায় ইসমাঈলের কোন রিজার্ভ ফোর্স ছিল না। এদের সব সৈন্য সারা দিনের রণক্লান্ত। মাহমূদের তাজাদম সৈন্যরা তাঁর নির্দেশমতো "বৃতপূজারীদের মিত্র সৈন্যদের পিষে ফেলো" ধ্বনি তুলে সিংহের গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মাহমূদের এই হামলা ছিল ইসমাঈল বাহিনীর ধারণাতীত। তাছাড়া 'বৃতপূজারী মিত্রদের পিষে ফেল' শ্লোগানে ইসমাঈল বাহিনীর মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। আত্মদুর্বলতা তাদের গ্রাস করে নিল। বাহিনীর সেনারা উচ্চধ্বনিতে আরো

বলছিল, "আল্লাহর সৈনিকেরা ভাতার জন্যে যুদ্ধ করে না, ইসলামের জন্যে জিহাদ করে তাঁরা"। ইসমাঈলের কমান্ডাররা মধ্যভাগকে বাঁচানোর জন্যে বাহুর সাহায্য চাইল। কিন্তু মাহমূদের সৈন্যরা 'হামলা কর এবং পালিয়ে যাও' কৌশল অবলম্বন করে প্রতিপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। যার ফলে ইসমাঈল বাহিনীর মধ্যভাগের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা তার বাহুর সৈন্যদের জন্যে সম্ভব হলো না।

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, মাহমূদ গযনবী সে দিন এক প্রচণ্ড রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিলেন। তিনি যখন প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে হামলা করেছিলেন, তখন শত্রু-সৈন্যদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিলো। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শত্রু-বাহিনীর সৈন্যরা মাহমূদের মোকাবেলা থেকে জীবন বাঁচানোর জন্যে পিছু হটতে তৎপর হয়ে উঠলো। ইসমাঈলের রক্ষণভাগের ওপর আক্রমণে মাহমূদ এতই বেপরোয়া ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে, বিশাল বাহিনীটাকে তিনি একাই যেন কচুকাটা করে ছাড়বেন। তিনি নিজেই নিজের পরিণতি ভুলে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেন। তাঁর জীবনপণ লড়াই দেখে তাঁর সৈন্যরাও জীবনের শেষ যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় আখেরী হামলা চালায়। মুহূর্তের মধ্যে ময়দানের চিত্র পাল্টে যায়।

তখনও পশ্চিমাকাশে ক্ষীণ সূর্যরশ্মি দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার নেমে আসতে এখনো সামান্য দেরী আছে। ময়দানে ইসমাঈল বাহিনীর দাপট কমে গেছে। ইসমাঈল-বাহিনীর রক্ষণভাগের প্রতিরক্ষা ব্যূহ তছনছ হয়ে গেছে। ইসমাঈল-বাহিনীর সৈন্যদের শৃঙ্খলা ও কমান্ড এলোমেলো হয়ে গেছে। অধিকাংশ সিপাহী কমান্ডার নিরাপদ আশ্রয়ের প্রত্যাশায় টিলার দিকে দৌড়ে পালাতে শুরু করে। টিলার উপরে পূর্ব থেকে অবস্থান নেয়া মাহমূদের তীরন্দাজ বাহিনীর দুশমনদের জন্যে আশ্রয়ের পরিবর্তে মৃত্যুদূত হয়ে দেখা দিল। শত্রুবাহিনী টিলার দিকে অগ্রসর হতেই মাহমূদের তীরন্দাজরা তীর বৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করল। অবস্থা বেগতিক দেখে ইসমাঈল বাহিনীর রক্ষণভাগের এক কমান্ডার হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পণ করে।

মাহমূদ কয়েকজন অশ্বারোহীকে নির্দেশ দিলেন, "তোমরা গোটা ময়দানে প্রচার করে দাও, ইসমাঈল-বাহিনীর আর কোন সৈনিককে যেন হত্যা না করা হয়। ওরা যদি যুদ্ধ করে কিংবা সারেন্ডার করতে অস্বীকার করে তবে-ই তাদের কয়েদ কর। আর যারা বশ্যতা স্বীকার করবে তাদের অস্ত্র নিয়ে ছেড়ে দাও।" মাহমূদের এই ঘোষণা শুনে ইসমাঈল-বাহিনীর সাধারণ সৈনিকদের যুদ্ধের শেষ

শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল। শত্রুবাহিনীর যে কমান্ডার প্রথমে হাতিয়ার ফেলে দিয়েছিল তার কাছে মাহমূদ জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল এখন কোথায়? কমান্ডার বলল, সে নিহতও হয়নি আহতও হয়নি।

আপনার আক্রমণের তীব্রতায় ভীত হয়ে সৈন্যদের কিছু না বলেই হয়ত পালিয়ে গেছে। কমান্ডার ইসমাঈলের পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য দিকও বলে দিল। মাহমূদ কয়েকজন অশ্বারোহীকে নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা ইসমাঈলকে খুঁজে বের কর এবং নৈতিক অপরাধীর মতো ওকে নজরবন্দী করে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

রাতের ঘন আঁধার ঘনিয়ে আসার আগে ভ্রাতৃঘাতী এই গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। ইসমাঈলের বাহিনী বন্দী অবস্থায় সারি বেঁধে বসে থাকল আর মাহমূদের সৈন্যরা তাদের পাহারা দিচ্ছিল। রাত বাড়ার সাথে সাথে আহত সৈন্যদের আহাজারি, চিৎকার আর রোদন বাড়তে থাকল। ক্ষত-বিক্ষত ঘোড়া, জখমী হাতি আর হাত-পা কাটা সৈন্যদের আর্ত চিৎকারে রাতের ময়দান বিভীষিকাময় হয়ে উঠল। মাহমূদ নির্দেশ দিলেন, উভয় দলের আহত সৈন্যদের তাঁবুতে এনে চিকিৎসা করো। শত্রু-মিত্র বিচার না করে সবার ক্ষতস্থানে যথাসম্ভব পট্টির ব্যবস্থা করো।

মশাল জ্বালিয়ে দেয়া হল চতুর্দিকে। সেবক দল ময়দান থেকে খুঁজে আহতদের চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল। মাহমূদ ময়দান জুড়ে লাশ আর আহতদের মধ্যে টহল দিচ্ছিলেন। পরিচিত কমান্ডার ও সিপাহীদের লাশ দেখে অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। এমন সময় দূর থেকে একটি মেয়েলী কণ্ঠে ভেসে এলো— মাহমূদ! মাহমূদ!

পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ শুনে মাহমূদ সে দিকে দৌড়ে গেলেন। তার পা জড়িয়ে ধরলেন। তাঁকে চুমু দিলেন। মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে আবেগে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ কারো মুখ থেকে কোন কথা বের হলো না।

যুদ্ধের ভয়াবহতা ও আশাতীত সাফল্যে মা ও ছেলে উভয়ে ছিলেন আবেগাপ্লুত, আত্মহারা কিন্তু বেদনাক্লান্ত। অনেকক্ষণ পর মা'কে তাঁবুতে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করে মাহমূদ ময়দানে-ই টহল দিতে লাগলেন। প্রতিটি শবদেহের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াতেন, মশালের আলোতে গভীরভাবে তাকে দেখে নিতেন। এভাবে প্রতিটি শবদেহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি যেন পরখ করছিলেন মাহমূদ। হঠাৎ তার মায়ের মতোই এক মেয়েলী কণ্ঠের ডাক তার কানে এলো-মাহমূদ! তিনি দাঁড়ালেন। দুই মশালবাহীর মধ্যদিয়ে শাহী পোশাক

পরিহিতা এক মহিলা আরোহীকে তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে দেখলেন। চেহারা, পরিচ্ছদ আর ঠাঁটবাটে রাজকীয় ভাবসাব। মহিলা আর কেউ নয়, মাহমূদের বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী, ইসমাঈলের মা। মাহমূদ তাকে দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ইসমাঈলের মা তার সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়।

আপনি কি এসব দেখতে এসেছেন— আপনার ছেলে আব্বার রেখে যাওয়া সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে কতোজনকে হত্যা করেছে? আপনি কি কানে শোনেন? ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত সৈন্যদের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছেন? কেন এসেছেন আপনি? কি চাই আপনার? ক্ষুব্ধকণ্ঠে ইমাঈলের মায়ের প্রতি প্রশ্ন করলেন মাহমূদ।

'আমি কোন কিছু দেখতে আসিনি, কোন কিছু শোনার ইচ্ছেও আমার নেই। আমি এসেছি আমার পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাইতে।'

'কোথায় আপনার ছেলে? আমি তো ওকে এখনও দেখিইনি।"

'সে তার তাঁবুতে আছে, তার পালিয়ে যাওয়ার সকল পথ তোমার সিপাহীরা বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যেরা তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে।"

"ওরাও কি ওকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে, যাঁদেরকে যোগ্যতা বিচার না করেই শুধু তোষামোদির কারণে আপনার ছেলে কমান্ডার থেকে সালার বানিয়ে দিয়েছিল? ওই কাফিরেরাও ওকে একা ফেলে চলে গেছে যাদেরকে সে উজীর আমীরের পদে আসীন করেছিল'? 'জিল্লে এলাহী', আর 'সুলতানে আলী' লকব গ্রহণ করা যত সহজ জিল্লে এলাহী আর সুলতানে আলীর মর্যাদা রক্ষা করা অতো সহজ নয়।" বললেন মাহমূদ।

ইসমাঈলের মা বলল, 'মাহমূদ! তুমি যা ইচ্ছে তা বলতে পার, কিন্তু আমাকে বল, আমি আমার একমাত্র ছেলের জীবন ভিক্ষা চাইতে এসেছি, আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করেছ কি?'

"আপনি যদি আজ আমার স্থানে হতেন তাহলে যার কারণে এতোগুলো প্রাণ বধ হলো তার বিচার আপনি কী করতেন? আপনি পারতেন, এতগুলো নিরপরাধ মানুষের খুনীকে ক্ষমা করতে?" মাহমূদ বললেন, 'আপনার মর্যাদা আর অবস্থানের কথা একটু ভেবে দেখুন! নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, যাদের তাজা রক্তে আপনার পা ডুবে গেছে, যাদের তপ্ত খুনের ছিটায় আপনার কাপড় রক্তিম হয়ে গেছে, তারা কারা? আপনি এক মর্যাদাবান ন্যায়পরায়ণ সুলতানের বিধবা। রাণী হোক কিংবা সাধারণ মহিলা হোক বৈধব্য সবার-ই জন্যে সমান

কষ্টদায়ক। সুলতানের বিবি হোক বা বিধবা হোক কওমের প্রতিটি নাগরিক তার কাছে নিজ সন্তানের মত। যেসব সিপাহীর লাশ মাড়িয়ে আপনি নিজ সন্তানের জীবন ভিক্ষা চাইতে আমার কাছে এসেছেন, যার কারণে এই রক্ত ঝরল, তার কী শাস্তি হতে পারে বলুন? এমন অপরাধীর পক্ষে কোন্ মুখে আপনি ক্ষমা চাইতে এসেছেন বলুন? এমন জিঘাংসু, জঘন্য কোন মানুষের বেঁচে থাকার কি অধিকার আছে? আপনার ছেলে এখন শত শত মানুষ হত্যার অপরাধী, সে খুনী।'

'মাহমূদ! দুর্ভাগ্য আমি তোমার মতো যোগ্য সন্তানের মা হতে পারিনি, কিন্তু আমি তোমার মরহুম পিতারই স্ত্রী। তোমার পিতার রুহের মর্যাদার দোহাই দিয়ে বলছি, আমার ছেলের প্রাণভিক্ষা দাও। আমি ছেলেকে নিয়ে তোমার রাজ্য ছেড়ে দূর দেশে চলে যাব। আমার এই শেষ আবেদনটি তুমি কবুল কর। তোমার পিতা আমাকে অতটুকুই স্নেহ করতেন যতটুকু স্নেহ তোমার মা'কে করতেন'। বলল ইসমাঈলের মা।

'মৃত্যুপথযাত্রী পিতার স্নেহের মূল্য আপনি দিয়েছেন আপনার অযোগ্য ছেলের নামে সালতানাতের বাদশাহী লিখিয়ে নিয়ে, তাই না? আর আজ আপনার সেই ছেলে সালতানাতকে ধ্বংস করে ছাড়ল। আপনি কি সে সব মায়ের মতো অধিকার রাখেন যারা নিজেদের তরুণ ছেলেদের রণসাজে সজ্জিত করে আমার মরহুম পিতার ইসলামী পতাকাতলে জিহাদের জন্যে বিদায় জানাতেন? আপনি কি আমার বিধবা মায়ের মতো একমাত্র ছেলেকে বাবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ময়দানে মৃত্যুর মুখোমুখি কওমের জন্যে জীবনবাজি যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন? আপনি কি দাবী করতে পারেন তাঁর মতো অধিকার? আপনি আপনার অযোগ্য ছেলেকে মসনদে বসিয়েছেন সিংহাসনের মজা লুটতে, নিজে রাজমাতা হয়ে বিলাসিতা চরিতার্থ করতে। আপনি আপনার ছেলেকে পরিণত করেছেন সালতানাতের ধ্বংসকারী রূপে, সম্ভাবনাময় একটি ইসলামী রাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন করে অগণিত মানুষের জীবন সংহার করতে। আপনার ছেলে খুনী, বিশ্বাসঘাতক! আর আপনি হলেন তাঁর প্রধান মন্ত্রণাদায়ী, কুচক্রী'।

মাহমূদ তার পাশে দাঁড়ানো দু'জন সৈন্যকে বললেন, 'যাও! এই মহিলার সাথে গিয়ে তার ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'।

ইসমাঈল তার তাঁবুতে অবনত মস্তকে উপবিষ্ট। তাঁবুতে দু' সিপাহীকে ঢুকতে দেখে সে কেঁপে উঠল। সে থতমত খেয়ে সিপাহীদের অনুরোধ করল, "তোমরা আমাকে পালানোর ব্যবস্থা করে দাও! আমি তোমাদের যা চাও তাই পুরস্কার দেবো!"

কমান্ডার সিপাহীকে বললেন, 'ওকে সুলতানের কাছে নিয়ে চল। এর ফয়সালা করবেন সুলতান।' অগত্যা ইসমাঈল নিজেই সিপাহীদের সাথে রওয়ানা হল। তার মা ইসমাঈলের পিছনে পিছনে চলতে লাগল।

ইসমাঈলকে যখন মাহমূদের সামনে এনে দাঁড় করানো হল, মাহমূদ তীর্যক দৃষ্টিতে একবার তার আপাদমস্তক দেখে বললেন, 'তোমার মা আমার কাছে তোমার জীবন ভিক্ষা চেয়েছে, আমি তোমার জীবন ভিক্ষা দিলাম, তোমাকে জীবিত রাখা হবে।'

ঐতিহাসিক কাসিম ফেরেশতা এ প্রেক্ষিতে লিখেছেন, ইসমাঈল মাহমূদের মুখোমুখি নীত হলে মাহমূদ ইসমাঈলের উদ্দেশে বলেন, 'আজ যদি আমি তোমার নিকট বন্দী হতাম, যদি তুমি বিজয়ী হতে তবে তুমি আমার সাথে কী ব্যবহার করতে'? ইসমাঈল বলল, 'আমি তোমাকে যাবজ্জীবন কয়েদখানায় বন্দী করে রাখতাম। তবে স্বাভাবিক জীবনের সব উপকরণের ব্যবস্থা করে দিতাম।'

'ঠিক আছে, আমিও তোমার সাথে এর চেয়ে খারাপ আচরণ করব না। তুমি যাবজ্জীবন বন্দী হিসেবে থাকবে এবং জীবনযাপনের সব কিছুই সাধারণ মানুষের মতই পাবে। ইচ্ছে করলে তোমার মাকেও সাথে নিয়ে যেতে পার।'

ইসমাঈল সারা জীবনের জন্যে মাকে নিয়ে জুরজান কয়েদখানায় বন্দী জীবন গ্রহণ করল। তাকে এর চেয়ে বেশি শাস্তি সুলতান মাহমূদ দিলেন না। অথচ ইসমাঈল বিজয়ী হলে মাহমূদের মৃত্যু ছিল অবধারিত। সুলতান মাহমূদ এই বিজয়ের মাধ্যমে এক আত্মঘাতী লড়াই থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। সালতানাতের ক্ষতিকারী সবচেয়ে বড় ক্রীড়নকের অবসান ঘটল। কঠিন এক আপদকে সামনে চলার পথ থেকে অপসারণ করতে সক্ষম হলেন মাহমূদ।

সুলতান মাহমূদ যখন ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে উপনীত আর গজনীতে প্রশিক্ষিত ও চৌকস বহু সৈন্য হতাহতের ঘটনা ঘটল তখন লাহোরে রাজা জয়পালের কাছে খবর পৌছে, সুলতান সুবক্তগীনের মৃত্যু হয়েছে। জয়পাল তার জেনারেলদের ডেকে সুসংবাদ দেন, 'আমার সবচেয়ে বড় শত্রু সুলতান সুবক্তগীন আজ দুনিয়া থেকে তিরোহিত। এখন আমরা সহজেই গজনী জয় করতে পারব। আমাদের বাহিনী হামলার জন্যে তৈরি আছে তো?' জয়পাল জেনারেলদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসুনেত্রে বললেন।

আগের মতো তাড়াহুড়ো করা উচিত হবে না মহারাজ। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, এক ব্যক্তির মৃত্যু হলেও গজনীর কওম মরে যায়নি। বলল এক জেনারেল। গজনীর সৈন্যদের মধ্যে যে দেশ ও জাতিপ্রেম রয়েছে তা এক

সুলতানের মৃত্যুতে মরে যাবে না। আমাদের সৈন্যরা অভিযানের জন্যে প্রস্তুত ঠিকই কিন্তু এদের মধ্যে এখনও মুসলমানদের মতো মৃত্যুপণ লড়াইয়ের প্রেরণা সৃষ্টি হয়নি। সৈন্যদের মধ্যে আমরা ধর্মীয় আবেগ ও জাতীয়তাবোধ জাগানোর চেষ্টা করছি। মন্দিরে মন্দিরে পণ্ডিত– পুরোহিতরা সাধারণ প্রজাদের মনে এই চেতনা জাগাতে চেষ্টা করছেন যে, "মুসলমানদের বিরুদ্ধে এ লড়াই দেবদেবীর ইজ্জত রক্ষার লড়াই, আমাদের ধর্ম-অর্চনা টিকিয়ে রাখার লড়াই। এ লড়াইয়ে আমাদের জিততেই হবে।"

সুবক্তগীনের ছেলে মাহমূদ এখন যুবক। বলল এক জেনারেল। তবে আমি নিশ্চিত বলতে পারব না, সে দেশের সেনাবাহিনীর কমান্ড সামলাতে পারবে কি না। তবে দুটি যুদ্ধে আমি তার মধ্যে যে বীর বীর্য দেখেছি তাতে বাপ মারা যাওয়ার পরও সে শক্ত হাতে দেশের হাল ধরতে সক্ষম হবে। ছেলের যোগ্যতা অনেক সময় বাপকেও ছাড়িয়ে যায়।

এখানে থেকেই আমি এ সব বিষয়ে খবর নিতে পারব। বলল রাজা জয়পাল। তোমরা জান যে, আমার কাছে গজনীর দুই সেনা কর্মকর্তা বন্দী রয়েছে। আমি এদের কাছ থেকে সুবক্তগীন পুত্রের খবর নিয়ে নিব। তোমরা সৈন্যদেরকে অভিযানের জন্যে তৈরি কর। আমি খুব শীঘ্রই গজনী রওয়ানা করতে চাই। সুবক্তগীনের কোন ছেলেরই তার মতো যোগ্য সেনানায়ক ও কৌশলী যোদ্ধা হওয়ার কথা নয়। আমি আশা করি, অতীতের দু' পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে এবার আমরা গজনী দখল করতে সক্ষম হব। এক কুমারী বলিদানের ব্যবস্থাও আমি করেছি। পণ্ডিতেরা ইতোমধ্যে কুমারী সংগ্রহ করেছে। বিশেষ ব্যবস্থায় কুমারীকে তৈরি করার পরই তাকে বলি দেওয়া হবে।

রাজা জয়পাল নেজাম ও কাসেম বলখীর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিল। কাসেম ও নেজাম তাকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছিল এই বলে যে, তারা গজনীর সুলতানের বিজয়ের নেপথ্য কারণ সম্পর্কে তাকে অবহিত করবে। রাজা জয়পাল মুসলিম সৈন্যদের বিজয়ের রহস্য উদঘাটনের লোভে বন্দী গজনী সৈন্য কর্মকর্তাদেরকে রাজমহলের পাশেই একটি সুরক্ষিত কক্ষে নজরবন্দী করে রেখেছিল এবং একজন মুসলিম কর্মচারীকে নিয়োগ করেছিল তাদের আহার সরবরাহ করার জন্য। এই আহার সরবরাহকারী রাজকর্মচারী ছিল গজনীর সুলতানের নিয়োগকৃত গোয়েন্দা। মায়াবী চেহারা, সৎস্বভাব আর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই যুবক নিজের নাম পরিচয় গোপন রেখে দক্ষতার সাথে তার গুরুদায়িত্ব পালন করছিল। জয়পালের রাজ্যের কারো পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব হয়নি যে,

রাজপ্রাসাদেই রয়েছে গজনীর চর। কয়েদীদের কক্ষের বাইরে সশস্ত্র প্রহরী সদা দণ্ডায়মান থাকতো। রাজা জয়পাল দু'বার পরাজিত হয়ে গজনী দখলের জন্যে এতই ক্ষিপ্ত ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, এই দু' বন্দীর প্রতি বহুদিন দৃষ্টি দেয়ার সময়ই পায়নি। রণপ্রস্তুতি ও নতুন সৈন্য রিক্রুটের ব্যস্ততায় আর গজনী দখলের উন্মাদনায় রাজা গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজও ভুলে গিয়েছিল।

বন্দীদের আহার সরবরাহকারী মুসলিম রাজ কর্মচারী তাদের বলেছিল, তোমরা রাজাকে কৌশলী কথা বলে ধোঁকায় ফেলবে। গজনী বাহিনীর বিজয়ের সঠিক রহস্য যে কোন মূল্যে গোপন রাখবে। রাজাকে ধোঁকায় না ফেললে তোমাদেরকে কয়েদখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করবে। বালাজুরীর উদ্দেশ্য ছিল, এরা যদি কৌশলী কথায় রাজাকে আশ্বস্ত ও বিভ্রান্ত করতে পারে, তবে এরা যেমন কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পাবে, জেলখানার যন্ত্রণা থেকেও রক্ষা পাবে। ফলে এদের মুক্তির ব্যবস্থা করার চিন্তা করা যাবে। অপর দিকে রাজা পেশোয়ার না ভিন্ন কোন পথ দিয়ে গজনী আক্রমণ করবে তাও জানা সম্ভব হবে। যেটা তার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

"রাজা যদি তোমাদের ডাকে তবে তোমরা তাকে আশ্বস্ত এবং বিভ্রান্ত করবে।" ইমরান বালাজুরী বন্দীদেরকে বলে দিল, আমি শীঘ্রই তোমাদেরকে এখান থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছি। এজন্যে তোমরা তৈরি থেকো। হতে পারে এজন্যে আমাকে এখান থেকে গায়েব হয়ে যেতে হবে।

"তুমি কোথায় যাবে?"

সালতানাতের পক্ষ থেকে আমার উপর যে গুরুদায়িত্ব রয়েছে তাও আমাকে পালন করতে হবে। সেই সাথে ব্যক্তি হিসেবে আমার মধ্যে যেহেতু মানবিকতাবোধ রয়েছে সেহেতু আমি নিজ কাঁধে একটি দায়িত্ব চাপিয়ে নিয়েছি সেটিও পালন করতে হবে। তোমাদের সাথে এখন আর কোন কথা লুকানোর নেই। এ ব্যাপারে তোমাদের সহযোগিতা আমার প্রয়োজন হতে পারে।

ঘটনা হলো, জয়পাল দু'বার পরাজিত হওয়ার পর পণ্ডিতেরা তাকে দেবতা রুষ্ট হয়েছে বলে বোঝাতে সক্ষম হয় এবং বলে, দেবতার অসন্তুষ্টি থেকে তাকে বাঁচতে হলে এক নির্মলা চরিত্রের কুমারীকে বলি দিতে হবে। তাহলে দেবতা খুশি হবে এবং রাজা বিজয়ী হবে। পৌত্তলিক এই জাতিটা জঘণ্য স্বভাবের। কোন স্বামী মারা গেলে তার স্ত্রীকে মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় সহমরণ করতে হয়। এই হলো এদের শাস্ত্রীয় বিধান। এরা দেব-দেবীকে খুশি করতে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ বলি দিতে পারে। বলছিলাম, বিজয় লাভ ও দেবতাকে খুশি করার

জন্যে পণ্ডিতরা এক কুমারী মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়েছে। বিশেষভাবে এই কুমারীকে বলিদানের জন্যে প্রস্তুত করে কিছুদিন পর বলিদান করা হবে। এই মেয়েটিকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে।

'এ কুমারীকে বাঁচালে আমাদের ফায়দা কি? বেঈমান কাফের-মুশরিকরা স্বজাতির সব কুমারীকে বলি দিলেও তাতে আমাদের কি?' বলল নেজাম।

'এই মেয়েটি আমাকে হৃদয় দিলে ভালবাসত এবং সে আমার সাথে আমাদের দেশে যেতেও রাজী ছিল।' বলল ইমরান। সে মুসলমানও হতে চেয়েছিল। আমি অনেক আগেই ওকে নিয়ে চলে যেতাম। কিন্তু গোয়েন্দাবৃত্তির কঠিন দায়িত্ব আমার প্রবৃত্তি চরিতার্থের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ গুরুদায়িত্ব এড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি রাজা জয়পালের ভবিষ্যত পরিকল্পনা এবং তার অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে গজনী যেতে চাচ্ছিলাম। মেয়েটি আমার সাথেই চলে যাবে বলে বায়না ধরেছিল। আর এ সময়ে তোমরা বন্দী হয়ে এলে। তোমাদের ছাড়িয়ে নেয়াও গোয়েন্দা হিসেবে আমার দায়িত্ব। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, তোমাদের এখান থেকে বের করে এক সাথেই আমরা চলে যাবো। কিন্তু একদিন খবর পেলাম, মেয়েটিকে মন্দিরের পণ্ডিতেরা বাড়ি থেকে ওদের বিশেষ বলিদান পর্ব পালনের জন্যে তুলে নিয়ে গেছে। তোমরা আমাকে অপরাধী বল আর জালেম বল— যা ইচ্ছে বলতে পারো, কিন্তু তোমাদের কাছে আমার প্রত্যাশা, তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে কোথাও লুকিয়ে রাখবো এবং ক'দিন পরে এক সাথেই আমরা চলে যাবো। দোয়া করো, আমার দায়িত্ব পালনের চেয়ে এই মেয়ের মহব্বত যেন আমার কাছে বড় হয়ে দেখা না দেয়।'

তার অর্থ হলো, তুমি আমাদের মুক্তির দায়িত্ব থেকে তাড়াতাড়ি অবকাশ পেতে চাচ্ছো, তাই না? বলল কাসেম।

"হ্যাঁ, তাই। যত দ্রুত সম্ভব। মেয়েটির জন্যে আমার রাতে ঘুম হয় না। আর মাত্র কয়েক দিন আছে। এরপর নরপশুরা মেয়েটিকে জবাই করে ফেলবে।"

ইমরান বালাজুরী বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা ও তার প্রেমিকাকে পণ্ডিতদের আখড়া থেকে বের করে আনার পরামর্শের দু'দিন পরই রাজা জয়পাল বন্দীদের তলব করল।

"তোমরা কি আমার জিজ্ঞাসার জবাব দিতে প্রস্তুত? আশা করি তোমরা নিজেদের জীবনের উপর দয়া করবে।" বলল রাজা।

"হ্যাঁ মহারাজ! আপনি আমাদের সাথে যে সৎ ব্যবহার করেছেন, এর প্রতিদানে আপনার যে কোন প্রশ্নের জবাব দিতে আমরা প্রস্তুত।" বলল কাসেম।

"তোমাদের সুলতান সুবক্তগীন মারা গেছে"। বলল রাজা। আকস্মিক সুলতানের মৃত্যু সংবাদে তারা বিমর্ষ হয়ে গেল। কিন্তু ত্বরিৎ তারা নিজেদের সামলে স্বাভাবিক হয়ে গেল।

"এখন গজনীকে রক্ষা করার মতো আর কেউ নেই। এখন তোমরা আমার সাথী হলে আমার সেনাবাহিনীতে তোমাদের বড় দায়িত্বও দিতে পারি। তবে তোমরা কি বলতে পার, বাবার অবর্তমানে সুলতানের ছেলে মাহমূদ কি গোটা ফৌজের কমাণ্ড দেয়ার যোগ্যতা রাখে? যুদ্ধ পরিচালনায় সে কতটুকু দক্ষ?"

'সে যুদ্ধে সুলতানের মতো পারদর্শী নয়।' বলল নিজাম। সে যুদ্ধক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কয়েকটি চালই চালে। এগুলো যদি আপনাকে বলে দেয়া হয় তাহলে সহজেই আপনি তাকে পরাজিত করতে পারবেন। মাহমূদের কৌশলই ছিল আপনার দ্বিতীয়বার পরাজয়ের কারণ।

এরা দু'জন রাজা জয়পালকে মাহমূদের রণকৌশল সম্পর্কে যা বলল বাস্তবের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। রাজা ওদের কথা শোনার জন্যে জেনারেলদেরও ডেকে আনল। নিজাম ও কাসেম মাহমূদের রণকৌশল জেনারেলদের কাছে ব্যাখ্যা করতে শুরু করল।

কাসেম একটু অগ্রসর হয়ে বলল, আমরা আপনাদের এসব কৌশল হাতে-কলমেও দেখিয়ে দিতে পারব। কিন্তু বন্দী অবস্থায় হাতে-কলমে তা দেখানো কি সম্ভব?

রাজা জয়পাল তখনি বন্দীদের ঘরের পাশ থেকে পাহারা তুলে নেয়ার নির্দেশ দিল। রাত এলো এবং সকাল হলো। পরের দিন ইমরান তাদের জন্য দিনভর অপেক্ষা করল। বসেই রইল সে। বিকেল বেলা রাজমহল থেকে বন্দীদের ডেকে পাঠাল রাজা। ইমরান বার্তাবাহককে বলল, আমি সকাল থেকে তাদের জন্য খানা নিয়ে বসে আছি, কিন্তু তাদের তো দেখছি না!

আসলে ইমরান নিজেই ওদেরকে ঘর থেকে বের করে নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। তাকে কেউ যাতে সন্দেহ না করে কিংবা এর প্রতিক্রিয়া কি হয় তা জানার জন্যে খাবার পরিবেশনের আড়ালে সে-ই তথ্যই সংগ্রহ করছিল ইমরান।

গজনীর কয়েদী নিজাম ও কাসেমকে ইমরানই কৌশল করে ফেরার করিয়েছে এ সন্দেহ কেউ করেছে বলে মনে হয়নি ইমরানের। এই অপারেশনে

সে সফল হলো বটে কিন্তু ইমরানের প্রেমিকা হিন্দু কুমারীকে পণ্ডিতদের দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে মুক্ত করার কঠিন কাজটা রয়ে গেল। এমন একটি মেয়ে যে ইমরানের প্রেমে নিজের ধর্ম, দেশ ও জাতিকে ত্যাগ করতেও আগ্রহী, তাকে নিশ্চিত পণ্ডিতদের বলির খড়গাঘাত থেকে রেহাই করা তার জন্যে যেমন জরুরী তেমনই কঠিন।

ইমরান সুদর্শন, পরিপাটি, অমায়িক যুবক। সে নানা রূপ ধারণ করতে পারে এবং সে নানা ঢংয়ে কথা বলতে ওস্তাদ। ভাষাও জানে একাধিক। ওর কথা যাদু মাখা। প্রকৃতপক্ষে ইমরান ছিল সে সব সুপুরুষের মতো আল্লাহ্ প্রদত্ত সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী বিপরীত লিঙ্গের মানুষ যাদেরকে দেখতে বারবার পিছন ফেরে তাকাতে বাধ্য হয়। ইমরান কোন শাহাজাদা ছিল না বটে, সামান্য এক রাজকর্মচারী। কর্মচারীর পোশাক পরতো, তাদের মতই কথা বলতো, কিন্তু রাজকর্মচারীর আড়ালে সে ছিল গজনীর দক্ষ গোয়েন্দাদের অন্যতম। সে পাঞ্জাবী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতো। কখনো কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়নি যে, এই আত্মপরিচয়হীন লোকটি রাজা জয়পালের জন্যে ভয়ঙ্কর এক বিপদ ডেকে আনতে পারে। বেশ কিছুদিন ধরে সে লাহোর থাকছে। শহরের একটি ঘরে একাকী থাকে। তার প্রতিবেশীরা তার সম্পর্কে জানত, সে রাজমহলের এক বিশেষ কর্মচারী। এছাড়া বেশি কিছু জানতো না। আর জানতো, সে মুলতানের অধিবাসী। অনেক রাত করে সে বাড়ি ফিরতো। তার সমবয়স্ক এক ব্রাহ্মণ হিন্দু জগমোহনের সাথে ছিল তার সখ্য। জগমোহনের বাবা ছিল ব্যবসায়ী।

গভীর রাতেও জগমোহনকে ইমরানের ঘরে আসতে দেখেছে প্রতিবেশীরা। ইমরান-জগমোহনের মতো এমন হিন্দু–মুসলিম বন্ধুত্ব প্রতিবেশীরা দ্বিতীয়টি দেখেনি। এলাকাটি ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে সাধারণত হিন্দুরা ঘৃণা করতো। হিন্দু পণ্ডিতেরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দু প্রজাদের মনে ঘৃণা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই জগমোহন ইমরানের আচরণে দারুণ মুগ্ধ হয়েছিল। ধীরে ধীরে তাদের মনে সৃষ্টি হয় এক গভীর হৃদ্যতা। প্রতিদিন দু'জনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ না হলে, কথা না হলে পেরেশান হয়ে যায় তারা। জগমোহন রাত দুপুরে এসেও ইমরানের ঘরে হানা দেয়। কখনও সে ইমরানের ঘরে রাত কাটিয়ে সকালে বাড়ি ফেরে।

পরিচয়ের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি ঘটনা। একদিন ইমরান জগমোহনের বাড়িতে তাকে খুঁজতে গেল। দেখে, মোহন কাঁদছে। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস

করলে মোহন বলল, "আজ আমার বড় বোনটিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।"

"কে পুড়িয়ে মারল?" জিজ্ঞেস করল ইমরান।

"আমার ধর্ম!"

বোনটির বিয়ে হয়েছিল এক বছরও হয়নি। ওর স্বামী ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়। কিছু দিন রোগে ভুগে আজ মারা গেল। ওর লাশ চিতায় রেখে ওর ভাইয়েরা আমার বোনটিকেও চিতায় দাঁড় করিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। তুমি হয়তো চিতা দেখনি ইমরান। চৌকোণা বিশিষ্ট একটি লোহার পাকা ভিটিতে এক মানুষ সমান কাঠখড়ি পরতে পরতে বিছিয়ে দিয়ে মধ্যে শবদেহ রেখে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আমি শবদেহ পোড়ানোর দৃশ্য সহ্যই করতে পারতাম না, কিন্তু আজ আমার বোনকে জীবন্ত দগ্ধ হতে দেখলাম!

হিন্দু মেয়েরা পূত চরিত্রের অধিকারী দাবী করে বলা হয়, মৃত স্বামীর চিতায় জীবিত স্ত্রীকেও জ্বলতে হয়। মৃত স্বামীর চিতায় জীবিত স্ত্রীর মরে যাওয়াকে 'সতীদাহ' বলা হয়। কোন মহিলা যদি সহমরণে অনীহা দেখায় তবে তাকে দ্বিতীয় বিয়ে থেকেও বিরত থাকতে হয়।

হিন্দু ধর্মের লোকেরা মনে করে, স্ত্রী যদি সহমরণ না করে তবে স্বামীর অবর্তমানে মানবিক দুর্বলতার সুযোগে সে যে কোন সময় অসতী হয়ে যেতে পারে। এজন্য মেয়েরাও সহমরণকেই গ্রহণ করে। আমি নিজেও 'সতীদাহ' প্রথার পক্ষে ছিলাম, কিন্তু আদরের বোনটিকে জীবন্ত পুড়ে মারতে দেখে এটা মেনে নিতে পারছি না। আমার কাছে এই রীতি জঘন্য এক বর্বরতা। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন মহিলা-ই সাগ্রহে স্বামীর চিতায় জ্বলে মরতে চায় না। আমার বোনও চিতায় জ্বলতে চায়নি। তাকে টেনে হেঁচড়ে চিতায় তোলা হয়েছে। তার দু'টো পা রশি দিয়ে চিতার সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে, যাতে সে চিতা থেকে পালাতে না পারে। আমাকে বোনটি খুব আদর করতো। কিন্তু আমি বোনটির জীবন রক্ষায় কিছুই করতে পারিনি। প্রায় দেড়-দু'শ লোক চিতার পাশে দাঁড়িয়েছিল। কেউ তার বাঁচার আকুতি শুনে এগিয়ে যায়নি। এই মানুষগুলো ধর্মের শিকলে বাঁধা এক একটি হিংস্র জীব। চিতার আগুনে যখন কাঠ ও বাঁশগুলো পোড়ার শব্দ হচ্ছিল ক্ষোভে-দুঃখে আমার হৃদপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। আমি আমার বোনের চিতার দিকে তাকাতে পারছিলাম না, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম অন্যদিকে। আমার বোনের আর্তনাদ ও চিৎকার আমার হৃদপিণ্ডে বারবার ধাক্কা দিতে থাকে।

ওর চিৎকার শুনে আমি চকিতে চিতার দিকে তাকিয়ে দেখি, বোন বাঁচার জন্যে ছটফট করছে, বাঁচানোর আকুতি জানাচ্ছে। ওর চিৎকারের পর বেশি করে আগুনে ঘি ঢেলে দেয়া হল। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখায় ওর সারাদেহ জ্বলে গেল, ওর বেঁচে থাকার আকুতি চিরদিনের জন্যে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আমার শরীর অবশ হয়ে আসছিল, চেতনা হারিয়ে যাচ্ছিল। দ্রুত কোন মতে শরীরটাকে টেনে সেখান থেকে চলে এসেছি। এখনও আমার কানে বোনটির চিৎকার ভেসে আসছে। এই বর্বর ধর্মের প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মেছে। যে ধর্ম জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারে তা কি কোন ধর্ম হতে পারে? ধর্ম মানুষকে উন্নত জীবনের পথ দেখায়। নিরপরাধ মানুষকে পুড়িয়ে মারার নাম ধর্ম নয়– এটা ধর্ম হতে পারে না কক্ষণও।”

“ধর্ম মানুষের বাঁচার অধিকার কেড়ে নেয় না। ধর্মে বর্বরতার কোন প্রশ্রয় নেই। আমি তোমাকে আমার ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছি না কিন্তু এটা সত্য যে, আমার ধর্মে নারীকে সম্মান করা হয়। কারো স্বামী মারা গেলে চার মাস পরই সে ইচ্ছে করলে আবার বিয়ে করতে পারে। বিধবার বিয়ের বয়স থাকলে সমাজের লোকেরা-ই তার পুনঃ বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। বিধবার প্রতি সকলে সহমর্মিতা দেখায়।” বলল ইমরান।

আমাদের পণ্ডিতেরা দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরও বলি দেয়। বলল মোহন। দুর্ভিক্ষ, খরা, বন্যা বা অনাবৃষ্টি আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছলে ছোট মেয়েদের ধরে এনে পণ্ডিতেরা বলি দিয়ে, লাশ জ্বালিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের জন্যে দেবতাদের খুশি করে। বলে, এক কুমারী মেয়েকে বলি দিলে বড় দেবতা খুশি হবে, রাজাও বিজয়ী হবে। এই কুমারী বলি দানের আয়োজন চলছে। যার ফলে কোন কুমারী মন্দিরমুখী হতে ভীষণ ভয় পাচ্ছে।

‘কুমারী বলীদান কখন হবে?’

‘পণ্ডিত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কুমারী তালাশ করছে।’ জগমোহন বলল। পণ্ডিতেরা বিশেষ গুণের কুমারী বাছাই করার জন্যে সবাইকে তাদের কুমারী মেয়েকে মন্দিরে পাঠাতে বলেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত পণ্ডিতেরা পছন্দনীয় কুমারী পায়নি বলে শুনেছি।’

‘তোমাদের কি কোন কুমারী বোন আছে?’

‘আমার একটি কুমারী বোন আছে। কিন্তু আমি তাকে মন্দিরে যেতে দেই না। আমার বাবাও বলেছে ও যেন মন্দিরে না যায়। আমার বোন খুব সুন্দরী। আমার ভয় হয় পণ্ডিতেরা দেখলে ওকেই পছন্দ করবে।’

জগমোহনের মন দুঃখভারাক্রান্ত ছিল। ইমরানের সাথে কথা বলে আনন্দ পেল।

"তুমি তোমার বোনকে মন্দিরে যেতে বারণ করে ভাল করেছ। রাজা জয়পালের পরাজয় হয়েছে তার ভুলের কারণে। সে আত্মপ্রবঞ্চনায় ভুগছে। সেই সাথে জাতিকেও ধোঁকা দিচ্ছে। এর চেয়েও মারাত্মক হলো, তোমাদের ধর্মীয় পণ্ডিতেরা গোটা জাতি ও রাজাকে প্রতারণা করছে। তারা শুধু রাজার সন্তুষ্টিতে ব্যস্ত। রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে এরা সব রকম প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে। অবশ্য এ ধরনের ধোঁকাবাজি মুসলমানদের মধ্যে আছে। এক ধরনের ভণ্ড প্রতারক পীর ও ফকিরেরা ধর্মের লেবাসে এসব করে থাকে। খৃস্টান ধর্মেও ওদের পাদ্রীরা ধর্মের প্রকৃত বিধানকে বিকৃত করে শাসকদের মন জয় করার জন্যে নানা উপাচারের জন্ম দিয়েছে। পণ্ডিতদের বলা উচিত ছিল, রাজা যাতে নিজের ত্রুটি এবং সুলতান সুবক্তগীনের সাফল্যের নেপথ্য কারণগুলো উদঘাটন করে। কিন্তু পণ্ডিতেরা সেই অপ্রিয় সত্য কথাটি বলেনি, যাতে রাজা নারাজ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এরা রাজাকে খুশি করার জন্যে দেবতা নারাজের গল্প ফেঁদেছে। আর কুমারী বলি দানের আজগুবী সমাধান দিয়েছে।

তোমার ধর্মের যে খারাপ দিকটির কথা বলেছো তা ধর্মীয় বিধান নয়, ধর্মগুরুদের সৃষ্টি। মানুষের সৃষ্ট বিদ'আতে আমাদের ধর্মে অনেক বিকৃতি দেখা দিয়েছে। রাজা-বাদশাহ ও ক্ষমতাবানদের খুশি করার জন্যে আমাদের কিছু মৌলভী-ইমাম সাহেবরা ধর্মের বিধান বিকৃত করছে। অথচ না ধর্মীয় বিধানে এমন আছে, না মানুষের বিবেক এমনটি করতে বলে। কিন্তু লোভী ধর্ম ব্যবসায়ীরা বিকৃতিগুলোতে ধর্মের লেবেল এঁটে দিয়েছে। শাসকরা যদি নিজেদের ক্ষমতা রক্ষায় ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চায় তবে কিছু ধর্মীয় পণ্ডিত ধর্মের বিধান বিকৃত করে ক্ষমতাবানদের আশ্রয় দেয়। যদি ক্ষমতাবানরা ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে প্রজাপীড়ন শুরু করে, প্রজাদের সাথে জুলুম, অত্যাচার, ধোঁকা, প্রতারণা শুরু করে, তবে একদল ধর্মীয় লেবাসধারী লোক শাসক শ্রেণীর জুলুমকে ধর্মীয় বৈধতা দিতে এগিয়ে আসে। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্যে। কিন্তু বিকৃতির কারণে আজ ধর্মের প্রতি মানুষের অনীহা সৃষ্টি হয়েছে।"

"আচ্ছা, তোমাদের ধর্মেও কি নরবলীর বিধান আছে?" ইমরানকে জিজ্ঞেস করল মোহন।

"না! আমাদের ধর্মে এমন কর্মকাণ্ডকে হত্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আমাদের কোন ধর্মীয় পণ্ডিত যদি কাউকে বলী দেয় তবে তাকে অবশ্যই হন্তারক হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

হ্যাঁ। মুসলমানরা স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে শুধু জিহাদের ময়দানে ধর্মের সুরক্ষার জন্যে। সুলতান সুবক্তগীন এ কাজটিই করেছেন। তার বিজয়ের নেপথ্য কারণও এটি। তিনি ইসলামের জন্যে সাধারণ মুসলমান ও সৈন্যদের এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, তারা জাতির ও ধর্মের মর্যাদা রক্ষার্থে যুদ্ধ-ময়দানে জীবন ত্যাগ করতে সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকে। আমি তোমাদের ধর্মকে হেয় করার উদ্দেশে বলছি না, প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করার জন্যে বলছি, আমরা এক প্রভুর ইবাদত করি। আমাদের ধর্মে একাধিক প্রভু নেই। একটু জ্ঞান খাটালে এ সত্য তুমিও উপলব্ধি করতে পারবে। এসব ভূত যেগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো তো মাটির তৈরি। এগুলো মন্দিরের শোভা বর্ধন ছাড়া কিছুই কি করতে পারে? ওদের গায়ে মশা-মাছি বসলেও, পশুরা পেশাব পায়খানা করলেও তাদের এতটুকু শক্তি নেই যে ওদের তাড়াবে। এরা নিষ্প্রাণ। একটু সাহস করে এসব ভূতকে যদি তুমি টুকরো করে ফেলো, এরা পারবে না এদের ভগ্নাংশগুলো জোরা দিয়ে নিজেদের পূর্বের অবয়ব ফিরিয়ে আনতে। এই যদি হয় দেবতাদের অবস্থা, তাহলে এরা পূজারীদের কিই বা উপকার-অপকার করতে পারবে! এর বিপরীতে আমাদের প্রভু শুধু মসজিদে থাকেন না, সব জায়গায় সব সময় তিনি উপস্থিত রয়েছেন। তিনি আমাদের অন্তরে বিরাজ করেন। তিনি কোন মানুষের রক্ত পিপাসু নন, কোন কুমারীকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে বলী দেয়ার দরকার হয় না।"

ইমরানের কথাগুলো বিপর্যস্ত ভগ্ন হৃদয় মোহনের হৃদয়রাজ্যে সান্ত্বনার ছোঁয়া দিচ্ছিল। সেই সাথে তার জীবন্ত বোনকে অগ্নিভস্ম করায় হিন্দু ধর্মের প্রতি তার ঘৃণা সৃষ্টি হলো।

তোমার কষ্ট ভাগ করে নেয়ার মতো নয়। আমি সহমর্মিতা ও দুঃখ প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু তোমাদের দুঃখ লাঘব করার সাধ্য আমার নেই। তবে তোমাকে এই আশ্বাস দিচ্ছি, যদি তোমার কোন প্রয়োজনে আমাকে স্মরণ কর তবে কাছে পাবে– বলল ইমরান।

দুঃখক্লিষ্ট মানুষের জন্যে এতটুকু সান্ত্বনার কথাও অনেক বড় সাহায্য। মানুষের মন যখন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন মানুষের কাছে বৈষয়িক সাহায্যের চেয়ে আন্তরিকতার ছোঁয়া অনেক বেশি উপকারে আসে। এটা কষ্টের উপর সুখের প্রলেপ দেয়। হৃদয়বান ব্যক্তিদের পক্ষেই দুঃখী মানুষের এরূপ

উপকার করা সম্ভব হয়। দুঃখের এই মুহূর্তে ইমরানের উপস্থিতি ও সান্ত্বনায় জগমোহনকে ইমরানের একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত করল। একদিন ইমরানের ছুটি ছিল, সেদিন মোহন তাকে শিকারে নিয়ে গেল। ইমরান তীর ধনুক সাথে নিয়ে গিয়েছিল। দু'জন মিলে বহু পাখি শিকার করে বাড়ি ফিরল।

ফেরার পথে মোহন ইমরানকে বলল, তুমি অনর্থক আমাকে দিয়ে এই সব পাখি বধ করালে। তুমি জান আমি বামুনের ছেলে। আমাদের জন্য প্রাণীবধ নিষেধ, তদ্রুপ গোশ্‌ত খাওয়া নিষিদ্ধ।

'গোশত খেলে তোমাদের ধ্যান-ধারণাও বদলে যাবে। আজ আমি তোমাকে গোশত্ খাইয়ে ছাড়ব। দেখো, এতে যদি তোমাদের দেবদেবী আমাকে কোন বিপদে ফেলে তবে সেই বিপদ ও শাস্তি আমি বরণ করে নেব।'

ইমরান পাখিগুলোর পালক ছাড়িয়ে মসলা দিয়ে চুলোর আগুনে সেঁকে কাবাব তৈরি করল। মোহন এসবে হাত দিতেই ভয় পাচ্ছিল। বেশি সাধাসাধি না করে ইমরান নানাভাবে এগুলোর স্বাদ ও উপকারিতা বলে যাচ্ছিল। বলছিল, আমাদের প্রভু মাত্র কয়েকটি ঘৃণিত জিনিস ছাড়া সব জিনিস খাওয়া বৈধ করে দিয়েছেন। মানুষের জন্যে আমাদের ধর্ম এমন কঠিন কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি যা মানুষের জীবন ধারণে কষ্ট সৃষ্টি করে। মোহন কাঁপা হাতে পাতিল থেকে একটু করে গোশ্‌ত মুখে পুড়ে নিল। জীবনে এই প্রথম সে গোশ্‌তের স্বাদ নিল। কিন্তু নিমিষেই গোটা একটি পাখি খেয়ে ফেলল মোহন। বলল, 'দাও! আরো খাব।'

আরো একটি পাখি খেল মোহন। বলল আরেকটি খাব। এভাবে কয়েকটি ভুনা পাখি খেয়ে মোহন গোশ্‌তের স্বাদে যখন মত্ত হয়ে পড়েছে, তখন ইমরান তাকে বারণ করল। না, আর খাবে না। হঠাৎ করে এসব গুরুপাকে বেশি আহার করলে তোমার পেট খারাপ হতে পারে। ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হতে হবে। আমার ঘরে তো যাতায়াত আছেই। আমি তোমাকে মাঝে মধ্যে গোশ্‌ত দিয়ে আপ্যায়িত করব।

ইমরানের নিষেধ সত্ত্বেও সে আরো দুটি পাখি গলাধঃকরণ করল এবং এই যুক্তি দিলো যে, কতক্ষণ দৌড়ালে হজম হয়ে যাবে।

এরপর মোহন যতবার ইমরানের ঘরে যেতো, গোশ্‌তের বায়না ধরতো। ইমরান তার চাহিদানুযায়ী গোশ্‌তের ব্যবস্থা আগেই করে রাখতো। ইমরানের

কথার যাদুই হোক বা গোশ্‌তের স্বাদই হোক মোহন পুরোপুরিই ওর ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠল।

'তুমি কি মন্দিরে যাও'? একদিন মোহনকে জিজ্ঞেস করল ইমরান।

মাঝে মধ্যে যাই। অবশ্য কিছুদিন ধরে নিয়মিত একটি রীতি পালনের জন্যে যাওয়া হয়।" বলল মোহন।

'তুমি যেসব মূর্তির সামনে পূজা-অর্চনা কর একদিন ওদের কানে কানে বলবে যে, তুমি গোশ্‌তখোর হয়ে গেছো। খেয়াল করো তোমাদের হাতে তৈরি এসব দেবদেবী তোমাকে কি জবাব দেয়।' বলল ইমরান।

দেখবে ওরা কিছুই বলবে না। এতদিন যাবত তুমি গোশ্‌ত খাও, কোন শাস্তি কি তোমাকে দিতে পেরেছে? হ্যাঁ! যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাদের কোন পণ্ডিত পুরোহিতের কানে এ খবর চলে যায় তবে গোটা পরিবারের উপর দিয়ে ঝড় বইয়ে দেবে।

এসব শুনে মোহন নিজ ধর্মের প্রতি আরো বিদ্বেষী হয়ে উঠল।

এক সন্ধ্যাবেলা। ইমরান একাকী ঘরে বসে রয়েছে। অনিন্দ্য সুন্দরী এক তরুণী তার দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল। কিশোরীর গায়ের রঙ দুধে আলতা। দীঘল কালো চুল, তার পিঠ জুড়ে যেন কৃষ্ণ বন্যা। একজোড়া চোখ যেন সাগরের মতো উচ্ছ্বল, দীঘির পানির মত স্বচ্ছ। তার কথা, চাওনি, হাঁটা-চলাও দৃষ্টি কাড়া।

ষোল সতের বছরের এই তরুণী এতই মোহনীয় যে, তার চেহারা থেকে দৃষ্টি সরানো যে কোন পুরুষের জন্যে কঠিন পরীক্ষা। অপরিচিত এই যুবতীকে ঘোর সন্ধ্যায় ঘরে দেখে ইমরান ভাবনায় পড়ে গেল।

'আপনিই কি ইমরান বালাজুরী?'

'হ্যাঁ! আমিই'।

"আমি জগমোহনের ছোট বোন। আমার নাম ঋষি। আমি দাদার খোঁজে এসেছি। বাবার অবস্থা খুব শোচনীয়। ঘরে কোন পুরুষ নেই যে কোন ডাক্তার-বৈদ্য ডেকে আনবে। আমি জানতাম, দাদা আপনার এখানে আসে।"

"হ্যাঁ! আসে। তবে অনেক রাতে আমার এখানে আসে। আচ্ছা, আমি তোমার সাথে আসছি, চেনা পরিচিত কোন বৈদ্যকে ডেকে নিয়ে আসব।"

"আপনি কি এখানে একাই থাকেন?" জিজ্ঞেস করল ঋষি।

"বিলকুল একা।"

"আপনার বিবি নেই?"

"এখনও বিয়ে করিনি।"

হিন্দু মেয়েটির চেহারার নিরুদ্বেগ ভাব আর মুচকি হাসি দেখে ইমরান বুঝে ফেলল, বাবার অসুখের কথা বললেও এই মেয়ে এতো সকাল সকাল উঠবার নয়। ইমরানের চেহারা ও কথা মেয়েটিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়ে রাখল।

"আপনি বিয়ে করেননি কেন?"

"ঋষি তোমার বাবা অসুস্থ। তোমার জলদি ঘরে ফেরা দরকার। আজ নয় অন্য দিন এসব ব্যাপারে কথা বলব।" বলল ইমরান।

"অসুখটা ততো গুরুতর নয়। এমনিতেই আপনার ঘরে একটু বেশি সময় বসলাম। আপনার ভাল না লাগলে উঠি। দাদার কাছে আপনার অনেক প্রশংসা শুনেছি। এজন্যে আপনাকে দেখার খুব শখ ছিল। সত্যিই আপনি সুন্দর, চমৎকার। আমার দাদাটা অধিকাংশ সময় উদাস থাকে। ইদানীং আহারাদিও ঠিকমত করে না।"

ইমরানের একবার ইচ্ছে করছিল, ঋষিকে বলে দেবে যে, মোহন প্রতিরাতেই তার ঘর থেকে গোশ্‌ত খেয়ে বাড়ি ফেরে, তাই সে আহার তো কম করবেই। কিন্তু এটা ছিল খুবই গোপন একটি ব্যাপার। গোপনীয়তা রক্ষার্থে সে বিষয়টি চেপে বলল, যে নিজের আদুরে বোনকে জীবন্ত পুড়ে মরতে দেখেছে তার মধ্যে উদাসীনতার ভাব আসাটা স্বাভাবিক। তুমিও মনে হয় বোনের মৃত্যুতে অনেক কষ্ট পেয়েছো, তাই না ঋষি?

কষ্টের কথায় ঋষির কণ্ঠ থেকে 'আহ' বেরিয়ে এলো। তার চোখে ছলছল করছে পানি। ধরা গলায় বলল, "জানিনা, আমার ভাগ্যেও হয়তো জীবন্ত পুড়ে মরাই রয়েছে। এজন্য ইচ্ছে করে জীবনে বিয়েই করব না।"

ইমরান তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিল ঋষির দিকে। ঋষিও মুগ্ধের মতো ইমরানের চেহারায় কি যেন খুঁজে ফিরছিল। ইমরান অনুভব করছিল, হতাশার সাথে সাথে কি যেন এক স্বপ্ন ঋষির হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে। শরীরের সৌন্দর্য আর ধর্মের সীমানার মাঝে আশা-দুরাশার দোলাচলে ঋষিদের গোটা পরিবার আজ দুলছে। ঋষিও বিধি-নিষেধে বাঁধা বামুন পরিবারের এক অসহায় তরুণী। যার পক্ষে এই বিধি-নিষেধের দেয়াল টপকানো সত্যিই বড় কঠিন। ঋষি হয়তো ইত্যবসরে ইমরানকে দেখে এসবই ভাবছিল। তার স্বপ্নের পায়রারা অনেক দূর উড়াউড়ি করে কোন নীড় খুঁজে না পেয়ে ক্লান্তি ও হতাশায় ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল।

"না, ঋষি না। তোমাকে জ্বলতে হবে না। আমি তোমাকে কখনও জ্বলতে দেবো না। তুমি যদি মরেও যাও, তবুও আমি তোমার লাশ চিতা থেকে তুলে নিয়ে আসব।" আবেগের আতিশয্যে ঋষির কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল ইমরান।

ইমরানের স্পর্শে ঋষি ভরকে গেলো। ইমরান নিজেকে সামলে স্মিতহাস্যে বলল, দুঃখিত ঋষি। আমাকে ভুল বোঝ না। সত্যিই আমি বুঝে উঠতে পারছি না, তোমাদের ধর্মে নিরপরাধ মহিলাদের কেন জ্বালিয়ে মারা হয়। তোমাদের পণ্ডিত পুরোহিত ও সমাজের মানুষেরা কেন এতো নির্দয় ও পাষাণ!

তুমি আমার ভাগ্য বদলাতে পারবে না, ইমরান। ঋষি ইমরানকে আপনি থেকে তুমি সম্বোধনে নেমে এল। ইমরান তন্ময় হয়ে ঋষির দিকে তাকিয়ে আছে। উভয়ের কণ্ঠ নীরব। কারো মুখে কথা নেই। ইমরান ঋষির আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলল, "আমি তোমার ভাগ্য বদলে দেবো ঋষি।" ক্ষীণকণ্ঠে ইমরান বলল, "তুমি যদি আমার সাথে থাকো, তবে যে কোন অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা প্রভু আমাকে দেবেন।"

"আগামীকাল কি আসব?" জিজ্ঞেস করল ঋষি।

"ঠিক এ সময়ে। তবে কেউ যেন দেখতে না পায়। ধর্মের বৈপরিত্য আমাদের জন্যে কঠিন বাধা। কেউ তোমার আসা আঁচ করতে পারলে কেলেঙ্কারী বেধে যাবে। জগমোহন আমাকে বলেছে, তোমাকে মন্দিরে যেতে দেয়া হয় না। এর কারণও সে আমাকে বলেছে।"

"আমি কোন দেবতার জন্যে বলী হতে চাই না। আমি দিনে ঘরের বাইরে বের হই না। কোথাও যেতে হলে রাতেই যাই।"

"আগামীকাল এলে কথা হবে। তুমি বাড়ি যাও। আমি কোন হেকিম না হয় বৈদ্য নিয়ে তোমাদের বাড়িতে আসছি।"

ঋষিকে বিদায় জানাতে ইমরান দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। ঋষি থমকে দাঁড়াল। উভয়ে ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি।

"আমি কোন অপরিচিত পুরুষের সান্নিধ্যে কখনও এত ঘনিষ্ঠ হইনি। তোমারও ঘনিষ্ঠ হতে ভয় করে। আমরা মুসলমানদের সম্পর্কে কখনও ভাল কিছু শুনিনি। দাদা যদি তোমার সম্পর্কে না বলতো, তবে এখানে আসার দুঃসাহস কখনও হতো না। তোমার সাথে কথা বলে আমি মুগ্ধ।"

উভয়ে হাতে হাত ধরে দরজা পেরিয়ে বারান্দায় এল। তার মধ্যে চলে যাওয়ার কোন তাড়া নেই। ইমরান ইচ্ছে করেই তার হাতটা ধরেছিলো। ঋষিও তার হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে না। ঋষি পরম স্বস্তিতে যেন এক সাহসী নিষ্ঠাবান মুসলিম যুবকের হাত ধরে পৌত্তলিক ধর্মের মৃত্যু সাগর পাড়ি দিতে যাচ্ছে। হঠাৎ করেই ঋষি ইমরানের হাত ছাড়িয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। ঋষি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর ইমরান ঘর থেকে বেরিয়ে এক হেকিমের কাছে রওয়ানা হল।

হেকিমকে জগমোহনদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই ইমরান ঘরে চলে এলো। বাড়িতে প্রবেশ করে বারান্দায় পা রাখতেই ইমরান টের পেল কে যেন গেটের দরজা খুলে আবার বন্ধ করেছে। কেউ প্রবেশ করছে কি-না দেখতে পিছন ফিরে তাকাতেই ইমরানের মনে হল কোন নারী। ভাবল আবার ঋষি আসেনি তো? কাছে আসতেই দেখল জামিলা। তুমি এই সময় কি করে এলে? জিজ্ঞেস করল ইমরান।

"আগে বল এই হিন্দু পেত্নী এখানে এলো কেন?"

শুধু এটাই জানতে এসেছি, এই হিন্দু মেয়েটি এখানে কেন এসেছিল? আমি কি এতই নচ্ছার যে, শুধু দূর থেকেই আমার সালামের জবাব দিয়ে চলে যাবে। আমার প্রস্তাবের জবাবে তুমি বারবার একথাই বলছো, 'তোমার স্বামীকে আমার ভয় করে, দয়া করে তুমি আমার ঘরে এসো না।'

ইমরান গেটের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে জামিলাকে ঘরে নিয়ে এল। এ ঘরেই একটু আগে ঋষি বসেছিল।

সে তার ভাইকে এখানে খুঁজতে এসেছিল। জামিলাকে বলল ইমরান। আজই আমি তাকে দেখলাম। ওর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, পরিচয়ও নেই। জামিলা! আমি তোমার সাথেও কোন সম্পর্ক রাখতে পারব না। তুমি একজন বিবাহিতা মুসলিম মহিলা। তোমার স্বামী আছে। তোমার সালাম ও পয়গাম তো উদ্দেশ্যমূলক। তুমি চাও শারীরিক সম্পর্ক। তোমার পয়গাম গ্রহণ করে গুনাহগার হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

"যাকে তুমি আমার স্বামী বলছো, সে আমার একার স্বামী নয়। তার তিন বিবি বর্তমান। আমি তন্মধ্যে ছোট। আমার বয়স এখনো বিশের কোঠা পেরোয়নি। স্বামীর বয়স আমার তিনগুণ। সে টাকার জোরে তিন বিবি পুষছে। আল্লাহ টাকা ছাড়া তাকে তিন বিবি রাখার মতো না দিয়েছে সৌন্দর্য, আর তার

না আছে দৈহিক সামর্থ্য। তার মতো নির্বীজ পুরুষ যদি টাকার জোরে তিন বিবি রাখতে পারে তবে একজন সামর্থ্যবান নারীর কি দুই স্বামী রাখা দোষণীয়? মেয়েদেরকে কেন তাদের পছন্দনীয় পুরুষের সংস্পর্শে যেতে নিষিদ্ধ করা হল? পুরুষদের এই অধিকার কেন দেয়া হলো যে, তারা ইচ্ছেমত তিন-চারজন করে যুবতী স্ত্রী-বিবি রাখতে পারে!

"এতে আমার কি অপরাধ? আমি তো পুরুষদেরকে তিন চার বিবি রাখার অনুমতি দেইনি। ঠিক মেয়েদেরকেও একাধিক স্বামী গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা আমি আরোপ করিনি। আমি তোমার সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক রাখতে অপারগ এতটুকু বলেছি। দয়া করে তুমি চলে যাও। তোমার স্বামী যদি জানতে পারে যে, তুমি এখানে আসো, তবে আমার খুব বিপদ হবে।"

সে এখানে নেই! পেশোয়ার গেছে ব্যবসায়িক কাজে। এক মাসের মধ্যে সে ফিরবে না। সে আমাকে সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল, কিন্তু আমি এমন অসুখের অজুহাত দেখলাম যে, সে ভড়কে গেলো। সে অন্য এক বিবিকে সাথে নিয়ে গেছে, সেটি আমার থেকে তিন বছরের বড়। এর বড়টা কোথায় যেন গেছে। অনেক রাত পর বাড়ি ফিরবে। সে আমাকে কোথাও যেতে বাধা দেয় না, আমিও তাকে যেতে বাধা দেই না। তুমি আমাকে মুসলমান বলছো। আমি নামে মাত্র মুসলমান। আমার বাবা-মার ঈমান হলো সোনা চাঁদি। মোটা অংকের পণ নিয়ে তারা আমাকে এই বুড়োটার হাতে তুলে দিয়েছে। ধর্মের প্রতি আমার আদৌ কোন আগ্রহ নেই। আমাকে শিখানো হয়েছে পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য নারীর জন্ম। আমি পুরুষের প্রমোদ সামগ্রী হয়েছি, তাই আমিও আমার জীবনের প্রমোদ সঙ্গী খুঁজে নেয়ার অধিকার রাখি। আমি তোমাকেই বানাতে চাই আমার সুখের সঙ্গী। তুমি বল! কি তোমার চাই। এর জন্যে কি মূল্য দিতে হবে তোমাকে। আমি কি এই হিন্দু মেয়েটার চেয়ে কম সুন্দরী?

"আমি তোমার স্বামীর কাতারের লোক নই। তোমার রূপ-লাবণ্য আর সৌন্দর্যের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। নারীর প্রতি আসক্তি থাকলে একাধিক না হলেও এ পর্যন্ত অন্তত একটি বিয়ে তো করতে পারতাম। কারো রূপ-লাবণ্যের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই, নিজের চেহারার প্রতিও আমার লক্ষ্য নেই। তুমি আমার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। মুসলিম নারীর সম্পদ হলো সতীত্ব। মনের কালিমা দূর করে নিজেকে পবিত্র কর।"

"তুমি একটা গবেট, ভীতু। নিজেকে বঞ্চিত এবং প্রতারিত করছ তুমি। আমার শরীরের আত্মা বলতে কিছু নেই। যেসব মেয়ে বাজারে টাকার মূল্যে

বিক্রি হয় এদের কোন প্রাণ থাকে না, মরে যায়। তুমি কি আমার মৃত জীবনটাকে জীবিত করতে পার ইমরান?"

"তাহলে স্বামীর কাছ থেকে তুমি তালাক নিয়ে নাও। তারপর আমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও।"

এটা সম্ভব নয় ইমরান! আমি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাই। যতো টাকা-পয়সা লাগে আমি সাথে নিব। তুমি যেখানে নিয়ে যেতে চাও সেখানেই যাব। তবুও তুমি আমাকে রক্ষা কর। একটু সুখ তুমি আমাকে দাও। জামিলা কামোদ্দীপ্ত হয়ে ইমরানের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আমার জিঞ্জির থেকে ছুটতে পারো না ইমরান। স্বামী ছাড়া আমি কারো সাথে মিলিনি। কিন্তু বহুদিন যাবত পিপাসার্ত আমি। আমার হৃদয় তোমাকে পেতে পাগল হয়ে গেছে। আমার শরীর কামনার আগুনে জ্বলে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে, তুমি আমাকে বাঁচাও ইমরান!

"তুমি প্রবৃত্তির আগুনে নয়, প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছ। এই আগুনে তোমার বাবাকে জ্বালাও। যে লোক টাকার বিনিময়ে বুড়ো লোকের কাছে তোমাকে বিক্রি করে দিয়েছে। এরপর একইভাবে স্বামীকেও সেই আগুনে নিক্ষেপ কর।"

"আচ্ছা বল, তুমি আমার সঙ্গী হবে?"

"কি করতে চাও তুমি?"

"আমি স্বামীকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলব। কিন্তু তুমি আমাকে এখান থেকে দূরে কোথাও নিয়ে যাবে।" গভীর দুশ্চিন্তায় ডুবে গেলে ইমরান। এ সুযোগে জামিলা একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকে। চরম উদ্দীপ্ত জামিলা। ভাবল এবার শিকার কব্জায় এসে গেছে।

ওকে দু'হাতে সরিয়ে বলল, ঠিক আছে, আমি তোমাকে সঙ্গ দেবো। কিন্তু স্বামীকে সে দিন বিষ খাওয়াবে যে দিন আমি বলব। এর মধ্যে আমি কোথাও জীবিকার ব্যবস্থা করে নেব।

"ধোঁকা দিচ্ছ না তো?"

"না।"

"আমাকে তোমার ঘরে আসতে বাধা দেবে না তো?"

"না আসলেই ভাল হবে। কারণ তোমার আমার সম্পর্কের ব্যাপারে কারো সন্দেহ সৃষ্টি হোক তা আমার কাম্য নয়।" বলল ইমরান।

আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল জামিলা। এবার ইমরান যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। তার শ্বাস-প্রশ্বাস বেড়ে গেল। জামিলা ঋষির মতোই সুন্দরী এবং কামনাদীপ্ত একটি আগুনের কুণ্ডলী। অতৃপ্ত বাসনা তাকে অন্ধ করে দিয়েছে।

জামিলার স্বামীর বাড়ি ইমরানের বাড়ির একেবারে কাছে। জামিলার বাড়ি গড়া নবাবী ধাঁচে। ইমরানকে সে তাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে বহুদিন যাতায়াত করতে দেখেছে। জামিলা বহুবার ইমরানকে মুখোমুখি সালাম করেছে। কিন্তু ইমরানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এরপর সে কয়েকবার এক গরীব অসহায় মহিলার মাধ্যমে সাক্ষাত প্রার্থী হওয়ার পয়গাম পাঠিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। সব ব্যাপারেই ইমরান নির্বিকার থেকেছে। এরপর থেকে জামিলা ইমরানের ঘরের দিকে দৃষ্টি রাখছিল, ওখানে কে কে যাতায়াত করে। আজ একটি হিন্দু মেয়েকে ইমরানের ঘর থেকে বের হতে দেখে ওর মধ্যে কামনার আগুন জ্বলে ওঠে। নিজেকে সামলাতে না পেরে সে ইমরানের ঘরে হানা দেয় নিজের ইচ্ছা চরিতার্থের ব্যাপারটিকে চূড়ান্ত করতে। জামিলাকে দেখে ইমরানের মনে হচ্ছিল, জামিলা তাকে ছিঁড়ে ফেড়ে গিলে ফেলবে। জামিলা যখন স্বামীকে বিষ প্রয়োগে হত্যার কথা বলে, তখন ইমরানের এখান থেকে চলে যাওয়ার চিন্তা মাথায় আসে। জামিলা যখন ওর স্বামীর আসার এক মাসের বিলম্বের কথা বলে তখন ইমরান ফন্দি আঁটে এক মাস এই কামিনীকে ধোঁকায় রাখা যাবে।

বাস্তবে ঋষির মন মগজে ইমরান স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। ইমরানের সান্নিধ্যের জন্যে ঋষির মন সময় সময় আনচান করে। ঋষির তুলনায় জামিলাও রূপ-সৌন্দর্যে কম নয়, কিন্তু মন বলে কথা। ঋষির বিপরীতে জামিলার প্রতি তার মনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ সৃষ্টি হয় না। পক্ষান্তরে ঋষি তার হৃদয়ে বারবার দ্বাদশীর চাঁদের মতোই উঁকি দিচ্ছে। অপরদিকে ঋষি ইমরানের সান্নিধ্যে আসার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠছে। ইমরানের সৌম্য কান্তি ঋষির মনে বারবার ভেসে উঠছিল। সে কিছুতেই তাকে বিস্মৃত হতে পারছে না।

জামিলা চলে যাওয়ার পর ইমরানের দায়িত্বের গুরুভারের কথা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ইমরান ভাবল, গোয়েন্দাবৃত্তির গুরুদায়িত্ব তাকে দৃশ্যত পাথর বানিয়ে রেখেছে। গোয়েন্দা দায়িত্ব পালনে নিজের আত্মপরিচয় গোপন রাখতে সফল হয়েছিল সে। দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থেই সে রাজমহলে নৌকরি নিয়েছে।

রাজকর্মচারী হিসেবে জয়পালের কার্যক্রম সম্পর্কে ভেতরের খবর অতি সহজে সংগ্রহ করতে পারছিল। ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সংবাদ সে গজনীর সুলতান সুবক্তগীনের কাছে পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আকস্মিকভাবে ঋষি ও

জামিলা তার মধ্যে মানবিক তাড়না উস্‌কে দেয়। মানব-মানবীর জৈবিক তাড়না তাকে এখন ছিঁড়ে খাচ্ছে। একাকী সে দায়িত্বের গুরুভার অনুভব করছিল এবং এই সমীকরণে পৌছতে সক্ষম হয়, ঋষি ও জামিলার কামনার ঝড় তাকে দায়িত্বের কঠিন অনুশীলন ও একাগ্রতা থেকে বিচ্যুত করতে পারে। আজকের পরিস্থিতিতে বুঝতে পারল, এখন থেকে তার ঘরে রীতিমত ঋষি ও জামিলার আগমন ঘটবে এবং এরা তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। সে একাকী ঠিক করল, তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন থেকে বিচ্যুত হওয়া একটা জাতির সাথে বেঈমানীর নামান্তর। তাই সে ওদের কিছু না জানিয়েই দূর এলাকায় ঘর দেখার সিদ্ধান্ত নিল। সেই সাথে এও ঠিক করল, অচিরেই সে লাহোর থেকে গজনী চলে যাবে।

সিদ্ধান্ত যাই নিক, দায়িত্বজ্ঞান যতই থাক, রক্ত-মাংসেই গড়া একজন মানুষ ইমরান। নারীর রূপ-সৌন্দর্য যে কোন কঠিন পুরুষকেও কাবু করতে সক্ষম। ইমরানের বেলায়ও এর ব্যত্যয় ঘটল না। দুই নারীর যন্ত্রণায় পিষ্ট হতে লাগল ইমরান। ভিতরে ভিতরে তার মধ্যে নারী ও গোয়েন্দা কর্তব্য দারুণ সংঘাতের জন্ম দেয়।

পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই ইমরানের ঘরে হানা দিল ঋষি। এটা ছিল ঋষির দ্বিতীয়বার ইমরানের সংস্পর্শে আসা। ঋষির ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ছোটবেলা থেকেই ইমরান তার পরিচিত, দু'জন একসাথে হেসে খেলেই বড় হয়েছে যেন।

'গতকাল তুমি বলেছিলে আমার শবদেহকে তুমি জ্বলতে দেবে না। একথা কেন বলেছিলে'? জিজ্ঞেস করল ঋষি।

প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে ইমরান বলল, 'গতকাল তুমি এখানে এসেছিলে তোমার ভাইয়ের খোঁজে। আজ কেন আসলে?'

"তোমাকে দেখতে এসেছি।"

"কেন?"

'তুমি আমাকে জ্বলতে দেবে না কেন তা জানতে। গতকাল তোমাকে বলতে পারিনি। একসেনা কর্মকর্তার সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে রয়েছে।'

"আর সে গজনী অভিযানে যাবে। তোমার জীবনও বোনের মতই চিতার আগুনে জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে।"

"এসব লোকগুলো নারীকে মানুষই মনে করে না। দেবতাদের জন্যে শুধু মেয়েদের কেন বলী দেয়া হবে, বলী কি কোন পুরুষ মানুষকে দিতে পারে না?" একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ঋষি।

"তোমাদের ধর্মে তোমার প্রশ্নের কোন জবাব নেই ঋষি। আমার ধর্মে মানুষ বলিদানের কোন রীতি নেই।"

"আমি পুড়ে মরতে চাই না। আর পালিয়ে বাঁচার কোন পথও নেই, কোন আশ্রয় নেই।" এক বুক হতাশা ও ভীতকণ্ঠে বলল ঋষি।

কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে ইমরান-ঋষি ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। উভয়েই ভুলে গেল ধর্মের ব্যবধান, সামাজিকতার দেয়াল। নিজের দায়িত্বজ্ঞানের কথাও ভুলে গেল ইমরান। রাত কত হয়েছে তারও কোন খেয়াল নেই। সেও যাওয়ার জন্যে উঠি উঠি করেও উঠতে পারছিল না। ইমরানের মধ্যে সে খুঁজে পেল তার জীবনের নিরাপত্তা, নিরাপদ আশ্রয়। ইমরানের সান্নিধ্যই যেন তার পরম ঠিকানা। সে উঠতেও চাচ্ছিল না, কিন্তু যেহেতু এখানে থাকা সম্ভব নয় তাই অগত্যা গাত্রোত্থান করল ঋষি। দু' তিন দিন পর ঋষি আবার ইমরানের ঘরে এল। কথা শুরু করতে যাবে এমন সময় বাইরে জগমোহনের হাঁক শোনা গেল।

"তোমার দাদা এসেছে ঋষি। তুমি পাশের কামরায় লুকিয়ে পড়।"

জগমোহন ঘরে প্রবেশের আগেই ঋষি অপর কামরায় লুকিয়ে গেলো।

"তুমি আমাকে মাংস খাইয়ে এমন করে ফেলেছো যে, ঘরের সব্জি-তরকারী দেখলে আমার খাবার আগ্রহ দমে যায়। কোন খাবার আছে কি?"

ইমরান গোশ্‌ত রান্না করে আগে থেকেই রেখেছিল। হাড়িসহ রান্না করা গোশ্‌ত সে মোহনের সামনে এনে দিল। জগ এটা দেখার প্রয়োজনবোধ করেনি, ইমরান খেয়েছে কি খায়নি। সে হাড়ির সবটুকু গোশ্‌ত খেয়ে সাবাড় করল।

"ওরা বলী দানের জন্যে কোন মেয়ে কি ছিনিয়ে এনেছে?"

"না এখনও পায়নি। জানি না, পণ্ডিতেরা কোন ধরনের কুমারী তালাশ করছে।"

"তোমাদের বোন কি মন্দিরে যায়?"

"না! তবে আমার আশঙ্কা হয়, আর কতদিন ওকে লুকিয়ে রাখতে পারব।"

ইমরান চেষ্টা করছিল জগমোহনকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিতে। সে মোহনের দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছিল না। তার অবসাদ ও ঘুমের ভান কার্যকর

ভূমিকা রাখল। মোহন চলে গেল দেরী না করে। জগমোহনের চলে যাওয়া আঁচ করে পাশের কামরা থেকে বেরিয়ে এলো ঋষি। তার চোখে-মুখে রাজ্যের ভীতি।

"দাদা কি গোশ্‌ত খেয়েছে?" বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল ঋষি।

আমি কখনও তোমার কাছে এই রহস্য ভেদ করতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু এটাও মোহনকে বলা সম্ভব ছিল না যে, পাশের কামরায় একজন তোমার কথা শুনছে। বলল ইমরান। যেদিন থেকে মোহন আমার বন্ধু হয়েছে, সেদিন থেকে গোশ্‌ত খেতে শুরু করেছে। কিন্তু এ জন্যে কি তোমাদের দেবদেবীরা মোহনকে কোন শাস্তি দিয়েছে? ধর্ম শুধু নেশাজাতীয় জিনিষগুলোই নিষেধ করে যেগুলো মানুষের জ্ঞান-শক্তি লোপ করে দেয়। ঋষি আবার তুমি কবে আসবে, তোমাকেও আমি গোশ্‌ত খাওয়াব।"

দু'দিন পর ঋষি আবার এলো। ইমরান তার জন্যে মুরগী ভুনা করে রাখল। ঋষি ভয়ে ভয়ে প্রথমে একটু একটু করে ভুনা মুরগীর গোশত মুখে দিল। এরপর বেশ মজা করেই খেল। খাওয়া শেষে বলল, "এরপর যেদিনই আসব, আমাকে গোশত্‌ খাওয়াতে হবে।"

এরপর থেকে ঋষি ঘনঘন ইমরানের ঘরে আসতে শুরু করল। ঋষি এসেই দুটি বায়না ধরতো, একটি গোশ্‌ত খাওয়ানোর আর দ্বিতীয়টি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে লাহোর থেকে কোথাও নিয়ে চলে যাওয়া।

কেননা, বাড়িতে তার বিয়ের আয়োজন জোরেশোরে চলছে। নিজাম ও কাসেম বন্দী হয়ে না এলে হয়তো এতোদিন ইমরান ঋষিকে নিয়ে লাহোর ত্যাগ করে চলে যেতো। সে প্রতিদিন ঋষিকে নতুন নতুন অজুহাত তুলে ভুলিয়ে রাখছিল। ঋষি ওর সাথে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে হন্যে হয়ে উঠছিল।

ইমরান ঋষিকে তার প্রকৃত পেশার কথা বলতে পারছিল না। একদিকে কাসেম ও নিজামের মুক্তির দায়িত্ব, রাজা জয়পালের তৎপরতার খবর যথা সময়ে গজনী পৌঁছানো, অপর দিকে ঋষির প্রেম– ত্রিমুখী ফাঁদে আটকে গিয়েছিল ইমরান।

ঋষির প্রেম নিবেদন তাকে কয়েকবার পালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু নিজাম ও কাসেমের চেহারা দেখার পর তাদের জীবন ও কর্তব্যনিষ্ঠা তার পলায়নে দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। নিজাম ও কাসেমের পক্ষে সশস্ত্র প্রহরা ফাঁকি দিয়ে পালানো সম্ভব হচ্ছিল না। এজন্যে ঋষিকে নিয়ে তার পালানো হয়ে উঠছিল না। কিন্তু ঋষির বাঁচার আকুতি, তার প্রেম ও চোখের পানি বারবার ইমরানের কর্তব্য নিষ্ঠায় বিচ্যুতি ঘটাচ্ছিল।

একদিন ঋষি বেরিয়ে যেতেই ইমরানের ঘরে প্রবেশ করল জামিলা। এ সময়ে ঋষির স্পর্শ-সান্নিধ্য ও স্বপ্নিল অনুভূতিতে জাবর কাটছিল ইমরান। শিহরিত হচ্ছিল উৎফুল্লে। এ মুহূর্তে জামিলা এসে তার সুখানুভূমিতে বাদ সাধে। ক্ষেপে গেল ইমরান। জামিলা হয়তো এসেছিল তার কামনার যন্ত্রণা প্রশমিত করতে। কিন্তু বিধিবাম। ইমরান তার উপস্থিতিতে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল–

"আমি তোমাকে এখানে আসতে নিষেধ করিনি? এখানে আসলে কেন, তোমার স্বামী আসার আগে এখানে তোমার কি কাজ?"

"তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করছো ইমরান। তোমার কত টাকা লাগে বল?"

"তুমি ভুল করছো জামিলা। আমি টাকায় বিক্রি হবার পাত্র নই, তোমার কাছে আমার কিছুই চাওয়ার নেই।"

"আচ্ছা! এই হিন্দু পেত্নীটাই তবে তোমার কাম্য? তুমি কি ভুলে গেছো, এটা হিন্দু রাজার দেশ। আমি ইচ্ছে করলে তোমাকে ধরিয়ে দিতে পারি। হিন্দুরা তোমার লুকোচুরি ধরতে পারলে তোমার ঠিকানা হবে জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে।"

"কয়েদ হবার আগেই আমি ঋষিকে নিয়ে পালিয়ে যাব। তুমি আমার কাছে যা প্রত্যাশা কর তা কখনও সফল হবার নয়। ঋষির জন্যে তোমার মতো ডজন ডজন মেয়েকেও আমি ত্যাগ করতে পারি।" বলল ইমরান।

জামিলাকে এভাবে বিগড়ে দেয়া ছিল ইমরানের মস্ত বড় ভুল। সে জানতো না, কামনা মেয়েদেরকে ডাইনী করে তুলে। নিজের যৌবন ও জীবনের প্রতি এই বঞ্চনা জামিলাকে বেপরোয়া করে তুলে। শরম-লজ্জা আর মুসলিম মহিলাদের কমনীয়তা হারিয়ে জামিলা এক ভয়ঙ্কর কমিনার রূপ নেয়। ইমরানের আঘাত ও প্রত্যাখ্যানে জামিলা প্রতিশোধ যন্ত্রণায় হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

হিন্দু মহিলাদের কাছ থেকে জামিলা জানতে পেরেছিল, রাজা জয়পালের জয়ের জন্যে পণ্ডিতেরা একটি কুমারী বলীদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত কুমারী তারা তালাশ করে পাচ্ছে না। বহু কষ্টে দিনটা সে কাটালো। সন্ধ্যা নামতেই রওয়ানা হল মন্দিরে। হিন্দু মেয়েদের সাথে কথায় কথায় সে জানতে পেরেছিল বড় পণ্ডিত কোথায় থাকে। সে সোজা মন্দিরের প্রধান গেট দিয়ে প্রবেশ করে বড় পণ্ডিতের কাছে চলে গেল। পণ্ডিত বেশভূষায় খান্দানি মুসলিম মহিলাকে মন্দিরে দেখে হতবাক হয়ে গেল। তাকে নিজের কাছে খুব খাতির করে বসাল।

“আপনি কবে কুমারী বলীদান পর্ব সম্পাদন করবেন!” পণ্ডিতের নিকট জানতে চাইল জামিলা।

“বিশেষ গুণের কুমারী পেলেই কাজটি আমরা সমাধা করব। কিন্তু তুমি এ ব্যাপারে জানতে চাচ্ছো কেন– মা!”

আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি। আপনি হয়তো জানেন না যে শহরের সব হিন্দু কুমারী মেয়ে মন্দিরে আসে না। আমি আপনাকে বলীদানের জন্য একটি উপযুক্ত মেয়ের সন্ধান দিতে পারি। আশা করি এই মেয়ে আপনাদের ইচ্ছে পূরণে যথার্থ প্রমাণিত হবে। জামিলা ঋষির বাবার নাম বলল। সেই সাথে জিজ্ঞেস করল, আপনি তার কুমারী মেয়েটাকে কখনও মন্দিরে আসতে দেখেছেন?।

“আমি তো তোমাকেও কখনও দেখিনি। তুমি কার মেয়ে?”

“আমি অমুক ব্যবসায়ীর স্ত্রী।”

“আমাদের ধর্ম আর বলীদানের ব্যাপারে তোমার আগ্রহের হেতু কি? তোমার মনে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকলে বল”– অনুনয়ের স্বরে বলল পণ্ডিত।

মূল মন্দিরের লাগোয়া একটি সুরক্ষিত কামরায় বড় পণ্ডিত থাকে। সেখানে সাধারণ হিন্দুদেরও যাওয়ার অনুমতি নেই। মুসলমানের প্রবেশ তো প্রশ্নাতীত। কোন মুসলমানের মন্দিরে প্রবেশ করার ব্যাপারে সঠিক নিষেধাজ্ঞা ছিল। এমন কি কোন হিন্দুর বাড়ির বসত ঘরেও মুসলমানেরা যাওয়া বারণ ছিল। হিন্দুদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা অস্পৃশ্য, অপবিত্র। কিন্তু জামিলার মতো বনেদী মুসলিম বণিকের স্ত্রীর কথা পণ্ডিত অতি আগ্রহের সাথে শুনল। সুন্দরী এই রমণীর মন্দিরাগমনকে সে রহস্যাবৃত মনে করে। পণ্ডিতেরা রমণ ও রমণীয় কর্মকাণ্ডে দারুণ দক্ষ। মেয়েদের চেহারা দেখলেই তারা বলতে পারে তার ভেতরের খবর। পণ্ডিত জামিলার মধ্যে আঁচ করল হিন্দু শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার ভিন্ন সূত্র। আর সেটিই উদঘাটন করতে তৎপর হলো পণ্ডিত। পণ্ডিতের তুলনায় জামিলা অনভিজ্ঞ এবং গবেট। সে অতৃপ্ত কামনা আর ইমরানের প্রত্যাখ্যানের আগুনে পুড়ছিল। ওর জ্ঞানবুদ্ধি যাও কিছু ছিল তাও প্রতিহিংসা ও উন্মাদনায় লোপ পেয়ে বসেছিল। সে তার মা-বাবা, স্বামী, ঋষি এবং ইমরানের প্রতিশোধ জিঘাংসায় কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলের মতো টগবগ করছিল। তার সংহারী মূর্তি সব কিছুকেই তছনছ করে বেসামাল করে দিয়েছিল। সে পণ্ডিতের জিজ্ঞাসার জবাবে নিজের কাপড়ের নীচ থেকে একটি পুটলি বের করে পণ্ডিতের সামনে রেখে খুলে দেখাল। পুটলিতে বহু স্বর্ণমুদ্রা। পণ্ডিতের চোখে চোখ রেখে জামিলা বলল–

"আমি যে মেয়ের নাম বলেছি তাকেই আপনি বলী দেবেন।" গোপন রহস্যের মতো করে বলল জামিলা।

এই মেয়ে যদি রোগী কিংবা আমাদের চাহিদাসম্পন্ন না নয়?

সে কুমারী। ষোল-সতের বছরের সুন্দরী। আপনাদের উদিষ্ট গুণসম্পন্ন না হলেও এটিকেই বলী দিতে হবে। এটাই আমার শর্ত।

'আমাদের ধর্মীয় কাজে দখলদারি করো না মেয়ে। এটা আমাদের পূজা-অর্চনার ব্যাপার।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল পণ্ডিত।

'পণ্ডিতজী মহারাজ! কোন ধর্ম কুমারী বলী দিতে বলে না। এটা তো ধর্মীয় ঠিকাদারদের বানানো প্রথা। যদ্বারা তারা মহারাজকে খুশি করে উপহার-উপঢৌকন লাভ করে। এর দ্বারা তারা এটাও সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চায়, তারা দেব-দেবীদের এতই প্রিয়ভাজন যে, তারা যে কাউকে বদ করলেও করতে পারে। আপনারা সাধারণ মানুষ থেকে নিজেদের অনেক উঁচুতে রাখতে ভালবাসেন।' একটু ঝাঁঝালো স্বরে বলল জামিলা।

"আমার ধর্মের প্রতি ভর্ৎসনা করো না বেটি। তুমি জান না, ধর্মের প্রতি কটূক্তি করার শাস্তি কতো কঠিন।" অস্পষ্ট আওয়াজে বলল পণ্ডিত।

"আমি শুধু আপনার ধর্ম নিয়ে বলছি না মহারাজ! আমাদের ধর্মেও এমন বাড়াবাড়ি আছে। আমাদের অনেক ইমাম, মৌলভী ও পীর সাহেব নিজেদের সুবিধামতো ধর্মকে ব্যবহার করেন। নিজেদের প্রবৃত্তিকে তারা আল্লাহর বিধান বলে মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়। নিজেদের ত্রুটিগুলো চেপে রেখে অন্যের উপর শাস্তির বিধান প্রয়োগ করেন। নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয় বান্দারূপে প্রকাশ করেন, সাধারণ মানুষ থেকে নিজেদেরকে অনেক উঁচু মনে করেন। এরা ধর্মের খোলস পরে অন্যদের চেয়ে নিজেদের উত্তম দাবী করেন। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাও বড় বড় অপরাধে লিপ্ত। ধর্মের মূল চেতনা বিনষ্ট করে এরা সাধারণ মানুষের জন্য ধর্মকে কঠিন করে তুলেছেন। যার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

পণ্ডিতজী! আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন, আপনাদের মন্দিরের বহু রহস্য আমার জানা আছে। অন্যরা যদিও এ সম্পর্কে বেখবর। আপনি বুঝেন, কারো ব্যথা হলে সে ব্যথার যন্ত্রণায় কোঁকাতে থাকে, আর ব্যথিতের যন্ত্রণা যারা বুঝতে চেষ্টা করে তারা ঠিকই তা অনুভব করে।"

"তোমার বয়স কম হলেও তোমার কথাগুলো বয়স্ক মানুষের মতো। কথাগুলো এত মূল্যবান যা নিয়ে খুব কম মানুষই ভাবে। স্বীকার করতে হবে, তুমি যথেষ্ট প্রাজ্ঞ ও মেধাবী।" পণ্ডিতের কণ্ঠে আভিজাত্য ও আত্মমর্যাদার ছাপ।

'আমার মনের দুঃখ আমাকে বয়স্ক বানিয়ে দিয়েছে। এসব আমার কথা নয়, আমার ভগ্ন হৃদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র। আমার হৃদয় ব্যথাভরা, দুঃখ-যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট।'

'কি রহস্য জান তুমি?'

'রহস্যের কথা আর কি বলবো। আমি অল্প বয়স্কা আর সুন্দরী না হলে মুসলমান পরিচয় দেয়ার পর এতক্ষণে আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে আপনি বের করে দিতেন অবশ্যই। কামরা ধুয়ে এখানে আগর-লোবান জ্বালাতেন, ধূপ দিতেন, ভজনা গাইতেন, আরো কতো শত করে মন্দির পবিত্র করতেন। কিন্তু আমার রূপ দেখে আপনি ভুলেই গেছেন, মুসলমান ঢুকলে হিন্দুর ঘর অপবিত্র হয়ে যায়!

আপনি সোনার মুদ্রাগুলো ধরে দেখেছেন, আমাকে কাছে বসিয়েছেন। এসব সোনার মুদ্রা আর আমার যৌবন উথলে পড়া শরীর দেখে আপনার চোখ ও মন থেকে পাণ্ডিত্য দূর হয়ে গেছে। আপনার মুখে শুধু পণ্ডিতের স্বরটা রয়ে গেছে। অন্তরের দিক থেকে এখন আপনি আমার স্বামীর মতই। সে টাকার বিনিময়ে আমাকে কিনে নিয়েছে। আমার বাবা আমাকে বিক্রি করে দিয়েছেন। আমি বিক্রিত পণ্য। এখন আমি বিক্রি হতে কিংবা কাউকে খরীদ করতে একদণ্ড ভাবি না। আমার মন যাকে চায় তাকে আমি খরিদ করতে পারি সব কিছুর বিনিময়ে।'

'তুমি কিন্তু রহস্যের কথা বলছিলে!'

আপনি বুকে হাত রেখে শুনুন তাহলে। দু'জন ধনাঢ্য লোকের মেয়েকে আপনারা বলীদানের জন্যে নির্বাচন করেছিলেন, কিন্তু টাকার বিনিময়ে তাদের ছাড়িয়ে নিয়েছে তার অভিভাবকরা। আমার স্বামী অনেক বড় ব্যবসায়ী। সে ধর্মের একটি বিধানই শুধু জানে যে, একজন মুসলমান একসাথে চারটি বিয়ে করতে পারে। তার ওঠাবসা, চলাফেরা সবই হিন্দুদের সাথে। তাই আমিও আমার ধর্মকে একপাশে রেখে দিয়েছি। এখন আপনিও আপনার ধর্মকে দরজার বাইরে রাখুন। সোনার মুদ্রাগুলো গুনে বুঝে নিন, আমার কথামতো কাজ করুন। আরও কিছুর চাহিদা থাকলে তাও বলুন।

পণ্ডিত সুযোগের সদ্ব্যবহারে স্মিত হেসে বললো, এতো অধৈর্য হচ্ছো কেন তুমি!

'তুমি কিভাবে নিশ্চিত হবো যে, আমার কাজ হবে এবং আমার সাথে কোন ধরনের প্রতারণা করা হবে না!'

'আমি সেই মেয়েটিকে তোমার পথ থেকে দূরে সরাতে চাও, তাই না?' পণ্ডিত মাদকাসক্ত লোকের মতো বলল। ঠিক আছে তোমার পথের কাঁটা সরে যাবে।

'যদি তার মা-বাবাও আপনার হাত ভরে টাকা দিয়ে দেয়, তাহলে কি হবে?'

'সেটিই হবে, যা তুমি চাচ্ছ।'

মন্দিরের শাঁখার বাজনা বন্ধ, ঘন্টাও স্তব্ধ। ঋষি নিজের বিছানায় আর ইমরান তার ঘরে গভীর ঘুমে সচেতন। হয়তো একে অন্যকে স্বপ্নে দেখছে। তারা মিলনের নেশায় ঘুমের গভীরে শিহরিত হচ্ছে। কিন্তু এদিকে রাতের আঁধারে জামিলা ও পণ্ডিতের সমঝোতায় তাদের অমলিন ভালবাসা সোনা ও কামনার দামে কেনা বেচা হয়ে গেল।

পরদিন বেলা ওঠার পর একটু দেরী করে ইমরান কাজে যাওয়ার জন্যে ঘর থেকে বের হল। জামিলার স্বামীর হাভেলীর সামনে দিয়েই তার রাজবাড়ি যাওয়ার পথ। হাভেলী অতিক্রম করতে যাবে তখন চাপাস্বরে কে যেন তাকে ডাকল। পিছনের কাউকে না দেখে উপরের বারান্দার দিকে তাকাতেই নজরে পড়ল জামিলা। চোখাচুখি হতেই জামিলা বলল, 'ইমরান! তোমার ওয়াদা মনে থাকে যেন।' ইমরানের দৃষ্টিতে জামিলার মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন গোচরীভূত হলো না।

গা জ্বলতে লাগল ইমরানের। কিছু না বলে নীরবে চলতে লাগল সে। রাজমহলে গিয়ে প্রথমেই সে কাসেম ও নিজামের ঘরে গেল। ঘরের বাইরে ছাড়া ভেতরে তাদের হাঁটা-চলায় কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। রাজা তাদের কাছ থেকে যুদ্ধ জয়ের কৌশল উদঘাটনের জন্যে হাত-পা বেঁধে ওদের কয়েদখানায় না রেখে মুক্ত কক্ষে নজরবন্দী করে রেখেছিল। তাদের খাতির-যত্ন ছিল রাজমেহমানদের মত। ইমরান এদের মুক্ত করার চিন্তায় বিভোর। ইমরান তাদের বলেছিল, তারা যেন রাজাকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে আস্থাভাজন হয়ে ওঠে, যাতে করে রাজা তাদের কথা বিশ্বাস করে তাদের ঘরের কাছ থেকে প্রহরা তুলে নেয়।

নিজাম ও কাসেম রাজাকে বিভ্রান্ত করার কৌশল ঠিক করে রেখেছিল। তারা রাজাকে এই প্রস্তাব দেয়ার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছে যে, রাজাকে তারা প্রস্তাব করবে, তারা রাজার সেনাবাহিনীতেই থেকে যেতে চাচ্ছে। গজনী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ের জন্যে নিজেদের সব অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা শক্তিশালী এক সেনা ইউনিট গড়ে তুলবে।

কিন্তু রাজা জয়পাল লাহোর থেকে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরের নেশায় রাজা পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছিল। প্রতিবেশী রাজাদের কাছ থেকে সৈন্য সাহায্য আর নতুন সৈন্য রিক্রুটের কাজে সে এতই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে, বন্দীদের সাথে যুদ্ধকৌশল নিয়ে বিস্তারিত মত বিনিময়ের অবসর তার ছিল না। যে কোন মূল্যে গজনীর পতন ঘটানোই ছিল জয়পালের লক্ষ্য।

সেদিনও ইমরান তাদের কামরায় গিয়ে রাজাকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের মুক্ত করার পথ সুগম করার পরামর্শ দিল। সে যখন বন্দীদের মুক্ত করতে তৎপর ঠিক সেই সময়ে তার ভালবাসার ময়নার উপর শুরু হয়েছে হায়েনার আক্রমণ। পণ্ডিতের সাঙ্গপাঙ্গরা মৃত্যু-বিভীষিকা হয়ে দেখা দেয় ঋষিদের উপর।

রাতেই ঋষিকে ছিনতাই করে বলীদানের ব্যবস্থা পাকা করে এসেছিল জামিলা। ঋষি নিজের ঘরেই ছিল। বাড়ির সব কিছু অন্য দিনের মতই ছিল স্বাভাবিক। এমন সময় ঘণ্টা ও শাঁখের আওয়াজ শোনা গেল। বাড়ির বাইরে ঢাক-ঢোলের বাজনা শোনা গেল। কানে ভেসে এল অনেক মানুষের কলরব। গলির ভেতরে পলায়নপর নারী-কিশোরীদের ভয়ার্ত চাপা কথাও ভেসে আসল। বাচ্চাদের হৈ চৈ শোনা যাচ্ছিলো। ঋষিও তো ছোট্টই। সেও তামাশা দেখার জন্যে দরজা দিয়ে উঁকি মারল। মিছিল গলির মধ্যে এসে পৌঁছেছে। মিছিলের অগ্রভাগে বড় মন্দিরের বড় পণ্ডিত। তার হাতে ছোট্ট একটি ঘণ্টি। সেটিকে বাজিয়ে বাজিয়ে সে আসছিল গলির ভিতরের দিকে।

বড় পণ্ডিতের পিছনে চার-পাঁচটি পালকি। অন্যান্য পণ্ডিত শিঙা ও ঘণ্টি বাজাতে ব্যস্ত ছিল। তাদের পিছনে সাজানো একটি পালকি বহন করছিল চার বেহারা। পণ্ডিত গুনগুনিয়ে ভজন গাইছিল। তাদের পিছনে বিরাট মিছিল।

ঋষি গলির মধ্যে না নেমে তাদের দরজায় দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিলো। বড় পণ্ডিত তার সামনে এসে দাঁড়াল, তার নাম জিজ্ঞেস করল। পণ্ডিতের নাম জিজ্ঞাসায় ঋষি ভড়কে গেল। তার মনে পড়ল, তার ভাই ও বাবা তাকে পণ্ডিতদের দৃষ্টির আড়ালে রাখার জন্যে শত বায়না ধরলেও তাকে কোন দিন মন্দিরে যেতে দেয়া হয়নি। সে তার নাম বলল না।

ওর নাম ঋষি। অচেনা একটি কণ্ঠ ভেসে এল। ঋষির ভাই-বাবা-মা সবাই বেরিয়ে এসেছিল। ঋষি পিছনের দিকে সরে যেতে চাচ্ছিল। পণ্ডিতের চেহারায় বিস্ময় ও আনন্দ খেলা করছিল। ঋষি তার ধারণার চেয়েও অনেক স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী।

'ইন্দ্রদেবী একেই প্রার্থনা করেছেন।' বলল পণ্ডিত।

'না-না মহারাজ!' চিৎকার দিয়ে পণ্ডিত ও ঋষির মাঝে এসে দাঁড়াল ঋষির মা। আপনারা যে মেয়েকে তালাশ করছেন আমার ঋষি সেটি নয়। ঋষি দরজা থেকে ভেতরের দিকে চলে যাচ্ছিল। এক পণ্ডিত এগিয়ে এসে তার হাত ধরে ফেলল। বড় পণ্ডিত পালকি আনার জন্যে হুকুম দিলে পালকি এনে বেহারারা দরজায় দাঁড়াল।

এ নির্দেশ দেবী ও রাজা উভয়ের। ইন্দ্রদেবী যে কুমারীকে চান, সেই কুমারী কারো ঘরে থাকলে সেই ঘরে সকল দেব-দেবীর অভিশাপ হতে থাকে। ওকে দেবীর জন্যে উৎসর্গ না করলে যে মা তাকে জন্ম দিয়েছে সেই মার কুষ্ঠ হয়ে সারা এলাকা ধ্বংস করে দেবে।

এই মেয়ে তোমাদের নয়। সে দেবীর আমানত। তাকে আমরা নিয়ে যাব। ঋষিকে টেনে হেঁচড়ে পালকিতে তোলা হল। সে চিৎকার করে হাত-পা ছুঁড়ে মুক্ত হতে ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। পণ্ডিতদের সাথে আসা এক লোক রুমালের মতো এক প্রস্থ কাপড় দিয়ে ঋষির নাক-মুখ মুছে দিল। ঋষি একটু কেঁপে উঠে নীরব হয়ে গেল। তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। তাকে পালকিতে ভরে দরজা বন্ধ করে দেয়া হল। শাঁখা ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ভজন গাইতে গাইতে ফিরে গেল পণ্ডিতেরা। মিছিলের লোকেরা মন্দির ও দেব-দেবীর জয়ধ্বনি করল। মহল্লার মানুষ ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেল। কানা-ঘুষা ও ফিসফিসানি শুরু হলো গলির লোকদের মুখে।

মহল্লার কিছু লোক ঋষির মা-বাবাকে আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ দিতে লাগল— দেবী তাদের মেয়েকে কবুল করেছে এই সৌভাগ্যের জন্যে। হিন্দু ধর্মের গোড়া ভক্তরা ঋষির মা-বাবাকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখছিল— দেবীর পছন্দনীয় পরিবার বলে। কিন্তু যাদের কলজের টুকরো মেয়েটিকে পণ্ডিতেরা জবাই করতে নিয়ে গেল, এদের মনের অবস্থা অনুধাবনের চেষ্টা কারোরই মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল না। মা-বাবার কানে তখনও ভেসে আসছিল ঋষির করুণ আর্তনাদ, বাঁচার আকুতি। কিছুদিন আগে তাদের অপর মেয়েটির জ্বলন্ত দগ্ধ হওয়ার দৃশ্য ও তার কান্না এখনও তারা ভুলতে পারেনি– সেই শোকের ধকলে এখনও গোটা পরিবার

বিধ্বস্ত। এর উপর একমাত্র চোখের মণি তরুণী মেয়েটিকেও পণ্ডিতেরা জবাই করতে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ঋষির মা-বাবার মনের অবস্থা যদি হিন্দুরা বুঝত তাহলে হয়তো পণ্ডিত আর মহল্লার লোকদের মধ্যে শুরু হয়ে যেতো তুমুল যুদ্ধ। কিন্তু মূর্খ এই লোকগুলো পণ্ডিতদের মিথ্যা ও প্রবঞ্চনায় এতই মত্ত যে, দেবী মেয়েটি গ্রহণ করেছে— এই বিশ্বাস তাদের মধ্যে বদ্ধমূল।

সন্ধ্যায় ইরমান ঘরে ফেরার একটু পরই জগমোহন তার ঘরে প্রবেশ করে। বসেই কান্নায় ভেঙে পড়ল মোহন। সে বলল, ঋষিকে পণ্ডিতেরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। অভাবিত এই দুঃসংবাদে ইমরানের অবস্থাও শোচনীয়। তার বুক ভারী হয়ে এলো। মোহন আরো বলল, কে জানি পণ্ডিতদের বলেছে, ঋষি মন্দিরে যায় না। বলীর জন্যে সেই উপযুক্ত।

তোমরা কি খবর নিতে পারবে ওকে কোথায় রাখা হয়েছে এবং কখন তাকে বলী দেয়া হবে? এ খবরটি জানতে চেষ্টা কর মোহন! আমি তাকে বাঁচানোর সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করব। বলল ইমরান। সম্ভবত বড় মন্দিরেই ওকে রাখা হয়েছে। আমরা কখনও এমন শুনিনি যে, কোন কুমারীকে ধরে নিয়ে সাথে সাথেই বলী দেয়া হয়েছে। পণ্ডিতেরা সেই কুমারীকে দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণে রাখে, তাকে নানাভাবে প্রশিক্ষণ দেয়, পাক-ছাফ করে। জানা নেই আরো কি কি আমল করে। এক পর্যায়ে কুমারী নিজেই বলতে থাকে, 'আমাকে দেবীর চরণে বলী দাও, উৎসর্গ করে দাও।' আমি জানতে চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু তুমি ওকে বাঁচাতে পারবে না ইমরান! ছিনিয়ে আনলেও ওকে আবার ওরা নিয়ে যাবে। এটা করতে গিয়ে আমাদের সাথে তোমার জীবনেও বিপদ নেমে আসবে। এই বলে সে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। নিজেকে সামলে বলল মোহন, এদেশ ছেড়ে আমার চলে যেতে ইচ্ছে করছে। আমার ধর্মের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মেছে।

"তোমাদের ধর্মে অনাচার ছাড়া আর কিই-বা আছে? ভগবত, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত তোমাদের ধর্মীয় কিতাবাদি পড়ে দেখ, এসব কিতাবে প্রবৃত্তির দাসত্ব আর বর্বরতার কাহিনীই লেখা আছে। এসব ধর্মীয় পুস্তকে ধোঁকা, প্রতারণা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকে উৎসাহিত করা হয়েছে। দেব-দেবীর রমণক্রিয়া চিত্রায়িত করে দেখানো হয়েছে এসব গ্রন্থে। মেয়ে ও শিশু হত্যাকেও বৈধতা দেয়া হয়েছে।

তোমার বোনকে যদি সাথে সাথে হত্যা করা হয় তবে ভাল। আমি জানি ও যতক্ষণ জীবিত থাকবে ততক্ষণ পণ্ডিতেরা কত পাশবিক ব্যবহার করবে ওর সাথে। জগমোহনের চোখ কপালে উঠে এলো। ওর চেহারা রক্তিম হয়ে গেল।

হুঁ, তোমরা এসব কাদা-মাটি আর পাথরের মূর্তির পূজা কর। এগুলোর মুখোমুখি হতেও তোমরা ভয় কর। আমি মুসলমান। এসবে আমার কোন ভয় নেই। আমি যদি তোমাদের দেবদেবীর আখড়া থেকে তোমার বোনকে উদ্ধার করতে পারি তবে কি তোমরা আমার সাথে যাবে?

কোথায়?

সেটা তখনই বলা যাবে। তবে তোমাদেরকে আমার ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। বলল ইমরান।

হ্যাঁ, আমি তোমার ধর্ম গ্রহণ করতে প্রস্তুত। আমি তোমাকে শপথ করে ওয়াদা দিচ্ছি, তুমি আমাদেরকে এখান থেকে দূরে কোথাও নিয়ে চল, তাহলে আমরা তোমার ধর্ম গ্রহণ করব এবং ঋষিই হবে তোমার বধূ। বলল মোহন।

এই লোভে আমি ঋষিকে উদ্ধার করতে যাবো না যে, তোমরা ঋষিকে আমার হাতে তুলে দিবে। আমার লক্ষ্য এটাই— আমি উদ্ধার অভিযানে তোমাদের দেব-দেবীদের পরাভূত করতে চাচ্ছি।

আমি বাঘের মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এজন্য আমি জীবনবাজী রাখতে প্রস্তুত। আমি তোমাদের রাজাকে বুঝিয়ে দিতে চাই, কাদামাটি আর পাথরের দেবতারা মাটি আর পাথর ছাড়া আর কিছু-ই নয়। মুসলমানদের নিকট এগুলো নিতান্তই পাথরের স্তূপ। তুমি নিশ্চিন্তে গিয়ে ঘুমাও মোহন। ঋষির মুক্তির ব্যাপারটি আমি নিজের কাঁধে তুলে নিলাম।

জগমোহন চলে গেল। ইমরানের দিকে আগ্নেয়গিরির মতো যন্ত্রণার লাভা উদ্‌গিরণ শুরু হল। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইমরানের মধ্যে প্রতিশোধ ও কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের ঝড় সৃষ্টি করল। দ্রুত বন্দী দু'জনকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করল ইমরান। বন্দী দুজনকে মুক্ত করার গুরুত্বটা হলো, যদি রাজা রাজমহলের অসংখ্য সুন্দরী রক্ষিতার একটিকেও ওদের ঘরে ঢুকিয়ে দেয়, তবে নারীর কাছে ফেঁসে গিয়ে ওরা স্বজাতি ও দেশের কথা ভুলেও যেতে পারে। ভুলে যেতে পারে সৈনিকের কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা। ফলে ওরা জাতিধ্বংসের কারণ হতে পারে। এরা নারী ও অর্থের ধোঁকায় পড়ে এবং রাজার ধন-সম্পদ ও খাতির-যত্নে ভুলে গিয়ে গজনীর মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্যে বিরাট হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। ইমরান বন্দীদের মুক্ত করার বিষয়টির খুঁটিনাটি চিন্তা করছিল। এদিকে ঋষিকে ছিনতাইয়ের ঘটনা তার অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দিল। সে ঋষিকে ইতোমধ্যে মনের মানসীরূপে হৃদয়ে জায়গা দিয়ে ফেলেছিল। উভয় সংকেটর

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ইমরান। পরিকল্পনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মাথা গরম হয়ে গেলো তার। নিজের ঘরে আবেগ, উত্তেজনা আর প্রতিশোধ স্পৃহায় জ্বলে উঠছিল বারবার। শুধু দায়িত্ববোধ ও প্রেমঘটিত ব্যাপার নয়, গোটা পরিস্থিতিটাকে সে আল্লাহর একক সত্তা ও মনুষ্যসৃষ্ট মূর্তির মধ্যে চিরায়ত সংঘাতের রূপ দিল। এই চ্যালেঞ্জকে সে গ্রহণ করল ঈমানের দাঁড়িপাল্লায় মেপে কঠিন চ্যালেঞ্জরূপে। যে করেই হোক পরিস্থিতির মোকাবেলা করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সে দৃঢ় পতিজ্ঞাবদ্ধ।

একাকী ঘরে সে ছাদের দিকে তাকাল। মনের অজান্তেই আল্লাহর জন্য তার দু'হাত উঠে এলো। কায়মনোবাক্যে দু'আ করল ইমরান। তার দু'চোখ বন্ধ হয়ে গেল। দু'চোখে অঝোর ধারায় অশ্রু বইতে লাগল। নিজের অজান্তেই তার মুখে উচ্চারিত হলো, 'খোদায়ে যুলজালাল! আমি যা কিছু করছি আপনার বান্দাদের ইজ্জত ও মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে করছি। আমাকে শক্তি, সাহস ও তৌফিক দিন। আমাকে এ সব মিথ্যা ভূতপূজারীদের কর্মকাণ্ডে ধৈর্য ধারণ ও বিজয়ী হওয়ার তৌফিক দিন। আপনি ও আপনার মনোনীত ধর্ম সত্য, ইসলাম সত্যের পথ, সত্যপন্থীদের পথ। আমাকে এই সত্যকে এই জমিনে প্রমাণ করার তৌফিক দিন।

আয় আল্লাহ! আমার মনে কোন গুনাহর ইচ্ছে নেই। গুনাহ করার ইচ্ছে থাকলে জামিলা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হতো না। আপনি তো দেখছেন, এই সুন্দরী নারী আমাকে কতো কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিল। আমি আপনার দয়ায় এই কঠিন পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়েছি।

আয় প্রভু! আমাকে পথ দেখান, আমাকে সাহায্য করুন। আমি যদি নিজের নফসের জন্য কিছু করে থাকি তবে আমাকে মৃত্যু দিন! আপনার পবিত্র নামের দোহাই, আপনার নামের ইজ্জত বুলন্দির জন্যে অধমকে কবুল করুন।'

মোনাজাত শেষে চোখে মুখে হাত বুলাল ইমরান। তার মাথা থেকে বিরাট দুশ্চিন্তার বোঝা যেন নেমে এল। স্বস্তিতে স্থির ও অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকল কতক্ষণ। হঠাৎ বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে সে ঘরের বাক্স খুলে একটি খঞ্জর বের করে আস্তিনে পুরে নিল এবং বাক্স বন্ধ করে দরজায় তালা দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে পড়ল।

ইমরানের চলার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল, তার পা স্বয়ংক্রিয় উঠছে নামছে। সে ভাবনার রাজ্যে হারিয়ে গেছে। সে গলির শেষ মাথায় গিয়ে মোড় নিতে গিয়ে

দেখল, এখানে কোন মোড় নেই, পথই শেষ হয়ে গেছে। পিছনে ফিরে সে ঘন বনবীথির মাঝ দিয়ে চলতে চলতে গাছের সাথে ধাক্কা খেল। সম্বিত ফিরে আবার উল্টো পথে চলতে শুরু করল। এক পর্যায়ে ইমরান মাথার পাগড়ী খুলে মাথা ও চেহারা এমনভাবে পেঁচিয়ে বেঁধে নিল যে, এখন তাকে দেখে কারো পক্ষে চেনার কোন উপায় নেই। দুটো চোখ ছাড়া আর কিছুই অবমুক্ত নয়। ইমরান ছিল পেশাদার গোয়েন্দা। শহরের সব অলিগলিই তার চেনা। গোয়েন্দাদের প্রথম কাজই থাকে আবাসন ও ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখা। ইমরান মন্দিরের দিকে রওয়ানা হয়। মন্দিরের কোথায় কি তা ইমরানের মুখস্থ। সে চুপিসারে প্রধান ফটক পেরিয়ে প্রধান পণ্ডিতের ঘরের দিকে গেল। তার ধারণা ঋষিকে এখানেই রাখা হয়েছে।

থমকে দাঁড়াল ইমরান। ভাবল, ঋষিকে এখান থেকে উদ্ধার করতে পারলে এখান থেকেই পেশোয়ারে চলে যাবে আর ঘরে ফিরে যাবে না। কিন্তু পা বাড়াতেই কোন অদৃশ্য শক্তি যেন থামিয়ে দিল তাকে। নিজাম ও কাসেমের কথা তার মনে পড়ল। মনে একথাও উদয় হলো, ঋষিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু যে জাতীয় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সে এখানে দীর্ঘ দিন যাবৎ সফলতার সাথে কাজ করছে এখন এভাবে চলে গেলে দায়িত্বে চরম অবহেলা হবে, বিশেষ করে নিজাম ও কাসেমের মুক্তি অসম্ভব হয়ে উঠবে। সেই সাথে রাজার গতিবিধি সম্পর্কেও সুলতান আগাম কোন সংবাদ পাবেন না আর।

চিন্তায় তার শরীর ঘেমে ওঠে। ধীরে ধীরে সর্পিল গতি ও সতর্কে বড় পণ্ডিতের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল ইমরান। ইমরানের মনে হলো, আবেগ তাড়িত হয়ে কিছু করা তার ঠিক হবে না, তাকে আরো সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

বিড়ালের মতো অতি সন্তর্পণে বড় পণ্ডিতের ঘরের কাছে চলে গেলো ইমরান। এলাকাটা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইমরান বড় পণ্ডিতের ঘরের অতি কাছে চলে গেল। দরজা থেকে একটু আগে দাঁড়িয়েছে ইমরান। এমন সময় পণ্ডিতের দরজা খুলে গেল। ভিতরের আলো দরজার ফাঁক গলিয়ে বাইরে পড়ল। এই আলোতে দেখা গেল, ভেতর থেকে একজন মহিলা বের হচ্ছে, সাথে বড় পণ্ডিতও বের হল। জায়গাটি ছিল ঝোপঝাড় ও ঘন গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ। সে দ্রুত একটি ঝোপের আড়ালে চলে গেল। পরিষ্কার দেখতে পেল, মহিলাটি আর কেউ নয় জামিলা।

'এখন নিশ্চিন্ত থাক, তোমার কাজ হয়ে গেছে' বলল পণ্ডিত।

'এখানে আমি ওকে দেখতে পেলে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। দেখলেন তো আপনার চাহিদা মতো আমি আপনার প্রাপ্য উসুল করেছি।' বলল জামিলা।

'এরপরও তুমি সন্দেহে ভুগছো। ওকে এখানে রাখা সম্ভব নয়। তাকে টিলার উপরে অবস্থিত মন্দিরে পৌঁছে দিয়েছি। তুমি চাইলেও আমি ওকে আগামীকালই বলী দিতে পারব না। আমাদের অনেক রীতিনীতি আছে। এগুলো পালন করতে হবে। এটাই তো প্রথম নয়। আমার জীবনে আমি চারটি কুমারী আর দুটি শিশু বলীদান করেছি। এই মেয়েকে অন্তত এক চাঁদ আমরা টিলার মন্দিরে রাখব। তাকে এভাবে তৈরি করব, তার বলাচলা সব বদলে যাবে। রঙ ঢঙে পরিবর্তন ঘটবে। এক সময় সে নিজে থেকেই বলতে থাকবে– "আমাকে দেবীর চরণতলে বলি দিন"। সে তার মুখেই বলীদানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবে। আমি তোমার উদ্দেশ্য সাধন করে দিয়েছি। সে আর তোমার পথের কাঁটা হতে আসবে না। যাও মাঝে মধ্যে এখানে এসো।'

'উদ্দেশ্যের মাত্র অর্ধেক আমার পূরণ হয়েছে।' বলল জামিলা।

বাকীটাও পূর্ণ করে দেব। বলল পণ্ডিত। তোমাকে এমন জিনিস দেব, সে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। একা যেতে পারবে, না কিছুদূর এগিয়ে দেব?

"না। এগিয়ে দিতে হবে না। একাই যেতে পারব।"

খুব কাছে থেকে জামিলা ও পণ্ডিতের সংলাপ শুনছিল ইমরান। একটি ঝোপের আড়াল ছাড়া তাদের মধ্যে দূরত্ব ছিল খুবই কম। ইমরানের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, ঋষিকে জামিলাই পণ্ডিতের হাতে তুলে দিয়েছে। এ কাজ করতে জামিলা পণ্ডিতকে কি বিনিময় দিয়েছে তাও বুঝতে বাকী রইল না তার।

জামিলা ইমরানের পাশ দিয়ে চলে গেল। গাছের মতোই দাঁড়িয়ে রইল ইমরান। পণ্ডিত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। পণ্ডিত দরজা বন্ধ করতেই জামিলার পিছু নিল ইমরান। জামিলার ধৃষ্টতা আর দুঃসাহসের জন্যে আশ্চর্য হলো ইমরান। ঘন বৃক্ষঘেরা চত্বর পেরিয়ে নির্বিকার চিত্তে বাড়ি ফিরছে জামিলা। ইমরানের ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে এখনই হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু নিজের ক্ষোভ রাগ নিয়ন্ত্রণ করে জামিলার দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। কাছে পৌঁছতেই পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ভয়ে থমকে দাঁড়াল জামিলা।

"তোমার অপূর্ণ আশা পূর্ণ হবে না জামিলা! তোমার পথের কাঁটা মনে করে নিরপরাধ একটি মেয়েকে জীবন্ত মেরে ফেলতে যে ভয়ঙ্কর চক্রান্ত তুমি করেছো, এর শাস্তি তোমাকে ভোগ করতেই হবে।"

উহ্! আমি তো ভয়ে মরে যাচ্ছিলাম। ভয়ার্তকণ্ঠে বলল জামিলা।

কোথাও গিয়েছিলে বুঝি?

হ্যাঁ! যেখান থেকে তুমি ফিরছো আমিও সেখান থেকেই ফিরছি।

জামিলা! এখন ইচ্ছে করলে আমি তোমাকে হত্যা করতে পারি। তোমাকে গায়েব করে দিতে পারি। তোমার স্বামীকে তোমার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানিয়ে দিতে পারি। তুমি কি মনে কর, এসব করে তুমি আমাকে বশে আনতে পারবে?

জামিলা নীরব। ভয় শঙ্কায় তার কণ্ঠ থেকে কোন শব্দ বেরুচ্ছিল না।

বল! আমার কথার জবাব দাও, জামিলা!

একটা হিন্দু মেয়ের জন্যে তুমি এতটাই পাগল হয়ে গেলে? অনেক কষ্টে শরীরের সব শক্তি দিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল জামিলা।

আমার কথা শোন! যদি দ্বিতীয়বার আর কোন দিন তুমি এই মন্দিরের দিকে পা বাড়াও তাহলে তোমার টুকরোটাও কেউ খোঁজে পাবে না। আর কোন দিন আমাব ঘরে ঢুকলে তোমাকে জ্যান্ত করব দিয়ে ফেলব। শোনে রাখ, মন্দির থেকে ফেরার পথে তোমার সাথে আমার দেখা হয়েছে, একথা পণ্ডিত কিংবা অন্য কেউ জানতে পারলেও কিন্তু তোমার অবস্থা খুবই শোচনীয় হবে।

"এই সব কিছুই তো আমি করেছি তোমাকে পাওয়ার জন্য।" বলে ইমরানের পা জড়িয়ে ধরল জামিলা। আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল, "তোমার মধ্যে আমি জীবনের সুখ দেখতে পাচ্ছিলাম, আমি তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম। ভেবেছিলাম, এই হিন্দু মেয়েটাকে সরিয়ে দিলে তুমি সম্পূর্ণ আমার হয়ে যাবে। মনে হয়েছিল, এই হিন্দু মেয়েটিকে তুমি বিনোদনের সঙ্গী হিসেবেই কেবল কাছে পেতে চাচ্ছো। ভাবতে পারিনি তুমি ওকে এতোটা ভালবাসো, ওর জন্যে তুমি এতোটা পাগল।"

"এখান থেকে যাও! দূর হও!"

"আমাকে মাফ করে দাও ইমরান!" ডুকরে কেঁদে উঠল জামিলা। পা জড়িয়ে থেকেই বলল, একটা হিন্দু মেয়ের জন্যে অসহায় এই মুসলমান অবলার মন ভেঙে দিও না। অসহায়ের প্রতি একটু দয়া কর।

"মজলুম নও বড় জালেম তুমি।" একথা বলে রাগে ক্ষোভে পা ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য জামিলাকে ধাক্কা দিলে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল জামিলা। ইমরান বলল, "আমি মাফ করলেও খোদা তোমাকে মাফ করবে না। ধুকে ধুকে তোমাকে মরতে হবে। এই অপরাধের শাস্তি তোমাকে ভুগতেই হবে। জীবনে

কোন দিন তুমি শান্তিতে ঘুমাতে পারবে না। ন্যাংটা হয়ে রাস্তায় চিল্লাবে আর কেঁদে কাটাবে।"

ছিটকে পড়া জামিলাকে হাত ধরে টান দিয়ে বসিয়ে দিল ইমরান। কালবিলম্ব না করে রওয়ানা হল ঘরের দিকে। একটু অগ্রসর হতেই জামিলার চিৎকার ভেসে এলো। সেই সাথে শুনতে পেল জামিলার ডাক ... ইমরান! ইমরান!

দাঁড়াল ইমরান। পরি মরি করে দৌড়ে এসে ইমরানের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কবুতরের বাচ্চার মতো ভয়ে কাঁপছিল জামিলা। ধরা গলায় বলল, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও ইমরান! আমার ভয় করছে। আমি যেতে পারব না। আগুনের মতো কি একটা দেখেছি সামনে– হঠাৎ করে জ্বলে উঠেছে আবার নিভে গেছে। তুমিও কি কোন আলো দেখেছিলে? আকাশে কোন বিজলি চমকায়নি তো?"

"কোন নারীকে ভয় দেখানো আমার রুচিবিরুদ্ধ। এখানে তোমাকে একা ফেলে রেখে যেতেও বিবেকে বাধছে। কিন্তু জেনে রেখো, নিরপরাধ মেয়েটির প্রতিটি রক্তের ছিটা তোমার জন্য ভীতিকর বিজলীর মতো চমকাবে, ওর মৃত্যুর আওয়াজ তোমার মাথায় বজ্রাঘাতের চেয়েও ভয়াবহ হয়ে দেখা দিবে। মৃত্যু তোমাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরবে, কিন্তু তুমি মরতে পারবে না।"

"আমার ভয় করছে!" ইমরানকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে আবার পড়ে গেল জামিলা। কোন মতে উঠতে উঠতে বলল, আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দাও। আমাকে একা ফেলে গেলে এখানেই মরে যাবো। আমার উপর একটু দয়া কর ইমরান!

চল!

জামিলার বাড়ির দিকে রওয়ানা হল ইমরান। জামিলা লাফিয়ে উঠে ইমরানের বাহু ঝাপটে ধরল। ইমরানের বাহু শক্ত করে ধরে এদিক ওদিক টলতে টলতে কোন মতে বাড়ির সীমানা পর্যন্ত পৌঁছল জামিলা। পথে কয়েকবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে গিয়ে ইমরানকে ঝাপটে ধরে রেহাই পেয়েছে। দেয়ালের কাছে পৌঁছে ইমরান থেমে গেল।

"আমি কী করব ইমরান!" জামিলা এভাবে উচ্চারণ করল যেন ঠাণ্ডায় দাঁতে খিল ধরে গেছে তার।

"পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর!"

"কী ভাবে?"

কীভাবে প্রায়শ্চিত্ত করবে সময় এলে বলব। এখন যাও।

ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল ইমরান।

পরদিন প্রতিদিনের মতো কাসেম ও নিজামের জন্যে সকালের নাশ্‌তা নিয়ে গেল ইমরান। রাজ মহলের গেটে পা দিয়েই সে বুঝতে পারল, রাজা প্রাসাদে ফিরেছে। একটু পরেই রাজার ফরমান এলো। রাজ মহলে ডাক পড়েছে কয়েদীদের। কাসেম ও নিজাম রাজার চাহিদা অনুধাবন করে মাহমূদের যুদ্ধ জয়ের ভুল চাল রাজার সৈনিকদের শিখিয়ে দেয়ার নাম করে রাজাকে আশ্বস্ত করে ফেলল। তারা বললো, তাদেরকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিলে তারা তাদের যোগ্যতা ও কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষর রাখবে। রাজা এদের কথা বিশ্বাস করে তাদের অনুরোধ মতে কামরার বাইরে থেকে পাহারা তুলে নিল।

কাসেম ও নিজাম তাদের কক্ষে ফিরে এসে ইমরানকে জানাল, রাজা বলেছে, সুলতান ইন্তেকাল করেছেন। বর্তমানে তার ছেলে মাহমূদ ক্ষমতাসীন। রাজার কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল, খুব তাড়াতাড়ি তারা গজনী আক্রমণ করতে চাচ্ছে। সুলতানের মৃত্যুতে রাজা গজনী বিজয়ের খুবই আশাবাদী। সে ভাবছে, খুব সহজেই মাহমূদকে পরাজিত করতে পারবে। সুলতানের মৃত্যু সংবাদ এদেরকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল। বেশি ভাবনার বিষয় হলো, সুলতানের অবর্তমানে গজনী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে কে থাকবে? কাসেম ও নিজাম মাহমূদকে মাত্র দু'তিন ডিভিশন সৈন্যের কমাণ্ড দিতে দেখেছে। কয়েকটি যুদ্ধে বাবার সহযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করতে দেখেছে। মাহমূদ সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল না— সেনাপতির কমাণ্ড সামলানোর কতটুকু যোগ্যতা রাখেন তিনি। তিনি কি তার পিতার মতো অল্প সংখ্যক সৈন্য দিয়ে বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করতে পারবেন? এ সংবাদ শোনার পর তাদের কাছে এখান থেকে ফেরার হয়ে জলদি সুলতান মাহমূদকে রাজার সৈন্যবল ও আক্রমণ প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করাটা অত্যন্ত জরুরী মনে হয়েছে।

এদিকে ইমরান তাদেরকে বলেছিল, ঋষি নামের যে হিন্দু মেয়েটি মুসলমান হয়ে তার সাথে গজনী চলে যেতে আগ্রহী ছিল তাকে ইতিমধ্যে পণ্ডিতেরা বলীদানের জন্য ধরে নিয়ে গেছে। ইমরান তাদের একথাও বলেছে, তাদের দু'জনকে এখান থেকে মুক্ত করে ওই মেয়েটিকেও সে মন্দির থেকে মুক্ত করে গজনী নিয়ে যাবে। বিষয় দু'টিকে সে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে।

ওদের কক্ষের বাইরে থেকে পাহারা তুলে নেয়ায় সে রাতেই এদের ফেরার করানোর সংকল্প করল ইমরান।

অন্য দিনের চেয়ে আজ রাতের খাবার অনেক বিলম্বে নিয়ে এলো ইমরান। কিছুক্ষণ বন্দীদের এখানে কাটিয়ে রাতের বেলা থালা-বাটি নিয়ে সে রাজমহলের প্রহরীদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেল। যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে যে, ইমরান রাতের খাবার দিয়ে আর বাসায় যায়নি।

দৃশ্যত প্রহরীদের সামনে দিয়ে রাজমহল ত্যাগ করলেও সে ঘরে ফিরেনি। রাজবাড়ির গেট পেরিয়ে পিছনের দিকের বাগানে চলে গেল ইমরান। রাজবাড়ির পিছনে বিরাট বাগান। গাছ-গাছালিতে ভরা। নানা রঙের ফল-ফুলের ছোট বড় অসংখ্য গাছ। ঘন বৃক্ষের ছায়ায় রাজবাড়ির পেছন দিকটা অন্ধকার। রাতে ওদিকটায় কেউ যায় না। গা ছম ছম করে। নিশাচর পাখি, হুতুম পেচার ডাক ও জংলী পশুদের চেচামেচি শোনা যায়। দেয়ালের বাইরে ওই জঙ্গলের দিকে রাতের অন্ধকারে একাকী আলো ছাড়া পা বাড়ানোর সাহস ইমরানের থাকলেও কোন পৌত্তলিকের নেই। নির্ভয় চিত্তে ইমরান জঙ্গলের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

রাজবাড়ির প্রাচীর ঘেঁষেই বাগান। প্রাচীর খুবই উঁচু। কোন অবলম্বন ছাড়া কারো পক্ষে লাফ দিয়ে দেয়ালের উপর উঠা অসম্ভব। দিনের বেলায় একটি জানালার ফাঁক দিয়ে কাসেম ও নিজামকে দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিল, ওখান দিয়ে দেয়ালের উপর উঠা সম্ভব। ওখানে গাছের ডাল ঝুলে একেবারে দেয়ালের উপরে এসে পড়েছে।

নির্দিষ্ট সময়ে নিজাম ও কাসেম ঘর থেকে বের হয়ে চারপাশটা দেখে নিয়ে চুপিচুপি পালানোর জন্যে এগুতে লাগল। সন্ধ্যা নামতেই রাজমহলের কর্মচারীরা নিজ নিজ ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। আর এদিকে মহলের অভ্যন্তরে রাতের অন্ধকার নিয়ে এসেছে আমোদ ফুর্তির আবেশ। আশ-পাশের রাজ-রাজাদের আগমনে রাজমহলের আলোকসজ্জা বেড়ে গিয়েছে। ঘোড়ার গাড়ী হরদম প্রাসাদে ঢুকছে। বাদকদল অতিথিদের স্বাগত জানতে বাজনা বাজাচ্ছে। নাচঘরের সাজসজ্জা শুরু হয়েছে। টুংটাং নর্তকীদের ঘুঙুর পায়ের নূপুর আর ঢাক-ঢোলের আওয়াজ কানে ভেসে আসছে। দাসদাসীদের হুল্লোড়ও ভেসে আসছে মাঝে মধ্যে। অতিরিক্ত মশালের আলো বেলায়ুরী ও আওরিযীর জন্যে কাল হয়ে দেখা দিল। সোজা পথে যাওয়া তাদের পক্ষে সহজ ছিল না। কেউ বন্দী হিসেবে তাদের শনাক্ত করতে পারলে আরো কঠিন প্রাচীরে আটকে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল তাদের। তবুও দু'চারজনের সামনে দিয়েই গোবেচারার মত প্রাসাদের অন্য অগন্তুকের মতো হাবভাব রেখে রাজপ্রাসাদের পিছনের দিকে যেতে লাগল।

অতিকষ্টে একটি দালানের আড়ালে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যেও মূল প্রাচীরের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হল। এরপর আন্দাজ করে খুব সতর্কতার সাথে দুটি ঢিল ছুড়ল আওরিযী। ইত্যবসরে দেয়ালের উপর থেকে একটি রশি ঝুলে পড়ল তাদের সামনে। দ্রুত রশি বেয়ে উভয়ে দেয়ালের উপরে উঠল। দেয়ালের বাইরে নীচ থেকে আওয়াজ দিল ইমরান- রশিটা দেয়ালের বাইরে ফেলে দাও। গাছ বেয়ে জলদি নেমে পড়। কাসেম ও নিজাম গাছের ডাল বেয়ে সহজেই নীচে নেমে আসল। ইমরান রশিটা পেঁচিয়ে থলের মধ্যে ভরে নিল। থলে থেকে দু'টা চোগা বের করে এগিয়ে দিল। তারা গলা থেকে পায়ের নীচ পর্যন্ত লম্বা চোগা গায় দিয়ে চলতে শুরু করল। অতি সতর্কতার সাথে রাজবাড়ির সীমানা পেরিয়ে এল। রাজ প্রাসাদের বাইরের জগৎ তখন ঘুমে আচ্ছন্ন। নিজের ঘরে এদের নিয়ে এলো ইমরান।

"এখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের চলে যাওয়া উচিত।" বলল নিজাম। আচ্ছা, দুটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করা যাবে?

"এত তাড়াতাড়ি তোমরা এখান থেকে যেতে পারবে না।" বলল ইমরান। সকালে রাজা যখন তোমাদের ফেরার হওয়ার কথা শুনবে, তখনই চতুর্দিকে লোক পাঠাবে তোমাদের খোঁজে। অবশ্য না পাঠানোর সম্ভাবনাও আছে। দু'বারের পরাজয়ের গ্লানি রাজাকে অন্ধ বানিয়ে ফেলেছে। এখনও সে সৈন্য সংখ্যা বাড়ানোর চিন্তায় বিভোর। অহর্নিশি ব্যস্ত যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে। আশপাশের সব হিন্দু রাজা দু'হাতে আর্থিক সহযোগিতা করছে। যুদ্ধব্যয়ের জন্যে রাজার ভাবতে হয়নি। কিন্তু বড় ভাবনা সৈন্য নিয়ে। প্রশিক্ষিত সৈনিকের বড়ই অভাব। অন্যান্য রাজা সৈন্য দিতে গড়িমসি করছে। এ জন্য রাজা দূরদূরান্তের রাজ্যগুলোতে গিয়ে তাদের কাছ থেকে সৈন্য আনছে। এখানকার হিন্দুরাজাদের একটা জটিল নিয়ম হলো, কেউ পরপর দু'বার যুদ্ধে পরাজিত হলে ক্ষমতা উত্তসূরীর হাতে বুঝিয়ে দিয়ে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। জয়পাল ইতিমধ্যে দু'বার পরাজিত হয়েছে। তার উত্তরসূরী তার ছেলে তাকে তৃতীয়বার যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছে। তাই শেষ চেষ্টা হিসেবে জয়পাল জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

হতে পারে এসব ঝামেলার কারণে রাজার মধ্যে তোমাদের ফেরার হওয়ার ঘটনায় কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হবে না। অথবা তোমাদের ধরার জন্যে শহরে খানা তল্লাশী বা চতুর্দিকে লোকও লাগাতে পারে। কাজেই আগামীকাল রাজপ্রাসাদের প্রতিক্রিয়া দেখে এরপর আমি তোমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করব। এর আগে এখানেই তোমরা লুকিয়ে থাক।

নিজাম ও কাসেম ছিল পদস্থ সেনা। যুদ্ধের কলাকৌশলে তারা সিদ্ধহস্ত। রাজ্য ও রাজাদের কূটচাল-বোলের সাথে তারা কম পরিচিত। কিন্তু ইমরান চৌকস গোয়েন্দা। কূটচালে সিদ্ধ হস্ত। পরিকল্পনায় পটু। অপরদিকে নিজাম ও কাসেম রাতের গেরিলা আক্রমণে পারদর্শী। এরা আর ইমরানের চিন্তা-ভাবনায় তাই অনেক পার্থক্য। ইমরান অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। সে বলল, তোমাদের যদি কয়েকদিন এখানে লুকিয়ে থাকতে হয়, তবে চাচ্ছি, রাজার সৈন্য শিবিরে আমরা আগুন লাগিয়ে দিব।

এটাও কি সম্ভব?

কেন সম্ভব নয়। এটা রাজার দ্বিতীয় হামলার আগেও হতে পরত। কিন্তু এখানে আমাদের যে দু'জন সৈন্য ছিল তারা একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে লড়াই করে মারা গেল। এজন্য আমরা আক্রমণও চালাতে পারিনি এবং সময় মতো সংবাদও পৌঁছাতে পারি নি যে, গজনী আক্রমণের মুখোমুখি।

"তুমিও তো এখন এক মেয়ের চক্করে পড়েছো।"

"তা ঠিক। কিন্তু আমি কর্তব্যকে প্রেমের ফাঁদে আটকাবো না। একটি মেয়ের জন্যে আমি গজনীর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হতে দেবো না। এজন্যে আমি তোমাদের হয়তো কুরবান করে দিতে পারি কিন্তু এর আগে যদি রাজা জয়পাল গজনী আক্রমণে বেরিয়ে পড়ে তবে গজনী থেকে দূরে পেশোয়ারেই যাতে গজনী বাহিনী তার সাধ মিটিয়ে দিতে পারে সে ব্যবস্থা আমি করব। সময় মতো সুলতানের কাছে খবর পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। এ নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না।"

"চিন্তার ব্যাপার হলো, সুলতান মাহমূদ সেনাবাহিনীর কমাণ্ড করতে পারবেন কি-না। তাছাড়া তিনি প্রতিবেশী মুসলিম রাজ্যগুলোর সাথে বিবাদেও জড়িয়ে পড়তে পারেন। সুলতানের অবর্তমানে সালতানাতে বিশৃঙ্খলাও দেখা দিতে পারে।" বলল কাসেম বলখী।

"গজনীর অবস্থা সম্পর্কে বর্তমানে আমরা একেবারেই বেখবর।" বলল নিজাম।

বাস্তবেও গজনীর অবস্থা ছিল শোচনীয়। সুলতানের মৃত্যুতে প্রতিবেশী মুসলিম রাজ্যগুলোর হিংসুটে শাসকরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। সুলতানের জীবদ্দশায় এরা কখনও মথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। গজনীর প্রতি শ্যেনদৃষ্টিতে তাকানোর সাহসও পেত না যারা, সুলতানের অবর্তমানে গজনীর

প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পড়ল তাদের। প্রতিহিংসাপরায়ণ শাসকেরা সবাই মিলে গজনীর ক্ষমতা করায়ত্ত করার ফন্দি আঁটতে শুরু করল। কিন্তু সুবক্তগীন ক্ষমতালিপ্সু কপট মুসলিম প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে আলোচনার মাধ্যমে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। একান্তই দায়ে পড়ে যুদ্ধ করতে হলেও তিনি অগ্রপশ্চাৎ গভীরভাবে ভেবে নিতেন। কিন্তু সুলতান মাহমূদের কাছে শত্রু-মিত্র আর সহায়ক ও চক্রান্তকারীদের ব্যাপারটি ছিল দিবালোকের মতো স্পষ্ট। তিনি ছোট বেলা থেকে দেখে আসছিলেন, কোন প্রতিবেশী রাজ্যের কোন্ শাসক সত্যিকার ইসলামী চেতনা ধারণ করে এবং সুলতানের ন্যায়-নীতির সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই সুবক্তগীনের মত ভাবনার চেয়ে কাজে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্রুত এ্যাকশনের মাধ্যমে চিন্তার চেয়েও তীব্র গতিতে সমাধানে পৌঁছায় ব্যক্তি মাহমূদ। তারুণ্য এবং পিতার মতো ইসলামী চেতনার জন্য তার কাজকর্মে ছিল প্রচণ্ড গতি।

গজনীর এক দিকে কাশগরের এলিখানী মুসলিমদের শাসন। অপরদিকে বুখারার সামানী শাসন। অন্যদিকে জিয়াত বংশের শাসন আর পূর্বে-গোরীদের রাজত্ব। এভাবে গজনী সালতানাত বেষ্টিত। দৃশ্যত চতুর্পাশের রাজ্যগুলো মুসলিম শাসনাধীন এবং অঙ্গরাজ্যের মতো হলেও এগুলোর কোনটিতেই ন্যায়পরায়ণ ইসলামী চেতনাসম্পন্ন শাসক ছিল না একটিও। নামেমাত্র এরা মুসলমান হলেও ঈমানী চেতনা হারিয়ে বেঈমানী মোনাফেকী আর ভোগবিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। গজনীর শাসকদের প্রতি এরা সবাই ছিল ঈর্ষাপরায়ণ। গজনীর চিহ্নিত শত্রু ও পৌত্তলিকদের সাথেই এসব ভোগবাদী মুসলিম শাসকদের ছিল বেশি দহরম মহরম।

মাহমূদ একদিন খবর পেলেন, বুখারার বাদশাহ খোরাসান অঞ্চল তওবুন বেগ নামের এক আমীরকে দান করে দিয়েছেন। খবর পেয়ে সুলতান মাহমূদ বুখারার বাদশাহকে পয়গাম পাঠালেন, 'আপনার সাথে আমাদের মৈত্রী চুক্তি রয়েছে। এ অবস্থায় কি করে আপনি গজনী সালতানাতের অধীনস্ত অঞ্চল আমীর তওবুন বেগকে দান করতে পারলেন! এ খবর পাওয়ার পর আমরা মৈত্রী চুক্তি কিভাবে বহাল রাখতে পারি? খোরাসান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিন। যাতে আমাদের মৈত্রী অক্ষুণ্ন থাকে। আপনি হয়তো জানেন, হিন্দুস্তানের পৌত্তলিক বাহিনী আমাদের উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমতাবস্থায় মুসলিম মিল্লাতের স্বার্থেই আমাদের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন অটুট রাখতে হবে।'

সুলতানের পয়গামের জবাবে বুখারা থেকে যে প্রতিক্রিয়া এল তাতে বোঝা গেল, তারা মাহমূদকে মোটেও গণ্য করে না। তারা লিখল, "বলখ, তিরমিজ ও হেরাত আপনার অধীনেই রয়েছে। আর বাকী অঞ্চলগুলো আমরা আমাদের আস্থাভাজন আমীরদের মধ্যে বণ্টন করে দিচ্ছি।"

সুলতান মাহমূদ এই অবজ্ঞাসূচক প্রতিউত্তরের পরও হাকীম আবুল হাসানকে বহুমূল্য উপঢৌকনসহ বুখারার শাসকের কাছে পাঠালেন এবং লিখে জানালেন- "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, যে দোস্তি ও সদ্ভাব আমাদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় বিদ্যমান রয়েছে সেখান থেকে আমি এমন অপমানজনক প্রতিউত্তর পাব। আমার দুঃখ হচ্ছে, মিত্রতা ও প্রতিবেশীর সাথে সৌহার্দ্যভাব হয়তো অক্ষুণ্ন রাখা আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। আমাকে চুক্তি ভঙ্গে বাধ্য করা হচ্ছে।"

সুলতানের এই সমঝোতা চেষ্টা তো ব্যর্থ হলোই বরং দূত আবুল হাসানও আর ফিরে এলো না। কিছু দিন পর গোয়েন্দার মাধ্যমে সুলতানের কাছে খবর পৌঁছল, আবুল হাসানকে বুখারার উজীর করা হয়েছে। যার জন্যে কোন সংবাদ পাঠানোও প্রয়োজন মনে করেনি সে। সংবাদ পেয়েই সুলতান মাহমূদ তার নিরাপত্তা বাহিনীর চৌকস কমান্ডোকে বুখারার কেন্দ্রীয় শহর নিশাপুরের দিকে অগ্রাভিযানের নির্দেশ দিলেন। ধারণার চেয়ে দ্রুত সুলতানের বাহিনী নিশাপুরের উপকণ্ঠে গিয়ে হাজির হল। নিশাপুরের আমীর তওবুন বেগের কাছে যখন সুলতানের বাহিনীর খবর পৌঁছল তখন সুলতানের সৈন্যরা নিশাপুরের সীমানার ঢুকে পড়েছে। তওবুন বেগ প্রতিরোধের সাহস না পেয়ে বুখারায় পালিয়ে গিয়ে শাহ মনসুরকে খবর দিল। খবর পেয়ে শাহ মনসুর সুলতানের মোকাবেলায় ময়দানে সৈন্য সমাবেশ করল।

তওবুন বেগ ক্ষমতার স্বাদে বিভোর। সে ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা ও যন্ত্রণায় সুলতানের বিরুদ্ধে চক্রান্তে নেমে গেল। সে আর এক কুচক্রী আমীর ফায়েককে গিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে যুদ্ধ সহায়তায় রাজী করাতে সক্ষম হল। আমীর ফায়েক সুবক্তগীনের জীবদ্দশায় বহু চক্রান্ত করেও টিকতে পারেনি। সে চক্রান্ত করে ব্যর্থ হয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। সেই জেদে আমীর ফায়েক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে শাহ মনসুরের সহযোগী হল।

তওবুন চক্রান্তে ওস্তাদ। আমীর ফায়েককে সে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে শাহ মনসুরকে বন্দী করে তার অযোগ্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভাই আব্দুল মালেককে মসনদে বসিয়ে অন্তরালে নিজেরা ক্ষমতা ও দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে গেল। দৃশ্যত এরা

সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধাচারী ও পরস্পরে বন্ধু হলেও পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ষড়যন্ত্রই ছিল এদের চরিত্র।

মাহমূদ কৌশলে এদেরকে কঠিন একটা জায়গায় মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করলেন। মাহমূদের আতঙ্কে এদের কেউই যুদ্ধে মোকাবেলা করার সাহস পেল না। মাহমূদের ভয়ঙ্কর আক্রমণের ভয়ে তওবুন বেগ যে কোথায় পালিয়ে গেল আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। আমীর ফায়েকও পালাতে গিয়ে আহত হয়ে সেই যে বিছানা নিল আর দাঁড়াতে পারল না। কিছুদিন পর ফায়েকের মৃত্যু সংবাদ পেলেন সুলতান।

কাশগরে তখন এলীখ খান ক্ষমতাসীন। সে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চিন্তা না করেই সুবক্তগীনের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে অবনতিশীল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বুখারায় আক্রমণ করে বসল। ক্ষমতাসীন বালক আব্দুল মালেককে হত্যা করল। আব্দুল মালেককে হত্যা করে এলীখ খানের কোনই লাভ হলো না। সুলতান মাহমূদের আতঙ্কে এলীখ খান বুখারায় অবস্থান করে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দুঃসাহস পেল না। সুলতান মাহমূদের আক্রমণের ভয়ে সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সুলতান বলখ ও খোরাসানকে গজনীর অধীনে নিয়ে এলেন।

আব্দুল মালেক নিহত হওয়ায় বুখরায় সামান শাসনের ইতি ঘটল। সুলতান সুবক্তগীনের অবর্তমানে গজনী ও আশপাশের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর গৃহযুদ্ধ ও অবনতিশীল পরিস্থিতি এতই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা মুশকিল। এই অবনতিশীল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সুলতান মাহমূদের উল্লেখযোগ্য লোকবল ও সমর সম্পদ ব্যয় করতে হয়। হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজাদের আক্রমণ প্রতিরোধে সুলতান যে সমর আয়োজন ও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এর বড় অংশই গৃহযুদ্ধ সামাল দিতে লেগে যায়। গৃহযুদ্ধের বিষবাষ্প রোধ করতে মাহমূদ যে মুসলিম সৈন্য ও যোদ্ধাদের কাজে লাগিয়েছেন এরাই পৌত্তলিকদের আগ্রাসন ঠেকানোর প্রধান শক্তি। আত্মকলহ ও প্রাসাদ চক্রান্ত দমনে এই অপরিমেয় জীবন ও সম্পদ ক্ষয় করতে না হলে মাহমূদের বিজয় অভিযান এবং হিন্দুস্তানের পৌত্তলিক দুঃশাসকদের ইতিহাস ভিন্ন হতে পারতো।

বিদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, বিলাসী, ক্ষমতালিপ্সু যে সব আমীর-উমারা মাহমূদের প্রতিরোধের মুখে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল এদের ঘরবাড়িতে ইহুদী-খৃষ্টান ও হিন্দু যুবতী, মদ-মাতলামী আর নৃত্যগীতের বিপুল উপকরণ পাওয়া গেল। বেরিয়ে আসে কুচক্রীদের অন্তরালের জীবন চিত্র আর সুলতানের বিরোধিতার

প্রকৃত কারণ। সাধারণ সৈনিক ও জনতা জানতে পারে, এসব আমীর-উমারার সাথে মাহমূদের আদর্শিক ব্যবধান কত। প্রত্যক্ষদর্শী ও ঐসব আমীরদের ঘনিষ্ঠজনেরা সুলতানকে জানায়, সুলতান-বিরোধী প্রত্যেক আমীরের সাথে ছিল হিন্দুস্তানের হিন্দু মহারাজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইহুদী ও খৃষ্টানরা দামী দামী উপঢৌকন আর সুন্দরী তরুণী পাঠাতো এদের হেরেমে। প্রত্যেক আমীরের বাড়িতে রাতে বসত নৃত্যগীত আর সুরা পানের আসর। ইহুদী সৃষ্ট হিন্দুস্তানের একটি কেরামতি গোষ্ঠীর প্রধান মুসলিম পরিচয়ে এদের কাছে সুন্দরী তরুণীদেরকে উপঢৌকন হিসেবে পাঠাতো। দৃশ্যত এরা মুসলিম দাবী করলেও প্রকৃত পক্ষে এরা ছিল ইহুদীদের চর। সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর আমলেও ইহুদী গোষ্ঠী বিভিন্ন মুসলিম ফেরকা সৃষ্টি করে ইহুদী-খৃষ্টান চক্রান্ত অব্যাহত রাখতে মুসলমানদের হেরেমে মেয়েদের পাঠাতো নির্যাতিতা ও আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে। প্রশিক্ষিত এই সব সুন্দরী গোয়েন্দা মেয়েদের রূপ-সৌন্দর্যের ফাঁদে অধিকাংশ ক্ষমতাবান লোক আটকা পড়ে যেত। তারা এদের জায়গা দিতো নিজেদের হেরেমে খাদেমা হিসেবে। নিজেদেরকে মালিকের কাছে মোহনীয় করে উপস্থাপন আর নিবেদিতা প্রমাণ করে এরাই প্রকারান্তরে খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হেরেমগুলোকে দুশমনদের দুর্গে পরিণত করতো। দেহবল্লরী আর যাদুময় নাটকীয়তায় এসব নারী শুধু আইয়ুবকেই নয়; যুগে যুগে মুসলিম খেলাফত ও শাসন ব্যবস্থায় যে কতো অপূরণীয় ক্ষতি করেছে তার প্রকৃত চিত্র প্রকাশ পেলে পৃথিবীর মানুষ হতবাক হয়ে যাবে। মাহমূদের সময়েও মুসলিম শাসকদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটাতে আমীর-উমারার ঘরে ঘরে তারা রমণীয় ফাঁদ বিছাতে সক্ষম হয়েছিল। বহুসংখ্যক আমীর শ্রেণীর লোক এদের পাতা ফাঁদে আত্মাহুতিও দিয়েছিল। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে মাহমূদকে অসংখ্যবার গৃহযুদ্ধ ও বিশৃংখলার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সব সময় তাকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছে।

রাজা জয়পালের গোয়েন্দা তৎপরতা তেমন জোরদার ছিল না। যার ফলে সুবক্তগীনের মৃত্যু সংবাদ ছাড়া জয়পালের বর্তমান গজনী সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছিল না। সুলতান যখন অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যস্ত আর প্রতিবেশীদের আক্রমণ রোধে ব্যাপৃত এ সময় যদি জয়পাল গজনী আক্রমণ করে বসত তাহলে হয় তো সুলতানের বিরোধীরা জয়পালের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতো। তখন ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে সুলতানের পক্ষে গজনী দখলে রাখা হয়ত কঠিন হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ যে, জয়পাল ও সুলতান বিরোধী

কারোরই প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা ছিল না। এরা সুলতানের ক্ষমতা ও প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে মোটেও জ্ঞাত ছিল না। এদের কাছে কেউ সুলতানের দূরবস্থার কথা বলেওনি। এদের তেমন কোন গোয়েন্দা তৎপরতাও ছিল না, যাতে প্রতিপক্ষের বাস্তব চিত্র সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারে। পক্ষান্তরে জয়পালের প্রধান সামরিক কেন্দ্র লাহোরে সুলতানের গোয়েন্দা কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী।

* * *

ইমরান দুই কয়েদী কাসেম ও নিজামকে নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে অন্যান্য দিনের মতো পর দিন সকাল বেলা নাশ্তা নিয়ে যথাসময়ে রাজ প্রাসাদে কয়েদীদের ঘরে হাজির হল। ঘরে বন্দীদের না দেখে সে ঘরের দরজার পাশে অপেক্ষা করতে লাগল। ইমরান রাজ প্রাসাদের কয়েক কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করল, কয়েদীরা কোথায় গেছে? কেউ তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারল না। কিছুক্ষণ পর রাজার ফরমান এলো কয়েদীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। ইমরান রাজার ফরমানবাহীকে বলল, সকাল থেকে সে বন্দীদের জন্যে নাশতা নিয়ে বসে রয়েছে কিন্তু তাদেরকে সে দেখছে না। বন্দীরা ঘরে নেই।

"হু, মুসলমানদের বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি"। কয়েদীদের লাপাত্তা হওয়ার সংবাদ শুনে বলল রাজা। "ওদের কামরা থেকে পাহারা তুলে দেয়াই ছিল মারাত্মক ভুল। এরা শহরে থাকবে না। যাও! শহর থেকে বের হওয়ার সব পথে চেকপোষ্ট বসিয়ে ওদের খোঁজ কর। পেশোয়ারের দিকে অশ্বারোহী পাঠিয়ে ওদের ধরে আন।"

"দু'জন বন্দী পালিয়ে যাওয়ায় আমাদের এমন কি ক্ষতি হয়েছে যে, সব জরুরী কাজ ফেলে রেখে ওদের পিছনে দৌড়াতে হবে!" বলল এক উজীর। "এই মুহূর্তে অভিযান প্রস্তুতিতে আমাদের পুনঃ মনোযোগ দেয়া উচিত। দু'জন ফেরারীকে ধরে আনতে বিপুল সংখ্যক লোককে এদিক ওদিক পাঠিয়ে অভিযান প্রস্তুতির কাজে বিঘ্ন ঘটানো ঠিক হবে কি?"

"ওদের ফেরার হওয়াতে আমার হারানোর কিছু নেই। ওদের কাছ থেকে যা পাওয়ার তা আমি পেয়ে গেছি। কিন্তু ওদের ফেরার হওয়ার শাস্তি ওদের দিতে চাই। তাই জলদি ওদের পাকড়াও-এর ব্যবস্থা কর।" পরক্ষণেই রাজাকে মন্দির থেকে সংবাদ দেয়া হল, বলীদানের জন্যে উপযুক্ত মেয়ে পাওয়া গেছে। আগামী পনের দিনের মধ্যেই মেয়েটিকে বলী দিয়ে ওর রক্ত রাজার মাথায় দেয়া হবে। এতে রাজার বিজয় নিশ্চিত হবে। এখন যে কোন দিন রাজা অভিযান শুরু করতে পারেন।

"শীঘ্রই আমরা অভিযানে বের হব।" বলল রাজা।

এসব সংবাদ সংগ্রহ করতে ইমরানের মতো ঝানু গোয়েন্দার মোটেও বেগ পেতে হল না। সারা দিন সে রাজ প্রাসাদে ডিউটি করে সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরে এল তখন তাকে অনেকটাই উদ্বেগ ও চিন্তামুক্ত মনে হল। বন্দীদের ফেরার হওয়ার ব্যাপারে ইমরানের উপর রাজপ্রসাদের কেউ সন্দেহ করল না। কাসেম ও নিজাম তাড়াতাড়ি গজনী রওয়ানা হওয়ার জন্যে তাকে পীড়াপীড়ি করছিল। ইমরান তাদের পরিস্থিতি জানিয়ে বলল, আরো কয়েকদিন তোমাদের এখানেই লুকিয়ে থাকতে হবে। এ মুহূর্তে বের হলেই মহাবিপদ। শহরের প্রতিটি বহির্গমন পথে চেকপোষ্ট বসানো হয়েছে। দূরদূরান্ত পর্যন্ত অনুসন্ধানীদল পাঠানো হয়েছে। এখন ঘর থেকে বের হলে নিশ্চিত ধরা পড়তে হবে।

ইমরানের দরজায় সাংকেতিক কড়া নাড়ানোর শব্দ হলো। ইমরান হেসে বললো, দোস্ত এসেছে! দরজা খুলে দিলে দু'জন লোক ভেতরে প্রবেশ করল। ইমরান ভেতরের ছিটকানি লাগিয়ে আগন্তুকদের ঘরে নিয়ে এল। কাসেম ও নিজামদের ঘরে এদের নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল।

এরা দু'জন ছিল পেশোয়ারের বাসিন্দা। তারা বলল, রাজা জয়পাল শীঘ্রই গজনী অভিযানে রওয়ানা হবে। এ মুহূর্তে আমাদের দুটি কাজ করতে হবে।

প্রথমতঃ কাউকে দ্রুত পাঠিয়ে সুলতানকে জয়পালের আক্রমণের খবর দিতে হবে। যাতে রওয়ানা হওয়ার আগেই সুলতান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ শহরের বাইরে রাজা যুদ্ধসামগ্রী ও রসদপত্রের বিরাট মওজুদ গড়ে তুলেছে। সমরসামগ্রী সংগ্রহ ও জমার আজ শেষ দিন। ওখানে বিপুল খাদ্য, যুদ্ধাস্ত্র, ঘোড়া আর গরুরগাড়ী রয়েছে। এসবে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে।

আগুন লাগানোর কি কৌশল হতে পারে? লাহোরের লোকদের এসবের কোন ধারণা নেই। বলল ইমরান।

এক আগন্তুক বলল, শোনেননি এর আগেরবার লাহোরবাসী কি খেলা দেখেছে। একটা মেয়েকে কেন্দ্র করে গোটা লাহোরবাসী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। এখন বাটান্ডাবাসীরাও গজনীর বিরুদ্ধে সমরায়োজন করেছে। তাই তাদেরও সে ধরনের কোন খেলা দেখাতে হবে।

বাটান্ডা জয়পালের রাজধানী। এজন্য এখানেই গজনীর গোয়েন্দাদের আড্ডা। যেদিন থেকে জয়পাল গজনী আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করল সেদিন থেকেই যাবতীয় সামরিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বানিয়েছিল লাহোরকে। লোহোরে

গজনীর গোয়েন্দা ছাড়াও স্থানীয় লোকেরাও তাদের তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছিল। হিন্দুরাজা ও শাসকদের অত্যাচার উৎপীড়নে বহু সংখ্যক স্থানীয় বাসিন্দা গজনীর গোয়েন্দা কার্যক্রমের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। বয়সে তরুণ, মেধাবী ও সাহসী অনেক যুবক লাহোরে গজনীর সুলতানের পক্ষে রাত দিন কাজ করে যাচ্ছিল।

রাজা জয়পাল যখন গজনী আক্রমণের চূড়ান্ত লক্ষ্যে লাহোরে বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম, সমরাস্ত্র ও গাড়ী ঘোড়ার সমাবেশ করে, তখন এগুলো ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে গজনী গোয়েন্দাদের কুড়িজনের একটি স্পেশাল টিম মুসাফির বেশে দু'জন দু'জন করে বিভক্ত হয়ে বাটাভা থেকে লাহোর প্রবেশ করে। এরা লাহোরের স্থানীয় এজেন্টদের সংবাদটি পৌঁছে দিয়েই অপারেশন শুরু করবে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত আলোচনা করতে এসেছে দু' গোয়েন্দা।

## গন্তব্য যাত্রা

লাহোরের মূল শহর থেকে একটু দূরে বিশাল ময়দান। হাজার হাজার তাঁবু, গাড়ী, ঘোড়া, সৈন্য ও সাজ সরঞ্জামে ঠাসা ময়দান। একটা তাঁবুর সাথে লাগানো আরেকটি তাঁবু। রাজ্যের হিন্দু প্রজারা নিজেদের সঞ্চিত সব ধন-সম্পদ অকাতরে রাজার সামরিক ভাণ্ডারে জমা করেছে। হিন্দু পণ্ডিত ও রাজার লোকেরা হিন্দু প্রজাদের মনে মুসলিম বিদ্বেষী উন্মাদনা ছড়িয়ে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। ক্ষেপিয়ে তুলেছে গজনীর সৈনিকদের বিরুদ্ধে। হাজারো গরুর গাড়ী বোঝাই করা হয়েছে যুদ্ধযাত্রী সৈনিকদের পানাহার ও যুদ্ধসামগ্রী পরিবহণ করতে। আসবাব পত্রের বিরাট আয়োজন স্তুপাকারে রাখা হয়েছে ময়দানে। দু' মাইল ব্যাসার্ধের গোটা এলাকাটি যুদ্ধ সরঞ্জাম ও তাঁবুতে ছেয়ে গেছে। দিনরাত টহল দিচ্ছে সশস্ত্র প্রহরী।

রাজা জয়পাল শীঘ্রই গজনী আক্রমণে প্রস্তুত। তাই যুদ্ধ সরঞ্জামকে বাইরে রাখা হয়েছে। সৈন্যদের বলা হয়েছে বাকী প্রস্তুতি দ্রুত সম্পন্ন করতে। তাঁবুর বাইরে পাহারার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বটে তবে তেমন কঠোর নয়। রাজার সেনা ছাউনী কিংবা যুদ্ধ সরঞ্জামে হাত দেবে এমন দুঃসাহস কারো ছিল না। এসব ক্ষেত্রে চুরির ঘটনাও কখনো ঘটেনি। তাই অশ্বারোহী প্রহরীরা মনের আয়েশে তাঁবুর চারপাশে ঢিলেঢালা টহল দিচ্ছে। রাজার এবারের যুদ্ধযাত্রা নিয়ে বেশির

ভাগ সময়ই তারা আড্ডায় মতে থাকছে। লাহোরের মুসলিমদের পক্ষ থেকে দুষ্কৃতির আশঙ্কাও তেমন ছিল না জয়পালের। কেননা, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ লাহোরে নামমাত্র কিছু সংখ্যক মুসলমানের বসবাস থাকলেও তারা অনুন্নত এলাকায় দীনহীন জীবন যাপন করতো। রাজার সময়োজনের বিরুদ্ধে কোন দুষ্কৃতির সাহস তাদের মোটেও ছিল না।

অবশ্য রাজার জানা ছিল, তার এলাকায় গজনীর গোয়েন্দা রয়েছে কিন্তু এরা তার বিশাল সমরায়োজনকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে ঘুর্ণাক্ষরেও রাজা তা ভাবতে পারেনি। তাই বিশাল সমরায়োজনের প্রতি যতটুকু সতর্ক নজরদারী দরকার ছিল ততটুকু ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি জয়পাল।

পণ্ডিতেরা সাধারণ হিন্দু প্রজাদের মধ্যে গজনীর সুলতান ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমনই ঘৃণা ও প্রতিহিংসা ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, হিন্দুরা রাজার আগ্রাসনকে ধর্মযুদ্ধ বলে বিশ্বাস করছিল। হিন্দু মহিলারা গায়ের অলংকার, জমানো টাকা আর বাজারে এটা ওটা বিক্রি করে যা-ই পাওয়া যেতো রাজার ভাণ্ডারে জমা করতো। প্রজাদের মনে বিশ্বাস ছিল, এবার ঠিকই রাজা গজনীর মুসলিম শাসককে পরাজিত করে সব মুসলিম প্রজাকে গোলাম-বাঁদী বানিয়ে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করবে। আর দেবদেবীদের জয়গান ভারতের সীমানা পেরিয়ে গজনী পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। মূলত রাজার এই বিশাল সাজ-সরঞ্জামের ভাণ্ডার স্ফীত হয়েছে সাধারণ প্রজাদের ঘাম-রক্তের বিনিময়ে। অতএব, হিন্দুপ্রজাদের পক্ষ থেকে দুষ্কৃতির আশঙ্কা মোটেও নেই।

অথচ জয়পালের বিশাল আয়োজন পর্বও খর্ব করে দেয়ার জন্যে গজনীর শার্দুলেরা পৌঁছে গিয়েছিল লাহোরে। শাহীনের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, চিতার মতো ক্ষীপ্র, বিদ্যুতের গতি ও সিংহ শক্তির অধিকারী এরা। এরা ইসলামের জন্যে নমরুদের আগুনে আত্মাহুতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা শুধু এতটুকুই যাচাই করে, কাজটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের অনুকূলে কিনা। এরা বিশ্বাস করতো, শত্রুর সিংহাসন উল্টে দেয়ার জন্যে কোন রাজশক্তির দরকার হয় না। রাজকীয় সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করতে সমান শক্তির সেনাবাহিনীর দরকার হয় না। এরা বিশ্বাস করতো, ঈমান শক্তিশালী হলে দুর্গের মহাপ্রাচীরও বালির বাঁধের মতো ধসিয়ে দেয়া যায়। যে মুহাম্মদ বিন কাসিম উপমহাদেশে ইসলামের ঝাণ্ডা গেড়েছিলেন এরা ছিল সেই মুহাম্মদ বিন কাসিমের উত্তরসূরী। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এরা এ অঞ্চলের নিবু নিবু ইসলামের প্রদীপকে জ্বালিয়ে রাখার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন হাজারো জীবন।

এরা এসেছে ঘোড়ায় চড়ে। এদেরই দু'জন এখানকার সব চেয়ে দায়িত্ববান গোয়েন্দা কর্মকর্তা ইমরানের সাথে দেখা করে তাদের উপস্থিতির কথা এখানে কর্মরত সহকর্মীদের জানিয়ে দেয়ার জন্য গিয়েছিল। আর অন্যরা ফাটা-ছেঁড়া, ময়লা পোষশাকে ঠিকানা অন্বেষে মুসাফির বেশে শহরের মধ্যে ঘুরাফেরা করে বিকেলেই শহরের বাইরে চলে গিয়েছিল। রাতে যখন শহরবাসী ঘুমের কোলে অচেতন, তখন এরা শহরের বাইরে এক নির্জন জায়গায় একত্রিত হয়ে উদ্দিষ্ট বাস্তবায়নে জীবনবাজী রাখতে হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার করছে। পরস্পরে মুসাফা ও কোলাকোলি করে শেষবারের মতো এরা সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে– হয় কার্যোদ্ধার নয়তো মৃত্যু– এই ছিল তাদের প্রতিজ্ঞা। এদের পরস্পরের আবার দেখা হবে এ প্রত্যাশা মন থেকে বিদায় করে দিয়েছিল গোয়েন্দারা। আবার জীবিত দেশে ফিরে যাওয়ার আশা এরা ত্যাগ করেই নেমেছিল এই কঠিন যুদ্ধে। নিরাপদ দূরত্বে ঘোড়া বেঁধে রেখে বিভিন্ন দিক থেকে দু'জন দু'জন করে তাঁবুর দিকে অগ্রসর হল। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল একটি করে পানিবহনের কৌটা। সাধারণ মুসাফির যেসব পাত্রে পানি বহন করে এরা এগুলোতে জ্বালানী নিয়ে এসেছে। সাথে রেখেছে দ্রুত আগুন জ্বালানোর সরঞ্জাম।

তাঁবুর বাইরে প্রহরীদের প্রতি তাদের সতর্ক দৃষ্টি। এক জায়গা দিয়ে দু'প্রহরী কিছু দূর চলে গেলে এই সুযোগে দু'জন ক্রোলিং করে মাটির সাথে শরীর মিশিয়ে দ্রুত দুটি তাঁবুর মাঝখানে গিয়ে থেমে গেল। কৌটা খুলে তাঁবুতে তেল ছিটিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। কিন্তু এখানে পৌছার আগেই আরো চার-পাঁচ জায়গায় আগুন জ্বলে উঠল। চার জানবাজ মালভর্তি গরুর গাড়ীতে জ্বালানী তেল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। প্রহরীরা হঠাৎ কয়েক জায়গায় একই সাথে আগুন জ্বলে উঠতে দেখে কোনটা রেখে কোনটা নিভাবে দিশা পাচ্ছিল না। দ্রুত তাঁবুর ভেতরের লোকেরা আগুন নিভাতে বেরিয়ে আসল। কিন্তু এর আগেই গজনীর গোয়েন্দারা চিতার ন্যায় ক্ষিপ্র গতিতে অন্ধকারে হারিয়ে যায়। রাতের বাতাসে দেখতে দেখতে আগুনের লেলিহান শিখা সারা ময়দান গ্রাস করে নেয়। আগুনে আকাশ লাল হয়ে গেল। আলো ছড়িয়ে পড়ল বহুদূর পর্যন্ত।

আগুনের তাণ্ডবে ঘুমন্ত সৈন্যরা জেগে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে শুরু করল। কে কার আগে জীবন বাঁচাবে– হুড়োহুড়ি করে অনেকেই আহত হল। গোলাবারুদের ডিপোতে আগুন ধরলে বিকট শব্দে সারা মাঠ কেঁপে উঠে। বাঁধা

ঘোড়া ও গরুগুলো আগুনে দগ্ধ অর্ধদগ্ধ হয়ে চেচামেচি করছিল আর ভয়ার্ত মানুষের আর্তনাদে গোটা ময়দান বিভীষিকাময় হয়ে উঠল। শহরের সকল বাসিন্দা জেগে উঠল আগুনের আলো ও মানুষের চিৎকারে। রাজার সব সৈন্য আগুন নেভানোর জন্যে ময়দানের দিকে দৌড়াল কিন্তু ততক্ষণে দু'মাইল ব্যাসার্ধের গোটা তাঁবু ঘেরা চত্বর আগুনে গ্রাস করে ফেলেছে। তাজা গাছপালায় পর্যন্ত ধরে গেছে। আগুনের তীব্র তাপের কারণে সৈনিকদের পক্ষেও তাঁবুর দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। কর্মকর্তারা নির্দেশ দিচ্ছিল, এখনও যে সব আসবাব পত্রে আগুন ধরেনি সেগুলো বাঁচাও কিন্তু কারো পক্ষেই আগুনের বেষ্টনি ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব হচ্ছিল না।

শহরের মজলুম মুসলিম অধিবাসীরা রাজার সমর সরঞ্জামে আগুন লাগায় স্বস্তিবোধ করছিল। কিন্তু হিন্দুরা এটাকে অগ্নিদেবতার অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ হিসেবে চিহ্নিত করে আহাজারি আর মাতম শুরু করে দিল। মন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠল। বড় পণ্ডিত সরস্বতির সামনে দু'হাত জোড় করে কাকুতি মিনতি শুরু করল। সব হিন্দু কিশোরী মহিলা মন্দিরে জমায়েত হয়ে ভজনা গাইতে লাগল। আর সকল পুরুষ বাসিন্দাদের সৈন্যরা হাঁকিয়ে নিয়ে গেল কুয়া থেকে পানি তুলে আগুন নেভানোর জন্যে। ঘোড়ার গাড়ী দিয়ে দূরের পুকুর ও নদী থেকে বড় মটকায় করে পানি এনে আগুন নেভানো তো দূরে থাক আধা মাইল দূর পর্যন্ত মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকাও সম্ভব ছিল না।

"সকল প্রহরীকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে ফেল।" বলল রাজা। রাজা জয়পাল সর্বগ্রাসী আগুনে সকল যুদ্ধ সরঞ্জাম পুড়তে দেখে দিশেহারা হয়ে যায়। রাজা চিৎকার, চেচামেচি করে আগুনের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরছিল আর অশ্রাব্য গালিগালাজ করছিল। রাজার ভয়ে তার উজীর, নাজির ও জেনারেলরাও শহরবাসী ও সাধারণ সৈনিকদের গালিগালাজ করছিল আর কঠিন ভাষায় কাজের নির্দেশ দিচ্ছিল। রাজা যে ঘোড়ায় সওয়ার ছিল কাকতালীয়ভাবে সেই ঘোড়াটিও বিকট আওয়াজে হ্রেষারব করছিল।

অনেক চেষ্টায় সামান্য কিছু সরঞ্জাম রক্ষা করা সম্ভব হয়। অসহায়ের মতো এক পর্যায়ে রাজা, মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা দূরে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে নির্বাক তাকিয়ে রইল।

"কিভাবে আগুন লেগেছে তা বলা কঠিন।" বলল রাজা। "যতো প্রহরী কাজে নিয়োজিত ছিল ওদের সবাইকে কয়েদখানায় পা উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখ। যদি কেউ আগুন সম্পর্কে সত্য তথ্য দেয় তবে তাকে মুক্তি দিবে, অন্যথায় তাদের

এভাবেই ঝুলিয়ে রাখবে। আর আগামী পনের দিনের মধ্যে পুড়ে যাওয়া সকল সরঞ্জামের ঘাটতি পূরণ করতে হবে। আমাকে শীঘ্রই গজনী আক্রমণ করতে হবে। সুবক্তগীনের মৃত্যুর পরই দ্রুত গজনী আক্রমণ করা উচিত ছিল। এখন যত দেরী হবে তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ততই প্রস্তুতির সময় পাবে।"

"এটা নিশ্চয়ই মুসলমানদের অপকর্ম।" বলল উজির উদয় শংকর। "মহারাজের কি স্মরণ নেই দু'কয়েদী যে পালিয়ে গেছে। হতে পারে ওরাই এই সর্বনাশের হোতা।"

"মুসলমানদের ঘরে ঘরে তল্লাশী কর। এদের ঘরে নগদ টাকা-পয়সা, স্বর্ণ রূপা আর খাদ্যদ্রব্য যা পাবে সব নিয়ে আসবে। কোন মুসলমানের প্রতি সন্দেহ হলে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো। কিন্তু আমার মনে হয় না তারা এমন অপকর্মের দুঃসাহস দেখিয়েছে।" কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল রাজা।

"এই অস্পৃশ্য জাতি এর চেয়েও জঘন্য কাজ করতে পারে।" বলল এক জেনারেল।

মহারাজ! আপনি গজনীর বন্দীদের কাছ থেকে বিজয়ের যে রহস্য উদঘাটন করছিলেন, আসলে এদের রহস্য এমনই। এদের দুঃসাহস আপনি ধারণাও করতে পারবেন না। আমাদেরকে এদের দুঃসাহসের চরম শিক্ষা দিতে হবে। অবশ্য আমি এ দুর্বলতা স্বীকার করছি যে, আমাদের সৈনিকদের মনে এমন সাহস নেই। একথাও ঠিক যে, আমাদের যে সব সেনা সদস্য গজনী থেকে পালিয়ে এসেছে এদের মনে এখনও মুসলিম সৈন্যদের আতঙ্ক বিরাজ করছে।

"তোমাদের সৈন্যদের বল, এ লড়াই আমাদের দেবতা ও মুসলমানদের পয়গম্বরের মর্যাদা রক্ষার লড়াই।" বলল রাজা। "বলে দাও, এ লড়াইয়ে যদি কোন হিন্দু নিহত হয় তবে পরজনমে সে সুন্দর পাখি হয়ে পুনর্জন্ম লাভ করবে। উন্মুক্ত আকাশে আর সাজানে বাগানো সে মন মাতানো গান গেয়ে মাতিয়ে রাখবে।"

রাজা জয়পালের মাথা বিগড়ে দিয়েছিল পণ্ডিতেরা। তাই পণ্ডিতদের যাদুকরী প্রভাবে রাজা বাস্তবতা ভুলে ওদের মতোই দেবদেবীর অলীক শক্তি ও বিশ্বাসে আকাঙ্ক্ষা পূরণের ও ব্যর্থতার গ্লানি মুছে ফেলার স্বপ্নে উন্মাদ ছিল।

রাজা বলল, "তোমারা জান না, দেবী আমাদের উপর রুষ্ট হওয়ার কারণেই এসব হচ্ছে। আর পনের দিনের মধ্যেই দেবীর জন্যে কুমারী বলীদান করা হবে। তখন সব কিছুই স্বাভাবিক হয়ে যাবে।"

"মহারাজ! আমার কথা আপনার ভাল নাও লাগতে পারে। এজন্য আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।" বলল জেনারেল। "একটি অবলা কুমারীকে বলী দিয়ে বিজয় অর্জন সম্ভব নয়। বিজয়ের জন্যে আমাদের প্রত্যেকটি সৈনিককে জীবন বলীদানের অঙ্গীকার করতে হবে। এমনকি আমার আপনার জীবনও জাতির জন্যে উৎসর্গ করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে এমন সন্তানের সংখ্যা না বাড়বে ততদিন পর্যন্ত বিজয়ের মুখ দেখা স্বপ্নই থেকে যাবে। যারা আমাদের সেনাবাহিনীর এক বছরের রসদ এক রাতে ধ্বংস করে দিয়েছে এরা কতটুকু জাতির জন্যে নিবেদিত প্রাণ তা আমাদের অনুধাবন করতে হবে"।

"তোমার কি দৃঢ় বিশ্বাস, এই আগুন মুসলমানরা লাগিয়েছে?" জেনারেলের প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দিল রাজা।

"জী হ্যাঁ মহারাজা! জবাব দিল জেনারেল। আমি সেনাপতি। একজন সৈনিকের পরাজয় আমারই পরাজয়। আমি বাস্তববাদী। বাস্তবতাকে যাচাই করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা আমার কর্তব্য। কোন সেনাপতি ধারণা আর অন্ধবিশ্বাসে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে না। আমি ভৌতিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে যুদ্ধনীতি গ্রহণ করলে আপনার রাজমহল মসজিদে পরিণত হবে আর আপনার রাজত্ব অল্প দিনের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

আমি আপনাকে বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত করছি। এটাই সত্য, আগুন মুসলমানরাই লাগিয়েছে। আমি নিরীক্ষা করে দেখেছি, আগুন এক জায়গায় লাগেনি। একই সাথে দশ পনের জায়গায় আগুন জ্বলে উঠে। যদি প্রহরীদের ভুলের কারণে আগুনের সূত্রপাত ঘটত তাহলে আগুন এক জায়গা থেকে জ্বলতো, একই সাথে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় জ্বলতো না। এক জায়গায় থেকে আগুনের সূত্রপাত হলে প্রহরীরা আগুন নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম হতো।"

"তার মানে কি এখানে আগুন দেয়ার জন্যে গজনী থেকে সৈন্য এসেছিল? না শহরের সব মুসলমান এসে দশ পনের জায়গা আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে?" ঝাঁঝালো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রাজা।

"একথা আমি হলফ করে বলতে পারি, এ আগুন শহরের মুসলমানরা লাগায়নি। গজনী থেকেও আগুন লাগাতে সৈন্য আসেনি। তবে যারাই আগুন লাগিয়ে থাকুক, এদের সংখ্যা কুড়ি পঁচিশ জনের বেশি ছিল না। আর এরা শুধু আগুন জ্বালাতে আসেনি, নিজেরাও জ্বলতে এসেছিল। এ ধরনের কাজ যারা করে এরা এমনই দুঃসাহসী হয়ে থাকে।

আমরা এদের পাকড়াও করে জীবিত জ্বালিয়ে দিলে কি হবে? এদের জায়গা আরো একশ' জনে পুরো করে ফেলবে। আমাদেরকে এদের বুকের আগুন নিভাতে হবে। আর এ আগুন হলো তাদের ঈমান ও বিশ্বাসের আগুন। গাছের পাতা ঝরে পড়লে গাছ মরে না, গাছের শিকড় কেটে দিতে হয়।

আগুন জ্বেলে আগুন নেভানো যাবে না। আগুন নেভাতে হলে পানি ঢালতে হবে। আপনাকে আগুনের মতো তপ্ত মাথায় নয় ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে পানি ঢালার ব্যবস্থা করতে হবে।" বলল উজির উদয় শংকর।

এখানকার মুসলমানদের উপর জুলুম করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এখানকার মুসলিম নেতাদের পুরস্কার-উপঢৌকন দিয়ে বাগে আনতে হবে। তাদের ইজ্জত-ইকরামের রাতের দরবার ও সুরা-গানের আসরে দাওয়াত করে মদ-সুরা ও নারীর সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করে ঈমানের জ্যোতি হৃদয় থেকে নিভিয়ে দিতে হবে। অতীতের কথা আমার মনে পড়ে। মুহাম্মদ বিন কাসিম ভারতের পশ্চিম-উত্তর প্রান্তে ইসলামের বীজ বপন করেছিলেন। তার আগমনে ভারতের অসংখ্যা হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে আমাদের দেব-দেবীদের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসে। বিন কাসিমের অবর্তমানে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে পদানত করতে চেষ্টা করেছে। পক্ষান্তরে বিন কাসিমের অনুসারীরা কৌশল প্রয়োগ করে তাদের সংস্কৃতিতে আমাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে। দেখা গেছে, সাংস্কৃতিক কৌশলটাই শক্তি প্রয়োগের চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে। অভিজ্ঞতা বলছে, মদ, নারী, আর ভোগ-বিলাসিতা মুসলিম নেতৃবর্গকে না প্রকৃত মুসলিম থাকতে দিয়েছে না হিন্দুয় রূপান্তরিত করেছে।

এক পর্যায়ে মুসলমানদের ইমলাম মসজিদের চার দেয়ালে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে গেছে। এদের শারীরিকভাবে শাস্তি দিয়ে বাগে আনা যাবে না। আত্মিকভাবে এদের হত্যা করতে হবে। প্রেম, মহব্বত ও ধোঁকা দিয়ে এদের সংস্কৃতি বিকৃত করে দিতে হবে।এদের হৃদয়ের ক্যানভাসে আঁকতে হবে আমাদের ভোগবাদী সংস্কৃতির রঙিন ছবি"।

"রাজা জয়পাল আগুনের দিকে তাকিয়ে হতাশ ও ভগ্ন হৃদয়ে কথা বলছিল। জয়পালের গজনী অভিযান কিছু দিনের জন্যে মূলতবি হয়ে গেল। গজনীবাসীরা সেনা অভিযান ছাড়াই সফল আক্রমণ করে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করে ফেলেছিল। অগ্নিকাণ্ডের উপস্থিত সুফল পাওয়া গেল। রাজার স্মৃতি থেকে কয়েদী কাসেম ও নিজামের ফেরার হওয়ার ব্যাপারটি হারিয়ে গেল।

এদিকে ঋষিকে পণ্ডিতেরা বলীদানের জন্য প্রস্তুত করতে পাহাড়ের উপর স্থাপিত মন্দিরে নিয়ে যায়। পাহাড়ের উপরের মন্দিরটিতে কোন স্থাপত্য নেই। অনেক আগে রাভী নদীর গতিধারা ভিন্ন ছিল। নদীর কূল ঘেঁষেই ছিল ঘন বন-জঙ্গল আর উঁচু উঁচু টিলার সমাহার। বর্তমানে যেটি বুড়ী নদী সেটিই আগে রাভী নদী ছিল। অসংখ্য পাহাড় ও টিলায় ঘেরা জায়গাটির মাটি পিচ্ছিল ও আগুনে পোড়ানো ইটের মতো শক্ত। জয়পালের আগের কোন রাজার আমলে হিন্দু কারিগররা টিলাগুলোকে কেটে চারদিকে দেয়ালের মতো করে গড়ে তোলে। তারা পাহাড় কেটে ভেতরে বালাখানার মতো অনেক কুঠরী বানায় এবং এসবের দেয়ালে দেবদেবীদের মূর্তি অংকন করে। পাথর কেটে মূর্তির অবয়ব তৈরি করে গোটা এলাকাটিকে মন্দিরে রূপান্তরিত করে ফেলে।

বাইরে থেকে কোন মানুষ সেখানে গিয়ে বুঝতেই পারতো না যে, এটি কি প্রকৃতই পাহাড় কেটে বানানো হয়েছে, না মোটা দেয়াল তুলে ঐ মন্দির তৈরি করা হয়েছে।

ওখানে সাধু সন্ন্যাসী ও মন্দিরের পণ্ডিত ছাড়া সাধারণের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। জায়গাটি যেমন দুর্গম, পথও ছিল জটিল। একটু পর পরই রাস্তার বাঁক ছিল এবং এক একটি রাস্তা কিছুদূর গিয়ে শেষ হয়ে যেতো। অভিজ্ঞতা ও জ্ঞাত লোকছাড়া ওখানে কারো সাধ্য ছিল না যাওয়া এবং বেরিয়ে আসা। তা ছাড়া সাধারণ কোন পূজা অর্চনা ওখানে হতো না। শুধু বলীদান অনুষ্ঠানগুলো লিরার মন্দিরে সম্পাদিত হতো। জায়গাটি যেমন ছিল ভয়াল তদ্রূপ দুর্গম। পণ্ডিতেরা ছাড়া ওদিকটা মাড়োনোর সাহস করতো না কেউ। সবাই বিশ্বাস করত, ওখনটায় দেবদেবী ও ভূত-পেত্নীর আবাসস্থল। এজন্যই ওখানে বলীদানপর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

জয়পালের পর সুলতান মাহমূদ যখন ভারত অভিযান শুরু করেন তখন আল্লাহর অপার কৃপায় বুড়ী নদীর গতিপথ বদলে যায় এবং অসংখ্য কুমারী ও নারীর সম্ভ্রমহানী ও রক্তে রঞ্জিত টিলার মন্দিরের দেবদেবীর চিহ্নও নদীর পানি ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। নদীর অব্যাহত ভাঙ্গনে টিলার অস্তিত্বই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বর্তমানে হিন্দুদের ইতিহাসে আর মুখে মুখেই শুধু সেই মন্দিরের কথা শোনা যায়। বাস্তবে ওখানে এখন টিলা ও মন্দিরের কোন নামগন্ধও নেই।

যে রাতে গজনীর গোয়েন্দা শার্দুলেরা জয়পালের যুদ্ধ সরঞ্জামে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল সে দিন বিকেলেই তাদের দু'জন ইমরানকে তাদের আগমনের ও অপারেশনের কথা জানাতে হাজির হয়েছিল ইমরানের ঘরে। তারা বেরিয়ে

যাওয়ার পরই আবার গেটে কড়া নাড়ার শব্দ হল। ইমরান গেট খুলে দিতেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো জামিলা। ইমরান গেট বন্ধ করে রাগতস্বরে জামিলাকে বলল– "আমার ঘরে আসতে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তারপরও আসলে কেন?

জবাব না দিয়ে তার পার জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠল জামিলা। কান্নাজড়িতকণ্ঠে বলল, "আমাকে পাপ থেকে বাঁচাও ইমরান। আমি ঘুমাতে পারি না। আমার চোখের সামনে সব সময় দৈত্যের মতো কি যেন এসে ভয় দেখাতে থাকে। ইমরান! তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

গভীর রাত। ইমরান জামিলাকে ঘরে নিয়ে যেতে দ্বিধা করছিল । কারণ, ঘরে কাসেম নিজাম অবস্থান করছে। জামিলাকে সে তাদের অবস্থান জানতে দিতে চায় না আর ওদেরকেও এটা বুঝতে দিতে চায় না যে, সে গোয়েন্দা কর্ম ছেড়ে নারী নিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে। জামিলার সাথে সে কথা বলতেই প্রস্তুত ছিল না কিন্তু ওর অবস্থান এতই বিপর্যস্ত ছিল যে, তাকে আর ধমকানো উচিত মনে করলো না ইমরান।

"দেও-দৈত্যের কথা কি বলছ! ওসব কিছুই না। তোমার অপরাধই ডাইনী হয়ে তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে।"

"না ইমরান! ঋষি আমার চোখে ভাসতে থাকে। আমি চোখ বন্ধ করতে পারি না। ওর চিৎকার আমার আত্মা কেঁপে ওঠে। চল ইমরান, ঘরে বসে কথা বলি।"

"না, ঘরে যাওয়া যাবে না। যা বলার এখানেই বল। আমার পাশে এসে দাঁড়াও।"

"আমি দাঁড়াতে পারছি না। আমার শরীর অবশ হয়ে আসছে। আমাকে বাঁচাও ইমরান। এত নিষ্ঠুর হয়ো না।"

জামিলার কাছে মেঝেতে বসল ইমরান। জামিলা তার শরীর ঘেঁষে বসল। সে ভয়ে কাঁপছে।

"আমি চোখ বন্ধ করলেই ঋষি চিৎকার করে আমাকে জাগিয়ে দেয়। ও আমাকে অভিশাপ দিতে থাকে, ভয়ে আমার আত্মা কেঁপে উঠে। আমি কিছুই বলতে পারি না। অন্ধকারেও আমি ঋষিকে দেখি। তবে সেটি সুন্দর ঋষি নয়, ইয়া লম্বা লম্বা দাঁত, বিরাট নখ আর কাঁটাভরা শরীর নিয়ে দৈত্যের মতো আমার দিকে তেড়ে আসে। কিন্তু কাছে এস বাতাসে মিলিয়ে যায়। গতরাতে এ দৈত্য

থেকে বাঁচার জন্যে আমি ঘরের একোণে ওকোণে দৌড়াদৌড়ি করে কাটিয়েছি। সারাটা দিন আমি ঘুমাতে পারিনি। দিনের বেলায় ওকে দেখতে না পেলেও ওর চিৎকার শুনতে পাই। আমার মনে হয়, ঋষি আমার কামরাতেই লুকিয়ে আছে। কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পাই না। আমাকে মেরে ফেলবে, ইমরান! আল্লাহর দোহাই! তুমি আমাকে ঋষির প্রেতাত্মা থেকে বাঁচাও!"

বস্তুত জামিলা ছিল মজলুম তরুণী। তার মা-বাবা টাকার লোভে মোটা অংকের পণ নিয়ে জামিলার চেয়ে তিনগুণ বেশি বয়সের এক বুড়োর সাথে তাকে বিয়ে দেয়। অথচ জামিলা পরমা সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী ও টগবগে তারুণ্যদীপ্ত রমণী। বণিকের ঘরে সে তৃতীয় বউ। মাসান্তে সফর থেকে বাড়ি ফেরা বণিকের ক্ষণিকের বিনোদন সঙ্গীনীমাত্র। জীবনের স্বাদ ও যৌবনের আহ্লাদ থেকে সে বঞ্চিতা, নিপীড়িতা। তাই তার হৃদয়ে এই অনাচার ও অতৃপ্তির যন্ত্রণায় জ্বলে ওঠে প্রতিশোধের সর্বনাশা আগুন। এই প্রতিশোধ বিত্তের বিরুদ্ধে বিকৃতির বিরুদ্ধে, সর্বোপরি অসচেতন বাবা-মার আত্মমর্যাদাহীনতার বিরুদ্ধে।

জামিলা যখন বাড়ির বারান্দা থেকে প্রতিদিন এই পথে সুদর্শন ইমরানকে যেতে দেখত আর ওর হাঁটাচলা, ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যে যে ছন্দময় ব্যঞ্জনা ফুটে উঠতো তা দেখে জামিলার হৃদয়ের বঞ্চনার হাহাকার আরো উথলে উঠতো, শুরু হতো দগ্ধ হৃদয়ে কামনার অগ্নুৎপাত।

দেখতে দেখতে ইমরানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে ইমরানের খোঁজ খবর নিয়ে তার ঠিকানা উদ্ধার করে। দৃষ্টি রাখতো ইমরানের প্রতি। একদিন ইমরানের ঘরে প্রবেশ করে পরিচিত হয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করল। ইমরান তার প্রতি আকৃষ্ট না হলেও জামিলা আশা ছাড়েনি। কিন্তু ঋষিকে ওর ঘরে আসতে দেখে জামিলা ঋষির প্রতি ইর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। ইমরানকে পাওয়ার পথে ঋষিকে কাঁটা মনে করে। তাই ঋষিকে সরিয়ে দিয়ে জামিলা ইমরানকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গিয়ে যখন দেখল, উদ্দিষ্ট অর্জন তো দূরে থাক তার জীবনই দুর্বিসহ হতে চলেছে, তাই সে এখন বিভীষিকাময় জীবন থেকে বাঁচার জন্যে ইমরানের দারস্থ হয়েছে। তবুও সে আশাবাদী, ইমরান তাকে সাহায্যে করবে। প্রয়োজনে সে কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে। ইমরানের সব কথা মেনে নিবে।

মূলত জামিলা দুশ্চরিত্রা ছিল না। কিন্তু ইমরানের প্রেম প্রত্যাখ্যান ও তাকে না পাওয়ার অশঙ্কা তাকে ভয়াবহ অপরাধের পথে ঠেলে দেয়। সে মন্দিরের বড় পণ্ডিতকে থলেভর্তি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ঋষিকে বলীদানে প্ররোচিত করে এখন বিবেকের দংশনে ভুগছে। সে নিজেকে ঋষির ঘাতক ভাবছে। তার সরলমন এই

মহাপাপ থেকে মুক্তি চাচ্ছে। তাই ইমরানের পায়ে ধরে এর প্রতিকার ভিক্ষা করছে জামিলা।

"গত রাতে তোমাকে আমি বলেছিলাম, পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, নইলে পাপের আগুনে তুমি জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।" বলল ইমরান। "এখনও ঋষি জীবিত। যে দিন তাকে হত্যা করা হবে সেদিন থেকে ওর প্রেতাত্মা তোমার ঘাড়ে সওয়ার হবে। যতদিন তুমি জীবিত থাকবে ওর প্রেতাত্মা তোমাকে তাড়াতে থাকবে। তুমি রাতে ঘুমাতে পারবে না, পাগল হয়ে যাবে, নয় তো আত্মহত্যা করবে। অথবা রাস্তাঘাটে, হাটে-বাজারে ভূতে পাওয়া মানুষের মতো চিৎকার চেচামেচি করবে। মানুষ তোমাকে দেখে ভয়ে পালাবে। লোকালয় থেকে তাড়িয়ে দিবে।"

"জামিলা ভয়ে জড়সড় হয়ে ইমরানের শরীরের সাথে মিশে যেতে চাইল। কাঁপছে থরথর করে। কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, বল, এখন আমাকে কি করতে হবে! আর এক রাত এভাবে কাটালে আমি পাগল হয়ে যাবো।'

"ঋষিকে পণ্ডিতদের কব্জা থেকে মুক্ত করে দাও।" বলল ইমরান। সে ইতিমধ্যে ভেবে নিয়েছে, জামিলা ঋষিকে মুক্ত করার ব্যাপারে কাজে লাগতে পারে।

"আমি কিভাবে ওকে মুক্ত করবো?"

"সে কাজ আমি করব। তুমি শুধু আমার সহযোগিতা করবে। এতেই তোমার মুক্তি। ঋষি খুন হলে সে দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবে কিন্তু তোমার যে কী ভয়াবহ অবস্থা হবে সে কথা তোমাকে আমি বলেছি।"

"তুমি যা-ই বল আমি তা-ই করব।"

"উঠ! ভেতরে চল।" ইমরান জামিলাকে ভেতরে নিয়ে গেল। ইমরান জামিলাকে অন্য একটি কামরায় বসাল। কাসেম ও নিজামের কামরায় একে নেয়া উচিত মনে করেনি। ঘরে বাতি জ্বালিয়ে ইমরান জামিলাকে বলল, "একাকী একটু বসো, ভয় নেই। এখানে ঋষির প্রেতাত্মা আসবে না।"

কাসেম ও নিজামের ঘরে গিয়ে ইমরান জামিলা ও ঋষির ঘটনা জানিয়ে বলল, সে ঋষিকে মুক্ত করতে জামিলাকে ব্যবহার করতে যাচ্ছে।

"মনে হচ্ছে তুমি আমাদের ফেরার করিয়ে এখানে এনে আরেক মুসিবতে ফেলে দিলে। তুমি এখানে প্রেম-প্রীতি নিয়ে মেয়েত থাকো, আমরা নিজেরাই বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।" বলল নিজাম।

"আমি ইশ্‌ক ও প্রেম-প্রিয়ার ফাঁদে আটকাবো না। আগেই আমি তোমাদের বলছি, ঐসব কূচক্রী পণ্ডিতদের আমি জানিয়ে দিতে চাই, ওদের কাদা মাটির তৈরি মূর্তিগুলো মুসলমানদের কোনই ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। আমি ওদের আখড়া থেকে ঘোড়ার ব্যবস্থা করে ছিনিয়ে এনে এদের বুঝিয়ে দেবো, কাদের ধর্ম সত্য। আমি ঘোড়ার ব্যবস্থা করে রেখেছি। আজ রাতেই যদি আমি মেয়েটিকে মুক্ত করতে পারি তবে আর এখানে ফিরে আসব না। তোমাদেরকেও সাথে নিয়ে যাবো এবং ওখান থেকেই গজনী রওয়ানা হবো।" বলল ইমরান।

"তুমি কি ভেবেছো?" বলল কাসেম বলখী। "কিসের ভিত্তিতে এতো দৃঢ়তার সাথে বলছো যে মেয়েটিকে তুমি মুক্ত করতে পারবে?"

ইমরান তার পরিকল্পনার কথা সব খুলে বলল কাসেম ও নিজামকে। ইমরানের পরিকল্পনা শুনে উভয়েই সম্মত হল। এরপর তিনজন পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত অপারেশনের ফয়সালা করে ফেলল। এদের এ ঘরে রেখে ইমরান জামিলার কামরায় গেল।

"এখানে কি ঋষির প্রেতাত্মা দেখা যায়"? জামিলাকে জিজ্ঞেস করল ইমরান।

"না! কিন্তু ভয় লাগে।"

"তুমি পণ্ডিতদের কব্জা থেকে ঋষিকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছো, এজন্য ওর প্রেতাত্মা আর তোমাকে ভয় দেখাবে না। ঋষি মুক্ত হয়ে গেলে তোমার পেরেশানীও থাকবে না।"

"আমাকে তো বলবে, কি করতে হবে আমার?" অনুযোগের সুরে বলল জামিলা।

"তোমাকে আমি একথাও বলে দিচ্ছি, যদি সফল হও, তবে আর এ বাড়িতে তোমাকে ফিরে আসতে হবে না।" বলল ইমরান। "আমার সাথে তোমাকে গজনী নিয়ে যাব।"

"সত্য বলছো!" হতাশার সাগরে আশার ঝিলিক দেখে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল জামিলা।

"আমি কখনও কাউকে ধোঁকা দেই না। তোমাকেও ধোঁকা দেবো না।" বলল ইমরান।

"এখন তুমি পণ্ডিতের আখড়ায় যাবে। গিয়ে বলবে, তুমি ঋষিকে স্বচক্ষে দেখতে চাও। এজন্য তোমাকে টিলার মন্দিরে নিয়ে যেতে বলবে। তোমাকে

থলে ভর্তি আশরাফী দিচ্ছি, এগুলো পণ্ডিতকে দেবে। আশা করি, এসব পেয়ে পণ্ডিত রাজী হয়ে যাবে। এছাড়া ও পণ্ডিত যা দাবী করবে রাজী হয়ে যাবে। ভয় পেয়ো না। আমি তোমার পিছনেই থাকছি। তোমার কাজ শুধু পণ্ডিতকে টিলার মন্দির পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া। কারণ, সেখানে সাধু-পণ্ডিত ছাড়া সাধারণ মানুষ যাওয়ার রাস্তা জানে না। সেখানে কারো যাওয়ার অনুমতিও নেই।"

"পণ্ডিত যদি আমাকে নিয়ে যেতে রাজী না হয় তবে কি করব?"

যেতে না চাইলে তুমি ছলে বলে তাকে মন্দিরে নিয়ে আসবে। আমি তাকে মন্দির যেতে বাধ্য করব। তাও যদি না যেতে চায় তবে এটিই হবে ওর জিন্দেগীর শেষ রজনী।"

"তাহলে আমার কি হবে?" উদ্বেগ কণ্ঠে বলল জামিলা। "আমি তো বলেছি, তোমাকে আর ঐ বুড়োর ঘরে যেতে হবে না। তুমি এখন আমার জিম্মায়। মন থেকে সব সন্দেহ-সংশয় ঝেড়ে ফেলে দাও। তুমি এখনই পণ্ডিতের আখড়ায় চলে যাও। আমি পেঁচার আওয়াজে তোমাকে সংকেত দিলে পণ্ডিতকে বাইরে নিয়ে আসবে।" বলল ইমরান।

জামিলাকে আশ্বস্ত করার জন্য ইমরান তাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করল। শেষে কয়েকটি থলে ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তাকে বিদায় করল। জামিলাকে বিদায় করেই ইমরান ঋষির ভাই জগমোহনের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। জগমোহন খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘরে বসেছিল। এমনিতেই মোহনের মন পৌত্তলিক ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল। একমাত্র বোন ঋষিকে পণ্ডিতেরা দেবীর চরণতলে বলীদানের নামে হাইজ্যাক করায় পৌত্তলিক ধর্মের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠেছিল জগমোহন।

ইমরান! পণ্ডিতেরা আমার ছোট বোনটিকে বলী দিতে নিয়ে গেছে।

আমি কোন পণ্ডিতকেই জ্যান্ত ছাড়ব না। কে-উ জানবে না কে পণ্ডিতদের হত্যা করেছে।... তুমি কি করে আসলে?

"ওখানে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ইমরান। ঋষিকে তারা টিলার মন্দিরে নিয়ে গেছে। আমরা ওখানে গেলে পথ খুঁজে পাব না। পণ্ডিতেরা আমাদের ওখানে দেখলে খুন করে আমাদের মরদেহ মাটিতে পুঁতে রাখবে। ওখানে যাওয়ার চিন্তা করো না ইমরান!"

"চিন্তা আমি অনেক করেছি। তোমার মন যদি তোমাদের ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে তবে তোমাদের উচিত এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া। আমি তোমাকে আর তোমার বোনকে আমাদের সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছি।"

"ঋষি! ঋষি কোথায় এখন?" বসা থেকে লাফিয়ে উঠে ইমরানের কাছে নিয়ে আসে জগমোহন। তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। এ মুহূর্তে আমার কাছে আর কিছু জানতে চাইবে না। যদি সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে আমি না পৌঁছি তাহলে বুঝাবে. আমি আর বেঁচে নেই।"

অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল মোহনের। কিন্তু ইমরান যখন নিষেধ করল, তখন আর জিজ্ঞেস করেনি। ইমরানের উপর জগমোহনের অগাধ আস্থা। সে চারটি ঘোড়া নিয়ে রাভী নদীর পাড়ে অপেক্ষার প্রতিশ্রুতি দিল এজন্যে যে, ইমরান তার বোনকে মুক্ত করে নিয়ে আসবে। এরপর বোন-ভাই ও ইমরান এক সাথে এদেশ ছেড়ে চলে যাবে। ইমরানের ব্যাপারে সে মনের মধ্যে কোন সংশয়কে প্রশ্রয় দিল না। তার মনে পণ্ডিতদের অপকর্মের প্রতিশোধ গ্রহণে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ইমরানের কথায় মোহনের হৃদয়ে নতুন জীবনের আলোক জ্বলে উঠল।

রাতের প্রথম প্রহরেই মন্দিরের বাইরে একটি ঝোপের আড়ালে নিজাম, কাসেম ও ইমরান লুকিয়ে রইল। ওদের পাশ দিয়ে একটি ছায়ামূর্তি চলে গেল।

"আমি তোমার পাশেই আছি জ্যামিলা! তোমার কোন ভয় নেই।"

ইমরানের কণ্ঠ শুনে ছায়ামূর্তি থেমে গেল।

ইমরান এগিয়ে গেল। ইমরান জামিলাকে জানাল, সে একা নয়। তার সাথে আরো দু'জন রয়েছে। সামনে কি ঘটতে পারে সে ব্যাপারে ইমরান অনিশ্চিত। তাই জামিলার কাছ থেকে কাসেমও নিজামকে আড়াল করে রাখাটাই যৌক্তিক মনে করছে ইমরান। জামিলা চলে গেলে কিছুক্ষণ পর ইমরান সাথীদের নিয়ে এগিয়ে গেল।

"আমি বুঝতে পারছি না, এ কঠিন অপারেশনে তুমি কীভাবে সফল হবে?" ইমরানের প্রতি প্রশ্ন ছোড়ে দিল নিজাম।

"আমি যা কিছুই করছি আল্লাহর উপর ভরসা করে করছি। আমি আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে সাফল্যের দু'আ করেছি। মনে আল্লাহর রহমতের বিশ্বাস নিয়ে তাঁর নামে এ কাজে নেমেছি। আমি যদি সত্য পথে থাকি তবে আমার বিশ্বাস, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সফল করবেনই।"

রাতের অন্ধকারে মন্দিরটাকে একটা বড় ভূতের মতো দেখাচ্ছিল। জামিলাকে সাহস দেয়ার জন্য একটু পর পর জোরে কাশি দিচ্ছিল ইমরান। পণ্ডিতের ঘর থেকে জানালার ফাঁক দিয়ে আলো দেখতে পেল ইমরান। জামিলা

মন্দিরে প্রবেশ করে পণ্ডিতের ঘরের দরজায় কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। পরক্ষণেই বন্ধ হয়ে গেল। ইমরান দেখতে পেল, জামিলা ঘরে ঢুকেছে।

সাথীদের নিয়ে আরো এগিয়ে গেল ইমরান। মন্দিরের কাছে গিয়ে সাথীদের একটি গাছের আড়ালে দাঁড় করিয়ে সে বিড়ালের মতো পা টিপে টিপে পণ্ডিতের দরজার কাছে চলে গেল। দরজার ফাঁক গলিয়ে সামান্য আলো বাইরে পড়েছে। মাত্র তিন চারটি সিঁড়ি দূরে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি বুঝে সে আরো সতর্ক পায়ে সিঁড়ি মাড়িয়ে এক্কেবারে দরজার সাথে মিশে দাঁড়াল।

"আমি বুঝতে পারছি না, তুমি ছোট্ট শিশুর মতো মেয়েটিকে দেখার জেদ ধরেছো কেন? ওখানে কোন হিন্দুও যেতে পারে না, আর তুমি তো মুসলমান!" বলল পণ্ডিত।

"আমি এই প্রেতাত্মাটাকে শেষবারের মতো এক নজর দেখতে চাই। দূর থেকে দেখেই চলে আসব।"

"আমার অবশ্য আজ রাতে ওদিকে যাওয়ার কথা আছে। তবে আমি যাবো রাতের দ্বিপ্রহরে। তুমি কি এতোক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে?"

"এখনই একটু চলুন না।" অনুনয়ের সুরে বলল জামিলা। আপনার পাওনা আপনার সামনেই পড়ে আছে। না চাইতেই আমি আপনার ধারণার চেয়েও বেশি পুরস্কার দিয়েছি। আমি জানি, আপনারা কুমারী বলীদানের নামে যা করছেন সবই প্রতারণা। আমি ইচ্ছে করলে এখন আপনার ভণ্ডামীর মুখোশ জনসমক্ষে উন্মোচন করে দিতে পারি। আমি আপনার জালে আটকা পড়িনি, এখন আপনি আমার জালে আটকা। আমার এতটুকু আশা আপনি পূর্ণ না করতে পারলে, বলতে পারি না, আপনার ভবিষ্যত পরিণতি কি হবে।"

জামিলা পণ্ডিতকে যাদুকরের মতো প্রভাবিত করে ফেলেছিল। একেতো ছিল থলে ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা আর অপরদিকে জামিলার হুমকির ভূমিকাও কম ছিল না।

একটু পরই পণ্ডিত আড়মোড়া ভেংগে বসল।

"আমি তোমাকে দূর থেকে দেখিয়েই চলে আসব, চল।" পণ্ডিতের কণ্ঠ শোনা গেল।

ইমরান সতর্ক পায়ে দরজার কাছ থেকে আড়াল হয়ে গেল। পণ্ডিত ও জামিলা কামরা থেকে বের হল। দরজা বন্ধ করে পণ্ডিত হাঁটতে লাগল। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ইমরান সাথীদের নিয়ে পণ্ডিতের পিছু পিছু অগ্রসর হল। এলাকাটি ছিল অনাবাদী ও জঙ্গলাকীর্ণ। ইমরানের আশঙ্কা হল, পণ্ডিত হয়তো।

তাদের হাঁটার শব্দ শুনে ফেলবে। কারণ, শুকনো পাতা আর লতাগুল্মে ভরা উঁচু নীচু পথে পা ফেলতেই শব্দ হচ্ছিল। কিন্তু কোন কিছুর প্রতি লক্ষ্য ছিল না পণ্ডিতের। সে জামিলাকে জড়িয়ে ধরে নানা কেলি করতে করতে মন্দিরের দিকে যাচ্ছিল। জগতের অন্য কিছুর খেয়ালই ছিল না পণ্ডিতের।

কিছুক্ষণ পর উঁচু নীচু পাহাড়সম টিলায় চলে এলো তারা। জামিলা ও পণ্ডিত দু'টি টিলার মাঝখান দিয়ে যেতে লাগল। ওদের অনুসরণ করে ইমরানও সাথীদের নিয়ে টিলার মাঝপথে ঢুকে পড়ল। কিন্তু সমস্যা হলো, কিছুক্ষণ পরপরই পথ বাঁক নিয়েছে। ঘন অন্ধকার। কোন দিকে বাঁক নিতে হবে তা অনুমান করা মুশকিল। জামিলা ও পণ্ডিতের আওয়াজ অনুসরণ করে অগ্রসর হচ্ছিল ইমরান। তবুও তারা পথ ভুল করে বসল। এরই মধ্যে দু'টি সুড়ং অতিক্রম করে এসেছে তারা। অল্পক্ষণ অগ্রসর হওয়ার পরই তারা বহু নারী কণ্ঠের কোরাস শুনতে পেল। পণ্ডিত ছাড়া একা এলে হয়তো প্রেতাত্মাদের গান মনে করে ভয়ে তারা ফিরে যেতো। তবে ইমরান পণ্ডিতদের স্বভাব সম্পর্কে জানতো। এ জন্য তার কাছে এ নারী কণ্ঠের আওয়াজ অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি।

সামনে রাস্তা এতো জটিল হয়ে উঠল যে, ইমরান ও তার সাথীদের পক্ষে জামিলা ও পণ্ডিতের অনুসরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ইমরান শঙ্কিত হলো, তারা পথ হারিয়ে ফেলতে পারে। কাজেই পণ্ডিত ও তাদের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনতে তার একটু দ্রুত পায়ে হাঁটল। কিন্তু বিধি বাম। পায়ের আওয়াজ পেয়ে থমকে গেল পণ্ডিত। কে পিছনে? পণ্ডিত কয়েক কদম পিছিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল। এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে কাউকে দেখতে পেল না পণ্ডিত। ইমরান খাপ থেকে খঞ্জর বের করে পণ্ডিতের বুকে ঠেকিয়ে দিল।

"এখানেই দাঁড়াও। একটুও নড়বে না। খুন হবে, না আমাদেরকে ছিনিয়ে আনা মেয়েটির কাছে নিয়ে যাবে? এই মুসলিম মহিলার কাছ থেকে যে মূল্য তুমি নিয়েছো তা আমি জানি। আজও ওর কাছ থেকে যে থলে ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা তুমি নিয়েছ তাও আমরা দেখেছি। জীবিত থাকতে চাইলে আমাদেরকে মেয়েটির কাছে নিয়ে যাও।" ভয়ে শঙ্কায় কাঁপতে লাগল পণ্ডিত। জামিলাও এসে দাঁড়াল তাদের পাশে। পণ্ডিত কাঁপা কাঁপা আওয়াজে বলল, "জামিলা! তুমি আমাকে ধোঁকা দিলে!"

"তুমি আমার জন্য যা করেছো, আমি তার চড়া মূল্য শোধ করেছি। আমি তোমাকে মুদ্রা দিয়েছি, শরীর দিয়েছি। আজ এখানে কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত

করতে এসেছি। তুমিও তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নদাও।" পণ্ডিতের প্রতি তীর্যক ভাষায় বলল জামিলা।

আরো দু'টি খঞ্জরের আগা পণ্ডিতের শরীর স্পর্শ করল। ভয়ে হীম হয়ে গেল পণ্ডিত। সে থর থর করে কাঁপতে লাগল। টিলার উপর থেকে সম্মিলিত নারী কণ্ঠের কোরাস পাহাড় ও টিলায় প্রতিধ্বনিত হয়ে মনোমুগ্ধকর এক সুর সৃষ্টি করেছিল। মনে হচ্ছিল যেন অন্য জগত থেকে ভেসে আসছে অপার্থিব এই সুর সঙ্গীত।

"আওয়াজ অনুসরণ করে আমরাই ঋষি পর্যন্ত যেতে পারব।" পণ্ডিতের উদ্দেশে বলল ইমরান। "আমরা শুধু তিনজন নই, গোটা টিলা ঘিরে রেখেছে আমাদের লোকেরা। আমাদের কথা মতো কাজ না করলে কোন পণ্ডিতকে আমরা জ্যান্ত রাখবো না। আজ একজন একজন হত্যা করে বন্দী মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবো। তবে আমরা খুনখারাবী চাই না। আমরা এসেছি, যে মেয়েটিকে তোমরা বলী দিতে এনেছো, শুধু ওকে নিয়ে যেতে। ইচ্ছে হলে তোমাদের পাথরের তৈরি দেবদেবীদের ডাকতে পার কিন্তু ওইসব পাথরের মূর্তি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে না। চল! আমাদের তাড়া আছে।"

নিঃশব্দে আগে আগে চলল পণ্ডিত। পণ্ডিত এত ভীত হয়ে পড়েছিল যে, সে ইমরানকে বলার সাহস পাচ্ছিল না যে, তোমাদের কথা মতোই যাব কিন্তু হাতিয়ার ফেলে দাও।

ইমরান ও তার সঙ্গীদের সামনের পথ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। তারা শুধু শুনতে পাচ্ছিল মেয়েলী কণ্ঠের সঙ্গীত। পণ্ডিত কয়েকবার পথ বাঁক নিয়ে কয়েকটি সুড়ং অতিক্রম করে এসেছে। হুঁশিয়ার হয়ে গেল ইমরান। পণ্ডিত না আবার ওদের ধোঁকা দিয়ে কোথাও আড়াল হয়ে যায় আর ওর লোকেরা তাদের ঘিরে ফেলে। তাই সে খুবই সতর্কতার সাথে অগ্রসর হচ্ছিল।

পথ একটি খোলা জায়গায় এসে শেষ হয়ে গেল। দৈর্ঘ প্রস্থে ৫০ × ৪০ হাত হবে। এর পরই পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে মন্দির। অনেকগুলো কামরা। দেয়ালগুলোতে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, পাথর কাটা মূর্তি। একটি শতরঞ্জি বিছানো। সামনে একটি বড় তশতরিতে প্রসাদ জাতীয় দ্রব্য। কুড়ি পঁচিশজন সাধু ধরনের লোক বসা। প্রত্যেকের বাহুবন্ধনে একেকটি তরুণী। তারা তরুণীদের নিয়ে হাশি-তামাশায় মত্ত। আর খোলা জায়গাটিতে দশ পনের জন তরুণী বৃত্তাকারে নেচে নেচে গীত গাইছে। এদের বৃত্তের ভেতরে বসা আরেকটি তরুণী। তাদের চারপাশে অসংখ্যা প্রদীপ জ্বলছে। সবাই অর্ধ উলঙ্গ।

থেমে গেল পণ্ডিত। সে অসহায়ভাবে তাকালো তিন মুসলমানের দিকে।

"মেয়েটিকে আমাদের হাতে তোলে দাও।" পণ্ডিতের পাঁজরে খঞ্জরের আগা স্পর্শ করে বলল ইমরান।

বড় পণ্ডিত গলা চড়িয়ে হাঁক দিল, 'থামো সবাই।'

নর্তকীরা নাচ থামিয়ে একদিকে সরে গেল। সাধুরা দাঁড়িয়ে গেল। ঋষি যেভাবে বসেছিল সেভাবেই ভাবলেশহীন বসে আছে। ইমরান ও তাঁর সাথীরা পাগড়ী দিয়ে চেহারা ঢেকে রেখেছিল। তারা দ্রুত খাপে ভরা তরবারী কোষমুক্ত করল। বড় পণ্ডিতকে আরো এগিয়ে দু'উন্মুক্ত তরবারীর মাঝে দাঁড় করানো। ইমরান ঋষিকে ধরে উঠাল। ঋষি চোখ বড় করে তাকে দেখছিল, যেন সে তাকে চিনতে পারছে না। ইমরান তাকে ডাকল, হাতে ঝাঁকুনি দিল, কিন্তু ঋষি তার দিকে ড্যাব ড্যাব চোখে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। পরিষ্কার বোঝা গেল তাকে এমন কিছু পানাহার করানো হয়েছে যার প্রভাবে তার স্বাভাবিক স্মৃতিবোধ রহিত হয়ে গেছে।

ইমরান তাকে বগলদাবা করে রওয়ানা হল। ঋষিও কোন বিরূপতা না দেখিয়ে সহগামী হল। পিছনে ফিরে সব সাধু পণ্ডিতকে লক্ষ্য করে ইমরান বলল, "যদি কেউ জায়গা থেকে একটু নড়াচড়া কর তবে সবাইকে হত্যা করে ফেলব। তোমাদের সবাইকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে।"

"এর উপর তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব কতক্ষণ থাকবে?" বড় পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করল ইমরান।

"সকাল পর্যন্ত কেটে যাবে।" জবাব দিল বড় পণ্ডিত। "যাও, ওকে তোমরা নিয়ে যাও।"

"তোমাকেও আমাদের সাথে যেতে হবে। রাস্তা খুব জটিল। আমাদের পুরো খেয়াল নেই।" বলে বড় পণ্ডিতের ঘাড়ে তরবারীর ফলা ছোয়াল ইমরান।

"আমাদের আগে আগে চলো।"

কেনা পশুর মতো পণ্ডিতকে আগে আগে হাঁকিয়ে নিয়ে গেল ইমরান।

সে ভয়ে আতঙ্কে জড়সড়। ফেরার পথে পণ্ডিত যখন দু'পাহাড়ের সুড়ং পথে ঢুকল, তখন গোয়েন্দারা রাজার যুদ্ধ সরঞ্জামে আগুনে ধরিয়ে দিয়েছে। ইমরান ও তার সাথীরা তরবারী উন্মুক্ত করে পণ্ডিতের পিছে পিছে আসছে। জামিলাও তাদের সাথেই হাঁটছে। ঋষি অচেতনের মতো হাঁটছিল তাদেরই সাথে।

একটু সামনে এগুতে তাদের চোখে পড়ল শহরের দিকে আসমান ছোঁয়া আগুনের লেলিহান শিখা। ইমরান আগুন দেখে চিৎকার দিয়ে বলে উঠল—

"আল্লাহু আকবার।" সাথীদের বলল, "দেখ, বাঘের বাচ্চারা রাজার কোমর ভেঙে দিয়েছে। গজনী আক্রমণে প্রস্তুতি গ্রহণকারীদের আল্লাহ এখানেই পরাজিত করে দিলেন।"

"হায়! একি, আমাদের শহরে এতো আগুন! হায় ভগবান! গোটা শহর জ্বলছে!" ভয়ার্ত আওয়াজ শোনা গেল পণ্ডিতের কণ্ঠে।

"এটা আমাদের প্রভুর গযব। তোমাদের উপর আমাদের প্রভু গযব নাযিল করেছেন। তোমাদের মন্দিরগুলোকেও নারীভোগ ও বেলেল্লাপনা থেকে মুক্ত রাখনি তোমরা। এই নিরপরাধ মেয়ের আহাজারি আর তপ্ত নিঃশ্বাসে তোমাদের শহরে আগুন ধরে গেছে। তোমাদের এই কুমারী বলীদান সম্পূর্ণ ধোঁকাবাজী। আমরা জানি, কিভাবে এবং কোন মতলবে অবলা মেয়েটিকে তোমরা তুলে এনেছিলে।

তোমাকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, জীবিত ছেড়ে দেবো। তাই জীবিত ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আমরা ঋষিকে নিয়ে গেছি এটা ঘুণাক্ষরে যেন কেউ জানতে না পারে। তোমাদের রাজা এই মেয়েকে এখনও দেখেনি। এর স্থলে অন্য কোন মেয়েকে ধরে এনে বলী দিবে।

এরপরও যদি দেখি, তুমি আমাদের কথার ব্যতিক্রম কিছু করছো, তাহলে জেনে রেখো, যে আগুনের তোমাদের রাজার সব যুদ্ধ সরঞ্জাম জ্বলছে, সেই আগুন সব পণ্ডিতকেও জ্বালাবে।"

পণ্ডিত জ্বলন্ত আগুন আর মানুষের শোরগোল ও চিৎকার শোনে হতভম্ব হয়ে গেল। পণ্ডিত তার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। ইমরান দ্রুত নদীর দিকে চলল। জগমোহন ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিল তাদেরই জন্য। এক রকম দৌড়ে পৌঁছল তারা নদীর পাড়ে।

"গোটা শহর জ্বলছে। মনে হয় আমাদের বাড়িতেও আগুন লেগেছে। এ আগুন কিভাবে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল!" ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল জগমোহন।

"জ্বলতে দাও। তোমরা আর ঘরে ফিরে যাচ্ছো না। আমার সাথে যাচ্ছো। কাজেই তোমাদের নিজেদেরকে আর হিন্দু মনে করা ঠিক হবে না। আমাদের ধর্মের সত্যতা দেখ। তোমার বোনকে পণ্ডিতেরা বলী দিতে নিয়ে গিয়েছিল, আমি দু'আ করেছিলাম, হে খোদা! আমাকে সাহায্য করুন যাতে আমি এই নিরপরাধ মেয়েটিকে উদ্ধার করতে পারি। তিনি আমার দুআ কবুল করেছেন। আমাদের মা'বুদই সত্য। দেখ রাজার সব যুদ্ধ সরঞ্জাম পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আর তোমার বোন- যার বলী হওয়ার কথা ছিল সে এখন আমাদের সাথে দাঁড়িয়ে

আছে। তোমাদের অসংখ্য দেবদেবীর সামনে থেকে ওকে আমরা ছিনিয়ে এনেছি, ওরা কিছু করতে পারল?”

ঋষি! বলে মোহন বোনকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু ঋষি মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হল না। ইমরান বলল, পণ্ডিতেরা ওকে ওষুধ খাইয়ে বিগড়ে দিয়েছে। সকাল পর্যন্ত এর রেশ থাকবে। এখন আমাদের হাতে সময় নেই। বোনকে তোমার ঘোড়ায় তুলে নাও।

ঋষিকে জগমোহন আর জামিলাকে ইমরান তার ঘোড়ায় তুলে নিল। কাসেম ও নিজাম অন্য দু'টি ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা হলা গজনীর পথে। এদিকে শুরু হল রাজা ও পণ্ডিতদের নতুন চক্রান্ত।

## অভিন্ন পথের অভিযাত্রী

ভোর হল। রাজা জয়পালের সকল যুদ্ধ-সরঞ্জাম জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। দেড় মাইল এলাকা জুড়ে শুধু ছাই-ভস্ম আর আগুনের কুণ্ডলী। তখনও মানুষ বেঁচে যাওয়া পণ্যসামগ্রী রক্ষায় সচেষ্ট। এদিকে মুসলমান পাড়ায় শুরু হয়েছে হিন্দুদের সন্ত্রাস। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ আর লুটতরাজ চলছে। বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। মুসলিম নারী-পুরুষদের টেনে হেঁচড়ে ঘর থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। মহিলাদের গায়ের অলংকার কেড়ে নেয়া হচ্ছে। রাজা জয়পাল নিজেই এই নির্দেশ দিয়েছে। রাজা বলেছে, মুসলমানদের ঘরে যা পাও হাতিয়ে নাও এবং সরকারের কোষাগারে জমা কর।

রাতে ইমরান ও তার সাথীরা পণ্ডিতের কাছ থেকে ঋষিকে ছিনিয়ে নেয়ার পর ব্যর্থ পণ্ডিত শহরের দিকে রওয়ানা হলো। শহর জ্বলছে কিন্তু সে বিষয়ে পণ্ডিতের মনে বিন্দুমাত্র ভাবনা নেই। সে সোজা মন্দিরে প্রবেশ করলো এবং একটু পরই কিছুসংখ্যক লোক নিয়ে বেরিয়ে এলো। শহরের সকল মানুষ আগুনের পাশে এসে জড়ো হয়েছে। ছেলে-বুড়ো, প্রৌঢ়-যুবা, যুবতী-কিশোরী কেউ বাকি নেই। পণ্ডিত ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা এই দুরবস্থার মধ্যেও খুঁটে খুঁটে দেখছিল মেয়েদের। কারণ, ঋষির শূন্যতা তাকে পূরণ করতেই হবে। হঠাৎ একটি চেহারায় দৃষ্টি আটকে গেল পণ্ডিতের। একটি কিশোরীর প্রতি ইঙ্গিত করে দূরে সরে গেল।

একটু পরই দেখা গেল, কয়েকটি ঘোড়ার গাড়ি এসে হাজির। মন্দিরে বিশেষ গাড়ির আগমনে সসম্মানে মেয়েরা এদিক ওদিক সরে গেল। পণ্ডিতের এক লোক ঐ কিশোরীকে ধরে ফেলল, অপর একজন মেয়েটির নাকের ওপর একটি রুমাল রেখে তাকে, টেনে-হেঁচড়ে গাড়িতে তুলল। অবস্থার আকস্মিকতায় ব্যাপারটি কেউ তেমন আন্দাজ করতে পারল না। পণ্ডিতের ঈশারায় দ্রুত মেয়েটিকে নিয়ে গাড়ি পৌঁছে গেল মন্দিরে। বেলা বাড়ার আগেই তাকে টিলার মন্দিরে পৌঁছে দেয়া হল। যে টিলায় আটকে রাখা হয়েছিল ঋষিকে। কিন্তু মেয়েটি চেতনানাশক পদার্থের প্রভাবে তখনও হুঁশ ফিরে পায়নি।

পৌত্তলিকতাকে কখনো ধর্ম বলা যায় না। আজও বিবেকবান মানুষের কাছে তা কখনো ধর্ম নয়। অলীক কল্পনা, রেওয়াজ-রসম, মনুষ্য সৃষ্ট আনুষ্ঠানিকতা ও গোড়ামীর সমন্বিত রূপ পৌত্তলিকতা। কোনো উর্বর মস্তিষ্কের মতলববাজ এই অমানবিক কর্মগুলোকে ধর্ম হিসাবে আখ্যা দিয়ে বিশাল জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত করেছে। পৌত্তলিকতাবাদে আল্লাহর পবিত্র সত্তার অনুভব অসম্ভব। কথিত এ মতবাদে নিরীহ অসহায় মেয়ে এবং শিশুদের অত্যাচার-উৎপীড়ন করা হয়, বিনা অপরাধে এদের হত্যা করা হয়; ধোঁকা, প্রতারণা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ পৌত্তলিক ধর্মের মূল ভিত্তি। পৌত্তলিক ধর্মের পণ্ডিতেরা এসব অমানবিক ও অলীক অপকর্মগুলোকে ধর্মীয় বিধান বলে সমাজে চালু করেছে আর ভক্তেরা এগুলোকেই মেনে নিয়েছে ধর্মীয় বিধান হিসেবে। এরা আল্লাহ্ তাআলার অসংখ্য মূর্তি বানিয়েছে এবং প্রতিটি বড় বড় সৃষ্টির পূজা করছে ও অসংখ্য দেব-দেবীকে একেকটা মহান সৃষ্টি এবং শক্তির অধিকারী বলে প্রচার করছে। এখনও পর্যন্ত এদের মধ্যে দেখা যায়, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, সাপ-বিচ্ছু, পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি ইত্যাদির পূজা করতে।

গজনীর শার্দুল-গোয়েন্দারা যে দক্ষতায় রাজা জয়পালের যুদ্ধ সামগ্রীতে আগুন ধরিয়ে দিল জয়পালের বাহিনী তাদের বিন্দু বিসর্গও আঁচ করতে পারলো না। জয়পাল উল্টো ভাবলো, কিশোরী বলীদানে বিলম্বের কারণে দেবতা অসন্তুষ্ট হয়ে সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। অবশ্য সে একথাও বলেছিল, অসম্ভব নয় যে, এটা সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দারা করেছে। কিন্তু এ অগ্নিকাণ্ড 'দেবতার-রোষ না প্রতিপক্ষ গোয়েন্দাদের কাজ' রাজা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছিল না। হতাশা ও ব্যর্থতায় নিমজ্জিত রাজা ক্ষুব্ধকণ্ঠে সেনাপতিকে বলল, "পণ্ডিতকে ডাক। দেবতা চরম রুষ্ট হয়েছে। একটির বদলে দু'টি মেয়েকে বলী দিতে হবে,

তাড়াতাড়ি।" রাজা চেঁচিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো বলছিল, "মুসলমানদের সব ঘর জ্বালিয়ে দাও। এদের সবকিছু লুটে নাও। আর সকল মুসলমান মেয়েকে ধরে এনে আমার সামনে হাজির করো।"

সত্যিকার যারা আগুন লাগিয়েছিল এরা ছিল দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী, দূরদর্শী। জয়পালের দেবতাদের শাসন এদের উপর অচল। জয়পাল যখন অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত নিয়ে ভাবছে আর হতাশা ও মর্ম-যাতনায় ভুগছে ইত্যবসরে গোয়েন্দারা তার নাগালের বাইরে চলে গেছে।

মুহূর্তের মধ্যে কয়েকশ' মুসলমান নারী শিশুকে ধরে এনে রাজার সামনে হাজির করা হলো। এদের অধিকাংশই ছিল সম্ভ্রান্ত মুসলিম ঘরের নারী ও শিশু। বলপূর্বক এদেরকে নিজেদের হেরেম থেকে ধরে আনা হয়। রাজা চোখ বড় বড় করে অগ্নি দৃষ্টিতে মুসলিম নারী-যুবতীদের দেখছিল। রাজ্যর এই দৃষ্টিতে যেমন ছিল রোষ তেমনি ছিল পাশবিক উন্মত্ততা।

মুসলিম নারীদের মধ্য থেকে একদল সুন্দরী যুবতী-কিশোরীকে রাজার সাঙ্গ-পাঙ্গরা অন্যদের ডিঙ্গিয়ে রাজার সামনে নিয়ে গেল। রাজা এদের দেখে বলল, "তোমাদের সৌভাগ্য যে তোমরা সবাই সুন্দরী। অন্যথায় তোমাদের সাথে এমন ব্যবহার করা হত, জীবনের জন্য তোমাদের জাতি একটা শিক্ষা পেত। এখন থেকে তোমরা রাজ মহলে থাকবে। তোমাদের ধর্মকে ভুলে যেতে হবে। যেদিন তোমাদের লোকেরা এসে বলবে, অগ্নিকাণ্ড কারা ঘটিয়েছে সেদিন তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে।" একথা বলে পৈশাচিক হাসি হাসল রাজা।

"তোমাদের ধর্মের মতো আমাদের ধর্ম এমন ঠুনকো নয় যে, তোমাদের কথায় ভুলে যাব।" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল এক কিশোরী।

"এই মেয়ে! বকবকানি বন্ধ কর।" গর্জে উঠল এক মন্ত্রী। "জান, কার দরবারে তোমরা দাঁড়িয়ে কথা বলছ?"

"তোমাদের মহারাজ আমাদের খোদা নয়।" বলল অন্য এক কিশোরী। "অসহায়, নিরপরাধ মেয়েদের উপর যে রাজা হাত উঠাতে পারে তাকে কোন মুসলিম নারী সম্মান করতে পারে না। মহারাজা! তুমি মনে রেখো, তোমার যাবতীয় জুলুম-অত্যাচার আমরা হাসি মুখেই বরণ করব। কিন্তু তোমার পরিণতি হবে ভয়াবহ। তোমাকে মৃত নয় জীবন্ত জ্বলতে হবে। তোমার কোন দেবতাই তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। ইতোমধ্যে তুমি দু'বার পরাজিত হয়েছো। একটি নয় হাজার কিশোরীকে দেবীর চরণে বলীদান করলেও তোমার পরাজয়

বিজয়ে রূপান্তরিত হবে না। পরাজয় তোমার বিধিলিপি। তুমি আমাদের শাস্তি দিলে এরচেয়ে শতগুণ বেশি কঠিন শাস্তি তোমাকে আমাদের প্রভু দেবেন।"

"এদের নিয়ে যাও।" নির্দেশ করল রাজা। সৈনিকেরা টেনে-হেঁচড়ে মুসলিম মেয়েদেরকে বন্দিশালায় নিয়ে গেল।

* * *

সুলতান মাহমূদ খোরাসান ও বোখারাকে নিজের শাসনে নিয়ে এলেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব হলো না। সে সময় বাগদাদের খেলাফতে আসীন হন কাদের বিল্লাহ আব্বাসী। ইসলামী নীতি অনুযায়ী সকল ছোট বড় রাষ্ট্র ও রাজ্য বাগদাদ খেলাফতের অধীনস্থ। সকল রাজ্য ও রাষ্ট্রপ্রধান কেন্দ্রীয় খেলাফতের ফরমান মানতে বাধ্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসকদের দুর্নীতি, আদর্শচ্যুতি এবং আঞ্চলিক শাসকদের ভোগ-বিলাসিতা ও ক্ষমতালিপ্সা খেলাফতের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে এবং শাসকদের মাঝে সৃষ্টি করে পারস্পরিক বিদ্বেষ। তখন শুধু বাগদাদ খেলাফত প্রতীকী কেন্দ্ররূপে বেঁচে আছে। তবুও সুলতান সুবক্তগীন কেন্দ্রীয় খেলাফতের সাথে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। সুলতান মাহমূদও খেলাফতের প্রতি আনুগত্য বহাল রাখলেন। বুখারা ও খোরাসানকে গজনী শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে সুলতান মাহমূদ কেন্দ্রীয় খলিফাকে লিখলেন— "আমার এলাকার মুসলমানরা গৃহযুদ্ধে যে বিপদগ্রস্ত হয়েছে সে বিপর্যয় এখনো কাটেনি। ইতিমধ্যে প্রতিবেশী ক্ষমতালিপ্সুদের বিরুদ্ধে আমাকে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। এরা আমাদের ভূখণ্ড টুকরো টুকরো করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল আর নিজেদেরকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করছিল। আমি তাদের কাছে বহুবার মৈত্রী ও সন্ধি প্রস্তাব পাঠিয়েছি, অমুসলিমদের ক্রীড়নক হয়ে মুসলিম জাতি নাশ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেছি কিন্তু আমার শান্তিপ্রস্তাব ও উদারতাকে তারা হীনমন্যতা ও দুর্বলতা মনে করেছে। এরা পরিস্থিতি এতই বিপদাপন্ন করে তুলেছিল যে, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমরা আপনার অনুমোদন গ্রহণ করার সুযোগও পাইনি। তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা করতে হয়েছে। দৃশ্যত আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, বোখারা ও খোরাসান বিদ্রোহী ও গাদ্দারদের থেকে ছিনিয়ে এনে আমি তা গজনী শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেছি। অবশ্য একে আমি সুসংবাদ ও সাফল্য মনে করি না। মূলত এটা একটা জাতীয় দুর্ঘটনা যে, আমরা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত। যে সমষ্টিগত শক্তি ইসলামের সুরক্ষা এবং অগ্রগতির জন্য ব্যয় করার কথা

ছিল, যে শক্তি ইসলামের সীমানাকে বিস্তৃত করার জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল সেই অপরিমেয় সম্ভাবনাকে আমরা অভ্যন্তরীণ হানাহানিতে অপব্যয় করেছি...।

আমি ময়দানের লোক। আমার মনে হয়, আমার জীবন রণাঙ্গনে কেটে যাবে। আমার লাশ হয়ত কোন যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকবে। আমার ভয় হয় ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে যেন আমি নিহত না হই। এমন লড়াই সংঘাতে আমার মৃত্যু হলে আল্লাহর কাছে আমি কি জবাব দেব? আমি আমার রাজত্বের পরিধি বৃদ্ধি করতে চাই না, আমি চাই ইসলামের বিস্তৃতি। রাজমুকুট মাথায় পরে রাজা হয়ে সিংহাসনে বসার অবকাশ আমি কখন পাব! হিন্দুস্তানের অসংখ্য দেব-দেবী আমাকে তিরস্কার করছে। রাজা জয়পাল হিন্দুস্তানের সকল রাজাকে নিয়ে আমার বিরুদ্ধে সমরায়োজন করছে। আমি যখন ওদের দিকে অগ্রসর হই তখন আমার মুসলমান ভাইয়েরা পিছন থেকে আমার পিঠে ছুরি মারে। আমার প্রতিপক্ষ হিসেবে আমার ভাই ও মুসলিমরা অভিন্ন শত্রুতে পরিণত হয়েছে...।

আপনি কি ঘোরী, তিবরিস্তানী, সামানী ও এলিখানীদের বলতে পারেন যে, আমরা সবাই একই নবীর উম্মত? এদেরকে কি একথা শুনানো সম্ভব যে, ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে বিধর্মীদের মোকাবেলায় টিকে থাকা সম্ভব নয়...?

এখানে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এখনো বিদ্যমান। জনাবের দু'আ ও সহযোগিতা আমার একান্ত কাম্য। গজনী সালতানাতের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভাল নয়। আমি জানি, আমাকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করা আপনার পক্ষেও অসম্ভব। আমি তা প্রত্যাশাও করি না। আপনি আমার জন্য দু'আ করুন, আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে সহযোগিতা করেন।

আপনার গুণমুগ্ধ
মাহমূদ
খাদেম
"গজনী সালতানাত"

সুলতান মাহমূদের পত্রের জবাবে বাগদাদের খলিফা কাদের বিল্লাহ্ আব্বাসী লিখলেন...

"আপনার চিঠি পাঠান্তে দুঃখ বোধ করছি। কিন্তু আশ্চর্যান্বিত হইনি। অবশ্যই ব্যাপারটা মোটেও নতুন নয়। আমাদের শাসকদের মধ্যে ক্ষমতার নেশা মিল্লাতের ঐক্যকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। আজ যারা পারস্পরিক

জিঘাংসায় লিপ্ত এরা ইসলাম ও মুসলমানের অমিত সম্ভাবনাকে নিজেদের হীন স্বার্থে অপাত্রে ব্যবহার করছে। আপন ভাইকে নিশ্চিহ্ন করতে এরা ইহুদী ও খৃস্টানদের সাথে মৈত্রী গড়ে তুলেছে। উম্মতে মোহাম্মদীকে নিজেদের দাস ও প্রজা বানিয়ে রাখার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীয় খেলাফতের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের শাসনের বিরুদ্ধে অপবাদ ও মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে গৃহযুদ্ধকে উস্কে দিচ্ছে। এটা এখন মুসলিম শাসকদের প্রধান কাজে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন থেকে আমাদের শাসকদের মধ্যে চলছে এই অপপ্রয়াস। নেতৃস্থানীয় মুসলিম ব্যক্তিবর্গ ক্ষমতার মোহে উম্মাহকে ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত করছে। আর এক অঞ্চলের মুসলমানদেরকে অপর অঞ্চলের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। ফলে খেলাফতের মানচিত্র শত ভগ্নাংশে পরিণত হয়েছে। আর এরই সুযোগ নিচ্ছে বিধর্মীরা। বিধর্মীরা আমাদের জ্বলন্ত আগুনে জ্বালানী ঢালছে। আর মুসলিম খেলাফতকে ভেঙ্গেচুরে বিনাশ করছে...।

আমাদের শাসকবর্গ মোটেও বুঝতে চাচ্ছেন না, আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেলে প্রতিটি অংশই বিধর্মীদের সহজ শিকারে পরিণত হবে। কাণ্ড থেকে শাখা ভেঙ্গে গেলে যেমন শুকিয়ে মরে যায়, তেমনি কেন্দ্রীয় খেলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মুসলিম রাজ্যগুলোও অল্পদিনের মধ্যে ইসলামী চেতনা হারিয়ে বিলীন হয়ে যাবে। এভাবে যদি একের পর এক শাখা ভাঙ্গতে থাকে তাহলে এক সময় মুসলিম খেলাফতের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে ...।

গৃহযুদ্ধকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য যদি আপনাকে চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় সেজন্য আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি। তবে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, ক্ষমতার মোহে যেন যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়েন। আপনি বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ জনগোষ্ঠীগুলোকে একত্র করুন। তাদেরকে ঐক্য-মৈত্রীর বাঁধনে আনতে চেষ্টা করুন। হিন্দুস্তানে মুসলমানরা দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে। কতিপয় শাসক হিন্দু রাজাদের ভয়ে এবং নিজেদের ভোগ ও বিলাসিতার উপকরণ আমদানী অক্ষুণ্ন রাখার হীন স্বার্থে ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি মনে করি, এদেরকে দমন করে হিন্দুস্তানের নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া আপনার দায়িত্ব। তাদের ঈমান ও ইজ্জতের সুরক্ষা করা আপনার কর্তব্য। অনৈতিকতার আড্ডা হিন্দুস্তানের দেব-মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে সেখানে ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা আপনারই কাজ...।

যদি আপনার দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন থাকে, আপনার উদ্দেশ্যে যদি কোন কলুষতা না থাকে, আল্লাহর পথে জিহাদই যদি হয় আপনার লক্ষ্য, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর

সাহায্য আপনার পদচুম্বন করবে। ক্ষমতার মোহে এবং জাগতিক স্বার্থে যারা যুদ্ধ করে দৃশ্যত বিজয়ী হলেও এ সফলতা ক্ষণিকের। স্থায়ী সাফল্য তারাই লাভ করে যারা সত্যের পথিক ও ন্যায়ের পথে চলে।"

বাগদাদের খলিফা এই চিঠিতেই সুলতান মাহমূদকে খোরাসান, বোখারা, আফগানিস্তানসহ বিশাল ভূখণ্ডের সুলতান ঘোষণা করেন এবং তাকে 'ইয়ামীনুদ্দৌলা' এবং 'আমিনুলমিল্লাত' অভিধায় অভিষিক্ত করেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মদ কাসেম ফেরেশতা লেখেন, রাজা জয়পালের দ্বিতীয় আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং গৃহযুদ্ধ অবদমনে সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনী, জনবল ও অস্ত্রবল একেবারেই পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক আবু নসর মুস্‌কাতি এবং আবুল ফজলের রচনা থেকে বোঝা যায় যে, সেই সময়ে সুলতান মাহমূদের অধীনে যে পরিমাণ দক্ষ সৈনিক, যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং অভিজ্ঞ আলেম-উলামা ছিলেন এবং তার প্রশাসনে যে পরিমাণে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মী বাহিনী ছিল সমকালীন কোন শাসকের এমনটি ছিল না। কিন্তু অভিজ্ঞ ও দক্ষ এসব লোকদের পারিতোষিক হিসাবে সুলতান মাহমূদকে মোটা অঙ্কের খরচ বহন করতে হতো। তিনি তার প্রতিবেশী গোলযোগপূর্ণ রাষ্ট্র এবং পৌত্তলিক ভারতের আনাচে কানাচে গোয়েন্দা বাহিনীকে যেভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এর পেছনেও তাকে বিপুল খরচ বহন করতে হতো। বস্তুত এসব কারণেই অর্থনৈতিক দুরবস্থার মুখোমুখি হয়ে পড়েন সুলতান মাহমূদ। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী মুসলিম শাসকরা সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তুলল আর অপরদিকে জয়পালের নেতৃত্বে হিন্দু রাজারা গজনী আক্রমণের প্রস্তুতি নিল। একদিকে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন অপরদিকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর মোকাবেলায় সেনাশক্তির ঘাটতি। যারা ছিল তার মূল শক্তি এরাই হয়ে গেল প্রতিপক্ষ।

সুলতান মাহমূদের অবস্থা যখন চতুর্মুখী আগ্রাসন ও অর্থনৈতিক দৈন্যতায় বিপর্যস্ত, সুলতানের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ঠিক এই মুহূর্তে আঁধার ভেদ করে দেখা দিল আলোর আভা ...।

চতুর্দিক থেকে গোয়েন্দা পরিবেশিত দুঃসংবাদের ঘনঘটা। রাজা জয়পাল আক্রমণ শানাচ্ছে। আমীর শ্রেণীর মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। গভীর দুশ্চিন্তায় তলিয়ে গেলেন সুলতান। নিজের আসনে বসে উদাস মনে উপরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ইত্যবসরে প্রহরী এসে খবর দিল, দু'জন আগন্তুক সুলতানের সাথে জরুরী সাক্ষাৎ করতে চায়। এরা চিস্তানের বাসিন্দা। সুলতান তাদেরকে হাজির করতে বললেন। তারা এল। সুলতান তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে কাছে

ডাকলেন এবং আসার উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। তারা বলল, আমরা চিস্তানের বাসিন্দা। আমাদের গ্রামে সুপেয় পানির অভাব। অনেক দূর থেকে আমাদেরকে খাবার পানি বহন করতে হয়। গ্রামের সবাই মিলে আমরা একটি কূপ খননের জন্য কাজ শুরু করেছিলাম। আমাদের ধারণা মতে পানি খুব বেশি গভীরে থাকার কথা নয় এবং জমিনও খুব বেশি শক্ত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মাত্র তিন হাত খননের পরই আর খনন করা সম্ভব হচ্ছিল না। পাথরের চেয়েও শক্ত মাটি দেখা গেল। খোরাসান ও চিস্তানের মহামান্য সুলতান! জমিন শক্ত ও পাথুরে হওয়াতে কোন সমস্যা ছিল না। আমরা তবুও খননকার্য অব্যাহত রাখতাম। কিন্তু তিন ফুট গভীরেই এমন মাটি দেখা দিল যে, আমাদের কোদাল, শাবল কোন কাজ করছিল না। আমরা জোরে আঘাত করলে মাটি থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়, কোদাল ভেঙ্গে যায়। কিন্তু পাথর ভাঙ্গে না। এটা নিছক পাথর নয়। পাথরের রঙ এমন নয়। আমাদের বিশ্বাস, এটা কোন মূল্যবান ধাতু হবে। অনেকেই বলাবলি করছে, আগেকার কোন রাজা-বাদশাহর গচ্ছিত ধন-সম্পদ এগুলো। যারা এই সমস্ত ধন-সম্পদ গচ্ছিত রেখেছে তাদের প্রেতাত্মা ও জিনদের বসবাস এখানে। গ্রামের মানুষ এসব বলাবলি করে খুব ভীতু হয়ে পড়েছে। ভয়ে কেউ ওদিক মাড়াতে চায় না। একজন বুযুর্গ ব্যক্তি আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন সুলতানের কাছে এই খবর পৌঁছাতে। কারণ, যদি গচ্ছিত ধন-সম্পদ হয়ে থাকে তাহলে এগুলো উন্মুক্ত পড়ে রয়েছে। হেফাযত করা দরকার। আর কোন দামী ধাতু হলেও বিষয়টা সুলতানের নজরে থাকা উচিত।

সুলতান মাহমূদ তাদের কথা শুনে ভূমি সম্পর্কে কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং কয়েকজন কমান্ডারের সাথে কিছুসংখ্যক সৈন্য দিয়ে কথিত এলাকা পরিদর্শনের জন্য পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, জিন-ভূত এসব কিছুই না। আপনারা ওখানে গিয়ে আরো খনন কার্য চালিয়ে ব্যাপারটি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আমাকে অবহিত করুন।

কয়েকদিন পর সুলতান মাহমূদকে খবর দেয়া হল, এটি কোন গুপ্তধন নয়, এটি স্বর্ণের খনি। ভূমি থেকে মাত্র চার-পাঁচ হাত গভীরে স্বর্ণস্তর। খনন করার পর বিরাট এলাকা জুড়ে স্বর্ণখনি দেখা গেল।

ঐতিহাসিক গারদেজী ও কাসেম ফেরেশতার মতে, সুলতান মাহমূদের শাসনামলেই ওই খনি থেকে স্বর্ণ উত্তোলন শুরু হয়। কিন্তু সুলতান মাহমূদের ইন্তেকালের পরে তার ছেলে মাসুদ যখন ক্ষমতায় আসীন হন তিনি পিতার নীতি আদর্শের পরিপন্থী কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি নিজেকে ভারতের হিন্দু রাজাদের

মতো সুলতানের পরিবর্তে রাজা ঘোষণা করেন, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেন। উত্তোলিত স্বর্ণখনির আয় অনৈসলামিক কর্ম, বিনোদন, সাজসজ্জা, মিনাবাজার প্রতিষ্ঠা ও খেল-তামাশায় ব্যয় করতে থাকেন। তখন এক রাতের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে স্বর্ণখনি মাটির গভীরে হারিয়ে গেল। পরবর্তীতে বহু খনন করেও মাসুদ আর স্বর্ণখনির অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন না।

স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হবার পর মাহমূদ যখন দেখলেন, প্রকৃত পক্ষে এটি খাঁটি স্বর্ণ খনি তখন তিনি তার পীর ও মুর্শিদ আবুল হাসান খেরকানির দরবারে হাজির হলেন এবং বললেন, "আমার আব্বু জীবদ্দশায় এই স্বর্ণখনিটিকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম, একটি স্বর্ণের গাছ আমার ঘরের ছাদ ফুড়ে উপরের দিকে উঠেছে এবং এর ডালপালা অর্ধেক দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

...এরপর আমার জন্ম হলো। অবশ্য এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করা হলো যে, আমার শাসনামলে গজনী সালতানাতের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং দূরদূরান্ত পর্যন্ত ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়বে। এখন স্বর্ণখনি যা আবিষ্কৃত হলো সেটির অবস্থানও অনেকটা গাছের মতো। স্বর্ণের স্তর মাটির অল্প গভীরে গাছের ডালপালার মতো ছড়িয়ে রয়েছে। আমার প্রিয় পীর ও মুর্শিদ! আপনি আমাকে মেহেরবানী করে বলুন, এসবের তাৎপর্য কী?"

"জমিনে এবং আসমানে আমাদের দৃষ্টিসীমার অগোচরে যা রয়েছে এর প্রকৃত কারণ একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন" বললেন, আবুল হাসান খেরকানী। "তুমি মনে মনে যা ধারণা করেছ আল্লাহ্ সেটিও জানেন। তুমি এখনও যা চিন্তা করোনি সে সম্পর্কেও আল্লাহ্ সম্যক অবগত। তোমার একথা অনুধাবন করা উচিত, আল্লাহ্ তা'আলা সেইসব রাজা-বাদশাহকে এ ধরনের অলৌকিক ইশারা করে থাকেন যারা রাসূলের প্রকৃত উম্মত হয়ে থাকেন। তুমি যদি আল্লাহর রাসূলের প্রেমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যেই জিহাদ করে থাক তাহলে যে সমস্ত লোক মুসলমান হওয়ার পরও ইসলামের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন এবং ক্ষমতা ও রাজত্বের লোভে মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে, অহেতুক খুনোখুনি করছে আর তুমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে এখন অভাবে নিপতিত হয়েছ এবং তুমি শুধু আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য কামনা করছ। আল্লাহ্ তোমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। গাছের আকৃতিতে তোমার অভাব পূরণে মাটির ভেতর থেকে স্বর্ণখনি উন্মোচন করে দিয়েছেন।

প্রত্যেক সুলতানেরই উচিত বৃক্ষ সদৃশ হওয়া। বৃক্ষ যেমন নিজে সূর্য-তাপ সহ্য করে মানুষকে ছায়া দেয়, মানুষ বৃক্ষের অঙ্গহানি করেও বৃক্ষের নীচে বসে আরাম করে। শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষ বৃক্ষ ছায়ায় বিশ্রাম নিয়ে আবার প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। নব উদ্যমে আবার জীবনকর্ম শুরু করে। সুলতানদের ভূমিকাও এরূপ হওয়া উচিত। বৃক্ষ মানুষের রক্ত পান করে না, জমিন থেকে খাদ্য শোষণ করে মানুষের উপকার করে। মানুষকে দেয় কিন্তু মানুষের কিছু নেয় না।... মাহমূদ! নিজেকে এরকম ঘন শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ মনে কর। বৃক্ষের গুণাবলী আত্মস্থ কর। বৃক্ষ যেমন মানুষের উপকার করে, মানুষ থেকে উপকৃত হয় না, মানুষ বৃক্ষ কাটে কিন্তু বৃক্ষ মানুষ কাটে না। বৃক্ষ মানুষের বহুবিধ কাজে লাগে। কেউ গাছ চিরে পালঙ্ক বানায়, কোন গাছ হয় অন্ধের হাতের যষ্টি। কোন গাছ রাজা-বাদশাহদের সিংহাসন তৈরিতে লাগে...।

"মাহমূদ! যে সুলতান নিজেকে মানুষের শাসক মনে করে, মানুষকে মনে করে তার প্রজা। নিজেকে মনে করে মানুষের অন্নদাতা, বস্ত্রদাতা। বৃক্ষের মত গুণাবলী আত্মস্থ করতে পারে না, তাদের সিংহাসন উল্টে যেতে বেশি সময় লাগে না।

মাহমূদ! দু'টো জিনিস মানুষকে শয়তানে পরিণত করে। একটি সম্পদ অপরটি রাজত্ব বা ক্ষমতা। সেই ব্যক্তিও শয়তানে পরিণত হয়, রাজত্ব বা সম্পদ কোনটি তার নেই কিন্তু এ দু'টোর মোহে সে আচ্ছন্ন। যার মাথায় রাজত্বের মুকুট রাখা হবে, সে যদি আল্লাহ্র সান্নিধ্যে মাথা নত করতে না পারে তার দ্বারা মানুষের কোন উপকার হয় না। এসব শাসক মানুষের অনুকম্পা ও শ্রদ্ধা পায় না। এসব শাসক মানুষকে মানসিক ও সামাজিক সুখ-স্বস্তি দিতে ব্যর্থ হয়। তারা আল্লাহ্র কাছে শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। যে শাসকদের ভোগ-বিলাসিতার বিপরীতে গণমানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা, আহাজারি-ফরিয়াদ, কষ্ট-দুর্ভোগের কান্না রয়েছে তাদের এই দুঃখ-দুর্ভোগগুলোই আখেরাতে সাপ-বিচ্ছু হয়ে এসব অত্যাচারী শাসকদের দংশন করবে...।"

খেরকানী আরো বলেন, "মাহমূদ! তুমি আল্লাহ্র সাহায্য চেয়েছ, আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করেছেন। একটু চিন্তা করে দেখ, তুমি আল্লাহ্র কোনো নবী-রাসূল নও। আসমান থেকে অবতীর্ণ ফেরেশতাও নও, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা জমিনের পেট চিরে স্বর্ণখনি উন্মোচন করে তোমার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করেছেন। এই স্বর্ণ তোমার নয়, সালতানাতের। এ স্বর্ণের মালিক তুমি নও, দেশ ও জনকল্যাণে তা ব্যয় করতে হবে। তুমি যদি

ক্ষমতা ও অহমিকায় আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহ ও অনুকম্পাকে ভুলে যাও, ভুলে যাও তোমার প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য, বিস্মৃত হও গণমানুষের অধিকার, তাহলে জমিন আবার তার সম্পদ লুকিয়ে ফেলবে। যা আল্লাহ্ দান করেন তা ছিনিয়েও নিতে পারেন। তাঁর অর্থবহ ইঙ্গিতকে অনুধাবন করতে সচেষ্ট হও।"

স্বীয় পীর ও মুর্শিদ আবুল হাসান খেরকানীর কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করে সুলতান মাহমূদ সৈন্যবাহিনীকে সুসংগঠিত করতে মনোনিবেশ করলেন। দেশের শাসন ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য প্রশাসনিক সংস্কার করলেন, তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তন আনলেন। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকায় উন্নতি পরিলক্ষিত হল। তবুও সাধারণ মানুষ তার সেনাবাহিনীতে তরুণ, যুবক ছেলেদের ভর্তি করার জন্য উৎসাহে এগিয়ে আসত। তরুণ যুবকরা সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়াকে আভিজাত্যের পরিচায়ক মনে করত।

সরকারি ব্যবস্থাপনা ও নতুনভাবে সৈন্যবাহিনী ঢেলে সাজানোর পর মাহমূদ রাজা জয়পালের গতিবিধি জানার অপেক্ষা করছিলেন। জয়পালের দেশ থেকে কোন সংবাদ পেতে বিলম্ব হওয়ার অর্থ ছিল, জয়পাল হয়ত পরাজয়কে বরণ করে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। মাহমূদের এক সেনাপতি বলল, এই সুযোগে আমাদের উচিত ভারত আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়া।

"জয়পাল দমে যাওয়ার ব্যক্তি নয়। অবশ্যই সে হামলা করবে।" বললেন সুলতান মাহমূদ। "আমি তার মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মাতে চাই যে, ভারত আক্রমণের অভিপ্রায় আমার মোটেও নেই। এটা কি ভালো হবে না, সে তার রাজ্য ছেড়ে এসে আমাদের এলাকায় যুদ্ধে লিপ্ত হবে? আমি যদি তার অগ্রাভিযানের খবর সময় মত পাই তাহলে আমাদের ইচ্ছে মতো সুবিধাজনক জায়গায় তাকে যুদ্ধ খেলায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করতে পারব?"

"এতদিনে তো লাহোর থেকে কোন না কোন খবর পৌছে যাওয়া উচিত ছিল। আমাদের লোকেরা গ্রেফতার হয়ে যায়নি তো?" বলল সেনাপতি।

"আরো কিছুদিন অপেক্ষা করুন, যদি কোন খবর না আসে আমি এদিক থেকে লোক পাঠাব।" বললেন সুলতান মাহমূদ।

লাহোর থেকে ইমরান, নিজাম, কাসেম বলখী, জগমোহন, ঋষি ও জামিলার দল রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। যে রাতে দুঃসাহসী গজনী কমান্ডোরা জয়পালের যুদ্ধ সামগ্রীতে অগ্নিসংযোগ করেছিল সেই রাতেই ঋষির স্থলে পণ্ডিতেরা অন্য একটি কুমারীকে জোরপূর্বক তুলে টিলার মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল। কিশোরীটি সংজ্ঞাহীন

হয়ে যাওয়ার পর যখন সংজ্ঞা ফিরে পেল তখন সবকিছু সে অনুভব করতে পারছিল। প্রকৃত হিন্দু ঘরানার মেয়ে হওয়ার কারণে সে দেবের চরণে নিজেকে বলীদানে উৎসাহ বোধ করছিল। সে নিজে থেকেই বলছিল, ইন্দ্রা দেবীর চরণে আমাকে বলি দিয়ে দাও... মহারাজা জয়পালের কপালে আমার রক্তের তিলক পরিয়ে দাও...। আমার রক্তের ঝলকানিতে শত্রুদের অন্ধ করে দাও।

এ সত্যি এক তেলেসমাতী কারবার। মেয়েটিকে কেন্দ্র করে তার বয়সী মেয়েরা বৃত্তাকারে অর্ধনগ্ন হয়ে নাচছে আর মেয়েটি বিশেষ এক ধরনের বাজনার তালে তালে মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিজে বলী হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে।

কুমারীকে বলীদানের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করার পর রাজা জয়পালকে টিলার মন্দিরে নিয়ে গেল পণ্ডিত। সাধু-সন্ন্যাসীরা রাজাকে সরস্বতি মূর্তির সামনে নিয়ে বসালো। রাজা সরস্বতীকে নমস্কার করলো। মন্দিরের কুমারীরা রাজার উপর ফুলের পাঁপড়ি ছিটিয়ে দিল। পণ্ডিতেরা ভজন গাইল। ঐ কুমারী মেয়েটিকে এভাবে সাজিয়ে রাজার সামনে পেশ করা হল যে, মনে হচ্ছিল মেয়েটি একটি পরী। মেয়েটি দু'হাত প্রসারিত করে রাজার উদ্দেশে বলছিল, ইন্দ্রাদেবীর চরণে আমাকে বলী দিয়ে দাও। রাজার কপালে আমার রক্তের তিলক পরিয়ে দাও।

কুমারী পণ্ডিতের যাদুর প্রভাবে মাথা পেতে ধরল। এক পণ্ডিত রাজা জয়পালের কোষ থেকে তরবারি বের করল। নাঙ্গা তরবারি রাজার মাথার উপর দিয়ে বার কয়েক ঘুরালো এবং এক কোপে কুমারীর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। মন্দিরে ঘন্টা ও শঙ্খধ্বনি বেজে উঠল। সাধু পণ্ডিতেরা ভজন গাইতে শুরু করল। সরস্বতী দেবীর চরণে করজোড়ে মিনতি জানাতে লাগল। প্রধান পণ্ডিত কুমারীর রক্তে আঙ্গুল চুবিয়ে রাজার কপালে তিলক পরিয়ে দিল। রাজা এই দুর্গম টিলার উপরে মন্দিরের এসব আয়োজন প্রত্যক্ষ করার পর তার চেহারা বিজয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মনে হল যেন রাজা গজনী জয় করে ফেলেছে। সুলতান মাহমূদ তার কাছে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রফুল্ল চিত্তে মন্দির থেকে বের হয়ে রাজা কড়া নির্দেশ জারী করল, এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত সৈন্যকে অভিযানের জন্য প্রস্তুত কর। রাজার নির্দেশে তার রাজ্যের সকল প্রজার গৃহ উজাড় হয়ে পড়ল। এর আগে হিন্দু প্রজারা রাজার কোষাগারে অকাতরে তাদের গচ্ছিত সম্পদ অর্পণ করেছিল। সেগুলো ভস্মীভূত হওয়ার পর পুনরায় রাজার অভিলাষ পূরণ করতে গিয়ে কৃষক প্রজাদের ঘরে এতটুকু আহারাদি অবশিষ্ট ছিল যা দিয়ে তারা মাত্র এক সপ্তাহ অতিবাহিত করতে পারে। কেননা, রাজা ও পণ্ডিতেরা হিন্দু প্রজাদের মধ্যে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ,

মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা এমনভাবে প্রচার করেছিল যে, প্রজাদের মনে মুসলমানদের প্রতি তীব্র আক্রোশ সৃষ্টি হয়েছিল। সকল হিন্দু প্রজা রাজার আগ্রাসী অভিযানে সাহায্য করাকে ধর্মীয় দায়িত্ব বলে বিশ্বাস করত। অবশ্য ইতিপূর্বে হিন্দু গৃহিণী-মহিলারা তাদের সৌখিন অলংকারাদি রাজার কোষাগারে জমা করেছিল। সেগুলো ভস্মীভূত হওয়ার পর এখন তারা তাদের বাকী সম্পদের সিংহভাগ রাজার কোষাগারে অর্পণ করতে বাধ্য হল। অপরদিকে রাজা জয়পাল অন্যান্য হিন্দু রাজা মহারাজাদের দরবারে ধরনা দিয়ে তার যুদ্ধ-ভাণ্ডারকে স্ফীত করতে সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টা চালাল। সবার কাছে রাজা শপথ করল, এবার সে আর পরাজিত হয়ে ফিরবে না। যে কোন মূল্যে সে গজনীকে পদানত করবেই।

* * *

নিজাম, কাসেম, জগমোহন, ঋষি ও জামিলাকে নিয়ে ইমরানের কাফেলা রাবী নদী পার হয়ে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। ততক্ষণে তারা লাহোর থেকে বহুদূরে। ইমরান পেশাদার গোয়েন্দা, লাহোরের পথঘাট তার নখদর্পণে। প্রচলিত পথ ছেড়ে অজানা পথে কাফেলাকে নিয়ে চলল ইমরান। ঘন এক বনবীথিতে রাত পোহাল তাদের। ঋষি ঘোড়ার উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে নামিয়ে আনল ইমরান। সবাইকে বলল, এখানে আমাদের বিশ্রাম নিতে হবে। সারারাত কারো ঘুমানো সম্ভব হয়নি। ঘোড়াগুলোরও বিশ্রাম দরকার। এদেরকে দানাপানি দিতে হবে। পথ আমাদের অনেক দীর্ঘ। তদুপরি আমাদের যেতে হবে লুকিয়ে ছাপিয়ে। সবাই শুয়ে পড়ল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমের অতলে ডুবে গেল। কিছুক্ষণ পর জামিলা ইমরানকে জাগিয়ে একটু দূরে নিয়ে গেল এবং বলল, "তুমি এই হিন্দু মেয়েটার সাথে আমাকেও নিয়ে এসেছ, আমার ভবিষ্যৎ কি হবে বল?"

"এ মুহূর্তে আমার সামনে তোমার ভবিষ্যৎ নয়, গজনী সালতানাতের ভবিষ্যতই প্রধান বিষয়।" জবাব দিল ইমরান। "গজনী পৌঁছে তোমাদের ব্যাপারে চিন্তা করব। আশা করি পথিমধ্যে এসব বিষয় তুলে আমার কর্তব্য কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না।"

"আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আবার প্রচণ্ড ভয়ও হচ্ছে— তুমি এখন তোমার দেশের জন্য দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত আছো। অথচ তোমাকে পাওয়ার জন্যই আমি তোমাকে সাহায্য করেছি। তোমাকে পাওয়ার জন্য আমি যে অপরাধ করেছিলাম, তোমার নির্দেশ মতোই সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমি করেছি।

কিন্তু এখন আমি দেখছি, ঋষির প্রতি তুমি ঝুঁকে পড়েছ, তুমি আমার থেকে অনেক দূরে সরে যেতে চাচ্ছ। নিজের জন্যেই তো তুমি ঋষিকে নিয়ে যাচ্ছ!"

"তোমার কি এখনও চিত্তে সুখ আসেনি?" বলল ইমরান। "এখনও কি ঋষি তোমাকে প্রেতাত্মা হয়ে ভয় দেখায়? সেতো এখন সশরীরে তোমার সাথে যাচ্ছে। এখন তো আর তোমার ভয় করার কিছু নেই। অপরাধের বোঝাও নেই তোমার উপর।"

"আমার সাথে এসব তাত্ত্বিক কথাবার্তা বলো না ইমরান।" জামিলা চোখ বন্ধ করে দৈহিক উত্তেজনায় প্রকম্পিত কণ্ঠে বলল, "আমার শরীর বিক্রিত পণ্যে পরিণত হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে, যদ্দিন এই শরীর আছে ততদিনই জীবন আছে, আছে দাম, আছে মান। আছে তোমার প্রতি মানুষের আগ্রহ।"

"শোন জামিলা!" ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল ইমরান। "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তোমার পথ আর আমার পথ ভিন্ন। তোমার কাছে আজ আমি আসল পরিচয় প্রকাশ করছি। আমি তোমাদের দেশের অধিবাসী নই, আমি গজনী সালতানাতের একজন সৈন্য। ওখানকারই অধিবাসী। আমি গজনী সেনাবাহিনীর এক পদস্থ গোয়েন্দা। আর এরা দু'জন গজনী সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা। বিগত যুদ্ধে এরা গ্রেফতার হয়ে জয়পালের প্রাসাদে অন্তরীণ হয়েছিল। এদের উদ্ধার করা ছিল আমার দায়িত্ব। আর দৈহিক রূপ-লাবণ্যের কাম-কামনায় জ্বলে পুড়ে মরছ তুমি। আমি এসবকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। এই হিন্দু মেয়েটি ও তার ভাই স্বধর্ম ত্যাগ করেছে, আমি এদেরকে কুফরী থেকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আমার কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম। শোন জামিলা! তোমার একথা প্রমাণ করতে হবে যে, ইসলাম একটা মর্যাদার ধর্ম। রূপ-রমণের কথাবার্তা এখন বাদ দাও। আমরা এখন শত্রু এলাকা অতিক্রম করছি। মৃত্যু আমাদের তাড়া করছে। নিজের ধর্মের জন্য নিজেকে বিলীন ও কোরবান করার জন্য প্রস্তুত হও।"

ইমরান আবেগে উদ্বেলিত হয়ে জামিলাকে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে চাচ্ছিল। কিন্তু জামিলা মোটেও ইমরানের কথায় কর্ণপাত করল না। ইমরান কি বোঝাতে চাচ্ছে সেটা মোটেও সে বোঝার চেষ্টা করছে না। দেহ-কামনার অগ্ন্যুৎপাত শুরু হল জামিলার হৃদয়ে। জামিলার ভাবখানা এমন ছিল যে, ইমরান যা বলছে সেগুলো তার পক্ষে মোটেও বোঝা সম্ভবপর নয়। জামিলার মাথায় শুধুই তার ভূত-ভবিষ্যৎ ঘুরপাক খাচ্ছিল। তার কাছে রাজা জয়পালের রাজ্য আর গজনীর সুরক্ষা নস্যি। ইমরানকে কব্জা করাই মূল কথা। দীর্ঘদিন থেকে জামিলা ইমরানকে একান্তভাবে কাছে পাওয়ার জন্য ফুটন্ত

কড়াইয়ের মতো উত্তপ্ত হয়ে আছে। শরীর মন আর দেহের উগ্র চাহিদাকে জামিলার পক্ষে সামাল দেওয়া মুশকিল। এতকিছুর পরও যখন দেখল, ঋষির প্রতি ইমরানের ভীষণ আগ্রহ তখন হিংসার আগুন জামিলাকে আরো বেপরোয়া করে তুলল। ইমরানের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সাড়া না পেয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হল জামিলা। তার মধ্যে আবার জন্ম হল বঞ্চিতের জিঘাংসা।

জামিলার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ঋষির দিকে নিবদ্ধ করল ইমরান। ঋষির কাছে গিয়ে ক্ষীণ স্বরে ডাকলো, ঋষি! ঋষি! ঋষি চোখ খুলে এদিক ওদিক দেখে ইমরানের দিকে অগ্রসর হল। ইমরানের কাছে পৌঁছে ছোট শিশুর মতো দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরল ঋষি। তার গলায় বুকে নিজের গণ্ডদ্বয় ও কপাল ঘষে আহ্লাদ জানাচ্ছিল সে। ইমরান সস্নেহে ঋষির মাথা ধরে তার চোখে চোখ রাখল।

অদূরে বসে জামিলা সবই দেখছিল। আর আগ্নেয়গিরির লাভার মতো দাউদাউ করে জ্বলছিল।

ঋষি ইমরানের গলা জড়িয়ে বিস্ময় বিস্ফোরিত নেত্রে ইমরানের কাছে জানতে চাইল, "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমরা এখন কোথায়? আমার দাদা কোথায়? দু'টো লোক ওখানে পড়ে রয়েছে, এরা কি জীবিত?" জামিলার দিকে দৃষ্টি পড়তেই ইমরানের গলা ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল ঋষি, 'এ মহিলাটি কে? এ তোমার বোন নয়তো? একে কোত্থেকে এনেছ?'

'তুমি সুস্থ হও। সবকিছুই বলব।' বলল ইমরান। ইমরান ঋষিকে ধরে তার কাছেই বসিয়ে দিল এবং বলল, 'তোমাকে আমরা পণ্ডিতের কবল থেকে ছিনিয়ে এনেছি।' দু'হাতে চোখ ডলে ঋষি বলল, 'হ্যাঁ, কিছুটা মনে পড়ছে। পণ্ডিতরা আমাকে দেবীর চরণে বলী দানের জন্য জোর করে তুলে নিয়েছিল...। আচ্ছা, ওরা এখন কোথায়? আমি কোথায়? আমি কোন স্বপ্ন দেখছি না তো?'

'এ মহিলার নাম জামিলা।' বলল ইমরান। "এ যদি সাহায্য না করত তাহলে পণ্ডিতরা তোমাকে যে দুর্গম জায়গায় অন্তরীণ করেছিল ওখান থেকে তোমাকে উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হতো না।"

ঋষিকে ইমরান তার অপহরণ হওয়ার ঘটনা বিস্তারিত বলল। ঋষিকে উদ্ধার করতে কিভাবে জামিলা তাকে সহযোগিতা করেছে তাও জানাল। আরো জানাল, জামিলা এক বিত্তশালী বণিকের পালিয়ে আসা স্ত্রী। এছাড়াও ঐ বণিকের আরো দুই স্ত্রী ছিল। তাকে উদ্ধার করতে সহযোগিতা করায় ঋষি জামিলাকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই জামিলার রূপ, সৌন্দর্য ও কমনীয়তা তার মধ্যে জন্ম দিল ঈর্ষা। সে জামিলাকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

ইত্যবসরে নিজাম ও জগমোহন ঘুম থেকে জেগে ঋষিকে খুঁজতে শুরু করল। ঋষি তখন সুস্থ। জাদু ও বিষক্রিয়ার প্রভাব তার মাথায় নেই। টিলার মন্দিরে ঋষির জীবনে কি ঘটেছিল তার একবিন্দুও মনে নেই ঋষির।

'বন্ধুগণ!' বলল ইমরান। 'আমাদের সামনে দীর্ঘ সফর এবং বড় ভয়াবহ সেই পথ। সাথে রয়েছে অনেক স্বর্ণমুদ্রা, অলংকারাদি। যে বিজন এলাকা দিয়ে আমরা অতিক্রম করব, না আছে এখানে কোন আহার সংগ্রহের ব্যবস্থা না আছে সুপেয় পানি। সাথে যা আছে এগুলোকে অবলম্বন করেই আমাদেরকে পথ চলতে হবে।'

"তুমি আমাকে বলেছিলে, ঋষিকে উদ্ধার করতে পারলে তুমি আর ফিরে যাবে না।" বলল জগমোহন। "এ জন্য আমি ঘর থেকে অনেক অলংকারাদি নিয়ে এসেছি। সে কাপড়ের একটি থলে কোমর থেকে খুলে ইমরানের সামনে রাখল এবং বলল, আমাদের ঘরে যত ছিল তা ছাড়াও ঋষির ব্যবহৃত অলংকারাদিও এখানে রয়েছে।"

জামিলাকে ইমরান বলেছিল, ঋষিকে উদ্ধার করতে পারলে সে আর শহরে ফিরবে না। এজন্য জামিলাও বণিক স্বামীর ঘর থেকে যথাসম্ভব নগদ টাকা-পয়সা, অলংকারাদি সাথে নিয়ে এসেছিল। সফরের রীতি অনুযায়ী ইমরানকেই দলনেতার দায়িত্ব অর্পণ করল নিজাম এবং বলল, 'এইসব সোনা-দানা, টাকা-পয়সা তোমার দায়িত্বে রাখা হল এবং আমরা গজনী পৌঁছা পর্যন্ত তোমার নির্দেশ মতই সবাই চলব।' নিজামের সিদ্ধান্ত সবাই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিল এবং যার কাছে যা ছিল সব ইমরানের কাছে অর্পণ করল। সোনা-দানা ও টাকা-পয়সার পরিমাণ একেবারে কম ছিল না। সবগুলো কোমরে বহন করা ছিল প্রায় অসম্ভব। এজন্য একটা পোটলা বেঁধে ইমরান টাকা-পয়সা ও সোনা-দানা নিজের কাছে রাখলো। ইমরান সফর সঙ্গী সবাইকে এই বলে সতর্ক করল, 'আমাদের পথ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। শুধু যে এই সোনাদানাই ডাকাতদের আগ্রহের বস্তু তাই নয়, যে দু'টি মেয়ে আমাদের সাথে রয়েছে ডাকাতদের জন্য এরাও খুব লোভনীয়।'

অতএব ডাকাত, ছিনতাইকারী এবং রাজার গোয়েন্দাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাতে সফর করার সিদ্ধান্ত নিল ইমরান এবং দিনের বেলা লুকিয়ে-ছাপিয়ে সম্ভাব্য নিরাপদ জায়গায় বিশ্রামের মনস্থ করল।

বেলা ডুবে গেছে। ইমরানের কাফেলা আবার রওয়ানা করল। ইমরানের পিছনে জামিলা আর জগমোহনের পেছনে ঋষি আরোহণ করল। যেতে যেতে

কাসেম তার ঘোড়াটাকে পিছনে নিয়ে গেল। কাসেমের অক্ষমতা ছিল, কাসেম নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানত না। নিজামের অবস্থাও ছিল তাই। কিন্তু ইমরান ছিল ভিন্ন। সে হিন্দুস্তানী ভাষা মাতৃভাষার মতই অনর্গল বলতে পারত। ঋষি, জামিলা ও জগমোহনের সাথেও সে অনর্গল কথা বলতে পারত। কাসেমকে পেছনে আসতে দেখে নিজামও পেছনে চলে গেল। তারা পরস্পর কথাবার্তা শুরু করল। দু'জনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা একটু গভীর করার লক্ষ্যে তারা ইমরান থেকে একটু দূরত্ব সৃষ্টি করে চলল।

"আচ্ছা, তুমি কি ইমরানকে বিশ্বাস করতে পার? এই দুইটা সুন্দরী মেয়েকে সে কেন নিয়ে যাচ্ছে?" নিজামকে জিজ্ঞেস করল কাসেম। "তাছাড়া এতগুলো সোনা-দানাও কেন তুমি ওর দায়িত্বে দিয়ে দিলে? তুমি কি জান না টাকা-পয়সা ও সুন্দরী নারী মানুষের ঈমানকে নষ্ট করে দিতে পারে...! টাকা আর নারীর কি যাদুকরী ক্ষমতা...!"

"ইমরান যদি বিশ্বাসযোগ্য না হতো তাহলে আমাদেরকে উদ্ধার না করেই সে এই হিন্দু মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত।" বলল নিজাম। 'দেখলে তো জামিলাকে সে কত কৌশলে ব্যবহার করেছে? যেহেতু এই মেয়েটি স্বামী বঞ্চিতা, এজন্য সুকৌশলে গজনী সালতানাতের পক্ষে তাকে ব্যবহার করেছে এবং তাকেও দিয়েছে স্বামী নির্যাতন থেকে মুক্তি।'

"এই দুই মেয়ের সাথে গজনী সালতানাতের লাভালাভের কি সম্পর্ক?" বলল কাসেম। "এটা ওর ভোগবাদী মানসিকতা। আর এর খরচ বহন করতে হচ্ছে সরকারি কোষাগার থেকে। তুমি যাই বল, ওর উপর আমার আস্থা নেই। তুমি কি ভেবে দেখেছ, জামিলা বিবাহিতা মেয়ে। স্বামী তালাক না দেয়া পর্যন্ত তার সাথে কারো বিবাহ বৈধ হতে পারে না! তুমি দেখো, জামিলাকে ইমরান রক্ষিতা হিসাবে রাখবে আর এই হিন্দু মেয়েটাকে মুসলমান বানিয়ে সে বিয়ে করবে।"

"তোমার কথাবার্তায় অবিশ্বাস নয়, হিংসার গন্ধ পাওয়া যায়।" বলল নিজাম। "দোস্ত! এই মেয়েদের উপর থেকে তোমার দৃষ্টি সরিয়ে নাও। তুমি কেন ভুলে গেলে, বন্দিদশা থেকে আমাদেরকে মুক্ত করে ইমরান আমাদের কতটুকু উপকার করেছে? ইমরান আমাদেরকে মুক্ত না করলে ওই কাফেরের বন্দিশালায় আমাদেরকে মরতে হতো। মুজাহিদ যুদ্ধ ময়দানে শহীদ হওয়ার জন্য জন্ম নেয়। বন্দিশালায় মৃত্যুবরণ করার জন্য নয়। গজনী পৌঁছে আমাদের কর্তব্য হবে আবার সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে হিন্দুস্তানী বেঈমানদের বিরুদ্ধে

জেহাদকে বেগবান করা। ইমরান কাকে রক্ষিতা রাখল আর কাকে বিয়ে করল, তাতে আমাদের কি আসে যায়!"

"আমরা সেনাবাহিনীর উর্দ্ধতন অফিসার, আর ইমরান একজন সাধারণ গোয়েন্দা। আমাদের অধিকার আছে ইমরানের দোষ-ক্রটি দেখার"। বলল কাসেম।

"এই ভ্রমণে আমরা ইমরানকে দলনেতা নির্বাচন করেছি"। বলল নিজাম। "সে যদি কোন ভুল করে বা কোন অন্যায় করে তাহলে আমরা তাকে বাধা দিতে পারি। কিন্তু তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না। আমাদের এখন লক্ষ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বিবাদে গজনীতে পৌঁছা। সুলতানকে অবহিত করা, রাজা জয়পাল গজনী আক্রমণের জন্য তোড়জোর করছে।"

"তুমি একেবারেই হাবা"। বলল কাসেম। "এই ব্যাটা আমাদেরকে ধোঁকা দেবে।"

জামিলা ইমরানের পেছনে আরোহণ করে তার কাঁধে হাত রেখে গায়ে গা মিশিয়ে বসেছে। ঘোড়ার ঝাঁকুনির সাথে সাথে বারবার ইমরানের গায়ে আঁছড়ে পড়ছে জামিলা আর আবেগ ও উত্তেজনাকর কথা বলে ইমরানকে তাতিয়ে তুলতে চাচ্ছে। ইমরান অনুভব করল, জামিলার মধ্যে কামনেশা তীব্র হয়ে উঠছে।

"এই হিন্দু মেয়েটিকে তোমার কাছে এত ভাল লাগে কেন?" ইমরানকে জিজ্ঞেস করল জামিলা। 'আচ্ছা বলতো, ও কি আমার চেয়ে বেশি রূপসী?'

"জামিলা! যে কথা আমি তোমাকে বলেছি এর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমি তোমাকে বলতে চাই, একজন মুসলিম নারী এবং অমুসলিম নারীর মধ্যে পার্থক্য থাকা উচিত। এ মুহূর্তে কোন মনোদৈহিক বিনোদনে আমার কোন আকর্ষণ নেই। অবশ্য তুমি সুন্দরী, আগুনের শীষের মতো তোমার শরীর। আমার মতো অসংখ্য যুবকের দীন-ধর্ম তুমি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে পার। আমাকেও চাচ্ছ তুমি তোমার রূপের আগুনে জ্বালাতে। কিন্তু তুমি জান না, বৈষয়িক আকর্ষণ আমি অনেক আগেই নিঃশেষ করে দিয়েছি। আমার সাথীরা আমাকে দলনেতা নির্বাচন করেছে। এই সাথীদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আমার ব্যক্তিগত সুখ, আরাম-আয়েশ আমি উৎসর্গ করে দিয়েছি। দলনেতা একটি ছোট্ট কাফেলার হোক বা রাষ্ট্রের হোক তার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, সুখ-আহ্লাদ প্রাধান্য পেতে পারে না। দলনেতার কাছে শত্রু-মিত্রের সংজ্ঞাও ভিন্ন।

দলনেতার দৃষ্টি থাকে তার দল ও জাতির স্বার্থের প্রতি। ব্যক্তি স্বার্থ সেখানে একেবারেই গৌণ।"

'উনি একটা পাথরের মূর্তি!' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল জামিলা। 'হিন্দুরা নিজ হাতে মূর্তি বানিয়ে এগুলোকে পূজা করে। এসব মূর্তিদের না আছে কোন জীবন, না আছে কোন অনুভূতি। তুমি কি অমন একটা কিছু!' জামিলার কথায় ইমরান হেসে ফেলল।

এভাবেই এগিয়ে চলল ইমরানের ছোট্ট কাফেলা। জামিলার মধ্যে হতাশাও বাড়তে লাগল। বঞ্চিত জীবনের যন্ত্রণা জামিলার মধ্যে আরও তীব্রতর হয়ে উঠল। চলন্ত পথে কাসেম ইমরানের কাছ থেকে একটু দূরত্ব সৃষ্টি করে চলতে লাগল। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ জামিলার ওপর। জামিলা যখন ওর দিকে তাকাত তখন তার চেহারায় ফুটে উঠত খুশির আভা। এসব নিয়ে ঋষির মধ্যে কোন ভাবান্তর ছিল না। ঋষি ছিল সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত। ভবিষ্যৎ নিয়ে জগমোহনের মনেও উঁকি দেয়নি কোন সংশয়, সন্দেহ। এভাবেই তারা প্রায় অর্ধেক রাস্তা চলে এল। একদিন কাসেম, নিজাম ও জামিলাকে সাক্ষী রেখে ঋষি ও জগমোহনকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান করে নিল ইমরান এবং ঋষির নাম দিল রাজিয়া ও জগমোহন ধারণ করলো আব্দুল জব্বার নাম।

একদিন ইমরানকে নিজের কাম চরিতার্থের জন্য সরাসরি আহ্বান করল জামিলা। কিন্তু তাতেও ইমরানের মধ্যে কোন ভাবান্তর হলো না। জামিলার আহ্বানে সাড়া দিতে পূর্ববৎ উদাসীন রইল ইমরান। 'তুমি আস্ত একটা পাথর।' কামনায় উদ্বেলিত জামিলা ইমরানের পিঠে থাপ্পর দিয়ে বলল, 'তুমি একটা মাটির পিণ্ড। এমন জানলে কস্মিনকালেও আমি তোমার ফাঁদে পা দিতাম না।'

ইমরানের ছোট্ট কাফেলা পেশোয়ারের পাহাড়ি অঞ্চল অতিক্রম করছে। এই এলাকা সম্বন্ধে ইমরান ছিল অভিজ্ঞ। এখানে কোথায় কি আছে, কোথায় ঘাস পাওয়া যাবে, কোথায় পাওয়া যাবে সুপেয় পানি— এর সবই ইমরানের জানা। এজন্য পাহাড়ি এলাকায় প্রবেশ করার আগেই একটা গ্রাম থেকে প্রয়োজনীয় পানাহার সামগ্রী সংগ্রহ করল ইমরান এবং বলল, 'বন্ধুরা! তোমাদেরকে আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমরা এখন রাজা জয়পালের সীমানা পেড়িয়ে অনেকটা নিরাপদ এলাকায় এসে পড়েছি। এখানে আমাদের গ্রেপ্তার হওয়ার কোন আশংকা নেই।'

কাফেলা থামিয়ে দিল ইমরান। তখন রাত প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। দিনের প্রচণ্ড গরমে সবাই ক্লান্ত শ্রান্ত। এলাকাটি অত্যন্ত রুক্ষ। গাছপালা নেই, নেই

কোন ছায়াতরু। দিনের বেলায় সূর্যতাপে পাহাড়ের শিলায় আগুন জ্বলতে থাকে। প্রতিটি পাথরকে মনে হয় একেকটা অগ্নিপিণ্ড। ঘোড়াগুলোকে এক পাশে বেঁধে রেখে সবাই আরামের জন্য শুয়ে পড়লো। ইমরান একটু দূরে শুইলো। সবাইকে শুইয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ জেগে রইল ইমরান। ততক্ষণে শুক্লপক্ষের চাঁদ পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। গভীর ঘুমে হারিয়ে গেল ইমরান।

কিন্তু কাসেমের চোখে ঘুম নেই। তার বুকের ভেতর তীব্র যন্ত্রণা। জামিলার রূপ-সৌন্দর্য তাকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। সাথীরা সবাই ঘুমে অচেতন। এ সময় দেখল তাকে অতিক্রম করছে একটি ছায়ামূর্তি। ক্ষীণস্বরে মাথা উঁচু করে ডাকল কাসেম, জামিলা! তার ডাকে থেমে গেল ছায়ামূর্তি। আসলেও ছায়াটি ছিল মূর্তিমান জামিলা। মুশকিল হলো, কাসেম জামিলার নাম ছাড়া তার সাথে কথা বলার মতো আর কোন কথাই জানে না। জামিলাও বুঝে না কাসেমের ভাষা। ইশারা ইঙ্গিতে জামিলাকে আহ্বান করল কাসেম। কাসেমের ইঙ্গিতে সাড়া দিল জামিলা। জামিলাকে কাছে বসিয়ে নানা অঙ্গভঙ্গি করে ইমরানের প্রতি তার ঘৃণা জামিলাকে বোঝানোর চেষ্টা করলো। আরো বোঝাতে চেষ্টা করলো, ইমরান সত্যিই ধোঁকাবাজ, প্রতারক। কাসেম জামিলাকে এই অনুভূতি দিতে চেষ্টা করল, সোনাদানা ও টাকা-পয়সা সে ইমরানের হাতে দিয়ে ভুল করেছে।

জামিলাকে দু'হাতে জড়িয়ে নিল কাসেম। কাসেমের সান্নিধ্য পেয়ে জামিলার হতাশ হৃদয়ে আবেগের বান ডাকল। সেও নিজেকে সঁপে দিল কাসেমের হাতে। কাসেমের স্পর্শ, সোহাগ ও সান্নিধ্য জামিলার হৃদয় থেকে ইমরানের আকর্ষণ মুহূর্তের মধ্যে বিলীন করে দিল। ইমরানের বিপরীতে কাসেমকেই সে মনে করল ভবিষ্যৎ। কাসেম বলখী জামিলাকে জড়িয়ে ধরে একটু দূরে নিয়ে গেল এবং এক জায়গায় বসিয়ে বিড়ালের মত পা টিপে টিপে ইমরানের দিকে এগুলো। ইমরান তখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। টাকা-পয়সা ও সোনার থলেটি তার পাশে রাখা। কাসেম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ক্ষিপ্ত পায়ে থলেটি হাতিয়ে নিল এবং দ্রুত জামিলার কাছে ফিরে আসল। সে জামিলাকে থলেটি দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেল ঘোড়ার কাছে। ঘোড়াগুলো এদের থেকে কিছুটা দূরে বাঁধা ছিল। দু'টি ঘোড়ায় গদি এঁটে একটিতে সওয়ার হলো কাসেম, জামিলাকে ইশারা করলো অন্যটিতে সওয়ার হতে। কিন্তু জামিলা ইঙ্গিতে বোঝাল, সে সওয়ার হতে পারে না। অগত্যা নিজের সামনেই সওয়ার করাল জামিলাকে, আর অন্য ঘোড়াটির লাগাম বেঁধে নিল তার ঘোড়ার জিনের সাথে। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো

তারা। কিছুদূর গিয়ে কাসেম এক হাতে জামিলাকে নিজের বুকের সাথে মিলিয়ে নিল এবং ঘোড়াকে তাড় লাগালো। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ঘোড়া। নিঝুম রাতের নীরবতা ভেঙ্গে অশ্বখুরের আওয়াজ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

সবার আগে ইমরানের ঘুম ভেঙ্গে গেল। গভীর রাতে ঘোড়ার আওয়াজ পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। মনে হতে থাকল খুব কাছেই কেউ ঘোড়া ছুটাচ্ছে। ইমরান চোখে মুখে হাত বুলিয়ে প্রথমেই দেখল থলেটি আছে কি-না। কিন্তু নেই। ধারে কাছে তালাশ করে থলেটির কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। ইতোমধ্যে নিজাম ও আব্দুল জব্বারও জেগে উঠল। তারা তাদের ঘোড়ার খোঁজ নিল। কিন্তু দু'টি ঘোড়া নেই। এদিকে জামিলা ও কাসেম লাপাত্তা।

"ওরা বেশিদূর যেতে পারেনি।" ইমরানের উদ্দেশে বলল নিজাম। "চলো এদেরকে আমরা পাকড়াও করব এবং নিজ হাতে এদের কতল করব।"

'না, এর দরকার নেই। যে মেয়েটিকে কাসেম নিয়ে গেছে প্রকৃতপক্ষে ও আমাদের কেউ নয়। সোনা-দানা ও টাকা-পয়সা যা নিয়েছে এগুলোও গজনী সালতানাতের সম্পদ নয়। এদেরকে পাকড়াও করা আমাদের দায়িত্বও নয়। বরং এদের পেছনে দৌড়ানো আমাদের কর্তব্য পরিপন্থী...। নিজাম ভাই! আমি তোমাদেরকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেছিলাম এই জন্য যে, হতে পারত রাজা তোমাদের দু'জনকে কব্জা করার জন্য সুন্দরী কোন ললনা লাগিয়ে দিত। নারী ও টাকা এমনি ভয়ঙ্কর জিনিস, পাথরের মতো কঠিন হৃদয়ের মানুষকেও মোমের মত জ্বালিয়ে গলিয়ে দিতে পারে। এমনটা হলে তোমরা ভুলে যেতে তোমাদের দায়িত্ব, তোমাদের জাতিত্ব, ধর্ম, নীতি, আদর্শ। ভোগ-ঐশ্বর্যের কাছে জলাঞ্জলী দিতে ঈমান, আমল। হিন্দু রাজার ক্রীড়নক হয়ে গজনী সালতানাতের জন্য মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে তোমরা।'

ধীরে ধীরে ঘোড়ার আওয়াজ ইথারে মিলিয়ে গেল। "আমার ঘুম চলে গেছে, চল আমরা অগ্রসর হতে থাকি।" বলল নিজাম।

একটি ঘোড়ার উপর ঋষিকে এবং অন্য গোড়ার উপর জগমোহনকে সওয়ার করে ইমরান ও নিজাম দু'জনে ঘোড়ার লাগাম টেনে হেঁটে চলল। সিদ্ধান্ত নিল, তারা পর্যায়ক্রমে সওয়ার হবে।

"ও হয়তো জামিলাকে জোর করে নিয়ে গেছে।" বলল ঋষি।

"না, জামিলাকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার দরকার হয়নি। বরঞ্চ বলতে পার, জামিলাই কাসেমকে নিয়ে গেছে। যাই হোক, আপদ চলে গিয়ে ভাল হয়েছে।"

রাত পোহাল। পূর্বাকাশে উঁকি দিল লাল টকটকে সূর্য। ইত্যবসরে জামিলা ও কাসেম অনেক পথ অতিক্রম করেছে। ওরা মরণপণ ঘোড়া ছুটিয়েছে। কাসেম গজনীর সৈন্যদের নির্মিত রাস্তা ধরে এগুচ্ছিল। যে রাস্তা গজনী বাহিনী তৈরি করেছিল ভারত আক্রমণের উদ্দেশে। কাসেম যখন জয়পাল বাহিনীর কাছে গ্রেপ্তার হয়েছিল, এ পথ দিয়েই জয়পালের সৈনিকেরা তাদের নিয়ে গিয়েছিল। এই একটাই ছিল মাত্র রাস্তা। যা থেকে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল না। বেলা বেড়ে উঠার সাথে সাথে কাসেম অনুভব করল, "আমি অপরাধী, আমি পলাতক, ফেরারী। আমার পেছনে ধাওয়া করছে ইমরান ও নিজাম।" ধরা পড়ার আশঙ্কা ও অপরাধের তাড়না কাসেমকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। সে অভিজ্ঞ সৈনিক ও দীর্ঘ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। যে কোন কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করা এবং দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি সহ্য করা তার পক্ষে মোটেও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু অপরাধবোধ কাসেমের সহন শক্তিকে ভেঙ্গে খান খান করে দিল। সে অনুভবই করল না যে, ঘোড়াগুলো এক নাগাড়ে দীর্ঘ সময় দৌড়াতে পারবে না। তার সফর ছিল দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে। বারবার বাঁক নিচ্ছিল পথ। কখনও চড়তে হতো পাহাড়ের উপরে, কখনও নামতে হতো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে। বারবার হোঁচট খেতে হতো পাথরের সাথে। বহু চড়াই উৎড়াই অতিক্রম করে চলতে হচ্ছিল তাকে।

বিরামহীন পথ চলায় ক্লান্ত হয়ে পড়ল ঘোড়া। যে ঘোড়াটায় কাসেম ও জামিলা উভয়ে আরোহণ করেছিল সেটি ঘেমে নেয়ে গিয়েছিল। হাঁ করে নিঃশ্বাস ছাড়ছিল। হঠাৎ পাথরে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঘোড়া। জামিলা ও কাসেম দু'জন দু'দিকে ছিটকে পড়লো। পেছনের ঘোড়াটি তাল সামলাতে না পেরে কাসেমের গায়ে এসে আছড়ে পড়ল। ঘটনার আকস্মিকতায় চিৎকার দিয়ে উঠল জামিলা। কিন্তু কাসেমের অবস্থা শোচনীয়। কোন মতে নিজেকে টেনে তুলে জামিলার দিকে অগ্রসর হলো এবং জামিলাকে টেনে বসাল কাসেম। সওয়ার ঘোড়াটি কয়েকবার পা ঝাপটা দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। অপর ঘোড়াটির উপর কোন সওয়ারী না থাকায় সেটি অত দুর্বল ছিল না। কাসেম বলখী সেই ঘোড়াটির লাগাম হাতে নিয়ে এদিক ওদিক দেখল, কোথাও ঘাস আছে কি-না। না, যে পর্যন্ত দৃষ্টি যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়। আর এ পাহাড়ি এলাকাটি এমন যে শুধুই পাথর। সামান্য দূর্বা ঘাসও কোথাও নেই। পানির তো প্রশ্নই ওঠে না। তখনো ধরা পরার আশঙ্কা কাসেমকে তাড়া করছে। সে মূল রাস্তা

ছেড়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ভিতরের দিকে চলে গেল। জামিলাকে বগলদাবা করে কোনমতে নিয়ে বসাল একটা পাথরের উপর। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল উভয়ে।

খুব বেশি সময় বিশ্রাম করতে পারেনি কাসেম। অপরাধ তাকে তাড়া করে নিয়ে চলল সামনের দিকে। জামিলাকে নিয়ে আবার সওয়ার হলো ঘোড়ায়। টাকার থলেটা জামিলা আঁকড়ে থাকল। এক হাতে জামিলা আর অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম টেনে খুব জোরে তাড়া করল কাসেম।

ইমরান ও নিজাম তাড়া করতে পারে এ আশংকায় কাসেম দীর্ঘ শ্রান্তির পরও পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে পারেনি। ধরা পড়ার ভয়ে সে মূল পথ ছেড়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দুর্গম এলাকা দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছার জন্য আবার ঘোড়া দৌড়াতে শুরু করল। জামিলা অশ্বারোহণে অভ্যস্ত নয়। এ ধরনের দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতাও তার নেই। জামিলা ইঙ্গিতে কাসেমকে বোঝাল, ক্লান্তিকর বিরামহীন ভ্রমণে তার পশ্চাদদেশ ফুলে গেছে, উরুসন্ধি ছিলে গেছে। সারা শরীর ব্যথায় বিষ হয়ে গেছে। পেট ধরে ইঙ্গিত করল, তার পক্ষে আর এক মুহূর্ত ঘোড়ায় বসে থাকা সম্ভব নয়।

যে স্বর্ণমুদ্রা ও রূপ সৌন্দর্যের জৌলুসে মুগ্ধ হয়ে কাসেম জামিলাকে নিয়ে কাফেলা ত্যাগ করে পালিয়ে এলো, সেই রূপ আর টাকার আকর্ষণ কাসেমের কাছে ফিকে হয়ে গেছে। কাসেম অনুভব করছে, তারও শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। তবুও মুখে কৃত্রিম শুষ্ক হাসির রেশ টেনে জামিলাকে এক হাতে জড়িয়ে বুকের সাথে মিশিয়ে নিল। কাসেম অনুভব করল, জামিলার শরীরের স্পর্শে আর আগের মত পুলক নেই। জামিলা নিষ্প্রাণ দেহের মতো। জামিলা কাসেমের আহ্লাদে শরীরটা এলিয়ে দিল কাসেমের গায়ে। জামিলার গণ্ডদেশে কাসেম ঠোঁট স্পর্শ করল, তার ঘর্মাক্ত শরীরের সবটা ভার কাসেমের উপর ছেড়ে দিল। এলো চুল কাসেমের গলায় জড়িয়ে গেল। জামিলা তার ঘাড়, গলা কাসেমের গলায় হেলিয়ে দু'হাতে উল্টোভাবে ওর গলা জড়িয়ে ধরল। কিন্তু ঘর্মাক্ত জামিলার শরীরটা কাসেমের কাছে দুর্গন্ধময় আবর্জনার মতো মনে হলো। আর জামিলার হেলিয়ে দেয়া শরীরটা কাসেমের কাছে বিরাট বোঝা অনুভূত হতে থাকল। কিছুক্ষণ পরেই কাসেম জামিলাকে ধাক্কা দিয়ে সামনে সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল। প্রচণ্ড খরতাপ ও পাহাড়ের অগ্নি বিচ্ছুরণের কারণে ঘামে উভয়ের কাপড় ভিজে শরীরের সাথে লেপটে গেছে।

কাসেমের শরীর অবশ হয়ে আসছিল। দীর্ঘ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক হিসেবে কষ্টকর অশ্বারোহণ তার পক্ষে এতোটা অসহনীয় ছিল না কিন্তু এই পলায়নে

জিহাদের ময়দানের যে আত্মশক্তি থাকে তা নেই। যে জামিলা ছিল তার পালানোর প্রেরণা সেই জামিলার প্রতি ভালবাসার পরিবর্তে বিতৃষ্ণার উদ্রেক হলো। নিজের প্রতিও ঘৃণা জন্মাল।

কাসেম অনুভব করল, এ ঘোড়াটিরও দম ফুরিয়ে আসছে। জিহ্বা বের করে দিয়েছে ঘোড়া। ঘন ঘন সশব্দে শ্বাস নিচ্ছে, দৌড়ের গতি শ্লথ হয়ে এসেছে। বারবার হোঁচট খাচ্ছে। যে দু'টি ঘোড়া নিয়ে কাসেম পালিয়ে এসেছে, এগুলো সেনাবাহিনীর ঘোড়া নয়। সেনাবাহিনীর ঘোড়া দীর্ঘ দুর্গম পথ পাড়ি দিতে এবং পানাহার না করেও অবিরাম পাহাড় পর্বত অতিক্রমে অভ্যস্ত থাকে। এগুলো ভাড়াটে ঘোড়া। যেগুলো সাধারণত বেসামরিক লোকেরা এখানে ওখানে যাওয়ার জন্যে ভাড়ায় নিয়ে থাকে। ইমরানের কথা মতো জগমোহন এগুলোকে পাশের গ্রাম থেকে ক'জন মেহমান আনা-নেয়ার কথা বলে ভাড়া করেছিল। এগুলো দুর্গম দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণে অভ্যস্ত নয়। তাই অবিরাম দানাপানি ও বিশ্রাম ছাড়া পাহাড়ী এলাকায় দৌড়ে চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল ঘোড়া।

ইমরানের পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য কাসেম আরো দুর্গম পথে পা বাড়াল। তালাশ করতে লাগল পাহাড়ের কোন গিরিপথ। তখন সূর্য মাথার উপরে। পাহাড়ের পাথরগুলো যেন খড়তাপে জ্বলছে। প্রচণ্ড তাপ বিকিরণ করছে পাহাড়। ঘোড়া এতোই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে, পাহাড়ের উঁচু নীচু বেয়ে আর এক কদম চলতে পারছে না। অগত্যা কাসেম ঘোড়া থেকে নামল। জামিলাকেও পাঁজাকোলা করে ঘোড়া থেকে নীচে নামাল। উভয়ে হাঁটতে থাকল হাত ধরাধরি করে। একটু হেঁটেই জামিলা ইশারা ইঙ্গিতে ঠোঁটে আঙ্গুল ধরে বুঝাল, পিপাসায় তার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে, তার পক্ষে আর এক কদম হাঁটা সম্ভব নয়। কাষ্ঠ হাসি হেসে কাসেম জামিলাকে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার নিজেরও যে কষ্টে বুক শুকিয়ে আসছে। শরীরটা নিজের কাছেই ভারী মনে হচ্ছে কাসেমের। ঘোড়াটা আর এগুতে পারছে না। পা হেঁচড়ে চলছে। পাহাড়ের ঢালে একটু ছায়া পড়েছে। সেখানটায় বসে পড়ল কাসেম। জামিলা কাসেমের শরীরের উপর ধপাস করে পড়ে যাওয়ার মতো করে বসে পড়লো। স্বর্ণ মুদ্রার থলেটি জামিলা এভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিল যে, এটি ময়লার থলে মাত্র। ঘোড়াটি হাঁপাতে হাঁপাতে এদিক ওদিক করছিল।

আবার জামিলা কাসেমকে বোঝাল, পিপাসায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। কাসেম তাকে কিছুটা বিতৃষ্ণামাখা ভাব নিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল, কষ্ট হলেও কিছু করার নেই। এখানে কোথাও পানি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। জামিলা তাকে

ইঙ্গিত করল এদিক ওদিক খুঁজে দেখতে। ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটা কোন মতে টেনে তুলে কাসেম পানি তালাশে বেরিয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে হতাশ হয়ে ফিরে আসল এবং জামিলার কাছে এসে অনিমেষ নেত্রে নিষ্পলক করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার অসহায়ত্ব তাকে বুঝাতে চাইল।

কাসেম যতটা ভয় করছিল ইমরানকে, তার চেয়েও বেশি নির্বিকার ছিল ইমরান কাসেম ও জামিলার ব্যাপারে। ওদের পিছু ধাওয়া করার বিন্দুমাত্র আগ্রহও ইমরানের ছিল না। কাসেম ও জামিলা হারিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই ইমরানের মাথা থেকে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল তারা।

ইমরান ও নিজাম আব্দুল জব্বার ওরফে জগমোহন ও রাজিয়ায় রূপান্তরিত ঋষিকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছিল। রোদের তাপ বেড়ে যাওয়ায় তারা একটি ছায়াপড়া ঢালে এসে থামল। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা সেই ছায়ায় বিশ্রাম করল।

বেলা ডুবে গেল। ইমরান সাথীদের নিয়ে শুকনো খাবার খেয়ে সংগৃহীত পানি থেকে সবাইকে অল্প অল্প করে পান করতে বলল। যাতে বাকী পথ অতিক্রম করতে কোন অসুবিধার মুখোমুখি না হতে হয়। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলে মৃদু মন্দ বাতাসে পাহাড়ের পাথর কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে এল। ইমরান সাথীদের নিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করল।

"আমরা প্রায় এসে গেছি। কিন্তু বাকী পথ খুবই কঠিন। আমাদের ঘোড়াগুলো খুবই ক্লান্ত। এদের দৌড়ানো সম্ভব নয়। পানাহার ছাড়া বিরামহীন দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ায় এগুলোর শক্তি প্রায় নিঃশেষ। তাছাড়া এ এলাকাটি খুব তাড়াতাড়ি অতিক্রম করার মতোও নয়। পথ খুব উঁচু নীচু আর পাথরগুলো ধারালো। খুব সতর্ক পায়ে চলতে হবে। অন্যথায় পড়ে গিয়ে পা ভাঙ্গার আশংকা রয়েছে। এখন আমাদের মূল লক্ষ্য গজনী পৌঁছা। পথে কোন তাজাদম ঘোড়া পেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে সুলতানকে সংবাদ দেয়া যেতো। রাস্তায় কোন সওয়ারী পেলে ওকে হত্যা করে হলেও ঘোড়া ছিনিয়ে নিতাম। এ মুহূর্তে আমার সবচেয়ে প্রয়োজন একটি তাজাদম ঘোড়া।"

"ইমরান! তোমরা না বল ইসলাম আল্লাহ্র ধর্ম? আল্লাহকে বল না ঘোড়াকে পানি পান করাতে?" মুচকি হেসে বলল ঋষি।

"বলার দরকার নেই। আল্লাহ্ সবকিছুই দেখেন।" প্রত্যয়ী কণ্ঠে বলল ইমরান। "দেখবে এ ঘোড়া পিপাসার জন্যে মরবে না। তুমি বুঝতে পারোনি, আল্লাহর রহম না হলে এ পথ নিরাপদে আমরা কিছুতেই অতিক্রম করতে পারতাম না। রাজা জয়পাল কাসেম ও নিজামকে পাকড়াও করার জন্যে সারা

দেশব্যাপী লোক ছড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু তাদের ফাঁকি দিয়ে আমরা চলে আসতে সক্ষম হয়েছি। এটা আল্লাহর বিরাট বড় রহমত। ঋষি! এখন তোমাকে আমার প্রকৃত পরিচয় দিচ্ছি। তোমরা জানতে, আমি মুলতানের অধিবাসী। আসলে আমি মুলতানের অধিবাসী নই, গজনীর বাসিন্দা। গজনী সুলতানের নিয়োগকৃত গোয়েন্দা কর্মকর্তা আমি। আর আমার দুই সাথী গজনী সেনাবাহিনীর অফিসার। বিগত যুদ্ধে এরা রাজা জয়পালের বাহিনীর কাছে গ্রেফতার হয়েছিল। আমি বন্দিদশা থেকে তাদের মুক্ত করে এনেছি এবং তোমাকেও পণ্ডিতদের আখড়া থেকে উদ্ধার করেছি। উভয় কাজ করেছি আল্লাহ্র ওয়াস্তে। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে প্রত্যেক কাজে মদদ করেছেন। আর জামিলা ও কাসেম জৈবিক তাড়নায় অসৎ উদ্দেশ্যে সবার সোনাদানা নিয়ে পালিয়েছে। দেখবে, ওদের পরিণতি হবে ভয়াবহ। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করেছি। আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করবেনই। সবার যদি আল্লাহ্র প্রতি ভরসা থাকে তবে পাথর চিরেও পানি বের হওয়া কঠিন কিছু নয়।”

বাস্তবেও পাথরের মধ্যেই পানি পেয়েছিল ইমরানের কাফেলা। তখন প্রায় রাতের দ্বিপ্রহর। পাহাড়ের গায়ে ঝিকমিক করছে চাঁদের আলো। শরীর হেলিয়ে চলছিল ঘোড়া দু'টো। একটি উপত্যকায় তারা এসে পৌঁছাল। হঠাৎ থেমে গেল ঘোড়া দু'টো। লাগাম টেনেও ঘোড়া দু'টোকে নাড়াতে পারল না ইমরান। ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে দেখল, উভয়টি জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট চাটছে আর উপত্যকার সমভূমির দিকে তাকিয়ে মাথা উঁচু করে ঘাড় হেলাচ্ছে। লাগাম ছেড়ে দিল ইমরান। ছাড়া পেয়েই ঘোড়া দু'টো সমভূমির দিকে যেতে লাগল।

ইমরান ঋষিকে বলল, ঋষি! তুমি নেমে পড়। ঋষি নামতে পারছিল না। ইমরান এগিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দিলে ঋষি তার কোলে ঝাঁপ দিয়ে নেমে পড়ল। অপর ঘোড়ায় সওয়ার ছিল নিজাম, সেও নেমে পড়ল। ভারমুক্ত হয়ে ময়দানের দিকে দৌড়ে পালাল ঘোড়া দু'টো। ইমরান বলল, আহ্! বেচারা পানির গন্ধ পেয়েছে। আমাদের মশকটা দাও। এদিকে কোথাও পানি আছে। ঘোড়ার সাথে নিজাম আর জগমোহনও দৌড়াতে লাগল। ইমরান ঋষিকে নিয়ে অনুসরণ করল তাদের। দু'টি পাহাড়ের ঢালের নীচুতে গিয়ে থেমে গেল ঘোড়া। মুখ নীচু করে দীর্ঘশ্বাসে পানি পান করতে লাগল। নিজাম ও জগমোহনও ততক্ষণে ঘোড়ার কাছে চলে গেছে। জগমোহন ইমরানের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, হায় ভগবান! পানি! ইমরান তার ভগবান ডাক শুনে দূর থেকে বলল, ভগবান নয় 'আল্লাহ্' বল। আল্লাহ্ তোমাকে পাহাড়ের মধ্যে পানির সন্ধান দিয়েছেন, ভগবান পানি দিতে পারে না। সে ঋষির দিকে তীর্যক দৃষ্টি হেনে বলল, 'দেখলে রাজিয়া।

আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে পাহাড়েও পানি দিতে পারেন।' কিছুটা লজ্জিত হলো ঋষি। ইমরানের আল্লাহ্ ভরসা ও দৃঢ়তার দরুন তার প্রতি সশ্রদ্ধভক্তিতে গা ঘেঁষে হাঁটতে লাগল— সে যেন সত্যিকার পথের দিশারী এবং সফল মানুষকেই পেয়েছে।

দূর থেকেই ইমরান দেখতে পেল পানি। চাঁদের আলো পানিতে পড়ে ঝকমক করছে। তৃষ্ণার্ত ঘোড়া পানি পান করে ঘাস খেতে শুরু করল। অথচ গোটা এলাকায় কোথাও ঘাস নেই। শুষ্ক পাথরে ঘাস জন্মাবে কি করে! কিন্তু এখানে পানি থাকায় আশপাশে বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে ঘাস। ঘোড়া দু'টো হামলে পড়ল ঘাসের ওপর। আঁজলা ভরে পানি পান করল সবাই। শীতল পানি। তীব্র তৃষ্ণা আর গরমের মধ্যে এই ঠাণ্ডা পানিকে মনে হলো জীবনের সবচেয়ে অমৃত সুধা। সবাই নবপ্রাণ ফিরে পেল যেন। ঘোড়া দু'টোকে ঘাস খাওয়ার অবকাশ দিতে ইমরান একটি বড় পাথরের উপর বসে পড়ল সবাইকে নিয়ে।

কাসেম বলখী ও জামিলা পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে গজনী পৌঁছার জন্যে আবারো রওয়ানা হল। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ মনে গজনী পৌঁছেই বা কি করবে এ চিন্তা কাসেমকে আরো বিপর্যস্ত করে তুলছিল। দিকভ্রান্তের মত তারা আধা দিন হেঁটেও একই জায়গায় বৃত্তাকারে ঘুরল। গজনীর দিকে মোটেও অগ্রসর হতে পারল না। এলাকাটি ছিল খুবই জটিল। পাহাড় আর ছোট ছোট টিলায় ভরা। সুস্থ মস্তিষ্কের লোক ছাড়া পরিচিত পথ ছেড়ে লক্ষ্য স্থির করাও কঠিন। কাসেমের দেহমন অতটুকু স্থির ছিল না যে, সে সঠিক পথের দিক নির্ণয় করতে পারে। ঘোড়া আর চলতে পারে না। জামিলা ও কাসেম উভয়ের অবস্থাও সঙ্গীন। দীর্ঘক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই। কতক্ষণ ঘোড়া ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল সেদিকেও খেয়াল নেই কারো। সম্বিত ফিরে এলে কাসেম ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল, জামিলাও পড়ে যাওয়ার মতো করে গড়িয়ে পড়ল ঘোড়া থেকে।

ক্লান্ত অবসন্ন কাসেমের দু'চোখ বুজে এলো ঘুমে। তাকাতেই পারছিল না। এক পা নড়ার শক্তিও নেই দেহে। একটি চওড়া পাথরে পা টানটান করে শুয়ে পড়ল কাসেম। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাসেমের বুকটা কাঠ হয়ে গেছে। জামিলা ও ঘোড়ার দিকে তাকানোর ইচ্ছে হলো না কাসেমের। জামিলা এসে কাসেমের গায়ের উপর ঠেস দিয়ে খানিক্ষণ বসল। এরপর কাসেমের বুকের উপর মাথা রেখে ওকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। কাসেম দু'হাতে জড়িয়ে নিল জামিলাকে। জামিলাও নিজেকে সোপর্দ করে দিল কাসেমের বুকে। অবসন্ন কাসেম জামিলার সংস্পর্শে অনুভব করল উন্মাদনা। মাথা তুলে জামিলাকে ইঙ্গিতে বুঝাল, পাহাড়ের

ওদিকে একটু আড়াল মতো জায়গার দিকে চলো। জামিলাই উঠে ওকে টেনে তুলল। দু'জন হাত ধরাধরি করে একটি ঝোপের আড়ালে পাহাড়ের গর্তের মতো জায়গায় গিয়ে জীবনের শেষ সাধ মিটাতে প্রবৃত্ত হল। কাসেম অনুভব করল, যে জীবন থেকে সে ফেরার হয়েছে সেই জীবন আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যতের চিন্তা ও গন্তব্যে পৌঁছার কথা ভুলে গেল তারা। দৈহিক কামনার আগুন জ্বালিয়ে ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

দীর্ঘ ঘুম শেষে কাসেম যখন চোখ মেলল তখন রাত শেষে বেলা উঠে গেছে। হকচকিয়ে উঠল কাসেম। নিজেদেরকে এভাবে পাহাড়ের কোলে অরক্ষিত অবস্থায় দেখে ঘাবড়ে গেল। দাঁড়িয়ে জায়গাটা পরখ করে দেখল, গতকাল সন্ধ্যায় তারা যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। রাতের অধিকাংশ সময় চলেও অগ্রসর হতে পারেনি মোটেও। একই জায়গা বৃত্তাকারে ঘুরেছে।

জামিলাকে ডেকে তুলল কাসেম। পরস্পরের প্রতি এরা তাকাতেও পারছিল না। আবার যাত্রা শুরু করতে চাইল কাসেম। কিন্তু ঘোড়াটি আর দেখতে পেল না। কাসেম ভাবল, ইমরান ও নিজাম হয়তো ওদের এখানে দেখে ঘোড়াটি নিয়ে গেছে। আর ওদের রেখে গেছে যাতে ক্ষুৎ-পিপাসায় ওরা মরুপাহাড়ে ঘুরে ঘুরে মৃত্যুবরণ করে।

ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত ঘোড়া খাবারের সন্ধানে হারিয়ে গেল। বহু খোঁজাখুঁজি করেও ঘোড়ার কোন চিহ্নও পেল না। হতাশ হয়ে ফিরে এলো জামিলার কাছে। ভীত শংকিত কাসেম জামিলাকে টেনে তুলে দৌড়াতে লাগল।

কিছুক্ষণ পাথুরে উঁচুনীচু পথে দৌড়ে চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলল জামিলা। সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। কাসেম তাকে টেনে তুলে কাঁধে নিয়ে আবার দৌড়াতে লাগল। সোনা-মুদ্রার থলিটাও হাতে নিল। কাসেম ভাবল, ধারে কাছেই হয়তো রয়েছে ইমরান ও নিজাম। ওদের দুরবস্থা দেখলে হয়তো সোনা ও মুদ্রার থলিটা ছিনিয়ে নেবে, জামিলাকেও নিয়ে যাবে তারা। বেশিক্ষণ জামিলাকে কাঁধে নিয়ে দৌড়াতে পারল না। দীর্ঘ পথের ক্লান্তি ও ক্ষুৎ-পিপাসায় এমনিতেই শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। তদুপরি গত রাতের পাপ ও পালানোর অপরাধবোধ কাসেমের সামনে প্রেতাত্মা হয়ে দেখা দিল।

ক্লান্ত কাসেম আর জামিলাকে বহন করে অগ্রসর হতে পারল না। চোখে সর্ষেফুলের মতো চতুর্দিক অন্ধকার ধোঁয়াটে মনে হলো। মাথা চক্কর দিয়ে উঠল কাসেমের। কাঁধের বোঝার মতো জামিলাকে ছেড়ে দিল কাসেম। যমদূত যেন দাঁত বের করে নাচতে লাগল কাসেমের সামনে। জামিলাকে পরম মমতায়

জড়িয়ে নিল বুকে। জামিলার শরীর অসাড় হয়ে গেল। জামিলা চেতনা হারিয়ে ফেলল। স্বর্ণমুদ্রার থলেটা হাত থেকে পড়ে গেল।

খানিক্ষণ পর জামিলার হুঁশ ফিরতে দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলো কাসেম। প্রাণ ফিরে পেল সে। দু'হাতে বাজু ধরে জামিলাকে বসাল কাসেম। কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল।

আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠল কাসেম। স্বগতোক্তি করতে শুরু করল সে :

"তুমি আমার ভাষা বুঝবে না জামিলা! আমরা গজনীর পথ থেকে ফেরার হইনি। আল্লাহ্র পথ থেকে পালিয়ে এসেছি। আল্লাহ্র পথ থেকে পালানোদের পরিণতি এটাই অবশ্যম্ভাবী। আমি ছিলাম অভিজ্ঞ সৈনিক। জীবনে বহুবার প্রচণ্ড তুষারপাত, আর লুহাওয়ায় মরু পাহাড়ে দিনের পর দিন বিরামহীন যুদ্ধ করেছি। দীর্ঘ সময় অনাহার, অনিদ্রা, ক্ষুধা-পিপাসায় কাটিয়েছি। সাথীদের অনেকেই শাহাদাৎ বরণ করেছে, আহত হয়েছে। হাত পা হারিয়েছে, নিজেও যখম হয়েছি, কিন্তু ধৈর্যচ্যুত হইনি, আজকের মতো সাহস হারাইনি, এমন অসহায় বোধ করিনি। আমার শরীরের রক্ত নিঃশেষ হয়ে গেলেও এমন বলহীন হওয়ার কথা নয়। এখন আমি জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। জানো, এর কারণ কি?"....উদ্বেলিত কাসেম জামিলাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'জান?' কিন্তু জামিলা তার কোন কথাই বুঝেনি। ফ্যালফ্যাল করে হা করে শুধু তাকিয়ে রইল কাসেমের দিকে। কাসেমের ভাষা না বুঝলেও জামিলা অতটুকু ঠিকই বুঝল, যে শক্ত সামর্থবান যুবককে সে দেহের কামনা পূরণের অপরিমেয় আধার মনে করেছিল সেই যৌবনের ঝর্ণা এখন শুকিয়ে গেছে, প্রেমের উত্তাপ নিভে গেছে। আবারো বলতে শুরু করল কাসেম :

"যুদ্ধ ময়দানে আমাদের দেহ নয়, আমাদের আত্মা লড়াই করতো। আমরা যুদ্ধ করতাম জাগতিক কোন লোভ-লালসার জন্যে নয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। আর এখানে আমরা পালিয়েছি দেহের কামনা আর মনের বাসনা পূরণে। আমরা আদর্শবিচ্যুত অপরাধী। তাই মাত্র দু'দিনের বৈরী পরিস্থিতিতে আমি প্রাণশক্তি খুইয়ে বসেছি। নিজের শরীরটাই এখন আমার কাছে ভারী মনে হচ্ছে। তোমার রূপের জৌলুস ম্লান হয়ে গেছে, তোমাকে মনে হচ্ছে দুর্গন্ধময় একটা পঁচা মরদেহ।

জামিলা! আমরা অপরাধী। পাপী। পাপীর কোন ঠিকানা নেই। দুনিয়াতে পাপীরা জীবনকে পাপাচারে ভোগ করে আর পরকালে আগুনে পুড়ে ভোগের প্রায়শ্চিত্ত করে।

জামিলা! আমরা পথচ্যুত হয়েছি। আমাদের সাথীরা সত্যপথের উপর রয়েছে। ওই হিন্দু মেয়ে ও তার ভাই সত্যের ঠিকানা পেয়েছে। মাটির মূর্তির পূজা ছেড়ে তারা আল্লাহ্‌র পথের দিশা পেয়েছে। ওরা ঠিক তাদের গন্তব্যে পৌঁছবে, কিন্তু আমরা ভ্রষ্টতার শিকার। আমাদেরকে এই বিজন প্রান্তরেই মরতে হবে।"

কাসেম বেদিশা হয়ে পড়েছিল। জীবনের করুণ পরিণতি আর অতীতের সুকীর্তি তাকে এতই বিপর্যস্ত করে তুলেছিল যে, তার আওয়াজ চড়ে গেল। জামিলা ভড়কে গেল কাসেমের উন্মাদনা দেখে। জামিলা হাত দিয়ে কাসেমের মুখ বন্ধ করতে চেষ্টা করল। বাকরুদ্ধ হয়ে কাসেম হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। জামিলাও জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা খুইয়ে ফেলেছে। তবুও কাসেমকে সান্ত্বনা দিতে নিজের ভাষাতেই বলতে শুরু করল :

"কাসেম! স্থির হও। এখনও আমরা চেষ্টা করলে বাঁচতে পারব। তোমাকে সাহায্য করার সামর্থ আছে আমার। যে কোন রাজ্যে আমরা দু'জন স্বাচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে দিতে পারব। প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা আমাদের হাতে রয়েছে। তুমি নিরাশ হয়ো না। আমার দিকে তাকাও। উঠ।"

"আমি জানি না তুমি কি বলছো জামিলা! আমি কি বলি তাও বুঝতে পার না তুমি।" নিজের মত করে বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল কাসেম। জামিলাকে হাত ধরে টেনে তুলে বলল, "মৃত্যু ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন বিকল্প নেই। এসো, মরার জন্য আরো ভাল কোন জায়গা পাওয়া যায় কি-না দেখি?"

ইমরানের কাফেলা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সমতল ভূমিতে চলে এসেছিল। পথিমধ্যে তারা আরো এক জায়গায় পানির সন্ধান পেয়েছিল। তাদের কাফেলার গতি ছিল মন্থর। কেননা দু'জনকে পায়দল চলতে হতো। হঠাৎ একটি ঘোড়া দেখতে পেল নিজাম। ঘোড়ার গায়ে গদি আঁটা। কিন্তু আশপাশে কোন আরোহীকে দেখা গেল না।

ইমরানকে ডেকে বলল নিজাম, ইমরান! তুমি বলেছিলে কোন ঘোড়া পাওয়া গেলে আরোহীকে হত্যা করে হলেও ঘোড়া ছিনিয়ে নেবে। ওই দেখ! একটি ঘোড়া দেখা যাচ্ছে।

নিজামের ইঙ্গিতে মরুভূমির দিকে তাকাল ইমরান। গদি আঁটানো একটি ঘোড়া আপন মনে ঘাস খাচ্ছে।

"আমার দৃষ্টিভ্রম না হলে বলতে পারি ঘোড়াটি আমাদেরই।" বলল ইমরান।

তারা একটু এগিয়ে দেখল, সত্যি ঘোড়াটি তাদেরই। যে দু'টো ঘোড়া নিয়ে কাসেম পালিয়েছিল এটি সে দু'টোর একটি। কিন্তু ধারে-কাছে কোথাও মানুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল না।

ইমরান ও নিজাম তরবারী কোষমুক্ত করে নিল। কারণ, হঠাৎ কোন আড়াল থেকে তাদের উপর কাসেমের আক্রমণ করার আশংকা রয়েছে। কিন্তু আশে পাশে বহু খোঁজাখুঁজি করেও জামিলা ও কাসেমের দেখা পাওয়া গেল না। খুঁজে না পেয়ে ইমরান ও নিজাম কাসেমকে ডাকতে শুরু করল।

"কাসেম! আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো। অতীতের সবকিছু আমরা ভুলে যাবো। তোমাকে বন্ধুর মতোই বরণ করে নেবো। কাসেম লুকিয়ে থেকো না, আমাদের সাথে চলে এসো!"

বহু ডাকাডাকির পরও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

"ইমরান! ওদিকে দেখ। শকুন উড়ছে।" বলল নিজাম।

বিস্তীর্ণ মাঠের কোথাও শকুনের ঝাঁক উড়তে দেখার মানে ওখানে কোথাও মৃতের অস্তিত্ব রয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদেহে শকুনের আক্রমণ বহুবার দেখেছে নিজাম। ইমরানেরও রয়েছে এ অভিজ্ঞতা। কাফেলাকে দেখে ঘোড়াটি মুখ উপরে তুলে হ্রেষারব করল। কিন্তু পালাতে চেষ্টা করল না। নিজাম ধীর পায়ে এগিয়ে ঘোড়ার বাগ হাতে নিল। অমনি ইমরান এক লাফে সওয়ার হলো ঘোড়ায়। নিজামও তার পিছনে চড়ে বসল। ঘোড়াটি বেশ ফুরফুরে। বোঝা যায় পর্যাপ্ত ঘাস ও পানি খেয়েছে সে। হয়তো বিশ্রামের কাজটিও সেরে নিয়েছে ইতিমধ্যে। তারা দ্রুত অগ্রসর হল শকুনের পালের দিকে। শকুনেরা কি যেন নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে।

কাছে গিয়ে ইমরান ও নিজাম কয়েকটি ঢিল ছুঁড়ে দিল শকুনের দিকে। ঢিল খেয়ে দূরে সরে গেল শকুনেরা। কাছে গিয়ে দেখল, দু'টি লাশ অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে রয়েছে। মরদেহ দু'টি আর কারো নয় কাসেম ও জামিলার। শকুন দল এরই মধ্যে ওদের পেট ফেড়ে নাড়ীভুঁড়ি বের করে ফেলেছে। স্বর্ণ ও মুদ্রার থলেটি কাসেমের মুষ্টিবদ্ধ। ইমরান মুষ্টি খুলে থলেটি ছাড়াতে চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই মুষ্টি খুলতে পারছিল না ইমরান। খুব বেশি আগে মরেনি এরা। শরীর এখনও তাজা। গা থেকে কোন দুর্গন্ধও ছড়ায়নি।

নিজাম ইমরানের উদ্দেশে বলল, "ইমরান! রেখে দাও ওসব। এগুলো ওদের হাতেই থাক। এই সোনা আর দেহই তো এদের মৃত্যু ডেকে এনেছে। এসব ওদের কাছে থাকুক। আমাদের এ দিয়ে দরকার নেই। গজনী সালতানাতের

সম্পদ নয় এগুলো। এগুলো না নিলেও আমাদের অপরাধ হবে না। হতভাগাদের আত্মা হয়তো এতে কিছুটা সান্ত্বনা পাবে। এসো। আমরা চলে যাই।" একটা দীর্ঘঃশ্বাস ছেড়ে করুণ দৃষ্টিতে একবার উভয়কে দেখে চলে এলো ইমরান। "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিরামহীন পলায়নে ক্ষুধা, পিপাসায় এদের মৃত্যু হয়েছে। যদি ডাকাতের আক্রমণে মরত তাহলে কাসেম অক্ষত থাকতো না, জামিলাকেও ডাকাতেরা রেখে যেত না। তাছাড়া স্বর্ণ ও মুদ্রার থলেটি এদের কাছে পাওয়া যেত না।" বলল ইমরান।

"আহ্! কি দুর্ভাগ্য এদের। আর একটু অগ্রসর হলেই পানি পেয়ে যেত এরা। এদের বাঁধনমুক্ত হয়ে ঘোড়া পানি ও ঘাসের সন্ধান পেয়েছে কিন্তু এদের ভাগ্যে পানি জুটেনি। বন্ধুরা! ... এদের থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। এতো বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-মুদ্রাও এদের জীবন রক্ষা করতে পারল না। বরং অনেক সময় টাকা ও সোনা-গয়না মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়।" ঋষিকে ইঙ্গিত করে বলল ইমরান।

"দেখো রাজিয়া! রূপের পরিণতি দেখে নাও। রূপ সৌন্দর্যের বড় গর্ব ছিল জামিলার। সে তার রূপের জালে আমাকেও বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু জামিলার মায়াজালে ধরা দিল কাসেম। আর এই রূপ আর সোনা দানাই কাল হলো ওদের।"

করুণ এ দৃশ্য ও ইমরানের কথায় অশ্রুসজল হয়ে উঠল রাজিয়া।

ওদের করুণ পরিণতি পিছনে ফেলে ইমরানের কাফেলা রওয়ানা হল গজনীর দিকে। এখন তাদের একজন সওয়ার হলো কাসেমের ঘোড়ায়।

সুলতান মাহমুদের কাছে যখন সংবাদ গেল যে, একজন মহিলাসহ লাহোর থেকে তিনজন লোক এসেছে। তারা সুলতানের সাথে দেখা করতে চায়। সুলতান হাতের কাজ রেখে তাদের ডেকে পাঠালেন। ইমরান ও নিজাম সুলতানকে সালাম দিয়ে মহলে ঢুকল। রাজিয়া ও আব্দুল জব্বারের কোন প্রয়োজন ছিল না, তাই তারা বাইরে অবস্থান করছিল।

ইমরান বিস্তারিত রিপোর্ট দিল। বাটাণ্ডার গোয়েন্দাদের তৎপরতা এবং রাজা জয়পালের সব যুদ্ধপোকরণ পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনাও সবিস্তারে জানাল। সে এ কথাও ব্যক্ত করল, কিভাবে নিজাম ও কাসেমকে রাজার বন্দিশালা থেকে মুক্ত করে এনেছে এবং কিভাবে হিন্দু মেয়েটিকে উদ্ধার করেছে পণ্ডিতদের আখড়া থেকে।

কাসেমের বিচ্যুতির কথা শুনে সুলতান খুব আফসোস করলেন। দুঃখে অনুতাপে সুলতানের চেহারা বিষাদময় হয়ে উঠল।

"নারী ও সম্পদের লিপ্সা মুসলিম জাতিকে যেভাবে পেয়ে বসেছে তা আমাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বে।" বললেন সুলতান। "সম্পদ আর নারীলিপ্সায়ই আমাদেরকে গৃহযুদ্ধে ঠেলে দিয়েছে। আচ্ছা, তোমরা কি সঠিক জানো, জয়পাল গজনী আক্রমণ করবে?"

"মহামান্য সুলতান! এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।" বলল ইমরান। "রাজার যুদ্ধ সরঞ্জাম ধ্বংস হয়ে গেলেও সেখানে রসদের ঘাটতি নেই। ইতোমধ্যে সে হয়তো ধ্বংস হওয়া সম্পদের ঘাটতি পূরণ করে ফেলেছে।"

"তোমাদের অন্য সাথীরা ওখানে কি করছে?" জিজ্ঞেস করলেন সুলতান। "জয়পালের তৎপরতা সম্পর্কে আমার নিশ্চিত হওয়া দরকার, সে কি পরিমাণ সৈন্য নিয়ে আসছে?"

"বাটান্ডার লোকদের কার্যক্রম সম্পর্কে আপনাকে বলেছি। ওরা সেখানকারই বাসিন্দা। অধিকাংশই যুবক। খুব সাহসী উদ্যমী। ওয়াইস-এর তত্ত্বাবধানে তারা তৎপরতা চালাচ্ছে। ওয়াইস আমাদের এখানকার লোক। সেখানের একটি মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব নিয়েছে কাজের সুবিধার জন্যে। রাজার সেনাবাহিনী রওয়ানা হলেই সে বিস্তারিত সংবাদ আপনাকে জানাবে।"

"মহামান্য সুলতান! আপনি আর কোন সংবাদের অপেক্ষা না করে প্রস্তুতি শুরু করে দিন।" বলল নিজাম। "জয়পালের সাথে আমার সরাসরি কথা হয়েছে। তার কথাবার্তা থেকে বুঝেছি, যে কোন মূল্যে সে গজনী আগ্রাসন চালাবে। সে তার সেনা অফিসারদের সাথে যেসব পরামর্শ করেছে তাও শোনার সুযোগ আমার হয়েছে। এবার সে পরাজিত নয় বিজয়ী হতে জীবনের শেষ আক্রমণের উদ্দেশে আসবে। মোকাবেলা সমান সমান নয়, দশের বিরুদ্ধে একজনের হবে এমন বিশাল হবে রাজার বাহিনী। তাই অতীতের মতো মুখোমুখি নয় গেরিলা পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে আমাদের। অবশ্য রাজা এক ধরনের নির্ভাবনায় রয়েছে যে, সুলতান সুবক্তগীনের ইন্তেকালের পর সেনাবাহিনী সামাল দেয়ার মতো দক্ষ কেউ গজনী বাহিনীতে নেই। তার এই চিন্তাই আমাদের বড় এক হাতিয়ার।"

"সৈন্য তো আমার কম ছিল না। কিন্তু বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের কারণে বহু সৈনিক বিভিন্ন উপদলে ভাগ হয়ে গেছে। যদ্দরুন আমাদের সেনাবল কমে গেছে। আমাদের সেনা অফিসারদের মধ্যে এখন ক্ষমতার লোভ দেখা দিয়েছে।

ইসলামের পক্ষে জিহাদ করার যোগ্যতা আর নেই এদের। সেনা অফিসাররা যখন ক্ষমতার মসনদ দখলের পেছনে পড়ে তখন সে জাতির ধ্বংসের সুড়ং পথ সৃষ্টি হতে থাকে। স্বজাতির ধ্বংস নিজেরাই টেনে আনে।"

তখন সুলতান মাহমূদ গজনী, বলখ ও খোরাসানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সাথে সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থাও করছিলেন। ইত্যবসরে নিজাম ও ইমরান লাহোর থেকে জয়পালের আক্রমণের খবর নিয়ে এলো। এদের কাছ থেকে সংবাদ পাওয়ার পর সুলতান সব সেনা কর্মকর্তাকে ডেকে পরামর্শ সভায় বসলেন। সেনা কমান্ড আগেই নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিলেন সুলতান। সেনাদের তিনি বললেন :

"এটা নিশ্চিত যে, হিন্দুস্তানের সব রাজা-মহারাজাকে নিয়ে তৃতীয়বার গজনী আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে জয়পাল। সেনা কমান্ড আগের মতো রাজার হাতেই থাকছে। ওদের সৈন্যসংখ্যা কত সে সংবাদ নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়নি বটে, তবে অন্তত এক লাখের কম হবে না তা অনুমান করা যায়। লাহোরে আমাদের লোকেরা রাজার সব রসদপত্র জ্বালিয়ে দিয়েছে। এজন্য রাজার অভিযান কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে। আপনারা নিজেদের দুর্ভাগ্যের ব্যাপারটি জানেন। সব সৈন্যকে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেতে পারছি না। কারণ, সব সৈন্য বাইরে নিয়ে গেলে আমাদের ভাইয়েরা সুযোগের অসদ্ব্যবহার করে আমাদের পিঠে ছুরি বসাবে।

এটা আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। আপনারা কি কখনও ভেবেছেন, যদি হিন্দুদের হাতে গজনীর পতন ঘটে তবে ওইসব ক্ষমতালিপ্সুদের অবস্থা কি হবে? শুধু তাই নয়, গজনীর পতন হলে হিন্দুরা খানায়ে কা'বা পর্যন্ত পৌত্তলিক প্রভাব বিস্তার করবে। অভিজ্ঞ প্রবীণগণ আমাকে জানিয়েছেন, ভারতের হিন্দু পণ্ডিতেরা দাবী করে, পুরাকালে দজলা ফোরাত পর্যন্ত নাকি হিন্দুদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। তাই তারা কা'বা পর্যন্ত রামরাজ্য বিস্তৃত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমাদের মনে রাখতে হবে, এরা শুধু যুদ্ধ করতে আসছে না, সাথে নিয়ে আসছে পৌত্তলিক ধর্ম আর আগ্রাসী চরিত্র। ইসলামের ধ্বংস সাধনে আমাদের প্রাণকেন্দ্রে আগ্রাসন চালাতে চায় হিন্দুরা। আপনাদেরকে শুধু সালতানাত ও নিজেদের ধনজন রক্ষার জন্যে নয় আমাদের প্রাণকেন্দ্র কা'বার সুরক্ষার জন্যে মরণপণ যুদ্ধ মোকাবেলা করতে হবে। আপনাদের সুবিধা হলো, হিন্দু সেনাদের মধ্যে মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড ভীতি রয়েছে। লাহোর থেকে দু'জন লোক খবর নিয়ে এসেছে। তারা জানিয়েছে, গত যুদ্ধের পর পালিয়ে বেঁচে যাওয়া রাজার সৈন্যরা দেশে ফিরে গজনী বাহিনীর আতংক ছড়িয়েছে। রাজার নতুন সৈন্যদের মধ্যে গজনী সেনাদের আতংক বিরাজ করছে।

এছাড়াও আপনাদের আরেকটি সুবিধা হলো, আপনারা গজনীর বাইরে নিজ ভূমিতে সুবিধামতো জায়গায় ওদের মোকাবেলা করবেন। ময়দান আপনাদের মর্জি মতো হবে। গুপ্ত হামলার প্রচুর সুবিধা থাকবে আপনাদের হাতে। এছাড়াও লুমগানের বেশ কয়েকটি দুর্গকে ওদের ধোঁকা দেয়ার জন্য ব্যবহারের সুবিধা থাকবে আপনাদের। ...

জয়পালের বাহিনীতে অনেক হাতি থাকবে। হাতির সুবিধা অসুবিধার ব্যাপারটি ইতিমধ্যে আপনারা জেনেছেন। হাতি যেমন সুবিধাজনক, আত্মঘাতি পরিণতির জন্যে এগুলো ততোধিক মারাত্মক।

আমরাও হাতি ব্যবহার করব কিন্তু আক্রমণাত্মক হামলায় নয় জবাবি আক্রমণে। ওদের সাথে এটা হবে আমাদের চূড়ান্ত লড়াই। পূর্বের কৌশলই অবলম্বন করতে হবে। সম্মুখ মোকাবেলা এড়িয়ে দুই প্রান্তে আক্রমণ করে দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে ওদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে হবে। দুশমনদেরকে আমাদের পিছনে তাড়িয়ে এনে সুযোগ মতো খেলিয়ে খেলিয়ে হত্যা করতে হবে ...।

শত্রুবাহিনীকে কখনও দুর্বল মনে করা ঠিক হবে না। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে আমরা যদি বিজয়ী হই তবে পেশোয়ার পর্যন্ত ওদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে এবং পেশোয়ার দখল করে নিতে হবে। আমি ওই এলাকার ভৌগোলিক মানচিত্রও আপনাদের দেখাচ্ছি। এর আগে আপনাদের মনে একথা গেঁথে নিতে হবে, আপনারা ইসলামের সুরক্ষার জন্যে লড়াই করছেন, এ লড়াই হক ও বাতিলের লড়াই। যে লড়াই আমাদের নবীজী (স.)-এর যুগে শুরু হয়েছিল, সেই লড়াই আজও আমাদেরকে লড়তে হচ্ছে। এমন যাতে না হয়, আমাদের হাতে ইসলাম ও মুসলমানদের অপমান হবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের নাম ঘৃণাভরে স্মরণ করবে, তাই আমাদের শ্লোগান হবে— "হয় মৃত্যু না হয় বিজয়'।"

দীর্ঘ উজ্জীবনীমূলক বক্তব্যের পর সুলতান মানচিত্রটি সেনা অফিসারদের সামনে মেলে ধরলেন। তাদেরকে বোঝালেন কোন কোন পথ অবলম্বন করে রাতের অন্ধকারে গেরিলা আক্রমণ চালাতে হবে। সবশেষে বললেন, আগামী প্রত্যুষেই আমরা অভিযান শুরু করব। সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখুন।

নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের মতে, ১০০১ সালের আগস্ট মাসে মাহমূদ মাত্র ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে জয়পালের মোকাবেলায় গজনী থেকে রওয়ানা হন। তার বাহিনীতে ছিল জয়পালের কাছ থেকে পাওয়া ৫০টি হাতি। সৈনিকদের অধিকাংশই ছিল অশ্বারোহী। পদাতিক বাহিনী বেশি ছিল না। কারণ, গজনীর

নিরাপত্তা রক্ষায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সেনা রেখে যেতে হয়েছিল। মাহমূদের যুদ্ধকৌশল ছিল সম্মুখ সমরে প্রতিপক্ষকে ঠেকিয়ে রেখে গেরিলা আক্রমণে শত্রুবাহিনীকে পর্যুদস্ত করা। এজন্য পদাতিক বাহিনীর চেয়ে অশ্বারোহী বাহিনী ছিল তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন, পেশোয়ারে সুলতান মাহমূদ আক্রমণ করেছিলেন, এটা সঠিক নয়। আক্রমণের সব ব্যবস্থা রাজা জয়পালের পক্ষ থেকে হয়েছিল। গজনী আক্রমণের জন্যে জয়পাল যখন রওয়ানা করে সুলতান মাহমূদ আগেভাগেই গোয়েন্দাদের মাধ্যমে সে খবর পেয়ে গজনীর বাইরে পেশোয়ারের সন্নিকটে জয়পালের মোকাবেলা করেন। এ বিষয়টিকে কুটিল ইতিহাসবেত্তারা উল্টোভাবে উপস্থাপন করেছে।

রাজা জয়পাল ক'দিনের মধ্যে রসদ ও আসবাবের ঘাটতি পূর্ণ করে ফেলেছিল। জয়পাল খুব তাড়াতাড়ি গজনী আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে তার জেনারেলদের বলেছিল, "যে আমার আক্রমণ প্রতিহত করেছিল সেই সুবক্তগীন মরে গেছে। এবার গজনীই হবে আমার রাজধানী। দেবতার চরণে কুমারী বলী দিয়েছি। এবার দেবতাও আমার উপর সন্তুষ্ট। দেবতা আমার সহযোগিতায় থাকবেন। বিজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।"

* * *

এবার আগের মতো হিন্দুস্তানের অন্য রাজা-মহারাজারা সৈন্যবল বেশি দেয়নি। তাদের সন্দেহ ছিল জয়পালের বিজয়ের ব্যাপারে। এজন্য টাকা পয়সা প্রচুর দিয়েছে কিন্তু অনর্থক সেনাক্ষয় এড়ানোর জন্যে নানা অজুহাতে সেনা সাহায্য কম করেছে। তারপরও দেখা গেছে, রাজা জয়পাল যখন লাহোর থেকে গজনীর উদ্দেশে রওয়ানা হয় তখন তার সাথে ছিল বারো হাজার অশ্বারোহী, ত্রিশ হাজার পদাতিক ও তিনশ' সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতি। রসদ, যুদ্ধাস্ত্র ও আহার সামগ্রী প্রায় এক বছরের সাথে নিয়েছিল রাজা। এক মাইলেরও বেশি দীর্ঘ ছিল রসদ সরঞ্জাম বোঝাই গরুর গাড়ির বহর। এছাড়া বিজয়ের পর গজনীর বণিক শ্রেণী ও ব্যবসায়ীদের বশে আনার জন্যে প্রচুর সোনাদানা-মণিমুক্তা সাথে নিয়েছিল জয়পাল।

রাজা অভিযান শুরু করতে খুবই উদগ্রীব ছিল। তাই খুব ব্যস্ততার মধ্যেই অভিযানে বের হল। তার ধারণা ছিল, গজনী সুলতানের অজান্তে সে গজনীর নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে নিবে। জয়পাল লাহোর থেকে পেশোয়ারে পৌছে মাত্র একরাত সেখানে অবস্থান করে। যাতে মালবাহী গরুর গাড়ীর বহর পৌছে যায়। এর পরদিনই গজনীর উদ্দেশে লাহোর ত্যাগ করে পথে নামে জয়পাল।

পেশোয়ার ত্যাগ করার সাথে সাথেই গজনীর গোয়েন্দারা সুলতানকে রাজার সামগ্রিক রণসজ্জার সংবাদ পৌঁছে দেয়। সুলতান জয়পালের সৈন্যসংখ্যা ও সামগ্রিক আয়োজনের খবর যুদ্ধ শুরুর অনেক আগেই পেয়ে গেলেন।

পেশোয়ার ছেড়েই রাজা জয়পাল জানতে পারে, সুলতান মাহমূদ পাহাড়ী এলাকায় তাঁবু ফেলেছেন। রাজা মাহমূদের আগমন সংবাদ বিশ্বাস করতে পারছিল না। তবুও পাহাড়ী এলাকাতেই তার বাহিনীকে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দেয়। আর সংবাদটির সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। রাতে সুলতান মাহমূদের অবস্থান জানার জন্য একটি দলকে পাঠাল রাজা। কিন্তু সেই দল আর ফিরে আসতে পারল না। গজনী বাহিনী জয়পালের সাথে বোঝাপড়া ইতোমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে।

তখনও ভোর। চারদিকে আবছা অন্ধকার। এরই মধ্যে গজনীর বীর বাহিনী গেরিলা হামলা চালিয়ে জয়পাল বাহিনীর একটি বাহুর তাঁবু ছিন্নভিন্ন করে দেয়। কিছু সংখ্যক নিহত ও আহত হয় রাজার সৈনিক। রাজা সংবাদ পেয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ দেয়। ততক্ষণে পূর্বাকাশে সূর্য উঠে গেছে। রণসাজে সজ্জিত হয়ে জয়পাল বাহিনী যখন সামনে বাড়ল তার বহু আগে থেকেই সুলতানের অশ্বারোহীরা তাদের স্বাগত জানাতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো।

জয়পাল তার সৈনিকদের আক্রমণ হানতে নির্দেশ দিল। হিন্দুবাহিনী হস্তিদলকে সামনে বাড়িয়ে দিল। সুলতানের সৈন্যরা হস্তিবাহিনীর মোকাবেলায় অগ্রসর হয়ে এদেরকে বিক্ষিপ্ত করতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল এবং সুযোগ মতো হাতিগুলোকে আহত করতে তৎপর হল। একটু অগ্রসর হয়ে আবার পিছিয়ে আসা। আবার আগে বেড়ে পাশে ছড়িয়ে পড়া। এভাবে রাজার বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল সুলতানের সৈন্যরা। ওদিকে সুলতান মাহমূদ নিজে কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাজার বাহিনীর পিছনে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু জয়পালের সৈন্যরা মাহমূদের ঘেরাও প্রচেষ্টাকে দেখে ফেলল এবং পিছনে সরতে শুরু করল।

রাজার সৈন্যরা পিছনের দিকে মোড় নিলে সুলতান আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। তুমুল লড়াই বেঁধে গেল। লড়াই যখন তুঙ্গে গজনী বাহিনী তখন পিছনে সরে আসতে থাকে। গজনী বাহিনী পশ্চাদপসরণ করছে দেখে হিন্দুরা তাদের ধাওয়া করে। এবার সুলতানের বাহিনী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় রাজার বাহিনী দু'ভাগ হয়ে গেল। ওদের একদল পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হল আর অপর দল পেশোয়ারের দিকে এগুতে লাগল।

এই সুযোগে সুলতানের কিছু সৈন্য প্রতিপক্ষের মাঝে চলে এলো এবং শত্রুবাহিনীর দুই প্রান্তে জোরদার আক্রমণ চালাল। রাজা জয়পাল ছিল দু'দলের মাঝামাঝি। পতাকা ছিল জয়পালের সাথে। কয়েকজন সৈন্য ছিল পতাকার পাহারায়। সুলতানের এই ছোট্ট দলটি রাজার পতাকা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে ঝাণ্ডা বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু তাদের কারো পক্ষে আর ফিরে আসা সম্ভব হলো না। রাজার ঝাণ্ডাবাহিনী অক্ষত রয়ে গেল।

দিনের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত রাজার দু'অংশের সাথে তুমুল লড়াই চলল। গজনী বাহিনী এদের খেলিয়ে খেলিয়ে কচুকাটা করছিল। এদিকে রাজা চাচ্ছিল সুলতানকে এখানে ব্যস্ত রেখে সে বিরাট বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে গজনী কব্জা করে নেবে। সেজন্য রাজা গজনীর দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

যখনি রাজা গজনীর দিকে কিছুটা অগ্রসর হলো, লুকিয়ে থাকা সুলতান বাহিনীর গেরিলাদের টার্গেটের মধ্যে এসে গেল শত্রুসেনারা। শুরু হলো শত্রুদের উপর তীর বৃষ্টি। তীরের আঘাতে রাজার সৈন্যরা মাটিতে ছিটকে পড়ে পাথরখণ্ডের মত ভূতলে গড়াতে লাগল। ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য ও ১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের বিশাল বাহিনীর মোকাবেলায় মাত্র ১০ হাজার মুসলিম অশ্বারোহী। সুলতানের সেনাবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতিও ছিল প্রচুর, কিন্তু লড়াই ধীরে ধীরে মুসলিম বাহিনীর অনুকূলে চলে আসছিল।

রাজা চাচ্ছিল মুসলমানরা সম্মুখ সমরে মোকাবেলা করুক। চেষ্টাও করছিল সেরূপ। তার সৈন্যদের ট্রেনিংও ছিল মুখোমুখি লড়াইয়ের। কিন্তু সুলতানের বাহিনী মুখোমুখি লড়াই এড়িয়ে বিক্ষিপ্তভাবে আকস্মিক আক্রমণ করে আবার দূরে সরে যাচ্ছিল, ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল হিন্দু-মুশরিকদের। সুলতান তার সুবিধামতো ময়দান নির্বাচন করে সেখানেই যুদ্ধের সূচনা করেন। রাজার ভাবনা ছিল ভিন্ন। ভেবেছিল, অতর্কিতে সে গজনী আক্রমণ করে মুসলিম বাহিনীকে নির্মূল করে ফেলবে।

সময় যতই যাচ্ছিল রাজার বাহিনী ততই পর্যুদস্ত হচ্ছিল। বিরাট সেনাবল থাকার পরও জয়পাল প্রাণপণ লড়াই করে যুদ্ধ আয়ত্তে আনতে ব্যর্থ হচ্ছিল। রাজা চাচ্ছিল যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে, তাতে সে বাহিনীকে নতুন করে বিন্যাসের সুযোগ পাবে, কিন্তু মুসলিম সৈনিকেরা ততক্ষণে 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার' বলে ময়দানে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এলোমেলো হয়ে পড়ে জয়পালের সৈন্যরা। জয়পালের যুদ্ধ বিলম্বিত করার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

পশ্চিম আকাশে সূর্য হেলে পড়ার পর পড়ন্ত বিকেলে সুলতান মাহমূদ পঞ্চাশটি হাতি আর দু'হাজার অশ্বারোহী নিয়ে রাজার কেন্দ্রীয় বাহিনীর পশ্চাতে তীব্র আক্রমণ করেন। জয়পালের শক্তি-কেন্দ্র ঘিরে ফেলে দু'হাজার অশ্বারোহী। তুমুল লড়াইয়ে বহু হতাহত হলো, জয়পাল বহু চেষ্টা করেও ঘেরাও থেকে বেরিয়ে যেতে ব্যর্থ হলো। শীর্ষস্থানীয় পনেরজন কর্মকর্তাসহ গ্রেফতার হলো রাজা।

রাজার পতনে তার বাহিনী পালাতে শুরু করে। মুসলিম সৈন্যরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল পেশোয়ার পর্যন্ত। হিন্দু বাহিনী শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার এড়াতে ও জীবন বাঁচানোর জন্য যে যেভাবে পারে পলায়নে প্রবৃত্ত হল। অবস্থা এমন হল যে, রাজার বিশাল বাহিনীকে বকরীর পালের মতো অল্প ক'জন মুসলিম সৈন্য বাঘের মতো তাড়িয়ে নিল।

সন্ধ্যার আগেই যুদ্ধ থেমে গেল। রাজা জয়পাল জীবনের চূড়ান্ত যুদ্ধেও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। অবশ্য গজনী বাহিনী এ বিজয়ে জীবন ও রক্তের যে মূল্য শোধ করেছেন তা গজনীর মানুষ কখনও শোধ করতে পারেনি। দুপুরের আগেই যুদ্ধ পরিণতির দিকে গড়ায়। তখনই পাঁচ হাজারের বেশি শত্রুসৈন্যকে হত্যা করে ফেলেছিল মুসলিম সৈন্যরা।

সুলতান তার সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, মুখোমুখি সংঘর্ষে যাবে না। রাজার দু' প্রান্তে হঠাৎ করে ক'জন আক্রমণ করে আবার পালিয়ে যাবে, আবার ঘুরে এসে আক্রমণ শানাবে। এভাবে ছোট্ট ছোট্ট দলে হঠাৎ আক্রমণ করে চলে যাবে। তাতে শত্রুবাহিনী সব সময় ব্যতিব্যস্ত থাকবে, কোথা থেকে এসে প্রতিপক্ষ হামলা করে বসে, আর হামলা কীভাবে এবং কতোটা কঠিন হচ্ছে তা নির্ণয়ে ব্যস্ত থাকবে।

এমনিতেই মুসলিম বাহিনীর আতংক বিরাজ করছিল জয়পাল শিবিরে। তদুপরি গজনী সৈন্যদের ক্ষীপ্র আক্রমণ আর আক্রমণ করে দ্রুত প্রস্থান করার ফলে পৌত্তলিকরা বুঝতেই পারলো না গজনী বাহিনীর সংখ্যা কত। প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা ছিল না জয়পাল বাহিনীর। অপর দিকে রাজার সৈন্যসংখ্যা ও শক্তি সম্পর্কে সুলতানের প্রত্যেকটি সৈনিক ছিল অবগত। যুদ্ধ শুরুর অনেক আগেই তারা গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের সহায়তায় প্রতিপক্ষের শক্তি সামর্থ ও প্রস্তুতির পরিপূর্ণ তথ্য পেয়ে গিয়েছিল। ফলে সুলতান বাহিনীর সামনে অস্ত্রসমর্পণ করতে হলো রাজা জয়পালের।

পেশোয়ার থেকে কিছুটা দূরে 'মিরান্দ' নামক স্থানে রাজা ও তার কর্মকর্তাদের হাজির করা হল সুলতানের সামনে। দোভাষির সাহায্যে শুরু হলো বন্দী ও বিজয়ীর মধ্যে সংলাপ।

"যুদ্ধ আপনি ও আমার মধ্যে হয়েছে কিন্তু জয় পরাজয় আপনি ও আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ ইসলামের বিজয়। আল্লাহ্ তাআলা এটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন— সত্যের মোকাবেলায় মাটি-পাথরের তৈরি দেব-দেবীদের কিছুই করার শক্তি নেই। ওরা মানুষের ভালমন্দ সংঘটনের মালিক নয়। মানুষকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। জন্ম-মৃত্যু জয়-পরাজয় তাঁর ইচ্ছায়ই হয়ে থাকে। এ নিয়ে আপনার তৃতীয় আক্রমণও ব্যর্থ হলো। এবার বিজয়ের জন্যে কুমারী বলীদান করেছিলেন। আপনার কল্পিত দেবতারা হয়তো আপনাকে নিরপরাধ কুমারী হত্যার শাস্তি দিয়েছে। কুরবানী আমরাও দেই তবে কাউকে খুন করে নয়। রণাঙ্গনে আমাদের সৈনিকদের লাশগুলো দেখুন! বুঝতে পারবেন, আল্লাহর জন্যে মুসলমানরা কিভাবে নিজেদের উৎসর্গ করে। আমাদের কুরবানী আল্লাহ্ পছন্দ করেন। আপনি কি আমাদের ঈমানে বিশ্বাস করেন? আপনার পঞ্চাশ হাজারের বিশাল বাহিনীকে মাত্র ১০ হাজার অশ্বারোহী ভেড়া বানিয়ে ছেড়েছে!"

"আপনার সাথে আমি ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে তর্ক করতে চাই না।" বলল রাজা। "পরাজয় আমি মেনে নিচ্ছি। আমি আপনার কাছে প্রাণভিক্ষা চাচ্ছি। সেই সাথে আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আর কোন দিন আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করব না।"

"হতেও পারে, চুক্তি করার পরও ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে আপনি চুক্তি ভঙ্গ করবেন। আপনার দ্বারা এমনটা হওয়া স্বাভাবিক।" বললেন সুলতান।

"না! এমনটি আমি কখনও করব না। এখন বলুন, সন্ধির জন্যে আপনাকে কি পরিমাণ মুক্তিপণ দিতে হবে?"

"মুক্তিপণের মধ্যে আমি যুদ্ধে প্রাপ্ত কোন সম্পদ গণ্য করব না। কারণ এগুলো গনীমত।" বললেন সুলতান।

রাজার বাহিনীতে ছিল বিপুল সম্পদ। আফগানদের অনুগত করতে বহু মূল্যবান মণিমুক্তা, হীরা-জহরত, স্বর্ণমুদ্রা সাথে নিয়ে এসেছিল রাজা। সেই সাথে গোটা বাহিনীর এক বছরের আহার সামগ্রী।

ঐতিহাসিকদের মতে, কুড়িটির মতো মুক্তার হার ছিল জয়পালের কাছে। আর স্বর্ণ ছিল পাঁচমণ। একটি হীরার হারের তখনকার বাজার মূল্যে ছিল আশি হাজার দিনার।

চুক্তি সম্পাদনে শর্ত করা হল : আড়াই লাখ দিনার ও পঞ্চাশটি সামরিক হাতির বিনিময়ে রাজাকে মুক্ত করে দেয়া হবে। পণবন্দী হিসেবে তার কর্মকর্তাদের বন্দী করে রাখা হবে।

পেশোয়ার পর্যন্ত অধিকার করে নিলেন সুলতান। খায়বর ও আশপাশের সকল পাহাড়ী এলাকায়ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করলেন।

ঐতিহাসিকদের মতে, ৮ মহররম ৩৮২ হিজরী সনের ২৭ নভেম্বর ১০০১ খৃস্টাব্দের বৃহস্পতিবার এ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। আর পরাজিত রাজা শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে মুক্তিপণের স্বীকৃতি দিয়ে জীবন নিয়ে ফিরে গিয়েছিল।

অধিকৃত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্যে সুলতান কিছুদিন পেশোয়ারে কাটালেন। যখন সংবাদ এলো, গজনীর আশপাশের কুচক্রীরা চক্রান্ত করছে, তখন তিনি গজনী ফিরে গেলেন।

হিন্দুজাতির অপরিমেয় সম্পদ ও জীবন ধ্বংস করে রাজা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে লাহোরে প্রত্যাবর্তন করল। এমনিতেই ছিল বয়স্ক-বুড়ো। পরাজয়ের যন্ত্রণা তাকে আরো কাহিল করে তুললো। রাজমহলে ফিরেই জরুরী দরবার তলব করল রাজা। দরবারে ঘোষণা করল নিজের ব্যর্থতা আর ক্ষমতা ত্যাগের কথা। রাজা বলল, আজ থেকে আমার ছেলে আনন্দ পাল রাজা। এ কথা বলেই রাজা সিংহাসন ত্যাগ করল।

রাজমহলেই সে সবাইকে বলল তার সাথে মহলের পার্শ্ববর্তী বাগানে যেতে। ছেলে আনন্দপাল তার সহগামী হল। যেতে যেতে রাজা ছেলের উদ্দেশ্যে বলল—

"তুমি যেভাবে ভাল মনে কর সেভাবেই রাজ্য চালাবে। এ ব্যাপারে আমার কোন পরামর্শ নেই। তবে ক'টি কথা মনে রেখো। কখনও গজনী আক্রমণে অগ্রসর হবে না। আমাদের বাহিনী মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে কোন দিন পেরে উঠবে না। ওরা ঐশী শক্তির বলে যুদ্ধ করে। এই শক্তি আমাদের সৈন্যদের নেই। মাহমূদকে আড়াই লক্ষ দিনার মূল্যের স্বর্ণ দিয়ে দিয়ো, না হয় তোমার উপর সে আক্রমণ করবে। আর আক্রমণ করলে পরিণতি যা পেশোয়ারে দেখে এসেছো তাই হবে। এই চুক্তির ব্যত্যয় করো না।"

রাজা যখন রাজমহলের পার্শ্ববর্তী বাগানে উপনীত তখন সবাই এটা দেখে আশ্চর্য হলো যে ওখানে চিতা তৈরি করা হয়েছে। চিতায় কাঠের স্তূপ করে রাখা হয়েছে— হিন্দু মরদেহ পোড়াতে যেভাবে রাখা হয়। কিন্তু সেদিন রাজমহলের কারো মৃত্যুর কথা কেউ জানে না। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই বিস্ময়াভিভূত।

চিতায় রাজা পৌঁছার আগেই চিতায় তেল ঢেলে দেয়া হয় এবং চিতার পাশে জ্বলন্ত মশাল হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়ানো। আরো ক'জন লোক কোন মরদেহ সৎকারে অপেক্ষা করছে।

কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই রাজা জয়পাল কাউকে কিছু না বলে চিতায় উঠে দাঁড়াল। মশালের দিকে হাত বাড়ালে লোকটি জ্বলন্ত মশাল রাজার হাতে তুলে দিল। রাজা তেলে ভেজানো কাঠের স্তূপে দাঁড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে মুহূর্তের মধ্যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। জয়পালের ছেলে দৌড়ে রাজাকে চিতা থেকে নামানোর জন্যে এগিয়ে গেল কিন্তু ততক্ষণে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে ফেলেছে রাজাকে। প্রজ্জ্বলিত আগুনের পাশে যাওয়া সম্ভব হলো না আনন্দ পালের।

কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনায় পাওয়া যায়, জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেয়ার আগে রাজা ছেলে আনন্দ পালকে নির্দেশ দিয়েছিল, সে যাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ প্রস্তুতি না করে এবং সুলতান মাহমূদকে চুক্তির শর্তানুযায়ী আড়াই লাখ দিনার পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সুলতানের সমবয়স্ক আনন্দ পাল উপদেশ উপেক্ষা করে বাবার জ্বলন্ত চিতার পাশে দাঁড়িয়েই চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দিয়ে পিতার পরাজয় ও অপমৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নিল। বলল, "গজনীবাসীকে আমি এক দিনারও দেবো না এবং বাবার প্রতিশোধ আমি নেবই।"

## এক রাতের স্বর্গবাস

মুলতান। উপমহাদেশের একমাত্র বসতি। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময় থেকে আজ পর্যন্ত নানা উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়া, দখল-মুক্তির শত পট-পরিবর্তনেও যা অমুসলিমদের পদানত হয়নি। উপমহাদেশ থেকে মোগল শাসনের অবসান ঘটলেও মুলতান ছিল সব সময় ইংরেজ বেনিয়াদের কব্জামুক্ত। এগারো শতকে উপমহাদেশ জুড়ে হিন্দুদের দাপট থাকলেও মুলতান ছিল পৌত্তলিক পঙ্কিলতা মুক্ত। অথচ তখন মুলতানের আশপাশের সব রাজ্যে ছিল হিন্দু পৌত্তলিকদের জয়জয়কার।

১০০২ খৃস্টাব্দের ঘটনা। মুহাম্মদ বিন কাসিমের পর ভারতের পৌত্তলিকদের গড়া রাম-রাজ্যের ভিত্তিমূলে দ্বিতীয়বারের মতো আঘাত হানেন সুলতান মাহমূদ গজনবী। মাহমূদ গজনবীর আঘাতে কেঁপে উঠল পৌত্তলিকদের স্বর্গ-সিংহাসন।

ভারতের সবচেয়ে প্রতাপশালী হিন্দু রাজা জয়পালের তিনটি হামলা প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেন। চিরতরে স্তব্ধ করে দেন জয়পালের আগ্রাসী থাবা। জয়পালকে রণাঙ্গনে বন্দী করে ফেলেন। জয়পাল আর যুদ্ধ না করার অঙ্গীকার করে মোটা অংকের মুক্তিপণের চুক্তি করে মুক্ত হয়ে রাজধানীতে ফিরে ছেলে আনন্দ পালকে সিংহাসন সোপর্দ করে জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেয়। আনন্দ পালকে জয়পাল মুক্তিপণ আদায় করতে এবং ভবিষ্যতে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত থাকতে ভবিষ্যদ্বাণী করে। মাহমূদ গজনবী পেশোয়ারের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে পেশোয়ার কেন্দ্রিক শাসন ক্ষমতা নিজের কর্তৃত্বে নিয়ে নেন। যার ফলে মাহমূদের রাজধানী গজনী অনেকটা বহিঃশত্রুর আক্রমণ আশংকা থেকে নিরাপত্তা লাভ করে।

সুলতান মাহমূদ রাজা জয়পালকে বন্দী করার পর আড়াই লাখ স্বর্ণমুদ্রা মুক্তিপণের শর্তে মুক্ত করে দেন। সেই সাথে পঞ্চাশটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতি যুদ্ধ খরচ বাবদ দেয়ার অঙ্গীকার করে জয়পাল। জয়পাল রাজধানীতে ফিরে যথারীতি সুলতানের কাছে পঞ্চাশটি হাতি এবং আড়াই লাখ স্বর্ণমুদ্রা পাঠানোর কথা বলে চিতায় আত্মাহুতি দেয়। কিন্তু আনন্দ পাল পিতার জ্বলন্ত চিতার পাশে দাঁড়িয়েই সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আনন্দ পাল সেই সামবেশেই তার পিতার প্রতিশ্রুত মুক্তিপণ ও যুদ্ধ জরিমানা দিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে।

রাজা জয়পালের আত্মাহুতির ঘটনাটি ঘটে ১০০২ খৃস্টাব্দে। দেখতে দেখতে দু'বছর চলে গেল। জয়পালের প্রতিশ্রুত জরিমানা নিয়ে আসার পরিবর্তে সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দারা খবর নিয়ে এল, আনন্দ পাল মুক্তিপণ পরিশোধের পরিবর্তে তার বাবার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছে।

... "এটা আমার কাছে আদৌ আশ্চর্যের কোন খবর নয়" বললেন সুলতান।" মানসিকভাবে এমনটির জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। আমি এ জন্যই জয়পালের এলাকা কব্জা করেছি যে, জয়পালের চেলা ও পরামর্শদাতাদের কাছে গজনী এখন আসমানের তারার চেয়েও দূরবর্তী মনে হবে। আল্লাহর রহমত ও আমার জানবাজ যোদ্ধাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শুধু গজনী নয় ওদের আজীবন লালিত দুঃস্বপ্ন খানায়ে কা'বাকে আমি ওদের আগ্রাসন থেকে নিরাপদ করতে পেরেছি।"

"জয়পাল পরাজিত হয়ে কাপুরুষের মতো আত্মাহুতি দিয়েছে। এখন সিংহাসনে বসেছে ওর ছেলে, ওদের আমরা মোটেও পরোয়া করি না।" বলল এক সালার।

"দুশমনকে এতোটা খাটো করে দেখতে নেই বন্ধুরা! দুশমনদের ব্যাপারে সবকিছু গভীরভাবে ভাবতে হয়।" বললেন সুলতান। "রাজা জয়পালের মৃত্যুতে পৌত্তলিকতার পূজারীরা সব মরে যায়নি। ভারত থেকে বিলীন হয়ে যায়নি মূর্তিভক্তি। এটা দু'টি আদর্শের লড়াই। হিন্দুরাজা যুদ্ধ করতে না চাইলেও ওদের ধর্মীয় পণ্ডিতেরা তাদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে। ওদের এলিট শ্রেণী এবং মাতাব্বররা কখনও শাসকদের নির্বিকার থাকতে দেবে না। দুশমনের শক্তিকে কখনও ছোট করে দেখবে না। বরং এখন তোমাদের ভাবতে হবে, এই জাতশত্রুদের পা কিভাবে চিরদিনের জন্যে ভেঙে দেয়া যায়।"

"আপনি যদি আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে অভিমত হলো— এখনই আমাদের লাহোরের দিকে অগ্রাভিযান করা উচিত। তবে এর আগে হিন্দুস্তানে আমাদের একটি ঘাঁটি তৈরি করতে হবে, যাতে আমরা আরো অগ্রসর হতে পারি এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারি।" বলল অপর এক সালার।

"ঘাঁটি আমাদের আছে।" বললেন সুলতান। "মুলতানকে আমরা ঘাঁটি মনে করতে পারি। মুলতানের শাসক আবুল ফাতাহ দাউদ বিন নসর একজন মুসলমান এবং আমাদের সুহৃদ।"

"জাঁহাপনা! দাউদ বিন নসর মুসলমান বটে, কিন্তু সে একজন কারামাতী, আপনি কারামাতীদের অতীত ইতিহাস জানেন, তাদের উপর ভরসা করা ঠিক নয়।" বলল উজীর।

"সে তো সুলতান সুবক্তগীন মরহুমের সাথে মৈত্রীচুক্তি করে প্রয়োজনের সময় একে অপরকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে। সে আমাদের ধোঁকা দিতে পারে না।" বললেন সুলতান।

"আলীজাহ! চিহ্নিত দুশমনের উপর নির্ভর করা যায় কিন্তু স্বজাতির গাদ্দারদের বিশ্বাস করা খুবই কঠিন।" বলল উজির।

"আগামীকাল প্রত্যুষে একজন দূত পাঠিয়ে দিন। আমার বিশ্বাস, মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয় ভূমি থেকে আমরা আশানুরূপ সহযোগিতা পাব। দাউদ বিন নসর হিন্দু বেষ্টিত এলাকায় থাকে, সে হিন্দুদের মনোভাব আমাদের চেয়ে ভাল জানে। আমার মনে হয়, আমাদের অভিযানের সংবাদে সে খুশি হবে। তার সহযোগিতা আমাদের যেমন প্রয়োজন, তারও আমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। আমার ইচ্ছা, সেখানে সামরিক দূত পাঠাব।"

"এ কাজে আসেম ওমর সবচেয়ে উপযুক্ত। বাহাদুর, উদ্যমী এবং চৌকস সেনা অফিসার। কথা বলার কৌশল জানে ভাল।"

"আসেম ওমর। কে যেন আমাকে বলেছিল, সে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ভদ্রলোক।" বললেন সুলতান।

"যুদ্ধ-কৌশল ও সামরিক বিষয়াদি সম্পর্কে আসেম ভাল জ্ঞান রাখে। সে একটা বিষয় যেমন বুঝে অপরকেও বোঝাতে পারে। রণাঙ্গনে শত্রুসেনাদের সামনেও সে স্বাভাবিক ভাবটা ধরে রাখতে পারে। এটা তার একটা বড় গুণ।" বলল সিপাহসালার।

"আপনি যদি মনে করেন সে-ই উপযুক্ত, তবে আমার দ্বিমত নেই। ওকে ডেকে পাঠান।" বললেন সুলতান। "আমি তাকে মৌখিক পয়গাম দেবো। কোন লিখিত পয়গাম দেবো না। কারণ, তাকে শত্রু এলাকা অতিক্রম করে যেতে হবে। লিখিত পয়গাম শত্রুদের হাতে চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।"

আসেম ওমর সুলতানের পয়গাম নিয়ে মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসরের দরবারে হাজির হয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। দাউদ বিন নসর-এর দরবারের জাঁকজমক দেখে আসেমের মনে হলো, দাউদ বিন নসর যেন সারা ভারতবর্ষের মহারাজা। সুলতান মাহমূদ এবং সুলতান সুবক্তগীনের রাজদরবারে আসেম ওমরের মতো কর্মকর্তা কেন সাধারণ সৈনিকেরাও সুলতানের পাশাপাশি বসে কথা বলতে পারে, কিন্তু দাউদ বিন নসরের দরবার সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুউচ্চ রাজ আসনে বসা দাউদ বিন নসর। আসনের নীচে সব কর্মকর্তা দাঁড়ানো।

অবস্থা দৃষ্টে আসেম নিজেকে দাউদ বিন নসরের সামনে অতি নগণ্য মনে করল। কী শান-শওকাত দাউদ বিন নসরের। তার দু'পাশে পরীর মত অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীরা পাখায় বাতাস করছে। মাথার উপরে বাহারী শামিয়ানা, রঙ-বেরঙের ঝাড়বাতি। নীচে সামনে অতি সাধারণ কয়েকটি আসনে মন্ত্রীপর্যায়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বসার ব্যবস্থা। ওরা দাউদ বিন নসরের সামনে পাথরের মূর্তির মতো স্থির।

"প্রজাদের ত্রাণকর্তা, মহামান্য রাজা! সুলতান মাহমূদ বিন সুবক্তগীনের দূত দরবারে উপস্থিত।" উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করল একজন ঘোষক।

আসেম ওমর এদিক সেদিক তাকাল। কিন্তু ঠাহর করতে পারল না, এ আওয়াজ কোত্থেকে এলো।

"গজনীর দূতকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।" বলল দাউদ। "কি সংবাদ নিয়ে এলে?"

"আপনার জন্যে কিছু উপঢৌকন নিয়ে এসেছি।" হতচকিত হয়ে বলল আসেম। নিজেকে সামলিয়ে বলল, "আগে আপনার খেদমতে সেগুলো পেশ করার অনুমতি চাচ্ছি।"

"সুলতান মাহমূদ কি তোমাদেরকে রাজ-দরবারের আদব শেখায়নি?" কিছুটা তাচ্ছিল্য মেশানো কণ্ঠে প্রশ্ন করল দাউদ!

"আলীজাহ্! আমাদের ওখানে এমন দরবারের ব্যবস্থা নেই। সুলতানের অধিকাংশ মজলিস হয় কোন ময়দান কিংবা সাধারণ ঘরে। সেখানে আমরা সবাই একসাথে বসে কথা বলি।"

"এটা কোন যুদ্ধ ময়দান নয় সম্মানিত অতিথি! আমার এখানে কোন লোকের আমার অনুমতি ছাড়া কাশি দেয়াও বেয়াদবী।"

"সুলতান হয়তো আমাকে কোন ভুল জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাকে বলা হয়েছিল, মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয় স্মৃতিবাহী ভূমির সর্বশেষ শাসকের কাছে আমাকে পাঠানো হচ্ছে। আমি তো মনে করেছিলাম, শত শত মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে আসা আরব মুজাহিদের মতো মুহাম্মদ বিন কাসিমের স্মৃতিবাহী এ রাজ্যের শাসকও হবেন আরব যোদ্ধাদের মতো তাঁবুর অধিবাসী।"

"তোমাকে কে বলল, আমি মুহাম্মদ বিন কাসিমের উত্তরসূরী। তোমরা ইতিহাস সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। আমরা এখানকার বিজয়ী শাসক। আমার দাদা আহমদ খান লোদী এই এলাকা জয় করে শাসন ক্ষমতা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন এ অঞ্চলে কারামতী আদর্শের প্রবর্তক। তবুও আজকের জন্য তোমাকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের রাজ্য বলার অধিকার দেয়া হলো। আমরা মুসলমান। আমাদের ভিন্নধর্মী মনে করার কারণ নেই। কিন্তু আমাদের রাজদরবারের একটা নিজস্ব নিয়ম-কানুন রয়েছে বৈকি।"

"এসব আদব রক্ষা না করা যদি অপরাধ হয়ে থাকে তবে আমি দুঃখিত ও লজ্জিত। ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কারণ এ আদব সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। আমি কি উপঢৌকন পেশ করতে পারি?" বলল আসেম ওমর।

"হ্যাঁ, অনুমতি দেয়া হলো।"

"দরবারের বাইরে আসেম ওমরের চার সাথী দাঁড়ানো। উপঢৌকন ছিল তাদের কাছে। আসেম দ্রুত পায়ে দরবার থেকে বেরিয়ে তাদের গিয়ে বলল, তোমরা এগুলো নিয়ে চল। উপহার সামগ্রীর মধ্যে কিছু ছিল খুব দামী হিরা মণিমুক্তার অলংকার এবং গজনী এলাকার দামী আসবাব। এসবের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য একটি জিনিস ছিল রাজা জয়পালের তরবারী। এই তরবারীটি সর্বশেষ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণের সময় সুলতানের কদমে উৎসর্গ করেছিল জয়পাল এবং বলেছিল, "দয়া করে আমাকে প্রাণভিক্ষা দিন। আর জীবনে কখনও আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দুঃসাহস করব না।"

আসেম ওমর অগ্রসর হয়ে তরবারীটি দাউদ বিন নসরের পায়ের কাছে রেখে দিল।

"কোন পয়গাম আছে কি?"

"আমাকে কি একাকী কথা বলার সুযোগ দেয়া হবে?"

দরবারীদের দিকে চোখ ফেরাল দাউদ। সবাই উঠে চলে গেল বাইরে। রয়ে গেল মাত্র দুটি যুবতী। এরা দাউদের কুরসীর পেছনে দাঁড়িয়ে তাকে বাতাস করছিল। দাউদের ইশারায় তার সিংহাসনের কাছে রাখা একটি আসনে গিয়ে বসল আসেম।

"এই দরবারের নিয়ম-কানুন আমাকে রক্ষা করতেই হয়, না হয় শাসন কাজ চালানো খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।" কিছুটা নমনীয় কণ্ঠে বলল দাউদ। "এসব নিয়ম রক্ষা করা আমাদের একটা সমস্যা। আর আপনার জন্যে সমস্যা হয়েছে এসব আইন-কানুন সম্পর্কে জানা না থাকা। আচ্ছা, আপনি কি লিখিত কোন পয়গাম এনেছেন?"

"জ্বী-না। পথে শত্রুদের হাতে সংবাদ হস্তগত হওয়ার আশংকায় সুলতান কোন লিখিত পয়গাম দেননি। আমি সেনাবাহিনীর একজন কমান্ডার। যেহেতু পয়গামটিও সামরিক কৌশল বিষয়ক, এজন্য সুলতান আমাকে পাঠিয়েছেন মৌখিক পয়গাম দিয়ে, লিখিত পয়গাম দেননি।"

"আপনি জানেন, রাজা জয়পাল পর পর তিনবার আমাদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান চালিয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকবার সে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। প্রত্যেকবারই সে মোটা অংকের জরিমানা দিয়ে আর যুদ্ধ না করার অঙ্গীকার করেছে কিন্তু কোন অঙ্গীকারই সে রক্ষা করেনি। শেষ পর্যন্ত তাকে জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিতে হলো। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত মুক্তিপণ তার স্থলাভিষিক্ত পুত্র আনন্দ পাল আজো পর্যন্ত আদায় করেনি। বরঞ্চ পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তার সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নেয়ার খবর পেয়েছি আমরা।"

যে দুই যুবতী দাউদ বিন নসরের পিছনে দাঁড়িয়ে বাতাস করছিল এরা উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

"আপনি জানেন যে, আমাদের রাজধানীকে নিরাপদ করতে আমরা লুগমান ও পেশোয়ার কজা করে নিয়েছি। চুক্তি মতে পাঞ্জাব আমাদের শাসনাধীন। আনন্দ পাল ও পাটনার শাসক বিজে রায় আমাদের নিয়োজিত শাসক। সুলতানের অনুমোদন ছাড়া তাদের কোন নির্দেশ জারি করার অধিকার নেই— এরা আমাদের সুলতানের অধীনে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করবে মাত্র। কিন্তু উভয়েই রাজা জয়পালের কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির জন্ম দিচ্ছে। তাই অন্যান্য হিন্দু রাজাদের নিয়ে এরা যাতে আবার সেনা অভিযান চালাতে না পারে সেজন্য সুলতান ইচ্ছা করছেন লাহোরে অগ্রাভিযান করবেন। সুলতানের উদ্দেশ্য দু'টি। শাসকদের পীড়ন থেকে সাধারণ নাগরিকদের মুক্তি দেয়া এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা। বহু ত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত একটি মুসলিম রাজ্য আজ মূর্তির বাগাড়ে পরিণত হয়েছে, সেখানে আবার তাওহীদের তাকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করাই সুলতানের উদ্দেশ্য।"

"এ পরিকল্পনায় আমরা কি করতে পারি।" জিজ্ঞেস করল দাউদ।

"যেহেতু আমি সৈনিক, এজন্য সামরিক ঢংয়ে কথা বলছি। আমরা বিজি রায় এবং আনন্দ পালের অবস্থানের মাঝামাঝি স্থানে একটি ঘাঁটি স্থাপন করতে চাচ্ছি। আপনি যেহেতু উভয়ের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করছেন এজন্য আপনার এলাকাকে ঘাঁটি স্থাপনের সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা বিবেচনা করছি। আমরা ঘাঁটি স্থাপন করেই মুসলমান অধিবাসীদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে শুরু করব। এতে আপনাদের যেমন ফায়দা হবে আমরাও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হব। এটা হবে উভয়ের জন্যে উপকারী। আমরা এখানে এলে আপনার দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পাবে না পৌত্তলিকরা। প্রয়োজনের সময় আমরা একে অন্যের সহযোগিতা করতে পারব। এ ব্যাপারে সুলতানের প্রয়োজন আপনার পক্ষ থেকে নিশ্চিত আশ্বাস। আপনার কাছ থেকে আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা চাই যে, আমরা যখন পেশোয়ার থেকে মুলতানের দিকে অগ্রাভিযান করে আপনার এলাকা অতিক্রম করব তখন যদি বিজি রায় কিংবা আনন্দ পাল আমাদের পথ রোধ করে তবে পিছন থেকে অথবা এ পাশ থেকে আপনি ওদের উপর হামলা করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবেন। তাহলে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে আমাদের সুবিধা হবে। আমরা কখন-ই আপনাকে একা ছেড়ে দেবো না। প্রয়োজনে আপনার জন্য আমরা আমৃত্যু লড়ে যাব।"

"সুলতান মাহমূদ অভিযান পরিচালনা করতে চাইলে তিনি তা করতে পারেন। আমরা তো আর তাকে বাধা দিতে পারব না। কিন্তু দুই রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো সৈন্য আমাদের নেই।" বলল দাউদ বিন নসর।

"আপনার জবাবে আশ্বস্ত হতে পারলাম না। আপনার কাছ থেকে এ জবাব নিয়ে গেলে সুলতান নিশ্চিত হতে পারবেন না। সেনারা তো আপনার মতো আমার মতো সেনাপতিদের কমান্ডে অগ্রাভিযান চালাবে, কাজেই সমূহ বিপদ আশংকার বিষয়টি আমাদেরকেই ভাবতে হবে। আমি আসার সময় এ অঞ্চলের পথ ঘাট দেখে এসেছি। এলাকাটি আমাদের জন্য নিরাপদ হলেও পাহাড়ের চূড়া থেকে তীরন্দাজদের টার্গেট হওয়ার আশংকা প্রবল। কাজেই সেনাবাহিনীর জন্যে পথটি মোটেও সুগম নয়। আপনার কাজ হবে আগে থেকে আপনি আপনার তীরন্দাজ সেনা ইউনিটকে ওই এলাকায় পাহারায় নিয়োগ করবেন, যাতে আমাদের সেনারা নিরাপদে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাগুলো অতিক্রম করতে পারে।"

"এ কাজ করতে হলে আমাদের তীরন্দাজদেরকে আমাদের প্রশাসনিক এলাকার বাইরে হিন্দুদের এলাকায় পাঠাতে হবে।" বলল দাউদ বিন নসর।

"লুগমান ও গজনী কখনও জয়পালের এলাকা ছিল না। অবশ্য লুগমান ও হিন্দ আমাদের এলাকাও নয়। কিন্তু জয়পাল আমাদের এলাকাতে সেনা অভিযান করেছে, এর জবাবে আমরা তাদের এলাকায় অভিযান চালাচ্ছি। আপনি কি একথা ভুলে গেছেন, যে এলাকা এরা শাসন করছে তা প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল! আমরা আমাদের ভূমি তাদের দখলমুক্ত করতে চাচ্ছি।"

গভীর চিন্তায় তলিয়ে গেল দাউদ। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, "আসলে আপনার সুলতানের চাহিদার জবাব তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া মুশকিল। এজন্যে আমার ভাবতে হবে। উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনা করতে হবে। আপনি এখানে চারদিন অপেক্ষা করুন। শহরের দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরে দেখুন, আমি আমার উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করে নেই। আজ থেকে আপনি রাজকীয় অতিথি। আজ রাতে আপনার সম্মানে ভোজসভা হবে। সেই সভায় আপনার সম্মানে বড় ধরনের আপ্যায়ন ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে।"

সত্যিই নৈশভোজের আয়োজন ছিল রাজকীয়। অনুষ্ঠানের বিলাসী আয়োজন দেখে আসেম ওমরের চোখ ছানাবড়া।

প্রাসাদের বাগানে আয়োজন করা হলো নৈশভোজের। রঙ-বেরঙের ঝাড়বাতি, জরিদার শামিয়ানা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে মনমাতানো প্যান্ডেল।

ঝাড়বাতিগুলো দেখে আসেমের কাছে মনে হলো, সোনা ও রুপার তৈরি কতগুলো জ্বলন্ত তারা। বহু বর্ণের ফানুস এবং জরিদার কারুকার্যময় শামিয়ানার সাথে ঝুলানো ঝাড়বাতিগুলোর নীচে অবস্থানরত মানুষগুলোর গায়ের রং যেমনই হোক না কেন সবাইকে ফর্সা আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী মনে হচ্ছিল।

অভাবিত এই মজলিসের বর্ণাঢ্য আয়োজনে আসেম এমনই প্রভাবিত হয়ে পড়ল যে, সে ঘোরের মধ্যে হারিয়ে গেল। মনে হতে লাগল, সে কোন স্বপ্নালোকে বিচরণ করছে। তবলার ও ঢোলের হাল্কা বাজনার তালে মঞ্চে একটি নর্তকী নাচের নানা মুদ্রা উপস্থাপন করছে। যেন একটি নাগিনী ফনা তুলে খেলছে শিকার নিয়ে। নর্তকী ষোড়শী যুবতী। দুই বাহু সম্পূর্ণ খোলা, পরনের কাপড় অতি সূক্ষ্ম। নাভীর নীচে কতগুলো রেশমী সূতোর পাকানো ঝালর দোল খাচ্ছে নাচের তালে তালে। এমন দোলনীতে তার উরুসন্ধি বারবার প্রকাশ পাচ্ছে। বুকের স্বল্পবসন তরুণীর যৌবনকে ফুটন্ত গোলাপের মতো প্রস্ফুটিত করছে। তরুণীটি হয়তো এমনিতেই সুন্দরী, কিন্তু আলোর বর্ণাঢ্য রঙ-এর প্রতিবিম্ব ওকে এতোই মায়াবী ও মোহনীয় করে তুলেছে যে, ওর রেশমী চুলের বাহার আর রুপোর মতো দাঁতের মুক্তা ঝরানো হাসিতে অনুষ্ঠানের সকল পুরুষের দৃষ্টি ওর দিকে নিবদ্ধ হতে বাধ্য।

নর্তকীটি বাজনার উচ্চাঙ্গ তালে নাচতে নাচতে আসর কাঁপিয়ে হারিয়ে গেল। যেন কোন জলপরী জলতরঙ্গের মধ্যে খেলা করে হঠাৎ জলরাশির মাঝে তলিয়ে গেল। বাজনা বদলে গেল। নতুন করে শুরু হল অন্য সুর। এবারের বাজনার তাল লয় ভিন্ন, আরো উগ্র, আরো তীব্র। ঠিক এ সময়ে জলরাশির ভেতর থেকে যেন হঠাৎ করে দৃশ্যমান হলো আরেক নর্তকী। যেন কোন জলপরী পানির তলা থেকে ভেসে উঠেছে। এটি আগের তরুণীর চেয়ে আরো স্বল্পবসনা, আরো বেশি উদ্দীপক। এর নাচ ও তাল আরো মোহনীয়।

আসেম বিন ওমর দাউদ বিন নসর থেকে দূরে। শত শত মেহমানের সাথে উপবিষ্ট। সবাই জানে, আজকের এ আয়োজন সুলতান মাহমূদের বিশেষ দূতের সম্মানে। কিন্তু কে কোথায় আর মেহমানই বা কে সে খবর নেয়ার খেয়াল নেই কারো। সবার দৃষ্টি মঞ্চের নৃত্যরত কিশোরীদের দিকে। ওদের নাচ আর যন্ত্রীদের বাজনা সমবেত সবাইকে আবেগের শৃঙ্গে পৌঁছে দিল। যুবতীদের নাচের মুদ্রা আর শারীরিক কসরত থেকে চোখ ফেরানো কারো পক্ষেই সম্ভব হলো না। আসেম ওমর অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নর্তকীর প্রতি। এতো সুন্দর, এতো আকর্ষণীয় হতে পারে নারী, সে তা কখনও ভাবতেই পারেনি। নর্তকীর নিক্কনের ঝংকারে কোথায় যে হারিয়ে গেল আসেম তার খবর কে রাখে।

এর আগে শরীরের কাঁপুনি ঝাঁকুনি আসেম দেখেনি তা নয়, তবে সেই কাঁপুনি ঝাঁকুনি নর্তকীর নয়। যুদ্ধ ময়দানে আহত মৃত্যু পথযাত্রী সৈনিকদের, যুদ্ধরত সিপাহীদের— যারা আহত হয়ে মাটিতে-মরুতে কিংবা পাহাড়ী পাথুরে জমিনে তড়পাতে তড়পাতে নিস্তেজ হয়ে চিরদিনের জন্যে স্থির হয়ে গেছে। গত বিশ বাইশ বছর যাবত আসেম দেখেছে যুদ্ধাহত সৈনিকের মৃত্যু যন্ত্রণার ছটফটানি। সেখানে দোস্ত-দুশমনের একই রঙ, একই কাতর ধ্বনি।

মাটি আর খুন এই দু'য়ের সাথে ছিল আসেমের মিতালী। রণাঙ্গনের ভয়াবহ দৃশ্য আসেমের প্রিয়। মরা এবং মারা এই ছিল আসেমের নেশা, ভালবাসা। আসেম তার সুলতানের চরিত্রেও এই রঙ-ই দেখে আসছে। সুলতানের দরবারে আসেম ধুলোবালির যে আস্তরণ দেখে, সেই ধুলো মাটির চরিত্র-আদর্শ সে সুলতানের মাঝেও দেখেছে। সুলতানের দরবারে এ ধরনের রঙিন ফানুস কল্পনা করাও মুশকিল।

দাউদ বিন নসরের দরবারে আসেম নৃত্যরত নর্তকীদের যে নাচের মুদ্রা দেখেছে, উদ্ভিন্ন যৌবনা উর্বষী তরুণীদের স্নায়ু উদ্দীপক যে অঙ্গভঙ্গি আসেম প্রত্যক্ষ করল, তাতে তার মধ্য থেকে যোদ্ধার আদর্শ বিলীন হয়ে মনের ভেতর ভোগবাদী লিপ্সা জেগে উঠেছে। ভেতর থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আসেমের ঘুমিয়ে থাকা কাম প্রবৃত্তি। যুদ্ধ ময়দানের বীভৎস রক্তাক্ত রূপের প্রতি তার মনে জন্ম নিতে লাগল প্রচণ্ড ঘৃণা। যুদ্ধাহত সৈনিকের রক্ত-রাঙা চেহারা আর তপ্ত খুনের গন্ধ তার মনের মধ্যে তীব্র বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করল, তদস্থলে জন্ম নিল ভোগের উন্মাদনা। দাউদ বিন নসরের এই কামোদ্দীপক রগরগে আয়োজন আসেমের ভেতরকার যোদ্ধাকে অল্প সময়ের মধ্যে আমূল বদলে দিল। সে অনুভব করল যুদ্ধের ক্লান্তি, ক্ষুধা-পিপাসার যাতনা। তার দু'পা এখন রণাঙ্গনের অশ্বারোহণে অক্ষম। তার তাবৎ সাহস, শক্তি ও প্রশিক্ষণ বিলীন হয়ে সেখানে উঁকি দিল ভীরুতা এবং যুদ্ধাবেগের স্থান দখল করল যৌবনের উন্মাদনা।

তরুণী দু'টি নৃত্য প্রদর্শন করে চলে যাওয়ার পর এলো চৌদ্দ পনেরো বছরের এক বালক। বালক হলেও তার চেহারা তরুণীদের চেয়ে আরো বেশি মোহনীয়। বালকটি আরো বেশি যৌন উদ্দীপক নৃত্য প্রদর্শন করতে শুরু করল। বালকের সাথে সমান তালে সহযোগী হলো অন্য দু'টি তরুণী। এরা প্রত্যেকেই স্বল্পবসনা। এদের যৌথ নৃত্য উপস্থাপনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল আসেম। তার দৃষ্টি ওদিকেই নিবদ্ধ। আশপাশের কোন খেয়াল নেই, কে কোথায় কি করছে।

ঠিক এ মুহূর্তে তার কানের কাছে রিনঝিন শব্দ। উপরের দিকে চোখ তুলল আসেম। দেখল, নর্তকীদের মতোই এক উর্বষী যুবতী শ্বেত শুভ্র রুপালী তশতরী হাতে তার সামনে দণ্ডায়মান। হাতে একটি পানপাত্র। তরুণীর ঠোঁটে ঈষৎ মুচকী হাসি, এমন মোহনীয় হাসি কখনও প্রত্যক্ষ করেনি আসেম। তরুণীর সলজ্জ গ্রহণের আবেদন আর আপ্যায়নের মাদকীয় ভঙ্গি আসেমকে মর্তে নামিয়ে দিল।

আসেম তরুণীকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, "এটা হয়তো শরাব। আমি শরাব পান করি না। আমি মুসলমান।"

"শরাব নয় শরবত।" আসেমের সামনের টেবিলে তশতরী রেখে শৈল্পিক ভঙ্গিতে পানপাত্র সুরাহী থেকে ভরে দিল তরুণী।

একটা শংকা মনে চেপে রেখেই পানপাত্র হাতে নিল আসেম। চুমুক দিল পান পাত্রে। মুহূর্তের মধ্যে অনুভব করল এক অজানা ভাল লাগার অনুভূতি। আসেম ওমর অনুভব করল এক অভাবিত স্বাদ-তৃপ্তি। সে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল তরুণীর দিকে— আহ্! কি স্বাদ! এ কি শরবত না জান্নাতের নেয়ামত! কিন্তু জিজ্ঞেস করার অবকাশ হলো না। তরুণীর চোখে চোখ পড়তেই ওর মাদকীয় হাসিতে হারিয়ে গেল আসেমের কণ্ঠ। আরো গভীর আবেশে তলিয়ে গেল আসেম। পুনরায় সোরাহী থেকে পানপাত্র পূর্ণ করে দিল তরুণী। অব্যক্ত ভঙ্গিতে নিবেদন করল, পান করুন সম্মানিত মেহমান! আপনাকে পান করিয়ে মাতাল করাই আমার কাজ। ভেসে চলুন স্বপ্নময় আগুনের দিকে। ইত্যবসরে আসেমের সামনে হাজির হল আরো বড় ধরনের একটি তশতরী নিয়ে অনিন্দ্য সুন্দর বালক। এ তশতরিতে ভুনা করা পাখি। তশতরী থেকে ভাপ উঠছে। মন ভুলানো স্বাদের গন্ধ। সে গন্ধে যে কোন ভোজনবিমুখ মানুষও আহারে প্রলুব্ধ হতে বাধ্য।

আশপাশে একবার চোখ বুলাল আসেম। সমবেত প্রত্যেক মেহমানের সামনে এ ধরনের পাখি ভুনার করা পাত্র রাখা হচ্ছে।

তরুণী ও বালক চলে গেছে। এবার সাগ্রহে আসেম তশতরী থেকে তুলে নিল একটি ভুনা পাখি। এক লোকমা মুখে পুরে চুমুক দিল পেয়ালায়। পাখির স্বাদ আর শরবতের তৃপ্তি বিস্মৃত করে দিল আপন কর্তব্য। একের পর এক পাখি আর পানপাত্র ভরে গলাধঃকরণ করতে থাকল আসেম। তৃপ্তির সুখে ভাসতে লাগল অন্য এক আসেম।

এই ফাঁকে বার কয়েক তার কাছে এলো সেই তরুণী ও বালক। খালিপাত্র তুলে নিল আর ভর্তি পাত্র রেখে দিল। সেদিকে খেয়াল ছিল না আসেমের। কতগুলো পাখি আর কত গ্লাস পানীয় পেটে চালান করেছে সে আন্দাজও ছিল না

তার। চোখ দুটো গোল হয়ে এলো। মাথা কিছুটা ভারী ভারী মনে হল। খাবার পরিবেশনকারিণী তরুণী তাকে হাত ধরে নিয়ে গেল একটি কক্ষে। অস্বাভাবিক সুন্দর পরিপাটি সাজানো কক্ষ। বিশাল এক পালঙ্ক। তুলতুলে তোষকের উপর রেশমী গালিচা। আসেম ঠিক মতো পা ফেলতে পারছিল না। কক্ষের দরজায় গিয়ে অনুভব করল, সে হয়তো ভুল করে শাহী কক্ষে ঢুকে পড়েছে। এমন বিলাসী বিছানা সে কল্পনা করতে পারছে না। কিন্তু তরুণী তাকে হাত ধরে বসিয়ে দিল পালঙ্কের উপর। মাথা থেকে পাগড়ী খুলে রেখে দিল পাশের টেবিলে।

"আহ্! যা পান করালে সেটাতো শরবত নয় শরাব!" জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল সে তরুণীর দিকে।

"আমরাও মুসলমান। এখানে ওই ধরনের শরাব পান করা হয় না, কাফের বেঈমানরা যেসব শরাব পান করে। আমরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের উত্তরসূরী। আমরা আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি।" বলল তরুণী।

আবারো পানপাত্র থেকে গ্লাস ভরে মুখের কাছে ধরল তরুণী। তরুণীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারল না আসেম। পান শেষে যখন গ্লাস রেখে দিল তখন তরুণী আসেমের গণ্ডদ্বয় হাতে নিয়ে আদুরে স্পর্শে চোখে চোখ রাখল।

"এটাই জীবন জনাব! এটাই ইসলাম! এতে কোন সাজাও নেই কোন দেনাও নেই।" মাদকতা মেশানো ভঙ্গিতে বলল তরুণী।

আসেমের সামনে অর্ধনগ্ন তরুণী। সে তার ভুবন ভুলানো মোহিনী হাসি আর শরীরের মিষ্টি গন্ধে আপ্লুত। আরো ঘনিষ্ঠ হলো তরুণী। আসেম তরুণীর উষ্ণতায় ভুলে গেল নিজের অবস্থান, কর্তব্য ও আত্মপরিচয়। তার মাথা গুলিয়ে গেল কাম তৃষ্ণায়। তার ঈমানের প্রদীপ নিভে গেল মদ, নারীর দমকা ঝাপটায়। ভেসে চলল আসেম আদিমতার নেশায়, জীবনের রঙীন ভেলায়।

সন্ধ্যায় যে সময়টায় মেহমানরা ভোজসভায় আসতে শুরু করে তখন রাজপ্রাসাদে দাউদকে বাতাসকারিণী দুই তরুণীর একজন নির্জন কক্ষে এক প্রৌঢ়কে বলছিল— "মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিশেষ দূত দাউদ বিন নসরকে কি পয়গাম দিয়েছে। সেই তরুণীই নৃত্য চলার সময় আসেম বিন ওমরকে আপ্যায়নে সহযোগিতা করছিল আর প্রৌঢ় লোকটি দাউদের পাশে বসে সবকিছু প্রত্যক্ষ করছিল, আপ্যায়নও গ্রহণ করছিল।

সেই লোকটি দাউদকে বলল, "সুলতান মাহমূদের পয়গামে আপনার ভয় পাওয়ার কি আছে! রাজা আনন্দ পাল এবং বিজি রায় মহাশয়দ্বয় আপনার রাজ্যের

নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাদের প্রতিনিধি হিসেবেই আপনার এখানে রয়েছি আমি। যে কোন সমস্যায় আপনার জন্যে রাজাদের ভরপুর সহযোগিতা নিতে পারব আমি। সুলতান মাহমূদ একজন সাম্রাজ্যবাদী। রাজ্য বিস্তারে হিন্দু মুসলমান তার কাছে সমান। আপনার লাভ ক্ষতিতে তার কিছু যায় আসে না। সে তার নিজের স্বার্থে আপনাকে ব্যবহার করতে চায় মাত্র।"

"আপনি কি আমার প্রতি আস্থা রাখতে পারছেন না?" প্রৌঢ়কে প্রশ্ন করল দাউদ। "আপনাদের সাথে যে মৈত্রীর বন্ধন যে কোন মূল্যে তা অক্ষুণ্ন রাখতে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আপনি কি খেয়াল করেননি, ইসলামের আত্মশক্তিকে আমি কিভাবে বিদায় করেছি আমার প্রশাসন থেকে? আপনি খেয়াল করেননি, মুসলমানদের হৃদয় থেকে আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়াদি আমি কত কৌশলে নির্মূল করছি? আপনাকে কে ধারণা দিল যে, আমি সুলতান মাহমূদের প্রত্যাশা পূরণ করব? দেখুন না ওর জন্যে কি ব্যবস্থা আমি করেছি! যে মেয়েটিকে আমি দূতের সেবায় নিয়োগ করেছি, যে কোন কঠিন আদর্শের অধিকারী পরহেযগার মু'মেনকেও সে তার যাদুকরী কৌশলে ঈমানহারা করতে সক্ষম। তাকে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ দিয়ে সেভাবেই তৈরি করেছি। দেখবেন সে দূত বেচারাকে ভেড়া বানিয়ে ছাড়বে।"

"এটাই যথেষ্ট নয় জাঁহাপনা! এই ব্যক্তি যেমন সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা, আমিও সামরিক বাহিনীর অফিসার। আমিও আপনাকে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকেই পরামর্শ দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস, আপনি সুলতান মাহমূদকে মোটেও পছন্দ করেন না। আপনি এটাও আশা করেন যে, সুলতান মাহমূদের মতো আপদকে দূরে রেখেই যাতে ঠাণ্ডা করে দেয়া যায়। এজন্য আপনি এই দূতকে ব্যবহার করতে পারেন। আপনি দূতকে বলে দিন, সুলতান মাহমূদের অগ্রাভিযানে তার সৈন্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন আপনি। এ আশ্বাসের ভিত্তিতে ওরা যখন এগিয়ে আসবে, তখন আনন্দ পালকে বলে তার সৈন্যদের আমি সুবিধা মতো জায়গায় বসিয়ে রাখবো। ধারণাতীতভাবে আনন্দ পালের সৈন্যরা 'খেল খতম' করে দেবে।"

"দূতের ব্রেন ওয়াশের ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। দেখেননি, শরবত মনে করে কতো গ্লাস খাঁটি মদ গিলেছে বেটা। এরপর যেটুকু হুঁশ-জ্ঞান থাকবে সেটুকুও দূর হয়ে যাবে মেয়েটির কৌশলী পরিচর্যায়।" বলল দাউদ।

আসেম ওমরের চার দেহরক্ষী দাউদ বিন নসরের দেহরক্ষীদের সাথে আহার করল। ওরা ঘুর্ণাক্ষরেও জানল না, তাদের দূত দাউদ বিন নসরের বালাখানায় এক রাতের স্বর্গবাসে মত্ত।

যে আসেমের ঘুম ভাঙতো অতি প্রত্যুষে, সেই আসেম সূর্যোদয়ের সময়ও গভীর ঘুমে তলিয়ে রইল। বেলা অনেক উপরে উঠার পর চোখ মেলল আসেম। চোখ মেলেই ঘাবড়ে গেল সে। গত রাতের ঘোর কেটে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে উঠল তার কাছে। ঠিক এ সময়ে ঘরে প্রবেশ করল সেই তরুণী। তার মুখে স্মিত হাসি আর হাতে তশতরী।

আসেম তাকে লক্ষ্য করে বলল, "গত রাতে তুমি আমাকে গুনাহগার করে দিলে। এখানে আমি বিশেষ এক কাজে এসেছিলাম।" কিছুটা আতংকিত কণ্ঠ আসেমের।

তরুণী তশতরী টেবিলের উপর রেখে দুধের একটি গ্লাস আসেমের হাতে ধরিয়ে দিল কিন্তু আসেম টেবিলে রেখে দিল গ্লাস। বলল, "গত রাতে কি ঘটেছিল তা না বলা পর্যন্ত তোমার হাতের কিছুই আমি স্পর্শ করব না।"

"তুমি জাহান্নাম থেকে জান্নাতে এসেছো! বুঝলে? এটার নাম জীবন, এটাই জিন্দেগী। বেঁচে থাকার সার্থকতা এখানেই।" বলল তরুণী।

এমন সময় এক শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রুধারী দীর্ঘ জুব্বা পরিহিত সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ প্রবেশ করল সে কক্ষে। স্বগতোক্তি করতে লাগল— "হতভাগ্য তোমাদের বাদশাহ! যাকে তোমরা সুলতান বলে থাকো। তার প্ররোচনায় জীবনের এই স্বাদ এই প্রাপ্তিকে তোমরা পাপ বলছো। অথচ জীবনে এতটুকু ভোগ করার অধিকার তোমাদের প্রাপ্য। কিন্তু সে তোমাদের জীবনকে বিষাদময় করে দিয়েছে। জীবনের স্বাদকে তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অগণিত প্রাণের বিনিময়ে নিজের স্বর্গবাসকে নিশ্চিত করতে চায় সে। এজন্য তোমাদের দিয়ে সে যুদ্ধ করায়, রক্তের হোলি খেলে। আর নিজে থাকে নিরাপদে। কে তোমাদের বলেছে যে, ইসলামে আরাম-আয়েশ, এতটুকু বিনোদন হারাম?" বৃদ্ধের বলার ঢঙ এবং ভাষার কারুকাজ এতো নিপুণ এবং কণ্ঠ এতো মধুর যে, আসেম ওমর রাতের তরুণীর মতো বুড়োর কাছে নিজেকে কখন সঁপে দিল টেরই পেল না। সে এতোটাই বুড়োর কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়ল যে, বুড়োর প্রতিটি কথাকে তার মনে হচ্ছিল জীবনের প্রতিচ্ছবি, সত্য ও বাস্তবতার প্রতীক।

আসলে এটা মানুষের সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতা। পাপ যখন পূর্ণ অবয়বে মানুষকে গ্রাস করে ফেলে তখন তার সাধারণ বোধটুকুও লোপ পেয়ে বসে, পাপকাজকেই তখন আকর্ষণীয় মনে হতে থাকে। পাপ কাজের পক্ষে তখন যুক্তি খুঁজে ফিরে মানুষের মন। অপরাধকে যৌক্তিকতার লেবেল এঁটে আরো অপরাধের গভীরে তলিয়ে যেতে যুক্তি সংগ্রহ করে মানুষ। আসেম ওমরের মন থেকেও ইসলামের

বিধি-নিষেধ লোপ পেয়ে গেল। ভোগবাদিতায় গা ভাসানোর জন্যে তার পক্ষে দরকার ছিল কিছু যৌক্তিক সাপোর্ট। কিন্তু তা আসেমের মাথায় ছিল না। এই পণ্ডিত লোকটি সেই হারামকে হালাল করণের যৌক্তিক ভিত্তিগুলোই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করছিল। আসেমের এ মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল ভোগবাদের পক্ষে এ ধরনের যৌক্তিক বিশ্লেষণ। বুড়ো তাই পরিবেশন করছিল। আরো নিবিড়ভাবে গ্রহণ করতে শুরু করল আসেম বুড়োর যুক্তিগুলো।

আসেম ওমর ছিল সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীর অন্যতম সেরা কমান্ডার। তাকে বিপথগামী করতে পারলে সহজেই সুলতান বাহিনীর বড় একটি অংশকে যুদ্ধবিমুখ করা সম্ভব। সে লক্ষ্যকেই সামনে রেখে হিন্দু রাজা আনন্দ পাল ও বিজি রায়ের নিয়োজিত প্রতিনিধির সাথে পরামর্শ করেছিল দাউদ।

আসেম ওমর কুচক্রীদের ফাঁদে ফেঁসে গেল। তার কাছে দাউদ পয়গাম পাঠাল, আজ রাজকীয় মেহমান হিসেবে গজনীর বিশেষ দূতকে শহরের দর্শনীয় জায়গাগুলোতে নিয়ে যাওয়া হবে। আসেমের জন্যে রাজকীয় ঘোড়ার গাড়ি আনা হয়েছে। যে গাড়িতে স্বয়ং দাউদ চড়ে থাকে। গাড়িটি চারটি বিশেষ ঘোড়া টেনে নেবে। সাথে দেয়া হলো দাউদের বিশেষ নিরাপত্তা রক্ষীদের ক'জন। বিশেষ পোশাকে সজ্জিত এরা। আসেমকে নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম হলো সমুদ্রতীরের মনোরম দর্শনীয় জায়গায়।

রাজকীয় বিলাসী ব্যবস্থাপনায় আসেম ভুলে গেল নিজের কর্তব্য কাজ। সে এখন নিজেকে বিশেষ সম্মানিত বোধ করতে লাগল। তার মধ্যে জন্ম নিল রাজা রাজা মনোভাব। সাথীদের খোঁজ-খবর নেয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করল না সে। তারা কোথায় আছে, কিভাবে আছে, সে খবর নেয়ার সুযোগ তার নেই। ওদেরকেও রাজপ্রাসাদ থেকে জানিয়ে দেয়া হলো, আজ তাদের দূতের ভ্রমণের প্রোগ্রাম করা হয়েছে। ইচ্ছে করলে তারাও এই সুযোগে শহর ঘুরে দেখতে পারে। সুযোগ পেয়ে তারাও শহর দেখতে বেরিয়ে পড়ল।

* * *

একজন ভাবগম্ভীর, সুদর্শন বুযুর্গ লোকই মনে হচ্ছিল তাকে দেখে। পরিধেয় পোশাক, মুখের দাড়ি আর কথা বলার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল, লোকটি বড় ধরনের আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি। একটি উঁচু দেয়াল ঘেরা বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখে থেমে গেল, যখন তার চোখে পড়ল চারজন সৈনিক ধরনের লোকের আগমন। ওদের পোশাক দেখেই তিনি আন্দাজ করেছিলেন, এরা মুসলমান সৈনিক এবং এখানে নবাগত। এদের মুলতানের অধিবাসী মনে হলো না, ভারতীয় মনে করাও

কঠিন। বুযুর্গ লোকটি চারজনের পথ রোধ করে দাঁড়াল। মুচকি হেসে বলল, "আপনারা গজনীর অধিবাসী?"

তারা চারজন থেমে গেল এবং হেসে হ্যাঁ সূচক জবাব দিল।

"আপনারা কি একটু সময়ের জন্যে আমার ঘরে আসবেন? আমাকে আপনাদের মেহমানদারী করার সুযোগ দিয়ে ধন্য করবেন?" ফারসী ভাষায় বললেন তিনি।

"পরবাসে নিজের মাতৃভাষার আহ্বানে কালবিলম্ব না করে সবাই তার অনুগামী হল। আপ্যায়নের ফাঁকে অতিথিরা জানাল তারা কমান্ডার আসেম ওমরের নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে গজনী থেকে এখানে এসেছে। কমান্ডার আসেম ওমর সুলতানের বিশেষ বার্তা নিয়ে দাউদ বিন নসরের এখানে এসেছেন।

"আসেম ওমর এ মুহূর্তে কোথায়?" জিজ্ঞেস করলেন বুযুর্গ।

"আমরা তাকে শাহী গাড়িতে সওয়ার হয়ে ভ্রমণে বের হতে দেখেছি।" জবাবে বলল এক নিরাপত্তারক্ষী।

"আমি আসেম ওমরের সাথে সাক্ষাত করতে চেয়েছিলাম কিন্তু জানতে পারলাম, সে এখন তার নিরাপত্তারক্ষীদের সাথেও সাক্ষাতের প্রয়োজন বোধ করছে না।" বলল লোকটি।

"কেন? কি হয়েছে?" বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জানতে চাইল এক নিরাপত্তারক্ষী। "এমন কিছু ঘটেনি তো যে তাকে বন্দী করে ফেলা হয়েছে? আর বন্দিশালায় না খেয়ে কষ্ট যাতনায় মৃত্যুবরণ করতে হবে তাকে!"

"সে বন্দিদশা অনেক ভাল যে বন্দিদশায় মানুষ কষ্ট দুর্ভোগ পোহায়, কষ্ট যাতনায় মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু যে জিঞ্জিরে আপনাদের কমান্ডারকে বাঁধা হয়েছে, তা খুব জটিল। এই জিঞ্জিরে মানুষ কষ্ট পায় না বটে কিন্তু তার ভেতরের বিবেক বোধ, ঈমানী শক্তি মরে যায়, সৈনিকের মধ্যে জন্ম নেয় ভীরুতা। এটা এমন এক জিঞ্জির যা হলো নারীর রেশমী চুল আর ষোড়শী যুবতীদের দেহবল্লরীর মাদকতার বাঁধন। যে কোন সৈনিক এ ধরনের বন্দিদশার শিকার হলে সে সৈনিকের আর যুদ্ধ করার মুরোদ থাকে না, সে হয়ে পড়ে নারীর আঁচলে বাঁধা পোষা জন্তু। আচ্ছা, গতরাতের নৈশভোজে কি আপনারাও অংশগ্রহণ করেছিলেন?"

"না। আমাদেরকে ভিন্নভাবে খাবার দেয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠানে আমাদের নেয়া হয়নি।" বলল এক নিরাপত্তাকর্মী।

"ওকে গতরাতে শরাব পান করানো হয়েছে এবং গতরাত সে এমন এক যাদুকন্যার বাহুডোরে ছিল যাকে এক কথায় আমরা মায়াবিনী বলে জানি।" বললেন বুযুর্গ।

"আপনিও কি সেই অনুষ্ঠানে ছিলেন?"

"না, আমি ওখানে যাইনি। দাউদ শাহীর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমার কান ও চোখ সময় সময় শাহী মহলের দিকে তাক করা থাকে। ভেতরের সব খবর আমার জানা। দাউদের কাছে আসেম কি পয়গাম নিয়ে এসেছে সে খবরও আছে আমার কাছে।"

"তাহলে ভয়ের ব্যাপারটি কি?"

"আশংকার ব্যাপার হলো, আসেম সুলতানের বিশেষ দূত হিসেবে এসেছে বটে, কিন্তু সে দাউদ ও হিন্দুরাজাদের কাছে আত্মবিক্রি করে তাদের চর হিসেবে গজনী ফিরে যাবে। আসেম সুলতানের জন্যে এক কঠিন প্রতারণার ফাঁদে পরিণত হবে। আমি ভাবছিলাম, কি করে আসেম অথবা আপনাদের সাথে সাক্ষাত করি। কোন সুযোগই করতে পারছিলাম না। সৎ উদ্দেশ্য থাকলে যে কোন কাজে আল্লাহ্ সাহায্য করেন। আপনারা শহর দেখতে বের হলেন, আর এই সুযোগে আল্লাহ্ আপনাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ করালেন। আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা এখন দূর হয়ে গেল।"

"আমাদেরকে বলা হয়েছে, মুলতান একটি ইসলামী রাজ্য।" বলল একজন নিরাপত্তারক্ষী। অপর একজন বলল, "মুসলমান হওয়ার কারণে সুলতান সুবক্তগীনের সময় থেকেই দাউদ বিন নসর আমাদের সুহৃদ।"

"আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি এই ভেবে যে, সবকিছু জানা থাকার পরও সুলতান মাহমূদ কি করে আপনাদের এখানে পাঠালেন এবং প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখলেন!

তো আমার কাছ থেকে জেনে রাখুন। যাতে আপনারাও আপনাদের কমান্ডারের মতো ওদের জালে আটকা না পড়েন।"

"... মুলতানের শাসন ক্ষমতা কেরামতীদের হাতে। এরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করে বটে কিন্তু তাদের আকীদা বিশ্বাস সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থী। যেমন— এরা আখেরাত বিশ্বাস করে না। এরা বিশ্বাস করে, বেহেশত দোযখ দুনিয়াতেই। আখেরাতে শাস্তি-পুরস্কার বলতে কিছু নেই। এরা ইসলামের হারাম

হালালকে অস্বীকার করে। ব্যভিচার ও মদপানে উৎসাহিত করে। তারা মনে করে, মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিই করেছেন ভোগ-বিলাসের জন্যে এবং ইসলামের হারাম হালালের বিষয়টি সম্পূর্ণ অবান্তর। এরপরও মুসলমানদের ধোঁকা দিতে এরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করে। প্রকৃতপক্ষে এরা হিন্দু, খৃস্টান ও ইহুদীদের চেয়েও জঘন্য, ছদ্মবেশী ভয়ংকর দুশমন। আব্দুল্লাহ এবং মাইমুন নামের দু' আরব এ মতবাদের উদ্ভাবক। কোন আরব দেশ থেকে তৃতীয় হিজরী শতকে এদের উত্থান শুরু। তবে এই মতবাদের মূল জনক এক খৃস্টান যাজক। ইহুদীদের সমর্থন ও সহযোগিতাও রয়েছে এদের পিছনে। কারো মতে ইরানের এক বড় অংশ এই কেরামতী মতবাদের অনুসারী।

এ থেকেই বোঝা যায়, এই বাতিল ফেরকা কেন সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলাম যখন রোম সাগর পেরিয়ে অর্ধেক পৃথিবী তৌহিদের আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলে, তখন খৃস্টান ও ইহুদী পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের টনক নড়ে। এরা বুঝেছে, কোন সত্য ধর্মকে তার অনুসারীদের হত্যা করে নিঃশেষ করা যায় না। তারা অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছে, সত্য ধর্মের অনুসারীদের যদি ধর্মের আবরণে বিভ্রান্ত করা যায় তবেই তাদের ঈমানী শক্তিকে বিনষ্ট করে দেয়া সহজ। এ হলো একটা পদ্ধতি। অন্য পদ্ধতি হলো, সেই ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও শাসকবর্গকে ধর্ম-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করা। শাসকদেরকে ভোগবাদী ও বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলা।...

মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো দৈহিক চাহিদা। যৌন চাহিদা মানুষের সহজাত বিষয় এবং তা পবিত্র বিধিমালার আওতায় প্রশংসনীয় বটে কিন্তু এটাই আবার বিধি-নিষেধের পরিপন্থী পন্থায় চরিতার্থ হলে চরম কদর্য হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর কাছে তা মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। তাই আমাদের চির শত্রুরা আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও শাসকবর্গকে বিপথগামী করতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে নারী, মদ ও বিত্ত-বৈভব।

ইহুদী খৃস্টানরা আব্দুল্লাহ্ ও মাইমুনকে অপরিমেয় ধন-সম্পদ ও তাদের প্রশিক্ষিত নারী সরবরাহ করে ভৃত্যে পরিণত করে। এরা এদেরকে ব্যবহার করে মুসলিম শাসকবর্গকে বিলাসী ভোগবাদিতায় অভ্যস্ত করতে সক্ষম হয়। ওদের কাজকর্ম সম্পূর্ণ ইসলাম বিবর্জিত হলেও সব বিষয়ে ইসলামের লেবেল এঁটে দেয়। যার ফলে মুসলমানরা বিভ্রান্তির শিকার। দৃশ্যত এরা ইসলামের নাম ব্যবহার করে ভেতরে ভেতরে ইসলামের মৌল আকীদা, হারাম-হালাল, পরকালের আযাব-গযব ও জবাবদিহিতার অনুভূতিটুকুও মানুষের মন থেকে মুছে

দিতে তৎপরতা চালায়। আর প্রচার করে, এটাই প্রকৃত ইসলাম। ধর্মান্ধ মুসলমানরা নাকি ইসলামের প্রকৃত রূপ বদল করে মানুষের কাছ থেকে ভোগবাদিতার অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। কত জঘন্য এদের কর্মকাণ্ড! কারামাতীরা প্রচার করে, মৃত্যুর পর জান্নাত জাহান্নাম বলতে কিছু নেই। এ সবই নাকি আলেমদের মনগড়া বিষয়। প্রত্যেক মুসলমানের মৌলিক অধিকার রয়েছে দুনিয়াতে সবকিছুর স্বাদ নেয়া এবং ভোগ করার। দুনিয়াতেই জান্নাত জাহান্নাম। যে কেউ ইচ্ছে মতো তার জীবনকে জান্নাতী সুখে ভরে নিতে পারে।...

স্বভাবত মানুষ ভাল কাজের দিকে ধীর লয়ে অগ্রসর হয়, কখনও পিছিয়েও আসে। কিন্তু মন্দ কাজের প্রতি মানুষ খুব দ্রুত অগ্রসর হয়। কারামাতীরা মানুষের এই সহজাত শক্তিটাকে কৌশলে ব্যবহার করছে। ২৯০ হিজরী সনে কারামাতীরা সিরিয়ার ব্যাপক জনসংখ্যাকে বিভ্রান্ত করে সেখানে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটাতে সক্ষম হয়। এক পর্যায়ে সেখানে তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেয়। ৩১১ হিজরী সনে এরা বসরা ও কুফা শহরে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজ চালিয়ে শহর দু'টিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। আবু তাহের নামের এক কুখ্যাত দস্যুকে তারা সে সময় ক্ষমতায় বসিয়ে মক্কা মুয়াজ্জিমাকেও দখলে নিতে সক্ষম হয়েছিল এই কারামতী গোষ্ঠী।

কারামাতীরা এক পর্যায়ে পবিত্র হাজরে আসওয়াদকে কা'বা গাত্র থেকে সরিয়ে বসরায় স্থানান্তরিত করে। প্রায় বিশ বছর হাজরে আসওয়াদ বসরায় ছিল ওদের কব্জায়। এরপর আল্লাহ্ ওদের শাস্তি দিতে শুরু করেন। হালাকু খান ওদের মৃত্যুদূত হিসেবে আভির্ভূত হন। হালাকু খানের আক্রমণে কারামাতীদের অধিকাংশ অনুসারী নিহত হয়। যারা বেঁচে থাকে তারা পালিয়ে ইরানে পাড়ি জমায়। ইরানেও ওরা স্থির থাকতে পারেনি। ইরানী স্থানীয়দের তাড়া খেয়ে শেষ পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশে এসে বসতি স্থাপন করে। ওই বিতাড়িত কারামাতীদের উত্তরসূরীদেরকেই আজ আপনারা দাউদ বিন নসরের সুরতে দেখছেন।

দাউদ বিন নসরের দাদা আহমদ খান কারামাতী মুলতানকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। সে ইসলামের সহীহ্ আকীদায় বিশ্বাসী মুসলমানদেরকে হত্যা করে, জুলুম অত্যাচার চালিয়ে এমন ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যে, ওদের মোকাবেলায় দাঁড়াবার মতো কেউ আর বেঁচে ছিল না। সকল প্রতিদ্বন্দ্বি শক্তিকে

নিঃশেষ করে কারামাতীরা প্রচার করতে শুরু করে, আমরা যে ইসলাম প্রচার করি সেটিই সত্যিকার ইসলাম। অত্যাচার উৎপীড়ন ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আহমদ খান একটি অনুগত গোষ্ঠী তৈরি করে নেয় এবং মুলতানে কারামাতী শাসন প্রতিষ্ঠা করে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের স্মৃতিবাহী এই মুলতান। সারা দুনিয়ার ইহুদী খৃস্ট শক্তি এদের সহযোগী। কিন্তু বাইরে থেকে মুসলমানরা এদের অপকর্ম ততোটা অনুধাবন করতে পারে না বলে এদেরকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের পদাঙ্ক অনুসারী মনে করে বিভ্রান্তির শিকার হয়। প্রকাশ্যে এরা হিন্দুদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখলেও নেপথ্যে দাউদ বিন নসর হিন্দুদের প্রধান সহযোগী এবং হিন্দু পৃষ্ঠপোষকতাই তার প্রধান শক্তি। কারামাতীদের দীর্ঘ ইতিহাস আপনাদেরকে এজন্য শুনাচ্ছি যে, যদি দাউদ সুলতানকে সহযোগিতার ওয়াদা করে তবে তা মারাত্মক প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। আপনারা যাতে এদের ভালভাবে চিনতে পারেন এজন্যই আমার এতোসব বলা।"

"আসেম ওমর কি পয়গাম নিয়ে এলেন এ ব্যাপারে আপনি অবগত হলেন কিভাবে?" প্রশ্ন করল এক নিরাপত্তাকর্মী। "আপনি কি করে জানলেন, রাতের বেলায় সে মদ পান করেছে? আপনি কি এখানে গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করছেন?"

"না। আমি কোন গোয়েন্দা নই। আমি সুলতান মাহমূদেরও নিয়োগকৃত গোয়েন্দা নই। আমি মুহাম্মদ বিন কাসিমের আত্মার সন্তান। তাঁরই উত্তরসূরী। আমরা সেই মহান ব্যক্তিদের বংশজাত— মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে যারা এখানে এসে সত্যিকার ইসলাম প্রচারে আত্মনিবেদন করেছিলেন। আমরা কারামাতীদের বিপরীতে সত্যিকার ইসলাম প্রচারে গোপন সংগঠন গড়ে তুলেছি। আমাদের নিজস্ব লোক রাজমহলের ভেতরে কাজ করে। ভেতরের সকল সংবাদ তাদের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি। দাউদ বিন নসর ব্যক্তিগতভাবেও জানে, তার বিরুদ্ধে একটি গোপন শক্তি সক্রিয় রয়েছে, কিন্তু সে আমাদের কখনও চিহ্নিত করতে পারেনি। আমরা খুবই সতর্কভাবে কাজ করি। আমাদের প্রত্যেক সদস্য সুশিক্ষিত, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। পুরুষ ছাড়াও অনেক মহিলা রয়েছে আমাদের সংগঠনে। তারা প্রত্যেকে ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী। তারা সৎ, আমানতদার ও পরহেযগার। দাউদ যদি আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযানের পরিকল্পনা করে তবে আগেই আমরা এর খবর পেয়ে যাই, তার পক্ষে আমাদের কার্যক্রম চিহ্নিত করা মোটেই সহজ নয়।"

"এখন আমাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত?"

"আগে আপনাদেরকে এ বিষয়টি বুঝতে হবে, দাউদ আপনাদের সুহৃদ নয়, সে হিন্দুদের সুহৃদ। সেই সাথে আপনাদের দূতবেশী কমান্ডারের উপরও ভরসা ত্যাগ করতে হবে। সে যদি সুলতানের কাছে মুলতানে সেনা অভিযানের পরিকল্পনা পেশ করে তবে আপনারা সুলতানকে দাউদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে বলবেন। তিনি যদি হিন্দুদের পদানত করতে সেনা অভিযানে আগ্রহী হন তবে সর্বাগ্রে মুলতানের কারামতী আখড়াকে নির্মূল করতে হবে।

আমি আপনাদের এ আশ্বাস দিচ্ছি, ইসলামের নামে প্রতারণা করে কেউ রক্ষা পায়নি। দাউদেরও শেষ রক্ষা হবে না। যারাই ইসলামের নামে প্রতারণা করেছে ধ্বংস হয়েছে। দাউদের ধ্বংসও অনিবার্য।"

"তাহলে আমাদের আগে দেখতে হবে, কমান্ডার আসেম ওমর কি করেন।" বলল এক নিরাপত্তারক্ষী। "তিনি তো দাউদের ফাঁদে পা নাও দিতে পারেন। যদি দেখি তিনি দাউদের ফাঁদে পা দিয়েছেন, তাহলে আপনি যা বলেছেন সে তথ্য সুলতানকে জানাব।"

* * *

দাউদ বিন নসরের সামনে উপবিষ্ট আসেম ওমর। তাদের সামনের টেবিলে একটি মানচিত্র।

"এ মানচিত্র আপনি সাথে নিয়ে যেতে পারেন।" বলল দাউদ। "আমি আপনাকে সুলতানের সেনাবাহিনীর জন্যে নিরাপদ পথ বলে দিলাম। চুন্নাব নদী পার হওয়ার জায়গাটিও বলে দিয়েছি।"

"আপনি যে পথের কথা বললেন, সে পথে আনন্দ পাল ও বিজি রায়ের সৈন্যরা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। আমার কাছে তো পথটি অনিরাপদ মনে হচ্ছে। এ জটিল পথে আপনি কিভাবে আমাদের নিরাপত্তা দেবেন?" বলল আসেম।

দাউদের উত্তরে আশ্বস্ত হতে পারল না আসেম। দাউদের কথা ও তার প্রতিশ্রুতিকে সামরিক দৃষ্টকোণ থেকে যাচাই করতে শুরু করল আসেম। আসেমের মনে দাউদের কথায় সন্দেহ উঁকি দিল। সন্দেহ নিরসনকল্পে বহু প্রশ্ন করল আসেম। আসেমের অভাবিত জিজ্ঞাসায় দাউদ ভেবাচেকা খেয়ে গেল।

"আর ক'দিন কি এখানে আছেন না আপনি?"

"কর্তব্যের খাতিরে আমাকে যেতে হচ্ছে। নয়তো আমার আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছিল না।"

"কর্তব্যের ব্যাপার হলে সেই কর্তব্য আমি যেভাবে বলি সেভাবে পালন করুন। আপনি সুলতানকে এ পথে এনে আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন। আপনি আমাদের এখানে এলে সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব সোপর্দ করা হবে আপনাকে। আর আরাম-আয়েশ যা পাচ্ছেন সেসব সব সময়ের জন্যে স্থায়ী করে দেয়া হবে।"

"আপনি যদি মাহমূদকে আমাদের পাতানো ফাঁদে আটকে দিতে পারেন, তবে আমি আপনাকে এ অঙ্গীকার দিচ্ছি, আমার রাজ্যের কিছু এলাকা ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন শাসন কাজ চালানোর ব্যবস্থা করে দেবো আপনাকে। যুদ্ধ ময়দানে এতো কৃতিত্ব অর্জনের পর জীবনে কিছুটা আরাম-আয়েশ করার অধিকার অবশ্যই আপনার আছে। মানুষতো আর দুনিয়াতে বারবার আসে না!"

শ্বেত শুভ্র শ্মশ্রুধারী লোকটি যে ধরনের কথা বলেছিল দাউদের মুখেও সে ধরনের কথা শুনতে পেল আসেম। দাউদ বলল, "হিন্দুদের চেয়ে পরোপকারী কোন সুহৃদ আপনি ইহজগতে পাবেন না। আপনি হিন্দুদের সাথে মিশে দেখুন না! সুলতানের ইচ্ছার বলী হয়ে জীবনটাকে তিলে তিলে ধ্বংস করে কি লাভ? আগামীকাল সকালেই চলে যান। সুলতানকে গিয়ে বলুন— দাউদ বিন নসর আপনাকে স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছে এবং অগ্রাভিযানের পথও বলে দিয়েছে।"

সেই দিন বিকেলের ঘটনা। আসেম ওমর তার কক্ষে চার নিরাপত্তারক্ষীকে ডেকে পাঠাল। তাদের বলল, "আগামীকাল সকালেই আমি রওয়ানা হবো।" আসেম তাদের প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়ে বিদায় গ্রহণ করল।

তারা মহলের একটি গলিপথে নিজেদের থাকার ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। এমন সময় পিছন দিক থেকে পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারা একটি মহিলাকে তাদের দিকে আসতে দেখল। মহিলাটি তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের দিকে না তাকিয়েই অনুচ্চ আওয়াজে নিজের ভাষায় ও ইঙ্গিতে বলল, "তোমাদের একজন এখনই ওই বুযুর্গ ব্যক্তির বাড়িতে চলে যাও, যার বাড়িতে তোমরা মেহমান হয়েছিলে।" মহিলাটি আর কোন কথা না বলে তার মতো করে ওদের অতিক্রম করে চলে গেল।

তাদের একজন তখনই গিয়ে সেই বুযুর্গ ব্যক্তির দরজায় কড়া নাড়ল। তিনি নিজেই দরজা খুলে তাকে ভেতরে নিলেন।

"আসেম ওমর কেরামাতীদের ফাঁদে আটকে গেছে।" বললেন বুযুর্গ। "সে দাউদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। চুক্তি মতো তাকে একটি মানচিত্র দিয়ে দেয়া হয়েছে, যে পথে সুলতানের বাহিনী নিয়ে আসবে সে। আপনারা আগামীকাল সকালেই এখান থেকে রওয়ানা হচ্ছেন। আপনারা সুলতানকে গিয়ে বলবেন, যাঁকে আপনি মুসলমান ও সুহৃদ মনে করছেন সে শত্রুতায় হিন্দুদের চেয়েও জঘন্য। কোন অবস্থাতেই আসেমের বলা পথে সেনাভিযানের চিন্তা যেন সুলতান না করেন। আপনি জলদি এ দেশ থেকে চলে যান। পথে কোন সময় নষ্ট করবেন না।"

"আচ্ছা ওই মহিলাটি কে? যিনি আমাদের একজনকে আপনার সাথে দেখা করার সংবাদ দিলেন?" জিজ্ঞেস করল নিরাপত্তারক্ষী।

"সে এক ভাগ্য বিড়ম্বিতা নারী।" বললেন বুযুর্গ।

"আপনারা হয়তো তার সৌন্দর্য দেখে থাকবেন। তাকে তার মা-বাবা মোটা অংকের পণের বিনিময়ে এক চরিত্রহীন ধনাঢ্য ব্যক্তির কাছে বিয়ে দেয়। লোকটি দাউদের সাথে সুসম্পর্ক অটুট রাখার স্বার্থে নিজের স্ত্রীকে উপহার হিসেবে দিয়ে দেয়। দাউদ দু'বছর তাকে হেরেমে রেখে রাজকর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করে। মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনই বুদ্ধিমতি, পড়ালেখাও জানে। সে ছিল আমার মেয়ের সহপাঠিনী। এই সুবাদে সে আমার বাড়িতে প্রায়ই আসে। আমার মেয়ের সাথে সময় কাটায়, কথাবার্তা বলে। ভাগ্যবিড়ম্বনার জন্য প্রথম দিকে সে খুব কান্নাকাটি করতো, কিন্তু আমার মেয়ের মাধ্যমে আমি তাকে যখন বলেছি, এই জাহান্নামের ভেতরে থেকেও তুমি ইচ্ছে করলে ইসলামের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পার, তখন সে দুঃখ বুকে চেপে আমাদের সহযোগিতা করতে শুরু করে। এর মাধ্যমে সব ধরনের শাহী ফরমান ও পরিকল্পনা আমরা আগেই জানতে পারি। সে যথাসময়ে আমাদের কাছে সংবাদ পৌছে দেয়। প্রশাসনিক কাজে সে খুবই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে এবং নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মী ও বিশ্বস্ত কর্মকর্তা হিসেবে রাজমহলে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ দাউদ বিন নসর যখন আসেমকে ডেকে একান্তে হিন্দুদের তৈরি মানচিত্র দিয়ে ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকাতে রাজ্যদানের টোপ দিল তখন এই মেয়েটি তাদেরকে পানীয় ও শরাব পরিবেশন করছিল। দাউদের একান্ত সচিব হিসেবে কাজ করে এই মেয়ে। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল তাদের কথাবার্তা। ওখানকার কাজ শেষ হলেই সে আমার এখানে এসে সব বলে গেছে। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো,

সুলতানকে আপনার আস্থায় নেয়া যে, আসেম ওমর যে প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছে তা প্রতারণার ফাঁদ আর আপনি যা বলবেন তা সঠিক।"

"এই মহিলা কি নিয়মিত আপনার নিকট যাতায়াত করে?" জিজ্ঞেস করল নিরাপত্তারক্ষী। "সে কি রাজমহল থেকে বের হওয়ার সুযোগ পায়? তাকে কোথাও পাঠিয়ে দেয়ার কথা কি আপনি কখনও ভেবেছেন? কোন মুসলমান যদি ওকে নিয়ে কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে চায় এবং বিয়ে করে। তা কি সম্ভব?"

"অনেকবার ওকে এই নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার কথা ভেবেছি। কিন্তু নির্ভরযোগ্য এমন কোন মুসলিম যুবক পাইনি যে তাকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় সংসার গড়তে পারে। আজকেও সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনাদের কেউ যদি সাহস করেন তবে সে আপনাদের কারো সাথে গজনী চলে যেতে আগ্রহী। ওকে কেউ বিয়ে না করলেও কোন বুযুর্গ ব্যক্তির সেবা করেও জীবন কাটিয়ে দিতে রাজী।"

"আমরা ওকে সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছি। কিন্তু সবার গোচরে ওকে নিয়ে পথ চলা মুশকিল হবে। ওকে যদি আমাদের যাত্রা পথের কোন জায়গায় শহর থেকে দূরে কোথাও আমাদের সাথে মিলিত করা যায় তবে সাথে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবা যেতে পারে। অবশ্য আসেম ওকে সাথে নিয়ে যেতে বাধ সাধবে। সে দিকটা আমরা সামাল দেবো।" বলল নিরাপত্তারক্ষী।

পরদিন খুব ভোরে সূর্যোদয়ের অনেক আগেই কমান্ডার আসেম চার সঙ্গীকে নিয়ে গজনীর পথে রওয়ানা হল। তাদের সাথে নতুন যোগ হলো দাউদ বিন নসরের উপঢৌকন বোঝাই করা একটি উট। এক সৈনিকের বর্শার সাথে বেঁধে দেয়া হল সাদা পতাকা। যা শাসকদের পক্ষ থেকে দেয়া তাদের জন্যে নিরাপত্তার প্রতীক।

আসেমের কাফেলা শহর অতিক্রম করে নদী পেরিয়ে গেল। আসেম ওমর আসার সময় সাথীদের সাথে নানা খোশগল্পে পথ অতিক্রম করেছিল। সঙ্গীরা ও তার মধ্যে তেমন কোন আভিজাত্যের বিভেদ ভাব ছিল না তখন। কিন্তু ফেরার পথে সেই আসেম অন্য মানুষ। এখন সে সবার থেকে আগে আগে চলছে। কারো সাথে কোন গল্প করার মনোভাব তার নেই। কথা দু'চারটি যা বলছে, সেগুলোর সবই হয়তো সঙ্গীদের প্রতি নির্দেশ নয়তো দিক নির্দেশনামূলক। তার মধ্যে এখন রাজকীয় ভাব। মাথাটা যেন আগের চেয়ে উঁচু হয়ে গেছে এক হাত। আচরণে স্পষ্ট অহমিকার ছাপ।

সূর্য প্রায় ডুবুডুবু অবস্থা। একটা ঘন জঙ্গলাকীর্ণ এলাকার ভেতর দিয়ে তারা যাচ্ছে। আসেম তাদের থেকে অনেকটা আগে। হঠাৎ এক সাথী অন্যদের ইশারায় বলল, দেখো তো ঝোঁপের আড়ালে দু'টি লোকের অবস্থান মনে হয় কি-না। ওদের চোখ এবং দেহের কিছু অংশ আবছা অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল। অন্যরাও তাকে সমর্থন করল এবং বলল, মনে হয় বুযুর্গ ব্যক্তি সেই মহিলাকে এখানে পৌছিয়ে দিয়েছে।

তারা গত রাতের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংকল্পবদ্ধ হলো। তাদের একজন ঘোড়া থামিয়ে ধীরে ধীরে ঘন-জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হল। বাকীরা আসেমের অনুগামী হল। সৈনিক একটু অগ্রসর হলেই সেই যুবতীকে দেখতে পেল। সে একটি ঘোড়ায় আরোহিত। সাথে একজন পুরুষ। লোকটি যুবতীকে সৈনিকের কাছে সোপর্দ করে নীরবে চলে গেল। যুবতীকে নিয়ে সৈনিক কিছুক্ষণ সেখানেই বসে রইল। এরা চোখের ভাব বিনিময় ও মুচকি হাসি ছাড়া কেউ কারো কথা পরিষ্কার বুঝতে পারে না। যুবতী ও সৈনিকের ভাষা ভিন্ন। যুবতী যখন ইঙ্গিতে সৈনিককে বলল চলুন, তখন সৈনিক তাকে চুপ করে বসে থাকতে অনুরোধ করল।

সূর্য ডুবে চারদিকে অন্ধকার নেমে এলো। সাথীদেরকে তাঁবু টাঙ্গিয়ে বিশ্রামের নির্দেশ দিল আসেম। আসেম যখন দেখলো, লোক একজন কম তখন অন্যদের জিজ্ঞেস করল, সে কোথায়? সবাই বিস্ময় প্রকাশ করল এবং অবজ্ঞাও দেখালো কিছুটা। বলল, সব সময় পিছনে পিছনে থেকেছে। বলছিল তার কাছে নাকি মুলতান খুবই ভাল লেগেছে। সে থেকে যাবে। আরেকজন বললো, কে জানে কোন বারবণিতাকে নাকি ভাল লেগেছে তার। ওখানেই ফিরে গেছে হয়তো।

আসেম ওদের প্রতি খুবই ক্ষোভ প্রকাশ করল। ওরাও আসেমের কথায় দৃশ্যত অনুতাপ করল। একজন বলল, "ওকে খোঁজা অর্থহীন। পশ্চাদ্ধাবন করেও কোন লাভ নেই। কে জানে কখন পালিয়েছে। আমরা তো স্বপ্নেও ভাবিনি ও এমন করে পালাবে।"

দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেল আসেমের চেহারা। বহুক্ষণ পর বলল, "ঠিকই বলেছ, ওকে খোঁজা অর্থহীন। তার চেয়ে বরং ও যেখানে যেতে চাইছে সেখানেই চলে যাক।"

এতো গুরুত্বপূর্ণ একজন সাথীর হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটিও খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারেনি আসেমকে। কারণ তার নিজের প্রাণই তো পড়ে রয়েছে দাউদের প্রাসাদে'। তার তনু মনে এখনও পেয়ালা আর রমণীর উষ্ণতার অনুভব।

নিরাপত্তারক্ষী যদি কোন রমণীকে মন দিয়ে থাকে তো আর বেশি কি দিয়েছে। আসেম নিজেকেই তো বিক্রি করে দিয়েছে দাউদের কাছে। ঈমান বিলীন করে দিয়েছে তরুণীর দেহের উষ্ণতায় মদের পেয়ালায়। শরীরটা শুধু যাচ্ছে গজনীর দিকে, আসেমের মনটা বাঁধা মুলতানের প্রাসাদে। তাই সাধারণ একজন সৈনিকের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তাকে কতটুকু আর প্রভাবিত করবে। নিজের কাছেই আসেমকে রাজা রাজা মনে হচ্ছে। সৈনিক তো দূরের কথা, খোদ সুলতানেরই কোন গুরুত্ব নেই তার কাছে।

কল্পনাও করতে পারেনি আসেম— সে যখন তিন নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে বিশ্রাম করছে, তখন তার হারিয়ে যাওয়া সৈনিক এক যুবতীকে নিয়ে গজনীর পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

**প্রথম খণ্ড সমাপ্ত**

সুলতান মাহমুদ গজনবীর ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস

# ভারত অভিযান

VAROT OVIJAN : 1

ISBN 984-70109-0000-3 SET

সুলতান
মাহমুদ গজনবীর
ঐতিহাসিক
সিরিজ উপন্যাস
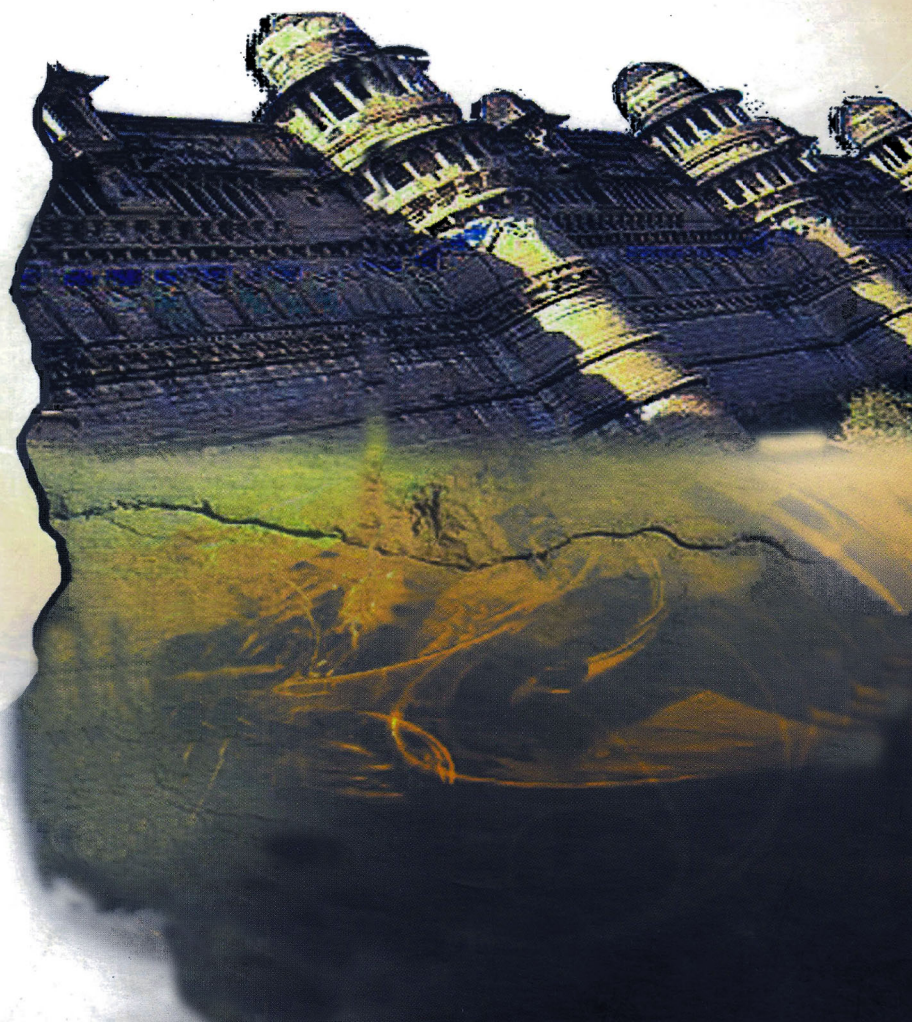
# ভারত অভিযান

# ভারত অভিযান - ২

# ভারত অভিযান

(দ্বিতীয় খণ্ড)

এনায়েতুল্লাহ

অনুবাদ
শহীদুল ইসলাম

এদারায়ে কোরআন
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর — ২০০৭

প্রকাশক ▶ আরিফ বিল্লাহ্, এদারায়ে কুরআন, ৫০, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০, স্বত্ব ▶ সংরক্ষিত, প্রচ্ছদ ▶ নাজমুল হায়দায়
কম্পিউটার কম্পোজ ▶ এম. হক কম্পিউটার্স, মুদ্রণ ▶ আল-আরাফা প্রিন্টার্স
মোবাইল ঃ ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

মূল্য ঃ একশত ষাট টাকা মাত্র

**BHAROT OVIJAN-1** : Writer Enayatullah, Translated by Shahidul Islam, Published by Edara-e- Quran, 50 Banglabazar, Dhaka-1100, Printed by Al-Arafa Printers Date of Publication September 2007.

**PRICE TAKA ONE HUNDRED SIXTY ONLY**

**ISBN 984-70109-0000-3 SET**

# উৎসর্গ

গর্বিনী মা রেখে যাবে বীরপ্রসবিনী, এই তো সকল মায়ের চিরন্তন চাওয়া। কিন্তু মাত্র সাত মাস বয়সেই 'ঈশাত নাশরা' মা বাবার কোল খালি করে চলে গেলো। রেখে গেলো রাজ্যের শূন্যতা।

অসীম দয়াময় আল্লাহর কৃপাধন্য ছোট মনিদের ছোটাছুটিতে ভরে ওঠুক মায়ের বিরহী কোল।

হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নগুলোর ছোটাছুটি আর জীবন্ত কোলাহলে উদ্ভাসিতহোক মায়ের উজাড় আঙিনা—এই আমাদের প্রত্যাশা।

—অনুবাদক

# প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে এদেশে উর্দুভাষী ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ'র পরিচয় দেয়ার নিষ্প্রয়োজন, তদ্রূপ বিশিষ্ট লেখক গবেষক ও অনুবাদক শহীদুল ইসলাম-এরও বিশেষ পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নেই।

ইসলামী উপন্যাসের রুচিবান পাঠক মাত্রই তাঁর অনুবাদ ও লেখার সাথে পরিচিত। কালজয়ী ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ-এর অন্যতম কীর্তি সুলতান মাহমূদ গজনবীর ভারত অভিযান সিরিজ এর এটি দ্বিতীয় খণ্ড। পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমরা এটিকে সার্বিক সুন্দর করার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। পাঠক পাঠিকা মহলে এ সিরিজ আদৃত হলেই আমাদের প্রয়াস স্বার্থক হবে বলে আমি মনে করছি।

—প্রকাশক

# লেখকের কথা

"মাহমূদ গজনবীর ভারত অভিযান" সিরিজের এটি দ্বিতীয় খণ্ড। উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতান মাহমূদ গজনবী সতের বার ভারত অভিযান পরিচালনাকারী মহানায়ক হিসেবে খ্যাত। সুলতান মাহমূদকে আরো খ্যাতি দিয়েছে পৌত্তলিক ভারতের অন্যতম দু' ঐতিহাসিক মন্দির সোমনাথ ও থানেশ্বরীতে আক্রমণকারী হিসেবে। ঐসব মন্দিরের মূর্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন মাহমূদ। কিন্তু উপমহাদেশের পাঠ্যপুস্তকে এবং ইতিহাসে মাহমূদের কীর্তির চেয়ে দুষ্কৃতির চিত্রই বেশী লিখিত হয়েছে। হিন্দু ও ইংরেজদের রচিত এসব ইতিহাসে এই মহানায়কের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে তাঁর সুখ্যাতি চাপা পড়ে গেছে। মুসলিম বিদ্বেষের ভাবাদর্শে রচিত ইতিহাস এবং পরবর্তীতে সেইসব অপইতিহাসের ভিত্তিতে প্রণীত মুসলিম লেখকরাও মাহমূদের জীবনকর্ম যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের বোঝার উপায় নেই, তিনি যে প্রকৃতই একজন নিবেদিতপ্রাণ ইসলামের সৈনিক ছিলেন, ইসলামের বিধি-বিধান তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। জাতিশত্রুদের প্রতিহত করে খাঁটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও দৃঢ় করণের জন্যেই নিবেদিত ছিল তার সকল প্রয়াস। অপলেখকদের রচিত ইতিহাস পড়লে মনে হয়, সুলতান মাহমূদ ছিলেন লুটেরা, আগ্রাসী ও হিংস্র। বারবার তিনি ভারতের মন্দিরগুলোতে আক্রমণ করে সোনা-দানা, মণি-মুক্তা লুট করে গজনী নিয়ে যেতেন। ভারতের মানুষের উন্নতি কিংবা ভারত কেন্দ্রিক মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা তার কখনো ছিলো না। যদি তৎকালীন ভারতের নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য করা এবং পৌত্তলিকতা দূর করে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার একান্তই ইচ্ছা তাঁর থাকতো, তবে তিনি কেন মোগলদের মতো ভারতে বসতি গেড়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতেন না? ইত্যাকার বহু কলঙ্ক এঁটে তার চরিত্রকে কলুষিত করা হয়েছে।

মাহমূদ কেন বার বার ভারতে অভিযান চালাতেন? মন্দিরগুলো কেন তার টার্গেট ছিল? সফল বিজয়ের পড়ও কেন তাকে বার বার ফিরে যেতে হতো গজনী? ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জবাব; ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ সৈনিক সুলতান মাহমূদকে তুলে ধরার জন্যে আমার এই প্রয়াস। নির্ভরযোগ্য দলিলাদি ও বিশুদ্ধ ইতিহাস ঘেটে আমি এই বইয়ে মাহমূদের

প্রকৃত জীবন চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রকৃত পক্ষে সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর মতোই মাহমূদকেও স্বজাতির গাদ্দার এবং বিধর্মী পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে একই সাথে লড়াই করতে হয়েছে। যতো বার তিনি ভারত অভিযান চালিয়েছেন, অভিযান শেষ হতে না হতেই খবর আসতো, সুযোগ সন্ধানী সাম্রাজ্যলোভী প্রতিবেশী মুসলিম শাসকরা গজনী আক্রমণ করছে। কেন্দ্রের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বাধ্য হয়েই মাহমূদকে গজনী ফিরে যেতে হতো। একপেশে ইতিহাসে লেখা হয়েছে, সুলতান মাহমূদ সতের বার ভারত অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু একথা বলা হয়নি, হিন্দু রাজা-মহারাজারা মাহমূদকে উৎখাত করার জন্যে কতো শত বার গজনীর দিকে আগ্রাসন চালিয়ে ছিল।

সুলতান মাহমূদের বারবার ভারত অভিযান ছিল মূলত শত্রুদের দমিয়ে রাখার এক কৌশল। তিনি যদি এদের দমিয়ে রাখতে ব্যর্থ হতেন, তবে হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকতাবাদ সাগর পাড়ি দিয়ে আরব পর্যন্ত বিস্তৃত হতো।

মাহমূদের পিতা সুবক্তগীন তাকে অসীয়ত করে গিয়েছিলেন, "বেটা! ভারতের রাজাদের কখনও স্বস্তিতে থাকতে দিবে না। এরা গজনী সালাতানাতকে উৎখাত করে পৌত্তলিকতার সয়লাবে কাবাকেও ভাসাতে চায়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময়ের মত ভারতীয় মুসলমানদেরকে হিন্দুরা জোর জবরদস্তি হিন্দু বানাচ্ছে। এদের ঈমান রক্ষার্থে তোমাকে পৌত্তলিকতার দুর্গ গুড়িয়ে দিতে হবে। ভারতের অগণিত নির্যাতিত বনি আদমকে আযাদ করতে হবে, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে হবে।"

আলবিরুনী, ফিরিশ্‌তা, গারদিজী, উতবী, বাইহাকীর মতো বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ তৎকালীন সবচেয়ে বড় বুযুর্গ ও ওলী শাইখ আবুল হাসান কিরখানীর মুরীদ ছিলেন। তিনি বিজয়ী এলাকায় তার হেদায়েত মতো পুরোপুরি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি নিজে কিরখানীর দরবারে যেতেন। কখনও তিনি তাঁর পীরকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠাননি। উপরন্তু তিনি ছদ্মবেশে পীর সাহেবের দরবারে গিয়ে ইসলাহ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি আত্মপরিচয় গোপন করে কখনও নিজেকে সুলতানের দূত হিসেবে পরিচয় দিতেন। একবার তো আবুল হাসান কিরখানী মজলিসে বলেই ফেললেন, "আমার একথা ভাবতে ভালো লাগে যে, গজনীর সুলতানের দূত সুলতান নিজেই হয়ে থাকেন। এটা প্রকৃতই মুসলমানের আলামত।"

মাহমূদ কুরআন, হাদীস ও দীনি ইলম প্রচারে খুবই যত্নবান ছিলেন। তাঁর দরবারে আলেমদের যথাযথ মর্যাদা ছিল। সব সময় তার বাহিনীতে শত্রু পক্ষের চেয়ে সৈন্যবল কম হতো কিন্তু তিনি সব সময়ই বিজয়ী হতেন। বহুবার এমন হয়েছে যে, তার পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ময়দানে দু'রাকাত নামায আদায় করে মোনাজাত করতেন এবং চিৎকার করে বলতেন, "আমি বিজয়ের আশ্বাস পেয়েছি, বিজয় আমাদেরই হবে।" বাস্তবেও তাই হয়েছে।

অনেকেই সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবী আর সুলতান মাহমূদকে একই চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বীর সেনানী মনে করেন। অবশ্য তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একই ছিল। তাদের মাঝে শুধু ক্ষেত্র ও প্রতিপক্ষের পার্থক্য ছিল। আইয়ুবীর প্রতিপক্ষ ছিল ইহুদী ও খৃষ্টশক্তি আর মাহমূদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল হিন্দু পৌত্তলিক রাজন্যবর্গ। ইহুদী ও খৃস্টানরা সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর সেনাদের ঘায়েল করতো প্রশিক্ষিত সুন্দরী রমণী ব্যবহার করে নারী গোয়েন্দা দিয়ে আর এর বিপরীতে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে এরা ব্যবহার করতো শয়তানী যাদু। তবে ইহুদী-খৃস্টানদের চেয়ে হিন্দুদের গোয়েন্দা তৎপরতা ছিল দুর্বল কিন্তু সুলতানের গোয়েন্দারা ছিল তৎপর ও চৌকস।

তবে একথা বলতেই হবে, সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর গোয়েন্দারা যেমন দৃঢ়চিত্ত ও লক্ষ্য অর্জনে অবিচল ছিল, মাহমূদের গোয়েন্দারা ছিল নৈতিক দিক দিয়ে ততোটাই দুর্বল। এদের অনেকেই হিন্দু নারী ও যাদুর ফাঁদে আটতে তা। অথবা হিন্দুস্তানের মুসলিম নামের কুলাঙ্গররা এদের ধরিয়ে দিতো। তারপরও সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর চেয়ে সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা কার্যক্রম ছিল বেশি ফলদায়ক।

ইতিহাসকে পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য, বিশেষ করে তরুণদের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশনের জন্যে গল্পের মতো করে রচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থ। বাস্তবে এর সবটুকুই সত্যিকার ইতিহাসের নির্যাস। আশা করি আমাদের নতুন প্রজন্ম ও তরুণরা এই সিরিজ পড়ে শত্রু-মিত্রের পার্থক্য, এদের আচরণ ও স্বভাব জেনে এবং আত্মপরিচয়ে বলীয়ান হয়ে পূর্বসূরীদের পথে চলার দিশা পাবে।

এনায়েতুল্লাহ
লাহোর।

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বিজিত রাজ্য পেশোয়ারে সুলতান মাহমূদ অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন দূত আসেমের আগমন প্রত্যাশায়। কিন্তু দু'সপ্তাহ কেটে গেল আসেমের কোন খবর পাচ্ছেন না। প্রত্যাশা এখন হতাশায় রূপান্তরিত হল সুলতানের, আশংকাও দেখা দিল তার মনে— আসেম সাথীদের নিয়ে শত্রুসেনাদের হাতে বন্দী হয়নি তো! দরবারীদের কাছে তিনি আশংকার কথা বারকয়েক ব্যক্ত করেছেন। তিনি শীর্ষ কর্মকর্তাদের কাছে এ ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন, "যদি শুনি আসেম ও তার সাথীদের ওরা বন্দী করেছে তাহলে আমি মুলতানের রাজপ্রাসাদের প্রতিটি ইট খুলে ফেলবো। ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া কাউকে জ্যান্ত রাখবো না।"

এর দু'দিন পর সুলতানকে সংবাদ দেয়া হলো, আসেমের এক সাথী এক যুবতী মহিলাকে নিয়ে গজনী ফিরেছে। দীর্ঘ সফর, ক্ষুধা পিপাসা আর কষ্ট যাতনায় ওদের অবস্থা খুবই করুণ।

"ওদেরকে এক্ষুণি আমার এখানে নিয়ে এসো।" কিছুটা বিস্ময়মাখা কণ্ঠে নির্দেশ করলেন সুলতান। "কোন অঘটন ঘটেনি তো?"

সৈনিক সুলতানের কক্ষে প্রবেশ করল। মুখ ব্যাদান। তার দু'চোখ কোটরাগত। শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে ঘন ঘন। যুবতীর অবস্থা ওর চেয়েও করুণ। সুলতান ওদের পানি দিতে নির্দেশ করলেন। পানি নিয়ে এলে উভয়ে কয়েক ঢোক পান করল।

"সুলতানে আলী মাকাম! ঘোড়াকে বিশ্রাম দেয়া ছাড়া আমরা পথে কোথাও এক মুহূর্ত দেরী করিনি। কমান্ডার আসেমের এখানে পৌছার আগেই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করা ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। সম্ভবত সে এখনও পৌছেনি।" বলল সৈনিক।

"জাঁহাপনা! আসেম আপনার পয়গামের যে জবাব নিয়ে আসছে তা সম্পূর্ণ প্রতারণা। মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসর হিন্দুদের চেয়ে আরো বেশি ভয়ংকর শত্রু আপনার। সে হিন্দুদের পক্ষ থেকে আপনাকে হত্যা করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছে। সেই সাথে আমাদের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্যে মারাত্মক চক্রান্তের জাল বিছিয়েছে। সে আনন্দ পাল ও বিজি

রায়ের পক্ষে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে নীলনক্‌শা এঁকেছে। সেই নীলনক্‌শার অংশ হিসেবেই ওরা আসেমকে হাত করে নিয়েছে। আসেম আপনার কাছে যে মানচিত্র নিয়ে আসছে, সেটি হিন্দুদের সরবরাহকৃত। বিজি রায় ও আনন্দ পালের সৈন্যরা দাউদের হয়ে ওৎ পেতে থাকবে আমাদের গমন পথে নিরাপত্তা দেয়ার কৌশল করে। কিন্তু সুযোগ মতো ওরা আপনার উপর হামলা করবে এবং আমাদের সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবে। আসেম তার অধীনস্থ সৈনিকদের নিয়ে ওদের ক্রীড়নক হিসেবে আত্মসমর্পণে প্ররোচনা দিবে।"

"দাউদ যে এই নীলনক্‌শা এঁকেছে, আসেম কি তা বুঝতে পারেনি?"

"সে নিজেই তো বিক্রি হয়ে গেছে। সে এখন দাউদের ক্রীড়নক। "

সৈনিক যুবতী সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করল সুলতানকে। কিভাবে ভাগ্য বিড়ম্বিতা এই যুবতী ইসলামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে এবং তার সাথে পালিয়ে এসেছে। সুলতান এক দোভাষীর মাধ্যমে যুবতীর কাছ থেকে জানলেন দাউদের অভ্যন্তরীণ হালত। এও জানলেন, আসেমের এতদিন ওখানে কিভাবে কেটেছে, কি করেছে, কি কি কথা হয়েছে দাউদ ও আসেমের মধ্যে। যুবতী দাউদ বিন নসরের কার্যক্রম, ওদের ধর্মীয় আচার ও আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানাল সুলতানকে। সে এ কথাও বলল, "আমি নিজের কানে এসব শুনেছি এবং নিজের চোখে দেখেছি ও নিজের হাতে আসেমকে মদ খেতে দিয়েছি।"

"এই মেয়েটিকে অন্দর মহলে পাঠিয়ে দাও। এর সেবা-যত্নে কোন ত্রুটি হয় না যেন। আর এই সৈনিকেরও খানা-দানা ও বিশ্রামের সুব্যবস্থা কর। ওকে শাহী মেহমানখানায় থাকতে দাও। এরা যে আসেমের আগেই পৌঁছে গেছে সে কথা প্রকাশ হয় না যেন।"

ওদের পৌঁছার চার পাঁচদিন পর আসেম ওমর সুলতানের দরবারে পৌঁছাল। আসেম সুলতানকে বলল, "দাউদ বিন নসর আপনার জন্যে দামী দামী উপঢৌকন পাঠিয়েছে এবং অধীর আগ্রহে আপনার আগমন প্রত্যাশা করছে। সে আপনাকে মুলতানে স্বাগত জানাতে উদগ্রীব। দাউদের দেয়া ষড়যন্ত্রের মানচিত্র সুলতানের কাছে মেলে ধরে সে বলল, এটা দাউদের বলে দেয়া পথ। এ পথে আমাদের সৈন্যরা অতিক্রম করলে সে সব ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। আসেম আরো বলল, দাউদ বিন নসর আমাদের খুব নির্ভরযোগ্য দোস্ত।"

"মুলতান পর্যন্ত সৈন্য নিয়ে যাওয়ার পথ আমি দেখে ফেলেছি। তবে তুমি আমাকে বল, বিজি রায় ও আনন্দ পালের সৈন্যরা কোন কোন জায়গায় ওঁৎ পেতে থাকবে এবং রাতের আঁধারে কীভাবে গুপ্ত হামলা করবে?"

"বিস্ময়ভরা চোখে সুলতানের দিকে তাকাল আসেম। নির্দেশ দিলেন সুলতান, "ওদের দু'জনকে নিয়ে এসো।"

একটু পরই আসেম ওমরের হারিয়ে যাওয়া নিরাপত্তারক্ষী আর সেই তরুণী এসে দাঁড়াল তার সামনে।

"এই যুবতীকে চেনো?" গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান। "তোমার কি মনে আছে, দাউদের প্রাসাদে বসে যখন তুমি তোমার ঈমান আর আমার জীবন বেচাকেনা করছিলে তখন এই যুবতী তোমাদের মদ পরিবেশন করছিল? তুমি কি আমার মুখেই তোমার কৃতকর্মের বিস্তারিত শুনতে চাও, না ওর মুখে শুনবে? এর চেয়ে কি এটাই ভাল নয় যে, কৃতকর্মের বর্ণনা তুমি নিজের মুখেই দাও।"

উঠে দাঁড়াল আসেম ওমর। কৃত অপরাধ আর পাপাচারের বোঝা ওর ঈমানী শক্তিকে বিলীন করে দিয়েছে। সত্যের মুখোমুখি হতে সাহস হলো না তার। আস্তে করে তরবারীটা কোষমুক্ত করে আগাটা বসিয়ে দিল পেটে এবং দু'হাতে তরবারীর বাট ধরে এমন জোরে চাপ দিল যে পিঠ ফুরে বেরিয়ে গেল। একটা চাপা চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল মেঝের ওপর। তড়পাতে লাগল ওর দেহ।

প্রহরীদের নির্দেশ দিলেন সুলতান। "ওর দেহকে শহরের বাইরে খোলা জায়গায় ফেলে এসো। ঈমান সওদাকারী দাফন কাফনের হকদার নয়।"

সেনাপতিদের ডেকে পাঠালেন সুলতান। নির্দেশ দিলেন, "এখনই সেনাদের তৈরি হতে বলুন। আমি আজই মুলতানের উদ্দেশে রওয়ানা হবো। ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হবে। পথে কয়েক জায়গায় যুদ্ধ করতে হবে আমাদের। পৌত্তলিকদের পাশাপাশি কারামাতী চক্রান্তও এবার খতম করব ইনশাআল্লাহ।"

## জনকের প্রায়শ্চিত্ত

নিজের তরবারী নিজের পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করল আসেম ওমর। তরবারী বিদ্ধ আত্মঘাতক আসেমকে শহর প্রাচীরের বাইরে ফেলে আসতে নির্দেশ দিলেন সুলতান। প্রখর রৌদ্রতাপে তড়পাতে তড়পাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল সে। কারো অনুমতি ছিল না যে আসেমের মুখে এক কাতরা পানি দেবে। অতীত কৃতিত্বের জন্যে অনুগ্রহ করে সুলতান আসেমের উত্তরসূরীদেরকে অনুমতি দিলেন মরদেহ তুলে নিয়ে যথারীতি দাফন করতে।

সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় একজন অধিনায়ক ছিল আসেম ওমর। যুদ্ধবিদ্যায় সে ছিল খুবই দক্ষ, সাহসী এবং বিচক্ষণ। কিন্তু জীবনের এই

যুগসন্ধিক্ষণে এসে নারীদেহ, মদের নেশা আর সামান্য জমিদারীর লোভ তাকে এমনই আদর্শচ্যুত করল যে, দূরতিক্রম্য শত্রু দুর্গ বিজয়ী আসেম, হাজারো শত্রু নিধনকারী বাহাদুর আসেম, সেনাধিনায়ক, বিচক্ষণ কূটনীতিক আসেম জবাবদিহির মুখোমুখি হতে না পেরে নিজের তরবারী পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করল। অথচ আসেম ছিল সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীর একজন আদর্শ সৈনিক। তার খ্যাতি ও যশ ছিল সর্বত্র আলোচিত। প্রধান সেনাপতি আসেমের কার্যক্রমের উপর ছিলেন আস্থাবান। তার প্রতি প্রধান সেনাপতির প্রশ্নাতীত আস্থা ও বিশ্বাসই সুলতানের ভিন্নমত থাকা সত্ত্বেও এতো গুরুত্বপূর্ণ মিশনে তাকে সুলতানের বিশেষ দূত হিসেবে গুরু দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল।

কাসেম ওমর। টগবগে যুবক। সুলতানের সেনাবাহিনীর ইউনিট কমান্ডার, দুর্ধর্ষ, বিচক্ষণ, সিদ্ধান্তে অবিচল, লক্ষ্যে স্থির। ছোট বেলা থেকেই পিতার কাছে কাসেম শুনতো যুদ্ধের কাহিনী। অল্প বয়সেই পুত্র কাসেমকে ভর্তি করে দিয়েছিল সুলতানের সেনাবাহিনীতে। রণাঙ্গনে সে ছিল বাবার যোগ্য উত্তরসূরী। আসেমের মৃত্যুকালে পুত্র কাসেম পূর্ণ যুবক। সেনাবাহিনীতে সে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান করে নিয়েছে নিজের যোগ্যতা বলে।

বাবার মৃত্যুসংবাদ যখন কাসেমের কাছে পৌছাল তখন সে এই ভেবে অনুতাপ করল যে, সেনাবাহিনীর একজন কৃতি অধিনায়কের পদে শূন্যতা সৃষ্টি হলো। দুঃখ পেল কাসেম এই ভেবে যে, তার বাবা বিশেষ দূত হিসেবে মুলতান গিয়েছিলেন; হিন্দুরা হয়তো তাকে শহীদ করেছে। বাবা হিসেবে শুধু নয়, সেনাবাহিনীর জন্য একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির শূন্যতা তাকে খুবই পীড়া দিচ্ছিল। তার বিশ্বাস ছিল, তার বাবার মরদেহ হয়তো মুলতান থেকে নীত হয়েছে।

মৃত্যু সংবাদবাহক কাসেমকে সাথে করে নিয়ে এলো আসেমের লাশের পাশে। উন্মুক্ত আকাশের নীচে, বালির মধ্যে, রক্তাক্ত পিতার লাশ দেখে কাসেম হতবাক। একি! তার পিতার মরদেহ তরবারী বিদ্ধ!

কাছের একটি ইমারতের বহিরাঙ্গণে সুলতান মাহমূদের প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ আত্তায়ী দাঁড়ানো। কাসেম বিন ওমরকে পিতার লাশের পাশে বিষণ্ন মনে দাঁড়ানো দেখে আব্দুল্লাহ্ পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন। যুবক কাসেমের প্রতি তার ভীষণ মায়া হলো। তিনি তার কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে নিজের দিকে ফেরালেন। বললেন, তোমার বাবার কাহিনী শুনলে তা তোমাকে এই করুণ দৃশ্য থেকে আরো বেশি দুঃখ দেবে। পিতার মায়া-মমতা,

তার কৃতিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মন থেকে দূর করে দাও। বরং এর জায়গায় তোমার দীন, ঈমান, কর্তব্য ও দেশপ্রেমকে স্থান দাও।

"তাজা রক্ত দেখে মনে হচ্ছে, তাকে এখানেই কিছু আগে হয়তো হত্যা করা হয়েছে।" বলল কাসেম বিন ওমর। "কি অপরাধে তাকে এমন নির্মম হত্যার শিকার হতে হলো। আমি জানি, তিনি সুলতানের বিশেষ দূত হিসেবে মুলতান গিয়েছিলেন। কিন্তু তার এমন অবস্থা হলো কেন?"

"তোমার পিতা আত্মহত্যা করেছে। তাকে কেউ হত্যা করেনি। এখানে তার কোন শত্রু নেই, ছিলও না। সে নিজেই নিজের সাথে দুশমনি করেছে। সে তার দীন-ঈমান, দেশ, জাতি ও সেনাবাহিনীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর সেই বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতিতে আত্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করেছে তোমার পিতা।" বললেন আবু আব্দুল্লাহ্।

আবু আব্দুল্লাহ্ কাসেম বিন ওমরের উদ্বেগ নিরসনের জন্যে তার পিতার পূর্বাপর ইতিবৃত্ত সবিস্তারে জানালেন। বললেন, কি কারণে কোন্ প্রেক্ষিতে সে আত্মহত্যার পথ অবলম্বন করেছে।

"পিতার অপরাধের শাস্তি কি আমাকেও ভোগ করতে হবে, মাননীয় সেনাপতি!" বিনীতভাবে জানতে চাইল কাসেম। "আমাকে কি সেনাবাহিনী থেকে অপসারণ করা হবে?"

"এখনও পর্যন্ত সুলতান এমন কোন নির্দেশ দেননি। সুলতানের পরে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব আমার হাতে। আমিও এমন কোন সিদ্ধান্ত নেইনি। আমার দৃষ্টিতে তুমি সাহসী ও কর্তব্যপরায়ণ কমান্ডার। আমি আশা করি, দায়িত্বের প্রতিক্ষেত্রে কর্তব্যনিষ্ঠায় তুমি আমার পদ পর্যন্ত পৌঁছবে। সবেমাত্র শুরু। এখনও গোটা জীবন তোমার সামনে রয়েছে। আমি আশা করি, তুমি তোমার পিতার ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিবে। বুঝতে চেষ্টা করবে, পাপের কতো আকর্ষণ, কীভাবে অপরাধ একজন নিষ্ঠাবান সেনাধ্যক্ষকে পথভ্রষ্ট করে!

ভাবতে পারো, ভোগ আর জাগতিক লিপ্সা আসেম ওমরের মতো কর্তব্যনিষ্ঠ সেনাধ্যক্ষকেও নিজের দেশ, সেনাবাহিনী আর দীন-ধর্ম থেকে কিভাবে বিচ্যুত করেছে! সুলতান মাহমূদের মতো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে পরাজিত করতে, নিজের গড়া মুসলিম মুজাহিদদেরকে বেঈমানদের হাতে পরাজিত করে গোলাম বানানোর কি ভয়ংকর জালে পা দিতে পারে! সেই চিন্তা করো, অপরাধ যখন মানুষকে তাড়া করে তখন আসেম ওমরের মতো বীর বাহাদুর যোদ্ধাও কাপুরুষের মতো আত্মহত্যার পথ অবলম্বন করে। তুমি যুবক। যুবকদের জীবনে

সবচেয়ে আশংকার বিষয় হচ্ছে, গুনাহর আহ্বান তাদের পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা কঠিন হয়ে পড়ে। যৌবনের যন্ত্রণায় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।"

"মাননীয় সেনাপতি! আমাকে কি পিতার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দেয়া হবে?"

"তোমাকে অবারিত সুযোগ দেয়া হচ্ছে। চল। লাশের পেট থেকে তরবারী বের করে আনো। তোমার বাবার মৃতদেহ সমাধিস্থ কর। কাফন-দাফনের ব্যবস্থা কর।"

"আমি কি সেই মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবো, যিনি মুলতান থেকে এসেছেন এবং যে আমার পিতার অপরাধের প্রত্যক্ষ সাক্ষী?"

"তুমি লাশ বাড়িতে নিয়ে যাও। সেই মহিলাকে আমি তোমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে তোমার আম্মুকেও সব ঘটনা বলবে। তুমি ইচ্ছে করলে, সেই সৈনিকের সাথে কথা বলতে পারবে যে সৈনিক এই মহিলাকে সাথে করে নিয়ে এসেছে।" বললেন প্রধান সেনাপতি।

পিতার দেহ থেকে তরবারী বের করে আনলেন কাসেম বিন ওমর। প্রধান সেনাপতি আসেমের লাশ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

স্ত্রীকে নিজের সাথে পেশোয়ার নিয়ে এসেছিল আসেম। আসেমের স্ত্রী ছিল পেশোয়ারেরই মেয়ে। ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজা জয়পাল যখন প্রথম সুলতান সুবক্তগীনের বিরুদ্ধে সেনাভিযান চালায় তখন সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে জয়পাল পালিয়ে যায়। তার সাথে ছিল অনেক মুসলিম বন্দী নারী ও বেসামরিক লোক। এরা সুবক্তগীনের সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়। সেই বন্দিনীদেরই একজন আসেমের স্ত্রী কাসেমের মা। এর পূর্বে রাজা জয়পালের বাহিনী পেশোয়ার অঞ্চলের অধিবাসীদের বাড়িঘর লুটপাট ও তরুণীদের অপহরণ করে সেনাবাহিনীর সেবিকা হিসেবে নিয়ে এসেছিল। এদেরই একজনকে বিয়ে করেছিল আসেম। আসেমের স্ত্রী পেশোয়ারের আঞ্চলিক ভাষা জানতো। তাই আসেম যখন পেশোয়ার যাওয়ার নির্দেশ পেল তখন আঞ্চলিক ভাষাভাষী হিসেবে স্ত্রীকেও সাথে নিয়ে গিয়েছিল সহযোগিতার প্রয়োজনবোধে। সেই পৌত্তলিক বাহিনীর হাতে অত্যাচারিতা মহিলার উদরে জন্ম নিয়েছে কাসেম। সৈনিক বাবার ঔরসজাত আর অত্যাচারিতা মায়ের উদরজাত কাসেম স্বভাবগতভাবেই পৌত্তলিকতা বিরোধী এক দ্রোহ। ইসলামী চেতনার এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। কাসেম মায়ের কাছেই শিখেছিল তার মাতৃভাষা। আর অবস্থানগত কারণে গজনীর ভাষা তো জানতই।

আসেমের লাশ দেখে তার বিধবা স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়ল। কিন্তু কাসেমের হাতে রক্তমাখা তরবারী দেখে কান্না থেমে গেল তার মায়ের। বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ছেলের দিকে।

“মা! আপনি যেভাবে রোদন করছেন, আপনার মতো মহিলার পক্ষে তার জন্যে শোক-তাপ করা খুবই বেমানান। হাতের তরবারীটা ছুঁড়ে মেরে কাসেম মায়ের উদ্দেশে বলল, তাকে কেউ হত্যা করেনি। নিজের তরবারী দিয়েই সে আত্মহত্যা করেছে।”

কাসেম উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল— “মা! সত্যি করে বলুন তো, আমি কি প্রকৃতপক্ষে তারই সন্তান? আপনি কি আগে হিন্দু ছিলেন? আমি কোন হিন্দুর ঔরসজাত নই তো? আমি কি লালিত পালিত হয়েছি কোন গাদ্দারের ঘরে?”

“কাসেম!” আর্তচিৎকার করে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন মা। “এসব তুমি কি বলছো? কি ঘটেছে! কি দেখছি আমি! তুমি কাকে গাদ্দার বলছো! বোখারা বলখের বিদ্রোহীদের পরাভূতকারী কমান্ডার, আজীবন পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে জিহাদকারী অকুতোভয় সৈনিক, যুদ্ধের ময়দানে পাহাড়ের মতো অবিচল যোদ্ধা, দীনের সেবক মুজাহিদ বাবাকে তুমি গাদ্দার বলছো! তিনি তো সুলতানের দূত হয়ে মুলতান গিয়েছিলেন। কবে ফিরেছেন? তিনি গাদ্দার হবেন কি করে? কি হয়েছে বাবা, বল! আমাকে খুলে বল!”

“আমি বলতে পারবো না মা! আপনাকে মুলতানের এক মহিলা সব বলবে। সে আসছে। এছাড়াও দূতের দেহরক্ষী হিসেবে যে কয়জন সৈনিক আব্বুর সহযাত্রী হয়েছিল তাদের একজনও আসছে। তার কাছ থেকেই আপনি সব জানতে পারবেন। এই তো এসেছে তারা!”

প্রথমেই ঘরে প্রবেশ করল মুলতানের মহিলা। প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ্ তাকে কাসেমদের বাড়িতে পাঠিয়েছেন। কাসেম খেয়াল করল, মহিলাটির বয়স বেশি নয়, যুবতী। কিন্তু যৌবনের কান্তি-কোমনীয়তা নেই তার চেহারায়। নির্যাতন, নিপীড়নের ছাপ স্পষ্ট তার চোখে-মুখে। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, বহু ঝড়-ঝাপটা গেছে এই মেয়ের জীবনে। তারপরও মেয়েটির চেহারায় একটা মোহনীয় ভাব, বিচক্ষণতা ও দীপ্তিময়তা বিদ্যমান— যা যে কোন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম।

মেয়েটি কাসেমদের ঘরে প্রবেশ করেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, “আমার নাম রাবেয়া, আমাকে আপনাদের ঘরে পাঠানো হয়েছে।”

"আমার স্বামী মুলতানে কি করেছিলেন?" জিজ্ঞেস করল আসেম ওমরের স্ত্রী।

"ওই ধরনের পরিবেশে শরীফ ধরনের লোকেরা যা করে থাকে, তিনিও তাই করেছেন।" জবাব দিল রাবেয়া। রাবেয়া বলে চলল, "আসেম ওমরকে দাউদ বিন নসর কীভাবে মদ নারী আর সুরা নর্তকীর মায়াজাল এবং ক্ষমতার মোহ দিয়ে ফাঁদে আটকে ফেলেছিল। রাবেয়া সবিস্তারে বলল— "মদ, নারী, গান-বাজনা, আয়েশ-উপভোগ ছাড়া দাউদের ওখানে নীতি-নৈতিকতার কী আছে? আপনার স্বামীর প্রতি আমার বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। তিনি কে তা আমি আগে জানতামও না। কিন্তু দাউদ বিন নসর সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীকে সহযোগিতার ধোঁকা দিয়ে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র করেছিল। সেই ষড়যন্ত্রের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিলেন আপনার স্বামী। আমি তখন তাকে জানতে পারি, যখন আমাকে তাদের মদ আপ্যায়নের নির্দেশ দেয়া হলো। আমি নিজ হাতে উভয়কে মদ ঢেলে দিয়েছি। তারা উভয়ে আকণ্ঠ পান করেছেন। তাদের বৈঠকে আমাকে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আমি তাদের কথোপকথনের সময় উপস্থিত ছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত আমিও এই চক্রান্তের অংশে পরিণত হয়েছিলাম। আমার বাবা এক কাপুরুষের সাথে আমাকে বিয়ে দিয়েছিল। সেই ব্যক্তি আমাকে দাউদ বিন নসরের কাছে উপহার হিসেবে রেখে যায়।

করুণ পরিণতির শিকার হয়ে মানসিকভাবে আমি ভেঙে পড়েছিলাম। গুনাহ্ আর পাপক্লিষ্ট জীবন-যাপনে বাধ্য হওয়ায় মনের দিক থেকে আমি মরেই গিয়েছিলাম। বেঁচে থাকা আমার কাছে অভিশাপ মনে হতো। কিন্তু একজন জ্ঞানী ও সাধক ব্যক্তি আমার মৃতপ্রায় হৃদয়টিকে সজীব করে তুলেছেন। তিনি আমার এক বাল্যবান্ধবীর পিতা। তিনি আমাকে বোঝালেন, দাউদ বিন নসর ইসলামের দুশমন। তুমি ওর হেরেমের অভ্যন্তরের ঘটনাবলী গভীরভাবে জেনে ওর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে দীন ও মিল্লাতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পার। বাহ্যত তোমার জীবন কষ্টকর হলেও আল্লাহ্ হয়তো তোমার অসহায়তাকে ক্ষমা করে দীন ও ইসলামের জন্য তোমার খেদমতে সন্তুষ্ট হবেন। তাঁর কথায় আমি সান্ত্বনা পেলাম। অল্প দিনের মধ্যে দাউদের হারেমে সবচেয়ে আস্থাভাজন ও কর্তব্যপরায়ণ সেবিকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমি সক্ষম হলাম। আর বান্ধবীর পিতাকে দাউদের কার্যক্রম সম্পর্কে যথারীতি অবহিত করার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নিলাম।"

রাবেয়া বলল, "কারামাতী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সীমাহীন জঘন্য। তেমনি ওদের কাজকর্ম ও চালচলন। কারামাতীরা নিজেদের মুসলমান দাবী করে বটে কিন্তু এমন কোন গুনাহর কর্ম নেই যা ওরা বৈধ মনে করে না। মুলতান কারামাতীদের প্রধান কেন্দ্র। ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ওদের বিভ্রান্তির শিকার হয়ে দলে দলে কারামাতী হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কারামাতীদের বিরুদ্ধেও কিছু সংখ্যক লোক সক্রিয় রয়েছে কিন্তু তারা প্রকাশ্যে নয় অতি গোপনে। ওখানে কারো পক্ষে কারামাতীদের বিরুদ্ধাচরণ করে টিকে থাকা অসম্ভব। আমার বান্ধবীর পিতা কারামাতী বিরোধী দলের নেতৃত্বে রয়েছেন। তিনি বিশুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী, আমলদার খাঁটি মুমিন ব্যক্তি। তিনি সব সময় বলেন, তাঁর সামর্থ নেই— এজন্যে তিনি গজনী আসতে পারছেন না। তিনি বলেন, সাক্ষাৎ হলে সুলতান মাহমূদকে তিনি মুলতান অভিযানের জন্যে অনুরোধ করতেন, কারণ, কারামাতীরা মুসলমানদের জন্য হিন্দুদের চেয়েও ভয়ংকর ও বিপজ্জনক।...

তাঁর কাছে নিয়মিত যাতায়াত ছিল আমার। দাউদের ওখানে যা কিছু ঘটতো, যেসব চক্রান্ত করা হতো, সব কিছুই হতো আমার জ্ঞাতসারে। এসবের খবর আমি যথারীতি তাকে জানিয়ে দিতাম। দাউদের হারেমেই আমি সুলতান মাহমূদ সম্পর্কে জেনেছি। দাউদের কাছে রাজা আনন্দ পাল ও বিজি রায় ক'দিন পরপর আসতো। ওরা সুলতান মাহমূদকে পরাজিত করতে এবং তার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে নিয়মিত শলা-পরামর্শ করতো।

আপনার স্বামী সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, তিনি সুলতানের সেনাবাহিনীর এক শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা। এজন্যে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু দাউদের হারেমের সুন্দরী কিশোরী আর মদ সুরার ফাঁদে পড়ে নিজের কর্তব্য ভুলে গেলেন। এমন কি নিজের বাহিনীকে ধ্বংস করার চক্রান্তে নিজেই জড়িয়ে পড়লেন।

একথা আমি বান্ধবীর পিতাকে জানানোর পর তিনি আপনার স্বামীর একজন দেহরক্ষীকে ডেকে তাকে সব কথা বুঝালেন এবং হারেম থেকে আমাকে পালানোর ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই রক্ষীর সাথে আমি গজনী এসেছি। আমরা আপনার স্বামীকে ভ্রান্তিতে রেখে তার আগেই গজনী পৌছে সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করি। কয়েকদিন পর দেহরক্ষীদের নিয়ে আপনার স্বামী গজনী পৌছে দাউদের চক্রান্ত বাস্তবায়নের জন্যে সম্পূর্ণ প্রতারণাপূর্ণ তথ্য সুলতানকে অবহিত করেন। সুলতান তার প্রতারণা প্রমাণের জন্যে আমাকে ও সেই দেহরক্ষীকে তার সামনে হাজির করেন। আমি আপনার স্বামীর প্রতারণা ফাঁস করে দিলে তিনি

নিজের পরিণতি বুঝতে পেরে কোমর থেকে তরবারী বের করে আচমকা পেটে বিদ্ধ করেন।"

কাসেম ও তার মা নীরবে রাবেয়ার কথা শুনছিল। রাবেয়ার কথা শেষ হলে তার মা উঠে আসেমের তরবারীটি হাতে নিয়ে কাসেমের দিকে বাড়িয়ে বললেন— "আমি তোমার পেটে শত্রুবাহিনীর তরবারী বিদ্ধ দেখতে চাই। তবে এর আগে ঐ তরবারী দিয়ে অন্তত্ব একশ' শত্রু তোমাকে নিধন করা চাই।"

"এ তরবারী আমাকে দিয়ো না। এ তরবারীতে যে রক্ত লেগে আছে তাতে শরাবের প্রভাব রয়েছে, এ তরবারী নাপাক; এ নাপাক তরবারী দিয়ে কি জিহাদ করা যায়?" বলল কাসেম।

আসেম ওমরকে অতি সাধারণ মানুষের মতো দাফন করা হলো। তার স্ত্রী আসেমের মৃত্যুতে অনুতাপ করল বটে কিন্তু মোটেও আর কান্নাকাটি করল না, যেমনটি একজন কৃতি সেনাপতির মৃত্যুতে তার প্রেয়সী স্ত্রী করে থাকে। আসেমের স্ত্রীর মনে হিন্দুদের প্রতি পাহাড়সম ঘৃণা। সে যৌবনে হিন্দুদের অপহরণের শিকার হয়। তার বিশ্বাস, নিরীহ অবলা কিশোরীদের অভিশাপের কারণেই প্রতাপশালী জয়পালের পরাজয় ঘটেছে। আল্লাহ্র মেহেরবানীতে সে আসেম ওমরের মতো দক্ষ সৈনিককে পেয়েছিল স্বামী হিসেবে। বিয়ের পর অল্পদিনের মধ্যেই আসেম অধিনায়ক পদে উন্নীত হয়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, ইসলাম ও মুসলিম বাহিনীর জন্যে নিবেদিত প্রাণ সেই কৃতি স্বামীকে হিন্দুরা চক্রান্তের ফাঁদে ফেলে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করল। কাসেমের আম্মা পেশোয়ারে সুলতানের অভিযানের কথা শুনে খুশি হয়েছিলেন। এজন্যে তিনি স্বামীর কাছে সফরসঙ্গী হওয়ার বায়না ধরেছিলেন। স্বামী আসেমও পেশোয়ারের আঞ্চলিক ভাষাভাষী হিসেবে কাজে লাগতে পারে মনে করে স্ত্রীকে পেশোয়ার নিয়ে এসেছিল। কাসেমের মায়ের মন ছিল প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষে অগ্নিকুণ্ড। সে কোনদিন তার মতো অসংখ্য যুবতীর উপর হিন্দুদের নির্যাতনের কথা বিস্মৃত হতে পারেনি। কিন্তু প্রতিশোধের আগুন নিভানোর যে স্বপ্ন নিয়ে কাসেমের মায়ের পেশোয়ার আগমন সেই মায়ের হৃদয় এখন আত্মগ্লানি ও বিষাদে ভরপুর। অসহনীয় কষ্ট তার সাহসী মনটাকে ভেঙ্গে খান খান করে দিচ্ছে। কাসেমের মা জীবনের সব স্বপ্ন স্বামীর পরিবর্তে পুত্রকে সঁপে দিল। ছেলেটিকে সে এখন অত্যাচারী হিন্দুদের বিরুদ্ধে সাহসীরূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট। রাবেয়াকে এক বঞ্চিতা ভাগ্য বিড়ম্বিতা অবলা মেয়ে হিসেবে নিজের কাছেই রেখে দিল। ভয়াবহ ক্ষতির মুখোমুখি থেকে সুলতানের বাহিনীকে বাঁচানোর জন্যে রাবেয়া যে কঠিন

দায়িত্ব পালন করেছে, এজন্য তিনি রাবেয়াকে সাধুবাদ জানালেন। তার জন্যে প্রাণ খুলে দু'আ করলেন।

আসেম ওমর যেদিন ষড়যন্ত্রের নকশা নিয়ে গযনীর উদ্দেশে রওয়ানা হল এর পরদিনই দাউদ বিন নসর বেরায় গিয়ে বিজি রায়কে জানাল, সুলতানকে পরাজিত করতে সে কি ফাঁদ পেতেছে। কিভাবে সুলতানের প্রেরিত দূতকে বিভ্রান্ত করে ধোঁকা দিয়ে চক্রান্ত বাস্তবায়নের ক্রীড়নক বানিয়েছে। বিজি রায় দাউদের সংবাদ নিয়ে সেদিনই লাহোর চলে গেল আনন্দ পালের কাছে। আনন্দ পালকে সে বলল, অল্প ক'দিনের মধ্যে দুশমন আমাদের জালে ধরা দিচ্ছে। আপনার কাজ দাউদের নকশা অনুযায়ী পথিমধ্যে মাহমূদের সৈন্যদের নাস্তানাবুদ করে দেয়া। আনন্দ পাল বিজি রায়ের কথা শুনে বলল, "আপনি কিভাবে দাউদের কথায় আশ্বস্ত হলেন? দাউদ নিজেও তো একজন মুসলমান। দাউদ চক্রান্ত করে আমাদের সর্বনাশ ঘটাবে না এমনটা কি করে বিশ্বাস করা যায়? মুসলমানদের উপর এতোটা ভরসা করা কি ঠিক হবে?"

"আপনি এখনও জানেন না, দাউদ আসলে মুসলমান নয়! আপনার তো কারামতীদের সম্পর্কে জানা নেই। ওরা আবার মুসলমান হলো কি করে? ওরা যত অপকর্ম করে তা তো কোন অমুসলমানও করে না। ওদেরকে ধর্মহীন বললে ভুল হবে না। ওরা নামমাত্র মুসলমান। আসলে ওরা চরম ইসলাম বিরোধী। তারপরও যদি দাউদ আমাদের সাথে কোন ধরনের প্রতারণা করে তবে তার পরিণতি হবে খুবই কঠিন। সে তো চতুর্দিকে আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রতারণা করলে ওর রাজ্য আমরা দখল করে ওকে হত্যা করব, না হয় জীবনের জন্যে জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করব।

আপনি একথা মনে করবেন না যে, মাহমূদের সৈন্যরা এই মুহূর্তে আমাদের উপর হামলা করতে আসছে। মাহমূদ চাচ্ছে মুলতানকে ওদের সেনা ঘাঁটি বানাতে। মুলতানকে কেন্দ্র বানিয়ে মাহমূদ আপনার ও আমার এলাকা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিতে চাচ্ছে।

আমি দু'জন গোয়েন্দা পেশোয়ারে পাঠিয়েছি। যখনই মাহমূদের সৈন্যরা মুলতান থেকে রওয়ানা করবে তখনই ওরা দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে আমাকে আগাম খবর দিবে। আমি ঝটিকা বাহিনীকে পাহাড়ী এলাকায় পাঠাচ্ছি। যখনই মাহমূদের বাহিনী সংকীর্ণ পথে এসে ঢুকবে ওরা পাহাড়ের উপর থেকে তীরবৃষ্টি বর্ষণ করে ওদের নাস্তনাবুদ করে ছাড়বে। তাছাড়া ওরা মাহমূদের প্রত্যেক ছাউনীতে রাতের অন্ধকারে ঝটিকা আক্রমণ করে পালিয়ে আসবে। এভাবে

ক্রমাগত হামলার শিকার হয়ে ওদের অগ্রসর হতে হবে। মাহমূদের বাহিনী যদি মুলতান পৌঁছতে সক্ষমও হয় তবে তাকে অর্ধেক সৈন্য পথে হারাতে হবে। এরপর মাহমূদকে হত্যার ব্যবস্থাও করে রেখেছি আমি।"

দীর্ঘ সময় আনন্দ পাল ও বিজি রায় সুলতান মাহমূদকে চক্রান্তের বেড়াজালে আটকানোর কৌশল নিয়ে আলোচনা করল। জনকের তিনবার ধারাবাহিক পরাজয়ের কারণে আনন্দ পাল ছিল সুলতানের আনুগত্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সর্বশেষ যুদ্ধে জয়পালের পরাজয়ের পর মুক্তিপণ ও চুক্তির শর্ত অনুযায়ী জয়পাল সুলতানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এখন থেকে আর কোনদিন তার সেনাবাহিনী সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করবে না এবং যুদ্ধ খরচ আদায় করা ছাড়াও বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর সে সুলতানের কোষাগারে জমা দিবে। কিন্তু জয়পালের ছেলে আনন্দ পাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আত্মঘাতক বাবার প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করে চললো। সে জন্যে আনন্দ পালের মনে সুলতানের আক্রমণ আশংকা ছিল প্রবল। সে কিছুতেই সুলতানকে ঘাটাতে চাচ্ছিল না। কিন্তু সুলতানের বাহিনী এদিকে অগ্রসর হোক এটাও ছিল তার কাছে আতংকের ব্যাপার। আনন্দ পাল ভাবছিল, মাহমূদের বাহিনীকে ক্ষতি করতে গিয়ে বিজি রায় না আবার তার জন্যে বিপদ ডেকে আনে।

"ঝটিকা অভিযানের যে শক্তি মুসলিম সেনাদের রয়েছে, আমাদের সৈন্যদের তা নেই। ঝটিকা অভিযানের জন্যে সৈনিকদের মেধাবী, সাহসী, কৌশলী ও ত্যাগী হতে হয়। আমাদের সৈন্যদের মধ্যে এসবের অভাব আছে।" বলল আনন্দ পাল। "আপনি ঝটিকা বাহিনী পাঠান, তাতে আমার সমর্থন থাকবে কিন্তু আমার পক্ষে সরাসরি কোন সেনাবাহিনী পাঠানো সম্ভব নয়।"

"পেশোয়ার থেকে এদিকে আসতে হলে মাহমূদকে সিন্ধু নদ পেরিয়ে আসতে হবে। সিন্ধু নদের উপরে আমরা নৌকার যে পুল তৈরি করে রেখেছি ওখানে আমি ওদের ঠেকানোর ব্যবস্থা করব, যাতে তারা নদ পেরিয়ে আসতে না পারে। পুলের আশপাশে আমি সৈন্য মোতায়েন করব যাতে ওরা নদ পেরিয়ে আসার সুযোগ না পায়। তারপরও যদি ওরা নদ পার হতে সক্ষম হয় তাহলে ওদের পথ রোধ করার দায়িত্ব আপনার। আমাদের সবার চেষ্টা হওয়া উচিত, ওরা যদি এদিকে এসেই যায় তবে যেন আর জীবিত ফিরে যেতে না পারে।" বললো বিজি রায়।

ওদের ভাবনার চেয়েও দ্রুতগতিতে সুলতানের বাহিনী মুলতান অভিযানের প্রস্তুতি নেয়। সুলতান কারামাতীদের শিকড় উপড়ে ফেলার জন্য খুব দ্রুত অভিযানের নির্দেশ দিলেন। তার কাছে তখন রসদের কোন ঘাটতি ছিল না, তাই

প্রস্তুতি নিতেও তেমন ভাবতে হয়নি। সুলতান সেনাপ্রধান ও শীর্ষ কর্মকর্তাদের ডেকে তাদেরকে অভিযানের কৌশল বলে নিলেন। তিনি এও বলে দিলেন, "পথিমধ্যে যথাসম্ভব কম ছাউনী ফেলতে হবে। ছাউনী যেখানেই ফেলা হোক, রাতের পাহারা জোরদার রাখতে হবে। গুপ্ত হামলার শিকার থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ছাউনীর আশপাশে ঝটিকা বাহিনী নিযুক্ত রাখতে হবে। কেননা, মুলতান পর্যন্ত পৌঁছতে প্রতি ক্ষেত্রে গেরিলা আক্রমণের আশংকা রয়েছে। এই আশংকা থেকে বাহিনীকে নিরাপদ রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।"

অগ্রণী দল নির্বাচনে সেনাপ্রধান আবু আব্দুল্লাহ্ আত্তায়ীকে নির্দেশ দিলেন সুলতান। বললেন, "এমনটা মনে করো না যে, অগ্রগামী দল পথ পরিষ্কার করে দিবে আর বাকী সৈন্যরা মানুষের ক্ষেতের ফসল, গাছের ফল আর আচার খেতে খেতে নির্বিঘ্নে মুলতান পৌঁছে যাবে। যেখানে আমরা যাচ্ছি, পথের প্রতিটি গাছ, প্রতিটি শস্যদানা, প্রতি ইঞ্চি মাটি আমাদের প্রতিপক্ষ। এ পথের প্রতিটি পাহাড়, টিলা ও ঝোপঝাড় আমাদের জন্যে মৃত্যুফাঁদ। অগ্রণী বাহিনীকে মেপে মেপে পা ফেলতে হবে। ঈগলের মতো সতর্ক দৃষ্টি আর হরিণের মতো সদা জাগ্রত থাকতে হবে। গতি হবে ক্ষীপ্র, লক্ষ্যভেদী। মনে রেখো, অগ্রণী দলকে প্রতিক্ষেত্রে প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হবে। প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করে তাদের সামনে এগুতে হবে। মূল বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকেও সার্বক্ষণিকভাবে শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে হবে।"

সাধারণ কমান্ডাররা বুঝতেই পারছিল না, সুলতান এ অভিযানে অগ্রণী দলকে কেন এত সতর্ক থাকতে বলছেন। সবার অজানা থাকলেও কাসেম বিন আসেমের জানা ছিল সুলতানের সতর্কবাণীর মর্ম-রহস্য। জানা থাকার কারণে সুলতানের নির্দেশনার পর সে দাঁড়িয়ে বলল—

"সুলতানে আলী মাকাম! আমার প্রস্তাব যদি আপনার হুকুমের বরখেলাপ এবং আপনার সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপের অপরাধ হিসেবে বিবেচিত না হয় তবে আমার অনুরোধ, আমার ইউনিটকে অগ্রণী দলের দায়িত্বে দেয়া হোক।"

"তোমার কি নাম?" জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

"ওর নাম কাসেম বিন ওমর।" কাসেমের পরিবর্তে জবাব দিলেন সেনাপ্রধান আবু আব্দুল্লাহ। "সে আসেম ওমরের ছেলে।"

কাসেমের দিকে তাকিয়ে সুলতানের চেহারায় ভাবান্তর ঘটল। তিনি একটু নীরব থেকে বললেন, "অগ্রণী দল পরে নির্বাচন করা হবে, তুমি পাশের ঘরে বস, তোমার সাথে পরে কথা বলব।"

অভিযানের সময়, কৌশল ও প্রস্তুতির নির্দেশনা দিয়ে সবাইকে বিদায় করে দিলেন সুলতান। সেনাপ্রধান আবু আব্দুল্লাহ্ ও কাসেমকে ডেকে একান্ত বৈঠকে কাসেমকে জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি অগ্রণী দলের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী কেন?"

"এ অভিযানে পথে পথে যে সব কঠিন বিপদের মুখোমুখি সুলতানের বাহিনীকে হতে হবে তা সবই আমার পিতার তৈরি। তাই পিতার তৈরি বিপদের মোকাবেলা সবার আগে ছেলেরই করা উচিত বলে আমি মনে করি।" বলল কাসেম।

"মুহতারাম সুলতান! ওর আম্মা আমার কাছে এসেছিল। স্বামীর আত্মহত্যায় তার কোন অনুতাপ নেই। সুলতানের জন্যে তার স্বামীর এতো বড় বিপদাংশকা সৃষ্টির জন্যে সে অত্যন্ত দুঃখিত। সে আমাকে বলেছে, তার ছেলেকে সে আল্লাহ্র পথে কুরবান করতে চায়। তাকে যেন অগ্রণী বাহিনীতে সুযোগ দেয়া হয়, যাতে সে তার বাবার অপরাধের কাফফারা করার সুযোগ পায়।"

"তুমিও কি তোমার আম্মার মতো আত্মবিশ্বাসী, না তোমার পিতার মতো তুমিও বেঈমানদের শিকারে পরিণত হবে?" কাসেমকে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

"শপথ করা ছাড়া আপনাকে আশ্বস্ত করার আর কোন উপায় আমার নেই— মহামান্য সুলতান! আমি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি, মায়ের উদ্দীপনাই আমি ধারণ করি, পিতার দুর্বলতা নয়। সৈনিক হিসেবে আমি পিতার উত্তরসূরী। আমি আমার পিতাকে একজন বিচক্ষণ, সাহসী ও বুদ্ধিমান সেনাপতি হিসেবেই দেখেছি, শুনেছি, কিন্তু তার করুণ পরিণতি দেখার পর বেঈমানদের চক্রান্তের উচিত শিক্ষা দিতে আমি শপথ গ্রহণ করেছি।"

"তুমি হয়তো জানো না, তোমার মায়ের বুকে বেঈমানদের প্রতি কি আগ্নেয়গিরি জ্বলছে। যৌবনের শুরুতেই সে বেঈমানদের দ্বারা অপহৃত হয়ে হিন্দু নরপশুদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে। তোমার মায়ের মতো তখনকার বহু তরুণীর সৌভাগ্য যে, হিন্দুরা পরাজিত হয়ে ওদের ফেলে চলে যায়। আমরা ওদের উদ্ধার করে সেনাবাহিনীর লোকদের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেই।

কাসেম! তুমি তরুণ। তুমি হয়তো জান না, হিন্দুরা মুসলমান তরুণীদের সম্ভ্রমহানীকে ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে। অথচ মুসলমানরা নারীর মর্যাদা রক্ষা আর ইসলামের জন্যে জীবন দিতে কত আন্তরিক ও অকুণ্ঠ! একজন মুসলমান অমুসলিম নারীর সম্ভ্রমকেও পবিত্র আমানত মনে করে জীবন দিয়ে তার সম্ভ্রম রক্ষা করে। ইসলাম নারীর গায়ে হাত দেয়াকে কবীরা গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য

অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, আর বেঈমানরা নারীর সম্ভ্রমহানীকে পুণ্যের কাজের মতো উৎসাহিত করে। কাসেম! বিশ্বের কোন মুসলিম তরুণী লাঞ্ছিত হলে সারা বিশ্বের মুসলিম তরুণদের ঘুম হারাম হয়ে যাওয়া উচিত। মুসলিম তরুণী লাঞ্ছিতের সংবাদে প্রতিশোধ স্পৃহায় বিশ্ব মুসলিমের ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। তাই আমাদের মুসলিম বোনদের লাঞ্ছিতের প্রতিশোধ আমাদের নিতেই হবে। নরপশুদের কালো হাত ভেঙে গুড়িয়ে দিতে হবে। না হয় আমাদের সন্তানরা ওদের পাশবিকতা ও দন্ত-নখরাঘাতে বারবার রক্তাক্ত হবে।"

"প্রতিশোধ! কন্যা জায়াদের লাঞ্ছিত করার প্রতিশোধ!"

"আমি সেই প্রতিশোধ নিতেই প্রস্তুত। সুলতানে আলী মাকাম!"

"কাসেম! তারুণ্য এক ধরনের অন্ধত্ব।" বললেন সুলতান। "ছোট বেলায় আমি আমার শাইখ ও মুর্শিদের কাছে শুনেছি, মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার চেয়ে নেক কাজ করার প্রবণতা বেশি শক্তিশালী। কিন্তু সেই প্রবণতা মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ যদি নিজ ইচ্ছা শক্তিকে নেক কাজ করার প্রতি ধাবিত করে তখনই সে পাপ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। আহ্! তোমার পিতার মৃত্যু আমাকে অতটুকু কষ্ট দেয়নি, যতটুকু কষ্ট দিয়েছে তার নৈতিক অবনতি। সারা জীবনের জিহাদ, ইসলামের খেদমতে নিজের অবদানকে সে মুলতানের ক'দিনের রঙ তামাশা আর আমোদ-আয়েশে জলাঞ্জলি দিয়ে দিল। এখানে ফিরে এসেছিল সে শুধু শরীরটি নিয়ে; তার হৃদয়কে মুলতানের নাচঘরেই সে হত্যা করে এসেছিল। এই মাটির পাপ পঙ্কিল দেহের মায়া ত্যাগ কর কাসেম, রূহকে পঙ্কিলতা মুক্ত রাখতে চেষ্টা কর। আমার মুর্শিদ শাইখ আবুল হাসান খিরকানী বলেছেন, মানুষের হৃদয় বা আত্মা আল্লাহ্র পবিত্র আমানত। যে এ পবিত্র আমানতে কালিমা লিপ্ত করল, সে আল্লাহ্র আমানতে খেয়ানত করল। কাসেম! আত্মাকে পবিত্র রাখতে চেষ্টা কর! তোমার পিতা তার রূহকে নাপাক করে ফেলেছিল— যার ফলে একজন খ্যাতিমান কৃতি ব্যক্তিত্ব হওয়ার পরও তাকে অপমানজনক মৃত্যুবরণ করতে হলো। তার এই লজ্জাজনক পরিণতির জন্য আমার মনে খুবই কষ্ট কাসেম ...।

দেখো, মুলতানের সেই মেয়েটি পাপের সাগরে নিমজ্জিত থাকার পরও সে তার আত্মাকে নেক কাজে নিয়োজিত রেখেছিল। ইসলামের সেবায় নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল। যার ফলে আল্লাহ্ তাকে পাপ-পঙ্কিল জগৎ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সে-ই তোমার পিতার অধঃপতন ও চক্রান্তে জড়ানোর কথা আমাকে অবহিত করেছে। দেখো! ইসলামের জন্যে নিবেদিতা এক অবলা

মহিলার দ্বারাও আল্লাহ্ তা'আলা কতো বড় কাজ নিতে পারেন। সে যদি আমাকে যথা সময়ে অবহিত না করতো, তবে না জানি আমাদের কতো কঠিন বিপদের মুখোমুখি হতে হতো। কাসেম! তুমি হয়তো আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য জানো! এটাও হয়তো বুঝতে পেরেছো, পথে পদে পদে কঠিন বাধা ডিঙাতে হবে।"

"আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য কি এবং পথিমধ্যে কি কি বিপদ হতে পারে তা আমি জানি সুলতানে আলী মাকাম। মেহেরবানী করে আপনি আমাকে অনুমতি দিন, যাতে আমি নিজের পছন্দমতো সহযোদ্ধা নির্বাচন করতে পারি। আশা করি, বেঈমান গুপ্তঘাতকরা আমাদের অগ্রযাত্রা রুখতে পারবে না।"

সুলতান মাহমূদ সেনাপ্রধান আবু আব্দুল্লাহকে বললেন, "কাসেমকে তার পছন্দমতো সহযোদ্ধা নির্বাচনের সুযোগ দিন।"

অগ্রগামী দলে নির্ভীক, সাহসী ও পারদর্শী পাঁচ'শ যোদ্ধা বেছে নিলো কাসেম। তারা পেশোয়ার থেকে সবার আগে রওয়ানা হলো। এই দলের অধিনায়ক কাসেম বিন ওমর। কাসেমের অশ্ব সবার আগে। তার পাশাপাশি অন্য একটি ঘোড়ায় আরোহী এক মহিলা। কাসেম জানতো, নিকাব পরিহিতা সহযাত্রী কে। বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর কাসেমের ঘোড়া থেমে গেল। থেমে গেল কাফেলা। কাসেম নিজ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে নিকাব পরিহিতার মুখোমুখি হয়ে বললো, "এখন আমাকে আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করে দাও মা!" মহিলার কদমবুচি করে বলল কাসেম।

মাও ঘোড়া থেকে নেমে গেলেন। কাসেমের ডান বাহুতে তাবিজের মতো একটা ছোট্ট পুটলী বেঁধে বললেন— "এটা পবিত্র কুরআনের সেই আয়াত যার বরকতে সকল বাধা পায়ে দলে তোমরা মঞ্জিলে পৌঁছে যাবে সাফল্যের সাথে। শর্ত হলো, তোমার ঈমানদারীর উপর অবিচল থাকতে হবে। মানুষের শারীরিক সামর্থ অটুট রাখতে হলে ঈমানী শক্তি মজবুত থাকা অপরিহার্য। আলবিদা হে প্রিয় পুত্র! যদি তুমি জীবিত ফিরে এসো তাহলে খুশি হবো, তবে সবচেয়ে খুশি হবো যদি তোমার লাশ ফিরে আসে আর তোমার শাহাদাতের বিনিময়ে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে।" এতটুকু বলার পর মায়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। আবেগে তার শরীর কাঁপতে শুরু করল। দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুর অঝোর ধারা।

কাল বিলম্ব না করে  কাসেম এক লাফে অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসে ঘোড়ার বাগে টান দিল। চলতে শুরু করল অগ্রগামী কাফেলা। অনেক দূরে গিয়ে পিছনে ফিরে

তাকাল কাসেম। একটি টিলার উপরে ছায়ার মতো অস্পষ্ট একজন অশ্বারোহী গোচরীভূত হলো। কাসেম অনুমান করল, তার মা হাত নাড়িয়ে তাকে আলবিদা জানাচ্ছেন। ঘোড়া সামনে চলতে লাগল। একটি উঁচু টিলা মা ও ছেলেকে অদৃশ্য করে দিল।

পেশোয়ারের এক বিশাল প্রান্তরে সেনাবাহিনীর সামনে এসে সুলতান মাহমূদ যখন দাঁড়ালেন তখন ভোরের অন্ধকার ভেদ করে পূর্বাকাশে সূর্য উঠছে। রসদপত্র বোঝাই করা দীর্ঘ সারি ধীরলয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সৈন্যরা সুলতানের নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

"মুজাহিদ ভাইয়েরা! আজ তোমরা আমার নির্দেশে নয়, আল্লাহ্র নির্দেশে অভিযানে বের হচ্ছো। তোমরা আজ এমন এক ভূখণ্ডে যাচ্ছো, যে ভূখণ্ড মুহম্মদ বিন কাসিম ও তাঁর সহযোদ্ধাদের আযানের ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছিল। কিন্তু বেঈমানেরা এখন আর সে দেশে উচ্চকিত হতে দেয় না সুমধুর আযানের আওয়াজ। সেখানে আজ ইসলামের নাম নিশানা নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম। মসজিদগুলো আজ পরিত্যক্ত। কাফের বেঈমানেরা অপবিত্র করছে আল্লাহ্র ইবাদতখানাগুলো, দুঃশাসন চলছে জালেমদের। তোমাদেরই বোন-কন্যাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হচ্ছে সে দেশের ঘরে ঘরে। সেই নির্যাতিতা মা বোনেরা তোমাদের আগমন অপেক্ষায় অধীর নেত্রে তাকিয়ে রয়েছে।

পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডে যদি একজন মুসলিম নারীও নির্যাতনের শিকার হয় তবে সেই নির্যাতিতাকে রক্ষা করার জন্যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জিহাদ করা সক্ষম প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্যে অবশ্যকর্তব্য। পবিত্র কুরআন নির্দেশ দিয়েছে— 'বেঈমানদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও, যতক্ষণ না জুলুমের অবসান হয়।' পৌত্তলিক বাহিনী তোমাদের উপর তিনবার আক্রমণ করেছে, প্রত্যেকবার তোমরা তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছো। হিন্দু রাজারা তোমাদেরকে পদানত, পরাজিত করে ইসলামের শক্তিকে ধ্বংস করে দিতে বদ্ধপরিকর। আজ যে অভিযানে তোমরা যাচ্ছো, এটা মামুলী দু'টি বাহিনীর যুদ্ধ নয়, দু'টি চির প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শের সংঘাত।

ইসলামই একমাত্র সত্যধর্ম এবং মানবতার মুক্তির সনদ— এই অমোঘ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং পুনর্বার বেঈমানদের জানিয়ে দিতেই পরদেশে আজকের এই অভিযান। মুলতানের পথঘাট অপরিচিত হলেও তোমরা সেটিকে পরদেশ মনে করো না, ওখানকার মাটি মুসলমানদের বরণ করতে উন্মুখ। মুলতানের বৃক্ষ-তরুলতা, মুলতানের জমিন বিন কাসিমের জিহাদী চেতনায়

উজ্জীবিত, মুজাহিদ কাফেলার অশ্ব পদচারণায় ধন্য হতে উদগ্রীব। সেখানকার আলো-বাতাস, বৃক্ষ-তরুলতা পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষায় অধীর। তোমাদের স্বাগত জানাতে প্রতীক্ষায় রয়েছে মুলতানের প্রতি ইঞ্চি মাটি। মুলতানের আকাশ তোমাদের তকবীর ধ্বনিতে তৃপ্ত হওয়ার অপেক্ষায় ব্যাকুল।"

সুলতান মাহমূদের আবেগ আপ্লুত ভাষণ দীর্ঘতর হতে লাগল। কমান্ডার ও অধিনায়কদের যুদ্ধকৌশল ও করণীয় সম্পর্কে অফিসিয়াল নির্দেশনা তিনি আগেই দিয়েছিলেন। অভিযান শুরু হওয়ার আগে প্রতিটি সৈনিকের মনে এ প্রত্যয় তিনি জন্মানো জরুরী মনে করলেন যে, "তোমাদের এ যুদ্ধাভিযান দেশের ভৌগোলিক সীমানা বৃদ্ধির জন্য নয়, রাজত্ব প্রসারের উদ্দেশ্যে নয়, এটি জিহাদ। মজলুম মুসলমানদের মুক্তির জিহাদ, ইসলামী ভূখণ্ডকে পুনর্দখলের জিহাদ। মুসলমানদের হৃত গৌরব উদ্ধারের জিহাদ, মুছে দেয়া ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করার জিহাদ।"

সুলতানের আবেগঘন অগ্নিঝরা বক্তৃতায় সৈনিকদের মধ্যে মনোবল দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো বেঈমানদের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিশোধ স্পৃহা, আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল প্রত্যেক সৈনিকের বুকে। গোটা বাহিনী প্রচণ্ড আক্রোশে বেঈমানদেরকে তুলোর মতো উড়িয়ে দিতে উদ্যত, সবাই তীব্র গতিতে শত্রুর মুখোমুখি হতে অস্থির হয়ে উঠল।

ওদিকে কাসেম বিন ওমরের অগ্রগামী দল বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সিন্ধু নদপারের নৌকাগুলোর কাছে পৌঁছে গেল। কাসেমের সেনা ইউনিট যখন পুলের মাঝামাঝি পৌঁছাল তখন এক ঝাঁক তীর এসে তার ঘোড়ার সামনে নৌকার পাটাতনে বিদ্ধ হলো। কাসেম সকলকে সতর্ক হতে বললো। ইত্যবসরে অপরদিক থেকে আওয়াজ ভেসে এলো— "সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে না, তাহলে তোমাদেরকে তীরের আঘাতে চালুনী বানিয়ে ফেলব।"

"তোমরা কে আমাদের পথ রোধ করার?" উচ্চ আওয়াজে বলল কাসেম। "আমরা সুলতান মাহমূদের সৈনিক। রাজা আনন্দ পাল আমাদের রায়ত। এ পুল দিয়ে অতিক্রমে আমাদের কেউ বাধা দিতে চাইলে তার পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ।"

"মহারাজা আনন্দ পালের হুকুম। এ পুল পেরিয়ে কোন যবনকে এদিকে আসতে দেয়া হবে না। তোমরা ফিরে যাও।"

কাসেম খেয়াল করল, ওপারের কোল ঘেঁষে উঁচু টিলা, ঘন বনবীথি। টিলার উপরে মাত্র ক'জন লোককে কাসেম দেখতে পেল। তার আন্দাজ করতে অসুবিধা

হলো না, পুলের নিরাপত্তা ও মুসলিম বাহিনীকে রুখে দিতে আড়ালে আরো বহু সৈনিক লুকিয়ে রয়েছে।

মাত্র একজন সাথীকে নিয়ে দ্রুত গতিতে ওপারে পৌঁছে গেল কাসেম। টিলার উপরে দাঁড়ানো হিন্দু সৈনিক কাসেমকে ক্ষুব্ধকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল— "কেন তুমি পুল পেরিয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে এদিকে আসতে চাচ্ছো?"

"আমরা কারো উপর আক্রমণ করতে আসিনি।" জবাব দিল কাসেম। "আক্রমণ ও যুদ্ধের প্রশ্নই এখানে অবান্তর। কেননা এ ভূখণ্ডের রাজা আমাদের করদাতা। আমরা শুভেচ্ছা সফরে এসেছি, আমাদের পুল পার হওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত।"

"তোমাদের করদাতা রাজাই তো আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে, মুসলিম ফৌজ আসছে, ওদেরকে পুলের ওপর রুখে দিতে হবে।" বলল হিন্দু সৈনিক।

"তোমাদের রাজা তো এখানে থাকার কথা নয়। তিনি লাহোর বা বাটান্ডায় থাকার কথা।"

"মহারাজা এখান থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে তাঁবু ফেলেছেন।" বলল হিন্দু সৈনিক। "যদি তার কাছ থেকে পুল পার হওয়ার অনুমতি নিতে চাও, তাহলে তোমার সুলতান নয়তো উজীরকে পাঠাও।"

"আমিই সুলতান আমিই উজীর। আমাকেই তোমার রাজার কাছে নিয়ে চলো।" বলল কাসেম। "আমি কিছুতেই ফিরে যাবো না। তুমি যদি আমাকে আড়ালে লুকিয়ে থাকা তীরন্দাজদের মাধ্যমে বাধা দিতে চাও, তবুও তোমার বাধা আমি মানবো না। আমরা পুল ছাড়াও নদী পেরিয়ে আসতে পারবো। তবে তোমাদের জন্য রাজার অন্যায় নির্দেশ পালন করতে গিয়ে জীবন বাজী রাখা ঠিক হবে না।"

হিন্দু সেনারা তাকে সাথে করে রওয়ানা হল। কাসেম চতুর্দিক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পেল, টিলার আড়ালে বহু সৈন্য লুকিয়ে রয়েছে। টিলা অতিক্রম করে একটু অগ্রসর হতেই তার নযরে পড়ল রাজা আনন্দ পালের শিবির। কাসেম এলাকাটির ভৌগোলিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। কাসেমের বুঝতে অসুবিধা হলো না, রাজা আনন্দ পাল নিজে কেন সেনাবাহিনী নিয়ে শিবিরে অবস্থান করছে!

রাজা আনন্দ পালের শিবিরটি ছিল সবুজ শ্যামল ময়দানে। কাসেমকে একটি চৌকোণা উঁচু তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। কয়েকটি কক্ষ পেরিয়ে যাওয়ার পর সে

দেখল, বিশাল একটি ঘরের মতো সাজানো গোছানো তাঁবুতে শাহী মসনদে রাজা আনন্দ পাল উপবিষ্ট। তার পিছনে দাঁড়িয়ে অনিন্দ্যসুন্দরী দু'তরুণী বাতাস করছে। রাজাকে আগেই অবহিত করা হয়েছিল, তার সাথে কে সাক্ষাৎ করতে আসছে। ফলে রাজার চেহারা ছিল ভাবগম্ভীর। তার চারদিকে রাজার শীর্ষ কর্মকর্তারা ও সেনাপতি দণ্ডায়মান।

"তোমাদের সুলতান কি নদী পার হতে চায়? তার এইদিকে আসার উদ্দেশ্য কি? কোথায় যেতে চায় সে?" কাসেমকে জিজ্ঞেস করল রাজা আনন্দ পাল।

"আপনি আমাদের করদাতা। এখনও পর্যন্ত আপনি চুক্তির শর্তানুযায়ী কর পরিশোধ করেননি। চুক্তি মতে আপনি আমাদের অধীন। অতএব সুলতান কেন নদী পেরিয়ে এদিকে আসতে চান একথা জিজ্ঞেস করার অধিকার আপনার আছে কি? তবুও আমি আপনাকে এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি, সুলতান আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছেন না। আমরা নির্বিবাদে এইপথ অতিক্রম করার সুযোগ চাই।"

"তোমার ঔদ্ধত্যপনা ক্ষমা করে দিলাম। জেনে রাখো, আমি কারো করদাতা নই। তোমাদের সাথে চুক্তি করেছিল আমার পিতা, আমি কোন চুক্তি করিনি। তিনি মরে গেছেন। তোমাদের সুলতান আমাকে কখনও পরাজিত করেননি। কাজেই আমি কেন বাবার জরিমানা দিতে যাবো? তোমাদের সুলতানকে বলে দিও, সে কোথায় যেতে চায় তা আমরা জানি। আমরা কিছুতেই সুলতানকে মুলতানে সেনাঘাঁটি স্থাপন করতে দেবো না। পাহাড়ের ওপাশে কি ঘটছে তাও আমি জানি। এ মুহূর্তে তোমাদের সুলতান কোথায় আছে, তার সাথে কতো সৈন্য রয়েছে সবই আমি তোমাকে বলে দিতে পারব। তাকে ফিরে যেতে বলো। আমি তার অধীনতা অস্বীকার করছি। কেন তাকে কর দেবো? সে যদি একান্তই নদী পার হতে চায় তবে অনুমতির জন্যে তাকে আমার দরবারে আসতে বলো।"

"আমরা এমন অহংকারী কোন রাজার দরবারে সুলতানকে যেতে দেই না। আত্মহংকারে যে রাজা ঘাড় উঁচু করে রাখে আমাদের সুলতান তার নিকট আসার প্রয়োজনবোধ করেন না। তিনি যদি এখানে আসতেও চান তবুও তাঁকে আমি আসতে দেবো না।" বলল কাসেম।

"ভদ্রভাবে কথা বল। তুমি আমাদের রাজদরবারের অপমান করছো।" হুংকার দিয়ে বলল এক আমলা। সে রাজার দিকে প্রতিশোধ আজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাল। রাজা মুচকি হেসে বলল, "তুমি যেতে পার। তুমি তরুণ। এবার তোমার যৌবনের প্রতি দয়া করে ক্ষমা করে দিলাম। আর কখনও পুলে কদম

রাখার দুঃসাহস করো না। তোমাদের সুলতান যদি যুদ্ধ করার ইচ্ছায় এসে থাকে, তবে তাকে বলো, আমরা প্রস্তুতই রয়েছি, সাহস থাকলে সে পুল অতিক্রমের চেষ্টা করে দেখুক।'

"আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি।" ক্ষোভ চেপে ফেলল কাসেম। "ফিরে যাচ্ছি।"

কাসেম ফিরে গিয়ে আনন্দ পালের সেনাদের বাধা এবং সাক্ষাতের ঘটনা বিস্তারিত সুলতানকে জানাল।

"তোমার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ কাসেম। তুমি চমৎকার কূটনৈতিক চাল দিয়েছো। ওকে এমনই একটা সংশয়ের মধ্যে ফেলা দরকার ছিল। দেখবে, আজ রাতেই আমি নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করব। তোমার অগ্রগামী ইউনিট পুলের কাছে অপেক্ষা করবে, আরেকটি অশ্বারোহী ইউনিট তোমার পিছনেই থাকবে সহযোগী হিসেবে। অন্য সৈন্যরা ভিন্ন পথে নদী পেরিয়ে আনন্দ পালের শিবিরে আক্রমণ শানাবে। তুমি আমার পয়গামের অপেক্ষা করবে। খবর পৌছার সাথে সাথে সহযোগীদের নিয়ে ঝড়ের বেগে পুল পেরিয়ে যাবে।

শত্রুবাহিনী তোমাদের মুখোমুখি থাকবে না— তোমাদেরকে ওরা পিছনে রাখবে তা বলা কঠিন। বুদ্ধি খাটিয়ে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করে কাজ করবে। এখন পুলের পিছনে চলে যাও। খেয়াল রাখবে, কোন বাহিনী যাতে তোমাদের অবস্থান নির্ণয় করতে না পারে।

আরেকটা বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে খেয়াল রাখবে, কোন সাধু-সন্ন্যাসী কিংবা দরবেশ ধরনের মানুষ বা সৈনিক যদি পুল পার হয়ে তোমাদের দিকে আসে তাকে অবশ্যই বন্দী করবে। এ সময়ে অপরিচিত যে কোন ব্যক্তিই শত্রুচর হওয়ার আশংকাই বেশি।"

সুলতান মাহমূদ সেনাপ্রধান আবু আব্দুল্লাহকে জানালেন, "রাজা আনন্দপাল নদীর ওপারে সেনাবাহিনী নিয়ে অপেক্ষমাণ। সে আমাদেরকে নদী পার হতে বারণ করে দিয়েছে। মাছ শিকারীর বেশ ধরে এখনই নদী তীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে যান, নয়তো দূরদর্শী কোন কমান্ডারকে পাঠান। আজ রাতেই নদী পার হয়ে আনন্দ পালের শিবিরে আক্রমণ করতে হবে।" সুলতান মাহমূদ কাসেমের কাছ থেকে নদী তীরের পরিবেশ পরিস্থিতি এবং ভৌগোলিক প্রকৃতি জেনে নিয়েছিলেন, যাতে নদী পেরিয়ে ওপারে উঠে নিজেদের গতি নির্ণয় সহজ হয়।

অপর দিকে রাজা আনন্দ পাল সেনাবাহিনীর অর্ধেককে সিন্ধু নদের পুল পাহারায় নিযুক্ত করে, যাতে সুলতানের বাহিনীকে ওরা ওখানেই রুখে দিতে পারে। পুলটি ছিল কাবুল নদী ও সিন্ধুনদের মোহনা থেকে একটু উজানে। সুলতান মাহমূদ নদীর পরিস্থিতি জেনে আরেকটু উজানে অগ্রসর হয়ে সিন্ধু নদ পার হলেন। এখানে নদী ছিল চওড়া কিন্তু অগভীর। বেলা উঠার আগেই সুলতানের সকল সৈন্য নদী পেরিয়ে ওপারে পৌঁছে গেল। তখন এক হাজার ছয় খৃষ্টাব্দের বসন্তকাল।

রাজা আনন্দ পাল ভাবতেও পারেনি, সুলতানের বিশাল বাহিনী পুল ছাড়াই এতো অল্প সময়ে নদী পার হয়ে যাবে। আনন্দ পাল শংকাহীন ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। সুলতানের সরাসরি কমান্ডে যখন আনন্দ পালের শিবিরে আক্রমণ শুরু হয়ে গেল তখন তাদের পক্ষে প্রতিরোধ করার কোন সুযোগ নেই। আনন্দ পালের যে সৈন্যরা পুলের পাহারায় ছিল ওরা ছিল সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত। রাজার শিবিরে আক্রমণের সংবাদ পেয়ে ওরা প্রতিরোধে অগ্রসর হল। ইত্যবসরে বেলা উপরে উঠে এসেছে। এদিকে কাসেম সাথীদের নিয়ে সুলতানের পয়গামের জন্যে অধীর অপেক্ষায় রয়েছে। সে একটি উঁচু টিলার উপর থেকে ওপারের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্যে দু'জনকে নিয়োগ করে রাখল। যারা সুলতান ও আনন্দ পালের যুদ্ধ পরিস্থিতি দেখছিল। ওরা যখন দেখল, পুল পাহারায় নিয়োজিত রাজার বাহিনী পাহারা তুলে নিয়ে ময়দানের দিকে দৌড়াচ্ছে, তখন তারা কাসেমকে ইঙ্গিতে ব্যাপারটি বোঝাল। কাসেম সঙ্গীদেরকে ঝড়ের গতিতে পুল পার হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে পুলের ওপারে পৌঁছে গেল। সবাইকে এক সাথে করে কাসেম আনন্দ পালের পুল প্রহরী বাহিনীর পিছন দিক থেকে তীব্র গতিতে আক্রমণ করল।

রাজা আনন্দ পাল প্রতি-আক্রমণের অবকাশই পেল না। পরিস্থিতি এমন হলো যে, রাজার পালানোই একমাত্র বিকল্প পথ। রাজা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। তার সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়ল। অধিকাংশকে সুলতানের বাহিনী বন্দী করল, কিছুসংখ্যক পালাতে সক্ষম হলো আর বাকীরা নিহত হলো। সুলতানের বাহিনী আনন্দ পালকে বর্তমান অজীরাবাদ পর্যন্ত তাড়া করেছিল। কিন্তু আনন্দ পাল গরীব মাঝিদের মোটা অংকের বখশিশ দিয়ে পাঞ্জাব নদী পার হয়ে প্রাণে বেঁচে যায়। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'সিন্ধু নদ' যুদ্ধ হিসেবে খ্যাত।

পশ্চাদ্ধাবনকারী সুলতানের সৈন্যরাও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সুলতান দ্রুত দূত পাঠিয়ে বিক্ষিপ্ত সৈন্যদেরকে ঝিলাম নদীর পূর্বতীরে একত্রিত করেন।

অবশ্য শত্রু বাহিনীর পিছনে পশ্চাদ্ধাবনকারী মুসলিম সৈন্যদের একত্রিত ও সমগ্র বাহিনীকে পুনর্গঠিত করতে এক মাস সময় লেগে যায়।

সুলতান মাহমূদ সেনাধিনায়ক ও কমান্ডারদের বললেন, "আমরা বিজি রায়ের অবস্থান থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। এই মুহূর্তে বিজি রায়ের সাথে সংঘর্ষ এড়াতে চেষ্টা করা উচিত। আমাদের সৈন্যরা রণক্লান্ত। এছাড়া আমাদের আসবাব পত্র ও শত্রুবাহিনীর থেকে প্রাপ্ত বিপুল সম্পদও যুদ্ধাবস্থায় আগলে রাখা কষ্টকর হবে। এখন আমাদের লক্ষ্য দাউদ বিন নসর। আগে আস্তিনের কাল সাপটিকে খতম করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

এবার মুলতানের দাউদ বিন নসরের মসনদের দিকে যাত্রা করল সুলতানের বাহিনী। এবারও কাসেম বিন ওমরের ইউনিট অগ্রগামী। মুলতান যাত্রার তৃতীয় দিন। কাসেম বিন ওমর সবার আগে। তার পাশাপাশি দু'জন অশ্বারোহী আঞ্চলিক গাইড। হঠাৎ কাসেম চার পাঁচশ গজ দূরে একজন অশ্বারোহীকে দেখল। লোকটি ঘোড়া থামিয়ে কাসেমের বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করছিল। অগ্র পশ্চাৎ দেখে লোকটি দ্রুত একদিকে অশ্ব হাঁকালো।

অন্যরা ভাবলো, লোকটি হয়ত সৈন্যদলকে দেখে ভয়ে পালিয়েছে। কিন্তু কাসেম মনে করল, লোকটি বিজি রায়ের চর হতে পারে, সে বিজি রায়কে মুসলিম বাহিনী আগমনের আগাম সংবাদ দিতে দৌড়াচ্ছে। কাসেম গাইডকে জিজ্ঞেস করল, "এখান থেকে বেরা কত দূর এবং কোনদিকে?"

গাইড বললো, "বেরা বেশি দূরে নয়, ঐ লোকটি তো বেরার দিকেই ঘোড়া দৌড়াচ্ছে।"

কাসেম বিন ওমর দু'জন অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে পালায়নপর অশ্বারোহীর পশ্চাদ্ধাবন করল। লোকটি অনেক দূর চলে গেছে কিন্তু কাসেম ও সাথীদের ঘোড়াগুলো ছিল দ্রুতগামী। তারা দৌড়াচ্ছে। এক পর্যায়ে তাদের চোখে পড়ল বেরা দুর্গের উঁচু মিনার। পলায়নপর ও পশ্চাদ্ধাবনকারীদের মধ্যে ক্রমশ দূরত্ব কমে এলে কাসেম সাথীদের বলল— "তীর বের কর। ওকে জীবিত যেতে দেয়া যাবে না।" এক সাথী ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে বসেই তীর চালাল। একটি তীর লোকটির পিঠে আর একটি তীর ঘোড়ার পশ্চাদ্দেশে বিদ্ধ হলো। এতে পলায়নকারীর ঘোড়ার গতি আরো বেড়ে গেল। কাসেমের সাথীরা আরো দু'টি তীর নিক্ষেপ করল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

ইতিমধ্যে শহরের সীমানা প্রাচীর তাদের গোচরীভূত হলো। সীমানা প্রাচীর দুর্গের মতোই উঁচু। পলায়নপর অশ্বারোহী শহরের প্রবেশদ্বারে ঢুকে পড়লে কাসেম ও সাথীরা ঘোড়া ফিরিয়ে নিল।

বিজি রায় দরবারে উপবিষ্ট। তার প্রধান সেনাপতি তাকে রিপোর্ট শুনাচ্ছিল। গুপ্ত বাহিনী দেড় মাস হয়ে গেছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা মাহমূদের কোন সৈনিকের দেখা পায়নি। বিজি রায়ের সামনে ছিল ষড়যন্ত্রের সেই নকশা যা দাউদ বিন নসর আসেম ওমরকে দিয়েছিল। বিজি রায় তাদের তৈরি পথে সুলতানের বাহিনীকে গুপ্ত আক্রমণে পর্যুদস্ত করার জন্যে বহু সংখ্যক ঝটিকা বাহিনী নিয়োগ করে রেখেছিল। আর প্রতিদিন আশা করতো, ঘুম থেকে উঠে সে শুনবে, তার গুপ্ত বাহিনীর হাতে মাহমূদের বাহিনী পর্যুদস্ত হতে শুরু করেছে। এরপর প্রতিদিন তাকে তার সৈন্যদের সাফল্য গাঁথার ফিরিস্তি জানানো হবে। কিন্তু দেড় মাস অতীত হয়ে গেল, সংবাদ তো দূরে থাক তার বাহিনী মুসলিম সৈন্যদের দেখাই পেল না। এটা ছিল বিজি রায়ের জন্যে এক চরম হতাশাজনক বিষয়।

"আচ্ছা, তাহলে মুসলিম বাহিনী গেল কোথায়?" ক্ষুব্ধকণ্ঠে সেনাপতির কাছে জানতে চাইল বিজি রায়। "পেশোয়ার থেকে খবর পাওয়া গেল, ওখান থেকে মাহমূদের বাহিনী রওয়ানা হয়ে গেছে; তাহলে ওরা গেল কোথায়? উধাও হয়ে গেল?"

"আমার মনে হয়, দাউদ আপনাকে ধোঁকা দিয়েছে, নয়তো সুলতান মাহমূদের দূত আপনাদের ধোঁকা দিয়েছে। মুসলমানকে বিশ্বাস করা আপনার ভুল হয়েছে মহারাজ!" বলল সেনাপতি।

এমন সময় বিজি রায়কে খবর দেয়া হল, এক সৈনিক পিঠে তীরবিদ্ধ হয়ে দুর্গে ফিরে এসেছে। বিজি রায় কিছু বলার আগেই তীরবিদ্ধ সৈনিক দরবারে প্রবেশ করল। তার পিঠে তখনও তীর বিদ্ধ, সারা শরীর রক্তাক্ত।

আহত সৈনিক বলল, "আমি পর্যবেক্ষণের এক পর্যায়ে সেনাবাহিনীর ছোট একটি ইউনিট দেখে ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে দাঁড়াই। ওরাও এগুতে থাকে। যখন বুঝতে পারি, ওরা সুলতান মাহমূদের সৈনিক, তখন ফিরে আসতে ঘোড়া দৌড়াই। কিন্তু ওদের দুই অশ্বারোহী আমার পিছনে অশ্ব হাঁকায়। ওরা পরপর কয়েকটি তীর ছুঁড়ে। একটি আমার পিঠে বিদ্ধ হয় আরেকটি আমার ঘোড়ার কোমরে আঘাত হানে। আমার বিশ্বাস, এরা মুসলিম বাহিনীর অগ্রগামী দল।"

"হ্যাঁ, ওরা সেই বাহিনীর অংশ যাদের জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি।" বলল বিজি রায়। সেনাপতিকে বিজি রায় বলল, "আমরা মাহমূদকে শহর ঘিরে ফেলার সুযোগ দেব না। ওরা দীর্ঘ ভ্রমণে ক্লান্ত। আমরা ওদেরকে শহর থেকে দূরে আমাদের সুবিধা মতো জায়গায় লড়তে বাধ্য করব। এক্ষুণি তোমরা শহর ছেড়ে বাইরে অবস্থান নাও।"

একটু পরেই বেজে উঠল যুদ্ধ নাকারা! বেরার সৈন্যদের মধ্যে রণপ্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। জঙ্গী হাতির চিৎকার, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি আর সৈন্যদের শোরগোলে মুখর হয়ে উঠল বিজি রায়ের রাজধানী। একদল সৈন্যকে আগে পাঠিয়ে দেয়া হলো, মুসলিম বাহিনী কতদূর এসেছে তার খবর নিতে। একটু পরেই সংবাদ এলো, মাহমূদের সেনাবাহিনী শহর থেকে দশ মাইল দূর দিয়ে অতিক্রম করছে। বিজি রায় নির্দেশ দিল, আমাদের সেনাবাহিনীকে ওর পথ রোধ করে রণপ্রস্তুতিতে থাকতে হবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিজি রায়ের সেনাবাহিনী শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কাসেম বিন ওমর অগ্রগামী বাহিনীর পশ্চাতে প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহকে জানাল, "এক শত্রুসেনা আমাদের দেখে পালাতে ছিল, সে আমাদের তীরে আহতাবস্থায় শহরে ফিরে গেছে।" আবু আব্দুল্লাহ্ সাথে সাথে সুলতান মাহমূদকে খবরটি অবগত করালেন। সুলতান এ সংবাদ শুনে দারুণ বিমর্ষ হলেন। কিছুক্ষণ ভেবে তিনি রসদসামগ্রী বোঝাই কাফেলাকে ওখানেই থামিয়ে দিলেন। আসবাব পত্রের পাহারার জন্যে কিছু সৈন্যকে নিযুক্ত করে কাসেমকে বললেন, "বিজি রায়ের সৈন্যদের গতিবিধি দেখে আমাকে জানাও।"

শত্রু সৈন্যদের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে কাসেম সুলতানকে যে সংবাদ দিল তা মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। বিজি রায় শহর থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে সুলতানের গমন পথে রণ প্রস্তুতিতে রেখেছে গোটা সেনাবাহিনীকে। জায়গাও বেছে নিয়েছে তার সুবিধামত। হস্তিবাহিনীকে সে সবার আগে রেখেছে।

সুলতান হস্তিবাহিনীর দুর্বলতা জানতেন। হাতি আহত হলে স্বপক্ষের জন্যে কতটুকু বিপদ বয়ে আনে এর অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট। তিনি পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে তীর ধনুক ও বর্শাসজ্জিত পদাতিক বাহিনীকে হস্তিবাহিনীর মোকাবেলার জন্যে নির্দেশ দিলেন। কয়েকটি হাতি আহত হয়ে বিকট চিৎকারে উল্টোপথে দৌড়াল, কিন্তু ওদের পিছন দিকটা ছিল মুক্ত। আহত হাতি ওদের জন্যে কোন ক্ষতির কারণ হলো না।

সুলতান একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি বিজি রায়ের রণকৌশলে বিস্মিত হলেন। এই প্রথম তিনি হাতির সফল ব্যবহার দেখে অবাক হলেন। সুলতান দেখলেন, তার পদাতিক বাহিনী হস্তিবাহিনীর মোকাবেলায় পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি অশ্বারোহী বাহিনীকে ওদের সহযোগিতার জন্যে নির্দেশ দিলেন। এক হাজার অশ্বারোহী ইউনিট ওদের সমর্থনে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু বিজি রায়ের অশ্বারোহী বাহিনী সুলতানের

অশ্বারোহীদেরকে দু'দিক থেকে ঘিরে ফেলল। ফলে মুসলমান অশ্বারোহীরা পদাতিক সৈন্যদের সাহায্যে ওদের কাছেই যেতে পারল না।

হিন্দু সৈন্যরা প্রচণ্ড উদ্যম ও সাহসিকতার সাথে মুসলিম সৈনিকদের তাড়া করছিল, ওদের কমান্ডিং নির্দেশনাও ছিল নিপুণ। সুলতান মাহমূদ ওদের পিছন দিকে একটি ইউনিট পাঠালেন ওদিক থেকে আক্রমণ করতে কিন্তু ওরা পিছন দিকটাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল আগে থেকেই। যে মুসলিম সৈন্যদল পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ করতে গিয়েছিল হিন্দু সৈন্যরা ওদের ঘেরাও করে ফেলল। ওরা আক্রমণ তো করতেই পারেনি, নিজেদের প্রাণ রক্ষা করাই মুশকিল হয়ে পড়ল। এক পর্যায়ে হিন্দুবাহিনী মুসলিম সৈন্যদের বিরুদ্ধে হস্তিদল লেলিয়ে দিল। খুব কষ্টে বহু হতাহতের পর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে মুসলিম বাহিনীর একাংশ ওদের ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলো। এভাবেই এদিনের বেলা অস্তমিত হলো। সুলতান প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পড়ে ভাবছেন, কী করবেন।

আশু পরাজয় নয়তো পশ্চাদপসরণ ছাড়া সুলতান বিজয় লাভের কোন পথ খোলা দেখছেন না। সুলতান বহু দূর পথ ঘুরে বেরা শহরের কাছে গিয়ে দেখে নিলেন, রাজধানীতে আক্রমণ করে বিজি রায়ের মনোনিবেশ ময়দান থেকে ঘুরিয়ে দেয়া যায় কি-না। কিন্তু তারও কোন সুযোগ ছিল না। বিজি রায় শহর রক্ষায়ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিল। শহরের বাইরে অসংখ্য মোরচাবন্দী সৈনিককে সে নিযুক্ত করে রেখেছিল রাজধানীর নিরাপত্তা রক্ষায়। এদিকে সে রাতে সুলতানের রসদপত্রেও হিন্দুরা আক্রমণ করে বসল। এই প্রথম সুলতান দেখলেন, হিন্দুরা তারই কৌশল অবলম্বন করে তাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে।

নির্ঘুম কাটল সারা রাত। সুলতান সবেমাত্র ফজরের নামায শেষ করলেন। তখন পদাতিক বাহিনী দিয়ে আক্রমণ চালানো হলো কিন্তু ফল হলো বিরূপ। মুসলিম সৈন্যরা যেটিকে শত্রুবাহিনীর বাহু মনে করেছিল আসলে সেটি বাহু ছিল না, ছিল ফাঁদ। সেই ফাঁদে পা দিয়েছিল সুলতানের পদাতিক সেনাদল।

পদাতিক বাহিনীর বিপর্যয়ে সেনাপ্রধান কাসেম বিন ওমরের অশ্বারোহী বাহিনীকে ওদের জায়গায় পাঠালেন। কাসেমের দল জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লাশের পর লাশ পড়লেও কাসেমের সাথীরা শত্রুর মোকাবেলায় পিছপা হলো না। তাজা রক্তে লাল হয়ে উঠল রণাঙ্গন। ময়দান জুড়ে সারি সারি মৃতদেহ। আহতদের আর্তচিৎকার ও জখমী সওয়ারের ক্রন্দনে পরিবেশ ভয়ংকর রূপ নিল, কিন্তু কোন পক্ষই মোকাবেলায় পিছুটান না দিয়ে হামলা আরো তীব্র করতে লাগল। তীব্র লড়াইয়ের মধ্যেই বেলা শেষে নেমে এলো সন্ধ্যা।

তৃতীয় দিনের শুরুতে সুলতানের সৈন্যসংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছে। বাকী সবাই হয়তো নিহত না হয় আহত হয়ে পড়ল। রসদ সামগ্রীও নিঃশেষ প্রায়। তৃতীয় দিনের প্রাণপণ মুকাবেলায়ও লড়াইয়ের যবনিকাপাত না ঘটায় সুলতান হতোদ্যম হয়ে পড়লেন। তিনি একবার ভাবলেন, এভাবে সৈন্যদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়া অর্থহীন। কিন্তু তৃতীয় দিন মুসলিম সৈন্যরা আক্রমণ আরো শাণিত করল, তাদের আবেগ ও আক্রমণের তীব্রতা দেখে সুলতান সিদ্ধান্ত বদলে ফেললেন। তিনি তার দেহরক্ষী বাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন, "মুজাহিদ ভাইয়েরা! বিজয়ের জন্যে আমি আমার জীবনকে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করলাম। এখন থেকে যুদ্ধের কমান্ড করব আমি স্বয়ং।" সুলতানের আবেগ ও অগ্নিঝরা বক্তৃতায় রিজার্ভ ও তার দেহরক্ষী সৈন্যদের খুন টগবগ করে উথলে উঠল। সৈন্যদের তাকবীর ধ্বনিতে বেরার আকাশ কেঁপে উঠল। রিজার্ভ বাহিনী নিয়ে সুলতান ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মুসলিম বাহিনী সিংহের মতো গর্জে উঠল শত্রুর মোকাবিলায়। শত্রু বাহিনীও শেষ শক্তি ঝেড়ে ছিল প্রতিআক্রমণে। কিন্তু তখনও বিজি রায়ের বাহিনী ময়দানে অবিচল। এক পর্যায়ে সুলতান নিজের বাহিনীকে পশ্চাদপসারণ করে নিলেন। ঘোড়া থেকে নেমে দু'রাকাত নামায পড়লেন। নামায শেষ করে সালাম দিয়েই তিনি এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। হাঁক দিলেন, "মুজাহিদ ভাইয়েরা! আল্লাহ্ আমাকে বিজয়ের ইশারা করেছেন। বন্ধুরা! এগিয়ে যাও। বেঈমানদের নিঃশেষ করো!" সুলতানের আহ্বানে স্তিমিত আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলে উঠল মুসলিম বাহিনী। প্রচণ্ড আওয়াজে হায়দরী হুংকারে গর্জে উঠল মুসলিম বাহিনী। একই সাথে গগনবিদারী তকবীর তুলে লাফিয়ে পড়ল সকল অশ্বারোহী শত্রু নিধনে।

সুলতান যখন আল্লাহ্র দরবারে সিজদাবনত, বিজি রায় তখন পণ্ডিতদের নিয়ে দেবীর পূজায় মগ্ন। মুসলমানদের অবিচল শক্তি আর পরাক্রম দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত বিজি রায় দেবীর চরণে পড়ে হাউ মাউ করে সাহায্য প্রার্থনা করছিল। বিজি রায়ের কাছে যখন পুনর্বার মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের খবর দেয়া হলো, তখন সে মূর্তির পা ধরে সাহায্যের জন্যে কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে মূর্তির পায়ে চুমু খেয়ে বিজয়ের আশায় অগ্নিমূর্তি ধারণ করে ময়দানে হাজির হলো। এসেই সে শুনতে পেল গগনবিদারী কণ্ঠ— "মুজাহিদ ভাইয়েরা! বিজয় নয়তো শাহাদত। আল্লাহ্র সিপাহীগণ! এটা মূর্তিপূজক ও তাওহীদে বিশ্বাসীদের সংঘাত। মুজাহিদ ভাইয়েরা! আল্লাহ্র জমিন থেকে পালিয়ে যাবে কোথায়? বিজয় নয়তো শাহাদাত, সামনে এগিয়ে যাও!"

যুদ্ধের দৃশ্য এ মুহূর্তে বদলে গেল। মুসলমানরা এখন বেপরোয়া। তাদের সামনে একটাই লক্ষ্য, বিজয়। গোটা মুসলিম বাহিনীর মধ্যে একই জোশ, একই চেতনার প্রজ্জ্বলন। তাদের চোখ থেকে যেন আগুনের ফুলকি ঝরছে, তরবারী লাভা উদ্গিরণ করছে, যেন আগ্নেয়গিরি তার জ্বালামুখ খুলে দিয়েছে। আগুনের লাভা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা ময়দানে। সুলতান নিজেই কমান্ড দিচ্ছেন। তাঁর তরবারীর আঘাতে সারি সারি মানবদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। তিনি যেদিকেই যাচ্ছেন শত্রুবাহিনী কচুকাটার মতো সাফ হয়ে যাচ্ছে। প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ্ দেখছেন, সুলতানের আবেগ অত্যুঙ্গে। তিনি সুলতানের নিরাপত্তার ব্যাপারটি সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিলেন। তার ডান-বামে-পিছনে ছোট তিনটি বিশেষ বাহিনীকে নিযুক্ত করলেন। নির্দেশ দিলেন, যে কোন মূল্যে তোমরা সুলতানের উপর আক্রমণ প্রতিহত করবে। আবু আব্দুল্লাহ্ দেখলেন, শত্রুবাহিনী এখন দিশেহারা। বিজি রায়ের বাহিনী রণক্লান্ত, ময়দানে লাশের স্তূপ জমে গেছে, সম্মুখ ভাগে মুসলিম বাহিনীর তীব্রতার কাছে শত্রু বাহিনী আক্রমণাত্মক নয়, এখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। তাই তিনি মুসলিম বাহিনীর দুই বাহুতে ও পশ্চাৎদিকে নিরাপত্তা বিধানের কঠোর নির্দেশ দিলেন। সেই সাথে দু'প্রান্তের মুজাহিদদের বললেন, "তোমরা আক্রমণ আরো তীব্র করো।"

দেখতে দেখতে যুদ্ধের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। বিজি রায়ের সম্মুখভাগের সেনাবল কমে এলো। বিজি রায় শহররক্ষীদের নির্দেশ দিল ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে। শহরের নিরাপত্তারক্ষীরা নিমিষে ময়দানে চলে এলো। এই প্রচণ্ড যুদ্ধাবস্থায় দিনমণি শেষ আলোর ঝলকানী দিয়ে আঁধারে হারিয়ে গেল। সুলতান শত্রুবাহিনীকে বিপর্যয়ের মুখোমুখি রেখে আক্রমণের ইতি টানলেন।

শহরের নিরাপত্তারক্ষীদের ময়দানে চলে আসার ব্যাপারটি বুঝতে পেরে আবু আব্দুল্লাহ্ রাতের আঁধারে ঝটিকা আক্রমণে রাজধানী তছনছ করে ফেললেন। শহরের প্রধান ফটক ভেঙে গুড়িয়ে দিলেন। দুর্গ প্রাচীরের কয়েক জায়গা ধসিয়ে দিলেন বিস্ফোরক ব্যবহার করে। পরদিন প্রত্যুষে আর কোথাও বিজি রায়ের পতাকা উড্ডীন দেখা গেল না। হিন্দু সৈন্যবাহিনী বিক্ষিপ্ত। বিজি রায়ের খোঁজ নেই। বহু খোঁজাখুঁজির পর অনেক দূরের এক মাঠে সৈন্য বেষ্টিত বিজি রায়কে একদল মুসলিম সৈন্য দেখতে পেয়ে ওদের দিকে ধাবিত হল। মোকাবিলা না করে বিজি রায়ের নিরাপত্তারক্ষীরা যে যেদিকে পারে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। বিজি রায়কে ঘিরে ফেলল সুলতানের সিপাহীরা। তাকে আত্মসমর্পণ করে অস্ত্র ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিল দলপতি। কিন্তু বিজি রায় অস্ত্র না ফেলে নিজের তরবারী নিজের পেটে ঢুকিয়ে দিল।

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বিজয়ী বেশে সুলতান বিজি রায়ের রাজধানী বেরায় প্রবেশ করলেন। দু'শর চেয়ে বেশি প্রশিক্ষিত হাতি তাদের দখলে এলো। রাতের আঁধার নেমে এসেছে তখন। চতুর্দিকে বহু দূর পর্যন্ত লাশ আর লাশ। উভয় পক্ষের অধিকাংশ সৈন্য হয় মৃত নয়তো আহত। সারা ময়দান ও শহর জুড়ে আহত সৈন্যের আর্তচিৎকার, করুণ আর্তি আর আহত জন্তুর বিকট চেচামেচি। বহু মশাল জ্বালিয়ে মুজাহিদরা আহত সাথীদের খোঁজে বের হলেন। লাশের পর লাশের স্তূপ থেকে উদ্ধার করতে লাগলেন পড়ে থাকা সহযোদ্ধাদেরকে। লাশের স্তূপের মাঝে আহত কাসেম মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণে সে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় মাঠে শোনা গেল একটি নারীকণ্ঠ। কাসেম...! কাসেম...! বেঁচে থাকলে আমার ডাকে সাড়া দাও! কাসেম...তুমি কামিয়াব, আমার আশা সফল হয়েছে আজ। আল্লাহ্ আমার দু'আ কবুল করেছেন...। কাসেম বলো, তুমি কি বেঁচে আছো...?

## চার কুমারী দুর্গ

আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে সেই রাতের চাঁদের আলোও ছিল রক্তিম। আকাশ ছিল ধূসর বিবর্ণ। সুলতান মাহমূদের সেনারা টানা তিন দিন মরণপণ যুদ্ধে যে রক্তনদী প্রবাহিত করেছিল এবং যে ধুলোবালি বেরার আকাশে উড়িয়ে ছিল তাতে সে আকাশ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ধূলির আস্তরণে। চাঁদনী রাতের ফ্যাকাশে আলোয় যে পর্যন্ত দৃষ্টি যেতো, তাতে মৃতের লাশ, শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ আর আহত জখমী সৈন্য, ঘোড়া, উট আর হাতির মিলিত চিৎকারে পরিবেশ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। রাতের নিস্তব্দ্ধতা নয় সেদিনকার বেরা ছিল একটি ধ্বংসযজ্ঞের মূর্তিমান চিত্র। মাইলের পর মাইল জমিন মানুষের রক্তে লাল রং ধারণ করেছিল।

সেই জমিন আজকের পাকিস্তানের অংশ। বিজয়ী ভূখণ্ডটি বর্তমান পাকিস্তানের হলেও ওখানে শহীদ যোদ্ধাদের কারো ঠিকানা পাকিস্তানে ছিল না। তারা এসেছিল সুদূর গজনী হতে। গজনী থেকে এসে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী সুলতানের সহযোদ্ধারা মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয়ভূমি উদ্ধার করেছিলেন পৌত্তলিক হায়েনাদের দখল থেকে। সেই বিরান মসজিদগুলো মুক্ত করেছিলেন শেরেকী চর্চার নাপাক গ্রাস থেকে। সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা মসজিদগুলোকে পরিণত করেছিল মদালয় ও ঘোড়ার আস্তাবলে। মসজিদগুলো তারা আবার উচ্চকিত করেছিল এক

আল্লাহ্‌র জয়গানে, মসজিদে মসজিদে আবারো চালু করেছিল একত্ববাদের বিজয়ধ্বনি 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।'

অসংখ্য আহত মুসলিম যোদ্ধার কাতর আর্তি আর দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও ছিল পৌত্তলিকদের পদানত করার শুকরিয়া। মৃত্যুপথযাত্রী মুজাহিদরা কষ্ট ভুলে গিয়ে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছিল ভয়ংকর শত্রুদের পরাজয়ে এবং সুলতানের শত্রুদেশে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করার সাফল্যে। অনেকের দেহ থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তারা বাবারে মারে, মরে গেলাম বলে আহাজারী করেনি, তাদের মুখে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা, বিজয়ের জন্যে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশে ধ্বনিত হলো, আলহামদুলিল্লাহ্‌।

সেই যোদ্ধারা ছিল অটল অবিচল ঈমানের অধিকারী, ইসলামী আকীদা-আমলে দৃঢ় বিশ্বাসী। তারা মাতৃভূমি ছেড়ে সুদূর মুলতানে এসেছিল, মুসলিম কন্যা জায়াদেরকে মুশরিক পাষণ্ডদের পাঞ্জা থেকে উদ্ধার করতে, যেসব মুশরিক-পশুরা মুসলিম মেয়েদেরকে দাসী বানিয়ে তাদের ইজ্জতের উপর পাশবিক উৎপীড়ন চালাচ্ছিল। তারা এসেছিল আল্লাহ্‌র পূজারীদের হৃত ইবাদতখানা আবার আল্লাহ্‌র দাসদের জন্যে মুক্ত করে দিতে।

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে সেদিন পৌত্তলিক হায়েনাদের কবল থেকে গজনীর শার্দুলেরা নির্যাতিত মুসলিম অবলাদের মুক্ত করেছিল। যারা জীবিত ছিল তারা যুদ্ধের ক্লান্তি ভুলে গিয়ে রাতের অন্ধকারে মশাল হাতে সারা প্রান্তর খুঁজে ফিরছিল সাথীদের মৃতদেহ এবং বেঁচে থাকা আহত সহযোদ্ধাদের। শতশত মশাল রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়েছিল বেরার মাঠে-প্রান্তরে। শত্রুসৈন্য আর আহত মুজাহিদের আর্তি, গগনবিদারী চিৎকারে সে রাতে যেন কেয়ামত নেমেছিল বেরার জমিনে। আহত উট, ঘোড়া আর হাতিদের বিচিত্র গোঙানী সৃষ্টি করেছিল এক ভয়ংকর পরিস্থিতির।

অগণিত মানুষের করুণ আর্তি আর অশ্ব হস্তির বিকট চিৎকারের মধ্যে মুজাহিদরা শুনতে পেল ক্ষীণ আওয়াজের এক নারীকণ্ঠ— কাসেম...! কাসেম...! জীবিত থাকলে সাড়া দাও। বড় অস্থির, দিগভ্রান্তের মতো দিগ্বিদিক দৌড়াচ্ছিল এক মশালবাহী। কখনো কোন আহতের মুখের কাছে মশালটি নিয়ে দেখছিল লোকটির চেহারা, হতাশ হয়ে আবার দৌড়াচ্ছিল মশাল উঁচু করে। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল কাসেম...! কাসেম...! আমার ডাকে সাড়া দাও! আমি তোমাকে খুঁজছি।

এই মৃত্যুপুরীতেই এক জায়গায় মারাত্মক আহতাবস্থায় পড়েছিল কাসেম। সারা শরীরে তার অসংখ্য ক্ষত। অত্যধিক রক্তক্ষরণে সে শক্তিশূন্য। মাথা তুলে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, চোখ মেলে পৃথিবীটা দেখার শক্তিও তার নেই। হুঁশ জ্ঞান পুরোপুরি লোপ না পেলেও যুদ্ধের ভয়াবহতার কিছুই মনে নেই কাসেমের।

কাসেম...! কাসেম...! নারীকণ্ঠের এই মায়াবী আওয়াজ ইথারে ভাসতে ভাসতে তার কানেও ধ্বনিত হচ্ছিল। কিন্তু তখন এ জগতের চেয়ে পরকালের ভাবনায় তন্ময় ছিল কাসেমের হৃদয়। ভাবছিল, সে হয়তো তার বাবার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরেছে নিজের জীবন এবং শরীরের সবটুকু রক্তের বিনিময়ে। তাই আকাশের হুরপরী ও ফেরেশতারা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে মর্তজগতে এগিয়ে আসছে। তার মস্তিষ্কের পরতে পরতে এসব ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে।

এক পর্যায়ে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল কাসেম    কাসেম    আহ্বান। ধ্যান ভেঙে গেল কাসেমের। স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠল তার মায়ের অবয়ব। বাবার অপরাধের কথা মনে পড়ায় সে কুঁকড়ে উঠল। তার মনে পড়ল, মা তাকে বাবার তরবারী হাতে দিয়ে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে আল্লাহ্র দুশমনদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করলাম, তোমাকে আমি মৃত অথবা দুশমনের তরবারী বিদ্ধ অবস্থায় দেখতে চাই। তবে মৃত্যুর আগে তুমি এ তরবারী দিয়ে কম করে হলেও শত দুশমন সংহার করবে। তবেই আমার হৃদয়ের যন্ত্রণা লাঘব হবে।"

তার স্মরণ হলো... সে তার বাবার তরবারী মাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল, এ তরবারী আমাকে দিও না মা! এটি নাপাক হয়ে গেছে। এতে লেগে রয়েছে মদ নারীর নাপাক প্রভাব।

তার আরো মনে পড়ল, পেশোয়ার থেকে রওয়ানা হওয়ার পর অনেকখানি পথ এগিয়ে দিয়ে তার ডান হাতের বাহুতে একটি কুরআনের আয়াত সম্বলিত তাবীজ বেঁধে দিয়ে মা বলেছিলেন— "আল বিদা আমার কলিজার টুকরো! তুমি জীবিত ফিরে এলে খুশি হবো, কিন্তু তোমার লাশ যদি বিজয়ের সংবাদ নিয়ে আমার কাছে ফিরে আসে তবে আরো বেশি খুশি হবো।" কানে বাজল প্রধান সেনাধ্যক্ষ আবু আব্দুল্লাহ্কে মায়ের অনুরোধ— "আমি আমার একমাত্র ছেলেকে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করে দিচ্ছি, তাকে তার বাবার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দেয়ার বিনীত অনুরোধ করছি।"

তখনও কাসেমের ক্ষতস্থান দিয়ে অঝোর ধারায় খুন ঝরছে। এই স্মৃতিগুলো কাসেমের অনুভূতিকে জাগিয়ে দিল চরমভাবে। মায়ের প্রতিটি কথা তার কানে অনুরণিত হচ্ছে। আনচান করে উঠল কাসেমের আহত হৃদয়। হায়! কোথায়

আছি আমি! মায়ের কাঙ্ক্ষিত বিজয় কি অর্জিত হয়েছে? আমি কি বাবার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরেছি? সুলতান কোথায়? কোথায় আছেন সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ্? আমার সাথীরা কেমন আছে? তারা সবাই গ্রেফতার হয়নি তো? সুলতান কি পশ্চাদপসরণ করেছেন? বেরা দুর্গকি দখলে এসেছে? আমার তরবারী মায়ের কাছে কে পৌছাবে? কে তাকে বলবে, তোমার ছেলে এই তরবারী দিয়ে শত নয় হাজারো দুশমনকে মৃত্যুর স্বাদ দেখিয়েছে। এতেও কি তোমার আত্মা শান্তি পাবে না? এমন হাজারো প্রশ্ন আহত কাসেমের কষ্ট আরো বাড়িয়ে তুলছে।

কাসেমের জানার উপায় ছিল না, সুলতান বিজয়ী হয়েছেন। এখন তিনি বিজি রায়ের রাজমহলে বসে অধিনায়ক ও কমান্ডারদের কাছ থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতির রিপোর্ট নিচ্ছেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানে ব্যস্ত রয়েছেন। অপর দিকে বিজি রায় নিজের তরবারী দিয়েই আত্মহত্যা করেছে।

যুদ্ধের পরিণতি চিন্তায় তার মন অস্থির হয়ে উঠল। জখমের যন্ত্রণা ভুলে গেল সে। উঠে দাঁড়াতে চাইল। কিন্তু তার হাত-পায়ের একটিও অক্ষত নেই। তরবারী আর বর্শার আঘাতে কাসেমের সারা শরীর জর্জরিত। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে ব্যথায় কুঁকিয়ে উঠল। উঃ! শব্দ বেরিয়ে এলো মুখ থেকে। বসে পড়ল কাসেম। কিন্তু না, বসে থাকাও সম্ভব হলো না তার। সুলতান, সেনাবাহিনী ও মায়ের আকাঙ্ক্ষা তার অসার দেহে শক্তির সঞ্চার করল। এবার মাটিতে ভর দিয়ে অনেক কষ্টে কোমর সোজা করে দাঁড়াল কাসেম। চারদিকটায় একবার চোখ বুলাল। দেখছে, অন্ধকারের মধ্যে ঘুরে ফিরছে অনেকগুলো মশাল। বিবর্ণ চাঁদের আলো। চাঁদ একটু পর পর ঢাকা পড়ে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে। এরই মধ্যে আবার কানে ভেসে এলো সেই আহ্বান— কাসেম...! কাসেম...! তুমি কোথায়? পাশাপাশি শোনা গেল পুরুষের ভারী কণ্ঠ— "এই মহিলা হয়তো কাউকে খুঁজছে। ওকে কেউ নিয়ে যাও।"

"সে কাসেমের লাশ তালাশ করছে?" বলল একজন। "তাকে বল, আমরা আহত এবং মৃতদের তুলে নিচ্ছি। কে সে, তার পরিচয় নিও।"

লোকগুলো কথা বলছিল গজনীর ভাষায়। কাসেম তাদেরকে হাঁক দিয়ে তার অবস্থান জানান দিতে চাচ্ছিল, কিন্তু তার মুখের আওয়াজ সে নিজেই শুনতে পেল না। কঠিন যন্ত্রণা ও অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণে তার শরীরে সামান্য শক্তিও ছিল না। তাছাড়া ময়দান আহত যোদ্ধা ও সওয়ারীদের শোরগোলে মুখরিত। উচ্চ আওয়াজে কথা বলা ছাড়া আর কাউকে ডাকার উপায় ছিল না। মশালগুলো

কাসেমের কাছ থেকে বেশি দূরে ছিল না। কিন্তু মনে হচ্ছে এগুলো তার কাছে এখন যোজন যোজন দূরত্বের সমান। কাসেমের পক্ষে সম্ভব ছিল না এক কদম অগ্রসর হওয়া। পায়ের রগ কেটে যাওয়ার কারণে পা ফেলে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করলে পড়ে গেল কাসেম। অনেক কষ্টে মাথা সোজা করে বসল। এমন সময় কানে ভেসে এলো পানি .... পানি ...।

আওয়াজ লক্ষ্য করে দেখল কাসেম, তার সামনেই কাতরাচ্ছে এক জখমী সৈনিক। কিন্তু গজনীর সৈনিক হলে তো সে 'পানি'র বদলে 'আব' বলতো। নিশ্চয়ই লোকটি মুলতানের। হিন্দু সৈনিক হবে। মায়ের মাতৃভাষা মুলতানী হওয়ার কারণে কাসেমও জানতো ভারতীয় হিন্দুরাই 'পানি' বলে। পানির কথা শুনে কাসেমের বুকের মধ্যে তৃষ্ণা হাহাকার করে উঠল। বুকটা যেন শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে। কখন কোথায় পানি পান করেছিল মনেই নেই। সুলতানের মতো যুদ্ধের ভয়াবহতায় সেও ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গিয়েছিল। তার স্মৃতিতে শুধুই যুদ্ধ এবং মায়ের কণ্ঠই ধ্বনিত হচ্ছিল। কাসেম ছিল অগ্রণী দলের কমান্ডার। সুলতান যখন যুদ্ধের কমান্ড নিজের দায়িত্বে নিয়ে বিজি রায়ের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানেন তখন কাসেম সুলতানের পাশেই মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তার সাথীদের অধিকাংশই শহীদ হয়েছিল মুখোমুখি যুদ্ধ করে। এক সময় কাসেম আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। এসব তার মনে নেই। তার শুধু মনে আছে, যুদ্ধ ক্রমশই তাদের প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে, বিজয় ছিল তাদের কাছে সুদূর পরাহত।

তুমি কে দাদা, ভগবানের নামে আমাকে একটু পানি দাও, বলে তড়পাতে শুরু করল আহত লোকটি। ভগবানের নাম শুনে কাসেমের মৃত দেহেও যেন আগুন জ্বলে উঠল।

সে তার তরবারী বের করতে কোমরে হাত দিল। কিন্তু খাপ শূন্য। কখন তরবারী পড়ে গেছে মনে নেই। তরবারী না পেয়ে কোমর থেকে খঞ্জর বের করল কাসেম। ঠিক এ মুহূর্তে আহত লোকটি বলে উঠল, তুমি হয়তো মুসলমান!

হ্যাঁ, আমি মুসলমান!

কাসেম সামান্য সময় ভাবলো। খঞ্জর কোমরে গুজতে গুজতে বলল, মুসলমান কখনো তৃষ্ণার্ত দুশমনকে হত্যা করে না। তুমি তৃষ্ণার্ত। কিন্তু আমার কাছে পানি নেই। ভগবানের নামে তুমি পানি চেয়েছো। তোমার ভগবান আর পানি নিয়ে আসবে না। আমি তোমাকে পানি পান করাব। একটু অপেক্ষা কর। দেখি তোমার জন্যে পানি পাই কি-না।

কাসেম দাঁড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু পা নড়বড়ে। সে অতি কষ্টে হামাগুঁড়ি দিয়ে একটি লাশের পাশে গেল। লাশের কোমর থেকে পানির মশক খুলে হামাগুড়ি দিয়ে আহত লোকটির পাশে পৌছে বলল, হা কর।

লোকটি বলল, তুমি মুসলমান, তোমার হাতে আমি পানি পান করব না।

কাসেম অবাক হলো। এতো ঘৃণা ওদের মনে! মরার সময়ও লোকটি মুসলমানের হাতে পানি পান করতে রাজি হচ্ছে না! মুসলমানদের কত ঘৃণা করে এরা!

তাহলে তোমার ভগবানকে ডাক। ভগবান পানি নিয়ে আসে কিনা দেখ। আমরা আল্লাহ্র নামে যুদ্ধ করি। এজন্য যুদ্ধের সময় আমাদের কোন ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভূত হয় না। তিনদিন ধরে আমরা ক্ষুধা-পিপাসা ভুলে যুদ্ধ করেছি, আমাদের কোন তৃষ্ণা নেই। আল্লাহ্ আমাদের বুক চির-প্রশান্তিতে ভরে দিয়েছেন।

এবার হিন্দু সৈন্যটি হাত বাড়িয়ে মশকটি ধরতে চেষ্টা করল, কাসেম মশকটি ওর মুখে ধরল, লোকটি এক নিঃশ্বাসে আধা মশক পানি গলাধঃকরণ করল।

যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছে, তুমি কি কিছু জান? লোকটিকে জিজ্ঞেস করল কাসেম।

আমি সাধারণ সৈনিক নই। দু'শ সৈনিকের কমান্ডার আমি। আমাদের রাজার মৃত্যুর পর আহত হয়েছি আমি।

আমাদের সুলতান কোথায়? বলতে পার?

সম্ভবত শহরে ...। শোন। মৃত্যুকালে তুমি আমাকে পানি পান করিয়েছো। আমি তো মরেই যাবো, তোমাকে একটা সত্যকথা বলে যাচ্ছি। আমাদের জাতিকে কখনও বিশ্বাস করো না। মুসলমানদের ধ্বংস করা আমাদের ধর্মের শিক্ষা। আমরা বহু মুসলমানকে ধোঁকা দিয়ে আমাদের অনুগত করে রেখেছি। আমাদের পণ্ডিতেরা সব সময় বলেন, মুসলমানরা আমাদের চিরশত্রু। ওদের শেষ করাই আমাদের ধর্ম। আমরা আমৃত্যু মুসলিম জাতির বিনাশে সব রকম চেষ্টা করে থাকি। এ যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হলেও যুদ্ধ থেমে থাকবে না। যতোদিন দুনিয়াতে একটি হিন্দুও বেঁচে থাকবে, সে চেষ্টা করবে মুসলমানকে ধ্বংস করতে। এটা আমাদের ধর্ম, এটা আমাদের ধর্মের নির্দেশ।

হিন্দু সৈনিকের কথা শুনে কাসেমের চেতনা আরো জেগে উঠতে লাগল। কথা বলতে বলতে হিন্দু সৈনিকটির যবান আড়ষ্ট হয়ে গেল, কিছুক্ষণ পর ওর আওয়াজ থেমে গেল। একটা হেচকি দিয়ে অসার ও নীরব হয়ে গেল লোকটি।

সুলতান মাহমূদ যখন বিজয়ী বেশে বেরা শহরে প্রবেশ করেন, শহরের ছোট বড় আবাল-বৃদ্ধ সকল মুসলমান তাকে স্বাগত জানানোর জন্যে শহর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সকলের মিলিত তকবীর ধ্বনিতে বেরার আকাশ পেয়েছিল নতুন আবহ। কেউ কেউ আনন্দের আতিশয্যে শুয়ে পড়েছিল সুলতানের ঘোড়ার সামনে। মুসলমানদের আনন্দে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন সুলতান। দীর্ঘদিন পর প্রাণ ফিরে পেয়েছে এখানকার মুসলমান জনসাধারণ। কিন্তু মুসলমানদের পাংশু চেহারা দেখে সুলতানের মন বিজয়ের আনন্দে নেচে উঠার বদলে বিষণ্নতায় ছেয়ে গেল। ওদিকে বেরার হিন্দুরা ছেলে-পেলে, স্ত্রী-সন্তান আর ঘাটুরী-পেটারা মাথায় নিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

সুলতানের দৃষ্টি পড়ল ওদের উপর। গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। বললেন সেনাধিনায়কদের, "ফেরাও ওদের। কোথায় যাচ্ছে এরা। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। রাতের অন্ধকারে বাড়িঘর ফেলে এরা কোথায় যেতে চাচ্ছে?" গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "ঘোষণা করে দাও, আমরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শহরের কোন অধিবাসীকে তাড়াব না, কারো বাড়িঘর লুট করবো না, আগুন ধরাব না। কারো ইজ্জতের উপর আক্রমণ করবো না। ওদের জলদি ফেরাও...। বল, যারা শহরে আছে তারা যেন তাদের পরিচিতজনদের লাশ এনে সৎকার করে এবং আহতদের চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়। আহত সবাইকে ময়দান থেকে তুলে আনার মতো জনবল নেই আমাদের। তারা ইচ্ছে করলে এ কাজের জন্য মহিলাদেরকেও ময়দানে নিয়ে যেতে পারে।"

সুলতানের নির্দেশে শহরত্যাগী হিন্দুদের ফিরিয়ে আনা হল। যারা গমনদ্যোত ছিল তাদেরকে অভয় দেয়া হল। সুলতানের অভয়বাণী প্রচার করা হলো শহরের সর্বত্র। বলা হলো, শহরের বাসিন্দাদের সাথে সুলতানের কোন বিরোধ নেই, তাদের সাথে তার কোন সংঘাত নেই। বিরোধ-সংঘাত ছিল রাজার সাথে এবং সংঘাত হয়েছে রাজার সেনাবাহিনীর সাথে। সাধারণ নাগরিকরা সম্পূর্ণ দোষমুক্ত।

হিন্দু-মুসলমান সকলকে লাশ তুলে আনতে বলা হলো। মুসলমানরা সুলতানের সহযোদ্ধাদের মৃতদেহ ও আহতদের তুলে আনার জন্যে ময়দানের দিকে ধাবিত হলো। তাদের সেবা-শুশ্রূষা এবং চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্যে দলে দলে লোক মশাল হাতে বেড়িয়ে পড়ল।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর শহরের প্রধান মন্দিরের বড় পণ্ডিত কয়েকজন সেবাদাসকে শহরে পাঠিয়ে বহু বিশ্বস্ত হিন্দুকে মন্দিরে ডাকাল। পণ্ডিতের সংবাদ

পেয়ে বহু সংখ্যক হিন্দু মন্দিরে জড়ো হল। আজ মন্দিরে শঙ্খ বাজছে না। ওদের চোখে আজ মূর্তিগুলোর চেহারা যেন ম্লান দেখাচ্ছে। সরস্বতীর চেহারায় হাসি থাকলেও তারা মনে করলো, পূজারীদের ব্যর্থতায় সে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। সারা মন্দির জুড়ে নীরবতা। শোকের ছায়া।

বড় পণ্ডিত কোন শ্লোক না আওড়িয়ে গম্ভীরকণ্ঠে সমবেত পূজারীদের বলল, "আমাদের সেনাবাহিনী পরাজিত হয়েছে, রাজা মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু আমরা এখনও জীবিত। পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার এক সুযোগ এসেছে। সুলতান আমাদেরকে শহরে থাকার অনুমতি দিয়েছে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার বাহিনী আমাদেরকে হয়রানী করবে না। তারা আশ্বাসও দিয়েছে, কোন ধরনের লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটবে না, কারো উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করা হবে না।

তারা যদি শহর লুটের ইচ্ছা করতো, শহর ধ্বংস করতে চাইতো, তাহলে এতোক্ষণে সারা শহর জ্বলে উঠতো। আমরা এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগাতে পারি। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারি। রাতের অন্ধকারে খুব সহজেই কাজটি সমাধা করতে পারি।

পণ্ডিত গম্ভীরকণ্ঠে বলল, "শহরের হিন্দু-মুসলমান নারী-পুরুষ সবাইকে নিজেদের নিহত আত্মীয়-স্বজনকে তুলে এনে সৎকার করতে এবং আহতদের সেবাকেন্দ্রে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

"তোমরা জলদি ময়দানে চলে যাও। সবাই মশাল সাথে নিবে, আর সাথে রাখবে খঞ্জর অথবা একটি ছোট্ট কুড়াল। মুসলমানরা বিজয়ী হলেও অর্ধেকের বেশি সৈন্য আহত হয়েছে। যেসব মুসলিম সৈন্য আহত অবস্থায় ময়দানে পড়ে আছে তারা যদি চিকিৎসা কেন্দ্রে এসে সুস্থ হয়ে ওঠে তবে ওরা আমাদের জন্যে বিপদ আরো বাড়াবে। শত শত মুসলিম যোদ্ধা ময়দানে আহত অবস্থায় পড়ে আছে। তোমরা ওদের দেখেই বুঝতে পারবে। ওদের মধ্যে যারা দাঁড়াতে পারে না তাদেরকে তোমরা কুড়ালের আঘাতে ওখানেই শেষ করে দেবে।"

"শহরের সব হিন্দুকে এ সংবাদ বলার দরকার নেই। বেশি বলাবলি করলে কোন সুবিধাভোগী আমাদের পরিকল্পনা ফাঁস করে দিতে পারে। নারী-পুরুষ সবাই যাও, সকাল পর্যন্ত যতো পারো শত্রুদের বধ করো। আমাদের দেশমাতা ও দেবীকে খুশি করতে হলে এ কাজ আমাদের করতেই হবে। যাও, যতো জলদি পারো সবাই কাজে লেগে যাও।"

কাসেম যে জায়গায় আহত হয়ে পড়েছিল সেখানটায় হতাহত লোক কম। আহতদের আহাজারীও নেই। তাই এখনো এদিকে উদ্ধারকারীদের কেউ আসেনি। এতোক্ষণ পর্যন্ত কাসেম... কাসেম... যে ডাক শোনা যাচ্ছিল তাও আর শোনা যাচ্ছে না। উদ্ধারকারীর আগমন আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল। নিজের জীবন নিয়ে কাসেমের ভাবনা ছিল না, তার প্রত্যাশা ছিল সে সুলতান ও সেনাপ্রধান আবু আব্দুল্লাহ্‌র সামনে হাজির হয়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করবে, "আমার পিতার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি আমি করতে পেরেছি? তার মা'কে জানাবে, মা! তোমার আশা কি এখন পূর্ণ হয়েছে?"

দূরে দূরে অনেক মশাল ঘুরতে দেখছে কাসেম। কিন্তু সবাই ওদিকেই ব্যস্ত। তার এ দিকটায় কেউ আসছে না। হতাশায় কাসেমের শরীর অবশ হয়ে আসছিল। তার পক্ষে এক কদম অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। পা দুটোয় কোন শক্তি নেই। প্রচুর রক্তক্ষরণে শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

এমন সময় বড় দুটো মশালকে এদিকে আসতে দেখে আশ্বস্ত হলো কাসেম। মাথাটা উঁচু করে তাকিয়ে রইল মশাল দু'টোর দিকে। খুব কষ্ট করে মাথাটা সোজা করে বসল মশাল দু'টোর আসার অপেক্ষায়। আর ভাবল, এরা হয়তো আমাদেরই কেউ হবে। আবারো তার কানে ধ্বনিত হলো সেই ডাক... "কাসেম ...! কাসেম...! জীবিত থাকলে আমার ডাকে সাড়া দাও!"

হায়! কাসেমের যে সেই দরদী ডাকে সাড়া দেয়ার শক্তি নেই, শত ইচ্ছে থাকার পরও তার কণ্ঠ থেকে কোন আওয়াজ বেরুচ্ছে না। ঝুঁকে ঝুঁকে, জায়গায় জায়গায় থেমে থেমে মশাল দু'টো এগিয়ে আসছিল কাসেমের দিকে। স্পষ্ট বুঝতে পারছিল কাসেম, লোক দু'টো থেমে থেমে মরদেহ দেখছে। ভাবতে ভাবতে মশালধারী লোক দু'টো একে অন্যের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল কাসেমের সামনে। তাদের হাতে মশাল জ্বলছে।

লোক দু'টোর অনুচ্চ বাক্যালাপ শুনতে পেল কাসেম— একজন সাথীকে বলছে, "মুসলমান! সাংঘাতিক ঘাড় ত্যাড়া, আমাদের সহ্যই করতে পারে না...।"

"হ্যাঁ। আমি মুসলমান। খুব ক্ষীণকণ্ঠে জানাল কাসেম। আমাকে বিজয়ের সুসংবাদটি জানাতে পার! মনে হয় তোমরা এখানকার বাসিন্দা। তোমরা আমার ভাষা বলতে পার না জানি। কিন্তু আমি তোমাদের কথা বুঝতে পারি বলতেও পারি।"

এদের একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপাত্মক হাসল। কোমর থেকে খঞ্জর বের করল একজন। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ সুসংবাদটি তোমাকে আমি এই খঞ্জরের ফলা দিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছি।"

কথা শেষ না করেই খঞ্জর চালাতে উদ্যত হলো লোকটি। কাসেম নিরুপায়। প্রত্যাঘাত তো দূরে থাক আত্মরক্ষার জন্যে একটু নড়ার শক্তিও তার নেই। কাসেমের জীবন ও মৃত্যুর মাঝে মাত্র মুহূর্তের ব্যবধান। কয়েক পলকের মধ্যেই কাসেমের বুকটা এফোড় ওফোড় হয়ে যেতো, যদি না খঞ্জরের আঘাত প্রতিহত হতো। যেই মশালধারীর খঞ্জর কাসেমের বুকে আঘাত হানতে নেমে আসছে— কোত্থেকে বিজলীর মতো একটি মশাল এসে আঘাত হানে ঘাতকের মুখে। একটা চিৎকার দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে ঘাতক। তার চকচকে খঞ্জরটা ছিটকে পড়ে দূরে। মশালটিও পড়ে যায় ওর হাত থেকে।

এরা মৃতপ্রায় কাসেমকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। এর আগে তেরজন আহত মুজাহিদকে এরা হত্যা করে এসেছে। এদের চৌদ্দতম শিকার ছিল কাসেম। সামান্য দূর থেকে রাবেয়ার নিক্ষিপ্ত মশালের আঘাত উদ্যত খঞ্জরের আঘাত থেকে রক্ষা করেছে কাসেমকে। মশালের আলোয় কাসেম দেখতে পেল, মুখ থুবড়ে পতিত ঘাতকের মশালটি হাতে তুলে নিয়েছে রাবেয়া। সংহারী মূর্তি ধারণ করে মোকাবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে রাবেয়া। এ সেই রাবেয়া। যে রাবেয়া ফেরারী হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসেম বিন ওমরের ফাঁদ ও দাউদ বিন নসরের চক্রান্ত সম্পর্কে আগাম সংবাদ দিয়েছিল সুলতানকে। এই সেই রাবেয়া যার সত্য সাক্ষ্যর কারণে আত্মহত্যা করেছে সেনাপতি আসেম। যার কারণে ধ্বংসের মুখোমুখি হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছেন সুলতান ও তার সেনাবাহিনী। পিতার সেই হন্তা, পুত্র কাসেমের জীবনদাত্রী হয়ে দেখা দিল যুদ্ধের ময়দানে।

এক ঘাতকের আঘাত থেকে রাবেয়ার নিক্ষিপ্ত মশালে বেঁচে গেল কাসেম। কিন্তু ঘাতক রয়ে গেছে আরেকজন। ওর সাথী রাবেয়ার উপস্থিতি দেখে কুড়াল উত্তোলন করল মোকাবেলার জন্যে। ঘাতক দেখল, এক যুবতী রুদ্রমূর্তি ধারণ করে মশাল হতে দাঁড়িয়ে। ওর হাতে কোন অস্ত্র নেই। কাসেম আহত। তার পক্ষে মোকাবেলা করা অসম্ভব। উপরন্তু রাবেয়া জীবনে কোনদিন খঞ্জর ধরেনি। হাতের মশালটি ছিল তার একমাত্র ভরসা। কাসেমের জীবন সংহারে উদ্যত ঘাতকের মুখের দিকে তাই হাতের মশালটিই ছুঁড়ে মেরেছিল। অব্যর্থ লক্ষ্য। মশালটি আঘাত হানে ঘাতকের মুখে। চোখ মুখ ঝলসে যায় ঘাতকের। দূরে

ছিটকে কুঁকাতে থাকে। ওর সাথী রাবেয়াকে দেখে ওকেই আগে বধ করতে আঘাত হানতে উদ্যত হলো। মশাল দিয়েই প্রতিরোধে লিপ্ত হলো রাবেয়া। অবস্থার আকস্মিকতায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মুহূর্তে এক পায়ে দাঁড়িয়ে গেল কাসেম। তবে নড়তে পারল না এক কদমও। রাবেয়া আর ঘাতকের মধ্যে চলছে সংঘাত। কৌশলী যোদ্ধার মত হাতের মশাল দিয়ে প্রতিরোধ করছে রাবেয়া। মৃতপ্রায় কাসেম এই সঙ্গিন অবস্থা দেখে স্থির থাকতে পারল না। তার মৃতপ্রায় শরীরে জেগে উঠল মুজাহিদের সত্তা। কোমর থেকে সে বের করে নিল খঞ্জর। খ র হাতে নিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করছিল। যেই না ঘাতক কাসেমের দিকে ফিরল, মশালের আলোতে দেখে ওর পেট বরাবর নিক্ষেপ করল খঞ্জর। লক্ষ্যভেদী নিশানা। খঞ্জরটি আমূল বিদ্ধ হলো দুশমনের পেটে। খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে ঘুরে গেল বেঈমান। যেই ঘাতক পিঠ ফেরাল অমনি রাবেয়া মশাল ঠেকিয়ে দিল ওর কাপড়ে। জ্বলে উঠল ঘাতকের পরিধেয় বস্ত্র। চকিতে আবার এদিকে তাকাল দুশমন, অমনি আবার রাবেয়া ওর মুখে ঠেসে ধরল মশাল। বাঁচার জন্যে দিগ্বিদিক জ্বলন্ত কাপড় নিয়ে দৌড়াতে শুরু করল ঘাতক। কিছুদূর গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

দূরের উদ্ধারকারী লোকেরা যখন একটি মানুষকে জ্বলতে দেখল এবং শুনতে পেল আর্তচিৎকার, তখন তাদের একজন এদিকে দৌড়ে এল। তারা এসে দেখতে পেল রাবেয়া ও আহত কাসেমকে। আর অদূরে ছটফট করছে ঝলসে যাওয়া দু'বেঈমান। এরা ছিল গজনীর সেনাসদস্য। কাসেম ও রাবেয়া পূর্বাপর ঘটনা জানাল সৈন্যদের। ইতিবৃত্ত শুনে সৈন্যরা ঘাতকদের পাশে গেল। এদের একজনের অবস্থা করুণ। অপর ঘাতকের চোখ-মুখ ঝলসে গেছে, কথা বলার শক্তি আছে ওর। গজনীর উদ্ধারকারী দলের এক কমান্ডার ওর বুকে তরবারী রেখে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল, "তোরা কারা? কোত্থেকে এসেছিস? বল, কেন ওকে হত্যা করতে চাচ্ছিলি? নইলে এই তরবারী তোর পেটে ঢুকিয়ে দেবো।"

বেঈমান ঘাতক মুজাহিদের হুংকারে সবই বলতে শুরু করল। বলল, "আমরা বড় পণ্ডিতের আজ্ঞাবহ। তার নির্দেশে আমরা মুসলমান আহতদের হত্যা করতে ময়দানে এসেছি। দু'জনে এর আগে তেরজনকে হত্যা করেছি, এ লোকটি ছিল আমাদের চৌদ্দতম শিকার।"

ভয়াবহ এই সংবাদ শুনে উদ্ধারকারী গযনী বাহিনীর লোকেরা ময়দানের সর্বত্র তল্লাশী শুরু করল। তারা এ ধরনের বহু ঘাতককে গ্রেফতার করল ময়দান

থেকে। তৎক্ষণাৎ হিন্দুদের বাধা দেয়া হল ময়দানে প্রবেশ করতে। বিদ্যুৎগতিতে বড় মন্দিরের প্রধান পণ্ডিতকে গ্রেফতার করা হল। কাসেম বিন ওমরকে নিয়ে আসা হল চিকিৎসা কেন্দ্রে।

* * *

গজনীর সেনাবাহিনী যখন পেশোয়ার থেকে মুলতানের পথে রওয়ানা হয় তখন কয়েকজন অধিনায়ক ও কমাণ্ডারের স্ত্রীও কাফেলার সাথে ছিলেন। রসদসামগ্রীর কাফেলার সাথে থাকতো তাদের বহনকারী পালকী। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্ত্রী ছাড়াও আরো কয়েকজন মহিলা ছিলেন সেই কাফেলায়। সেইসব অভিজাত মহিলাদের প্রধান কাজ ছিল সেবা ও অসুস্থ রোগীদের দেখাশোনা করা। অন্যান্য যুদ্ধে আহতদের সেবা যত্ন সৈনিকরাই করতো, কিন্তু এই যুদ্ধের গুরুত্ব ও সার্বিক পরিস্থিতি অনুধাবন করে মহিলাদের সঙ্গে আনা হলো, যাতে সৈনিক স্বল্পতায় আহতদের সেবার কাজে তারা সহযোগিতা করতে পারে।

"তোমার আম্মা শুরুতে আমাকে আসতে দিতে চাচ্ছিলেন না। তাঁর কাছেই আমাকে থাকতে বলেছিলেন।" ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করায় কিছুটা সুস্থানুভব করার পর কাসেমের পাশে বসে বলছিল রাবেয়া। তবে তোমাদের রওয়ানা হওয়ার সময় তোমার আম্মা আমাকে বললেন, "এবারের অভিযানে কিছু সংখ্যক মহিলা সাথে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছে। আমি তাকে অনুরোধ করলাম, 'আপনি আমাকেও কাফেলায় শরীক হওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।' জানি না তিনি কার সাথে বলে আমাকে কাফেলায় শরীক হওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।"

"আমি তোমার মাকে বললাম, সুলতানের এক গাদ্দার সেনাধিনায়কের অপকর্ম ফাঁস করে দিয়ে আমি সুলতান ও সুলতানের সেনাবাহিনীকে ভয়ংকর পরাজয় থেকে বাঁচাতে সাহায্য করেছি। আপনি যদি এর পুরস্কার দিতে চান, তবে আমাকে যে করেই হোক যুদ্ধ কাফেলার সাথে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। আমার ভেতরে যে কষ্ট ও দুঃখের আগুন জ্বলছে তা সেই দিন নিভাতে পারবো, যেদিন সুলতান মুলতান জয় করবেন, আর আমি আমার বেঈমান বাপকে নিজের হাতে খুন করবো। দাউদ বিন নসরের পাপের প্রাসাদ নিজের হাতে আমি গুড়িয়ে দেবো, ওখানে কেয়ামত ঘটিয়ে ছাড়ব।

তোমার মা আমার কথা শুনে বললেন, বোন! আমার ভেতরেও তো আগুন কম নয়। যুদ্ধে যেতে আমারও ইচ্ছে করছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়েছে, স্বামী ছাড়া কোন মহিলাকে কাফেলার সাথে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে না। কথা বলতে

বলতে তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি বললেন, তুমি যাও, আমার একমাত্র ছেলে অগ্রণীদলের কমান্ডার হয়ে যাচ্ছে। আশা করি আমার ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও পিছপা হবে না। ওর মাথা থেকে শরীর আলাদা না হওয়া পর্যন্ত ও মৃত্যুবরণ করবে না। আমি ওকে সাহস দিয়ে বলেছি, তুমি জীবিত আমার কাছে ফিরে এলে আমি খুশি হবো। কিন্তু তোমার জীবনের বিনিময়ে হলেও আমি যুদ্ধজয়ের সুসংবাদ চাই। বোন রাবেয়া! মুখে যাই বলি না কেন, আমি তো মা, যখন ভাবি রণাঙ্গনে পানি... পানি... করে আমার পুত্র মারা যাচ্ছে তখন হৃদয়টা ভেঙ্গেচুরে খান খান হয়ে যায়। তখন আর সাহস থাকে না। কিন্তু পুত্র কাসেম নয়, আমি একজন মুজাহিদের মা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেই। মুজাহিদরা মরতেই যুদ্ধ করে, বাঁচতে নয়। বেঈমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মরণেই মুজাহিদের সফলতা। ভাবি, আমার উদর থেকে জন্ম নেয়া এ মুজাহিদ আমার নয়, এ আমার কোলে আল্লাহ্‌র আমানত মাত্র। আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন তখনই আমানত ফিরিয়ে নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আমার দুঃখ করা অনুচিত। তখন মনটা শান্ত হয়, দুঃখ কিছুটা লাঘব হয়।"

"তোমার আম্মা আমাকে হাত ধরে বললেন, রাবেয়া! তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও। আহতদের খুঁজতে গিয়ে সবার আগে তুমি আমার ছেলেকে খুঁজবে। ওর মুখে পানি দেবে। তুমি আমার প্রতিচ্ছবি হয়ে মায়ের ভূমিকা পালন করবে। রাবেয়া! তোমার কোন সন্তান নেই। সন্তানের মমতা দিয়ে ওর প্রতি যত্ন নিও তুমি। উপরে আল্লাহ্ আর নিচে তোমার কাছে আমি পুত্রকে সোপর্দ করলাম...।

কাসেম! তোমার আম্মা আমাকে এও বলেছিলেন— রাবেয়া! তোমার কাছে যদি এমন সংবাদ আসে, আমার ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রে পিঠ দেখিয়েছে বা মোকাবেলা করা থেকে পালিয়ে ছিল, তাহলে তরবারী, বর্শা কিংবা খঞ্জর দিয়ে তুমিই ওকে খুন করে ফেলো। মনে করো, আমার স্বামী গাদ্দার ছিল ওর ঔরসজাত সন্তানও গাদ্দারই হয়েছে। গাদ্দারকে শেষ করেছো ওর বীজও শেষ করে দিবে। ও এমন করলে বাকী জীবনটা কোন পীর বুযুর্গের উঠোন ঝাড়ু দিয়ে কাটিয়ে দেবো।"

"আমার কার্যক্রম সম্পর্কে আপনি কোন তথ্য জানতে পেরেছেন?" রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করল কাসেম।

"পেশোয়ার থেকে আসার পথে সিন্ধুনদ পার হওয়ার জন্য যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তখন আমি সেনাধ্যক্ষ আবু আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কাসেমের সংবাদ কি? তিনি বললেন, কাসেম দারুণ সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছে। আমি

তাকে বললাম, আমার আসার খবরটি যেন কাসেম জানতে না পারে। কেননা সে আমার আসার সংবাদ পেলে তার মন এদিকেও ঝুঁকতে পারে, তাতে যুদ্ধের মনোযোগ নষ্ট হবে।"

রাবেয়া আরো জানাল, "যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে রসদসামগ্রী বহরের সাথে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যুদ্ধে কি হচ্ছে এ সংবাদ আমরা পাচ্ছিলাম না। তিন দিন টানা যুদ্ধ চলল, আমাদের কাউকেই এদিকে আসতে দেয়া হলো না। একদিন খবর পেলাম, যুদ্ধের অবস্থা সঙ্গীন। হয়তো আমাদের পশ্চাদপসরণ করতে হতে পারে! একথা শুনে সব মহিলা লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল। কারো কাছেই তোমার কোন সংবাদ আমি পাচ্ছিলাম না। আমরা সবাই নামায পড়ে বিজয়ের জন্যে দু'আরত ছিলাম। এমতাবস্থায় আজ দুপুরে আমাদের সংবাদ জানানো হলো, আমাদের বিজয় হয়েছে। কিন্তু আমাদের ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। হতাহতের সংখ্যাই বেশি। সারা ময়দান জুড়ে লাশ আর লাশ। জখমীদের তুলে আনার মতো পর্যাপ্ত লোকেরও অভাব। আমাদেরকে এখানকার চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়া হলো। ডাক্তাররা ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিতো, মহিলারা ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধতো, আহতদের ওষুধ খাওয়াতো, পানি পান করাতো।

একের পর এক আহত যোদ্ধাকে সেবাকেন্দ্রে আনা হচ্ছিল আর তাদের গায়ের রক্ত পরিষ্কার করে ক্ষতস্থানে ওষুধ দেয়া হচ্ছিল। অনেকের চেহারা পুরোটাই রক্তে মাখা ছিল, অধিকাংশই ছিল মরণাপন্ন, বেহুঁশ। কয়েকজন তো সেবাকেন্দ্রে এসে মারা গেছে। আমি আহতদের দেহ থেকে রক্ত পরিষ্কার করছিলাম। কাজের ফাঁকে চেতনাজ্ঞানসম্পন্ন অনেকের কাছে আমি জিজ্ঞেস করেছি তোমার কথা। অনেকেই অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। মাত্র তিনজন তোমাকে দেখেছিল বলেছে কিন্তু সবাই এ কথাই বলেছে, 'তার দল যেদিকে গিয়েছিল ওইদিক থেকে খুব কম লোকই ফিরে এসেছে।'

বেলা ডুবে যাওয়ার পর তোমার দলের একজন আহতকে আমি পেয়েছি। সে আমাকে বলল, কাসেম বিন ওমর যদি এখনো এখানে না এসে থাকে তবে সে হয়তো মারা গেছে। আমার সামনেই কাসেম আহত হয়েছিল। লোকটি আরো বলল, সম্ভবত আমাদের ইউনিটের মধ্যে আমি একাই বেঁচে এসেছি। কাসেম ছিল আমাদের ইউনিট কমান্ডার। যুদ্ধের পরিস্থিতি এমন ছিল যে, যেন হিন্দুরা আমাদের খতম করেই নিঃশ্বাস নেবে। সুলতানের সরাসরি কমান্ডে যখন শেষ হামলার নির্দেশ হলো— তখন প্রধান সেনাপতি কাসেমকে বললেন, "কাসেম!

রাজার পতাকাটিকে গুড়িয়ে দিতে হবে।" তিনি আমাদেরকে রাজার রক্ষণভাগে আক্রমণ করতে নির্দেশ দিলেন। সেনাপ্রধান বললেন, কাসেম! রাজার ঝাণ্ডা গুড়িয়ে দিতে পারলে যা পুরস্কার চাইবে তাই দেয়া হবে। বিদায়ের সময় মনে হচ্ছিল, সেনাপ্রধান আমাদের শেষ বিদায় জানাচ্ছিলেন।"

আহত যোদ্ধা আরো বলল, 'শেষ পর্যায়ে কাসেম এতোই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিল যে, হয় সে রাজার ঝাণ্ডা গুড়িয়ে দেবে না হয় নিজেই শেষ হয়ে যাবে। আখেরী আক্রমণে আমরা ছিলাম বেপরোয়া। কাসেমের উদ্দীপনা আমাদের সবাইকে পাগল করে তুলেছিল। মৃত্যু আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। জীবন-পণ আঘাত হানলাম। রাজার ঝাণ্ডাকে আক্রমণ করে তছনছ করে দিলাম। কিন্তু ততক্ষণে আমাদের কেউ আর অশ্বপৃষ্ঠে বসে নেই, সবাইকে শত্রুসেনারা আহত করে ফেলেছিল। আমার বিশ্বাস, এখনও পর্যন্ত যদি তাকে এখানে না দেখা যায় তবে সে আর জীবিত নেই।'

এরপর আমি সেবাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পথে একটি পড়ে থাকা মশাল উঠিয়ে হাতে নিলাম। ময়দানে এসে আমি হতবাক। কখনও রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখিনি। আর এখানকার মৃতদেহ দেখে মনে হলো যেন জঙ্গল কেটে অসংখ্য গাছ ফেলে রাখা হয়েছে। প্রতিটি লাশকেই আমি গভীরভাবে দেখছিলাম। প্রতিটি আহতের কুঁকানী শুনে দৌড়ে যেতাম। প্রত্যেকটি হিন্দু মরদেহ দেখে আমার মধ্যে প্রশান্তি আসতো কিন্তু মুসলমান যোদ্ধার মৃতদেহ দেখামাত্র চোখে পানি এসে পড়তো। এভাবে দেখতে দেখতে অনেক সময় চলে গেল। আহতদেরকে চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠানোর কাজ চলতে লাগল।

এক পর্যায়ে তোমাকে ডাকতে শুরু করলাম আমি। কেমন যেন হয়ে গেলাম। তোমার মায়ের আত্মা বুঝি আমার বুকে এসে ঢুকেছিল। সজোরে চিৎকার শুরু করে দিলাম তোমার নাম ধরে। উদ্ধারকারীদের অনেকেই বলল, 'আপনি ফিরে যান, এখানে কাসেমকে পাওয়া যাবে না।' কারো কথায় আমি স্বস্তি পেলাম না। সারা ময়দান দেখে দেখে এদিকে চলে এলাম যেখানে মরদেহ চোখে পড়ছে কম। তোমাকে না পেলে সারারাত তোমাকে খুঁজেই ফিরতাম। দিনের আলোতে তোমার লাশ উদ্ধার করে তবেই আমি ঘরে ফিরতাম।

যাকেই পেতাম তোমার কথা জিজ্ঞেস করতাম। এমন সময় দৃষ্টি পড়ল দু'টি মশালের দিকে। আমি ছিলাম ওদের পিছনে। আমি এগিয়ে গেলাম ধীরে ধীরে। ইচ্ছা ছিল ওদের কাছে তোমার কথা জিজ্ঞেস করব। কিন্তু কিছুটা দূরে থাকতেই মশালের আলোয় তোমার চেহারা চিনে ফেললাম আমি। তখন তুমি বসেছিলে।

আমি তোমাকে দেখলেও তুমি কেন আমাকে দেখতে পেলে না আমি বুঝতে পারছিলাম না।

ওদের পোশাক দেখেই বুঝতে পারছিলাম, এরা উদ্ধারকারী গজনীর সেনা নয় এবং মুসলমানও নয়। ওদের দেখে আমার কোন দুর্ঘটনার আশংকা হয়নি কিন্তু যখন দেখি, ওদের একজন তোমাকে মেরে ফেলতে তরবারী তুলেছে, কোন কিছু না ভেবে দৌড়ে এসে ওর মুখে মশাল দ্বারা আঘাত করলাম। কাসেম! এ আসলে আল্লাহ্‌র দারুণ মেহেরবানী। তোমার বেঁচে থাকাটা একটা বিস্ময়। তবে তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে, আল্লাহ্‌ অবশ্যই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন। কারণ তোমার কাজ এখনও শেষ হয়নি।"

দাউদ বিন নসর বিজি রায়ের পরাজয় সংবাদ পেয়ে কারামতী প্রাসাদ ছেড়ে মুহাম্মদ বিন কাসেমের সময়ে নির্মিত একটি দুর্গে আশ্রয় নেয়। দুর্গের ভেতরে বিশাল প্রাসাদ। প্রাসাদের অভ্যন্তরে বহু কক্ষ। প্রহরী, গোলামখানা, আস্তাবল, বিরাট আঙিনা, শানবাঁধানো পুকুর, সজ্জিত বাগান— মোটামুটি একটি রাজপ্রাসাদ। এই দুর্গ সম্পর্কে জনশ্রুতি ছিল যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের পর যখন এলাকাটি হিন্দুরা দখল করে নেয় তখন অনেক শিশু ও নারীকে হত্যা করে এর একটি কক্ষে নিক্ষেপ করেছিল। এখন এই দুর্গটিতে জিন-ভূতের বসবাস— এ কথা ছিল সব লোকের মুখে মুখে। বিশেষ করে লোকেরা বলাবলি করতো, ওই বাড়িতে হিন্দু দখলদাররা চার কুমারীকে চরম নির্যাতন করে হত্যা করেছিল। দুর্গের ভেতরে নিহত চার কুমারীর কান্না এখনো নাকি শোনা যায়। শিশুদের দৌড় ঝাপ, খেলাধুলা চেচামেচি এবং কোলাহলরত মানুষের কথাও নাকি মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়।

এই দুর্গ সম্পর্কে মানুষের মনে এতো ভীতি ছিল যে, কেউ এর ধারে-পাশে যেতো না। কেউ কেউ বলতো, তারা দুর্গের ছাদের উপরে আগুন জ্বলতে দেখেছে। দেখেছে ভূত-পেত্নীর ঝগড়া-ফ্যাসাদ। ওখানে এখনো নাকি মৃতদের হাড়গোড় পড়ে রয়েছে।

যেদিন সুলতান মাহমূদ বেরা জয় করেন সেদিন মুলতানের এই চার-কুমারী দুর্গে ছিল মেলা। মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসর কারামাতীদের ধর্মীয় নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সে মানুষের কাছে নিজেকে আল্লাহ্‌র খাস লোক ও পয়গম্বর বলে পরিচয় দিতো এবং নানা অলৌকিক কীর্তি জাহের করে সরল ও অল্পশিক্ষিত মানুষকে কারামাতী মতাবলম্বী করতে সচেষ্ট ছিল। এ সময়ে দাউদ বিন নসরের ভক্তরা দেশ জুড়ে একথা প্রচার করল যে, মুসলমানদের

শাসক, কারামাতী ধর্মের নেতা, আল্লাহ্‌র ওলী দাউদ বিন নসর স্বীয় কারামাতীতে চার-কুমারী দুর্গের সকল জিন-ভূতকে বন্দী করে তার অনুগত বানিয়ে ফেলেছেন, যাতে এগুলো মানুষের কোন ক্ষতি করতে না পারে এবং মানুষ এই দুর্গের কাছে যেতে ভয় না পায়। দাউদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা আরো প্রচার করল, চার-কুমারী দুর্গের জিন-ভূতেরা প্রতিদিনই একজন তাজা মানুষের রক্ত পান করতো, আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতে দাউদ নিজের কারামতী ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগুলোকে বন্দী করে রেখেছেন, যে কেউ ইচ্ছা করলে বন্দী জিন-পেত্নীদের দেখতে পারে।

সুলতান মাহ্‌মূদ বেরায় যে সময়ে নতুন সৈন্য ঘাটতি পূরণে ব্যস্ত এ সময়ে চার-কুমারী দুর্গে চলছে লোকমেলা।

এ আজব খবর শুনে দাউদের কারামতী দেখতে দলে দলে লোক সন্ধ্যার পরে চারকুমারী দুর্গে সমবেত হতে লাগল। দুর্গটিকে সাজানোও হলো নতুনরূপে। জায়গায় জায়গায় প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। দুর্গের প্রধান ফটক ও রাস্তার চারপাশে এমন তীব্র সুগন্ধী ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে, যারাই দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করছিল, দুনিয়া ভুলে মুগ্ধ বিমোহিত হচ্ছিল কিংবদন্তির দুর্গাভ্যন্তরের অবস্থা দেখে।

দুর্গের বহিরাঙ্গন অবিকল পূর্বের মতোই রেখে দেয়া হয়েছে। যেখানে দীর্ঘদিনের ময়লা আবর্জনা জমে ইঁদুর, মাকড়সা জাল বুনেছে, আর পলেস্তরা খসে খসে পড়ে গেছে। শুধু ভেতরের পরিবেশ আমূল বদলে বাড়ির উঠোনে বিশাল প্যান্ডেল টেনে রঙ-বেরঙের শামিয়ানা টাঙিয়ে রঙীন বাহারী বাতি জ্বালিয়ে এমন স্বপ্নিল পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, সাধারণ মানুষ তা দেখে হতবাক।

প্যান্ডেলের মাঝখানে রাখা হয়েছে একটি বিরাট গালিচা। গালিচার উপর সিংহাসন। সিংহাসনটি মণি-মুক্তা হীরা জওহারে সজ্জিত। রঙীন আলোতে সিংহাসনের মণিমুক্তাগুলো তারার মতো ঝকমক করছিল। সাধারণ মানুষ অভূতপূর্ব এ দৃশ্য দেখে অপার বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে দাউদের অলৌকিক শক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠছিল।

দু'চার দিনের মধ্যে সারা মুলতানে ছড়িয়ে পড়ল দাউদের কারামতী। লোকমুখে প্রধান আলোচ্য বিষয় চার-কুমারীর দুর্গ।

মানুষ বলাবলি করছিল, হাজার বছর আগে নিহত চার কুমারীকে দাউদ আবার লোকের সামনে জীবিত করে এভাবে দেখিয়েছে যে, তারা বাতাসে উড়ে এসে আবার বাতাসে মিলিয়ে গেছে। দর্শকেরা নাকি কিশোরীদের আওয়াজ ও শিশুদের কথাও শুনেছে।

দাউদের কারামতী মুলতানবাসীর মধ্যে এমনই প্রভাব ফেলল যে, কোন কোন মসজিদের ইমাম জুমআর দিনের বক্তৃতায় পর্যন্ত দাউদের কারামাতী উল্লেখ করে বক্তৃতা করতে শুরু করে। তারা দাউদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হিন্দুদের মন্দিরগুলোতে পণ্ডিতেরা দাউদের কারামতীকে সত্য বলে প্রচার করছে। হিন্দু পণ্ডিতরা শিষ্য-পূজারীদের বলছে, আসলে কারামতী ধর্মই আসল ইসলামী ধর্ম। মোল্লারা শুধু শুধু মানুষের মধ্যে নেক ও পাপের প্রাচীর সৃষ্টি করে ভোগান্তির মধ্যে ফেলেছে। এসব আসলে মিথ্যা। মানুষের জৈবিক চাহিদা সৃষ্টিকর্তার দেয়া। সে দুনিয়াতে তার ইচ্ছা ও সাধ্যমতো যা কিছু করার তাই করতে পারে। এতে কোন পাপবোধের কারণ নেই।

মুলতান শহরের সবচেয়ে ঘন-ঘিঞ্জি এলাকায় বসবাস মুসলমানদের। কারামাতীদের হাতে মুলতানের শাসনক্ষমতা চলে যাওয়ার পর থেকে হকপন্থী মুসলমানদের আর্থিক ও সামাজিক অবনতি ঘটে। চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বদিক থেকেই মুসলমানদের উপর নেমে আসে দুর্যোগ। যারা কারামাতীদের অনুসারী তারাই সরকারী সহযোগিতা ও আনুগত্যে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে।

ঘন বসতি মুসলিম এলাকায় অনুরূপ আরেকটি দুর্গসম বাড়িতে কিছু সংখ্যক খাঁটি মুসলিম পরিবার বাস করে। চার-কুমারী দুর্গে মেলা শুরু হওয়ার ক'দিন পর এই দুর্গসম বাড়িতে কয়েকজন লোক একটি পুরনো ঘরে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আলোচনারত। তবে তাদের আলোচনার বিষয় দাউদের কারামতীর প্রশংসা নয়, দাউদের কারামতীর বিরূপতা। আলাপকারীদের একজন সেই বুযুর্গ যিনি রাবেয়াকে আসেম ওমরের চক্রান্ত ফাঁস করে দেয়ার জন্য দাউদের প্রাসাদ থেকে ফেরার হতে সাহায্য করেছিলেন।

"মুলতানের শাসনক্ষমতা কারামাতীদের হাতে। সর্বময় দণ্ডমুণ্ডের মালিক তারা। তাই আমরা প্রকাশ্যে একথা বলতে পারছি না, কারামাতী আসলে ইসলামী আদর্শ নয়, সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থী। ইসলাম মানুষকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নেক কাজে উৎসাহিত করে। ইসলামের সম্পর্ক মানুষের আত্মার সাথে আর কারামাতী ধর্ম শরীর সর্বস্ব। কারামাতী মতে, মানুষ যথেচ্ছভাবে তাবৎ বিলাস-ব্যসন, জিনা-ব্যভিচার, মদ-নারী সম্ভোগ করতে পারে। কারামাতী মতে একজন সুন্দরী নারী ইচ্ছে করলে স্বামী ছাড়াও যে কোন পছন্দনীয় পুরুষের সঙ্গ লাভ করতে পারে, তাতে কোন বাধা নেই। সে তার শরীরের একচ্ছত্র মালিক। তার ইচ্ছায় বাধা দেয়ার এখতিয়ার কারো নেই। তাদের মতে, আল্লাহ্ মানুষকে

দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ করতে। এতে বিধি-নিষেধ থাকতে পারে না। আপনারা লক্ষ্য করেছেন— কারামাতীদের অনুসারী ঢলের মতো বাড়ছে। সাধারণ অজ্ঞ মানুষ এদের প্ররোচণায় আকৃষ্ট হয়ে ঈমান হারাতে শুরু করেছে।" বললেন একজন।

"মানুষ স্বভাবতই পাপকর্মের প্রতি দ্রুত আকৃষ্ট হয়।" বললেন সমবেতদের মধ্যে আলেম ব্যক্তি। "নেক কাজে দৈহিক কোন সুখ নেই। মানুষের আসল শক্তি আত্মা। আত্মা দেখা যায় না। আত্মার সুখ তারাই অনুভব করতে পারে যারা আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী করে আত্মা পবিত্র রেখেছে। সাধারণত মানুষ এটা বুঝতে চায় না। আত্মা পাপকর্মে দুর্বল হয়ে যায়। আত্মা দুর্বল হয়ে গেলে শরীরও দুর্বল হয়ে পড়ে। বেশি পাপকর্ম করলে মানুষের আত্মা মরে যায়। জীবন শেষে মানুষ যখন মরে যায় তখন দেহটাকে মাটিতে দাফন করা হয় কিন্তু আত্মা কখনও মরে না, আত্মা আল্লাহ্র দরবারে হাজির করা হয়।"

"আপনি যা বলছেন— তা এখানে উপস্থিত সবাই জানে। আমাদের মাথার উপর এখন যে মুসিবত চেপে বসেছে দয়া করে এ ব্যাপারে কথা বলুন!" বলল এক যুবক। "যেদিন থেকে চার-কুমারী দুর্গে দাউদ মেলা বসিয়ে জিন ও চারকুমারীর প্রেতাত্মাকে দেখাচ্ছে, সে দিনের পর থেকে দলে দলে মুসলমান দাউদের কারামাতী ধর্ম গ্রহণ করে ঈমান হারাচ্ছে। আমি একটি মসজিদে ইমামকে ওয়াজ করতে শুনেছি, কারামাতী ধর্ম সত্যধর্ম। কোন ভ্রান্ত মতাদর্শ যখন মসজিদে প্রভাব সৃষ্টি করে তখন সাধারণ মানুষ এটিকে সত্য বলেই গ্রহণ করতে শুরু করে।"

'আপিন কি জানেন, হিন্দু পণ্ডিতেরা মন্দিরে পূজারীদেরকে বলছে, কারামাতী ধর্ম সত্যিকার ইসলামী ধর্ম। মৌলভীদের ধর্ম সঠিক নয়।' বলল আরেক যুবক।

"ইমাম আর পণ্ডিত উভয়ে একই কথা বললেও কোন হিন্দুকে তুমি কারামাতী ধর্ম গ্রহণ করতে দেখবে না।" বললেন বুযুর্গ ব্যক্তি। "আমরা লোকদের একথা বলতে পারছি না যে, কারামাতী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একটি গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী খৃস্টানদের সৃষ্ট। মহাভারতে এরা হিন্দু ও খৃস্টানদের সহায়তায় মুসলমানদের ঈমানহারা করতে মিশনারী কাজ করছে। বেঈমানদের অন্যতম একটি নীল নক্শা হলো— ইসলামের মোড়কে মুসলমানদের ঈমানহারা করতে গুনাহ্র কাজে জড়িয়ে ফেলা। কারামাতীদেরকে রীতিমতো হিন্দুরা পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে, যাতে মুলতানের কারামাতীদেরকে মুসলিম বলে সাধারণ মুসলিমদের ধোঁকা দিতে পারে।

ভাইয়েরা! মুসলমানদের বিরুদ্ধে জঘন্য চক্রান্ত শুরু হয়েছে। চার-কুমারী দুর্গের কারামাতী মুলতানের অর্ধেক মুসলমানকেই ঈমানহারা করে ফেলেছে। এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে, কি করে আমরা এই জঘন্য চক্রান্ত রুখতে পারব। এখনও পর্যন্ত আমাদের কারো স্বচক্ষে দেখা হয়নি, চার-কুমারী দুর্গে আসলে কি ঘটছে।"

"যারা দেখে এসেছে তারা বলেছে, প্রত্যেক রাতেই চারকুমারী ও শিশুদের নাকি জীবন্ত করে দেখানো হয়।" বললেন আলেম। শোনা যাচ্ছে, একটি ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে নাকি মেয়েগুলো দৃশ্যমান হয় আবার ধোয়ার কুণ্ডলীতে হারিয়ে যায়। আমাদের কারও স্বচক্ষে ব্যাপারটি দেখে আসা উচিত। আমরা তো ওখানে যাচ্ছি না এসব আজগুবী ঘটনা আমাদের ধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে।"

"এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি, এটা নির্ধারণ করতেই আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।" বলল এক যুবক। "ওখানে যদি কোন ধোঁকা প্রতারণা কিংবা জাদুটোনার ব্যাপার ঘটান হয়ে থাকে তবে কারামাতীদের রহস্য আমরা ফাঁস করে দেবো।" যুবক তার সমবয়সী যুবকদের ইঙ্গিত করে বলল, "আমরা ইসলামের জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত। ওখানে যদি আমাদের কোন সংঘাতের মুখোমুখি হতে হয় তবুও আমাদের ভয় নেই। আপনি আলেম-জ্ঞানী। আপনি আমাদের করণীয় কি সে সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা দিন।"

"বাবারা! মনোযোগ দিয়ে শোন!" বললেন আলেম। "কারামাতী গোষ্ঠী কাফেরদের সৃষ্ট। ওদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য তোমরা জান। চিন্তার ব্যাপার হলো— ধর্ম অনেক সময় মানুষকে দুর্বল করে দেয়। মুসলমানরা ধর্মের জন্যে জীবন বাজী রাখতে দ্বিধা করে না, আমাদের শত্রুরা তা ভালভাবে জানে বলেই ধর্মের অস্ত্র ব্যবহার করেই আমাদের ঘায়েল করতে তৎপর।"

"দাউদ ক্ষমতালিপ্সু। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্যে সে ধর্মের লেবাস পরেছে। ধর্মের লেবেল এঁটেই দাউদ নিজের ক্ষমতা শক্ত করার কাজে লিপ্ত। লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে, আমাদের ধর্মের লোকেরা জাতিগতভাবে যতো প্রতারণার শিকার হয়েছে সবগুলো ধর্মের আবরণেই হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ তো আর এখন নেই। তারা নিজেরা যেমন খাঁটি ছিলেন লোকদেরকেও খাঁটি ধর্মকর্ম পালনে বাধ্য করতেন। বর্তমান শাসকরা ধর্মের আবরণে নিজেদের খেলাফত টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট। এরা ধর্মকে মোড়কের মতো ব্যবহার করে অশিক্ষিত লোকদের সমর্থক বানাচ্ছে। সাধারণ লোকদের এদের ধোঁকা বুঝতে অনেক দেরী হয়। আর যখন বুঝে তখন আর করার কিছু

থাকে না। কেউ যদি এদের ধোঁকার মোকাবেলায় সঠিক কথা বলে তাকে ক্ষমতার শক্তি-বলে নিঃশেষ করে দেয়া হয়।

দাউদ বিন নসর যে মুসলমান নয় এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দাউদ যে ইসলামের ক্ষতি করছে, খৃস্টান ও হিন্দুদের সাথে মিলে মুসলমানদের ধ্বংস করতে শুরু করেছে— প্রকাশ্যে একথা আমাদের বলা যেমন ঝুঁকিপূর্ণ ওর বিরুদ্ধে মোকাবেলায় যাওয়াও কঠিন ব্যাপার। ওর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে না আমরা কিছু করতে পারছি না, আর আমরা সত্য কথা বলতে পারছি। এজন্য আমাদেরকে গোপন তৎপরতা চালাতে হবে।" বলল সেই অগ্রসর যুবক।

"হ্যাঁ। আজ রাতেই আমরা চার-কুমারী দুর্গে যাব।" বললেন দরবেশ। "সরেজমিনে পরিস্থিতিটা দেখে এসে তারপর আমরা ঠিক করব পরবর্তী কর্তব্য।"

সন্ধ্যার পর দুর্গের জনারণ্যে প্রবেশ করল বুযুর্গ ও তাঁর সাথীরা। দুর্গাভ্যন্তরের পরিবেশ দেখে সবাই অবাক। দর্শকদের আগ্রহ, মুগ্ধতা দেখে তাদের বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। দর্শকরা দুর্গের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ঘরবাড়িগুলো দেখছিল। বুযুর্গের সাথে ছিল নয়জনের একটি তরুণ দল। তন্মধ্যে দু'জনের বয়স ছিল সতেরো আঠারো। তারা এটা সেটা দেখতে দেখতে এমন এক জায়গায় এসে থামল সেখান থেকে আর সামনে কাউকে যেতে দেয়া হয় না। একজন প্রহরী দর্শকদেরকে সামনে অগ্রসর হতে না দিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। বুযুর্গ ও তাঁর সাথীরাও এখানে এসে থেমে গেল। সামনে এগুতে চাইলে বাধা দিল প্রহরী। বুযুর্গ প্রহরীকে জিজ্ঞেস করল, সামনে কি? প্রহরী জবাব না দিয়ে রাগতস্বরে বুযুর্গকে ফিরে যেতে বলল। ইত্যবসরে প্রহরীর দৃষ্টি অন্য দিকে চলে গেল আর ফাঁক বুঝে প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন বুযুর্গ। জায়গাটি ছিল আলো আঁধারী। তাই প্রহরী বুযুর্গের অনুপ্রবেশ ঠাহর করতে পারল না। বুযুর্গ প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে সাথীদের ইশারা করলেন ওখান থেকে চলে যেতে। সাথীরা ওখান থেকে ফিরে গিয়ে মঞ্চের চারপাশে জড়ো হওয়া মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

অন্ধকার গলিপথে যেতে যেতে বুযুর্গ একটি ঘরের মধ্য থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখলেন। তিনি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলেন, ভেতরের ঘরটি খুব সাজানো, মেঝের মধ্যে সুদৃশ্য গালিচা বিছানো। গালিচার উপরে বালিশ। রঙ বেরঙের ঝাড়বাতি জ্বালানো। অর্ধনগ্ন পাঁচ ছয়টি সুন্দরী তরুণী উচ্ছল নৃত্যরত। বালিশে ঠেক দিয়ে দুই সুদর্শন পুরুষ রাজকীয় ভঙ্গিতে বসা। তাদের সামনে

পানপাত্র। তারা থাবা দিয়ে নৃত্যরত একেকটি তরুণীকে ধরে নিজের কোলে টেনে নিয়ে ওকে উলঙ্গ করে নানাভাবে মজা করছে আর অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ছে।

এ দৃশ্য দেখে বুযুর্গ আরো সামনে অগ্রসর হলেন। সামনে পেলেন দরজা খোলা একটি কামরা। ভেতরে বাতি জ্বলছে, কোন লোক নেই। ভেতরে ঢুকে পড়লেন বুযুর্গ। দেখলেন এককোণে একটি সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। বুযুর্গ ভাবলেন, এটা হয়তো কোন সুড়ঙ্গ পথ নয়তো কোন গুদাম ঘরের সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেঙে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন বুযুর্গ। আশ্চর্য! বাড়ির কোথাও কোন মেরামতের কাজ না হলেও এ সিঁড়িটি ছিল নতুন এবং সুড়ঙ্গ পথটি ছিল যথেষ্ট প্রশস্ত। একজন জোয়ান মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে পারতো। বুযুর্গ সুড়ঙ্গ পথে এগুতে থাকলেন, সুড়ঙ্গের জায়গায় জায়গায় বাতি জ্বালানো। বুযুর্গ টেরই পাননি, তার কয়েক কদম পিছনে খঞ্জর হাতে একলোক তাকে অনুসরণ করছে। লোকটি খঞ্জর হাতে পা টিপে টিপে বুযুর্গের পিছনে পিছনে আসছিল। লোকটি বুযুর্গ ব্যক্তিকে খঞ্জর দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করতে হাত উপরে উঠাল— কিন্তু লোকটি বুঝে উঠতে পারছিল না, সুড়ঙ্গ পথটি এতোটুকু চওড়া নয় যে, হাত উঁচু করে হাত ঘুরিয়ে আঘাত হানা যাবে। সুড়ঙ্গ পথের দেয়ালে আঘাত লেগে শব্দ হলে বুযুর্গ চকিতে পিছন ফিরে বিদ্যুৎগতিতে কোমর থেকে খ র বের করে আঘাতকারীকে প্রতিঘাত করলেন। উভয়ের হাতের খঞ্জরে টক্কর খেয়ে শব্দ হল। কেউ লক্ষ্যভেদ করতে পারল না। বুযুর্গ বামপায়ে সজোরে প্রহরীর কোমরে লাথি মেরে চিৎ করে ফেলে দিলেন। নিজের খঞ্জর ওর বুকে আমূল বিদ্ধ করে হেচকা টানে বের করে আবার পাঁজরে ঢুকিয়ে আরেকটি লাথি মারলেন। লোকটি আর্তচিৎকার দিয়ে  গড়িয়ে পড়ল।

আক্রান্ত আর্তচিৎকার দিলে দৌড়ে সিঁড়ির প্রবেশপথে এসে পড়লেন বুযুর্গ। তার দিকে দৌড়ে এলো কয়েকজন। বুযুর্গ বললেন, জলদি নিচে যাও। আমি আসছি। ওরা আহতের আর্তচিৎকার শুনেছিল। বুযুর্গকে চিনতে না পেরে ওরা সুড়ঙ্গপথের দিকে দৌড়ে গেল আর এই ফাঁকে দৌড়ে গলিপথ মাড়িয়ে জনারণ্যে মিশে গেলেন বুযুর্গ। রক্তমাখা খঞ্জরটি এর আগেই কোমরে গুঁজে ফেলেছিলেন তিনি।

সমবেত সকল লোকের আকর্ষণ ছিল মঞ্চের দিকে। সেখানে আলোর তীব্রতা কম। সবার দৃষ্টি মঞ্চের দিকে। বুযুর্গ তাঁর সাথীদের খুঁজে বের করে সংক্ষেপে বললেন, তিনি কোথায় গিয়েছিলেন, কি দেখেছেন এবং কি করে

এসেছেন। সাথীরা তাকে এখান থেকে চলে আসার প্রস্তাব দিয়ে বলল, অন্যথায় আপনার ধরা পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। শংকা না বাড়িয়ে বুযুর্গ চলে এলেন দুর্গ থেকে।

একটু পরই নাকাড়া বেজে উঠল। বাজল সানাই। এটা দাউদের মঞ্চে আগমন বার্তা। একটু পরই ঘোষক ঘোষণা দিল— মুলতানের শাসক, কারামাতী পয়গাম্বর, আবুল ফাতাহ শাইখ নসর বিন শাইখ হামিদ কারামাতী, সত্য ইসলামের পতাকাবাহী মঞ্চে আসছেন, জিন ও ভূত তার তাবেদার। উপস্থিত সকলেই মাথা নীচু করে তাকে অভিবাদন জানাবে।

ঢোল নাকারা বাজতে থাকল। বাজনার তালে তালে সৃষ্টি হলো সুর লহরী, যেন আন্দোলিত হতে থাকলো শত শত বছরের পরিত্যক্ত দুর্গের সব ঘরদোর। বাজনার আবহে মঞ্চের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে এলো দাউদ, মাথায় রাজমুকুট। সারা গায়ে জরিদার জমকালো রাজকীয় পোশাক। সে এসে উপবেশন করল হীরা-মুক্তার সিংহাসনে। মানুষ তার আগমনে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল। ঘোষক হাঁক দিল, "শত শত বছর ধরে এই দুর্গ জিন-ভূত-প্রেত্নীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল, এরা প্রতিদিন একজন না একজনের তাজা রক্তপান করতো। সত্যধর্মের পয়গাম্বর তার বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতাবলে খোদার বিশেষ ক্ষমতায় সকল ভূত-পেত্নী ও জিনকে তিনি অনুগত বানিয়ে ফেলেছেন। ওদেরকে বন্দী করে রেখেছেন। সমবেত সকল মানুষের কর্তব্য তার আনুগত্য স্বীকার করে তার হাতে মুরীদ হওয়া। না হয় জিন-ভূতেরা তাদের ক্ষতি করবে।"

এমন গুরু গম্ভীর আওয়াজে এই ঘোষণা দেয়া হলো যে, সমবেত মানুষজন ভীষণ প্রভাবিত হলো। এরপর কানে ভেসে এলো ধীরলয়ের যন্ত্রসঙ্গীতের আওয়াজ, সেই সাথে নৃত্যের সুরলহরী। এ সময়ে সমবেত কণ্ঠের কোরাস সঙ্গীতের আওয়াজও ভেসে এলো। পুরো প্যান্ডেলটি বাজনার তালে তালে নেচে উঠল। দাউদ বিন নসর মসনদ থেকে দাঁড়িয়ে গেল দর্শকদের দিকে পিঠ করে। বিড় বিড় করে মন্ত্রের মতো কি যেন আওড়াল। সুড়ঙ্গ পথ ছিল অন্ধকার। ওখান থেকে প্রথমে ধোঁয়া নির্গত হয়ে মঞ্চের জায়গাটি অন্ধকার হয়ে গেল। দাউদ দুহাত প্রসারিত করে বলল, খোদায়ে যুলজালাল! হে মানুষ ও জিনের সৃষ্টিকর্তা! আমাকে তুমি খোদায়ী শক্তি দাও। যাতে জিন ও ভূতের কষ্ট থেকে তাদের আমি মুক্তি দিতে পারি। সে ধমকের স্বরে বলল, "আমার সামনে আয়।" কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ায় মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে ধোঁয়া কমে গেল, ধোঁয়ার ভেতর থেকে চারটি কুমারী সুন্দরী দৃশ্যমান হল।

মেয়েগুলো যেন জান্নাতের হুর। তাদের গায়ে ফিনফিনে রেশমী পোশাক। বাদকদলের বাজনা আরো তীব্র হলো। যন্ত্রসঙ্গীতের সুরে কেঁপে কেঁপে উঠল মঞ্চ। যুবতীরা এক সাথে দাউদকে কুর্নিশ করতে সেজদায় পড়ে গেল। দাউদ তাদেরকে উঠে যেতে ইশারা করল। ধোঁয়া সম্পূর্ণ গায়েব হওয়ার আগেই যুবতীরাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

যুবতীদের অন্তর্ধান বুঝে উঠার আগেই মঞ্চে দেখা গেল চারটি দৈত্যের মতো জংলী মানুষ। লোমশ কালো চেহারা। কুচকুচে কালো শরীর। বড় বড় চোখ। মাথার চুলগুলো সজারুর কাঁটার মতো খাড়া। মাথায় বাঁকানো শিং। দীর্ঘ দাঁত ওদের মুখের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে। মঞ্চের উপরে বেতাল বেশামালভাবে নাচতে শুরু করে দিল দৈত্যগুলো। ঘোষণা হলো— এরাই জিন। এদের চেয়ে আরো উদ্ভট চেহারার দানবের মতো একটি লোককে দেখা গেল হাতে চাবুক নিয়ে দাঁত খিটমিট করছে। সে বন্য দৈত্যগুলোকে এভাবে পেটাতে শুরু করে দিল যে, ওদের বিকট চিৎকারে দর্শকগণ ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলল, থামো! থেমে গেল পেটানো। ভূতগুলো সমস্বরে বলে উঠল, হুজুর! আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। হুজুর! আমরা এখন আপনার কথা মানবো, আমরা আপনার মুরীদ হয়ে গেছি। আমরা কসম করে বলছি— আপনি আল্লাহ্‌র পয়গম্বর, আল্লাহ্‌র দূত। এ সংবাদ আমরা গায়েব থেকে জানতে পেরেছি।

মঞ্চের দিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আবারো ধেয়ে আসল। অন্ধকার হয়ে গেল মঞ্চ। ধোঁয়া কেটে যখন মঞ্চ পরিষ্কার হয়ে গেল তখন সেখানে দৈত্য দাউদ কাউকেই আর দেখা গেল না। ঘোষণা করা হল— কারামাতী পয়গম্বর আল্লাহ্‌র দরবারে হাজিরা দিতে গেছেন।

তোমরা যা দেখে এলে এসবই সেই সুড়ঙ্গের তেলেসমাতি। সাথীদের উদ্দেশ্যে সেই পুরনো বাড়িতে বসে বলছিলেন বুযুর্গ ব্যক্তি। যে মেয়েগুলোকে তোমরা দেখে এসেছো ওদেরকে আমি একটি বন্ধ ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেছি। এ সবই সেই সুড়ঙ্গ পথের কারিগরী। সুড়ং পথটি নতুন তৈরি করা হয়েছে। এই সুড়ঙ্গ পথটি মঞ্চে এসে শেষ হয়েছে। এই সুড়ঙ্গ পথেই মঞ্চের দিকে ধোঁয়া ছোঁড়া হয়। মেয়ে ও কৃত্রিম দৈত্যগুলো এই সুড়ঙ্গ পথ দিয়েই দৃশ্যমান হয়ে আবার ধোঁয়ার অন্ধকারে সুড়ঙ্গ পথে চলে যায়।

চার-কুমারী দুর্গে দাউদের তেলেসমাতী দেখে আসার পর বুযুর্গের নেতৃত্বে আবার পুরনো বাড়িতে বসল তাঁর সতীর্থদের পর্যালোচনা বৈঠক। আগেই আমার

সন্দেহ হয়েছিল এই দুর্গে জিনদের কোন অস্তিত্ব নেই, থাকলেও এভাবে এদেরকে বন্দী করে রাখা যায় না।

বুযুর্গ ও তাঁর সহযোগিরা যখন চার-কুমারী দুর্গের ঘটনা ও তাদের করণীয় নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন তখন সেই বাড়ির দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেল বাড়ির মালিক। আর অন্যেরা বিপদাশংকায় পালানোর জন্যে তৈরি হয়ে গেল। বাড়ির মালিক ছিল এদের সহযোগী। কোন বিপদ সংকেত থাকলে সে দরজার কাছে এসে কাশি দেবে এমন কথা ছিল। কিন্তু আজ সে কাশি দেয়নি। যখন দরজা খোলা হল তখন দেখা গেল, তাদেরই অন্য এক সাথী উপস্থিত।

আমি যে খবর শুনে এসেছি, তা যদি সত্য হয় তবে কারামাতীদের মৃত্যু ঘণ্টা ঘনিয়ে এসেছে। বেরা থেকে কয়েকজন লোক এসে বলেছে, সুলতান মাহমূদ বেরা দখল করে নিয়েছেন। বেরার রাজা বিজি রায় আত্মহত্যা করেছে। লোকগুলো বলেছে— তিনদিন পর্যন্ত এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে যে, সুলতান ও বিজি রায় সবারই সহায় সম্পদ সব বিনষ্ট হয়ে গেছে। এখন সুলতান গজনীর সাহায্যের জন্যে অপেক্ষা করছেন। গজনী থেকে রসদপত্র পৌছাতে সময় লাগবে। বর্তমানে বেরা থেকে কাউকে বের হতে দেয়া হচ্ছে না, কাউকে ঢুকতেও দেয়া হচ্ছে না।

সবাই গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। কিছুক্ষণ পর আলেম বললেন, "রাজশক্তির সাথে টক্কর দেয়া আমাদের সম্ভব নয়। আমরা এখন গোপনে কারামাতী চক্রান্তকারীদের নির্মূল করার কাজটি চালিয়ে যেতে পারি। যে কাজটি আমাদের দরবেশ সুনিপুণভাবেই শুরু করে এসেছে। সতর্ক থাকতে হবে আমাদের যেন কেউ চিহ্নিত করতে না পারে। যদি দাউদকে হত্যা করা যায় তবে হয়তো এই অপকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। তৃতীয় পন্থা হতে পারে আমাদের কয়েকজন বেরা গিয়ে সুলতান মাহমূদকে এখানকার পরিস্থিতি জানিয়ে মুলতান আক্রমণের জন্যে অনুরোধ করা।

একথায় সায় দিল সবাই। সিদ্ধান্ত হল, আলেম, বুযুর্গ ও আরো তিনজন নওজোয়ান সাথী পরদিন সকালেই বেরার উদ্দেশে রওয়ানা হবে।

দরবেশের গোপন আস্তানায় যখন সুলতান মাহমূদের বেরা বিজয়ের খবর শোনানো হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে দাউদকেও তার গোয়েন্দারা খবর দিল যে, সুলতান মাহমূদ বেরা দখল করে নিয়েছে এবং বিজি রায় আত্মহত্যা করেছে।

দাউদ তখন চার-কুমারী দুর্গের যাদুকরী ধোঁকাবাজীর এক সহযোগী হত্যার অপরাধে অন্যান্য প্রহরীর উপর চড়াও হচ্ছিল। প্রহরীরা তার সামনে দণ্ডায়মান হয়ে করজোড়ে নিবেদন করছিল, তাদের কেউ ওকে হত্যা করেনি। বরং তারা একজনকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। কিন্তু দাউদ কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে রাজি নয়। দাউদের বিশ্বাস, কোন তরুণীর চক্রান্তে এদেরই কেউ ওকে হত্যা করেছে। দাউদ ওদেরকে শাসাচ্ছিল কিন্তু প্রহরীদের সবাই মিনতি করছিল আমরা ওকে হত্যা করিনি।

এ সময় দাউদের সেনাপতি এসে জানাল বেরার দুঃসংবাদ। সংবাদ শুনে দাউদের অবস্থা এমন হলো যে, তার মদের নেশা উবে গেল। বেসামাল দাউদ চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশংকায় চোখে অন্ধকার দেখছিল। এরই উপর ভয়ানক দুঃসংবাদ ওকে আরো শংকিত করে ফেলল। নিরাপত্তা প্রধানকে হুকুম দিল, ওদেরকে হাত পা বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে দাও, তারপরও যদি সত্য কথা না বলে তবে কোন খাবার না দিয়ে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখবে।

প্রহরীদেরকে নিয়ে যাওয়ার পর সেনাপতিকে দাউদ বলল, মাহমূদ যদি বেরা দখল করে থাকে তবে আমাদেরকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে। তুমি আগামীকাল সকালেই ব্যবসায়ীর বেশে কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা পাঠিয়ে দাও। তারা গিয়ে সরেজমিনে ব্যাপারটি দেখে আসুক। মাহমূদের কাছে যদি সৈন্যবল কম থেকে থাকে তবে আমরা মহারাজা আনন্দ পালকে খবর দেবো ওর উপর হামলা করতে।

সকাল বেলা মুলতান থেকে ছোট দু'টি কাফেলা বেরার উদ্দেশে বের হল। এক দলে দরবেশ, আলেম ও তার তিন সাথী, আর অপর দলে দাউদের সেনা বাহিনীর দুই কর্মকর্তা ও অপর চারজন সৈনিক।

দাউদের লোকেরা যখন দরবেশের কাফেলাকে দেখল তখন বলল, মনে হয় ওরাও ওদিকে যাবে। চল, আমরাও ওদের সাথে মিশে যাই।

* * *

## হক ও বাতিলের লড়াই

থমকে গেল দাউদের চমক। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় দাউদের নাচ, নখরা ভাটা পড়ল। বেরা পতনের খবরে দাউদের মাথায় চক্কর দিয়ে উঠল; সে চারজন কমান্ডার ও দুইজন উর্ধ্বতন সেনা অফিসারকে বেরার উদ্দেশে পাঠাল। ওদেরকে নির্দেশ দিল, যে করেই হোক, তোমরা বেরায় গিয়ে সুলতান মাহমূদের অবস্থা জানাবে। সে কবে নাগাদ মুলতান অভিযানে বের হতে পারে এবং তার সৈন্যসংখ্যা কত? ওখানকার হিন্দুদের অবস্থা কি তাও ভাল করে অনুসন্ধান করবে এবং সম্ভব হলে ওদের সাথে যোগাযোগ করে আসবে। নির্দেশ মত ছয়জনের কাফেলা বণিকের বেশে বেরার পথে রওয়ানা হল। এই ছয়জনের প্রত্যেকেই ছিল গোয়েন্দাবৃত্তিতে পারদর্শী এবং কট্টর কারামাতী।

মুলতান থেকে কিছু দূর যাওয়ার পর গুপ্তচর কারামাতীরা দরবেশ, আলেমসহ আরো তিন ব্যক্তিকে বেরার দিকেই যেতে দেখল। তারা এদের সাথে মিশে গেল। ভাবল, একই দিকে যেহেতু যাচ্ছি, তাই এদের কাছ থেকে কোন সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। দাউদের গুপ্তচররা ছিল অশ্বারোহী। তাছাড়াও তাদের তিনটি উট বোঝাই ছিল মালপত্রে। দরবেশের সাথীদের তিনজন ছিল উষ্ট্রারোহী এবং আলেম ও দরবেশ অশ্বারোহী। এরা ছিল নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলমান। তারা যাচ্ছিল সুলতান মাহমূদকে কারামাতীদের দুষ্কৃতি সম্পর্কে অবহিত করে মুলতান আক্রমণের অনুরোধ জানাতে।

উভয় কাফেলা মুখোমুখি হলে কুশল বিনিময় হলো, সালাম কালামও হলো। কিন্তু পরিচিতি পর্বে উভয় কাফেলা কিছুটা রক্ষণশীলতা বজায় রাখলো। দরবেশ জানালো, "তারা মুলতানের বাসিন্দা, মুলতানেই ব্যবসা করে। ব্যবসায়িক কাজে বেরা যাচ্ছে।" কারামাতীরা বলল, "তারা লাহোরের বাসিন্দা। ব্যবসায়িক কাজে মুলতান এসেছিল। এখন বেরা হয়ে লাহোর ফিরে যাবে।"

"আপনারা তো মুলতানের অধিবাসী, তাহলে তো আপনারা কারামাতী মুসলমান?" দরবেশকে জিজ্ঞেস করল এক কারামাতী।

"না, আমরা সুন্নী মুসলমান। কারামাতীদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ওদেরকে আমরা মুসলমানই মনে করি না। আপনারা তো মনে হয় সুন্নী মুসলমান। কারণ, মুলতান ছাড়া আর কোথাও কারামাতী নেই।" বলল দরবেশ।

"ওদের আমরা চিনি না।" বলল এক কারামাতী সৈনিক। "আমরাও আপনাদের মতই সুন্নী মুসলমান। আচ্ছা— শুনলাম, সুলতান মাহমূদ বেরা দখল করেছে? ওখানকার রাজা বিজি রায় নাকি আত্মহত্যা করেছে?"

"শুনলাম তাই।" বললেন আলেম। "যদি খবরটি সত্য হয়ে থাকে, তবে আপনার, আমার সবারই খুশি হওয়া উচিত। মুহাম্মদ বিন কাসেমের পর এই প্রথম কোন ন্যায়পরায়ণ সুলতান এদিকে অভিযান করলেন। আপনি দেখে থাকবেন, এ অঞ্চলের অশিক্ষিত দরিদ্র মুসলমানরা কীভাবে দলে দলে হিন্দুদের চক্রান্তে ধর্মান্তরিত হচ্ছে।"

"আমরা খুব খুশি হয়েছি।" বলল কারামাতী কমান্ডার। "আমরা চাই সুলতান মাহমূদ লাহোরও দখল করে নিক। এ এলাকাটিও মুসলমানদের দখলে আসা দরকার।"

"লাহোরের আগে সুলতান মাহমূদের উচিত মুলতান দখল করা। কথায় বলে, ঘরের শত্রু বিভীষণ। আপনি হয়তো জানেন, মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসর খৃস্টান ও হিন্দুদের ক্রীড়নক সেজে মুসলমানদের পরিচয়ে ইসলামের শিকড় কাটছে।"

"জানা তো নেই, সুলতান মাহমূদ দাউদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জানেন কি না। সুলতানের কাছে সঠিক তথ্য আছে কি না তাও তো জানা নেই।" বলল কারামাতী কমান্ডার।

"জানা না থাকলেও তার এখন জানা উচিত।" বললেন আলেম।

"আমরা তো এক সাথেই বেরা যাচ্ছি। সুলতান মাহমূদ যাতে দাউদ বিন নসরকে বন্ধু মনে না করেন, এ ব্যাপারটি তাকে অবহিত করা তো আমাদেরও কর্তব্য।" বলল কারামাতী কমান্ডার।

"অবশ্যই।" বললেন দরবেশ। এ কর্তব্য আমাদের অবশ্যই পালন করা দরকার।

সবাই সমতালে চলতে লাগল। আলেম ও দরবেশ এ কথা প্রকাশ করতে চাচ্ছিল না যে, তারা সুলতান মাহমূদের কাছেই যাচ্ছে। তাদের গতিবিধি দেখে কারামাতীদের এমন কোন সংশয়ও হয়নি। কিন্তু কারামাতীরা ছিল দুর্দান্ত চালাক এবং পেশাদার গোয়েন্দা। ওরাও নিজেদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করেনি। কারামাতীরা দরবেশ ও সাথীদের আকীদা বিশ্বাস নিয়েই কথাবার্তা বলছিল। দরবেশ ও আলেম ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করতে পারেনি যে ওরা সুন্নী মুসলমান নয়

এবং ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কিছুও হতে পারে। তাদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক না হওয়ায় সমমনা মনে করে তারাও অকপটে ওদের সাথে কথাবার্তা বলতে লাগল।

বেলা ডুবার আগেই তারা মুলতান অঞ্চলের বড় নদী রাভী পেরিয়ে গেল। যে জায়গা দিয়ে তারা নদী পার হল এখানে নদীটি বেশ চওড়া কিন্তু অগভীর। নদী পেরিয়ে তীরে উঠেই তারা সবাই রাত যাপনের জন্যে সুবিধা মতো একটি জায়গা বেছে নিল। এ সময় কারামাতী দলের কমান্ডার তার ঘোড়ার পিঠ থেকে সামান ও জিন খুলছে, তার এক সৈনিক তার কাজে সহযোগিতা করছে। সহযোগী সৈনিকটি জিন খুলতে খুলতে কমান্ডারের উদ্দেশ্যে বলল, "লোকগুলোকে দেখে তো ব্যবসায়ীই মনে হয় কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে কোন বদ মতলবে বেরা যাচ্ছে না তো? যে দু'জন লোক আমাদের সাথে কথাবার্তা বলছে, মনে হয় এরা শিক্ষিত, আলেম। এরা যদি আমাদের সম্পর্কে কোন কূটকৌশল না করে তবুও আমাদের উচিত হবে এদের সাথে থাকা। কারণ আলেম হিসাবে বেরাতে তারা যে সম্মান পাবে এদের সাথে থাকলে আমরাও তাদের দ্বারা উপকৃত হবো। আমাদের উচিত তাদের সাথে হৃদ্যতা সৃষ্টি করা।"

"আজ রাতে আমরা মদের মশক খুলব না। যাতে তারা আমাদেরকে মু'মেন মুসলমান মনে করে। তাদের মধ্যে ওই বুড়ো লোকটি খুব ভালভাল কথা বলে। আমরা তাদেরকে সুলতান মাহমূদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে উৎসাহ দেবো। এরপর তাদের সাথে আমাদের একজনও চলে যাবো মাহমূদের দরবারে। তাহলে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানা যাবে।"

সবাই এক সাথে আহারে বসল। আহার পর্বেও কারামাতী কমান্ডার সারাদিনের মতো ধর্মীয় প্রসঙ্গে কথা বলতে লাগল। ওদের কথায় বুঝা যাচ্ছিল, তারা নিষ্ঠাবান মুসলমান। কথার ধরনও ছিল এমন যে, আলেম ও দরবেশ মনে করলেন, তাদের মতো এরাও সুলতান মাহমূদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাদের মতোই ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ। কারামাতী দলের সবাই প্রশিক্ষিত গোয়েন্দা। ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিক। দরবেশ ও আলেমের মিশন ছিল ইসলামী চেতনা থেকে উৎসারিত কর্তব্যের প্রতিফলন। তাই তাদের মধ্যে সব বিষয়ে অতিরিক্ত সচেতনতার বোধ ছিল না। তাদের মন-মস্তিষ্কেও এসবের গন্ধ নেই। পক্ষান্তরে কারামাতী দলটির মিশনই ছিল সন্দেহজাত, ধূর্তামি আর প্রতারণার। কথায় কথায় কারামাতী প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিল দলনেতা।

"কারামাতীদেরকে আমরা ভ্রান্ত মনে করি।" বলল কারামাতী কমান্ডার। "কিন্তু মুলতানে আমরা যাকেই দেখলাম সবাইকে দাউদের অনুসারীই মনে হলো। সেখানে লোক মুখে চার-কুমারী দুর্গের কথা শুনে গতরাতে আমরা সেই মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা জিন দেখলাম, কুণ্ডলীর ভেতর থেকে চারটি তরতাজা কুমারী মঞ্চে আবির্ভূত হলো। তারা আবার ধোঁয়ার মধ্যেই হারিয়ে গেল। আমাদের কাছে তো এগুলো বাস্তব এবং দাউদের কারামতীই মনে হলো। মনে হয় দাউদের মধ্যে বিশেষ আধ্যাত্মিক গুণ আছে— না হয় এসব কি কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব?"

"যে দিক থেকে আপনারা চার-কুমারী এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখলেন সেদিক থেকে কোন লাশ বের হতে দেখেননি?" কারামাতী কমান্ডারের কথায় আবেগ তাড়িত হয়ে রহস্য প্রকাশ করে দিলেন দরবেশ।

"লাশ! কার লাশ?" বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কারামাতী কমান্ডার।

"দাউদের একজন বিশ্বস্ত প্রহরীর লাশ। চার কুমারী আর জিনের ভোজভাজি আমি দুর্গের ভেতরে গিয়ে দেখে এসেছি।" বললেন দরবেশ।

"বলেন কি? আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাদেরকে এই রহস্যের কথা খুলে বলুন তো! আমরা তো ভাবতেই পারিনি, কোন বাতিল গোষ্ঠীর মধ্যে এমন অলৌকিক ক্ষমতা থাকতে পারে। আমরা তো তার কারামাতী দেখে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে মুরীদ হওয়ার চিন্তা করেছিলাম। আর আপনি বলছেন, ভোজভাজি! ভাই মেহেরবানী করে আমাদের সন্দেহমুক্ত করুন। এতেও আপনার সওয়াব হবে!"

কারামাতী কমান্ডারের চাতুর্যপূর্ণ কথায় আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন দরবেশ। তিনি ওদেরকে সুন্নী মুসলমান মনে করে তার গোপন অভিযানের কথা সবিস্তারে বলে দিলেন। বললেন, কিভাবে তিনি ভেতরে প্রবেশ করে গোপন কক্ষে চার কুমারীকে দেখলেন এবং দাউদ ও সহযোগীদেরকে তরুণী বেষ্টিত অবস্থায় মদ পানরত অবস্থায় পেলেন। তাও বললেন, একজনকে হত্যা করে কিভাবে তিনি গোপন সুড়ঙ্গ পথ ডিঙিয়ে বেরিয়ে এলেন।

কারামাতী কমান্ডার ও সাথীরা অভাবিত এই সফল অভিযানের জন্যে দরবেশকে বাহবা ও ধন্যবাদ দিল। এ কৃতিত্বের জন্যে দরবেশের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাকে খুবই উজ্জীবিত করতে লাগল। ওরা তো দরবেশের কথা শুনে হতবাক। "বলে কি বুড়ো! যে হত্যাকাণ্ডের কিনারা করতে না পেরে দাউদ মহলের অভ্যন্তরীণ সকল নিরাপত্তারক্ষীকেই কঠিন শাস্তি দিচ্ছে, ওরা ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বলতে পারছে না কে ঘটিয়েছে হত্যাকাণ্ড। আর

এই বুড়ো কি সেই হত্যার নায়ক! মনে মনে মহা খুশি হল তারা, অভাবিতভাবে হাতের নাগালে অপ্রত্যাশিত শিকার। আর পালাবে কোথায়? শিকার এখন তাদের হাতের নাগালে। ভেতরের মনোভাব প্রকাশ করল না কারামাতীরা।

রাতের আহারপর্ব সেরে সবাই বিছানা পেতে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারামাতী কমান্ডার দরবেশের প্রতি দারুণ ভক্তি দেখাচ্ছে। তার প্রতি অত্যধিক সম্মান দেখিয়ে সে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে দরবেশের বিছানা করল। সারাদিনের বিরামহীন ক্লান্তির কারণে শুয়েই সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল দরবেশের। চোখ মেলল কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। মোটা কাপড় দিয়ে তার চোখ মুখ বেঁধে ফেলা হয়েছে। সে উঠে দাঁড়াল কিন্তু পা বাড়াতে পারল না। দু'তিনজন লোক তার হাত পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলল। সাথে সাথে তাকে ধরাধরি করে একটি উটের উপরে রেখে বেঁধে ফেলল উটের সাথে। উটের রশি আরেকটি ঘোড়ার সাথে বেঁধে ঘোড়াকে তাড়া দিল। সহগামী হলো আরেকটি ঘোড়া। কারামাতী গুপ্তচররা অপ্রত্যাশিতভাবে চার-কুমারী দুর্গের রহস্যজনক নিরাপত্তারক্ষী হত্যাকারীকে পেয়ে তাকে দাউদের কাছে পৌঁছে দিয়ে মোটা অংকের পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় দরবেশকে মুলতানে নিয়ে যাওয়ার জন্য দু'জনকে দিয়ে রাতের অন্ধকারেই পাঠিয়ে দিল। এ কাজটা আসলেই ছিল তাদের জন্য বিরাট এক সাফল্য আর দরবেশ ও সাথীদের জন্যে মারাত্মক বিপর্যয়।

দরবেশের সাথীরা তার কাছ থেকে অনেকটা দূরে বেঘোরে ঘুমাচ্ছিল। রাতের এই অপহরণ ঘটনা মোটেও টের পেল না তারা।

খুব ভোরেই ঘুম ভাঙল আলেম ব্যক্তির। তিনি ঘুম থেকে উঠে নামাযের জন্য দরবেশকে জাগাতে তাঁর বিছানায় গেলেন। কিন্তু বিছানা খালি। ভাবলেন, দরবেশ হয়তো তার আগেই শয্যা ত্যাগ করে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছেন। অথবা অযু করতে নদীতে গেছেন। কারামাতী কমান্ডার ঘুম থেকে উঠে তাদের বাধা উট ও ঘোড়ার দিকে গেল। একটু পরই চিল্লাতে শুরু করল, "হায়! আমাদের দু'টি ঘোড়া ও একটি উট নেই। আমাদের দু' সাথীও নেই। হল্লাচিল্লা করে কারামাতী কমান্ডার আবিষ্কার করল, আমাদের দামী জিনিসপত্রগুলোও সব নিয়ে গেছে। কমান্ডার চেমামেচি করে ঘোড়ায় জিন লাগাতে শুরু করল, আর বলতে লাগল, বেশি দূর যেতে পারেনি। চলো, ওদের তালাশ করি।" এমন সময় আলেম বললেন, "আমাদের দরবেশকেও তো দেখছি না।"

"হ্যাঁ, তাহলে সে-ই আমাদের লোকদের অপহরণ করেছে। তাকে তো আমরা দরবেশ মনে করেছিলাম। কিন্তু গতরাতে সুড়ঙ্গের মধ্যে যেভাবে এক সৈনিককে সে হত্যা করে ফিরে এসেছে— এ লোক পেশাদার খুনী। চল ওকে ধরতে হবে।"

"ওর পিছু নেয়া বোকামী।" বলল অপর এক কারামাতী। "জানা তো নেই এখান থেকে কখন কোন দিকে পালিয়েছে সে।"

"হ্যাঁ। তুমি ঠিক বলেছো। এ মরু বিজন প্রান্তরে কোথায় খুঁজে ফিরব আমরা। ওকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।" বলল কমান্ডার।

"আলেম ব্যক্তি নীরবে দাঁড়ানো। তার তিন সাথীও হতবাক। হচ্ছে কি এসব? দরবেশকে তো তারা জানে, সে খুন-খারাবী, চুরি-ডাকাতি করবে, একথা তারা কল্পনাও করতে পারে না। তার মতো একজন মর্দে মু'মেন নেক মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। অথচ এরা বলছে, দরবেশ তাদের মালপত্র লোকসহ অপহরণ করে নিয়ে গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা হতবাক।

"আমার তো মনে হয় তোমরাও ডাকাত।" আলেমকে উদ্দেশ্য করে বলল কারামাতী কমান্ডার।

"আমরা ডাকাত হলে এখন আমাদের কাউকে তুমি এখানে দেখতে না। আর তোমরাও জীবিত থাকতে না। সবাই লাশ হয়ে থাকতে।" বললেন আলেম। "দেখো! তোমাদের দু'লোক নিরুদ্দেশ। আমার তো মনে হয়, তোমাদের ওই লোকেরা চুরি করার জন্যে মালপত্র বাঁধছিল, তা দেখে ফেলেছিল দরবেশ। ওদের অপকর্ম ফাঁস হয়ে যাবে মনে করে ওরা দরবেশকে হত্যা করে নদীতে ফেলে পালিয়ে গেছে। ওরা জোয়ান দু'জন, আর দরবেশ বুড়ো একা।"

তাদের লোক কোথায় গেছে, তা কারামাতীদের জানা। তাই কারামাতী কমান্ডার মনে করল, এরাও যদি দরবেশের গোপন মিশনের সহযোগী হয়ে থাকে, তবে এদের বেশি ঘাটানো ঠিক হবে না। এদের কাছ থেকে আরো তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনায় কারামাতী কমান্ডার আলেম ও তার সাথীদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করল না। বস্তুত তাদের উদ্বেগের কোন কারণও ছিল না। কমান্ডার নিজেই তো দরবেশকে অপহরণের ব্যবস্থা করেছে।

পুনরায় উভয় কাফেলা বেরার দিকে রওয়ানা হলো। কারামাতীরা আগে আর আলেম ও সাথীরা ওদের পিছনে।

"এদের গতিবিধি আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। সাথীদের ক্ষীণ আওয়াজে বললেন আলেম।" সকাল থেকে এদেরকে আমি গভীরভাবে দেখছি, আমার কাছে এদেরকে ব্যবসায়ী মনে হয়নি। এরা ব্যবসায়ী নয় অন্য কোন পেশার লোক। দরবেশ গতরাতে আবেগপ্রবণ হয়ে সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশের ঘটনা বলে দিয়েছিল। আমার মনে হয়, এরা দাউদের লোক। গোয়েন্দা। এরাই দরবেশকে অপহরণ করে মুলতান নিয়ে গেছে। এরা বেরা যাচ্ছে, সুলতান মাহমূদের গতিবিধি ও তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানার জন্যে।"

"আমাদের সচেতন থাকা দরকার।" বলল এক সাথী। "ওরা যেন বুঝতে না পারে, দরবেশের সাথে আমাদের গভীর কোন সম্পর্ক ছিল।"

"এরা যদি সত্যিই গোয়েন্দা হয়ে থাকে, তবে এদেরকে আমি বেরায় ধরিয়ে দেবো। এখন থেকে এদের সাথে আমরা আরো আন্তরিক ভাব দেখাবো।"

"এ বিষয়টা তো পরিষ্কার বোঝা গেছে, এরা আমাদের নবী দাউদ বিন নসর ও কারামাতী ধর্মাদর্শের ঘোরতর বিরোধী। এখন থেকে ওদের সাথে আমরা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব দেখাবো। আমাদের জানতে হবে এদের প্রকৃত পরিচয় এবং এদের মূল উদ্দেশ্য।" সাথীদের বলল কারামাতী কমান্ডার।

সূর্য যখন মাথার উপর, তখন কারামাতী কমান্ডার সওয়ারীগুলোকে ঘাস পানি খাওয়ানো এবং নিজেদের বিশ্রাম ও আহারের জন্য কাফেলা থামিয়ে দিল। আহার পর্বে কারামাতী কমান্ডার আলেমকে জিজ্ঞেস করল—

"দরবেশের সাথে আপনার সম্পর্ক কতো দিন ধরে?"

আলেম বললেন, "আমি শুধু এতটুকু জানতাম, মুলতানে সে ব্যবসা করে। কোথায় কি ব্যবসা তা জানি না। আমরা যখন বেরা রওয়ানা হলাম, তখন সে আমাদের সাথে এসে মিলিত হয়েছে।"

"ঐ লোকটি চার-কুমারী দুর্গে একটি লোক হত্যা করেছে, তা কি আপনারা জানতেন?"

"খুনের কথা জানতে পারলে আমরা তাকে সাথেই রাখতাম না।" বললেন আলেম। "সে যদি ধর্মীয় ভাবাবেগে খুন করে থাকে তাও ঠিক করেনি। নরহত্যা মহাপাপ। হত্যাকাণ্ড আল্লাহও ক্ষমা করেন না।"

গুপ্তচর নেতা বহু চেষ্টা করেও আলেমের কাছ থেকে নতুন কোন তথ্য উদ্ঘাটন করতে পারল না। কারামাতীরাও আলেম কাফেলার সাথে একথাই প্রকাশ করছিল যে, তারা কারামাতী নয় নিষ্ঠাবান মুসলমান।

রাজা, মহারাজা কোন সুলতানের শাসনের বাইরে বিজন মরু প্রান্তরে দু'টি ছোট কাফেলা একই কাফেলায় লীন হয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু দৃশ্যত একটি কাফেলা হলেও এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বিস্তর ব্যবধান। একদল আরেক দলের প্রাণঘাতি শত্রু। এরা পারস্পরিক শত্রুতায় লিপ্ত এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চিন্তায় বিভোর। হক ও বাতিলের অদৃশ্য সংঘাতে তারা অহর্নিশ চিন্তামগ্ন। আলেম সন্দেহাতীতভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, এরা ব্যবসায়ী নয় কারামাতী। আলেম ছিলেন বয়স্ক প্রবীণ। তার তিন সাথী অবশ্য যুবক। কিন্তু কারামাতীদের সবাই শক্তিশালী। আলেম ভাবছিলেন, এরা যদি প্রশিক্ষিত সৈনিক হয়ে থাকে, তবে তার তিন সাথী কি এদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে?

মনে মনে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে অগ্রসর হচ্ছিলেন আলেম। আল্লাহ্‌ই সকল বিপদে মদদগার। কোন মানুষ মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না যদি আল্লাহ্‌র রহমত না থাকে। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন, এরা যদি তার সাথে বেরা পর্যন্ত যায় তবে এদেরকে তিনি ধরিয়ে দিবেন। তবে বুযুর্গ দরবেশকে নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেলেন তিনি। তাকে যদি কারামাতীরা হত্যার দায়ে দাউদের কাছে ধরে নিয়ে যায় তবে বৃদ্ধ লোকটি অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে মুলতানে আমাদের সবার ঠিকানা বলে দিতে পারে। তাহলে তাদের স্ত্রী-সন্তান ও আত্মীয়দের দাউদের বাহিনী চরম লাঞ্ছিত করবে ও অত্যাচার চালাবে।

ইসলামী ইতিহাসে কষ্ট ও ত্যাগের কথা মনে হলো তার। কতো কঠিন নির্যাতন, নিপীড়ন সহ্য করেছেন সাহাবায়ে কেরাম। এ মুহূর্তে ইসলামের জন্যে তাদেরও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কুরবানী এখন সময়ের দাবী। সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেন—

"প্রিয় সাথীরা! আজ আমরা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি, তা খুবই কঠিন। ইসলামের জন্যে আমাদের ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকারের সময় এসেছে। আশা করি আল্লাহ্‌র রাস্তায় যে কোন ত্যাগ স্বীকারে তোমরা পিছপা হবে না। মনে রেখো, যে মুসলমান ত্যাগ স্বীকার না করে কষ্ট দেখে পালিয়ে যায়, ইতিহাস থেকে তাদের নাম চিহ্ন হারিয়ে যায়। হতে পারে আমাদের এই অভিযানের কারণে তোমাদের প্রত্যেকের পরিবারে অবর্ণনীয় অত্যাচার নেমে আসবে। সব জুলুম-অত্যাচার দৃঢ়তা ও সাহসের সাথে সহ্য করতে হবে। তোমরা যদি কষ্ট দুর্ভোগ ও নির্যাতনের মোকাবেলায় অটল থাকতে না পার তবে এখনই বাড়িতে ফিরে যেতে পার। তবে মনে রাখবে, যে মুসলমান ঈমানের পরীক্ষায় পালিয়ে যায়, ইতিহাস থেকে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"

তিন যুবকের কেউই আলেমকে ফেলে বাড়ি ফিরে যেতে রাজী হলো না। পক্ষান্তরে তারা আলেমকে তাদের দলনেতা স্বীকৃতি দিয়ে বললো, "আপনি আমাদের যে কোন নির্দেশ দিবেন, আমরা জীবন বাজী রেখে তা পালনে অঙ্গীকার করছি।"

ইতিহাসের এ এক নির্মম বাস্তবতা। যাদের রক্তের বিনিময় ও ত্যাগে রচিত হয় ইতিহাস, যাদের কুরবানীর বিনিময়ে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর যতো রাজা-বাদশাহ-বিজয়ীর কীর্তিগাঁথা, তাদের অধিকাংশই রয়ে গেছে অজ্ঞাত। কেননা, ইতিহাস যুদ্ধের ময়দানে বিজয়ীর নামোল্লেখ করে, যে সব অজ্ঞাত লোক নিজেদের পরিচয় আড়াল করে বিজয়ের ভিত রচনা করতে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে ইতিহাস তাদের জানে না।

তখন সূর্য ডুবে গেছে। কারামাতী কমান্ডার রাত যাপনের জন্যে যাত্রাবিরতি দিতে অনুরোধ করল। জায়গাটি ছিল সবুজ শ্যামল, তাজা ঘাসের প্রাচুর্য ছিল সেখানে। অসংখ্য ঝোপঝাড় উঁচু নীচু টিলায় ভরা। কারামাতী কমান্ডার আলেমের উদ্দেশ্যে বলল, "একটি সুবিধা মতো জায়গা দেখুন, আমিও দেখছি।" আলেম সাথীদের নিয়ে আরো সামনে অগ্রসর হলেন। একটি মরু প্রস্রবণের পাশে তিনি তাঁবু খাটাতে বললেন সাথীদের। জায়গাটিতে পানি ও ঘাস রয়েছে। পশুগুলোর খাবার ও নিজেদের বিশ্রাম উভয়টা একই সাথে সারা যাবে।

কারামাতীরা পিছনে রয়ে গেল। আলেম ভাবলেন, ওরা হয়তো এদিক সেদিক দেখে এ জায়গাটিকেই পছন্দ করবেন, কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও কারামাতীরা এলো না। আলেম ওদের আসার ব্যাপারে ভাবলেশহীন। ওরা ভিন্ন রাত কাটাক, তাতে কিছু যায় আসে না।

আলেম লক্ষ্য করলেন, "তাদের অদূরেই একটি তাঁবু খাটানো। সেখানে এক হিন্দু বৃদ্ধ এবং এক যুবক দাঁড়ানো। সাথে একজন বয়স্কা মহিলা এবং দু'জন তরুণী। তরুণী দু'জন দেখতে রাজকুমারীর মতো। তাদের তাঁবুর সামনে একটি মশাল জ্বলছে।

আলেমও তাদের তাঁবুর সামনে একটি মশাল জ্বালিয়ে এর হাতল মাটিতে পুঁতে দিয়ে সবাইকে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। ক্লান্তির আবেশে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল অল্প সময়ের মধ্যেই।

মাঝরাতে নারী ও পুরুষের আর্তচিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল সবার। আলেম ও সাথীরা সবাই উঠে তরবারী হাতে নিলেন বিপদাশঙ্কায়। জ্বলন্ত মশালের আলোয়

দেখতে পেলেন, তাদের দিকে এগিয়ে আসছে পাশের তাঁবুর বৃদ্ধ হিন্দু ও বয়স্কা মহিলা। কিন্তু তাদের সাথের দু' যুবতীকে দেখা গেল না।

আলেম ও সাথীরা তরবারী উঁচিয়ে ওদের দিকে অগ্রসর হলে ওরা পাশ ফিরে দৌড়াতে উদ্যত হলো। আলেমের সাথীরা সমস্বরে ওদের হুঁশিয়ার করে বললো, "পালাতে চাইলে নির্ঘাত মরতে হবে, জীবন বাঁচাতে চাইলে দাঁড়াও।"

মৃত্যুভয়ে ওরা দাঁড়িয়ে গেল। আলেম ও সাথীরা তাদের কাছে গেলে জীবন ভিক্ষা চাইল তারা। আর ভয়ে কাঁপতে লাগল। অনেক কষ্টে আলেম তাদের বুঝালেন, "আমরা তোমাদের হত্যা নয়, সাহায্য করতে চাই। বলো, তোমরা পালাচ্ছিলে কেন?"

"তোমাদের সাথীরা আমাদের সবকিছু নিয়ে গেছে। আমাদের সাথে থলে ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, অনেক দামী গহনা ছিল, সবই ওরা নিয়ে গেছে। তোমাদের সাথীরা মেয়ে দু'টিকেও নিয়ে গেছে।" ভয়ার্তকণ্ঠে বলল বৃদ্ধ।

"মেয়ে দু'জন তোমার কি হয়?"

"ওরা আমার মেয়ে। এ আমার ছেলে, আর এ আমার স্ত্রী। আমরা বেরা থেকে পালিয়ে এসেছি। বেরা মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে। আমরা হিন্দু।"

"গযনীর মুসলমানরা কি তোমাদের ঘরবাড়ি লুটপাট করেছে? শহরে গণহত্যা চালিয়েছে? তোমাদের মেয়েদের নির্যাতন করেছে?"

"না-না, তা নয়।" বলল বৃদ্ধ। "বিজয়ী সুলতান তো নির্দেশ দিয়েছেন, কোন হিন্দুর ঘরে কেউ যাবে না, কোন নারীকে কেউ লাঞ্ছিত করো না। সকল নাগরিকের মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধানের নির্দেশ দিয়েছে সুলতান। কিন্তু আমার এই মেয়ে দু'টো খুব সুন্দরী। বলাতো যায় না, বিজয়ী সৈন্যরা আবার আমার মেয়েদের লাঞ্ছিত করে কি-না। এই আশঙ্কায় আমি তাদের নিয়ে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, বেরাতেই আমরা নিরাপদ ছিলাম।

হুজুর! দয়া করে আপনার সাথীদের কাছ থেকে আমার মেয়ে দু'টিকে উদ্ধার করে দিন। ওরা ওদের মেরে ফেলবে। আমার অনেক সোনাদানা ওরা নিয়ে গেছে, সব আপনারা নিয়ে নিন তবুও আমাদেরকে এদের হাত থেকে রক্ষা করুন। আমার সাথে যা আছে তাও আপনাদের দিয়ে দেবো। তবুও আপনারা আমার মেয়ে দু'টির প্রতি একটু দয়া করুন।"

বৃদ্ধ হিন্দুর কথা শুনে আলেম বুঝতে পারলেন কারামাতীরাই এই অপকর্মের হোতা। কারণ, কারামাতীদের কাছে জীবন মানে ভোগ আর সম্ভোগ। ওরা বেঁচেই

থাকে পাপকর্মের জন্য। সুন্দরী মেয়ে দু'টিকে দেখে ওরা আর লোভ সামলাতে পারেনি। ওদের কাছে নারীভোগ পাপ নয়, পুরুষের অধিকার।

"তোমাদের কাছে কি অস্ত্র নেই?" হিন্দুদের জিজ্ঞেস করলেন আলেম।

"মালপত্রের সাথেই ছিল আমাদের তরবারী। ওরা আমাদের উপর এভাবে হামলে পড়ল যে, আমরা তরবারী হাতে নেয়ার সুযোগ পেলাম না। ওরা আমাদের মারপিট করে সব ছিনিয়ে নিয়েছে। নিরুপায় হয়ে আমরা এখন বেরার দিকে ফিরে যাচ্ছিলাম, এ সময় আপনারা আমাদের দাঁড়াতে বললেন।"

আলেম তার তিন সাথীকে বললেন, "এই হিন্দুকে আমাদের এ কথা বুঝাতে হবে যে, মুসলমানদের কাছে নারীর ইজ্জত ধর্ম বর্ণের ঊর্ধ্বের বিষয়। মুসলমান যে কোন ধর্মের নারীর ইজ্জত রক্ষার্থে জীবন বাজী রাখতে কুণ্ঠাবোধ করে না। নারীর মর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী কর্তব্য। আজ আমাদের একথা প্রমাণের সময় এসেছে যে, মুসলমানরা কর্তব্য পালনে কতটুকু নিষ্ঠাবান। আমাদের চোখের সামনে দু'টি অসহায় নারীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হবে আর আমরা নিশ্চুপ বসে থাকবো তা হতে পারে না। আশা করি তোমরা এদের ইজ্জত রক্ষায় জীবন বাজী রাখতে পিছপা হবে না। আমি তোমাদের সাথে আছি। এসো এক সাথে পাষণ্ডদের রুখে দাঁড়াই, আল্লাহ্ আমাদের মদদ করবেন।"

আলেম সাথীদের বললেন, "কেউ আবেগপ্রবণ হয়ে তাড়াহুড়ো করো না। আগে ওদের অবস্থা পরখ করে নাও, তারপর সুযোগ মতো আঘাত হানো। ওদের দেখে মনে হয় প্রশিক্ষিত সৈনিক।"

আলেম ও সাথীরা ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন কারামাতীদের তাঁবুর দিকে। ওদের তাঁবুটি ছিল একটা টিলার ঢালে। আলেম টিলার পাশ ঘেঁষে পিছন দিক থেকে দেখে নিলেন ওদের অবস্থা। মশাল জ্বলছে, কারামাতী চার পাষণ্ড দুর্বাঘাসের উপর বসে মদ গিলছে আর অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ছে। তরুণী দু'জন সম্পূর্ণ নিরাবরণ। মদের সুরাহী ওদের হাতে। যেই ওদের পানপাত্র খালি হয়ে যাচ্ছে মেয়ে দু'টো আবার ঢেলে দিচ্ছে। কারামাতীরা মদে অভ্যস্ত। এই মদ ও পানপাত্র ওদের সাথেই ছিল কিন্তু নিজেদের মুসলমান বুঝাতে এরা গতদিন মদ বের করেনি।

দীর্ঘক্ষণ আলেম ও সাথীরা কারামাতী হায়েনাদের অপকর্ম দেখলেন। যুবতী দু'টোকে নিয়ে এরা কাবাবের মতো টানাটানি করছে। একজন ছেড়ে দিচ্ছে তো আরেকজন আবার কোলে টেনে নিচ্ছে। সেই তালে চলছে সুরাপান। এক পর্যায়ে কারামাতী কমান্ডার উঠে দাঁড়িয়ে গেল। বেশি মদ পানের কারণে ওর পা দুটো

টলছিল। দাঁড়িয়ে নিজের কাপড় খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল কমান্ডার। আর একটি মেয়েকে পাঞ্জায় নিয়ে ঘাসের উপর শুইয়ে দিয়ে হামলে পড়ল তার উপর। আলেম সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আঘাত হানো।"

সাথীরা সবাই এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কারামাতীরা ছিল মদে চুরচুর। আঘাত প্রতিরোধের কোন সুযোগ পেল না কেউ। আলেমের তরবারীর প্রথম আঘাতেই কমান্ডারের মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে তরুণীকে নিয়ে কারামাতী কমান্ডার আদিমতায় মেতে উঠেছিল সে একটা চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কারামাতীর রক্তে স্নাত হয়ে গিয়েছিল মেয়েটি। আলেমের সাথীরা অন্য তিন নরপশুরও ইহলীলা সাঙ্গ করে দিল।

বেহুঁশ তরুণীর চোখে মুখে পানির ঝটকা দেয়া হলে সে জ্ঞান ফিরে পেল। উভয় তরুণীকে বলা হলো কাপড় পরে নিতে। ঘটনার আকস্মিকতায় ওরা নির্বাক হয়ে পড়েছিল। ওরা ভেবেছিল, চার নরপশুর পাঞ্জা থেকে তারা আরেক দল পাষণ্ডের কব্জায় পড়েছে। কিন্তু তাদের ধারণা পাল্টাতে বেশি সময় লাগল না। অল্প সময়েই তারা বুঝতে পারল, এরা হায়েনারূপী মানুষ নয়, ঘোর এ দুঃসময়ে তাদের জন্যে রহমতের দূত।

আলেম দু' হিন্দু পুরুষকে বললেন, "তোমরা তোমাদের ছিনিয়ে নেয়া মালপত্র মুদ্রা ও অলংকারাদি ওদের আসবাব থেকে বের করে নাও। প্রয়োজনে ওদের উট ঘোড়াসহ সবকিছুই তোমরা নিয়ে যেতে পার।"

হিন্দুরা কারামাতীদের দেহ ও গাঠুরী তল্লাশী করে তাদের সোনা গহনা ও মুদ্রা উদ্ধার করল। আলেম হিন্দু বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, "এতো স্বর্ণমুদ্রা ও অলংকার নিয়ে প্রহরী ও সওয়ারী ছাড়া এ পথে পা বাড়ালে কেন?"

হিন্দু বৃদ্ধ জানাল, "মুসলমান বিজয়ীরা বেরা থেকে কোন হিন্দুকেই বাইরে যেতে এবং ভেতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। তাই আমাদের লুকিয়ে ছাপিয়ে আসতে হয়েছে। কোন সওয়ারী সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।"

"এখন তোমরা আমাদের হেফাযতে থাকবে। তোমরা ইচ্ছা করলে আমাদের সাথে বেরায়ও ফিরে যেতে পার, আর চাইলে আমরা তোমাদেরকে মুলতান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি।" বললেন আলেম।

বৃদ্ধ হিন্দু কিছু স্বর্ণমুদ্রা ও অলংকার আলেমের সামনে রেখে বলল, "এখন যেহেতু আমরা উট ও ঘোড়া পেয়ে গেছি, মুলতান যেতে আর অসুবিধা হবে না। আপনারা আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছেন। মেহেরবানী করে এই নজরানা কবুল করলে কৃতজ্ঞ হবো।"

"হু, তোমরা কি আমাদেরকে ভাড়াটে খুনী ভেবেছো!" ক্ষুব্ধকণ্ঠে গর্জে উঠলেন আলেম। "সম্পদের লিপ্সা থাকলে তরবারীর আঘাতে তোমাদের সবকিছু আমরা ছিনিয়ে নিতে পারতাম। এসব রাখো। আজ রাত আমাদের এখানে আরাম করো। তরুণীদের ঝর্ণায় নিয়ে গা ধুইয়ে আনো। জানোয়ারটার রক্তে ওদের শরীর মেখে গেছে।"

আলেম ও সাথীদের এই সৌজন্য ব্যবহার ছিল হিন্দুদের কাছে অকল্পনীয়। আলেম একথা বলার পর যুবকটি তরুণী দু'টিকে ঝর্ণায় নিয়ে গেল রক্ত মাখা শরীর পরিষ্কার করাতে।

আলেম হিন্দু বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, "বেরার অবস্থা কি?" বৃদ্ধ বলল, "বেরার অবস্থা খুবই শোচনীয়। বেরার বাইরে হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধে উভয় বাহিনীর অর্ধেকের বেশি সৈন্য মারা গেছে। রাজা বিজি রায় আত্মহত্যা করেছেন।" বৃদ্ধ আরো বলল, "মুসলমান সৈন্যসংখ্যা এখন এতো কম যে যদি কোন বহিঃশত্রু আক্রমণ করে বসে তাহলে সুলতান মাহমূদ বেরাকে রক্ষা করতে পারবেন না।"

"কার পক্ষ থেকে আক্রমণ আশঙ্কা রয়েছে?"

"আক্রমণ করলে রাজা আনন্দ পাল করতে পারেন। শুনেছি, পেশোয়ারের কাছে আনন্দ পাল সুলতান মাহমূদের অগ্রাভিযান রুখে দেয়ার জন্যে পথ রোধ করেছিলেন। কিন্তু সুলতানের বাহিনী নদী পেরিয়ে আনন্দ পালের সৈন্যদেরকে এভাবে ঘিরে ফেলে যে বহু কষ্টে জীবন নিয়ে পালিয়ে গেছেন আনন্দ পাল। এখন রাজধানীতে রাজা আনন্দ পালের ছেলে শুকপাল রয়েছে। ইচ্ছে করলে সে বেরা আক্রমণ করতে পারে।"

"আচ্ছা! আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?" আলেমকে জিজ্ঞেস করল হিন্দু বৃদ্ধ।

"মুলতান থেকে এসেছি আমরা। আমরা মুলতানের অধিবাসী।"

"তাহলে তো আপনারা অবশ্যই কারামাতী। আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।"

"না, আমরা কারামাতীদের দুশমন। তুমি আমাদের সাথে নির্ভয়ে কথা বলতে পার, আমরা তোমাদের নিরাপত্তার ওয়াদা করেছি। তোমাদের কোন ক্ষতি করবো না, ক্ষতি করতেও কাউকে দেবো না।" বললেন আলেম।

আলেমের কথা শুনে ম্লান হয়ে গেল হিন্দু বৃদ্ধের চেহারা। আলেম লক্ষ্য করলেন, বয়স্কা মহিলাকে এই লোকটি নিজের স্ত্রী পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু দেখে

মনে হয় না এরা স্বামী-স্ত্রী। ইতোমধ্যে ঝর্ণা থেকে রক্তমাখা শরীর পরিষ্কার করে হিন্দু যুবকের সাথে ফিরে এসেছে দু' যুবতী। আলেম গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলেন ওদের। যুবকটির চেহারা ও অবয়বের সাথে তরুণীদের কোন মিল নেই। তরুণী দু'টির রাজকুমারীর মতো অবয়ব। গায়ের রঙও ওদের ফর্সা আর ওদের কথিত মা নিকষ কালো। মা মেয়ে এবং ভাই বোন ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেমন না আছে বয়সের সামঞ্জস্য, না আছে ওদের চেহারার আদল অভিব্যক্তির মিল। বস্তুত বয়স্কা মহিলাটিকে ওদের সেবিকা বলেই মনে হয়। আর যুবকটি ওদের কোন হুকুম বরদার।

"এই মৃত বদমাশগুলো তোমাদের পালিয়ে যেতে দিয়েছিল, আমরা তোমাদের যেতে দেবো না। এদের মতো আমরা তোমাদেরকেও হত্যা করব। আর মেয়ে দু'টিকেও নিয়ে যাবো। এই মহিলাকে রেখে যাবো এখানেই। যেন কোন হিংস্র জানোয়ার ওকে খেয়ে ফেলে। যদি আমাদের মিথ্যা বলো, তোমাদের এই পরিণতিই বরণ করতে হবে। আর যদি সত্য কথা বলো, তাহলে তোমাদের সসম্মানে গন্তব্যে পৌছে দেয়া হবে। এই মেয়ে দু'টি তোমার কন্যা নয়, আর এই যুবক ওদের ভাই নয়, এই মহিলাও ওদের মা নয়। ঠিক নয় কি? আমরা তোমাদের জীবন বাঁচিয়েছি, তোমাদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌছে দেয়ার ওয়াদা করেছি অথচ তোমরা আমাদের সাথে মিথ্যা পরিচয় দিচ্ছো। তোমরা কি বলোনি, কারামাতীরা তোমাদের সুহৃদ?"

আলেমের কথায় পাণ্ডুর হয়ে গেল হিন্দু বৃদ্ধের চেহারা। সে বলল, হ্যাঁ, বলেছিলাম। ওদেরকে এ কথা বলার কারণেই ওরা আমাদের ছেড়ে দিয়েছিল।

"দেখো, রাজা-বাদশাহ-যুদ্ধ-ক্ষমতা এসবের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা ব্যবসায়ী, ব্যবসা আমাদের পেশা। তোমরা সঠিক পরিচয় দিলে আমরা আমাদের কৃত অঙ্গীকার পালন করবো।"

আপনারা আমাদের জীবন রক্ষা করেছেন। আমাদের বখশিশ পর্যন্ত নেননি। আমাদের মুখে সত্য কথা শুনে যদি আপনারা খুশি হন তবে মনে করব আপনাদের কিছুটা হলেও কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পেরেছি। তাহলে শুনুন, আমি এদের পিতা নই, ওই বয়স্কা মহিলাও এদের মা নয়। আসলে এই তরুণী দু'জনের সেবিকা সে। যুবকটি এদের সেবক।

"সত্য ঘটনা বলো। অবশ্যই বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে তোমরা মুলতান যাচ্ছিলে?" জিজ্ঞেস করলেন আলেম।

“আপনার ধারণা ঠিক। আমরা মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসরের কাছে এ পয়গাম নিয়ে যাচ্ছিলাম যে, সুলতান মাহমূদের কাছে এখন সৈন্যসংখ্যা খুবই কম। দাউদ যদি এ মুহূর্তে বেরা আক্রমণ করে তাহলে সুলতান মাহমূদ বেরা কব্জায় রাখতে ব্যর্থ হবে। কারণ, দাউদ যদি বেরা ঘেরাও করে তাহলে বেরাতে যে তিন হাজার হিন্দু সৈনিক বন্দী রয়েছে এবং মন্দিরগুলোতে যেসব হিন্দু যোদ্ধা লুকিয়ে রয়েছে এবং যেসব হিন্দু নাগরিক সুলতানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুযোগে নিজের বাড়িঘরে রয়েছে সবাই একসাথে বিদ্রোহ করে সুলতানের মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃআক্রমণের মুখে মুষ্টিমেয় সৈন্য দিয়ে কিছুই করতে পারবে না সুলতান। সুলতানকে পরাজিত করার এ এক মোক্ষম সুযোগ। আমরা এ সংবাদ নিয়েই মুলতান যাচ্ছিলাম।”

“তোমাদেরকে কে পাঠিয়েছে?”

“পরাজয়ের পর বিজি রায়ের সেনাবাহিনীর কয়েকজন শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে। আমি বিজি রায়ের সরকারের মন্ত্রী ছিলাম। অন্যান্যের মতো আমিও মন্দিরে আত্মগোপন করেছিলাম। মন্দিরেই আমরা গোপনে সলাপরামর্শ করে ঠিক করি, এ মুহূর্তে যে করেই হোক দাউদ বিন নসরকে বেরা আক্রমণে রাজি করানো জরুরী। সবাই মিলে আমাকেই এ কাজে প্রতিনিধিত্ব করতে সাব্যস্ত করলেন। দাউদের জন্য উপহার হিসেবে সোনা গহনা, মুদ্রা ছাড়াও দেয়া হলো এই মেয়ে দু'টিকে। এরা রাজমহলের প্রশিক্ষিত রক্ষিতা। নারী, সম্পদ ও ক্ষমতার প্রতি আজন্ম লিপ্সা দাউদের। ওর এ চরিত্রের কথা ভালভাবে জানে হিন্দুরা। তাই দাউদের সাথে তারা অর্থ ও নারীর ভাষায়ই কথা বলে। এই মেয়ে দু'টি বিজি রায়ের পরাজয়ের পর মন্দিরেই আত্মগোপন করেছিল। তাদেরকে বহু বলে কয়ে বুঝানো হলো যে, তাদেরকে দাউদের কাছে একটি মিশনে পাঠানো হচ্ছে। তারা নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়ে যে ভাবেই হোক দাউদকে যেন বেরা আক্রমণে রাজী করায়। হৃতরাজ্য উদ্ধার ও ধর্মের খাতিরে মেয়েরাও রাজী হয়।

আপনি যেসব সোনা গহনা দেখেছেন, এগুলো ছাড়াও আমাদের কাছে আরো মণিমুক্তা রয়েছে। এগুলো ডাকাতরা খুঁজে পায়নি। আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, আমাদের কাছ থেকে কিছু সম্পদ আপনারা রেখে দিন। আপনারা আমাদের জীবন রক্ষা করেছেন।” বলল হিন্দু বৃদ্ধ।

“আলেম বৃদ্ধকে ধমকের সুরে বললেন, তোমাকে নিঃশেষ করে দিচ্ছি, সোনা গহনা টাকার কথা আমার সামনে আর বলবে না। এসবের প্রতি আমাদের লোভ

নেই। রাজ্য রাজা আর যুদ্ধের যে কাহিনী বলছো, তাতেও আমাদের কিছু যায় আসে না। আমাদের কাছে বড় বিষয় হলো, তোমাদেরকে নিরাপদে মুলতান পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকার পালন করা। তোমাদের রাজার পরাজয় ও আত্মহত্যার পরও কি তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা পরাজয় মেনে নিতে পারেনি?" বৃদ্ধের অন্তরের আরো গভীর থেকে সত্য বের করার জন্যে কৌশলের আশ্রয় নিলেন আলেম।

"পণ্ডিতেরা হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে ধর্মের অংশ মনে করছেন। পণ্ডিতেরা হিন্দুদের বলছে, মাহমূদ গযনবীর অবস্থান যদি বেরায় মজবুত হয়ে পড়ে তবে শুধু যে আমরা রাজ্যহারা হলাম তাই নয়, গোটা ভারত থেকে হিন্দুত্ববাদ বিলীন হয়ে যাবে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের মতো সারা ভারতে সুলতান মাহমূদও ইসলাম ছড়িয়ে দেবে। তাই মুসলমানদের অগ্রগতি রোধ করা প্রত্যেক হিন্দুর ধর্মীয় কর্তব্য। ধর্মের জন্য প্রত্যেক হিন্দু নারী-পুরুষের জীবন বাজী রাখতে হবে। মুসলমানদেরকে হত্যা করা আজ হিন্দুদের প্রধান পুণ্যের কাজ। আপনি মুসলমান, আপনার কাছে হয়তো আমার কথা পীড়াদায়ক মনে হবে, কিন্তু আমি আপনাকে সত্য বলার অঙ্গীকার করেছি, এজন্য প্রকৃত সত্যই বলে দিলাম। এখন আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের হত্যাও করতে পারেন, ইচ্ছা করলে ছেড়ে দিতে পারেন।"

এই হিন্দু বৃদ্ধ ও যুবক কোন সামরিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক ছিল না, ছিল গোড়া হিন্দু। ধর্মের ভাবাবেগে সোনা গহনা ও তরুণী দু'টিকে সাথে নিয়ে রাস্তার বিপদাপদের কথা না ভেবেই ধর্মীয় মিশনে বেরিয়ে পড়েছিল। সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে এতো সহজে এরা ভড়কে যেতো না এবং ভীত-বিহ্বল হয়ে কঠিন সত্যগুলো এত সহজে প্রকাশ করত না। আলেম ওদেরকে অভয় দিলেন, বললেন, "তোমাদের ভয় নেই, আমরা তোমাদের উপর কোন জুলুম করবো না।" আলেম আরো বললেন, "তোমরা এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারো, আমার লোকেরা তোমাদের পাহারা দেবে।"

এদের কাছে একজন সাথীকে প্রহরায় নিযুক্ত করে অপর দুজনকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে আলেম পরামর্শে বসলেন। দীর্ঘ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন, এদেরকে মুলতানের পথে ছেড়ে দিবেন এবং তারা দ্রুত বেরায় পৌঁছে সুলতানকে জানাবেন মুলতানের অবস্থা। একথাও বলবেন, সুলতান যেন মন্দিরে লুকিয়ে থাকা হিন্দু সৈনিক ও দুষ্কৃতকারী পণ্ডিতদের গ্রেফতার করেন আর বিজি রায়ের ছেলে ও দাউদের আক্রমণ সম্পর্কে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

দরবেশকে অপহরণকারী কারামাতীরা মাঝ রাতে রওয়ানা হয়ে তীব্রগতিতে পথ চলে দিনের শেষ ভাগেই মুলতান পৌছে গিয়েছিল। এরা দরবেশকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় দাউদের সামনে ফেলে দিয়ে বললো, "হুজুর! এই সেই চার-কুমারী দুর্গের ঘাতক। এই লোকটিই সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করে প্রহরীকে হত্যা করেছে।" তারা কিভাবে দরবেশের কাছ থেকে রহস্য জেনেছে এবং তাকে অপহরণ করেছে সবিস্তারে সব জানাল।

দাউদ বিন নসরকে যখন একথা জানাল যে, দরবেশের সাথে আরো চার ব্যক্তি ছিল এবং তারা বেরার পথে রয়েছে। তখন দাউদ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গর্জে উঠল, "ওদেরকেও ধরে নিয়ে আসলে না কেন?"

কমান্ডার শুধু একে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছিল। কমান্ডার এই খুনীর সাথীদের সাথেই বেরা যাচ্ছে।

এ খবর শুনে দাউদ দশ বারোজন চৌকস সৈনিককে শক্তিশালী ঘোড়া নিয়ে দ্রুত দরবেশের অপর সাথীদেরকেও ধরে নিয়ে আসার নির্দেশ দিল। নির্দেশ পেয়েই তারা রওয়ানা হয়ে গেল দরবেশকে অপহরণকারী দুই সৈনিককে সাথে নিয়ে। এরা দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে চোখের পলকে শহর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাতের দ্বিপ্রহর। আলেম ও তার দুই সাথী একজনকে পাহারায় নিযুক্ত করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ অনেকগুলো অশ্বখুরের আওয়াজ শোনা গেল। দ্রুতই শব্দটা এগিয়ে এলো তাঁবুর দিকে। পাহারাদার তার সাথী ও হিন্দুদেরকেও জাগিয়ে দিল। আলেম জেগেই আঁচ করলেন বিপদাশঙ্কা। তিনি দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে মেয়েদেরকে টিলার আড়ালে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে মশালবাহী কয়েকজন অশ্বারোহী এদিকটায় কি যেন খুঁজতে লাগল। যেখানে কারামাতীদের লাশ পড়েছিল মশালের আলোয় নজরে পড়ল ওদের। কাছে গিয়ে ওরা ওদের চেহারা পরখ করে এদিক সেদিক তাকাল। অনতিদূরেই ছিল ওদের উট ও ঘোড়াগুলো বাঁধা। উট ও ঘোড়া দেখে ওদের বুঝতে বাকী রইল না অবশ্যই ধারে কাছে মানুষ রয়েছে। এদের সাথে আরো এসে যোগ হলো আট দশজন অশ্বারোহী। সবাই সমস্বরে হুশিয়ার ধ্বনি দিতে শুরু করল কাউকে না দেখে। চিৎকার করে বললো, যারাই এখানে আছো বেরিয়ে এসো। না হয় কাউকেই জীবিত রাখা হবে না।

কয়েকবার এমন হুমকি দেয়ার পরও যখন কোন সাড়া পেল না তখন খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল। টিলার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল সবাই। প্রথমেই তাদের নজরে পড়ল মেয়ে দু'টি। মেয়ে দু'টিকে তারা ধরে ফেললো। বয়স্ক হিন্দু

দু'জনও বেরিয়ে আসলো আড়াল থেকে। অশ্বারোহীরা বলল, আমরা মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসরের লোক তোমাদের এগিয়ে নিতে এসেছি। কিন্তু দরবেশকে অপহরণকারী দুই কারামাতী বলল, "আমরা যাদের খোঁজে এসেছি, এরা সেই লোক না। ওদের সাথে কোন নারী ছিল না।"

"এদেরকে কারা হত্যা করেছে?" কারামাতীদের লাশের দিকে হিন্দুদেরকে জিজ্ঞেস করল এক অশ্বারোহী।

"আমরা জানি না।" বলল বৃদ্ধ হিন্দু। "আমরা বেরা থেকে এসেছি। দাউদ বিন নসরের জন্য একটি পয়গাম নিয়ে মুলতান যাচ্ছিলাম, আমরা এখানে তাঁবু খাটানোর আগে থেকেই লাশগুলো পড়েছিল।"

"মিথ্যা বলছো তোমরা।" হুমকির স্বরে বলল দলনেতা। "কি পয়গাম নিয়ে মুলতান যাচ্ছো তোমরা?"

"আমাদের মুলতান যেতে দাও, যা বলার তা তোমাদের শাসক দাউদকেই বলব, আর কাউকে বলা যাবে না।" বলল বৃদ্ধা।

এক অশ্বারোহী তাদের বিছানাপত্র দেখে চেঁচিয়ে উঠল। "এখানে তো অনেক বিছানা। লোক তো দেখা যাচ্ছে কম। নিশ্চয়ই আরো লোক এখানে শুয়েছিল, তারা কোথায়?"

"এই মেয়েদের ন্যাংটা করে ফেলো।" নির্দেশ দিল কমান্ডার। "বুড়ো দু'টিকে ঘোড়ার পিছনে বেঁধে টেনে-হেঁচড়ে মুলতান পর্যন্ত নিয়ে যাও। মেয়েদেরকে টিলার আড়ালে নিয়ে চল। দেখবে অল্পের মধ্যে এদের দেমাগ ঠিক হয়ে যাবে।"

মেয়েরা দেখতে পেল দৈত্যের মতো চৌদ্দজন অশ্বারোহী। চার পাঁচজন কমান্ডারের নির্দেশে তাদেরকে ন্যাংটা করতে অগ্রসর হলে মেয়ে দুটো চিৎকার শুরু করল। ততক্ষণ পর্যন্ত হিন্দু বৃদ্ধ ও যুবক আলেম ও তার সাথীদের সম্পর্কে মুখ খুলেনি।

যেই ওরা মেয়েদের কাপড় ধরে টানাটানি শুরু করল তখন আড়াল থেকে আওয়াজ এলো, "সাবধান! মেয়েদের গায়ে হাত তুলবে না, আমাদের গ্রেফতার করতে পার, এদেরকে আমরাই খুন করেছি।"

দৃঢ় পায়ে ওদের সামনে এগিয়ে এলেন আলেম। তিনি মেয়েদের বেইজ্জতি দেখে ওদের সামনে আত্মপ্রকাশ করলেন। সাথীরা তার অনুগামী হলো। আলেম বললেন, "অযথা মেয়েদের উত্ত্যক্ত করো না। তোমাদের শাসকের কাছে নিয়ে চলো আমাদেরকে। যা বলার মুলতানের দরবারেই বলব সব।"

* * *

মুলতানের রাজদরবার। দাউদের রোষাগ্নিতে পতিত দরবেশ। বিস্ময়কর সেই প্রহরী হত্যার নায়ককে নিজেই জিজ্ঞেস করছিল দাউদ।

"তুমি কিভাবে সুড়ঙ্গ পথে ঢুকলে? প্রহরীকে হত্যা করলে কেন?"

"আমি তোমার এই প্রহরীকে হত্যা করেছি একথা প্রমাণ করতে যে, মৃত কুমারীদের জীবন্ত করে উপস্থিত করা এবং জিনকে বেঁধে রাখার ক্ষমতা মুলতান শাসকের নেই।" "দৃঢ়কণ্ঠে দাউদের জবাব দিল দরবেশ। "এ বিষয়টিও আমি প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, এখানে কোন জিন-দানব নেই, কোন ভূত-প্রেতও নেই। কারামাতীদের এই দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং প্রতারণা।"

প্রচণ্ড আক্রোশে দরবেশের চেহারায় একটা চপেটাঘাত করল দাউদ। বলল, "এতো বড় স্পর্ধা! আমার দরবারে দাঁড়িয়ে আমার কেরামত সম্পর্কে কটূক্তি করছো তুমি! তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো! জানো! তোমার জীবন-মৃত্যু এখন আমার হাতের মুঠোয়! আমার হাত থেকে তোমাকে এখন কে বাঁচাবে?"

"মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ আমাকে বাঁচাবেন।" দৃঢ়কণ্ঠে বললেন দরবেশ। "দাউদ! ফেরাউন ক্ষমতার দম্ভে খোদা দাবী করেছিল। তার পরিণতির কথা তুমি জান। তোমার পরিণতি ফেরাউনের চেয়েও ভয়ংকর হবে দাউদ! আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, অচিরেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।"

আবারো কষে একটা থাপ্পড় মারল দাউদ। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল, "আমার পায়ের নীচের একটি পিঁপড়ার চেয়েও নিকৃষ্ট তুমি। তোমার সাথে তর্ক করতেও আমার ঘৃণা হয়। একথা তোমাকে বলতেই হবে, তোমার সাথে কে কে ছিল এবং বেরায় কোন উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলে?"

"আমি একা। আল্লাহ্ ছাড়া আমার আর আপন কেউ নেই।" বলল দরবেশ। "তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হলো, আমি বেরা যাচ্ছিলাম ঠিক তবে কেন যাচ্ছিলাম তা কখনও বলবো না।"

"তোমরা মাহমূদ গযনবীকে একথা বলতে যাচ্ছিলে যে, সে যেন মুলতান দখল করে কারামাতী শাসন ধ্বংস করে দেয়।" বললো দাউদ। "তুমি তো আমার কারামাতী দেখলে, তুমি বিজন প্রান্তরে একটা কথা বললে আর এতো দূরে থেকেও আমরা তা জেনে গেছি। তুমি আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে পস্তাবে। তোমার হাড্ডি থেকে আমরা গোশ্‌ত আলাদা করে ফেলব। একটু পরে তুমি চিৎকার করে আমার কথার জবাব দেবে কিন্তু তখন আর তোমার জবাব আমরা শুনবো না। আজ রাত তোমাকে চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ দেয়া হলো। কয়েদখানায় বসে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা কর। আগামীকাল তোমাকে জবাব

দিতে হবে, তোমার সাথে আর কে কে ছিল। সুড়ঙ্গ পথে তুমি কিভাবে প্রবেশ করেছিলে এবং সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা মুলতানে কতজন আছে এবং এরা কোথায় থাকে?"

"ঠিক আছে, এসব প্রশ্নের জবাব না হয় আগামীকালই শুনবে। কিন্তু আজ শুনে রাখো, ক্ষমতার তখ্ত কারো জন্যে স্থায়ী নয়। ক্ষমতার মোহে পড়ে পৃথিবীতে বহু লোক ধ্বংস হয়েছে। তোমার মতো লোকেরা ক্ষমতার মসনদে বসে যখন মাথায় রাজমুকুট পরে তখন আল্লাহ্র ক্ষমতার কথাটি ভুলে যায়। তোমার মতো শাসকেরাই ক্ষমতায় বসে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়, জুলুম-অত্যাচার চালায়। কিন্তু আল্লাহকে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না। আল্লাহ্ সব সময় মজলুমদের পক্ষে, জালেমদের বিরুদ্ধে। তুমি মিথ্যা পয়গাম্বরী দাবী করে আল্লাহ্র সত্যধর্ম ইসলামকে বিকৃত করেছো, স্বাধীন মানুষকে দাসে পরিণত করেছো। ধর্মের আশ্রয়ে নারীদের সম্ভ্রম লুটে নিয়ে তুমি ধর্মকে কলংকিত করেছো। তোমার মিথ্যা প্রকাশ করে দেয়ার জন্যই আমি সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করে তোমার নিযুক্ত প্রহরীকে খুন করেছি। তুমি মহাপাপী। তোমার পাপ আল্লাহ্ কখনও ক্ষমা করবেন না।"

গর্জে উঠল দাউদ। "নিয়ে যাও একে! বন্দিশালায় আটকে রাখো।"

কয়েকজন রক্ষী দৌড়ে এসে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলল দরবেশকে। দরবেশের ভরাট কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল, "দাউদ! তোমার মিথ্যা দাবী ও পাপাচারের দিন শেষ। তোমার মসনদের উপরে আমি জহরের বজ্রপাত দেখতে পাচ্ছি ...! দাউদ, আল্লাহ্র গজবকে তুমি বন্দী করতে পারবে না। আল্লাহ্র গজব তোমাকে ধ্বংস করবেই।"

"জাঁহাপনা! আমাকে অনুমতি দিন ওর ধৃষ্টতা জীবনের জন্যে খতম করে দেই।" দাউদকে নিশ্চুপ দাঁড়ানো দেখে বলল এক দরবারী। সে আরো বলল, "কারামাতী আদর্শের অপমান আপনাকে নীরবে সহ্য করতে দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি জাঁহাপনা!"

"মুলতানে আমার হাজারো শত্রু বেড়ে উঠেছে। আমার আস্তিনের মধ্যে রয়েছে কালসাপ। ওর কাছ থেকে আমাকে জানতে হবে, কে কোথায় রয়েছে। নয়তো একে তো আমি দরবারেই শেষ করে দিতে পারতাম।"

"এর সাথে যারা ছিল তারাও হয়তো ধরা পড়বে।" বলল এক দরবারী।

"উধাও হয়ে যেতে পারে।" বলল দাউদ। এদের চেয়েও আমার দৃষ্টি এখন মাহমূদের দিকে। মাহমূদের গতিবিধি সম্পর্কে বেরা থেকে একটা নিশ্চিত খবর

পাওয়া খুব জরুরী। তার এক সেনাপতিকে হাত করে আমরা ফাঁদে ফেলতে পেরেছিলাম, কিন্তু আমাদের সে ধোঁকা ব্যর্থ হয়ে গেছে। খবর পেয়েছি, আমাদের নীল নক্শা ফাঁস হওয়ার ফলে সে আত্মহত্যা করেছে। বিজি রায় পরাজিত হয়ে আত্মাহুতি দিয়েছে। মাহমূদ গযনীর হাতে সৈন্য কম বলেও তার মাথায় বুদ্ধি আছে। অথচ হিন্দুস্তানে সৈন্যের অভাব নেই কিন্তু বুদ্ধির ঘাটতি রয়েছে প্রচুর।"

সুলতান মাহমূদ বেরা জয় করে বিজয়ের তৃপ্তির চেয়ে প্রকট সৈন্য ঘাটতিতে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। সাম্রাজ্য বিস্তার তার নেশা নয়, ধন-সম্পদ, মণি-মুক্তা অর্জনের লোভও তার নেই। বেরা ছিল হিন্দুস্তানের মূল ভূখণ্ডের প্রথম শহর। বেরায় মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যাও খুব কম ছিল না কিন্তু অধিকাংশ মসজিদ মন্দিরে রূপান্তরিত দেখে তার অন্তর কেঁদে উঠেছিল। তিনি বেরার কোথাও ইসলামের কোন অবিকৃত চিহ্ন দেখতে পেলেন না।

বেরা দখলের পর সর্বপ্রথম পণ্ডিতদের দল সুলতানকে স্বাগত জানাতে আসল। পণ্ডিতরা সুলতানের সামনে এসে দু' হাত জোড় করে প্রথমে তাকে নমস্কার জানাল এরপর কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে প্রণাম করল। বিজয়ের পর পেশোয়ারের পণ্ডিতরাও এভাবেই তাকে অভিবাদন জানিয়েছিল। সুলতানকে সিজদা করতে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন; ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, "দাঁড়াও তোমরা! আমি খোদা নই। এভাবে কোন মানুষকে সিজদা করা এবং সিজদা গ্রহণ করা শির্ক। আমি তোমাদের শহর দখল করেছি বটে কিন্তু শহরের অধিবাসীদের প্রভু হয়ে যাইনি। আমাদের ধর্মে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা হারাম। তোমরা আমাকে গুনাহগার করছো। তোমরা কি বলতে চাও, তা বল।"

"জাঁহাপনা! আমরা আপনার কাছে আমাদের জীবন ও মন্দিরের মর্যাদা ভিক্ষা চাচ্ছি।" দু'হাত জোড় করে নিবেদন করল পণ্ডিতগণ।

"এখানকার মসজিদগুলোর যে সম্মান তোমরা দিয়েছো, মন্দিরের সে রকম মর্যাদাই কি তোমরা চাও?" পণ্ডিতদের বললেন সুলতান। "তোমরা যেমন এখানকার মুসলমানদের মর্যাদা দিয়েছিলে সে রকম মর্যাদা কি তোমরা চাচ্ছো? তোমাদের রাজমহল থেকে হিন্দু নারীর চেয়ে মুসলমান মেয়েই বেশি উদ্ধার করা হয়েছে। তোমরা যদি ধর্মের খাঁটি অনুসারী হতে তাহলে মেয়েদের এভাবে বেইজ্জতি বরদাশ্ত করতে না। নারীর ইজ্জত সম্ভ্রম লুণ্ঠন করাই কি তোমাদের ধর্ম?"

"মহামান্য মহারাজ! আমাদের করার কিছুই ছিল না।" বলল বড় পণ্ডিত। "আমাদের দেশে মহারাজার হুকুম ধর্মের বিধানের মতোই পালনীয়।"

"তবে তোমাদের দেশে ধর্ম মহারাজার গোলাম। আর তোমাদের মতো যারা ধর্মের কাণ্ডারী, ধর্মের পাহারাদার তারা ধর্মকে মহারাজাদের পায়ের নীচে সোপর্দ করেছো।" বললেন সুলতান। পণ্ডিত ও দুভাষীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তার একান্ত এক সেনাধ্যক্ষকে বললেন, "আমাদের ধর্মের বহু শাসক ও আলেমদের মধ্যেও এ ব্যাধি রয়েছে। আমাদের শাসকশ্রেণী, আমীর, শরীফ ও ধর্মীয় পণ্ডিতেরাও নিজেদের অপকর্ম আড়াল করতে ধর্মকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। শাসকরা নিজেদের অপকর্ম আড়াল করতে নিজেদেরকে ইসলামের খাদেম বলে দাবী করে।"

"মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসরও এই ব্যাধিতে আক্রান্ত।" বললো সেনাধিনায়ক।

সুলতান ও সেনাধিনায়কের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল ফারসী ভাষায়। বেরার পণ্ডিতেরা ফারসী জানতো না। তাই তাদের পক্ষে সুলতানের কথা বুঝার কোন উপায় ছিল না।

সুলতান দোভাষীর মাধ্যমে বললেন, পণ্ডিতদের বলে দাও, তোমাদের দেবদেবী যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তাদের বল তোমাদের জীবন, মান-সম্মান ও ধর্মকে যেন তারা রক্ষা করে। দেব-দেবীদের বলো, তারা নিজেদের রক্ষা করুক। আমি গুনাহগার বলছি, তোমাদের দেবদেবীগুলোকে যদি মন্দির থেকে বাইরে ফেলে দেই, তোমরা দেখতে পাবে, একজন গুনাহগার ব্যক্তির হাত থেকেও এরা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না। ওরা আবার মানুষের অপরাধের শাস্তি দিবে কিভাবে?

দোভাষী যখন স্থানীয় ভাষায় পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে সুলতানের কথা ব্যক্ত করল, পণ্ডিতদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল।

সুলতান বললেন, "আমি জানি, ধর্মের বরকন্দাজ সেজে মন্দিরগুলোতে তোমরা কতো জঘন্য অপকর্ম কর। তোমাদের ধর্মের মেয়েরাই তোমাদের ইবাদাতখানাগুলোতে সম্ভ্রম নিয়ে বাঁচতে পারে না। এজন্যই কি তোমরা কাদা-মাটি, ইট-পাথর দিয়ে দেবদেবী বানিয়ে রেখেছো, যাতে ওরা তোমাদের কোন অপকর্মে বাধা দিতে না পারে? তোমরা আমার কাছে তোমাদের ইজ্জত, সম্পদ ও মর্যাদা রক্ষার আবেদন নিয়ে না এলেও আমি কোন নারীর ইজ্জত ও কোন নাগরিকের জীবন সম্পদের ক্ষতিসাধন হতে দিতাম না। বেকসুর মানুষের জীবন সম্পদ রক্ষা করা আমার আল্লাহ্র হুকুম। আমাকে এসব থেকে আল্লাহ্

বিরত রাখেন। আল্লাহ্র নির্দেশ পালনেই আমি এখানে এসেছি। সব কাজ আমি আল্লাহ্র বিধান মতো সম্পাদন করার চেষ্টা করি।"

চকিতে দোভাষীর দিকে ফিরে সুলতান বললেন, "ওইসব পণ্ডিতদের তুমি জিজ্ঞেস কর, ওরা মন্দিরের ভেতরে পালিয়ে আসা হিন্দু সৈনিক, মন্ত্রী ও বড় বড় কর্তাব্যক্তিদের লুকিয়ে রাখেনি তো? ওদের জিজ্ঞেস কর, মন্দিরের ভেতরে বসে পণ্ডিতেরা আমাদের বিজয়কে নস্যাত করার জন্যে চক্রান্ত করবে না এমন গ্যারান্টি কি তারা দিতে পারবে?"

"না মহারাজ!" দোভাষীর কথা শুনে হাতজোড় করে বলল বড় পণ্ডিত। "আমরা আপনার গোলাম। মন্দিরে আপনার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে না।"

"ওরা কোথায়?" ডানে বামে তাকিয়ে বললেন সুলতান। "যাদেরকে লাহোরের পথ থেকে ধরে আনা হয়েছে ওদেরকে এখানে হাজির কর।" একটু পরেই পিঠমোড়া করে হাত বাঁধা দু'জনকে দরবারে হাজির করা হলো।

পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে সুলতান বললেন, "তোমরা কি চেন এদের?" বন্দীদের বললেন, "তোমরা এদেরকে বল কেন তোমাদের গ্রেফতার করা হয়েছে?"

"এই পণ্ডিতরাই আমাদেরকে লাহোর পাঠিয়েছিল। লাহোরের রাজা আনন্দ পালের পুত্র শুকপালের কাছে পণ্ডিতেরা আমাদেরকে এ সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছিল যে, বেরা বিজয়ী সুলতান মাহমূদের সৈন্যবল একেবারেই কম। এখনই বেরা আক্রমণ করে বিজি রায়ের পরাজয় ও আনন্দ পালের পলায়নের প্রতিশোধ নিতে তারা শুকপালের বেরা আক্রমণের জন্যে অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। এরা আমাদের কাছে বলে দিয়েছিল, বেরায় যে বিপুল পরিমাণ হিন্দু সৈনিক বন্দী হয়েছে, আক্রমণ হলে তারা বিদ্রোহ করে সুলতানের বাহিনীর জন্যে ভয়ংকর হয়ে উঠবে।"

নিজ নিজ অপরাধের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিল দুই কয়েদী।

"সন্দেহজনক অবস্থায় এদেরকে আমার সৈন্যরা পথ থেকে গ্রেফতার করেছে।" বললেন সুলতান। "আমরা এ কথাও জানতে পেরেছি, তোমরা মুলতানে দাউদের কাছেও এ ধরনের খবর পাঠিয়েছ।"

"তোমরা আমার কাছে জীবনের নিরাপত্তা চাইতে এসেছো। হে মূর্তিপূজারীরা! মনে রেখো, তোমরা আমার সৈন্যদের অগ্রাভিযান রুখতে পারবে না। তোমাদের দেব-দেবীদের বলো না, তারা আমার বিজয়কে নস্যাৎ করে দিক। তোমরা যেমন মিথ্যুক, প্রতারক, তোমাদের দেব-দেবী বিশ্বাসও ভিত্তিহীন

কাল্পনিক। তোমাদেরকে আমি এতটুকু সুযোগ দিতে পারি, তোমরা তোমাদের মূর্তিগুলো কাঁধে নিয়ে শহর থেকে চলে যাও। অন্যথায় তোমাদের স্বধর্মীয় বন্দীদের দিয়েই আমি এগুলো গুড়িয়ে দেবো। আমি যে সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছি তা যদি গ্রহণ কর তবে নিরাপদে সসম্মানে এখানে বসবাস করতে পারবে। তোমরা তো কায়া ও দেহ পূজারী; এসব ত্যাগ করে এখন রূহ ও আত্মাকে সমৃদ্ধ কর, আল্লাহ্র দেয়া নেয়ামত আত্মাকে খোরাক দাও। এতো দিনতো শুধু দেহের স্বাদ মেটালে এখন আত্মার স্বাদ মেটাও। সম্পদ, অর্থ আর সোনা-দানাতো খুব জমিয়েছো। এসবের মধ্যে সুখ নেই। আল্লাহ্র রহমতের সুখে সুখী হও। যাও! আমার প্রস্তাব গ্রহণ করবে কি-না চিন্তা করে দেখো, এরপর আমাকে জবাব দাও।"

পণ্ডিতরা হতাশ হয়ে চলে গেলে সুলতানকে একজন আলেম বলল, "মাননীয় সুলতান! এরা গোড়া হিন্দু। এরা আপনার কাছে ইসলাম গ্রহণ করতে আসেনি, এসেছে আপনাকে ধোঁকা দিতে। এরা দেহ পূজারী, নিজেদের স্বার্থে এরা ধর্মকে ব্যবহার করছে।"

"ব্রাহ্মণরা ইসলামের ঘোর শত্রু। এরা জানে, ইসলামে জাত-পাত নেই, উঁচু-নীচু নেই। সবাই সমান। কিন্তু এরা ধর্মের নামে সমাজে শ্রেণীবৈষম্য তৈরি করে রেখেছে। এরা জানে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের প্রভুত্ব শেষ হয়ে যাবে।"

এই আলেমের নাম হলো সাঈদুল্লাহ। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী। সেই সময়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমের উত্তরসূরীদের মধ্যে যে স্বল্পসংখ্যক পরহেযগার লোক এ অঞ্চলে ছিলেন তন্মধ্যে সাঈদুল্লাহ উল্লেখযোগ্য। সুলতান মাহমূদের বেরা বিজয়ের খবর শুনে তিনি তাকে স্বাগত জানাতে হাজির হন। সুলতান মাহমূদ আলেম ও জ্ঞানীদের সম্মান করতেন। তাঁর দরবারে আলেমগণ সব সময়ই কদর পেতেন।

মৌলভী সাঈদুল্লাহ সুলতানকে বললেন, "এ অঞ্চলে মুহাম্মদ বিন কাসিমের একজন অনুসারী দীর্ঘদিন ধরে এমন অভিযানের জন্যে অধীর অপেক্ষা করছে। তাদের প্রত্যাশা ছিল, কোন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম নেতা যদি এ অঞ্চলে অভিযান চালায় তবে তারা জীবনবাজী রেখে বেঈমান কারামাতী ও হিন্দু-মুশরিকদের পদানত করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে, যাতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের হৃতগৌরব পুনরুজ্জীবিত করে আবার এ অঞ্চলকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আনা যায়।

মাননীয় সুলতান! হিন্দুরা স্বভাবজাত ধোঁকাবাজ। ব্রাহ্মণরা নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে হেন কোন অপকর্ম ও অপকৌশল নেই যা তারা করতে পারে না। আপনি দেখলেন তো, একদিকে ওরা আপনাকে পরাজিত করতে চক্রান্তের জাল বিছিয়েছে, অপরদিকে আপনার দরবারে এসে আপনার পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রাণভিক্ষা চাইছে। এদেরকে বিশ্বাস করা কঠিন। দৃশ্যত আনুগত্যের ভান করবে কিন্তু অন্তরালে আপনার প্রশাসনকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য ইঁদুরের মতো কাটতে থাকবে। এরা ইসলাম গ্রহণ করলেও দুশমনী ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। ভেতরে ভেতরে ঘুণের মতো মুসলিম শাসনকে দুর্বল করতে থাকবে। ফোকালা করে দেবে আপনার প্রশাসনকে।"

"আমাদের শক্তির খুঁটি ও শিকড় তো আমাদের জাতি-ভাইয়েরাই কাটছে। ক্ষমতালিপ্সু ও দুর্নীতিপরায়ণ মুসলিম শরীফ শ্রেণীই তো আমাদের প্রশাসনকে ফোকলা করে দিচ্ছে। পারস্পরিক ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ অমিত সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। যে সৈন্যদের কর্তব্য ছিল মুশরিক পৌত্তলিকদের নির্মূল করা, তারা ভ্রাতৃঘাতি লড়াইয়ে নিজেদেরকে ধ্বংস করছে। আপনি দেখুন, এ অঞ্চলের সব মুসলিম রাজ্য ও সৈনিক যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তবে এক অভিযানেই সারা ভারত জয় করা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, রাজধানী থেকে দূর অভিযানে বেরুলে সব সময় আমি উৎকর্ণ থাকি কখন না খবর আসে, প্রতিবেশী কোন মুসলিম শাসক গযনী আক্রমণ করেছে। আমাদের জ্ঞাতি শাসকরা ঈমান আমল নিলাম করে ফেলেছে। রাসূল আকরাম (সা.) যাদের হাতে ইসলাম রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, যারা মুসলিম সেনাদের পৃষ্ঠপোষকতা করার কথা তারা নিজেরাই ঈমান বিক্রি করে দিয়েছে। এরা শির্ক নির্মূল করার পরিবর্তে শিরকের পৃষ্ঠপোষকতা করছে।"

"মাননীয় সুলতান! আপনাকে আমরা এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, দীর্ঘদিন ধরে বৈরী শক্তির মোকাবেলা ও অমুসলিম শাসনাধীনে থেকেও ঈমানকে আমরা বুকে পুষে রেখেছি, আপনি এখান থেকে চলে গেলেও মুসলমানের ঈমান রক্ষার জিহাদ আমরা অব্যাহত রাখবো। ইনশাআল্লাহ্।"

"এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ঈমান ব্যাপারী তো মুলতানের ক্ষমতার অধিকারী দাউদ। সে তো রীতিমতো ঈমান বিক্রির মেলা বসিয়েছে।"

"জ্বী হ্যাঁ, আমরা শুনেছি, মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসর ও হিন্দুরা মিলে সাংঘাতিক চক্রান্ত করছে, মুসলমানরা দলে দলে ঈমানহারা হচ্ছে।"

"সেই খৃস্টানের দেমাগের প্রশংসা করতেই হয়, হতভাগা মুসলমানদের ঈমান হরণের সাংঘাতিক এক ফেরকা তৈরি করেছে। যারা কারামাতী নামে মুসলিম পরিচয় দিয়ে বেঈমানীর বাজার গরম করেছে। দাউদ কারামাতীর ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম কর্ম নিয়ে ওর কোন মাথাব্যথা নেই। তার সবচেয়ে বড় চাহিদা ক্ষমতা আর ভোগ-বিলাসিতা।"

* * *

এদিকে আলেম ও তার সাথীদের বন্দী করে ফেলল কারামাতীরা। আলেম দেখলেন, চৌদ্দজন সৈনিকের সাথে মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হওয়া মানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। এর চেয়ে ওদের অপকর্ম সম্পর্কে দাউদকে বললে হয়তো একটা সুরাহা হবে। তাই তিনি মোকাবেলা না করে স্বেচ্ছায় গ্রেফতারী বরণ করে নিলেন। সাথীরাও তার অনুগামী হলো।

কারামাতী সৈনিকরা তাদের হাত বেঁধে ফেলল। হিন্দু কাফেলাসহ সবাইকে নিয়ে রওয়ানা হলো মুলতানের উদ্দেশে।

দিনের অপরাহ্নে মুলতানের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল তারা। লোকজন দেখতে পেল চৌদ্দজন সৈনিকের একটি কাফেলা। তাতে তিনজন নারী দু'জন হিন্দু এবং চারজন বন্দী। বন্দীদের হাত বাঁধা। দর্শকরা আশ্চর্য হলো আলেমকে দেখে। কারণ, মুলতানে তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। আলেমের সাথী যুবকরাও অনেকের পরিচিত। কি বিস্ময়! তাদেরকে সৈনিকেরা হাত বেঁধে আনল কোত্থেকে? কি অপরাধ করেছে এরা?

যারাই এই কাফেলাকে দেখছিল, আলেমকে বন্দী দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করছিল, "এরা কি করেছে, বন্দী করা হলো কেন?"

"হত্যা! এরা হত্যা করেছে?" বলল এক সৈনিক।

"কাকে হত্যা করেছে?"

"সেনাবাহিনীর লোক হত্যা করেছে।"

"আমরা সৈন্য হত্যা করিনি ডাকাত হত্যা করেছি।" চিৎকার দিয়ে বললেন আলেম।

"আমরা এই মহিলার সম্ভ্রম হরণকারী চার কারামাতীকে হত্যা করেছি।" উচ্চ আওয়াজে বলল বন্দী এক যুবক।

"চুপ কর!" ধমকে বলল এক সৈনিক।

"আল্লাহ্‌র আওয়াজকে তোমরা শক্তি দিয়ে বন্ধ করতে পারবে না।" চিৎকার দিয়ে বলল অপর বন্দী যুবক।

অবস্থা বেগতিক দেখে সৈনিকরা তাদেরকে পেটাতে শুরু করল। তারাও আর উচ্চবাচ্য করল না।

দাউদকে খবর দেয়া হলো, দরবেশের সাথীদের গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। আরো বলা হলো, আমাদের যে চার গোয়েন্দা বেরা যাচ্ছিল দরবেশের সাথীরা তাদেরকে খুন করেছে। সেই সাথে এ খবরও দেয়া হলো, দু'জন পুরুষ ও তিনজন হিন্দুর একটি কাফেলা বেরা থেকে পয়গাম নিয়ে এসেছে।

সবার আগে হিন্দুদেরকে ডেকে পাঠালো দাউদ। হিন্দু বৃদ্ধ দরবারে এসে দাউদকে কুর্নিশ করে দুই তরুণীকে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করল। সেই সাথে দাউদের পায়ের কাছে একটি চামড়ার থলে মেলে ধরল। দাউদ একবার তরুণীদের আরেকবার পায়ের কাছে স্তূপীকৃত স্বর্ণমুদ্রা দেখছিল। তরুণীদ্বয় তাদেরকে বরণ করে নিতে মুচকি হাসি ও সলজ্জ আনুগত্য ও অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলল অবয়ব জুড়ে। একে তো এরা সীমাহীন সুন্দরী, তদুপরি কাউকে কাবু করতে এদেরকে দীর্ঘ ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল দক্ষরূপে। কোন্ কাজে কিসের জন্যে তাদেরকে কার কাছে পাঠানো হচ্ছে সে কথা তাদেরকে আগেই বলে দিয়েছিল পণ্ডিতেরা। তাই অল্পক্ষণের মধ্যে দাউদের মনে কামাগ্নি জ্বালিয়ে দিল তরুণী দু'টি। ওদের পটলচেরা চাউনী ও মোহনীয় ভঙ্গিতে বেসামাল হয়ে পড়ল দাউদ।

বৃদ্ধ হিন্দু জানাল, "আমি বিজি রায়ের সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় কমান্ড ইন চীফ ছিলাম। মহারাজার পরাজয়ের পর আমরা মন্দিরে আশ্রয় নিই। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে মন্দিরের মধ্যে রাজকোষের অধিকাংশ স্বর্ণ, রৌপ্য লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল। কিভাবে তাদের পরাজয় ঘটল এবং সুলতান মাহমূদের অবস্থা এখন কিরূপ সবই সবিস্তারে জানাল বৃদ্ধ। তার কাছে তাকে কোন উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে তাও ব্যক্ত করল। বলল, লাহোর ও বাটান্ডাতেও পয়গাম পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকেও সৈন্য আসবে। তখন আপনার কাজ আরো সহজ হয়ে যাবে। হিন্দু বৃদ্ধ আরও বলল, আপনি যদি শাসন টিকিয়ে রাখতে চান তবে আপনাকে বেরা আক্রমণ করতেই হবে। বেরা আক্রমণ করলে আপনি শুধু শত্রুমুক্ত হবেন না, অঢেল সম্পদও আপনার কব্জায় আসবে।

খুব গম্ভীরভাবে বৃদ্ধের কথা শুনছিল দাউদ। বৃদ্ধ বলা শেষ করার পরও দাউদের কাছ থেকে সে কোন প্রতিক্রিয়া পেল না। হিন্দু বৃদ্ধ জানতো, যুদ্ধবিগ্রহ কারামাতীদের ধাতে নেই। এই বেঈমান গোষ্ঠী চক্রান্তের ফসল। চক্রান্তই এদের প্রধান হাতিয়ার। ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও ইসলামের মোড়ক এঁটে কুফরী কর্মই

এদের টিকে থাকার প্রধান সহায়ক। কেননা, ইসলামের নামে কুফরী মতবাদ প্রচার করে খাঁটি মুসলমানদের ঈমান হারা করতেই খৃষ্টান, হিন্দু ও ইহুদীরা এদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছে। কারামাতীদের এসব দুর্বলতা ও দাউদের সাহস সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল হিন্দু বৃদ্ধের। তাই সে বলল, "মহামান্য মুলতানের অধীশ্বর বাটাভা ও লাহোরের সৈনিকদের আপনার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আপনি বিলক্ষণ জানেন, আপনার ক্ষমতা আমাদের সহযোগিতায় টিকে রয়েছে। এও জানেন, চারপাশে হিন্দু রাজা মহারাজাদের বেষ্টনীর মধ্যে আপনার অবস্থান। হিন্দুরা যদি আপনার সহযোগিতা না করে আপনাকে আর্থিক সাহায্য না দেয় তাহলে ক্ষমতা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আপনার উপায় থাকবে না। আপনি যদি বেরা অভিযান না করেন তাহলে আমরা এটাই বুঝব, আপনি আমাদের মিত্র নন, গজনী শাসকের মিত্র। তখন আমরা আপনার সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করব, সব সহযোগিতা বন্ধ করে দেব এবং কারামাতীদেরকে জানিয়ে দেবো আপনার পয়গাম্বরীর গূঢ় রহস্য ও প্রতারণার গোপন কথাও ফাঁস করে দেবো।"

দাউদ হিন্দু বৃদ্ধের কুশলী চালে ঘাবড়ে গেল। বলল, "দেখুন! আপনি নিজেও একজন সেনাধিনায়ক। প্রায় শত মাইল দূরে গিয়ে কোন শহর অবরোধ করার মতো সৈন্যবল আমার নেই, বড় জোড় এখানে কেল্লাবন্দী হয়ে লড়াই করতে পারব।"

"শত মাইল দূরে হলেও আপনাকে সেনাভিযান করতেই হবে। আমরা আপনার সৈন্যদের সুলতান মাহমূদকে ধোঁকা দেয়ার জন্য ব্যবহার করবো। আপনার অগ্রাভিযান দেখেই মাহমূদ বেরা শহর ছেড়ে বাইরে চলে আসবে, আপনাকে অবরোধ করার সুযোগ সে দেবে না। কারণ, সে জানে অবরোধের জের পোহাবার সামর্থ তার নেই। মাহমূদ শহর থেকে বেরিয়ে এলেই লাহোর ও বাটাভার সৈন্যরা তাকে ঘিরে ফেলবে। আপনার কিছুই করতে হবে না। সে লাহোর ও বাটাভার সৈন্যদের মোকাবেলাই তো সামলাতে পারবে না। সে আপনার দিকে আসার সুযোগই পাবে না। এর আগেই খেল খতম হয়ে যাবে। আমরা আপনাকে এই ওয়াদা দিচ্ছি যে, মাহমূদকে বন্দী করে আপনার হাতে তুলে দেবো।"

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল দাউদ। এমতাবস্থায় তার দৃষ্টি পড়ল পায়ের কাছে পড়ে থাকা স্বর্ণমুদ্রায়; দৃষ্টি মুদ্রা থেকে সরিয়ে দুই তরুণীর দিকে ফেরাল দাউদ। তরুণীদের দিকে তাকানোর পর তার চিন্তাক্লিষ্ট চেহারা বদলে গেল। তার

অভিব্যক্তিতে তখন প্রকট হয়ে উঠল যুদ্ধবিগ্রহ ও যুদ্ধাভিযান ইত্যাকার বিষয়াদির প্রতি বিতৃষ্ণা। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল, সে হিন্দু বৃদ্ধকে এখান থেকে তাড়াতে পারলেই বাঁচে।

"আমার বাহিনীকে কখন রওয়ানা করতে হবে?" বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল দাউদ।

"প্রস্তুতি শুরু করে দিন আপনি।" বলল বৃদ্ধ। "আমি এখন বেরা যাচ্ছি, সেখানে আমি লাহোর ও বাটান্ডার সৈনিকদের আগমন সংবাদ জানতে পারবো। তাদের সেনাবাহিনী রওয়ানা হওয়ার খবর পেয়েই আমি আপনাকে দ্রুত সংবাদ পাঠাবো। আপনি রসদপত্র গরুর গাড়িতে বোঝাই করে রাখুন, যাতে খবর পাওয়া মাত্র অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারেন।"

দাউদ বিন নসর হিন্দু আগন্তুকদের আপ্যায়নে শরাব ও কাবাব আনার নির্দেশ দিলে তার এক দরবারী স্মরণ করিয়ে দিল, বন্দীদের নিয়ে বাইরে সৈন্যরা অপেক্ষা করছে। বন্দীদেরকে হাজির করার নির্দেশ দিলে তাদেরকে হাজির করা হলো।

"তোমাদেরকে বেশি কথা বলার সুযোগ দেবো না।" আলেম ও তার সাথীদের উদ্দেশ্যে বলল দাউদ। "তোমাদের এক সাথী চার-কুমারী দুর্গে আমার এক প্রহরীকে হত্যা করেছে। তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তোমরাও তার সাথে ছিলে। এ ছাড়াও তোমরা আমার চৌকস চারজন সৈন্যকে হত্যা করেছো। তা কি ঠিক নয়? কেন তোমরা এদেরকে হত্যা করলে?"

"এর জবাব আমার কাছে শুনুন, মহামান্য মহারাজ!" বলল বৃদ্ধ হিন্দু। এরা যদি এ চার পাষণ্ডকে হত্যা না করতো তাহলে এই সোনার মুদ্রা আর এই তরুণীরা আপনার কাছে পৌছাতে পারতো না। আমরা তো কিছুতেই বুঝতে পারতাম না, এরা আপনার সৈনিক কিনা। হিন্দু বৃদ্ধ চার কারামাতী হত্যার ইতিবৃত্ত সবিস্তারে জানাল দাউদকে এবং বলল, এই বুযুর্গ ব্যক্তি ও তার সাথীরা উদ্ধার না করলে স্বর্ণ ও মেয়েগুলোর চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যেতো না।

আমরা তো এদের কাণ্ড দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, একদল হায়েনার কবল থেকে আরেক দলের পাল্লায় পড়লাম। কিন্তু এই বুযুর্গ আলেম তরুণীদের কাপড় পরালেন, আমাদের নিশ্চিন্ত করলেন। আমরা তাকে উপঢৌকন পেশ করলাম। তিনি আমাদের উপঢৌকন গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানালেন। এমতাবস্থায় মধ্যরাতে আপনার এই সৈন্যরা আমাদের ধরে নিয়ে আসে।"

দাউদ তাকাল বন্দীদের দিকে। আলেম বললেন, "কিছুতেই আমাদের বুঝার উপায় ছিল না, এরা আপনার সৈনিক। আমরা তো এই নিরপরাধ মেয়েগুলোর জীবন বাঁচানোর জন্যে এদেরকে হত্যা করেছি।"

"বন্দী ওই বুড়োর সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক?" আলেমকে জিজ্ঞেস করল দাউদ। "আমি জানি, তোমরা সুলতান মাহমূদের সাথে সাক্ষাৎ করতে বেরা যাচ্ছিলে।"

"তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।" বললেন আলেম। "আমরা বেরা যাচ্ছিলাম ঠিক কিন্তু আমরা জানি না, সুলতান মাহমূদ কোথায় থাকে। আমরা ব্যবসায়ী, ব্যবসার কাজেই যাচ্ছিলাম।"

"মহামান্য আমীর! এরা আমাদের জীবন বাঁচিয়েছে, মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করেছে, আপনার আমানতকে হেফাযত করেছে। আমাদের উপঢৌকন পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। আমি এদেরকে মুক্ত করে দিয়ে আপনার দ্বারা পুরস্কৃত করতে চাই।" বলল বৃদ্ধ হিন্দু।

তরুণী দু'জনের দিকে তাকাল দাউদ। তরুণীরা কয়েকবার বলল, "হ্যাঁ, এদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক। যদি এরা পশুগুলোকে হত্যা না করতো...।"

"ছেড়ে দাও এদের...।" স্মিত হাস্যে নির্দেশ করল দাউদ। দাউদের নির্দেশে আলেম ও তার সাথীদের মুক্ত করে দেয়া হলো।

* * *

দু' তিন রাত পরের ঘটনা। সেই পুরনো হাভেলীতে আবার গভীর রাতে মিলিত হলেন আলেম ও তার সাথীরা। দরবেশ ও আলেম গ্রেফতার হয়ে আলেম ও তার তিন সাথী মুক্ত হওয়ার পর তাদের অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। তদুপরি তারা করণীয় নির্ধারণে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে মিলিত হতেন নিয়মিত। এ রাতেও একে একে মিলিত হলেন সবাই। আলোচনার বিষয় ছিল দরবেশকে মুক্ত করা। দরবেশকে মুক্ত করার কোন ব্যবস্থাই দেখা যাচ্ছিল না। তাকে জেলখানার কোন জায়গায় কোন ঘরে রাখা হয়েছে কোন ধারণা নেই তাদের। বিগত দু'দিন তাদের কয়েকজন জেলখানার দেয়াল পরখ করে দেখেছে। হুক ছুঁড়ে দেয়ালের উপর উঠে তাকে মুক্ত করার চিন্তাও জানবাজ যুবকরা করেছিল। কিন্তু তাতে বৃথা জীবনহানি ঘটতে পারে বিধায় আলেম তাতে সাড়া দিলেন না। আলেম তাদের বুঝালেন, বাস্তব ও ফলপ্রসূ কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় কি না তা ভেবে দেখো।

এসব ভাবনায় আলেমের সময় ক্ষেপণে কিছুটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এক যুবক। বলল, "আমাদের বুযুর্গ সাথী জল্লাদের তরবারীর নীচে মৃত্যুর প্রহর গুনছে, এ কথাটি আপনারা অনুধাবন করছেন না কেন? আমাদের কারো জীবন চলে গেলেও তাতে আপত্তি নেই, তবুও তাঁকে মুক্ত করা একান্ত কর্তব্য।"

আলেম তাকে সান্ত্বনা দিতে বললেন, "দেখো, আমরা দরবেশকে মুক্ত করতে গিয়ে ব্যর্থ হলে দরবেশকে তখনি জল্লাদের হাতে খুন হতে হবে। জীবন মরণের মালিক আল্লাহ্। আমরা যা কিছু করছি আল্লাহ্র জন্য করছি। ধৈর্য ধরো, আল্লাহ্ অবশ্যই একটা সুরাহা করবেন।"

হঠাৎ কে যেনো কড়া নাড়ল দরজায়। সবাই সতর্ক হয়ে গেলেন পালানোর জন্য। কারণ, গ্রেফতার ও মুক্তির পর তাদের পদে পদে বিপদাশঙ্কা আরো বেড়ে গিয়েছিল। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে দরবেশ সবার ঠিকানা বলে দিতে পারেন এমন আশঙ্কাও তাদের আলোচনায় ছিল।

দু'জন হাতে খঞ্জর নিয়ে পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। একজন দরজার শিকল খুলে দিয়ে দরজার আড়ালে চলে গেল। অন্যজন অপর পাল্লার আড়ালে লুকাল নিজেকে। ভেতরে এক লোক প্রবেশ করল। বন্ধ করে দিল দরজা। আগন্তুক তাদেরই একজন।

"এখানে ক'জন আছে?" জিজ্ঞেস করল আগন্তুক।

"আটজন।" জবাব দিল একজন।

"সবাই বাইরে চলে এসো। দরবেশকে চারজন সৈনিক এদিকে নিয়ে আসছে। আমরা ইচ্ছে করলে দরবেশকে এখন মুক্ত করতে পারি। এখন শহর একেবারে জনশূন্য। কাজটি করার এখনি উপযুক্ত সময়।"

কয়েদখানায় দরবেশের হাড়গুড়ো করে ফেলেছিল অত্যাচার চালিয়ে। তবুও তার মুখ থেকে তার সাথী ও অন্য কারো পরিচয় ও ঠিকানা বের করতে পারেনি জালেমরা। ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত শত্রু চিহ্নিত করতে অন্য পন্থা উদ্ভাবন করল। রাতের দ্বিপ্রহরে দরবেশকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তার স্ত্রী-সন্তানকে শাস্তি দিয়ে তাদের কাছ থেকে অন্যদের পাত্তা উদ্ধার করবে। এ উদ্দেশ্যে রাতের অন্ধকারে চার সিপাহী তাকে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য রওয়ানা হয়েছিল। দরবেশের ঘর ছিল পুরনো হাভেলী থেকে অনেকটা আগে।

আলেম ও তার সাথীদের সবাই হাতে লোহার ডাণ্ডা নিয়ে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। রাস্তায় একটু অগ্রসর হওয়ার পরই তারা সিপাহীদের

দেখতে পেল। সিপাহীদের দেখেই তারা অন্ধকারে লুকিয়ে গেল। যেই তাদের পাশ দিয়ে দরবেশকে নিয়ে সিপাহীরা যেতে লাগল অমনি অতর্কিতে সবাই সিপাহীদের মাথায় আঘাত করল। উপর্যুপরি আঘাতে ওরা চিৎকার দেয়ার অবকাশও পেল না, জ্ঞান হারিয়ে চার সিপাহী লুটিয়ে পড়ল। দরবেশের হাত-পা বাঁধা ছিল শিকলে। তাকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে সাথীরা সবাই অন্ধকার গলির মধ্যে আড়াল হয়ে গেল। গলিপথ ছিল নীরব নিস্তব্ধ। কেউ এই মহা অপারেশন দেখতে পেল না।

দাউদের দরবার থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়িতে এসেই আলেম এক ব্যক্তিকে বেরায় এ সংবাদ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে, মুলতানের শাসক দাউদ বেরা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাকে রাজী করানোর জন্যে হিন্দুরা নারী ও সোনাদানা উপঢৌকন পাঠিয়েছে। অনুরূপ সংবাদ লাহোর ও বাটান্ডাতেও পাঠানো হয়েছে। তিন তরফ থেকেই আক্রমণ আশঙ্কা রয়েছে সুলতানের।

সুলতানের কাছে অবশ্য এ সংবাদ অপ্রত্যাশিত নয়। তিনি এ সংবাদ পাওয়ার আগেই দু'জন হিন্দু সংবাদবাহককে বন্দী করে ষড়যন্ত্রের খবর জানতে পেরেছেন। এরপর মন্দিরে তল্লাশী চালিয়ে বিজি রায়ের বহু সেনা অফিসারকে গ্রেফতার করা হলো। ষড়যন্ত্রকারী পণ্ডিতদেরও আটক করা হলো। সব হিন্দুকে শহরের বাইরে ময়দানে জড় করে মন্দিরের সকল মূর্তি ওদের সামনে রেখে দেয়া হলো। সমবেত সকল হিন্দুর উদ্দেশ্যে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন সুলতান :

"তোমাদেরকে আমি এখানে একত্রিত করে এ বিষয়টি বুঝাতে চাচ্ছি, তোমাদের হাতের তৈরি মাটি ও ইট পাথরের এসব মূর্তির কিছু করার ক্ষমতা নেই। এদের যদি ক্ষমতা থাকে তবে বল, তারা নিজেদেরকে রক্ষা করুক। এদের ধ্বংস প্রত্যক্ষ কর। সব ছেড়ে এক আল্লাহ্র ইবাদত কর, যে আল্লাহ্ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের জীবন মরণের মালিক।"

সুলতানের নির্দেশে হিন্দুদের সামনেই সকল মূর্তি গুড়িয়ে টুকরো টুকরো করা হলো।

বেরা দখল করেই সুলতান দ্রুত পেশোয়ারে এই বলে দূত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, "যত কম সংখ্যকই হোক দ্রুত সৈন্য পাঠাও, রসদের দরকার নেই।"

সেইদিন থেকে সুলতানের প্রতিটি প্রহর কাটতো সাহায্যকারী সৈন্যাগমনের অপেক্ষায়। পথ ছিল দীর্ঘ। তাছাড়া শত্রু বেষ্টিত এলাকা দিয়ে অনেক ঘুরো পথে শত্রুদের দৃষ্টি এড়িয়ে সহযোগীদের পৌছাতে যথেষ্ট বিলম্ব হওয়াটাই স্বাভাবিক

ছিল, কিন্তু সমূহ বিপদাশঙ্কায় সহযোগী সৈন্যদলের আগমনের বিলম্ব অস্থির করে তুলেছিল সুলতানের মন। কারণ, দু'টি অপ্রত্যাশিত যুদ্ধে সুলতানের অধিকাংশ সৈন্য শহীদ হয়ে গিয়েছিল। সৈন্য ঘাটতি পূরণ করার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। অবশ্য বেরায় মুসলমান যথেষ্ট ছিল, কিন্তু হিন্দুরা মুসলমানদেরকে দাসে পরিণত করেছিল। সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের মোটেও নেয়া হতো না। শুধু তাই নয়, তরবারী, অস্ত্র চালনা ও অশ্বারোহণ করা ছিল মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ।

বেরায় সুলতানের অবস্থা হয়েছিল শিকারীদের পাল্লায় আহত বাঘের মতো। নিজের দেশ থেকে অনেক দূরে সুলতান। চতুর্দিকে শত্রু। অবস্থা এমনই করুণ যে, শুধু যে তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে পরাজিত হবেন তাই নয়, জীবনাশঙ্কাও প্রকট হয়ে উঠেছিল তার। অবশিষ্ট সৈনিক ও কর্মকর্তাদের মনে বিরাজ করছিল চরম হতাশা।

"বন্ধুগণ! আমি তোমাদের জীবন নিয়ে জুয়া খেলা শুরু করিনি।" সকল কমান্ডারকে একত্রিত করে একদিন বললেন সুলতান। "উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি সচেতন। তবে জেনে রেখো এবং মনে সাহস রেখো, আমরা কখনও পালিয়ে যাবো না, পরাজিতও হবো না। আল্লাহ্ সঠিক সময়ে ঠিকই আমাদের সাহায্য করবেন। ইতোমধ্যে আমাদের অধিকাংশ আহত যোদ্ধা সুস্থ হয়ে উঠেছে, দু' একদিনের মধ্যেই সহযোগী সৈন্যরা এসে পড়বে। ইনশাআল্লাহ, আমাদেরকে অবশ্যই মুলতান অভিযান করতে হবে। এখানে আমরা বসে থাকলে মুলতানের সৈন্যরা আমাদের ঘেরাও করে ফেলবে এবং আনন্দ পাল ও বিজি রায়ের সৈন্যরাও এদের সাথে যোগ দিবে। আর আমরা মুলতানে অভিযান চালালে ওদের পরাজিত করা কোন দুষ্কর ব্যাপার হবে না তা তোমরা জান। কারণ, মুলতানের সৈন্যদের যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা নেই। মুলতান জয় করে নিলে ওখানকার সৈন্যদের দ্বারা আমাদের উপকার হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। শত পাপাচারী হলেও ওরা মুসলমান তো?"

সকল কয়েদীকে পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন সুলতান। যাতে ওরা চলতে পারে কিন্তু পা তুলে দৌড়াতে না পারে। অপরদিকে বেরার সকল মসজিদে আযান এবং বেদখল হওয়া মসজিদগুলোকে আবাদ করার নির্দেশ দিলেন আর বললেন, "পুরুষরা মসজিদে এবং মেয়েরা বাড়িতে কুরআন খতম ও মুসলমানদের কল্যাণে নফল নামায পড় এবং দু'আ করতে থাক।"

বেরায় সুলতান যখন সহযোগী সৈন্যাগমনের অধীর অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন তখন লাহোরে চলছে অন্য কাণ্ড। লাহোরের রাজা আনন্দ পাল সুলতানের পথরোধ

করতে গিয়ে এমনভাবে পরাজিত হলো, সে রাভী নদী পেরিয়ে কাশ্মীরের পথে পালিয়ে গেল। লাহোরে তার স্থলাভিষিক্ত ছিল রাজকুমার শুকপাল। শুকপালের অধীনেও বহু সৈন্য রিজার্ভ ছিল। এরা এ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু রাজার সৈন্যরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে দু'জন চারজন করে রাজধানীতে ফিরে এসে পরাজয়ে নিজেদের নিরপরাধ সাব্যস্ত করতে মুসলিম সৈন্যদের সম্পর্কে ভীতিকর বর্ণনা দিচ্ছিল। তাদের কথাবার্তায় মনে হতো, গযনী বাহিনীর সৈন্যরা মানুষ নয়, এগুলো জিনের মতো। তাদের কথা শুনে যুদ্ধে না যাওয়া সৈন্যদের মধ্যেও ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজকুমার শুকপাল ও তার মা রাণী প্রেমদেবী এসব সংবাদে চরম উদ্বিগ্ন ছিল। তারা রাজা আনন্দ পালের ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল কিন্তু সপ্তাহ চলে যাওয়ার পরও তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। কেউ বলতেও পারল না কোনদিকে গেছে রাজা।

আনন্দ পালের ছিল তিন স্ত্রী। প্রেমদেবীর পুত্র শুকপাল ছাড়াও তার আরো বৈমাত্রেয় ভাই ছিল। রাজার নিরুদ্দেশে প্রেমদেবীর উদ্বেগ ছিল না, তার দৃষ্টি ছিল রাজার অবর্তমানে পুত্র শুকপালকে সিংহাসনের অধিকারী করা।

একদিন শুকপালের কাছে খবর গেল, বেরা থেকে একটি দল জরুরী বার্তা নিয়ে এসেছে। তাদেরকে তখনি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ডেকে নেয়া হলো। এরা ছিল বেরার মন্দিরে লুকিয়ে থাকা সামরিক অফিসার ও পণ্ডিতদের প্রেরিত সংবাদ বাহক। এই সংবাদ বাহকরা বাটাভায় আনন্দ পালের দ্বিতীয় রাজধানীতে খবর পৌছালে সেখানকার কর্তাব্যক্তিরা তাদেরকে বলল, এখানে সেনাভিযান পরিচালনা করার মতো কর্তৃত্ববান কেউ নেই, আপনারা লাহোর যান। সেখানে রাজার পুত্র শুকপাল রয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে অভিযান পরিচালনা করতে পারেন। সংবাদ বাহকরা বেরার পরিস্থিতি জানিয়ে তাকে বেরা আক্রমণের প্রস্তাব করল। শুকপাল সংবাদের গুরুত্ব অনুধাবন করে তার মাকে জানাল। শুকপালের মা প্রেমদেবী সংবাদ শুনে সাথে সাথেই সেনাপতি রাজ গোপালকে ডেকে পাঠাল।

সেনাপতি রাজ গোপাল বেরা আক্রমণে অস্বীকৃতি জানাল। রাজ গোপাল আত্মপক্ষ সমর্থনে বলল, "যে বাহিনীর পথরোধ করতে গিয়ে রাজা আনন্দ পাল পরাজিত হয়ে হারিয়ে গেছেন, পথে বিপুল জনবল হারানোর পরও যারা অগ্রাভিযান চালিয়ে রাজা বিজি রায়ের মতো প্রতিষ্ঠিত ও সর্বাত্মক প্রস্তুত একটি বাহিনীকে পরাজিত করে রাজধানী দখল করেছে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে হলে ওদের চেয়ে তিনগুণ সৈন্য প্রয়োজন। আমাদের ততো

সৈন্য নেই। তাছাড়া বেরা পর্যন্ত পৌঁছাতে অন্তত দু'টো বড় নদী আমাদের পেরিয়ে যেতে হবে। আমাদের এখন যে সৈন্য রয়েছে এদের মানসিক শক্তিও ভঙ্গুর। রাজকুমার শুকপাল ছেলে মানুষ। এমতাবস্থায় এতো বড় ঝুঁকি না নিয়ে মহারাজা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

"মহারাজার অনুপস্থিতির সুযোগটুকুই আমি নিতে চাই সেনাপতি।" বলল রাণী প্রেমদেবী। "বেরায় মাহমূদের মুষ্টিমেয় যে সৈন্য রয়েছে এরা আমাদের বাহিনীর আক্রমণে মোটেও দাঁড়াতে পারবে না। এ অভিযানে আমাদের বাহিনী বিজয়ী হলে এই বিজয় আমার পুত্রের সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হবে। তা আমার ছেলের সিংহাসনের অধিকারী হওয়ার সহায়ক হবে। আর যদি পরাজয় ঘটে তবে সেই পরাজয় হবে আমার। কেননা, সেনাবাহিনী কমান্ড থাকবে আমার হাতে। তাতে শুকপালের কোন ক্ষতি হবে না।"

"শুকপাল সাথে থাকবে বটে তবে তাকে রাখতে হবে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাঝে। তার জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে।" বলল রাজরাণী প্রেমদেবী।

রাজগোপাল! তুমি কি বুঝতে পারছো না, আমাদের আগে যদি দাউদ বেরা দখল করে নেয় আর মাহমূদ ও দাউদ মিলে বেরাকে ইসলামী রাজ্যে পরিণত করে তবে এ অঞ্চলে গযনীর দু'টো ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। বলাতো যায় না, দাউদ আর যাই হোক মুসলমান তো, সে মাহমূদের সাথে যদি মিত্রতা গড়ে তোলে।"

"দাউদ সেনাভিযান করবে এমনটা আমি কল্পনাও করতে পারি না।" বলল সেনাপতি রাজগোপাল। "ধন-সম্পদ, ভোগ-বিলাস আর মদ-নারীতে আকণ্ঠ ডুবে থেকে সে তো ধর্মকেই ভুলে গেছে, সে কোন দিন যুদ্ধের সাহস করার কথা নয়। গযনীর সৈন্যরা যুদ্ধ করে ঈমানের জোরে। দাউদ আমাদের কাছে ঈমান বিক্রি করে ফেলেছে, তার পক্ষে গযনী বাহিনীর মোকাবেলা করা অসম্ভব।"

রাজগোপালকে অন্য কক্ষে নিয়ে গেল প্রেমদেবী। প্রেমদেবীর বয়স তখন প্রায় পঁয়ত্রিশ। কিন্তু তার শরীর, সৌন্দর্য তখনও কুমারীর মতো অটুট। সে রাজগোপালের চোখে চোখ রেখে বলল, "রাজগোপাল! ভুলে গেলে, শুকপাল যে তোমারই সন্তান। মহারাজাকে মানুষ শুকপালের বাবা বলে সে আমার স্বামী বলে। রাজরাণী হওয়ার পরও তোমাকেই আমি হৃদয়ের স্বামী বানিয়ে রেখেছি। মহারাজা আনন্দ.পাল লাহোরের এ যুদ্ধে তোমাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তাকে বলেছি, রাজধানীতে একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি থাকা দরকার। তুমি

তার সাথে গেলে নিশ্চয়ই নিহত হতে...। রাজগোপাল! তোমার সন্তানকে সিংহাসনে আসীন করাতে উদ্যোগী হও। আমি চাই, তোমার সন্তান শুকপাল মাহমূদকে কয়েদ করে লাহোরে নিয়ে আসুক। রাজগোপাল! তোমাকে আমার প্রেমের দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি অভিযানে আপত্তি করো না।"

সুলতান মাহমূদ জানতেন, পেশোয়ার থেকে সহযোগী বাহিনীর এতো তাড়াতাড়ি পৌঁছা সম্ভব নয়। তবুও তিনি শহর প্রাচীরের উপরে উঠে অধীর উদ্বেগে উত্তর-পশ্চিম দিকে তাকিয়ে থাকতেন। ধুলো উড়তে দেখলেই সহযোগী বাহিনী এসে গেছে বলে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

* * *

মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসর উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত দুই তরুণী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তরুণীদ্বয় পান পাত্রে ঢেলে দিচ্ছিল সুরা, আর আয়েশী ভঙ্গিতে গলাধঃকরণ করছিল দাউদ। এমতাবস্থায় দাউদকে খবর দেয়া হলো, প্রহরী হত্যাকারী কয়েদীকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পথে প্রহরীদেরকে বহু লোকজন আক্রমণ করে আসামী ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। মদে মাতাল দাউদ নির্দেশ দিল, ওরা ঘুষ খেয়ে কয়েদীকে ছেড়ে দিয়েছে। ওদেরকে কয়েদখানায় বন্দী করে রাখো। আর কয়েদীর ঠিকানা তালাশ করে ওর স্ত্রী সন্তান ধরে এনে বন্দী করো। কিন্তু দরবেশের বাড়ি তালাশ করে সৈন্যরা ওখানে কোন মানুষকেই দেখতে পেল না।

একদিন সকালে উত্তর-পশ্চিম দিকের বদলে উত্তর-পূর্ব দিকে ধুলো উড়তে দেখলেন। সুলতান ধুলো দেখেই বুঝতে পারলেন কোন সেনাবাহিনী এদিকে আসছে। তিনি ভাবলেন, আমার সহযোগী বাহিনী হয়তো এসে পড়েছে। তিনি দৌড়ে শহর প্রাচীর থেকে নেমে এলেন মুলতান রওয়ানা হওয়ার জন্য। তিনি মুলতান পৌঁছাতে অধীর অপেক্ষায় ছিলেন। তার গন্তব্য ছিল মুলতানেরই দিকে। কিন্তু পথিমধ্যে বিজি রায় তার পথরোধ করার কারণে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতে হলো।

তিনি সেনাপতিদের ডেকে বললেন, "সহযোগী বাহিনী এসে গেছে। অতএব আমরা আগামীকালই রওয়ানা হচ্ছি।" এমন সময় এক অশ্বারোহী গোয়েন্দা খবর নিয়ে এলো, "কোন এক শত্রুবাহিনী আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে! বাহিনীতে হাতি ও বহু সংখ্যক অশ্বারোহী ছাড়াও পদাতিক সৈন্য রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে এরা হিন্দু। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না কোন রাজা বা মহারাজার সৈন্য এরা।"

সুলতান মাহমূদ চিৎকার দিয়ে উঠলেন এই বলে, তোমরা বসো, আমি নিজেই ওদের দেখে আসছি। তিনি দ্রুত একটি ঘোড়ায় চড়ে ঘন জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর একটি উঁচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে তিনি অগ্রগামী বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি কয়েকবার জায়গা বদল করে শত্রুবাহিনীর জনবলের আন্দাজ করতে চেষ্টা করলেন এবং তার সাথে আগমনকারীকে বললেন, "আমরা ওদেরকে অবরোধের সুযোগ দেবো না, তাহলে মুলতানের বাহিনী এসে সেই অবরোধকে আরো দীর্ঘায়িত করবে। তুমি জলদী যাও। কৃষক ও মুসাফির বেশে কয়েকজন গোয়েন্দাকে পাঠিয়ে দাও, যাতে তারা এরা কার সৈন্য এবং এদের উদ্দেশ্য কি সে সম্পর্কে নিশ্চিত খবর নিয়ে আসতে পারে।"

শহরে ফিরে এসেই সুলতান নিজের স্বল্প সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। এমন সময় তাকে আবার খবর দেয়া হলো উত্তর-পশ্চিম দিকেও ধুলো উড়তে দেখা যাচ্ছে। তিনি দৌড়ে শহর প্রাচীরের উপর উঠলেন। তাকে এ দুশ্চিন্তা পেয়ে বসেছিল যে, এটি কি পেশোয়ারের সহযোগী বাহিনী না রাজা আনন্দ পালের বাহিনী! দুশ্চিন্তায় তার চেহারায় ঘাম দেখা দিল। তিনি একবার উত্তর-পশ্চিম কোণে একবার পূর্ব-উত্তর কোণের উড়ন্ত ধুলোর দিকে তাকাচ্ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল নদী। তার চিন্তাশক্তি বিদ্যুতের মতো তীব্র গতিতে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করছিল। নদীর দিক থেকে উর্ধ্বশ্বাসে শহরের দিকে ছুটে এলো একজন অশ্বারোহী। কাছে পৌছতেই তাকে সুলতানের নিকটে আসার জন্য ইঙ্গিত করা হলো। অশ্বারোহী কাছে পৌছে সালাম দিয়ে জানাল, মাননীয় সুলতান! সহযোগী বাহিনী এসে পড়েছে।

সাথে সাথে সুলতান বললেন, "ওদেরকে নদীর তীরেই থামতে বল।" আরো বললেন, "অন্য কাউকে পাঠাও, এ লোকটি ক্লান্ত হয়ে গেছে।"

রাতে সুলতান নিজেও শয্যা গ্রহণ করলেন না, অন্য কাউকেও ঘুমাতে দিলেন না। ইত্যবসরে তার কাছে খবর পৌছল, উত্তর-পূর্বের বাহিনী আনন্দ পালের কিন্তু রাজা আনন্দ পাল নেই, তার ছেলে শুকপাল বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই সংবাদের ঘণ্টা তিনেক পর আবার সংবাদ এলো, লাহোরের বাহিনী শহর থেকে তিন মাইল দূরে থেমে গেছে কিন্তু তারা তাঁবু ফেলেনি। বোঝা যায়, রাতেই তারা শহর অবরোধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এ সংবাদ জানার পর দু'জন অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে রাতেই সুলতান সহযোগী বাহিনীকে যেখানে থামতে বলেছিলেন সেখানে চলে গেলেন। পেশোয়ারের সহযোগী বাহিনী ও লাহোরের আনন্দ পালের সৈন্যের মাঝে ব্যবধান ছিল মাইল পাঁচেক। তন্মধ্যে ছিল ঝিলাম নদী।

সহযোগী বাহিনীর অধিনায়ককে বুকে নিয়ে সুলতান বললেন, "তোমরা আমার জন্যে আল্লাহ্‌র রহমত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছো। তোমরা আজ না পৌঁছলে আমি বুঝতে পারছিলাম না আমাদের অবস্থা কি হতো?"

"ভাই নু'মান! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন! তোমার অবস্থান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে রাজা আনন্দপালের সৈন্যরা অবস্থান করছে। ওরা রাতের শেষভাগে কিংবা ভোরে শহর অবরোধ কিংবা আক্রমণ করবে। বেলা উঠার আগেই তুমি সৈন্যদের নদী পার করিয়ে ওপারে নিয়ে যাবে। কিন্তু কোন শোরগোল করবে না। দিনের আলোতে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে আর উঁচু জায়গায় বসে শত্রু সেনাদের পর্যবেক্ষণ করবে। আমি ওদেরকে শহর অবরোধ করার সুযোগ দেব না। একদল পদাতিক সৈন্যকে ওদের দিকে এগিয়ে দেবো, ওরা ওদের মুখোমুখি হয়ে পিছিয়ে আসবে। আর ওরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে। তোমার সামনে থাকবে এদের একবাহু, ইচ্ছে করলেই তুমি ওদের পিছনে চলে যেতে পারবে। আমি ওদের সম্মুখ দিক ও বাম বাহু সামলাবো।"

শুকপাল ও সেনাপতি রাজগোপাল রাত পোহাতে দেয়নি। ফজরের নামায থেকে সালাম ফেরাতেই সুলতানকে খবর দেয়া হলো, শত্রুবাহিনী অগ্রসর হচ্ছে। তাকে আরো বলা হলো, শত্রুবাহিনীর আগমন দেখে মনে হচ্ছে, তারা শহর অবরোধ করবে। শহরের কাছে এসে ওরা অবরোধ বিস্তৃত করছে, আরো ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে সুলতানের পরিকল্পনা বেকার হয়ে গেল। তিনি পদাতিক বাহিনী পাঠিয়ে ওদেরকে এগিয়ে এনে সুবিধামতো জায়গায় অবস্থান নেয়ার সুযোগ পেলেন না।

সুলতান মাহমূদ শহর প্রাচীরে উঠে দেখলেন, শহর থেকে এক মাইলের মতো দূরে—এগিয়ে আসছে শত্রুবাহিনী। তিনি কমান্ডারদের নির্দেশ দিলেন, অশ্বারোহীদেরকে দু'ভাগে ভাগ করে দুই প্রান্তে আক্রমণ করো। অশ্বারোহীরা প্রস্তুতই ছিল। দ্রুত শহর থেকে অশ্বারোহীরা বেরিয়ে দু'দিকে শত্রুবাহিনীর দুই বাহুর দিকে চলে গেল।

রাজগোপাল সুলতানের বাহিনীকে অগ্রসর দেখে বিদ্যুৎগতিতে তার বাহিনীর বিস্তৃতি রুখে সুলতানের অশ্বারোহীদের ঘেরাও করে ফেলার চেষ্টা করল। সুলতানের অশ্বারোহীরা বিজলীর গতিতে আঘাত করল শত্রুবাহিনীর বাহুতে। সুলতান শহর প্রাচীরে দাঁড়িয়ে সবই প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনি দ্রুত অশ্বারোহী বাহিনীর পিছনে পদাতিক বাহিনীকে পাঠালেন বাম বাহুতে আঘাত হানতে। সুলতানের নির্দেশ মতো উভয় দল পশ্চাদপসরণ শুরু করল। এতে শত্রুবাহিনী

পদাতিক বাহিনীর দিকে ঝুঁকে পড়ল। ভেঙে গেল ওদের অবরোধ চেষ্টা। শত্রুবাহিনীর পশ্চাদদেশ এখন নদীর তীরে অপেক্ষমাণ সুলতানের সহযোগী বাহিনীর সামনে।

নু'মান ছিলেন অভিজ্ঞ সেনাপতি। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তারা আক্রমণ চালাল পিছন দিক থেকে। শত্রুবাহিনী আর পালিয়ে যাওয়ার অবকাশ পেল না। ওদের আহত হাতিগুলো তাদের জন্য হয়ে উঠল যমদূত।

বেলা তখন উপরে উঠে গেছে। হিন্দুদের ঢাকঢোল নাকারার আওয়াজ, হাতির চিৎকার আর ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি ও মুসলিম বাহিনীর তকবীরে আকাশ কেঁপে উঠছে। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। সুলতান মাহমূদ নগর প্রাচীরে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তার দৃষ্টি ছিল রাজকুমার শুকপালকে বহনকারী হাতির উপর। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, হিন্দুদের পতাকা বহনকারী সওয়ার শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। হতাহত হচ্ছে হিন্দুরা। মুসলমানরা ঝটিকা আক্রমণ করে দ্রুত জায়গা বদল করছে। এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করে শুকপাল ও হিন্দুদের পতাকাবাহী হাতি সোজা এগিয়ে আসল শহর প্রাচীরের দিকে। সুলতান দেখলেন, হাতির উপরে রাজকীয় আসনে বসা এক যুবক। হাতিটি আহত হয়ে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছিল। শতচেষ্টা করেও মাহুত এটিকে শহরের দিকে আসার গতি ফেরাতে পারেনি। আহত হাতি শহর প্রাচীরের প্রধান গেটে এসে থামতেই এক সাথে কয়েকটি তীর এসে বিদ্ধ হলো হাতির গায়ে। ভয়ংকর চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল হাতি। মাহুত এক লাফে হাতি থেকে নেমে দৌড়ে পালাল। সুলতান বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, "হাতিটিকে ধরে ফেল।"

যুবককে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, সেই হবে আনন্দ পালের ছেলে রাজকুমার শুকপাল। পতাকাবাহী ছাড়া তার সাথে আর কেউ ছিল না। বেসামাল হাতির আর্তচিৎকারে হাতি থেকে নেমে পড়ল শুকপাল। সে শহর প্রাচীরের গায়ে গা ঘেঁষে ভয়ে কাঁপতে লাগল। সুলতান নির্দেশ দিলেন, ওকে ধরে উপরে নিয়ে এসো।"

সুলতান এগিয়ে গেলেন শোকপালের দিকে। হাত ধরে বললেন, "ভয় পেয়ো না। তোমার কিছু হবে না। তোমার সাহসের প্রশংসা করতেই হয়। তবে গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আসার আগে বাবাকে তোমার জিজ্ঞেস করে আসা উচিত ছিল, গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে কত মূল্য দিতে হয়। এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সৈন্যদের পরিণতি দেখো।"

শুকপাল দেখলো, তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে মুসলমানদের হাতে কচুকাটা হচ্ছে। ওদের গর্বের হাতিগুলো সেনাদের পিষে মারছে আর মুসলিম সৈন্যরা তকবীর দিয়ে ময়দানে একক প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সেনাপতি রাজগোপালকে কোথাও দেখতে পেল না শুকপাল। শঙ্কায় কাঁপতে লাগল রাজকুমার।

"আমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে?" সুলতানকে জিজ্ঞেস করল রাজকুমার।

"নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ধারণ কর। তোমার ক্ষেত্রে আমি হলে তুমি কি সিদ্ধান্ত নিতে। তবে এর আগে এ ব্যাপারটি বুঝে নাও, তোমাদের হাতে গড়া মূর্তিগুলো তোমাদের কোনই সাহায্য করতে পারে না। এসব মিথ্যা দেবদেবী ছেড়ে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে মানো, তাঁর ইবাদত কর। এই আল্লাহ্ আমাকে দুরবস্থার মাঝেও এ নিয়ে তৃতীয় বিজয় দান করেছেন।"

"আপনি আমার ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ।" বলল শুকপাল।

সুলতান মৌলভী সাঈদুল্লাহকে ডেকে বললেন, "এই যুবককে আপনার কাছে রাখুন। সে কয়েদীও নয়, আযাদও নয়। এখন সে তার ধর্মের প্রতি আস্থাহীন। তাকে খুব যত্ন করুন।"

বিজয়ের তিনদিন পর সুলতান মুলতানের উদ্দেশে রওয়ান হওয়ার ঘোষণা দিলেন। তার সামনে দু'শ মাইলের দীর্ঘ সফর। সুলতান সকল কয়েদীকে পায়ের শিকল মুক্ত করে গলায় বেড়ী পরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কাফেলা দ্রুত চলার জন্য গরুর গাড়িগুলো যেখানে বালু ও চড়াইয়ে আটকে যেতো কয়েদীদের ঠেলে তুলতে নির্দেশ দিতেন। কাফেলা অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিলো।

এদিকে মুলতানের কারামাতী শাসক লাহোর ও বাটান্ডার সৈন্যদের রওয়ানা হওয়ার সংবাদের অপেক্ষায় ছিল। যুদ্ধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হিন্দুদের "নিমক হালাল" করতে বাধ্য হয়েই সে বেরা আক্রমণের জন্যে তৈরি হয়ে সংবাদের অপেক্ষায় ছিল। তার কাছে আর লাহোর বাহিনীর সংবাদ পৌঁছল না।

বেরা থেকে যুদ্ধে যাওয়ার কোন সংবাদ এলো না বটে তবে তার গোয়েন্দারা তাকে খবর দিল, এক বিশাল বাহিনী দ্রুতগতিতে মুলতানের দিকে আসছে। দাউদ খবর পেয়ে দৌড়ে দুর্গের উপরে একটি মিনারে উঠে অগ্রসরমান সৈন্যদের দেখতে লাগল, ততক্ষণে সুলতানের বাহিনীকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সুলতানের সৈন্যরা মুলতানের সীমানায় প্রবেশ করল। দাউদ তার বাহিনীকে দুর্গ প্রাচীরে মোকাবেলার জন্য দাঁড় করিয়ে প্রধান গেট বন্ধ করে

সেখানকার পাহারা মজবুত করতে নির্দেশ দিল। দেখতে দেখতে সুলতানের বাহিনী মুলতান শহর অবরোধ করে ফেলল।

সুলতানের পক্ষ থেকে দাউদকে কয়েকবার শহর গেট খুলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব দেয়া হল। বলা হলো, গেট খুলে না দিলে শহরের প্রতিটি ইট খুলে ফেলা হবে এবং সকল কারামাতীকে হত্যা করা হবে।

সুলতান মাহমূদকে বলা হয়েছিল, কারামাতীরা নিবীর্য ও সাহসহীন। এরা পাপাচারে লিপ্ত বিলাসী ও আরামপ্রিয়। কিন্তু শহরে প্রবেশের প্রতিটি আক্রমণ ওরা ভয়ংকরভাবে ব্যর্থ করে দিচ্ছিল। কয়েকটি হামলা এভাবে ব্যর্থ করে দেয়ার পর সুলতানের ভুল ভাঙল।

টানা সাতদিন অবরোধ করে রাখার পরও কারামাতীরা শহরে প্রবেশ রোধে কঠোর অবস্থান বজায় রাখল। সুলতান বললেন, "এভাবে অবরোধ দীর্ঘায়িত করার সুযোগ নেই। আমাদের হাতে সময়ও নেই। তোমাদেরকে আল্লাহ্ কঠিন মুহূর্তেও বিজয়ী করেছেন এবারও করবেন। প্রাচীর ডিঙাতে এবং ভাঙতে চরম আঘাত হানো, এরা পাপাচারী। এরা তোমাদের ঠেকিয়ে রাখবে কোন শক্তি দিয়ে!"

সুলতান শহর দুর্গের প্রধান ফটক ও প্রাচীর ভাঙতে গাছ কেটে দু'টি হাতির গায়ে বেঁধে হাতি দৌড়িয়ে আঘাত করতে নির্দেশ দিলেন। ঝুলন্ত গাছ নিয়ে হাতি শহর ফটকে আঘাত হানছিল। এভাবে কেটে গেল আরো তিনদিন। হাতি ও মানুষ মিলেও প্রধান গেট ভাঙতে সক্ষম হলো না। দরজার কাছাকাছি গেলেই উপর থেকে কারামাতীদের তীরবৃষ্টি বর্ষণে মুজাহিদরা হতাহত হচ্ছিল। প্রধান ফটকের দিকে কারামাতীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অন্যদিকেও প্রাচীর ভাঙার চেষ্টা চলছে। শহরের ভেতরে অবরুদ্ধ লোকেরা আতংকিত হয়ে ভয়াবহ চেচামেচি শুরু করেছে। আর গেটের বাইরে মুসলিম সৈন্যদের তকবীর ধ্বনি ও হাতি-ঘোড়ার চিৎকারে ভয়াবহ এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। শহরের ভিতরের মুসলিম নাগরিকরা যখন জানতে পারল, গজনীর সুলতানের বাহিনী মুলতান আক্রমণ করেছে তখন তারা ভেতর থেকে প্রধান গেট খুলে ফেলার জন্যে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লে কারামাতীরা তাদের সবাইকে শহীদ করে ফেলে।

চতুর্থ দিন দাউদ বিন নসর ভীত হয়ে বছরে বিশ লাখ দিনার কর দেয়ার অঙ্গীকার করে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠাল সুলতানের কাছে। কিন্তু সুলতান যখন শুনলেন, ভেতরের মুসলমানরা দরজা খোলার চেষ্টা করলে তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে, তখন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি কমান্ড নিজের হাতে নিয়ে

আখেরী হামলা চালালেন। মুসলিম যোদ্ধারা মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গেট ভাঙতে। কয়েক জায়গা ভেঙেও ফেলল। দুরাচারী কারামাতীদের গণহত্যার নির্দেশ দেয়া হলো। সুলতান নিজেই এতো কারামাতী হত্যা করলেন যে, জমাট রক্তে তরবারীর হাতলে তার হাতের মুষ্টি এভাবে আটকে গিয়েছিল, মুষ্টি আর খুলতে পারছিলেন না। দীর্ঘক্ষণ গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর তার হাতের মুষ্টি খোলা সম্ভব হয়েছিল।

কারামাতীরা সেদিন ইতিহাসের শেষ লড়াই করেছিল সুলতান বাহিনীর মোকাবেলায়। সেদিন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ওরা শেষ রক্তবিন্দু ঢেলে দিয়েছিল। কারামাতী নারীরাও অস্তিত্ব রক্ষায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু মুসলিম বাহিনীর ক্রোধের মুখে তারা ছিটকে পড়ে গেল। সেদিনের যুদ্ধে কারামাতীদের রক্তের বন্যায় মুলতান শহর ভেসে গিয়েছিল।

দাউদ বিন নসর সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। দাউদের লাপাত্তা হওয়ার সাথে সাথে মুলতানের জমিন থেকে চিরতরে কারামাতী শাসন ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হলো। কারামাতী শাসন এখন এক ইতিহাস। সুলতান মাহমূদ মুলতান দখল করে কেরামতীদের স্বর্ণ-মন্দির ধ্বংস করে দিলেন। ওদিকে ভেতর থেকে দরজা খুলে দেয়ার অভিযানে মুলতানের সেই দরবেশ, আলেম ও তাদের সহকর্মীবৃন্দ জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

মুলতান অভিযান শেষ করে তখনও স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারেননি সুলতান। তিনি এর পুনর্গঠন ও মুলতানকে গজনী শাসনাধীনের মজবুত ঘাঁটি তৈরির ব্যাপার নিয়ে ভাবছিলেন। এ মুহূর্তেই হেরাতের গভর্নর আরসালানের কাছ থেকে পয়গাম এলো– কাশগরের রাজা এলিখ খান গজনী আক্রমণ করেছে। খবর শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন সুলতান।

তিনি আবু আলী মঞ্জুরীকে মুলতানের গভর্নর নিযুক্ত করে দ্রুত বেরায় পৌছলেন। বেরা এসে জানতে পারলেন, শুকপাল মুসলমান হয়ে গেছে। সে এখন সুলতানের গোলাম ও বৎস হয়েই থাকতে চাচ্ছে। সুলতানের মন তখন গজনীতে। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে গজনী আক্রমণের সংবাদে। তিনি গভীরভাবে অগ্রপশ্চাৎ ভাববার অবকাশ পেলেন না। শুকপালের আনুগত্য ও মুসলমান হওয়ার কারণে তাকে বেরার গভর্নর ঘোষণা করলেন। যদিও তাকে জানানো হলো, হিন্দুরা অবিশ্বস্ত, ওদের উপর এতোটা বিশ্বাস করা ঠিক হবে না

কিন্তু কারো কথা শোনার সময় তার ছিল না। ঘোষণা সেরেই তিনি গজনীর পথে পা বাড়ালেন ...।

সুলতান মাহমূদের সামনে এখন শত্রুকবলিত রাজধানী গজনী। অপরদিকে বেরায় নিজের নিয়োজিত হিন্দুজাদা শুকপাল। যার রক্তে রয়েছে অবিশ্বাস, প্রতারণা ও মিথ্যার মিশ্রণ। সুলতানের অনাবশ্যক পুরস্কার ও উদারতার প্রতিদান কিভাবে শোধ করবে শুকপাল? দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে শ্রান্ত, ক্লান্ত সহযোদ্ধা ও সুলতান কিভাবে উদ্ধার করবেন শত্রুকবলিত রাজধানী?

## নগরকোটের নর্তকী

নগরকোট ছিলো হিন্দুস্তানের এক বিখ্যাত দুর্গ। সেই যুগ ছিল দুর্গ শাসনের। নগরকোট দুর্গের ভগ্নস্তূপ এখনও বিদ্যমান। তৎকালীন হিন্দুস্তানের দুর্গগুলো একটির চেয়ে আরেকটি ছিলো নানা কারণে বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। বিখ্যাত নগরকোট দুর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো এর শক্ত কাঠামো, বিশাল বিস্তৃতি। মধ্যে অবস্থিত বিশাল মন্দিরটি ছিলো নগরকোট দুর্গের প্রধান আকর্ষণ। মন্দিরটিই ছিলো দুর্গের ভেতরে আরেক দুর্গসম। মন্দিরের মধ্যে অসংখ্য কক্ষ ছিলো। ভেতরে ঢুকলে অচেনা মানুষ হারিয়ে যেতো। মন্দিরের ভেতরে ছিলো গোপন কক্ষ, সুড়ঙ্গ পথ। নগরকোট মন্দিরের মধ্যে ঘোড়া-হাতি হারিয়ে গেলেও খুঁজে পাওয়া ছিলো দুষ্কর। বিশাল এই মন্দিরের নিরাপত্তার জন্যে এটিকে ঘিরে তৈরি হয় বিশাল দুর্গ। যা তৎকালীন মহাভারতের দুর্গগুলোর মধ্যে ছিলো অন্যতম।

এই দুর্গ ছিলো মহাভারতের বিখ্যাত শহর কাংরার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের উপর। পাহাড়ের উপর থাকার কারণে এটি ছিলো সুরক্ষিত। এই দুর্গে আক্রমণ করতে হলে পাহাড়ের উপর উঠতে হতো। দুর্গে অবস্থানরত নিরাপত্তা রক্ষীরা পাহাড়ের উপর থেকে তীর ছুঁড়ে এবং বড় বড় পাথর গড়িয়ে দিয়ে যে কোনো হামলাকারীকেই পরাস্ত করে দিতো। যার ফলে কারো পক্ষে এই দুর্গ দখল করা ছিলো দুষ্কর।

সুলতান মাহমূদ গজনবী যখন পেশোয়ার, বেড়া ও মুলতান দখল করে নিলেন তখন মহাভারতের হিন্দু রাজা-মহারাজাদের টনক নড়ে। তাদের কাছে মনে হলো, বিজয়ী সুলতান মাহমূদ মূর্তিপূজারী ভারতের বুকে খঞ্জর বিদ্ধ করেছেন। সুরক্ষিত হওয়ার ফলে নগরকোট মন্দিরের গুরুত্ব আরো বেড়ে গেলো। মন্দির যেমন ছিলো গুরুত্বপূর্ণ তদ্রূপ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণও

ছিলো হিন্দুদের কাছে পূজনীয়। নগরকোট মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রাধাকৃষ্ণ কট্টর ব্রাহ্মণ।

রাজা-মহারাজারা শাসন করতো নিম্নবর্ণের হিন্দুদের, আর পুরোহিত রাধাকৃষ্ণ শাসন করতো রাজা-মহারাজাদের। অবতারের মতোই সকল বর্ণের হিন্দু রাধাকৃষ্ণকে সম্মান করতো, তার পায়ে মাথা ঠুকে প্রণাম জানাতো। সাধারণত মন্দিরে যেসব ঘটনা ঘটে থাকে, নগরকোট মন্দিরে সেসব কখনো ঘটতো না। পুরোহিত রাধাকৃষ্ণ নগরকোট মন্দিরে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিলো যে, সেখানে হিন্দু পূজারীরা পূজা-পার্বন ছাড়া অন্যকিছু ভাবতেও পারতো না। নগরকোট মন্দিরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর পূজারীদের যাতায়াত ছিলো বটে, কিন্তু কোনো নারীর পক্ষে কোনো পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসার অনুমতি ছিলো না এবং নারী-পুরুষ একত্রে পূজায় শরীকও হতে পারতো না।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর পূজারী পুরোহিত রাধাকৃষ্ণের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে চাইতো, কিন্তু পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ কোনো নারীকে শরীর স্পর্শ করতে দিতো না। নারী, শিশু, কিশোরী, যুবতী আর বৃদ্ধ যাই হোক না কেনো, কারো পক্ষেই প্রধান পুরোহিত রাধাকৃষ্ণের কাছে যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। সে নারী সংস্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে রাখাকে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বলে বিশ্বাস করতো।

মন্দিরে বড় পুরোহিত রাধাকৃষ্ণের আরো কয়েকজন সহকারী পুরোহিত ছিলো। নারীর সংস্পর্শ থেকে তাদেরকে রাধাকৃষ্ণ দূরে থাকার জন্যে নির্দেশ দিতো। কঠোরভাবে তাদেরকে নারী সঙ্গ থেকে দূরে রাখতো। রাধাকৃষ্ণ মনে করতো, নারীই পৃথিবীতে সকল অনিষ্টের মূল। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ বিশ্বাস করতো, নারীর মধ্যে এমন জাদুকরী ক্ষমতা রয়েছে, সে জাদু যদি কোনো পুরুষকে পেয়ে বসে তাহলে সেই পুরুষ আর কোনো ভালো কাজ করতে পারে না। সে পাপ ছাড়া ভালো কিছুর কথা ভাবতেও পারে না।

এই বিশ্বাস থেকে রাধাকৃষ্ণ যৌবনে সংসার ত্যাগ করে হিমালয় পাহাড়ের কোলে হিন্দুদের পবিত্র গঙ্গা নদীর উৎসস্থলে চলে গিয়েছিলো। দীর্ঘ পনের বছর রাধাকৃষ্ণ বিজন প্রান্তরে দেব-দেবীর পূজা করে কাটিয়েছে। ততোদিনে তার রিপু তাড়না মরে যায়। তার মনে কোন কামনা-বাসনা আর বাকি থাকেনি। দীর্ঘ সাধনার পর গঙ্গা প্রবাহের পথ ধরে লোকালয়ে এগুতে থাকে রাধাকৃষ্ণ। নগরকোটে পৌঁছে পাহাড়ের উপর এ বিশাল মন্দির দেখে স্থানটি তার কাছে খুবই

ভালো লাগে। মন্দিরের সেবায় লেগে যায়। এক পর্যায়ে কঠোর সাধনাবলে নিজেকে উন্নীত করে প্রধান পুরোহিতের মসনদে।

প্রধান পুরোহিত রাধাকৃষ্ণের বয়স এখন ষাটের কাছাকাছি। এতোগুলো বছর পাড়ি দিয়ে এলেও তার চেহারা-শরীরে বয়সের ছাপ পড়েনি। শরীরের শক্ত বাঁধনের ফলে চেহারার কোথাও বলিরেখা দখল পায়নি। নিরামিশভোজী রাধাকৃষ্ণ কোনো জীবজন্তুর গোশ্‌ত ভুলেও আহার করে না। পূজা-পার্বন আর সেই ভোরবেলায় গঙ্গাজলে স্নান শীত-বর্ষা-হেমন্ত কোনো ঋতুতেই বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। কঠোর নিয়ম-নীতি মেনে চলার কারণেই নগর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হিসেবে সবাই তাকে বরণ করেছে। সাধারণ হিন্দুদের কাছে সে শুধু মন্দিরের পুরোহিতই নয়, এক জ্যান্ত দেবমূর্তিও।

তার হাঁটা-চলা, চাহনী, বলায় রয়েছে দারুণ সম্মোহনী শক্তি। রাজা-মহারাজাদের চেয়েও তার চলন-বলনে রয়েছে ঐশ্বর্যের বহিঃপ্রকাশ। সে গর্বভরে সবাইকে বলতো, দুনিয়ার খেল-তামাশা, আমোদ-প্রমোদ, নারীর স্পর্শ থেকে আমার দেহ-মন পবিত্র। তাই শত বছর পর্যন্ত আমার শরীর এমনই থাকবে। সে গর্ব করে বলতো, যে তার দেহ-মনকে পবিত্র করে নিতে পারে, তার শরীর সবসময় থাকে তরতাজা। জগতের রোগ-শোক জড়া তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

মহাভারতের হিন্দু ধর্মীয় অঙ্গনে সে ছিলো একটা স্তম্ভ। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত ছিলো তার কণ্ঠস্থ। তার ভাষায় ছিলো জাদুকরী ক্ষমতা। মানুষ তাকে বাস্তব অবতার বলে পূজা করতো। ভাবতো, নগরকোট মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সনাতন ধর্মের বাস্তব নতুনা। রাজা-মহারাজাদেরকে সে দাপটের সাথে শাসন করতো। যেসব রাজা-মহারাজাকে সাধারণ প্রজারা পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতো, সেসব রাজা-মহারাজা তার পায়ে মাথা ঠুকে প্রণাম জানাতো। তারা এই পণ্ডিতের সান্নিধ্যে এলে নিজেদের ক্ষমতা ও দাপট তার পদমূলে সঁপে দিতো।

নগরকোট মন্দির ছিলো সোনাদানা, মণিমুক্তা, হীরা-জহরতের ভাণ্ডার। সারা ভারতের রাজা-মহারাজারা প্রাণ খুলে নগরকোট মন্দিরে নিয়মিত নজরানা পাঠাতো। মণিমুক্তা, হীরা-জহরত, সোনাদানা পাঠাতে পারাকে তারা সৌভাগ্যের পরিচায়ক ভাবতো। নগরকোট অঞ্চলের সকল কৃষক, জমিদার নিয়মিত মন্দিরে খাজনা দিতো। কারণ, এ অঞ্চলের সব জমির মূল মালিকানার অধিকারী ছিলো মন্দির। বিশাল এই সম্পদ পুরোহিত রাধাকৃষ্ণ না নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করতো,

না সম্পদে কোন পুরোহিতকে হাত দিতে দিতো। এসব সম্পদের ব্যাপারে সে বলতো, এ সম্পদের মালিক ভগবান। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানেই খরচ হবে এ সম্পদ। মন্দিরের বিশাল আয়ের একটি অংশ প্রধান পুরোহিত রাধাকৃষ্ণ অতি দরিদ্র হিন্দু প্রজাদের মাঝে ব্যয় করতো, আর কিছু বরাদ্দ থাকতো গরীব হিন্দুদের শিক্ষা-দীক্ষায়। বাকি সম্পদের ব্যাপারে তার কথা ছিলো, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রতা রক্ষায় ব্যয় হবে মন্দিরের সব ধন-রত্ন।

১০০৭ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ৩৯৮ হিজরী সনের ঘটনা। সুলতান মাহমূদ বর্তমান আটকাবাদে তৎকালীন লাহোরের প্রতাপশালী রাজা আনন্দ পালকে সম্মুখ সমরে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। লজ্জাজনকভাবে তৃতীয়বারের মতো পরাজিত হয়ে রাজা আনন্দপাল কাশ্মীরের দিকে পালিয়ে যায়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাজা আনন্দ পাল আর নিজের রাজধানীতে ফিরে আসেনি। এরপর সুলতান মাহমূদ বেরায় রাজা বিজি রায়কে চরমভাবে পর্যুদস্ত করেন। বিজি রায়কে পরাজিত করার পরই মুলতানে হামলা করে হিন্দু ও খৃস্টানদের ক্রীড়নক কারামতিদের দুর্ভেদ্য দুর্গ চিরতরে ধ্বংস করে দেন। সেই সাথে মুলতানকে গজনী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। বেরার অপর যুদ্ধে আনন্দ পালের ছেলে শুকপাল পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু সুলতানের অনুপস্থিতিতে সেনাবাহিনীকে ধোঁকা দিয়ে পুনরায় ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত করায় সুলতান মাহমূদ নিজে গজনী থেকে ফিরে এসে শুকপালের চক্রান্ত ভণ্ডুল করে দিয়ে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ১০০৭ খৃস্টাব্দে মহাভারতের বুকে ইসলামের ঝাণ্ডা নতুন করে উড্ডীন হওয়ার ফলে নগরকোট মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। সুলতান মাহমূদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রাভিযান এবং বেরা, পেশোয়ার ও লাহোর যুদ্ধে হিন্দু রাজাদের শোচনীয় পরাজয়বরণের সংবাদ নিয়মিত পাচ্ছিলো। এ কথাও তার অজানা ছিলো না যে, রাজা আনন্দ পাল পরাজিত হওয়ার পর রাজধানীতে না ফিরে কাশ্মীরের দিকে পালিয়ে গেছে। এ সংবাদ শুনে নগরকোটের প্রধান পুরোহিত পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ হিন্দুস্তানের সকল রাজা-মহারাজাকে নগরকোটে ডেকে পাঠায়। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের ডাকে উজান, কাশ্মীর, কনৌজ, গোয়ালিয়ার, আজমীরের রাজাসহ সকল রাজা-মহারাজা উপস্থিত হয়।

"তোমরা কি আরাম-আয়েশ আর বিলাস-ব্যসনের ফল এখনো পাওনি? না এখনো আরো পাওয়ার বাকি আছে?" নগরকোট মন্দিরের রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে রাজা-মহারাজাদের উদ্দেশ্যে বললো পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ। তোমাদের এই লজ্জাজনক

পরাজয়ের কারণ তোমরা তোমাদের রাজপ্রাসাদগুলোকে স্বর্গে পরিণত করেছো। তোমরা ঘুমোতে যাও তো নারী সেবিকারা তোমাদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়। তোমাদের ঘুম থেকে জাগানোর সময় হলে নারী সেবিকারাই তাদের নরম হাতের স্পর্শে তোমাদের ঘুম ভাঙ্গায়। তোমাদের স্নানের প্রয়োজন হয়, তাও নারী সেবিকারাই সারিয়ে দেয়। নারীর স্পর্শ আর নারীর সহযোগিতা ছাড়া তোমরা এক কদম চলতে পারো না। সেবিকাও তো এমন যারা সুন্দরী-রূপসী। তোমাদের তৃষ্ণা পেলে তো মিষ্টি শরাব দিয়েও তৃষ্ণা মেটাতে পারো।

"আনন্দ পাল বলেই না পরাজিত হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে এই ম্লেচ্ছোর বাচ্চা আসুক না...।"

'আনন্দ পাল নয়, ভারতের প্রত্যেক রাজার জন্যই এটি পরাজয়।" গর্জে উঠলো পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ। "বলছো কি? তোমরা কি হিন্দু নও! এই পরাজয় কি তোমাদের মোটেও স্পর্শ করেনি? গজনীর এক মুসলিম যোদ্ধা তোমাদের এক জাতি ভাইকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার অর্থ হলো, গোটা হিন্দু ধর্মের পরাজয়। আনন্দ পালের পরাজয় তোমাদের পরাজয়। আমার পরাজয়। বেরা, মুলতান, লাহোরের মন্দিরগুলো কি তোমাদের বিবেচনায় পবিত্র নয়?"

মুসলমানরা দেব-দেবীর মূর্তিগুলোকে মন্দির থেকে বাইরে ফেলে এগুলোর উপর দিয়ে ঘোড়া দাবড়িয়ে পায়ে পিষে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। এগুলোর সাথে কি তোমাদের ধর্মের কোনোই সম্পর্ক নেই। যেখানে শঙ্খধ্বনি বাজতো, যেখানে বাজতো ঘণ্টা, যেখানকার তরুলতা আকাশ-বাতাস মন্দিরের গুণকীর্তন শুনতো, সংস্কৃতি ও ধর্মের শ্লোক ধ্বনিত হতো; সেখানে আজ ধ্বনিত হয় 'আযান'!"

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের শ্লেষাত্মক কথায় রাজা-মহারাজাদের সমাবেশে নেমে এলো পিনপতন নীরবতা। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ বলছেন, "ওখানকার মুয়াজ্জিনের আযান এতোটা দূরে বসেও আমার কানে বিদ্ধ হয়। কষ্টে আমি রাতে ঘুমাতে পারি না। হরেকৃষ্ণ ও হরেরামের পরিবর্তে আমার কানে বাজে আযানের ধ্বনি। আমি এখন মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করতে ভয় পাই। দেব-দেবীদের চোখে-মুখে ক্ষোভ দেখছি। আমার মনে হয়, এ মন্দির, এ দুর্গ, এ পাহাড় সবই যেনো ক্ষোভে কাঁপছে। তোমরা কি চাও যে মুসলমানরা এখানে এসে আমাদের এই দেব-দেবীগুলোকেও গুঁড়িয়ে দিক। এ মন্দিরেও ধ্বনিত হোক ওদের 'আযান'।"

"এমনটি হতে দেয়া হবে না মহারাজ!" সমবেত সকল রাজা-মহারাজার কণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত হলো। "আমরা আমাদের সবকিছু উৎসর্গ করে দেবো।

কিন্তু কোনো মুসলমান এদিকে এলে তাকে আর জীবিত ফিরে যেতে দেবো না।"

"ওরা এখান থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য আসবে না। ওরা এখানে আসবেই। আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি। আমার দৈবজ্ঞান এ কথাই বলছে। তোমরা তো সুন্দর প্রমোদবালা আর নর্তকীদের নিয়ে আমোদে ডুবে রয়েছো। তোমরা কি লক্ষ্য করছো, মুসলমান বিজয়ীরা কি তোমাদের মতো সুন্দরী ললনাদের সঙ্গে রাখে? তোমরা এই পবিত্র মন্দিরেও ভোগের সকল উপকরণ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছো!

বলতে পারো, আমার কেনো ঘুম আসে না? আমি গভীর রাতে গঙ্গামাতার নির্মল পানিতে ডুব দিয়ে ভগবানের কাছে কান্নাকাটি করি কেন? আমার তো কোনো রাজ্য নেই, রাজধানী নেই। কিন্তু তারপরও আমার এতো উদ্বেগ, এতো দুশ্চিন্তা কেনো? তোমরা যদি পরিস্থিতি আমার চোখে দেখো, আমার জ্ঞানে চিন্তা করো, তাহলে সারা মহাভারত তোমাদের নিজের দেশ মনে হবে। মনে রেখো, মাহমূদ গজনবী কোনো দেশ দখলের জন্য লড়ছে না। হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব বিলীন করা আর এখানে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার যুদ্ধ। মুহাম্মদ বিন কাসিমের হাতে ভারতের হিন্দু রাজার পতন ঘটলেও পরে আমাদের বাপ-দাদারা এ দেশ থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করেছিলেন। অথচ আজ আবার ইসলাম ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসছে। আর তোমরা এখনো গভীর বিলাস ঘুমে ডুবে আছো।

ধর্মকে না হয় তোমরা ভুলেই গেলে। কিন্তু তোমাদের নিজেদের কথা কি একটু ভেবেছো? তোমরা যদি পরাজিত হও, তোমরা কোথায় যাবে? তোমাদের শবদেহের সৎকার করার কেউ থাকবে? জীবিত থাকলে বাকি জীবনটা মুসলমানদের কারাগারে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে। আর তোমাদের স্ত্রী-কন্যাদের সাথেও সেই আচরণই করা হবে, এসব নর্তকী-বাইজীদের সাথে তোমরা যা করে থাকো।"

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের বক্তব্য শুনে রাজা-মহারাজাদের চৈতন্যদয় হলো। তাদের ভ্রান্তি দূর হয়ে যায়। তাৎক্ষণিক তারা ভুলে যায় পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-ভেদাভেদ। তারা চরম উত্তেজনায় সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকে। তারা সম্মিলিত হিন্দু বাহিনী গঠন করে বেরা ও মুলতানের মাঝে মুসলিম বাহিনীকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা আঁটে।

আবেগ নয়, আকল দিয়ে কাজ করো। সবাই মিলে একক সেনাবাহিনী তৈরি করে মুলতানের দিকে অভিযান শুরু করো। আর মুসলিম সুলতানকে সেখানকার কোনো পাহাড়ের গিরি খাদে আটকে ফেলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করো। তাকে উন্মুক্ত ময়দানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেরেশান করে তোলো। তাহলে বেরা ও মুলতান এমনিতেই তোমাদের দখলে চলে আসবে। তোমরা যদি পেশোয়ারে মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হও তাহলে তোমাদের মোকাবেলায় থাকবে মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য। বেরা ও মুলতান থেকে পাঠানো সাহায্যকারীদের তোমরা পথিমধ্যেই আটকে দিতে পারবে।

রাজা-মহারাজাদের বৈঠকে কিছুক্ষণ সামরিক কৌশল নিয়ে কথাবার্তা হলো। সকল রাজা-মহারাজাই আনন্দ পালের শূন্যতা অনুভব করছিলো। পণ্ডিত তাদের জানালো, "জানতে পেরেছি সে কাশ্মীরে আছে। তাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হবে। তোমরা প্রত্যেক রাজ্যে ঘোষণা করে দাও, মুসলমানদের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য, অনেক রসদপত্র, বাহন, অস্ত্র, পোশাক ও তাঁবুর প্রয়োজন। এ জন্যে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। ধর্ম ও দেব-দেবীদের মর্যাদা রক্ষা তহবিলে প্রত্যেকের উচিত উদার হস্তে দান করা। আর প্রত্যেক যুবককে সোৎসাহে সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্যে আহ্বান জানাও।"

"লাহোরে আমরা দু'বার দু'টি কুমারী বলী দিয়েছি, তবুও অদৃষ্টের চাকা ঘুরলো না। দু'টি নরবলীই ব্যর্থ হয়েছে। মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছে আর আমরা হেরেছি। মনে হয় ভগবান আমাদের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট।" বললো এক রাজা।

"কবুল না হওয়ার কারণ হলো, এসব কুমারী সতী-সাধ্বী ছিলো না।" বললো স্তম্ভিত রাধাকৃষ্ণ। "আমি পণ্ডিতদের জানি, এরা দীর্ঘদিন এই কুমারীদ্বয়কে হেফাজতের নামে দেবতাদের আমানতের খেয়ানত করেছে। এমন পাপী পণ্ডিতদের হাতে ব্যবহৃত কুমারী বলী দিলে দেবতারা তা গ্রহণ করে না। আমিও এ কথা ভাবছি। দেবতার চরণে এক পবিত্রা কুমারী বলী দেয়া দরকার। এ কুমারী তোমাদের কারো নর্তকীর মধ্য থেকে দিতে হবে। নর্তকী হতে হবে যুবতী, সুন্দরী, রূপসী এবং সে হবে মুসলমান। তাকে হতে হবে রাজার খুব প্রিয়জন।"

"নর্তকীরা তো আর পবিত্র হয় না মহারাজ। আর আপনি বলছেন তাকে মুসলমানও হতে হবে।" বললো এক রাজা।

"হ্যাঁ, আমি এ জন্যই বলছি, তাকে কোনো পণ্ডিত নিজের কাছে রাখেনি তা নিশ্চিত করতে হবে। পণ্ডিতের কাছে রক্ষিতা না হলে তাকেই আমি পবিত্র মনে

করি। আমি সেই নর্তকীকে আমার তত্ত্বাবধানেই মন্দিরে রাখবো। এরপর দেখো, এই কুমারী বলী দেবতারা কবুল করে কিনা। নর্তকীকে আমি বাছাই করবো।"

সারা হিন্দুস্তানের সকল হিন্দু রাজ্যজুড়ে হাটে-মাঠে, অলিতে-গলিতে, মন্দিরে-ভজনালয় সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়লো এ খবর– মুসলমানরা তুফানের মতো মহাভারতের একটির পর একটি দুর্গ জয় করছে। মুসলমানরা পেশোয়ার থেকে মুলতান পর্যন্ত সকল হিন্দু তরুণীদের ধরে নিয়ে সেনাদের যৌন দাসীতে পরিণত করছে। মন্দিরগুলো মুসলমানরা আস্তাবলে পরিণত করছে। যেসব হিন্দু সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে, এরা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং পঙ্গু হয়ে গেছে। এদের প্রতি দেবতারা অভিশাপ করেছে। যদি সকল হিন্দু রাজা-প্রজা মিলে মুসলমানদের প্রতিরোধ না করে, তাহলে সকল হিন্দু দেবতার অভিশাপে ধ্বংস হয়ে যাবে।

এসব প্রচারণায় সকল হিন্দুর মনে দেব-দেবীর অভিশাপের ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। মন্দিরগুলোতে পুরোহিতরা ধর্মালোচনার চেয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। সকল পূজারী ও হিন্দু নারী-পুরুষের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে পচণ্ড ঘৃণা ছড়িয়ে দেয়। সবচেয়ে বেশি আতংক ছড়িয়ে দেয়া হয় নারীদের মাঝে। এর ফল দাঁড়ায়, (ঐতিহাসিক গরদিজী, উতবী এবং আবুল কাসেম ফারিশতার ভাষায়) হিন্দু নারীরা তাদের রক্ষিত গহনাপত্র বিক্রি করে টাকা-পয়সা সরকারী কোষাগারে জমা দিতে থাকে। যেসব নারীর গহনাপত্র ছিলো না, তারা সূতা কেটে উপার্জিত অর্থ রাজকোষে জমা করতে থাকে। অতি দরিদ্র হিন্দু মেয়েরা শ্রম বিক্রি করে অর্জিত অর্থ রাজা-মহারাজাদের সামরিক তহবিলে জমা দিতে থাকে। সারা হিন্দুস্তানের হিন্দুদের মধ্যে এমন এক উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে যে, সবাই অর্থ উপার্জন আর তা সরকারী তহবিলে জমা করার চিন্তায় পেরেশান হয়ে যায়। হিন্দু যুবকরা নিজেদের ঘোড়া সাথে নিয়ে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য উদগ্রীব সময় কাটায়।

এ উন্মাদনা ছিলো মহাভারতের হিন্দুদের মনে। বিষয়টি এমন যে, পাহাড়ী আগ্নেয়গিরি তার ভূগর্ভস্থ লাভা উদ্‌গিরণ করতে চাচ্ছে। আর ভেতর থেকে আগুন-পাথর বের করে দিচ্ছিলো তার লেলিহান শিখা। দেখে মনে হচ্ছিলো, এ পাহাড় যদি এখন ভেঙ্গে পড়ে তাহলে তার আগ্নোৎপাতে সারা দুনিয়া জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে।

সুলতান মাহমূদ গজনবী এই মানব অগ্নেয়গিরির পাদদেশেই অবস্থান করছিলেন। তিনি সেসব মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করে পুনরায় ফিরে

এসেছেন, যারা তার আশা-আকঙ্ক্ষা এবং তার বিশ্বাসের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করে। এসব ঈমান বিক্রেতাদের আক্রমণ থেকে গজনী সালতানাতকে রক্ষার জন্য সীমান্ত এলাকায় প্রচুর সংখ্যক সৈন্য যদি প্রহরায় নিয়োগ না করতে হতো, তাহলে এরা ভারত অভিযানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারতো। বেরা ও মুলতান যুদ্ধে সুলতান মাহমূদের বহু সৈন্য নিহত হয়েছিলো। সৈন্য ঘাটতিতে তিনি নতুন সৈন্য ভর্তি করে অনেকাংশে পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ভারত অভিযানের জন্য তা ছিলো অপর্যাপ্ত।

অব্যাহত বিজয়ের পরও সুলতান কখনো নিজের শক্তি-সামর্থের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আস্থায় আত্মশ্লাঘা অনুভব করতেন না। তিনি এমনটিও কখনো ভাবেননি যে, হিন্দু রাজা-মহারাজারা তাকে বিনা প্রতিরোধে ছেড়ে দেবে। সুলতান নিজের সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করার জন্য একটু অবকাশ চাচ্ছিলেন। রাজা আনন্দপালের পক্ষ থেকেই তিনি প্রত্যাঘাতের বেশি আশংকা করছিলেন। ভারতের সকল রাজা-মহারাজা সম্মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারে এ চিন্তাও তিনি মাথায় রেখেছিলেন।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় পাওয়া যায়, সুলতান মাহমূদ তার বাহিনীকে বিজয়ের আনন্দে বিভোর হয়ে অবকাশ যাপনের সুযোগ দেননি। তিনি পুনরায় সৈন্যদেরকে অধিকতর কঠিন সামরিক কৌশল রপ্ত করাতে মনোযোগী ছিলেন এবং সৈন্যদেরকে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি যত্নবান করে তোলেন। সেনাবাহিনীকে নতুন করে উচ্চতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা এবং কমান্ড ও নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার প্রতি অভ্যস্ত করে তোলার কাজটি করতেন সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত ইমামগণ। তাছাড়া সুলতান মাহমূদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো, তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (মালে গনীমত) থেকে কখনো সেনাদের বঞ্চিত করতেন না। পক্ষান্তরে বিজিত এলাকায় সেনাবাহিনীর যথেচ্ছাচার ও লুটপাটও তিনি বরদাশত করতেন না।

তিনি গোয়েন্দা বাহিনী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন রাজধানীতে বসবাসকারী স্থানীয় মুসলমানরা সুলতানের গোয়েন্দাদের সম্ভাব্য সহযোগিতা করতো। অবশ্য এসব মুসলমানদের মধ্যে ঈমান বিক্রেতাও ছিলো। এরা প্রায়ই মুসলমান গোয়েন্দাদের ধরিয়ে দিতো। তদুপরি সুলতানের গোয়েন্দা ব্যবস্থা এতোটুকু মজবুত ছিলো যা দ্বারা তিনি কোনো রাজধানীতে হিন্দু রাজা-মহারাজারা কি করছে, এসব খবর তার কাছে সময় মতোই পৌছে যেতো। কিছু সংখ্যক সৈন্যের অনুরোধে রাজা আনন্দ পাল কাশ্মীর থেকে তার রাজধানী লাহোরে ফিরে এলো।

সে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিলো বলে সুলতান মাহমূদের সাথে সন্ধি চুক্তি করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। এমনকি আনন্দ পাল এক দূত মারফত সুলতান মাহমূদের কাছে সন্ধি প্রস্তাব পাঠিয়ে ছিলো।

এ ব্যাপারে বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং সুলতান মাহমূদের এসব অভিযানের প্রত্যক্ষদর্শী আলবেরুনী লিখেছেন, রাজা আনন্দ পালের পক্ষ থেকে এমন সময় এক দূত সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলো, যখন সুলতান কাশগড় সীমান্তে আক্রমণকারী এক মুসলিম ক্ষমতালিপ্সুর সাথে জীবনপণ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সেই যুদ্ধ এতোটাই কঠিন হয়ে পড়েছিলা যে, সুলতানের কাছে কখনো বিজয় সুদূরপরাহত মনে হতো। এমন সংকটজনক পরিস্থিতির সংবাদ পৌছে গিয়েছিলো আনন্দ পালের কাছে। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পরও আনন্দ পাল সুলতানের কাছে এই বলে পয়গাম পাঠায় :

"আমি জানতে পেরেছি, তুর্কীরা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং বিদ্রোহ খোরাসান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আপনি সম্মত হলে আমি পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, দশ হাজার পদাতিক এবং একশ' জঙ্গী হাতি নিয়ে আপনার সহযোগিতার জন্য আসতে প্রস্তুত। তাছাড়া আপনি সম্মতি দিলে আমার পরিবর্তে আমার ছেলেকে এর চেয়েও দিগুণ সৈন্যসহ পাঠাতে প্রস্তুত। আমার এই প্রস্তাবকে আপনি যেভাবেই মূল্যায়ন করুন না কেনো, আমি তাতে দুঃখিত নই। কারণ, আপনি আমাকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছেন। আমি চাই না আপনার উপর অন্য কেউ বিজয়ী হোক।"

এ পয়গাম ও প্রস্তাব থেকে অনুমান করা যায়, রাজা আনন্দ পাল সুলতান মাহমূদের সামরিক দক্ষতা ও রণকৌশলের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল ও ভীত ছিলো। সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে পুনর্বার যুদ্ধ করার মতো সাহস আনন্দ পাল হারিয়ে ফেলেছিলো।

অবশ্য সুলতান মাহমূদ শুধু কৌশলি সেনাপতিই ছিলেন না; মেধা ও দূরদর্শিতার ক্ষেত্রে তৎকালীন মুসলিম শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি হিন্দুদের কূট-চরিত্র সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। সেই সময় তার সামরিক সহযোগিতার খুবই প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু তিনি এক পরাজিত হিন্দু রাজার সহযোগিতা নিতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আনন্দ পালের সামরিক সাহায্যের অন্তরালে এই আশংকাবোধ করছিলেন, আনন্দ পাল হয়তো চাচ্ছে, সুলতান মাহমূদ গযনবী গজনীর মধ্যেই স্বজাতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকুক। তাছাড়া এ আশংকাও উড়িয়ে দেয়ার মতো ছিলো না যে, সাহায্যের নাম করে

কঠিন কোন মুহূর্তে সুলতানের পক্ষ তাগ করে আনন্দ পাল সৈন্যবল নিয়ে প্রতিপক্ষে চলে যাবে।

আনন্দ পাল কি ইতিহাস ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একথা জানাতে চায় যে, সুলতান মাহমূদ এক হিন্দু রাজার সহযোগিতায় যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলো?

আনন্দ পালের পয়গাম ও প্রস্তাব নিজ সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের শুনিয়ে এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন সুলতান। এর মধ্যে যদি অন্য কোন দূরভিসন্ধি নাও থাকে, তবুও এ কথা কিভাবে মেনে নেয়া যায় যে, চরম দু'প্রতিপক্ষের মাঝে এখন মৈত্রী স্থাপিত হয়ে গেছে? যে আমার ধর্মের শত্রু, আমার জাতির শত্রু, তার কোন প্রস্তাবে আমি সম্মত হতে পারি না, তার সহযোগিতার প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তিনি আনন্দ পালের দূতকে মৌখিকভাবেই এ বলে জবাব দিলেন যে, তোমার রাজাকে গিয়ে বলবে, "আমাদের সাথে তার কোনো সন্ধি সমঝোতা সম্ভব নয়। আমাদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন অসম্ভব।"

এ জবাবের পরও আনন্দ পাল লাহোরে ফিরে এলো। সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর আনন্দ পালের সামনে একটাই পথ খোলা ছিলো, চূড়ান্ত যুদ্ধ করে পরিণতিতে পৌঁছা। তখনো আনন্দ পালের সৈন্য সামন্তের ঘাটতি ছিলো না। সে রাজধানীতে পৌঁছেই তার সামরিক কমান্ডার, সেনাপতি ও উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠকে বসলো। বৈঠকে সে জানালো, খুব অত্যল্প সময়ের মধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানতে চায়। সে বললো, এবার সে যেভাবেই হোক লড়াই করে সুলতানের কব্জা থেকে বেরা ছিনিয়ে আনতে চায়। কথোপকথনে এ কথাও উঠলো, এতো কম সৈন্য নিয়ে সুলতান মাহমূদ কিভাবে জয়লাভ করবে?

আজ পর্যন্ত কিংবা স্বর্গবাসী মহারাজা জয়পালও সুলতান মাহমূদকে কোন ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকাতে পারেনি। বললো জয়পালের এক সেনাপতি। আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছার আগেই সে খবর পেয়ে যায়। যার ফলে সে তার সেনাবাহিনীকে নিজের মতো করে প্রস্তুত করে নেয়। প্রতিবারই দেখা গেছে, আমরা তার তৈরি ফাঁদে আটকা পড়েছি। এর অর্থ হলো, সে আমাদের অগ্রাভিযানের আগাম সংবাদ পেয়ে যায়। তার গোয়েন্দারা খুবই সতর্ক। এরা হয়তো আমাদের মধ্যেই বসবাস করে।

কিছুসংখ্যক মুসলমান আমাদের এখানে বসবাস করে, এদের মধ্যেই হয়তো গোয়েন্দা রয়েছে। বললো আনন্দ পাল। এ জন্য মুসলমান আবাদী ধ্বংস করে দেয়া দরকার।

এই পদক্ষেপ আমাদের তেমন কোন ফল দেবে না মহারাজ। বললো আনন্দপালের প্রধান উজীর। সেসব লোককে এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে গোয়েন্দারাও পালিয়ে যাবে। তার চেয়ে আমাদের উচিত, এমন পদক্ষেপ নেয়া যাতে গোয়েন্দাদের ধরা যায়। এখানকার মুসলমানদের শত্রু বানানো ঠিক হবে না। আপনি তো জানেন, সব মুসলমান গোয়েন্দাগিরি করে না। মুসলমানের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি মুসলমানের দ্বারা স্বার্থকভাবে করানো সম্ভব। আমাদের এ পদক্ষেপ নেয়া দরকার, যাতে মুসলমানরাই আমাদের হয়ে মুসলমান আবাদীর ভেতরের খোঁজ-খবর রাখে। এদের মধ্যে কে কে গোয়েন্দাগিরি করে তাদের খুঁজে বের করতে হবে। অন্তত একজনকে যদি ধরা যায়, তাহলে এ কাজে কারা জড়িত সে তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

তাহলে এদের ধরার কাজ আজ থেকেই শুরু করো এবং দ্রুত সেনা প্রস্তুতি শুরু করে দাও।

আনন্দ পালের উজির সন্তুষ্টির সাথে জানালো, প্রজারা খুবই সহযোগিতা করছে মহারাজ। মন্দিরে মন্দিরে পুরোহিত পণ্ডিতরা সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা এবং পুনরায় চূড়ান্ত আঘাত হানার ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করছে। জনসাধারণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। ফলে সেনাবাহিনীতে দলে দলে যুবক ভর্তি হচ্ছে এবং প্রজাসাধারণের পক্ষ থেকে অঢেল ধন-সম্পদ রাজকোষে জমা হচ্ছে।

* * *

রাজা আনন্দ পালের রাজপ্রাসাদে ঘোড়ার দেখাশোনা এবং বেয়াড়া ঘোড়াকে বাগে আনার কাজে নিয়োজিত ছিলো শুয়াইব আরমুগানী নামের এক মুসলমান। সে ছিলো সুঠাম ও স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘদেহী ও অভিজ্ঞ অশ্বারোহী। সে পেশোয়ারের অধিবাসী। রাজা জয়পালের আত্মাহুতির আগে সে লাহোরে আসে। তখন সে ছিলো তরুণ। আর এখন সে পূর্ণ যুবক। সে যে কোনো বেয়াড়া ঘোড়াকে সহজে বাগ মানাতে পারে। এ জন্য রাজা জয়পাল যেমন শুয়াইব আরমুগানীকে ভালবাসতো, রাজা আনন্দ পালও তাকে অত্যধিক পছন্দ করে। ঘোড়া বাগ মানানো ছাড়া আরও বহু গুণের অধিকারী শুয়াইব। যার ফলে রাজ প্রাসাদের সকল মানুষ এমনকি রাজকুমারী ও রাজকুমারদের কাছে শুয়াইব আরমুগানী

ছিলো খুবই প্রিয়পাত্র। তার কণ্ঠ ছিলো মায়াবী এবং কথাবার্তায় ছিলো জাদুমাখা। তার ঠোঁটে সব সময় হাসি লেগে থাকতো। তার বিশ্বস্ততার প্রশ্নে কারো মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিলো না। রাজপ্রাসাদে সে এতোটাই বিশ্বস্ত ও প্রিয়পাত্র ছিলো যে, রাজমহলের সবাই তাকে নামে মাত্র মুসলমান ভাবতো।

রাজা আনন্দ পালের রাজমহলে আরো ক'জন মুসলমান কর্মচারী ছিলো। তারা ছোট ছোট কাজ করতো। রাজা আনন্দ পালের নির্দেশে অতি গোপনে এসব মুসলমানদের পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে দিলো উজির। হিন্দু সেনারা মুসলমানদের ছদ্মবেশে তাদের যাচাই করতে শুরু করলো। তারা সুলতান মাহমূদের পক্ষে আর হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিষোদগার করতো। সেই সাথে মুসলমান মহিলাদের সাথে খাতির জমিয়ে তাদের স্বামী-পুত্রদের মনোভাব ও কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতো। হিন্দু পুরুষরা ছদ্মবেশ ধারণ করে মুসলমান পুরুষদের সাথে সখ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করতো এবং তাদের ভেতরের খবর জানার জন্যে বন্ধুত্বের অভিনয় করতো। অনেক ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা বলেই পরিচয় দিতো। এই প্রচেষ্টায় একজন মুসলমানকে গোয়েন্দা সন্দেহে গ্রেফতার করা হলো। সন্দেহের ভিত্তিতে আরো কয়েকজন মুসলমানকে গ্রেফতার করে কারা প্রকোষ্ঠের অন্তরালে কঠিন শাস্তির চাকায় পিষ্ট করতে শুরু করলো।

শুয়াইব আরমুগানী মুসলমান হলেও তার প্রতি কারো সন্দেহ করার অবকাশ ছিলো না। কারণ, সে ছিলো আস্তাবলের প্রধান। ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ করা এবং আস্তাবল দেখাশোনার মধ্যে তার কার্যক্রম ছিলো সীমিত। তাকে সন্দেহ করার একটিমাত্র অজুহাত ছিলো যে, সে একাকী থাকতো। পেশোয়ারে তার স্ত্রী-সন্তান থাকলেও তাদের সে কখনো লাহোর আনেনি। সে অবিবাহিত হলে অতোদিনে তার বিয়ে করার প্রয়োজন ছিলো। এদিক থেকে তাকেও সন্দেহ করা যেতো কিন্তু এসব ব্যাপারে তাকে সবাই সন্দেহের বাইরে রেখেছিলো। তার সম্পর্কে অনেকেই জানতো, সে সুলতান মাহমূদ সম্পর্কে খুবই নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। সে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলে। তাকে কেউ কখনো মসজিদে যেতে দেখেনি। কোন মুসলমানের সাথে মিশতেও তাকে দেখা যায়নি।

এক সন্ধ্যায় তার বসতঘরে সে একাকী বসেছিলো। এমন সময় তার দরজায় কে যেনো টোকা দেয়। সে উঠে এসে দরজা খুলে দেয়। বাইরে দাড়িওয়ালা এক পৌঢ়ের সাথে বোরকা পরিহিতা এক যুবতী দাঁড়িয়ে। পুরুষটি নিজের পরিচয় দিয়ে জানালো, সে পেশোয়ারের অধিবাসী। একজন ব্যবসায়ী। সে ব্যবসায়িক কাজে এখানে এসেছে। তার মা মরা মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে

আসতে হয়েছে। কারণ, বাড়িতে কারো কাছে রেখে আসার মতো লোক তার নেই। মেয়েটির মা দু'বছর আগে মারা গেছে। মেয়েটিও বেড়ানোর জন্য আগ্রহী ছিলো। এ জন্য তাকে আর রেখে আসার চিন্তা করিনি।

লোকটি পেশোয়ারের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছিল। মুসাফিরদের জন্যে সরাইখানায় থাকার ভালো ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এমন সুন্দরী যুবতী মেয়েকে সরাইখানায় রেখে আসা ঠিক মনে করিনি। শুনেছি, হিন্দু সেনারা হঠাৎ করে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালায় আর সন্দেহের নাম করে মুসলমানদের বন্দী করে। এক লোক আপনার কথা বলে দিলো। বললো, সে খুব ভালো মানুষ। একাকী থাকে। আপনি মেয়টিকে নিয়ে তার বাড়িতে চলে যান। সেই লোকটির মুখে আপনার খুব প্রশংসা শুনলাম। সে-ই আমাকে আপনার বাড়ির পথ দেখিয়ে দিয়েছে। লোকটি বললো, আপনার বাড়িও নাকি পেশোয়ারে।

কোনো মুসলমান অসহায় মুসাফিরের জন্যে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে পারে না। যেখানে একটি মুসলিম তরুণীর ইজ্জতের প্রশ্ন, সেখানে আমি প্রয়োজনে সারারাত পাহারা দিয়েও কাটাতে পারি। মুসলমান অপরিচিত হলেও পর হতে পারে না। আসুন, আপনার মেয়েকে ঘরের ভেতর নিয়ে আসুন। আমার ঘরে কয়েকটি কক্ষ আছে।

লোকটি তরুণী মেয়েটিকে নিয়ে ঘরের ভেতর প্রবেশ করলো। তরুণী বাতির আলোয় যখন তার চেহারার নিকাব ফেলে দিলো, তখন শুয়াইব আরমুগানী তার চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলো।

মেয়েটি কোনো সাধারণ তরুণী ছিলো না। তার চেহারা ছিলো চাঁদের মতো আকর্ষণীয়। তরুণীর রূপ দেখে আরমুগানীর মুখ থেকে আচমকা উচ্চারিত হলো, আপনি সরাইখানায় না থেকে ভালো করেছেন। ঢেকে রাখার মতো জিনিসকে একটি নয়, সাত পর্দার আড়ালে রাখাই উচিত।

আগন্তুককে বসিয়ে রেখে দৌড়ে বাজারে গেলো আরমুগানী। বাজার থেকে মেহমানদের জন্যে খাবার নিলো। ততক্ষণে তরুণী বোরকা খুলে মাথার উড়নাও খুলে ফেলেছে। বে-নেকাব তরুণীর রূপ-সৌন্দর্য দেখে আরমুগানী আর তরুণীর চেহারা থেকে দৃষ্টি সরাতে পারলো না।

রাজপ্রাসাদের চাকরির সুবাদে কয়েকজন সুন্দরী তরুণী আরমুগানীকে বাহুডোরে বাঁধতে চেয়েছিলো। কিন্তু আরমুগানী কারো বাঁধনেই নিজেকে আবদ্ধ করেনি। রাজা আনন্দ পালের দু'রাজকুমারী আরমুগানীর কাছে অশ্বারোহণ শিখতে আসতো। এরা উভয়েই চেষ্টা করতো তারা নিজে নিজে ঘোড়ার পিঠে

ওঠে বসবে না, আরমুগানী যাতে হাত ধরে তাদের ঘোড়ার পিঠে তুলে দেয়। তারা অশ্বারোহণ শিখে ফেলেছিলো, তবুও বারবার শেখার জন্যে আসতো আর বলতো, এখনো তারা ভালোভাবে অশ্বারোহণ করতে পারে না।

উভয় রাজকুমারী ছিলো সুন্দরী-রূপসী। তাদের পরিষ্কার ইঙ্গিতপূর্ণ আবেদনগুলোও আরমুগানী এভাবে এড়িয়ে যেতো, সে এতোটাই গেয়ো যে এসব বোঝে না। অথবা এমন ভাব করতো যে, তার বুকের মধ্যে পুরুষের আত্মাই নেই।

একবার এক রাজকুমারী ঘোড়া হাঁকিয়ে তাকে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানকার এক নিরিবিলি বনানীতে রাজকুমারী আরমুগানীকে অনুরোধ করে বলে, সে যেনো তার পেছনে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে। কারণ, তার পড়ে যাওয়ার ভয় হচ্ছে। রাজকুমারী প্রথমে বন্ধুত্বের সুরে বললো, আরে এসো না! আমাকে ধরে রাখো। কিন্তু আরমুগানী তার সহ-সওয়ার হতে অস্বীকৃতি জানালো। কয়েকবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে রাজকুমারী নির্দেশের সুরে তার ঘোড়ায় চড়তে বলে। এবার মুচকি হেসে আরমুগানী এড়িয়ে গেলো, তবুও একই ঘোড়ার পিঠে রাজকুমারীর সাথে বসতে রাজি হলো না। এতে রাগ করে রাজকুমারী ঘোড়া ফিরিয়ে প্রাসাদে চলে এসেছিলো।

নারীদের ব্যাপারে আরমুগানী ছিলো পাথর। কিন্তু এবার সে নিজের ঘরে আসা মেহমানের তরুণী মেয়েকে দেখে নিজের মধ্যে ঝড় অনুভব করলো। এক প্রবল আকর্ষণ তাকে তরুণীর দিকে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করতে লাগলো। সে তরুণীর সাথে কথা বলার জন্য মনের মধ্যে তাড়না বোধ করলো। সেই সাথে মনে মনে এ কথাও সে ভাবতে লাগলো, এর মধ্যে তার কোন অসৎ উদ্দেশ্য নেই তো! সে চাচ্ছিলো, তার মেহমান যদি বাইরে চলে যেতো, তবে এখানেই সে তরুণীর সাথে আলাপ জমাতে পারতো। তরুণী যখন শুয়াইব আরমুগানীর দিকে তাকাতো, তখন তার ঠোঁটের কোণার ঈষৎ মুচকি হাসিটা আরমুগানীর মধ্যে এক তাণ্ডব শুরু করে দিচ্ছিলো।

রাতের আহার পর্ব সেরে আরমুগানী মেহমানদের রাত যাপনের জন্য অন্য দু'টি কক্ষ দেখিয়ে দেয়। তরুণী দেখিয়ে দেয়া কক্ষে শুয়ে পড়ে। কিন্তু তরুণীর বাবা ফিরে এসে আরমুগানীর পাশে বসে।

রাতের অবসরে তারা নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলতে থাকে। এক পর্যায়ে মেহমান বলে, আমি মুসলমান হিসেবে সুলতান মাহমূদের অব্যাহত বিজয়ে গর্ববোধ করি। মেহমানের কথাবার্তায় প্রকাশ পাচ্ছিলো, সে সুলতান মাহমূদের

খুবই ভক্ত এবং তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। সে শুধু একজন ব্যবসায়ী নয়, জ্ঞান-গরিমা ও বেশ উঁচুমানের লোক মনে হলো তার আলাপচারিতায়। সে মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রসঙ্গেও আলোচনা করলো। এখনও যদি সেই চেতনায় সুলতান মাহমূদ অগ্রসর হন, তাহলে সারা হিন্দুস্তান মুসলমানদের কব্জায় নিয়ে আসা সম্ভব। মেহমান এই আশংকাও ব্যক্ত করলো, সুলতান মাহমূদের কাছে সৈন্য বাহিনী কম। হিন্দুস্তানের সকল রাজা-মহারাজা মিলে যদি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহলে সুলতান মাহমূদের পক্ষে পেরে ওঠা অসম্ভব।

আরমুগানী মেহমানের বুদ্ধিদীপ্ত কথায় খুবই খুশি হলো এবং বললো, মুসলমানদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। সুলতানের সৈন্যরা আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে যুদ্ধ করে।

"তা ঠিক। কিন্তু শুধু সেনাদের যুদ্ধ করাই যথেষ্ট নয়। সকল মুসলমানেরই উচিত কিছু না কিছু করা। দেখুন, আমরা দু'জন মুসলমান এখানে আছি। আমরা মুসলিম বাহিনীর জন্য কি করেছি? অথচ তারা জীবনবাজি রেখে কাফেরদের দেশে ইসলামের পতাকা তুলে ধরেছে। আর আমি এখানে ব্যবসা করছি, আপনি বেঈমানদের নৌকরী করছেন।" মেহমান বললো।

"এখন করছি বটে। প্রয়োজনে আমি চাকরি ছেড়ে দেবো।"

"না ভাই। চাকরি ছাড়ার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাকে দেখতে চেয়েছিলাম, আপনি কোন্ পর্যায়ের মুসলমান। এখন বুঝতে পারছি, আপনি ইসলামের জন্যে মরণ স্বীকার করতে প্রস্তুত। এখন আমি আপনার সাথে মন খুলে কথা বলতে পারবো। আপনি চাকরি ছেড়ে দেয়ার কথা বলছেন। এটা ঠিক হবে না। চাকরিটাকে আপনি সুলতান মাহমূদের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারেন। আপনি আস্তাবলের প্রধান এবং প্রশিক্ষক। অশ্বারোহণ প্রশিক্ষক হওয়ার সুবাদে হিন্দু সেনা কর্মকর্তাদের ছেলে-মেয়েরা আপনাকে খুবই পছন্দ করে বলে আমাকে জানিয়েছে সেই লোক– যে লোকটি আমাকে আপনার বাড়ির পথ দেখিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, শাহ্জাদীরা ও উজির-মন্ত্রীদের তরুণী মেয়েরাও আপনাকে ভালোবাসে। আপনার আর কিছু করার দরকার নেই, শুধু এতোটুকু জানতে চেষ্টা করবেন, রাজার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? এখানকার প্রস্তুতি ও তৎপরতা দেখে-শুনে সুলতান মাহমূদের কাছে সুযোগ মতো খবর পাঠিয়ে দেবেন।"

"আপনি এ ধরনের কাজ করেন নাকি?"

একটা রহস্যময় হাসি দিয়ে মেহমান বললো, "আসলে আমি যথার্থই একজন ব্যবসায়ী। কিন্তু ব্যবসায়িক কাজে আমার লাহোর আসার কোন প্রয়োজন ছিলো না। আমি উট বোঝাই করে মালপত্র নিয়ে এ জন্যে লাহোর এসেছি যাতে এখানকার পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পারি। রাজা আনন্দ পাল কি করেছে, তার রণপ্রস্তুতি কোন্ পর্যায়ে এবং কবে নাগাদ সে মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করেছে– এসব জানাই হলো আমার মূল উদ্দেশ্য। ওদিকে সুলতানের কিছুটা সময় দরকার। কাশগরীদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে তার বিপুল সৈন্য হারাতে হয়েছে। সেনাবাহিনীকে পুনরায় তৈরি করার জন্যে তার কিছুটা সময় একান্তই দরকার।"

"আপনাকে কেউ পাঠিয়েছে? না আবেগের টানেই আপনি এ কাজ করছেন?"

"আমি কোনো মাধ্যম হয়ে কাজ করি না। সরাসরি আমার সম্পর্ক সুলতান মাহমূদের সাথে এবং তার প্রধান সেনাপতি আবু আবদুল্লাহ আল-তায়ীর সাথে। এখানে আমার এমন একজন লোকের দরকার যে রাজ-দরবার ও রাজমহলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে খবর রাখে, আর সেই লোকটি আপনি। যে লোকটি আমাকে বাড়ির পথ দেখিয়ে দিয়েছে সে আমার বিশ্বস্ত। সে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে বুঝে-শুনেই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে।"

"সে কে?"

"সে কথা আমি আপনাকে বলতে পারবো না। তাতে আপনি এমনটা মনে করবেন না আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি না। আমি সবই আপনাকে জানাবো কিন্তু আপনাকে এ প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, আপনি আমার কাজে সহযোগিতা করবেন? যদি আপনি আমাকে ধোঁকা দেন তাহলে পস্তাতে হবে।"

মেহমানের এসব কথা শুনে আরমুগানীর মাথা নীচু হয়ে গেলো। সে গভীর চিন্তায় পড়ে গেলো।

"আপনি একটু ভেবে দেখুন। সুলতান মাহমূদের প্রয়োজনে আমি আমার তরুণী মেয়েকে পর্যন্ত ব্যবহার করার জন্যে তৈরি হয়ে গেছি।" প্রচণ্ড আবেগে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো মেহমান। "এমন রূপসী তরুণী যে প্রয়োজনে পাথর ভেঙ্গে ভেতরের তথ্য বের করে আনতে পারবে। এমনও হতে পারে যে, এখানে আমাদের কোনো নাশকতামূলক তৎপরতা চালাতে হবে।"

"আমার দু'টি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।" বললো আরমুগানী।

"মেয়েদেরকে কখনো এ কাজে ব্যবহার করবেন না। মুসলমান মেয়েরা প্রয়োজনে লড়াই করে, অতীতে বহু ক্ষেত্রে মেয়েরা ময়দানে লড়াই করেছে। কিন্তু গোয়েন্দা কাজের জন্য তাদেরকে কাফেরদের মনোরঞ্জনের জন্যে ছেড়ে দেবেন না। এটা সম্পূর্ণ হারাম। এ ঘৃণ্য কাজ বেঈমানরা করে। মুসলমানরা নারীর ইজ্জত রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে- ইজ্জত বিকিয়ে দেয়ার জন্য নয়। দ্বিতীয় কথা হলো, আমি আপনার কোনো সহযোগিতা করতে পারবো না। আমি রাজার খাই, রাজার সেবা করি। রাজা আমাকে এতো পারিশ্রমিক দিচ্ছেন যে তা আমার শ্রমের তুলনায় বহুগুণ বেশি।"

"হু, একদিকে আপনি ইসলামী চেতনা ও মর্যাদার কথা বলেন, আর অপরদিকে বেঈমানদের নিমক হালালী করেন। অথচ আমি শুনেছিলাম আপনি খুবই সাহসী ও নির্ভেজাল ঈমানদার মানুষ।"

"এই উভয়টাই আমার মধ্যে আছে। সাহসও আমার আছে, ঈমানেও কোনো ঘাটতি নেই। কিন্তু তাই বলে মুসলমান নিমকহারাম হয় তা আমি বলতে পারবো না।"

"তাহলে তো তাড়াতাড়ি আমার লাহোর ছাড়া দরকার। কারণ, আপনি আমাকে ও আমার মেয়েকে ধরিয়ে দিতে পারেন। এখানকার বিশ্বস্ত লোকেরা আমাকে বলেছে, সন্দেহ হলেই মুসলমানদেরকে রাজার সৈন্যরা পাকড়াও করছে।"

চকিতে বসা থেকে ওঠে তাক থেকে কুরআন শরীফ নামিয়ে মেহমানের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, পবিত্র কিতাবের শপথ করে বলছি, আমি আপনাকে ও আপনার মেয়েকে কখনো ধরিয়ে দেবো না। আপনার সাথে কোনো ধরনের ধোঁকাবাজি করবো না। এখন আপনি শপথ করে বলুন, এ কাজে আপনি আপনার মেয়েকে কখনো ব্যবহার করবেন না। আর আপনি সুলতান মাহমূদ গজনবীকেও ধোঁকা দেবেন না।"

মেহমান কালবিলম্ব না করে কুরআন শরীফ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো, "মেয়ের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে আপনি আমার উপর জুলুম করেছেন। আপনি জানেন না আমি কী ভয়ানক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছি। যদি আমি ধরা পড়ে যাই তাহলে আমার মেয়েকে করুণ পরিণতি বরণ করতে হবে। আপনি কি এ মুহূর্তে আমার মেয়ের দায়িত্ব নিতে পারবেন? কিছুক্ষণ তাকে আপনার এখানে রাখতে পারবেন? এ অবসরে আমাকে ব্যবসায়িক কাজে একটু বাইরে কাটাতে হবে।"

“কোনো তরুণী মেয়েকে অনাত্মীয়ের ঘরে রাখা অশংকাজনক কাজ। কিন্তু আমি আপনার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারছি না, আবার গ্রহণ করতেও ভয় পাচ্ছি।”

মেহমান বণিক বসা থেকে ওঠে ঘরের মেঝেতে মাথা নীচু করে পায়চারী করতে থাকে। কিছুক্ষণ ভেবে বললো, “আমি যদি আপনার কাছে আমার মেয়েকে পেশ করি, তাহলে আপনি তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হবেন? আমি চাচ্ছি, নিজেই ওর বিয়ে পড়িয়ে দেবো।”

“আপনি আমার মধ্যে এমন কি গুণ দেখতে পেলেন যে এমন সুন্দরী মেয়েকে আমার মতো একটা সাধারণ লোকের সাথে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন? আমি নিজেকে আপনার মেয়ের জন্য উপযুক্ত মনে করি না।”

“তোমার সবচেয়ে বড় গুণ তুমি গোয়েন্দা নও। এ জন্যই আমি তোমাকে যাচাই করতে চাচ্ছিলাম, তুমি গোয়েন্দাগিরি করো কিনা। তুমি একজন বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী। এদিক থেকে আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ নিরাপদ। কারণ, গোয়েন্দাদের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। তারা তাদের স্ত্রী-সন্তানদের সাথে রাখতে পারে না। আমার মেয়ের জন্যে বহু বিত্তশালী পাত্র আছে। পেশোয়ারে অবস্থানকারী এক ডেপুটি সিপাহসালার আমার মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহী। কিন্তু আমি সম্মতি দেইনি। আমি কোনো বিত্তশালীর কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে চাই না। কারণ, ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এক বিবিতে সন্তুষ্ট থাকে না।”

মেহমানের বিয়ের প্রস্তাবের কথা নিজের কানে শুনেও শুয়াইব আরমুগানীর যেনো বিশ্বাস হচ্ছিলো না। কারণ, এই তরুণীকে প্রথম দর্শনে সে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেছে। মেয়ের বাবা নিজ থেকে বিয়ের প্রস্তাব করায় তার পক্ষে এ ব্যাপার নিয়ে আর ভাবনা-চিন্তা করা অপ্রীতিকর মনে হচ্ছে। তারপরও আরমুগানীর মাথায় বিক্ষিপ্ত ভাবনারা ভীড় করছে।

“আমি আজ সন্ধ্যায় আবার আসবো।” এই বলে আরমুগানীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মেহমান। এখন আরমুগানী আর তরুণী ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই।

সকাল বেলা। নাস্তার আয়োজন করে আরমুগানী তরুণীর সামনে রেখে বললো, “তোমার নাম কি?”

মেয়েটির সলজ্জ উত্তর, “যারকা।”

“আমার সাথে তোমার বিয়ে হচ্ছে। তোমার বাবা কি তোমাকে একথা বলেছেন?”

আরমুগানীর কথা শুনে তরুণী লজ্জায় মাথা এতোটাই নীচু করে ফেললো যে, সে যেনো লজ্জায় মারা যাচ্ছে।

"আরে এতো লজ্জা কিসের? আমার কথার জবাব দাও যারকা?" আরমুগানী তরুণীর চিবুক ধরে মাথা উপরে তুলে বললো। "আমাকে ভালো করে দেখে নাও। আমাকে যদি তোমার পছন্দ না হয় তাহলে পরিষ্কার বলে দাও। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সারা জীবনের জন্যে আমি তোমাকে শিকলে বাঁধতে চাই না। তুমি অসম্মত হলে আমি তোমার বাবাকে খোলাখুলি নিষেধ করে দেবো। বলবো, এ বিয়ে হবে না।"

তরুণী মুখে কিছুই বললো না। আরমুগানীর ডান হাতটি টেনে নিয়ে চুমু দিলো এবং চোখে চোখ রাখলো তরুণী।

প্রায় যৌবনের শুরু থেকেই অশ্বারোহণ ও অশ্ব প্রশিক্ষণে কেটেছে আরমুগানীর জীবন। অশ্বলোমের স্পর্শে ঘোড়ার গায়ে হাত বুলাতে অভ্যস্ত সে। সে কখনো অনুভব করেনি কোনো যুবতী তরুণী সুন্দরীর এমন মায়াবী স্পর্শ, শরীর জুড়ে শিহরণ। এমন ভুবন মোহিনী চাহনী, এমন নজরকাড়া দৃষ্টি, এমন রেশম কোমল স্পর্শের সাথে আরমুগানী অপরিচিত। হঠাৎ রূপসীর এই অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শ ও আত্মনিবেদনে আবেগে আত্মহারা হয়ে গেলো আরমুগানী।

সন্ধ্যায় যারকার বাবা যখন ফিরে এলো, তখন তার সাথে এলো আরও দু'জন। তারা এসে শুয়াইব আরমুগানীর সাথে যারকার বিয়ে পড়িয়ে দিলো। যারকার পিতা যারকাকে বিয়ে উপলক্ষে দামি দামি কাপড়, গহনাপত্র এবং প্রচুর নগদ অর্থ উপঢৌকন দিলো।

বিয়ে পর্ব সেরে রাতেই যারকার বাবা আরমুগানীর ঘর থেকে বিদায় নেয়। তার যাওয়ার ভঙ্গিটা এমন ছিলো, সে যেনো যারকার বিয়ে দিতেই এখানে এসেছিলো। সেই রাতে শুয়াইব আরমুগানীর সংশয় হচ্ছিলো, কোনো স্বপ্ন দেখছে না তো?

যারকার বাবা চলে যাওয়ার একটু পরে যারকা আরমুগানীর সাথে এমন অন্তরঙ্গ মনোভাব পোষণ করছিলো যেনো আরমুগানী তার অনেক দিনের পরিচিত। মনে হচ্ছিলো, দীর্ঘদিন থেকে সে আরমুগানীকেই মনের একান্ত পুরুষ হিসেবে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলো। যারকার আত্মনিবেদনে আরমুগানী এতোটাই আত্মহারা যে, মনে হচ্ছিল ঝর্নার তীরে এসেও সে তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছে।

"তোমার বাবা সুলতান মাহমূদের ব্যাপারে বেশি আবেগপ্রবণ।" যারকার উদ্দেশ্যে বললো আরমুগানী। "আচ্ছা তুমি কি বলতো পারো তার এসব বলার উদ্দেশ্য কি?"

"আমি যদি বলি, বাবা যে ইচ্ছা পোষণ করেন, আমিও তাই পোষণ করি। তাহলে আপনি আমার এ ইচ্ছাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? বাবা আপনার সাথে যেসব কথা বলেছেন, তিনি সবই আমাকে বলে গেছেন।"

"এ কথাও কি তিনি বলেছেন, তার গোয়েন্দা কাজে সহযোগিতার জন্য তুমি যাতে আমাকে সম্মত করাও?"

"হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনার সাথে এখন আর আমার কিছু লুকানোর নেই। তিনি আমাকে বলে গেছেন, আমি যাতে বলে-কয়ে আপনাকে তার সহযোগিতা করতে উৎসাহিত করি। কারণ, রাজা আপনাকে এমন দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন, যেখান থেকে আপনি খুব মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।"

"এ জন্যই কি তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছো? আমার তো মনে হয়, এ কাজের পুরস্কার হিসেবে আমার হাতে তোমাকে তুলে দেয়া হয়েছে।"

"না না, তা নয়। পুরস্কার মনে করতে পারেন। তবে তা আল্লাহ্ আপনাকে দান করেছেন। কোনো ব্যক্তি দেননি। আপনি এখন শুধু আমার জীবন সঙ্গী নন, আপনি আমার মনের শান্তি, হৃদয়ের অধিপতি। আমি গতকালই আপনাকে প্রথম দেখেছি। অথচ আমার মনে হচ্ছে, কতকাল ধরে আপনি আমার একান্ত পরিচিত। এখন থেকে আপনিই আমার সুখ, আপনিই স্বপ্ন, আপনিই বাস্তব। এখন আপনিই আমার হৃদয় রাজ্যের অধিকারী। আপনার কোনো সংশয়-সন্দেহ পোষণের কারণ নেই। বাবা আপনাকে ইসলামের জন্যে আত্ম-উৎসর্গকৃত পতঙ্গ মনে করতে পারেন। তিনি এতোটাই উদগ্রীব যে, পারলে একাই সারা হিন্দুস্তান ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসবেন। আমি দেখেছি, তিনি যতো মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, সবাইকে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন, সুলতান মাহমূদের বিজয় অভিযানে প্রত্যেক মুসলমানের করণীয় রয়েছে। মসজিদে গিয়ে তিনি দীর্ঘ সময় সুলতানের বিজয় ও হিন্দুদের পরাজয়ের জন্য দুআ করেন। তিনি নিজে আমাকে তরবারী চালনা, অশ্বারোহণ ও তীরন্দাজী শিখিয়েছেন। একবার তো তিনি আবেগে আমার উদ্দেশে বলেই ফেললেন, বেটি! হতে পারে আমি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবো না, এর আগেই ইসলামের জন্য তোমার কুরবান হয়ে যেতে হবে।"

যারকার কথায়ও আরমুগানী বুঝতে বাধ্য হলো, এ মেয়েটিও তার বাবার মতোই আবেগপ্রবণ।

"এ কথা তোমাদের কে বলেছে যে, আমি গজনীর গোয়েন্দা?"

যারকা এ সময় এক হাত আরমুগানীর কাঁধে তুলে নিজেকে এতোটাই কাছে নিয়ে এলো যে, তার ললাট আরমুগানীর ললাট স্পর্শ করছে। "বাবাকে এ ব্যাপারে কে কি বলেছে তা আমি জানি না। তিনি আমাকে শুধু বলেছেন, আমরা যার কাছে যাচ্ছি তিনি খুবই কাজের লোক। আপনি যদি সত্যিই বলে থাকেন যে, আপনি সুলতান মাহমূদের গোপন দলের লোক নন, তাহলে সেটা হবে আমার জন্য হতাশার কারণ।"

"তাহলে কি মনে-প্রাণে তুমি আমাকে ভালোবাসা দিতে পারবে না?"

"এ কথা বলছেন কেন? ভালবাসা ভিন্ন জিনিস। একবার মনের মণিকোঠায় যার ঠাঁই হয়ে যায়, দুনিয়ার কোনো স্বার্থের কারণে তা নষ্ট হতে পারে না। আমার হৃদয় রাজ্যে আপনার আসন পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। আমি আপনাকে বোঝাতে চাচ্ছি, আমি এমন একটা কার্যকর পদক্ষেপ দেখতে চাই, যাতে গোটা হিন্দুস্তান না হোক অন্তত অর্ধেক হিন্দুস্তান ইসলামী পতাকার ছায়ায় স্থান পায়। যাতে এখানকার অনাগত প্রতিটি শিশু মুসলমান হিসেবে পৃথিবীর আলো-বাতাসে বেড়ে উঠতে পারে।

"তোমাকে এ কথা কে বলেছে যে, শুধু গোয়েন্দাগিরির দ্বারাই সুলতান মাহমূদকে সহযোগিতা করা যাবে। গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ ছাড়াও তাকে আরো সহযোগিতা করার বহু পদ্ধতি রয়েছে।"

"বাবা শুধু গোয়েন্দাগিরির কথাই আমার কাছে বলেছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, নারীরা নাকি গোয়েন্দা কাজে বেশি সহযোগিতা করতে পারে। বাবা বলেছেন, আপনি নাকি এ কাজে আমাকে ব্যবহার না করার জন্য তাকে কুরআন শরীফ হাতে তুলে দিয়ে শপথ করিয়েছেন। আমিও এমন কোনো কাজ করতে পারবো না যে ক্ষেত্রে আমার ইজ্জতের উপর আঘাত আসতে পারে। তবে এ কথাও ঠিক, শুধু আপনার বিবি হয়ে ঘরে বসে থাকাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার হয়ে আপনি সে কাজ করুন যা বাবা আপনাকে বলে গেছেন। তাতেই আমার আত্মা শান্তি পাবে।"

শুয়াইব আরমুগানী যারকার এ আবেদনের কোনো সান্ত্বনাদায়ক জবাব দিতে পারেনি।

* * *

সেদিন থেকেই ঘরের প্রতি আরমুগানীর আকর্ষণ বেড়ে যায়। সে এখন কাজের মধ্যে সময় বের করে ঘরের পথ ধরে। ঘরে কিছুক্ষণ যারকার সাথে কাটিয়ে আবার কাজে যায়। যারকা এখন আরমুগানীর স্ত্রী। কিন্তু আরমুগানী

তাকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েও স্বস্তি পাচ্ছে না। বারবার সে যারকার দিকে এমনভাবে তাকায়, যেনো যারকাকে কেউ কোনো সময় তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার আশংকা আছে। আরমুগানীর সীমাহীন ভালোবাসার বিপরীত যারকাও তাঁর প্রতি আত্মোৎসর্গকৃত মনোভাব পোষণ করে, তার প্রেমে যারকা যে চরম সুখী তা অকপটে প্রকাশ করে। আর প্রতি রাতেই সে আরমুগানীকে প্ররোচনা দেয় ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণে আরমুগানী যেনো অবশ্যই তার বাবার কাজে সহযোগিতা করে। সুলতান মাহমূদের বিজয়ের জন্য অবশ্যই আরমুগানী যেনো কিছু একটা ভূমিকা রাখে। সেই সাথে যারকা আরমুগানীর প্রতি সীমাহীন বিশ্বস্ততার প্রকাশ ঘটাতে থাকে। সুলতান মাহমূদের সাফল্যের চিন্তায় সে বারবার আবেগে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। যেনো সুলতান মাহমূদের অমঙ্গল হলে সে মরেই যাবে।

* * *

বিয়ে পরবর্তী উষ্ণতা, আবেগ ও পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসার মুগ্ধতার মধ্যে কিভাবে কেটে গেলো দশ-বারো দিন তা আরমুগানী টেরই পায়নি। দশ-বারো দিন পর এক রাতের প্রায় দ্বিপ্রহর। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ভালোবাসার উষ্ণতায় পরিতৃপ্ত। যেনো উভয়ের শরীর বেয়ে প্রেম গলে গলে পড়ছে। রাত বাড়ছে। দিনভর ক্লান্তিকর শ্রমের কারণে আরমুগানীর দু'চোখ বুজে আসছে। যারকা আরমুগানীর গলায় নিজেকে জড়িয়ে বলে, "আপনার শরীরের উষ্ণতা, আপনার ভালোবাসা, আপনার সৌন্দর্য আমাকে যেনো বেহেশ্‌তে পৌঁছে দিয়েছে। সত্যিই আমার মনে হয় জান্নাত এর চেয়ে মোটেও বেশি সুখের নয়। কিন্তু এতো ভালোভাসা, এতো প্রেম, এতো সুখের মধ্যেও আমার চোখে যখন দীনের জন্যে শাহাদাতবরণকারী যোদ্ধাদের ছবি ভেসে ওঠে, তখন আমার মনটা বিষিয়ে ওঠে। মনে হয় শহীদদের আত্মাগুলো আমার এই সুখানন্দে অভিশাপ দিচ্ছে। আমার কানে যেনো ধ্বনিত হয় শহীদদের কণ্ঠ, তুমি প্রেম ভালোবাসায় ডুবে আছো! আমাদের আত্মার শান্তি আর আত্মত্যাগকে সফল করার পরিবর্তে অলস সময় কাটাচ্ছো!"

আরমুগানীকে দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে, "প্রিয়তম! তুমি আমার আত্মার এই আকুতিটুকু মেরে ফেলো। যাতে আমি শুধু একটা সুন্দরী পুতুলে পরিণত হয়ে যাই। নয়তো আমার কাছে মনে হয় শহীদদের অসমাপ্ত মিশন যদি আমরা পূর্ণ করতে না পারি, তাহলে আমরা মুসলমান হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেয়ার অধিকার রাখি কি? এমন হলে ধর্মই ত্যাগ করা উচিত।"

এমনিতেই যারকার আত্মনিবেদন, কথার জাদুমালা আর রূপ-সৌন্দর্যে আরমুগানীর মধ্যে জন্ম নেয় ভাবালুতা। আবেগে তার মনের গোপন বাঁধ ছিঁড়ে যাওয়ার দশা। এর মধ্যে যারকার এই কাব্যিক কথামালা আর হৃদয় গলানো নিবেদন তাকে আরো বেশি উদ্বেলিত করে তোলে। যারকার ভালোবাসা আরমুগানীর বোধজ্ঞান কর্তব্য ও অঙ্গীকারকে পরাভূত করে ফেলে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে অন্তরের গোপন কুঠরীতে পুষে রাখা রহস্যের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে আরমুগানী। সে বলে, "যারকা! আমি মসজিদে বসে হাতে কুরআন শরীফ নিয়ে শপথ করে বলেছিলাম, জীবন দোবো কিন্তু আমার বন্ধুদের কথা কারো কাছে প্রকাশ করবো না। কিন্তু আজ আমি নির্দ্বিধায় শপথ ভেঙ্গে দিচ্ছি এ কারণে যে, এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে তুমি শুধু আমার বিবাহিতা স্ত্রীই নও, তুমি আমার সেইসব বন্ধু ও সহকর্মীদের মতোই বিশ্বস্ত, যারা পেশোয়ার থেকে এখানে আসার আগে কুরআন শরীফ নিয়ে নিজেদের আত্মপরিচয় গোপন রাখার শপথ নিয়েছিলো। যারকা, শোন! তোমাকে আমার গোপন ভেদ বলে দিচ্ছি। আমি গজনী সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা। যৌবনেই আমি গজনী সেনাবাহিনীতে গোয়েন্দা বিভাগে প্রশিক্ষণ নিয়েছি এবং প্রশিক্ষণের পর কর্তা ব্যক্তিরা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, যতো বেয়াড়া ঘোড়াই হোক না কেন আমার হাতে তাকে বশ মানতেই হবে। তাছাড়া আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আমার রয়েছে। এখানে আসার পর আমার এই গুণের কথা জানতে পেরে রাজা আমাকে আস্তাবলের প্রধান নিয়োগ করেন।... সেই দায়িত্ব পালনে আমার ত্যাগের কথা চিন্তা করলে তুমি পেরেশান হয়ে যাবে যারকা। যৌবনের সব আকাঙ্ক্ষাগুলোকে কর্তব্য পালনের প্রয়োজনে গলাটিপে মেরে ফেলেছি। এখনো পর্যন্ত বিয়ে করিনি। বছরের পর বছর আমি সম্পূর্ণ একাকী কাটিয়েছি। তোমার মতো বহু সুন্দরী রূপসী আমাকে প্রেম নিবেদন করেছে। এমনকি রাজ কুমারীরাও আমাকে একান্তে পাওয়ার জন্য বহু লোভ দেখিয়েছে। প্রেমের আবেদন প্রত্যাখ্যান করায় আমাকে হত্যা করানোর ভয়ও দেখিয়েছি। তবুও নারীর ব্যাপারে আমি পাথর ছিলাম। লাহোর ও বাটান্ডায় গজনীর যতো গোয়েন্দা, সব আমার কমান্ডের অধীনে। যতোবার হিন্দুরা আমাদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালনা করেছে, আমার সহকর্মীরা আগেভাগেই এ খবর সুলতানের কাছে পৌছে দিয়েছে। যার ফলে সুলতান পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে হিন্দু সেনাদের ফাঁদে ফেলে কচুগাছের মতো কেটেছে।

যারকা! আমরা হলাম সেই চোখ, যে চোখ দিয়ে সুলতান গজনীতে বসেও এখানকার প্রকৃত পরিস্থিতি দেখতে পান। আমরা হলাম সেই কান, যে কানের

দ্বারা সুলতান গজনীতে থেকেও লাহোর থেকে কয়টি ঘোড়া তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পান। আমার সহকর্মীরা লাহোরে হিন্দু বাহিনীর রসদপত্র জ্বালিয়ে দেয়ার মতো দুঃসাহসী কাজও সাফল্যের সাথে সম্পাদন করেছে। এখন রাজা আনন্দ পাল পুনর্বার সুলতানের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা আবারও তাদের রসদপত্রে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালাবো, যাতে সুলতান যুদ্ধের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পান।

যারকা! আমার পক্ষে একথা বলা সম্ভব নয়, আর কতদিন আমি তোমায় সঙ্গ দিতে পারবো। তুমি এমন একজন মানুষের সাথে নিজেকে জড়িয়েছো, যার মাথা জল্লাদের তরবারীর নীচে ঝুঁকানো। তোমার বাবাকে আমার এই গোপন পরিচয়ের কথা বলা সম্ভব ছিলো না। কারণ, তার পরিচয় আমার অজ্ঞাত।"

যারকা আরমুগানীকে বুকে জড়িয়ে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বললো, "আপনি আমার হৃদয়কে আনন্দে ভরে দিয়েছেন। আপনার এই কর্তব্য পালনের কথা শুনে আমার দারুণ সুখ লাগছে। আমি ভীষণ গর্ব অনুভব করছি। আমি আপনার সাথে এ মর্মে অঙ্গীকার করছি, আমাকে আপনি যে কোন কঠিন কাজেই ব্যবহার করুন না কেন। আমি ঠিকই সাফল্যের সাথে সেই কাজ সম্পাদন করতে পারবো। আমাকে যদি আপনি কোনো জায়গায় আগুন লাগাতে বলেন কিংবা আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেন, তাতেও আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবো না।"

"আমি নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তোমাকে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে দেবো না। আমি যদি গ্রেফতার হওয়ার আশংকা বোধ করি কিংবা আমার জীবনহানীর আশংকা সৃষ্টি হয়, তবে বহু আগেই আমি তোমাকে বলে দেবো, আমার অবর্তমানে তোমাকে কোথায় আশ্রয় নিতে হবে।"

"আপনার দু'একজন সহকর্মীর নাম-ঠিকানা আমাকে বলুন। আপনার ঘরে ফিরতে দেরি হলে বা কয়েক দিন বাড়ি ফেরার সুযোগ না পেলে আমি যাতে আপনার খোঁজ-খবর তাদের কাছ থেকে নিতে পারি।"

"না যারকা! আমরা নিজের মায়ের কাছেও বন্ধুদের পরিচয় প্রকাশ করি না। আমার অবর্তমানে যদি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে আমার সহকর্মীরাই এসে তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে। তাদের সাথে এমন কোনো চিহ্ন থাকবে, যা দেখে তুমি নিশ্চিত হতে পারবে যে, তোমার সাথে তারা কোনো ধরনের ধোঁকাবাজি করছে না।"

যারকা যখন আরমুগানীর দু'একজন সহকর্মীর নাম-ঠিকানা জানার জন্য কয়েকবার বিগলিত আবেদন জানালো, তখন এক পর্যায়ে রাগে-ক্ষোভে চোখ

লাল করে আরমুগানী বললো, "যারকা! এ কথা তোমার মুখে যেনো আর কোনদিন উচ্চারিত না হয়। মনে রাখবে, এ ব্যাপারে আমি তোমার ভালোবাসাকেও ত্যাগ করতে পারবো।"

* * *

আরো কিছুদিন এভাবেই কেটে যায়। যারকা আরমুগানীর ঘরণী হয়ে দৃশ্যত চরম সুখানুভব প্রকাশ করলেও ভেতরে ভেতরে কঠিন হয়ে ওঠে। ততদিনে আরমুগানী যারকার কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছে। আরমুগানীর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পাওয়ার পর যারকা তার প্রতি প্রকাশ্যে আরো বেশি পতিগতপ্রাণ স্ত্রীর মতো আচরণ করতে শুরু করে। এক রাতে দীর্ঘ সময় আরমুগানী ও যারকা নিজেদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা ও আদর-সোহাগে কাটিয়ে দেয়। আরমুগানী দিনের বেলায় আস্তাবলে নতুন কিছুসংখ্যক আনীত ঘোড়াকে সামলানোর কাজে ব্যস্ত সময় কাটানোর ফলে দিনে ঘরে সময় দিতে পারেনি বলে মধ্যরাত পর্যন্ত যারকার সাথে খোশালাপ করে। এক পর্যায়ে সে ক্লান্তশ্রান্ত দেহে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ! কিন্তু যারকার চোখ নির্ঘুম।

ঘুমন্ত স্বামীকে কিছুক্ষণ জেগে জেগে নিরীক্ষণ করে যারকা। যারকা যখন দেখলো, আরমুগানী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তখন আস্তে করে বিছানা থেকে ওঠে সে সতর্ক পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে পা টিপে টিপে দেউড়ির কাছে চলে আসে। দেউড়িতে এসে বাড়ির গেটে কান লাগিয়ে আবার উঠানে দাঁড়িয়ে কি যেন আন্দাজ করতে চেষ্টা করে। এরপর ঘরের ভেতরে গিয়ে আরমুগানীকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। আরমুগানী তখন বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। সে নাক ডাকছে। আবার ঘর থেকে উঠানে এসে পা টিপে টিপে অস্থিরভাবে পায়চারী করছে যারকা। এমন সময় বিড়ালের ডাক শুনতে পায় যারকা। কিন্তু বিড়ালের ডাক কি ঘরের ছাদ থেকে এলো না সদর দরজার বাইরে থেকে এলো, ঠিক ঠাহর করতে পারলো না। সে পা টিপে টিপে সদর দরজার কাছে যায়। সদর দরজার খিল খুলে সে দরজা একটু ফাঁক করে বাইরে তাকালে দেখে তিনজন লোক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এদের একজন এগিয়ে এসে কানে কানে বলে, "ঘুমিয়ে পড়েছে।"

যারকা তাৎক্ষণিক কোন জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ নীরব দাঁড়িয়ে থেকে অতি ক্ষীণকণ্ঠে বললো, "একটু আগেও সজাগ ছিলো, এখন হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি তোমাদের জন্যে গেটের পাশেই অপেক্ষা করছিলাম। তোমরা এখানেই দাঁড়াও। যদি ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে আমি তোমাদের ডাকবো।"

গেটের খিল বন্ধ করে দিয়ে দ্রুত পায়ে ঘরে প্রবেশ করে যারকা। হঠাৎ সে আরমুগানীকে মাথা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দেয়। গভীর ঘুম থেকে ধড়ফড় করে জেগে উঠে আরমুগানী। চোখ মেলে প্রদীপের আলোয় যারকার চেহারা দেখে ভড়কে যায়। "কি ব্যাপার, তোমার কি হয়েছে যারকা?"

আরমুগানীর মুখে আঙ্গুল দিয়ে যারকা ফিস ফিস করে বলে, "বেশি কথা বলার সময় নেই আরমুগানী।" দ্রুত কথা বলতে শুরু করলো যারকা। "আরমুগানী! এ মুহূর্তে তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও। আমি তোমাকে ধোঁকা দিয়েছি। আমার বাবা তোমাকে ফাঁসানোর জন্য আমাকে প্রতারণার ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করেছে। আমার বাবা আসলে কোন ব্যবসায়ী নন, তিনি আনন্দ পালের পোষা এক গোয়েন্দা। আমরা পেশোয়ার নয়, বাটান্ডা থেকে এসেছি। তোমার ব্যাপারে রাজপ্রাসাদের একজন সংশয় প্রকাশ করেছিলো যে, তুমি গজনী সুলতানের পক্ষে গোয়েন্দা কাজে নিয়োজিত। কিন্তু এই দাবীর পক্ষে এ পর্যন্ত কেউ কোন প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। এই দায়িত্ব অবশেষে আমার বাবার কাঁধে অর্পণ করা হয়– তুমি গোয়েন্দা কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে এবং তুমি গোয়েন্দা হয়ে থাকলে তোমার সাথে আর কে কে রয়েছে তা জানতে। দায়িত্ব নিয়ে বাটান্ডা থেকে সে প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে আসে এবং নিজেকে একজন সুলতান ভক্ত ব্যবসায়ী হিসেবে তোমার কাছে পরিচয় দেয়। সে নিজে তোমার প্রকৃত পরিচয় জানার বহু চেষ্টা করেছে কিন্তু তোমার প্রকৃত পরিচয় জানা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে তার কর্তব্য পালনের হাতিয়ার হিসেবে সে আমাকে তোমার কাছে বিয়ে দেয়। অবশ্য আমার রূপ-সৌন্দর্যে তুমি অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছিলে বটে, কিন্তু তোমার প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করা ছিলো আমার দায়িত্ব। কোনো পুরুষই নারীর প্রতি দুর্বলতাকে অস্বীকার করতে পারে না। তদুপরি তোমার কাছ থেকে প্রেম-ভালোবাসা ও চরম অনুগত স্ত্রীর অভিনয় করে তথ্য উদ্ধার করার সফলতা ছিলো আমার একান্ত কাম্য। আমার কাজে আমি শতভাগ সাফল্য পেয়েছি।"

যারকার কথা শুনে আরমুগানীর পিলে চমকে যায়। সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো যারকার কথা শুনতে থাকে। যারকা দ্রুত বলে চললো, "তুমি কাজে চলে যাওয়ার ফাঁকে এক মহিলা আমার কাছে আসতো, আমি তোমার কাছ থেকে কতটুকু রহস্য উদ্ধার করতে পেরেছি, প্রতিদিন সে এ রিপোর্ট নিয়ে যেতো। একদিন আমি সেই মহিলাকে বললাম, লোকটি গজনী বাহিনীর একজন ভয়ংকর গোয়েন্দা। সে লাহোর বাটান্ডায় নিয়োজিত গোয়েন্দাদের কমান্ডার। এ কথা শুনে আমাকে তোমার সহকর্মীদের পরিচয় জানার নির্দেশ দেয়। কিন্তু তুমি আমার

একান্ত চেষ্টার পরও সহকর্মীদের পরিচয় দিতে অস্বীকৃতি জানালে। আমি আমার বাবাকে খবর পাঠালাম, এ লোকের কাছ থেকে তার সহকর্মীদের পরিচয় জানা সম্ভব নয়। এ কথা শুনে আমাকে খবর পাঠালো, আজ রাতে যেন আমি জেগে থাকি। বাইরে বিড়াল ডাকার মিউ মিউ শব্দ শুনতে পেলে আমি যেন দরজা খুলে দিই। তিনজন সশস্ত্র লোক আসবে। এদের মধ্যে আমার বাবাও থাকবে। তারা তোমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে। তারপর এরা তোমার কাছ থেকে বাকি তথ্য উদ্ধার করার জন্য তোমাকে অবর্ণনীয় শাস্তি দেবে। আরমুগানী! আমার একটি অনুরোধ তুমি রাখো। এর বেশি আর তুমি আমার কাছ থেকে জানতে চেয়ো না। ওরা এসে গেছে। বাইরে অপেক্ষা করছে।"

"তাহলে তুমি দরজা খুলে দিচ্ছো না কেন?" এক লাফে একথা বলে বিছানা থেকে ওঠে দাঁড়ালো আরমুগানী। তার কক্ষে রাখা বর্শা হাতে নিয়ে বলে, "দূর হো বদকার, বেশ্যা কোথাকার! তোর ঘাতক তিনজনকে নিয়ে আয়, নয়তো আমিই দরজা খুলে দিচ্ছি। দেখবি, কিভাবে তিনজনকে বধ করে তোর শিকার বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়।"

আরমুগানীকে জড়িয়ে ধরে যারকা। বলে, "আরমুগানী! তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথা একটু শোনো। আল্লাহর দোহাই লাগে তুমি বাইরে যেও না।"

এদিকে তিন ঘাতক বাইরে দাঁড়িয়ে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে। একজন বললো, "এতোক্ষণে তো দরজা খুলে দেয়ার কথা।"

"কি জানি, ছুড়কি না আবার আমাদের ধোঁকা দেয়। ও ভেতর থেকে দরজা আটকিয়ে গেলো কেন?" বললো অপর একজন।

"হু, মনে হয় তোমার মেয়ে ওর দাসীতে পরিণত হয়েছে।" যারকার বাবার উদ্দেশ্যে উষ্মা প্রকাশ করলো অপর এক ঘাতক। "তুমি তো খুব চালাক। কিন্তু অনেক সময় অতি চালাক লোকও বেকুব হয়ে যায়।"

"আরে বক বক করো না তো! আরেকটু সময় অপেক্ষা করেই দেখো না কি হয়।" কিছুটা ধমকের স্বরে বললো যারকার বাবা।

* * *

যারকা শুয়াইব আরমুগানীকে আরো বলে, "তোমার প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করে দেয়ার দায়িত্ব আমি কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম। সেই দায়িত্ব আমি ষোল আনা আদায় করেছি। আমি বাবাকে তোমার প্রকৃত পরিচয় বলে দিয়েছি। আমি ধোঁকা ও প্রতারণার যে পুতুল সেজে তোমার ঘরে প্রবেশ করেছিলাম, কিন্তু তোমার

আকর্ষণীয় পৌরুষ, তোমার ব্যক্তিত্ব আর ইসলামী সালতানাতের প্রতি তোমার শুভ কামনা এবং তোমার উন্নত নৈতিকতার জিঞ্জিরে আমি আটকা পড়ে গেছি। তোমার প্রতারণামূলক কাজের প্রয়োজনে তোমার কাছে আমাকে বিয়ে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তোমার অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসা আমাকে সারা জীবন তোমার দাসী হয়ে থাকার জন্যে বিবেকে তাড়না সৃষ্টি হয়েছে। আমি কোনো ভদ্র ঘরের মেয়ে নই। এ পর্যন্ত যারাই আমার সঙ্গ দিয়েছে, সবাই আমার শরীর নিয়ে উল্লাস করেছে। একমাত্র তুমি আমাকে হৃদয়ের সীমাহীন ভালোবাসা দিয়ে সিক্ত করেছো। আমাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছো বলেই আমার নিকট তোমার প্রকৃত পরিচয় জানাতে দ্বিধা করোনি। তুমি নিজের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আমার প্রতি তোমার অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছো। এর ফলে আমার হৃদয়ে মরে যাওয়া ইসলামী চেতনা পুনরুজ্জীবন লাভ করেছে।

বাবার নির্দেশ আমি এ জন্যে মানতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, ছোট বেলায় আমার মা মারা গেছে। বাবা আমাকে মায়ের আদর দিয়ে বড় করেছে। সে কোনো দিন আমাকে মায়ের অভাব বুঝতে দেয়নি। বাবার ধন-রত্নের কোনো অভাব ছিলো না। সে আমাকে শাহজাদীর মতো আরাম-আয়েশে বড় করেছে। আমি বড় হলে তার ন্যায়-অন্যায় প্রতিটি নির্দেশ অতি-আনুগত্যের সাথে পালন করেছি। বাবা আমাকে ব্যবহার করে হিন্দু ক্ষমতাশীলদের হাত করেছে এবং তাদের মাধ্যমে রাজার বিশ্বস্ততা অর্জন করেছে। সে তার ঈমান বিক্রি করে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জন করেছে। সে মুসলমান হয়েও হিন্দুদের হাতে মুসলমানদের অপমা ও লাঞ্ছিত করেছে। এ সবকেই আমি 'জীবন' ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি আমার সামনে যে নতুন জগতের দরজা খুলে দিয়েছো, সে জগত সম্পর্কে আমি মোটেও পরিচিত ছিলাম না। আমি জানতাম না, স্বামীর ভালোবাসাই যে নারীর জাগতিক জান্নাত।

আমি বাবার হক আদায় করেছি। দরজা খুলে ওদের আসা নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত আমার ইচ্ছা ছিলো তোমাকে ধরিয়ে দেবো। কিন্তু যখন ওদের দিকে তাকালাম, ওদের চেহারা দেখে মনে হলো ওরা যেনো আমাকে চিড়ে আমারই কলজেটা বের করে নিতে এসেছে। আমার হৃদয়ে একটা কাঁপুনী অনুভব করলাম। আমার বাবার চেয়ে তখন তোমাকেই বেশি আপন মনে হতে লাগলো। বাবার কাছে আমি একটা পণ্য মাত্র। কিন্তু তোমার হৃদয়ে আমি এক নিঃসীম সুখের আধার। এ জন্য আমি তাদের কাছে মিথ্যা বলেছি। বলেছি, ও এখনো ঘুমোয়নি। একটু অপেক্ষা করো, ঘুমিয়ে পড়লেই তোমাদের ডাকবো। ওরা

বাইরে তোমাকে গ্রেফতার করার জন্য অপেক্ষা করছে। আরমুগানী! তোমার ভালোবাসা, ধর্মের প্রতি তোমার নিষ্ঠা এবং তোমার কর্তব্যপরায়ণতার কসম! তুমি পালিয়ে যাও। দেয়াল টপকে পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে যাও। হয়তো তোমার সাথে আবারও দেখা হবে। যদি জীবিত থাকি তবে দেখা হবেই। তুমি যেখানেই থাকো না কেনো আমি তোমাকে খুঁজে বের করবোই।"

ওদিকে অপেক্ষমান তিন ঘাতক দরজা খুলতে বিলম্ব হওয়ায় অস্থির হয়ে পড়ে। তাদের একজন বলে, "আমি ঘরের পেছনের দিকে যাচ্ছি। আমার মনে হয় ওরা পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে গেছে।"

রাজার গোয়েন্দা দলের একজন যখন ঘরের ছাদের উপর ওঠে, তখন আরমুগানী ছাদ থেকে দেয়াল টপকে নীচে নেমে গেছে। কারো উপরে ওঠার শব্দ শুনে সে দেয়াল ঘেঁষে একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে যায়। লোকটি ছাদের উপর থেকে আরমুগানীর উদ্দেশে হুমকি দিলে আরমুগানী এক লাফে বাউন্ডারির দেয়াল টপকে দৌড় দেয়। তাকে দৌড়াতে দেখে রাজার লোকেরা হৈচৈ শুরু করে দেয় কিন্তু ততোক্ষণে আরমুগানী কয়েকটি গলি পেরিয়ে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে। এরপরও তিন ঘাতক তার পিছু ছুটতে থাকে। আরমুগানী পেছনে তাদের আসতে দেখে দৌড়ের গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। রাতের অন্ধকার তার পথ চলা এবং নিজেকে আড়াল করার জন্য সহায়ক হয়।

এক পর্যায়ে শহরের অলিগলি পেরিয়ে সে অনেকটা ফাঁকা জায়গায় চলে এসেছে। এখানটায় বাড়িঘর কম। এখানে একটি হাভেলী দেখতে পায় যার চারপাশটা দেয়াল ঘেরা এবং দেয়ালের পাশে ঝোঁপ-ঝাড়ের মতো বাগান। সে দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ একটা ঝোঁপের কাছে এসে বসে পড়ে এবং উঁকিঝুকি করতে থাকে। আরমুগানী হামাগুড়ি দিয়ে দেয়ালের ফটক পর্যন্ত এসে ত্বরিৎ ফটকের ফাঁক দিয়ে দেয়ালের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং ফটকের বিপরীত দিকে চলে যায়। সে তখনও দাঁড়ায়নি। হামাগুড়ি দিয়েই এগুচ্ছিলো।

পেছনে দৌড়াতে থাকা ঘাতকরা ফটকের কাছে এসে আরমুগানীকে খুঁজতে থাকলে ফটকের প্রহরী তাদের বললো, "এখানে কাউকে খুঁজছো? এখানে কেউ আসেনি।" রাজার লোকেরা যখন জোর দিয়ে বললো, "আমরা তো দেখলাম একটা চোর এদিকেই এসেছে।" প্রহরী তাদের কড়া ভাষায় বলে দেয়, "না, এখানে কোনো লোক আসেনি। এটা একজন সম্মানি লোকের বসতবাড়ি। এখানে চোর প্রবেশ করবে কিভাবে!"

রাজার লোকেরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

কিছুক্ষণ পর আরমুগানী দাঁড়িয়ে দেখে, হাভেলীর একটি কক্ষে প্রদীপ জ্বলছে। সে বুঝতে পারে, এখানে অপেক্ষা করা ঠিক নয়। কিন্তু পাশাপাশি এটাও ভাবলো, তার পিছু নেয়া ঘাতকরা এখনও হাভেলীর আশপাশে তাকে খুঁজতে পারে। এ ভাবনায় সে ঠাঁয় বসে থাকে।

আরমুগানী এই হাভেলী সম্পর্কে জানতো কিন্তু কখনো এখানে আসার সুযোগ হয়নি। এটা ছিলো রাজা আনন্দ পালের একান্ত নর্তকী ও গায়িকার হাভেলী। প্রকৃতপক্ষে এই গায়িকা ছিলো মুসলমান। কিন্তু নিজেকে সে বাঁদিনী বলে পরিচয় দিতো। পেশাগত যোগ্যতা ও দৈহিক সৌন্দর্যে সে ছিলো অনন্যা। সামুরাতি নামেই পরিচয় দিতো নর্তকী। সামুরাতি নিজের যোগ্যতা ও মান সম্পর্কে ছিলো পূর্ণ সচেতন। সে রাজা আনন্দ পালের কাছ থেকে এ দাবী আদায় করে নিয়েছিলো যে, সে রাজ প্রাসাদের ভেতরে বসবাস করবে না। সামুরাত্তির আবেদনে রাজার টাকায় নির্মিত এই হাভেলীটি ছিলো যথার্থ অর্থেই রাজকীয়। হাভেলীর চারপাশে ছিলো সাজানো মনোরম বাগান। অসংখ্য বাহারী গাছ-গাছালি আর ফুল-ফলের সমাহার। প্রতি রাতের মামুলী নাচের অনুষ্ঠানে নাচ-গান করতো না সামুরাতি। রাজপ্রাসাদে যদি বিশেষ কোন অতিথি আসতো তখন নাচ-গান পরিবেশনের জন্য ডাক পড়তো সামুরাতির। সামুরাতি সাধারণ কোনো নর্তকী নয়, সে একটা উড়ন্ত প্রজাপতি। কারো পক্ষে সামুরাতিকে স্পর্শ করাও অসম্ভব।

সে রাতে যখন আরমুগানী তার হাভেলীতে প্রবেশ করে, এর কিছুক্ষণ আগেই রাজমহল থেকে ফিরেছিলো সামুরাতি। কারণ, এ রাতে অন্য কোনো রাজ্যের রাজার আগমনে রাজপ্রাসাদে বিশেষ নাচ-গানের অনুষ্ঠান ছিলো। সে রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সাজ-পোশাক খুলছিলো। সামুরাতির যথেষ্ট বয়স হয়েছে। যৌবন তাকে বিদায় জানাতে চাচ্ছে। সে তার বৃদ্ধা সেবিকার উদ্দেশে বলে, "আজ খুব ক্লান্ত হয়ে গেছি খালাম্মা।"

"নর্তকীরা যখন ক্লান্তি অনুভব করে, তখন তার উচিত বিয়ে করে ফেলা।" সামুরাতির উদ্দেশে বলে বৃদ্ধা সেবিকা। "কিন্তু বাস্তবতা হলো, নর্তকী ও গায়িকারা মনে করে তাদের কণ্ঠ আর রূপ-জৌলুস আজীবন অম্লান থাকবে আর তাদের উপর মানুষ সবসময় ফুল-চন্দন ছিটাবে।"

"আরে আমি তো এখনও যুবতী।" মুচকি হেসে সেবিকার উদ্দেশে বলে সামুরাতি।

"আমিও তোমার মতোই ভাবতাম। তুমি তো জানো, আমিও তোমার মতোই রাজমহলের নর্তকী ছিলাম। এখন তুমি যেমন সুখ্যাতি পেয়েছো, আমার সময়ে আমিও ছিলাম এমন বিখ্যাত। তুমি যেমন কাউকে পাত্তা দাও না, আমিও তখন বড় বড় মহারাজকেও পাত্তা দিতাম না। তখন আমার পেশায় যেসব প্রবীণ মহিলা ছিলো, তারা আমাকে বিয়ে করার কথা বলতো। আমিও তখন তোমার মতোই বলতাম, আরে এখনই বিয়ে কিসের? আমি তো এখনও যুবতী মাত্র। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, আজ আমি তোমার সেবিকা। প্রবীণদের কথা না মেনে আমি যখন অনেক বয়সে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুতি নিলাম, তখন আমার শরীর ভেঙ্গে গেছে। যৌবনে আমার ঘরের আঙ্গিনায় আমার সাথে ভাব জমানোর জন্য যারা সারাক্ষণ ঘুর ঘুর করতো, তারা আমার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কোনো বুড়োও আমাকে বিয়ে রাজি হলো না।"

সেবিকার কথায় ছিলো রূঢ় বাস্তবতা। সামুরাতিও অনুভব করে, তার শরীর অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছে। সেবিকা তার চোখে আঙ্গুল দিয়ে বাস্তবতাকে এভাবে দেখিয়ে দিলো যে, সামুরাতির আত্মমগ্নতা উবে গিয়ে তার মনের মধ্যে উঁকি দেয় উদ্বিগ্নতা।

এমন সময় হাভেলীর বাইরে কুকুর ডাকার শব্দ শোনা গেলো। সেই সাথে এমন শব্দ শোনা যায়, যাতে মনে হয় কুকুর কারো উপর হামলে পড়েছে এবং ক্ষতবিক্ষত করছে। সামুরাতি হাভেলী পাহারার জন্য কুকুর পালতো। রাতের বেলায় যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত আগন্তুকের প্রবেশ থেকে হাভেলীকে রক্ষার জন্য কুকুর হাভেলীর বাগানে ছেড়ে দিতো। কুকুরটি ছিলো খুবই ভয়ংকর আর শক্তিশালী। কুকুরের আগ্রাসী ডাক শুনেই সামুরাতি বুঝতে পারে, নিশ্চয়ই সে কারো উপর হামলা চালিয়েছে। তাই সে দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়। সে দেখতে পায়, কুকুর একজনকে কামড়ে ধরে হেচড়াচ্ছে। সে দৌড়ে গিয়ে কুকুরটাকে ধরলে কুকুর রাগে সামুরাতির হাতেও কামড় দেয়।

"কে তুমি?" আক্রান্তকে জিজ্ঞেস করে সামুরাতি। "চুরিটুরি করতে এসেছিলে নাকি?"

"দেখো, চোর কিংবা ডাকাত হলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম না। আমার নাম শুয়াইব আরমুগানী।"

"আরে, তুমি কি আস্তাবলের প্রশিক্ষক না?"

"হ্যাঁ, সামুরাতিজী। তুমি ঠিকই বলেছো।"

"তো এখানে তুমি কি নিতে এসেছিলে? ঘরে চলো। তুমি তো জানো, যদি পালাতে চাও, তাহলে তোমার অবস্থা কত কঠিন হবে?"

ঘরের আলোয় গেলে আরমুগানী বুঝতে পারে, কুকুর কামড়ে তার শরীরের সব কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে ফেলেছে। তার উভয় বাহু ও পা থেকে রক্ত ঝরছে। কুকুর তার শরীর ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। তার এক পা থেকে অনেকটা গোশত খাবলে নিয়েছে।

"এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে এখান থেকে কিছু নিতে এসেছিলো।" বললো সামুরাতি। "আমার মনে হয়, যারা আমাকে একান্তে পেতে চায় তুমিও সেই দলের একজন। লোভই তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। তুমি হয়তো বুঝেছো, আমি একাকী এখানে থাকি। জানো, আমার কুকুর আমার হাভেলীর চার দেয়ালের ভেতরে কোন বাঘকেও একদণ্ড দাঁড়াতে দেয় না।"

সামুরাতি তার বৃদ্ধা পরিচারিকাকে বললো, "ওর সারা শরীর কুকুর ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে। ওর ক্ষতস্থান ধোঁয়ার জন্য পানি গরম করো এবং পরিষ্কার কাপড় নিয়ে এসো, সেই সাথে শরাবও এনো। শরাব এবং কাপড় ভস্ম ক্ষতস্থান তাড়াতাড়ি শুকাতে সাহায্য করে।"

পরিচারিকা চলে গেলে আরমুগানী সামুরাতিকে বলে, "তোমার বাগানে তোমার কুকুর আমাকে হামলা করেছে, তাই তুমি আমাকে চোর বলতেই পারো। সেই সাথে আমাকে চরিত্রহীনও বলতে পারো যে তুমি একা থাকো জেনে অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এসেছি। শোনো সামুরাতি! যে রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি তোমার এতোটা গর্ব আর অহংকার, যদি তুমি তোমার এই রূপ-জৌলুস আমার চোখে দেখো, তাহলে নিজের প্রতিই তোমার ঘৃণা আসবে।"

"ও, তাহলে কি তুমি আমাকে ঘৃণা করতে রাতের আঁধারে চোরের মতো আমার বাড়িতে এসেছো?"

"শোনো, যে তোমাকে ভালোবাসে আর আমি যাকে ভালোবাসি তাকে যদি তুমি একবার দেখো, তাহলে আয়নায় নিজের চেহারা দেখাই তুমি ছেড়ে দেবে। আমি রাতের আঁধারে তোমার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তোমার রূপ-সৌন্দর্য ভোগ করতে এসেছি এই অহংকার অন্তর থেকে বের করে দাও। তুমি তো আর রাজা আনন্দ পালের রাজকুমারীদের চেয়ে বেশি রূপসী নও। আমি তাদেরও প্রত্যাখ্যান করেছি।"

"হু, তাহলে এখানে কেন মরতে এসেছিলে?"

সামুরাতির এক হাতেও কুকুর কামড়ে দিয়েছিলো। সামুরাতির ক্ষতস্থান থেকে বিছানার উপর দু'তিন ফোঁটা রক্ত টপ টপ পড়লো। আরমুগানী সামুরাতির সামনে দাঁড়ানো। তার ক্ষতস্থান থেকে অনবরত রক্ত ঝরছিলো। আরমুগানী দেখলো, সামুরাতির রক্ত আরমুগানীর রক্তের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

"দেখো, তোমার রক্ত আর আমার রক্ত একসাথে মিশে কেমন উজ্জ্বল রঙ ধারণ করেছে। অথচ তোমার রক্ত কিন্তু এতোটা উজ্জ্বল ছিলো না। তুমি অব্যাহত অপরাধ আর গুনাহ্ করতে করতে নিজের রক্তকেও দূষিত করে ফেলেছো। তোমার রক্ত যখন দূষণমুক্ত রক্তের সাথে মিশেছে, তখন সে তার আসল বর্ণ ফিরে পেয়েছে। অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছো নর্তকী। তোমাকে আমার সামুরাতি নামে ডাকতে ইচ্ছে করছে না। তোমার প্রকৃত নাম আমি জানি না বটে, কিন্তু একজন মুসলিম যুবতীকে হিন্দু নামে ডেকে মুসলমানের অবমাননা করতে আমার বিবেক সায় দেয় না। যাক, আমি যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। দেখো, তোমার আর আমার রক্ত একই ধারার। সেই সব পিতার রক্ত আমরা শরীরে বহন করছি, যারা অভিন্ন বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। এমনও হতে পারে, আমি এবং তুমি একই বংশজাত সন্তান।"

"আরে, তোমাকে তো পাগল মনে হচ্ছে। পাগলের মতো কি সব আবোল-তাবোল বকছো!"

"তুমি কি আমাকে চেনো, আমি কে? আমি তোমাকে তোমার রক্তের আসল পরিচয় বলে দিচ্ছি। নাচ-গান তোমার পেশা হতে পারে না। তোমার ধর্মে নাচ-গান বৈধ নয়। তোমার এই রূপ-জৌলুস, তোমার কণ্ঠ তোমার নিয়ন্ত্রিত জিনিস নয়। ভবিষ্যতে এ সবই তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবে। আজ তুমি আমাকে বলছো, চোরের মতো আমি তোমার ঘরে হানা দিয়েছি। একদিন এমন আসবে, যখন তুমি আমার মতো কোনো চোর তোমার ঘরে হানা দিক এমন কামনায় অধীর হয়ে থাকবে। তখন রাতের বেলায় তোমার কুকুরকে বেঁধে রাখবে, যাতে কেউ তোমার ঘরে হানা দিতে পারে কিন্তু তোমার কুকুর ছাড়া আর কাউকে তুমি তোমার ঘরে দেখতে পাবে না। যাক, তুমি অন্তত একটা ভালো কাজ করো, আমাকে তোমার ঘরে আশ্রয় দাও।"

"কেন আশ্রয় চাচ্ছ তুমি? কি অপরাধ করে তুমি পালিয়েছো?"

"আমি তোমাকে একটি তরুণীর গল্প শোনাবো। সে বয়সে তরুণী, আর তোমার চেয়েও সুন্দরী। অটুট তার শরীর। পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে উজ্জ্বল তার

অবয়ব। সে এক দৃষ্টিতে তোমার চেয়েও বেশি গুনাহগার, কিন্তু একটি কাজের দ্বারাই সে জান্নাতের বাসিন্দা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তুমিও অন্তত একটা পুণ্য কাজ করো। আমাকে আশ্রয় দাও...।"

"তোমার পরিচারিকাকে এখানে আসতে দিও না। আমার ক্ষত আমি নিজেই পরিষ্কার করে নেবো। তাকে বলে দাও, আমি যে এখানে আছি, তা যেন কাউকে না জানায়।"

রাজপ্রাসাদ থেকে ঘরে ফিরে কাপড় বদলানোর সময়ও সামুরাতিকে তার বৃদ্ধা পরিচারিকাও এমন কিছু বাস্তব কথাই বলেছিলো। সেসব কথা তখনো তার মানসপটে উচ্চারিত হচ্ছিলো। এমতাবস্থায় এক সৌম্য কান্তি যুবক আহত অবস্থায় যে তার ঘরেই আশ্রয়প্রার্থী সেও তাকে বলছে, তার রূপ-সৌন্দর্যে এখন ভাটা পড়ে গেছে। এতে সামুরাতির মনের বোঝা আরো ভারী হয়ে যায়। সে পরিচারিকাকে এই বলে তার কক্ষ থেকে যেতে বলে, "আমার ঘরে যে অচেনা লোক প্রবেশ করেছে তা তুমি কাউকে বলবে না।"

সামুরাতি নিজ হাতে আরমুগানীর ক্ষতস্থানের রক্ত পরিষ্কার করলো। শরাব দিয়ে সব ক্ষতস্থান ধুয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলো। পায়ের আঘাত ছিলো খুবই মারাত্মক।

আরমুগানী সামুরাতির হাতের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে তাতে পট্টি বেঁধে দেয়। এর ফাঁকে আরমুগানী সামুরাতিকে যারকার ইতিবৃত্ত সবিস্তারে শোনায়। সামুরাতির কাছে আরমুগানী কোনো কথাই আর আড়াল করলো না এবং কোনো মিথ্যাও বললো না। সে সামুরাতিকে এ কথাও জানালো যে, সে সুলতান মাহমূদের হয়ে এখানে গোয়েন্দা কাজে জড়িত। সে দীর্ঘক্ষণ ইসলামের মর্যাদা ও হিন্দুদের ইসলাম বিদ্বেষের ব্যাপারে কথা বললো।

আরমুগানী বললো, "যারকাকে তার বাবা বিলাস-ব্যসনে অভ্যস্ত করে শাহজাদীতে পরিণত করেছিলো। আমাকে প্রতারিত করার ব্যাপারেও সে ছিলো সফল এবং নিপুণ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। কিন্তু আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও প্রেম তার মধ্যে মরে যাওয়া ইসলামী চেতনা পুনরুজ্জীবিত করেছে। যার ফলে শেষ মুহূর্তে সে এমন কাজ করেছে যাতে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।"

"হয়েছে হয়েছে, আর বলতে হবে না। এখন আমার কথা শোনো। আজ রাতে কালাঞ্জারের রাজা এসেছে। এ জন্য রাজপ্রাসাদে আমার ডাক পড়েছিলো। রাজা আনন্দ পাল কালাঞ্জারের রাজাকে বলেছে, এই মেয়েটি মুসলমান এবং সে

আমার খুব প্রিয়পাত্র ও নর্তকী। তাতে কালাঞ্জারের রাজা বললো, আমি কোনো মুসলিম সুন্দরী তরুণী দেখলে ওকে অপহরণ করে নর্তকী বানাই, নয়তো বেশ্যাবৃত্তিতে লাগাই। মুসলিম বংশ নিপাত করতে এবং ওদের চরিত্র ধ্বংস করার এই একটিই যুৎসই পথ। আপনিও যদি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে দেখতে পাবেন আপনার দেশে যেসব মুসলমান বসবাস করছে, এরা হয় নর্তকী নয়তো সব বেশ্যাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েছে।"

সামুরাতি যখন আরমুগানীকে রাজা কালাঞ্জারের কথা শোনায়, তখন আরমুগানীর চেহারা দুঃখে-অনুশোচনায় লাল হয়ে যায়। আরমুগানী সামুরাতির ভেতরকার মৃতপ্রায় জাতীয় চেতনায় নাড়া দেয়। সামুরাতি যখন তাকে রাজা আনন্দ পালের রাজপ্রাসাদের কথা বলে, তখন সে সামুরাতিকে আরো উজ্জীবনীমূলক কাহিনী শোনায়। সামুরাতির জ্বলন্ত প্রদীপে এসব কথা ছিলো তেল ঢালার মতো।

আরমুগানী বললো, "দেখো সামুরাতি! আজ আমি মুসলমান তরুণীদের সম্ভ্রম বিক্রির কারণে মৃত্যুর মুখোমুখি। অথচ গজনীর যেসব যোদ্ধা এখানে এসে যুদ্ধ করে শাতাদাতবরণ করেছেন, তারা মুসলমান নারীদের সম্ভ্রম রক্ষার্থে নিজেদের জীবন বিলীন করে দিয়েছেন। শোনো সামুরাতি! তোমরা হলে হিন্দুদের খেলনার পুতুল। তোমরা পুরনো হয়ে যাচ্ছো। খেলনা পুরনো হয়ে গেলে সেগুলো আর খেলার উপযুক্ত থাকে না, তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তোমরাও চিরাচরিত নিয়মে একসময় আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। তাই যারকা হয়ে যাও, সামুরাতি! নিজ বিশ্বাসের সাথে আর বেঈমানী করো না।"

সামুরাতি এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি কখনো হয়নি। কঠিন-কঠোর রূঢ় কথা শুনতে সে অভ্যস্ত নয়। সে সাধারণত তার রূপ-সৌন্দর্য আর নিপুণ নাচ ও মনোহরী কণ্ঠের প্রশংসাই মানুষের নিকট থেকে শুনে থাকে। নিজেকে যে কেউ স্পর্শ না করতে পারা দেবী ভাবে সামুরাতি। যাকে সবাই ছুঁতে চায়, একান্তে পেতে প্রত্যাশী, আজ ঘরে ঢুকেই বৃদ্ধা পরিচারিকার মুখে শুনতে পেলো তার এই রূপ-রস, খ্যাতি ও জৌলুসে ভাটা শুরু হয়েছে, অচিরেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। এরপর আরমুগানী চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো যৌবনের রূপ-জৌলুস বেশি দিন থাকে না। ফুল সৌরভ হারিয়ে শুকিয়ে গেলে মানুষ যেমন তা আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়, কোনো ভ্রমর আর সেই ফুলে বসে না। তেমনি যৌবনের দীপ্তি নিভে গেলে কোনো পুরুষ আর তার প্রতি তাকিয়েও দেখবে না।

সামুরাতিকে আরমুগানী বললো, "তুমি নিজেই একটা ধোঁকা, আর যারা তোমার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে তারাও মারাত্মক ধোঁকাবাজ।"

“যারকাকে হয়তো আমি দেখেছি। যে মেয়েটির কথা বলছি সেই যদি যারকা হয়ে থাকে, তবে সে যে খুবই রূপসী তাতে সন্দেহ নেই। আচ্ছা আরমুগানী! তুমি তাকে খুব ভালোবাসো! একান্তে পেতে চাও!”

“আমার প্রাণ ওর জন্য ব্যাকুল সামুরাতি। এটা এমন এক টান, এমন এক আকর্ষণ, যে আকর্ষণের স্বাদ তুমি কখনো অনুভব করোনি।”

“আমি যদি তোমাকে আশ্রয় দেই তবে আমাকে কি সেই ভালোবাসা দেবে? বুঝতে পারছি না আমার হৃদয়ের মধ্যে যে কি তুফান শুরু হয়েছে! মনে হচ্ছে পৃথিবীটা দুলছে।”

“তুমি আমাকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করতে পারো। হৃদয়কে যদি তৃপ্ত করতে চাও, তাহলে তোমার হৃদয়ে এক বোনের মমতার ঢেউ তোলো, দেখবে আমার সান্নিধ্য তোমাকে স্নেহ-মমতার পরশে ভরে দেবে।”

“ঠিক আছে, তুমি আমার এখানেই থাকো।” কিন্তু কথা জড়িয়ে এলো সামুরাতির। আর কিছু বলতে পারলো না।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ আরমুগানীর দু'গাল দু'হাতে ধরে ওর চোখের দিকে তাকাতেই সামুরাতির দু'চোখ বেয়ে শ্রাবণের ধারার মতো অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ধরাগলায় অস্পষ্ট ভাষায় বলে, “আর কখনো আমার সামনে তুমি যারকার নাম নেবে না। তুমি বলেছো, সে তোমার বোন নয় কিন্তু আমি এতেও প্রতারিত হওয়ার আশংকা করছি।” আরমুগানীর চেহারা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে চোখের পানি মুছে সামুরাতি।

“রাজা-মহারাজা আর সম্রাটদের হৃদয়েও রাজত্ব করো তুমি। আমার মতো একজন সামান্য মানুষকে তোমার এতো ভয় কেনো?”

“আমি জানি না... আমি বলতে পারবো না কেনো তোমাকে আমার এতোটা ভয় করছে। কেনো অনতিক্রম্য মনে হচ্ছে তোমাকে। তুমি এখন আমার আশ্রয়ে, বলতে গেলে আমার অধিকারে।”

“কিন্তু না, আমি বলতে পারবো না।”

“হ্যাঁ, তুমি আর আমি অভিন্ন জাত। এই রক্ত দেখিয়ে তুমি আমার প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে দিয়েছো। আমি এখন নিজের পরিচয় জেনে গেছি। তোমার পা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত কেউ এ ঘরে ঢুকবে না।”

* * *

পিছু ধাওয়াকারীরা শুয়াইব আরমুগানীকে ধরতে না পেরে হতাশ হয়ে ওর বাড়িতে ফিরে গেলো। শুয়াইব আরমুগানীব বাড়িতে গিয়ে দরজার কড়া নাড়াতেই যারকা দরজা খুলে দিলো। যারকার বাবা জিজ্ঞেস করলো, "ও বেরিয়ে গেলো কি করে?"

"ও জেগেই ছিলো, তোমরা বারবার বিড়ালের মতো ডাকছিলে। আমি তোমাদের থামাতে এলে সে টের পেয়ে যায়। লোকটি খুবই চালাক। সে আমাকে কিছু না বলে দৌড়ে গিয়ে ঘরের ছাদে উঠে। এ সময় আমি তোমাদের একজনের চিৎকার শুনে বুঝতে পারি ও পালিয়েছে। তোমরা বড্ড ভুল করেছো। তোমাদের ভুলের কারণে সে পালাতে পারলো। মিছেমিছি এতোদিন শুধু আমাকে ওর বউ বানিয়ে রাখলে। লাভটা কি হলো?"

শহর ও আশপাশের এলাকাজুড়ে শুয়াইব আরমুগানীর খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত চললো তল্লাশি অভিযান। তল্লাশির সময় প্রতিটি মুসলমানের বাড়ির আস্তাবলের খড়কুটো পর্যন্ত ওলোট-পালট করা হলো। কিন্তু কোথাও আরমুগানীর চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গেলো না।

এদিকে নগরকোটের বড় পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ খবর পায়, রাজা আনন্দ পাল রাজধানীতে ফিরে এসেছে। রাজার ফিরে আসার খবর পেয়ে পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ তাকে নগরকোট মন্দিরে ডেকে পাঠায়। পণ্ডিতের খবর পেয়ে সাথে সাথেই রাজা আনন্দ পাল তার একান্ত প্রহরীদের রওনার প্রস্তুতির নির্দেশ দেয়। হিন্দুস্তানের অন্যান্য রাজা-মহারাজার মতো রাজা আনন্দ পালও নগরকোট মন্দিরকে খুব সম্মান করতো এবং সেখানকার প্রধান পণ্ডিতের নির্দেশকে অবশ্য পালনীয় ভাবতো। এবার সে শুধু পণ্ডিতের নির্দেশ পালনের জন্যই পণ্ডিতের খবর পাওয়া মাত্র রওনার নির্দেশ দিলো না। তার উদ্দেশ্য ছিলো, পণ্ডিতের মাধ্যমে সে অন্যান্য রাজা-মহারাজার সহযোগিতা লাভে সমর্থ হবে। যেনো সে সুলতান মাহমূদের সাথে একটা চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার সামর্থ অর্জন করতে পারে। সে একজন যথার্থ মহারাজার মতো পূর্ণ শান-শওকতের সাথে রাজা আনন্দ পালের নগরকোট মন্দিরে পদার্পণ করে। তার সাথে রীতিমতো এক বিরাট কাফেলা। কাফেলায় তার একান্ত দেহরক্ষী বাহিনী ছাড়াও রয়েছে তার প্রিয় গায়িকা ও নর্তকী সামুরাতি। এ ছাড়াও রয়েছে কয়েকজন সেবিকা ও পরিচারিকা। সামুরাতি তার বৃদ্ধা পরিচারিকাকে ঘরে রেখে এসেছে এবং তাকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়ে এসেছে, সে যেনো আরমুগানীকে গুপ্তধনের মতোই লোকচক্ষুর আড়ালে হেফাজতে রাখে। বিপুল লোক বহর নিয়ে রাজা আনন্দ পাল নগরকোট মন্দিরের

কাছে পাহাড়ের পাদদেশে এক সবুজ প্রান্তরে তাঁবু তুলে। টানা চার-পাঁচ দিন ভ্রমণের পর রাজা আনন্দ পাল নগরকোট পৌঁছে। সফরের ক্লান্তির কারণে নগরকোট পৌঁছেই রাজার মন্দিরে প্রবেশ করা সম্ভব হলো না।

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের কাছে যখন রাজা আনন্দ পালের আগমন সংবাদ পৌঁছালো, তখন পণ্ডিত খবর পাঠালো, বিকেলে পণ্ডিত রাজাকে অভ্যর্থনার জন্য নিচে আসবে। পড়ন্ত বিকেলে পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ রাজাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যখন নিচে নেমে এলো, তখন রাজা আনন্দ পাল তাঁবু থেকে বেরিয়ে পণ্ডিতের পা স্পর্শ করে তাতে চুমু দেয় এবং তাকে ভক্তি জানায়। রাজার তাঁবু দেখে পণ্ডিত তো হতবাক। তাঁবু তো নয়, যেনো কোনো এক রাজপ্রাসাদ। রাজার বিশাল তাঁবুতে রঙ-বেরঙের শামিয়ানা, সুদৃশ্য ঝালর আর চতুর্দিকে বাহারী ঝাড়বাতি। রাজার তাঁবুতে গালিচা বিছানো। পণ্ডিত রাজার কক্ষে বসার একটু পরই তাকে উদ্দেশ্য করে চার নর্তকী নাচ শুরু করে দেয়। নৃত্যগীতের মধ্যে পণ্ডিত রাজা আনন্দ পালের উদ্দেশ্যে বলে, "মনে হয় আপনি সেই আনন্দপাল নন, যে আনন্দ পাল নিজে আর তার পিতা একাধারে কয়েকবার সুলতান মাহমূদের কাছে পরাজিত হয়েছেন। আপনার কি মনে নেই, পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে আপনার বাবা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন আর সম্মুখ সমরে শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করে আপনি দেশত্যাগ করেছিলেন? যদি আপনি সেই আনন্দ পালই হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার পরাজয়ের প্রধান কারণ এই বিলাসিতা। যে বিলাসিতা আপনি আমাকে খুশি করার জন্য প্রদর্শন করছেন। কারণ, আমি শুনেছি, আমাদের মহারাজারা নাকি যুদ্ধক্ষেত্রেও নাচ-গান ও আমোদ-ফূর্তির সকল আয়োজন সঙ্গে রাখেন।"

"পণ্ডিত মহারাজ! মৃত্যুর আগে আমরা মনের চাহিদা পূর্ণ করার জন্যে বিনোদনের উপকরণসমূহ সঙ্গে রাখি আর কি?"

"তা ঠিক। কিন্তু আপনি তো এখানে মরতে আসেননি। এখনও বেঁচে আছেন। আপনার এই বেঁচে থাকার লক্ষ্য কি বাকি জীবন বিলাসিতায় মেতে থাকা? আমি এ জন্যই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনার পরাজয়ের কারণগুলো আর কেউ বলার সাহস না পেলেও আমি বলে দেবো। রূপসীদের সৌন্দর্য আর শরীর নিয়ে যারা উল্লাসে মেতে থাকে, তাদের করুণ পরিণতি ছাড়া আর কি হতে পারে!"

পণ্ডিতের কথা শেষ না হতেই নর্তকী মেয়েগুলো এভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলো, যেনো বাতাসে ওরা হারিয়ে গেছে। এরপর বাদ্যযন্ত্রের বাজনা বদলে যায়।

এবারের বাজনার ধ্বনি এমনই আকর্ষণীয় যে পণ্ডিত নিজেও হতচকিত হয়ে উঠলো। ঠিক এমন সময় তাঁবুর এক কোণা থেকে সামুরাতি এভাবে দৃশ্যপটে এলো যেনো একটি জলপরী পানি থেকে ভেসে ওঠেছে। সামুরাতি বিস্ময়কর এক নৃত্যের তালে তালে পণ্ডিতের একেবারে কাছে চলে আসে। তার ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি খেলা করছে। নৃত্যের ছন্দে এগিয়ে এসে পণ্ডিতের সামনে বাঁকিয়ে প্রণাম করে। রঙিন ফানুসের বাহারী আলোয় নর্তকী সামুরাতির নৃত্যে পণ্ডিত বিমোহিত হয়ে গেছে। সামুরাতির শরীর যখন নাচের নানা মুদ্রায় কখনো ফুটন্ত ফুলের মতো মেলে ধরলো এবং বাজনার উচ্চাঙ্গ তালে নিজেকে পাখির মতো বাতাসে ভাসিয়ে রাখলো, তখন পণ্ডিত রাজা আনন্দ পালকে জিজ্ঞেস করলো, "এ হিন্দু না মুসলমান?"

"মুসলমান।" জবাব দিলো রাজা আনন্দ পাল। "মুসলমান তরুণীদেরকেই এ পেশায় আমরা ব্যবহার করি। এই মেয়েটিকে যদি আমরা মন্দিরের নর্তকী হিসেবে রেখে দেই, তাতে আপনি রাজি হবেন তো?"

"এর পরিবর্তে আপনি চাইলে আমি একশ' নর্তকী দিয়ে দিতে পারি। এই মেয়েটি আমার খুবই প্রিয়।"

"হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে এমন কথাই শুনতে চাচ্ছিলাম। আপনার বোঝা উচিত, এ মেয়েকে আমি নিজের সেবার জন্য নিতে চাচ্ছি না। আমি নর্তকী রাখবো কেন? আমি তো নারী স্পর্শও করি না। ওকে আমি কৃষ্ণ ভাগবানের চরণে বলীদান করবো।"

"বলি দেবেন!" চোখ কপালে তুলে জানতে চাইলো রাজা।

"হ্যাঁ, রাজা আনন্দ পাল। এটা আমার ব্যক্তিগত কোনো ইচ্ছা নয়। দেব-দেবীদের চাহিদা এটা। এই নর্তকীকে দেবতারা ভোগ করতে চায়।"

"আমরা তো ইতিমধ্যে লাহোরে দু'টি তরুণী বলী দিয়েছি।"

"তবুও আপনি দু'বারই পরাজিত হয়েছেন, তাই না। এর কারণ হলো, যেসব পণ্ডিতের হাতে আপনি কুমারীদের বলী দিয়েছেন, এসব পণ্ডিত আপনার দেয়া কুমারীদের সতীত্বহারা করে পাপ করেছে। আমাকে দেবী কৃষ্ণ স্বপ্ন দেখিয়েছেন, এমন কোনো মুসলিম তরুণীকে বলী দিতে হবে যে রূপে-গুণে অনন্যা। আর সে না হবে বয়স্কা, আর না হবে কিশোরী। নাচ-গানে সে হবে অনন্যা। সে যার কাছে থাকবে, তাকে সে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসবে। কোনো মূল্যেই এই মেয়েকে সে হারাতে সম্মত হবে না। বহুদিন থেকে আমি এমন একটি নর্তকী খুঁজছিলাম। আজ আপনার কাছে তা পাওয়া গেলো। আমি হিন্দু

ধর্মের বিজয় দেখতে চাই, আমি দেব-দেবীদের অভিশাপ থেকে আপনাদের রক্ষা করতে চাই।"

রাজা আনন্দ পালের পক্ষে নগরকোট মন্দিরের বড় পণ্ডিতের কথা অমান্য করা সম্ভব ছিলো না। কিছুদিন আগে অন্যান্য রাজা-মহারাজাদের ডেকে পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ যেসব কতা বলছিলো, রাজা আনন্দ পালকেও হিন্দু ধর্মের জয় এবং সুলতান মাহমূদকে পরাজিত করার দিক-নির্দেশনামূলক কথা শোনালো। রাজা আনন্দ পালকেও পণ্ডিত পরামর্শ দিলো, সুলতান মাহমূদকে পেশোয়ারের পার্শ্ববর্তী ময়দানে যুদ্ধের নামে আটকে রাখতে হবে আর অপরদিকে গজনী আক্রমণ করে দখল নিতে হবে। এছাড়া গজনীর মুসলমানদের অভিযান ঠেকানো সম্ভব নয়।

"আমি যদি লাহোরেই ব্যস্ত থাকি, তাহলে বেরা এবং মুলতানের কি হবে?" প্রশ্ন করলো আনন্দ পাল।

"দেখবেন, এই দুই শহরের সকল মুসলিম সৈন্য আমাদের হাতে বন্দীরূপে গ্রেফতার হবে।" বললো পণ্ডিত। "আপনি এখন রাজধানীতে ফিরে যান। নাচ-গান বাদ দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিন। সকল রাজ্য থেকেই আপনার কাছে সৈন্য আসছে। সে ব্যবস্থা আমি সেরে ফেলেছি।"

পরদিন সকাল বেলা রাজা আনন্দ পাল পাহাড়ের উপর অবস্থিত মন্দিরে গিয়ে পূজাপার্বন শেষ করে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। এদিকে সেই রাতেই বড় পণ্ডিত সামুরাতিকে সাথে নিয়ে যায়। আনন্দ পালের পক্ষে বিদায়লগ্নেও আর সামুরাতির সঙ্গে দু'চার কথা বলার সুযোগ হলো না।

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ পাহাড়ের উপর অবস্থিত বড় মন্দিরের মূল আস্তানায় সামুরাতিকে নিয়ে যায়। সামুরাতি ঘুণাক্ষরেও জানতো না তাকে বলী দিয়ে তার দেহের রক্তে হিন্দুদের কৃষ্ণদেবীর চরণ ধোয়া হবে। সামুরাতিকে পণ্ডিত যখন মন্দিরের পাতাল কক্ষে নিয়ে গেলো, তখন সামুরাতি জানতে চাইলো, তাকে এখানে কেন আনা হয়েছে?

"আমার সাথে আসা কি তোমার কাছে ভালো লাগেনি?" সামুরাতির দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো পণ্ডিত। পণ্ডিত বিছানা দেখিয়ে বললো, "আগে বসো, তারপর কথা বলো।"

সামুরাতি বিছানায় বসতে বসতে পণ্ডিতের দু'হাত তার দু'হাতে তুলে নেয় এবং পণ্ডিতকে নিজের দিকে টান দেয়। সামুরাত্তির টানে পণ্ডিত তার পাশে বসে পড়লো। সামুরাতি পণ্ডিতের চোখে চোখ রেখে একটা ভুবন মোহিনী হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে দেয়। এই হাসির ঝিলিকে পণ্ডিতের শরীর কেঁপে ওঠে। সামুরাতি

বললো, "মহারাজা! আমার নাচের সম্মান করতে পারেনি। আপনি আমার নাচ দেখেছেন কিন্তু কণ্ঠের গান শুনেনি। তবুও আপনার দৃষ্টিতে আমার দেহবল্লরী আকর্ষণীয় মনে হয়েছে।"

"হ্যাঁ। আরে তুমি তো ভুল বুঝেছো তরুণী।" গম্ভীর স্বরে বললো পণ্ডিত। "তোমার রূপ-সৌন্দর্য আমার ভালো লেগেছে বটে কিন্তু তুমি বুঝতে ভুল করছো। আমি জীবনে কোনোদিন নারী স্পর্শ করিনি আর জীবনে কোনদিন তা করবোও না।"

"কেনো?"

"আমি নারীর সংস্পর্শে যাওয়াকেই পাপ মনে করি।"

"তাই নাকি? তাহলে আজ এই পাপ করছেন কেনো?" জানতে চাইলো সামুরাতি।

"এ কথার জবাব আমি এখন দিতে পারবো না।" বললো পণ্ডিত। "তবে এ কক্ষে এসে তুমি মনে যে ধারণা পোষণ করেছো, আমার ক্ষেত্রে এমন ধারণা মন থেকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলো। তোমার শরীরের সৌন্দর্য নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমাকে এসব ব্যাপারে তুমি আর কিছু জিজ্ঞেস করো না। তোমাকে আমি মনের মধ্যে দেবীর মর্যাদা দিয়ে রেখেছি। তোমাকে আমি গঙ্গা জলে স্নান করাবো। তোমার সকল পাপ ধুয়ে সাফ করে ফেলবো।"

পণ্ডিতের কথা শুনে সামুরাতির হাসি পেলো। বেশি সময় সে নিজের হাসি চেপে রাখতে পারলো না। টানা কিছুক্ষণ হাসলো। আর পণ্ডিত নির্বাক হয়ে সামুরাতির চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো। শিশুর মতো হাসতে হাসতে উচ্ছ্বসিত হয়ে সামুরাতি পণ্ডিতের কোলে লুটিয়ে পড়ে। সামুরাতির রেশমী কোমল চুলগুলো পণ্ডিতের কোলজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। সামুরাতি তার চুলে এমন সুগন্ধি লাগিয়েছিলো– বিশেষ কোনো রাজার আগমনের অনুষ্ঠানেই শুধু এ ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে সে। সুগন্ধিতে ছিলো মন মাতানো সৌরভ। মনোহরী এই সৌরভের সাথে সামুরাতির খোলা কাঁধ আর নরম হাত যখন পণ্ডিতের শরীর স্পর্শ করে, তখন হঠাৎ যেনো পণ্ডিত তার শরীরে একটা কাঁপুনি অনুভব করে। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ জীবনে এতো ঘনিষ্ঠভাবে কোনো তরুণীকে দেখেনি। কিন্তু আজ সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট এক অপ্সরা তার কোলে লুটিয়ে আছে।

"ওঠো নর্তকী! বলো, তুমি কেনো এভাবে হাসছো।" সামুরাতিকে স্পর্শ না করেই লুটিয়ে পড়া থেকে ওঠে বসতে নির্দেশ দেয়।

সামুরাতি বিশেষ কোনো অভিজাত বংশের মেয়ে নয়। সে যৌবনের শুরু থেকেই শরীর নিয়ে খেলা করতে শিখেছে। পণ্ডিতের তাড়া খেয়ে ওঠে বসার পরিবর্তে সে পণ্ডিতের কোলে আরো বেশি করে নিজেকে মেলে ধরে। সে চিত হয়ে পণ্ডিতের মুখের দিকে শিশুর মতো কৌতূহলীকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "গঙ্গা জলে স্নান করিয়ে আপনি আমার সব পাপ ধুয়ে দেবেন? না, তা নয়। আপনি ভুল বলেছেন। আপনার বলা উচিত ছিলো, যখন গঙ্গা জলে ঝাঁপ দেবো, তখন গঙ্গার সব পাপ গঙ্গার পানির সাথে ধুয়ে চলে যাবে।"

পণ্ডিত নিজে সামুরাতির হাত ধরে উঠানোর কোনো চেষ্টাই করলো না। সামুরাতি নাগিনীর মতো ফণা ধরে ওঠে বসলো এবং পণ্ডিতের দুটো হাত নিজের হাতে নিয়ে বললো, "আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি কেনো আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন? আপনি আমাকে পবিত্র করতে চাচ্ছেন...।" একথা বলে সে গম্ভীর হয়ে যায়। "আমার পাপ সেদিন মুছবে যেদিন আপনি ওইসব পাপীষ্ঠকে গঙ্গা জলে ডুবিয়ে জনমের স্নান করাবেন, যারা এতোদিন আমার শরীর নিয়ে খেলা করেছে। আমার শরীরকে যারা খেলার পুতুলে পরিণত করেছে। বলুন, আপনার ভগবান কি ওদের কোনো বিচার করতে পারে না?...

পণ্ডিত মহারাজ! আমার কোনো জাত-ধর্ম নেই। ওরা আমার জাত-ধর্ম থাকতে দেয়নি। কিছুদিন থেকে আমি অনুভব করছি, দৃশ্যত আমি যতো পাপ কর্মেই লিপ্ত থাকি না কেন, আমার দেহের খাচার ভেতরে যে হৃদয় আছে সেটি সম্পূর্ণ পবিত্র। এই পবিত্র হৃদয়টি সেই মহাপুরুষের জন্য অপেক্ষা করছিলো যে স্থূল লালসা নয়, আমাকে প্রকৃত হৃদয়ের ভালোবাসা দেবে।"

"তুমি কি জানো সেই মহাপুরুষটি কে?"

"হ্যাঁ, জানি। আপনিই সেই মহাপুরুষ। সে আপনার চেয়েও বয়স্ক কেউ হতে পারতো কিংবা আমার চেয়ে আরো তরুণ কেউ, সেই মহাপুরুষ হতে পারতো। সে কোনো মুনিঋষি কিংবা মাওলানা মুফতী হতে পারতো। সে কোনো চাটাইয়ে শয়নকারী দরবেশ হতে পারতো। আবার রাজপ্রাসাদের বিলাসী বাসিন্দাও হতে পারতো।... বলুন, আপনার কাছে কি গঙ্গা জলে বিধৌত অমলীন ভালোবাসা আছে?"

সামুরাতির কথা শুনে পণ্ডিত এভাবে চমকে উঠলো যেনো হঠাৎ কেউ তাকে সুখ-স্বপ্ন থেকে জাগিয়ে দিয়েছে। পণ্ডিত নিজেকে যতোই দাবী করছিলো নারী স্পর্শ থেকে তার শরীর পবিত্র এবং ভবিষ্যতেও পবিত্র থাকবে, কিন্তু সামুরাতির কোমল স্পর্শ আর তার রেশমী কোমল চুলে সে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলো।

সামুরাতির লাজুক হাসি পণ্ডিতকে জাদুর মতো অবচেতন করে দিয়েছে। পণ্ডিত নিজেও মুগ্ধ হাসি হেসে বললো, "অবশ্যই, একজন পূজারীর কাছ থেকে তুমি পাপ নয়, ভালোবাসাই পাবে।"

"আপনি যদি আমাকে সেই রকম ভালোবাসা দেন, যে ভালোবাসার জন্য আমার হৃদয় উন্মুখ হয়ে আছে, তাহলে আমি পাথরের মূর্তির সামনে এমন নাচন নাচবো যে, তারাও আমার নাচ দেখে নাচতে শুরু করবে। আর যে মূর্তির হাতে আপনি বাঁশি রেখেছেন সেই বাঁশি থেকে এমন সুর বের হবে, যে সুরে আপনিও হারিয়ে যাবেন। দূর দরাজ থেকে লোকজন নগরকোটের নর্তকীর নাচ দেখার জন্য আসবে। লোকজন কৃষ্ণ ভগবানকে ভুলে গিয়ে নগরকোটের নর্তকীর পূজা করতে শুরু করবে।"

হঠাৎ পণ্ডিত বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং কক্ষে দু'হাত পেছনে বেঁধে মাথা নিচু করে পায়চারি করতে শুরু করে। পণ্ডিতের পায়চারি লক্ষ্য করছিলো সামুরাতি। পণ্ডিত থেমে থেমে সামুরাতির দিকে তাকাচ্ছিলো আর পায়চারী করছিলো।

"আপনি কি সকাল বেলা মহারাজের তাঁবুতে যাবেন?" পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করলো সামুরাতি।

"আমি যদি মহারাজা আনন্দ পালের কাছ থেকে চিরদিনের জন্যে তোমাকে নিয়ে আসি, তাতে তুমি খুশি হবে?"

"এটা আমার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। পরিবর্তন শুধু একটাই। আগে আমি এক রাজার দখলে ছিলাম, সেখান থেকে এখন একজন মন্দিরের পণ্ডিতের দখলে এলাম। যখন এনেছেন আমাকে মনের মতো করে ভালোবাসা দিতে হবে। আপনাকে অবশ্যই আমার হৃদয়ের মূল্য দিতে হবে। সোনা-দানা দিয়ে এর মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

চকিতে সামুরাতি তার শরীর থেকে হীরা-মতি-পান্নার গহনা খুলে পণ্ডিতের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দেয় এবং আঙ্গুল থেকে মুক্তার আংটি খুলে ছুঁড়ে ঘরের মেঝেতে ফেলে দিয়ে বলে, "নিন, এসব গঙ্গা জলে ফেলে দিন।"

পণ্ডিত মাথা নিচু করে হার ও আংটি কুড়িয়ে তার সামনে রেখে বলে, "যাও, এখন আরামে শুয়ে ঘুমাও। আমি খুব ভোরে আসবো এবং তোমাকে গঙ্গা তীরে নিয়ে যাবো।"

* * *

সামুরাতিকে পণ্ডিতের হাতে তুলে দিয়ে রাজা আনন্দ পাল লাহোর ফিরে যায়। রাজার বুকভরা কষ্ট তার সবচেয়ে প্রিয় গায়িকা নর্তকীকে ছেড়ে আসতে হলো। সামুরাতির নাচের মুদ্রা আর জাদুকরী কণ্ঠের জন্য রাজা আনন্দ পাল একশ' তরুণীকেও নর বলী দিতে প্রস্তুত ছিলো। কিন্তু পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ তাকে কোনো কথা বলারই অবকাশ দিলো না। দেবীর নামে তাকে বলী দেয়ার জন্য তুলে দিয়ে গেলো। শেষবারের মতো সামুরাতির সাথে দু'টি কথা বলারও সুযোগ দিলো না। উপরের মন্দিরে গেলেও রাজা আর সামুরাতির দেখা পেলো না। এ জন্য রাজার মনটা ভারী হয়ে আছে। বেশ ক'দিন সামুরাতির শূন্যতায় মন খারাপ রইলো রাজার। কিন্তু খুব বেশি দিন সামুরাতির প্রেমের যাতনা বোধ করার অবকাশ পেলো না রাজা। অন্যান্য রাজা থেকে দলে দলে সৈন্য তার রাজধানীতে আসতে শুরু করেছে। বাধ্য হয়েই সামুরাতির কথা ভুলে গিয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতির দিকে তাকে মনোনিবেশ করতে হলো।

দেখতে দেখতে আজমীর, কনৌজ ও গোয়ালিয়রের সেনাবাহিনী লাহোর পৌঁছে যায়। কাজরের সেনাবাহিনীকে লাহোর না পাঠিয়ে পেশোয়ারের দিকে পাঠানো হয়। কাজর বাহিনীর কমান্ডারকে বলে দেয়া হলো, সে যেনো সিন্ধু নদী পার হয়ে তাঁবু খাটিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

১০০৮ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র মাস। সিন্ধু নদ তখন উত্তাল। কানায় কানায় পানিতে ভরা থাকায় সেনাবাহিনীর যাতায়াত যথেষ্ট কষ্টকর হয়ে উঠলো। সে সময় বহু নৌকা একসাথে জুড়ে দিয়ে পুল তৈরি করা হতো। কিন্তু নৌকার তৈরি পুলকে বারবার ঢল এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। সেই সাথে বিশাল সেনা বহরের সাথে অপরাপর উট-ঘোড়া ও গরুগাড়ি বোঝাই রসদপত্র পারাপারের জন্য অন্তত মাসখানেক সময় দরকার ছিলো। কিন্তু হিন্দু রাজা সুলতান মাহমূদকে সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের সুযোগ মোটেও দিতে চাচ্ছিলো না।

তৎকালীন ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, সে সময় গোটা লাহোর একটি সেনা ক্যাম্পে পরিণত হয়েছিলো। যেদিকেই চোখ যেতো শুধু সেনাবাহিনীর আনাগোনা চোখে পড়তো। দলে দলে বিভিন্ন রাজ্য থেকে সেনাবাহিনী লাহোরে পদার্পণ করেছিলো। সেই সাথে দলে দলে হিন্দু তরুণ-যুবকরা সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য লাহোরে এসে জড়ো হচ্ছিলো।

যেসব হিন্দু যুবক-তরুণ অশ্বারোহণ ও তীর তরবারী চালাতে পারতো, তাদেরকে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নেয়া হচ্ছিলো। হিন্দু মহিলা তাদের যুবক ছেলেদের এবং তরুণী বধূরা তাদের সামর্থবান স্বামীদেরকে সেনাবাহিনীতে পাঠিয়ে গর্ববোধ করছিলো।

মন্দিরের পণ্ডিতরা ভক্তদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এতোটাই ক্ষেপিয়ে তুলেছিলো যে, কোন হিন্দু মা আর তার তরুণ ছেলেকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বারণ করতো না বরং যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতো। সাধারণ হিন্দু প্রজারা সেনাদের জন্য পণ্যসামগ্রীর পাহাড় গড়ে তুলেছিলো। সেনাদের জরুরী রসদপত্র বহনের জন্য সাধারণ প্রজারা পর্যন্ত তাদের উট, মহিষ ও গরুগাড়ী দিয়ে দিচ্ছিলো। তখন মন্দিরগুলোতে শুধু একটাই প্রার্থনা হতো, "হে ভবগান! হিন্দুদের বিজয়ী এবং মুসলমানদের পরাজিত করো।"

অবস্থা দেখে মনে হতো, হিন্দুদের অন্যসব কামনা-বাসনা হারিয়ে গিয়েছিলো। তাদের তখন একটা কামনাই ছিলো, মুসলমানদের পরাজিত করা, তাদের নিঃশেষ করা। লাহোরের আশপাশের লোকেরা বিশাল সেনাবাহিনীর আগমনে আনন্দে নেচে ওঠেছিলো। ঐতিহাসিক আল-বিরুনী ও ফিরিশতা লিখেন, হিন্দুস্তানে এর আগে এতো বিপুল সেনা সমাবেশ কখনো ঘটেনি।

হিন্দু রাজাদের বিশাল রণপ্রস্তুতির বিপরীতে সুলতান মাহমূদের ছিলো মুষ্টিমেয় সেনা আর আল্লাহর উপর ভরসা। অবশ্য হিন্দু বাহিনীর আধিক্যে তিনি মোটেও চিন্তান্বিত ছিলেন না। কারণ, তার নিজস্ব রণকৌশলের প্রতি তিনি ছিলেন পূর্ণ আস্থাশীল এবং আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির প্রতি তার ছিলো অগাধ বিশ্বাস।

সেই দিনগুলোতে সুলতান ছিলেন পেশোয়ারে। লাহোর থেকে অব্যাহতভাবে তার কাছে খবর আসছিলো। সেনাবাহিনী তো নয় বিশাল এক প্লাবন তার দিকে ধেয়ে আসছে। অবশ্য তখনো সুনির্দিষ্টভাবে তার কাছে খবর পৌঁছেনি, এ প্লাবনের গতি কোন্ দিকে।

বেরা ও মুলতানে তিনি এতো পরিমাণ রসদপত্র সঞ্চিত করেছিলেন যে, বেরা ও মুলতান অবরুদ্ধ হলেও এক বছর পর্যন্ত অবরোধবাসীরা নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারবে। তিনি মনে করেছিলেন, হিন্দুরা যদি তার দখলিকৃত এসব শহর অবরোধ করে তাহলে বাইরে থেকে তিনি অবরোধ ভাঙ্গার চেষ্টা করবেন।

* * *

একদিন সুলতান মাহমূদকে তার গোয়েন্দা শাখা খবর দিলো, বিদরো অঞ্চলে ফঞ্জরের সেনারা শিবির স্থাপন করেছে। এ সংবাদ সুলতানকে আরো ভাবিয়ে তুললো। তিনি বুঝতে পারলেন, হিন্দুরা একসাথে তিনটি রণক্ষেত্র তৈরি করছে। তারা বেরা এবং মুলতান অবরোধ করবে, একই সাথে আমাকে এখানে ব্যস্ত থাকতে বাধ্য করবে।

বিষয়টি প্রকৃতপক্ষেই সুলতানের জন্য ছিলো চরম উদ্বেগের। কারণ, এমন পরিস্থিতিতে একই সাথে তিনটি রণাঙ্গন মোকাবেলা করা এবং জয়লাভ করার ব্যাপারটি তার পক্ষে মোটেও সম্ভব ছিলো না। বিজয় তো দূরের কথা, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই তখন সংশয়পূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

হিন্দু সেনাদের বিদরো পৌঁছার সংবাদের কয়েক দিন পরই সুলতানের কাছে খবর এলো, সম্মিলিত হিন্দু বাহিনী প্লাবনের মতো ধেয়ে আসছে। হিন্দু বাহিনীর দৃষ্টি ছিলো পেশোয়ারের দিকে। লাহোর ও আশপাশের লোকেরা হিন্দু বাহিনীকে এতোটাই সহযোগিতা করেছে যে, তারা কাঁধে বয়ে সেনাদের রাভী নদী পার করে দিয়েছে। তখন রাভী নদীতে ছিলো যথেষ্ট স্রোত। নদী পার হওয়ার জন্য নৌকা দিয়ে পুল তৈরি করা হয়। নৌকা স্রোতে যাতে নড়তে না পারে এ জন্য স্থানীয় লোকেরা মোটা মোটা রশি দিয়ে বেঁধে হাজার হাজার লোক টেনে রাখে, যার ফলে সেনাদের নদী পার হতে বেগ পেতে হয়নি। সামরিক রসদপত্রের বোঝাই গরুগাড়ীগুলোকে হিন্দু জনতা নিজেরা ঠেলে নদী পার করে আরো এগিয়ে দেয়, যাতে নরম মাটি ও কাদা পানিতে আটকে মালবাহী জন্তুগুলো কাহিল না হয়ে যায়।

সুলতান মাহমূদকে যখন জানানো হলো, সকল হিন্দু ফৌজ লাহোর থেকে পেশোয়ারের দিকে চলে এসেছে তিনি তা বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি বেরায় ছদ্মবেশে গোয়েন্দা পাঠিয়েছিলেন। তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিলো না, কেন হিন্দুরা বেরা ও মুলতান এড়িয়ে লাহোরের দিকে অগ্রসর হবে। সকল দিক থেকেই গোয়েন্দারা যখন খবর পাঠাচ্ছিলো, বেরা ও মুলতানের দিকে হিন্দুদের কোনো দৃষ্টি নেই, সম্মিলিত হিন্দু ফৌজ পেশোয়ারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেই সাথে তার একান্ত গোয়েন্দা দলও যখন এ খবর নিশ্চিত করলো যে, হিন্দু বাহিনী পেশোয়ারের পথে অগ্রসর হচ্ছে, তখনই সুলতানের বিশ্বাস হলো কিন্তু ততোদিনে অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে।

সুলতান এ খবর নিশ্চিত হলে তার সেনা কর্মকর্তাদের বললেন, শত্রুদের কাছে বেরা ও মুলতানের চেয়ে গজনী বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে হচ্ছে, পেশোয়ারের যে ময়দানে জয়পাল আমাদের কাছে পরাজিত হয়েছিলো, হিন্দু সম্মিলিত বাহিনী সেই ময়দানেই আমাদের মুখোমুখি হতে চাচ্ছে। ওরা আমাদের বাহিনীকে কচুকাটা করে গজনী দখলের পরিকল্পনা এঁটেছে। তারা যদি এ লক্ষ্য অর্জনে এদিকে এসে থাকে, তাহলে অবশ্যই তা দূরদর্শিতার পরিচায়ক বটে। এতো বিপুল সেনা সদস্যের একটি বাহিনীর লক্ষ্য এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক।...

আল্লাহ ছাড়া দৃশ্যত সিন্ধু নদ আমাদের সহায়ক হতে পারে। কোনভাবেই যাতে হিন্দু বাহিনী সিন্ধু নদ পার হতে না পারে, সে ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। এখন আমাদের দরকার একদল আত্মত্যাগী যোদ্ধা আর লক্ষ্যভেদী তীরন্দাজ। শত্রুবাহিনী যদি নদ পার হতে চায়, তাহলে তারা যে কোনো মূল্যে শত্রুদের নদ পরাপার রুখে দেবে। শত্রুবাহিনী যদি নৌকা দিয়ে পুল তৈরি করে সিন্ধু পার হতে চায়, তাহলে আমাদের যোদ্ধারা জীবনবাজি রেখে ওদের নৌকার রশি কেটে দেবে। আর হাতি যদি নৌকার পুল দিয়ে পার করতে চায়, তাহলে হাতিগুলোকে তীরন্দাজরা তীরবিদ্ধ করবে। দু'একটি হাতি তীরবিদ্ধ হলে পুল দিয়ে আর কাউকে পার হতে দেবে না।

অবশ্য শুধু এই তৎপরতা দ্বারা শত্রুবাহিনীর পথ রোধ করা যাবে না। কারণ, শত্রুবাহিনী যখন এখানে পৌছবে, তখন শীতকাল শুরু হয়ে যাবে। তখন নদীর পানি কমে যাবে। নদীর স্রোতও তেমনটা থাকবে না। আমরা শত্রু বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করবো নদীর তীরে। এ যুদ্ধটা হয়তো আমাদের জীবন-মরণ যুদ্ধে পরিণত হবে।

সুলতান তখনই বেরা, মুলতান ও গজনীতে দূত পাঠিয়ে খবর দিলেন, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে রিজার্ভ বাহিনীর সকল সদস্য পেশোয়ার এসে পড়ো। খুব দ্রুতগতিতে এসো। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান মাহমূদ এমন হয়ে গেলেন যে, তিনি মানচিত্র সামনে রেখে গভীর চিন্তায় ডুবে যেতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধুই ভাবতেন। পানাহার ও ঘুমের কথাও ভুলে যেতেন। তার আঙ্গুল মানচিত্রের রেখায় রেখায় ঘুরতো। তিনি নতুন যুদ্ধক্ষেত্র নির্ধারণ করতেন, কৌশল নির্ধারণ করতেন। সবদিক বিবেচনা করে আবার সেটি পরিবর্তন করে নতুন রণক্ষেত্র নির্ধারণ করতেন। এভাবে সকাল, দুপুর হয়ে রাতও চলে যেতো। ওয়াক্ত মতো নামায আদায় ছাড়া তার আর কোনো কিছুর দিকে খেয়াল ছিলো না।

* * *

রাজা আনন্দ পাল যখন নগরকোট মন্দির থেকে রাজধানীতে ফিরে এলো, তখন শুয়াইব আরমুগানী সামুরাতির ঘরে। সামুরাতির পরিচারিকা আরমুগানীকে জানালো, "রাজা সফর থেকে ফিরে এসেছে কিন্তু সামুরাতি ফেরেনি।"

দু'তিন রাত পর সামুরাতির পরিচারিকা আরমুগানীকে জানালো, "যেসব তরুণী সামুরাতির সঙ্গে নগরকোট গিয়েছিলো তারা বলেছে, প্রথম রাতেই নগরকোটের বড় পণ্ডিত সামুরাতিকে মন্দিরের ভেতরে নিয়ে গেছে। এরপর তারা আর সামুরাতির দেখা পায়নি। রাজাও আর তার ব্যাপারে কিছু বলেনি।"

এ খবর শুনে আরমুগানী ভাবতে লাগলো, নগরকোট থেকে সামুরাতির ফিরে না আসার কারণ কি? সে ভাবলো, পণ্ডিত সামুরাতিকে দেখে এতোই মুগ্ধ হয়ে গেছে যে, সামুরাতিকে সে নিজের কব্জায় রেখে দিয়েছে। নগরকোটের বড় পণ্ডিতের কথা রদ করার দুঃসাহস হিন্দুস্তানের কোনো রাজা-মহারাজার নেই।

বৃদ্ধা পরিচারিকা হৃদয়ের সবটুকু মমতা দিয়ে শুয়াইব আরমুগানীর সেবা-শুশ্রূষা করছিলো। সে ছিলো আরমুগানীর প্রতি বিশ্বস্ত। সামুরাতির নির্দেশে অতি গোপনীয় রত্নের মতোই আরমুগানীকে সবার দৃষ্টি থেকে আড়ালে রেখেছিলো বৃদ্ধা। সেই সাথে প্রতিদিন আরমুগানীর ক্ষতস্থানের পট্টি বদলে ওষুধ দিয়ে দিচ্ছিলো। যার ফলে আরমুগানীর ক্ষতস্থান দ্রুত সেরে উঠছিলো।

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে শুয়াইব আরমুগানী। সামুরাতির ঘরে আশ্রয় নিয়ে গ্রেফতারী এড়িয়ে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিলো আরমুগানী। আত্মরক্ষার ব্যাপারটিই তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো আরমুগানীর জন্য। অপরদিকে যারকার কথা এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারছে না। এতোদিন গোয়েন্দা কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে বলে কোনো মেয়েকে বিয়ে করেনি আরমুগানী। কিন্তু যারকাকে বিয়ে করার পর আরমুগানীর জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে। সে প্রবৃত্তির গোলামে পরিণত হয়ে পড়ে। ফলে যদিও আরমুগানী জানতো যারকার সাথে তার বিয়েটা হয়েছে চক্রান্তমূলক কিন্তু সেটিকে সে এই বলে মেনে নিয়েছিলো যে, যারকা চক্রান্তের ক্রীড়নক হলেও মনে-প্রাণে তাকে ভালোবেসেছে। এর প্রমাণ হলো, সে ঝুঁকি নিয়ে তার প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন তার হৃদয়ের একমাত্র আকুতি, যারকাকে সে কোথায় পাবে?

সামুরাতির বৃদ্ধা পরিচারিকা আরমুগানীর এসব গোপন কথা জানতো না। তার পক্ষে বৃদ্ধাকে এ কথা বলাও সম্ভব ছিলো না, সে যারকা নামের এক তরুণীর সাহচর্য পেতে অধীর হয়ে আছে।

একদিন একটি ঘোড়াগাড়ী সামুরাতির বাড়ির সামনে এসে থামলো। সামুরাতি বাড়ি ফিরে এসেছে ভেবে বৃদ্ধা পরিচারিকা দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ঘোড়াগাড়ী থেকে দুই তরুণী নামলো। তারা এসে সামুরাতির পরিচারিকার সাথে কথা বলতে শুরু করলো। আরমুগানী লুকিয়ে আগন্তুকদের দেখছিলো। দুই তরুণীকে দেখে সে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না। দুই তরুণীর একজন ছিলো যারকা। যারকা সামুরাতির সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছিলো।

বৃদ্ধা পরিচারিকা তাদেরকে সামুরাতির কক্ষে বসিয়ে গল্প করছিলো। এমতাবস্থায় আরমুগানীর পক্ষে বৃদ্ধাকে ডাকা সম্ভব ছিলো না। সাত-পাঁচ ভেবে সে একটি ফুলদানী মেঝেতে ছুঁড়ে মারলো। ফুলদানী ভাঙ্গার আওয়াজ শুনে পরিচারিকা দৌড়ে এ কক্ষের দিকে এলো এই ভেবে যে, হয়তো বিড়াল কোনো কিছু ফেলে দিয়েছে।

বৃদ্ধা এ কক্ষে এলে আরমুগানী তাকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে কানে কানে বললো, তোমাকে এ ঘরে আনার জন্যে আমিই ফুলদানী ছুঁড়ে ফেলেছি। আগন্তুক মেয়ে দু'টির মধ্যে যারকা নামের মেয়েটিকে এভাবে আমার কাছে পাঠাবে যাতে তার সঙ্গী মোটেও বুঝতে না পারে।

বৃদ্ধা আরমুগানীকে জানালো, সে সামুরাতির সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলো। সে জানতো না, মাসুরাতি বাড়িতে নেই। এখন তো সে চলে যাচ্ছে, কিভাবে আমি ওকে তোমার কথা বলবো?

আরমুগানী নাছোরবান্দা। সে বৃদ্ধাকে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করলো, তুমি যে করেই হোক আমার কাছে ওকে পাঠানোর ব্যবস্থা করো। এ কাজটি খুব জরুরী।

আরমুগানীর উপর্যুপরি অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধা সম্মত হলো। এই বৃদ্ধা পরিচারিকা ছিলো অভিজ্ঞ। জীবনে বহু নারী-পুরুষকে সে আঙ্গুলের ইশারায় নাচিয়েছে। উটকো একটা বাহানা সৃষ্টি করে পরিচারিকা অপর তরুণীকে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেলো। এই ফাঁকে আরমুগানী এসে যারকার সামনে দাঁড়ালো। যারকা আরমুগানীকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। সে আরমুগানীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিস্ময়ের সাথে বললো, তুমি এখনো এদেশে রয়ে গেছো? পায়ে আঘাত পেয়েছো কিভাবে?

"যদি ধোঁকা দিতে চাও তাহলে পরিষ্কার বলে দাও। আমি তোমার জন্যই এখানে অপেক্ষা করছিলাম। প্রতারণা করলে জীবনের জন্য চলে যাবো। নয়তো বলো, কোথায় তোমার সাথে সাক্ষাৎ হবে?"

"হায়! আমি কিভাবে বিশ্বাস করাবো যে, তোমার সাথে ধোঁকাবাজি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি যেখানে যেতে বলবে সেখানেই যাবো। চাইলে এখানেও আসতে পারি।"

"ঘরে নয়, বাইরেই আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই। প্রয়োজনে তোমাকে ঘরেও নিয়ে আসতে পারবো।... তবে এর মধ্যে তুমি এ ব্যাপারটা জানতে চেষ্টা করবে, সামুরাতি কেন নগরকোট থেকে ফিরে আসেনি। সে

আমাকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে উপকার করেছে। এখন চলে যাও। তোমার সঙ্গীনী এসে পড়ছে।"

যারকা আরমুগানীর সামনে থেকে আড়াল হতে চাচ্ছিলো না। বহুদিন পর অপ্রত্যাশিতভাবে সে আরমুগানীর সাক্ষাৎ পেলো। সে ভেবেছিলো, আরমুগানী নিরাপদেই শহর থেকে পালাতে পেরেছে। সে কোনদিন আরমুগানীর দেখা পাবে এমনটি আশা করেনি। কারণ, তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে আরমুগানীর গ্রেফতার হওয়ার আশংকা ছিলো। আরমুগানী কোনো অবস্থাতেই গ্রেফতার হতে চাইবে না। কারণ, আরমুগানী যে সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা, এ সংবাদ লাহোরে জানাজানি হয়ে গিয়েছিলো। কাজেই, আরমুগানীর পক্ষে আর লাহোরে আসা সম্ভব নয়।

যারকা আরমুগানীর জীবনে এক আয়েশী মরীচিকা হয়ে দেখা দিয়েছিলো। যারা যারকাকে মরীচিকার মতো ব্যবহার করেছিলো, তাদের এই প্রয়োগ ছিলো স্বার্থক। এই ধোঁকায় পড়ে আরমুগানী ওয়াদা ভঙ্গ করে তার আত্ম-পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছিলো। আরমুগানী নারী সৌন্দর্যের ফাঁদে পড়ে নিজের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছিলো কিন্তু হয়তো সেটি কুরআন কারীমেরই বরকত যে, যে ফাঁদ পাতা হয়েছিলো আরমুগানীকে ফাঁসানোর জন্য, সেই ফাঁদে সে নিজেই আটকে গিয়েছিলো। আরমুগানীর ফাঁদও ছিলো এমন কার্যকর যে, চক্রান্তকারিণী যারকা নিজের মিশন ভুলে গিয়ে শিকারকে শুধু মুক্ত করেই দেয়নি, সেও শিকারের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। কারণ, জীবনে যতো পুরুষের স্পর্শে সে গিয়েছিলো, কেউ তাকে আরমুগানীর মতো অকৃত্রিম ভালোবাসায় সিক্ত করেনি। সবাই তার দেহ-সৌন্দর্য নিয়ে উল্লাস করেছে মাত্র। নারী মনের ভালোবাসার অভাবটুকু আরমুগানীর অপত্য ভালোবাসায় আরো তীব্র হয়ে ওঠে, বুকের মধ্যে না পাওয়ার হাহাকার আরো প্রচণ্ড হয়। আরমুগানীর অকৃত্রিম ভালোবাসার ঝর্নাধারায় অবগাহন করে নিজেকে সিক্ত করতে সবকিছু ভুলে যায় যারকা। যারকা নিজেকে ভাসিয়ে দেয় আরমুগানীর প্রেমের জোয়ারে। কিন্তু জোয়ারের পর ভাটার টানে তারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই যারকা সামুরাতির ঘরে আরমুগানীর দেখা পেয়ে যায়। কিন্তু বেশিক্ষণ আরমুগানীর সান্নিধ্যে কাটানোর সুযোগ ছিলো না যারকার। কারণ, তার বান্ধবীকে খুব বেশি সময় বৃদ্ধা পরিচারিকা অন্য ঘরে বসিয়ে রাখতে পারছিলো না।

"আগামীকাল রাতে এই বাড়ির বাগানে তোমার সাথে আমার দেখা হবে।" এই বলে কক্ষ থেকে চলে গেলো আরমুগানী।

যারকা ও তার বান্ধবী চলে যায়। বৃদ্ধা পরিচারিকা আরমুগানীকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি লুকিয়ে যারকার সাথে কি কথা বলেছো? ওই মেয়েটি থেকে নিজেকে আড়ালে রাখলে কেন?"

এমন প্রশ্ন করা ছিলো স্বাভাবিক। বৃদ্ধা আরমুগানীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলো বটে কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় সে মোটেও জানতো না। সামুরাতি তাকে শুধু বলেছিলো, ওকে তুমি লোকচক্ষুর দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখবে। আর ওর ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করবে। বৃদ্ধা সামুরাতির কথা যথার্থভাবেই পালন করছিলো।

এই বৃদ্ধা ছিলো রাজমহলের শীর্ষ নর্তকীদের একজন। রূপে-গুণে-নাচে সমবয়স্কাদের মধ্যে সে ছিলো অনন্যা। কিন্তু বয়সের ভারে যখন তার সুঢৌল গণ্ডদ্বয়ে দেখা দিলো বলী রেখা, আর মাথার দু'চারটি চুলে সাদা বর্ণ ধারণ করলো, নাচের মুদ্রায় দেখা দিলো ছন্দপতন তখন তার প্রতি আকর্ষণে ভাটা পড়লো। সে রাজমহল থেকে বিতাড়িত হলো। তার নাচের মুদ্রায় যারা বিমোহিত হতো, তার শরীর নিয়ে খেলতো, যারা অহর্নিশ উন্মুখ থাকতো, তাদের সবাই তার দিকে আর ফিরে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করতো না। রাজমহল থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর তার রক্তের কণায় কণায় আত্মোপলব্ধি হলো যে, রাজমহলের মহারথীরা আমার মতো নারীদের শরীর ও সৌন্দর্যকেই শুধু ভোগ করতে চায়। এদের মধ্যে কোনো মানবিক দয়া নেই। এরপর সে একজনকে ভালোবাসে। স্বপ্ন দেখে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার। কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ এক নর্তকীর ঘর বাঁধার স্বপ্ন পূরণ হলো না। রাজার আনুগত্য প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার কারণে সেই পুরুষকে রাজা কারান্তরীণ করলো। কারণ, সে ছিলো মুসলমান। বস্তুত সেই লোক স্বজাতির সাথেও বেঈমানী করেছিলো, কিন্তু পরিণামে আজীবন অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠে ধুঁকে ধুঁকে মরা ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্তি ঘটলো না। বয়স্ক এই নর্তকীর এই ভালোবাসার কথাও নীরবে-নিভৃতে মৃত্যুবরণ করলো। কেউ তা জানতে পারলো না তার সেই স্বপ্নের পুরুষের কথা। কারণ, জানাজানি হয়ে গেলে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে তাকেও কারাবরণ করতে হতো।

এখনও সে শাব্দিক অর্থে বুড়ি নয়। স্বাস্থ্য সচেতন বলে এখনও তার শরীরের গাঁথুনী ও চেহারা ছবি ছিলো ভরাট ও টলটলে। সে যখন বুঝতে পারলো তার পক্ষে আর নাচা সম্ভব নয়, তার জায়গা দখল করে নিয়েছে সামুরাতি তখন সে সামুরাতির ঘরে এসে ঠাঁই নেয়। সামুরাতির সাথে এই বয়োজ্যেষ্ঠ নর্তকীর সম্পর্ক অন্য নর্তকীদের মতো ছিলো না। যেমনটি নর্তকীদের মধ্যে পারস্পরিক

হয়ে থাকে। সামুরাতিকে সে খুব ভালোবাসতো। সামুরাতি নাচে-গানে ছিলো সকলের সেরা। জাদুকরী কণ্ঠ ও রূপ-সৌন্দর্যে সামুরাতি ছিলো অনন্যা। পরিচয়ের শুরু থেকেই সামুরাতির প্রতি মনের টান ছিলো এই প্রবীণার। এক পর্যায়ে রাজমহল থেকে বিতাড়িত হয়ে সে যখন সামুরাতির বাড়িতে ঠাঁই নিলো, তখন সামুরাতি তাকে সানন্দে জায়গা দিলো। সেও নিজেকে ঢেলে দিলো সামুরাতির সেবা-যত্নে। দিনে দিনে সামুরাতি তাকে মায়ের আসনে স্থান দিয়েছিলো আর বয়োজ্যেষ্ঠও তার হৃদয় নিংড়ানো স্নেহ-মমতা উৎসর্গ করে দিলো সামুরাতির কল্যাণে।

শুয়াইব আরমুগানী আহত হলে সামুরাতি তাকে ঘরে নিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করে যখন বললো, গোপন রত্নের মতো তুমি ওকে আগলে রাখবে এবং সেবা-যত্ন করবে। তখন সে জানতেও চায়নি, লোকটি এমন কি রত্ন আর কেনই বা তাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখতে হবে। সে এমনিতেই বুঝে নিয়েছিলো, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে। বৃদ্ধা বুঝে নিয়েছিলো, নিশ্চয়ই এ সুদর্শন যুবককে বিশেষ লক্ষ্যে লুকিয়ে রাখতে চায় সামুরাতি। কারণ, এক সময় সেও একজনকে আপন করে নিতে চেয়েছিলো। কিন্তু রাজার বাহিনী তার ভালোবাসার মানুষটিকে ধরে নিয়ে সারাজীবনের জন্য কয়েদখানায় বন্দী করে রেখেছে। ঘর বাঁধার স্বপ্নটা তার স্বপ্নই থেকে যায়। আজীবন বুকের মধ্যে সেই কষ্ট-যাতনা সে বয়ে বেড়াচ্ছে। তাই সামুরাতির জীবনটাও এমন যন্ত্রণাদগ্ধ হোক, তা সে ভাবতেই পারে না। ফলে সামুরাতির এতোটুকু বলায়ই সে অমূল্য রত্নের মতোই আরমুগানীকে আগলে রাখতে চেষ্টা করে। সামুরাতি রাজা আনন্দ পালের নগরকোট মন্দিরে গিয়ে ফিরে না এলেও আরমুগানীকে সে যথারীতি লোকচক্ষুর আড়ালেই রেখেছে। আসলে এ কাজটি সে করেছে সামুরাতির ভালোবাসার টানে। নিজের অপূরণীয় প্রেমের সুপ্ত ঝর্না থেকে সিঞ্চিত মমতা দিয়ে সে ধীরে ধীরে সুস্থ করে তোলে আরমুগানীকে। সামুরাতির দীর্ঘ অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সে কোনো দিন আরমুগানীকে এ কথাটিও জিজ্ঞেস করেনি, সে কে? কি তার পরিচয়? কোত্থেকে এসেছে? যাবেই বা কোথায়?

যারকা এ বাড়িতে সামুরাতির সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে আরমুগানী যখন তার সাথে লুকিয়ে কথা বলতে অনুরোধ জানায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধা পরিচারিকার মনে প্রশ্ন দেখা দেয়, লুকিয়ে থাকা এই যুবকের সাথে যারকার কি সম্পর্ক? কিভাবে তার পরিচয় যারকার সাথে? যারকার সাথে অতি গোপনে বান্ধবীকে এড়িয়ে কি কথা সে বললো?

বৃদ্ধার মনোভাব আন্দাজ করে আরমুগানীর মধ্যেও এ তাড়না সৃষ্টি হলো যে, সে নিজের প্রকৃত পরিচয় বৃদ্ধার কাছে ব্যক্ত করবে কিনা? ভেবে-চিন্তে সে সিদ্ধান্ত নিলো, হ্যাঁ, বৃদ্ধাকে বলেই দেবে তার পরিচয়।

আরমুগানী বৃদ্ধাকে ডেকে বললো, "যারকা আমার বিবাহিতা স্ত্রী।"

"তাই যদি হবে তবে এমন রাখঢাক কেন?" জানতে চাইলো বৃদ্ধা।

"তুমি কি ওর সৌন্দর্য দেখেছো?" আরমুগানীর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সে বললা, "তুমি কি জানো যারকা কার মেয়ে?"

"যারকা এক ভয়ংকর সাপের সন্তান?" উত্তর দিলো বৃদ্ধা। "ওর বাবাকে আমি চিনি। সে দুর্নীতিবাজ, বেঈমান, আত্মমর্যাদাহীন, গাদ্দার, কুলাঙ্গার এক মুসলমান। সে তার নিজের কন্যার রূপ-সৌন্দর্যের বিনিময়ে রাজ দরবারে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হয়েছে।"

"ওর মেয়ে গোপনে আমাকে বিয়ে করেছিলো। সে আমার ঘরে চলে এলে তার বাবার কানে এ সংবাদ চলে যায়। তুমি জানো, গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে লাহোরের সব মুসলমানদের ঘরে তল্লাশি করছে এবং নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। ব্যক্তিগত আক্রোশেও অনেকে নিরপরাধ মানুষকে ধরিয়ে দিচ্ছে। যারকার বাবা সামরিক বাহিনীর এক পদস্থ কর্তাব্যক্তির কাছে তার সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে দেয়ার কথা বলে প্রশাসনকে পক্ষে নিয়ে এক রাতে কয়েকজন পুলিশ নিয়ে আমার ঘরে হানা দেয় এই বলে যে, আমি গজনী সুলতানের গোয়েন্দা। কিন্তু যারকা আমাকে গ্রেফতারির কবল থেকে বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। পুলিশ আমার ঘরে হানা দেয়ার আগেই যারকা কিভাবে যেনো জানতে পারে এবং আমাকে গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে বলে, তোমাকে গ্রেফতার করতে পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করেছে। পরিস্থিতির ভয়াবতা অনুমান করতে পেরে আমি ঘরের ছাদে উঠে দেয়াল টপকে দৌড়ে পালাতে গিয়ে তোমাদের বাড়ির চৌহদ্দিতে এসে বাগানে লুকাই। পুলিশ আমার পিছু ধাওয়া করেও ধরতে পারেনি। কিন্তু তোমাদের কুকুর আমাকে পেয়ে বসে। তোমাদের বিবি সাহেবা আমার এ অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে আমাকে আশ্রয় দেয়। আচ্ছা, আমাকে কি গোয়েন্দা মনে হয়?"

"না, তোমাকে গোয়েন্দা মনে হবে কেন?" বললো বৃদ্ধা পরিচারিকা। "যারকার বাবা আক্রোশের কারণে এমনটা করেছে। আচ্ছা, তুমি এখন কি করতে চাও?"

"আমার পক্ষে এখন আর লাহোরে থাকা সম্ভব নয়। যারকার বাবা যদি আমার কথা জানতে পারে, তবে সে আমাকে ধরিয়ে দেবে, নয়তো হত্যা করবে। আমি যারকাকে নিয়ে পেশোয়ার চলে যেতে চাই।"

"সে কি তোমার সাথে যেতে প্রস্তুত?"

"হ্যাঁ, সে তো একপায়ে খাড়া। আমি এ ব্যাপারে তোমার সহযোগিতা চাই। আগামীকাল সন্ধ্যায় যারকা লুকিয়ে এখানে আবার আসবে। আমি গোপনে বাগানের একটি জায়গায় ওর সাথে দেখা করবো বলে কথা দিয়েছি। এখন তো আদ্যপান্ত তুমিও জানতে পারলে। এখন তুমি কি ওকে ঘরে নিয়ে আসা পছন্দ করবে? অবশ্য ওর পিছু পিছু যদি কেউ এখানে পৌঁছে যায়, তাহলে আমার ধরা পড়ার আশংকা আছে।"

"তুমি নির্দ্বিধায় ওকে ঘরে নিয়ে আসতে পারো। আমি কুকুর ছেড়ে দেবো, তাহলে কারো পক্ষে এদিকে পা বাড়ানো সম্ভব হবে না। কেউ পিছু নিলেও তুমি পালানোর সুযোগ পাবে। যারকাকে আড়াল করার প্রয়োজন নেই। কারণ, আমি দৃঢ়তার সাথে যে কারো সাথে এ কথা বলতে পারবো যে, সে সামুরাতির সাথে দেখা করতে এসেছিলো।"

"তুমি কি এ বিষয়টি জানতে পেরেছো, মহারাজা ফিরে এসেছে কিন্তু সামুরাতি ফিরে এলো না কেন?"

"চেষ্টা করছি।" বললো বৃদ্ধা। "এমন তো হওয়ার কথা নয় যে, মহারাজা সামুরাতিকে উপঢৌকনস্বরূপ কাউকে দিয়ে আসবে। কারণ, যে কোনো মূল্যে সামুরাতিকে সে হাতের মুঠোয় রাখতে চাইবে।"

"আমি অবশ্য যারকাকে এ ব্যাপারে খবর নেয়ার জন্য বলে দিয়েছি। আশা করি, সে এ বিষয়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহে সক্ষম হবে।"

* * *

যারকা কথা মতো সন্ধ্যায় সামুরাতির বাড়িতে এলো। সে ঠিকই সামুরাতির না ফেরা সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে। আরমুগানী বাগানের বাইরে যে জায়গায় সে লুকিয়ে ছিলো, সেই জায়গায় যারকার জন্য অপেক্ষা করছিলো। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর যারকা এলো। যারকা একাকীই এলো। সে যারকাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে এলে পরিচারিকা বাগানে কুকুর ছেড়ে দেয়।

যারকা প্রথমেই জানালো, 'সামুরাতিকে নগরকোটের প্রধান পণ্ডিত বলী দেয়ার জন্য রেখে দিয়েছে। সে দ্বিতীয় সংবাদ দিলো, বিগত কয়েক মাস ধরে

তিন-চারটি রাজ্যের যেসব সেনা রাজা আনন্দ পালের রাজধানী লাহোরে জমায়েত হচ্ছিলো, এরা সবাই পেশোয়ারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই সম্মিলিত হিন্দু বাহিনীর বিজয়ের জন্য পণ্ডিত দেবীর পদমূলে নর বলী দেয়ার জন্য সামুরাতিকে আটকে রেখেছে। মনে হয় এর মধ্যে পণ্ডিত সামুরাতিকে বলী দেয়ার কাজ সমাপ্ত করেছে।" বললো যারকা।

"আমার বিশ্বাস, সামুরাতি এখনো বেঁচে আছে।" বললো বৃদ্ধা পরিচারিকা। "কারণ, যেসব নারীকে পণ্ডিতরা বলী দিতে চায়, এদেরকে কয়েক দিন নিজেদের কজায় রেখে মানসিকভাবে তৈরি করে। তাদেরকে গঙ্গাজলে ধৌত করে আর নানা তন্ত্রমন্ত্র পড়ে বশে আনে। এদেরকে নেশাদ্রব্য খাইয়ে এমন করে ফেলে যে, তরুণী নিজে থেকেই বলতে থাকে, আমাকে দেবীর চরণে বলী দিয়ে দাও।"

তিন জনের মধ্যে নেমে এলো গভীর নীরবতা।

"সামুরাতি আমার যে উপকার করেছে, তা কোনো সাধারণ কাজ নয়। আমি তা ভুলে যেতে পারি না।" বললো আরমুগানী। "আমি অবশ্যই নগরকোট যাবো এবং সামুরাতি জীবিত না ইতিমধ্যেই তাকে বলী দেয়া হয়েছে– তা জানতে চেষ্টা করবো। যদি জীবিত থাকে, তবে আমি তাকে বাঁচানোর সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করবো।"

"নগরকোট মন্দির সম্পর্কে তুমি জানো না।" বললো বৃদ্ধা। "সেটি সাধারণ কোনো মন্দির নয় যে, তুমি সেটিতে প্রবেশ করে সব কক্ষ ঘুরে দেখতে পারবে। আমি নগরকোট মন্দিরের ভেতরে গিয়েছি। নগরকোট মন্দির একটা গোলক ধাঁধা। সেখানে রয়েছে বিশাল পাতাল কক্ষ। পাতাল কক্ষগুলো এতোটাই বিশাল যে, কোনো হাতিও যদি সেখানে হারিয়ে যায়, তাও খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। তাছাড়া মন্দির ঘিরে রয়েছে বিশাল সেনা দুর্গ। বহু মানুষ সেখানে পূজা পাঠ করতে যায় বটে, কিন্তু সামুরাতিকে পণ্ডিতেরা কোথায় রেখেছে তা জানা সহজ ব্যাপার নয়।"

শুয়াইব আরমুগানীর শরীরে তখন যৌবনের দৃপ্ত তারুণ্য ঝিলিক দিয়ে উঠে। সে জানতো, সামুরাতি একটি মুসলিম মেয়ে। একজন মুসলিম তরুণী হিন্দুদের যুদ্ধ জয়ের জন্য বলীর শিকার হবে, তা মোটেও বরদাশত করতে পারছিলো না আরমুগানী। আরমুগানীর চোখে তখন ভেসে উঠলো সেই দৃশ্য, যখন কুকুর তাকে মারাত্মকভাবে আহত করার পর সামুরাতি তাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে নিজের হাতে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে দিচ্ছিলো। সামুরাতির এক হাতও কামড়ে দিয়েছিলো কুকুর। অনবরত ঝরেপরা আরমুগানীর রক্তের সাথে সামুরাতির

ক্ষতস্থান থেকেও যখন দু'ফোঁটা তাজা রক্ত বিছানায় পড়েছিলো, তখনই এই রক্ত দেখিয়ে সামুরাতিকে সে বলেছিলো, দেখো, তোমার আর আমার রক্তের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই, যেনো একই রক্ত। সেদিন সামুরাতি তাকে বলেছিলো, আজ তুমি আমার রক্ত দেখিয়ে আমার মৃতপ্রায় বোধকে জাগিয়ে দিলে। এই রক্ত দেখে এখন আমি নিজের আত্মপরিচয় উপলব্ধি করতে পারছি।

দীর্ঘক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো আরমুগানী। সেই রাতের গোটা ঘটনা তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ভেসে উঠলো সামুরাতির হৃদয়ের আকুতি এবং মমতার পরশ। হঠাৎ সে বলে উঠলো, "পাথরের তৈরি মূর্তির কল্যাণে এক মুসলিম তরুণীর মৃত্যু হতে আমি কখনো দেবো না।" চকিতে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে আরমুগানী বললো, "তুমি দাবী করো, সামুরাতিকে নিজের মেয়ের মতোই স্নেহ করো। তোমার হৃদয়ে তার জন্য রয়েছে মায়ের মমতা। যদি তাই মনে করো তাহলে তুমি কি তা প্রমাণ করতে পারবে? তুমি কি আমার সাথে নগরকোট যেতে পারবে? কারণ, আমি নগরকোটের পথ চিনি না। তুমি আমাকে নগরকোট নিয়ে চলো আর ভেতরের পরিবেশটা একটু বুঝিয়ে দিও। আমার বিশ্বাস সামুরাতি এখনও জীবিত আছে।"

"পথেই আমরা গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার আশংকা নেই কি?" বৃদ্ধা বললো।

"না। অন্তত পথের গ্রেফতারী আমরা এড়িয়ে যেতে পারবো। কারণ, আমরা ছদ্মবেশে যাবো।" আরমুগানী যারকার উদ্দেশে বললো, "তুমি এখানেই থাকো যারকা। আমি বেঁচে থাকলে অবশ্যই দেখা হবে।"

"আমিও যাবো তোমাদের সাথে।" দৃঢ়তার সাথে বললো যারকা। "আমি আর একাকী থাকতে পারবো না। যেখানে তুমি যাবে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।"

পরিচারিকা আগেই জেনেছিলো আরমুগানী আর যারকা স্বামী-স্ত্রী। এ জন্য সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সামুরাতির মৃত্যু আশংকা আর আরমুগানীর প্রতি তার অবদানের বিষয়টি আরমুগানীকে এতোটাই আবেগাপ্লুত করে ফেলেছিলো যে, সে ভুলেই গিয়েছিলো তার একান্ত প্রেয়সী দীর্ঘদিন পর তার একান্তই পাশে রয়েছে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে তার একান্ত সান্নিধ্যের জন্য চলে এসেছে। আরমুগানীর ভাবান্তর অনুধাবন করে যারকা তার কাঁধে হাত রেখে মৃদু ঝাঁকুনি দেয়। যারকার দিকে তাকায় আরমুগানী।

"মনে হয় তুমি এখন পর্যন্ত আমাকে ধোঁকাই ভাবছো।" শ্লেষমাখা কণ্ঠে বললো যারকা। "একজন নর্তকীকে তুমি আমার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভাবছো এবং ওর জন্য পেরেশান হয়ে পড়েছো?"

"ওহ্ যারকা!" যারকার হাত ধরে বললো আরমুগানী। "এভাবে বলো না। সামুরাতি আমাকে আশ্রয় না দিলে আজ রাজার বন্দীশালায় আমাকে জীবন্ত লাশে পরিণত হতে হতো। তুমি জানো না, তুমি যেমন মুসলমান, সামুরাতি একজন মুসলিম তরুণী। আমি তোমাকে মোটেও অবিশ্বাস করছি না। ভাবছি, তোমাকে এখানে রেখে যেতেও মন চাচ্ছে না, আবার সাথে নিয়ে যাওয়ার সাহস পাচ্ছি না। এখানে রেখে গেলে মনে হয় না পুনর্বার ফিরে এসে আমার পক্ষে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হবে।"

"ছদ্মবেশে যেভাবে তুমি পরিচারিকাকে নিয়ে যাবে, সেভাবে আমাকেও তোমার সাথে নিয়ে চলো। অতীতের কৃত গুনাহর কাফফারা করার সুযোগটুকু আমাকে দাও।"

"যারকা! একটা বিষয় তোমার খেয়াল রাখতে হবে যে, সামুরাতির পরিচারিকাকে তুমি যে আমার স্ত্রী একথা আমি বলেছি বটে কিন্তু আমি যে গজনী সুলতানের গোয়েন্দা এ কথা কিন্তু বলিনি। আমার আরো দুই সাথীকে সঙ্গে নিতে হবে। আজ রাতে আমি ওদের সাথে দেখা করবো। আমি ওদের বলে-কয়ে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য রাজি করাবো। তুমি এখন চলে যাও। সম্ভব হলে আগামীকাল সকালে একটু এদিকে এসো। তখন বলে দিতে পারবো, আমাদের যাত্রা কিভাবে হবে।"

যারকা তাকে জানালো, "সরকারীভাবে তোমাকে এখন আর খোঁজাখুঁজি করছে না। এ মুহূর্তে লাহোর অনেকটাই শান্ত। সেনাবাহিনী অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে, ধর-পাকড়ও থেমে গেছে।"

আরমুগানীর দাড়ি তখন বেশ বড় হয়ে গেছে। এমনিতেই সে রূপ বদল করার বিস্ময়কর ক্ষমতা রাখতো। তাছাড়া বহু ধরনের আওয়াজ সে করতে পারতো। যারকাকে অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়ে তার বন্ধুদের উদ্দেশে অন্যদিকে চলে গেলো আরমুগানী। তার মন-মানসিকতায় এখন সামুরাতির মুক্তিই প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

* * *

নগরকোটের পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের হৃদয়রাজ্যেও সামুরাতি প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো। নারীর ব্যাপারে পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ ছিলো পাথর। পণ্ডিত নারীদের খুবই ঘৃণা করতো। বলতো, নারী একটা জীবন্ত যন্ত্রণা, সকল অঘটনের শিকড় এই নারী। নারীর মধ্যে এমন জাদু রয়েছে যদি তা কোনো পুরুষকে পেয়ে বসে

তাহলে সেই পুরুষের আর কোন কর্মশক্তি থাকে না। তখন মন্দ ছাড়া মঙ্গলের কিছু ভাবতেই পারে না নারী প্রভাবিত পুরুষ।

কিন্তু সামুরাতিকে বলী দেয়ার জন্য যখন পাহাড়ের উপর মন্দিরের গোপন কক্ষে নিয়ে গেলো এবং সামুরাতিকে বলীর কথা শোনালো, তখন সামুরাতি তার সাথে এমনসব আচরণ করছিলো, যেন পণ্ডিতের ভেতরকার কোনো এক শক্তি মোচড় দিয়ে ওঠে। সেই শক্তির উপস্থিতি এতোদিন পণ্ডিত অনুভব করেনি। অতঃপর ভোরবেলায় এসে সামুরাতিকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে পণ্ডিত নিজের শয়নকক্ষে চলে যায়। নিজের ভেতর পণ্ডিত এতোটাই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলো যে, বিছানায় গা এলিয়ে দেয়া মাত্রই সে ঘুমিয়ে পড়তে পারতো। সে কখনো মানসিক অস্থিরতায়ও ভোগেনি কিন্তু এ রাতে পণ্ডিতের কি যে হলো, ঘুমানোর চেষ্টা করেও সে ঘুমাতে পারছিলো না। সামুরাতির অট্টহাসি আর শিশুর মতো গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ার মতো আচরণ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। সামুরাতির রেশম কোমল চুলের স্পর্শ যেনো তার অনুভবে শিহরণ খেলে যাচ্ছে। নারীর স্পর্শ, নারী দেহের উষ্ণতা ও গন্ধের সাথে তার পরিচয় ছিলো না। কিন্তু আজ নারীদেহের আকর্ষণ থেকে সে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারছিলো না।

সামুরাতির উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ তার কানে নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছিলো– "আপনি যদি আমাকে সেই ভালোবাসা দেন, যে ভালোবাসার জন্য আমার হৃদয় বহুদিন থেকে তৃষ্ণার্ত, তাহলে মনের আনন্দে আমি এমন নৃত্য করবো যে, পাথরের মূর্তিগুলোও আমার সাথে নাচতে শুরু করবে। লোকজন দূর-দূরান্ত থেকে নগরকোটের নর্তকীর নাচ দেখতে আসবে আর ভগবানের পূজা বাদ দিয়ে লোকজন নগরকোটের নর্তকীর পূজা করতে শুরু করবে।"

পণ্ডিত এতোটাই মোহাবিষ্ট হয়ে সামুরাতির কথা ভাবছিলো, যেনো সে রঙিন স্বপ্নে মেতে আছে। আর এরই মধ্যে কেউ তার শরীরে সুঁই ফুটিয়ে জাগিয়ে দিয়েছে। সে রাগে-ক্ষোভে ফুঁসতে লাগলো। এক লাফে বিছানা ছেড়ে দাঁড়ালো। তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো যেনো। সে মনে মনে স্বগতোক্তি করলো– সামান্য একজন নর্তকী...? মুসলমান...? ম্লেচ্ছ পাপীষ্ঠা। জানা নেই কত পুরুষের সাথে মেলামেশার পাপ মাথায় নিয়ে বেড়াচ্ছে। ও করছে কৃষ্ণ ভগবানকে অপমান? কৃষ্ণ ভগবানের ক্রোধ সম্পর্কে জানে না হতভাগী। এ জন্যই দেব-দেবীকে পাথরের মূর্তি বলে!

নিজের হাতের তালুতেই প্রচণ্ড আঘাত করে পণ্ডিত। ক্ষোভে দাঁতে দাঁত পিষে স্বগতোক্তি করলো– ছিঃ ছিঃ ম্লেচ্ছের বাচ্চা ম্লেচ্ছ, আমার শরীর অপবিত্র করে দিয়েছে! আমি মিথ্যা বলিনি, নারীর শরীর পুরুষকে জানোয়ার বানিয়ে দেয়। পণ্ডিত নিজের অজান্তেই বিড় বিড় করতে লাগলো। সে যা ভাবছিলো তা কণ্ঠ দিয়ে সশব্দে বেরিয়ে আসছিলো– "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে পবিত্র করতে হবে। হয়তো বহু দিন লাগবে, তবুও ওকে পবিত্র করে ওর রক্ত দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পা ধুইয়ে দিতে হবে।"

দীর্ঘক্ষণ পর পণ্ডিতের দেমাগ সামুরাতির প্রভাবমুক্ত হলো। মধ্যরাতের পর পণ্ডিত গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো ভোরেই পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ভোরের আবছা অন্ধকারে উঁচু পাহাড়ী মন্দির থেকে নীচে নেমে ভজন গুনগুনিয়ে পণ্ডিত গঙ্গার একটি শাখা নদীর তীরে পৌছালো। নদীতে নেমে হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে দু'হাত পানি ছিটিয়ে ভজন জপতে জপতে পানিতে বসে পড়লো। হিন্দুরা আজো বিশ্বাস করে, গঙ্গা নদীর পানিতে স্নান করলে সকল পাপ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। ঠাণ্ডা পানিতে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর পণ্ডিত অনুভব করলো তার শরীরটা এখন জুড়িয়ে এসেছে। সারারাত সে শরীরে একটা জ্বালা অনুভব করেছে। সে অনুভব করলো নর্তকী সামুরাতি তার শরীরে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলো, সে আগুন চিরদিনের জন্য নিভিয়ে দিয়েছে বলে মনে করছে।

ভজন ও গঙ্গা স্নান পণ্ডিতের মনে স্বস্তি এনে দিলো। এখন সে আগের পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের ভাবগাম্ভীর্য ফিরে পেলো। যে কারণে কোনো পূজারিণী নারীকেও পর্যন্ত কোনদিন তার শরীর স্পর্শ করতে দেয়নি রাধাকৃষ্ণ। রাতের অস্থিরতায় সামুরাতির প্রতি তার মনে যে ঘৃণা ও ক্ষাভ দানা বেঁধেছিলো, তাও তিরোহিত হয়ে গেলো। সে ভাবতে লাগলো, মাসুরাতির কোনো দোষ নেই, তাকে পাপ কাজে বাধ্য করা হয়েছে। তাই তো সে বলেছে, সে নির্ভেজাল প্রেমের কাঙালী। সে বলেছিলো, আমাকে কি গঙ্গা জলে বিধৌত অকৃত্রিম ভালোবাসা দিতে পারবে?

হ্যাঁ, তোমাকে আমি গঙ্গা জলে বিধৌত নির্ভেজাল প্রেম দেবো। স্বগতোক্তি করে রাধাকৃষ্ণ। আমি এ নর্তকীকে গঙ্গা জলে ধৌত করে অকৃত্রিম প্রেম দেবো। এরপর ওকে কৃষ্ণ দেবীর চরণে বলী দিয়ে বলতে পারবো যে, আমি এমন এক নারীকে বলী দিয়েছি যাকে আমি ভালোবাসি। অবশ্যই এই বলীদান দেবীর কাছে কবুল হবে। গজনী, বলখ, বোখারা, সমরকন্দ মহাভাতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

মন্দিরের শাখা ধ্বনি মাহমূদের প্রতিটি মসজিদে ধ্বনিত হবে। হিন্দু ধর্মের মহাবিজয় আর ইসলাম ধর্মের পতন ঘটবে।

গঙ্গা স্নান থেকে ফিরে এসে মন্দিরের যেখানে হিন্দু নারী-পুরুষ সকালের পূজা দিচ্ছিলো, মণ্ডিত সেখানে গেলো। সে ঘটি থেকে গঙ্গার পানি মূর্তির চরণে ছিটিয়ে দিয়ে হাত জোড় করে মূর্তিকে প্রণাম করলো।

অন্যদিনের চেয়ে সেদিন সকালে সময় বেশি নিয়ে পূজা-অর্চনা করতে লাগলো। সে যখন দেব-দেবীর সন্তুষ্টি বিধানে আত্মতুষ্টির মোহময়তা কাটিয়ে স্বাভাবিক হলো, তখন সেখানে আর কেউ নেই। নগরের লোকজন পূজা-অর্চনা শেষ করে সবাই যে যার মতো চলে গেছে।

পণ্ডিতের মনে পড়লো, আরে, এই নর্তকীকেও গঙ্গা জলে স্নান করানো উচিত ছিলো। কিন্তু ততোক্ষণে সূর্য উঠে চতুর্দিকে সকালের কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে। সে কক্ষে এসে দেখলো, সামুরাতি এখনো গভীর ঘুমে অচেতন। সে সামুরাতির বিছানা থেকে দু'তিন কদম দূরে দাঁড়ালো। যেনো কোনো অদৃশ্য হাত তাকে ওখানেই থামিয়ে দিয়েছে।

সামুরাতি নিরুদ্বেগে ঘুমাচ্ছিলো। তার ঠোঁটে যেনো তখনও নিষ্পাপ শিশুর হাসি মেখেছিলো। দেখে মনে হচ্ছে, সে হয়তো রঙিন কোন স্বপ্ন দেখছে। বেলা অনেক উপরে ওঠে গেলেও সে নিশ্চিন্তে বেঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন। পণ্ডিত ভাবলো, পাপ তো মানুষকে স্বস্তি দেয় না! এই নর্তকী তো পূজা পাঠের ঘোরবিরোধী। ওর আত্মা কি পবিত্র? এটা কি ওর আত্মিক প্রশান্তি যে বলীদানের কথা শুনেও নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে?

ঘুমন্ত সামুরাতিকে দেখতে দেখতে পণ্ডিতের ভাবান্তর ঘটলো। ঘুমন্ত নর্তকীর চেহারায় সে কোন পাপ দেখছে না। ইত্যবসরে সামুরাতির ঘুম ভেঙ্গে গেলে পণ্ডিতের মনে হলো এ যেনো সদ্যভূমিষ্ঠ নিষ্পাপ কোনো শিশু, যে নিশ্চিন্তে মায়ের কোলে শুয়ে আছে। পণ্ডিত অনুভব করলো, নর্তকী আর তার মধ্যে যেনো একই রক্ত প্রবাহিত। পণ্ডিত সামুরাতির দিকে তাকিয়ে অতীতে হারিয়ে যায়। তার মনে পড়ে শৈশবের কথা। যখন এই তরুণীর মতোই সে বেঘোরে ঘুমাতো। ছোটবেলার দেখা সেই মায়ের চেহারা তার চোখে ভেসে ওঠে। অতীতের ভাবনা কাটিয়ে বাস্তবতা অনুভব করার জোর চেষ্টা করলো পণ্ডিত কিন্তু ভাবালুতা তাকে আরো বেশি আবিষ্ট করে ফেললো। তার মনে হতে লাগলো, তার মায়ের চেহারা যেন অবিকল সামুরাতির চেহারার মতোই ছিলো অমলিন নিষ্কলুষ।

কন্যা-জায়া-জননী– পণ্ডিতের হৃদয়ে এ তিন মমতার কাঁটা বিদ্ধ হতে শুরু করলো। হঠাৎ তার মধ্যে দেখা দিলো বিশাল শূন্যতা। নিজেকে বিরান ভূমিতে ভগ্নস্তূপের মতো মনে হতে লাগলো। জীবনের দীর্ঘ সময় কন্যা-জায়া-জননীর শূন্যতা পূরণের জন্য সে দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করে পূরণ করতে চেয়েছে, কিন্তু আজ এই নর্তকী তার মধ্যে সেই শূন্যতাকেই প্রকট করে তুলেছে। মনে হচ্ছে তার এতোদিনের সাধনা নর্তকী গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দিয়েছে। সে একটা পরিত্যক্ত উজার শ্মশান। নর্তকীর মধ্যে নারীর সকল রূপ-সৌন্দর্য, স্নেহ-মমতা জীবন্ত হয়ে উঠলে পণ্ডিতের হৃদয়ে শুরু হলো এক ধরনের হাহাকার। সামুরাতিকে স্পর্শ করার জন্য অধীর হয়ে উঠলো।

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ যখন সামুরাতির আরো কাছে আসে তখন সামুরাতি চোখ খুলে। সে পণ্ডিতকে দেখে আড়মোড়া দেয় এবং হাই তুলে। পণ্ডিত জীবনে কখনো কোন নারীকে এতো কাছে থেকে ঘুম থেকে ওঠে হাই তুলতে দেখেনি। সামুরাতির হাইতোলা দেখে পণ্ডিতের মধ্যে এক ধরনের ঝড় সৃষ্টি হয়। এমন এক ভাবের সৃষ্টি হয় যা কখনো সে অনুভব করেনি। এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি অনুভব করতে লাগলো। দেখা দিলো আত্ম-বিমোহিতা।

"ওহ! কত বেলা হয়ে গেছে। গত রাতে আপনি আমাকে একাকী ফেলে কোথায় চলে গিয়েছিলেন?" সামুরাতি বললো।

"তুমি একাকী ভয় পাও?"

"ভয়? হেসে লুটিয়ে পড়লো সামুরাতি। ভয় তো একটা অনুভূতি। আমার অনুভূতি মরে গেছে। নারী পরপুরুষে ভয় পায় কিন্তু পরপুরুষের হাতের খেলার পুতুল নারীর কোনো ভয় থাকে না। যে পথিক একবার লুটেরা দ্বারা লুণ্ঠিত হয়, বাকি পথ সে নির্ভয়েই অতিক্রম করে। আমার এখন আর কোনো দস্যুর ভয় নেই।"

"তুমি যেভাবে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলে তা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব যাদের আত্মা পবিত্র। কিন্তু একটা নর্তকী কিভাবে এতো প্রশান্তচিত্ত হতে পারে!"

"আমার শরীরে এখন শুধু রূহটাই আছে, যাকে আপনি আত্মা বলছেন। আমার শরীরটা পর হয়ে গেছে কিন্তু আত্মা আমার নিজের, এটা প্রকৃতপক্ষে শান্তই আছে।"

"কি! কিভাবে তা সম্ভব?"

"ধর্মীয় উন্মাদনায় অন্ধ ব্যক্তিরা আত্মার এই প্রশান্তির কথা বুঝতে পারে না। তারা একটাই শোর তোলে, প্রার্থনা করো আত্মার প্রশান্তি পাবে। জাগতিক

বোঝা হৃদয়ে না থাকলে আত্মা প্রশান্ত থাকে। মানসিকতার মধ্যে যদি সুচিন্তা কাজ করে তাহলে আত্মা শান্তি পায়...। এসব কথার কথা পণ্ডিত মশাই। আমি মানুষের পাপের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিয়েছি, যার দ্বারা আমি আত্মার প্রশান্তি পাচ্ছি।"

কথাগুলোতে হয়তো সামুরাতির জাদুকরী কৌশল ছিলো নয়তো তা ছিলো আত্মশক্তির প্রভাব। সামুরাতির বলার ভঙ্গিতে এতোটাই আত্মবিশ্বাস ছিলো যে, তার কথা শুনে পণ্ডিতের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যায়। পণ্ডিতের মন-মানসিকতায় প্রভাব বিস্তার করে সামুরাতি। পণ্ডিতের দেমাগে এতোদিন পুষে রাখা পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা আর স্বর্গ-নরকের দর্শন এলোমেলো হয়ে গেলো।

খোলা কাঁধ। বিক্ষিপ্ত কেশরাজি। পণ্ডিত সাধনার এ দীর্ঘ জীবনে এই প্রথম অনুভব করলো নারীকে যন্ত্রণা বলা সহজ কিন্তু নারীর ফাঁদ থেকে নিজেকে রক্ষা করা ততোটা সহজ নয়। সামুরাতিকে এ অবস্থায় দেখে পণ্ডিতের হৃদয়রাজ্যে তোলপাড় শুরু হলো। মনের মধ্যে শুরু হলো যুদ্ধ।

"আরে আপনি একেবারে চুপ হয়ে আছেন যে?" স্মিত হেসে বললো সামুরাতি। "আপনি মহারাজা আনন্দ পালের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে এনে একাকী ফেলে চলে গেছেন। আচ্ছা, রাতে আপনি কোথায় ছিলেন? আপনি না আমাকে পবিত্র করতে চান? পবিত্র করতেই আমাকে নিয়ে এসেছেন। আমাকে পবিত্র কবে করবেন?"

হঠাৎ হতচকিয়ে উঠলো পণ্ডিত। তার মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে পড়লো, "কৃষ্ণদেবীর চরণে তোমাকে বলী দেবো।"

কথাটা এমনভাবে বললো পণ্ডিত যেনো এমন সৌভাগ্য সবার কপালে জোটে না।

পণ্ডিতের কথায় সামুরাতির মধ্যে কোনো ভাবান্তর ঘটলো না। বলীদানের কথা শুনে বিস্মিতও হলো না। ঠোঁটের স্মিত হাসিও ম্লান হলো না।

কিন্তু মুখ ফসকে কথাটা বের হওয়ায় পণ্ডিত নিজেই বিস্মিত হলো, এ মুহূর্তে কথাটা বলা তার উচিত হয়নি। যাকে বলীদান করা হয়, তাকে কখনো বলীদানের কথা জানানো হয় না। বরং নেশা জাতীয় কিছু খাইয়ে ও কৌশল প্রয়োগ করে তার দেমাগে বিকৃতি সাধন করা হয়। তার চিন্তা-চেতনায় পণ্ডিতের মনোবাসনা আত্মপ্রবিষ্ট করা হয়। কিন্তু পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণকে সামুরাতির প্রভাব এতোটাই আবিষ্ট করে ফেলেছিলো যে পণ্ডিত নিজের নিয়ন্ত্রণ বিবেকের কব্জায় রাখতে ব্যর্থ হয়।

"আপনি আমার দেহকে বলী দিতে চান? কিন্তু এই শরীর তো আমার শরীর নয়। এটা যদি আমার দেহ মেনে নিই, তাহলে তা তো অনেক আগেই বলী হয়ে গেছে। দেখুন, আত্মাটা একান্তই আমার। আপনি এটিকে বলীদান করুন। অবশ্য আমার আত্মা আপনার কব্জায় যাবে না। আপনি কি কখনো কারো আত্মা কব্জা করেছেন অথবা আপনার আত্মার উপর কি অপর কারো কব্জা হয়েছিলো?"

এসব তাত্ত্বিক কথায় বোকার মতো সামুরাতির দিকে তাকিয়ে রইলো পণ্ডিত।

"আপনি সত্যিকার প্রেম-ভালোবাসার সাথে পরিচিত নন। কারণ, আমি আপনাদের সম্পর্কে মন্দিরগুলোর ভেতরে কি ঘটে তা জানি। এখানে সেইসব জিনিসকে পছন্দ করা হয় যেগুলো দৃশ্যত সুন্দর আর যেগুলোকে স্পর্শ করা যায়। এ জন্যই তো আপনারা সেই প্রভুকে বিশ্বাস করেন না, যে প্রভুকে দেখা যায় না। দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রভু আপনারা নিজের হাতে তৈরি করে নেন। আপনারা দেহকে বলী দিয়ে মনে করেন এসব মূর্তিকে খুশি করেছেন। এটাও বিশ্বাস করেন, এসব পাথরের মূর্তি আপনাদের সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে দেবে।"

"তুমি মুসলমান বলেই এ ধরনের কথা বলছো।"

"না, আমি কিছুই না। আমার কোনো ধর্ম নেই। আমি একটা তৃষ্ণার্ত আত্মা। আপনার আত্মাও তৃষ্ণার্ত। আমি পুরুষের চোখের দিকে তাকিয়ে তাদের মনের অবস্থা বলে দিতে পারি।" সামুরাতি একটি হাত এগিয়ে বললো, "আপনার হাত আমার হাতে রাখুন। দূরে বসে আছেন কেন? আমার কাছে আসুন।"

মূর্তির মতো বসে রইলো পণ্ডিত। সামুরাতি লাফিয়ে উঠে তার গা ঘেঁষে বসে। সামুরাতি দু'হাতে পণ্ডিতের চেহারা তালুবদ্ধ করে পণ্ডিতের চোখে চোখ রাখে। কেঁপে উঠলো পণ্ডিতের শরীর। সামুরাতির হাত তার চেহারা থেকে সরিয়ে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে যায়।

কি যেনো বলতে চাচ্ছিলো কিন্তু পণ্ডিতের কথা জড়িয়ে যায়। জড়ানো কণ্ঠে পণ্ডিত বললো, 'তোমার জন্য কাপড় পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি স্নান করে নাও। ইতিমধ্যে তোমার খাবারও পৌঁছে যাবে।' এ কথা বলেই পণ্ডিত দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

পণ্ডিতের মনোভাব দেখে প্রচণ্ড হাসি পেলো সামুরাতির। শোয়াইব আরমুগানীর কথা তার মনে পড়লো। সে আরমুগানীকে বলেছিলো, তার উপস্থিতিতে আনন্দ পালকে কাঞ্জরের রাজা বলেছিলো, আমরা সুন্দরী মুসলিম

তরুণীদেরকে ধরে এনে বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত করি এবং তাদেরকে নৃত্যসংগীত ও বেহায়াপনায় উৎসাহিত করি। মুসলমানদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও তাদের বংশধারা বিনষ্টকরণে এর বিকল্প নেই। এ তৎপরতা অব্যাহত রাখলে এমন এক সময় আসবে যখন যেসব মুসলমান হিন্দু প্রধান এলাকায় বসবাস করবে, সম্ভ্রম বিক্রি ও নাচ-গান ছাড়া এদের জীবন-জীবিকার উপায় থাকবে না।

সামুরাতির মনে পড়লো, আরমুগানী তাকে বলেছিলো, মুসলমান তরুণীদের চরিত্রহীনতার শিকার সে নিজে। সে আরো বলেছিলো, গজনী থেকে এতো দূরে এসে মুসলমান যোদ্ধারা তোমাদের মতো মুসলিম তরুণীদের সম্ভ্রম বিক্রির কারণে শাহাদতবরণ করছে, জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে। অথচ তারা তোমাদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করছে। আরমুগানী তাকে আরো বলেছিলো, সামুরাতি কাউকে বিয়ে করে বধূ হয়ে যাও, নিজের আত্মাকে শান্তি দাও, নিজের আত্মপরিচয় উপলব্ধি করো।

আরমুগানীর কথায় সামুরাতি আত্ম-পরিচয় ফিরে পেয়েছিলো। সামুরাতির হৃদয়পটে যখন আরমুগানীর চেহারা ভেসে উঠলো, তখন তার ভেতর একটা ঝড় বয়ে গেলো। আরমুগানীর প্রতিটি কথা তার কানে ধ্বনিত হতে লাগলো। তার যখন মনে পড়লো, আরমুগানী হয়তো যারকার সাক্ষাৎ পেয়েছে এবং তার সাথে বসবাস করছে। সে বুকের ভেতর একটা কষ্ট অনুভব করলো। আরমুগানীই ছিলো সামুরাতির জীবনের প্রথম পুরুষ যে তার আশ্রয় ও এক প্রকার বন্দীত্বে থেকেও তার মনকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিলো।

সামুরাতির মধ্যে একটা দৃঢ় সংকল্প জন্ম নিলো, কিছুতেই হিন্দুদের মূর্তির জন্য সে নিজেকে বলী হতে দেবে না। সে বন্দীদশা থেকে পালানোর কথা ভাবতে লাগলো। এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি সে কখনো হয়নি। সে কোনো সৈনিক ছিলো না, ছিলো না কোনো নারীযোদ্ধা। এক অর্থে সামুরাতি ছিলো শাহজাদী। কারণ, রাজ-রাজন্যবর্গের হৃদয়রাজ্যে বিরাজ করতো সামুরাতি। বড় বড় রাজনৈতিক নেতা, ক্ষমতাবান পুরুষও তার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার আবেদন করতো। ফলে ফেরার হওয়ার বিষয়টি তার জন্য ছিলো একটা সুকঠিন কাজ। তাছাড়া এই দুর্গসম মন্দির থেকে পালানোর বিষয়টি সহজ ছিলো না। কিন্তু এরপরও মনে মনে সে পালিয়ে যাওয়ার দৃঢ়সংকল্প করলো।

বিছানা ছেড়ে উঠতে যাবে এমন সময় সামুরাতির কক্ষে প্রবেশ করলো দুই তরুণী। এদের একজনের হাতে কাপড় আর অপরজনের হাতে খাবার। তরুণী দু'জন যুবতী বটে কিন্তু সুন্দরী নয়। খাবার অবসরে সামুরাতি তরুণীদ্বয়কে

জিজ্ঞেস করলো, আমরা মন্দিরের সদর দরজা থেকে কতটুকু দূরে? তরুণীদ্বয় তার কথার জবাব না দিয়ে বললো, আমাদের কঠোরভাবে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে, আপনার সাথে যেনো কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা না বলি। সামুরাতির কথার জবাব এড়িয়ে তরুণীদ্বয় তার পরিচয় জানতে চাইলো। আপনার পরিচয় কি?

"আমি নগরকোটের নর্তকী। বড় পণ্ডিতজী মশাই এ মন্দিরে নাচ-গান করার জন্য আমাকে এনেছেন।"

"মহারাজ আপনার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।" বললো এক তরুণী।

"কোন নারীর প্রতি এতোটা আগ্রহী হতে মহারাজকে আমরা কখনো দেখিনি।" বললো অপর তরুণী। "তিনি তো এর আগে কোন নারীর সাথে কথাই বলতেন না। কিন্তু আপনার ব্যাপারে তিনি এভাবে কথা বলছেন, মনে হয়েছে আপনি তার মেয়ে কিংবা বোন।"

"এটা মহারাজার অনুগ্রহ।" বললো সামুরাতি। "তিনি আমাকে সারা মন্দির দেখাবেন। এমনিতেই তোমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, মন্দিরের সদর গেট এখান থেকে কোন্ দিকে?"

"আপনি তো সদর দরজা দিয়েই মন্দিরে এসেছিলেন।"

তরুণীরা সামুরাতিকে সদর দরজার কথা বললেও সে কিছুই আন্দাজ করতে পারলো না। তবে এটা বুঝতে পারলো, কোনো জানাশোনা লোকের পথ দেখানো ছাড়া তার পক্ষে সদর গেট পর্যন্ত পৌছা সম্ভব নয়। সে তরুণীদের কাছে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলো। তরুণীদ্বয় কিছু কিছুর জবাব দিলো, কোনো কোনো কথার জবাব এড়িয়ে গেলো। পণ্ডিত সম্পর্কে তরুণীরা তাকে জানায়, নারীর নাম নিতেও সে অপছন্দ করে।

এই তরুণীরা জানতো না এই নর্তকীকে বলীদানের জন্য আনা হয়েছে। তারা সামুরাতিকে গোসল করালো এবং তাদের নিয়ে আসা কাপড় পরিয়ে দিলো। কাপড়টি ছিলো শাড়ি। তরুণীদ্বয় সামুরাতির মাথায় তিলক পরিয়ে দিয়ে চলে যায়।

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের একান্ত কক্ষে আরো দু'পণ্ডিত উপবিষ্ট। তারা জানতো, সামুরাতিকে বলীদানের জন্য আনা হয়েছে। সামুরাতিকে বলীদানের জন্য প্রস্তুত করা ছিলো তাদের কাজ। তারা প্রস্তুতি নিচ্ছিলো তাদের কাজ শুরু করার। বলে

রাখা ভালো, নগরকোট অঞ্চলে তখন চলছিলো ভয়ানক অভাব-অনটন। কারণ, দীর্ঘদিন থেকে এ অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছিলো না। অথচ পাহাড়ী এলাকা হওয়ার কারণে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো। অনাবৃষ্টির কারণে খাদ্যাভাবে মানুষ ও গৃহপালিত পশু মরতে শুরু করে। অতঃপর পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের নির্দেশে এক কিশোরীকে বলীদান করা হয়। সেই তরুণীকেও এ কক্ষে রেখে বলীদানের জন্য দু'পণ্ডিতকে প্রস্তুত রাখা হয়েছিলো।

আগের মেয়েটি ছিলো অল্পবয়সী বালিকা। কিন্তু এ বালিকা নয়, যুবতী। সে রাজার একান্ত নর্তকী ছিলো। আগের তরুণী ছিলো পবিত্র। কিন্তু সামুরাতিকে আগে পবিত্র করতে হবে– সহকর্মী দু'পণ্ডিতকে রাধাকৃষ্ণ বলেছিলো। একেই বলী দেয়া হবে কিন্তু তৈরি করতে বেশ সময় লাগবে। এ হচ্ছে মুসলমান। একে পূজা-অর্চনার জন্য আগে মানসিকভাবে তৈরি করতে হবে। এরপর বলী দেয়ার ব্যাপারে ভাবতে হবে।

"আপনি জানেন মহারাজ! রাজা আনন্দ পালের নেতৃত্বে আমাদের সম্মিলিত সেনাবাহিনী অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে। বলীদান তো যুদ্ধ শুরুর আগেই করা উচিত।" বললো এক পণ্ডিত।

"রণাঙ্গনে পৌঁছতে সেনাবাহিনীর অনেক দিন লাগবে।" বললো বড় পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ। "যে পরিমাণ সেনাবাহিনী অভিযানে গেছে, তারা মাহমূদ গজনবীর সেনাদের কচুকাটা করে গজনী পর্যন্ত চলে যাবে। আর যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত পৌঁছতে সেনাদের দু'তিন মাস সময় লেগে যাবে। এর মধ্যে আমাদের বলীদান কর্মও সমাধা হয়ে যাবে। আমরা এ সময়ের মধ্যে এ নর্তকীকে বলীদানের জন্য প্রস্তুত করে ফেলবো। আশা করি নিজের পক্ষ থেকেই নর্তকী দেবীর চরণে তাকে বলীদানের জন্য অনুরোধ করতে থাকবে।"

রাধাকৃষ্ণের সহকর্মী দুই পণ্ডিত বলীদানে বিলম্বের ব্যাপারে সম্মত হচ্ছিলো না, কিন্তু প্রধান পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ মনে মনে বলীদান মূলতবী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। সহযোগী দু'পণ্ডিতের বারংবার অসম্মতিতে বড় পণ্ডিতের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হলো। সে নির্দেশের স্বরে বললো, যে যাই বলুক, এই নর্তকী বলীদানে সে কারো কথাই শুনবে না। কারণ, নর্তকী বলীদানের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তার একার। ওকে নির্বাচনও করেছে পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ নিজে। দেব-দেবীর ইঙ্গিতে যেহেতু সে এই নর্তকীকে বলীদানের জন্য বাছাই করেছে, তাই সে-ই ভালো জানে কখন কিভাবে ওকে বলীদান করতে হবে।

সহযোগী দুই পণ্ডিত যখন ওঠে চলে গেলো, তখন চিন্তার গভীরে তলিয়ে গেলো রাধাকৃষ্ণ।

* * *

এদিকে সামুরাতির বিস্ময়ের অবধি রইলো না। টানা তিন দিন তিন রাত চলে গেলো কিন্তু একবারও বড় পণ্ডিত তার কক্ষে এলো না। সেই দুই তরুণী তার জন্য খাবার নিয়ে আসে আর তার সব প্রয়োজন পূরণ করে। সামুরাতি তাদের অনেকবার বলেছে, তারা যেনো পণ্ডিতজী মহারাজকে একবারের জন্য হলেও তার কাছে পাঠায়। কিন্তু এরপরও পণ্ডিত আসেনি। নিজের প্রাণ সংহারের জন্য সামুরাতির কোনো দুঃখ ছিলো না, কিন্তু তার মনটা ভারী হয়ে উঠলো এ জন্য যে হিন্দুরা তাকে নর্তকীতে পরিণত করেছে, তার ধর্মীয় চেতনা বিনষ্ট করে দিয়েছে, তার সম্ভ্রম লুটেছে, শেষ পর্যন্ত হিন্দুদের বিজয়ের জন্য দেবীর পদতলে তার প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে।

সামুরাতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো, মাটি-পাথরের তৈরি মূর্তিগুলোর কোনো ক্ষমতা নেই, ওরা কিছুতেই মাবুদ হতে পারে না। জয়-পরাজয়ে মূর্তিগুলোর কোনো প্রভাব নেই। যিনি সত্য ও প্রকৃত মাবুদ, তার বিধান মতে নরবলী দান ও নিরপরাধ মানুষ হত্যা সম্পূর্ণ অন্যায়, গুনাহের কাজ। নরবলী নিতান্তই মিথ্যা ধর্মের অপরীতি।

সামুরাতির মনে পড়লো, কয়েক বছর আগে রাজা জয়পালের বিজয়ের জন্য লাহোরে এক তরুণীকে বলী দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু সেই যুদ্ধে রাজা এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলো যে, রাজধানীতে ফিরে এসে সে জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেয়।

মৃত্যুকে সামুরাতি ভয় করছিলো না কিন্তু পৌত্তলিকদের মূর্তির জন্য মোটেও মরতে চাচ্ছিলো না। আরমুগামী সামুরাতির আত্ম-পরিচয়কে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু মন্দিরের বন্দী দশা থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো পথ তার দৃষ্টিতে পড়ছিলো না। সামুরাতি বিচলিত হচ্ছিলো এই ভেবে যে, যে কোনো সময় তাকে নিয়ে মূর্তির পদমূলে বলীদান করবে। সামুরাতি বহুবার শুনেছে মন্দিরের পণ্ডিতদের কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে না। কিন্তু তার দেখাশোনাকারী দুই তরুণী বলেছে, পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের মধ্যে কোনো চারিত্রিক ক্রটি নেই, সে প্রকৃত অর্থেই একজন সাধক পুরুষ, ঋষি। অনেকের মুখে সে আগেও শুনেছে, পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ শুধু ঋষিই নয়, সে একজন ব্রাহ্মচারী।

সামুরাতির মনে পড়লো প্রথম যে রাতে তাকে এখানে নিয়ে এসেছিলো, তখন তার কাছে মনে হয়েছিলো পণ্ডিত নিজে ভোগ করার জন্য তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। সে যখন এ ধরনের ইঙ্গিত করে তখন পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ তাকে বলেছিলো, "তোমার দেহ সৌন্দর্য আমার ভালো গেলেছে বটে কিন্তু যা ভেবেছো তা ভুল। আমার জীবন নারীভোগ থেকে পবিত্র। নারীসঙ্গ নেয়া দূরে থাক, নারীকে কাছে থেকে দেখাও আমি পছন্দ করি না।"

সামুরাতির মনে পড়লো, পণ্ডিত যখন তার সাথে কথা বলছিলো, তখন পণ্ডিতের চেহারার মধ্যে একটা উদাস ভাব সে দেখতে পেয়েছে। পুরুষের মনের কথা ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পারে সামুরাতি। তাছাড়া নিজের রূপ-সৌন্দর্য ও ভাবভঙ্গীর জাদুময়তা সম্পর্কেও পূর্ণ সচেতন। সামুরাতির মনের মধ্যে নতুন একটা চিন্তা উঁকি দিলো। সেই সাথে পালানোর একটা পথও বের করার কথা ভাবতে লাগলো। সে মনে মনে তার প্রকট নারীত্বের জাদুময়তাকে মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার ফন্দি আঁটলো। এটাই ছিলো সামুরাতির একমাত্র পুঁজি, যা দিয়ে কঠিন লোহাকেও সে মোমের মতো গলিয়ে দিতে সক্ষম।

নগরকোট মন্দিরে আসার চতুর্থ রাতের প্রথম প্রহর। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ সামুরাতির কক্ষে এলো। সামুরাতির কক্ষে দু'টি প্রদীপ জ্বলছে আর সামুরাতি সারা কক্ষ জুড়ে পায়চারি করছে। পণ্ডিত তাকে দেখে স্থবির হয়ে যায়। সে সামুরাতিকে নৃত্যের পোশাকে প্রথম দেখেছিলো, সেই পোশাক ছিলো কৃত্রিম। তখন তার কাঁধ, গলা, বুক ও পিঠের ঊর্ধ্বাংশ ছিলো উন্মুক্ত। তার চেহারায় ছিলো কৃত্রিম প্রলেপ আর চুল ছিলো নাচিয়ের ঢংয়ে সাজানো, চোখে ছিলো কাজলমাখা। সেই পোশাকে ছিলো উগ্রতা কিন্তু এখনকার পোশাক সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন সামুরাতি একান্তই অকৃত্রিম। সাজ-পোশাক ও চেহারায় কোনো কৃত্রিমতা নেই। অকৃত্রিম প্রাকৃতিক অবয়বে সামুরাতিকে এখন দেখতে পেলো পণ্ডিত। তার চেহারা ও কনুই উন্মুক্ত। এলোমেলো তার চুল আর চোখে নেই বাড়তি কাজল। অবিকল অকৃত্রিম অবয়বে সামুরাতিকে আরো বেশি মোহনীয় মনে হলো। পণ্ডিতের দৃষ্টিতে মনে হলো সামুরাতি মর্ত্যের নারী নয়, স্বর্গের অপ্সরা।

"আপনি কি আমাকে ভুলে গিয়েছিলেন মহারাজ?" পণ্ডিতের কাছ ঘেঁষে বললো সামুরাতি। "লোকে বলে জীবজন্তুকে জবাই করার আগে পানি পান করাতে হয়, আপনি কি আমাকে পান করাবেন না? আমার আত্মার তৃষ্ণা মিটাবেন না? আমাকে জবাই করার আগে যদি আমার মনের তৃষ্ণা না মিটান,

তাহলে এই মন্দিরে আমার আত্মা ঘুরে বেড়াবে। আমার আত্মা সর্বক্ষণ আপনাকে অস্থির করে রাখবে।"

পণ্ডিতের চোখে চোখ রেখে কথা বলছিলো সামুরাতি। তার চোখে-মুখে-চেহারায় ছিলো সেই জাদুকরী ভাষা যা সে কারো মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করতো। পণ্ডিত অনুভব করলো, তার শরীরে একটা কামোদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। সামুরাতিকে নৃত্যের পোশাকে দেখে পণ্ডিতের মনে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হতো কিন্তু অকৃত্রিম পোশাকে মাথায় তিলক পরিহিতা সামুরাতির অঙ্গভঙ্গিতে নর্তকীর নির্লজ্জতা নেই। মেয়েটিকে এখন শান্ত সৌম্য কান্তিময় পূতঃপবিত্রা মনে হচ্ছিলো পণ্ডিতের কাছে। পণ্ডিত সামুরাতির কথায় উদাস মোহাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

সামুরাতি পণ্ডিতের হাত ধরে তাকে বিছানায় বসতে অনুরোধ করে। কিন্তু পণ্ডিত বসলো না। সে কক্ষে পায়চারি করতে লাগলো। সামুরাতি নীরব দাঁড়িয়ে রইলো। পণ্ডিত দাঁড়িয়ে তাকে দেখলো এবং মাথা নীচু করে ফেললো, যেনো সামুরাতির মুখোমুখি হতে অপ্রস্তুত। কয়েক কদম পায়চারি করে দাঁড়িয়ে সামুরাতিকে কাছে ডাকে পণ্ডিত।

"আমি জানি, তুমি প্রেমের কাঙালিনী।" বললো পণ্ডিত। "আসলে তুমি স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা বঞ্চিতা। তোমার ভালোবাসা প্রয়োজন। স্নেহ-মমতা ও প্রেম দরকার। বাবার আদর... ভাইয়ের স্নেহ... সন্তানের মমতা... অথবা তোমার চাই...?"

"হ্যাঁ, আপনি কি জানেন না, তৃষিত হৃদয় কোন্ ভালোবাসা চায়? আপনার কাছে কোন্ ভালোবাসা আছে?"

পণ্ডিতের চেহারার ভাব বদলে যেতে থাকে। তার চোখে আন্তরিকতা ভেসে ওঠে। সামুরাতি পণ্ডিতের কাঁধে তার বাজু রেখে নিজেকে পণ্ডিতের শরীরের সাথে এতোটাই মিশিয়ে দিলো যে সামুরাতির বুক পণ্ডিতের বুক স্পর্শ করে। সামুরাতির শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠানামা স্পষ্টই অনুভব করতে লাগলো পণ্ডিত। সামুরাতি পণ্ডিতকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে কানে কানে বললো, 'আপনার কাছে আছে কি সেই ভালোবাসা, যে ভালোবাসার সাথে দেহের কোনো সম্পর্ক নেই, যে প্রেমে নেই কোনো পাপের গন্ধ?'

সামুরাতির তপ্ত নিঃশ্বাস পন্ডিতের নিঃশ্বাসের সাথে মিশে তাকে মোহাচ্ছন্ন করে তুলে।

"ঘাবড়ে যাবেন না সাধু! আপনি যে নারী থেকে পালিয়ে থাকেন, সেই নারী হয় শরীর সর্বস্ব, সে তো একটা জীবন্ত মূর্তি মাত্র। আমি কোনো মানব মূর্তি নই। দেহকে আমি ত্যাগ করেছি, আপনাকে হৃদয়ের ভালোবাসা দিচ্ছি আমি, আপনাকে আমার আত্মার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। এ আত্মা থেকে আপনার পালানোর দরকার নেই, এটাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।" বললো সামুরাতি।

অবচেতন হয়ে যাচ্ছিলো পণ্ডিত। সামুরাতি দু'হাতে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে নিলো পণ্ডিতকে। পণ্ডিত সামুরাতির জাদুকরী দৃষ্টির অদৃশ্য শিকলে বাঁধা পড়ে যায়।

"আমি জানি, আপনার আত্মাও তৃষ্ণার্ত। নারীর প্রেম-ভালোবাসার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আপনার ধারণা নেই। নারী অপবিত্রা হতে পারে কিন্তু তার ভালোবাসা অপবিত্র নয়।"

হঠাৎ করে পণ্ডিত সামুরাতির কাঁধে হাত রেখে সামুরাতিকে বুকের বেষ্টনী থেকে দূরে ঠেলে চোখে চোখ রেখে বললো- "আমি জানি না ভালোবাসা কেমন। আমি জানি না কোন্ প্রেম-ভালোবাসার কথা তুমি বলছো। আমার কোনো মেয়ে নেই, বোন নেই। মাকে দেখেছি ছোটবেলা। বিয়েও করিনি আমি। তুমিই আমাকে ভালোবাসা বোঝাও।"

"আপনার হৃদয়ে কি কোনো ধরনের তৃষ্ণা অভাববোধ অনুভব হচ্ছে না?" বললো সামুরাতি।

"আমার ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে যুবতী।" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো পণ্ডিত। "তুমি আমাকে আর জ্বালিও না।"

সামুরাতি গভীরভাবে পণ্ডিতের কথায় পরিবর্তন লক্ষ্য করলো, আগে পণ্ডিত কথায় কথায় 'আমাদের' শব্দ ব্যবহার করতো কিন্তু আজ 'আমার' শব্দ ব্যবহার করছে।

"আমাকে জবাই করার আগে ভালোবাসার স্বাদটুকু আপনি আস্বাদন করে নিন, নয়তো আমার দেহ জবাই হয়ে যাবে বটে কিন্তু আপনার আত্মার অপমৃত্যু ঘটবে।"

পণ্ডিতের মাথা গুলিয়ে গিয়েছিলো, সে মনের মধ্যে কোনোকিছুই গোছাতে পারছিলো না। কখনো সামুরাতির দিকে তাকাতো আবার কখনো মাথা নীচু করে কক্ষে পায়চারি করছিলো।

"কবে আমাকে বলী দেবেন পণ্ডিতজী মহারাজ!" চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো পণ্ডিত। এভাবে কথাটি বললো যেনো তার মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়েছে, "না না, এখনই নয়– তোমাকে এখনই বলী দেয়া হবে না।"

'আজ না হয় হবে না, কিন্তু কাল তো দেয়া হবে?' পণ্ডিত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিড় বিড় করে বললো– "কাল আসতে বহু সময় বাকী। কে জানে কাল কি হবে!"

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো পণ্ডিত এবং দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলো। পণ্ডিতের কক্ষ ত্যাগের ভঙ্গি দেখে সামুরাতির হাসি পায়। সে পণ্ডিতের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। সামুরাতির কক্ষ থেকে বেরিয়ে নিজের কক্ষে গিয়ে দরজা বন্ধ করে সরস্বতী মূর্তির সামনে হাতজোড় করে প্রণাম জানায়। সরস্বতী মূর্তি হাসছিলো। সরস্বতী মূর্তির আদলটা হাস্যোজ্জ্বল। পণ্ডিত জীবনে এই প্রথম সরস্বতী মূর্তির হাস্যোজ্জ্বল চেহারার দিকে গভীরভাবে তাকালো। তার মনে এক অস্থিরতা তোলপাড় করছে, যা সে বুঝে উঠতে পারছে না। জীবনের যতো দুঃখ-কষ্ট সবই ভজন-গুঞ্জনের ভাষায় পণ্ডিত এ সরস্বতী মূর্তির কাছে পেশ করতো। কিন্তু আজ তার কি যে হলো তা কিছুতেই ব্যক্ত করতে পারছে না।

হাস্যোজ্জ্বল সরস্বতী মূর্তির সামনে হাতজোড় করে ভজন গাইতে গাইতে মূর্তির অম্লান হাসির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললো পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ। সরস্বতী মূর্তির সামনে প্রার্থনা করে তার মনের জ্বালা দূর করার জন্য বসেছিলো পণ্ডিত কিন্তু আজ দীর্ঘক্ষণ ভজন-বন্দনা করেও মনের মধ্যে স্বস্তি পাচ্ছিলো না। মূর্তির হাস্যোজ্জ্বল চেহারা তার কাছে অপূর্ব মনে হচ্ছিলো। মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে সরস্বতির মূর্তিটাই সামুরাতির অবয়ব ধারণ করলো। মূর্তির হাসিতে বিকশিত হলো সামুরাতির অকৃত্রিম অবয়ব। মনের অজান্তেই তার কণ্ঠে গীত হতে লাগলো ভজন সংগীত।

* * *

১০০৮ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ৩৯৯ হিজরী সনের সেপ্টেম্বর মাস। প্লাবনের মতো হাজার হাজার হিন্দু সৈন্য পেশোয়ারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের গতি তীব্র করা সম্ভব হচ্ছিলো না। কারণ, এ বাহিনীতে ছিলো কয়েকটি হিন্দু রাজ্যের সৈন্য। কঞ্জরের সেনাবাহিনী খিদরো এলাকায় শিবির স্থাপন করে। লাহোর থেকে যে বাহিনী যাত্রা শুরু করে, তন্মধ্যে রাজা আনন্দ পালের বাহিনী ছাড়াও উজান, গোয়ালিয়র, কনৌজের সৈন্যও ছিলো। এরই মধ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে আরো নতুন সেনাদল এদের সাথে এসে শামিল হচ্ছিলো। নতুন বাহিনীকে স্বাগত

জানানোর জন্য সম্মিলিত বাহিনী যাত্রাবিরতি করতো। সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ডে ছিলো রাজা আনন্দ পালের ছেলে ব্রাহ্মপালের উপর ন্যস্ত। সে সৈন্যদের জড়ো করে তারপর একসাথে অগ্রসর হতে চাচ্ছিলো।

সম্মিলিত বাহিনীর গতি মন্থর হওয়ার অপর কারণ ছিলো নদী। সৈন্যরা নদী পার হয়ে গেলেও তাদের রসদ সামগ্রীর গাড়ি পার করা ছিলো কঠিন। সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা প্রায় লাখের কোঠায় পৌছে। অপরদিকে সুলতান মাহমূদের কাছে তখন সৈন্য ছিলো মাত্র হাজারের কোঠায়। বিশাল হিন্দু বাহিনীর নদী পার হতে কয়েক দিন লেগে যায়। বড় নদী ছাড়া আরো ছোট ছোট নদীও তাদের গতিপথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সম্মিলিত বাহিনীর গতি মন্থরতার অপর কারণ ছিলো জনগণের অতি উৎসাহ। মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোটা ভারতের মন্দিরগুলো থেকে এমন জোরদার প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, গজনী বাহিনী গোটা হিন্দুস্তান দখল করতে ধেয়ে আসছে, ওরা সব হিন্দু মন্দির গুড়িয়ে দিয়ে মসজিদ বানাবে, সকল হিন্দু তরুণীকে ধরে বাদী-দাসীতে পরিণত করবে, সকল হিন্দুকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবে। মন্দিরের এই অপপ্রচারে হিন্দুস্তান জুড়ে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন সেনাবাহিনীকে আশীর্বাদ জানানোর জন্য, তাদের আদর-আপ্যায়ন করার জন্য জড়ো হতে থাকে। এতে সেনাদের গতিতে মাঝে-মধ্যে ছেদ পড়ছে। সাধারণ হিন্দুরা তাদের সঞ্চিত সোনাদানা, খাবার-দাবার, উট-ঘোড়া সেনাদের উপঢৌকন দেয়ার জন্য খবর শুনে আগেভাগেই পথিমধ্যে জমা করে রাখতো। যেসব হিন্দু যুবক তীর-তরবারী ও বর্শা চালাতে পারতো, অশ্বারোহণে দক্ষতা রাখতো; তারা নিজেদের ঢাল-তরবারী ও অশ্ব নিয়ে সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত হতো। মন্দিরের ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতরা ধর্মের দোহাই দিয়ে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করছিলো।

সম্মিলিত হিন্দু বাহিনী মহা-প্লাবনের মতো অগ্রসর হচ্ছিলো। প্রতিদিনই হিন্দু বাহিনীতে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো সৈন্য সংখ্যা। সকল হিন্দু নাগরিক ও সৈন্যের মধ্যে একই শ্লোগান, একই আওয়াজ– মুসলমানদের পিষে ফেলো, ওদেরকে ভারত সাগরের ওপারে পাঠিয়ে দাও। ইসলামকে চিরদিনের জন্য হিন্দুস্তানের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দাও।

পেশোয়ারে অবস্থানরত সুলতান মাহমূদের কাছে প্রতিদিন খবর আসছিলো, হিন্দু বাহিনী কতটুকু অগ্রসর হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ওদের বাহিনীর সংখ্যা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি তার সেনাপতিদের বলে দিয়েছিলেন, শত্রুবাহিনী

কিছুতেই যাতে নদী পার হতে না পারে। যুদ্ধ নদী তীরেই সংঘটিত হবে। তার সেনাপতিরা এই আশংকা প্রকাশ করেছিলো, যেহেতু শত্রুবাহিনী সংখ্যায় বিপুল, তাই পেছনে নদী রেখে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়া আত্মঘাতী হতে পারে। কারণ, প্রয়োজনে পশ্চাদপসারণের সুযোগ তখন বিপদ শংকুল হয়ে উঠবে।

সুলতান মাহমূদ তাদের বললেন, আমাদের গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে। সম্মুখ মোকাবেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর গেরিলা যুদ্ধের জন্য নদী তীরবর্তী এলাকাই সবচেয়ে উপযুক্ত। তিনি সেনাপতিদের বলেন, পেশোয়ারের নদী তীরবর্তী এলাকা অসমতল। এখানটা গেরিলা যুদ্ধের উপযোগী নয়। শত্রুবাহিনী এপাড়ে এসে গেলে সংখ্যাধিক্যের জোরে দু'চার ইউনিট সৈন্য হারিয়েও আমাদের ঘেরাও করতে সমর্থ হবে। আর ওপারে যদি ওরা আমাদের পিছু হটতে বাধ্যও করে, তবুও রিজার্ভ বাহিনী দিয়ে আমরা ওদের নদী পারাপার ঠেকিয়ে দিতে পারবো।

নিজ সেনাদের চেতনা, তাদের আবেগ, আদর্শিক দৃঢ়তা, নিজের রণ-পরিকল্পনা সর্বোপরি আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা ছিলো সুলতানের। তিনি অনেক আগেই মাঝি-মাল্লা ও মুটে-মজুরদের বেশে সিন্ধু তীরে কিছু সৈনিক মোতায়েন করে রেখেছিলেন। অপরদিকে কিছু ঝটিকা বাহিনীর সদস্য খিদরোতে মোতায়েন করেছিলেন। তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, শত্রুবাহিনীর আনাগোনা, গমনাগমন পর্যবেক্ষণ করবে এবং এরা যদি নদী পার হতে চায় তবে নদী পারাপারের জন্য তৈরি নৌকা-পুলের রশি কেটে দেবে। সম্ভব হলে নৌকা ছিদ্র করে দেবে।

গভীর চিন্তা-ভাবনার পর সুলতান তার বাহিনীকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন এবং সিন্ধুকূলে এসে পৌঁছলেন। তিনি সেনাবাহিনীকে চার অংশে ভাগ করলেন। দুই অংশকে নদীর অপর পাড় আটকের উত্তর পাশে নিযুক্ত করলেন। আর দুই অংশকে নদীর এপাড়ে পেশোয়ার তীরে রাখলেন। এ পাড়ের দুই ভাগের একভাগ ছিলো অশ্বারোহী ও তীরন্দাজ। তাদেরকে নদী রক্ষার নির্দেশ দেয়া হলো। তাদের দায়িত্ব হলো নদীর তীরবর্তী এলাকাকে শত্রুমুক্ত রাখা এবং কিছুতেই যাতে শত্রুবাহিনী কোনদিক থেকে নদী পাড় হতে না পারে, তা নিশ্চিত করা। আর এপাড়ের অপর অংশটি ছিলো রিজার্ভ বাহিনী। সেই সাথে নদীতে একটি নৌকা-পুলও তৈরি করা হলো।

সেনাবাহিনীর অবস্থান ঠিক করতেই সুলতানের কাছে খবর এলো, শত্রুবাহিনী তাদের অবস্থান থেকে পনের মাইল কাছে এসে গেছে। এটাই ছিলো

শত্রুবাহিনীর শেষ ছাউনী। সুলতান আরো কিছু সময় চাচ্ছিলেন। তার একটু অবকাশের প্রয়োজন ছিলো। অবশ্য এ অবকাশ থেকে কোনো দিক থেকে সামরিক সহযোগিতা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো না। তখন শীতের মৌসুম শুরু হয়েছিলো। তিনি চাচ্ছিলেন যুদ্ধটা প্রচণ্ড শীতের মধ্যে টেনে নিতে। তার সেনারা প্রচণ্ড শীতেও লড়াই করতে অভ্যস্ত। কিন্তু কনৌজ ও গোয়ালিয়রের সেনাদের সম্পর্কে তিনি জানেন, ওরা অত্যধিক শীতে যুদ্ধ করতে অসুবিধা বোধ করে।

* * *

এদিকে নগরকোট মন্দিরে সামুরাতির প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। নর্তকী সামুরাতির কক্ষ ততোদিনে শাহজাদীর কক্ষে পরিণত হয়েছে। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ সামুরাতির কক্ষে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পগুজব করতো। পণ্ডিতের বর্তমান অবস্থা দেখলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারত না, এই সেই পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণের বয়স সামুরাতির বয়সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো। পণ্ডিত সামুরাতির কক্ষে একটি পালঙ্ক নিয়ে এলো এবং এর মধ্যে গালিচা ও মখমলের বিছানা পাতার নির্দেশ দিলো। প্রদীপের পরিবর্তে সামুরাতির কক্ষে এলো রঙিন ফানুস, আর সেবিকা দুই তরুণী প্রতিদিন সকালে কক্ষ ঝাড়া-মোছা করে পুরনো ব্যবহার্য জিনিসপত্র সরিয়ে নতুন জিনিস ও নতুন ফুলের তোড়া দিয়ে যেতো।

অন্য পণ্ডিতরা ভেবেছিলো, তাদের গুরু সামুরাতিকে বলীদানের জন্য নিজেই বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করছে। কিন্তু পণ্ডিত সামুরাতির কক্ষে গিয়ে ভুলেই যেতো বলীদানের জন্য প্রস্তুত করার কথা। কিন্তু সামুরাতি কখনো বিস্মৃত হয়নি যে তাকে বলী দেয়া হবে। সে জানতো তাকে বলীদানের জন্যই প্রস্তুত করা হচ্ছে।

এতোদিন কখনো ভুলেও পণ্ডিত সামুরাতিকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু যে পণ্ডিতকে কেউ কোনদিন হাসতে দেখেনি, এখন সে এ কারণে ও কারণে রীতিমতো হাসে। সামুরাতির কোনো কোনো কথায় সে সশব্দে হেসে ওঠে। ইতিমধ্যে সামুরাতি তাকে কয়েকবার বলেছে, তাকে যেনো শীঘ্রই বলী দিয়ে দেয়। কারণ, মৃত্যুর অপেক্ষা খুব কষ্টকর। সামুরাতির মুখে এ কথা শুনলে পণ্ডিতের চেহারা বিমর্ষ হয়ে যায়।

যে পণ্ডিত ভাবতো নারীর সংসর্গ ত্যাগ করে সে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে নিয়েছে, সেই পণ্ডিত এখন দেবতাদের অসন্তুষ্ট করে সামুরাতিকে খুশি করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। নারী বঞ্চিত রেখে নিজের মধ্যে পণ্ডিত যে শূন্যতা সৃষ্টি করেছিলো, সেই শূন্যতা সামুরাতির মাধ্যমে পূর্ণতা পাচ্ছিলো। পিপাসার্ত মানুষ

পানি দেখলে যেমন তৃষ্ণার কষ্ট আরো বেশি অনুভব করে, তেমনি পণ্ডিতও সামুরাতির সান্নিধ্যে নিজের শূন্যতা আরো বেশি অনুভব করতে লাগলো। সে সামুরাতিকে কখনো নিজের কন্যা রূপে, কখনো বোনের অবয়বে, কখনো নিজের মায়ের রূপে অনুভব করতে লাগলো। এই মন্দিরে সামুরাতির চেয়ে আরো সুন্দরী তরুণীও এসেছে কিন্তু পণ্ডিত কখনো ওদের সাথে কথা বলার প্রয়োজনও অনুভব করেনি। দৈবক্রমে ওদের দিকে কখনো দৃষ্টি পড়ে গেলে সাথে সাথে সে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতো। সামুরাতিই ছিলো প্রথম নারী যার সাথে পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ কথা বলেছে এবং নিজের অজান্তেই সামুরাতি তাকে বুকে জড়িয়ে নেয়। সামুরাতির সেই স্পর্শ ও আলিঙ্গন পণ্ডিতের মধ্যে সেই অনুভূতি সৃষ্টি করে, যে অনুভূতির দ্বারা মানুষ নিজেকে অনুধাবন করতে পারে।

"তোমার আত্মা কি এখনো সেই শূন্যতা অনুভব করে যে ভালোবাসা পূরণের অনুরোধ তুমি আমাকে করেছিলে?" সামুরাতিকে জিজ্ঞেস করলো পণ্ডিত।

"সম্ভবত আপনিই প্রথম পুরুষ যে এতোদিন আমাকে নিজের আয়ত্তে রেখেও এভাবে রেখেছেন যেনো আমি আপনার কব্জায় থেকেও আপনার আয়ত্তের বাইরে।" বললো সামুরাতি। "আমার শরীরের প্রতি আপনার কোনো আকর্ষণ নেই। এতেই আমার আত্মা শান্তি পেয়েছে।... আচ্ছা, এখন কি দেবতার চরণে বলী হওয়ার যোগ্য আমি হতে পেরেছি?"

"না, এখনও সেই সময় আসেনি।" উদাস কণ্ঠে বললো পণ্ডিত।

পণ্ডিত গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামুরাতির দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে পণ্ডিতের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু পরতে শুরু করলো। সামুরাতি আগ বেড়ে পণ্ডিতের মাথা তার বুকে চেপে ধরলো। শাড়ির আঁচলে পণ্ডিতের চোখের পানি মুছে দিলো। তার ঝুঁকে থাকা মাথার এলোমেলো চুলগুলো পণ্ডিতের নাকে-মুখে ছড়িয়ে পড়লো। পণ্ডিতের একটি হাত কাঁপতে কাঁপতে উপরের দিকে উঠে এলো। সামুরাতির গাল পণ্ডিতের মাথা স্পর্শ করছিলো। কাঁপা কাঁপা হাতে পণ্ডিত সামুরাতির রেশমী কোমল চুল স্পর্শ করলো। কয়েকটি চুল নিজের চোখের উপর ছড়িয়ে দিলো পণ্ডিত।

হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় পণ্ডিত। ঘটনার আকস্মিকতায় ভড়কে গেলো সামুরাতি। উঠে চোখ বড় বড় করে পণ্ডিত সামুরাতিকে দেখতে লাগলো। যেনো তার আত্ম-পরিচয়কে জাগিয়ে দিয়েছে কেউ। যেনো কোনো অশরীরী আত্মা এসে তার হাতকে নারীর চুলে স্পর্শ করিয়েছে।

মন্দিরের ঘণ্টা ধ্বনি বাজতে লাগলো। সমূর্তিতে ফিরে এলো পণ্ডিত। কোনো রাজা-মহারাজা মন্দিরে এলেই কেবল এই ঘণ্টা ধ্বনিত হয়। পণ্ডিত নিজে মন্দিরের সদর দরজায় গিয়ে আগন্তুক রাজা-মহারাজাকে অভ্যর্থনা জানায়। সামুরাতির দিকে গভীর মমতার দৃষ্টি মেলে পণ্ডিত বললো, "হয়তো কোনো মেহমান এসেছে, আমি আসছি।"

বিশেষ ঘণ্টা ধ্বনি অমূলক ছিলো না। রাজা আনন্দ পালের স্ত্রী এলো নগরকোট মন্দিরে। এই স্ত্রী হলো আনন্দ পালের অপর পুত্র ব্রাহ্মপালের মা। আনন্দ পাল সম্মিলিত বাহিনীর সাথে থাকলেও গোটা বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ড ছিলো ব্রাহ্মপালের হাতে। রাজা আনন্দ পাল তার এই স্ত্রীকে বলেছিলো, রাজমহলের সবচেয়ে সুন্দরী ও অভিজ্ঞ নর্তকীকে নগরকোটের পণ্ডিত বলীদানের জন্য রেখে দিয়েছে। রাজা আরো বলেছে, এবার ব্রাহ্মপালের নেতৃত্বে সম্মিলিত বাহিনী বিজয়ী হবেই হবে।

এর আগে আনন্দ পালের অপর স্ত্রী শুকপালের মা এই ভেবে ছেলেকে বিদ্রোহে উস্কানি দিয়েছিলো যে, শুকপাল বিদ্রোহ করে বেরায় সুলতান মাহমূদকে বন্দী করতে পারবে। আর শুকপাল হবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। কিন্তু পরিণতিতে শুকপাল নিজেই বন্দী হলো আর সুলতান তাকে আজীবনের জন্য বন্দী করে জেলখানায় আটকে রাখলো।

এখন আনন্দ পালের দ্বিতীয় স্ত্রী ভাবলো, তার ছেলে পেশোয়ার জয় করে গজনী পদানত করবে এবং বাপের সিংহাসনের উত্তাধিকারী হবে। সে পুত্রের বিজয়ের জন্য উন্মুখ ছিলো। তাই নগরকোটে নর্তকীর বলীদান পর্ব সমাধান হয়েছে কিনা তা জানার জন্য রাণী এখানে এসেছে।

বড় পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ রাজা আনন্দ পালের স্ত্রীকে জানায়, মুসলমান ঘরের মেয়ে এবং নর্তকী হওয়ার কারণে মেয়েটিকে পবিত্র করে বলীদানের উপযোগী করতে অনেক সময় লেগে গেছে।

ব্রাহ্মপালের মা বললো, "এর আগেও এক কুমারী মেয়েকে বলী দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাকে প্রস্তুত করতে এতো সময় লাগেনি!" সে পণ্ডিতকে তাকিদ করলো, শীঘ্রই যেনো বলীদান কাজ সেরে ফেলা হয়। কারণ, আমাদের সৈন্যরা রণাঙ্গনের একেবারে কাছে চলে গেছে অথচ সে জানতে পেরেছে, নর্তকীকে নাকি এখনো মা গঙ্গার জলে স্নানও করানো হয়নি।

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের মর্যাদা ছিলো রাজা-মহারাজাদের চেয়েও বেশি। হিন্দুস্তানে তাকে ভগবানের বিশেষ দূত মনে করা হতো। কিন্তু আনন্দ পালের

স্ত্রীর আশংকা ও উষ্মায় পণ্ডিতের আভিজাত্য ও অহংবোধে আঘাত হানে। রাণী আরো বললো, "নর্তকী সামুরাতি এতোটাই সুন্দরী যে ওকে কেউ দেখলে আর চোখ ফেরাতে পারে না। জানি না, ওর এই জাদুময়তা নগরকোট মন্দিরেও প্রভাব সৃষ্টি করেছে কিনা। আমার সন্দেহ হচ্ছে, নর্তকীর জাদু এখানেও প্রভাব বিস্তার করেছে। নর্তকীর বলীদান কর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি মন্দিরেই অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ এ কথার পরও আনন্দ পালের স্ত্রীকে কিছুই বললো না। কারণ, তার সন্দেহ অমূলক ছিলো না। পণ্ডিত আনন্দ পালের স্ত্রীকে জানালো, "এই একটি কাজই বাকি রয়েছে, এ কাজ আগামীকাল সকালেই সমাধা হবে। তার পরদিন নর্তকীর বলীদান কর্ম সেরে ফেলা হবে।"

রাজা আনন্দ পালের স্ত্রী এ কথার পর শাহী মেহমানখানায় চলে যায়। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ আবার ফিরে আসে সামুরাতির কক্ষে। সামুরাতি স্মিত হেসে তাকে অভ্যর্থনা জানায়। পণ্ডিতের চেহারা ছিলো উদ্বিগ্ন। সে নিষ্পলক সামুরাতির দিকে তাকিয়ে রইলো। সামুরাতি তার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ জিজ্ঞেস করলে পণ্ডিত জানালো, "সে আগামীকাল ভোরে আসবে এবং তাকে নিয়ে গঙ্গা তীরে যাবে।" এ কথা বলেই কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেলো পণ্ডিত।

* * *

এদিকে শুয়াইব আরমুগানীর কাফেলা সামুরাতির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। দু'টি উট ও তিনটি ঘোড়ার ছোট কাফেলা। একটি উটে এক যুবতী আর অপর উটে এক অর্ধবয়স্কা মহিলা আরোহী। আর তিনটি ঘোড়ায় তিনজন পুরুষ। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হবে এরা তীর্থযাত্রী, একটি কুকুরও এই কাফেলার সহযাত্রী। সেই যুগে দূর ভ্রমণযাত্রী কাফেলার সাথে প্রশিক্ষিত কুকুর নেয়া হতো নিরাপত্তার সহায়ক হিসেবে। লাহোর থেকে রওয়ানা হয়ে নগরকোটের দিকে যাচ্ছে কাফেলা। রাস্তায় তাদের কেউ জিজ্ঞেস করলে তারা জানিয়েছে, পূজাপাঠের জন্য তারা নগরকোট মন্দিরে যাচ্ছে। টানা তিন দিন চলার পর আরমুগানীর ছদ্মবেশী এই কাফেলা নগরকোট মন্দিরের কাছে চলে আসে। নগরকোট মন্দিরের নিকটবর্তী হয়ে তারা লোকজনকে বলে, তারা মহাঋষি রাধাকৃষ্ণের দর্শনের জন্য, তার পদধূলি নেয়ার জন্য নগরকোট এসেছে। কারণ, নগরকোটের আশপাশের লোকেরো পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণকে অবতার বলেই মনে করে।

নগরকোটের অনতিদূরে আরমুগানীর কাফেলা শেষ রাত যাপনের জন্য যাত্রাবিরতি করে। রাতের বেলা আগুন জ্বালিয়ে আগুনের চারপাশে বসে কাফেলার একজন বললো, "আমরা যদি মন্দিরে প্রবেশ করতে পারি আর আমাদের কেউ সন্দেহ না করে, তাহলে মন্দিরের কোথায় কি আছে তা জানা সম্ভব হবে। যদি জানতে পারি, সামুরাতিকে বলী দেয়া হয়ে গেছে, তাহলে আমি নগরকোটের সব পণ্ডিতকে হত্যা করে ক্ষ্যান্ত হবো।"

এই দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞা আর কারো নয়, শুয়াইব আরমুগানীর। কারণ, মন্দিরের আচার অনুষ্ঠান সে জানতো। লাহোর থেকে আরো দু'জন সহকর্মীকেও সে সাথে করে নিয়ে আসে। যারকা আগেই সামুরাতির বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলো। সামুরাতির পরিচারিকা তো পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলো। আরমুগানী ও তার দু'সহকর্মী মাথা ন্যাড়া করে হিন্দু পুরোহিতদের মতো মাথায় তিলক পরেছিলো। গোঁফ পরিষ্কার করে এমন কৃত্রিম গোঁফ মুখে লাগিয়ে নিয়েছিলো যে, তাদের ঠোঁট দেখাই যাচ্ছিলো না। পরিচারিকা ও যারকাকেও হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতো পোশাকে সজ্জিত করা হয়েছিলো। মহিলা দু'জন শরীরে লম্বা দানাওয়ালা দস্তানা ঝুলিয়ে দিলো।

উট ও ঘোড়ার ব্যবস্থা শুয়াইব আরমুগানীর সহকর্মীরা করেছিলো। কুকুর সাথে নেয়ার বায়না ধরেছিলো পরিচারিকা। কারণ, ওখানে গেলে সামুরাতির অতি যত্নে পোষা কুকুরের দেখাশোনা করার কেউ ছিলো না। সামুরাতি এই কুকুরকে খুবই যত্ন করতো। অবসরে কুকুরের সাথে খেলা করতো সামুরাতি আর রাতের বেলা তার বাড়ি পাহারা দিতো এই দুর্ধর্ষ কুকুর। অবশ্য পথে এমন একটি কুকুর সাথে রাখার প্রয়োজনও ছিলো।

শেষ মঞ্জিলে রাত যাপনের অবসরে তারা সামুরাতিকে উদ্ধারের পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলছিলো। তারা এটাই ভাবলো, এ ধরনের অপারেশন শেষ করে জীবন নিয়ে ফিরে আসা খুবই কঠিন। যারকা ও বৃদ্ধা পরিচারিকা দায়িত্ব নিলো, সামুরাতি যদি জীবিত থেকে থাকে তবে তারা তাকে উদ্ধার করবেই করবে।

বিশাল মন্দিরে ছিলো প্রায় কুড়িটি বড় বড় কক্ষ। ছিলো ছোট ছোট আরো বহু খিলান। তা ছাড়াও রয়েছে বিশালাকার পাতাল সুড়ং। সুড়ঙের সিঁড়িগুলো অন্ধকার। সামুরাতিকে এসব অন্ধ গলি থেকে বের করে আনার ব্যাপারটি জীবন বাজি রাখারই নামান্তর। বৃদ্ধা পরিচারিকা মন্দিরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তাদের অবহিত করলো। তাছাড়া সবচেয়ে বেশি আশংকার কারণ ছিলো, মন্দিরের চারপাশ ঘিরে রাখা দুর্গসম সেনা ছাউনী।

আরমুগানী ও আরমুগানীর দু'সহযোগী খঞ্জর ও ছোট তরবারী তাদের পরিধেয় কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলো। রাতের শেষ প্রহরে তাদের এই ছোট্ট কাফেলা মন্দিরের দিকে রওয়ানা হলো। বৃদ্ধা পরিচারিকা কাফেলাকে পথ দেখাচ্ছে। রাতের অন্ধকার থাকতেই তারা মন্দিরের প্রধান ফটকে পৌছে যেতে চায়।

এই রাতটিই ছিলো সেই রাত, যে রাতে পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ সামুরাতিকে বলেছিলো, খুব ভোরে এসে গঙ্গাস্নান করানোর জন্য তাকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবে। খুব ভোরে পণ্ডিত যখন সামুরাতির কক্ষে উপস্থিত হলো, সামুরাতি তখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পণ্ডিত তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললো। বললো, 'তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে।' সামুরাতি নীরবে পণ্ডিতের সাথে রওয়ানা হলো। মন্দির থেকে বের হলে তাদের জন্য দুর্গের প্রধান ফটক খুলে দেয়া হলো। দুর্গের বাইরে এসে তারা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নীচে নামতে শুরু করলো। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ওঠানামা পণ্ডিতের জন্য কোনো মুশকিলের ব্যাপার ছিলো না। কারণ, তার এ পথ খুবই চেনা। কিন্তু সামুরাতির জন্য নীচে নামা ছিলো কঠিন। কারণ, ঘোড়াগাড়িতে যাতায়াত করে সে অভ্যস্ত। তার পক্ষে পায়ে হেঁটে পাহাড়ের নীচে নামার ঘটনা কখনো ঘটেনি। তাছাড়া তাকে যে চপ্পল দেয়া হয়েছিলো, তা পায়ে দিয়ে হাঁটা তার জন্য ছিলো আরো মুশকিল। পাহাড় থেকে নীচে নামার সময় বারবার সামুরাতির পা পিচলে যাচ্ছিলো। পণ্ডিত তাকে ধরে সহযোগিতা করছিলো, যার ফলে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছিলো সামুরাতি। পণ্ডিতকে এক হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছিলো সামুরাতি। পণ্ডিতও নিজেকে সামলানোর জন্য একহাতে সামুরাতিকে ঝাপটে রাখলো। তারপরও যখন বারবার সামুরাতি হোঁচট খাচ্ছিলো, তখন পণ্ডিত অনেকটা সামুরাতিকে তার কাঁধেই আগলে নিয়ে নীচে নামতে শুরু করলো। মওসুম ছিলো শীতের। সামুরাতি ছোট হয়ে পণ্ডিতের শরীরের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখে।

অনেক কষ্টে তারা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নীচে নেমে নদী তীরের দিকে রওয়ানা হয়। মন্দির নদীতীর থেকে বেশ দূরে। উপরের পাহাড় চূড়ায় মন্দির আর নীচের নদী তীরবর্তী এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ। পণ্ডিত সামুরাতিকে তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করেনি। পরস্পর জড়াজড়ি করেই তারা নদীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। তখনো পূবাকাশে ভোরের লালিমা দেখা দিতে অনেক দেরী। ভোর হতেই লোকজন গঙ্গাতীরে আসতে শুরু করবে। এ জন্য পণ্ডিত অন্ধকার থাকতেই সামুরাতিকে নিয়ে গঙ্গাতীরের দিকে ছুটলো। যাতে অন্ধকারে মাসুরাতিকে সে লুকিয়ে রাখতে পারে।

"আপনি কি আমাকে শেষ গোসল দেয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন?" জানতে চাইলো সামুরাতি।

পণ্ডিত তার হাতের বন্ধনে সামুরাতিকে আরো বেশি করে নিজের শরীরের সাথে লেপ্টে নেয়ার চেষ্টা ছাড়া কোনো জবাব দেয় না। মনে হচ্ছিলো, পণ্ডিত বুঝি তাকে নিজের শরীরের সাথে পিষে ফেলবে।

"আপনি কথা বলছেন না কেন? আমাকে আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আমাকে আজই যদি মরতে হয় তাহলে বলেই দিন না?"

"হ্যাঁ, সবই বলবো সামুরাতি।" দু'হাতে বুকের সাথে সামুরাতিকে চেপে ধরে বললো পণ্ডিত। "আমার মন বলছে শুধু তুমি একা নও, আমরা উভয়েই বলী হয়ে যাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে, আমার হয়তো আজকের সূর্য আর দেখা হবে না।" আওয়াজ জড়িয়ে এলো পণ্ডিতের। জড়ানো কণ্ঠে বললো, "হয়তো এটাই জীবনের শেষ সময়। আমাকে পিপাসা নিয়ে মরতে দিও না। আমি ভেবেছিলাম, আমার হৃদয়ের আবেগ-ভালোবাসা মরে গেছে। কিন্তু না, আমার হৃদয়ের আবেগ মরেনি। আমি তোমার মধ্যে মমতাময়ী নারীর ছবি আঁকতে চেয়েছি– তোমাকে মেয়েরূপে, বোনরূপে, মায়ের অবয়বে চিত্রিত করতে চেয়েছি। দেবীর চরিত্রও তামার মধ্যে আমি চিত্রিত করতে চেয়েছি। কিন্তু কোনোটিই স্থিতি পায়নি। আমি তোমার মধ্যে দেবীর হাসিও দেখেছি কিন্তু তবুও আমার পাপীমনকে বোঝাতে পারিনি। আমি বুঝতে পারি না, এমন কেনো হলো। নারীর সঙ্গ থেকে আমি পালাতে বহু চেষ্টা করেছি কিন্তু...।"

"আপনি পাথরের মূর্তির পূজা করেন। আমার আল্লাহর ইবাদত করুন, দেখবেন মন থেকে সব পাপ দূর হয়ে যাবে।" বললো সামুরাতি।

"আমাকে আর কথার প্যাঁচে জড়িও না নর্তকী। আমি তোমাকে হৃদয়ের প্রেম দিয়েছি। এর বিনিময়ে তুমি আমাকে দেহের উষ্ণতা দিয়ে তৃপ্ত করো। আজ হয়তো তোমার জীবনের শেষ দিন। এরপর তোমার দেহকে জ্বালিয়ে দেয়া হবে কিন্তু আমি তো বেঁচে থেকেও জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে ভস্ম হচ্ছি।"

সামুরাতি হাসিতে ভেঙ্গে পড়লো এবং নিজেকে হঠাৎ করে পণ্ডিতের বাহুবন্ধন থেকে দূরে সরিয়ে নিলো। "শোনো! তোমার কৃষ্ণদেবী যদি সত্য হতো, তাহলে তোমার পঞ্চাশ বছরের প্রার্থনাকে এভাবে পাপে ভেসে যেতে দিতো না। আমি স্বাধীন। আমি জানতাম, তুমিও কোনো একদিন ওদের মতোই আমাকে চাইবে পাপীষ্ঠ পুরুষগুলো আমাকে যেভাবে পেতে চায়। আমি এ জন্যই তোমার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা সেই পাশবিকতাকে উস্কে দিয়েছি, যেন তুমি যন্ত্রণায়

কাতর হয়ে আমার পায়ে এসে পড়ো। আমি তোমাকে ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো আমার পিছু পিছু মন্দিরের বাইরে নিয়ে আসবো এবং তোমার বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে যাবো।... হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি এখন স্বাধীন, আমি এখন মুক্ত।"

সামুরাতি হঠাৎ করে একদিকে দৌড়াতে লাগলো। কিন্তু অসমতল জমিনে সে বেশি দূর এগুতে পারলো না। পণ্ডিত দৌড়ে ওকে ধরে ফেললো এবং বললো, "পাগলামী করো না নর্তকী। আমার কাছ থেকে পালিয়ে তুমি কোথায় যাবে? আমি ঠিকই তোমাকে ধরিয়ে আনবো এবং বলী দিয়ে দেবো। আমি তো তোমার কাছে তেমন দামী জিনিস চাচ্ছি না।"

সামুরাতি গায়ের সব শক্তি দিয়ে পণ্ডিতের গালে থাপ্পর মেরে বললো, "আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরে যাবো কিন্তু তোমার মূর্তির জন্য মরতে পারবো না।"

"তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না নর্তকী। মূর্তির অপমান করো না।"

"আমার আল্লাহ্ আমাকে বাঁচাবে। আমার আল্লাহ্ যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের একটা মূর্তিও অটুট থাকবে না।"

পণ্ডিতের ভেতরকার পৌরুষরূপী পশুটা ক্ষুধার্ত বাঘের মতো বেপরোয়া হয়ে উঠলো। যে প্রবৃত্তিকে হিমালয়ের পাদদেশে হত্যা করে এসেছিলো বলে মনে করেছিলো, পণ্ডিতকে তা আজ মাংসখেকো হিংস্র শৃগালে পরিণত করলো।

হঠাৎ অনতিদূরে একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শোনা যায়। দেখতে দেখতে কুকুরের ডাক নিকটবর্তী হতে থাকে।

যে সময় উপরের পাহাড় থেকে নীচে নেমে পণ্ডিত সামুরাতিকে নিজের বুকে জড়িয়ে নিয়েছিলো, ঠিক সে সময় শুয়াইব আরমুগানীর ছোট কাফেলা মন্দিরে যাওয়ার জন্য পাহাড়ী পথের শুরুটায় এসে পৌঁছে। সামুরাতির পরিচারিকা এই পথ ভালোভাবেই চেনে। এখানেই উট ও ঘোড়া তাদের ছেড়ে দিতে হবে। সামুরাতির কুকুরটি ছিলো বন্ধনমুক্ত। কুকুর হঠাৎ জমিন শুঁকে দু'পায়ে মাটি আচড়াতে থাকে এবং ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে শুরু করে। সেই সাথে ওই পথেই কুকুরটি দৌড়াতে লাগলো যে পথে পণ্ডিত সামুরাতিকে নিয়ে গঙ্গাতীরের দিকে গিয়েছিলো। কাফেলার কেউ এদিকে তেমন খেয়াল করেনি। কারণ, কুকুর এমনটা করেই থাকে। কিন্তু কুকুর উচ্চ আওয়াজে ঘেউ ঘেউ করে সামনের দিকে দৌড়াতে থাকে। সামুরাতির সেবিকা বললো, মনে হয় কুকুর কোনো শিয়াল বা বনবিড়ালের গন্ধ পেয়েছে। তাদের কারো পক্ষে ঘুণাক্ষরেও ভাবার অবকাশ ছিলো না, কুকুর তার মালিকের গন্ধ পেয়ে দৌড়াচ্ছে। মাসাধিক সময় ধরে সামুরাতির সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন। কুকুরটি সামুরাতির এতোটাই প্রিয় ছিলো

যে, শিশুর মতো সে কুকুরের সাথে খেলা করতো। কুকুর বিছানায় ওঠে সামুরাতির সঙ্গ দিতো।

পণ্ডিত কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দের কোনো পরোয়া করলো না। সে সামুরাতিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ঝাঁপটে ধরে। সামুরাতি পণ্ডিতের পাঞ্জা থেকে মুক্ত হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এ সময় কুকুরটি এসে সামুরাতির মুখের কাছে মুখ নিয়ে শুঁকে। সামুরাতি ভাবলো, এটি হয়তো কোনো নেকড়ে নয়তো মন্দিরের কোনো কুকুর হবে। কুকুরটি যে তারই পোষা তা সামুরাতির কল্পনার অতীত ছিলো। কুকুর ওর মুখে মুখ ঘষতে এবং ওর গা চাটতে শুরু করলো। সামুরাতির কেন যেনো সন্দেহ হলো, এটি তো তার শিরির মতোই মনে হচ্ছে। হঠাৎ মনের অজান্তেই সামুরাতির মুখ থেকে বেরিয়ে এলো– "শিরি, ছিঁড়ে ফেলো।"

সামুরাতির নির্দেশ মাত্রই কুকুর সামনের দু'টি পা ছড়িয়ে দিয়ে পণ্ডিতের উপর হামলে পড়লো এবং পণ্ডিতের এক কাঁধের গোশ্‌ত কামড়ে ছিঁড়ে ফেললো। কুকুর পণ্ডিতকে কামড়ে ধরে হেঁচড়াতে শুরু করলে পণ্ডিত বিকট শব্দে চিৎকার দিতে থাকে। এ সুযোগে সামুরাতি উঠে দাঁড়ায়। আর কুকুর পণ্ডিতের এক রান কামড়ে ধরে। পণ্ডিত মরণ চিৎকার দিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। এবার কুকুর তার রানের গোশ্‌ত ছিঁড়ে নিয়ে এক পা কামড়ে ধরে। সামুরাতি তখন চিৎকার করে বললো, আমি তোকে বলেছিলাম না পণ্ডিত! আমার আল্লাহ্ আমাকে বাঁচাবে। এটি আমার পালিত কুকুর। লাহের থেকে আমার গন্ধ শুঁকে শুঁকে দৌড়ে আমাকে বাঁচাতে এসেছে।

সামুরাতি কুকুর শিরিকে ঝাঁপটে ধরলো। সে ভাবতেই পারছে না তার কুকুর কী করে এখানে আসলো। দীর্ঘদিন পর মালিককে পেয়ে সামুরাতির পায়ে লুটোপুটি খেতে শুরু করলো। এদিকে পণ্ডিত প্রচণ্ড আঘাত নিয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য পালাতে লাগলো। এমন সময় সামুরাতির কানে ভেসে আসে কারো পায়ের আওয়াজ। ভয়ে কেঁপে উঠে সামুরাতি। ভাবে, পণ্ডিতের আর্তনাদ শুনে হয়তো মন্দিরের সেনারা সাহায্যের জন্য আসছে। সামুরাতি কোথাও লুকানোর চেষ্টা করে। ঠিক এমন সময় এক নারীকণ্ঠ শোনা যায়, শিরি শিরি। কুকুর শিরিকে সামুরাতির বৃদ্ধা সেবিকা ডাকছে। এদিকে পণ্ডিতের আর্তনাদ এতোটাই বিকট ছিলো যে, সামুরাতির মনে হলো পণ্ডিত মরণ আর্তনাদ করছে। আরমুগানী ও তার সঙ্গীরা পণ্ডিতের আর্তনাদের পাশাপাশি কুকুরের গোঙানীর আওয়াজও শুনতে পাচ্ছিলো। এ সময় আরমুগানীর মনে পড়লো, এই কুকুর তাকেও একদিন হামলা করে আহত করেছিলো।

তারা সবাই কুকুরকে ধরার জন্য এদিকে দৌড়ে এলে আলো-আঁধারীর মধ্যে সামুরাতি লুকাতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু লুকানোর মতো যুৎসই জায়গা পাচ্ছিলো না সামুরাতি। দৌড়-ঝাঁপের মধ্যে গলার আওয়াজ শুনে যখন আগন্তুকদের কণ্ঠ আরমুগানী ও তার সেবিকার কণ্ঠের মতো মনে হলো তখন ভাবনায় পড়লো, সে কোনো স্বপ্ন দেখছে না তো? না, আর লুকানোর চেষ্টা করলো না সামুরাতি। সামুরাতি তাদের মুখোমুখি হয়ে বললো, কিভাবে এখানে নীত হয়েছে। অতি সংক্ষেপে আরমুগানীও সামুরাতিকে জানালো তারা কি করে এ পর্যন্ত এসেছে। অকুস্থলে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা ঝুঁকিপূর্ণ ভেবে তারা সবাই যে জায়গায় উট ও ঘোড়া বেঁধে রেখেছিলো, সেখানে ফিরে এলো। যারকা ও সামুরাতিকে একটি উটের পিঠে, সেবিকাকে আরেকটি উটের উপর সওয়ার করিয়ে অন্যরা ঘোড়ায় চড়ে বসলো। খুব দ্রুতগতিতে স্থান ত্যাগ করে অগ্রসর হতে লাগলো আরমুগানীর কাফেলা। তাদের ফেরার গন্তব্য এখন লাহোর নয়, বেরা। লাহোর এখন আর তাদের কারো জন্যই নিরাপদ নয়।

পরিচিত পথ ছেড়ে বিজন জঙ্গল ও অচেনা পথ ধরে তারা অগ্রসর হতে লাগলো। তাদের পশ্চাদ্ধাবনের আশংকা ছিলো। আরমুগানী ভেবেছিলো, পণ্ডিত মন্দিরে গিয়ে বলবে, সামুরাতি পালিয়ে গেছে। সামুরাতির পালিয়ে যাওয়ার খবর শুনে পাহাড়ের সেনা ছাউনী থেকে সেনারা ঘোড়া নিয়ে নীচে অবতরণ করবে এবং সামুরাতির খোঁজে বের হবে। ইত্যবসরে তাদের অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

আরমুগানীর আশংকা সঠিক ছিলো না। কেউ তাদের খোঁজে পশ্চাদ্ধাবন করেনি। সামুরাতির কুকুর পণ্ডিতের কাঁধ ও রানের গোশত্ ছিঁড়ে নিয়ে পাজরের হাড় ভেঙ্গে দিয়েছিলো। ক্ষতস্থান থেকে অস্বাভাবিক রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিলো। পণ্ডিত অব্যাহত চিৎকার করলেও কেউ না কেউ তাকে বাঁচানোর জন্য অবশ্যই আসতো। কারণ, এই আঘাতে তাৎক্ষণিকভাবে পণ্ডিতের মৃত্যু হওয়ার আশংকা ছিলো না। কিন্তু তাৎক্ষণিক দু'চারটি আর্ত-চিৎকার দিয়ে পণ্ডিত আর কোনো শব্দ করেনি। সে কাউকে তার সাহায্যের জন্যও ডাকেনি। এছাড়া পরনের কাপড় ছিঁড়ে ক্ষতস্থানে বেঁধে রক্ত বন্ধ করার জন্যও সে কোনো চেষ্টা করেনি। পাহাড়ের উপরে যাওয়ার পরিবর্তে পণ্ডিত অনতিদূরের সমতল ভূমির লোকালয়ের দিকেও নিজেকে বাঁচানোর জন্য অগ্রসর হয়নি।

কোথাও গেলো না পণ্ডিত। বাঁচার কোনো চেষ্টাই করলো না। কাষ্ঠ হাসি হেসে মনে মনে বললো, হয়েছে, খুব হয়েছে। এমনটাই হওয়া উচিত ছিলো।

উচিত শিক্ষা হয়েছে...। পণ্ডিত নিজের নিস্তেজ ক্ষতবিক্ষত দেহটাকে টেনে-হেঁচড়ে গঙ্গার তীরের দিকে চললো এবং বলতে লাগলো, "গঙ্গা মাও আমার এই পাপরাশি ধুতে পারবে না, কোনো আগুনও হয়তো আমার পাপ জ্বালাতে পারবে না। মন যখন পাপী হয়ে যায়, তখন শরীর পাপে ডুবে যেতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। আহ্! খুব তেষ্টা পেয়েছে ভগবান...!" পণ্ডিতের মাথা চক্কর দিতে শুরু করলো। কয়েকবার চক্কর খেয়ে পড়ে গেলো পণ্ডিত। শরীরের সব রক্ত ঝরে পড়েছে। এভাবে হোঁচট খেতে খেতে গঙ্গার পানির দিকে এগুতে থাকলো। এক পর্যায়ে পণ্ডিত ক্ষীণ আওয়াজে স্বগতোক্তি করলো, "আর একটু শক্তি দাও ভগবান, আমাকে গঙ্গা মা'র কোলে যেতে দাও!"

পণ্ডিতের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছিলো। সে চক্কর খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো। আবার কোনো মতে মাথা তুলে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো। এভাবে সামনে এগুচ্ছিলো। গঙ্গার পানির স্রোত ও ঢেউয়ের শব্দ তার কানে ভেসে আসছিলো। গঙ্গার শব্দ শুনে আরো তাড়াতাড়ি পৌঁছার জন্য অবশিষ্ট সব শক্তি দিয়ে গড়াতে লাগলো পণ্ডিত। এমন সময় তার স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠলো সামুরাতির কথা– "আমাকে আমার আল্লাহ্ বাঁচাবে, তোমাদের এসব মূর্তি সব ধ্বংস হয়ে যাবে।" তখন নিজের স্বগতোক্তিও মনে পড়লো তার– "নারী মা-বোন-স্ত্রী-কন্যা হতে পারে, এছাড়া নারীকে অন্য কোনো রূপে রূপায়িত করে কাছে টানলে জ্বলে যেতে হবে। পরিণতি খুবই খারাপ হবে।" গোটা মন্দিরে এই নীতিই প্রতিষ্ঠা করেছিলো পণ্ডিত। কিন্তু নিজের নীতিতেই সে অটল থাকতে পারেনি। নিজেই সেই পাপে জড়িয়ে পড়েছিলো। সামুরাতিকে সে সেই রূপই দিয়েছিলো, যা না ছিলো মা-বোন-কন্যা, না ছিলো স্ত্রী।

শরীরের রক্ত ঝরতে ঝরতে শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছিলো পণ্ডিতের। এদিকে পাপের অনুশোচনায় পণ্ডিতকে আরো নির্জীব করে ফেলেছিলো। এমতাবস্থায় গড়াতে গড়াতে সে গঙ্গা তীরে পৌঁছে যায়। এ জায়গাটা ছিলো ঈষৎ ঢালু। নদীর ঢেউ অনেক উপরে উঠে আসতো, আবার চলে যেতো অনেক নীচে। এমতাবস্থায় দু'চোখে অন্ধকার নেমে এলো পণ্ডিতের। কাদামাটিতে নিথর দেহ এলিয়ে দিলো পণ্ডিত। গঙ্গার ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো তার গায়ে। পণ্ডিত শেষবারের মতো ক্ষীণকণ্ঠে বললো, "আমি পাপের পিয়াসী, আমি পাপী।" এ সময় বিশাল এক ঢেউ এসে পণ্ডিতের নিথর দেহটি গঙ্গা তার গভীর বুকে টেনে নিয়ে যায়।

এদিকে মন্দিরের অন্যরা নগরকোটের মূর্তিগুলোকে নর্তকীর রক্তে স্নাত করার জন্য অপেক্ষা করছিলো। মন্দিরের সকল পুরোহিত মহাঋষির পথ চেয়ে

অপেক্ষা করছে। ব্রাহ্মপালের মা পণ্ডিতের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছিলো। বেলা এক প্রহর পার হলেও যখন পণ্ডিতকে গঙ্গাতীর থেকে ফিরে আসতে দেখা গেলো না, তখন ঋষির খোঁজে বেরিয়ে পড়লো লোকজন। দিনের শেষভাগে অনুসন্ধানকারী লোকজনও ফিরে এলো। কোথাও পণ্ডিত ও সামুরাত্তির খোঁজ পাওয়া গেলো না। অনুসন্ধানকারীরা গঙ্গাতীরে যাওয়ার পথে দেখতে পেলো রক্তের ছোপ ছোপ দাগ। কিন্তু সেই রক্তের কোনো পরিচয় পাওয়া গেলো না। সেই রক্তের দাগ জন্ম দিলো বহু কাহিনী। অনেকেই অনেকভাবে রক্তের ব্যাখ্যায় গল্প তৈরি করলো। কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নগরকোটের পণ্ডিত ও সামুরাত্তির অস্তিত্ব উদ্ধার করতে পারলো না। এমতাবস্থায় সম্মিলিত হিন্দু বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ব্রাহ্মণপালের মা দেবদেবীর অভিশাপের ও অসন্তুষ্টির ভাবনায় মানসিকভাবে মুষড়ে পড়লো। ভয় করতে লাগলো, না জানি দেব-দেবীর পক্ষ থেকে কোন গজব আপতিত হয় কিনা।

* * *

গজব আপতিত হচ্ছিলো সুলতান মাহমূদের উপর, তাদের উপর নয়। দৃশ্যত হিন্দুরা এতো বিপুল সেনা সমাবেশ ঘটাবে, তা সুলতান আগে আন্দাজ করতে পারেননি। বিপুল সেনা সমাবেশ থেকে কিভাবে সুলতান নিজের বাহিনীকে নিরাপত্তা দেবেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছেন। সম্মিলিত হিন্দু বাহিনীর দুর্বলতাগুলো ইংরেজ ঐতিহাসিকের লেখায় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার ভিএ স্মিথ লিখেন–

'হিন্দু বাহিনীর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিলো বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত বিভিন্ন রাজ্যের সেনাদেরকে একই কমান্ডের অধীনে ন্যস্ত করা। অথচ এই কমান্ডার অন্যান্য বাহিনীর রণকৌশল ও যুদ্ধপারদর্শিতা সম্পর্কে কিছুই জানতো না। দ্বিতীয়ত, হাই কমান্ডের প্রতি অন্যান্য সেনাধ্যক্ষদের আস্থা ছিলো না। তাদের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচণ্ড অভাব ছিলো। তৃতীয়ত, হাজার হাজার বেসামরিক লোককেও এই বাহিনীতে তাদের আবেগ ও দৈহিক সামর্থের বিচারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। অথচ এরা কোনো দিন যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত দেখেনি। রণকৌশল সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিলো না। চতুর্থত, হিন্দু বাহিনী ছিলো সংখ্যাধিক্যে ও সামরিক সরঞ্জামের প্রতি অতিশয় নির্ভরশীল।'

হিন্দু বাহিনীকে মানসিকভাবে শক্তি যোগাতো সেনাবাহিনীর সহগামী হিন্দু পুরোহিত ও তাদের সাথে নিয়ে আসা বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। মুসলমান সেনারা দেখেছে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে হিন্দু পুরোহিতরা সবার আগে এসব মূর্তি

ফেলে পালাতে শুরু করে। পক্ষান্তরে সুলতান মাহমূদ তার রণকৌশল ও জানবাজ যোদ্ধাদের পরিবর্তে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের ভরসা করতেন। প্রত্যেক লড়াইয়ের আগে তিনি দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। নিজের রণকৌশলের প্রতি তিনি ছিলেন আস্থাশীল। সেই সাথে এ বিষয়টিও তাকে শক্তি যোগাতো যে, নিজের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থে তিনি যুদ্ধ করেন না, স্রেফ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্যই তিনি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হন। সম্মিলিত হিন্দুদের বিশাল বাহিনী দেখে তার সেনাদের সর্বশেষ নির্দেশনা দিতে গিয়ে তিনি বললেন–

'বন্ধুরা! বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর চেয়ে তিনগুণ বেশি বেঈমান বাহিনীকে নবীজী পরাজিত করেছিলেন। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে আমাদের। আমি আজ তোমাদের কয়েকটি কথা বলতে চাই।' নিজের অশ্বে আরোহণ করা অবস্থায় সেনাদের উদ্দেশ্যে সুলতান বলতে লাগলেন, 'আমি তোমাদের এই আত্মতুষ্টিতে ভুলিয়ে রাখতে চাই না যে, বিজয় তোমাদেরই হবে। তবে এ কথা অবশ্যই বলবো, তোমরা যদি আল্লাহর হয়ে যুদ্ধ করো, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের মদদ করবেন। মনের মধ্যে এই চেতনা রাখো, তোমরা আল্লাহর সত্য ধর্মের জন্য যুদ্ধ করছো। আল্লাহর কোনো শত্রুকেই তোমরা জীবিত থাকতে দেবে না। তোমাদের সামনে এখন পাহাড় দাঁড়ানো। এই পাহাড়কে অজেয় মনে করে যদি জীবনের প্রতি তোমরা বেশি দরদী হয়ে উঠো, তাহলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। মনে রাখবে, পাহাড় যতো দুর্ভেদ্য ও দুর্গম হোক না কেন, আমরা একে টুকরো টুকরো করে ফেলবো। নিজেদের কম জনবল আর শত্রুদের সংখ্যাধিক্যের কথা ভুলে যাও। মনে রেখো, যুদ্ধ মনের জোরে হয়ে থাকে। আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ তাদেরই মদদ করেন যারা আল্লাহর নামকে উচ্চকিত করার জন্য বিজয়ের আশা নিয়ে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়।'

নিজ বাহিনীর ছোট্ট দু'টি ইউনিটকে নিজের প্রত্যক্ষ কমান্ডে নিয়ে সুলতান মাহমূদ সিন্ধু নদের পাঞ্জাব তীরে তাঁবু গাড়লেন। তার গোয়েন্দাদের চোখে যেমন হিন্দু বাহিনীর বর্ণনা তিনি শুনেছেন, নিজের চোখে দেখেও তিনি হিন্দু বাহিনীকে পরখ করেছেন। হিন্দু বাহিনী এবার বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত। তাই তিনি সেনা কমান্ডারদের উদ্দেশ্যে বললেন– 'এবার হিন্দুরা বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত, তাই আমাদেরকে খুবই ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে অগ্রসর হতে হবে।' তিনি পূর্বের যুদ্ধ পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন এনে সেনাবাহিনীকে কয়েকটি ঝটিকা বাহিনী ও

গেরিলা দলে বিভক্ত করেন এবং কিছুসংখ্যক সৈন্যকে নদীর তীরবর্তী এলাকায় ছড়িয়ে দিলেন। পেশোয়ার ও গজনীর নিরাপত্তার জন্য তিনি নদীকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর প্লান করলেন।

এছাড়া তার সেনা শিবিরের চতুর্দিকে তিনি পরিখা খনন করালেন। শিবিরের ভেতরে মরিচাবন্দী হয়ে প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করাকে সমীচীন ভাবলেন। আরো কিছু নতুন কৌশলের কথা তিনি ভাবছিলেন কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করাও তার জন্য ছিলো ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, প্রতিদিনই নতুন নতুন লোক ও সেনা এসে হিন্দু বাহিনীর সাথে যোগ দিচ্ছিলো।

সুলতান দেখলেন, হিন্দু বাহিনী এখনো যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেনি। আল্লাহর উপর ভরসা করে একদিন ভোরবেলায় ফজর নামাযের পরক্ষণেই এক হাজার তীরন্দাজ ঝটিকা সৈন্যকে শত্রু সেনাদের উপর আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। বাহিনীর সবাই ছিলো ধাবমান অশ্বারোহণ ও লক্ষ্যভেদী তীরন্দাজে পারদর্শী।

৩৯৯ হিজরী মোতাবেক ২৯ রবিউস সানি ১০০৮ খৃস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গারদিজী স্বচক্ষে দেখা সেই যুদ্ধের বর্ণনায় বলেন, মাত্র এক হাজার তীরন্দাজকে আক্রমণে পাঠিয়ে সুলতান যেনো ভিমরুলের চাকে ঢিল দিলেন। শত্রু বাহিনী এদেরকে এভাবেই তুচ্ছজ্ঞান করলো, কোনো গুরুত্বহীন জিনিস লোকেরা যেমন অবজ্ঞাভরে আবর্জনায় ফেলে দেয়।

শত্রুবাহিনীর ৩০ হাজার অশ্বারোহী ১ হাজার মুসলিম তীরন্দাজের উপর হামলে পড়লো। গুরখা জাতি সেই সময় কোনো ধর্ম-কর্ম পালন করতো না। কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিলো, আদিতে তারাও হিন্দুদের অংশ ছিলো। এই বিশ্বাস থেকে হিন্দুদেরই সহযোগী ছিলো গুরখা সমাজ। এরা এতোটাই লড়াকু ও হিংস্র ছিলো যে, শীত-গ্রীষ্ম, পাহাড়-সমতল সবসময় সব জায়গায় খোলা মাথায় কোনো ঢাল ছাড়াই প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। ঐতিহাসিক কাসিম ফারিশতা লিখেন–

গুরখা সৈন্যরা কয়েক মিনিটের মধ্যে সুলতানের অশ্বারোহী তীরন্দাজদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে পাঁচশ' মুসলিম সৈন্যকে শহীদ এবং বহু সেনাকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। সুলতানের ক্যাম্পে গুরখারা ঢুকে পড়ে। কিন্তু সুলতানের পরিখা গুরখাদের পেছনে ফেরা অসম্ভব প্রমাণ করে। সুলতান আশংকা করছিলেন, প্রতিপক্ষের গোটা ফৌজ যদি একযোগে আক্রমণ করে, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে দেবে। সুলতান তার সৈন্যদের নিয়ে

ক্যাম্পে আটকা পড়ে। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি তার বাহিনীকে যেভাবে সাজিয়ে রেখেছিলেন এর সুফল দেখা দিলো। ততোক্ষণ পর্যন্ত সুলতানের প্রধান সেনাপতি আবদুল্লাহ আলতাঈ যে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী রিজার্ভ সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, এরা তখনো গুরখা বাহিনীর বিরুদ্ধে মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হয়নি।

ইঙ্গিত পেয়ে সেনাপতি আবদুল্লাহ আলতাঈ গুরখাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করলেন। শুরু হলো গুরখাদের কচুকাটা করা। ততোক্ষণে গুরখারা ক্ষান্ত হয়ে পড়েছে আর সংখ্যারও যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। গুরখারা জীবন বাঁচানোর জন্য যখন পরিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো, তখন আলতাঈ'র রিজার্ভ সৈন্যরা তীর ও বল্লমের আঘাতে তাদের ধরাশায়ী করছিলো। যুদ্ধের এই অবস্থা দেখে মুসলমানদের সোজা হয়ে দাঁড়ানোর অবকাশ না দেয়ার লক্ষ্যে সকল সেনাকে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়া হলো। মুসলমান শিবিরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আনন্দ পালের জানা ছিলো না। সেখানে তখন গুরখারা কচুকাটা হচ্ছিলো। রাজা আনন্দ পাল বিজয় অবশ্যম্ভাবী ভেবে তার হস্তি বাহিনীসহ নিজে সামনে অগ্রসর হয় এবং তার ঝাণ্ডা আরো উঁচু করে তুলে ধরা হয়।

সুলতানের সেনাপতি আবদুল্লাহ আলতাঈ'র দু'হাজার রিজার্ভ সৈন্যের একটি অংশ রাজা আনন্দ পালের বাহিনীর একপ্রান্তে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঐতিহাসিক ফারিশতা লিখেন, লক্ষাধিক শত্রুর মোকাবেলায় মাত্র ৬ হাজার সৈনিক মোটেও উল্লেখ করার মতো নয়। কিন্তু তদুপরি অলৌকিক ঘটনার মতোই বিস্ময়করভাবে মুসলিম বাহিনী রাজার বিশাল বাহিনীর উপর অল্পক্ষণের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে ফেললো। রাজার বাহন হাতির মুখে বিদ্ধ হলো কয়েকটি তীর। হঠাৎ রাজার হাতির চোখে একটি তীর বিদ্ধ হলে সেটি বিকট চিৎকার দিয়ে পেছনে ফিরে নিজ বাহিনীর মধ্যে দৌড়ঝাঁপ শুরু করলো। রাজার ঝাণ্ডা মাটিতে পড়ে যায়। হিন্দু বাহিনীর ঝাণ্ডা আর উঁচুতে তুলে ধরা সম্ভব হলো না। রাজার হাতির বিকট চিৎকারে অন্যান্য হাতিও ভড়কে গিয়ে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি শুরু করে। ফলে নিজ হস্তি বাহিনীর পায়ের তলায় পিষ্ট হতে লাগলো হিন্দু বাহিনী। রাজার হাতি প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে সবকিছু মাড়িয়ে রাজাকে নিয়ে পিছু পালাতে দেখে অন্যান্য হিন্দু রাজ্যের সেনারা মনে করলো, হয়তো সামনে মুসলমানরা জোরদার হামলা করেছে। তাই রাজা পশ্চাদপসরণ করছে। কিছু না ভেবেই তারা পালাতে শুরু করলো। ভেঙ্গে গেলো সম্মিলিত বাহিনীর চেইন অব কমান্ড।

সম্মিলিত বাহিনী হয়ে পড়লো কাণ্ডারীহীন। তখন ছিলো শীতের মওসুম। ডিসেম্বরের শেষ দিন। পাশের পাহাড়গুলো বরফে ঢাকা। শীতের তীব্রতা ছিলো সমতলের হিন্দুদের জন্য অসহনীয়। এই সময়টার জন্যই সুলতান অপেক্ষা করছিলেন। সুলতান যখন দেখলেন, শত্রু বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে, তখন তিনি তার সকল সৈন্যকে সরাসরি আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন এবং শত্রু বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করার হুকুম করলেন। প্রধান সেনাপতির দু'হাজার রিজার্ভ ফোর্স আর ডেপুটি সেনাপতি আরসালানের অধীনস্ত দশ হাজার আফগান, তুর্কী ও খিলজী সৈন্য হিন্দু বাহিনীর উপর একই সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ততোক্ষণে শত্রুবাহিনী আক্রমণ নয়– আত্মরক্ষা এবং পশ্চাদপসরণে লিপ্ত।

কাসিম ফারিশতা লিখেন– পালাতে গিয়ে হিন্দু বাহিনীর ২০ হাজার সৈন্য নিহত হয়। যারা অস্ত্র সমর্পণ করলো এদের বন্দী করা হলো। সুলতানের নদীর পাড়ের ঝটিকা বাহিনীও ততোক্ষণে এসে মূল বাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছে। সুলতান ইতিপূর্বে কখনো পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দেননি, কিন্তু এবার শত্রুদের তাড়া করার নির্দেশ দিলেন। শত্রু সেনাদের তাড়া করতে গিয়ে মুসলিম বাহিনী নগরকোটে পৌঁছে গেলে তার গোয়েন্দারা জানালো, নগরকোটের এ মন্দিরকে হিন্দু রাজা-মহারাজারা অন্যতম একটি সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করে রেখেছে। এটিকে রক্ষার জন্য হিন্দু সেনাক্যাম্প স্থাপন করেছে। সুলতান একথা শুনে আর অগ্রসর না হয়ে নগরকোট মন্দির অবরোধের নির্দেশ দিলেন।

রাজা আনন্দ পালের সেনা ও কালিঞ্জরের সৈন্যরা ইচ্ছা করলে নগরকোট মন্দিরকে বাঁচাতে পারতো কিন্তু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সুলতান মন্দির অবরোধ করে দূর থেকে এর ভেতরে পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ দেন। মন্দির ও মন্দির রক্ষাকারী সেনাদের অবস্থান ছিলো পাহাড়ের উপর। এ জন্য সুলতানের পক্ষে ওদেরকে সরাসরি আঘাত হানা সম্ভব হচ্ছিলো না। দু'তিন দিন অবরোধ করে প্রধান ফটক ভাঙ্গার জন্য জোরদার আক্রমণ হানলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মন্দিরের লোকজন ফটক খুলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে।

সুলতান মাহমূদ মন্দিরে প্রবেশ করে প্রথমেই মূর্তিগুলোকে পাহাড়ের উপর থেকে নীচের দিকে ফেলে দিলেন। সেগুলো ভেঙ্গেচূড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। নগরকোট মন্দিরে ছিলো সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার। মন্দির থেকে সাত কোটি স্বর্ণের চাকতি বের হলো। স্বর্ণের অলংকার ছিলো মণকে মণ। হীরা-মতি-পান্নাও মণ হিসেবে ওজন করতে হয়েছিল। সুলতান মাহমূদকে পরাজিত করার জন্য হিন্দু পণ্ডিত ও রাজা-মহারাজারা প্রজাদের কাছ থেকে এসব

ধন-সম্পদ সংগ্রহ করেছিলো। হাজরো থেকে নগরকোট পর্যন্ত গোটা অঞ্চল সুলতান ইসলামী শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। সেই যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি সইতে না পেরে রাজা আনন্দ পাল কয়েক দিন পর মৃত্যুবরণ করে।

সুলতান নতুন বিজিত এলাকায় থেকে তার প্রশাসনকে শক্তিশালী করার প্রতি মনোনিবেশ করলেন। ঠিক এ সময় তার কাছে সংবাদ এলো, গৌড় অঞ্চলে মুহাম্মদ নামের এক আফগান শাসক ১০ হাজার সৈন্য সমাবেশ করেছে এবং গৌড়ি সম্প্রদায়ের সব লোক তার সহযোগী হতে শুরু করেছে। সেটিও ছিলো এক গৃহযুদ্ধের খবর। কালবিলম্ব না করে ১০০৯ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ৪০০ হিজরী সনে সুলতান মাহমূদকে বাধ্য হয়েই গজনী ফিরে যেতে হলো এবং আরেকবার নামধারী মুসলিম বেঈমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হলো।

## মানুষ ও শয়তানের লড়াই

নগরকোট মন্দিরের মূর্তি ও হিন্দু আখড়া জয় করে সেখানে ইসলামী শাসন প্রবর্তনের পর সুলতান মাহমূদ গৌড়দের বিদ্রোহ দমনে গজনী ফিরে যাচ্ছিলেন। কারণ, গৌড়ি সম্প্রদায় তার রাজধানী সুরক্ষার প্রশ্নে ঝুঁকি ও হুমকি সৃষ্টি করেছিলো। এটা ছিলো সুলতান মাহমূদের জন্য চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। তিনি যতোবার হিন্দুস্তানে এসে বিজয় নিশান উড়িয়ে এখানে ইসলামী শাসনের ভিত মজবুত করতে চেয়েছেন, ততোবারই সুলতানের অবর্তমানে কোনো না কোনো মুসলিম বেঈমান গজনী আক্রমণে প্রলুব্ধ হয়েছে। ফলে সংবাদ পেয়েই সুলতানকে রাজধানী রক্ষার জন্য গজনী ফিরে যেতে হচ্ছিলো। তিনি হিন্দুস্তানে তার প্রশাসনিক ভিত মজবুত করার অবকাশ পেলেন না।

হিংসাপরায়ণ অমুসলিম ঐতিহাসিকরা তার এই অগত্যা ফিরে যাওয়ার বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রকৃত সত্য উদঘাটন না করে সুলতান মাহমূদের নামে কলংক লেপন করেছে। তারা বলেছে, সুলতান মাহমূদ ধন-সম্পদ লুটতরাজের জন্য মন্দিরে আক্রমণ করতো, মূর্তি ভেঙ্গে দিতো, মন্দিরে স্বর্ণ-মণিমুক্তা যা থাকতো তা সংগ্রহ করতো। তাই লুটতরাজ শেষ হলেই সে পুনরায় গজনী ফিরে যেতো। হিন্দুস্তানে ইসলামী শাসন প্রবর্তনে এবং মুসলমানদের শাসন প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণে সুলতান মাহমূদ আন্তরিক ছিলো না।

দু'হাজার হিন্দু বন্দীকে সাথে করে গজনী ফিরে যাচ্ছিলেন সুলতান। প্রকৃতপক্ষে এরা বন্দী ছিলো না, তখনকার রীতি অনুযায়ী এরা ছিলো দাস।

মহারাজা আনন্দ পাল যুদ্ধে পরাজয়ের পর উপঢৌকন হিসেবে দু'হাজার দাস দিয়েছিলো। তাছাড়া কিছু সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতি সুলতান হিন্দু বাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন আর কিছু হাতি হিন্দু রাজা-মহারাজারা পরাজয়ের পর বশ্যতা স্বীকার করে তাকে উপহার দিয়েছিলো।

যে পরিমাণ সৈন্য নিয়ে তিনি গজনী ত্যাগ করেছিলেন, ফেরার সময় সংখ্যা তার চেয়ে অনেক কম ছিলো। বিজিত এলাকার প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে কিছু সৈন্যকে ওখানে রেখে আসতে হলো। এছাড়া তার কোনো সৈন্য শত্রুর হাতে বন্দী না হলেও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যুদ্ধে শাহাদাতাবরণ করেছিলো।

এই কঠিন সময়ে তার অন্যতম দু'কমান্ডারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। এরা প্রতিপক্ষের হাতে মারাও যায়নি। আবার সুলতান মাহমূদ নগরকোটের প্রশাসনিক কাজেও এ দু'জনকে রেখে আসেননি।

এদের একজন কমান্ডার বুগরা খান আর অপরজন কমান্ডার উলস্তগীন। উভয়েই ছিলো আকর্ষণীয় দেহ-সৌষ্ঠবের অধিকারী টগবগে যুবক। বুগরাখান ছিলো পেশোয়ার অঞ্চলের অধিবাসী। সে গজনী থেকে মাঝে মধ্যে পেশোয়ার যাতায়াত করতো বলে হিন্দুস্তানের স্থানীয় ভাষা বুঝতো এবং অল্প বিস্তর বলতেও পারতো। সুলতান মাহমূদের সৈন্যরা যখন নগরকোট দুর্গ জয় করে, তখন বুগরা খান পার্শ্ববর্তী একটি পাহাড়ের চূড়ায় তার ইউনিট নিয়ে মোতায়েন ছিলো। বুগরা খানের সৈন্যরা যখন দেখলো মুসলমানরা দুর্গের প্রধান ফটক ভেঙ্গে ফেলেছে তখন তার ইউনিটের সৈন্যরা উর্ধ্বশ্বাসে দুর্গের দিকে ঘোড়া ছুটায়। বুগরা খান তার ঘোড়াকে সবার আগে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাড়া দেয়। হঠাৎ ঘোড়া এমনভাবে লম্ফ দিয়ে ছুটতে লাগলো যে বুগরা খান নিজে তাল সামলাতে না পেরে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। তার ঘোড়াটিও বুগরা খানের এভাবে পড়ে যাওয়ায় ভয় পেয়ে তাকে ফেলে দৌড়ে চলে যায়। পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে গিয়ে গড়াতে গড়াতে বুগরা খান নীচে চলে যায়। তার উভয় পা মচকে যায়। শরীরে কয়েক স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তার পক্ষে সোজা হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হচ্ছিলো না। এমতাবস্থায় হিন্দু সৈন্যরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য এদিক-ওদিক পালাচ্ছিলো। হিন্দুদের পালাতে দেখে বুগরা খান ঝোঁপ-ঝাড়ের আড়ালে নিজেকে লুকাতে চেষ্টা করছিলো। কারণ, হিন্দু সৈন্যদের সামনে পড়লে আর তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখতো না।

প্রচণ্ড আঘাত ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে চেতনাবোধ প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলো বুগরা খান। অর্ধচেতন অবস্থায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য সে কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে পালাতে শুরু করেছিলো কিছুই জানা ছিলো না। কখনো বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতো আবার যখনই হুঁশ ফিরে পেতো উঠে একদিকে চলতে শুরু করতো। বারবার চেতনা হারিয়ে ফেলতো। অবচেতন দেহে পড়ে থাকা অবস্থায় কারো হুংকারে চেতনা ফিরে পেলো বুগরা খান। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তরবারীর বাঁটে তার হাত চলে গেলো। কোষমুক্ত করে ফেললো তরবারী। তরবারী মুষ্টিবদ্ধ করে যেই না উঠে দাঁড়াতে চাইলো অমনি ব্যথায় মোচর দিয়ে উঠলো পা। প্রায় ভেঙ্গে গেছে তার একটি পা। তদুপরি ক্ষতস্থান থেকে অনবরত রক্তক্ষরণ ও টানা কয়েক দিনের অনাহার-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে গেছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেও ক্ষণিকের মধ্যেই লুটিয়ে পড়ে বুগরা খান।

"আরে বুগরা খান! মাথা ঠিক করো। কি হয়েছে? আমি আলসতুগীন।" বুগরা খানের নিজের ভাষায় কথা বললো লোকটি। "তুমি এখানে কি করে এলে?"

বুগরা খান কথা বলার চেষ্টা করলো কিন্তু তার মুখে কোনো শব্দই উচ্চারিত হলো না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তার কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। জিহ্বা লেপ্টে গেছে। বুগরা খানের মুখ দেখেই আলাসতুগীন বুঝে নিলো সে খুবই তৃষ্ণার্ত। আলাসতুগীন তার কোমরে বাঁধা পানির পাত্র খুলে তার মুখে ধরলো। কয়েক ঢোক পানি পান করলো বুগরা খান। কিছুক্ষণ পর পুরোপুরি চেতনা ফিরে পেলো। অবস্থার উন্নতি দেখে তার মুখে কিছু খাবার তুলে দিলো আলাসতুগীন।

আলাসতুগীনও বুগরা খানের মতোই একজন সেনা কমান্ডার। সেই সুবাদে বুগরা ও আলাসতুর মধ্যে ছিলো গভীর হৃদ্যতা। সুলতান যখন মন্দির ও দুর্গ অবরোধ করেন, তখন বুগরা খানের যেমন দায়িত্ব ছিলো ইউনিটসহ পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের উপর থেকে যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে ভেতরে ও বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধ করা। অনুরূপ আলাসতুগীনের দায়িত্বও ছিলো নগরকোট থেকে কিছুটা দূরে হিন্দু সৈন্যদের রসদ সামগ্রী আসার পথ রোধ করা এবং পথিমধ্যেই সাহায্যকারী দলকে আটকে রাখা। আলাসতুগীনের অধীনে ছিলো ছোট একটি তীরন্দাজ ইউনিট। এরা ধাবমান ঘোড়ায় চড়েও লক্ষ্যভেদী তীরন্দাজে পারদর্শী ছিলো এবং ছিলো কুশলী যোদ্ধা। একদিন আলাসতুগীন ইউনিটের চোখে পড়লো একটি হিন্দু বাহিনী। তবে এরা নগরকোটের দিকে যাচ্ছিলো না, যাচ্ছিলো নগরকোটের বিপরীত দিকে। আলাসতুগীনের তীরন্দাজ

ইউনিট হিন্দু সেনাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ শুরু করলে ইত্যবসরে এর পাশ দিয়েই অগ্রসরমান একটি পদাতিক সেনাদল দেখা গেলো। ওদের চোখে পড়লো, মুসলিম তীরন্দাজ ইউনিট হিন্দুদের তাড়া করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পলায়নপর হিন্দু অশ্বারোহী আর পদাতিক সৈন্যরা একাকার হয়ে গেলো। অশ্বারোহী আশ্রয় নিলো পলায়নপর পদাতিক সৈন্যদের মাঝে আর পদাতিক সৈন্যরা অশ্বারোহীদের আশ্রয় ভেবে মুসলিম তীরন্দাজদের মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হলো। আলাসতুগীনের জনবল ছিলো হাতেগোনা কয়েকজন। অপরদিকে পলায়নপর হিন্দুরা সংখ্যায় ছিলো অনেক। এরা সবাই জীবন বাঁচানোর তাকিদেই মুসলিম তীরন্দাজদের ঘিরে ফেলে এবং কাবু করে ফেলে। মাত্র কয়েকজন তীরন্দাজ ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে চতুর্দিকের আঘাতে বেসামাল হয়ে পড়লো। অধিকাংশই মারা পড়লো আর অল্প ক'জন জীবন নিয়ে পালাতে সক্ষম হলো। এই পালিয়ে বাঁচাদের একজন ইউনিট কমান্ডার আলাসতুগীন। টানা কয়েক দিন সে সাথীদের খুঁজে ফিরছিলো। কিন্তু অচেনা হিন্দুস্তানের বিশাল জঙ্গলে কোন্ দিকে হারিয়ে গেছে কোনো কূল-কিনারা করতে পারলো না। সেই গহীন জঙ্গলে সে অবচেতন অবস্থায় দেখতে পেলো বুগরা খানকে। আর এই বুগরা খান তারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তার মতোই সেনা কমান্ডার।

পানি ও খাবার গ্রহণ করার পর স্বাভাবিক জীবনবোধ ফিরে পায় বুগরা খান। কিন্তু তার চলার শক্তি ছিলো না। ততোক্ষণে দিন পেরিয়ে রাত হয়ে গেছে।

রাত পোহালে কমান্ডার আলাসতুগীন বুগরা খানকে নেয়ার জন্য এবং নগরকোটের রাস্তা দেখিয়ে দেয়ার জন্য কোনো লোক পাওয়া যায় কিনা এ জন্য ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। রাতেই বুগরা খান তাকে জানিয়ে দিয়েছিলো নগরকোট দুর্গ মুসলমানরা জয় করে নিয়েছে। তাদের অবস্থান থেকে কিছুদূর অগ্রসর হলেই আলাসতুগীন একটি বসতি দেখতে পায়। তাকে লোকালয়ের দিকে অগ্রসর হতে দেখে কিছু লোক তার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে। ওরা ছিলো গ্রামীণ দরিদ্র হিন্দু। মুসলমান সেনা অফিসার দেখে গ্রামের লোকজন তাকে নমস্কার জানাতে থাকে। আলাসতুগীন ইশারা-ইঙ্গিতে ওদের সাথে কথা বলে চারজন যুবককে তার সাথে নিয়ে বুগরা খানের নিকট ফিরে আসে। ততোক্ষণে বুগরা খানের অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে। খানের অবস্থার অবনতি দেখে আলাসতুগীন দু'চারটা শব্দ ব্যবহার করে ওদের কাছে জানতে চাইলো, নগরকোট এখান থেকে কত দূর? হিন্দুরা ইশারা ইঙ্গিতে বুঝালো নগরকোট এখান থেকে বহুদূর এবং অসমতল পাহাড়ী পথ।

চার যুবকের একজন তাদের বললো, এমতাবস্থায় এই আহত ব্যক্তির পক্ষে নগরকোট যাওয়া সম্ভব নয় বরং একে গ্রামে নিয়ে যাই। কিছুটা সুস্থ হলে আমরা তাকে নগরকোট পৌঁছে দেবো। বুগরা খান লাহোরের লোক। সে ওদের কথা পুরোপুরিই বুঝতে পারলো এবং বন্ধু আলাসতুগীনকে ওদের প্রস্তাবের কথা তার ভাষায় বুঝিয়ে দিলো।

হিন্দু যুবকরা এ কথাও বললো, আমাদের গ্রামে এ ধরনের হাড়ভাঙ্গা ও ক্ষতের চিকিৎসা হয় এবং এখানে প্রচুর দুধ ও মধু পাওয়া যায়, যা আহত ও দুর্বল লোককে দ্রুত সারিয়ে তুলে।

মনের দিক থেকে আলাসতুগীন গ্রামে অবস্থানের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। কারণ, এসব গ্রামের মানুষেরা তাদের বশ্যতা স্বীকার করলেও দুশমন সম্প্রদায়ের। এদের বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু বুগরা খানের অবস্থা ছিলো খুবই নাজুক। এ অবস্থায় তাকে নগরকোট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। ফলে বাধ্য হয়েই সে বুগরা খানকে বললো, আপাতত এখানে থেকে যাই।

আলাসতুগীন ছিলো খুবই সতর্ক কমান্ডার। সে হিন্দুদের স্বভাব সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত ছিলো। বুগরা খান তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বন্ধুর জীবন-মরণ পরিস্থিতিতে অনেকটা আবেগপ্রবণ হয়ে গেলো আলাসতুগীন। পরিশেষে অগ্র-পশ্চাৎ এতো কিছু না ভেবে চার যুবককে নির্দেশ দিলে আহত বুগরা খানকে সবাই মিলে কাঁধে তুলে নিলো।

আলাসতুগীন যখন চার হিন্দু যুবককে গ্রাম থেকে নিয়ে গিয়েছিলো, তখন রাস্তার পাশে তিনজন লোক একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে উস্‌খুস্‌ করছিলো। এদের একজন ছিলো নগরকোট মন্দিরের পুরোহিত আর অপর দু'জন নগরকোট দুর্গের শীর্ষস্থানীয় আমলা। মন্দির পতনের ক'দিন আগেই পুরোহিত পাশের এক গ্রামে এসে আশ্রয় নেয়। আর সামরিক আমলা দু'জন এসেছে একদিন আগে। এদের তিনজনকেই গ্রামের হিন্দুরা লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলো। পুরোহিত ও দু'কর্মকর্তা সুলতানের বাহিনীর হাতে সম্মিলিত বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় আর মন্দির দখল করে মূর্তি ভাঙ্গার জন্য মুসলিম সেনাদের বিরুদ্ধে মনের প্রচণ্ড বিদ্বেষে অগ্নিশর্মা রূপ ধারণ করছিলো। এই গ্রামে মুসলিম সেনার উপস্থিতি দেখে এরা আশংকা করছিলো, এখান থেকেও হয়তো তাদের পালাতে হবে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে মুসলিম সেনাকে ফিরে যেতে দেখে দু'কর্মকর্তার উদ্দেশে পুরোহিত বললো, 'আমি যদি তোমাদের মতো সৈনিক হতাম তাহলে কাপুরুষের মতো এখানে এসে লুকিয়ে থাকতাম না। মনে হয় না যে তোমাদের শরীরে

রাজপুত ধারার রক্ত আছে। তোমরা কি দেখেছিলে ম্লেচ্ছদের ঘোড়াগুলো আমদের মন্দিরের প্রধান ফটক ভেঙ্গে কিভাবে প্রবেশ করেছিলো? তোমরা কি দেখেছিলে, দুশমন সৈন্যরা আমাদের কৃষ্ণদেবীর মূর্তিগুলোকে কিভাবে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ফেলে ঘোড়ার পায়ে পিষে টুকরো টুকরো করেছে? আমি নিজ চোখে দেখেছি, ম্লেচ্ছ সৈন্যরা আমাদের সরস্বতী ও ভগবতী মূর্তিকে পায়ের নীচে পিষ্ট করেছে। এক মুসলমান সৈন্য আমাদের মন্দির চূড়ায় উঠে আযান দিয়েছিলো, তা কি তোমরা শুনেছিলে? হয়তো শুনে থাকবে। হয়তো পবিত্র গীতা ও মূর্তি মুসলমানদের পদপিষ্ট হতেও দেখে থাকবে। তোমরা রাজপুত হলে শত্রুদের হাতে জীবন বিসর্জন দিতে কিন্তু জীবন নিয়ে পালিয়ে আসতে না। আসলে তোমাদের কাছে ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার চেয়ে জীবনই বেশি প্রিয়।'

"না না মহারাজ!" এক কর্মকর্তা পণ্ডিতের পায়ের দিকে হাত প্রসারিত করে বললো। "আমরা কাপুরুষ নই পণ্ডিত মহারাজ।"

"হাত সরিয়ে নাও।" ঘৃণাভরে বললো পুরোহিত। "তোমরাও ম্লেচ্ছ। যে সৈনিক নিজ ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারে না, তার স্বজাতির কোনো পল্লীতে থাকার অধিকার নেই। তোমাদের উচিত জঙ্গলের জীব-জন্তুদের সাথে বসবাস করা। তোমরা কি ধারণা করতে পারো, আমি এই তিন কুমারীকে কিভাবে শত্রু বাহিনীর বেষ্টনীর মধ্য থেকে বের করে নিয়ে এসেছি? আমি ওদের চেহারায় কালি মাখিয়ে পুরুষের কাপড় পরিয়ে বের করে নিয়ে আসি। আর যারা মন্দিরে রয়ে গেছে তারা কী কঠিন অবস্থার শিকার হয়েছে, তা কি তোমরা জানো!"

"আমরা এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবো মহারাজ।" বললো অপর কর্মকর্তা।

"হু, তোমরা যদি সত্যিই আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন হতে, তাহলে মন্দির থেকে তোমরা পালিয়ে আসতে না, মন্দির থেকে তোমাদের লাশ বের হতো। তোমাদের আত্মা থাকতো আকাশে। আসলে তোমরাও ম্লেচ্ছ, আত্মপরিচয় লুকিয়ে তোমরা হিন্দু সমাজে বসবাস করছো। দেখো, গজনীর এই সুলতান দেশের অন্য মন্দিরগুলোরও একই অবস্থা করবে। আজ নগরকোট ধ্বংস হয়েছে, আগামীকাল থানেশ্বরের পালা। তোমরা কি জানো, থানেশ্বর আমাদের কাছে এতোটাই পবিত্র মুসলমানদের কাছে মক্কা-মদীনা যেমন পবিত্র। হায়, আজ যদি আমার এই বৃদ্ধ শরীরে শক্তির সঞ্চার হতো, আমি যদি গজনীর মুসলতানকে নিজ হাতে হত্যা করতে পারতাম!"

"এ কাজটি করার জন্যই আমরা এখানে অবস্থান নিয়েছি মহারাজ।" বললো এক কর্মকর্তা। "আমরা পেছনে পড়িনি, ইচ্ছা করেই এখানে থেকে গেছি। আমি সৈনিক নই, আমলা। আমরা যা চিন্তা করি, সৈনিকদের দেমাগে তা কখনো আসবে না। আমরা যতোটুকু আত্মমর্যাদাবোধ লালন করি, তা কোনো রাজা-মহারাজও লালন করে না। জানো, রাজা-মহারাজাদের আত্মমর্যাদাবোধ কম কেন? কারণ, তারা ক্ষমতার পূজারী। মন্দিরের সাথে শাসকদের ভালোবাসা এতোটুকু গভীর নয় মহলের প্রতি তাদের আগ্রহ যতোটুকু তীব্র। রাজমহল যার কাছে বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে, মন্দির তার কাছে গুরুত্বহীন হয়ে যায়। দেখো, সুলতান মাহমূদ কোনো অবতার নয়, একজন মানুষ মাত্র। অথচ নগণ্য একজন মানুষ হয়ে এতোগুলো হিন্দু রাজ্যকে সে পায়ের তলায় পিষ্ট করলো! আমি মনে করি, এই একটি মাত্র মানুষকে যদি শেষ করে দেয়া যায়, তাহলে গোটা গজনী বাহিনী আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইবে।'

"সুলতান মাহমূদ মানুষ হলেও তাকে হত্যা করা সহজ ব্যাপার নয়।" বললো একজন কর্মকর্তা। "আপনার হয়তো জানা নেই আমি দরবেশের বেশ ধারণ করে দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করেছিলাম, কিন্তু মধ্যে কয়েক জায়গায় আমার পথরোধ করা হয়েছে। আমাকে ঘাটে ঘাটে যাচাই করা হয়েছে। প্রত্যেকবার আমি ওদের বলেছি, ভাই! আমি একজন দরবেশ মানুষ, দুনিয়া ত্যাগী। সুলতানকে মোবারকবাদ জানাতে এসেছি। অনেক অনুরোধের পর সিপাহীরা আমাকে তাদের কমান্ডারের কাছে নিয়ে গেলো। কমান্ডার আমাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের পর আমার শরীর তল্লাশি করে চোগার ভেতর লুকিয়ে রাখা খঞ্জর বের করে এনে বললো, দরবেশের পরিচয় দিচ্ছো, তাহলে সাথে অস্ত্র কেন? আমি বললাম, যে ধর্মের একজন সুলতান দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে একের পর এক রাজ্য দখল করে এতোদূর পর্যন্ত মূর্তিপূজা বন্ধ করতে এসেছেন, সেই ধর্মের একজন অনুসারীর কাছে কি এই অস্ত্রটুকুও থাকবে না, তা কি করে হয়? আমি একজন খাঁটি মুসলমান। আর প্রত্যেক মুসলমানের কাছে আত্মরক্ষামূলক হাতিয়ার থাকা অলংকার। এতো কৌশলে কথা বলার পরও সে আমাকে এক দারোয়ানের হাতে তুলে দিলো। আমি তখন অনুভব করলাম, গজনীর সুলতানের কাছে পৌঁছা মোটেই সহজ কাজ নয়, তাকে হত্যা করা তো দূরের কথা। ব্যর্থ হয়ে অবশেষে আমাকে ফিরে আসতে হয়েছে।"

"আমরা এখন এখানেই থাকবো।" বললো অপর কর্মকর্তা। "এখানে থেকে আমরা অপেক্ষা করবো। সুলতান অবশ্যই বিজিত এলাকা দেখার জন্য বের হয়ে এখানে আসবেন। তখন হয় দূর থেকে তীর মেরে হত্যা করবো, নয়তো কাছে

গিয়ে খঞ্জর দিয়ে তাকে হত্যা করবো। আমরা নিজেদের জীবনের মায়া করি না মহারাজ। যদি আমাদের দু'জনের জীবনের বিনিময়েও হয়...।"

"এটা করতে পারলে তোমরা পরজনমে এদেশের মহারাজা হবে।" বললো পুরোহিত। "ব্রাহ্মণ ও রাজপুতরাও তোমাদের পায়ে মাথা ঠেকাবে।" পণ্ডিত একটু গম্ভীর হয়ে ভেদকথা বলার মতো করে বললো, "আমিও এ কথাই ভাবছিলাম, কিভাবে ওই একটি মাত্র লোককে হত্যা করা যায়। আমার সাথে যে তিন তরুণী এসেছে তোমরা কি তাদের সৌন্দর্য দেখেছো? আমি ভাবছি, কি করে ওদেরকে উপঢৌকন হিসেবে সুলতানের কাছে পৌছানো যায়। ওরা সেখানে পৌছতে পারলে তার খাবারে বিষ প্রয়োগ করতে পারতো।"

"অসম্ভব।" বললো এক কর্মকর্তা। "আমাদের বলা হয়েছে, এই সুলতান নাকি পাথরের মতো কঠিন। মদ ও নারীর প্রতি তার মোটেও আসক্তি নেই। এ জন্য তার সৈন্যরা কোনো অঞ্চল জয় করলেও সেখানকার কোনো নারীর ইজ্জতের উপর কোনো আঘাত হানে না। কোনো নারীর সম্ভ্রমহানির ঘটনা ঘটে না। সুলতান মাহমূদকে নারীর ফাঁদে ফেলা সম্ভব নয়। অন্য কোনো পথ ভাবতে পারেন।"

"অথচ নারী আর মদই আমাদের মহারাজাদের ডুবিয়েছে।" বললো পুরোহিত। "আর মুসলমানদের বিজয়ের মূল কারণ হলো তারা মদ ও পরনারী ভোগকে ঘৃণা করে। তদুপরি আমাদের কিছু একটা করতেই হবে। আমাদের আরো ভাবতে হবে। আমি রাতে ঘুমাতে পারি না। জীবনভর যে কৃষ্ণমূর্তির পূজা করে কাটিয়েছি, নিজের চোখের সামনে তাদের অমর্যাদা হতে দেখেছি। এ জন্য এদেশের উপর ভগবানের অভিশাপ পড়বে, আমার উপর পড়বে, তোমাদের উপরও পড়বে।"

নগরকোট মন্দির সুলতানের বাহিনী পদানত করেছে প্রায় ৮/১০ দিন হয়েছে। ক'দিন ধরে এই হিন্দু কর্মকর্তা ও পুরোহিত পাহাড়ের পাদদেশের এই পল্লীতে আত্মগোপন করে আছে। হিন্দু দু'কর্মকর্তা তাদের বেশ বদল করে দু'-দু'বার পাহাড়ের উপরে অবস্থিত দুর্গে গিয়েছিলো সুলতান মাহমূদকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু সুলতানকে হত্যা করার কোনো সুযোগ তারা পায়নি। এরপরও তারা হতোদ্যম হয়নি। পণ্ডিতের কথাও তাদের হতাশাগ্রস্ত করেনি। সুলতান বিজিত এলাকা পর্যবেক্ষণে বের হলে দূর থেকে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করার মানসে দু'কর্মকর্তা দু'টি ধনুক, প্রয়োজনীয় সংখ্যক তীর সংগ্রহ করেছে। এলাকাটি ছিলো জঙ্গলাকীর্ণ এবং উঁচু-নীচু অসংখ্য পাহাড়ে

বেষ্টিত। আড়াল থেকে তীর নিক্ষেপ করে লুকিয়ে পড়া কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

ইত্যবসরে আলাসতুগীন পল্লী থেকে চার যুবককে নিয়ে ফিরে আসে। দূর থেকে পুরোহিত ও দু'কর্মকর্তা ভেবেছিলো, গজনীর এই সেনা হয়তো চার যুবককে বেগার খাটানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর এই তিন হিন্দু দেখতে পেলো, পল্লীর চার যুবক এক ব্যক্তিকে কাঁধে করে নিয়ে আসছে। হিন্দু কর্মকর্তারা আলাসতুগীনকে এবার চিনে ফেলে। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে তারা লুকিয়ে পড়লো। আলাসতুগীন যখন গ্রামে পৌঁছলো তখন গ্রামের অন্যান্য লোকজনও এসে জড়ো হলো। বুগরা খানকে একটি চৌকিতে শুইয়ে দেয়া হলো। গ্রামের দু'বৃদ্ধা তার আঘাত ও ক্ষতস্থান দেখতে লাগলো। একটু পরীক্ষা করে তারা ক্ষতস্থানের চিকিৎসা শুরু করে দিলো।

আলাসতুগীনের বলে দেয়া কথায় বুগরা খান দুই বৃদ্ধাকে তাদের ভাষায় বললো, গ্রামের লোকজন যদি তাদের সাথে কোনো ধরনের দুরভিসন্ধিমূলক কিছু করে, তাহলে সারা গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাইকে পাইকারী হারে হত্যা করা হবে।

"আপনারা আমাদের শাসক-প্রভু। গোটা গ্রামের মানুষ আপনাদের সেবায় একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। উল্টো-সিধা করার দুঃসাহস কে করবে? আমরা এর চেয়েও বেশি আঘাতের সুচিকিৎসায় দক্ষ। কোনো চিন্তা করবেন না। ৪/৫ দিনের মধ্যে আপনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবেন।"

আলাসতুগীন ও বুগরা খানের জন্য একটি ঝুঁপড়ির মতো ঘর খালি করে সেটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হলো। গ্রামের লোকজনের কাছে সবচেয়ে উন্নত যে বিছানা ছিলো, তাই তাদের জন্য বিছিয়ে দেয়া হলো। রাতে শুয়ে শুয়ে আলাসতুগীন বুগরা খানকে বললো, প্রত্যুষে সে সেনা ক্যাম্পে গিয়ে বুগরা খানকে এখানে থেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু বুগরা খান তাতে আপত্তি করে বললো, তাকে একাকী ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না। একাকীত্বের সুযোগে গ্রামের লোকজন তাকে গায়েব করেও দিতে পারে, নয়তো ক্ষতস্থানে বিষ প্রয়োগ করে ক্ষতি করতে পারে।

দীর্ঘ ক্লান্তি, ক্ষুধা, পিপাসায় কাতরতার কারণে দু'কমান্ডার কিছুক্ষণ পরই গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। কিন্তু তাদের ঘর থেকে কিছুটা দূরেই অপর একটি ঘরে হিন্দু পুরোহিত, কর্মকর্তা ও চিকিৎসক ক্ষীণ আওয়াজে সলাপরামর্শ করছিলো। পুরোহিত অন্যদের বললো, এই দু'সেনা অফিসারকে আমরা নিজেদের

কাজে ব্যবহার করতে পারি। সেই কৌশল আমাদের জানা আছে। যার দ্বারা কোনো কাপুরুষকেও বাহাদুর আর বাহাদুরকে কাপুরুষে পরিণত করা যায়। সুলতানকে যদি তার নিজের লোকজনের দ্বারা হত্যা করানোর ব্যবস্থা করা যায়, তবে সেটিই হবে সবচেয়ে উত্তম। বললো এক কর্মকর্তা। কারণ, আমরা অনেক চেষ্টা করে দেখেছি, সুলতানের কাছে যাওয়া অপরিচিতের জন্য খুবই কঠিন।

"তোমরা দু'জন শোন!" বৃদ্ধ দু'চিকিৎসককে বললো পুরোহিত। "এ দু'কমান্ডারকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে দেয়া যাবে না। আমাকে একটি ঘোড়া দাও, আমাকে এখনই থানেশ্বর যেতে হবে। ঘোড়াটা এমন সামর্থবান হতে হবে, যেনো দ্রুত আমি সেখানে যেতে পারি এবং দ্রুত ফিরে আসতে পারি।" দু'কর্মকর্তাকে পুরোহিত বললো, "তিন কুমারীকে আমি তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। এদের করণীয় সম্পর্কে আমি ওদের বুঝিয়ে বলে যাবো। তোমরা অন্যান্য দিকে খেয়াল রেখো।"

গ্রামের এক লোককে ইশারা করলে তিন তরুণীকে কমান্ডারদের ঘরে নিয়ে আসা হলো। পণ্ডিত তরুণীদের করণীয় কর্তব্য বুঝিয়ে দিলো। এরই মধ্যে ঘোড়া প্রস্তুত করে নিয়ে আসা হলো। পুরোহিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে দ্রুত চলে গেলো।

ভোরবেলায় আলাসতুগীন ঘুম থেকে ওঠে দেখলো বুগরা খান ব্যথায় কোকরাচ্ছে। আলাসতুগীন বৃদ্ধ চিকিৎসকদের ডাকার জন্য ঘর থেকে বের হতে যাবে, তখনই দরজার পাশে দেখলো দু'তরুণী দাঁড়ানো। আলাসতুগীনকে দেখে ওরা সলজ্জ হাসলো। সুন্দরী তরুণীদের দেখে আলাসতুগীনের চোখ ছানাবড়া। এক তরুণী তার উদ্দেশে কিছু বললেও সে পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে রইলো। তার চেহারা দেখেই মনে হলো সে কিছুই বুঝেনি। অপর তরুণী মাথা ঝুঁকিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলো এবং উভয়েই ভেতরে প্রবেশ করে বুগরা খানের পাশে গিয়ে বসলো।

এক তরুণী বুগরা খানের মাথা হাতে নিয়ে বললো, খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি? অপরজন তার হাত নিজের হাতে নিয়ে নিলো। বুগরা খান ঘটনার আকস্মিকতায় নির্বাক হয়ে গেলো। তার মুখ থেকে কোনো কথাই বের হলো না। ব্যথায় সে যে কুঁকাচ্ছিলো, তাও ভুলে গেলো।

"এদের কেউই আমাদের ভাষা বুঝে না।" তরুণী অপর সঙ্গীকে বললো।

"না না, আমি তোমাদের ভাষা বুঝি। কিন্তু আমি তামাদের মতো এমন সুন্দরী তরুণীদের দেখে ভেবে পাচ্ছিলাম না এই জঙ্গলে তোমাদের মতো রূপসী কোত্থেকে এলো? মনে হয় তোমরা এই গ্রামের বাসিন্দা নও।"

“এ জঙ্গলেই আমাদের জন্ম।” বললো এক তরুণী। “এই জঙ্গলে কেউ বিপদে পড়লে, কেউ কোনো আঘাতপ্রাপ্ত হলে আমরা তার সেবা-শুশ্রূষা করে থাকি। আচ্ছা, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে?”

“ব্যথা খুব বেশি।” জবাব দিলো বুগরা খান এবং তরুণীর হাত তার হাতে তালুবদ্ধ করে নিলো।

“খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন। ঠিক আছে, আমরা আপনার খাবার নিয়ে আসছি।” এই বলে উভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

তরুণীরা যখন খাবার নিয়ে প্রবেশ করলো, তখন ওরা তিনজন। একজনের হাতে হাত-মুখ ধোয়ার পানি, অপর দু'জনের হাতে পানাহার সামগ্রী। খাবারের মধ্যে অন্যতম ছিলো মধু মেশানো দুধ।

এক তরুণী বুগরা খান ও আলাসতুগীনের হাত-মুখ ধুইয়ে দিলো। উভয়েই দুধপান করলো এবং খাবার ও ফলফলাদি আহার করলো। তরুণীরা খাবারের শূন্যপাত্র তুলে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই বুগরা খানকে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠতে শোনা গেলো। আলাসতুগীন বুগরা খানের হাসি শুনে গভীরভাবে তার চেহারার দিকে তাকিয়ে নিজেও হেসে ফেললো। দীর্ঘদিন পর দু'বন্ধু এভাবে প্রাণখোলা হাসলো। কারণ, হাজারো রণাঙ্গনে তাদের পরাজয় যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিলো তখন গজনী বাহিনীর কারো বেঁচে থাকার আশা ছিলো না। কিন্তু রাজা আনন্দপালের হাতির চোখে তীরবিদ্ধ হলে সেটি যখন বিকট আর্তচিৎকার দিয়ে ওদের বাহিনীকেই পদপিষ্ট করতে শুরু করলো আর রাজার ঝাণ্ডা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো; তখন হিন্দু বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পালাতে শুরু করে।

আলাসতুগীন ও বুগরা খানের প্রতি শত্রু বাহিনীকে তাড়া করার নির্দেশ হলে তারা নিজ নিজ ইউনিটকে নিয়ে শত্রু বাহিনীর পিছু ধাওয়া করে। সেই যুদ্ধে তাদের বহু সহযোদ্ধা শাহাদাতবরণ করেছে। ফলে তাদের হৃদয় থেকে হাসি উধাও হয়ে গিয়েছিলো। সেই যুদ্ধে কোনো বিরতি না দিয়ে সকলকে নগরকোটের দিকে অগ্রাভিযানের নির্দেশ হলো। সেখানে পৌঁছেও কঠিন যুদ্ধ করতে হলো। মৃত্যু যখন চোখের সামনে থাকে, তখন মানুষ কাঁদে। কিন্তু এই দু'কমান্ডার কাঁদার লোক ছিলো না। তারা গজনী থেকে পাহাড়, নদী, জঙ্গল, সমতল ভূমি এবং শত্রু বাহিনীর বাধা ডিঙ্গিয়ে বিজয়ের বেশে নগরকোট পর্যন্ত পৌঁছেছে। এখন বিজিত এলাকার এই ঝুপড়িতে বসে বুগরা খান যখন অট্টহাসিতে মেতে উঠলো, তখন বন্ধুর তাৎপর্যপূর্ণ হাসি দেখে আলাসতুগীনও হেসে ওঠে। আলাসতুগীন বুগরা খানের উচ্ছ্বাসিত হাসিতে আন্দাজ করে, দীর্ঘ ক্লান্তিকর যুদ্ধ

তাদের হৃদয় থেকে হাসি কেড়ে নিয়েছিলো, চাপা দিয়ে রেখেছিলো তাদের প্রাণোচ্ছ্বল আবেগ। যুদ্ধ আর খুনাখুনিই নয়, এখন তাদের ইচ্ছে করে আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠতে, জীবনকে উপভোগ করতে।

বুগরা খান বন্ধু আলাসতুগীনকে জানালো, তার ব্যথা অনেকটাই কমেছে। আলাসতুগীন দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলো। বুগরা খানের বুঝতে বাকি রইলো না বন্ধু কিসের জন্য দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু তরুণীর বদলে ঘরে প্রবেশ করলো তাদের চিকিৎসক দুই বৃদ্ধ। এদের দু'জনকে গ্রাম্য অশিক্ষিত মনে হলেও হাবভাব দেখে মনে হলো পেশাগত কাজে তারা খুবই দক্ষ। তারা ঘরে প্রবেশ করে বুগরা খানের ক্ষতস্থান থেকে পট্টি খুললো, ভাঙ্গা পা দেখলো এবং শেষে দু'জন রায় দিলো, সম্পূর্ণ সেরে উঠতে আরো দিন দশেক লাগবে।

তাদের থেকে কিছুটা দূরে আরেকটি ঝুপড়ি ঘরে দু'হিন্দু কর্মকর্তার সামনে তিন তরুণী উপবিষ্ট। এক কর্মকর্তা তরুণীদের উদ্দেশে বললো, "তোমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। দু'তিন দিন ওদের কাছে বেশিক্ষণ থাকবে না। তাহলে ওদের সন্দেহ হতে পারে। দুধ নিজেরা পান করে পরীক্ষা করে নিও। স্বাদে কোনো তারতম্য ঘটলে তাতে আরো দুধ দিয়ে বেশি করে মধু মিশিয়ে নিও।"

"নেশা ধরানোর ব্যাপারে তোমরাই তো যথেষ্ট। দুধে নেশা মেশানো ছাড়া তোমরাই ওদের নেশাগ্রস্ত করার জন্য যথেষ্ট।" বললো অপর কর্মকর্তা।

"খেয়াল রেখো, তোমরা যেনো আবার নেশায় আক্রান্ত না হয়ে যাও।" বললো অপর কর্মকর্তা। "কারণ উভয়েই কিন্তু তাগড়া যুবক।"

"হয়তো এর চেয়েও আরো কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে তোমাদের।" বললো এক কর্মকর্তা। "নিজের দেশ ও জাতির প্রয়োজনে তোমাদের এই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এখন তোমাদের কর্তব্য হলো, পণ্ডিত মহারাজের আসা পর্যন্ত ওদেরকে এখানে আটকে রাখা। পণ্ডিতজী একজন দক্ষ ঋষিকে সাথে নিয়ে আসবেন। তিনি এসে এদেরকে ভক্তে পরিণত করবেন। এরপর দেখো, এদের হাতেই আমরা সুলতানকে হত্যা করাবো।"

সুলতান মাহমূদের দুই খ্যাতিমান কমান্ডার হিন্দুদের চক্রান্তের ফাঁদে আটকে গেলো। দু'তিন দিনের মধ্যেই এরা তাদের কর্তব্য, দায়িত্ব ও অভিষ্ট লক্ষ্যের কথা বিস্মৃত হয়ে গেলো। তারা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি, দুধ ও মধুর সাথে মিশিয়ে তাদেরকে প্রতিদিন নেশাজাতীয় দ্রব্য পান করানো হচ্ছে। এরা যেহেতু শরাব পানে অভ্যস্ত ছিলো না, তাই দুধ ও মধুর সাথে মেশানো সামান্য শরাবেই ওরা

আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতো। সেই সাথে রূপসী তিন তরুণীও ওদের মধ্যে সৃষ্টি করে প্রচণ্ড কামনার নেশা।

এভাবে যখন প্রায় সপ্তাহ চলে গেলো। একদিন এক তরুণী বুগরা খান এবং আরেক তরুণী আলাসতুগীনের গায়ে গা মিশিয়ে আবেগ ও বিনয়ী কণ্ঠে নিবেদন করলো, তাদেরকে যেনো সাথে করে গজনী নিয়ে যাওয়া হয়। দু'কমান্ডার এ কথাও ভাবতে পারেনি যে, এই এলাকার মানুষই তো সব কালো। এর মধ্যে সুন্দরী তরুণী আসলো কিভাবে। ওদের জন্মদাতাই বা কে?

দুই বৃদ্ধ বুগরা খানের সেবা-শুশ্রূষা করছিলো আর চিকিৎসা অব্যাহত রাখছিলো। এরই মধ্যে বুগরা খান অনেকটাই সুস্থ হয়ে ওঠে। সে এখন নিজে নিজে হাঁটা-চলাফেরা করতে পারে। তবুও এ গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার কথা একবারও ভাবনায় আসেনি। কমান্ডার আলাসতুগীনের মনও ঝুপড়ির বেড়াজালে বন্দী হয়ে গেছে। একদিন উভয় বন্ধু তরুণীদের বললো, রাতের বেলায় তারা যেনো এ ঘরে একবার আসে। তরুণীরা বললো, রাতের বেলায় এদিকে পা বাড়ালে মা-বাবা তাদের প্রাণে রাখবে না। তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে শুধু সেবা-শুশ্রূষা করতেই দিনের বেলা আসতে দেয়।

আসলে প্রশিক্ষিত এই তরুণীরা গজনী বাহিনীর দুই কমান্ডারের সুপ্ত কামনাকে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করছিলো। যুদ্ধক্লান্ত দুই কমান্ডারের জন্য তরুণীরা মরিচীকা হয়ে দেখা দিলো। তারা যেভাবে উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে দু'কমান্ডারের প্রতি ভালোভাসা ও মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতো, তাতে কমান্ডারদের মধ্যে প্রেমের দুর্বিনীত আকর্ষণ সৃষ্টি করে। যৌবনে উদ্দীপ্ত দুই যুবক কমান্ডার যখন রূপসী-তরুণীদের নাঙ্গা কাঁধের উপর বিক্ষিপ্ত রেশমী চুলগুলো নিয়ে খেলা করতো, তখন ভেতরে ভেতরে তাদের মধ্যে কামনার দানব তর্জন-গর্জন শুরু করে দিতো। তারা আবেগে কাঁপতো। আন্দোলিত হতো তাদের দেহ-মন।

এদিকে এদের অবস্থান থেকে কিছুটা দূরে একটি বিশাল মন্দির মূর্তিশূন্য করে সেখানে আযান চালু করেছিলেন সুলতান মাহমূদ। আর এখানে তারই দুই কমান্ডার হিন্দুদের চক্রান্তে পড়ে জ্যান্ত-মূর্তির পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

একদিন বুগরা খান তার সেবারত তরুণীকে বললো, "তোমরা আমাকে লাশের দুর্গন্ধ আর রক্তের হোলিখেলা থেকে তুলে এমন পরিবেশে নিয়ে এসেছো, এখানকার ঝুপড়িটাও আমার কাছে রাজমহলের মতো সুখ দিচ্ছে।"

"আপনি চাইলে আমরা আপনাকে সত্যিকার মহলেই নিয়ে যেতে পারবো।" তরুণী বললো। "কিন্তু আমরা যা-ই করি তাতে আপনি আপত্তি করবেন না।" এ

কথা বলেই তরুণী চলে যায়। পুনরায় একটি পেয়ালা হাতে নিয়ে এলো এবং বুগরা খানের সামনে রেখে বললো, "পান করুন। এটি এই মাটির বুনো ফলের রস। এই এলাকা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বুগরা খান পেয়ালা হাতে নিয়ে কয়েক ঢোক পান করতেই তরুণী পেয়ালা ছিনিয়ে নিয়ে বললো, "এই রস এক সাথে বেশি পান করা ঠিক নয়।"

জীবনে এমন স্বাদের কোনো জিনিস বুগরা খান পান করেনি। কিছুক্ষণ পরই তার মধ্যে একটা ফুরফুরে আনন্দ দোল খেয়ে যায়। হঠাৎ সে তরুণীকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে বলে, "এখন আমি চলাফেরা করতে পারি কিন্তু তোমাদের ছেড়ে যাবো না। সুলতান যদি আমাকে তোমাদের ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেয়, তাও আমি মানবো না।"

"আপনি কি কখনো শরাব পান করেছেন? শুনেছি মুসলমানরা শরাব পান করে না।"

"হু, শরাবকে অভিশম্পাত করি আমি। তোমরা থাকতে আমার শরাবের কোনো প্রয়োজন নেই।" বললো বুগরা খান।

"আমি আপনাকে শরাবই তো পান করিয়েছি। বলুন তো এমন শরাবকে কেনো আপনারা হারাম মনে করেন?"

বুগরা খান শরাব পানের কথা শুনে গম্ভীর হয়ে যায় এবং ভাবনায় পড়ে গেলো। তরুণী বুগরা খানের আরো ঘনিষ্ঠ হতে থাকলো এবং বুগরা খানের চোখের সামনে নিজেকে মেলে ধরলো। খানের চোখে চোখ রাখতেই বুগরা খান ভুলে গেলো হালাল-হারামের বিধি-বিধান।

"আলাসতুগীন!" বন্ধুকে ডাকলো বুগরা খান।

আলাসতুগীন ছিলো ঝুঁপড়ির অপর কক্ষে। সে বন্ধুর ডাকে চলে এলো। বুগরা খান তাকে পেয়ালা দেখিয়ে বললো, "দেখো! সুন্দরীরা কী চমৎকার পানীয়কে শরাব বলছে। নাও, আমি পান করেছি, তুমিও পান করো। ভারী মজার জিনিস।"

আলাসতুগীন বন্ধুর কথায় পেয়ালা হাতে তুলে নিলো এবং পেয়ালার অবশিষ্টটুকু গলাধঃকরণ করলো। কিছুক্ষণ পর বুগরা খানের মতো সেও স্বপ্নীল জগতের বাসিন্দা হয়ে গেলো।

গজনী বাহিনীর দু'কমান্ডার নিজেদের জন্য শরাব হালাল করে নিলো। তারা

এটিকে শরাব বলতেই নারাজ। পরদিন দু'তরুণী তাদের ঘরে প্রবেশ করে দু'জনকে তাদের মুখোমুখি বসিয়ে বলতে লাগলো, "আমরা এ গ্রামের অধিবাসী নই। আমাদের অভিভাবকরা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। আপনাদের সৈন্যরা যখন নগরকোট মন্দির অবরোধ করে তখন আমরা মন্দিরে পূজা দিতে যাচ্ছিলাম। অবরোধের কথা শুনে আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং নিজ বাড়িতে না গিয়ে এই পল্লীতে নিয়ে আসে। গ্রামের লোকজনকে বলে, গজনী বাহিনী নগরকোট দুর্গ অবরোধ করে এমতাবস্থায় তরুণী মেয়েদের নিয়ে যাতায়াত করা ঝুঁকিপূর্ণ। আপনারা আমাদের মেয়েদেরকে হেফাজত করুন। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে আমরা মেয়েদের নিয়ে যাবো। আমাদের সাথে অপর যে মেয়েটিকে দেখছেন, ও আমাদের প্রতিবেশী। আমাদের অভিভাবক আমাদের নিতে এসেছেন। আপনারা দু'জন আমাদের সাথে চলুন। আমরা বললে আপনাদেরকে নিতেও রাজি হয়ে যাবে।"

বুগরা খানকে তরুণীদ্বয় বললো, আপনি আপনার বন্ধুকেও ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলুন।

বুগরা খান তরুণীদের প্রস্তাবের কথা আলাসতুগীনকে নিজের ভাষায় জানালে সে বললো, "আমরা সেনাবাহিনীর লোক। ওদের সাথে আমাদের যেতে দেখা অবস্থায় আমরা ধরা পড়লে আমরা গাদ্দার ও পক্ষত্যাগী সৈনিক হিসেবে চিহ্নিত হবো। সেনা আইনে আমাদের মৃত্যুদণ্ড হবে। এই তরুণীরা যদি আমাদের সাথে থাকতে চায় তাহলে ওদের এখানেই থাকতে বলো। এদেরকে আমাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থার কথা চিন্তা করবো। ওদের উচিত আমাদের সাথে থাকা।"

তরুণীদ্বয় হতাশ হয়ে চলে গেলো। একটু পর তাদের ঝুঁপড়িতে প্রবেশ করলো দুই প্রবীণ। তারা বললো, "আমরা দু'জন এ মেয়েগুলোর অভিভাবক। ওরা হয়তো আমাদের পরিচয় দিয়েছে। এই যুবতী মেয়েদেরকে নিয়ে রাস্তায় বের হওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তাই আপনারা যদি আমাদের সাথে থাকেন তাহলে রাস্তায় মেয়েদের কেউ অপহরণ করার চিন্তাও করবে না। আপনারা এর বিনিময়ে যা চান তাই দেয়া হবে।"

"আমরা তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি কিন্তু পুরস্কার হিসেবে এই মেয়ে দুটোকে চাই। এ প্রস্তাব যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তাহলে একাই চলে যেতে পারো।" বললো বুগরা খান।

“এদের জন্যই তো আমরা এতটা ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি হয়েছি আর এতটা ঝুঁকি নিতে চাচ্ছি।” বললো একজন। “আমরা মেয়েদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো কোন্ যুক্তিতে!”

“রাখো তোমাদের যুক্তি। তোমরা মেয়েদেরকে এখান থেকে নিতেই পারবে না।” ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো বুগরা খান।

* * *

সেদিন রাতের ঘটনা। উভয় তরুণী বুগরা খান ও আলাসতুগীনের পাশে বসে তাদেরকে শরাব পান করাচ্ছিলো। শরাবের নেশায় উভয়েই ছিলো নেশাগ্রস্ত। ঝুঁপড়ির দরজা ছিলো খোলা। রাতের প্রথম প্রহরের পর ঝুঁপড়িতে সন্ন্যাসীর মতো এক লোক প্রবেশ করে। লম্বা চুল ও চোয়াল ভরা দাড়ি। লোকটি চোগা পরিহিত। হাতে লম্বা লাঠি। লাঠির মাথায় কাঠের তৈরি সাপের প্রতিকৃতি। তরুণীদ্বয় সন্ন্যাসীকে দেখেই চকিতে ওঠে এসে তার পায়ে হাত রেখে প্রণাম করে এবং বুগরা খান ও আলাসতুগীনকে জানায়, “ইনি একজন সন্ন্যাসী। এপথে হঠাৎ করে আসেন। কেউ তার ঠিকানা জানে না এবং তার ধর্মের কথাও বলতে পারে না। এই সন্ন্যাসী ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন। জঙ্গলের সাপও তার কথা শুনে। রাজা-মহারাজা তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কিন্তু তিনি দুনিয়ার কোনো সুখ-আহ্লাদ ভোগ করেন না। জঙ্গলেই থাকেন।”

“তোমার তো জীবিত থাকার কথা ছিলো না। এতোটাই উপর থেকে তুমি পড়েছিলে যে মৃত্যুর আশংকা এখনো পুরোপুরি কেটে যায়নি। এসো, আমার কাছে এসো।” বললো সন্ন্যাসীরূপী লোকটি।

সন্ন্যাসী বুগরা খানকে তার সামনে বসিয়ে প্রদীপটি কাছে টেনে নিলো। সে পকেট থেকে একটা হীরার মতো কিছু বের করে বুগরা খান ও তার মাঝখানে এমনভাবে ধরলো যে, প্রদীপের আলো পড়তেই সেটি থেকে বিভিন্ন রঙ বিচ্ছুরিত হতে থাকে। রঙের এই খেলা ছিলো খুবই মনোহরি।

সন্ন্যাসী বুগরা খানকে বললো, “এদিকে তাকাও এবং হীরাটি দেখতে থাকো। লক্ষ্য করো, এর মধ্যে তুমি জীবন-মৃত্যুকে নিজের চোখে দেখতে পাবে। আমি পরীক্ষা করে দেখবো, কোন্ ঘরে আছে তোমার আত্মা– মৃত্যুর ঘরে না জীবনের ঘরে।”

হীরের টুকরো থেকে বিচ্ছুরিত রঙ আর সন্ন্যাসীর কথার মধ্যে এমন জাদু ছিলো যে বুগরা খান আত্মহারা হয়ে যেতে লাগলো। অর্ধ অবচেতন তো সে শরাব পান করেই হয়েছিলো। এবার সন্ন্যাসীর কথা ও জাদুকরী হীরের ঝিলিকে

সে সম্পূর্ণ আত্মহারা হয়ে গেলো। সে মোটেও আন্দাজ করতে পারেনি যে, সন্ন্যাসী নিষ্পলক তার চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সন্ন্যাসী হীরের টুকরোটিকে উপরের দিকে তুলে তার চোখের সামনে রাখলো। বুগরা খান হীরার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। একসময় সন্ন্যাসী হীরের টুকরোটিকে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেললো। কিন্তু বুগরা খান তা মোটেও টের পেলো না। এবার বুগরা খান এক পলকে সন্ন্যাসীর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সন্ন্যাসী এখন যা বলছে, চোখের দৃষ্টির মাধ্যমে তা বুগরা খানের ভেতরে প্রবেশ করছে। তার মধ্যে সৃষ্টি করছে স্বপ্নালুতা। সন্ন্যাসীর বলার ধরনও ছিলো মোহনীয়। সন্ন্যাসী এভাবে কথা বলছিলো যে, সে কোনো স্বপ্নিল জগতে বিচরণ করছে।

এক পর্যায়ে বুগরা খান বলতে শুরু করলো, "হ্যাঁ হ্যাঁ, এইতো আমি জান্নাত পেয়ে গেছি। আমার কাছ থেকে এ জান্নাত কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। হ্যাঁ, আমিই গজনীর বাদশাহ। আমি খুন করে ফেলবো। আমার তরবারী অনেক দিন কাউকে হত্যা করে না...।"

পাশে বসে আলাসতুগীন দেখছিলো সন্ন্যাসীর কর্মকাণ্ড। কিন্তু সে এসবের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলো না। শুধুই অবাক হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে ছিলো।

এবার বুগরা খানকে ছেড়ে দিয়ে আলাসতুগীনকেও অনুরূপ পরীক্ষার নামে জাদুকরী প্রভাবে স্বপ্নিল জগতে বিচরণ করালো সন্ন্যাসী। কিছুক্ষণ পর সেও বুগরা খানের মতোই স্বপ্নিল জগতে বিচরণ করতে লাগলো।

মানুষ যখন অপরাধ ও পাপের মাধ্যমে নিজের কর্তব্যকে চেপে রাখে তখন ভোগবাদিতার স্বপ্নিল জগতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করে না। পাপাচার ও মদের বিস্ময়কর কার্যকারিতা হলো এসব মানুষের আত্মশক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়। অমুসলিমরা শত শত বছর আগে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে যে স্বপ্নময় পাপাচারের দ্বারা আকৃষ্ট করতো, কৌশলের ধরন পরিবর্তন হলেও আজও সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

ইসলাম একটি আদর্শ, সৎ চরিত্রের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে ইসলামের ভিত্তি। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের পদানত করার জন্য পাপাচারের মনোহরি দিকটাকেই ব্যবহার করে। পাপাচারের মধ্যে এমন দুর্বিনীত আকর্ষণ রয়েছে যে, তা মানুষের দুর্বলতাগুলো উস্কে দেয় এবং আত্মশক্তিকে দুর্বল করে ফেলে। মুসলমানদের দুর্বলতা ও মূল শক্তির উৎসকে অগ্নিপূজারী পৌত্তলিক ও ইহুদীবাদীরা চিহ্নিত করে এগুলো নিঃশেষ করার নব নব কৌশল উদ্ভাবন করছে।

ইহুদীরা মুসলিম মেধা ও শক্তিগুলোকে ধ্বংস করার জন্য তাদের সুন্দরী ললনাদের ব্যবহার করেছে। খৃষ্টানরা মুসলিম তরুণদের বিভ্রান্ত করতে আজও তাদের সুন্দরী কন্যা-জায়াদের ব্যবহার করে। মুসলিম তরুণদেরকে আজও চক্রান্তকারী ইহুদী-খৃষ্টান-পৌত্তলিকরা মদের নেশা, নারী আর ধন-সম্পদের টোপ দিয়ে আদর্শচ্যুত করছে। ওদের মনোলোভা ফাঁদে পড়ে মুসলিম মিল্লাতের বহু বাঘা বাঘা সমাজপতিও ধ্বংস হয়ে গেছে।

বুগরা খান ও আলাসতুগীনের দেমাগ দুই রূপসী শরাব খাইয়ে আগেই কব্জা করে নিয়েছিলো। ওরা আক্ষরিক অর্থেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। উভয়েই আত্মশক্তি ও বোধ হারিয়ে ফেলেছিলো। যোগী সন্ন্যাসীদের জাদুকরী তৎপরতা আজও বহাল রয়েছে। জাদুকরী প্রভাব প্রয়োগ করে এরা লাঠিকেও সাপে পরিণত করতে পারে। সমবেত বহুজনকে জাদু করে এরা বিভ্রান্ত করতে পারে। এখন তো জাদু একটি শিল্প হিসেবে সারা দুনিয়া জুড়ে আদৃত।

এই জাদুকরদের নিয়ে আসার জন্য দু'আমলাকে এখানে রেখে তারা অজ্ঞাত স্থানে চলে গিয়েছিলো। শুরুতে পুরোহিত তরুণীদের অভিভাবক হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করে। তরুণী দু'জন বুগরা খান ও আলাসতুগীনকে তাদের সাথে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে উভয়েই তা প্রত্যাখ্যান করলো। এরপরই এদেরকে জাদু করে অন্ধভক্তে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেয় পুরোহিত। মদ ও নারীর প্রভাব আগেই তাদেরকে আদর্শচ্যুত করে ফেলেছিল, বাকিটা যোগী এসে জাদু প্রয়োগ করে পূর্ণ করলো।

ভোরের আলো বিকশিত হওয়ার আগেই রওয়ানা হয়ে যাওয়া এই কাফেলা নগরকোট থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছিলো। বুগরা খান ও আলাসতুগীন ঘোড়ার পিঠে আর অন্যরা উটের পিঠে আরোহণ করেছে। হিন্দু পুরোহিত ও তার দুই আমলা সঙ্গীসহ জাদুকরও কাফেলার সহযাত্রী। বুগরা খান ও আলাসতুগীন রাজপুত্রের মতো মাথা উঁচু করে রাজকীয় চালে অশ্বের উপর উপবিষ্ট। ওরা তো আনন্দে আত্মহারা আর যারা ওদেরকে জাদুকরী প্রভাবে গোলামে পরিণত করেছে, ওদের মুখে হাসি নেই; ওরা কার্য সিদ্ধি চূড়ান্ত করণের চিন্তায় মগ্ন।

কাফেলা চলতে চলতে মাঝে-মধ্যে পথে থামতো, আবার চলতো। আর বিশ্রামের সুযোগে বুগরা খান ও আলাসতুগীনকে পানীয় ও খাবারে নেশাদ্রব্য খাওয়ানো অব্যাহত রাখলো। ধীরে ধীরে এরা নিজেদের ধর্ম-দেশ ও আদর্শ ভুলে অন্ধকারে তলিয়ে যেতে লাগলো।

এক সময় কাফেলা থানেশ্বর পৌঁছলো। সেই যুগে থানেশ্বর মন্দির ছিলো ভারতের বিখ্যাত মন্দিরগুলোর শীর্ষ দু'টির একটি। হিন্দুরা থানেশ্বর মন্দিরকে মুসলমানদের কাবা'র মতোই সম্মান করতো। থানেশ্বর মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের জানা ছিলো, গজনী বাহিনীর দু'কমান্ডারকে নেশাগ্রস্ত করে থানেশ্বর নিয়ে আসা হচ্ছে। এদের হাতে মাহমূদ গযনবীকে হত্যা করানো হবে। কেননা, নিজ বাহিনীর ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি ছাড়া কারো পক্ষে সুলতান মাহমূদের ধারে-কাছে যাওয়া সম্ভব নয়।

বুগরা খান ও আলাসতুগীনের জন্য মন্দিরের পাতালপুরীতে দু'টি কক্ষ সাজানো হলো। কক্ষ দু'টিকে রাজমহলের আদলে খুশবো ও বাহারী আসবাবপত্রে সাজানো হলো। তুলতুলে নরম বিছানার উপর গেলাফ বিছানো হলো। ছাদে ঝুলিয়ে দেয়া হলো রঙিন ফানুস। দুই কমান্ডার সেখানে পৌঁছলে তাদেরকে রাজকীয় অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হলো। অভ্যর্থনাকারীরা তাদের গমন পথে মাথা অবনত করে কুর্নিশ করলো। তাদের সাজানো কক্ষে পৌঁছে দেয়ার সাথে সাথেই কিছু মহিলা সেবার জন্য এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু এরা তরুণী নয়, বয়স্ক মহিলা।

কাফেলা থানেশ্বর পৌঁছার পরই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হিন্দুদের আলাদা করে তাদের জানালো, সুলতান মাহমূদ গজনী চলে গেছে। সামান্য কিছু সংখ্যক সৈন্য নগরকোট রেখে গেছে। এটা জানা সম্ভব হয়নি, তাড়াতাড়ি সে ফিরে আসবে নাকি দীর্ঘ সময় সেখানে থাকবে। এমতাবস্থায় এদেরকে এখানে রাখার মধ্যে কোন লাভ আছে বলে মনে হয় না।

"সুলতান অবশ্যই আসবে পণ্ডিত মহারাজ!" বললো দুই আমলা। "এই দুই লোক আমাদের হাতে এসে গেছে। এদেরকে আমরা নিজেদের মতো করে তৈরি করতে পারবো। এরা আমাদের উপকারে আসবে। এদের দিয়েই আমরা মাহমূদকে খুন করাতে পারবো।"

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর হিন্দু পুরোহিত ও সন্ন্যাসী জাদুকর ও আমলাদ্বয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, বুগরাখান ও আলাসতুগীনকে থানেশ্বর মন্দিরেই রাখা হবে এবং এদের দিয়ে সুলতান মাহমূদকে হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

সুলতান মাহমূদ জরুরী খবর পেয়ে গজনী চলে এলেন। গজনীর পশ্চিমে গৌড় নামের একটি পাহাড়ী এলাকা শাসন করতো মুহাম্মদ বিন সূরী। মুহাম্মদ বিন সূরী সুলতান মাহমূদকে হিন্দুস্তানে ব্যস্ত দেখে দশ হাজার সদস্যের এক সৈন্য

বাহিনী নিয়ে গজনীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এসে তাঁবু গাড়লেন। তাঁবুর চারপাশে পরিখাও খনন করলেন তিনি। তাছাড়া তার তাঁবুর তিনদিকেই ছিলো উঁচু পাহাড়। শুধু একদিকে পরিখা ও পাহাড় ছিলো না। চতুর্দিকে প্রাকৃতিক পাহাড়ী প্রতিরক্ষার কারণে মুহাম্মদ সূরীর তাঁবুটি দুর্গের মতো সুরক্ষিত প্রমাণিত হলো। ফলে তাঁবু থেকে কিছু সংখ্যক সৈন্য বেরিয়ে গজনী বাহিনীর উপর ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে দ্রুতগতিতে তাঁবুতে ফিরে যেতো। এভাবে তারা গজনী বাহিনীর চৌকিগুলোতে একের পর এক আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করে তুলে।

দু'দিন গজনী সেনাদের দু'টি দল আক্রমণকারীদের তাড়া করে তাঁবু পর্যন্ত নিয়ে গেল কিন্তু তাঁবুর চতুর্দিকে পরিখা থাকায় আর সামনে অগ্রসর হতে পারলো না। যে পথটা ছিলো সেদিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করতেই সেখানে থাকা তীরন্দাজরা তাদের উপর তীরবৃষ্টি বর্ষণ করলো। কিছুক্ষণ তীর নিক্ষেপের জবাবে তীর নিক্ষেপ করে ফিরে আসা ছাড়া কোন উপায় ছিলো না। গজনীর সৈন্যরা পেরেশান হয়ে গেলো সূরীদের আক্রমণে। সূরী বাহিনী গজনী বাহিনীর শক্তি ক্ষয় করে দুর্বল করার পর এক সময় আক্রমণ করে গজনী দখল করার চিন্তা করছিলো। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে গজনীর নিরাপত্তায় নিয়োজিত সেনাপতি সুলতানকে বিষয়টি অবহিত করা জরুরী মনে করলেন।

সূরীদের গজনী আক্রমণের সংবাদ সুলতান মাহমূদের কাছে যখন পৌঁছল, তখন তিনি নগরকোট মন্দির ও সেনা শিবির অবরোধ করেছেন মাত্র। গজনী আক্রান্তের খবর শুনে সুলতানের মাথায় বাজ পড়লো। তিনি নগরকোটে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। প্রচণ্ড আক্রমণের কারণে নগরকোট দুর্গবাসীরা প্রতিরোধে টিকতে না পেরে হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পণ করলো। দ্রুত মন্দির থেকে সব মূর্তি ফেলে দিয়ে দুর্গ দখল শেষে সেনাবাহিনীকে দু'ভাগে ভাগ করে একটি অংশ নিজের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য আলাদা করলেন আর একটি অংশ নগরকোট দুর্গের প্রশাসন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নিয়োগ করলেন।

এমনিতেই সুলতান মাহমূদের যাত্রা হতো অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে। কিন্তু সে দিনের মতো আর কখনো সুলতান মাহমূদকে এতোটা ক্ষুব্ধ দেখা যায়নি। অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে সুলতান মাহমূদ গজনীতে পৌছে গেলেন। রাস্তায় তিনি সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, আমাদের সফর হবে খুবই দ্রুত। তাই তোমরা চলাবস্থায়ই সওয়ারীগুলোকে ফসলের ক্ষেতের মধ্যদিয়ে ছেড়ে দিও। উট, ঘোড়া, হাতিগুলো যাতে চলতে চলতে কিছুটা খেয়ে নিতে পারে। আর পদাতিক সৈন্যদেরকে তিনি বলে দিয়েছিলেন, তোমরা পথিমধ্যে কোন বসতি পেলে তাদেরকে খাবার দিতে নির্দেশ দিবে।

সুলতান মাহমূদ যুদ্ধ করতেন প্রতিপক্ষের সৈন্যদের সাথে। শাসকরাই হতো তার প্রতিপক্ষ। সাধারণ নাগরিকদের জন্য তিনি কখনো কষ্টের কারণ হননি। বরং তার সৈন্যরা বেসামরিক নাগরিকদের জান-মালের নিরাপত্তা দিয়েছে। কিন্তু এবার তিনি গজনী আক্রান্তের কথা শুনে স্বজাতি গাদ্দার ও পরাজিত আনন্দ পালের মৈত্রী চুক্তিবিরোধী তৎপরতায় চরম ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন। দ্রুত গজনী পৌঁছানোর জন্য তার সৈন্য ও সওয়ারদের এর বিকল্প ছিলো না।

সূরীদের ধারণার চেয়ে অনেক আগে সুলতান মাহমূদ গজনী পৌঁছে গেলেন। গজনী পৌঁছেই তিনি মুহাম্মদ বিন সূরীকে দূতের মাধ্যমে এই বলে পয়গাম পাঠালেন যে, "জাতির গাদ্দারদের পরিণতি কখনো ভালো হয় না। ইসলামী সালতানাতকে টুকরো টুকরো করে শাসনকারী ক্ষমতালিপ্সুদের পায়ের তলা থেকে শুধু ক্ষমতার মসনদই দূরে সরে যায় না, মাটিও থাকে না। জাতিকে প্রতারিত করে স্বজাতির মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে লিপ্তকারীদের শাস্তি দুনিয়াতেই ভোগ করতে হয়। সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে হাতে কুরআন নিয়ে অঙ্গীকারকারী শাসকদের রাজমহলই এক সময় জাহান্নামে পরিণত হয়।... নিজের আখেরাত ও জাগতিক মঙ্গল চাইলে শত্রুতা না করে আমাকে সহযোগিতা করো। চলো আমার সাথে হিন্দুস্তানে। সেখানে মুহাম্মদ বিন কাসিমের আযাদ করা মুসলিম বসতিগুলো এখন মূর্তি পূজারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। চলো সেখানে গিয়ে পরিত্যক্ত বিরান মসজিদগুলোকে আবাদ করি এবং বিভ্রান্ত মুসলমান ও হিন্দুদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের পথ দেখাই।... আমি তোমাদের কাছে আবেদন করছি না। বেঈমানী ও ঈমানের সওদাগরী তোমাকে যেদিকে ঠেলে দিচ্ছে, আমি এর অশুভ পরিণতি দেখতে পেয়ে তোমাকে সতর্ক করছি। ক্ষমতার মোহ তোমাদের এমন আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে যে, কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ তোমাদের নামে অভিশাপ বর্ষণ করবে। আমি তোমাকে দু'দিনের অবকাশ দিচ্ছি। আমার সহযোগী হতে চাইলে এসো। নয়তো সৈন্যদের নিয়ে গজনী ছেড়ে চলে যাও।"

সুলতানের দূত যখন মুহাম্মদ বিন সূরীর কাছে পয়গাম নিয়ে গেলো, সূরী রাজকীয় ভঙ্গীতে দূতের কাছ থেকে পয়গাম নিয়ে বললেন, "মৈত্রী চুক্তির জন্য পয়গাম নিয়ে এসেছো?" সূরীর প্রশ্নে দূত নীরব রইলো।

এক নিঃশ্বাসে মুহাম্মদ বিন সূরী সুলতানের পয়গাম পড়ে অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে বললো, "তোমাদের সুলতান কি আমাকেও আনন্দপ াল আর বিজি রায় মনে করেছে! যাও, ওই ভূতটাকে বলো, মুহাম্মদ বিন সূরী তোমার কথায় রাজি

নয়। যদি সাহস থাকে তাহলে তুমি এসো। আমরা ফিরে যাওয়ার জন্য এখানে আসিনি।"

মুহাম্মদ বিন সূরী এক পর্যায়ে হুংকার দিয়ে দূতকে বললো, "যাও! ওই গোলামের পুত্র গোলামকে বলো, সে যেনো তাড়াতাড়ি এখানে এসে আমার সাথে দেখা করে এবং আসার সময় গজনী সালতানাতকেও যেন একটি পাত্রে করে নিয়ে আসে।"

সূরীদের কাছ থেকে সুলতান মাহমূদ এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করেননি। যুদ্ধ জয়ের চেয়ে এরা বেশি পারদর্শী ছিলো লুটতরাজে। সুলতান মাহমূদের পিতা সুলতান সুবক্তগীনের শাসনামলেও গোরীরা গজনীর আশপাশের এলাকায় লুটতরাজ করতো। এ পর্যায়ে সুলতান মাহমূদ এদেরকে চূড়ান্ত শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এর আগে কোনদিন গোরীরা গজনীর আশপাশে এসে সৈন্য সমাবেশ করার সাহস করেনি। এবারই প্রথম মুহাম্মদ বিন সূরী দশ হাজার গোরী সৈন্য নিয়ে গজনীর পার্শ্ববর্তী ময়দানে তাঁবু গাড়লো। সুলতান মাহমূদ তার দুই সেনাপতি জেনারেল আলতুনতাস ও জেনারেল আরসালান জাযেবকে বললেন, আমি গোরী শাসকদেরকে চূড়ান্ত শিক্ষা দিতে চাই। আপনারা এ জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিন।

সুলতান মাহমূদ বেশভূষা বদল করে সূরীদের ক্যাম্প পর্যবেক্ষণ করার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তিনি সূরীদের ক্যাম্প নির্মাণের কৌশল ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখে মনে মনে ওদের প্রশংসা করলেন। সেই সাথে ওদের শিবিরকে কবরস্তানে পরিণত করার বিষয়টিও ভাবতে লাগলেন। কিন্তু সূরীদের শিবির উজাড় করার বিষয়টি তার দৃষ্টিতে মোটেও সহজসাধ্য মনে হচ্ছিলো না।

অনুরূপ একটা শিবির সুলতান খিদরী নামক স্থানে স্থাপন করেছিলেন। সে সময় শত্রুবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করে বটে কিন্তু তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারেনি বরং শত্রুবাহিনীই নাস্তানাবুদ হয়। সূরীদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ এবং শিবির স্থাপন কৌশল দেখে সুলতান চিন্তান্বিত হলেন। তিনি পর্যবেক্ষণ শেষে শিবিরে পৌঁছে সেনাধ্যক্ষদের বললেন, শত্রুবাহিনী মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে শিবির স্থাপন করেছে, ওদেরকে শিবির থেকে বের করে আনা সহজ হবে না।

সারারাত চললো সামরিক কৌশল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা। অবশেষে শেষরাতের মধ্যেই সৈন্যদের যাত্রা শুরুর নির্দেশ দিলেন তিনি। সৈন্যদেরকে শত্রু শিবির থেকে কিছুটা দূরে পূর্ণ রণপ্রস্তুতিতে থাকার নির্দেশ দিলেন। সকাল বেলা তিনিও

গিয়ে সৈন্যদের সাথে যোগ দিলেন। সেখানে পৌছার সাথে সাথেই আক্রমণের হুকুম দিলেন সুলতান। কিন্তু সূরী সৈন্যরা সুলতানের বাহিনীকে ওদের ক্যাম্পের ধারে কাছে যেতেও দিলো না। শেষ পর্যন্ত যে অংশে পরিখা নেই সেই অংশে একযোগে হামলে পড়ার নির্দেশ দিলেন। সূরীর সৈন্যরা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। তারা সুলতান মাহমূদের সৈন্যদের নাজেহাল করতে লাগলো।

সূরীরা ছিলো সুবিধা মতো স্থানে। তারা শিবির থেকে বেরিয়ে এসে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। কঠোর আক্রমণের মুখে পিছু চলে যেতো। মুখোমুখি ছাড়া আর কোন দিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ করা সম্ভব ছিলো না। কারণ, তাদের শিবিরটি ছিলো তিনদিকে পাহাড় বেষ্টিত, সেই সাথে তাদের শিবিরগুলো পরিখা দিয়ে সুরক্ষিত।

দিনের প্রথম প্রহরে সহযোদ্ধা দুই জেনারেলকে নতুন একটি চালের কথা বললেন সুলতান। সেই কৌশল মতো যুদ্ধের কায়া বদলে ফেললেন। সুলতান নিজেও সেনাদলের মধ্যভাগে আক্রমণে শরীক হলেন। মুহাম্মদ বিন সূরী সুলতানকে এগিয়ে আসতে দেখে তার আক্রমণ প্রতিহত করতে আরো দু'টি ইউনিটকে শিবিরের বাইরে গিয়ে আক্রমণ করতে নির্দেশ দিলো। তখন পর্যন্ত সূরীরা প্রাধান্য বজায় রেখেছিলো আর সুলতানের বাহিনী ছিলো অনেকটা চাপের সম্মুখীন।

তুমুল সংঘর্ষ বেঁধে গেলো গজনী ও সূরী বাহিনীর মধ্যে। এক পর্যায়ে সুলতান ধীরে ধীরে পিছু হটতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি এমন নির্দেশ দিলেন যে, তার সৈন্যদেরকেও এ নির্দেশ হতবাক করলো। হঠাৎ তিনি নিজেই চিৎকার দিয়ে বললেন, "বন্ধুরা সবাই পালাও, সূরীরা নয়তো কাউকে জীবিত রাখবে না।" এ কথা বলে তিনি নিজেও ঘোড়া ঘুরিয়ে পিছু ছুটলেন। তার সারি থেকে আরো কয়েকজনের কণ্ঠে এ ধরনের আহ্বান শোনা গেলো।

সূরীদের কানেও গেলো এই আওয়াজ। মুহাম্মদ বিন সূরী সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছিলো। অবস্থাদৃষ্টে সে গজনী বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করার নির্দেশ দিলো। বললো, ওদের কাউকেই গজনী ফিরে যেতে দিও না। মাহমূদকে আমার সামনে জীবিত ধরে আনো, আর গজনীর প্রতিটি ইট খুলে ফেলো।

বিজয়ের আতিশয্যে সকল সূরী সৈন্য শিবির থেকে বেরিয়ে পড়লো। শিবির হয়ে পড়লো সৈন্যশূন্য। প্রায় মাইল তিনেক দূরে গিয়ে সুলতান মাহমূদ পিছুহটা মুলতবী করে পূর্ব নির্দেশ মতো পলায়নপর সৈন্যদেরকে পশ্চাদপসরণ না করে

ঘুরে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলেন। সুলতানের সকল কমান্ডারের জানা ছিলো, এই পশ্চাদপসারণ সুলতানের একটা রণচাল। সুলতান ঘুরে দাঁড়িয়েই তাকে ধাওয়াকারী সূরী সৈন্যদের উপর বজ্র আক্রোশে হামলে পড়লেন। শুরু হলো তুমুল মোকাবেলা। এদিকে জেনারেল আরসালান এই সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলেন। তিনি পেছন ঘুরে সূরীদের একপাশে আক্রমণ করলেন, আর অপরজন সূরীদের শিবিরে প্রবেশের পথ বন্ধ করে দিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেন, রণকৌশলে অনভিজ্ঞ সূরী বাহিনী সুলতানের দূরদর্শী ফাঁদে আটকে যায়। বস্তুত এবার গজনী বাহিনীর হাতে সূরী বাহিনী কচুকাটা হতে লাগলো।

সেদিনের সূর্য ডোবার আগেই সূরীদের সূর্য চিরদিনের জন্য ডুবে গেলো। মুহাম্মদ বিন সূরী পালানোর অবকাশ পেলো না। একটি খাদের আড়াল থেকে দু'জন অনুচরসহ মুহাম্মদ বিন সূরীকে পাকড়াও করে সুলতানের সামনে হাজির করা হলো।

মুহাম্মদ! মাত্র একদিন আগে আমি তোমাকে যা লিখেছিলাম, তা আজ বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। তোমাকে পরাজিত করে আমি মোটেও উৎফুল্ল নই। এই লড়াইয়ে যে রক্তক্ষয় হয়েছে সেই রক্ত অন্য কাজে ব্যবহার করা উচিত ছিলো। আল্লাহর এই বিষয়টা আমি বুঝতে পারি না, শাসকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিরপরাধ নাগরিকদের কেন ভোগ করতে হয়!

সুলতান মাহমূদ বলছিলেন আর এদিকে মুহাম্মদ বিন সূরীর শরীর নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলো। প্রথমে তার মাথা হাঁটুর ফাঁকে ঝুঁকে পড়লো। এরপর গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে এবং একটা কাঁপুনী দিয়ে শরীরটা নিথর হয়ে গেলো। প্রহরীরা তাকে ধরে উঠাতে গেলো। দেখা গেলো, তার চোখ উল্টে গেছে এবং তার শরীর থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

মুহাম্মদ বিন সূরীর সাথে তার যে দু'জন অনুচর ছিলো তারা জানালো, সূরীর হাতের আংটিতে একটি বিষাক্ত হীরা ছিলো। পরাজয় ও পাকড়াও অনিবার্য হয়ে পড়ায় সে আংটির হীরাটি খুলে গিলে ফেলে। ঠিক সেই সময়ই সৈন্যরা আমাদের পাকড়াও করে এখানে নিয়ে আসে।

১০১০ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ৮০১ হিজরী সনের গ্রীষ্মকালে সংঘটিত হয়েছিলো এই যুদ্ধ।

হিন্দুস্তান থেকে গজনী ফিরে আসার মধ্যে ছয়-সাত মাস কেটে গেছে। এর মধ্যে সুলতান মাহমূদের কাছে খবর আসতে লাগলো, দিল্লী থেকে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে থানেশ্বরে একটি বিশাল মন্দির রয়েছে। সেখানে নানা ধরনের মূর্তি

রয়েছে। বিশেষ করে বিষ্ণু দেবতার মূর্তিকে মানুষ আদমের চেয়েও বেশি পুরনো মনে করে। সেটির বেদীতে পূজা দেয়ার জন্য বহু দূর থেকে পূজারীরা আসে এবং বিষ্ণুকে পূজা দিতে পারলে হিন্দুরা মুসলমানদের কাবা জিয়ারতের মতো পুণ্যলাভ করে বলে সুখানুভব করে।

পৌত্তলিকতা বিরোধী আকীদা ও বিশ্বাসের কারণেই সুলতান মাহমূদ সকল মূর্তি ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই সাথে তার গোয়েন্দারা তার কাছে রীতিমতো খবর পাঠাচ্ছিলো যে, নগরকোট ও খিদরোর যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর হিন্দুরা হতোদ্যম হয়ে পড়েছে। চোখের সামনে তাদের দেব-দেবীদের এহেন দুর্গতি ও ধ্বংসের পরও মুসলমানদের কোন ক্ষতি না হওয়ায় অনেকেই হতাশ। সেই সাথে মুসলিম সৈন্যরা তাদের সামনে অসংখ্য গরুকে জবাই করে খেয়ে ফেলে। যে গরুকে হিন্দুরা গো-মাতা বা গো-দেবতা হিসেবে পূজা করে এবং তারা গরুর গোশত খাওয়া হারাম মনে করে।

সুলতানের সৈন্যরা তাঁর কাছে খবর পাঠাতে লাগলো, গোটা হিন্দুস্তানের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। গোটা জাতিই ভীতসন্ত্রস্ত। অবস্থা এমনই ভয়াবহ যে, আকাশের গর্জন শুনেও এরা মূর্তির সামনে হাত জোড় করে কান্নাকাটি শুরু করে দেয় নিরাপত্তা কামনা করে। এই পরিস্থিতিটা সুলতান মাহমূদের সহায়ক ছিলো। সূরীকে চিরদিনের জন্য নিঃশেষ করে দীর্ঘ বিশ্রাম না নিয়েই তিনি পেশোয়ারের দিকে অভিযানের নির্দেশ দিলেন। পেশোয়ার পৌঁছেই তিনি বেরা ও নগরকোটে দু'জন পয়গাম বাহক আর দূতকে পাঠালেন। নগরকোটের সৈন্যদের বলা হলো সম্পূর্ণ রণপ্রস্তুতি নিয়ে রাখতে। কারণ, সুলতান থানেশ্বর অভিযান চালাতে আসছেন।

বিশেষ দূতকে রাজা আনন্দ পালের রাজধানী পাঞ্জাবে পাঠানো হলো এই সংবাদ দিয়ে যে, সুলতানের বাহিনী পাঞ্জাবের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করবে। চুক্তি অনুযায়ী রাজা আনন্দ পালের কর্তব্য হলো, সুলতানের বাহিনীর নিরাপদে পথ অতিক্রম করার ব্যবস্থা করা। তাদের গমন পথে যেনো কেউ বাধা বিপত্তি সৃষ্টি না করে। সেই সাথে আনন্দ পাল অন্যান্য হিন্দুরাজ্যের সৈন্য একত্রিত করে যেনো মৈত্রী বাহিনী গঠনের চেষ্টা না করে। আনন্দ পাল এ ধরনের কিছু করলে বোঝা যাবে রাজা চুক্তি ভেঙ্গে দিয়েছেন। তাহলে সুলতানের কর্তব্য হয়ে পড়বে বাটান্ডা ও পাঞ্জাবে অভিযান চালিয়ে লাহোর ও পাঞ্জাবের দ্বিতীয় রাজধানী বাটান্ডার প্রতিটি ইট খুলে ফেলা।

রাজা আনন্দ পাল তার এক ভাইয়ের নেতৃত্বে দু'হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সজ্জিত একটি বাহিনীকে পাঠায় সুলতান মাহমূদকে অভ্যর্থনার জন্য। সেই সাথে

দলনেতার কাছে এই পয়গাম লিখে পাঠালো যে, এ আমার ভাই এবং দূত। একে আপনার কাছে এই অনুরোধসহ পাঠাচ্ছি যে, "থানেশ্বর আমাদের একটি পবিত্র মন্দির ও বড় পুণ্যস্থান। আপনার ধর্ম যদি আপনাকে অন্যদের ধর্মালয় ধ্বংসের নির্দেশ দিয়ে থাকে, তবে নগরকোট ধ্বংস করে আপনি সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, থানেশ্বরের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করুন। এর পরিবর্তে আপনাকে আমি প্রতি বছর খাজনা দেবো। তাছাড়া আপনার বাহিনীর থানেশ্বর আসা-যাওয়ায় যতো খরচ হতো সবই আমি অগ্রিম দিয়ে দেবো। এর বাইরেও আমি আপনাকে পঞ্চাশটি হাতি ও মূল্যবান মণিমুক্তা উপঢৌকন দেবো।"

ঐতিহাসিক ফারিশ্‌তা লিখেন, সুলতান মাহমূদ আনন্দ পালের প্রস্তাবে লিখেন– "আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ থেকে আমার প্রতি নির্দেশ হলো, যেখানেই মূর্তিপূজা হয় সেখানে যাও এবং মূর্তি ধ্বংস করে দাও। এক্ষেত্রে আমার রাসূলের দৃষ্টিভঙ্গী হলো, মূর্তি ভাঙ্গার প্রতিদান আখেরাতে আল্লাহ্ দেবেন। মূর্তি না ভাঙ্গার অঙ্গীকার করে আপনার কাছ থেকে আমার পক্ষে কোন উপঢৌকন নেয়া সম্ভব নয়। থানেশ্বর মন্দিরের মূর্তিগুলো ধ্বংস না করার পক্ষে আমার কাছে কোন যৌক্তিক কারণ নেই।"

রাজা আনন্দ পাল যখন মণি-মুক্তা ও খিরাজের লোভ দেখিয়েও থানেশ্বর আক্রমণ থেকে সুলতান মাহমূদকে নিবৃত করতে পারলো না, তখন দিল্লী, আজমীর, কনৌজেও রাজা-মহারাজাদের কাছে এই বলে দূত পাঠালো যে, গজনীর সুলতান বিনা উস্কানিতে থানেশ্বর মন্দির আক্রমণের জন্য ভারতের সীমানায় প্রবেশ করেছে। থানেশ্বরের বিষ্ণু মন্দির ধ্বংস করাই তার এবারের আক্রমণের উদ্দেশ্য।

* * *

এদিকে থানেশ্বরে সুলতান মাহমূদ গযনবীকে হত্যার সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। ১০১১ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ৮০৬ হিজরী সন। সুলতান নগরকোট থেকে গজনী ফিরে যাওয়ার এখনও বছর পূর্ণ হয়নি। এতো দিনের মধ্যে তার দু'কমান্ডার বুগরা খান ও আলাসতুগীন রাজধানীতে ফিরে না আসায় তাদের পরিবারে সংবাদ দেয়া হলো, তাদের নিহত হওয়ার কোন প্রমাণ সেনাবাহিনীর হাতে নেই। সম্ভবত তারা হিন্দুদের হাতে বন্দী রয়েছে।

ওরা তো আসলে হিন্দুদের বন্দী ছিলো না– ছিলো শাহজাদা হিসেবে। জাদুটোনা ও নেশাগ্রস্ত করে এদেরকে থানেশ্বর মন্দিরে এনে দু'টি রাজকীয়

আসবাবপত্রে সাজানো কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের সেবার জন্য দেয়া হয়েছে উদ্ভিন্ন যৌবনা সেবিকা।

বুগরা খানের পায়ের যখম ঠিক হয়ে গিয়েছিলো। সে এখন রীতিমতো হাঁটা-চলা ও সওয়ার হতে পারছে। বুগরা খান স্থানীয় হিন্দুদের ভাষা জানতো। এ জন্য সে-ই তাদের মেজবানের সাথে কথাবার্তা বলতো। দুই বন্ধু মিলে আড্ডা দিয়ে গল্পগুজব করে আর মদ ও নারীর মদির নেশায় সময় কাটিয়ে দিতো।

যে দুই তরুণী ওদের দু'জনকে পথ ভুলিয়ে প্রেমের ছলনা ও নেশাদ্রব্য খাইয়ে থানেশ্বর মন্দিরে নিয়ে আসে, ওদের থানেশ্বর পৌঁছে দিয়ে এই তরুণীদ্বয় ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। কয়েকদিন ওদের জায়গায় নতুন তরুণীদের দেখে অবশেষে বুগরা খানকে তার বন্ধু আলাসতুগীন বললো, ওদের জিজ্ঞেস করো, আগের সেই তরুণীরা কোথায়। ওদের না পেলে আমি এখানে থাকবো না, আমাদের সেনাবাহিনীতে ফিরে যাবো।

যে জাদুকর দরবেশের বেশ ধারণ করে বুগরা খান ও আলাসতুগীনকে বিভ্রান্ত করে থানেশ্বর নিয়ে এসেছিলো, একদিন বুগরা খান তাকে জিজ্ঞেস করলো, আমাদেরকে যে দু'টি মেয়ে আগে সেবাযত্ন করতো তারা কোথায়?

"তোমরা কি দেবীদেরকে তোমাদের মনোরঞ্জনের জন্য পেতে চাও। তারা তো মানুষ ছিলো না। তোমরা যেহেতু নগরকোট মন্দিরের মূর্তি ভাঙ্গায় শরীক ছিলে না, এ জন্য দেবীরা তোমাদের অসহায়ত্বের সময় মানুষের রূপ ধারণ করে তোমাদের সেবা করেছেন।

মানুষের মতোই তোমাদের সাথে ব্যবহার করেছেন।... তোমরা যখন তাদের ভালোবাসা চেয়েছো, তারা তোমাদেরকে প্রেম দিয়েছেন। কিন্তু তোমাদেরকে অসৎ উদ্দেশ্য থেকে বিরত রেখেছেন। তোমরা যখন তাদের কাছে অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কথা বলেছো, তখন তারা হাসি-তামাশা করে তা এড়িয়ে গেছেন। তারাই আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তোমাদেরকে যেনো সেনাবাহিনী থেকে বের করে এনে হত্যা, খুনাখুনি ও যুদ্ধবিগ্রহ থেকে আলাদা করে রাজকীয়ভাবে সেবাযত্ন করা হয়।"

"আরে না, তোমার কথা ঠিক নয়। ওরা ঠিকই মানুষ ছিলো" দৃঢ়তার সাথে বললো বুগরা খান।

বুগরা খানের চোখে চোখ রেখে জাদুকর সন্ন্যাসী বললো, "না, তারা মানুষ ছিলেন না। তোমরা তাদের ভক্ত। তোমাদের হৃদয় তাদের প্রেমে পাগল।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তাদের ভক্ত। তাদের পূজারী।... আমার হৃদয় তাদের হৃদয়ের পিঞ্জিরায় আটকানো।" উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলতে লাগলো বুগরা খান।

ততদিনে বুগরা খানের দেমাগ সন্ন্যাসী জাদুকর সম্পূর্ণই বদলে দিয়েছে। বুগরা খানের স্বাভাবিক বিবেকবোধ চাপা পড়ে গিয়েছিলো। এখন জাদুকর যা বলতো এবং যা ভাবতো, বুগরা খান তাই সত্য ভাবতো। শুধু বুগরা খান নয়, আলাসতুগীনও বুগরা খানের মতোই জাদুকরী প্রভাব ও মদের ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিলো।

বুগরা খান ও আলাসতুগীনকে মন্দিরে রাজার হালে প্রতিপালন করা হচ্ছিলো। তারা যখন বাইরে বের হতো, তখন সাধারণ হিন্দুরা তাদের দেখে মাথা নীচু করে তাদের কুর্নিশ করতো। এতে এরা নিজেদেরকে রাজা রাজা ভাবতো। টানা দু'তিন মাস এদের উপর চললো জাদুকর ও সন্ন্যাসীদের কারসাজি। এক পর্যায়ে যখন সন্ন্যাসীরা বুঝলো যে, এদের নিজস্ব বিবেক বোধ আর অবশিষ্ট নেই, নিজেদের মতো করে কোনকিছু ভাবার মতো বুদ্ধি এদের লোপ পেয়েছে, তখন তাদেরকে একদিন বলা হলো, দেবীরা তাদেরকে ডেকেছে। দেবীর ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য এদেরকে থানেশ্বর মন্দির সংলগ্ন বাগানে নিয়ে গেলো পুরোহিতরা। রাতের অন্ধকারে বাগানের দৃশ্য ছিলো মনোরম। তাদেরকে একটি রাজকীয় মসনদে বসানো হলো। তাদের আসনের চারপাশে জ্বালানো হলো রঙ-বেরঙের ঝাড় বাতি। তাদের বসার জায়গা থেকে পনের-বিশ হাত দূরে দু'টি কাপড়ের গালিচা বিছিয়ে দেয়া হলো। রঙিন বাতির আলোয় গালিচাগুলো তারার মতো ঝলমল করছিলো।

এদিকে ধীরে ধীরে সেতারের বাজনা শুরু হলো। সেই সাথে ভেসে এলো বাঁশির সুর। বাঁশি ও সেতারের মিলিত আওয়াজে রাতের পরিবেশটা হয়ে উঠলো স্বপ্নিল। স্বপ্নিল সুরের মূর্ছনার মধ্যে হঠাৎ সামনে চলে এলো সেই দুই তরুণী। কেউ বলতেই পারলো না এরা কী ফুলেল কাপড়ের আড়াল থেকে বের হয়েছে, না ফুলের ভেতর থেকেই প্রকাশ পেয়েছে। এদের পরনে এমন পাতলা সূক্ষ্ম কাপড় যে ওদের দেহবল্লরী উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো। তাদের মাথায় কোন ধরনের নিকাব ছিলো না। তাদের রেশমী চুলগুলো আলুথালুভাবে ঘাড়ের উপর ও বুকের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিলো। রাতের স্নিগ্ধ সমীরণে উড়ন্ত রেমশী চুলগুলো ওদের রূপ-সৌন্দর্যকে আরো শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

এরা দৃষ্টিগোচর হতেই সমবেত সকল হিন্দু দু'হাত জোড় করে প্রণাম করলো। বুগরা খান ও আলাসতুগীন হাত প্রসারিতও করেনি, প্রণামও করেনি। তারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওদের দিকে তাকিয়ে আত্মহারা হয়ে গেলো। তরুণীদ্বয় ধীরে ধীরে পায়চারি করতে লাগলো, তাদের পা যেনো মাটি থেকে উপরেই উঠছিলো না। সব মানুষ ওদের প্রণাম শেষে মাথা সোজা করে ওদের দিকে হাত প্রসারিত করে করজোড় নিবেদনের ভঙ্গিতে বসে রইলো। তরুণীরা ধীরে ধীরে রঙিন কাপড়ের আসন দু'টিতে বসতেই তাদের অর্ধেক কাপড়ের আড়ালে চলে গেলো। দেখতে দেখতে তরুণীদ্বয় সেই আসনের মধ্যেই গায়েব হয়ে গেলো।

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত তাদের উদ্দেশ্যে বললো, "যাও, কাপড়ের আসনে তাদের দেখো।"

বুগরা খান ও আলাসতুগীন আসনের দিকে অগ্রসর হয়ে চার-পাঁচ কদম থাকতেই দু'টি কবুতর সেখান থেকে উড়ে চলে গেলো। তারা কাছে গিয়ে শূন্য গালিচা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলো না।

"এরা তো দেবী। শুধু তোমাদের জন্যই মানুষের রূপ ধারণ করে এসেছিলো।" বললো এক পুরোহিত। "তারা তোমাদের আশীর্বাদ দিয়েছে। আজ থেকে তোমরা আমাদের রাজা আর আমরা তোমাদের দাস মাত্র। তোমাদের আগের জীবনের কথা স্মরণ করো, কোথায় ছিলে তোমরা, কি ছিলো তোমাদের মর্যাদা ও সম্মান! আর আজ কোথায় এসেছো তোমরা। দেবীরা বলে গেছেন, তোমাদের সেবার জন্য তাদের মতোই দুই রূপসী সুন্দরী মানুষ তোমাদের কাছে পাঠাবেন।"

"এরা কি আমাদের সামনে দেখা দেবে?" জানতে চাইলো বুগরা খান।

"দেব-দেবীরা তো আর আমাদের ইচ্ছাধীন নন।" বললো প্রধান পুরোহিত। "তোমরা নগরকোট মন্দিরের মূর্তি ভাঙ্গনে শরীক ছিলে না বলেই দেবীরা তোমাদের উপর খুশি। মূর্তির অবমাননাকারী সুলতান থেকে তোমরা দূরে ছিলে।... এই দেবীরাও মূর্তির মতোই সুন্দরী। এদেরকেই পাথরের মতো মনে হবে। আমি তোমাদেরকে তাদের আসল রূপও দেখাবো।"

দেবীর প্রদর্শনী দেখে বুগরা খান ও আলাসতুগীন যখন তাদের কক্ষে এলো, তখন আলাসতুগীন বুগরা খানের উদ্দেশ্যে বললো, "আমরা জানতাম হিন্দুরা ভূত পূজা করে, ওদের ধর্ম বাতিল ধর্ম। কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে এরা ইলমে গায়েব জানে।... আচ্ছা আমরা কিসের ইবাদত করি?"

যোগী-সন্ন্যাসী ও জাদুর প্রভাবে ইসলামের তাওহীদ সম্পর্কেই ওদের মনে সংশয় সৃষ্টি হয়। এরা হিন্দুদের দেব-দেবীকেই সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। মানুষ তখনই পথভ্রষ্ট হয় যখন মনোদৈহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধুই দৈহিক তৃপ্তির মধ্যে ডুবে যায়। তখন শারীরিক প্রয়োজন পূরণের জিনিসকেই মানুষ মহা সত্য বলে বিশ্বাস করতে থাকে। এমন পর্যায়ে মানুষ জাদুটোনাকেই মুজিযা ভাবতে থাকে এবং ধোঁকা, প্রতারণা ও ফাঁকিবাজিকেই সত্যের মাপকাঠি বলে বিশ্বাস করে। মানুষ যে পরিমাণ প্রবৃত্তিপূজারী হয়, সেই পরিমাণে তার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেতে থাকে এবং ভ্রান্তির মধ্যেই আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

* * *

"অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, ওদের দেশে জাদুটোনা নেই।" সঙ্গীদের বললো থানেশ্বর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। "নয়তো এরা এই কাজ দেখে এতোটা বিস্মিত হতো না। আমাদের দেশে কাউকে এভাবে গায়েব করে ফেলা খুবই সাধারণ ঘটনা।... এদেরকে আরো কিছু বিস্ময় দেখাও। আমার মনে হচ্ছে, এদেরকে এখন আমরা নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে পারবো। এদের হাতে সুলতান মাহমূদকে খুন করাতে না পারলেও নগরকোটে অবস্থানকারী সেনাপতি ও অন্যান্যদের ঠিকই হত্যা করানো সম্ভব হবে।"

"জাদুর সাথে আমাদের ওষুধপত্রও কার্যকর ভূমিকা রাখবে"– বললো নেশাদ্রব্যের অভিজ্ঞ কবিরাজ। "ওদের এখন মেয়েদেরকে প্রেতাত্মারূপে দেখাবো।"

মন্দিরের বেদীতে দু'টি চৌবাচ্চা ছিলো। এগুলোতে ফুলের নকশা করা কাপড় বিছিয়ে দেয়া হলো। চৌবাচ্চার পাশে লোবানের বাতি জ্বলছে। জ্বলন্ত লোবানের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে একেবেঁকে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে আর মূর্তিগুলোকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। বাতিগুলো রাখা ছিলো মূর্তির নীচে ও পেছনে। তাতে মূর্তিগুলো আরো ঝকমকে মনোহরী দেখাচ্ছিলো।

সেই দুই তরুণী সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় চৌবাচ্চার মধ্যে দাঁড়ানো ছিলো। ওদের চোখ বন্ধ। কোন নড়াচড়া নেই। ঠিক মূর্তির মতোই ঠাঁয় স্থির হয়ে দাঁড়ানো। লোবানের ধোঁয়ার কুণ্ডলী অপসারিত হয়ে ওদের চেহারা পরিষ্কার হয়ে উঠলে পুরোহিত সবাইকে মাথা নিচু করে মূর্তিকে সিজদা করার নির্দেশ দিলো। অন্যদের সাথে বুগরা খান ও আলাসতুগীনও সিজদায় লুটিয়ে পড়লো।

সেই মূর্তি দর্শনের পর বুগরা খান ও আলাসতুগীনের ঈমানের শেষ চিহ্নটিও বিলীন হয়ে গেলো। তাদেরকে মদ-নারী ও নেশায় ডুবিয়ে রাখার সকল ব্যবস্থা

করা হয়েছিলো। জাদুটোনা আর শারীরিক আমোদ-ফূর্তির মধ্যে ওদের মাতিয়ে রাখা হলো। সন্ন্যাসী ও জাদুকররা যখন নিশ্চিত হলো, হিন্দুদের এসব ছলচাতুরীর রহস্য ভেদ করে ওদের পক্ষে তাওহীদের বিশ্বাসে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, তখন মন্দিরের পুরোহিতরা তাদের মনে সুলতান মাহমূদ সম্পর্কে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াতে লাগলো।

"সুলতান মাহমূদ একটা ডাকাত, খুনী, সন্ত্রাসী। সে হিন্দুস্থানে সুন্দরী নারী আর ধন-রত্ন লুট করতে আসে।" বলতে শুরু করলো পুরোহিত। বুগরা খান ও আলাসতুগীনের উদ্দেশ্যে বললো, "তোমরাই বলো, যে দেবীদের তোমরা দেখেছো, তোমরা কি তাদের অসম্মান করতে পারবে? যে দেবীরা তোমাদেরকে খুনাখুনি ও কঠিন জীবন থেকে উদ্ধার করে এমন শাহী জীবন দান করেছে, তাদের মূর্তিকে কি তোমরা নিজ হাতে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে পারবে? এখন তোমাদের জন্য এ আনন্দময় জীবনের সবচেয়ে বড় বাধা হলো সেই পাষণ্ড ডাকাত। সে যদি এখানে এসে মূর্তি ভাংতে শুরু করে, তাহলে তোমাদের শরীরে আগুন ধরে যাবে। যদি দেবদেবীর একটি অঙ্গ ভেঙ্গে যায়, তাহলে তোমাদের শরীরেরও অঙ্গ ভেঙ্গে যাবে। দেবদেবীদের কোন মৃত্যু নেই, তাই তোমাদেরও মরণ হবে না। কিন্তু তোমরা সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাবে। আর সেই দিনের মতো জঙ্গলে পড়ে পড়ে যন্ত্রণায় ধুঁকতে থাকবে, যেখান থেকে এ দেবীরা তোমাদের তুলে এনে সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলেছিলো।"

"এখানেও কি সুলতান মাহমূদ আসবে?" অবাক হয়ে জানতে চাইলো বুগরা খান।

"যদি এসেই পড়ে!" বললো পুরোহিত।

"ওকে আসতে দাও। এখানে এলে সে জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।" বললো বুগরা খান।

টানা চার-পাঁচ মাসে ওদের মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটলো যে, এরা নেশার ঘোরে কিংবা জাদুর প্রভাবে অবচেতন মনে হিন্দুদের অনুসারী হয়ে গেছে এমন ছিলো না। ওরা এখন স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মতোই মন্দিরের বাইরেও ঘুরে বেড়াতো। তাদের মধ্যে কোন নেশাগ্রস্তের বাতিক ছিলো না। স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মতোই ওরা হিন্দুত্ববাদে দীক্ষিত হয়ে গেলো।

একদিন বিকেল বেলায় একটি বাগানে পাঁয়চারি করছিলো দু'জন। এমন সময় দূর থেকে আওয়াজ ভেসে এলো, "আলাসতুগীন...!"

নাম ধরে ডাক শোনার কারণে উভয়েই চারপাশ তাকিয়ে দেখলো। এক সন্ন্যাসীরূপী লোককে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলো। তার কপালে সিঁদুর দিয়ে 'ওঁম' লেখা। সন্ন্যাসীর মাথায় হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতোই জটা আর সিঁদুরের আল্পনা আঁকা। সন্ন্যাসী কাছে এসে বললো, "আরে, তোমাদের ব্যাপারে তো আমাদের কিছুই বলা হয়নি। তোমরা এখানে কখন এলে, কোথায় থাকছো?"

"ওহ!" কিছুটা বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বললো আলাসতুগীন। "তুমি উবায়দ না?"

এক সময় উবায়দ ও আলাসতুগীন একই সেনা ইউনিটে কর্মরত ছিলো। সেই সুবাদে একজন অপরজনকে চিনতো। উবায়দ ছিলো অভিজ্ঞ গেরিলা যোদ্ধা। সেই সাথে খুবই মেধাবী ও দুঃসাহসী। উবায়দ বুগরা খানকে চিনতো না। আলাসতুগীন বুগরা খানকে উবায়েদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। কিন্তু একথা বললো না, তারা এখানে কিভাবে এসেছে, কি করছে এবং কোথায় আছে? উবায়দকে পরবর্তীতে গোয়েন্দা বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। এদের দেখেও উবায়দ মনে করলো এদেরকেও হয়তো গোয়েন্দা কাজে পাঠানো হয়েছে।

"সুলতান কাছেই এসে গেছেন।" বললো উবায়দ। "তোমরা কি তার কাছে কোনো সংবাদ পাঠিয়েছো?"

"তুমি কি খবর পাঠিয়েছো?" জবাব এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা উবায়দকে জিজ্ঞেস করলো আলাসতুগীন।

"আমাদের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হলো, আগের মতো এই মন্দির রক্ষার জন্যও হিন্দুস্তানের অন্যান্য রাজা-মহারাজারা এখানে সৈন্য সমাবেশ ঘটাবে। কিন্তু যতোটুকু দেখতে পাচ্ছি এখনো অন্য জায়গা থেকে এখানে কোনো সৈন্য আসেনি। এখানে আগে থেকে যে সেনাবাহিনী ছিলো তাই রয়েছে।" বললো উবায়দ।

আলাসতুগীন আর উবায়দ গজনীর স্থানীয় ভাষায় কথা বলছিলো। সে উবায়দকে জানালো, বুগরা খানের সাথে সে মন্দিরের ভেতর পর্যন্ত ঢুকে গেছে এবং আপাদত মন্দিরের ভেতরেই অবস্থান করছে। ওরা যে সম্পূর্ণ বদলে গেছে এ ব্যাপারটি উবায়দকে মোটেও টের পেতে দিলো না। উবায়দকে তাদের ব্যাপারে অন্ধকারে রেখেই তারা জায়গা ত্যাগ করে মন্দিরের দিকে রওয়ানা হলো। আলাসতুগীন আরো জানালো, তারা উভয়েই হিন্দু সেজে মন্দিরের পুরোহিতদেরও ভক্ত বানিয়ে ফেলেছে।

উবায়দ যখন বাগান থেকে বেরিয়ে ফিরে যেতে লাগলো, তখন এক লোক তার মুখোমুখি হয়ে জানতে চাইলে, তুমি কে? কোত্থেকে এসেছো? উবায়দ

লোকটিকে একটি হিন্দুয়ানা নাম বলে দিলো এবং জানালো, আমরা কয়েকজন সন্ন্যাসী লাহোর থেকে এসেছি। জঙ্গলের মধ্যে আমরা তাঁবু টেনেছি, ওখানেই থাকি।

কিন্তু লোকটি উবায়দের কথা বিশ্বাস করতে পারলো না। তাকে সন্দেহ করতে লাগলো। সে ছিলো হিন্দুদের গোয়েন্দা বিভাগের লোক। বুগরাখান ও আলাসতুগীনকে দূর থেকে পাহারা দিতো এই গোয়েন্দা। গোয়েন্দা যখন দূর থেকে উবায়দকে আলাসতুগীনের সাথে কথা বলতে দেখলো, তখনই তার সন্দেহ হলো। তাই ওকে জানার জন্য তারা বাগান ছেড়ে যেতেই উবায়দের দিকে এগিয়ে এলো গোয়েন্দা।

উবায়দ যখন বললো, আমরা জঙ্গলে তাঁবু ফেলেছি, তখন লোকটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাদের তাঁবু দেখার জন্য প্রস্তাব করলো। উবায়দ তাকে সাথে নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করলো। জঙ্গলের ভেতরে ঠিকই চার-পাঁচজন যোগী-সন্ন্যাসীরূপী লোক একটা তাঁবুতে অবস্থান করছিলো। কিন্তু উবায়দ এই গোয়েন্দাকে দেখাতে নিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসতে দিলো না। তাঁবুতে পৌঁছা মাত্রই অন্যান্য সন্ন্যাসীরূপী লোকেরা উবায়দের ইঙ্গিতে লোকটিতে হাত-পা বেঁধে ফেললো। এরপর খঞ্জর বুকে ধরে উবায়দ জিজ্ঞেস করলো, কি কারণে আমার প্রতি তোর সন্দেহ হয়েছিলো, বল?

হিন্দু গোয়েন্দা কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানালো। এরপর ওর পায়ে দড়ি বেঁধে একটি গাছের সাথে ঝুলিয়ে নীচে আগুন ধরিয়ে দিলো। আগুনের তাপ গায়ে লাগতেই চিৎকার শুরু করলো হিন্দু গোয়েন্দা। সবকিছু বলবে বলে স্বীকার করলো। দড়ি খুলে নীচে নামালো ওকে। ধীরে ধীরে ওর সন্দেহ, গোয়েন্দাবৃত্তি এবং বুগরা খান ও আলাসতুগীন সম্পর্কেও সব কাহিনী বলে দিলো। গোয়েন্দা আরো জানালো, যেহেতু ওরা দু'জন গজনী বাহিনীর কমান্ডার এ জন্য তাদের পক্ষে সহজেই সুলতানের ধারে-কাছে যাওয়া সম্ভব। তারা হঠাৎ একদিন সুলতানের কাছে গিয়ে বলবে, তারা হিন্দুদের বন্দিদশা থেকে পালিয়ে এসেছে, তাই সুলতানের সাথে তাদের একান্ত জরুরী কথা আছে। এভাবে সুলতানের একান্ত সান্নিধ্যে গিয়ে তাকে হত্যা করবে।

হিন্দু গোয়েন্দার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধারের পর ওকে বেঁধে রাখলো উবায়দের গোয়েন্দা দল। তারা জঙ্গলের আরো ভেতরের দিকে চলে গেলো।

* * *

এদিকে বাগানে উরায়দের সাথে কথা বলে বুগরা খান ও আলাসতুগীন যখন মন্দিরে ফিরে গেলো, তখন দেখতে গেলো মন্দিরের লোকজন ব্যস্ত ও ভীতিকর পরিস্থিতি। জিজ্ঞেস করলে তাদের জানানো হলো, গজনীর সৈন্যরা থানেশ্বর মন্দির আক্রমণের জন্য আসছে। মন্দিরের পুরোহিত ও অন্যান্য লোকেরা মহারাজা আনন্দ পাল ও অন্যান্য হিন্দু রাজাদের সেনা দলের আগমনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলো। কিন্তু কোন হিন্দুরাজের সৈন্যদের এদিকে আসতে দেখা যাচ্ছে না।

থানেশ্বর মন্দিরের পুরোহিতদের জানা ছিলো না যে, সব রাজাদের কাছেই খবর পৌছে গেছে, সুলতান মাহমূদ থানেশ্বর মন্দির আক্রমণের জন্য আসছে। মুসলিম বাহিনী এ জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু সুলতানের অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে পৌছে যাওয়ার কথা তারা ভাবতেই পারেনি।

সুলতান ঝড়ের গতিতে সফর করছিলেন। থানেশ্বর মন্দির সাধারণ কোন পূজাশ্রম ছিলো না। এটি বেষ্টিত ছিলো বিশাল দুর্গ ও সেনা ছাউনী দ্বারা। সেনা শিবিরটিতে পরিপূর্ণ একটি সুসজ্জিত বাহিনী অবস্থান ছিলো। সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করতো মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। থানেশ্বর মন্দিরের পৃথক গোয়েন্দা বিভাগ ছিলো। গোয়েন্দারা প্রধান পুরোহিতকে খবর দিলো, সুলতান মাহমূদ চলমান গতিতে অগ্রসর হলে আগামী একদিন এক রাতের মধ্যে থানেশ্বর পৌছে যাবে।

বুগরা খান ও আলাসতুগীন মন্দিরে গিয়ে জানালো, সুলতান মাহমূদের এক গোয়েন্দার সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। ওর সাথে আরো কয়েকজন রয়েছে। আগামীকাল আবার এদের একজন তাদের সাথে বাগানে দেখা করতে আসবে।

মন্দিরের সেনাপতি তাদেরকে বললো, তোমরা আগামীকাল সেই গোয়েন্দার সাথে দেখা করবে এবং ওদের সাথে গিয়ে ঠিকানা দেখে আসবে। যাতে ওদের ধরে শেষ করে দেয়া যায়। বুগরা খান ও আলাসতুগীনকে এ কথাও বলা হলো যে, তোমরা গোয়েন্দাদের ঠিকানা জেনে মুসলিম বাহিনীর দিকে চলে যাবে এবং নিজেদেরকে গোয়েন্দা পরিচয় দিয়ে বলবে, আমরা হিন্দুদের কয়েদখানা থেকে পালিয়ে এসেছি, সুলতানের সাথে একান্ত সাক্ষাতে আমাদের কথা আছে।

প্রায় এক বছর সময়কালে বুগরা খান ও আলাসতুগীন মুসলিম সালতানাতের সুরক্ষায় জিহাদী চেতনা লালনকারীর অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুৎ হয়ে গিয়েছিলো। এই বিচ্যুতি ছিলো হিন্দুয়ানী চেতনার উপযোগী। এরা প্রশিক্ষিত জন্তুর মতোই অনুগত হয়ে গিয়েছিলো। হিন্দু পুরোহিতদের পাশবিক ভোগবাদিতা, মদ, নেশা, জাদুর প্রভাবে এরা মানবিকতার মর্যাদা থেকেও বিচ্যুৎ

হয়েছিলো। তাদেরকে সেই দু'সুন্দরী তরুণীর মূর্তি দেখিয়ে ওদেরকে দেবীতে রূপান্তরিত করে মূর্তিপূজারীতে পরিণত করেছিলো। এরা কল্পনাও করতে পারেনি যে, সেই দু'তরুণীকেই চৌবাচ্চার মধ্যে মূর্তিরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। চৌবাচ্চার চারপাশে ধূপ লোবান ও আগরবাতি এমনভাবে জ্বালানো হয়েছিলো যে, এসবের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর কারণে তারা বুঝতেই পারেনি যে এরা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে।

এ পর্যায়ে তাদেরকে যখন বলা হলো, সুলতান মাহমূদ থানেশ্বর মন্দির লুট করতে ও ভাঙ্গতে আসছে। তখন বুগরা খান ও আলাসতুগীন ক্ষোভে অগ্নিরূপ ধারণ করলো।

এদিকে থানেশ্বর মন্দির সংলগ্ন সেনা শিবিরে হৈচৈ পড়ে যায়। তারা বিভিন্ন প্রতিরক্ষা মোর্চা ঠিক করতে শুরু করে। মন্দিরের ভেতরে-বাইরে সেনাদের দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়ে গেছে। শহরের মানুষের মধ্যে ভীতি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং শহরের সাধারণ লোকজনও তরবারী ও বর্শা নিয়ে মন্দির রক্ষার জন্য মন্দিরের প্রধান ফটকে জমায়েত হতে থাকে। সেনাবাহিনীর লোকেরা তাদের করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে এবং তাদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেয়।

এ দুর্যোগ মুহূর্তেও পরদিন বুগরা খান ও আলাসতুগীন উবায়দের সাথে সাক্ষাৎ করতে বাগানে চলে গেলো। তারা উভয়েই উবায়দকে মিথ্যা কাহিনী এবং অসত্য কার্যক্রমের গল্প শোনালো এবং প্রস্তাব করলো, আমাদেরকে তোমাদের আস্তানায় নিয়ে চলো। অবশ্য উবায়দ আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে, ওদেরকে ফুসলিয়ে হলেও আস্তানায় নিয়ে আসবে। কিন্তু এখন তারা নিজেরাই উবায়দের ইচ্ছা পূরণে আগ্রহী হয়ে উঠলো। তাতে উবায়দের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়ে গেলো। সে তাদের নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেলো।

উবায়দ আগেই সহকর্মীদের দিক-নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলো, বুগরা খান ও আলাসতুগীনকে এখানে নিয়ে এলে তাদের আটকে ফেলতে হবে। পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো উবায়দ তাদের নিয়ে আস্তানায় পৌছা মাত্রই কয়েকজন তাদের ঝাঁপটে ধরে রশি দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেললো।

উবায়দ আশংকা করছিলো, গতকালের মতো আজও হয়তো ওদের অনুসরণকারী থাকতে পারে। তাই দ্রুত তারা সেই আস্তানা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়াটাকেই নিরাপদ মনে করলো। স্থান ছেড়ে আসার জন্য উবায়দের দল কমান্ডার বুগরা খান ও আলাসতুগীনের হাত বেঁধে পা খুলে দিলো এবং উভয়কে

একই রশিতে বেঁধে একজন ধরে রাখলো যাতে পালাতে না পারে। আর হিন্দু গোয়েন্দাকে জঙ্গলের মধ্যে মেরে ফেললো।

খুব বেশি দূরে তাদের যেতে হয়নি। কয়েক মাইল পথ অগ্রসর হলেই গজনী বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের দেখা পেলো। উবায়দ অগ্রবর্তী দলের কমান্ডারকে তাদের অপারেশনের কথা এবং সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলে কমান্ডার উবায়দকে জানালো, তোমাদের আর অগ্রসর হওয়ার দরকার নেই। সুলতান কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে পৌঁছে যাবেন। উবায়দ আর অগ্রসর না হয়ে সেই স্থানেই অপেক্ষা করলো।

সুলতান মাহমূদ তার একান্ত নিরাপত্তা রক্ষীদের নিয়ে ঝড়ের বেগে থানেশ্বরের দিকে আসছিলেন। সুলতানের নিরাপত্তা রক্ষী দলের কমান্ডার পথিমধ্যে কয়েকজন সন্ন্যাসীরূপী লোককে দাঁড়ানো দেখে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কেন পথিমধ্যে দাঁড়িয়ে আছে? কাছে এসে কমান্ডার দেখতে পেলো, এই সন্ন্যাসীরা আর কেউ নয়, তাদেরই গোয়েন্দা কমান্ডার উবায়দের দল। ইতিমধ্যে সুলতান সেই জায়গায় পৌঁছে গেলেন।

উবায়দ প্রথমেই সুলতানকে জানালো, থানেশ্বরে বাইরে থেকে কোন সেনাবাহিনী আসেনি এবং থানেশ্বর সেনা শিবিরের সৈন্যরা ছাড়াও শহরের বসিন্দারাও তাদের সাথে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। সেই সাথে জানালো, আমাদের সাবেক এই দুই কমান্ডারকে সুলতানকে হত্যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিলো। সুলতানকে এদের আদিঅন্ত পুরো কাহিনী শোনালো উবায়দ।

"এদেরকে যেভাবে রেখেছো সেভাবেই রাখো। তবে কোন অবস্থাতেই ওদের কোন কিছু পানাহার করতে দিও না।" ক্ষুধায় চেতনা হারালেও খেতে দিও না। তাহলে ওদের নেশা দূর হয়ে যাবে। তারপর ওদেরকে আমি সঠিক বাস্তবতা দেখাবো।" বললেন সুলতান।

সাবেক কমান্ডার দু'জন চোখ বড় বড় করে হতবাক হয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলো। সুলতান উবায়দের কাছ থেকে সার্বিক পরিস্থিতির রিপোর্ট নিয়ে সৈন্যদের নিয়ে এগিয়ে চললেন।

গতির প্রতিযোগিতায় সুলতান বিজয়ী হলেন। থানেশ্বর মন্দিরের সেনা কমান্ডাররা দেখলো রাজা-মহারাজাদের বাহিনী পৌঁছার আগেই সুলতান তার সৈন্যদের নিয়ে থানেশ্বর পৌঁছে গেছেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদের ক্ষিপ্র গতিময়তায় থানেশ্বরের সকল হিন্দু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। আসলে গতিময়তা ছিলো সুলতান মাহমূদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রেও

তিনি হিন্দু সৈন্যদের আগে পৌছার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সুলতান থানেশ্বর পৌছে আগে হিন্দুদের প্রতিরোধ কৌশল পর্যবেক্ষণ করে অবরোধ না করে সরাসরি আঘাত হানার নির্দেশ দিলেন। সুলতানের নির্দেশে গজনী বাহিনীর তীরন্দাজ ইউনিট শহর প্রাচীরের উপর এমন তীব্র তীরবৃষ্টি বর্ষণ করলো যে, প্রতিরোধকারী সৈন্যরা আর মাথা তোলার সুযোগ পেলো না। শহর প্রাচীরের প্রধান ফটক ভেঙ্গে ফেললো গজনী বাহিনীর দুঃসাহসী বীর সৈন্যরা। হিন্দু বাহিনীর মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সুলতান শহরে ত্রাস সৃষ্টির নির্দেশ দিলেন। মুসলিম সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করেই ব্যাপক ভাংচুর করে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো। হিন্দু নাগরিক তো দূরের কথা, সৈন্যরা জীবন বাঁচানোর জন্য দিকবিদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করলো।

সুলতান মাহমূদ মন্দিরের সকল মূর্তি বাইরে বের করে প্রকাশ্য রাস্তার উপর ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু থানেশ্বর মন্দিরের সবচেয়ে বড় মূর্তি ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বিষ্ণু মূর্তিকে না ভেঙ্গে অক্ষত রাখার নির্দেশ দিলেন সুলতান। এই বিষ্ণু মূর্তির জন্যই সারা হিন্দুস্তানে থানেশ্বর মন্দির বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলো। সুলতান বিষ্ণু মূর্তিকে অক্ষত অবস্থায় গজনী নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। থানেশ্বর বিজয়ের পর গজনী ফেরার সময় বিষ্ণু মূর্তিকে গজনীর সৈন্যরা বহন করে নিয়ে গেলো। সমকালীন একজন ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে জামা যায়, গজনীর রেসকোর্স ময়দানে থানেশ্বর মন্দিরের অহংকার বিষ্ণু মূর্তিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। আর ঘোড়ার পায়ের আঘাতে আঘাতে তা গজনীর ধূলো-বালির সাথে মিশে যায়।

থানেশ্বর মন্দির ও শহরের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেয়ার পর সুলতান গোয়েন্দা কমান্ডার উবায়দকে নির্দেশ দিলেন ধৃত বুগরা খান ও আলাসতুগীনকে তার কাছে নিয়ে আসতে।

বুগরা খান ও আলাসতুগীনসহ সকল যুদ্ধবন্দীকে সুলতানের সামনে এনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হলো। বন্দীদের প্রথম সারিতে ছিলো ধৃত দুই সাবেক কমান্ডার, মন্দিরের পুরোহিত দল ও সন্নাসী-জাদুকরদের শীর্ষ ব্যক্তিসহ সেই তরুণীদ্বয় এবং মন্দিরের নর্তকী-সেবিকারা।

সুলতান বন্দী বুগরা খান ও আলাসতুগীনকে নির্দেশ দিলেন, তোমাদের পূজনীয় এই দুই তরুণীকে দেখো। আর ওদের থেকে তোমাদের দেবীদের আলাদা করে ফেলো। উভয়েই হতবাক হয়ে দেখলো। তারা যে দুই তরুণীর প্রেমে পড়ে ওদেরকে স্বর্গের অপ্সরা ভেবে পূজা করতে শুরু করছিলো, এরা দিব্যি

সশরীরে তাদের সামনে বন্দী অবস্থায় দণ্ডায়মান। সুলতান জাদুকরকে নির্দেশ দিলেন, এই তরুণীদ্বয়কে তোমার জাদু দিয়ে চৌবাচ্চার মধ্যে গায়েব করে দাও। এরপর গায়েব থেকে এদেরকে আবার বাস্তবে হাজির করো।

দু'টি চৌবাচ্চা নিয়ে আসা হলো। এক জাদুকর এগিয়ে এসে তরুণীদ্বয়কে ধরে এনে চৌবাচ্চার মধ্যে বসিয়ে দিলো এবং একটু পর সবাই দেখলো চৌবাচ্চা সম্পূর্ণ খালি, সেখানে কিছু নেই। একটু পর সেই জাদুকর খালি চৌবাচ্চা থেকেই আবার তরুণীদ্বয়কে বের করে আনলো।

"এটা হিন্দুস্তানের হাজারো জাদুর মধ্যে খুবই সাধারণ একটা জাদু।" বললেন সুলতান। "হিন্দুদের ধর্ম টিকেই আছে জাদু ও রহস্যময়তার অন্ধকারে। আসলে এই পৌত্তলিক ধর্মটার মূল জিনিসই শরীর কেন্দ্রিক। আত্মার সাথে পৌত্তলিকতার কোন সম্পর্ক নেই। ভোগবাদিতা ও রমণলীলা হিন্দু ধর্মের প্রধান উৎস।"

সন্ন্যাসী, জাদুকর ও পুরোহিতদের উদ্দেশ্যে সুলতান বললেন, "আমি তোমাদের দেবদেবীদের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছি। ওদেরকে বলো না, আমার উপর তাদের অভিশাপের মুসীবত চাপিয়ে দিতে।"

বিস্ময় ও হতবাক হয়ে বুগরা খান ও আলাসতুগীন সবকিছু দেখছিলো। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তখন তাদের দেমাগ থেকে নেশার প্রভাব অনেকটাই বিলীন হয়ে গেছে। সুলতান আবেগময় সম্মোহনী ভাষায় বক্তৃতা করছিলেন। ঠিকই সেই সময়ে মন্দির চূড়া থেকে ভেসে এলো আযানের সুমধুর মনোমুগ্ধকর ধ্বনি 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার'। সুলতান থেমে গেলেন। বুগরা খান ও আলাসতুগীনের শরীর ততোক্ষণে পাপের অনুভূতিতে নির্ঝরে কাঁপতে শুরু করেছে, আর তাদের দু'চোখে গড়িয়ে পড়ছে অনুশোচনার পাপানল।

আযান শেষ হলে সুলতান সাবেক দুই সেনা কমান্ডারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমাদের আজ আমি কোন শাস্তি দেবো না। তোমরা জীবন নিয়ে স্বাধীনভাবেই বেঁচে থাকো। সকল মুসলমানকে জানিয়ে দাও যে, আমাদের শত্রুরা তোমাদের মতো তুখোড় যোদ্ধাদেরকে শুধু তলোয়ার দিয়েই আঘাত করে না, ওদের হাতে এমন ধারালো অস্ত্র রয়েছে যা দিয়ে তারা কোন মুসলিম সেনাপতির অন্তর কেটে দিতে পারে, ঈমান নষ্ট করে দিতে পারে, ইসলাম-মুসলিম জাতীয়তা ও ঐতিহ্য ভুলিয়ে দিয়ে বাতিলের সেবাদাসে পরিণত করতে পারে।"

* * *

## সাপ স্বর্ণ ও মানুষ

ঐতিহাসিক ফারিশতা লিখেন, ৮০২ হিজরী মোতাবেক ১০১১ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাহমূদ থানেশ্বর মন্দির জয় করে যখন গজনী ফিরে এলেন, তখন গজনীকে দেখে হিন্দুস্তানের কোন শহর মনে হতো। কারণ, গজনীর অধিবাসী ও সৈন্য সংখ্যা খুব বেশি ছিলো না। কিন্তু প্রতিবারই অভিযান শেষে হিন্দু যুদ্ধবন্দীদের গজনী নিয়ে আসতেন সুলতান। কিন্তু থানেশ্বর যুদ্ধে হিন্দু যুদ্ধবন্দির সংখ্যা দাঁড়ায় দুই লাখের উপরে। সে সময় যুদ্ধবন্দিদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করা হতো এবং সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (গনীমতের) মতোই পদ অনুযায়ী তাদের বণ্টন করে দেয়া হতো।

গজনী ফিরে সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ মালে গনীমত বণ্টনসহ যুদ্ধবন্দিদের বণ্টন করে দেয়ার পর সুলতান সকল সেনা সদস্যের উদ্দেশ্যে বললেন, যুদ্ধবন্দি গোলামদের সাথে কেউ এমন ব্যবহার করো না যে, এরা বাকি জীবন নিজেদেরকে জন্তু-জানোয়ারের মতোই কাটাতে বাধ্য হয়। ওদেরকে ইসলামী রীতি-নীতি সম্পর্কে অবহিত করো। ওদের ভাগ্যকে তোমরা সদোত্তর দিয়ে এভাবে বদলে দাও যাতে তারা শুধু আপনজন ও জাতি-ধর্মকেই ভুলে যায় না, সাগ্রহে ইসলামে দীক্ষা নেয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে তখন যুদ্ধবন্দির সংখ্যা দু'লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। ফলে এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে গোলামে পরিণত করে না রেখে ওদেরকে মুসলিম সমাজের মূল ধারায় লীন করে দেয়ার জন্য কঠোর নির্দেশ জারি করলেন। এর ফলে অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, অল্প দিনের মধ্যেই বিপুলসংখ্যক হিন্দু গোলাম ইসলাম গ্রহণ করে স্বাধীনতা লাভ করলো।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতানের দূরদর্শী এই সিদ্ধান্তের ফলে গোলামী থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দুদেরকে নওমুসলিম হিসেবে সমাজের মূল ধারায় মিশে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হলো। এক পর্যায়ে সুলতান নওমুসলিমদের সমন্বয়ে সেনাবাহিনীর আলাদা একটি রেজিমেন্ট গঠন করেন। তাছাড়া সুলতানের অধীনে একটি হিন্দু রেজিমেন্টও ছিলো। যার কমান্ডারও ছিলো হিন্দু। সুলতান মাহমূদের প্রশাসনিক কাজেও হিন্দুদেরকে অফিসার পদে নিযুক্ত করেছিলেন এবং মুসলমানদের তুলনায় হিন্দু আমলাদের বেশি সুযোগ-সুবিধা দিতেন। হিন্দু সেনাদেরকে তিনি কখনো ভারত অভিযানে ব্যবহার করতেন না। পার্শ্ববর্তী মুসলিম শাসকদের মোকাবেলায় হিন্দু রেজিমেন্টকে ব্যবহার করতেন সুলতান।

থানেশ্বর বিজয়ের পর বিপুল সংখ্যক বন্দী নিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসার পর সেই রাতে গজনীতে প্রথম রাতের বেলায় সৈন্য ও সাধারণ নাগরিকরা

আনন্দে মেতে উঠলো। রাতে গজনীর রেসকোর্স ময়দানে সমবেত সৈন্য ও শহরবাসী আতশবাজি পোড়ালো। মানুষ পরম বিজয় উৎসবে মেতে নাচতে লাগলো। শহরের অলিগলি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো আনন্দের বন্যা। অবস্থা এমন হলো যে, গজনীতে যেনো রাত নামেনি। চতুর্দিকে আলোকসজ্জা ও আতশবাজিতে রাতের গজনী কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠলো।

থানেশ্বর মন্দিরের সবচেয়ে বড় বিষ্ণু মূর্তিকে ঘোড়ার টানা গাড়িতে তুলে শহরময় প্রদর্শনী করা হলো। লোকজন মূর্তিতে থু থু ছিটিয়ে দিলো আর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মূর্তির সুন্দর গায়ে ক্ষত সৃষ্টি করছিলো। এরপর বিশালাকার বিষ্ণু মূর্তিকে রেসকোর্স ময়দানে নিয়ে আসা হলো। সেখানে সমবেত হাজার হাজার সৈনিক-জনতার সামনে সেটিকে ভেঙ্গে ফেলা হলো। সে সময় সকল হিন্দু বন্দিকেও ময়দানে নিয়ে আসা হলো, যাতে দর্শকদের সাথে তারাও তাদের দেবতার করুণ পরিণতি স্বচোখে দেখতে পারে। বন্দিদের উদ্দেশ্যে এক ঘোষক বললো, দেখো, এটা নিছক একটা পাথরের তৈরি বিগ্রহ মাত্র। এটা কোন মতেই দেবতা হতে পারে না। এটা তোমাদের ধর্মের পুরোহিতদের তৈরি প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। এসব মূর্তির মধ্যে যদি কোন দেবতার শক্তি থাকতো তাহলে এতোক্ষণে আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিতো।

'আল্লাহু আকবার, ইসলাম জিন্দাবাদ, পৌত্তলিকতা মুরদাবাদ' শ্লোগানে শ্লোগানে রাতের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো আর হিন্দু কয়েদীরা মর্মজ্বালা নিয়ে নীরবে তাদের দেবতার করুণ পরিণতি প্রত্যক্ষ করলো। সেই রাতে গজনী শহরে যে আনন্দ-উল্লাস ও হৈ-হুল্লোড়ে বিজয় উৎসব অনুষ্ঠিত হলো, গজনী শহরে এমনটি আর কখনো ঘটেনি। মুসলমানদের বাড়িঘরও ছিলো উল্লাসমুখর। কিন্তু এতোসব আনন্দ উৎসব সত্ত্বেও একটি মহল ছিলো সম্পূর্ণ নিস্তরঙ্গ। সেই মহলে যিনি অবস্থান করছিলেন, এতো আনন্দ-উৎসবেও তিনি ছিলেন চিন্তান্বিত। আনন্দ-উৎসবে যোগ না দিয়ে তিনি নিজের একান্ত কক্ষে একাকী বসে ছিলেন। দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তায় তার চেহারা ছিলো মলিন। এমন সময় তার কক্ষে উপস্থিত হলো দুই লোক। তারা তাকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করে পাশে উপবেশন করলো। এরা ছিলো গজনী বাহিনীর দুই গোয়েন্দা প্রধান আর মহলে অবস্থানকারী ব্যক্তিটি ছিলেন বিজয়ের প্রধান নায়ক সুলতান মাহমূদ। তিনি বিজয় উৎসবে যোগ না দিয়ে তার দুই গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে ডেকে গজনীর প্রতিবেশী মুসলিম শাসকদের কর্মতৎপরতার খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন।

**দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত**

VAROT OVIJAN : 2
ISBN 984-70109-0000-3 SET

ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস

সুলতান মাহমুদ গজনবীর

# ভারত অভিযান

# ভারত অভিযান - ৩

# ভারত অভিযান

(তৃতীয় খণ্ড)

এনায়েতুল্লাহ

অনুবাদ

শহীদুল ইসলাম

এদারায়ে কোরআন

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ — ২০০৮

প্রকাশক ▶ আরিফ বিল্লাহ্, এদারায়ে কুরআন, ৫০, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০, স্বত্ব ▶ সংরক্ষিত, প্রচ্ছদ ▶ নাজমুল হায়দায়
কম্পিউটার কম্পোজ ▶ এম. হক কম্পিউটার্স, মুদ্রণ ▶ আল-আরাফা প্রিন্টার্স
মোবাইল ঃ ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

মূল্য ঃ একশত ষাট টাকা মাত্র

**BHAROT OVIJAN-3** : Writer Enayatullah, Translated by Shahidul Islam, Published by Edara-e- Quran, 50 Banglabazar, Dhaka-1100, Printed by Al-Arafa Printers Date of Publication March 2008.

**PRICE TAKA ONE HUNDRED SIXTY ONLY**

**ISBN 984-70109-0000-3 SET**

# উৎসর্গ

তাকিয়া তাবাস্‌সুম (যীবা) গল্প উপন্যাস তার পড়া হয়ে ওঠে না কিন্তু আব্বুর নতুন বই এলেই দখলে নেয়ার জন্যে মরিয়া।

...............আর অভিযোগ কেন যে আমি ছোট হলাম! ছোট না হলে আব্বুর ছদ্মনাম আবুশিফা না হয়ে আবুযীবা হতো। সত্যি, অনিষ্পন্ন অভিযোগ। অতএব, এ উৎসর্গ তার নামে। বইপ্রিয়তা তাকে আলোকিত মানুষ করুক, এই দু'আ।

—অনুবাদক

# প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ্! 'এদারায়ে কুরআন' কর্তৃক প্রকাশিত সুলতান মাহমূদ এর ভারত অভিযান সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। এজন্য আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং পাঠক মহলকে জানাচ্ছি মোবারকবাদ। নিয়মিত বিরতি দিয়ে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না কিন্তু দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও মুদ্রণ সামগ্রির উচ্চমূল্য আমাদের টুঁটি চেপে ধরেছে। ফলে কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে এই সিরিজের প্রকাশনা।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে রবিউল আউয়াল '০৮ এর বইমেলা উপলক্ষে এই সিরিজের তৃতীয় খণ্ডটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে সুখানুভব করছি।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতার পরও আমরা এ খণ্ডটি আগেরগুলোর চেয়ে আরো সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তবুও মুদ্রণ প্রমাদ ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। বিজ্ঞমহলের কাছে যে কোন ত্রুটি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মতো তৃতীয় খণ্ডটিও পাঠক-পাঠিকা মহলে আদৃত হলে আমাদের সার্বিক প্রয়াস সার্থক হবে।

—প্রকাশক

# লেখকের কথা

"মাহমূদ গজনবীর ভারত অভিযান" সিরিজের এটি তৃতীয় খণ্ড। উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতান মাহমূদ গজনবী সতের বার ভারত অভিযান পরিচালনাকারী মহানায়ক হিসেবে খ্যাত। সুলতান মাহমূদকে আরো খ্যাতি দিয়েছে পৌত্তলিক ভারতের অন্যতম দু' ঐতিহাসিক মন্দির সোমনাথ ও থানেশ্বরীতে আক্রমণকারী হিসেবে। ঐসব মন্দিরের মূর্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন মাহমূদ। কিন্তু উপমহাদেশের পাঠ্যপুস্তকে এবং ইতিহাসে মাহমূদের কীর্তির চেয়ে দুষ্কৃতির চিত্রই বেশী লিখিত হয়েছে। হিন্দু ও ইংরেজদের রচিত এসব ইতিহাসে এই মহানায়কের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে তাঁর সুখ্যাতি চাপা পড়ে গেছে। মুসলিম বিদ্বেষের ভাবাদর্শে রচিত ইতিহাস এবং পরবর্তীতে সেইসব অপইতিহাসের ভিত্তিতে প্রণীত মুসলিম লেখকরাও মাহমূদের জীবনকর্ম যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের বোঝার উপায় নেই, তিনি যে প্রকৃতই একজন নিবেদিতপ্রাণ ইসলামের সৈনিক ছিলেন, ইসলামের বিধি-বিধান তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। জাতিশত্রুদের প্রতিহত করে খাঁটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও দৃঢ় করণের জন্যেই নিবেদিত ছিল তার সকল প্রয়াস। অপলেখকদের রচিত ইতিহাস পড়লে মনে হয়, সুলতান মাহমূদ ছিলেন লুটেরা, আগ্রাসী ও হিংস্র। বারবার তিনি ভারতের মন্দিরগুলোতে আক্রমণ করে সোনা-দানা, মণি-মুক্তা লুট করে গজনী নিয়ে যেতেন। ভারতের মানুষের উন্নতি কিংবা ভারত কেন্দ্রিক মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা তার কখনো ছিলো না। যদি তৎকালীন ভারতের নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য করা এবং পৌত্তলিকতা দূর করে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার একান্তই ইচ্ছা তাঁর থাকতো, তবে তিনি কেন মোগলদের মতো ভারতে বসতি গেড়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতেন না? ইত্যাকার বহু কলঙ্ক এঁটে তার চরিত্রকে কলুষিত করা হয়েছে।

মাহমূদ কেন বার বার ভারতে অভিযান চালাতেন? মন্দিরগুলো কেন তার টার্গেট ছিল? সফল বিজয়ের পড়ও কেন তাকে বার বার ফিরে যেতে হতো গজনী? ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জবাব; ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ সৈনিক সুলতান মাহমূদকে তুলে ধরার জন্যে আমার এই প্রয়াস। নির্ভরযোগ্য দলিলাদি ও বিশুদ্ধ ইতিহাস ঘেটে আমি এই বইয়ে মাহমূদের

প্রকৃত জীবন চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রকৃত পক্ষে সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর মতোই মাহমূদকেও স্বজাতির গাদ্দার এবং বিধর্মী পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে একই সাথে লড়াই করতে হয়েছে। যতো বার তিনি ভারত অভিযান চালিয়েছেন, অভিযান শেষ হতে না হতেই খবর আসতো, সুযোগ সন্ধানী সাম্রাজ্যলোভী প্রতিবেশী মুসলিম শাসকরা গজনী আক্রমণ করছে। কেন্দ্রের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বাধ্য হয়েই মাহমূদকে গজনী ফিরে যেতে হতো। একপেশে ইতিহাসে লেখা হয়েছে, সুলতান মাহমূদ সতের বার ভারত অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু একথা বলা হয়নি, হিন্দু রাজা-মহারাজারা মাহমূদকে উৎখাত করার জন্যে কতো শত বার গজনীর দিকে আগ্রাসন চালিয়ে ছিল।

সুলতান মাহমূদের বারবার ভারত অভিযান ছিল মূলত শত্রুদের দমিয়ে রাখার এক কৌশল। তিনি যদি এদের দমিয়ে রাখতে ব্যর্থ হতেন, তবে হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকতাবাদ সাগর পাড়ি দিয়ে আরব পর্যন্ত বিস্তৃত হতো।

মাহমূদের পিতা সুবক্তগীন তাকে অসীয়ত করে গিয়েছিলেন, "বেটা! ভারতের রাজাদের কখনও স্বস্তিতে থাকতে দিবে না। এরা গজনী সালাতানাতকে উৎখাত করে পৌত্তলিকতার সয়লাবে কাবাকেও ভাসাতে চায়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময়ের মত ভারতীয় মুসলমানদেরকে হিন্দুরা জোর জবরদস্তি হিন্দু বানাচ্ছে। এদের ঈমান রক্ষার্থে তোমাকে পৌত্তলিকতার দুর্গ গুড়িয়ে দিতে হবে। ভারতের অগণিত নির্যাতিত বনি আদমকে আযাদ করতে হবে, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে হবে।"

আলবিরুনী, ফিরিশ্‌তা, গারদিজী, উতবী, বাইহাকীর মতো বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ তৎকালীন সবচেয়ে বড় বুযুর্গ ও ওলী শাইখ আবুল হাসান কিরখানীর মুরীদ ছিলেন। তিনি বিজয়ী এলাকায় তার হেদায়েত মতো পুরোপুরি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি নিজে কিরখানীর দরবারে যেতেন। কখনও তিনি তাঁর পীরকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠাননি। উপরন্তু তিনি ছদ্মবেশে পীর সাহেবের দরবারে গিয়ে ইসলাহ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি আত্মপরিচয় গোপন করে কখনও নিজেকে সুলতানের দূত হিসেবে পরিচয় দিতেন। একবার তো আবুল হাসান কিরখানী মজলিসে বলেই ফেললেন, "আমার একথা ভাবতে ভালো লাগে যে, গজনীর সুলতানের দূত সুলতান নিজেই হয়ে থাকেন। এটা প্রকৃতই মুসলমানের আলামত।"

মাহমূদ কুরআন, হাদীস ও দীনি ইলম প্রচারে খুবই যত্নবান ছিলেন। তাঁর দরবারে আলেমদের যথাযথ মর্যাদা ছিল। সব সময় তার বাহিনীতে শত্রু পক্ষের চেয়ে সৈন্যবল কম হতো কিন্তু তিনি সব সময়ই বিজয়ী হতেন। বহুবার এমন হয়েছে যে, তার পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ময়দানে দু'রাকাত নামায আদায় করে মোনাজাত করতেন এবং চিৎকার করে বলতেন, "আমি বিজয়ের আশ্বাস পেয়েছি, বিজয় আমাদেরই হবে।" বাস্তবেও তাই হয়েছে।

অনেকেই সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী আর সুলতান মাহমূদকে একই চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বীর সেনানী মনে করেন। অবশ্য তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একই ছিল। তাদের মাঝে শুধু ক্ষেত্র ও প্রতিপক্ষের পার্থক্য ছিল। আইয়ুবীর প্রতিপক্ষ ছিল ইহুদী ও খৃস্টশক্তি আর মাহমূদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল হিন্দু পৌত্তলিক রাজন্যবর্গ। ইহুদী ও খৃস্টানরা সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর সেনাদের ঘায়েল করতো প্রশিক্ষিত সুন্দরী রমণী ব্যবহার করে নারী গোয়েন্দা দিয়ে আর এর বিপরীতে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে এরা ব্যবহার করতো শয়তানী যাদু। তবে ইহুদী-খৃস্টানদের চেয়ে হিন্দুদের গোয়েন্দা তৎপরতা ছিল দুর্বল কিন্তু সুলতানের গোয়েন্দারা ছিল তৎপর ও চৌকস।

তবে একথা বলতেই হবে, সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর গোয়েন্দারা যেমন দৃঢ়চিত্ত ও লক্ষ্য অর্জনে অবিচল ছিল, মাহমূদের গোয়েন্দারা ছিল নৈতিক দিক দিয়ে ততোটাই দুর্বল। এদের অনেকেই হিন্দু নারী ও যাদুর ফাঁদে আটতে যেতো। অথবা হিন্দুস্তানের মুসলিম নামের কুলাঙ্গররা এদের ধরিয়ে দিতো। তারপরও সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর চেয়ে সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা কার্যক্রম ছিল বেশি ফলদায়ক।

ইতিহাসকে পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য, বিশেষ করে তরুণদের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশনের জন্যে গল্পের মতো করে রচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থ। বাস্তবে এর সবটুকুই সত্যিকার ইতিহাসের নির্যাস। আশা করি আমাদের নতুন প্রজন্ম ও তরুণরা এই সিরিজ পড়ে শত্রু-মিত্রের পার্থক্য, এদের আচরণ ও স্বভাব জেনে এবং আত্মপরিচয়ে বলীয়ান হয়ে পূর্বসূরীদের পথে চলার দিশা পাবে।

এনায়েতুল্লাহ
লাহোর।

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

প্রতিবেশী মুসলিম শাসকদের মধ্যে এলিখ খান ছিলো সুলতানের জঘন্যতম শত্রু। সুলতানের অনুপস্থিতির সুযোগে একবার সে গজনী দখলের উদ্দেশে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আগ্রাসন চালিয়েছিলো। কিন্তু তাকে গজনী বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে জীবন নিয়ে পালাতে হয়েছিলো। হিন্দুস্তান থেকে সংবাদ পেয়ে বিদ্যুদ্গতিতে গজনী ফিরে এসে সুলতান নিজে এলিখ খানকে প্রতিরোধ করেছিলেন। এলিখ খান সুলতানের শাসনাধীন খোরাসান অঞ্চল দখল করে নিতে তৎপর ছিলো।

"মাননীয় সুলতান! এলিখ খান একটি বিষধর সাপ। ও যতোদিন বেঁচে থাকবে, ততোদিন সুযোগ পেলেই আমাদের দংশন করতে থাকবে।" বলছিলেন সুলতান মাহমূদের কাছে আগত দুই গোয়েন্দা কর্মকর্তার একজন। এদের একজন সুলতানের নির্দেশে এলিখ খানের সেনাবাহিনীর মধ্যেই কাজ করতো। তারা জানালো, এবার আপনার অনুপস্থিতিতে এলিখ খান তার ভাই তোগা খান ও কাদের খানকে প্ররোচিত করছিলো তারা যেনো আপনার বিরুদ্ধে সামরিক সংঘাতে তাকে সহযোগিতা করে। তারা তিনজন মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল সেনাবাহিনী নিয়ে গজনী আক্রমণ করে দখল করে নিতে চাচ্ছিলো। কিন্তু তোগা ও কাদের খান আপনার ভয়ে এলিখ খানের সহযোগী হতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে এলিখ খান তার ভাই তোগা খানের বাদশাহী দখল করার জন্য সেনা অভিযান চালায়। কিন্তু উজগন্দ নামক স্থানে পৌঁছার পর তাদের উপর প্রচণ্ড তুষারপাত ও ঝড়োবৃষ্টি শুরু হয়। ফলে এলিখ খানের সৈন্যদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। বিপুলসংখ্যক সওয়ারী ও সৈন্য প্রচণ্ড তুষারপাতের কবলে পড়ে মারা যায়। প্রাকৃতিক প্রতিরোধের মুখে বড় ধরনের ক্ষতি সাধিত হয়। বাধ্য হয়েই এলিখ খান সেনাভিযান পরিহার করে আপন রাজধানীতে ফিরে আসে।

"তোগা খান কী করতে চায়?" জানতে চাইলেন সুলতান।

"তিনি আপনার সহযোগী। আমাদের যে সহকর্মী তোগা খানের সেনাবাহিনীতে কর্মরত, সে খবর দিয়েছে, এলিখ খানের অভিযান প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যর্থ হওয়ার পর তাকে হুঁশিয়ার করে পয়গাম পাঠায়, যদি পুনর্বার সে তার রাজ্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায়, তাহলে তিনি সুলতানের সাথে মৈত্রী গড়ে তুলবেন।"

"তোগা খানকে কি বিশ্বাস করা যায়?"

"মাননীয় সুলতান! কারো মনের কথা তো আর বলা যায় না। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা বোঝা যায়, তাতে তোগা খান আপনার সাথে মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী।"

"এর অর্থ হলো, এলিখ খানের মতো একজন হিংসুটে ক্ষমতালিপ্সু আগ্রাসীর দুষ্কৃতি থেকে নিজের রাজ্য ও শাসনের নিরাপত্তার জন্য তোগা খান আমাদের সাথে মৈত্রী গড়তে আগ্রহী।" ব্যাখ্যা করলেন সুলতান। "ঠিক আছে, আমি তার সাথে মৈত্রী স্থাপনে অস্বীকৃতি জানাবো না। তবে তোগা খানের সাথে আমার একবার সাক্ষাৎ হওয়া দরকার। এসব ক্ষমতালোভী মুসলিম শাসক আমাদের জন্য পায়ের বেড়িতে পরিণত হয়েছে।... তোমরা তোগা খানকে খুবই গোপনে একথা জানিয়ে দাও যে, আমি শীঘ্রই তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছি। সাক্ষাতের জন্য তাকে আমার কাছে আসতে হবে না, আমিও তার কাছে যাবো না। গজনীর বাইরে যতো দূরেই হোক সেখানে চলে আসলে আমি নিজে গিয়ে সেখানে তার সাথে সাক্ষাৎ করবো।"

এসব কারণে বিজয়ের উল্লাসে শরীক হতে পারেননি সুলতান। অভ্যন্তরীণ হিংসা আর স্বজাতির ক্ষমতলিপ্সু শাসকদের প্রতিহিংসায় গৃহযুদ্ধের খড়গ সবসময় সুলতানের মাথার উপর ঝুলন্ত ছিলো। তিনি এ পর্যায়ে এসে অনুভব করলেন, ঘরের ভেতরের এই বিষধর সাপগুলোর মাথা পিষে ফেলা এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অত্যন্ত সংগোপনে সুলতানের গোয়েন্দারা তোগা খানের কাছে তাঁর পয়গাম নিয়ে গেলে সাক্ষাতের ব্যাপারে তিনি কোন আপত্তি করেননি। তিনি গজনী থেকে নিরাপদ দূরত্বে একটি জায়গার কথা বলে দিলেন। চারদিন পর সেই জায়গায় দুই শাসকের সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হলো।

সময়মতো ঠিক জায়গায় তোগা খান পৌছে গেলো। জায়গাটি ছিলো প্রাকৃতিক নিসর্গে ভরপুর মনোরম। একটি খরস্রোতা নদীর পাশে ঘন গাছগাছালী আর বনফুলের সমাহারে সবুজ-শ্যামল জায়গায় তোগা খান ও সুলতানের সাক্ষাৎ হলো। সুলতান তোগা খানকে বুকে জড়িয়ে নিলেন।

"এ কথা কি সত্য যে, আপনি আমার সাথে মৈত্রী স্থাপন করতে চান? আমি আপনার কাছে পয়গাম দিয়ে দূত পাঠানোর কথা ভাবছিলাম, ঠিক সেই সময় আপনার পয়গাম পেয়ে আপনার ডাকে সাড়া দিলাম। আমি আপনার সাথে মৈত্রী চুক্তি করতে আগ্রহী।" বললেন তোগা খান।

"আপনার এই মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্য কি আপনার রাজত্বের নিরাপত্তার জন্য, নাকি মুসলমানরা পরস্পর মিলেমিশে থাকা আল্লাহর নির্দেশ– এ জন্য? আপনি যদি রাজত্বের নিরাপত্তার জন্য মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী হয়ে থাকেন, তাহলে সেই মৈত্রীতে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি শুধু বাগদাদ খেলাফতের অধীনে মৈত্রী স্থাপন করতে পারি। আমি চাই স্বাধীন মুসলিম রাজ্যগুলোর অস্তিত্ব থাকুক, সবাই খেলাফতে বাগদাদকেই মুসলমানদের কেন্দ্র বলে স্বীকার করে নিক। ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে অক্ষুণ্ন রাখতে হলে সকল মুসলিম শাসকের খেলাফতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিকল্প নেই।" সুলতান বললেন।

সুলতান মাহমূদের কথা শুনে তোগা খানের ঠোঁটের কোণে একটা বিরক্তিকর হাসির ভাব ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, "সুলতান মাহমূদকে আমি খুবই দূরদর্শী ও জ্ঞানী মনে করতাম। কিন্তু বুঝতে পারছি, আপনার মধ্যে রণকৌশল ও যুদ্ধজয়ের যেমন পারদর্শিতা আছে।... বোঝা যাচ্ছে, আপনার মধ্যে ধর্মীয় ভাবাবেগ প্রবল। বলা চলে আপনি ধর্মের ব্যাপারে অতি মাত্রায় আবেগপ্রবণ।"

"আপনি কী বোঝাতে চাচ্ছে? পরিষ্কার করে বলুন।" সুলতান বললেন।

"আপনি যে খলীফাকে ইসলামের সেবক ও কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে রেখেছেন, তিনি এতোটাই ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যলিপ্সু, যেমনটা ক্ষমতালিপ্সু আমার ভাই ও আপনার প্রতিবেশী মুসলিম শাসকবৃন্দ। এরা আপনার কাছ থেকে গজনী ও খোরাসান ছিনিয়ে নেয়ার জন্য সবসময়ই চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।" তোগা খান বললেন।

"আপনি কি বাগদাদের খলীফা কাদের বিল্লাহ আব্বাসীর কথা বলছেন?" জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

"আমি জানি, আমার কথা আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না।" বললেন তোগা খান। "বেশ কিছুদিন আগেই এ ব্যাপারে আমি আপনাকে অবহিত করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার ভাই এলিখ খানের কারণে আমি বিড়ম্বনা বাড়াতে চাইনি। সেই সাথে আমার মধ্যে এই আশংকাও বিরাজ করছিলো যে, আপনার কাছে আমার কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না। আপনি আমার ব্যাপারে বেশি সন্দেহপরায়ণ হয়ে যেতে পারেন। আমিও আপনার মতোই কেন্দ্রীয় খেলাফতের প্রত্যাশী। কিন্তু সেই খলিফাকে আমি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ভাবতে রাজি নই, যে একটি এলাকার শাসক হওয়ার পরও নিজের রাজ্যবিস্তারে চক্রান্তের আশ্রয় নেয়।"

"তোগা খান! ক্ষমতাসীন খলিফার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের আগে ভেবে নাও- যদি এ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহলে আমি সেনা অভিযান পরিচালনা করে তোমার রাজত্বের সাধ মিটিয়ে দেবো।" রাগে-ক্ষোভে ফুঁসে উঠলেন সুলতান।

হাসলেন তোগা খান। সেই হাসিতে কিছুটা রহস্যময়তা এনে বললেন, "মানুষের মধ্যে যখন শক্তির অহংকার দেখা দেয়, তখন নিজের ভুলগুলোকেও দূরদর্শিতা মনে করে এবং নিজের উপলব্ধির ব্যতিক্রম কোন কথা শুনতে পছন্দ করে না। সুলতান নিজেকে সামরিক শক্তির গর্ব থেকে মুক্ত করুন। আমি খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করে আপনার কাছ থেকে কী সার্থ অর্জন করতে পারবো? বাস্তবতা অনুধাবন করতে চেষ্টা করুন। দেখুন, আপনার বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের এমন কোন শাসক নেই, যে চক্রান্তে শরীক হয়নি। শুধু আমি আর কাদের খান ছাড়া আর সবাই আপনার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানও করেছে। আপনার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযানে শরীক না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আমরা সামরিক দিক থেকে দুর্বল ছিলাম। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আপনার বিরুদ্ধে মহাশক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারতাম। কিন্তু আমি ও কাদের খান সবসময় গৃহযুদ্ধের বিপক্ষে ছিলাম এবং আপনার ভারত অভিযান সাফল্য লাভের প্রত্যাশী ছিলাম। আপনার হয়তো জানা নেই, এলিখ খান আমাকে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য শুধু উস্কানিই দেয়নি, তার কথায় সাড়া না দেয়ার অপরাধে আমার বিরুদ্ধে...।"

"আপনার বিরুদ্ধে সেনাভিযানও করেছে।" তোগা খানের মুখের অনুচ্চারিত কথা পূর্ণ করে দিলেন সুলতান। "কুদরতি তুফান ও তুষারপাত তার সেই অভিযান ব্যর্থ করে দেয়। এ ছাড়াও আপনার নিজের ব্যাপারেও কোন কথা জানতে চাইলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন তোগা খান।

"আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে যদি আপনার কাছে খবর থেকে থাকে, তাহলে আমার ইচ্ছা ও বলার মধ্যে আপনার কোন ধরনের সংশয় থাকা উচিত নয়। তারপরও যদি আমার ব্যাপারে আপনার সংশয় দূর না হয়, তাহলে বুঝতে হবে আমার এখানে নিয়োজিত আপনার গোয়েন্দা কোন কাজই করছে না। শুধু শুধুই বেতন-ভাতা নিচ্ছে।" বললেন তোগা খান।

"বলুন, কী বলতে চান আপনি?" তোগা খানের উদ্দেশে বললেন সুলতান।

"বর্তমান খলীফা কাদের বিল্লাহ আব্বাসী ক্ষমতালিপ্সু এবং সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী।" বললেন তোগা খান। "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, খোরাসানের অর্ধেকটা শাসন করছেন খলীফা আর অর্ধেকটা আপনার নিয়ন্ত্রণে।... খলীফা আপনার শাসনাধীন অংশও কব্জা করতে উদগ্রীব। এ লক্ষ্যে তিনি ক্ষমতালিপ্সু এলিখ খানকে ব্যবহার করছেন। খলীফা এলিখ খানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে যদি আপনার বিরুদ্ধে সেনাভিযান চালায়, তাহলে তিনি সৈন্যবল দিয়ে প্রকাশ্য সহযোগিতা না করলেও গোপনে পরিবহন, অস্ত্রশস্ত্র ও আর্থিক সুবিধা দিয়ে সহযোগিতা করবেন। খলীফা যদি মুসলমানদের ঐক্য, সংহতি ও এককেন্দ্রিকতার প্রত্যাশী হতেন তাহলে তো তার উচিত ছিলো, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এলিখ খানের বিরুদ্ধে তিনি সেনাভিযান করতেন। তিনি দৃশ্যত হিন্দুস্তান অভিযানে আপনাকে বাহবা দিচ্ছেন আর পর্দার অন্তরালে চাচ্ছেন আপনি যেনো হিন্দুস্তানে ব্যস্ত থাকেন। আর ওখানে আপনার সামরিক শক্তি ক্ষয় হতে থাকুক, যাতে আপনি সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েন। খলীফা সেই দিনের প্রত্যাশায় প্রহর গুণছেন, যেদিন তিনি খবর পাবেন আপনি হিন্দুস্তানে পরাজিত হয়েছেন, নয়তো সম্মুখসমরে মারা গেছেন। আমীর আবুল মুলক, দারা বিন কাবুস, আবুল কাসেমকে আপনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছেন খলীফা কাদের বিল্লাহ আব্বাসী। এই অঞ্চলে গৃহযুদ্ধের পেছনে খলীফার চক্রান্ত সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।"

তোগা খানের কথা শুনে ক্ষোভে-দুঃখে সুলতানের চোখ লাল হয়ে যায়। তিনি যে খলীফাকে মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পবিত্র আসনে সমাসীন ভাবতেন, আজ তাকেই তার শত্রুতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা শুনে তিনি হতবাক হয়ে পড়েন।

"আপনি এসব কথার প্রমাণ চাইলে আমি আপনাকে প্রমাণ দেখাবো।" বললেন তোগা খান। "সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, আমি আপনার সহযোগী, প্রয়োজনে আমার সৈন্যরা আপনার সহযোগিতা করবে, আমার দূত যাবে আপনার কাছে। আমার সামরিক শক্তি কম হতে পারে, তবে ঈমানের দিক থেকে আমি দুর্বল নই। এলিখ খান যখন আমার বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালাতে এসেছিলো, তখন খোদায়ী তুষারপাত ও ঝড় তাকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটতে বাধ্য করেছিলো। সে একজন ঈমান বিক্রেতা।"

"যে জাতির কেন্দ্রীয় নেতা ঈমান বিক্রেতা হয়ে যায়, সেই জাতি সর্বাংশেই লুটেরা আর ডাকাতদের আখড়ায় পরিণত হয়।" দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন সুলতান।

খ্যাতিমান ঐতিহাসিক কাসিম ফারিশ্তা ও আলবিরুনী লিখেছেন, সুলতান মাহমূদকে কখনো এমন বিমর্ষ হতে দেখা যায়নি। তোগা খানের সাথে সাক্ষাতের পর তিনি যখন গজনীতে ফিরে এলেন, তখন তার চেহারা ছিলো বিধ্বস্ত। তিনি কোনো কথাই বলতে পারছিলেন না। অস্থিরতায় তার দু'হাত নিসপিশ করছিলো। উজির তাকে জিজ্ঞেস করলেও তোগা খানের সাথে কী কথা হয়েছিলো, তা বলেননি।

সুলতান মাহমূদ ছিলেন সমকালীন বিখ্যাত বুযুর্গ আবুল হাসান খিরকানীর ভাবশিষ্য। খিরকানী গজনী থেকে প্রায় দু'দিনের দূরত্বে বসবাস করতেন। সুলতান মাহমূদ মাঝে-মধ্যে আধ্যাত্মিক গুরু আবুল হাসান খিরকানীর সান্নিধ্যে যেতেন। গুরুর কাছে গেলে তিনি মানসিক প্রশান্তি অনুভব করতেন। তার মনের বোঝা খিরকানীর সাথে যে কোনো সমস্যা নিয়ে আলাপের দ্বারা হাল্কা হয়ে যেতো।

তোগা খানের সাথে সাক্ষাতের পর বাগদাদের খলীফা সম্পর্কে অনাকাঙ্ক্ষিত খবরাখবর শুনে তিনি এতোটাই কষ্ট পেলেন যে, তার চিন্তাশক্তি স্থবির হয়ে গেলো। কারণ, খলীফাকে তিনি বিশ্বের ইসলামী চেতনার কেন্দ্রবিন্দু

মনে করতেন। তিনি ভাবতেন, বাগদাদই ইসলাম ও মুসলমানদের ইজ্জত, মর্যাদা ও উজ্জীবনের প্রাণশক্তি। কিন্তু খলীফা কাদের বিল্লাহ আব্বাসী ছিলো ইসলামী সালতানাতের কলঙ্ক। তিনি মনে মনে কখনো তোগা খানের প্রতি ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন, আবার কখনো খলীফার প্রতি তার ক্ষোভ-ঘৃণা সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছিলো। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিলো যে, তোগা খান তাকে বিভ্রান্ত করতে অসত্য কোনো তথ্য দেয়নি। এ খবর তার চিত্তকে অস্থির করে তুলেছিলো। এমতাবস্থায় বারবার তার আধ্যাত্মিক গুরু আবুল হাসান খিরকানীর কথা মনে পড়ছিলো।

সেই দিনই তিনি আবুল হাসান খিরকানীর সাথে সাক্ষাতের জন্য রওনা হলেন। ভোরে রওনা হয়ে পরদিন সন্ধ্যায় তিনি গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন। গুরুর সকাশে পৌঁছে তাঁর হাতে চুমু দিয়ে সুলতান মাহমূদ বললেন, "আমার বিশ্বাসের পরিপন্থী একটা সংবাদ আমাকে মানসিকভাবে চরম হতাশাগ্রস্ত করে ফেলেছে। দারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছি আমি। আমাকে স্বস্তির কোনো পথ বাতলে দিন গুরু।"

"কী হয়েছে? হিন্দুস্তান থেকে কি পরাজিত হয়ে এসেছো?" জিজ্ঞেস করলেন খিরকানী।

"আপনাদের দুআয় হিন্দুস্তানের মুশরিকদের কাছে আমি কখনো পরাজিত হবো না। বিজয়ী কোনো সুলতান তখনই পরাজিত হয় যখন স্বজাতীয় কোন ভাই তার পিঠে আঘাত হানে।" সুলতান বললেন।

"আমি সেইসব আত্মঘাতী ভাইদের ব্যাপারে মোটেও বেখবর নই সুলতান। কিন্তু ভুলে যেও না আল্লাহ সত্যের পক্ষে আছেন। আল্লাহ তোমাকে মদদ করবেন, তোমার হতাশ হওয়ার কোনোই কারণ নেই।" বললেন খিরকানী।

"আপনি হয়তো জানেন। কিন্তু এ কথাও কি আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে যে, খলীফা আল-কাদের বিল্লাহ আমার বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে প্ররোচনা দিচ্ছে। আমাকে একথা বলেছে এলিখ খানের ভাই তোগা খান।" সুলতান বললেন।

খিরকানী স্মিত হেসে বললেন, "আমি এটাও জানি। খলীফার অসৎ ধারণা সম্পর্কে আমি যখন প্রথম জানতে পারি, তখন তুমি হিন্দুস্তানে। তুমি আজ না আসলে আমিই তোমাকে এ ব্যাপারে অবহিত করতে খবর পাঠাতাম।"

"তাহলে কি আমি তোগা খানের সংবাদকে সত্য বলেই বিশ্বাস করবো? আমি কি এতোদিন আত্মপ্রবঞ্চনায় ছিলাম যে খলীফাতুল মুসলিমীন আল্লাহর রসূলের প্রতিনিধি?" সুলতান বললেন।

"যারা সত্যিকার অর্থে রাসূলের প্রতিনিধি ছিলেন, তারা গত হয়ে গেছেন।" বললেন খিরকানী। "তাদের পর যারা এসেছে এবং ভবিষ্যতে যারা আসবে, তারা প্রবৃত্তির পূজারী খলীফা হবে। বর্তমান খলীফা একটি রাজ্য শাসন করে। সমরকন্দের শাসকও তিনি। তিনি যে কোনো মূল্যে তার মসনদ আঁকড়ে থাকতে তৎপর। রাজত্বই তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। খেলাফতের সকল রীতি পদদলিত করে বর্তমান খলীফা তার প্রত্যক্ষ রাজত্বের পরিধিকে সম্প্রসারিত করতে শক্তিশালী ও দুর্নীতিপরায়ণ শাসকদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলেছেন। তুমি কি জানো না, তোমার পিতার শাসনামলে কারামাতীদের সাথে বর্তমান খলীফা কাদের বিল্লাহ আব্বাসী গোপনে মৈত্রী গড়ে তুলেছিলেন? আর তখন কারামাতীরা অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিলো। এরপর তুমি যখন আপসহীনভাবে নিজের দৃঢ়তা ও সাহসিকতার উপর ভর করে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে হিন্দুদের দু'টি গজনী আক্রমণ প্রতিহত করে ওদের দেশের ভেতরে গিয়ে হিন্দুদের পরাজিত করে হিন্দু অঞ্চল নিজের কব্জায় আনতে শুরু করলে এবং কারামাতীদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে ওদের ভণ্ডামী ও ভ্রষ্টামী নির্মূল করতে সক্ষম হলে, তখনই খলীফা তোমাকে 'আমীমুল মিল্লাত ও য়ামীনুদ্দৌলা' খেতাবে ভূষিত করেন। তোমাকে তার বিশ্বস্ত ও অনুগত করে নেন। হিন্দুস্তানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পৌত্তলিকতা দূর করে সেখানে ইসলামের সত্যের বাণী প্রচার করা আর বিন কাসিমের বিজিত রাজ্যগুলোর নিগৃহীত মুসলমানদেরকে ব্রাহ্মাণ্যবাদীদের নাগপাশ থেকে মুক্তির ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই। বরং তোমার ক্রমবর্ধমান শক্তিতে সে শংকিত। এ আশংকা থেকেই তিনি প্রকাশ্যে তোমাকে বাহবা দিচ্ছেন আর নেপথ্যে তোমার শত্রুদেরকে উস্কানি দিয়ে তোমার শক্তি খর্ব করতে তৎপর রয়েছেন।"

"একজন কেন্দ্রীয় খলীফার এ ধরনের তৎপরতায় লিপ্ত হওয়া কি সমীচীন?" বললেন সুলতান।

"তুমি তাকে খলীফাতুল মুসলিমীন বলছো? আমি তাকে কখনো মুসলিম বিশ্বের অভিভাবক মনে করি না। শরীয়তের দৃষ্টিতে তার খলীফার মসনদে

আসীন হওয়ার কোনোই যোগ্যতা নেই। খলীফা হওয়ার জন্য তাকওয়া ও ইসলামী আদর্শের অনুসারী হওয়া অপরিহার্য। সেই সাথে মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন তার একান্ত কর্তব্য। তার মধ্যে কোনো ধরনের বৈষয়িক লালসা থাকা মোটেই উচিত নয়। এসব বিচারে সে মোটেও খলীফা হওয়ার উপযুক্ত নয়। যে খলীফা প্রত্যক্ষ রাজ্য শাসন করে, সে দুর্নীতিমুক্ত থাকতে পারে না।" খিরকানী বললেন।

"আমরা কি এমন খলীফাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারি না?" বললেন সুলতান মাহমূদ।

"না। কারণ, খেলাফত এখন পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত সম্পদে পরিণত হয়েছে। খেলাফত এখন ইসলামের প্রতীক হওয়ার পরিবর্তে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত ক্ষমতার মসনদে পরিণত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রধান কারণ খেলাফতের বিকৃতি সাধন। খেলাফত এখন শক্তি, ক্ষমতা ও ব্যক্তি শাসনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এখন যাকেই খলীফা বানানো হোক, সে-ই এমন হবে। ধীরে ধীরে মুসলিম উম্মাহ আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। উম্মাহর ঐক্য, সংহতি, সম্মান ও মর্যাদা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে মুসলিম সালতানাত। ভবিষ্যতে এমন হবে যে, হাতে কুরআন শরীফ নিয়ে খলীফারা নিজেদেরকে ইসলামের সেবক ঘোষণা করবে; কিন্তু ইসলামের শত্রুদেরকে বন্ধু আর বন্ধুদের শত্রু বানাবে। তারা হবে মুসলিম উম্মাহর জন্য জলজ্যান্ত ধোঁকা। তারা নিজেদের চারপাশে তোষামোদকারী ও অনুগত ভৃত্যের জাল তৈরি করবে। মুসলিম উম্মাহ আরবী, আজমী, মিশরী, তুর্কি নানা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে যাবে। ইসলামের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যেই সৃষ্টি হবে সংশয়। শাসন ক্ষমতায় যারাই অধিষ্ঠিত হবে, তারা হবে স্বৈরাচারী।" খিরকানী বললেন।

"এ প্রেক্ষিতে আমার কী করা উচিত?" বললেন সুলতান। "আমি খলীফাকে তোষামোদ করতে পারবো না।"

"খলীফাকে তুমি বুঝিয়ে দাও, তার চক্রান্তের ব্যাপারে তুমি অবগত।" বললেন খিরকানী। "মাহমূদ! মুসলমান যখন ঈমান নিয়ে বাণিজ্য করে, তখন বস্তুনিষ্ঠতার অধিকারী সত্যপন্থী ঈমানদানদের বোকা ও মিথ্যাবাদী মনে করতে থাকে। তুমি হিন্দুস্তানে যেসব লোকের হাতে ঐসব এলাকার শাসনভার ন্যস্ত

করেছো, আমার ভয় হয়, ওরা না আবার প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে যায়। মুসলমানদেরকে দু'টি জিনিস বড় বেশী ঘায়েল করে ফেলে- একটি প্রবৃত্তির খায়েশ আর অপরটি সম্পদ ও ক্ষমতার মোহ। হিন্দুস্তান ধোঁকা ও প্রতারণার উর্বর ভূমি। তোমার নিযুক্ত শাসকরা ঈমান বিক্রেতা হয়ে যায় কিনা এ বিষয়টি আমাকে খুব ভাবায়। ভবিষ্যতে তোমার সমূহ বিপদ ও কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে, তাতে তুমি ঘাবড়ে যেয়ো না।"

"তাহলে কি আমি খলীফাকে বিষয়টি জানিয়ে দেবো?" সুলতান বললেন।

"সত্য কথা বলতে দ্বিধা করা উচিত নয়। আমিও খলীফাকে বিষয়টি জানাতে চেষ্টা করবো।" খিরকানী বললেন।

আধ্যাত্মিক গুরু আবুল হাসান খিরকানীর সান্নিধ্য থেকে গজনী ফিরে সুলতান মাহমূদ বাগদাদের খলীফা কাদের বিল্লাহ আব্বাসীর কাছে এই বলে পয়গাম পাঠালেন যে- "গজনী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত খোরাসানের অধিকাংশ এলাকা আপনি দখল করে রেখেছেন। আপনাকে আমি আমাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এলাকার একটি মানচিত্র এঁকে দিচ্ছি। যেসব এলাকা আমি চিহ্নিত করে দেবো, সেসব অঞ্চল থেকে আপনি আপনার আমলা ও সেনাদের প্রত্যাহার করে নিবেন। খলীফার কোনো এলাকারই প্রত্যক্ষ শাসক হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমি জানি, আপনি আমার প্রস্তাব মানতে সম্মত হবেন না। এতোদিন আমি খেলাফতের সম্মানে নীরব ছিলাম; কিন্তু আমার আজীবন লালিত ধারণা এখন ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আশা করি, আপনি নির্বিবাদে আমার চিহ্নিত এলাকাগুলো আমাদের ফেরত দেবেন। আশা করি, নিজের মর্যাদা ও সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে আপনি কোনো ধরনের প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে আমার আবেদনে সাড়া দেবেন।"

ঐতিহাসিক ফারিশতা, আলবিরুনী ও গরদিজী প্রমুখ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে খলীফা কাদের বিল্লাহ পুরোপুরি জ্ঞাত ছিলেন। তিনি এটাও জানতেন যে, সুলতান যা ইচ্ছা করেন এবং বলেন, তা বাস্তবে প্রতিফলন না ঘটিয়ে ক্ষান্ত হন না। খলীফা এটাও জানতেন, গজনী অঞ্চলের সকল অধিবাসী সুলতানের অনুগত। তাই সুলতানের পয়গাম পাওয়ার পর কোনো ধরনের টালবাহানা না করে খোরাসান রাজ্যের যে অংশটুকু গজনী সালতানাতের অংশ ছিলো, তা থেকে সেনাবাহিনী ও আমলাদের প্রত্যাহার করে সুলতানের নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর করলেন।

খলীফার এই কাজে সুলতান আরো ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এতো তাড়াতাড়ি খলীফার রণেভঙ্গ দেয়ার অর্থ হলো তার মধ্যে আসলে ধর্মীয় চেতনা অনুপস্থিত। সে ক্ষমতালিপ্সু ও ধুরন্ধর। এরপর সুলতান মাহমূদ এই বলে আবার বাগদাদে দূত পাঠালেন যে, সমরকন্দের উপর আপনার দখলদারিত্ব বৈধ নয়। এই শহরটিও আমার অধীনে হস্তান্তর করুন। সুলতানের সমরকন্দ চাওয়ার পয়গামের জবাবে খলীফা এই বলে তার এক বিশেষ দূতকে সুলতানের কাছে পাঠালেন যে, "খলীফা কোনো অবস্থাতেই সমরকন্দের দখল হস্তান্তর করবেন না। খলীফা এও বলেছেন, আপনি যদি এই দাবী আদায়ে শক্তি প্রয়োগ করেন, তাহলে খলীফা গোটা জাতির সম্মুখে আপনাকে অপমানিত করবেন।"

জবাবে সুলতান মাহমূদ দূতকে বললেন, "তুমি বাগদাদে গিয়ে খলীফাকে জিজ্ঞেস করো, সে কী চায়। আমি এক হাজার জঙ্গী হস্তি নিয়ে বাগদাদ আসবো।" রাগে-ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, "খলীফাকে বলবে, আমাকে যদি বাগদাদ আসতেই হয়, তাহলে আমি বাগদাদের রাজপ্রাসাদের প্রতিটি ইট খুলে ফেলবো আর প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ হাতির পিঠে বোঝাই করে গজনী নিয়ে আসবো।"

এক ইংরেজ ঐতিহাসিক এইচ এইচ হোয়ার্থ অন্যান্য মুসলিম ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃত করে লিখেছেন, সুলতান মাহমূদের এই হুমকিতে খলীফা কাদের বিল্লাহ আব্বাসী রীতিমতো ভড়কে যান। তিনি এমন এক মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন যে, ইচ্ছা করে নিজের পদকে অবলম্বন করে তিনি সুলতান মাহমূদকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিতে পারতেন। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবনাচার এতোই কদর্য ছিলো যে; তিনি নিজ অবস্থানের চেয়ে অত্যন্ত নমনীয়ভাবে সুলতান মাহমূদের ক্ষোভের জবাব দিলেন। যার ফলে সুলতান মাহমূদ সেনাভিযান পরিচালনা করে সমরকন্দকে নিজের শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

এক হাজার বারো খৃস্টাব্দের প্রায় অর্ধেক বছর চলে গেছে। সুলতান মাহমূদ ভারতের বিজিত রাজ্যগুলোর ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিতই ছিলেন। পা াবের রাজা আনন্দ পাল তখনো জীবিত থাকলেও তার শক্তি-সামর্থ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো। তিনি সুলতান মাহমূদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

গোয়েন্দাদের মাধ্যমে হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজাদের তৎপরতার খবরাখবর তিনি রীতিমতো পাচ্ছিলেন। তার কাছে একদিন খবর এলো, রাজা আনন্দ পাল মারা গেছেন। তার ছেলে তরুণ চন্দ্রপাল এখন পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

থানেশ্বর মন্দিরের সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ বিষ্ণুদেবীর মূর্তি সুলতান মাহমূদ গজনী নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে নিয়ে বিষ্ণুমূর্তিকে খুবই অপমানজনকভাবে ধ্বংস করা হয়েছিলো। হিন্দুদের কাছে বিষ্ণুমূর্তির অমর্যাদা যতোটুকু না ছিলো গ্লানির, তার চেয়ে বেশি ছিলো আতংকের। হিন্দুরা বিষ্ণুমূর্তির অমর্যাদার কারণে দেবদেবীদের অভিশাপে নিপতিত হওয়ার আশংকায় ভীতসন্ত্রস্ত ছিলো। পণ্ডিতরা দেবালয়ে মূর্তির সামনে বসে ভয়ে থর থর করে কাঁপতো। তাদের ধারণা ছিলো, বিষ্ণমূর্তি পৃথিবীতে মানুষের আগমনের সাথে সাথেই সৃষ্টি হয়েছিলো। পৃথিবীর প্রথম মানুষটিও বিষ্ণুমূর্তিকেই পূজা করতো। সেই পুরনো দেবমূর্তির এহেন অমর্যাদায় হিন্দুরা গঙ্গার পানিতে নেমে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো। সাধারণ একটু বাতাস এলে কিংবা আকাশের গর্জন শুনলেই হিন্দুরা দু'হাত জোড় করে বিড় বিড় করে ভগবানের কাছে ক্ষমাভিক্ষা চাইতো।

জয়পালের মৃত্যুর পর আনন্দ পাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বেশ জাকজমক নিয়ে কয়েকটি যুদ্ধে সুলতান মাহমূদকে হুমকি দিয়েছিলো। কিন্তু প্রত্যেকটি যুদ্ধেই সুলতান মাহমূদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় আনন্দ পাল। অবশেষে সে সুলতানের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এরপরও সুলতানকে ফাঁকি দিয়ে জব্দ করার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয় আনন্দ পাল।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, ক্রমাগত পরাজয়ে আনন্দপাল হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলো। বিশেষ করে সুলতান মাহমূদ থানেশ্বর মন্দির কব্জা করে নেয়ার পর এর শোক সইতে না পেরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে রাজা আনন্দ পাল। অবশেষে তার মৃত্যুর পর পুত্র তরুণ চন্দ্রপাল ক্ষমতাসীন হয়।

রাজা আনন্দ পালের মৃত্যুর খবর শুনে হিন্দুস্তানের ছোট-বড় সকল রাজা-মহারাজা ও রায়গণ এসে লাহোরে জমায়েত হয় আনন্দ পালের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে। আনন্দ পালের মরদেহ যখন চিতায় জ্বলছিলো, তখন কনৌজের রাজা সমবেত হিন্দু শাসকদের উদ্দেশে উচ্চ আওয়াজে বললো,

“আজ আমরা এমন এক মহান পুরুষের চিতার পাশে দাঁড়িয়েছি, যিনি সারাজীবন মন্দিরের হেফাযতের জন্য মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে কাটিয়েছেন। হিন্দুস্তানের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র শাসক, যিনি নিজের সীমানা পেরিয়ে গিয়ে সুলতান মাহমূদকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। আমাদের গাদ্দারী ও কাপুরুষতার কারণে আজ হিন্দুস্তানের ঐতিহাসিক মন্দিরগুলো থেকে মুসলমানদের আযান ধ্বনিত হচ্ছে। আসুন, বীরপুরুষ রাজা আনন্দ পালের জ্বলন্ত চিতার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা শপথ নিই, আমরা সবাই মিলে মন্দিরের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবো এবং হৃত মন্দিরগুলো ফিরিয়ে এনে মসজিদগুলোকে মন্দিরে পরিণত করবো।”

“আমি এই অঙ্গীকার করছি বিষ্ণুদেবীর প্রতিশোধ নিতে। আমি গজনীর প্রতিটি ইট খুলে ফেলবো।” বললো কনৌজের রাজা।

সমবেত প্রত্যেক রাজা-মহারাজা, ঋষি ও পুরোহিত আনন্দ পালের জ্বলন্ত চিতার তপ্ত আগুনের তাপে উত্তপ্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলো, তারা ভারতে ইসলামের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি লাশের বাঁধ দিয়ে হলেও রোধ করবে। প্রত্যেকেই শপথ করলো, তারা মুসলমানদের মসজিদগুলোকে মন্দির, মুসলমানদেরকে হিন্দু এবং গজনীকে মহাভারতের রাজধানীতে রূপান্তরিত করবে। আনন্দ পালের উত্তরাধিকারী তরুণ চন্দ্রপাল সমবেত রাজাদের সারিতে দাঁড়িয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিলো।

“রাজকুমার তরুণ চন্দ্রপালেরও এ সমাবেশে কিছু বলা উচিত। তিনিই তো এখন ক্ষমতাসীন রাজা।” বললো এক পুরোহিত। “শোক-তাপ এখন ভুলে যাওয়া উচিত। রাজপুতরা অশ্রু নয়, বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শোককে শক্তিতে পরিণত করে।”

যুবক তরুণ চন্দ্রপাল সারি ঠেলে আরো সামনে এগিয়ে এলো। বাবার জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে সমবেত রাজা-মহারাজাদের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, “আপনারা সবাই তো কঠিন সব অঙ্গীকারবাণী উচ্চারণ করলেন। কিন্তু বলুন তো, আপনাদের মধ্যে এমন ক'জন আছেন, যিনি কৃত অঙ্গীকার পূরণ করবেন? ইসলামের স্রোতের সামনে লাশের বাঁধ এতোদিন পর্যন্ত কেন আপনারা দিতে পারেননি। মুসলমানরা যখন থানেশ্বরের দিকে যাত্রা করেছিলো, তখন আপনাদের এই শক্তি ও দাপট কোথায় ছিলো? এখানকার

মসজিদগুলোকে মন্দির এবং মুসলমানদেরকে হিন্দু বানানো খুব কঠিন কাজ নয়, রাজপুতরা রক্তের সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়াকে ভয় করে না। আপনারা আমার বাবার খুব প্রশংসা করেছেন; কিন্তু বাবা তার এলাকায় প্রত্যেকটি যুদ্ধ মোকাবেলা করেছেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের কাছে এ জন্য কিছু সৈন্য দিয়েছিলেন, যাতে আমরা মুসলমানদেরকে পেশোয়ারে ঠেকিয়ে রাখি। আপনারা কথায় যেমন সাহসিকতা দেখান, কাজে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আপনারা চান, সুলতান মাহমূদের অগ্রযাত্রা আমরা এখানেই বাধাগ্রস্ত করে রাখি আর আপনারা নির্বিবাদে রাজত্ব করবেন।"

"মহারাজ! আপনি আসলে কী বলতে চাচ্ছেন?" তরুণ চন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলো এক রাজা।

"আমি পরিষ্কার বলে দিতে চাই, আমার রাজ্যকে নিরাপদ রাখার জন্য আমি মুসলমানদেরকে বন্ধু হিসেবে বরণ করে নেবো। সুলতান মাহমূদ আমার রাজ্যে আক্রমণ করলে আমি মোকাবেলা করবো। কিন্তু এখানকার নিরপরাধ মুসলমানদের উপর আমি হাত উঠাবো না।" বললো তরুণ চন্দ্রপাল।

"তাহলে আপনি কি মাহমূদের মিত্র ও আনুগত্য মেনে নিচ্ছেন?" প্রশ্ন করলো কনৌজের রাজা।

"হ্যাঁ, আমি মাহমূদকে কর দেবো এবং তার আনুগত্য মেনে চলতেই চেষ্টা করবো।"

"আপনি কি জানেন না, এখানকার মুসলমানরা হিন্দুস্তানে বসবাস করলেও গজনী সুলতানেরই আনুগত্য করে?" বললো অপর এক রাজা।

"আপনার কি একথা জানা নেই যে, গজনীতেই বহু হিন্দু বসবাস করে, আর গজনী বাহিনীতে পৃথক একটি হিন্দু ইউনিট পর্যন্ত রয়েছে? কিন্তু তাদের থেকে কি কেউ বিদ্রোহ করে সেখান থেকে এখানে এসেছে? ওদের কব্জায় আছে সেনাবাহিনীর চৌকস ঘোড়া, জঙ্গী হাতি, আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র। তারা সেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারছে। তাদের কেউ এ পর্যন্ত কেনো হিন্দুস্তানে পালিয়ে এলো না? এখানকার সব মুসলমান আমাদের শত্রু নয়। অনেকেই আমাদের খুবই বিশ্বস্ত।" বললো তরুণ চন্দ্রপাল।

হঠাৎ মহিলাদের ভিড় ঠেলে এক সুন্দরী তরুণী রাজা-মহারাজাদের সারিতে দাঁড়ানো তরুণচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ালো। সে তরুণচন্দ্রের হাত

থেকে তরবারী কেড়ে নিয়ে উঁচিয়ে ধরে বললো, "আপনারা সবাই জানেন, আমি এই ব্যক্তির স্ত্রী। তাকে বলুন, সে আমাকে বাবার জ্বলন্ত চিতায় ফেলে কিংবা এই তরবারী দিয়ে হত্যা করুক। আমি পরিষ্কার ঘোষণা করছি, আমি রাজপুতের কন্যা। আমার বাবা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি আমার ধর্ম অবমাননার প্রতিশোধ নেবো, আমার বাবার রক্তের বদলা নেবো। আজ থেকে আমি আমার স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করছি। সে একটা কাপুরুষ। যে ব্যক্তি গজনী সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না।"

তরুণচন্দ্র তরুণীর প্রতি ধেয়ে এলো। কিন্তু ততোক্ষণে তাদের দু'জনের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে গেলো আরেক যুবক এবং দ্রুত সে তরুণীর হাতের তরবারী কেড়ে নিলো। এই তরুণ ভীমপাল। আনন্দ পালের দ্বিতীয় পুত্র এবং তরুণচন্দ্রের ছোট ভাই। ঐতিহাসিকরা তাকে ভীমপাল বাহাদুর নামে উল্লেখ করেছেন। ভীমপাল ছিলো খুবই ডানপিঠে ও দুঃসাহসী। ভীমপাল তরুণপালকে বাধা দিয়ে বললো, "খবরদার তরুণপাল! এখানে এমন কেউ নেই, যে তোমার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। এই মহিলার গায়ে তুমি হাত তুললে তুমি যে আমার ভাই এবং ওর স্বামী আমি সেকথা ভুলে যাবো। এখন থেকে আমিই হবো আমার বাবার সিংহাসনের অধিকারী। বাবার সিংহাসনের সে-ই স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, যে তার অপমানের প্রতিশোধ নিতে সক্ষম।"

ভীমচন্দ্র সমবেত লোকদের দিকে তাকিয়ে তরবারী উঁচিয়ে বললো, "আমি যদি গজনী সুলতানের বশ্যতা অস্বীকার করি এবং বিষ্ণুদেবীর অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার অঙ্গীকার করি, তাহলে কি আপনারা আমাকে বাবার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নেবেন?"

"হ্যাঁ, তুমিই মহারাজা জয়পাল ও মহারাজা আনন্দ পালের যোগ্য উত্তরসূরী।" ঘোষণা করলো প্রধান পুরোহিত।

এরপরই সমাবেশ থেকে আওয়াজ উঠলো, "তরুণচন্দ্র পালকে বসিয়ে দাও, তরুণচন্দ্রের কাছ থেকে তরবারী ছিনিয়ে নাও। ভীমপাল মহারাজের জয় হোক।"

দেখতে দেখতে ভীমপালের জয়ধ্বনি উচ্চকিত হলো। এর সাথে পাল্লা দিয়ে উঁচু হয়ে উঠলো আনন্দ পালের চিতার আগুন। চিতার লেলিহান অগ্নি

শিখার সাঁই সাঁই শব্দ আর ভীমপালের জয়ধ্বনিতে তলিয়ে গেলো তরুণচন্দ্রের বাস্তববাদিতার অস্তিত্ব। কিছুক্ষণের মধ্যে আনন্দ পালের দূরদর্শী বড় ছেলে ব্রাহ্মণ্যবাদী উগ্রতার কাছে পরাজিত হয়ে সাধারণ রাজকুমারে পরিণত হলো। তার জায়গায় আনন্দ পালের উগ্র ও অদূরদর্শী দ্বিতীয় পুত্র ভীমপাল রাজা-মহারাজা ও পুরোহিতদের সমর্থনে সিংহাসনে স্থলাভিষিক্ত হলো। পাঞ্জাবের মহারাজায় অভিষিক্ত হলো ভীমপাল।

* * *

দিন শেষে সেই রাতেই আনন্দ পালের রেখে যাওয়া রাজপ্রাসাদে হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজা ও পুরোহিতদের কনফারেন্স বসে। সমাবেশের সভাপতির আসন অলংকৃত করলো আনন্দ পালের দ্বিতীয় পুত্র ভীমপাল। মসনদ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রাসাদ থেকে গায়েব হয়ে গেলো তরুণচন্দ্র পাল। শুরু হলো ভীমপালের নেতৃত্বে মুসলিম উৎখাতের চিন্তা-ভাবনা।

সবচেয়ে প্রবীণ পুরোহিত প্রস্তাব করলো, "হিন্দুস্তানের সবগুলো মসজিদ গুড়িয়ে দিতে হবে এবং এখানকার মুসলমানদের বাধ্য করা হবে- হয় তারা গজনী চলে যাবে, নয়তো সনাতন ধর্ম গ্রহণ করবে।"

"এ ব্যাপারে আমি দাদা তরুণচন্দ্রের কথা সমর্থন করি। নিরপরাধ মুসলমানদের উপর আমরা কেনো হাত তুলতে যাবো?" বললো ভীমপাল। "আমরা শত্রুর সংখ্যা বাড়াতে চাই না, বন্ধুর সংখ্যা বাড়াতে চাই। এখানকার সবগুলো মসজিদ ধ্বংস করে দিলেও মুসলমানদের কিছু যায়-আসে না। মুসলমানরা যেখানেই নামায পড়তে দাঁড়ায়, সে জায়গায়ই মসজিদে পরিণত হয়। এসব ছায়ার পেছনে আমাদের দৌড়ে কোনো লাভ হবে না। সুলতান মাহমূদের মতো মহাশক্তির বিরুদ্ধে হবে আমাদের লড়াই। আমি হিন্দুস্তানের ইতিহাসে আমার নামের সাথে এ কাহিনী রেখে যেতে চাই না, ভীমপাল গজনীর সুলতানের কাছে পরাজিত হয়ে নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছে।"

"আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো মুসলমানরা শুধু আমাদের মন্দিরগুলো ধ্বংস করে দেয়নি; মন্দির দখল হয়ে যাওয়ার কারণে বিপুল হিন্দু ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে।" বললো এক বিচক্ষণ পুরোহিত।

"লোকজন দেবদেবীর অভিশাপ ভয় পাচ্ছে; কিন্তু এখনো দেবদেবীদের কোন অভিশাপে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়নি। দেবতাদের অভিশাপ বর্ষণের আগেই আমাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাণ্ডব হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে, মুসলমানরা যেগুলোকে ভূত বলে সেগুলোই আমাদের দেবতা। দেবতাদের অসম্মানকারী কোনো মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নেই।"

"যেসব দুর্গ মুসলমানদের দখলে রয়েছে, সেগুলো অবরোধ করা হোক।" প্রস্তাব করলো এক রাজা। কিন্তু সাথে সাথেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলো কয়েকজন। তারা বললো, "মুসলিম দখলকৃত কোনো দুর্গ অবরুদ্ধ হওয়ার খবর পেলে পূর্ণ শক্তি নিয়ে চলে আসবে মাহমূদ। যে কোনো সামরিক পদক্ষেপের আগে আমাদের প্রস্তুতি নেয়া দরকার। আর প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন সময়। সময় নিয়ে পূর্ণ প্রস্তুতির পর আমরা ইচ্ছা করলে মাহমূদকে হিন্দুস্তানের কোনো সুবিধামতো এলাকায় টেনে নিয়ে ফাঁদে ফেলা সম্ভব হবে।"

"এ সময়ের মধ্যে রেরা, মুলতান ও থানেশ্বরে যেসব মুসলিম কর্মকর্তা রয়েছে তাদেরকে আমাদের হাত করে নেয়ার চেষ্টা করা দরকার, যাতে তারা মাহমূদের সহযোগিতা না করে।" প্রস্তাব করলো ভীমপালের উজির। ভীমপালের উজির ছিলো অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। সে আরো বললো, "মুসলমান কর্মকর্তাদের বাগে আনার কৌশল আমাদের জানা আছে। সে কৌশল প্রয়োগ করে আমরা এদের অকার্যকর করে দিতে পারি।"

"মুসলমান কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি খুবই সতর্ক ও নিষ্ঠাবান।" বললো ভীমপাল। "তবুও আমার মনে হয়, আপনার কোনো কৌশল এসব সেনাপতি ও কর্তাব্যক্তিদের বাগে আনতে সফল হবে।"

উজির স্মিত হেসে বললো, "মুসলমানরাও মানুষ। সাধারণ মানুষরা অবতার ও পয়গাম্বরের গুণবিশিষ্ট হয় না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা দুর্বলতা এবং একটা চাহিদা থাকে। যারা এই দুর্বলতা ও চাহিদাকে দমিয়ে রাখতে পারে, তারাই হয় মুনি-ঋষি কিংবা পীর-বুযুর্গ। আমরা মানুষের মধ্যে থাকা সহজাত দুর্বলতা ও চাহিদাকে উস্কে দিয়ে তাদেরকে সেই উচ্চাসন থেকে নিচে নামিয়ে দিতে পারি। তাদের মধ্যে ভোগবাদের স্বপ্ন জাগিয়ে দিতে পারলে তারা কর্তব্যপরায়ণতা ভুলে যাবে।... আমরা থানেশ্বর থেকেই এ কাজ শুরু করতে পারি।"

রাজা-মহারাজাদের কনফারেন্সে আরো সিদ্ধান্ত হলো, এখন থেকে ভারতের সকল রাজা-মহারাজা সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের পূর্ণ প্রস্তুতি শুরু করবে। সেই সাথে মুসলমান সেনাধ্যক্ষ ও কর্মকর্তাদের পক্ষে নিয়ে আসার পূর্ণ চেষ্টাও অব্যাহত থাকবে। এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর আনন্দ পালের দ্বিতীয় পুত্রকে সুলতান মাহমূদের কাছে এই বলে বার্তা পাঠানোর কথা বলা হলো যে, তিনি আর সুলতান মাহমূদের করদাতা নন। রাজা আনন্দপাল যে মৈত্রী চুক্তি করেছিলেন, তা প্রত্যাখ্যান করা হলো।

হিন্দুস্তান থেকে ফেরার সময় সুলতান মাহমূদ তার অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল তাঈ, আলতানতুশ এবং আরসালান জায়েবকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, সেখানকার সমস্যা ছিলো খুবই কঠিন। হিন্দুস্তানের অভিযানে অনেক অভিজ্ঞ জেনারেল ছিলেন। কিন্তু তারা উল্লেখিত তিন জেনারেলের মতো দূরদর্শী ছিলেন না। সুলতান সেসব সেনাধ্যক্ষকেই বিজিত এলাকার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োগ করেছিলেন।

থানেশ্বর রাজ্যের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন বাহরাম গৌঢ় আর শহরের গভর্নর প্রশাসক ছিলেন কুতুব গোজাক। কুতুব গোজাক এ-ই প্রথম হিন্দুস্তানে এসেছিলেন। এখানকার প্রতিটি জিনিসই তার মনে বিস্ময় সৃষ্টি করতো। তিনি যখন দেখলেন, দু'টি মেয়েকে দু'টি আসনে বসিয়ে সেই আসনগুলোকে মানুষশূন্য করে ফেলা হলো এবং কিছুক্ষণ পর সেই জায়গায় আবার সেই তরুণীদেরকেই গায়েব থেকে হাজির করা হলো, তাতে তিনি খুবই বিস্মিত হলেন। গজনীর নারীরাও রূপ-সৌন্দর্যে কম ছিলো না কিন্তু তার কাছে হিন্দুস্তানের নারীদের রূপ-লাবণ্য দারুণ আকর্ষণীয় মনে হলো। তাকে জানানো হলো, হিন্দুস্তান আসলেই কারামত ও জাদুর দেশ। এখানে নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল কোন্‌টা সত্যিকার কারামত আর কোন্‌টা জাদু। কুতুব গোজাকের কাছে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যজনক লাগলো, এখানকার লোকজন সাপপূজা করে এবং নারীরা তাদের দুধ সাপকেও পান করায়।

একদিন সাত-আটজনের একটি মুসাফির সন্ন্যাসীদল চার-পাঁচজন তরুণী নিয়ে থানেশ্বর মন্দিরে পূজা দিতে এলো। সন্নাসীদের সবার গলা থেকে পায়ের

টাখনু পর্যন্ত সাদা কাপড়ে আবৃত। তরুণীরাও সাদা কাপড়ে আবৃতা। কিন্তু খুব হাল্কা ওড়না দিয়ে তাদের মাথা ঢাকা। সব কজন তরুণীরই চুল হাল্কা বাদামী, চোখ নীলাভ, গায়ের রঙ শ্যামল-রাঙা মিশেল। সবার গড়ন ও চালচলন এক ধরনের। পুরুষদের সবারই দাড়ি আছে, তবে মাত্র একজনের দাড়ি সাদা।

সন্ধ্যার পর এই অভিযাত্রীদল যখন থানেশ্বর দুর্গে প্রবেশ করছিলো, তখন তাদের সবাইকে দেখে অতি ধর্মপরায়ণ সাধু-সন্ন্যাসী ও সংসার বৈরাগীই মনে হচ্ছিলো। তারা দুর্গের ফটকে এসে দুর্গপতির সাথে সাক্ষাতের আবেদন করলো। তারা আবেদনে জানালো, তাদের সাথে কয়েকজন তরুণী আছে। এ জন্য তারা সরাইখানায় থাকতে ভয় পাচ্ছে। তারা দুর্গপতির সাথে সাক্ষাত করে একটা নিরাপদ জায়গায় রাতযাপনের অনুমতি চায়। তাদের আবেদন মানবিক বিবেচনা করে দুর্গপতির সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হলো। মুসাফিরদল দুর্গপতির কাছে যেতে দেখে সেনাধ্যক্ষ বাহরাম ও তার ডেপুটিও তাদের দেখার জন্য দুর্গপতির দফতরের দিকে রওনা হলেন।

এ লোকগুলোর পোশাক-পরিচ্ছদ তেমন আশ্চর্যকর ছিলো না। আশ্চর্যের বিষয় ছিলো, এই দলের পুরুষরা যেমন ছিলো সুন্দর, তার চেয়েও বেশি সুন্দর ছিলো তরুণীরা। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিলো পুরুষদের মধ্যে সাদা দাড়িওয়ালা লোকটির গলায় একটি সাপ পেঁচানো ছিলো। সাপটি ফণা তুলে কখনো লোকটির মাথার উপর, কখনো চেহারায় উঁকি-ঝুঁকি মারছিলো। পুরুষদের সবার কাছেই ছিলো একটি করে সুন্দর লাঠি। প্রত্যেক লাঠির মাথায় ছিলো একটি করে ফণাদার সাপের মূর্তি। তরুণীদের গলায় সুন্দর কারুকার্যময় সুতার তৈরি দড়ি পেঁচানো ছিলো। সেসব দড়িতে ছোট ছোট ঘুঙুর বাঁধা ছিলো। তরুণীদের হাঁটার তালে তালে ছোট ঘুঙুরগুলো এক ধরনের বাজনা সৃষ্টি করছিলা, যেনো কোনো ঝরনার পানি পাথরে আঘাত খেয়ে খেয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে।

দুর্গশাসক কুতুব গোজাক অভিযাত্রীদলকে সসম্মানে বসালেন। কারণ, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তার কাছে সম্মানি শ্রেণীর লোক মনে হচ্ছিলো।

"আমরা আপনার কাছে আসবার সাহস করতাম না; কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি, আপনি একটি ভ্রান্ত ধর্মের বিরোধী। বাতিল নির্মূলে আপনাদের

প্রয়াসের জন্য আমরা আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই অনেক বড় মাপের ও অভিজাত বংশের লোক।" বললো সাদা দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসী।

"আপনাদের ধর্ম কী?" সেনাধ্যক্ষ বাহরাম জিজ্ঞেস করলেন।

"আমরা সাপের পূজারী।" বললো সাদা দাড়িওয়ালা। "অবশ্য সাপের পূজা করলেও আমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করি। আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন সেই সব লোক, যারা বাদশাহ সিকান্দরের সাথে মহাভারতে এসেছিলেন। তাদের সম্পর্কে এই জনশ্রুতি আছে যে, তারা একটি বিশাল নাগকে খোঁজ করতেন, যে নাগের দেখা তারা ভারতের বাইরে কোথাও পাননি। কিন্তু হিন্দুস্তানে এসে তারা কাঙ্ক্ষিত নাগের দেখা পান। ফলে তারা সেকান্দরের সেনাবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং শীর্ষ নাগের পেছনে দৌড়াতে থাকেন। বলা হয়ে থাকে, প্রভু তাদেরকে মুকুটধারী সেই নাগ দিয়েছিলেন। সেই নাগের রঙ ছিলো লাল-সোনালী। তার মাথায় ছিলো টুপির মতো ফুল এবং একটি কালো নাগের উপরে সেই নাগটি আরোহণ করেছিলো।... মুকুটধারী নাগ দৌড়ে পালাতে থাকলে আমাদের পূর্বপুরুষদের কয়েকজন নাগের পিছু ছুটতে থাকলো। এক পর্যায়ে নাগ এমন দুর্গম এলাকায় চলে গেলো, যেখানে কোনো মানুষের পক্ষে পৌঁছা সম্ভব ছিলো না। গঙ্গা নদীর একটি শাখা নদী প্রবাহিত হচ্ছিলো এই এলাকা দিয়ে। নদীর উপরে একটি প্রাকৃতিক পুল ছিলো। বস্তুত সেটি ছিলো নদী প্রস্তের সমান বড় একটি পাথর। কিন্তু পাথরটি ছিলো খুব সরু এবং ধারালো। সেই পাথরের নিচ দিয়ে প্রবাহিত পাহাড়ি নদীটি ছিলো খুবই স্রোতস্বিনী এবং গভীর। নাগ সেই পুলের উপর দিয়ে চলে গেলো। চার অনুসরণকারীও তার পিছু নিলো। তন্মধ্যে দু'জন পা পিচলে পড়ে গেলে তারা খরস্রোতা নদীর স্রোতে ভেসে গেলো আর দু'জন তীরে পৌঁছতে সক্ষম হলো। নদীর এপারটি ছিলো নাগদের বসতি। খুবই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর এলাকা। আমাদের দুই পূর্বপুরুষ সেখানেই পরবর্তীতে বসতি স্থাপন করেন। সেখান থেকেই এসেছি আমরা। সাপদের সাথেই আমাদের বসবাস। সাপই আমাদের ধ্যান-জ্ঞান।"

"সাপকে কি আপনারা উপাস্য মনে করেন?" জিজ্ঞেস করলেন প্রশাসক।

"না, আমরা প্রভুকেই প্রভু মানি। কিন্তু সাপকে আমরা এ জন্য পূজা করি যে, এই সাপ আমাদের ও প্রভুর মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে। সাপ যেমন শয়তানি করতে পারে, তদ্রূপ ফেরেশতার কাজও করতে পারে। লোহা ও

পাথরকে সাপ স্বর্ণে পরিণত করতে পারে। কোনো সাপের যদি একশ' বছর বয়স হয়ে যায় তাহলে তার শরীরে এমন একটি টুকরো তৈরি হয়, যা হীরার মতো চমকাতে থাকে। কেউ সেটিকে বলে মনসা, কেউ বলে মণি। সাপ সেটিকে সবসময় মুখের ভেতর রাখে। অনেক সময় নাগ সাপ সেই মনসা কিংবা মণিকে নিয়ে খেলা করে, বাতাসে উড়িয়ে দেয় আবার ঝাঁপ দিয়ে ধরে ফেলে। সেই মণিকে যদি আপনি লোহার টুকরোয় স্পর্শ করেন, তাহলে লোহাও সোনা হয়ে যাবে। সেটি যদি আপনার তরবারীতে স্পর্শ করা যায়, তাহলে তরবারীও সোনায় পরিণত হবে। কিন্তু কোনো মানুষ আজো সেই সর্পমণি অর্জন করতে পারেনি। মণি মুখে নিয়ে সাপ রাতে ঘুমোতে পারে না। সাপ মণিটি মুখ থেকে বের করে মাটিতে রেখে ঢেকে দিয়ে তারপর ঘুমোয়। শত বছরে এ ধরনের মণিওয়ালা সাপ দু'একটি জন্মে। কিন্তু শোনা গেলেও এ পর্যন্ত কেউ মণিওয়ালা সাপের দেখা পায়নি। সেই সাথে সাপের মণিও কেউ অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। হিন্দুস্তানে একথা প্রচলিত আছে যে, যে সেই সাপের মণি অর্জন করতে পারবে, সে সারা হিন্দুস্তানের রাজত্ব লাভ করবে। শীর্ষ নাগও তার আনুগত্য স্বীকার করবে। তখন তার রাজমহল, তার রাজদুর্গ সব সাপে পাহারা দেবে। তখন সে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শাসক হিসেবে অভিহিত হবে।"

"আপনি কিংবা আপনার পূর্বপুরুষদের কেউ কি সেই নাগের সর্পমণি দেখেছেন?" জিজ্ঞেস করলো সেনাধ্যক্ষ বাহরাম।

"না, দেখিনি। আমাদের এলাকায় মণিওয়ালা সাপ আছে; সে কিন্তু যেখানে থাকে সেখানে আমাদের কারো যাওয়ার অনুমতি নেই। কেউ সেখানে যাওয়ার দুঃসাহস করে না। সাপ কোথায় থাকে, সেই জায়গাটি আমরা চিনি; কিন্তু সেখানে যাওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আমাদেরকে বলা হয়েছে, ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে স্বর্ণ পড়ে রয়েছে। হীরা, মোতি, পান্নার স্তূপ সেখানে। আমাদের পুরোহিত বলেছেন, ওখানকার মেয়েদেরকে দেখে কেউ বিশ্বাসই করবে না এরা মর্তের কোনো মানুষ। সেইসব সুন্দরী রমণীদের কথা জগতের অনেকেই জানে; কিন্তু তারা বিশ্বাস করে ওখানকার রমণীরা নাগিনী, মানুষ নয়। আসলে সে কথা ঠিক নয়। আসলে এরা আমাদেরই বংশজাত। কিন্তু এরা অত্যধিক সুন্দরী হলেও খুবই দুর্ভাগা। জীবনের একটা সময় পর্যন্ত তারা খুবই উজ্জ্বল থাকে বটে; কিন্তু এক পর্যায়ে নির্জীব হয়ে যায়। কারণ, তারা জীবনে কখনো পুরুষের সান্নিধ্য পায় না।"

সাদা দাড়িওয়ালা লোকটি এমনই জাদুময় ভঙ্গিতে স্বপ্নপুরী নাগের কথা বলছিলো যে, দুর্গপতি কুতুব গোজাক, সেনাধ্যক্ষ বাহরাম ও তার ডেপুটি রুদ্ধশ্বাসে তা শুনতে লাগলো এবং বিস্ময়ে তাদের গায়ের পশম খাড়া হয়ে গেলো। তাদের সামনেই উপবিষ্ট ছিলো চার তরুণী। তাদের ঠোঁটে ছিলো স্মিত হাসির আভা। গজনীর এই শাসকরা তরুণীদের রূপ-সৌন্দর্য দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। তারা ভেবেই পাচ্ছিলো না, এদের চেয়েও আরো সুন্দরী কোনো মানুষ হতে পারে! তারা মেহমানদের খুবই খাতির-যত্ন করলো এবং তাদের জন্য রাজকীয় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলো।

এক পর্যায়ে সবাই ঘুমোনোর জন্য চলে গেলো। কিন্তু সাদা দাড়িওয়ালাকে দুর্গশাসক কুতুব গোজাক তার কাছে বসিয়ে রাখলো। সে বৃদ্ধ থেকে সেই নাগের রাজ্যের গোপন রহস্য জানতে চেষ্টা করতে লাগলো। সাদা দাড়িওয়ালা কুতুব গোজাককে বললো, "সারা হিন্দুস্তানের রাজত্বের ভেদ লুকিয়ে রয়েছে নাগের দেশে। যেখানে অপরিচিত কারো পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় এবং কেউ যাওয়ার দুঃসাহসও দেখাতে পারে না।"

"আচ্ছা, কারো পক্ষে কি সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়?" খুব মনোযোগ দিয়ে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো কুতুব। "আমার ধন-দৌলতের কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমি শুনেছি, হিন্দুস্তানের পাহাড়ী অঞ্চলে এমন গাছ-গাছড়া রয়েছে, যা সেবন করলে...।"

"হ্যাঁ, যা বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করে...।" কুতুব গোজাকের অসমাপ্ত কথা বলে দিলো সন্ন্যাসীরূপী সাদা দাড়িওয়ালা। "আমাকে দেখুন, আমার দাড়ি সাদা হয়ে গেছে, বয়সও একশ' পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আমার শরীরে হাত দিয়ে দেখুন, এখনো কেমন শক্তি-সামর্থ রয়েছে। আপনি ঠিকই শুনেছেন। আমাদের এলাকায় এমন গাছ-গাছড়া রয়েছে, যেগুলোতে সাপের বিষ মিশ্রিত রয়েছে, যেগুলো বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করে। সেইসব গাছ আমরা চিনি। সেগুলোতে এমন সব গুণ রয়েছে, যে শুধু বার্ধক্যকেই রোধ করে না, জীবনকেও দীর্ঘস্থায়ী করে।"

কুতুব গোজাক ভাবছিলো, এ লোকের কাছ থেকে সে একাই রহস্য উদঘাটন করছে। কিন্তু এদিকে যুবক সামর্থবান সেনাধ্যক্ষ বাহরাম সেই দলের একজন পুরুষ ও একজন তরুণীকে তার কক্ষে নিয়ে জানতে চাচ্ছিলো, তারা

কি তাদের সেই বিস্ময়কর এলাকায় তাকে নিয়ে যেতে পারে? কিন্তু দলের পুরুষ লোকটি তাকে বলছিলো, তারা তাদের দলের সাথে এবং এলাকার গোপন রহস্য ফাঁস করে দেয়ার মতো গাদ্দারী করতে পারে না। পুরুষ লোকটি কথা বলতে বলতে একটা অজুহাত খাড়া করে সেনাধ্যক্ষের কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। তরুণী একাকী সেনাপতির কক্ষে রয়ে গেলো। তরুণী মনোহরী ভঙ্গিতে হাসছিলো। সেনাপতি তার সাথেও আলাপ জুড়ে দিলো। তরুণী সেনাপতিকে বললো, "জীবনে আপনার মতো এমন সুদর্শন সুপুরুষ আমি কখনো দেখিনি।"

"তুমি তো বেহেশতে থাকো।" তরুণীকে বললো সেনাপতি বাহরাম।

"সেটি জান্নাত নয়, জাহান্নাম। সেখানে নারীর আবেগের কোনো মূল্য নেই। যৌবনকে যেখানে গলা টিপে হত্যা করতে হয়, তা জাহান্নাম বৈ আর কি। আমাদের জীবন তো ওইসব সন্ন্যাসীদের সাথেই কাটাতে হয়, যাদের কোনো প্রাণ-মন বলতে কিছু নেই। আমাদের তো নারীত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।" তরুণী বললো।

তাদের কথাবার্তা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে শেষ হলো, যেখানে দু'টি ভিন্ন সত্তা থাকলেও মনোদৈহিক দিক থেকে একাত্ম হয়ে যায়। তরুণী যখন সেনাপতির প্রতি আবেগপূর্ণ প্রেম-ভালোবাসা প্রদর্শন করলো, তখন সেনাপতি বাহরাম তাকে বললো, "আচ্ছা বলো তো, সাপের মণির কাহিনী কতটুকু সত্য?" তরুণী তাকে বললো, "আমার পক্ষে আপনাকে সঙ্গ দিয়ে ওখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু আমি আপনাকে পথের অবস্থা বলে দিতে পারি।" বস্তুত তরুণী সেনাপতিকে পথের দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলো আর সেনাপতি বাহরাম খান একটি কাগজে সাপের দেশের নকশা এঁকে নিচ্ছিলো।

"আপনার কাছে বিপুল পরিমাণ তীর থাকতে হবে। কারণ, এই পথে সাপের খুব উৎপাত। বিপদ দেখলেই যাতে তীর দিয়ে আপনি সাপ মেরে ফেলতে পারেন। আমি আপনাকে যে সুড়ংগ পথের কথা বলছি, সেটির উপরে একটি বিশাল অজগর কুণ্ডলী পাঁকিয়ে বসে থাকে। সেটির মাথায় তীর লাগলেই মরে যাবে। কিন্তু শরীরে তীর লাগলে আপনার পক্ষে প্রাণ নিয়ে বেঁচে আসা মুশকিল হবে। সুড়ংগ পথটি খুবই দীর্ঘ। আপনি সেটি অতিক্রম করলে একটি সুন্দর ঝর্না দেখতে পাবেন। সেই ঝর্নার তীরেই আপনি ওই সাপের

দেখা পাবেন। সেখানে সর্পরাজ মণি নিয়ে খেলা করতে থাকে। সেটি আপনি তীর দিয়ে মেরে ফেললেই মণি আপনার হাতের মুঠোয় এসে যাবে।"

"তখন তোমাকে আমি কোথায় পাবো?"

"আমাকে পেয়ে যাবেন।" চোখে চোখ রেখে ভুবনমোহিনী হাসি দিয়ে বললো তরুণী।

পরদিন প্রত্যুষেই নাগেশ্বরের কাহিনী রচনাকারী সন্ন্যাসীদল থানেশ্বর দুর্গ থেকে চলে গেলো। তারা রেখে গেলো নাগরাজ্যের বিস্ময়কর আখ্যান।

সকালে কুতুব গোজাক তার একান্ত নিরাপত্তারক্ষীদের থেকে দু'জনকে ডেকে পাঠালেন। এই দু'জন ছিলো তার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং দুঃসাহসী বীরযোদ্ধা। তাদের ডেকে তিনি বললেন, "শোনো! শাসক হিসেবে আমি তোমাদের ডেকে পাঠাইনি, একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে তোমাদের ডেকেছি আমি। তোমরা যদি আমাকে একটি কাজ করে দিতে পারো, তাহলে তোমাদেরকে আমি পদোন্নতি দিয়ে গজনী পাঠিয়ে দেবো। আর তোমরা যদি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিতে চাও, তাহলে অবসর দিয়ে দেবো। তবে তোমাদেরকে এখান থেকে বিদায় করার সময় এমন সোনাদানা-কড়ি দিয়ে দেবো যে, তোমাদের সাত পুরুষ সুখে-শান্তিতে আরাম-আয়েশে জীবন কাটাতে পারবে। তবে শর্ত হলো, তোমাদেরকে আমি এমন এক জায়গায় পাঠাচ্ছি, যেখানকার রহস্যের কথা পৃথিবীর কাউকে জানাতে পারবে না। আমি তোমাদেরকে বিশেষ এক পোশাকে একটি বিশেষ জায়গায় পাঠাবো।"

উভয়েই প্রতিশ্রুতি দিলো, তারা তাদের মিশনের খবর কাউকে জানাবে না। কুতুব গোজাক তাদের সামনে একটি চিত্র রেখে তাদের গতিপথ বোঝাতে লাগলো। সৈন্য দু'জন যতোই রাস্তার ভয়াবহতার কথা শুনতে লাগলো, বিস্ময় ও আশ্চর্যে তাদের চেহারা ফ্যাকাশে হতে লাগলো।

"গত রাতে সাদা চাদর পরিহিত সন্ন্যাসীরূপী একদল মুসাফিরকে আমার দফতরে হয়তো আসতে দেখেছো। ওই পথ দিয়ে পাহাড়ী নদী অতিক্রম করলেই সেই দলের সাদা দাড়িওয়ালা লোকটির দেখা পাবে তোমরা। তাকে পেয়ে গেলে তোমাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে। সে তোমাদেরকে একটি গাছের শিকড় এবং প্রচুর সোনাদানা দেবে। সেগুলো নিয়ে তোমরা সোজা আমার কাছে চলে আসবে। গাছের শিকড়টা আমাকে দিয়ে দিবে আর সোনাদানা তোমরা নিয়ে নিবে।"

"সেই গাছের শিকড়টি কেমন?" জানতে চাইলো এক সৈনিক।

"সেটি এমন এক গাছের শিকড়, তা খেতে পারলে তুমি শত বছরেরও বেশি বাঁচতে পারবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত শরীর থাকবে শক্ত-সামর্থ, টগবগে যুবকের মতো।"

সৈনিক দু'জন এ কথা শুনে পরস্পর চোখাচোখি করলো। ভাবখানা এমন যে, সোনাদানার চেয়ে এই শিকড়ের প্রতিই তাদের বেশি আগ্রহ।

"আমার নিজেরই যাওয়ার কথা ছিলো। সেই সন্ন্যাসী আমাকেই যেতে বলেছিলো। কিন্তু তোমরা তো জানো, দুর্গশাসকের পক্ষে এতো দীর্ঘ সময় দুর্গের বাইরে থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমার এই ক্ষমতা আছে, তোমাদের দু'জনকে যতো সময়ের জন্য ইচ্ছা বাইরে পাঠাতে পারি।"

গত রাতে সেনাপতির কক্ষে তরুণী যখন নাগের দেশে যাওয়ার পথের কথা বলছিলো, তখন সাদা দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসীরূপী লোকটি দুর্গশাসককে পথনির্দেশ দিচ্ছিলো এবং তাকে সশরীরে যাওয়ার প্রস্তাব করছিলো। সাদা দাড়িওয়ালা কুতুব গোজাককে এ কথাও বলেছিলো, আপনি আমাকে যে ইজ্জত ও সম্মান করেছেন, এর পরিবর্তে আপনাকেও চির যুবক থাকার ওষুধ ও সোনাদানা উপঢৌকন দেবো।

* * *

সর্পনাগের পূজারীরা চলে যাওয়ার পর সেনাপতি বাহ্‌রাম তার ডেপুটিকে বললো, "তুমি যদি না যাও, তবে আমি নিজেই যাবো। আমরা দু'জনের মধ্যে যে কোনো একজন বাইরে থাকলেও এ কথা বলা যাবে যে, বাইরে সেনাচৌকিগুলো দেখার জন্য গেছে। মেয়েটি আমাকে পথ বলে দিয়েছে। তুমি ভাবতে পারো, আমরা যদি সেখানে যেতে পারি, তাহলে আমাদের অবস্থান কোথা থেকে কোথায় চলে যাবে। এ কাজে আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা দরকার। হয় তুমি যাও, নয়তো আমি যাবো। চার-পাঁচজন চৌকস সৈন্য সাথে নিতে হবে।"

"মাননীয় সেনাপতি! আপনি কি দৃঢ় বিশ্বাস করে ফেলেছেন যে, ওই লোকটি যা বলেছে তা সর্বৈব সত্য?" সন্দেহ প্রকাশ করলো ডেপুটি সেনাপতি।

"আপনি কি ভেবেছেন, মেয়েটি এমন কঠিন রহস্যের কথা কেনো আপনার কাছে প্রকাশ করে দেবে?"

"হ্যাঁ, ভেবেছি। ভেদ বলে দেয়ার কারণ হলো, আমাকে দেখে তার এতোটাই ভালো লেগেছে যে, নিজের উপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই। সে আমাকে পাওয়ার জন্য আত্মভোলা হয়ে গেছে। সে একান্তভাবে চায় আমি তাদের রহস্য ভেদ করে সোনাদানা কজা করে নিই এবং তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করি।"

"কিন্তু আমার সন্দেহ হয় লোকগুলো তাদের তরুণী মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য রাত কাটানোর জন্য এসব উদ্ভট গল্প ফেদেছিলো।" বললো ডেপুটি সেনাপতি। "এরা আপনাদের ধোঁকা দিয়ে নির্বিবাদে রাত কাটিয়ে চলে গেছে।"

"তুমি আমায় সঙ্গ দেবে কিনা তাই বলো?" বললো সেনাপতি। "তোমাকে আমি অধীনস্ত মনে করে নয়, বন্ধু মনে করে আমার একান্ত বিষয়ে তোমাকে অংশীদার করেছিলাম। ওখান থেকে আমি যদি কিছু নিয়ে আসতে পারি, তাতে তোমারও অর্ধেক থাকবে। আচ্ছা বলো তো, ঘরবাড়ি আপনজন থেকে দূরদেশে হত্যা আর খুনাখুনিতেই জীবনটা শেষ করে দেয়াই কি আমাদের বিধিলিপি? এসব হচ্ছে রাজা-মহারাজা ও সুলতানদের ঝগড়া। যুদ্ধ করে যেসব ধন-রত্ন পাওয়া যায়, তাতে তাদের আরাম-আয়েশ বাড়ে। তারা যুদ্ধে আমাদের জীবন বিপন্ন করে আমাদের রক্তের বিনিময়ে রাজা-বাদশাহ হচ্ছে। মৃত্যু-বিভীষিকা থেকে নিজের জীবনটাকে উদ্ধার করে কিছুটা আরাম-আয়েশ করার অধিকার কি আমাদের থাকতে পারে না?"

সেনাপতি বাহরাম যখন তরুণীদের রূপ-সৌন্দর্যের কথা শুরু করলো, তখন ডেপুটি সেনাপতিরও চোখ চমকে উঠলো। সেনাপতি ডেপুটিকে বললো, "তুমি চিন্তা করো না। তুমি না গেলে আমিই যাবো। আমি হয়তো আমার জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে তোমার প্রধান কাজ হবে আমার অনুপস্থিতির কারণ গোপন রাখা। তুমি আমার অনুপস্থিতির ব্যাপারে বলবে, দূরে অবস্থিত আমাদের বিভিন্ন সেনাচৌকিগুলো পরিদর্শন করে সেগুলোকে আরো কার্যকর করার জন্য আমি পরিদর্শনে বেরিয়েছি। প্রশাসক আমার এ কাজে কোনো বাধা দেবে না। তোমার দ্বিতীয় কাজ হবে, দৃশ্যত আমাদের উপর আক্রমণ হওয়ার আশংকা নেই, তবুও নিশ্চিন্তে থাকা উচিত

নয়। কারণ, আমরা শত্রুবেষ্টিত অবস্থায় রয়েছি। শত্রু থেকে কখনো নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। যদি কোন কারণে শত্রুরা দুর্গ আক্রমণ করে, তাহলে দুর্গ রক্ষার জন্য তুমি জীবন বাজি রাখবে। তাহলে সৈন্যরা আর আমার অনুপস্থিতির ঘাটতি অনুভব করবে না।"

ডেপুটি সেনাপতি সেনাপতি বাহরামের প্ররোচনায় সায় দিয়ে দিলো। সে এই গোপন রহস্য গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলো। তার সামনে এখন সমস্যা হয়ে দেখা দিলো সেনাপতির ক'জন সহচর নির্বাচন। কারণ, সোনা-রুপার লোভে যে কোনো সিপাহী এ অভিযানে যেতে এবং বিষয়টি গোপন রাখতে রাজি হবে; কিন্তু বিপুল ধন-রত্ন হাতিয়ে নিতে এরাই আবার স্বয়ং সেনাপতিকেই হত্যা করে বসতে পারে। এমনও হতে পারে, তারা নিজেরাও খুনাখুনিতে জড়িয়ে পড়বে। নানা কারণে সেনাপতির জন্য চারজন সফরসঙ্গী নির্বাচনে ডেপুটিকে খুবই চিন্তায় ফেলে দিলো। অনেক ভেবে-চিন্তে তার বিশেষ ঝটিকা বাহিনী থেকে চার সিপাহীকে নির্বাচন করলো ডেপুটি সেনাপতি।

তারা মনে করেছিলো, তারা দু'জন ছাড়া এই গোপন রহস্যের ব্যাপারটি আর কেউ জানে না এবং সেই সর্পরাজ্যে যাওয়ার পথও জানা নেই আর কারো। এদিকে সাদা দাড়িওয়ালা ব্যক্তি দুর্গশাসককেও সর্পরাজ্যে যাওয়ার পথের কথা বলে গিয়েছিলো। হৃতযৌবন ফিরে পাওয়ার ওষুধের জন্য দুর্গশাসক দু'জন বিশ্বস্ত সেনাকে পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। তার কাছেও বিষয়টি গোপন রাখাই ছিলো প্রধান সমস্যা। সেও এই আত্মপ্রবঞ্চনায় মুগ্ধ ছিলো যে, সে ছাড়া আর কেউ এই গোপন রহস্যের কথা জানে না।

সাদা দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসী তার দলবল নিয়ে অতি প্রত্যুষে দুর্গ ত্যাগ করে চলে যায়। তরুণীদের বহনের জন্য হাওদাওয়ালা উট ছিলো। আর কাফেলার পুরুষরা সফর করছিলো ঘোড়াগাড়ীতে। সন্ন্যাসীদের কাফেলা যখন শহর অতিক্রম করছিলো, তখন তাদের দেখার জন্য পথে পথে বহু লোক জমায়েত হতে শুরু করছিলো। এক পর্যায়ে দর্শনার্থীদের ভিড় ঠেলে থানেশ্বর শহর পেরিয়ে গেলো সন্ন্যাসীদল। শহর ছেড়ে সন্ন্যাসীদের দলনেতা গাড়িচালকদের বললো, ফেরার পথেও মুসলমানদের সেনাচৌকির দিকে নজর রেখো। কোনো চৌকির ধারে-কাছে যেয়ো না। তুমি তো জানো, ওদের চৌকি কোন্ কোন্ জায়গায় রয়েছে।

দুপুরের দিকে সন্ন্যাসী কাফেলা একটি জঙ্গলময় বিরান ভূমিতে পৌঁছলো। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সেখানে কোনো লোকালয় ছিলো না। তাছাড়া এলাকাটি ছিলো খুবই দুর্গম। মাঝে-মধ্যে টিলা, ঝোঁপঝাড় আর উঁচু-নিচু। একটি সুবিধা মতো জায়গা দেখে সন্ন্যাসীদের দলনেতা যাত্রা বিরতি দিয়ে বিশ্রামের জন্য থেমে গেলো। তরুণীরা উটের উপরের হাওদা থেকে নেমে এলো। ঘোড়াগুলোর বাঁধন খুলে দেয়া হলো। মাটির উপর মাদুর পেতে সবাই বসলো। কাফেলার সবাই ছিলো খুবই খুশি। তরুণীরা তো উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছিলো। দলের অন্যরা তরুণীদের উচ্ছ্বাস-আনন্দ দেখে হাসছিলো।

"আচ্ছা, আমরা যে শিকার বধ করতে পেরেছি, তা কীভাবে বোঝা যাবে?" দলপতির কাছে জানতে চাইলো এক তরুণী।

"থানেশ্বরে আমাদের লোকজন আছে। দুর্গের ভেতরেও আছে আমাদের গোয়েন্দা।" বললো দলনেতা সাদা দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসী। "দুর্গশাসক ও সেনাপতি যদি আমাদের বাতানো পথে অগ্রসর হয়, তাহলে আমাদের লোকেরা তাদের অনুসরণ করবে। তারা যদি নিশ্চিত হয় যে, এরা আমাদের বলা পথেই অগ্রসর হচ্ছে, তাহলে কোন্ কোন্ জায়গায় খবর পৌঁছাতে হবে, সে ব্যাপারে তারা জানে।"

"যে সেনাপতির কাছে আমাকে পাঠানো হয়েছিলো, সে তো আমার কথা শুনে অভিভূত হয়ে পড়েছিলো।" বললো এক তরুণী।

"ওরা কী করবে সে নিয়ে তোমাদের দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই। ওরা যা-ই করুক, সেটি হবে আমাদের জন্য সহায়ক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, থানেশ্বর মন্দির অচিরেই আমাদের হাতে ফেরত আসবে।"

হঠাৎ করে কাফেলার একজন উৎকর্ণ হয়ে বললো, "মনে হয় আমার কানে ঘোড়া দৌড়ের আওয়াজ ভেসে আসছে।"

"এখানে কে আসবে; আমাদের ঘোড়াগুলোরই আওয়াজ হবে হয়তো।" সান্ত্বনা দিলো একজন।

এ ব্যাপারে আর কেউ মনোযোগ দিলো না। অথচ তা তাদের ঘোড়ার আওয়াজ ছিলো না। সন্ন্যাসী কাফেলাটি থানেশ্বর পেরিয়ে বিজন ময়দানে প্রবেশ করলে একটি ঝোপের আড়াল থেকে তাদের পর্যবেক্ষণ করছিলো এক বালক। তখন উটের হাওদাগুলোর পর্দা উঠানো ছিলো। ফলে ভেতরে বসা তরুণীদের

স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলো বালকটি। বালক ঘোড়াগাড়ীতে আরোহীদেরও গভীর দৃষ্টিতে দেখে বুঝতে পারলো এই অভিযাত্রী দল অত্যন্ত দামী। সে বিপরীত দিকে দৌড়ে কোথায় যেনো হারিয়ে গেলো।

দশ-বারোজনের একটি অপেক্ষমান কাফেলার কাছে গিয়ে থামলো বালকটি। কাফেলার লোকেরা তখন মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি দিয়ে আরাম করছিলো। অদূরেই তাদের ঘোড়াগুলো বাঁধা ছিলো। বালকটি গিয়ে তার দেখা কাফেলার কথা বললো এবং জানালো কাফেলাটি কোন্‌দিকে যাচ্ছে। তাদের মধ্য থেকে এক যুবক বালকটিকে সাথে নিয়ে কাফেলার অবস্থা জানার জন্য অগ্রসর হলো। তারা পাহাড়ী টিলা ও ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে কাফেলা দেখে বালকের পিঠ চাপড়িয়ে ফিরে এলো। সে এসে অন্যদের বললো, "শিকার খুবই মূল্যবান।" তাদের কেউ কেউ বললো, "কাফেলা কোন্‌দিকে যায়, তা দেখে ওদের পিছু পিছু অগ্রসর হও। রাতের বেলায় ওদের উপর হামলা করো।" আরেকজন বললো, "রাত-দিন বাদ দাও। আমাদের জন্য সবই সমান। শুধু খেয়াল রাখো, আশপাশে যেনো কোনো সেনাচৌকি না থাকে। কোনো সেনাচৌকিতে আওয়াজ চলে গেলে সৈন্যরা এসে আমাদের সবাইকে হত্যা করবে; কারো পালানোর সুযোগ থাকবে না।"

"হতভাগা মুসলমান সৈন্যরা তো আমাদের জীবন বিপন্ন করে ফেলেছে।" দলনেতা বললো। "এ জন্য আমরা হিন্দু রাজা-মহারাজাদের শাসনই বেশি পছন্দ করি। তারা রাজধানীর বাইরের লোকদের কোনো পরোয়াই করে না। অথচ গজনীর লোকেরা তো জঙ্গলেও শাসন জারি করেছে। আগে জঙ্গল ছিলো সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে। যাক, চলো এখনই কাফেলাকে লুটে নিই। আশপাশে কোনো সেনাচৌকি নেই।"

আসলেও তাদের ধারে-কাছে কোনো সেনাচৌকি ছিলো না। কিন্তু গজনী বাহিনীর সাত-আটজন সৈনিক দূরবর্তী একটি চৌকি থেকে থানেশ্বর ফিরে যাচ্ছিলো। তারা ছিলো অশ্বারোহী। খুব নিশ্চিন্তে গল্প-স্বল্প করে তারা ধীর-স্থিরভাবে পথ অতিক্রম করছিলো।

সর্পপূজারী সন্ন্যাসীদের কাফেলা একটি জায়গায় যাত্রা বিরতি করে আহারাদি সেরে শুয়ে-বসে বিশ্রাম করছিলো। পথে দস্যুদের একটি ঘোড়া হ্রেষারব করছিলো বটে; কিন্তু তাদের কেউ সেদিকে খেয়াল করেনি। দস্যুরা

তাদের ঘোড়াগুলোকে কাফেলার অবস্থান থেকে কিছুটা দূরে বেঁধে রেখে হেঁটে কাফেলার দিকে অগ্রসর হলো। অগ্রসর হয়েই দস্যুদল ঘিরে ফেললো কাফেলা।

দস্যুদলের নিক্ষিপ্ত একটি তীর কাফেলার এক লোকের বুকে এসে বিদ্ধ হলো। সবাই আতঙ্কিত হয়ে চতুর্দিকে দেখতে লাগলো। ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের কানে ভেসে এলো, "সবাই দাঁড়িয়ে যাও, কোনো চেঁচামেচি করবে না এবং কেউ পালানোর চেষ্টা করবে না।"

কাফেলার লোকজন দেখতে পেলো, ঝোঁপের আড়াল থেকে দশ-বারজন লোক বেরিয়ে এসেছে। ওদের সবার চেহারা ঢাকা। মাথা কালো কাপড়ে আবৃত। শুধু চোখ দু'টো খোলা। এরা ডাকাত। দস্যুতাই এদের পেশা। ডাকাত দলকে এগিয়ে আসতে দেখে সন্ন্যাসীরূপী কাফেলার পুরুষরা তাদের ঢিলেঢালা পোশাকের আড়াল থেকে খঞ্জরের চেয়ে বড় তরবারীর চেয়ে ছোট এক ধরনের অস্ত্র বের করে মোকাবেলার জন্য তৈরি হয়ে গেলে। ডাকাতদল যাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে সন্ন্যাসী মনে করেছিলো, মুহূর্তের মধ্যে তাদের কায়া বদলে গেলো। তারা এখন তরবারী নিয়ে রীতিমতো ডাকাতদলের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে গেলো। সন্ন্যাসীরা দুই তরুণীকে আগলে রেখে মোকাবেলা করছিলো আর ডাকাতদল তাদের বেষ্টনী ভেঙ্গে তরুণীদের কব্জা করার চেষ্টা করছিলো।

ডাকাতদল ভেবেছিলো, সন্ন্যাসীরূপী এই লোকগুলোকে ধমক দিয়েই কাবু করে ফেলবে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। তারা মনে করেছিলো, ধমকি দিয়েই সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নেবে এবং সুন্দরী তরুণীদের অপহরণ করে নিয়ে যাবে। কিন্তু তাদেরকে কঠোর প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হলো। সন্ন্যাসীরূপী লোকগুলোও নিয়মিত সৈন্যের মতো লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হলো। অবশ্য সন্ন্যাসীদের হাতিয়ারগুলো যুৎসই ছিলো না। লম্বা তরবারী দিয়ে ডাকাতরা তাদের কাবু করে ফেললো এবং কয়েকজনকে হত্যা করে ফেললো। তরুণীরাও এমন সাহসিকতার পরিচয় দিলো যে, মৃতদের ছোট্ট তরবারীগুলো হাতে নিয়ে তারাও আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হলো। এক পর্যায়ে তরুণীরা ডাকাতদের হুমকি দিলো, তোমরা রাজপুত কন্যাদের গায়ে হাত দিতে পারবে না। আমরা মৃত্যুবরণ করবো; তবু তোমাদের লালসার শিকার হবো না। কাফেলার জোরদার আক্রমণে দু'তিন ডাকাতও মারা গেলো।

গজনীর সৈন্যরা ওদের কাছ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো। হঠাৎ তাদের কানে ভেসে এলো নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। তারা থেমে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো, কাছেই দশ-বারটি ঘোড়া বাঁধা। তারা পূর্ব থেকেই জানতো হিন্দুস্তানের বিজন এলাকায় ডাকাত ও পথদস্যুদের আখড়া থাকে। রাজা-মহারাজারা এই দস্যুদের নিয়ন্ত্রণে কখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। অথচ সুলতান মাহমূদ বিজিত এলাকার প্রশাসকদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেনো শহর অঞ্চলের বাইরেও যেসব সেনাচৌকি থাকে, তাদেরকে নির্দেশ দেয় এলাকায় রীতিমতো টহল দিতে, যাতে নিরাপদে মুসাফিরগণ যাতায়াত করতে পারে এবং পথদস্যুদের যেনো সৈন্যরা নির্মূল করতে চেষ্টা করে।

সৈন্যদল তাদের গতিপথ বদল করে তাদের অশ্বগুলোকে তাড়া করলো। মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়াগুলোর কাছে পৌঁছে দেখতে পেলো, একদল দুর্বৃত্ত অদূরে কয়েকজন তরুণীকে তুলে নেয়ার জন্য চেষ্টা করছে। সৈন্যরা ওদের হুমকি দিলো। সৈন্যদের উপস্থিতি দেখে ডাকাতদল তরুণীদের ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু তারা ওদের ঘোড়া পর্যন্ত পৌঁছার আগেই সৈন্যরা তাদের পাকড়াও করে ফেললো।

এরপর অকুস্থলে এসে দেখলো দু'তরুণী ছাড়া আর বাকি সবাই নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে সাদা দাড়িওয়ালা একজনের দেহে তখনো প্রাণ আছে বলে মনে হলো। সৈন্যরা তার চেহারায় পানির ঝাপটা দিয়ে তাকে ঘোড়াগাড়ীতে তুলে নিলো আর তরুণীদের অভয় দিয়ে বললো, তোমাদের আর কোনো ভয় নেই, তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারো। ধৃত ডাকাতদের হাত-পা বেঁধে ওদের ঘোড়ার সাথেই হেঁটে যেতে বাধ্য করলো। তরুণী দু'জনকে একটি ঘোড়াগাড়ীতে সওয়ার হতে অনুরোধ করলো। অতঃপর সবাই রওনা হলো থানেশ্বরের পথে।

গজনীর সৈন্যরা এতোগুলো ঘোড়া, কয়েকজন বন্দি আর শেষ রাতে বিদায় হওয়া সন্ন্যাসী কাফেলার উট ও ঘোড়াগাড়ী নিয়ে থানেশ্বর দুর্গে যখন প্রবেশ করলো, তখন বেলা ডুবে গেছে।

ডাকাতদলের গ্রেফতারি এবং লুণ্ঠিত কাফেলার কথা দুর্গশাসক কুতুব গোজাক ও সেনাপতি বাহরামের কানে পৌঁছামাত্রই তারা উভয়ে দৌড়ে এলেন। তাদেরকে জানানো হলো, এই ডাকাতদল সন্ন্যাসীদের কাফেলা আক্রমণ করে

দু'তরুণী ও অন্যান্য সব পুরুষকে হত্যা করেছে। সৈন্যরা জানতো না, এরা শেষ রাতে এ দুর্গ থেকেই রওনা হয়েছিলো।

দুর্গশাসক সাদা দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসীর জীবন বাঁচানোর জন্য চিকিৎসকদের সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। দুর্গশাসক তার হৃতযৌবন ফিরে পাওয়া এবং দীর্ঘ জীবন লাভেব জন্য সন্ন্যাসীকে বাঁচানোর প্রতি মনোযোগী হলেন। এদিকে দুই তরুণী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। তাদের মুখে কথা বের হচ্ছিলো না। একটি পৃথক কক্ষে তাদের থাকতে দেয়া হলো। তাদের সেবা-যত্নের জন্য দু'জন মহিলাকে নিযুক্ত করা হলো। দুর্গশাসক ও সেনাপতি তাদের সান্ত্বনা দিলো, তোমাদের আর কোনো শংকা নেই; সৈন্যদের দিয়ে তোমাদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

সাদা দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসী অচেতন ছিলো। রাতভর চিকিসকরা তার চিকিৎসা অব্যাহত রাখলো। দুর্গশাসক নিজে চিকিৎসা তদারকি করলেন। পরদিন দুপুরে সে হুঁশ ফিরে পেলো। চোখ খুলেই সে ক্ষীণকণ্ঠে জানতে চাইলো সে এখন কাথায়? তাকে জানানো হলো, সে এখন থানেশ্বর দুর্গে। দুর্গশাসক নিজে তার চিকিৎসার তদারকি করছেন। তাকে আরো জানানো হলো, তার কাফেলার দু'জন তরুণী অক্ষত অবস্থায় বেঁচে আছে। তাদেরকে সৈন্যরা সযত্নে এনে এখানে রেখেছে। সে তরুণী দু'জনকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাদের ডেকে পাঠানো হলো।

তরুণীদ্বয় এসে তাকে জানালো, গজনী সৈন্যরা তাদেরকে উদ্ধার করে এনেছে এবং আপনাকে জীবিত দেখে সৈন্যরা এখানে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। তারা এ কথাও জানালো যে, দুর্গশাসক ও সেনাপতি নিজে তাদের সার্বিক দেখাশোনা করছেন। এমনকি তাদের সেবা-যত্নের জন্য দু'জন মহিলাকেও নিয়োগ করা হয়েছে।

গজনীর সৈন্যদের এই মহানুভবতার কথা শুনে সন্ন্যাসীর চোখে পানি চলে এলো। সে আবেগপ্রবণ হয়ে তরুণীদের বললো, "আমি আর এই লোকদের ধোঁকা দিবো না। দুর্গশাসকের হয়তো আমার প্রতি যত্নবান হওয়ার ব্যক্তিস্বার্থ থাকতে পারে। কিন্তু থানেশ্বর অভিমুখী গজনী সৈন্যদের তো আমার প্রতি যত্নবান হওয়ায় কোনো স্বার্থ ছিলো না। তোমাদের মতো সুন্দরী তরুণীদের এরা পরম সম্মানে আদর-যত্নে এখানে নিয়ে এসেছে। অথচ তোমরা ছিলে

একেবারেই অসহায়। ওরা তোমাদের যা ইচ্ছা, তাই করতে পারতো; কিন্তু বিন্দুমাত্র কদর্যতা তোমাদের স্পর্শ করেনি। বরং তোমাদের এখানে এনে পরম আদর-যত্নে রেখেছে। এরা আমাকে নতুন জীবন দিয়েছে। আমি আর এদের ধোঁকা দিতে পারি না।"

সে দুর্গশাসকের সাথে কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করলে দুর্গশাসককে খবর দেয়া হলো। দুর্গশাসক তখনই চলে এলো এবং তরুণীরা তাদের কক্ষে চলে গেলো।

"আমি আপনার সৈন্যদের এই মহানুভবতার প্রতিদান দিতে চাই।" ক্ষীণকণ্ঠে বললো সন্ন্যাসী।

"আপনি একে অনুগ্রহ মনে করবেন না।" বললো দুর্গশাসক। "আপনি আগে সুস্থ হয়ে নিন। আমি দু'জনকে প্রস্তুত করে রেখেছি, যারা আপনাকে নিয়ে যাবে। আপনি জানেন, আমি আপনার কাছে কী প্রত্যাশা করি। আর ওই সৈন্যদের কথা বলছেন, যারা আপনাকে ডাকাতদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। আপনি সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে গেলে ওদের জন্য কিছু সোনাদানা দিয়ে দিলেই চলবে।"

"আসলে আমার কাছে না আছে কোনো সোনাদানা, না আছে কোনো বিস্ময়কর ওষুধী গাছ।" দৃঢ়কণ্ঠে বললো সন্ন্যাসী। "আপনার সেবা ও যত্নের প্রতিদান আমি সোনাদানা আর যৌবন ফিরে পাওয়ার কথিত ওষুধ দিয়ে দিতে চাই না। আমি আপনার ও সৈন্যদের উপকারের প্রতিদান একটি কঠিন সত্য উচ্চারণ করে দিতে চাই। প্রকৃতপক্ষে আমি আপনাকে চির যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার ওষুধী গাছের কথা এবং সর্পমণি ও সোনাদানা এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরা যে মনোরম জগতের কথা বলেছিলাম, তা সবই অসত্য ও কাল্পনিক। জগতে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। এ কারণে আপনি ইচ্ছা করলে দেয়ালের উপর থেকে ফেলে দিয়ে আমাকে হত্যা করতে পারেন এবং এই তরুণীদেরকে উপভোগ করেও প্রতিশোধ নিতে পারেন। তারপরও আমি বলবো, প্রকৃত সত্য বলে দিয়ে আমি আপনার বড়ই উপকার করছি। আপনি দু'জনকে ওষুধী গাছ আনার জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন। যদি এদেরকে কাল্পনিক ঠিকানার সন্ধানে পাঠিয়ে দিতেন, তাহলে তারা জীবনেও সেই অবাস্তব গন্তব্যের খোঁজ পেতো না। বরং ঠিকানাবিহীন পথে ঘুরে ঘুরে জীবন বিপন্ন করতো। আপনার

দুই সেনাকর্মকর্তাও আমার এক তরুণীর ধোঁকায় পড়ে সর্পমণি আর সোনাদানা কব্জা করার নেশায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলো। তারাও হয়তো কথিত সর্পমণি ও সোনাদানার স্বর্গীয় রাজ্যের তালাশে বেরিয়ে পড়তো।"

সন্ন্যাসীর মুখে পূর্ব কথার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা শুনে দুর্গশাসকের মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো। কয়েকবার তার চেহারার রং বদল হলো। তিনি দাঁতে দাঁত পিষতে শুরু করলেন।

"আপনি বিস্মিত হবেন না।" দুর্গশাসকের উদ্দেশে বললো সন্ন্যাসী। আমি এই পরিস্থিতিতেও আপনাকে ধোঁকায় রাখতে পারতাম এবং আপনার সেবা-যত্নে আমি নিশ্চিন্তে সুস্থতা লাভ করতে পারতাম। কিন্তু আমি কল্পনাও করতে পারিনি আপনার সেনাবাহিনীর সাধারণ সিপাহীরাও এতো উঁচুমানের সততা ও চরিত্রের অধিকারী। আসলে আপনাদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ আপনাদের ধর্মের বস্তুনিষ্ঠতা ও সত্যতা। বাস্তবে আমরা লাহোর থেকে এসেছিলাম। রাজা আনন্দ পালের দ্বিতীয় পুত্র ভীমপাল এখন সিংহাসনে সমাসীন। রাজা ভীমপালের অভিজ্ঞ সেনাপতি তার একটি চক্রান্তের অংশ হিসেবে আমাদের পাঠিয়েছে। আমাদের পরিকল্পনা ছিলো আপনাকে ও আপনার সেনাপতিকে স্বপ্নিল জগতের লোভ দেখিয়ে এবং প্রচুর সোনাদানা, চিরযৌবন ও রাজত্বের মোহে ফেলে বিভ্রান্ত করা। আপনাকে দুর্গের বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং প্রয়োজনে আপনাকে গায়েব করে ফেলার পরিকল্পনাও আমাদের ছিলো।"

"আমরা আপনার কথায় বিভ্রান্ত হয়ে যাবো কিসের ভিত্তিতে আপনি এ বিশ্বাস করলেন।" সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলো কুতুব গোজাক।

"আপনি তো একজন মানুষ, ফেরেশতা নন। মানুষ যতোই ন্যায়নিষ্ঠ হোক না কেনো আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতার বাসনা সবার মধ্যে কাজ করে। এই বাসনাকে আপনি দমিয়ে রাখতে পারেন; কিন্তু তা নির্মূল করতে পারবেন না। ধন-সম্পদ ও সুন্দরী নারী ভোগ-বিলাসিতার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপকরণ। আমরা মানুষের মানবিক দুর্বলতাগুলো বুঝি। যে কোনো মানুষের মধ্যে যৌবনকে দীর্ঘদিন ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা থাকে। আপনার দৈহিক গড়ন ও বার্ধক্যের টান দেখে আমি আপনার পড়ন্ত যৌবনকে উস্কে দেয়ার কথা বলে আপনাকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আপনি আমার কথায়

আকৃষ্ট হয়ে বলেছিলেন, সোনাদানার চেয়ে আপনার কাছে যৌবন ফিরে পাওয়ার ওষুধী গাছটিই বেশি কাঙ্খিত।"

সন্ন্যাসীরূপী লোকের কথায় কুতুব গোজাকের চেহারায় লজ্জার আভাস ভেসে উঠলো।

"আপনি পেরেশান হবেন না।" বললো সন্ন্যাসী। "আপনার জায়গায় অন্য কোনো ব্যক্তি হলেও আমাদের ফাঁদে পা দিতো। আমি তরুণীদেরকে নিয়ে এসেছিলাম আপনার মধ্যে যৌবনের ভাটার টান অনুভূত করানো জন্য। দুনিয়াটাকে আমি খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। বহু মানুষকে আমি ঘেঁটেছি। আমি মানুষের স্বভাবজাত প্রবণতা নিয়ে গভীর নিরীক্ষা করেছি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে আমি আপনার মধ্যে প্রয়োগ করেছি। মনের বাসনা পূরণের জন্য এবং জীবন ও জগতকে উপভোগ করার লোভে মানুষ বিবেককে চাপা দিয়ে আবেগের দাসত্ব করতে শুরু করে। তখন কর্তব্যপরায়ণ মানুষও আপন কর্তব্য ও দায়িত্ব ভুলে যায়। অধঃপতনের দিকে ধাবমান লোকটিও তখন নিজের অধঃগতি অনুধাবন করতে পারে না। তখন অনেকেই বুঝতে পারে না হৃতযৌবন ফিরে আসে না এবং সোনাদানা ধন-সম্পদের দ্বারা এবং দৈহিক ভোগবাদিতার দ্বারা আত্মার প্রকৃত প্রশান্তি পাওয়া যায় না। জাগতিক ধোঁকা ও প্রবৃত্তির প্ররোচনাকে যারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তারাই হয় সাধু-সন্ন্যাসী বা পীর-বুযুর্গ। যে মানুষের মধ্যে আত্মার নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যায়, সে শত শক্ত দুর্গেও পরাজয়বরণ করে। শত্রুরা তার পিঠে চড়ে বসে। আপনি আপনার মিশন থেকে বিচ্যুৎ হয়ে গিয়েছিলেন আর আমাদের কর্তব্য ছিলো আমাদের মিশনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।... কিন্তু এই পড়ন্ত জীবনে আমি কায়মনোবাক্যে আপনাকে একটি রূঢ় বাস্তব উপদেশ দিতে চাই। যে দুই তরুণী ডাকাতদের হাত থেকে বেঁচে গেছে এদেরকে আপনারা আটকে রাখবেন না। এদেরকে আটকে রাখলে এরা আপনার সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ফেলবে, আপনাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা জন্ম দেবে। অবশ্যম্ভাবী নৈতিক ও বাহ্যিক উভয় ধরনের পরাজয় থেকে রক্ষা পেতে হলে নিজের প্রবৃত্তিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।"

সাদা দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসীর ক্ষত শুকাতে প্রায় মাসখানিক সময় লেগে গেলো। এই সময়ের মধ্যে সেনাপতি বাহরাম জেনে গেলো সাপ ও মানুষ

একই সাথে বসবাস করে পৃথিবীতে এমন কোনো রাজ্য নেই। সেই সাথে দুর্গে নিয়ে আসা তরুণীদ্বয়ও তাকে জানিয়ে দিলো আসলে সর্পরাজ্য সর্পমণি বলতে বাস্তবে কিছুই নেই।

এসব রূঢ় বাস্তবতা প্রকাশ করার পরও কুতুব গোজাক যথারীতি পরম যত্নে সন্ন্যাসীর চিকিৎসা তদারকি অব্যাহত রাখলেন। তরুণী দু'জনকে সসম্মানে দুর্গেই রাখা হলো। এক পর্যায়ে তাদের বিদায়ের সময় হলো।

"আপনি শত্রুতার বিষাক্ত মনোভাব নিয়ে এখানে এসেছিলেন আর এখন আপনাকে আমরা বন্ধুর মতোই বিদায় জানাচ্ছি। আমাদের আচার-ব্যবহার যদি আপনার ভালোই লেগে থাকে, তাহলে যাওয়ার সময় অন্তত এতোটুকু বলুন, আসলে আপনাদের রাজা-মহারাজাদের উদ্দেশ্য কী?" সন্ন্যাসীর উদ্দেশে বললেন দুর্গশাসক। "সে কি আমাদের সুলতানের প্রতি আনুগত্য বহাল রাখবে, না তার বাবার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে?"

"আমরা আপনাদের ঈমান ও কর্তব্য বিনষ্টের জন্য যে কঠিন আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম, এটাই প্রমাণ করে আমাদের নতুন মহারাজা ভীমপাল আপনাদের সুলতানের আনুগত্য করবে না বরং তাকে চ্যালেঞ্জ করবে।" বললো সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী আরো বললো, "রাজা ভীমপাল নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে করদরাজা থাকবে না। আপনাদের অধীনস্ত দুর্গশাসক ও সেনাপতিদেরকে মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করার মিশন হিসেবেই আমরা আপনার কাছে এসেছিলাম। তাকে নিশ্চিত করা হয়েছে, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হলে গজনী বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়বে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, গজনীর সুলতানকে তাড়িয়ে একটি দুর্গম ও কঠিন জায়গায় নিয়ে গিয়ে তার উপর সমন্বিত আক্রমণ করা হবে। সেই সাথে তাকে কর দিতে অস্বীকার করবে নতুন রাজা ভীমপাল।"

রাজা ভীমপালের কাছে খবর পৌঁছে গেলো সন্ন্যাসীর বেশে থানেশ্বর দুর্গে যে গোয়েন্দাদেরকে মিশনে পাঠানো হয়েছিলো, তা অকার্যকর হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে এ কথা জানানো হয়নি যে, শুধু মিশনই ব্যর্থ হয়নি, বরং তারা যে পরিকল্পনা করেছিলো, তাও ফাঁস হয়ে গেছে। অবশ্য ভীমপাল এসব চক্রান্তে বিশ্বাসীও ছিলো না। নিজের সাহসিকতা ও সামরিক কার্যক্রমের প্রতি ভীমপালের বেশি আস্থা ছিলো। সে পুরো উদ্যমে যুদ্ধপ্রস্তুতি করতে লাগলো

এবং কোন্ দুর্গম ও কঠিন জায়গায় সুলতানকে পরাজিত করা যায়, তা জায়গা নির্বাচনের প্রতি বেশি মনোযোগী হলো।

ঝিলম থেকে রাওয়ালপিণ্ডি পর্যন্ত একের পর এক পাহাড় অবস্থিত। বর্তমানে পাহাড়ের ভেতর ও পাদদেশ দিয়ে চলে গেছে মহাসড়ক ও রেলপথ। পূর্বে এসব জায়গার পথ ছিলো গুহার মতো। ঝিলম পাহাড়ী এলাকায় বুগীরটিলা নামে একটি জায়গা ছিলো। সেখানকার অধিবাসীদের জাদু-টোনা ছিলো সারা ভারতবর্ষে বিখ্যাত। সুলতান মাহমূদের সময়ে এই এলাকাটি ছিলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ এবং খুবই দুর্গম। ভীমপাল সুলতান মাহমূদের সাথে মোকাবেলার জন্য ঝিলম ও রাওয়ালপিন্ডির মাঝামাঝি দুর্গম এই স্থানটিকে বেছে নিলো। সে তার সেনাবাহিনী সেই দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় স্থানান্তরের নির্দেশ দিলো। সেই সাথে সেনাপতিদের বললো, তারা যেনো পাহাড়ী এলাকায় যুদ্ধ করার জন্য সেনাদেরকে বিশেষভাবে তৈরি করে। গজনী বাহিনীকে লাহোরে যাওয়ার জন্য এই দুর্গম ও সংকীর্ণ পথ অবলম্বন করতে হতো। এই সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য ভীমপাল জায়গায় জায়গায় ফাঁদ তৈরি করলো এবং পাহাড়ের উপরে তীরন্দাজ ইউনিট নিযুক্ত করলো। তীরন্দাজের উপরই বেশি গুরুত্ব দিলো ভীমপাল। আক্রমণের পর পাহাড়ী এলাকায় গজনী বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে তাদের পরাস্ত করার জন্য বিশেষ অশ্বারোহী ও হস্তি বাহিনীকেও প্রস্তুত করলো। হস্তি বাহিনীকে অতি সংকীর্ণ পথে আক্রমণ এবং বিস্তৃত ময়দানে মোকাবেলার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দিলো।

একদিন ভীমপালের কাছে খবর এলো, থানেশ্বর দুর্গ শাসকের পক্ষ থেকে এক দূত মহারাজার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। ভীমপাল তাদেরকে রাজ দরবারে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলো। থানেশ্বর দুর্গশাসকের দূতের সাথে ছিলো ভীমপালের পাঠানো সাদা দাড়িওয়ালা সেই সন্ন্যাসী ও তার সহযোগী দুই তরুণী। থানেশ্বর দুর্গের ডেপুটি সেনাপতি দূত হিসেবে বারজন নিরাপত্তা রক্ষী নিয়ে ভীমপালের রাজদরবারে এসেছিলো।

দূত রাজা ভীমপালের মুখোমুখি হয়ে বললো, "মহারাজ! আমরা আপনার আমানতকে ফেরত দিতে এসেছি। আপনার পাঠানো অন্যান্য সন্ন্যাসী ও তরুণীরা হিন্দু ডাকাতদের আক্রমণে নিহত হয়েছে বিধায় আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। এদেরকেও গুরুতর আহত অবস্থায় আমাদের সৈন্যরা উদ্ধার করে

এনেছিলো। আমরা তাদেরকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করেছি। আমরা তাদেরকে আরো আগেই ফেরত পাঠাতে পারতাম; কিন্তু এই বয়স্ক সন্ন্যাসীর আঘাত ছিলো মারাত্মক; তার সুস্থ হতে সময় লেগেছে। আপনি এই তরুণীদের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমরা আপনার আমানতের কোনো খেয়ানত করেছি কিনা। তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন, তাদের দলের কোনো সদস্য আমাদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছে কিনা।"

সমকালীন ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, ভীমপালের মতো দুঃসাহসী ও অত্যাচারী রাজাও সন্ন্যাসীর ব্যর্থতার কোনো প্রতিশোধ নিতে পারেনি। বরং ব্যর্থ সন্ন্যাসী ও দূতকে সসম্মানেই বিদায় করেছে। এর ফলে ডেপুটি সেনাপতি সাহসিকতার সাথেই রাজদরবারে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি রাজার উদ্দেশে বলেন, "মাননীয় মহারাজ! আপনি আমাদের করদাতা। চুক্তি অনুযায়ী আপনি ও আমাদের মধ্যে কেউ কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নেবে না। কিন্তু আপনি ইতিমধ্যেই বেশকিছু তৎপরতা চালিয়েছেন, যা চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং এটাও প্রমাণিত হয়েছে, হিন্দু রাজপুতরা সাপের চেয়েও ভয়ংকর।"

রাজা ভীমপাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দূতের দিকে তাকিয়ে বললো, "করদাতা অর্থ এই নয় যে, তোমরা আমাদের রাজদরবারে এসে যাচ্ছে তাই কথা বলবে।"

রাজার মনোভাব দেখে দরবারীদের কেউ কেউ তরবারীর বাঁটে হাত রেখে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে দূতের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। দূতরূপী ডেপুটি সেনাপতি চকিতে একবার রাজদরবারের চতুর্দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, "দুর্ভেদ্য রাজদরবারের ভেতরে নিরস্ত্র এক দূতের বিরুদ্ধে এতোজন লোক রণপ্রস্তুতি নিলেন, ভাবতেও অবাক লাগে। আমাদের সুলতানের দরবারে কোনো নিরস্ত্র দূতের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে যদি কোনো শাহজাদাও তরবারীর বাঁটে হাত রাখতো, তাহলে সুলতান তার হাত কেটে ফেলতেন। তরবারীর পরাকাষ্ঠা যুদ্ধ ময়দানে দেখাতে হয়। তোমরা যদি তরবারী চালনায় এতোটাই সিদ্ধহস্ত হতে, তাহলে এই বৃদ্ধ ও তরুণীদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে না। এরা তো তোমাদেরই বোন-কন্যা। এদের সম্ভ্রমকে তোমরা যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারলে?"

কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, সেদিন ভীমপালের রাজদরবারে যে ব্যক্তি দোভাষীর কাজ করছিলো, সে থানেশ্বর দুর্গশাসকের বিশেষ দূত গজনী বাহিনীর একজন তুখোড় যোদ্ধা ডেপুটি সেনাপতির তিরস্কারমূলক বক্তব্য হুবহু

ভাষান্তরিত করে রাজাকে শোনাচ্ছিলো না। দূতের কঠোর ও কড়া তিরস্কার ও অবমাননামূলক শব্দগুলোকে অনেকটাই সাদামাটা ও সহজ ভাষায় রাজার কাছে পেশ করছিলো। অবস্থা দেখে দূত রাজার দোভাষীর উদ্দেশে বললেন, "আমি জানি না, তুমি আমার কথাগুলো হুবহু ভাষান্তরিত করে রাজার কাছে উপস্থাপন করছো কিনা। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, আমার আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে হুবহু তুমি রাজার কাছে পেশ করছো না। আমি যেভাবে বলছি, হুবহু সেভাবে আমার কথাগুলো তোমাদের রাজার কাছে উপস্থাপন করো।"

এ পর্যায়ে এ কথাটিও দোভাষী রাজাকে শোনালো।

"সম্মানিত দূত, শুনুন! আমার বাবা ছিলেন আপনাদের করদাতা। তিনি মারা গেছেন। এখন আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, আমি কর দেবো কিনা। অবশ্য এ অবস্থায়ও আমাদের মৈত্রী বহাল আছে এবং থাকবে।" বললো রাজা।

"আমি আপনার কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা এ মুহূর্তে কর্তব্য মনে করছি।" বললো দূতরূপী ডেপুটি সেনাপতি। "আপনার দাদা আমাদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। আপনার বাবাও কোনো ক্ষেত্রেই জয়লাভ করতে পারেননি। এখন আপনার পালা। আপনি ইতিমধ্যে কয়েক তরুণীকে বলি দিয়ে দিয়েছেন। আপনি পাথরের মূর্তির সামনে বসে আরাধনা করে কী পাচ্ছেন? পরাজয় ছাড়া এতে কি কোনো উপকার হয়েছে! আপনার কি এখনো বুঝে আসেনি, আপনাদের ধর্ম একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস? সেই অদ্বিতীয় নিরাকার প্রভুই আপনাদেরকে একের পর এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি করছেন। কারণ, তিনিই একমাত্র প্রভু। শাস্তি ও পুরস্কার দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে। আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুন মহারাজ।"

"কারো রাজদরবারে এসে কোনো দূত কারো ধর্মকে অবমাননা করুক এমন দুঃসাহস আমরা কোনো দূতকে দিই না।" বললো রাজা। "আমার রাজ দরবারে এসে আমার সামনে আমার ধর্মকে অবমাননা করে আপনি আমাদের সাথে মৈত্রীচুক্তির ব্যাপারে ভাবতে বাধ্য করছেন। ঠিক আছে, আপনি এখন আসতে পারেন।"

দূত রাজদরবার ত্যাগ চলে এলেন। সাদা দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসী এবং দুই তরুণী অধোমুখে তখনো রাজদরবারে দাঁড়ানো।

“ওদের এখান থেকে নিয়ে যাও।” হুংকার দিয়ে নির্দেশ দিলো ভীমপাল। “এই বৃদ্ধ আর মেয়েগুলো আমার জীবনের কলঙ্ক হয়ে থাকবে। আমার দৃষ্টি থেকে এদের সরিয়ে দাও। এসব আমি কখনো ব্যবহার করতে প্রস্তুত নই। আমি সম্মুখযুদ্ধে মোকাবেলা করেই মাহমূদকে বন্দী করে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করবো, এখন বলো কার ধর্ম সঠিক!”

ঝিলম তীরের পাহাড়ী এলাকা সেনা শিবিরে পরিণত হলো। সেখানে বিপুল সংখ্যক সৈন্য পাঠালো রাজা ভীমপাল। এদিকে মন্দিরে মন্দিরে হিন্দু পুরোহিতরা আবারও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে শুরু করলো। ফলে পূর্বের মতো বেসামরিক লোকজন ঢাল-তলোয়ার ও তীর-ধনুক নিয়ে লাহোরে জমায়েত হতে শুরু করেছে। হিন্দু জনসাধারণ রাজা ভীমপালের কোষাগারে অর্থ-সম্পদ জমা করতে শুরু করলো। হিন্দু নারীরা তাদের গায়ের অলংকার খুলে ভীমপালের যুদ্ধভাণ্ডারে দান করতে লাগলো। প্রত্যেক হিন্দুর মধ্যে যুদ্ধ-উন্মাদনা জন্ম নিলো। যেসব হিন্দু যুবক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন এলাকা থেকে লাহোর পৌঁছলো, তাদেরকে ঝিলম তীরবর্তী পাহাড়ী এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হলো।

সুলতান মাহমূদের কাছে খবরাখবর আসছিলো। কিন্তু তার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি যে, ভীমপাল তার বিরুদ্ধে আক্রমণ করার চক্রান্ত করছে এবং আক্রমণের জন্য প্ররোচনা দিচ্ছে। এমতাবস্থায় ১০১২ খৃস্টাব্দ চলে গেলো। ১০১৩ খৃস্টাব্দের শেষভাগে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর এলো, ভীমপাল সুলতানের সাথে তার বাবার মৈত্রীচুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং কর দিতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সুলতানের গোয়েন্দারা এ খবরও পাঠালো যে, রাজা ভীমপাল ঝিলম নদীর তীরবর্তী পাহাড়ী এলাকায় তার সৈন্যদের ছড়িয়ে রেখেছে এবং জায়গায় জায়গায় ফাঁদ তৈরি করেছে। সমকালীন হিন্দু জনতা ভীমপালকে বীর উপাধিতে ভূষিত করেছিলো। আর এদিকে শত্রু নির্মূলে সুলতান মাহমূদ ছিলেন অধৈর্যশীল। বেঈমানদের বিরুদ্ধে তিনি সব সময়ই ক্ষিপ্ত থাকতেন। তার এক পা সর্বদাই ঘোড়ার পাদানিতে থাকতো। ভীমপালের রণপ্রস্তুতির কথা শুনে সুলতান ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে তাঁর সৈন্যরাও কিছুটা বিশ্রাম নেয়ার অবকাশ পেয়েছিলো এবং তার সৈন্যঘাটতিও এ সময়ে পূরণ হয়ে গিয়েছিলো। ভীমপাল ভেবেছিলো, সুলতান মাহমূদ হয়তো আরো কিছুদিন পরে এদিকে অভিযান করবেন এবং লাহোর পর্যন্ত পৌঁছুতে তার বাহিনীর

অন্তত ছয় মাস সময় লাগবে। ততোদিনে শীতকাল শেষ হয়ে গ্রীষ্মকাল শুরু হয়ে যাবে। আর তখন হিন্দুস্তানীদের জন্য সময়টা যুদ্ধের উপযোগী হবে। কিন্তু ভীমপালের এ ধারণা ছিলো নিতান্তই ভুল।

ভীমপাল জায়গায় জায়গায় তার সৈন্য মোতায়েন করে ফাঁদ তৈরি করে নিশ্চিন্তে লাহোরে অবস্থান করছিলো আর ভাবছিলো, সুলতানের বাহিনী মারগালা অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকা অতিক্রম করলেই তার গোয়েন্দারা তাকে খবর দেবে। রাওয়ালপিন্ডি অঞ্চলের একটি জায়গার নাম মারগালা। ভীমপাল সুলতানের ক্ষিপ্রগতি সম্পর্কে জানতো না। তাই সে রাজকীয় চালে ধীরগতিতে অগ্রসর হয়ে লাহোর থেকে বালনাথ নামক পাহাড়ী উপত্যকায় পৌঁছলো। এদিকে সুলতান মাহমূদ মারগালা এসে গতি থামিয়ে দিলেন। সারা রাত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। তিনি এখানে যাত্রাবিরতি করে তাঁর গোয়েন্দাদের মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করেন, শত্রু বাহিনীর অবস্থান কোথায়, তাদের বিস্তৃতি কোন্ পর্যন্ত এবং তাদের রণকৌশল কী ধরনের হতে পারে? ইত্যবসরে ভীমপাল বালনাথ নামক স্থানে পৌঁছায়। জায়গাটি ছিলো পাহাড়-টিলা ও খানা-খন্দকে ভরা। ভীমপাল জায়গাটিকে নিজের সুবিধা অনুযায়ী দুর্গের মতো ব্যবহার করার পরিকল্পনা করে অবস্থান গ্রহণ করে।

প্রত্যুষেই সুলতান মাহমূদ ভীমপালের অবস্থান এবং সেখানকার ভৌগোলিক পরিস্থিতির সামগ্রিক তথ্য পেয়ে যান। সুলতানকে আরো জানানো হলো, ঝিলমের টিলা ও পাহাড়ের চূড়ায় ভীমপালের তীরন্দাজ বাহিনী অবস্থান নিয়েছে এবং জায়গায় জায়গায় ওঁৎ পেতেছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি জেনে সুলতান সেনাকমান্ডারদের ডেকে বললেন, তিনি লাহোর যাবেন না এবং ঝিলমের পাহাড়ী পথেও তিনি অগ্রসর হবেন না। তিনি কমান্ডারদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে অগ্রবর্তী সেনাদেরকে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

ভীমপালের সৈন্যবল সুলতানের সৈন্যবলের চেয়ে অনেক বেশি ছিলো। অবস্থানগত দিক থেকেও ভীমপাল ছিলো সুবিধাজনক স্থানে। সুলতান মাহমূদের সৈন্যরা আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলো। সাধারণ বাংকারে অবস্থানকারী কোনো বাহিনীকে আক্রমণ করতে হলে বেশি সৈন্যের প্রয়োজন হয়। কারণ, এমন আক্রমণে আক্রমণকারীদের জনবল বেশি ক্ষতির

সম্মুখীন হয় কিন্তু এক্ষেত্রে সুলতানের সৈন্যসংখ্যা বেশি ছিলো না। এ ক্ষেত্রে ঝটিকা বাহিনীকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সুলতানকে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হলো। সাধারণত গুপ্ত হামলা ও ঝটিকা আক্রমণের সাফল্য নির্ভর করে সৈন্যদের বীরত্ব ও সাহসিকতার উপর। রাতের অন্ধকারে লক্ষ্যস্থলে না গিয়েই যদি ফিরে এসে কোনো সৈন্যদল কর্তা ব্যক্তিদেরকে মিথ্যা তথ্য দেয়, তা নিরূপণ করার মতো বিকল্প কোনো সূত্র থাকে না।

এক্ষেত্রে সুলতান মাহমূদের গুপ্ত আক্রমণকারীদের নির্বাচন করা হতো সৈন্যদের দৈহিক ও মানসিক দৃঢ়তা এবং ধর্মীয় আবেগের ভিত্তিতে। ঝটিকা বাহিনীর সদস্যের সাথে সুলতান মাহমূদ আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতেন। সুলতান মাহমূদের ঝটিকা বাহিনীর সদস্যদের অবস্থা এমন হতো যে, তাদের জীবন-মরণে কবরস্থ হওয়া এবং কাফন দাফন হওয়ার সম্ভাবনাও থাকতো না।

পরদিন রাতের বেলায় সুলতান মাহমূদের সৈন্যরা পাহাড়ী অঞ্চলে পৌছে গেলো। ঝটিকা বাহিনীর সদস্যরা রাতের অন্ধকারে আরো এগিয়ে গেলো। প্রত্যেক দলে ছিলো দশ-বারজন দুর্ধর্ষ সৈন্য আর তাদের সাথে থাকতো একজন করে স্থানীয় গাইড। প্রত্যেক দলের টার্গেটি ছিলো সেই পাহাড় চূড়া, যেখানে ভীমপাল অবস্থান করছে। সময়টা ছিলো ডিসেম্বরের শুরু এবং শীতের প্রচণ্ডতা। এমন বরফশীতল রাতে শত্রুপক্ষ থেকেও কোনো জঙ্গী তৎপরতার সম্ভাবনা নেই মনে করে ভীমপালের সৈন্যরা বাংকারে বাংকারে মাথা গুঁজে শুয়ে ছিলো।

সুলতানের ঝটিকা বাহিনী পা টিপে টিপে বরফশীতল রাতের অন্ধকারে পাহাড়ে ও টিলার চূড়ায় উঠে গেলো। হিন্দু তীরন্দাজ সৈন্যরা তখন বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। প্রতি বাংকারে মাত্র একজন করে প্রহরী পাহারা দিচ্ছিলো। এই একজন পাহারাদারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা তেমন কঠিন হলো না। কয়েকটি চৌকিতে হিন্দু সৈন্যরা জাগ্রত থাকার কারণে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো আর অধিকাংশ চৌকিতেই সুলতানের বাহিনী ঘুমন্ত সৈন্যদেরকে নিঃশেষ করে দিলো। জাগ্রত সৈন্যদের সাথে কঠিন মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হওয়ার কারণে চতুর্দিকে শোরগোল পড়ে গেলো। শোরগোলের আওয়াজ ভীমপালের কানে পৌছুলে পরিস্থিতি জানার জন্য ভীমপাল লোক পাঠালো। কিন্তু সংবাদ সংগ্রহ করে কেউই আর ফিরে এলো না।

রাত শেষে প্রত্যূষেই সুলতান মাহমূদ তাঁর গেরিলা দলের সাফল্যের সংবাদ পেলেন। অতঃপর তার সৈন্যদের একটি অংশকে তিনি চুপিসারে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ভীমপালের রণকৌশল সুলতান মাহমূদের বুঝতে মোটেও বেগ পেতে হলো না। ভীমপাল ভেবেছিলো, সুলতানের বাহিনী পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে অতিক্রম করবে। এ জন্য সে পাহাড়ের পাদদেশে সৈন্যদের ছড়িয়ে দিয়েছিলো।

দুপুরের আগেই সুলতানের সৈন্যরা ক্ষুধার্ত সিংহের মতো গর্জন দিয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে পাহাড়ের উপর থেকে নীচের দিকে তুফানের মতো ধেয়ে এলো। ভীমপালের সৈন্যরা আকস্মিক এই আক্রমণে প্রতিরোধের অবকাশই পেলো না। ওঁৎ পেতে ফাঁদ তৈরি করে রাখা হিন্দু সৈন্যরাই ফাঁদে আটকে গেলো। অবস্থা বেগতিক দেখে দাদা জয়পালের মতো ভীমপালও নিজের জীবন নিয়ে পালিয়ে গেলো। যাওয়ার আগে সে নির্দেশ দিলো, সকল সৈন্য বাংকার থেকে বেরিয়ে লাহোর রক্ষার চেষ্টা করো।

ভীমপালের ভাগ্য প্রসন্ন ছিলো যে, সে পালাতে সক্ষম হয়েছিলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রুবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ড নিঃশেষ হয়ে গেলো। হিন্দু বাহিনীর পতাকাও গায়েব হয়ে গেলো। পতাকা গায়েব ও কেন্দ্রীয় কমান্ড না থাকায় হিন্দু বাহিনী দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে শুরু করলো আর সুনিয়ন্ত্রিত ও লক্ষ্যভেদী গজনী বাহিনীর সৈন্যরা অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা এলাকা শত্রুমুক্ত করে ফেললো।

যুদ্ধ শেষে গজনী বাহিনীর হাতে হিন্দু যুদ্ধবন্দিরা জানিয়েছে, রাজা ভীমপাল পরিস্থিতি বেগতিক দেখে কাশ্মীরের দিকে পালিয়ে গেছে। সুলতান মাহমূদ ভীমপালের প্রতি এতোটাই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, তিনি একটি সেনা ইউনিট নিয়ে ভীমপালের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। কাশ্মীরে ঝিলাম নদীর তীরে অবস্থানরত হিন্দু সৈন্যরা সুলতানের অগ্রবর্তী দলকে ঘেরাও করে সবাইকে হত্যা করে। এই সাফল্যে হিন্দু বাহিনীর সেনাপতি সামনে অগ্রসর হয়ে সুলতানের বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তারা বুঝতে পারে, জীবনের সবচেয়ে ভুল কাজটিই তারা করেছে। কিছুক্ষণ ব্যর্থ মোকাবেলা করে অবশেষে তাদের সবাইকে সুলতানের কাছে পরাজয়বরণ করতে হয়।

বিজয়ের পর সুলতান মাহমূদ ঘোষণা করলেন, এখানকার সকল অধিবাসী যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে, তাহলে সকল বসতি উজাড় করে দেয়া হবে। সুলতানের ঘোষণায় লোকজন দলে দলে ইসলামে দীক্ষা নিতে লাগলো। সেখানকার যুগিরটিলা নামক স্থানের একটি মন্দিরে একটি মূর্তি ছিলো খুবই পুরনো। হিন্দুরা বিশ্বাস করতো, চল্লিশ হাজার বছরের পুরনো এই মূর্তিটি। সুলতান মাহমূদ পুরনো মূর্তিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে মন্দিরটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেললেন। ১১১৪ সালের জুলাই মাসে বিজয়ীবেশে সুলতান মাহমূদ পুনরায় গজনীতে ফিরে এলেন।

## অজেয় দুর্গ

১০১৪ হিজরী সনের শেষ ভাগের ঘটনা। ঝিলম নদীর তীরবর্তী পাহাড়ের ঢালে সাধারণ একটি দুর্গে সুলতান মাহমূদের কিছুসংখ্যক সৈন্য অবস্থান করছিল। পাঞ্জাবের মহারাজ ভীমপালকে পরাজিত করে সুলতান মাহমূদ এ দুর্গ তাঁর অধীনে নিয়ে এসেছিলেন। পাঞ্জাবের বিজিত এলাকায় সুলতান মাহমূদ তার নিজস্ব শাসনব্যবস্থা চালু করতে পারেননি। কারণ, গযনীতে গণ্ডগোল দেখা দেয়ায় তাকে তড়িঘড়ি করে গযনীতে ফিরে যেতে হয়েছিল। পা াবের পরাজিত মহারাজার সাথে সুলতানের কৃতচুক্তি অনুযায়ী তিনি পাঞ্জাবের যে কোন স্থানে তাঁর সেনাবাহিনীর দু'-একটি শিবির স্থাপনের ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। চুক্তি মোতাবেক সেনাদের সর্বময় খরচ ভীমপালের বহন করার কথা ছিল।

বালনাথ দুর্গে সুলতান মাহমূদের সৈন্যদের অবস্থান কয়েক মাস হয়ে গেল। মাকরানের অধিবাসী সারওয়াগ নামের ডেপুটি সেনাপতি ছিলেন বালনাথের দুর্গপতি। হঠাৎ একদিন বালনাথ দুর্গে দু'জন অশ্বারোহী এলো। আগন্তুকদের একজন একটি মসজিদের ইমাম আর অপরজন গযনী বাহিনীর একজন সৈনিক। তারা কাশ্মীরের সীমান্ত এলাকা থেকে এসেছে। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আসায় তারা ছিল পরিশ্রান্ত। তাদের চেহারা ধুলোবালি মাখা আর শীতের তীব্রতায় ঠোঁট ফেটে চৌচির।

তাদের চেহারা ছবিই বলে দিচ্ছিল, তারা দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসেছে এবং পথিমধ্যে কোন বিশ্রাম ও পানাহার করেনি। এরা বালনাথ দুর্গে এসেই দুর্গরক্ষক সরওয়াগের কাছে চলে এলো।

"আপনারা খুবই ক্লান্ত। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন, এরপর আমি আপনাদের কাছ থেকে ওখানকার খোঁজ খবর জানবো।"

"ওখানকার যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তার চেয়ে আমাদের চেহারা মোটেও খারাপ হয়নি সম্মানিত দুর্গপতি।" বললেন আগন্তুক ইমাম।

"তাই! কী হয়েছে? হিন্দুরা কি আমাদের লোকজনকে বন্দী করে রেখেছে? উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন সারওয়াগ! হিন্দুরা কি আপনাদেরকে ইসলামের

প্রচার কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে? সুলতানের নির্দেশ বাস্তবায়নে হিন্দুরা আপনাদেরকে বাধা দিচ্ছে?"

"না, এমন কিছুই হয়নি। আমি বাধ্য হয়েই এই সিপাহীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। সে ঘটনা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে।... আমি নিজেও সৈনিক, শুধু ইমাম নই। আপনার এমনটি ভাববার অবকাশ নেই যে, আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওখান থেকে পালিয়ে এসেছি। কাশ্মীর যাদুগরদের স্বর্গরাজ্য। এছাড়া ওখানে এক প্রকার অস্বাভাবিক অদৃশ্য শক্তি রয়েছে, যারা মানুষকে নানাভাবে ধোঁকা দেয়। এই অস্বাভাবিক শক্তি জিনও হতে পারে, মানুষের প্রেতাত্মাও হতে পারে।" বললেন ইমাম।

"মনে হচ্ছে, আপনারা হিন্দুদের যাদুটোনার শিকার হয়েছেন। বললেন দুর্গপতি সারওয়াগ। আপনি যা বলছেন, এসব কথা এতো সহজে আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। সুলতান ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বহু যাচাই-বাছাই করে দুর্গপতির দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন। তাকে আমার সম্পর্কে বলা হয়েছিল, সেনাপতি সারওয়াগ কুসংস্কার ও অপপ্রচারে প্রভাবিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার মতো ব্যক্তি নয়। আপনি হিন্দুস্তানে জন্মগ্রহণকারী মানুষ। হিন্দুদের নানা কুসংস্কার ও ভৌতিক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী পরিবেশে বড় হয়েছেন। অথচ এখন আপনি মুসলমানদের ইমাম। একজন ইমামকে অবশ্যই বাস্তববাদী ও দূরদর্শী হওয়া উচিত। কারণ, আপনি সমাজের পরিচালক। সাধারণ মানুষ আপনাকে অনুসরণ করবে।

"সম্মানিত দুর্গপতি! এতদূর থেকে নাওয়া-খাওয়া, ঘুম-বিশ্রাম ত্যাগ করে অবিরাম সফর করে আপনার কাছে ছুটে এসেছি, আপনাকে বুঝতে হবে ব্যাপারটি সাধারণ কোন ঘটনা নয়। আপনার পক্ষে ঘটনার ভয়াবহতা কল্পনা করাও কঠিন। তাই আপনি আমার সবকথা শোনার আগেই বলে দিয়েছেন আমি বাস্তববাদী নই। বললেন ইমাম।

আমি একথা এজন্য বলেছি যে, আপনারা ওখানকার ঘটনা বলতে গিয়ে যাতে আবেগাপ্রবণ হয়ে বাড়িয়ে না বলেন।" বললেন দুর্গপতি। যা হোক, এখন আপনি যা বলতে চাচ্ছিলেন বলুন।

"প্রকৃতিগতভাবেই কাশ্মীর এমন শোভামণ্ডিত অঞ্চল যে, মনে হয় কাশ্মীর দুনিয়ার কোন ভূখণ্ড নয়, যেন এটা মানুষ নয়– জিন্নাতের আবাসস্থল। কখনো

মনে হয়, এ ভূখণ্ড হয়তো মর্তের মানুষের আবাসস্থল নয়, এখানে ওইসব মানুষের রুহেরা বাস করে, যারা সবাই জান্নাতী।” বললেন ইমাম।

“রূহ আল্লাহ তায়ালার একটি আমানত। মানুষ মরে গেলে রূহ আল্লাহর দরবারে চলে যায়। বললেন, দুর্গশাসক সারওয়াগ। কোন রূহ জমিনে বসবাস করে না। আপনি কল্পনা আর স্বপ্নের কথা বলবেন না সম্মানিত ইমাম। আসলে আপনি ওখানে কী দেখে এসেছেন, হুবহু সেই কথা বলুন।

“আমরা ওখানে গিয়ে মানুষকে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত করছিলাম। আমরা তাদেরকে নামায পড়াতে শুরু করি এবং মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে তাদের জানাতে থাকি। এ কথাও বুঝাতে চেষ্টা করেছি. আল্লাহর সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কী? ওখানকার লোকজন সুলতানের নির্দেশে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল বটে; কিন্তু আমরা তাদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিলে তারা মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে।

কিছুদিন পর সেখানে রাতের বেলায় বিস্ময়কর এক আলোর ঝলকানী দেখা দেয়। অথচ তখন আসমানে না কোন মেঘ ছিল, না বৃষ্টি-বাদলের লক্ষণ ছিল। আমি যে গ্রামে ছিলাম এক পর্যায়ে ওই গ্রামেও অদ্ভুত বিজলী দেখতে পাওয়া যায়। একদিন রাতের বেলায় সেই গ্রামের মাঠে ঘোড়া দৌড়ানোর আওয়াজ শোনা যায়। এমন নয় যে, আওয়াজটি কাছে থেকে শুরু হয়ে দূরে মিলিয়ে যেত, বরং কাছে থেকেই আওয়াজটি শোনা যেত এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তা হারিয়ে যেত।

একদিন দিনের বেলায় কাঠুরিয়া লোকজন জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহে গেলে তারা জঙ্গলের মধ্যে নারীকণ্ঠের কান্নার আওয়াজ শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়ে পালিয়ে এলো। তারা এসে এই খবর শোনালে অন্য লোকজন জঙ্গলে কোন বিপদাপন্ন নারীর কান্না কি-না তা যাচাই করতে গিয়ে কোন জনমানুষের অস্তিত্বই জঙ্গলে খুঁজে পায়নি।

একদিন রাতের বেলায় বিপন্ন নারীকণ্ঠের কান্না শোনা গেল। নারীর কান্না থেমে যাওয়ার পর জলদগম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো... ‘দেব-দেবীদের অভিশাপ পতিত হবে... পাহাড় ফেটে যাবে... বনে আগুন জ্বলবে... সাবধান! দেব-দেবীদের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের অসন্তুষ্ট করো না।’

ইমাম আরো বললেন, এসব কথা শুনে আমি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি, দেবদেবীদের কোন অস্তিত্ব নেই, এসব দেখে তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। তোমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করবে। কিন্তু বুঝতে পারলাম, আমার আশ্বাসবাণীতে তারা আশ্বস্ত হতে পারছে না। এই ঘটনার চার/পাঁচ দিন পর পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে চারজন লোক ভীত-বিহ্বল অবস্থায় আমাদের গ্রামে এলো। তারা এসে জানাল, তাদের গ্রাম সংলগ্ন একটি পাহাড় ফেটে গেছে। ফাটা পাহাড় থেকে একটু পর পর আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। মাঝে মধ্যে ভেঙ্গে পড়ছে পাহাড়ের অংশবিশেষ। ভাঙ্গা পাহাড়ের আশপাশে অদ্ভুত আকৃতির মানুষের আনাগোনা তারা দেখতে পেয়েছে।

এসব ভীতিকর কাহিনী শুনে আমার গ্রামের লোকজন এতটাই ভীত হয়ে পড়ল যে, তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে গেল। আমি যতই তাদের 'কিছু হবে না' বলে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করি; কিন্তু তারা ততই ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমি গ্রামের মুরুব্বীদের বোঝাতে চেষ্টা করি, যা শোনা যাচ্ছে, এগুলো হিন্দু যোগী সন্ন্যাসীদের কারসাজী। এরা সাধারণ লোকজনকে ইসলাম গ্রহণ থেকে ফেরানোর জন্য এসব যাদুটোনা করছে।

সম্মানিত দুর্গশাসক! আমি যতই আশ্বাসবাণী শোনাই না কেন, কিছু ঘটনা আসলে এমনও ঘটেছে, যেগুলোর কোন ব্যাখ্যা নেই। কোন অবস্থাতেই এগুলোকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। যেমন ধরুন, রাতের বেলায় পরিষ্কার মেঘহীন আকাশে বিজলী চমকানোর বিষয়টি মানুষকে বোঝানো মুশকিল। মানুষকে কি বোঝাবো, আমার নিজের কাছেই এই বিষয়টির কোন ব্যাখ্যা নেই। তাছাড়া আরো এমন ঘটনাও ঘটেছে, এ সৈনিকের মুখে আপনি তা শুনুন।

"আমাদের সেনাচৌকির অবস্থান নদীর পাড়ে।" বললো সৈনিক। হঠাৎ এক রাতে আমরা নারীকণ্ঠের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। একাধিক নারীর কান্নার আওয়াজ শুনে চৌকির কমান্ডার যুবায়ের সাহেব আমাকে এবং অপর একজন সিপাহীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। যেদিক থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে এসেছিল, আমরা সেদিকে অগ্রসর হলে আওয়াজ থেমে গেল। অপর দিক থেকে দু'জন পুরুষকে আমরা আসতে দেখলাম। কমান্ডার যুবায়ের জামালী তাদের জিজ্ঞেস করলেন, নারীকণ্ঠের কান্নার আওয়াজ কোন দিক থেকে এসেছে? তারা জানালো, কোন নারীর কান্নার আওয়াজ তারা শোনেনি।

ঠিক সেই সময় নারীদের কান্নার আওয়াজ আবার শোনা গেল। কমান্ডার তখন তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এই তো কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এই মহিলারা কারা? তারা বললো, কোথায়, আমরা তো কারো কান্নার আওয়াজই শুনছি না? আমরা বিস্মিত হলাম, যে আওয়াজ আমরা দিব্যি শুনতে পাচ্ছি, একই আওয়াজ অন্যেরা শুনতে পাচ্ছে না কেন?

সেই দুই ব্যক্তি আমাদের জানালো, এই এলাকায় মাঝে মধ্যে দু'জন তরুণীকে দেখা যায়। যারাই দেখতে পায়, তাদেরকেই ওরা কাছে যেতে ডাকে, কিন্তু কাছে গেলে আর ওদের পাওয়া যায় না। তরুণীরা অদৃশ্য হয়ে যায়। লোক দু'জন আরো কিছু কথা বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু কমান্ডার জামালী আর কথা না বাড়িয়ে আমাদের নিয়ে চৌকিতে ফিরে এলেন। পরদিন সন্ধার পর যুবায়ের জামালী আমাকে ও অপর এক সাহসী সৈনিককে সাথে নিয়ে বের হয়ে বললেন, তিনি গতরাতের কান্নার রহস্য উদ্ঘাটন করতে চান। আমাদের চৌকির ধারে-কাছে কোন জনবসতি ছিল না। গোটা এলাকাটি ছিল খুবই সুন্দর। আমরা দু'টি টিলাসম পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় একটি পাহাড়ের ঢালে আমরা দু'জন তরুণীকে দেখতে পেলাম। ওদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত আসমানী রঙের এমন পাতলা কাপড় জড়ানো ছিল যে, ওদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো দূর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। তরুণীদ্বয়ের মাথা ছিল খোলা, তাদের চুলগুলো ছিল আজানু প্রলম্বিত। ওরা পরস্পর কথা বলছিল আর আমাদেরকে ইশারায় কাছে যেতে আহ্বান করছিল। ওরা যেখানটায় দাঁড়ানো ছিল, সেই জায়গাটি ছিল অসম্ভব সুন্দর। চারদিকে ঘন ঘাস আর বাহারী রঙের লতাগুল্ম ও সুশোভিত ফুলগাছের ঝোপঝাড়। জায়গাটি ঘন গাছ গাছালীতে ভরা ছিল। গাছের ডালপালা পরস্পর মিলেমিশে পুরো জায়গাটায় ছাতার মতো আচ্ছাদন তৈরী করেছে। সূর্যের আলো ঘনগাছের পত্রপল্লব ভেদ করে মাটিতে পৌঁছাতে পারতো না। দাঁড়ানো দু'জনকে মনে হচ্ছিল এই প্রাকৃতিক পরিবেশেরই যেন অংশ। দুই তরুণীকে দাঁড়ানো দেখে আমরা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে পড়লাম। তরুণীদ্বয় তাদের অবস্থানেই দাঁড়িয়ে রইল। কমান্ডার যুবায়ের জামালী বললেন, তিনি সামনে এগিয়ে যাবেন। আমরা তাকে বাধা দিলাম। কিন্তু তিনি আমাদের বাধা মানলেন না। আমরা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলাম. তরুণী দু'জনের একজন হাতের ইশরায় যুবায়ের জামালীকে কাছে ডাকল।

আমাদের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কমান্ডার এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি তরুণীদের কাছে যাওয়ামাত্রই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সে কি বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল? দুর্গশাসক সারওয়াগ জানতে চাইলেন।

"না, বাতাসে মিলিয়ে যায়নি– খুব দ্রুত জমিনে তলিয়ে গেল। বললো সিপাহী।

"আমরা তাকে জমিনে তলিয়ে যেতে দেখে যখন তরুণীদের দিকে তাকালাম, তখন আর তরুণীদ্বয়কে ওখানে দেখতে পেলাম না। এই অবস্থা দেখে আমরা ভয়ে ওখান থেকে পালিয়ে এলাম। এই ব্যক্তি আমাদের এলাকার ইমাম। আমরা এসে তাকে এই ঘটনা জানালাম। মনে হলো, ইনি এসব ঘটনায় আগে থেকেই ভীত।"

"আমার জীবন নিয়ে আমার কোন ভয় নেই। আমার ভয় হচ্ছে, ইতোমধ্যে আমরা যেসব লোককে ইসলামে দীক্ষিত করেছি, তারা আবার ইসলাম থেকে পৌত্তলিকতায় ফিরে যাবে।" বললেন ইমাম।

ওখানকার অধিবাসীরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, তারা যেহেতু হিন্দুত্ব ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাই তাদের উপর দেবদেবীদের গযব আপতিত হচ্ছে। এজন্যই তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য আসমানী মাখলুক জমিনে নেমে এসেছে।"

চৌকির সৈন্যদের মধ্যেও এই ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে যে, সুলতান এখানে ক্ষমতাবলে মানুষকে ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন, এজন্যই এসব অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছে। বললো সৈনিক। কমান্ডার যুবায়ের জামালীর জমিনে দেবে যাওয়ার ঘটনাটি এমনই প্রভাব সৃষ্টি করেছে যে, যেই শোনে, তার চেহারাই বিবর্ণ হয়ে যায়। চৌকির সকল সৈন্যই এখন নানা সংশয় ও কুসংস্কারে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে।"

'তোমাদের মধ্যে কি এমন সাহসী কেউ ছিল না যে কমান্ডার যে জায়গায় জমিনে দেবে গেছে, সেই জায়গাটিতে গিয়ে বিষয়টির কারণ অনুসন্ধান করবে? পাহাড়ী এলাকায় ঘাস ও ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে অনেক গভীর গর্ত থাকে। তাছাড়া এমনটিও তো হতে পারে, ওখানে গর্ত তৈরী করে রাখা হয়েছে আর এই দুই তরুণী স্রেফ হিন্দু যোগী-সন্ন্যাসীদের যাদুর অংশ হিসেবেই এমন মোহময় আচরণ করেছে?

সম্মানিত ইমাম, আপনি কি ঈমানের শক্তি সম্পর্কে জ্ঞাত নন? আপনি কি জানেন না, ঈমান শক্তিশালী হলে তার উপর কোন যাদুটোনাই কার্যকর হতে পারে না?

দুর্গশাসকের এ কথায় ইমাম নীরব হয়ে গেলেন, সিপাহীর কণ্ঠেও আর কোন কথা উচ্চারিত হল না।

"ঠিক আছে, আমি আপনাদের সাথেই যাচ্ছি। এখানে সুলতান আমাকে শুধু শাসনকাজ চালানোর জন্য নয়, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও ইসলামের পাহারাদার নিযুক্ত করেছেন। বললেন দুর্গশাসক সারওয়াগ।

এটা কোটলী কাশ্মীরের ঘটনা। দক্ষিণ কাশ্মীরের এই এলাকাটিতে তখন ছিল কোটলী রাজাদের রাজত্ব, যা পুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজুরী এলাকায় লোহা কোট নামের একটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। পাহাড়ের উপর অত্যন্ত মজবুত এই দুর্গ ছিল বহিরাক্রমণ থেকে অত্যন্ত সুরক্ষিত। সেই দুর্গের রাজা ছিল নন্দরায়। পাঞ্জাবের যে কোন রাজা যুদ্ধে পরাজিত হলে কোটলীর লোহাকোট দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিতো। কারণ, এই দুর্গটি ছিল অজেয় ও অস্বাভাবিক মজবুত। রাজা জয়পাল সুলতানের কাছে শেষবারের মতো পরাজিত হয়ে এই দুর্গেই এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জয়পালের ছেলে আনন্দপালও সুলতান মাহমূদের হাতে পরাজিত হয়ে এই দুর্গেই এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। রাজা ভীমপালকে টৌল্লাযুগিয়া নামক স্থানে সুলতানের সৈন্যরা পরাজিত করার পর সেও কাশ্মীরের কোন অঞ্চলে এসেই আশ্রয় গ্রহণ করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সুলতান মাহমূদ রাজা ভীমপালকে তাড়া করে কাশ্মীর পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলেন। কাশ্মীরের রাজা নন্দরায়ের এক সেনাপতি তংগা সুলতান মাহমূদের প্রেরিত-অগ্রগামী দলকে ঘেরাও করে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ক্ষতির জন্য তংগাকেও চড়ামূল্য পরিশোধ করতে হয়। সুলতান নিজে তংগাকে তার দলবলসহ পাকড়াও করে যুদ্ধবন্দী করে ফেলেন। তংগার এই ক্ষয়ক্ষতিতে সুলতান এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তংগা ও তংগার সকল সহযোদ্ধাকে হত্যা করে তাদের মরদেহ ঝিলম নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এর পর বিজিত এলাকায় সুলতান ফরমান জারী করেন, যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না, তাদের গ্রাম ছাড়া করা হবে। ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে সকল নাগরিক সুবিধাসহ সরকারীভাবে তাদের ধন-জন ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা দেয়া হবে।

দুর্গ থেকে বাইরে এসে সুলতানের মোকাবেলা করার সাহস হয়নি রাজা নন্দরায়ের। তার সামরিক শক্তি অনেকাংশেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সুলতান মাহমূদ নন্দরায়ের এলাকায় পৌঁছে রাজা নন্দরায়ের কাছে পয়গাম পাঠালেন, তিনি যেন রাজা ভীমপালের মতোই তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে খিরাজ দিতে স্বীকারোক্তিমূলক সন্ধিচুক্তি করেন। রাজা নন্দরায় সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে তাকে খাজনা দিতে সম্মতি জানান। ফলে সুলতান ও রাজা নন্দরায়ের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্থাপিত হয়। চুক্তিতে শর্ত ছিল, নন্দরায়ের নিয়ন্ত্রিত যে কোন জায়গায় সুলতান ইচ্ছে মতো দু'তিনটি সেনাচৌকি স্থাপন করতে পারবেন এবং একজন শাসকের অধীনে গোটা এলাকার নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রিত হবে। নাগরিক ট্যাক্স রাজা নন্দরায়ই আদায় করবেন। কিন্তু তিনি সুলতানের সৈন্যদের সার্বিক ব্যয় নির্বাহ করবেন এবং বার্ষিক একটি মোটা অংকের সম্মানী বিজয়ী সুলতানকে দিতে বাধ্য থাকবেন।

সুলতান মাহমূদ বিজিত এলাকার সকল সাধারণ মানুষকে ইসলামে দীক্ষা নেয়ার নির্দেশ জারী করেন। সেই সাথে এই নোটিশও জারী করেন, পেশোয়ার, লাহোর, মুলতান ও বেরায় ইসলাম শিক্ষা দেয়ার মতো পারদর্শী কয়েকশত শিক্ষককে যেন কাশ্মীর এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং এখানকার নওমুসলিমদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয়। এসব জরুরী নির্দেশনা দেয়ার পর কেন্দ্রের গোলযোগের খবর পেয়ে তিনি দ্রুত রাজধানী গযনীতে ফিরে যান।

একাধিক ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন, সুলতান মাহমূদ বলেছিলেন, 'কারো উপর কোন ধর্মমত চাপিয়ে দেয়া যায় না। আমি যদিও কাশ্মীরের সকল মানুষকেই মুসলমান হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছি, কিন্তু আমি অমুসলিমদের এই অভিযোগ প্রমাণ করতে চাই না যে, বিজিত রাজ্যের নাগরিকদের উপর সামরিক শক্তিবলে ইসলাম চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

সুলতান বললেন, কাশ্মীরের লোকজন গোয়াড় ও অশিক্ষিত। এরা শাসকদের যে কোন নির্দেশকেই ধর্মীয় নির্দেশের মতো অলঙ্ঘনীয় মনে করে। এদের রাজা মহারাজার ইচ্ছা অনিচ্ছাই এদের ধর্ম। আমি এদের একথা বোঝাতে চাই যে, ধর্মের বিধি-নিষেধের সম্পর্কে কোন শাসক কিংবা রাজা-মহারাজাদের সাথে নয়। ধর্মের সম্পর্ক একান্তই আল্লাহর সাথে। আর

আল্লাহ বা মাবুদকে মাটি-পাথর দিয়ে বানানো যায় না। এই এলাকায় যদি কিছু মসজিদ তৈরী করে দেয়া যায়, তাহলে সেখানে উঁচু নীচু শাসক শাসিত একই সারিতে নামায পড়লে তারা বুঝতে পারতো, ইসলাম ধর্ম শ্রেণী বৈষম্য সমর্থন করে না। ধর্মের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। আল্লাহর কাছে মানুষ হিসেবে সবাই এক। রাজা হোক প্রজা হোক, শাসক হোক, কিংবা শাসিত, সবার মাথা-ই একসাথে একই মাটিতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদায় অবনত হয়।'

খ্যাতিমান অমুসলিম ঐতিহাসিক স্যার আর্লিস্টিন এর ভাষায় সুলতান মাহমূদ বলেছিলেন, 'যদি বিজিত এলাকার গণমানুষের কাছে ইসলামের মহত্ব কল্যাণকামিতা বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপন করা না হয়, তাহলে গণমানুষের মধ্যে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হবে যে, সুলতান বলেন এক আর করেন আরেক, যা সুলতানের ভাবমর্যাদা বৃদ্ধি ও ক্ষমতা সংহত করার জন্য সহায়ক, তা-ই তিনি করেন। ফলে নতুন মুসলমানরা ধর্ম থেকে নিরুৎসাহিত হয়ে ধর্মচ্যুত হয়ে যেতে পারে। আমার সালাতানাতের মধ্যে কোন মুসলমানের ধর্মচ্যুতিকে আমি বরদাশ্ত করবো না। সাধারণ মানুষকে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে তাদের প্রভু কে, তাদের রাসূল (সা.)-কে এবং তাদের ধর্মের বিধি-নিষেধ কী?

মহারাজা নন্দরায়ের শাসনকার্য দুটি দুর্গের ভেতরে বন্দী হয়ে পড়েছিল। আর দুর্গের বাইরে বিজিত রাজ্যে সুলতান মাহমূদ আল্লাহর নির্দেশ মতো আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাশ্মীরের নওমুসলিমদের ধর্ম শিক্ষা দেয়ার জন্য পেশোয়ার, লাহোর, মুলতান ও বেরা থেকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত বহুসংখ্যক লোক এনে নতুন এলাকায় ধর্মীয় শিক্ষা ও ইমামতি করার জন্য ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। কাশ্মীর এলাকায় তৈরী করা হয়েছিল বহু মসজিদ। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই কাঠ দিয়ে একটি করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

তৎকালে ভারতের এই এলাকাটির সাধারণ মানুষের ধর্ম বলতে তাদের রাজা-মহারাজাদের তোষণই ছিল প্রধান স্তম্ভ।

রাজা-মহারাজাদেরকেই এই এলাকার সাধারণ প্রজারা দেবতার জাগতিক প্রতিনিধি বলে বিশ্বাস করতো। আসলে এদের ধর্মবিশ্বাস ছিলো জীবনে বেঁচে থাকা আর পানাহার করার স্বাধীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অবরুদ্ধ, নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত এসব লোক যখন মুসলিম সৈন্যদেরকে বিজয়ী বেশে দেখতে পেল,

প্রত্যক্ষ করলো মুসলমানদের সাম্য-মৈত্রী-মানবিকতা ও ভেদাভেদহীন নীতি, তখন স্বেচ্ছায়, বিনা প্ররোচনা ও বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকেই তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। এসব অজ্ঞ-অনভিজ্ঞ নাগরিকদের হৃদয়ে ইসলামের বোধ-বিশ্বাস মজবুত করার নির্দেশনা দিয়ে সুলতান মাহমূদ জরুরী প্রয়োজনে গযনীতে ফিরে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু পরাজিত হিন্দু রাজা-মহারাজাদের জন্য সুলতানের এই ইসলাম প্রচার আয়োজন ছিল রাজত্ব হারানোর চেয়েও আরো বেশী বেদনাদায়ক। ভীমপাল কোন সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় না নিয়ে দুর্গম গ্রামাঞ্চলে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। তাকে যখন জানানো হলো, সুলতান মাহমূদ ভারত ছেড়ে গযনী চলে গেছেন, তখন রাজা ভীমপাল গোপন আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে দুর্গম পথে লাহোর পৌঁছলেন।

ভীমপালের লাহোর ফিরে আসার সংবাদ শুনে দীর্ঘদিন পর গোটা এলাকার রাজা-মহারাজারা এসে লাহোরে একত্রিত হলেন। শুধু রাজা-মহারাজারা নন, ভারতের বিভিন্ন খ্যাতিমান মন্দিরের খ্যাতিমান পুরোহিত পণ্ডিতগণ এসে হাজির হলেন।

ভীমপালের নেতৃত্বে এক বৈঠকে ভারতে ইসলামের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি রোধের নানা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হলো। সকল পুরোহিত পণ্ডিত অব্যাহত ব্যর্থতা ও পরাজয়ের জন্য শামরিক শাসক ও নেতাদের ব্যর্থতাকেই দায়ী করছিলেন। কোন কোন পুরোহিত সুলতান মাহমূদকে হত্যার জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার পরিকল্পনা পেশ করলেন। ক্ষীণ আওয়াজে এমনটিও উচ্চারিত হলো, সুলতান মাহমূদকে সিন্ধু নদের ওপারেই আটকে রাখতে হবে- পেশোয়ারে প্রবেশের সুযোগ দেয়া যাবে না। আর এখানে তার রেখে যাওয়া সৈন্যদেরকে ঘেরাও করে আহার-সামগ্রীর সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে ক্ষুৎপিপাসায় ধুকে-ধুকে মারার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু যে যতো যুৎসই প্রস্তাবই উত্থাপন করুক না কেন, রাজা-মহারাজা ও পুরোহিত-পণ্ডিতদের এই বৈঠকে স্থির কোন যৌথ সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হলো না। অনেকটা সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যেই শেষ হলো কনফারেন্স।

মূলত অনৈক্য ও সিদ্ধান্তহীনতার মূল কারণ ছিল প্রত্যেক রাজা-মহারাজা ও পুরোহিত পণ্ডিতের নিজ নিজ কর্তৃত্ব ও রাজত্ব অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা। এক পর্যায়ে লাহোরের প্রধান পুরোহিত কণ্ঠ চড়িয়ে বললেন, সবাই এখন

মুসলমানদের ভয়ে আতঙ্কিত। অথচ সংখ্যায় কিন্তু মুসলমানরা সব সময়ই সামান্য। মুসলমানরা এতোটা দূর থেকে এখানে এসে যুদ্ধ করছে। এখানকার প্রতিজন মানুষ, ছেলে-বুড়ো সবাই মুসলমানদের শত্রু। এখানকার মাটি-মানুষ সবই মুসলিম সৈন্যদের বৈরী। তারপরও মুসলমানরাই একের পর এক রাজ্য দখল করে নিচ্ছে। আমাদের সবাইকে এ বিষয়টি ভাবতে হবে। কেন এমন হচ্ছে? সুলতান মাহমূদ কি কোন দৈত্য? জিন? না দানব? আসলে সে আপনাদের মতোই একজন মানুষ। তথাপি আপনাদের সবাইকে পরাজিত করছে। এর প্রধান কারণ হলো সে তার ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে, সে তার ধর্মের পূজারী, ধর্মের প্রতি সে নিবেদিত। ধর্মের প্রতি এই নিবেদিতপ্রাণ হওয়াকেই মুসলমানরা বলে ঈমান। ধর্মে নিষ্ঠাই তাদের বিজয়ের প্রধান শক্তি। ধর্মের প্রতি আপনাদের এতোটা নিষ্ঠা নেই। ধর্মের চেয়ে আপনারা নিজেদের ক্ষমতা, মর্যাদা ও রাজত্ব নিয়ে বেশী ব্যস্ত।

প্রধান পুরোহিতের একথায় রাজা-মহারাজাদের মজলিসে নেমে এলো নীরবতা। পুরোহিত এই নীরবতা দেখে সবার দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন–

"হিন্দুস্তান হিন্দুদের দেশ, দেবদেবীদের দেশ। এটা আল্লাহু আকবার এর দেশ নয়। এটা হরেকৃষ্ণ হরিহরি মহাদেব এর দেশ। কিন্তু দেবদেবীদের দেশ হলে কি হবে, এদেশে এখন দেবদেবীদের কী ধরনের অবমাননা করা হচ্ছে, তা আপনারা দিব্যি দেখতে পাচ্ছেন। এই ধরিত্রী চিৎকার করে বলছে, সে তার উপরে বিচরণকারী এক মুসলমানের বোঝাও সহ্য করতে পারে না। আপনারা যদি ধরিত্রীর এই চিৎকার শুনতে না পান, অনুধাবন না করেন, তাহলে আমাদের ভবিষ্যত বংশধর ও নতুন প্রজন্ম মুসলমানদের গোলামে পরিণত হবে এবং শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাই ভবিষ্যত প্রজন্ম ও অনাগত বংশধরদেরকে এই অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে হবে।

আপনারা স্মরণ করুন, আমাদের পূর্বপুরুষরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের রোপিত ইসলামের বৃক্ষটিকে হিন্দুস্তান থেকে কিভাবে উপড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। অথচ সেই বৃক্ষ কিন্তু মহিরুহে পরিণত হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত আর অশোকের এই দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল বিন কাসিমের রোপিত ইসলামের শিকড়; কিন্তু আমাদের মহান পণ্ডিত ও ঋষিগণ হৃদয়ে ধর্মের

জপমালা নিয়ে ভগবানের নামে অসীম সাহসিকতা ও কৌশলের মাধ্যমে হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পড়া আযানের ধ্বনিকে মিটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যে পাপের শাস্তি আপনাদের প্রত্যেকেই ভোগ করতে হচ্ছে, তাহলো আপনারা সবাই সুলতান মাহমূদের এই যুদ্ধকে রাজ্যপাটের বিরুদ্ধে আক্রমণ মনে করছেন। এই ভুল ধারণা আপনাদের ত্যাগ করতে হবে। আপনাদের বুঝতে হবে, এই যুদ্ধ দু'টি শাসকগোষ্ঠীর লড়াই নয়, এই যুদ্ধ দু'টি ধর্মের লড়াই। দুই ধর্ম ও বিশ্বাসের এই লড়াইয়ে ক্রমাগভাবে ইসলাম বিজয়ী হচ্ছে। মহারাজা ভীমপালের শুধু পরাজয় ঘটেনি। এখানে হিন্দুত্ববাদের পরাজয় ঘটেছে। পরাজয় ঘটেছে দেবদেবী ও ভগবানে বিশ্বাসীদের। কালাঞ্জরের গোটা এলাকায় হাজারো মৌলভী ও ইমামদের ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। গ্রামে গ্রামে তৈরী করা হয়েছে মসজিদ। ইসলাম যদি এসব মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে, তবে আর কোনদিন কারো পক্ষেই এদেশ থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করা সম্ভব হবে না।

"মাননীয় পণ্ডিত, এসব কথা আমাদের জন্য নতুন নয়, বললেন ভীমপাল। এখন আমাদের ভাবা উচিত, কালাঞ্জরের এলাকায় যেভাবে ইসলামের বীজ বপন করা হচ্ছে, তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করা। আমি স্বীকার করে নিচ্ছি, আমি যুদ্ধে সুলতান মাহমূদের কাছে পরাজিত হয়েছি, আমার সেনাবাহিনীও ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সেটিই শেষ কথা নয়। আমাদের আবারো চেষ্টা করতে হবে। একটি চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য হিন্দুস্তানের সকল রাজা-মহারাজার সহযোগিতা দরকার।"

"আপনি পরাজয় স্বীকার করেছেন। এটাও আপনাকে মেনে নিতে হবে যে, ভবিষ্যতেও আপনি আরো পরাজয়ের সম্মুখীন হবেন।" বললেন পুরোহিত। এবারের যুদ্ধে যদি চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনা না যায়, তবে প্রস্তুতির জন্য সময় নষ্ট করা হবে নিতান্তই সময়ের অপচয়। এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কালা রে যেভাবে সাধারণ প্রজাদের মুসলমান বানানো হয়েছে এবং তাদের হৃদয়ে ইসলামকে বদ্ধমূল করার চেষ্টা চলছে, তা প্রতিহত করা।"

"কী করবেন? এখন তো আর আপনার পক্ষে সেখানে গিয়ে ধর্মপ্রচার করা সম্ভব নয়।" পুরোহিতের উদ্দেশে বললেন কালাঞ্জরের রাজা নন্দরায়। কেননা, মাহমূদের সৈন্যরা সেখানে চৌকি স্থাপন করে শাসনকার্য চালাচ্ছে। মুসলিম

সৈন্যরা রাত-দিন টহল দেয়। আমি শুনেছি, মাহমূদ নাকি নির্দেশ দিয়েছে, কাউকে যদি হিন্দুধর্ম প্রচার করতে পাও, তবে তাকে সেখানেই হত্যা করবে। কালাঞ্জরে আমার দুর্গ ছাড়া আর কোথাও এখন আর হিন্দুধর্মের পূজা-অর্চনা নেই। দুর্গের বাইরে সবখানেই ইসলাম ধর্মের চর্চা, ইসলাম ধর্মের আলোচনা। আপনি যে সব ইসলাম প্রচারক ও ইসলামের কথা বলেছেন, তারা পুরোমাত্রায় মুসলিম সৈন্যদের সহযোগিতা পাচ্ছে।"

'তরবারী দিয়ে সব কাজ হয় না' বললেন রাজা ভীমপালের প্রধান উজির। "যাদু চালাও। ওরা যদি শক্তির জোরে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে থাকে, আমরা তরবারীর শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই আবার এসব লোককে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে পারি। আমরা এসব লোকের মনে ইসলাম সম্পর্কে সংশয়-সন্দেহ জন্মাতে পারি। এসব বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ, তাদের ডাকা হোক, তাদেরকে একাজ চালানোর ব্যবস্থা করা হোক। কালাঞ্জরের মাটি, মানুষ, ভূপ্রকৃতি, সুবিধাবাদী যাদুটোনার কারিশমা প্রদর্শনের জন্য খুবই উপযোগী। কালাঞ্জরের লোকদের মনে ভয়ানক আতঙ্ক সৃষ্টি করুন এবং অস্বাভাবিক দৃশ্যের অবতারণা করুন। যে অল্পসংখ্যক সৈন্য সুলতান মাহমূদ রেখে গেছে, তাদের মনেও আতঙ্ক সৃষ্টি করুন, সেই সাথে ওদেরকে রূপসৌন্দর্য ভোগবাদের ফাঁদে ফেলে বেকার করে দিন। গোপন ও অদৃশ্য কর্মকাণ্ডের দ্বারা যদি আমরা মুসলমানদের মোকাবেলায় এখনই কার্যক্রম শুরু না করি, তাহলে মুসলমানদের ঈমানী শক্তি বেড়ে যাবে, তখন ওদের মোকাবেলা করা আমাদের জন্য আরো কঠিন হবে।"

"হ্যাঁ, মানুষের সৃষ্টিগত দুর্বলতাগুলোতে কাজে লাগাতে হবে।" উজিরের কথাকে সমর্থন করলেন প্রধান পুরোহিত। প্রেম ও ভয় সকল মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান এবং এটি একটি প্রকৃতিপ্রদত্ত ও দুর্বলতা। ভালোবাসা ও প্রেমের আহ্বান মিথ্যা হলেও যে কোন মানুষের পক্ষেই তা তাৎক্ষণিক প্রত্যখ্যান করা কঠিন। মুসলিম সৈন্যদেরকে প্রেমের বিষ পান করিয়ে বিগড়ে দাও, তাহলে ইসলামের প্রচারক আর নওমুসলিম সবাই তোমাদের এই জালে আটকে যাবে।

রাজনৈতিক সমাধানের পথে যখন কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা ছাড়াই বৈঠক ভেঙে যেতে উপক্রম হয়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রধান পুরোহিতের চানক্য কৌশল সবাইকে আশ্বস্ত ও ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করল। এটা ছিল এমন

প্রস্তাব যাতে সবাই একমত পোষণ করল এবং এ প্রক্রিয়া জোরদার করার তাগিদ অনুভব করল।

১০১৪ সনের শেষের দিনগুলোতে দক্ষিণ কাশ্মীরে বিজিত এলাকাগুলোতে ইসলাম গ্রহণকারী হিন্দু নওমুসলিমদের বিভ্রান্ত এবং মুসলিম সৈন্যদেরকে বেকার করে দেয়ার জন্য শুরু হলো হিন্দু যোগী-সন্ন্যাসী ও পুরোহিতদের যাদু-টোনার আগ্রাসন। বলতে গেলে তখন হিন্দু পুরোহিতদের রাজত্ব ছিলো গোটা ভারত জুড়ে। যেসব গ্রামে কোন অস্বাভাবিক ঘটনার দৃশ্য কেউ দেখেনি, সেসব গ্রামে বাতাসে ভর করে প্রচারিত হচ্ছিলো যতোসব ভীতিকর কাহিনী। গুজবের পাল্লা এতোটাই ভারী ছিলো যে, অমুক গ্রামে পাহাড় থেকে আগুন বের হচ্ছে, মেঘবৃষ্টিহীন আকাশে বিজলী চমকাচ্ছে, অমুক গ্রামে পথচারীদের পথ আটকে দিয়েছে সুন্দর প্রেতাত্মা। লোকমুখে এসব কাহিনী শুনেই মানুষের অন্তরাত্মা ভয়ে কেঁপে উঠতো। ভয় এক সময় পরিণত হতো সামাজিক আতঙ্কে। এমন গুজবও প্রচার পেয়েছিলো যে, গযনী বাহিনীর লোকেরা ধরে নিয়ে জবাই করে মাংস খেয়ে ফেলছে।

সুলতান মাহমূদের সেনাচৌকির কমান্ডার যুবায়ের জামালীর মাটিতে ধসে যাওয়ার কাহিনী ছিল মারাত্মক ভয়ঙ্কর। এই ভয়ঙ্কর সংবাদটি সারওয়াগকে অবহিত করা জরুরী ছিল। কারণ, সারওয়াগ ছিলেন কালাঞ্জর অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশাসক। সকল ছোট ছোট সেনাচৌকি ছিলো তার অধীনে। ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এক সৈনিক ও একজন ইমাম আঞ্চলিক কমান্ডার সারওয়াগকে ব্যাপারটি সম্পর্কে অবহিত করতে দ্রুত আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টার টিলাযুগিয়ায় পৌঁছায়। টিলাযুগিয়ায় ছিলো তখনকার আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টার ও কমান্ডার সারওয়াগের অবস্থান। সারওয়াগ বিষয়টি জানার পর তিনি সাথে সাথেই সংবাদদাতাদের নিয়ে কালাঞ্জর রওনা হন।

সেনাকমান্ডার সারওয়াগের সাথে তার কয়েকজন দেহরক্ষী ছিল। সেই সাথে তাদের আসবাবপত্র ও রসদ বহন করার জন্য কয়েকটি খচ্চর ও উট কাফেলার সাথী হলো। তাদের কাফেলার আগে আগে দু'জন অশ্বারোহী পথিক যাচ্ছিল। তাদের বেশভূষা দেখে মনে হচ্ছিল, তারা সাধারণ কোন মুসাফির। অশ্বারোহী মুসাফির দু'জন সারওয়াগের কাফেলাকে দেখে আগে আগেই যাচ্ছিল।

ইমাম ও সংবাদবাহী সৈনিক যখন কালাঞ্জর থেকে সংবাদ নিয়ে টিলাযুগীয়াতে আসছিলেন, তখন তাদের পক্ষে দেখার অবকাশ হয়নি, এই দুই অশ্বারোহী তাদেরকেই অনুসরণ করে পিছু পিছু আসছিল। ইমাম ও সংবাদবাহী সৈনিক যখন বালনাথে প্রবেশ করেছিল, তখন অশ্বারোহীরা কোথায় যেন চলে গিয়েছিলো। এখন সারওয়াগ সিপাহী এবং ইমামকে নিয়ে যখন কালাঞ্জরের দিকে রওনা হলেন, তখন এরা তাদের আগে আগে চলতে শুরু করল।

সারওয়াগের কোন গাইডের দরকার ছিল না। কারণ, ইমাম ও সংবাদবাহী সৈনিক রাস্তা সম্পর্কে অবহিত ছিল। কাফেলা সাধারণ গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। পাহাড়ী পাথুরে জমিন, ঘাসের বিছানা, উঁচু-নিচু টিলা তাদের পিছনে থেকে যাচ্ছিল। কাশ্মীরের বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া তারা দেখতে পাচ্ছিলেন। ইমাম সেনাপতি সারওয়াগকে বলছিলেন, ওই যে বরফ ঢাকা উঁচু পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে, এটির পাদদেশে যে বসতি এলাকাটি রয়েছে, এটি এই অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং সেখানকার অধিবাসীদের সৌন্দর্য সারা ভারতে প্রবাদতুল্য।

উঁচু-নিচু টিলাময় পাহাড়ী এলাকায় যখন এই কাফেলা পৌঁছলো, তখন রাত হয়ে গেছে। বিরতিহীনভাবে তারা রাতেও কিছু পথ এগিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। কিছুপথ অগ্রসর হয়ে বিশ্রামের জন্য কাফেলা যাত্রা বিরতি করল। তখন ছিল হাল্কা ঠাণ্ডার সময়। পরদিন দিনের বেলা যখন কাফেলা রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন হঠাৎ একটি ঘোড়া খুব জোরে হ্রেষারব করে লাগাম ছিড়ে পালিয়ে গেলো। এটি ছিল একজন নিরাপত্তারক্ষীর ঘোড়া। আরোহী তখনও ঘোড়ার পিঠে বসতে পারেনি, এর আগেই অজানা আতঙ্কে চম্পট দিল ঘোড়া।

সবাই দেখতে পেল তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট লম্বা একটি সাপ ঘাসের উপর গড়াচ্ছে। জায়গাটি ছিল ঘন সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত। ছোট ছোট আগাছা জাতীয় গাছে থোকা থোকা ফুল ফুটে রয়েছে। প্রকৃতি যেন পরিকল্পিতভাবে জায়গাটিকে রং-বেরঙের বৃক্ষাদি লাগিয়ে অপরূপ সাজে সাজিয়েছে। ছোট ছোট টিলা আর উঁচু-নিচু খানা-খন্দকের মাঝে মাঝে সমতল জমিন। এ যেন কোন দক্ষ ভাস্কর্যের তৈরী মনোরম মনোসেন্ট।

সাপ দেখে সামান ও খাদ্যসামগ্রী বোঝাই উট ও ঘোড়া ছুটে পালাল। ঘোড়া ও খচ্চরগুলোকে পালাতে দেখে সবাই ওগুলোকে ধরতে পিছু পিছু

দৌড়াল, সাপ মারার অবকাশ কারো হলো না। জায়গাটি এমন যে, ঘোড়া আর খচ্চর সামানপত্র নিয়ে কোথায় পালিয়েছে আন্দাজ করাই কঠিন। সাপের ভয়ে পালানো কোন জন্তুকে আয়ত্তে আনা কঠিন।

সবাই যখন ঘোড়ার খোঁজে টিলার আড়ালে হারিয়ে গেল, ঠিক এই সময়ে টিলার আড়াল থেকে অকুস্থলে দু'জন লোকের আগমন ঘটল। সাপটি তখনও ধীরে ধীরে ঘাসের উপর গড়াগড়ি করছে। এদের একজন এসে সাপটিকে একটু আড়ালে নিয়ে একটি থলের মধ্যে ভরে থলের মুখ বন্ধ করে ঘোড়ার জিনের সাথে থলেটি বেধে ফেলল। সেখানে আরো একটি ঘোড়া দাঁড়ানো ছিল।

সাপ পাকড়াওকারী লোকটি একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অপর গোড়াটির জীন ধরে বিপরীত দিকে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর তার সাথীও এসে অপর ঘোড়াটিতে সওয়ার হল। ধীরে ধীরে উভয়েই দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

সেদিন সারওয়াগের কাফেলার পুরো সময় ঘোড়া ও রসদবাহী খচ্চর ধরার পেছনেই কেটে গেল। হঠাৎ আগমনকারী দু'জনের একজন অপরনজনকে বলল-

"সামনে চল, এরা ফিরে যাবে না।"

"ফিরে যেতেও পারে। তবে এদের উপর নজর রাখতে হবে।" বলল অপরজন।

দিনের শেষ প্রহরে সারওয়াগের ছোট্ট কাফেলার অর্ধেক সওয়ার ও অর্ধেক পায়ে হেঁটে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। বহু চেষ্টার পর তারা তিন চারটি ঘোড়া আর মালবাহী দু'টি খচ্চর ও উটকে ধরতে পেরেছিল। সারওয়াগ দৃঢ়চেতা সেনাধ্যক্ষ। কোন বাধাই তাকে লক্ষচ্যুত করতে পারে না। তিনি কাফেলার সাথীদের বললেন, পায়ে হেঁটে যারই ক্লান্তি লাগে সওয়ার হবে। আমি এখন থেকে হেঁটেই যাবো। হিন্দুস্তানের এসব নাগ আমাদের মিশন ভণ্ডুল করে দিতে পারবে না।

এ পর্যায়ে তারা পাহাড়ী এলাকায় এসে পৌছলো। একদিকে বিশাল পাহাড়, আর একদিকে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের ঢাল। একটু পরপরই তাদের পথ মোড় নিচ্ছিল। কখনও তাদেরকে দু'পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করতে হচ্ছিল। তারা যতোই সামনে অগ্রসর হচ্ছিল, শীতের প্রকোপ ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কনকনে শীতের বাতাস। অবশ্য জায়গাটি এমন যে,

পানাহার সামগ্রী সাথে না থাকলেও তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরতে হতো না। জায়গাটিতে প্রচুর পানি আছে। জায়গায় জায়গায় পাহাড়ী ঝরনা বেয়ে স্ফটিকস্বচ্ছ পানি নিচে পড়ছে। নানা ধরনের ফলজ গাছে বাহারী ফল ঝুলছে। যে কয়টি জন্তু তাদের সাথে ছিল, এদের খাবারের অভাব ছিল না। এলাকাটি পশুর খাবার উপযোগী সবুজ ঘাসে ভরা।

এমন জায়গায় এসেই তাদের রাত হয়ে গেল। একটি পাহাড়ের ঢালে রাতের বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলল তারা। রাতের বেশীর ভাগ সময় কাটলো এলাকাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথাবার্তায়। তাদের তাঁবুর পাশেই বাধা ছিল জন্তু কয়টি। সকাল বেলায় আবারো রওনা হওয়ার জন্য ঘোড়ায় জীন আটকানো হলো এবং কাফেলা এগোতে শুরু করল।

অন্যদেরকে সওয়ার করে কাফেলার সরদার সারওয়াগ হেঁটেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবকে একটি ঘোড়ায় সওয়ার করালেন। দলনেতা পায়ে হেঁটে রওনা হওয়ায় সারওয়াগের নিরাপত্তা রক্ষীরাও পায়ে হেঁটেই যাচ্ছিল। হঠাৎ ইমাম সাহেবের ঘোড়া এদিক ওদিক লাফালাফি শুরু করল। যারা ঘোড়ায় চড়ে অভ্যস্ত, তারা ঘোড়ার এসব আচরণের অর্থ জানে। ঘোড়ার অবস্থা দেখে সারওয়াগ ইমামকে বললেন, জলদী ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে পড়ুন! ইমাম সাহেব ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ার সাথে সাথেই ঘোড়াটি তীব্র হ্রেষারব করে ছুটে পালাল। সাথে সাথে অন্য ঘোড়াগুলোও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে হ্রেষারব করতে লাগল।

হঠাৎ একজন বলে উঠল, সাপ! সাপ! এবার একই রং ও একই মাপের দু'টি সাপকে দেখা গেল। সবগুলো ঘোড়া নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে লাগাম ছিড়ে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। সবাই ঘোড়া ধরতে পিছু পিছু দৌড়াল। কারো আর সাপ মারার খেয়াল হলো না। দু'টি ঘোড়া পাহাড়ের ঢালু জায়গায় দৌড়াতে গিয়ে পা পিছলে নিচে প্রবাহমান ঝিলম নদীতে পড়ে গেল। সারওয়াগের দুই সৈনিক পাহাড়ের উঁচু ঢালু থেকে দেখল তাদের অতি জরুরী সফরসঙ্গী দু'টি ঘোড়া আতঙ্কিত হয়ে পালাতে গিয়ে পাহাড়ে পা পিছলে নদীতে পড়ে গেছে আর স্রোতস্বীনী ঝিলমের তীব্র স্রোত তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। নদী থেকে ঘোড়া দুটোর তীরে উঠে আসার কোন অবকাশই ছিল না।

পাহাড়ের ঢালে রাতযাপনকারী সারওয়াগের কাফেলা সকালবেলায় রওনা হওয়ার সময় যখন অবশিষ্ট সওয়ারী ঘোড়া দুটোকেও হারিয়ে বিষণ্নমনে সেখান

থেকে রওনা হয়ে গেল, কিছুক্ষণ পর ফেলে যাওয়া সেই জায়গাটিতে এলো সারওয়াগের কাফেলাকে আড়াল থেকে অনুসরণকারী দুই অশ্বারোহী। এরা এসে ঘাসের উপরে গড়াগড়িরত অবস্থায় সাপ দুটোকে ধরে থলের মধ্যে আটকিয়ে তাদের একটি ঘোড়ার জীনের সাথে সাপভর্তি থলেটি ঝুলিয়ে দিল।

কি সব অদ্ভুত ব্যাপার সম্মানিত সেনাপতি! এই এলাকা দিয়েই তো আমি দু'-তিন দিন আগে এই সৈনিককে নিয়ে আপনার কাছে পৌঁছেছি। তখন তো কোন সাপ আমার নজরে পড়েনি! এখন শীতের সময়। শীতের সময় সাধারণত সাপ গর্তে থাকে। সাপ শীত সহ্য করতে পারে না।

"ভেবে দেখুন ইমাম সাহেব! মনে হয় আমরা আসল পথ ভুলে অন্য পথে এসে পড়েছি। দেখুন না কোন জনবসতি কি চোখে পড়ছে? এমন জনমানবহীন এলাকায় রাস্তা ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।' ইমাম সাহেবের উদ্দেশে বললেন সেনাপতি সারওয়াগ।

সেনাপতি সারওয়াগের মনোবল এখনও চাঙ্গা। তিনি পায়ে হেঁটেই কাফেলাকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সবাইকে পায়ে হেঁটে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার জন্য উজ্জীবিত করছিলেন। সারওয়াগের প্রবল ধারণা জন্মালো, ইমাম সাহেব হয়তো আসল রাস্তা ভুলে অন্যপথে কাফেলাকে নিয়ে যাচ্ছেন। চলতে চলতে সন্ধ্যার আগে পথের একটি মোড়ে তারা দু'জন অশ্বারোহীকে দেখতে পেল। অশ্বারোহী দু'জন তাদের কাছাকাছি এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল এবং রাস্তার কিনারায় দু'হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। সারওয়াগ তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, উভয়েই মাথা নিচু করে সারওয়াগকে কুর্নিশ করল। সারওয়াগ ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি এদের ভাষা বোঝেন, এদের তুলুন এবং এদের কাছ থেকে পথের কথা জিজ্ঞেস করে নিন।

ইমাম সাহেব লোক দু'টিকে উঠতে বললেন। ইমাম সাহেবের কথায় তারা উঠলো বটে; কিন্তু একজন হাত জোড় করে ভিখারীর মতো করে বললো–

"আমরা আপনাদের গোলাম। আপনারা মুসলমান। আমরা আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করেছি।"

ইমাম সাহেব এদেরকে তাদের গন্তব্যের কথা জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা ঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছি তো?"

“না, আপনারা পথ ভুল করেছেন। বললো একজন। আমরা বহুদূর থেকে আপনাদের দেখে এসেছি। আমরা অবাক হচ্ছি, এ পথ দিয়ে আপনারা কী করে জীবন নিয়ে ফিরে এলেন! আমরা তো এই এলাকাটিকে মৃত্যুপুরী বলে থাকি। বাঘের মতো হিংস্র জন্তুও এই অঞ্চলে আসে না। এই এলাকাটি সাপের এলাকা। আপনারা যে দিকে যাচ্ছেন, এ পথে প্রতিটি গাছের ডালে ডালে একেকটি সাপকে ঝুলে থাকতে দেখবেন। আপনারা এ পথ ছেড়ে অন্য পথে চলুন। বলেই সে রাস্তার কথা বলতে শুরু করল। কিন্তু এ পথটি খুবই জটিল। ঘন ঘন মোড় নিতে হবে। এ পথে গেলে বারবার আপনাদের পথ হারানোর আশঙ্কা আছে। এজন্য আমরা আপনাদের সাথেই যাচ্ছি।

“ইমাম সাহেব পথিকের বক্তব্য সারওয়াগকে জানালে সারওয়াগ ওদেরকে সাথে নিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। আরো বললেন, এরা আমাদের পথ দেখিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দিলে এ কাজের জন্য আমরা তাদেরকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবো।”

“আগন্তুক দুই অশ্বারোহী সারওয়াগের কাফেলার গাইডের দায়িত্ব পেল।

চলতে চলতে সারওয়াগ ইমাম সাহেবের মাধ্যমে গাইডদের কাছে জানতে চাইলেন, তোমরা কি এই এলাকার বিস্ময়কর ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু জান?

জবাবে তারা বললো, “আমরা তো সেই জায়গা থেকেই পালিয়ে এসেছি। আমরা ভয়ে স্ত্রী-সন্তানসহ এলাকা ছেড়ে এদিকে এসে পড়েছি।” জবাব দিলো তাদের একজন।

“তোমরা কি কোন পাহাড় থেকে আগুন বেরোতে দেখেছো?”

“আমরা অনেক দূরে থাকি। আমরা সরাসরি আগুন দেখিনি। তবে অনেক দূর থেকে আগুনের শিখা দেখেছি। মনে হচ্ছিল যেন আসমান জ্বলছে। আমরা রাতের বেলায় আসমানে বিজলী চমকাতেও দেখেছি।... আমরা এমন আওয়াজও শুনেছি... কেউ নিজেদের বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করো না...। বললো সেই লোক।

“তোমরাও কি বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছো?”

“জি হ্যাঁ। আমরা ইসলামকে সত্যধর্ম বলে বিশ্বাস করি। এজন্য আমরা ওখান থেকে চলে এসেছি। আমরা আপনাদের ধর্ম কিছুতেই ত্যাগ করবো না।”

"গাইড দু'জনই একের পর এক সেইসব ঘটনা আরো ভয়াবহ রূপ দিয়ে সারওয়াগকে জানাল, যে ঘটনা সারওয়াগকে ইমাম ও সংবাদবাহী সিপাহী শুনিয়েছিল। এদের দু'জনই তাদের কথাবার্তায় আতঙ্কিত ভাব ফুটিয়ে তুলেছিল। ইমাম সাহেব ও সারওয়াগ তাদের অভয় দিচ্ছিলেন, এতো আতঙ্কের কিছু নেই। তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। গাইড দুজন অনুগত দাসের মতো কাফেলাকে পথ দেখিয়ে আগে আগে যাচ্ছিল।

দক্ষিণ কাশ্মীরে দেওকোট নামের একটি জনবসতি। দেবদারু আর চিলি কাঠের তৈরী বিশ-পঁচিশটি বাড়ি নিয়ে দেওকোট গ্রাম। গ্রামের সকল অধিবাসীই হিন্দু। এ গ্রামে দেবদারু কাঠের একটি ছোট্ট মন্দিরও আছে। মন্দিরের অনতিদূরে গযনী বাহিনীর একটি ছোট্ট চৌকি। চৌকিতে প্রায় জনাত্রিশেক সৈনিকের অবস্থান। আজমীর নামের এক লোক এই ছোট্ট সেনাচৌকির কমান্ডার। আজমীর মুলতানের অধিবাসী। এক সময় আজমীর ছিল কারামতী সম্প্রদায়ের লোক। মুলতান দখল করে সুলতান মাহমূদ যখন কারামতীদের ধর্মীয় ভণ্ডামীর মুখোশ উন্মোচন করে দেন, তখন বহু কারামতী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুন্নী মুসলমানে দীক্ষা নেয়। আজমীর ছিল সেই কারামতীদেরই একজন।

কমান্ডার আজমীর একদিন নিয়মিত সেনাটহলের উদ্দেশ্যে সাথীদের নিয়ে গ্রামে টহল দিচ্ছিল। সুলতান মাহমূদের নির্দেশে সেই গ্রামের মন্দিরটি অপসারণ করে মসজিদ তৈরী করা হয়েছিল। মসজিদে একজন ইমামও নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইমাম সেখানকার অধিবাসীদের কুরআন-হাদীস শিক্ষা দিতেন এবং লোকজনকে ইসলামের ইবাদত-বন্দেগীর রীতি-পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। এ গ্রামের লোকজনও ছিল অদ্ভুত ঘটনায় আতঙ্কিত। কারণ, তারাও গ্রামের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে আগুন জ্বলতে দেখেছিল এবং রাতের বেলায় বিজলীর আলোয় আকাশ উদ্ভাসিত হতে দেখেছিল।

এক রাতে এমনই বিজলী চমকানোর সময় ইমাম সাহেব ঘর থেকে বাইরে গেলে তিনজন বিবস্ত্র নারীকে দেখতে পান। তখন ছিল তীব্র বাতাস। বাতাসে বিবস্ত্র তরুণীদের চুলগুলো উড়ে তাদের চেহারা ঢেকে দিচ্ছিল। তরুণীরা সেই পাহাড়ের ঢালে দাঁড়ানো ছিল। রাত ছিল অন্ধকার। বিপরীত পাহাড় থেকে আলো দ্যুতি ছড়াচ্ছিল। সেই আলাতে আবছা আবছা দেখা

যাচ্ছিল পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণীদের। ঘটনাক্রমে ইমাম সাহেব সেদিন ঠিক এ সময়ে ঘরের বাইরে এসেছিলেন। তিনি দেখলেন, কিছুক্ষণ জ্যোতি ছড়িয়ে পাহাড়ী আলো বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর আবার একই জায়গা থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে আলোক রশ্মি। কিন্তু পরে আর তরুণীদের সেখানে দেখা যায়নি।

পরদিন ইমাম সাহেব চৌকিতে গিয়ে কমান্ডার আজমীরকে গতরাতে তার দেখা দৃশ্যের কথা জানালেন। ইমাম সাহেব আজমীরকে জানালেন, গ্রামের লোকজন বলাবলি করছে, ইসলাম যদি সত্য ধর্মই হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম সাহেব তাদেরকে অবশ্যই এ ধরনের অলৌকিক কোন কিছু দেখাবে। গ্রামের লোকেরা আরো বলাবলি করছে, ধর্মচ্যুতির কারণে তাদের উপর মুসিবত ধেয়ে আসছে। এজন্য তাদেরকে শাস্তি পেতে হবে।

আজমীর ইমামের কথা শুনে গ্রামে গিয়ে অধিবাসীদের আতঙ্ক দূর করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে অধিবাসীদের ভয় দূর হয়নি; বরং সে নিজেই কিছুটা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছে। কারণ, সে আলেম ছিল না। ইসলামের সহীহ আকীদা-বিশ্বাসের অকাট্য কোন দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান ছিল না। সে শুধু জানতো “কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বললে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে” এই নির্দেশের কথা।

গ্রাম প্রদক্ষিণ করে মসজিদে গিয়ে কমান্ডার আজমীর ইমাম সাহেবকে বললো, আমি একজন সৈনিক আর আপনি আলেম। আপনার ইলম এসব ঘটনার কী ব্যাখ্যা দেয়? আপনি এ সম্পর্কে লোকজনকে একটা বুঝ দিন। তা না হলে আমাদের সৈনিকরাও তো ইসলাম ছেড়ে দেবে।

আমি তরবারী দিয়ে লড়াই করতে পারি, মানুষ শাসন করতে পারি, যে কোন দুর্ভেদ্য দুর্গের প্রাচীর ডিঙাতে পারি, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ এবং নাদান একজন মানুষ। আপনার ও ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসের পাহারাদারী করার জন্য আমাকে এখানে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সুলতান নির্দেশ দিয়েছেন যেন মানুষের মন জয় করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু এখানে এমন সব ঘটনা ঘটছে যে, তাতে মানুষের মনের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে নানা সংশয়-সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সম্মানিত ইমাম, এ সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলুন, আল্লাহ না করুন শেষে আমি নিজেই পথভ্রষ্ট হয়ে না যাই।

বাস্তবে এসব অদ্ভুত ঘটনার বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা দেয়ার মতো প্রজ্ঞা ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও হিন্দুদের কঠিন চক্রান্ত সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ইমামের কাছে ছিল না।

ফলে যৌক্তিক কোন আশ্বাস বাণী ছাড়াই কমান্ডারসুলভ ভঙ্গিতে গ্রামবাসীকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে হুমকি ধমকি দিয়ে চৌকির কমান্ডার আজমীর নিজের চৌকিতে ফিরে এলো। আজমীর নিজেও বিভ্রান্তির শিকার। গ্রামের লোকেরা রাতের অন্ধকারে যে আওয়াজ শুনেছিল, নীরব ও একাকীত্বে আজমীর নিজেই সেই আওয়াজ শুনতে শুরু করল– "ইসলাম যদি সত্যিই সৃষ্টিকর্তার ধর্ম হয়ে থাকে, তবে এসব ঘটনার বিপরীতে কোন অলৌকিক ঘটনা দেখাও না!"

"আজমীরের সেনাচৌকির অবস্থানও ছিল একটি পাহাড়ের ঢালুতে। কাঠের তৈরী দু'তলা বিশিষ্ট একটি ঘরকে সেনাচৌকি বানানো হয়েছে। রাতের বেলায় উদ্বিগ্ন মনে চৌকির দুতলার জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল কমান্ডার আজমীর। রাত যেমন তীব্র ঠাণ্ডা, তেমনই ঘন অন্ধকার। দশ হাত দূরের কোন জিনিসও দেখা যাচ্ছিল না। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক গাছ গাছালীর নানা ফুলের সুবাসে মনোমুগ্ধকর একটি মনমাতানো পরিবেশ। নাম না জানা অচেনা ফুলের গন্ধে মোহিত চারদিক।

আজমীর ছিল নিবেদিতপ্রাণ মুসলমান। কিন্তু এখানে এসে সে ইসলামকে নিয়ে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখী। আজমীর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো, হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস নিতান্তই একটি বাতিল ধর্মবিশ্বাস। মূর্তিপূজা সর্বৈব একটি কুফরী কাজ। কিন্তু ইসলাম যে সত্য ধর্ম, এ বিষয়টি বাস্তবতার নিরীখে সংশয়ের শিকার নওমুসলিম আজমীরের কাছে প্রমাণ করার মতো কোন উপাদান ছিল না। সে জোর দিয়ে বলতে পারছিল না, ইসলমাই সত্য।

নিস্তব্ধ রাতের এই একাকীত্বে চিন্তা-ভাবনায় হঠাৎ ছেদ ঘটালো দূরের একটি পাহাড়ের ঢালের আলোকরশ্মি। ঘন অন্ধকার রাতেও রশ্মির আলোর ঝলক ছিল বেশ তীব্র। আলোটি কয়েকবার চমকালো আবার বন্ধ হয়ে গেলো। এ দৃশ্য দেখে কমান্ডার আজমীরের গায়ের পশম খাড়া হয়ে গেলো। সে ভাবতে লাগল, সকাল হলেই গ্রামের মানুষের মুখে শোনা যাবে– রাতে গ্রামের পাহাড়ে তারা আগুন জ্বলতে দেখেছে। অথবা বলবে, রাতের বেলায় অমুক পাহাড় আগুন উদ্গীরণ করেছে।"

অবস্থাদৃষ্টে কমান্ডার আজমীর এতোটাই পেরেশান হলো যে, সে সিজদায় পড়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাজড়ানো কণ্ঠে নিবেদন করল, হে পরওয়ারদেগার! তুমি তোমার পবিত্র নামের মর্যাদা রক্ষা করো। তুমি তোমার প্রিয় ধর্ম ইসলামের পবিত্রতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখো। তুমি আমার ঈমানের দ্যুতি দেখাও, আমি যাতে এসব অদ্ভুত আগুনের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারি এই ক্ষমতা দাও।"

রাত শেষে ভোরের আলো যখন দিনের বার্তা ঘোষণা করলো, তখনও সেই রাতের ঘটনা কমাণ্ডার আজমীরের মনে পাথরের বোঝা হয়ে বিরাজ করছিল। সে দায়িত্ব অনুভব করছিল, এসব অস্বাভাবিক ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করে তার ধর্মের পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। কিন্তু এসব অলৌকিক ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের মতো ইলম ও প্রজ্ঞা কিছুই তার ছিল না। সূর্য যখন অনেকটা উপরে উঠে গেল, তখন একটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সে একাকীই বেরিয়ে পড়ল। সে চুপি চুপি গ্রামের মানুষের ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করল।

সে সময় কাশ্মীরের এই এলাকাটি ছিল ঘন গাছ গাছালীতে ভরা। ঘন বনজঙ্গলে প্রায়ই হিংস্র জীব-জন্তুকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেতো। মাঝেমধ্যে হরিণও পাওয়া যেতো। তীর-ধনুক আজমীরের সাথেই ছিল। একটি বর্শাও থাকতো তার সাথে সব সময়।

যেতে যেতে চৌকি থেকে অনেকটা দূরে একটি জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল সে। জঙ্গলের পাশ দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছিল পাহাড়ী নদী। হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো নারী-কণ্ঠের হাসির আওয়াজ। অতি সন্তর্পণে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকালো আজমীর। তার নজরে পড়ল নদীতে তিনটি রূপসী তরুণী জলকেলী করছে আর হাসাহাসি করছে। একজন অপরজনের গায়ে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। অদ্ভুত সুন্দর তরুণী তিনজন। কোমর থেকে তাদের উর্দ্ধাংশ সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন। নিম্নাঙ্গে যদিও একখণ্ড কাপড় আছে, কিন্তু তাও এতোটাই পাতলা যে, শরীরের পশমগুলো পর্যন্ত দিব্যি দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে।

তরুণীদের অস্বাভাবিক রূপসৌন্দর্যে বিস্মিত হলো না আজমীর। কারণ, আল্লাহ তাআলা প্রকৃতিগতভাবেই এই এলাকাটিকে দুনিয়ার মধ্যে সবেচেয়ে

সুন্দর করে বানিয়েছেন। এখানকার সব মানুষই সুন্দর। আজমীরকে যে বিষয়টি অবাক করলো, তা হলো, এখানকার ধারে কাছে কোন জনবসতি নেই। দূরের জনবসতি থেকে কেউ এখানে গোসল করতে আসে না। তাছাড়া তরুণীদের দেখে নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসী মনে করার কোনই যুক্তি নেই। এদের রূপ-সৌন্দর্যের সাথে আশপাশের গ্রামের তরুণীদের কোন তুলনাই হতে পারে না। এদেরকে গ্রাম্য তরুণী বলারও কোন অবকাশ নেই। আজমীরের মনে পড়ল, এই এলাকায় জনশ্রুতি আছে, অনেকেই নাকি গ্রাম থেকে দূরে পাহাড়ের ঢালে বা নির্জন স্থানে সুন্দরী নারীদের দেখতে পায়। লোকজনের ভাষায় এরা হয়তো প্রেতাত্মা, নয়তো স্বর্গের জ্বিন-পরী।

কমান্ডার আজমীর মুগ্ধ ও বিমোহিত হয়ে তরুণীদের দেখছিল। হঠাৎ এক তরুণী একদিকে তাকিয়ে আর্তচিৎকার করে দৌড় দিল। দেখাদেখি আরেক তরুণীও দৌড়ে পালাল। তৃতীয় তরুণীটি নদীর পাড়ে বসা ছিল। সে উঠে দৌড় দিতে গিয়ে নদীতে পড়ে গেল। সেখানে পানি ছিল হাঁটু পরিমাণ। ঠিক এমন সময় একটি বিশালকায় বন্য শূকর গর্জন করতে করতে পানির দিকে অগ্রসর হলো। তরুণী পানি থেকে সোজা হয়ে উঠে যেই ভয়ঙ্কর দাঁতাল বন্য শূকর দেখতে পেল, অমনি আর্তচিৎকার করে আবারো পানিতে গড়িয়ে পড়ল। বিশালদেহী বন্য শূকরটি এবার তরুণীকে ধরার জন্য পানিতে নেমে তরুণীর দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

আজমীরের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল এই তরুণী কোন প্রেতাত্মা কিংবা জীন পরী নয়- নিতান্তই মর্তের মানুষ। কমান্ডার ঘোড়ার লাগাম টেনে অশ্বপৃষ্ঠে এড়ি দিল। তাড়া খেয়ে ঘোড়া দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেল। কমান্ডার আজমীর বর্শাটিকে ডান হাতে নিয়ে নিশানা নিল। লক্ষ্যভেদী আঘাত হানতে হবে। কারণ, বন্য শূকর লাফিয়ে লাফিয়ে নর্তন-কুর্দন করে তীব্র গর্জন করে তরুণীকে শিকার করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। তরুণীকে ধরে ফেলবে ফেলবে অবস্থায় কমান্ডার আজমীর প্রচণ্ড জোরে শূকরের দিকে বর্শা নিক্ষেপ করলে বর্শাটি তীরের মতো উড়ে গিয়ে শূকরের পাঁজরে আমূল বিদ্ধ হল। বিকট চিৎকার করে শূকরটি লাফিয়ে উঠে পানিতে উল্টে পড়ল। বন্য শূকরটি আবারো পানি থেকে উঠে ঠাঁয় কয়েকটি চক্কর দিয়ে পানিতে ঢলে পড়ল।

আজমীর এক লাফে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দৌড়ে নদী থেকে তরুণীকে তুলে আনল। দাঁতাল বন্য শূকরটি তখনও পানিতে পড়ে ধীরে ধীরে গোংড়াচ্ছে আর পা ছড়িয়ে দাপাদাপি করছে।

তরুণী বেহুঁশ। তার সাথী তরুণীরা কোথায় পালিয়েছে পাত্তা নেই। আজমীর সংজ্ঞাহীন তরুণীকে পাজাকোলা করে এনে ঘোড়ার পিঠে শুইয়ে দিল এবং নদীর তীরে পড়ে থাকা কাপড়গুলো এনে তরুণীর উলঙ্গ দেহটা ঢেকে দিয়ে চৌকির দিকে রওনা হলো। সে বেহুঁশ তরুণীটিকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছিল আর মনে মনে ভাবছিল এই তরুণীদের পরিচয় উদ্ধার করতে পারলে হয়তো অনেক গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হবে।

আজমীর ভেবে কূল পাচ্ছিল না, এতো সুন্দরী এই তিন তরুণী এখানে কোত্থেকে এসেছে! আর ওর সাথীরাই বা কোথায় হারিয়ে গেছে। এই নির্জন জঙ্গলের মধ্যে এসে এরা নদীতে ঝাপাঝাপিই বা করছিল কোন উদ্দেশ্যে? এরা কি একবারও ভাবেনি, জঙ্গলের ভেতর থেকে যে কোন সময় কোন হিংস্র জন্তু এসে তাদের জন্য বিপদ হতে পারে? আকাশ-পাতাল ভাবনার কোন কিনার হওয়ার আগেই সংজ্ঞাহীন তরুণীকে নিয়ে চৌকিতে পৌছে গেল কমান্ডার আজমীর।

সেনাচৌকিতে পৌছানোর পর তরুণী ক্ষীণ কণ্ঠে আওয়াজ করল। তরুণী নিজে থেকেই শয়ন থেকে উঠতে চেষ্টা করছিল। কমান্ডার আজমীর তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে দিল। তরুণীর জ্ঞান ফিরে এসেছে। কিন্তু নিজেকে এই অচেনা সেনাচৌকিতে দেখে শূকর দেখার চেয়ে আরো বেশী ঘাবড়ে যাওয়ার ভাব চোখে মুখে ফুটে উঠলো। অত্যধিক ভীত হওয়ার কারণে তার মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো। আজমীর স্থানীয় ভাষায় কথা বললে বুঝতে পারল তরুণী। আজমীর তাকে পরিধেয় কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করে নিতে বলল।

"আপনিই কি আমাকে জংলী দাঁতাল শূকরের কবল থেকে বাঁচিয়েছেন?" ধরা গলায় আজমীরের উদ্দেশে বলল তরুণী।

"আমি যদি সেখানে না থাকতাম এবং আমার হাতে যদি বর্শা না থাকতো, তাহলে তোমার পক্ষে জীবন বাঁচানোই মুশকিল ছিল। এতোক্ষণে বন্য শূকরের আঘাতে তোমার ক্ষত-বিক্ষত দেহ নদীর স্রোতে ভেসে যেতো। আমিই সেই হিংস্র শূকরটিকে হত্যা করেছি। এখন আর তোমার কোন ভয়

নেই। তুমি নিরাপদ। তুমি যেখানে যেতে চাও তোমাকে নিরাপদে সেখানেই পৌঁছে দেয়া হবে। আতঙ্কিত তরুণীকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে বলল কমান্ডার আজমীর।

কাপড় পরার জন্য তরুণী অপর একটি খালি কক্ষে চলে গেল। আজমীর এতোক্ষণ দেখছিল তরুণীকে। মানুষও এতো সুন্দর হতে পারে? এ যেনো কল্পনাকেও হার মানায়!

কাপড় পরে ফিরে এসে তরুণী আজমীরের কাছে জানতে চাইলো, "এখন আমার সাথে কী ধরনের আচরণ করা হবে?"

"যার আশঙ্কা তুমি করছো, এমনটি করতে চাইলে সেই নদীর তীরেই আমি করতে পারতাম।" বলল আজমীর।

আমি তোমার সম্পূর্ণ উলঙ্গ শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। এখানে কোন বদ মতলবে তোমাকে নিয়ে আসিনি। তোমার জীবন রক্ষার তাগিদেই তোমাকে এখানে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। এখন বল, কোথায় যেতে চাও তুমি? যেখানে যেতে চাও, সেখানেই তোমাকে রেখে আসবো।"

"আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি এই এলাকার কোন লোক নও। তোমার কথাবার্তা এই এলাকার মনে হয় না। তোমার চালচলনও এই অঞ্চলের মানুষের সাথে মিলে না। তাছাড়া তুমি কোন গরীব গ্রাম্য বাবার সন্তানও নও।"

"আমি যদি আপনাদের কোন প্রশ্নেরই জবাব না দিই, তাহলে আমার সাথে কী আচরণ করা হবে?"

"তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া ছেড়ে দেবো না।" তোমাকে পবিত্র আমানতের মতো সযত্নে এখানে রাখবো।" বললো আজমীর।

খিক্ খিক্ করে হেসে ফেলল তরুণী। হঠাৎ সে আজমীরের সাথে এভাবে কথা বলতে শুরু করল, আজমীর তার কতো দিনের চেনা-জানা লোক। সে স্বেচ্ছায় আজমীরের কাছে নিজেকে সঁপে দিচ্ছিল।

তরুণীর এই বিগলিত ও স্বেচ্ছা সমর্পণের মনোভাব দেখে আজমীর বললো, "আমি একজন মুসলমান। আমি আমার সুলতান ও দায়িত্বের সাথে গাদ্দারী করতে পারি না। তুমি ভাবাবেগ সম্পর্কে আমাকে একটা পাথর মনে করতে পার।"

তরুণী আজমীরকে তার মায়াজালে আবদ্ধ করার জন্য আরো কিছু কৌশল প্রয়োগ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে পারল, প্রকৃতপক্ষেই আজমীর একটা পাথর।

অবশেষে তরুণী আজমীরের উদ্দেশ্যে বলল, আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। আমি যেমনটি আপনাকে ভেবেছিলাম, আপনি মোটেও তেমন নন। এখন আমার কর্তব্য আমার সত্যিকার অবস্থা আপনাকে জানানো। এরপর আপনার যা ইচ্ছা আপনি করতে পারেন।...

"আমি সেই প্রেতাত্মাদের একজন, যারা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সুন্দরী তরুণীর বেশে গোচরীভূত হয়। কিন্তু আমি প্রেতাত্মা নই মানুষ। আমার সাথে আরো যে দু'জন তরুণী ছিল, তারাও মানুষ। কালাঞ্জর দুর্গ আমাদের ঠিকানা। আমাদের অস্থায়ী ঠিকানা যেখান থেকে আপনি আমাকে উঠিয়ে এনেছেন, সেখান থেকে কিছুটা দূরের পাহাড়ের উপর। আজ রাত আমাদের উপর দায়িত্ব ছিল বিপরীত পাশে অবস্থিত পাহাড়ের উপর থেকে বিজলী চমকানো এবং আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণ ঘটানো।

"বিজলী চমকানোর রহস্যটা আসলে কী?"

"আপনি ইচ্ছা করলে ওইসব লোকদের পাকড়াও করতে পারেন। অবশ্য সমস্যা হলো, ওরা এতোক্ষণে হয়তো আমাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে। ওরা যদি আমাকে জীবিত বা মৃত উদ্ধার করতে না পারে, তাহলে তাদের গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তারা এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারে। আপনি কি এদের পাকড়াও করার ব্যাপারে কিছু ভাবছেন?"

'যেখান থেকে আমি তোমাকে তুলে এনেছি, আমি তোমাকে সেখানে ছেড়ে দিয়ে আড়ালে বসে থাকবো। ওরা হয়তো তোমাকে খুঁজতে আসবে, তখন ওদের আমি পাকড়াও করবো।" বলল আজমীর।

তুমি যদি আমাকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করো, তাহলে মনে রাখবে তুমি সব সময় আমার তীরের নিশানার মধ্যেই থাকবে।"

"আমি আপনাকে ধোঁকা দেবো না। আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। আমি আপনাকে এর প্রতিদান দেবো।"

কমান্ডার আজমীর তরুণীকে যেখান থেকে তুলে এনেছিল, সেখানে পৌঁছে দিল। আজমীরের বর্শার আঘাতে নিহত বন্য শূকরটি মরে সেখানেই পড়ে আছে। অল্প পানি থাকায় স্রোত সেটিকে ভাসিয়ে নিতে পারেনি।

তরুণী ছাড়া পেয়ে নদীর তীর ধরে উজানের দিকে অগ্রসর হতে এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাদের লোকজনকে তালাশ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর নদীর অপর তীরে দু'জন পুরুষকে দেখতে পেল তরুণী। তারা তরুণীকে ডাকল। তরুণী তাদেরকে হাতের ইশারায় এ পাড়ে আসার জন্য ডাকল। উভয়ে পাহাড়ী নদীর হাঁটুসমান পানি ভেঙে এ পাড়ে এসে তরুণীকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোত্থেকে এসেছো, এতোক্ষণ কোথায় ছিলে?"

এরা যখন দাঁড়িয়ে পরস্পর কথা বলছিল, তখন নদীর তীরের ঘন ঝোঁপের আড়াল থেকে চারসঙ্গী সিপাহীসহ আজমীর ময়দানে বেরিয়ে এলো। তরুণীর পরিচিত পুরুষ দু'জন আজমীরকে দেখে ঘাবড়ে গেল। আজমীরের হাতে তাক করা তীর-ধনুক। সে হুমকির স্বরে ওদের বলল, "পালাতে চেষ্টা করো না, যেখানে আছো, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক।"

আজমীরের হুমকি ও তার সাথে সশস্ত্র সঙ্গীদের দেখে তরুণীর দলের লোকজন ঘাবড়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। ইতোমধ্যে আজমীরের সাথীরা তাদের ঘিরে ফেলল।

"আমাদেরকে তোমাদের আস্তানায় নিয়ে চল।" তরুণীর দলের লোক দুজনকে নির্দেশের স্বরে বলল আজমীর।

তারা আজমীরের কথার কিছুই বুঝতে পারেনি এমন হাবভাব দেখিয়ে কৌশলে নির্দেশটি এড়িয়ে যাওয়ার ফন্দী করল। কিন্তু আজমীর তাদের বলল, কোন ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিলে তোমাদের হত্যা করা হবে। যদি ভালো চাও, তবে আমার নির্দেশ মতো তোমাদের আস্তানায় নিয়ে যাও।

আজমীরের কাছে তাদের সব চক্রান্তের জাল ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তরুণীকে তাদের আঞ্চলিক ভাষায় গালমন্দ ও তিরস্কার করতে লাগল দুই পুরুষ। "হারামজাদী, তুই আমাদের সবকিছু প্রকাশ করে দিয়েছিস!"

ওদের কথাবার্তায় পাত্তা না দিয়ে আজমীর তরবারী কোষমুক্ত করে তাড়া দিয়ে বলল, বাঁচতে চাও তো আগে আগে আমাদের নিয়ে চলো।

আজমীরের নির্দেশে আগে আগে পথ দেখিয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আরো গহীন জঙ্গলের দিকে যেতে লাগল লোক দুজন। কিছুক্ষণ পর লোক দু'জন একটি টিলার উপরের দিকে চড়তে লাগল। ঘন গাছ গাছালী ও লতাগুল্মে আকীর্ণ জায়গাটিতে কোন জনমানুষের পা পড়েনি। অনেকক্ষণ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠার পরও পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছানো গেল না। অনেকটা উপরে এসে দেখা গেল এ জায়গাটায় পাহাড় দেয়ালের মতো খাড়া। এ জায়গায় পাহাড়ের উপর শুকনো কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে একটি ঝুপড়ী। ঝুপড়ীর কাছে বিশাল একটি শুকনো কাঠের স্তূপ। ঝুপড়ীর বাইরে লোকজনের কথাবার্তা শুনে ঝুপড়ী থেকে দুই তরুণী বেরিয়ে এলো। আজমীর উভয় তরুণীকে নদীতে জলকেলী করতে দেখেছিল। এরা বাইরে বেরিয়ে তাদের লোকজনকে ঘিরে রাখা সৈনিকদের দেখে ঘাবড়ে গেল।

কমান্ডার আজমীর ঝুপড়ীতে উঁকি দিয়ে দেখলো, ঝুপড়ীর ভেতরে একটি বিশালকায় কাঠের ফ্রেমে স্বচ্ছ আয়না। আরো আছে আয়নার চেয়েও আরো বেশী স্বচ্ছ বিশালাকার গ্লাস।

"এগুলো কী?" পুরুষ দু'জনকে জিজ্ঞেস করল আজমীর।

"এগুলো কিছু না। আমরা এমনিতেই এদিকে এসেছি।"

পুরুষ দুজনকে টালবাহানা করতে দেখে বন্য শূকরের আক্রমণ থেকে প্রাণে বাঁচানো তরুণীর দিকে তাকাল আজমীর। এই তরুণী এর আগেই জীবন বাঁচানোর জন্য আজমীরের প্রতি কৃতজ্ঞ। সেই সাথে একান্তে পেয়েও তার সাথে কোন পাশবিক আচরণ না করে তাকে আমানতের মতো পবিত্র জ্ঞানে নিরাপত্তা দেয়ায় সে আজমীরের কাছে ওয়াদা করেছিল, তার কাছে তাদের সব রহস্যই প্রকাশ করে দেবে। প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনেকটাই ইতোমধ্যে পূরণ করেছে সে। বাকীটুকু পূরণ করতে সঙ্গী পুরুষদের উদ্দেশ্যে তরুণী বলল, এখন আর টালবাহানা করা নিষ্ফল। কারণ, আমাদের অনেক কিছুই জেনে গেছে এরা।

তারা কমান্ডার আজমীরকে উপরে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেল। পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে চতুর্দিকে তাকিয়ে আজমীর দেখতে পেল, গাছগাছালীর উপর দিয়ে তার চৌকি দেখা যাচ্ছে। গাছের ফাঁক দিয়ে আজমীর নদীর তীরের যে জায়গাটায় গিয়েছিল, সেই জায়গাটাও আবছা মতো দেখতে পেল।

আজমীরকে জানানো হলো, ওই যে শুকনো কাঠের স্তূপ দেখা যাচ্ছে, খাড়া পাহাড়ের এই জায়গায় রাতের বেলায় এই শুকনো কাঠের স্তূপে আগুন জ্বালানো হবে। এই আগুন পাহাড়ের নিচের গ্রামবাসীর দৃষ্টির আড়ালে থাকবে। এরপর বিশাল এই আয়নাটি সমতল পাহাড়ের যে জায়গাটায় তারা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে রাখা হবে। জ্বলন্ত আগুনে ঢেলে দেয়া হবে তেল। তাতে আগুনের শিখা বহু উঁচুতে উঠে যাবে। জ্বলন্ত আগুনের ঝলক পড়বে আয়নার উপর। তখন আয়নাটিকে দু'-তিনবার বিরতি দিয়ে সেনাচৌকি ও গ্রামের দিকে ঘুরানো হবে। জ্বলন্ত আগুনের ঝলক আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়ে সেনাচৌকি ও গ্রামে প্রতিফলিত হবে। খুব অল্প সময়ে আয়নাটি ঘুরানোর কারণে আয়নায় প্রতিবিম্বিত আলোর ঝলকানীকে অজ্ঞাত লোকের কাছে বিজলীর ঝলক মনে হবে।

এদের কথার মর্ম উপলব্ধি করা আজমীরের পক্ষে মোটেও কঠিন ছিল না। কারণ, তরুণী তাকে আগেই জানিয়েছিল, আজ রাত তাদের পরিকল্পনা ছিল গ্রামের উপর বিজলী চমকানো এবং পাহাড়ে আগুন জ্বালানো। কয়েক দিন আগে অন্য পাহাড় থেকে গ্রামের উপর বিজলী চমকানোর বিষয়টিও এখন আজমীরের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

"এটা বুদ্ধির খেলা" বলল দু' পুরুষের একজন।

রাতের অন্ধকারে আগুনের আলো এই আয়নায় প্রতিবিম্বিত হলে আলোর ঝলক সৃষ্টি করে। আর প্রতিবিম্বিত আলোকে পাহাড়ের নিচে বসবাসকারী গ্রামের লোকজন দেখে মনে করে আসমানের বিজলী। পাহাড়ের উচ্চতা সম্পর্কে জ্ঞাত লোকেরাও এটা ভাবতে পারে না, এই আলোর ঝলকানী পাহাড়ের চূড়া থেকে এসেছে। রাতের অন্ধকারে আলোর ঝলক দেখিয়ে দিনের বেলায় আমাদের প্রশিক্ষিত লোকজন গ্রামের মানুষের মধ্যে এই আলোকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের অলৌকিক কাহিনী প্রচার করে। আর লোকদের মধ্যে এসব কাহিনী বাতাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে, জন্ম নেয় কল্পনা আর অবাস্তবতা মিলিয়ে ভৌতিক সব কল্পকাহিনীর গুজব।

আমাদের লোকেরা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার ও অলৌকিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে প্রচারণা চালায়, দেবদেবীদের ধর্ম ত্যাগ করার কারণে দেবতাগণ তোমাদের উপর রুষ্ট হয়েছেন। তোমরা আবার স্বধর্মে ফিরে

না এলে গযব নেমে আসবে। বিভিন্ন রকম বিপদাপদে পতিত হবে তোমরা। এসব থেকে বাঁচার একটাই উপায়, তওবা করে আবার স্বধর্মে ফিরে এসো এবং দেবদেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য বেশী করে পূজা-অর্চনা করা।

লোকজন নির্জন স্থানে সুন্দরী উলঙ্গ পরীর বেশে যাদের দেখে প্রেতাত্মা কিংবা পরী মনে করেছে, এ তিন তরুণীই ছিল কথিত পরী বা প্রেতাত্মা। এরা এই এলাকার অধিবাসী নয়। লাহোর ও বাটান্ডার রাজমহলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশিষ্ট তরুণী এরা।

আল্লাহ তাআলা কমান্ডার আজমীরের বিগলিত মোনাজাত কবুল করেছেন। সে তার ঈমানের দ্যুতি এখন নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছে। তার কাছে সব অদ্ভুত ও আসমানী গজবের কাণ্ডকাহিনীর অন্তরালে এসব যোগীদের ভণ্ডামীর ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন বিভ্রান্ত নওমুসলিম গ্রামবাসীকে এ ব্যাপারে অবহিত করার প্রয়োজন বোধ করল কমান্ডার আজমীর। দুই যোগী পুরুষ ও তিন তরুণীকে পাকড়াও করে সেনাচৌকিতে এনে কঠোর প্রহরায় রাখল আজমীর। সেই সাথে তাদের জিজ্ঞেস করল, আর কোন কোন জায়গায় তাদের লোকজন এমন কাণ্ডকারখানা ঘটাচ্ছে?

* * *

এদিকে সেনাপতি সরওয়াগের কাফেলা পথে পাওয়া দুই গাইডের দেখানো পথে অগ্রসর হচ্ছিল। ইমাম সাহেব কয়েকবার দুই গাইডকে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন, কী ব্যাপার! এতো সময় লাগছে কেন? এতো দিনে তো আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার কথা!

জবাবে দুই গাইড ইমামকে বোঝালো, অত্যধিক নিরাপত্তার কারণে তারা দীর্ঘপথে অগ্রসর হচ্ছে। কারণ, এ পথটি সবচেয়ে নিরাপদ ও সহজ।

আসলে গাইডদের নিয়ে যাওয়া পথ মোটেও সহজ ছিল না। গাইডদ্বয় কাফেলাকে বিভ্রান্ত করে অচেনা দুর্গম দীর্ঘ পথে নিয়ে যাচ্ছিল।

একদিন রাতের বেলা এক জায়গায় বিশ্রাম করার জন্য যাত্রাবিরতি করল কাফেলা। তখন গাইড দু'জন কাফেলার প্রধান সরওয়াগকে জানাল, "আগামীকাল দ্বিপ্রহরের আগেই তারা গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। বিরতিহীনভাবে

দুর্গম পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করার ফলে কাফেলার সবাই ছিল খুবই ক্লান্ত। যাত্রাবিরতি দিয়ে হাল্কা কিছু খাওয়া-দাওয়ার পর গা এলিয়ে দিতেই সবাই ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

সকালে যখন তাদের ঘুম ভাঙল, তখন উভয় গাইড উধাও। খোঁজাখুঁজি করে তাদের কোথাও পাওয়া গেল না। খোঁজাখুঁজি করাও সহজ ছিল না। চতুর্দিকে উঁচু পাহাড়। ঘন ঝোঁপ-ঝাড়ে ঢাকা পাহাড়। গাছ গাছালী ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। তারা কোথায় এসেছে, কোন দিকে যেতে হবে কিছুই জানে না তারা। যে পথে এসেছে এই পথে ফিরে যওয়া ছাড়া আর কোন পথ তাদের জানা নেই।

আফসোস! হিন্দুদের চক্রান্তের শিকার হয়েছি আমরা। এরা দু'জন জানতো, আপনি আমাদের এই এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নানা গল্প বলছিলেন, এরা এই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়েছে। ইমামের উদ্দেশ্যে বললেন সেনাপতি সরওয়াগ।

"আমরা যখন বালনাথ দুর্গের পাশ দিয়ে আসছিলাম, তখন আমি দু'জন অশ্বারোহীকে দূরে দেখতে পেয়েছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, ওরা হয়তো কোন পথিক। কে জানে ওরাই কি সেই পথিক কি-না!" বললো এক সিপাহী।

"প্রথম যখন আমরা সাপ দেখি, তখন আমি ওদের দেখেছিলাম, কিন্তু তাদের চেহারা দেখা যাচ্ছিল না।" বললো অপর এক সিপাহী।

"তোমাদের দেখা লোকেরা এরাই হোক বা অন্য কেউ হোক, তাতে কী আসে যায়?" বললেন সারওয়াগ। আসল কথা হলো, আমরা এক ভয়ানক প্রতারণার শিকার হয়েছি। এখন এখান থেকে কিভাবে বের হওয়া যায় চিন্তা কর। আর একটা কাজ কর, আমাদের পুটলীতে খাওয়ার মতো যা কিছু আছে সব ফেলে দাও। এতে ওরা বিষ মিশিয়ে রেখে যেতে পারে। সেনাপতির নির্দেশে খাবার যা কিছু ছিল বিষ সব ফেলে দেয়া হলো।

এবার শুরু হলো অজানা-অচেনা পথে কঠিন এক সফর। এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে সারা দিন কেটে গেল। রাতটা কোনমতে কেটে গেল বটে; কিন্তু অত্যধিক ঠাণ্ডায় কেউই স্বস্তি পেল না। পরদিনও এভাবেই অজানা অচেনা পথে ঘুরে ঘুরে কেটে গেল। পরদিন রাতে যে সময় সারওয়াগের কাফেলা ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য একটু উষ্ণ জায়গা খুঁজছিল, ঠিক সেই সময় প্রতারক দুই

হিন্দু গাইড লোহাকোট দুর্গে বসে দুর্গপতির কাছে তাদের কাজের বর্ণনা দিচ্ছিল, কিভাবে তারা সারওয়াগের কাফেলাকে অচেনা পাহাড়ী জায়গায় ফেলে এসেছে। সেখান থেকে ওদের বেরিয়ে যাওয়া মোটেও সহজ ব্যাপার নয়।

"তোমরা ওদের হত্যা করে এলে না কেন?" দুর্গপতি আফসোস করে বলল। সুলতান মাহমূদ কোন সাধারণ লোককে আঞ্চলিক কমান্ডারের দায়িত্ব দেয়নি। তোমরা খুবই মূল্যবান শিকার হাতে পেয়েছিলে। তোমাদের কাজে আমি খুবই খুশী। কিন্তু ওদের ইহলীলা সাঙ্গ করে আসতে পারলে বেশী খুশী হতাম।'

"কালাঞ্জর থেকে আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কোন মুসলমান সেনাকে যেন কেউ হত্যা না করে। আমরা জানি না এ নির্দেশ কেন দেয়া হয়েছে। নয়তো খুব সহজেই আমরা ওদের খাবারে বিষ মিশিয়ে দিতে পারতাম।

"কালাঞ্জরের মহারাজা ভেবেচিন্তেই বলেছেন, তিনি হয়তো সুলতান মাহমূদকে এই বার্তাই দিতে চান, চুক্তি অনুযায়ী এখানে তার সৈন্যরা নিরাপদেই আছে। তবে তারা নিজেরাই যদি অচেনা জায়গায় গিয়ে ঘুরে ঘুরে মারা যায়, তাতে আমাদের কি করার আছে?"

আসলেও তাই হলো। সারওয়াগকে তার কাফেলাসহ অচেনা পথে ঘুরে ঘুরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া থেকে কে রক্ষা করবে? তারা নিজেরাই তো ওখানে গিয়েছে। দুদিন একটানা ঘুরেও তারা না পেল কোন পথের সন্ধান, না পেল কোন জনবসতির চিহ্ন। দূরে কাছে কোথাও কোন জনমানবের চিহ্ন তাদের চোখে পড়ল না। পানাহারবিহীন এই নির্জন জঙ্গলে প্রায়ই তাদের চোখে পড়ে জোড়ায় জোড়ায় পাহাড়ী বাঘ। সিংহের গর্জনও কানে আসে। পৃথিবীর এতো সৌন্দর্যমণ্ডিত মায়াবী এই জমিন তাদের কাছে এখন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হলো।

খুবই কার্যকর একটা চাল দিয়েছে হিন্দু চক্রান্তকারীরা। সারওয়াগ ছিলেন এই এলাকার আঞ্চলিক সেনাপ্রধান। প্রধান সেনাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে নওমুসলিমদেরকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য তারা যে চক্রান্তের আয়োজন করেছিল, সারওয়াগের অনুপস্থিতিতে সেই কর্মকাণ্ড চালানোর প্রধান প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেল। হিন্দু যোগী-সন্ন্যাসী ও পুরোহিতরা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে খুবই দক্ষ ও নিপুণ। মন্দিরগুলোতে পুরোহিতরা পূজারীদের

বলতে লাগল, গোমা-তা যেমন পবিত্র, মুসলমানরা তেমনই অপবিত্র। মুসলমানদের হত্যা করে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা ধর্মের প্রধান কাজ। মন্দিরের পুরোহিতরা মুসলমান হত্যাকে ধর্মের সবচেয়ে বড় পুণ্যের কাজ বলে ঘোষণা করে। সেই দিনের পুরোহিত আর নব্য ভারতের হিন্দু নেতাদের নীতির আদর্শের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আজো ভারতকে মুসলমানশূন্য করার ব্যাপারে সকল হিন্দুই এক ও অভিন্ন মত পোষণ করে।

১০১৪ খৃস্টাব্দের একদিন। রাজা নন্দরায় কালাঞ্জর দুর্গে বসে দুষ্কৃতকারী দলপতির কাছ থেকে তাদের কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট শুনছিলেন। রাজা নন্দরায় দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা বিজিত এলাকাসমূহের নওমুসলিমদের বিভ্রান্ত করে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা এবং মুসলিম শাসকদের উৎখাত করার চক্রান্তের জাল বুনেছিলেন, তা মুসলিম সৈন্য ও শাসকদের কাছে ধরা পড়ে যায়। তারা যাদুটোনা এবং সুন্দরী নারীদেরকে প্রেতাত্মারূপে গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের কাছে হিন্দু দেবদেবীদের গযবের আলামত হিসেবে উপস্থাপন করতে পাহাড়ের উপর থেকে কৃত্রিম আলো ফেলে বিজলী তৈরী করে। দুষ্কৃতকারী দলের নেতা বলছিলো, আমাদের প্রশিক্ষিত দলের দুই পুরুষ সদস্য ও তিন কিশোরীকে মুসলিম সৈন্যরা আসবাবপত্রসহ পাকড়াও করেছে এবং তাদেরকে গ্রামে গ্রামে নিয়ে গিয়ে মানুষকে সবকিছু দেখিয়ে বলেছে, এরাই হলো তোমাদের দেখা আসমানী গজবের প্রতীকী প্রেতাত্মা আর এইসব আসবাব হলো আসমানী বিজলীর রসদ।

কমান্ডার আজমীর যে কয়জনকে গ্রেফতার করেছিল, তাদের জীবন ভিক্ষা এবং বিনা শাস্তিতে মুক্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কুচক্রী দলের অন্য সদস্যদেরও ঠিকানা-পরিচয় জেনে নিয়েছিল।

তরুণীকে ব্যবহার করে আজমীর তার পুরুষ ও অন্য সাথীদের যেভাবে পাকড়াও করে, ঠিক একই কৌশলে অন্যান্য কুচক্রীদেরও সে পাকড়াও করতে সমর্থ হয়।

একদিন আজমীর কয়েক গ্রামের লোকজনকে একত্রিত করে কুচক্রী দলকে তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে বলতে বাধ্য করল, এ পর্যন্ত দেবদেবীদের নামে তাদের কাছে যা প্রচার করা হয়েছে, তার সবই ছিলো শুধুই গুজব, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। গ্রামের অনেকেই অপকর্মকারীদের চিনে ফেলল। চক্রান্তকারীরা গ্রামের

লোকদের কাছে তাদের আসল পরিচয় প্রকাশ করে দেয়। সন্ধ্যার পর আজমীর কুচক্রীদেরকে রাতের বিজলী চমকানোর মহড়া দিতে এবং তরুণীদেরকে প্রেতাত্মারূপে অবির্ভূত হয়ে দেখাতে বাধ্য করে।

মহারাজা নন্দরায় যখন দেখতে পেলেন, তার চক্রান্ত ভন্ডুল হয়ে গেছে, তখন তিনি যেসব ইমাম ও প্রশিক্ষক নওমুসলিমদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছে এবং ইবাদত-বন্দেগীর তালিম দিচ্ছে, তাদের হত্যা করে লাশগুলো এমনভাবে গুম করার নির্দেশ দেন, যাতে এর কোন আলামত কেউ খুঁজে না পায়। যেসব ক্যাম্পে গযনী বাহিনীর সৈন্যরা অবস্থান করছে, তাদেরকে ক্যাম্প থেকে একজন দু'জন করে বিচ্ছিন্ন করে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলার নির্দেশ দেন রাজা নন্দরায়।

এক রাতে আজমীর তার ক্যাম্পের একটি কক্ষে একাকী বসে ছিল। তার পাশেই একটি কক্ষে চক্রান্তকারী পুরুষ ও তরণীদের আটকে রাখা হয়েছিল। ওদের কক্ষের সামনে কমান্ডার আজমীর প্রহরার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। বন্দীদের একথাও বলে দিয়েছিল সে আগামীকালই তোমাদের দলের পুরুষদের বালনাথ পাঠিয়ে দেয়া হবে। আঞ্চলিক কমান্ডার সেনাপতি সারওয়াগের হাতে তোদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। আর তরুণীদেরকে সেনাপ্রহরায় কালাঞ্জর পাঠিয়ে দেয়া হবে।

রাতের মধ্যভাগে এক সিপাহী কমান্ডার আজমীরকে এসে জানালো, এক বন্দী তরুণী আপনার সাথে কথা বলতে চায়।

কমান্ডার আজমীর তরুণীকে ডেকে পাঠাল। সে যে তরুণীকে নদী থেকে তুলে এনেছিল, সে-ই ছিল সাক্ষাত প্রত্যাশী।

"সম্মানিত কমান্ডার, আজ রাতেও কি আপনি আমাকে কাছে ডাকবেন না? অন্তত আজ রাতটি আপনার কাছে কাটাতে ইচ্ছে করছে আমার।"

তরুণীর কথায় হাসি পেল আজমীরের। সে বলল, আমি অনুভব করি, তুমি অস্বাভাবিক সুন্দরী। আল্লাহর কসম, তোমার মতো রূপসী নারী আমি জীবনে দ্বিতীয়টি দেখিনি। তোমার বিস্মিত হওয়ার বিষয়টিকে আমি বুঝি না এমন নয়। আমার মতো একজন যুবকের পক্ষে দীর্ঘদিন স্ত্রীসঙ্গবিহীন জীবন কাটানোর পর তোমার মতো রূপসীকে হাতের নাগালে পেয়ে একটুও আকৃষ্ট না হওয়ার ব্যাপারটি তোমাকে অবাক করেছে। অথচ তোমরা প্রত্যাশা কর, আমি

তোমাদের রূপের প্রতি আকৃষ্ট হই। কিন্তু তুমি যদি আমার মতো মুসলমান হতে, তোমার উপরে যদি আমার মতো এমন কঠিন দায়িত্ব ন্যস্ত থাকতো, তুমি যদি ঈমানের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হতে, তাহলে আর তোমার কাছে ব্যাপারটি অস্বাভাবিক মনে হতো না। তোমাদের দৃষ্টি মানুষের দেহের প্রতি, এটা তোমাদের ধর্মের শিক্ষা আর আমাদের দৃষ্টি থাকে আত্মার প্রতি। আত্মাকে কেন্দ্র করেই আমাদের ধর্মবিশ্বাস আবর্তিত। এটাই আমাদের ধর্মের শিক্ষা।"

"তোমার ভালোবাসা পেতে আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই?"

"কালনাগিনীর বিষ খুলে নিলেও সে কালনাগিনীই থাকে। তাকে যদি মধুও পান করাও, তবুও তার দেহে বিষই উৎপাদিত হবে এবং এক সময় ঠিক নাগিনীর মতোই ছোবল মারবে। কারণ, এটাই তার ধর্ম।..."

আমি এখানে প্রেমপ্রীতির খেলা আর বিয়ে-শাদী করে সুন্দরী নারী নিয়ে ফুর্তি করতে আসিনি। তোমার এই অপরূপ সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় দেহবল্লরীর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। এটা আমার ঈমানের শক্তি। এ কারণে আমার দৃষ্টি নিজের যৌবনের প্রতি যেমন পড়ে না, তদ্রূপ তোমার মতো রূপসীর দেহবল্লরীর প্রতিও আমি আকর্ষণ বোধ করি না। শোন সুন্দরী ! আমার ধর্ম আমাকে শিক্ষা দিয়েছে, শত্রুপক্ষের কোন অবলা নারী যদি তোমাদের হাতে বন্দী হয়, তখন তাদের অসহায়ত্বের সুযোগে তাদের রূপরসের স্বাদ নেয়া মহা অপরাধ। নারী বন্দীদেরকে তোমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে রাখবে।"

আজমীরের কথা শুনে তরুণীর চোখে পানি এসে গেল। সে আজমীরের চৌকিতে তার সাথে গা মিশিয়ে বসল। আজমীরের কাঁধে একটি হাত রেখে তরুণী এমনভাবে তার শরীরে গা এলিয়ে দিয়ে বসল যে, তার এলো চুলগুলো আজমীরের নাকে-মুখে স্পর্শ করছিল। বিগলিত কণ্ঠে তরুণী আজমীরকে বলল–

"আপনি আমাকে বন্য শূকরের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছেন। এখন আপনি আমাকে মুক্ত করে পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে আমার ঠিকানায় পৌছে দিতে চাচ্ছেন। এতোটা দিন আমাদের মতো তিনটি যুবতী মেয়ে সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার উপর আপনার দয়া-অনুগ্রহে কাটালাম, তারপরও আপনি আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তো দূরে থাক আমাদের রূপ যৌবনের প্রতি একটু গভীরভাবে তাকিয়েও দেখেননি। আপনি পাথর হয়ে রইলেন....।"

কথা বলতে বলতে নীরব হয়ে গেল তরুণী। এক পর্যায়ে দুহাতে আজমীরের চেহারা তার দিকে ঘুরালো। মমতা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আজমীরের প্রতি তার আত্মনিবেদনের ভাব তরুণীর চোখে-মুখে ফুটে উঠলো।

হঠাৎ তরুণী বললো, "আমি তাজা রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে আপনি কোন গভীর বেদনায় আক্রান্ত। আজমীর, আপনি কি আহত?"

আস্তে করে বামহাতটি উপরে উঠালো আজমীর। তার হাতে একটি ধারালো খঞ্জর। খঞ্জরের অগ্রভাগ রক্তমাখা। তরণী তার ডানপাশে বসে ছিল। সে দেখতে পায়নি, সে যখন আজমীরের গলা জড়িয়ে গায়ে গা এলিয়ে দিয়ে আজমীরের দেহে কামনার আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করছিল, এই প্রমোদনা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য অতি সন্তর্পণে আজমীর তার কোমরে রক্ষিত খঞ্জর কোষমুক্ত করে ধীরে খোলাপায়ের উপরিভাগে বিদ্ধ করল। তরুণী রক্তমাখা খ র দেখে বসা থেকে উঠে আজমীরের মুখোমুখি দাঁড়াল। তখন আজমীরের পায়ের ক্ষতস্থানের দিকে তার নজর পড়ল। ফিনকী দিয়ে সেখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। অবাক বিস্ময়ে সেদিকে কতোক্ষণ তাকিয়ে রইল তরুণী।

"এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই সুন্দরী।" আমি মানুষ, ফেরেশতা নই। আমি পুরোপুরি সক্ষম একজন যুবক। তোমার শরীরের স্পর্শ ও রেশমী চুলের ছোঁয়া আমাকে স্বীয় কর্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছিল। আমি শুধু সুলতানের চাকুরী করি না, আল্লাহর দরবারেও আমার কর্তব্য সম্পর্কে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। এ ভূখণ্ডে একজন সুলতান আর মহারাজাদের সংঘাত রাজ্য দখল নিয়ে নয়, এটি সত্য ও ন্যায় এবং অসত্য ও অন্যায় মতবাদের সংঘাত।

আমি সাময়িক একটু সুখ ভোগের জন্য আমার আজীবন লালিত স্বপ্ন ও আদর্শকে জলাঞ্জলী দিতে পারি না। তোমার রূপ-সৌন্দর্য ও সমর্পিত নিবেদন উপেক্ষা করে মনের মধ্যে চাপও সৃষ্টি করতে চাই না। এজন্য তোমার দিকে থেকে দৃষ্টি ফেরাতে নিজের পায়েই খঞ্জর বিদ্ধ করেছি।... ঠিক আছে তুমি এখন নিজের কক্ষে চলে যাও।...

তরুণী আজমীরের একটি হাত টেনে নিয়ে তার চোখে স্পর্শ করাল এবং তাতে চুমো খেয়ে নিজ কক্ষে চলে গেল।

পরদিন সকালে তিন তরুণীকে তিনটি ঘোড়ায় সওয়ার করে দশজন অশ্বারোহী সহযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে কমান্ডার আজমীর কালাঞ্জরের পথে রওনা

হয়ে গেল। তরুণীরা বারবার তাদের ঘোড়া আজমীরের ঘোড়ার পাশে নিয়ে আসছিল। কিন্তু আজমীর তাদের প্রতি মুচকি হাসি উপহার দেয়া ছাড়া কোন কথা বলেনি।

মধ্যরাতের পরে কালাঞ্জর দুর্গের প্রধান ফটকের সামনে পৌঁছলো আজমীরের কাফেলা। দুর্গের অনতিদূরে তরুণীদের নামিয়ে দিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে আসতে উদ্যত হলো আজমীর।

জীবন বাঁচানোর কৃতজ্ঞতায় আজমীরের কাছে নিজেকে সমর্পণকারী মেয়েটি আজমীরের পথ আগলে দাঁড়িয়ে বিনীত কণ্ঠে বললো, "আপনার উপকারের কোন প্রতিদান আমি দিতে পারিনি। আমার দেহ ছাড়া আপনাকে দেয়ার মতো আর কিছু ছিলো না আমার। এজন্য আজীবন একটা দুঃখবোধ আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে।"

"আমি কোন প্রতিদান চাই না। আমাকে আমার প্রভু উত্তম প্রতিদান দিবেন। তুমি তোমাদের রাজাকে গিয়ে বলো, যুদ্ধ হয় রণাঙ্গনে পুরুষে-পুরুষে। নারীকে দিয়ে কখনো যুদ্ধ জেতা যায় না।"

সহযোদ্ধাদের নিয়ে ফিরে আসার পথে আজমীরের মন ছিল ফুরফুরে। আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে নিজেকে সমর্পণ করার পর আল্লাহ তার আবেদন মঞ্জুর করেছেন। তার ঈমানের নূর সে প্রত্যক্ষ করেছে। সেই সাথে অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালন করতে পেরেছে সে।

এদিকে সেনাপতি সারওয়াগ অচেনা পাহাড়ের ঘূর্ণিপাকে ঘুরে ঘুরে হয়রান। তিন-চারদিন বিরতিহীন ঘুরে-ফিরেও পাহাড়ের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছার কোন পথ পায়নি তারা। এই এলাকায় যদি খাওয়ার উপযোগী সুমিষ্ট ফলজ গাছের সমারোহ এবং সুপেয় পানির প্রাচুর্যতা না থাকতো, তাহলে এতোদিনে তাদের পক্ষে জীবন বাঁচানোই অসম্ভব হয়ে যেতো।

লোহাকোট দুর্গের হিন্দু রাজাকে প্রথম এ খবরটি দেয়া হলো যে, বালনাথ দুর্গের মুসলিম দুর্গপতি এবং গযনী সুলতানের আঞ্চলিক প্রশাসক সেনাপতি সারওয়াগ একজন ইমাম ও কয়েকজন সৈন্য নিয়ে পাহাড়ের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাদেরকে হিন্দুরা বিভ্রান্ত করে পাহাড়ের মধ্যে এনে ছেড়ে দিয়েছে। লোহাকোট দুর্গের দুর্গপতি কালবিলম্ব না করে এ খবরটি রাজা নন্দরায়কে জানাল। রাজা নন্দরায় এ খবর শুনেই নির্দেশ দিলেন, ওদের সবাইকে পাকড়াও করে দুর্গে নিয়ে আসা হোক।

এক দিন পর পার্শ্ববর্তী একটি মুসলিম সেনাচৌকির এক সিপাহী কমান্ডার আজমীরের চৌকিতে এসে সেই চৌকির কমান্ডারের পক্ষ থেকে জানাল–

"আমি খবর পেয়েছি, কালাঞ্জর দুর্গের একটি সেনাদল আমাদের সেনাবাহিনীর একটি ছোট্ট কাফেলাকে গ্রেফতার করে কালাঞ্জর নিয়ে যাচ্ছে। আমার পক্ষে এটা জানা সম্ভব হয়নি যে, এই মুসলিম সৈন্যরা কারা এবং কোন চৌকির সৈনিক? আমি ওদের উদ্ধার করতে যাচ্ছি, কিন্তু আমার জনবল খুবই কম। যথাসম্ভব জনবল দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করুন।"

"সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তার চৌকির বাছাই করা দশজন সিপাহীকে নিয়ে আজমীর নিজেই রওনা হলো। পথ ছিল দুর্গম এবড়ো-থেবড়ো। তারপরও আজমীর ও সাথীরা চার-পাঁচ ঘন্টর মধ্যে সংবাদ প্রেরণকারী চৌকির কমান্ডারের কাছে পৌছে গেল।

গযনী বাহিনীর কয়েকজন সদস্যক কালাঞ্জরের সৈন্যরা গ্রেফতার করার খবরটি দিয়েছিল স্থানীয় একজন অধিবাসী। সে জানালো, হিন্দুদের দলের সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ-ষাটজনের কম হবে না। আজমীর ও সংবাদদাতা কমান্ডার ত্রিশজন সিপাহী নিয়ে উদ্ধার অভিযানে রওনা হলো। সংবাদদাতা লোকটিই ছিল তাদের গাইড। বেশী দূর যেতে হলো না তাদের। ঘণ্টাখানিক অগ্রসর হওয়ার পর ময়দান পেরিয়ে একটি পাহাড়ী উপত্যকায় পৌছে তারা দেখতে পেল হিন্দুবাহিনীর বেষ্টনীতে গমনকারী কয়েকজন মুসলিম যোদ্ধাকে। দূর থেকেই তারা সেনাপতি সারওয়াগকে চিনতে পারল। সেই সাথে অন্য সিপাহীরাও ছিল তাদের পরিচিত।

কাছাকাছি গিয়ে আজমীর হিন্দুদের শাসিয়ে বলল, "বন্দীদের এখানেই ছেড়ে দিয়ে তোমরা চলে যাও।"

হিন্দুরা আজমীরের হুমকির কোন মৌখিক জবাব না দিয়ে মোকাবেলার প্রস্তুতিতে সারিবদ্ধ হয়ে গেল। সাথে সাথে আজমীরের নেতৃত্বে সহযোদ্ধারা হিন্দুদের উপর হামলে পড়লো। হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষের সবাই ছিল অশ্বারোহী। হিন্দুদের হাতে বন্দী সারওয়াগের সাথীদের সবাইকে ওরা পায়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করেছিল। শুরু হয়ে গেল দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ। অল্পক্ষণের মধ্যে বন্দীদেরকে মুক্ত করতে সক্ষম হলো আজমীরের দল। উভয় পক্ষের মধ্যেই হতাহতের ঘটনা ঘটলো।

এক পর্যায়ে হিন্দুবাহিনী পালিয়ে গেলে বন্দীদশা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত সারওয়াগ ও তার সাথীরা নিহত যোদ্ধাদের ঘোড়াগুলো ধরে সেগুলোতে সওয়ার হয়ে নিকটবর্তী মুসলিম সেনাচৌকির দিকে রওয়ানা হলো। কিন্তু এই দলের মধ্যে কমান্ডার আজমীরকে দেখা গেল না।

কমান্ডার আজমীরের ঘোড়া আহত হয়ে রণাঙ্গন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। আজমীর ঘোড়া না ছেড়ে এটিকে নিয়ে চৌকিতে ফেরার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পলায়নপর সাত-আটজন হিন্দু সৈন্য পেয়ে গেলো তাকে। ওরা আজমীরকে একাকী পেয়ে ঘেরাও করে ফেলল। ঘোড়াটি দুর্বল হয়ে পড়ায় তার পক্ষে পালানো সম্ভব ছিলো না। একাকী এতোজনের মোকাবেলা করাও সম্ভব ছিলো না তার। অগত্যা অসহায় আজমীরকে গ্রেফতারী বরণ করতে হলো। হিন্দুরা তাকে ঘোড়ার পিঠে বেধে কালাঞ্জর নিয়ে গেল। পথিমধ্যে আরো হিন্দু সৈন্য এদের সাথে মিলিত হলো। তারাও দু'জন মুসলিম সৈন্যকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছিল।

মুহূর্তের মধ্যে দুর্গে রটে গেল, কয়েকজন মুসলিম সৈন্যকে বন্দী করা হয়েছে। রাজমহলের ভেতরের রক্ষিতা ও নর্তকীদের কাছে চলে গেল মুসলিম সৈন্য গ্রেফতার করে আনার খবর। বন্য শূকরের আক্রমণ থেকে আজমীরের উদ্ধার করা নর্তকী এ খবর শুনে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে এলো। কারণ, মুসলমান সৈন্যদের বন্দীশালায় বেশ কিছুদিন কাটিয়েছে সে। মুসলমানদের উন্নত মানসিকতা, ধর্মনিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা ও সর্বোপরি আদর্শের পরাকাষ্ঠা সে গযনী বাহিনীর মধ্যে দেখেছে। এখন সেই গযনী বাহিনীর সৈনিককে হিন্দুদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার খবরে সে তাদের নিজ চোখে দেখার আগ্রহ দমাতে পারলো না। কমান্ডার আজমীরের বীরত্ব, হৃদ্যতা, মানবিকতা, উন্নত নৈতিকতার কারণে গোটা গযনী বাহিনীর প্রতিই সেই তরুণীর হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তির আসন সৃষ্টি হয়েছিল। ধর্মীয় চাপে মুসলমানদের প্রতি যতই হিংসা থাকুক না কেন, হৃদয়ের গভীরে শ্রদ্ধার আসনটিকে সে সরিয়ে দিতে পারছিলো না। তাই নিজ চোখে মুসলমান বন্দীদের দেখার জন্য যখন সে বন্দীদের কাছে পৌঁছল, আজমীরকে দেখে হতচকিয়ে গেল তরুণী, তখন মুহূর্তের মধ্যে সে সিদ্ধান্ত নিল, যে লোক হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে, তাকে বাঁচাতে আমি সম্ভাব্য সব কিছুই করবো। যেই ভাবনা সেই কাজ।

হিন্দু সৈনিকদের কমান্ডারকে হাতের ইশারায় একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে তরুণী তার কানে কানে আজমীরকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলো। সে কমান্ডারকে জানালো, এই মুসলিম সৈনিক কিভাবে তার জীবন বাঁচিয়েছিলো এবং এর প্রতিদানে নিজেকে পেশ করার পরও সে তা গ্রহণ করেনি। তরুণী কমান্ডারকে বললো, তুমি এ কাজ করলে তোমাকে প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশী পুরস্কার দেবো এবং তাকে এমনভাবে দুর্গের বাইরে পাঠাবো যে, কেউ ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারবে না।

তখনও পর্যন্ত বন্দীরদেরকে কোন সরকারী উচ্চ মহলের কাছে পেশ করা হয়নি। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেছে। বন্দীদেরকে তখন বন্দীশালায় রেখে দেয়ার কথা। হিন্দু কমান্ডারকে ছলে-বলে-কৌশলে আজমীরের মুক্তিদানে সম্মত করিয়ে তরুণী অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আজমীরকে একটি ঘন ঝোপ-ঝাড় ও গাছগালাছীর আড়ালে নিয়ে গেল। আজমীরকে এখানে বসিয়ে রেখে তরুণী দৌড়ে চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে কিছু কাপড় ও একটি ঘোড়া নিয়ে এলো। তাড়াতাড়ি আজমীরের গায়ে পরিয়ে দিল হিন্দু ঋষি-পুরোহিতদের কাপড় এবং তাকে একজন বয়স্ক পুরোহিতের পোশাকে সজ্জিত করে মাথায় বিশেষ পাগড়ী বেধে দিল এবং ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অগ্রসর হতে বলে নিজে আগে আগে চলল।

শাহী নর্তকী এগিয়ে গিয়ে প্রধান ফটকে প্রহরারত দায়িত্বশীল অফিসারকে বললো, "বাবাজি আমাদের কাছে এসেছিলেন। এখন জরুরী কাজে তাকে দুর্গের বাইরে অবস্থিত কাছের গ্রামে যেতে হচ্ছে। সেখানে দু'জন লোক মারা গেছে। তিনি পৌছুলে পরেই শুরু হবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। অন্দরমহল থেকে আমাকে দ্বার খুলিয়ে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে।"

দ্বাররক্ষী জানতো, এই তরুণী রাজমহলের নর্তকী। রাজপ্রাসাদ ও মহলে এই তরুণী প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কেও অবহিত দ্বাররক্ষী। তাই কোন ধরনের দ্বিধা-চিন্তা না করে দ্বার খুলে দিল সে। পুরোহিতবেশী আজমীর বিনা বাধায় ফটক পেরিয়ে গেল। তাকে বের করে দিয়ে পুনরায় বন্ধ করে দিল ফটক। আজমীর দুর্গ থেকে বেরিয়ে ঘোড়া না হাঁকিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো। দুর্গ থেকে অনেক দূরে গিয়ে সে পুরোহিতের বেশধারী জামা খুলে ফেলল এবং পেট মোটা করার জন্য জামার নিচে গুঁজে দেয়া কাপড়ও ছুঁড়ে ফেলে দিল। মাথার

বিশেষ পাগড়ীও ফেলে দিয়ে স্বাভাবিক হয়ে চৌকির উদ্দেশ্যে ঘোড়া হাঁকাল আজমীর।

একটানা ঘোড়া হাঁকিয়ে পরদিন অপরাহ্নে নিজের চৌকিতে পৌঁছল আজমীর। সেনাপতি সারওয়াগ ও তার যেসব সঙ্গী হিন্দুদের হাতে বন্দী হয়েছিল, তাবা মুক্ত হয়ে আজমীরের সেনাচৌকিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কারণ, সব কাছের চৌকির মধ্যে আজমীরের চৌকিই ছিল সবচেয়ে মজবুত ও নিরাপদ।

"আরে আজমীর যে! এ দু'দিন তুমি কোথায় ছিলে? এখন কোথেকে এলে? দুদিন পর আজমীরকে চৌকিতে ফিরতে দেখে জানতে চাইলেন সেনাপতি সারওয়াগ।

"আগে জরুরী কথা শুনুন।" বললো কমান্ডার আজমীর। আমার ঘোড়া অচল হয়ে গিয়ে আপনাদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম। আমার একাকীত্ব ও ঘোড়ার অচলাবস্থা আমাকে বন্দিত্ব বরণ করতে বাধ্য করে। একজনের সহায়তায় আমি কালাঞ্জর দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছি। এখানকার অবস্থা খুবই খারাপ। কালাঞ্জরের রাজা এখানকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রেখেছিল, আপনি তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আল্লাহর মেহেরবানী যে, তাদের এ চক্রান্ত ভণ্ডুল হয়ে গেছে। আপনাকে গ্রেফতার করে কালাঞ্জর নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাই প্রমাণ করে, এখানকার ছোট ছোট সব হিন্দু রাজারা আর আমাদের করদরাজা হিসেবে থাকতে রাজি নয়। এরা গোপনে সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছে। কালাঞ্জর দুর্গ থেকে আমি জানতে পেরেছি, কালাঞ্জর দুর্গে দু-তিনজন রাজার সকল সৈন্য একত্রিত হচ্ছে। লাহোরের মহারাজা ভীমপাল নিজে বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কালাঞ্জর দুর্গে আসছেন। সম্ভবত সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ড ভীমপালের হাতে থাকবে। মহারাজারা কালাঞ্জর দুর্গে একত্রিত হয়েই সুলতানকে কর দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে পয়গাম পাঠাবে। এরপর আমাদের ছোট ছোট চৌকিগুলো ধ্বংসের কাজ শুরু হবে।"

"এমনটা হওয়াই তো স্বাভাবিক।" বললেন সেনাপতি সারওয়াগ। যে কোন পরাজিত শক্তি প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করতেই পারে। হিন্দু এমন এক দ্বিমুখী জাতি যে, এরা পরাজয় অবশ্যম্ভাবী মনে হলে তোমার সামনে তরবারী

ফেলে দিয়ে পায়ে পড়ে, ভিক্ষুকের মতো প্রাণভিক্ষা চাইবে। তখন যদি ওদের মুক্তির বিনিময়ে বলো তোমাদের সকল কন্যা, জায়া, ভগ্নিকে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে, তাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না। কিন্তু কোনমতে তোমার তরবারীর কব্জামুক্ত হতে পারলেই বিষাক্ত সাপের মতো ছোবল মারবে। হিন্দুদের সাথে আমাদের যুদ্ধ রাজত্বের সীমা কিংবা ধন-সম্পদ নিয়ে নয়, আমাদের সাথে হিন্দুদের সংঘাতের একমাত্র কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস। এ যুদ্ধ যতদিন পর্যন্ত হিন্দুস্তানে একজন হিন্দু কিংবা মুসলমান থাকবে, ততোদিন পর্যন্তই অব্যাহত থাকবে। কিন্তু এখন দেখার বিষয় হচ্ছে, হিন্দুরা কখন আমাদের আক্রমণ করে।”

“আমি আপনাকে অনুরোধ করবো, হিন্দুদের আক্রমণ দেখার জন্য আমাদের নিষ্ক্রীয় বসে থাকা ঠিক হবে না। আজই একজন দূত গযনী সুলতানের কাছে এই আশঙ্কার সংবাদ দিয়ে পাঠানো দরকার। আমাদের উচিত হবে শত্রুদের শক্তি ও সামর্থের ব্যাপারে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর না তোলা। কারণ, যখন ওদের আক্রমণ শুরু হয়ে যাবে, তখন অল্প কজন লোক দিয়ে আপনি ওদের বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা কিভাবে করবেন? বললো কমান্ডার আজমীর।

আজমীরের প্রস্তাব খুবই যৌক্তিক মনে হলো সেনাপতি সারওয়াগের। তিনি তখনই মৌখিক পয়গাম দিয়ে গযনীর উদ্দেশ্যে দু'জন সৈনিক পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। তাদেরকে বলা হলো, পথিমধ্যে যথাসম্ভব কম বিশ্রাম নেবে এবং প্রয়োজন হলে প্রত্যেক চৌকি থেকে ঘোড়া বদল করে নেবে।

প্রত্যাশার চেয়েও কম সময়ে দূত গযনী পৌঁছে গেল। সুলতান মাহমূদ তাঁর সেনাবাহিনীর সকল সৈনিকের মধ্যেই এ বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন যে, কয়েক মিনিটের বিলম্ব অনেক ক্ষেত্রে গোটা বাহিনীর পরাজয়ের কারণ হতে পারে। সুলতানের এই শিক্ষার কারণে সংবাদবাহক প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত গযনী পৌঁছে গেল। সংবাদবাহক যখন সুলতানকে কাশ্মীরের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করছিল, তখন তার যবান চললেও মাথা দোল খাচ্ছিল আর যন্ত্রণায় তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। ক্ষুধা-পিপাসা এবং বিরতিহীন ক্লান্তিতে তার দেহ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল।

এ প্রসঙ্গে ইংরেজ ইতিহাস গবেষক স্যার হেনরী হোয়ার্থ ১৮৯৮ সালে লেখা এক নিবন্ধে ঐতিহাসিক ইবনে ইসপান্দেয়ার-এর সূত্রে লেখেন,

"কাশ্মীরের গোলযোগ ও সেনাপতি সারওয়াগের গ্রেফতারী এবং রাজা নন্দরায় ও ভীমপালের চক্রান্তের খবর শুনে সাথে সাথেই সুলতান সেনাবাহিনীকে অভিযানে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন। এর আগে কখনো অভিযানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশল সম্পর্কে সৈন্যদের অবহিত করা ছাড়া তাকে অভিযানের নির্দেশ দিতে দেখা যায়নি। এর কারণ সম্পর্কে বিশ্লেষকগণ বলেছেন, ইসলামের নীতি-আদর্শের প্রশ্নে সুলতান ছিলেন খুবই আপোসহীন ও আবেগপ্রবণ। তিনি তখন বলেন, দক্ষিণ কাশ্মীরের যে এলাকায় তিনি মৌখিকভাবে ইসলামী শাসন জারী করে এসেছিলেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই নির্দেশ মান্য করে স্থানীয় অধিবাসীদের সিংহভাগ ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং নওমুসলিমদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য তার নির্দেশে বহু মসজিদ-মক্তব স্থাপিত হয়েছিল। বহু সংখ্যক ইমাম ও শিক্ষক লাহোর বাটান্ডা ও অন্যান্য জায়গা থেকে কাশ্মীরে পাঠানো হয়। কিন্তু পরাজিত হিন্দু রাজারা বহুমুখী চক্রান্তের জাল বিস্তার করে নওমুসলিমদের বিভ্রান্ত করে ফেলেছে। শুধু তা-ই নয়, আঞ্চলিক প্রশাসক সেনাপতি সারওয়াগকে চক্রান্তকারীরা বন্দী করেছে। সেই সাথে সুলতানের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন সুলতান এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, স্বভাবজাত যুদ্ধ চিন্তা ও পরিকল্পনা করে নেয়ার অবকাশ তার হয়নি। স্বাভাবিক অবস্থায় নিজেকে ফিরিয়ে এনে তিনি ভাবতেই পারেননি, কোথায় কোন অবস্থায় কাদের সাথে মোকাবেলায় রওনা হচ্ছেন তিনি। ফলে তার বাহিনী কাশ্মীরে পৌঁছার আগেই সেখানে প্রচণ্ড শীত ও তুষারপাত শুরু হয়ে যাবে এদিকটি তিনি চিন্তা করেননি। তিনি ভাবতেই পারেননি, অত্যধিক ঠাণ্ডা আর তুষারপাত তার পরাজয়ের কারণ হতে পারে কিংবা অভিযানকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারে।

ঐতিহাসিক হায়দার কিরগানী 'তারিখে রাশেদী' গ্রন্থে লিখেছেন, "হতে পারে অতীতের অব্যাহত বিজয়ের মনোবল ও শত্রুদের চক্রান্তের ক্ষুব্ধতায় সুলতান অভিযানের সময়, ক্ষেত্র, অবস্থা ও প্রতিবন্ধকতার কথা বিবেচনা না করেই সৈন্যদের রওনা হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিংবা কাশ্মীরের প্রাকৃতিক অবস্থা, শীতকালে সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির ব্যাপারে তাঁর বাস্তব কোন ধারণা ছিল না। কাশ্মীরের পথঘাট সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ছিল অস্বচ্ছ।

বস্তুত পেশোয়ার থেকে আরো কিছু সৈন্য সাথে নিয়ে স্বভাবজাত দ্রুততার চেয়ে আরো বেশী ক্ষিপ্রতায় তিনি কাশ্মীরের সীমানায় পৌঁছেন। ১০১৫ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দশকে সুলতান তার সৈন্যদল নিয়ে কাশ্মীর পৌঁছেন। তখন পাহাড় ও সমতল সবজায়গা তুষারপাতের কারণে বরফে ঢাকা পড়ে গেল। সুলতানকে তাঁর গোয়েন্দা সূত্র খবর দিল, রাজা ভীমপাল ও নন্দরায় এখন কালাঞ্জর দুর্গে নয়, লোহাকোট দুর্গে অবস্থান করছে। কালাঞ্জর দুর্গ অবরোধ করে কালক্ষেপণ না করে লোহাকোট দুর্গ অবরোধের পরামর্শ দেয়া হলো। কারণ, লোহাকোট দুর্গ দখলে এসে গেলে কালাঞ্জর অবরোধ ছাড়াই দখলে এসে যাবে।

এদিকে লোহাকোট দুর্গে অবস্থানকারী মহারাজাদের কাছে খবর এলো, সুলতান মাহমূদ এসে গেছে। মহারাজা নন্দরায় চক্রান্ত ও দুষ্কৃতিকারী দলের প্রধানকে ডেকে বললেন, "তোমার সেই লোকদের নিয়ে এসো।" কিছুক্ষণের মধ্যে রাজা নন্দরায়ের সামনে দশ-বারোজন লোকের একটি দলকে এনে দাঁড় করানো হলো।

"তোমাদের কী করতে হবে তা কি তোমাদের জানা আছে?" সামনে দণ্ডায়মান লোকদের জিজ্ঞেস করলেন রাজা নন্দরায়।

"জি মহারাজ! আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। আমরা সুলতানের কাছে গিয়ে বলবো, আমরা এই এলাকার মুসলমান। এই অঞ্চলের পোশাক পরেই আমরা তার সামনে যাবো। আমরা তার কাছে আবেদন করবো, আমরা আপনার অভিযানে শরীক হতে চাই এবং আপনার সেনাদের গাইড দেয়ার প্রয়োজনেই আমরা এসেছি। কারণ, মৌসুমী তুষারপাত পথঘাট সবই তলিয়ে দিয়েছে। বহুল ব্যবহৃত পথের কোনই চিহ্ন নেই। এমন অবস্থায় লোহাকোট কোন পথে যাওয়া যাবে আমরা সেই পথ জানি। আমরা নিষ্ঠাবান মুসলমানের মতোই কথাবার্তা বলবো। তাদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য আমরা শুদ্ধ উচ্চারণে কলেমা ও নামায শিখে নিয়েছি।"

"সাবাস! যেভাবেই হোক তোমরা ওকে লোহাকোট নিয়ে আসবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লোহাকোট থেকে তাকে ব্যর্থ হয়েই ফিরতে হবে। ফিরে যাওয়ার পথে তোমরাই হবে তাদের পথপ্রদর্শক। তখন তোমরা তোমাদের আসল উস্তাদী দেখাবে।"

এই দশ-বারোজন লোক ছিল কট্টর হিন্দু। এরা ছিল প্রশিক্ষিত দুষ্কৃতিকারী। এরা সুলতান মাহমূদকে বিভ্রান্ত করার জন্য দাড়ি রেখেছিল। চালচলন, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদে তারা প্রত্যেকেই সাচ্চা মুসলমানরূপে নিজেদের উপস্থাপন করার সব কৌশল রপ্ত করেছিল।

লোহাকোট দুর্গের দিকে অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন সুলতান। পথের দুর্গমতা, অত্যধিক ঠাণ্ডা এবং তুষারপাতকে উপেক্ষা করলেন তিনি। কাশ্মীরে তাঁর যেসব সেনাচৌকি ছিল, তারা লোহাকোটে পৌঁছানোর জন্য অভিজ্ঞ গাইড বাছাই করে রেখেছিল। কারণ, সেই যুগের রীতি ছিল কোন সেনাবাহিনী যদি কোন অচেনা জায়গায় আক্রমণ চালাতো, তখন স্থানীয় লোকদের থেকে গাইড সংগ্রহ করতো।

লোহাকোটের দিকে অগ্রসর হলে পথিমধ্যে দশ-বারোজনের একটি কাফেলা এসে সুলতানের বাহিনীতে যোগ দিল। এই দলের লোকেরা সুলতানের সহযোগিতার ব্যাপারে খুবই উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছিল। তারা নিজেদেরকে নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে সুলতানের সামনে নিখুঁতভাবে পেশ করে। তারা এও বলে, আমরা দীর্ঘদিন এসব হিন্দুরাজাদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছি। আজ আমরা ওদের জুলুমের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। তাদের আবেগময় আবেদন আর মুসলমান হিসেবে নিখুঁত ভাবভঙ্গিমায় আশ্বস্ত হয়ে তাদের একেকজনকে গাইড হিসেবে প্রত্যেকটি সেনা ইউনিটে ভাগ করে দিলেন সুলতান। সেনাপতিদের বললেন, তাদের কথামতো অগ্রসর হতে।

লোহাকোট দুর্গ সম্পর্কে অনেক কাহিনীই শুনেছিলেন সুলতান। কিন্তু যখন লোহাকোর্ট দুর্গকে প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তার মনে হলো, তাকে লোহাকোট দুর্গ সম্পর্কে খুব কমই বলা হয়েছে।

সুলতান মাহমূদ ছিলেন দুর্গজয়ের উস্তাদ। কিন্তু লোহাকোট দুর্গ দেখে তিনি বিরাট এক ধাক্কা খেলেন। দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন কেন লোহাকোট দুর্গ অজেয় দুর্গ হিসেবে খ্যাত। দুর্গটি ছিল বিশাল এক পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এটি যেমন ছিল দুর্ভেদ্য, তদ্রূপ এর গঠনও ছিল মজবুত। সম্পূর্ণ পাথর ও মাটির মিশ্রণে বিশাল পুরুত্বে তৈরি ছিল দুর্গের প্রাচীর। তাছাড়া দুর্গের চারকোণে ছিল চারটি সুউচ্চ বুরুজ। এই বুরুজ থেকে যে কোন আক্রমণকারী দলকে সহজেই তীরের আঘাতে ঘায়েল করা সহজ ছিল।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল, প্রাকৃতিকভাবেই দুর্গের চতুর্দিকে ছিল গভীর খাদ। প্রতিটি ফটকের সামনের চত্বর ছিল অনেক ঢালু। ফটকগুলো বিশালকায় লোহার ডাণ্ডা দিয়ে তৈরি। হাতির কাঁধে শক্ত গাছের কাণ্ড রেখে এগুলোকে আঘাত করলেও ভাঙ্গা সম্ভব ছিল না।

সুলতান মাহমূদ দুর্গকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সকল সৈন্যকে এক জায়গায় একত্রিত করলেন। একটি অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে কাছের একটি টিলার উপরে দাঁড়িয়ে তিনি তার সৈন্যদের সাহস জোগানো এবং হিম্মত বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বললেন, হে আল্লাহর সৈনিকেরা! তোমরা গযনী সালাতানের জন্য নয়, আল্লাহ ও রাসূল সা. এর উদ্দেশ্যে যুদ্ধে এসেছো। আমরা এই এলাকার লোকজনকে ইসলামের দীক্ষা দিয়ে আল্লাহর নাফরমানী থেকে ফিরিয়ে এনেছিলাম। কিন্তু শুধু মুসলমান হওয়ার অপরাধে এখানকার বেঈমান রাজা-মহারাজারা এদের উপর নির্যাতনের তুফান চালাচ্ছে। আজকে তোমাদেরকে এই বেঈমানদের রক্তে ইসলামের প্রদীপ জ্বালাতে হবে।

"ওই যে দুর্গ তোমরা দেখছো, এই দুর্গ তোমাদের দেখে উপহাস করছে। এখানকার মৌসুমও তোমাদের ভ্রূকুটি করছে। তোমরা মরুময় পাথুরে ময়দানে লড়াই করে অভ্যস্ত। আজ এখানে প্রমাণ করে দাও, শীত ও বরফে যদি আসমান-জমিন সব কিছুও জমাট বেধে যায়, তারপরও মুসলমানের রক্ত জমে না। ঈমানের উষ্ণতা বরফের পাহাড়কেও গলিয়ে পানি করে দিতে পারে।

দেখো, আমরা বহুদূর থেকে এসেছি। আমরা এখানে এসেছি আল্লাহর পয়গাম তার বান্দাদের কাছে পৌছে দিতে। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে শপথ নাও, কঠিন দুর্ভেদ্য এ দুর্গে ইসলামের পতাকা না উড়িয়ে আমরা ফিরে যাবো না।"

সরাসরি সৈন্যদের সামনে এমন আবেগী ভাষণ সুলতান তেমন দিতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি কমান্ডারদের মাধ্যমে সৈনিকদের উজ্জীবিত করার পয়গাম দিতেন। কঠিন ও কঠোর ট্রেনিং দিয়ে সুলতান মাহমূদ তার প্রতিজন সৈন্যকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ত্যাগী, কষ্ট সহিষ্ণু ও সাহসী করে গড়ে তুলতেন। তাদেরকে আবেগী বক্তৃতা দিয়ে উজ্জীবিত করার তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু লোহাকোট দুর্গের অবস্থা ও তুষারপাতের বিরূপ পরিস্থিতি সুলতানের মনে যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনাকে এতোটাই দুঃসাধ্য করে তুলেছিল যে, কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদেও যার মধ্যে কখনো কোন ভাবান্তর দেখা যায়নি, রণাঙ্গনের

কঠিন পরিস্থিতিও যাকে পেরেশান, উদ্বিগ্ন ও আশাহত করতে পারেনি, সেই পাহাড়সম সাহসিকতার অধিকারী সুলতানের হৃদয়ে লোহাকোট দুর্গ জয় এতোটাই দুঃসাধ্য মনে হচ্ছিল যে, তার কণ্ঠের আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁকে বারবার থামতে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তিনি যথার্থ শব্দটি বলার জন্য স্মৃতিপট হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

যে কোন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ শুরুর আগে সুলতান দু'রাকাত নফল নামায পড়তেন। কিন্তু এদিন ঘোড়া থেকে নেমে তিনি তা করেননি। এমন কিছুও বলেননি যে, আমি জয়ের ইঙ্গিত পেয়েছি, বিজয় আমাদেরই হবে। অনেক রণাঙ্গনে তিনি এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ভাষণ শেষে তিনি তাঁর ঘোড়াকে টিলার উপর থেকে নিচে নামিয়ে আনলেন।

লোহাকোট দুর্গের চারপাশে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত হতে লাগলো। যে পাহাড়ের উপর দুর্গ অবস্থিত এর বাইরে উঁচু নীচু অসংখ্য টিলা। এসব টিলা ও সমতল সব জায়গাতেই প্রচুর গাছগাছালী। দুর্গের বাইরের ঢালুতেও প্রচুর বৃক্ষাদি ছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে দুর্গের ঢালের বৃক্ষাদি কেটে সাফ করা হয়েছে।

সুলতান মাহমূদ দুর্গের চতুর্দিক ঘুরে পর্যবেক্ষণ করলেন। দুর্গ প্রাচীর ও বুরুজের উপর থেকে হিন্দু সৈন্যরা তাঁকে হুমকি দিচ্ছিলো এবং নানা তিরস্কারসূচক বাক্য ছুঁড়ে দিচ্ছিলো। হিন্দু সৈন্যরা তাচ্ছিল্যের স্বরে বলছিল, "মাহমূদ! তোমার খোদা তোমার ভাগ্যে বরফের কবর লিখে রেখেছে।"

চতুর্দিকের টিলা ও পাহাড়ের উপর তীরন্দাজ নিযুক্ত করে সুলতান দুর্গপ্রাচীরে অবস্থানকারী সৈন্যদের উপর তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। তীরন্দাজদের তীরের সহায়তা নিয়ে প্রাচীর ভাঙায় পারদর্শী সৈন্যদেরকে তিনি দুর্গ প্রাচীরের নিচে সুড়ং খননের জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি জানতেন, কাশ্মীরের পাহাড়গুলো নিরেট পাথরের নয়, পাথুরে মাটির হয়ে থাকে। কাজেই এতে খননকাজ তেমন কঠিন হবে না। সুলতান মাহমূদ ভেবেছিলেন, কয়েক গজ সুড়ং খনন করতে পারলেই খননকারীরা দুর্গ প্রাচীরের উপরের তীর থেকে নিজেদের হেফাজত করতে পারবে এবং নির্বিঘ্নে খননকাজ চালাতে পারবে।

প্রাচীর ভাঙা ও সুড়ং খননকারী দল নির্দেশ পেয়েই খননকাজে এগিয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের তৎপরতা থেমে গেল। একজনের

পক্ষেও জীবন নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব হলো না। দুর্গ প্রাচীর থেকে বৃষ্টির মতো তীর এসে তাদের সবাইকে বিদ্ধ করলো। সুলতানের তীরন্দাজরা আশপাশের পাহাড় ও টিলার উপর থেকে যেসব তীর নিক্ষেপ করছিলো, বেশী দূরত্বের কারণে তা দিয়ে দুর্গ প্রাচীরের শত্রু তীরন্দাজদের দমানো সম্ভব হলো না।

কয়েক সৈনিক জীবনবাজী রেখে প্রধান ফটকে অগ্নিসংযোগ করার জন্য দাহ্য পদার্থ এবং ফটক ভাঙার জন্যে হাতুড়ী-শাবল নিয়ে ফটকের দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু ফটকের সামনের চত্বর ছিলো ঢালু এবং বরফে ঢাকা। মুসলিম সৈন্যরা ঢালু বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে পা পিছলে বরফের মধ্যে পড়তে লাগল আর উপর থেকে শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীরবিদ্ধ হয়ে গড়িয়ে নিচে পড়তে লাগল। তাদের মধ্যেও দু'-চারজন ছাড়া কারো পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব হলো না।

অন্যান্য ফটকেও অনুরূপ হামলা করার চেষ্টা হলো। একটি ফটকে কিছু জানবাজ আঘাত করতে শুরু করেছিল। কিন্তু দুর্গপ্রাচীরের উপর থেকে ফটক ভাঙচুরকারীদের উপর জ্বলন্ত কাঠ এবং আগুনের সলিতা নিক্ষেপ করলো শত্রুবাহিনী। তাদের সবার শরীরই ঝলসে গেলো।

ঐতিহাসিক উত্‌বী, গারদিজী, ইবনুল আছীর এবং দুজন ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ লিখেছেন, রাতের বেলায়ও সুলতানের সৈন্যরা দুর্গ প্রাচীরের নিচে সুড়ং খননের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু দিনের বেলায় সুলতান দেখতে পেলেন, দুর্গ প্রাচীরের নিচের খাড়িতে মুসলিম সৈন্যদের লাশের স্তূপ জমে গেছে। অবস্থা দেখে সুলতানের চেহারা রাগে-ক্ষোভে কালো হয়ে গেলো। তিনি পাগলের মতো দুর্গের চতুর্দিকে দৌড়াচ্ছিলেন আর সুড়ং খননের জন্য নির্দেশ দিচ্ছিলেন। সুলতানের নির্দেশে মুসলিম কমান্ডার ও সৈন্যরা অকাতরে তাদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছিল।

পরদিন সন্ধ্যার আগেই চতুর্দিকে প্রচন্ড অন্ধকার নেমে এলো। হিমশীতল রাতের অন্ধকারে শুরু হলো প্রবল তুষারপাত আর সেই সাথে ঝড়ো হাওয়া। তীব্র ঝড়ো হাওয়া আর প্রচণ্ড তুষারপাতে মানুষ তো দূরে থাক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গি ঘোড়াগুলোও টিকতে পারছিলো না। জীবন বাঁচানোর জন্য জঙ্গি ঘোড়াগুলো এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করতে শুরু করলো; কিন্তু আশ্রয় নেয়ার মতো কোথাও কোন আড়াল ছিলো না।

সমতল-অসমতল সব জায়গা বরফে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। কোনটা খাদ কোনটা টিলা বোঝা যাচ্ছিল না। তুষারপাত ও ঝড়ের গতি যেদিকে ছিল,

সেদিকে ছিল কাশ্মীরের বিখ্যাত ঝিলম নদী। প্রবল বাতাসের ধাক্কা অশ্বারোহী ও ভারবাহী সব জন্তু ওদিকেই হটতে বাধ্য হচ্ছিল। ঝিলম নদীর তীর ছিল সরু; কিন্তু উঁচু ও খাড়া। নদী ছিল অপ্রশস্ত, গভীর ও তীব্র স্রোতস্বিনী। নদী তীরের সবকিছু বরফে ঢাকা পড়ে গেল। বাতাসের ধাক্কায় অশ্বারোহী, আরোহীহীন জন্তু সবই নদী গর্ভে গড়িয়ে পড়ছিল। তীব্র স্রোত আর বরফঢাকা খাড়া তীর বেয়ে কারো পক্ষে উপরে উঠে আসার উপায় ছিল না। সেই রাতের অন্ধকারে কতো সিপাহী আর কতো ভারবাহী জন্তু ঝিলম নদীর স্রোতে ভেসে গিয়েছিল, তার প্রকৃত হিসেব রাখা সম্ভব ছিল না।

রাত শেষে যখন ভোরের সূর্য উচিত হল, তখন কারো পক্ষে বলার উপায় ছিলো না, এটিই গতকালের ঝিলম তীর আর লোহাকোট দুর্গের চারপাশ। হাজার হাজার মুসলিম যোদ্ধা বরফের নিচে তলিয়ে গেল। উঁচু বরফের আস্তরণ পড়ে গেল সবখানে। সুলতানকে বেঁচে থাকা কমান্ডারগণ বিনয়ের সাথে বললেন–টানা বিজয়ের নেশায় আমরা এই অভিযানকে সেইভাবে বিবেচনা করিনি। এটাই হয়তো আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো। এবার ক্ষান্ত হওয়া যাক। আল্লাহ চাহে তো আমরা আবার আসবো। যারা এখনও বেঁচে আছে, তাদের জীবন রক্ষার দিকটিই প্রাধান্য দেয়া হোক।

সুলতান মাহমূদ কমান্ডারদের পরামর্শ মেনে নিয়ে সৈন্যদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ব্যর্থতার দায়ও নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন তিনি। কিন্তু ফিরে যাওয়ারও পথ ছিলো না। সবকিছু বরফে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমন বেগতিক অবস্থায় পথিমধ্যে যোগ দেয়া গাইডেরা এগিয়ে এলো। তারা এই দুঃসময়ে সুলতানকে আশ্বাস দিলো, মাননীয় সুলতান ! দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, এখনো ফেরার একটি পথ পরিষ্কার আছে।

সেনাবাহিনী তখন বিক্ষিপ্ত। তারা প্রধান তিনটি অংশে বিভক্ত। পরিচয় গোপনকারী হিন্দু গাইডেরা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গাইডের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো।

তীব্র তুষারপাত রাতের বরফে তুফান আর সুড়ং খননের ব্যর্থ অভিযানে অর্ধেকের চেয়ে বেশী সৈন্য আগেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। বাকী অর্ধেকের কম সৈন্য তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পরিচয় গোপনকারী শত্রু গাইডের দেখানো পথে যখন গযনী ফিরতে রওনা হলো, এর পরিণতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক কারিশ্মা লিখেছেন–

"তীব্র তুষারপাত ও তুষার ঝড়ের পরদিন সুলতান মাহমূদ অবরোধ প্রত্যাহার করে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। কিন্তু ফেরার পথে হিন্দু পথপ্রদর্শকরা তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে এতোটাই বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয় যে, টানা এক সপ্তাহ গোটা বাহিনীকে তারা অচেনা-অজানা তুষার পথে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হত্যা করে। তীব্র ঠাণ্ডা, অপর্যাপ্ত পানাহার, ব্যর্থতার গ্লানি আর সহযোদ্ধা হারানোর শোকে এমনিতেই মুসলিম যোদ্ধারা ছিলো ক্লান্ত, হতোদ্যম ও মনোবলহারা। এমতাবস্থায় বরফে ঢাকা পিচ্ছিল পথে বেশিরভাগ সৈন্যকে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হচ্ছিল। যুদ্ধাস্ত্র ও জরুরী সামানপত্র কাঁধে করে বহন করতে হচ্ছিল তাদের। শত্রু পক্ষের গুপ্ত গাইড ঝিলম নদীর সংকীর্ণ তীর ধরে তাদের নিয়ে যাচ্ছিল। অগ্রসর হতে গিয়ে বারংবার পা পিছলে গভীর নদীর অতলে গড়িয়ে পড়ছিল মুসলিম যোদ্ধারা। তাছাড়া জায়গা জায়গায় ছিল বরফের ফাঁদ। দৃশ্যত সমতল দেখা গেলেও হালকা বরফের নিচে লুকিয়ে ছিল গভীর গর্ত। এসব ফাঁদে পা দিয়ে বহু যোদ্ধা বরফের চোরাবালিতে তলিয়ে যেতে থাকে। বহু ঘোড়া ও ভারবাহী জন্তুও বরফের চোরাবালিতে পড়ে জীবন ত্যাগ করতে থাকে। তীব্র ঠাণ্ডায় যেসব যোদ্ধা চলার শক্তি হারিয়ে বসে পড়তো, তার পক্ষে আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হতো না। এভাবে সুলতানের অসংখ্য যোদ্ধাকে জীবন দিতে হলো। অথচ এরা প্রত্যেকেই ছিল সুলতান মাহমূদের বাহিনীর চৌকস যোদ্ধা।

দুর্গজয় তো সম্ভব হলোই না, তদুপরি ব্যর্থতা মেনে নিয়ে ফিরতে গিয়ে শত্রু গাইডের পাল্লায় পড়ে শত শত যোদ্ধাকে কুরবানী দিতে হলো। বন্ধুবেশী শত্রু গাইডেরা এক দিন গোটা বাহিনীকে ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। বরফঢাকা পাহাড়ী পথে চক্কর খেয়ে সিংহভাগ সহযোদ্ধাকে হারিয়ে সুলতান মাহমূদ যখন টিলাযুগিয়ায় অবস্থিত সেনাপতি সারওয়াগের সেনাক্যাম্পে পৌঁছলেন, তখন তার সাথে মাত্র হাতে গোনা কয়েকশত যোদ্ধা। ব্যর্থ, ক্লান্ত, শোকাহত সুলতান কয়েকদিন সারওয়াগের ক্যাম্পে অবস্থান করে গযনী ফিরে এলেন।

## লক্ষ্য যখন ক্ষমতা ও সিংহাসন

১০১৭ খৃস্টাব্দের ৩রা জুলাই মোতাবেক ৪০৮ হিজরী সনের ৫ সফর। স্বগোত্রীয় ঈমান বিক্রেতাদের সম্মিলিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে সুলতান মাহমূদকে এক ভয়ানক রক্ষক্ষয়ী সংঘাতে লিপ্ত হতে হলো। এই সংঘাত ছিল সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টিকারী। যে সংঘাতের নেপথ্যে ছিল ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলিম কুচক্রীদের জোটবদ্ধ ষড়যন্ত্র।

১০১৫ সালে অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত হয়ে কাশ্মীর থেকে হাতেগোনা মুষ্টিমেয় সহযোদ্ধাকে নিয়ে পরাজিতের বেশে সুলতানের গযনী ফিরতে হয়েছিল। বিশাল এই ক্ষয়ক্ষতি সামলে উঠার জন্য এবং সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠনের জন্য টানা কয়েকটি বছর প্রয়োজন ছিল সুলতানের। কারণ, কাশ্মীরের লোহাকোট দুর্গের ব্যর্থতা প্রাকৃতিক বৈরীতা এবং চক্রান্তকারী হিন্দু গাইডের চক্রান্তে সুলতান মাহমূদের সামরিক শক্তি একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তখন সাধারণ কোন যুদ্ধের মোকাবেলা করার সামর্থও তার বাহিনীর ছিলো না। রাজধানী গযনীর নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত সৈনিক এবং সীমান্তের অস্থায়ী চৌকিগুলোতে প্রহরারত যোদ্ধারা ছাড়া তাঁর কেন্দ্রীয় কমান্ড প্রায় জনবলশূন্য হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় বহিরাক্রমণ প্রতিহত করার সামর্থ তাঁর থাকলেও প্রতিআক্রমণ করার মতো জনবল সেনাবাহিনীতে ছিলো না।

হিন্দুদের পক্ষ থেকে আক্রমণের তেমন আশঙ্কা তাঁর ছিলো না। কারণ, তখনো পর্যন্ত হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছিল। কাশ্মীরের লোহাকোট দুর্গে পরাজয় মেনে নিয়ে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে টিলাযুগিয়া ক্যাম্পে কয়েক দিন অবস্থান করলেও রাজা ভীমপাল ও নন্দরায় তাঁর উপর আক্রমণের সাহস পায়নি। অথচ এ সময় বিপুল সংখ্যাধিক্যে প্রবল হিন্দুবাহিনী আক্রমণ করলে হয়তো তাদের হাতে সুলতানকে বন্দিত্ব বরণ, নয়তো শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে হতো। কিন্তু হিন্দু রাজা-মহারাজারা তাঁকে আহত বাঘের মতোই ভয়ানক ভেবে তাঁর কাছ থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ দূরত্বে রেখেছেন।

এমতাবস্থায় চিহ্নিত শত্রু হিন্দুদের পক্ষ থেকে কোন ঝুঁকির আশঙ্কা না থাকলেও স্বগোত্রীয় মুসলিম ক্ষমতালিপ্সু প্রতিবেশী ক্ষুদ্র শাসকদের পক্ষ থেকে ঝুঁকির আশঙ্কা প্রবল হতে থাকলো। অধিকাংশ প্রতিবেশী মুসলিম শাসক এককভাবে কিংবা যৌথভাবে সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াই করে এক বা একাধিকবার পরাজিত হয়েছিল। স্বগোত্রীয় এসব ক্ষমতালিপ্সুদের প্রতিবারই সুলতান ক্ষমা করে দিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রত্যাশায় ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু মসনদ ও ক্ষমতার পূজারী, নীতি-আদর্শবিচ্যুত এসব শাসক সুলতানের শক্তিশালী অবস্থানকে সব সময় তাদের বিপদ জ্ঞান করতো। তারা শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে সব সময়ই সুলতানের ধ্বংস কামনা করতো। সুলতানকে হীনবল ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে পরম্পর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে লিপ্ত থাকতো। কুচক্রী প্রতিবেশীদের জন্য সুলতানের এই বিপর্যয় মহাসুযোগ সৃষ্টি করে দিল। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে উঠে-পড়ে লেগে গেল তারা।

কাশ্মীরের ব্যর্থ অভিযান শেষে সুলতান মাহমূদ যখন গযনীতে ফিরে এলেন, তখন তাঁর অবস্থা অনেকটাই ডোরকাটা ঘুড়ির মতো। বাতাসের দয়ার উপর ভর করে ঘুড়ি যেমন উড়তে থাকে, সে জানে না জমিনে পড়বে না কোন গাছের ডালে পড়ে ফেটে যাবে। সুলতান মাহমূদের সাথে কাশ্মীর অভিযান শেষে যে সামান্যসংখ্যক সৈন্য ছিলো, তারা শোক-মিছিলের আবহে রাজধানীতে ফিরছিলো। গযনীর যেসব লোক সেনাবাহিনীর আগমনবার্তা পেয়ে রাস্তায় তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য জড়ো হয়েছিলো, সৈন্যদের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে তাদের মুখে আর কোন শব্দ উচ্চারিত হলো না। বিজয়োল্লাসের তাকবীর ধ্বনি তাদের বুকের পাঁজরে যেন আটকে গিয়েছিল। যেসব নারী দরজা-জানালায় দাঁড়িয়ে সেনাবাহিনীর প্রত্যাবর্তন দেখছিলো, সৈন্যদের বিপর্যস্ত দৃশ্য দেখে তারা দাঁতে আঙুল কামড়ে ধরলো।

সুলতান মাহমূদ রাজধানীর অধিবাসীদের এমন শোকাবহ নীরবতা দেখে ঘোড়া থামিয়ে তাঁর প্রধান সেনাপতি আলতানতাশকে ডেকে পাঠালেন।

"আলতানতাশ! কী হয়েছে, রাজধানীর উৎসুক সব মানুষ নীরব হয়ে গেলো কেন? সৈন্যদের মৃত্যুতে ওদের শ্লোগান হারিয়ে গেলো কেন? তাদের বলো, জাতির প্রয়োজনেই সৈন্য বেঁচে থাকে। এজন্য তোমাদের সবার মরে

গেলে চলবে না। তোমাদের স্লোগান বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তোমরা স্লোগান দাও, ‘ইসলাম জিন্দাবাদ” “সালতানাতে গযনী জিন্দাবাদ”। তোমরা আহত সৈন্যদের উজ্জীবিত করো। তোমাদের উৎসাহ ও প্রাণোচ্ছলতা তাদেরকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। যারা শাহাদাত বরণ করেছে, তারা তাদের জীবন জাতির সেবায় দান করে গেছে। তাদের কুরবানীর মর্যাদা আমাদের রক্ষা করতে হবে।”

সেনাপতি আলতানতাশ উচ্চ আওয়াজে সুলতানের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন। মাঝে মাঝে গযনীর আকাশ-বাতাস ‘সালতানাতে গযনী জিন্দাবাদ, ইসলাম জিন্দাবাদ, ইসলামের সৈনিকেরা জিন্দাবাদ, মূর্তি ধ্বংসকারী সুলতান জিন্দাবাদ, ইত্যাকার স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠলো।

সুলতান মাহমূদ আবারো সেনাপতির উদ্দেশে বললেন, “মহিলাদের বলো, ‘ইসলাম তোমাদের কাছে তোমাদের ভাই-বেটাদের কুরবানী দাবী করছে। আপনজন হারানোর শোকে মাতম করলে চলবে না। তোমাদেরকে ইসলামের প্রয়োজনে স্বামী-সন্তান, ভাই-পুত্রদেরকেও কুরবানী দিতে হবে।”

সেনাপতি আলতানতাশ সুলতানের একথাগুলোও উচ্চ-আওয়াজে পুনরাবৃত্তি করলেন। একথা শুনে যেসব নারী তাদের সংগৃহীত ফুল লুকিয়ে ফেলেছিলো, আহত সৈনিকদের উপর তা ছিটিয়ে দিতে শুরু করলো। সেই সাথে নারীদের কণ্ঠ থেকে ভেসে এলো, “কোন অসুবিধা নেই, ইসলামের প্রয়োজনে আমাদের ভাই-পুত্র-স্বামীদের তোমরা নিয়ে যাও।”

সুলতান মাহমূদ রাজধানীবাসীর মনোবল বাড়িয়ে দিয়ে শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন বটে; কিন্তু তাঁর নিজের মনের গভীরে ব্যর্থতা ও হতাশার যে কাঁটা বিদ্ধ হয়েছিলো তা তিনি কিছুতেই সরাতে পারছিলেন না। কাশ্মীর যুদ্ধের সকল ব্যর্থতা তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি বাহিনীর বেঁচে থাকা সেনাপতি এবং গযনীতে অবস্থানকারী সেনাকমান্ডারদের ডেকে বললেন, “জয়-পরাজয় মূলত আল্লাহর হাতে। কিন্তু লোহাকোট অভিযানের যাবতীয় ব্যর্থতার দায় আমার। আমি এর সকল দায়-দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিচ্ছি। কারণ, আমি সেখানকার মৌসুমী প্রভাবকে মোটেও বিবেচনায় নিইনি। স্থানীয় সংবাদ প্রেরকদের কাছ থেকে ওখানকার অবস্থা যাচাই করিনি। সর্বোপরি হিন্দু প্রতারকদের ধোঁকায় আমি প্রতারিত হয়েছি।

জাতির এই কলঙ্ক, এই ক্ষয়ক্ষতিকে বিজয়ে রূপান্তরিত করে দেখানোর দায়-দায়িত্ব এখন আমি কাঁধে তুলে নিচ্ছি।

রাজা হিসেবে রাজ্য শাসন করা আমার কাজ নয়। আমার কাজ ইসলামের বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়া। তোমরা আমার একটি কথা খুব মনে রেখো। তা হচ্ছে, এখন যদি কেউ তোমাদেরকে পরাজয়ের জন্য তিরস্কার করে, তবে সেই তিরস্কারকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে তাকে আশ্বস্ত করো, তোমাদের সমর্থন-সহযোগিতা থাকলে গযনী বাহিনী অচিরেই পরাজয়ের গ্লানি মুছে দেবে।

ব্যর্থতার পুরো দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নেয়ার পরও স্বস্তি পাচ্ছিলেন না সুলতান মাহমূদ। ক্রমেই তার মন অত্যন্ত অস্থিরতায় পেরেশান হয়ে উঠছিলো। মনের অস্বস্তি অস্থিরতা ও পেরেশানী থেকে মুক্তি পেতে অবশেষে তিনি তার শায়খ আবুল হাসান খারকানীর সাক্ষাতে রওনা হলেন।

গযনী থেকে একদিন ও অর্ধেক রাতের দূরত্বে অবস্থান করতেন খারকানী। অল্প কজন নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে স্বীয় মুর্শিদের কাছে পৌছলেন সুলতান মাহমূদ।

বিমর্ষ, ভগ্নহৃদয় ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত সুলতানকে দেখে খারকানী বললেন, "অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, সুলতান পরাজিত হয়ে এসেছেন। কিন্তু তাই বলে তার চোখে পানি কেন?"

"অপমান আর ব্যর্থতার গ্লানি মুর্শিদ" বললেন সুলতান। আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি। আমি হাজার হাজার সহযোদ্ধাকে কাশ্মীরের বরফের নিচে রেখে এসেছি, এদের রূহ আমাকে রাতে ঘুমোতে দেয় না। ওরা যেন আমাকে কানে কানে বলে যায়, "একি করলেন সুলতান? কোন অপরাধে আমাদের কাশ্মীরে এনে বরফ চাপা দিলেন? আমরা তো মর্দে-ময়দান ছিলাম, আমরা তো আপনার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বেঈমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম।"

"বিভ্রান্তি। মানসিক অপরাধবোধ থেকে এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন আপনি। যে যোদ্ধারা সহযোদ্ধাদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ শাহাদত বরণকারীদের আত্মা তাদেরকে বিভ্রান্ত করে না, কোন ধরনের পেরেশানী সৃষ্টি করে না। দেখবেন, এই শহীদদের আত্মা জীবন্ত সৈনিকে রূপান্তরিত হবে। আল্লাহর নামে এখন থেকে আপনারা যেখানেই লড়াই

করবেন, এসব রূহ আপনাদের শক্তি জোগাবে। আপনার মতো একজন দৃঢ়চেতা লড়াকু রণনায়কের পথে এ ধরনের বিভ্রান্তি প্রতিবন্ধক হতে পারে না। এসব নিতান্তই আবেগাশ্রয়ী বিষয় সুলতান। হতোদ্যম হবেন না। হিন্দুস্তানের অসংখ্য মজলুম আপনার পথ চেয়ে আছে, শত শত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া মসজিদ আপনার আগমন অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।"

"আমি মারাত্মক ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিলাম। প্রথমত মৌসুম আমাকে ধোঁকা দেয়, দ্বিতীয়ত প্রশিক্ষিত কুচক্রী হিন্দুরা মুসলমান সেজে আমাকে গাইড হিসিবে ধোঁকায় ফেলে।"

"হিন্দুদের এসব ধোঁকাবাজী কোন নতুন বিষয় নয় সুলতান!" বললেন খারকানী। ইসলামের গোড়া থেকেই কুফরীশক্তি মুসলমানদের ধোঁকা দিচ্ছে। ভবিষ্যতেও এই ধোঁকাবাজী অব্যাহত থাকবে। আপনার কাজ হলো ভবিষ্যতে যাতে এমন ধোঁকার শিকার হতে না হয়, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা। ভারতের আগেই হয়তো আপনাকে নিজ ভূমিতে স্বগোত্রীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

ইহুদী ও খৃস্টশক্তি সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের মৈত্রী ও ঐক্যের শিকড় কেটে দিচ্ছে। যে খলীফা ছিলেন মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক, সেই খলীফাই এখন ক্ষমতা ও মসনদের লিপ্সায় অন্ধ। মুসলিম উম্মাহর কেন্দ্রীয় শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আপনি যদি ইসলামের স্বার্থে যুদ্ধ-জিহাদে আগ্রহী হয়ে থাকেন। তাহলে সুলতানীর উষ্ণতা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন। চেনা-অচেনা শত্রুদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুন। স্বজাতি ও স্বদেশের জনগোষ্ঠীকে ভীতসন্ত্রস্ত না করে সামরিক শক্তি দিয়ে শত্রুদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিন। তাজ ও তরবারী সহাবস্থান করতে পারে না। ভালোবাসা হয় তরবারীর সাথে থাকবে, নয়তো তখতের সাথে। যে তরবারী তাজ ও তক্তের হেফাযতের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেই তরবারী ঘৃণ্য। মাত্র একটি পরাজয়ে হতোদ্যম হয়ে যাবেন না সুলতান! উঠে সে-ই, যে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। এই হোঁচট খাওয়ার পর পুনরায় গা ঝাড়া দিয়ে আবার সেই শক্তি নিয়ে দাঁড়ান, যে অবস্থায় আপনি পড়ে গিয়েছিলেন। নিজের ভুলত্রুটি নিজের কাঁধে নিন, এ ব্যাপারে জাতিকে ভুল তথ্য পরিবেশ করবেন না।"

"আপনি বলেছেন, ইহুদী ও খৃস্টানরা আমাদের শিকড় কাটছে? এটা বলে আপনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন?" খারকানীর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন সুলতান।

"ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু ইহুদী জাতি।" বললেন শায়খ আবুল হাসান খারকানী। ইহুদিরা মসজিদে আকসাকে তাদের ইবাদতখানা মনে করে। ইহুদীরা চেষ্টা করছে, ফিলিস্তিনকে তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রে পরিণত করে কাবাকে দখল করে নিতে এবং মুসলমানদের একক ইবাদতগাহকে ধ্বংস করে দিতে। ইহুদীরা মুখোমুখী সংঘর্ষের জাতি নয়। এরা কখনো মুখোমুখী সংঘর্ষে জড়াতে চায় না। ওদের হাতে আছে অঢেল সম্পদ। এই সম্পদ ব্যবহার করে তারা মুসলমানদের শিকড় কাটছে। হিন্দুদের মতো ইহুদীরাও মুসলিমদের ক্ষতিসাধনে কন্যা-জায়াদের ব্যবহার করে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃস্টানদেরও সহায়তা দিচ্ছে ইহুদীরা। যে কারামতী জনগোষ্ঠীর স্বরূপ আপনি উন্মোচন করে সাধারণ মানুষকে ওদের ধোঁকাবাজী পরিহার করে সঠিক ইসলামে দীক্ষা নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, কুফরী মিশ্রিত কথিত মুসলিম নামের এই গোষ্ঠীর জন্মদাতা ইহুদী পণ্ডিতেরা। আপনার বিরুদ্ধে যেসব মুসলিম শাসক অব্যাহত চক্রান্তে লিপ্ত, পর্দার অন্তরালে তাদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে ইহুদীরা। আপনাকে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে রাখার নেপথ্যে ইহুদীরা জড়িত...।

অচিরেই হয়তো নিজ ভূমিতেই স্বগোত্রীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আপনাকে লড়াই করতে হবে। প্রতিবেশী প্রতিপক্ষগুলোকে পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন।

মহান আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন এবং সব সময় সতর্ক থাকুন। নিজ দেশের জনগণকে আপনার সাথে রাখুন। সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠনের চেষ্টা ত্বরান্বিত করুন এবং খাওয়ারিজমের প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ রাখুন। আমি শুনতে পেরেছি, খাওয়ারিজমে ইতোমধ্যে ইহুদীদের কারসাজী জোরে-শোরে চলছে।"

সেই সময় খাওয়ারিজম ছিল একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। জুরজানিয়া ছিল খাওয়ারিজমের রাজধানী। বুখারা ছিল খাওয়ারিজমের একটি প্রদেশ। খাওয়ারিজম রাষ্ট্রে মামুনী খান্দানের রাজত্ব ছিল। অনেক পূর্ব থেকেই খাওয়ারিজম ছিল মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র। ৯৯৫ খৃস্টাব্দে আবু আলী মামুন বিন মুহাম্মদ ইবন আলী খাওয়ারিজমে হামলা করে বাদশা আবু আব্দুল্লাহকে বন্দী করেন এবং গোটা খাওয়ারিজম রাষ্ট্রই দখল করেন নেন। দু'বছর নিজ কব্জায় রাখার পর ৯৯৭ সালে আবু আলী মামুন নিহত হন। কিন্তু হত্যাকারী আবু

আলী মামুনের খান্দানের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারেনি। পিতার নিহত হওয়ার পর আবু আলী মামুনের পুত্র আবুল হাসান আলী মামুন মসনদে আসীন হন। বারো বছর রাজত্ব করার পর ১০০৯ সালে অপরিণত বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর তিন বছর আগে সুলতান মাহমূদের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করতে তিনি সুলতানের ছোট বোনকে বিবাহ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সুলতানের বোন খাওয়ারিজম ত্যাগ করে সুলতানের কাছে চলে এসেছিলেন।

আবুল হাসান আলী মামুনের ইন্তেকালের পর তার ছোট ভাই আবুল আব্বাস মামুন ক্ষমতাসীন হন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর। আবুল আব্বাসের ছিল দুই স্ত্রী। খাওয়ারিজম রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আবুল হারেস বিন মুহাম্মদ। আবুল আব্বাসের পিতা আবু আলী মামুনের সময় থেকেই তিনি মন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন। এই বয়স্ক মন্ত্রীর গভীর হৃদ্যতা ছিলো মামুনী খান্দানের সাথে। আবুল হারেস ছিলেন সত্যিকারের একজন মুসলমান। মুসলমানদের প্রতি তার হৃদয়ে ছিলো অকৃত্রিম ভালোবাসা। বয়সে প্রবীণ ও ঋজু এই লোকটির কোলে-পিঠেই বড় হয়েছিলেন মামুনের দুই ছেলে। তাই তিনি পিতার মতোই তাদেরকে কল্যাণজনক পরামর্শ দিতেন এবং যে কোন অকল্যাণ ও অপ্রীতিকর কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে বলতেন। খাওয়ারিজম রাষ্ট্রের বুখারা প্রদেশের গভর্নর আলাফতোগীন ছিলেন মধ্যবয়সী ও অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ চতুর একজন শাসক। এই লোকটিকে আলহারেস পছন্দ করতেন না। দৃশ্যত আলাফতোগীন খাওয়ারিজম রাষ্ট্রের এবং মামুনী খান্দানের আনুগত্য করলেও তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ছিলো সন্দেহজনক।

আবুল আব্বাস ক্ষমতাসীন হওয়ার পর একদিন নির্ভরযোগ্য বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ মন্ত্রী আলহারেসকে একান্তে ডেকে পাঠালেন। আবুল আব্বাস একান্তে আল হারেস এর সাথে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, প্রজাদের অবস্থা তথা প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করছিলেন। মতবিনিময়ের এক পর্যায়ে আলহারেসের উদ্দেশে আবুল আব্বাস বললেন—

"আমার পিতা নিহত হয়েছেন, বড় ভাইও মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি খুবই একাকীত্ব অনুভব করছি। এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় মনের মধ্যে একটি গোপন কথা কাঁটার মতো কষ্ট দিচ্ছে। আপনি কি এই রহস্যের কিনারা করতে পারবেন?"

"যে সব রহস্যের জাল এই বুড়োর চোখ ভেদ করতে পারবে, এমনটি আর কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। মামুনী খান্দানের অতীত-বর্তমান কোনকিছুই আমার কাছে গোপন নয়। তোমার মনের মধ্যে যদি কোন গোপন কাঁটা বিদ্ধ হয়ে থাকে, তা আমাকে দেখাও, হয়তো আমি সেটিকে অপসারণ করতে পারবো।" বললেন বয়োজ্যেষ্ঠ মন্ত্রী আল হারেস।

"আপনি তো জানেন, ভাইয়ের মৃত্যুর পর বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন এখানে এসেছিলেন। তিনি তখন আমাকে একান্তে বলেছিলেন, আপনার বড় ভাইয়ের মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আপনাকে খাওয়ারিজমের নতুন বাদশা হিসেবে মোবারকবাদ দিচ্ছি। সেই সাথে আজ আপনার কাছে একটি গোপন রহস্য উন্মোচন করে দেয়া কর্তব্য মনে করছি। আপনি জানেন, আপনার পিতাকে হত্যা করা হয়েছিলো। হত্যাকারীদেরও আপনি জানেন। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না, আপনার ভাইও কিন্তু হত্যার শিকার হয়েছেন। তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি।

এ খবর শুনে আমি খুব একটা পেরেশান হইনি। কারণ, আমাদের শত্রুদের আমি জানি। কিন্তু আলাফতোগীন আমাকে বললেন, "ভাইকে এমন এক ধরনের বিষ খাওয়ানো হয়েছিল, যার প্রতিক্রিয়া ছিলো পেটের পীড়ার মতো। ধীরে ধীরে তার শরীরে এই বিষক্রিয়া চলতে থাকে; কিন্তু ডাক্তারের পক্ষে পেটের পীড়া ছাড়া ওই বিষক্রিয়াকে সনাক্ত করা সম্ভব ছিলো না।"

"এমনটি অসম্ভব কিছু নয়। শত্রুরা অনেক কিছুই তো করতে পারে।" বললেন উজীর আবুল হারেস। আপনাদের শত্রুরা আপনাদের সামরিক শক্তিমত্তার ভয়ে ভীত। তাই তারা এ ধরনের চক্রান্তের আশ্রয় নিতেই পারে।"

কিন্তু ব্যাপারটি শুধু এতেই শেষ নয় সম্মানিত উজীর। বললেন নতুন শাসক আবুল আব্বাস। আলাফতোগীন আমাকে সংশয়হীনভাবে বলেছেন, ভাইকে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন সুলতান মাহমূদ। আর সেই বিষ খাইয়েছে সুলতানের বোন এবং আমার ভাবী স্বয়ং। এই বিষ প্রয়োগের কারণ হিসেবে বলেছেন, সুলতান মাহমূদ ভাইকে তার অধীনতা মেনে নিতে বলেছিলেন; কিন্তু ভাই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এখন আমি কি আলাফতোগীনের কথা বিশ্বাস করবো?"

"না, তুমি বিশ্বাস করবে না।" বললেন বয়স্ক আলহারেস। আলাফতোগীনের কথা বলেই আমি এটিকে ঠিক মনে করি না। এ ছাড়াও আমি এটিকে সত্য মনে করি না এজন্য যে, সুলতান মাহমূদ রক্তে-মাংসে একজন মর্দে মুজাহিদ। তাঁকে বিষ প্রয়োগ করার কথা বিশ্বাস করা যায়; কিন্তু তিনি কাউকে বিষ প্রয়োগ করাবেন এটা বিশ্বাস করা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁকে চিনি। তিনি যদি রাজত্ব এবং রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধিতে আগ্রহী হতেন, তাহলে বেঁচে থাকার সর্বময় চেষ্টা থাকতো তাঁর সব কাজে। কিন্তু তাঁর কাজকর্ম দেখলে তুমিও বলবে, দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে রাজত্ব করা তাঁর শখ নয়। তুমি তো জানো, কতোবার তিনি গযনী থেকে কতো দূরে হিন্দুস্তানে গিয়ে যুদ্ধ করেছেন। এখনও তিনি গযনী থেকে শত শত মাইল দূরে হিন্দুস্তানের সবচেয়ে দুর্গম এলাকায় যুদ্ধ করতে গেছেন। তিনি ইসলামের সৈনিক, ইসলামের প্রচার-প্রসারে লিপ্ত একজন ধর্মপ্রচারক। তিনি একজন সফল মূর্তি ধ্বংসকারী।"

"নতুন বাদশা আবুল আব্বাস আর বয়োজ্যেষ্ঠ উজির যখন পরস্পর এসব কথাবার্তা বলছিলেন, সুলতান মাহমূদ তখন দক্ষিণ কাশ্মীরের লোহাকোট দুর্গ অবরোধ করে বৈরী মওসুম ও দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীরের ফাঁদে আটকে গেছেন। তীব্র তুষারপাতে চাপা পড়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে তার সহযোদ্ধারা।

তুমি তো দেখতে পাচ্ছো, কতোবার স্বেচ্ছায় মৃত্যুফাঁদে পা দিয়েছেন সুলতান। বললেন হারেস। হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজাদের সামরিকশক্তি কোন মামুলী ব্যাপার নয়। হিন্দুস্তানের রাজশক্তির বিরুদ্ধে বর্তমান মুসলিম জগতের মধ্যে শুধু সুলতান মাহমূদই টক্কর দিতে পারেন এবং তিনি তা দিচ্ছেনও। এ ধরনের লড়াকু যোদ্ধারা কখনো কাউকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন না।"

"আমি নিহত হতে চাই না।" বললেন আবুল আব্বাস। যে আমাকে জীবিত রাখতে চাইবে এবং নিজেও জীবিত থাকতে চায়, আমি তাকে মিত্র বানাতে চাই। আপনি আমাকে পরামর্শ দিন, আমি কি তুর্কিস্তানের খানদেরকে মিত্র বানাবো, না সুলতান মাহমূদকে মিত্র বানাবো?

সুলতান মাহমূদকেই আমার সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী মনে হয়। সুলতান মাহমূদ সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস যা-ই থাকুক না কেন, যেভাবে তিনি শক্তির

জোরে শত্রুদের পদানত করে তাদের এলাকা গযনী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেছে, একদিন হয়তো আমাকেও বলে বসতে পারে আমার আনুগত্য স্বীকার করে নাও। তাছাড়া আমার চতুর্পার্শ্বের শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আমার দরকার একজন শক্তিশালী মিত্র।"

সেই শক্তি ও মিত্রের দাবী পূরণ করার ক্ষমতা একমাত্র সুলতান মাহমূদেরই রয়েছে।" বললেন উজীর আল হারেস।

"আমার মনের কথাগুলো আজ আপনার কাছে বলতে চাই সম্মানিত উজীর।" বললেন আবুল আব্বাস। শুধু কথা আর অঙ্গীকারের দ্বারা বন্ধুত্বের সম্পর্ক ততোটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আমার মনে মিত্রতা দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী করার একটা চমৎকার কৌশল এসেছে। আমি সুলতান মাহমূদের বিধবা বোনকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবো। সে আমার বড় ভাইয়ের বিধবা। তাকে তখনই আমার খুব ভালো লাগতো। বয়সে সে হয়তো আমার চেয়ে এক অর্ধ বছরের বড় হবে; কিন্তু সুলতান মাহমূদ কি আমার সাথে তাঁর বোনের বিয়ের ব্যাপারে রাজী হবেন?"

"স্মিত হেসে আবুল হারেস বললেন, "এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারবো না। তবে আপনি কি এই ঝুঁকির ব্যাপারটি ভাবেন না? আপনার ভাইকে যদি সে বিষ দিতে পারে, তবে আপনাকেও সে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে পারে।"

"না, নাহিদা আমাকে বিষ দিতে পারে না।" আকাশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে স্বগতোক্তির মতো করে বললেন আবুল আব্বাস। না, লাবণী আমাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে পারবে না। কিছুটা উচ্চৈঃস্বরেই উচ্চারণ করলেন আব্বাস। আবুল হারেসের দিকে তাকিয়ে বললেন, লাবণী জানতো আমি তাকে কতোটা ভালোবাসি। আমি ছিলাম তার স্বামীর ছোট ভাই, দেবর।

সে আমাকে খুবই ভালোবাসতো। আদর করে আমাকে শাহজাদা ডাকতো।... সত্য কথা বলতে কি, ভাইয়ের মৃত্যুর পর আমার মনে হয়েছে, আমি ভাইয়ের শূন্যতাকে সহ্য করতে পেরেছি; কিন্তু লাবণীর চলে যাওয়াকে সহ্য করতে পারছি না।"

"আপনি কি নাহিদার ভালোবাসার টানে তাকে বিয়ে করতে চান, নাকি সুলতানের সাথে বন্ধুত্ব ও মিত্রতা মজবুত করার জন্য?"

"উভয়টিই আমার লক্ষ্য।" উজিরের জিজ্ঞাসার জবাবে বললেন আবুল আব্বাস। তবে নাহিদার প্রতি আমার ভালোবাস হয়তো প্রাধান্য পাবে। আসল কথা হলো, নাহিদাও আমাকে ভালবাসতো। কিন্তু তার ও আমার এই ভালোবাসার মধ্যে কোন কদর্যতা ছিলো না। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিলো অনেকটা ভাই-বোনের মতো অথবা গুণবতী ভাবী আর স্নেহশীল দেবরের মধ্যে যেমনটি হয়ে থাকে।

অবশ্য এখন অবস্থা অনেকটাই বদলে গেছে। তখন নাহিদার সাথে আমার এতোটাই গভীর হৃদ্যতা ছিলো যে, আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী আলনূরী এ ব্যাপারে আমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট ছিল। আল নূরীর পিতা আবু ইসহাককে আপনি জানেন। তিনি আমাদের সেনাবাহিনীর একজন শীর্ষ কমান্ডার এবং সেনাপতি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আল নূরী নাকি তার কাছে আমার ব্যাপারে নালিশ করেছে। আমি শ্বশুর সাহেবকে বলেছি, আলনূরী আমাকে ও আমার ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে নিয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করেছে। ভবিষ্যতে যেন সে আর এমন দুঃসাহস না করে। আমার এই কথা বলার পর তার চেহারার যে অবস্থা আমি দেখলাম, তা মোটেও ভালো মনে হলো না।"

"সুলতান মাহমূদকে হিন্দুস্তান থেকে ফিরে আসতে দাও। তোমার এই প্রস্তাবে যেমন তোমার প্রেম-ভালোবাসা রয়েছে, তদ্রূপ এতে কৌশলী রাজনীতিও রয়েছে। এ ব্যাপারে তুমি আরো চিন্তা করো, আমিও ব্যাপারটি নিয়ে আরো ভাবি। বললেন উজির।

আবুল আব্বাস আর তার প্রধান উজির আবুল হারেস যখন সুলতান মাহমূদের সাথে মৈত্রী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন নিয়ে মতবিনিময় করছিলেন, সুলতান মাহমূদ তখন কাশ্মীরের বৈরী পরিবেশে ব্যর্থতার গ্লানিতে বিপর্যস্ত হচ্ছিলেন। তার অজেয় বাহিনীর সৈন্যরা ঝিলম নদীর শীতল পানিতে ভেসে যাচ্ছিল আর তুষারপাতে বরফের নিচে তলিয়ে যাচ্ছিল।

এ ঘটনার প্রায় ছয় মাস পর উজির আবুল হারেস একদিন বাদশা আবুল আব্বাসকে একান্তে বললেন, গযনী থেকে বিস্ময়কর খবর এসেছে! সুলতান মাহমূদ কাশ্মীর থেকে এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে এসেছেন যে, তার সাথে এক-দশমাংশ সৈন্যও ফিরে আসেনি। যারা ফিরে এসেছে এদের অধিকাংশই মারাত্মকভাবে আহত। এবারের ফিরে আসায় মাহমূদের সাথে

হিন্দুস্তানের সোনা দানা বোঝাই জঙ্গী হাতি যেমন ছিলো না, কোন হিন্দু বন্দীও ছিলো না। তাঁর গোটা সামরিক শক্তিই সেখানে ধ্বংস হয়ে গেছে।”

“এরপরও আমি তাঁর বোনকে বিয়ে করতে চাই।” বললেন আবুল আব্বাস। আপনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আপনার মতো অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু আপনি মনে হয় আমার কথা সমর্থন করবেন। আমি যদি দুঃসময়ে সুলতান মাহমূদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াই, সে নিশ্চয়ই আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ও হিতাকাঙ্ক্ষী থাকবে। কখনো যদি আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তখন সে নিশ্চয়ই আমাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে।

আপনি বলুন তার কাছে আমার প্রস্তাব পাঠানোর উপযুক্ত সময় কোনটি হতে পারে? আমাকে কি নিজে যেতে হবে?”

“এখনই উপযুক্ত সময়।” বললেন, আবুল হারেস। তার এই শোচনীয় পরাজয়ে সহমর্মিতা জানানো দরকার। তা ছাড়া কূটনৈতিক রীতি রক্ষায় এটাও বলা যেতে পারে যে, আমরা তার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এ ক্ষেত্রে তোমার যাওয়া জরুরী নয়। আমিই যাবো এবং বিয়ের প্রস্তাবও তাকে দিয়ে আসবো।

কয়েক দিন পর খাওয়ারিজমের প্রবীণ উজীর আবুল হারেস দু'জন দূত এবং কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীসহ কয়েকটি উপঢৌকন বোঝাই উট নিয়ে গযনী পৌঁছলেন। সুলতান মাহমূদের কাছে খবর গেলো, খাওয়ারিজমের বাদশা আবুল আব্বাসের উজির সুলতানের সাথে দেখা করতে এসেছেন। খবর শুনে তাৎক্ষণিকভাবেই উজিরকে সুলতানের কাছে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়া হলো।

খাওয়ারিজমের বাদশা শাহ্ আবুল আব্বাস মামুন সুলতানে আলী মাকাম এর খেদমতে কিছু উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। সেই সাথে কাশ্মীর অভিযানে আপনার অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি ও পরাজয়ের জন্যে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। শাহে খাওয়ারিজম আরো বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা সুলতানকে এতোগুলো বিস্ময়কর বিজয়ে পর একটি মাত্র ব্যর্থতা দিয়েছেন, এটিও ধারাবাহিক সাফল্যেরই অংশ। আল্লাহ্ তাআলা গযনী সুলতানকে যে মনোবল ও সাহস দিয়েছেন, আশা করি পরাজয় তাকে কাবু করতে পারবে না। শাহ্ বলেছেন, আমি প্রয়োজনে যে কোন ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত। কেননা, বিপদেই তো ভাই ভাইয়ের কাজে লাগে।”

আমাদের এখানকার রীতি ও শিষ্টাচার এটাকে সমর্থন করে না যে, একজন মুসলমান বাদশাহর সম্মানিত উজির সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবে। আপনি আমার পাশের আসনে বসুন।" আবুল আব্বাসকে সম্মানের সাথে কথাগুলো বললেন সুলতান।

সুলতানের আবদারে প্রবীণ কূটনীতিক ও মন্ত্রী আবুল হারেস আসনে বসলেন। অতঃপর সুলতান মাহমূদ বললেন, "আমি খাওয়ারিজম বাদশাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমি যখন আমার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আমার এই দুঃসময়ের সুযোগে স্বার্থসিদ্ধির আশঙ্কা করছি, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর হাত বাড়িয়েছেন। তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবেন, নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য বন্ধুর আমার খুব প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে আমি সাহায্য-সহযোগিতা চাই না।"

খাওয়ারিজমের অভ্যন্তরীণ অবস্থার ব্যাপারে আমারও প্রবল আগ্রহ আছে। আবুল আব্বাস একেবারেই তরুণ। সাগর উপকূলে বুখারায় কী ঘটছে, এসব ব্যাপার কি সে বোঝে? সে কি জানে গভর্নর আলাফতোগীনের দৃষ্টিভঙ্গী কী?"

"সে না জানলেও এসব ব্যাপার আমার অজানা নয় সুলতান।" বললেন, উজীর আবুল হারেস। গভর্নর আলফতোগীনের কর্মকাণ্ড আমার কাছেও সন্দেহজনক মনে হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রতি আমাদের আস্থা আছে।

আমি যতোটুকু জানি, তাতে বলতে পারি, সেনাদের উপর আপনাদের বেশী আস্থা রাখা মোটেও ঠিক নয়। বললেন সুলতান। সেনাবাহিনীতে সাধারণ সৈনিকদের নীতি নির্ধারণে কোন ভূমিকা থাকে না। মূলত সেনাপতি ও ডেপুটি সেনাপতিরাই সেনাবাহিনীর মূলশক্তি। তারাই নীতি নির্ধারণ করে, সাধারণ সৈনিকরা হয় তাদের ঘুটি। এদেরকে ব্যবহার করা হয় মাত্র। অনেক সময় সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে শাসক হওয়ার নেশা চাপে আর তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বলির পাঠায় পরিণত হয় সাধারণ সৈনিকরা। দুর্নামটাও এসে পড়ে সাধারণ সৈনিকদের উপর। জনসাধারণের যতো ক্ষোভ-নিন্দা সব পড়ে সাধারণ সৈনিকদের উপর। শাস্তিও পেতে হয় তাদেরই। কর্মকর্তারা থাকে পর্দার আড়ালে, জনতার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আপনাকে সেনাকর্মকর্তাদের প্রতি কড়া নজর রাখতে হবে।"

নানা বিষয় নিয়ে দীর্ঘ সময় উজীর ও সুলতান মতবিনিময় করছিলেন। উজীর আবুল হারেস ছিলেন অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী লোক। তিনি কথায় কথায় বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে ফেললেন।

"সম্মানিত সুলতান! আবুল আব্বাস আপনাকে সহযোগিতার প্রস্তাব করেছেন ঠিকই; কিন্তু সত্যিকার অর্থে তিনিই আপনার সাহায্য প্রত্যাশী। অবশ্য এখনই তার কোন সাহায্যের প্রয়োজনই নেই। তিনি আপনার সাথে দৃঢ় মৈত্রী গড়ে তুলতে আগ্রহী। তিনি এমন একজন শাসকের সাথে মৈত্রী গড়ে তুলতে চান, যে তাকে কখনো ধোঁকা দেবে না। আর এমন ব্যক্তি আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। স্থায়ী ও অটুট মৈত্রী বন্ধনের জন্য তিনি আপনার বোন, তার মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করতে চান। সুলতান যেন তার এই আবেদন গ্রহণ করেন একান্তভাবে তিনি তা কামনা করেন।"

"বিয়ের ফয়সালা আমার বোন নিজে করবেন। বললেন সুলতান। প্রশাসনিক স্বার্থ রক্ষার জন্য আমি বোনকে ব্যবহার করতে মোটেও রাজি নই। আমি তাকে পরামর্শ দিতে পারি, খাওয়ারিজম ও গযনীর সম্পর্কের গুরুত্ব বোঝাতে পারি; কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত তার উপর চাপিয়ে দিতে পারি না। কারণ, বিয়ের বিষয়টি একান্তই তার মনের ব্যাপার। আপনাকে এর জবাব পেতে হলে কিছুদিন সময় দিতে হবে।"

"খাওয়ারিজমের মসনদে আসীন হওয়ার আগ পর্যন্ত আবুল আব্বাসকে একজন সুন্দর মনের মানুষ হিসেবেই আমি জানতাম।" সুলতানকে বললো তার বিধবা বোন। "তখন সে ছিল নিতান্তই বালক। এখন সে যুবক। সেই সাথে মসনদে আসীন বাদশা। এ পর্যায়ে তাকে পর্যবেক্ষণ বা তার সম্পর্কে কিছু বলা মুশকিল। নিশ্চয়ই এখন তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে।"

"তার এই পয়গামের জবাব তুমি দেবে। আমি তার প্রতিনিধিকে জানিয়ে দিয়েছি, আমি বোনের উপর এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবো না।"

"সে কথা হয়তো ঠিকই আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে আপনার পরামর্শ আমার দরকার আছে। আপনি যদি মনে করেন, খাওয়ারিজমের বাদশাকে আমি বিয়ে করলে গযনীর কোন উপকার হবে, তাহলে তাকে আমি বিয়ে করতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করবো না। কোন বাদশাকে বিয়ে করে তার প্রাসাদের রওনক বাড়ানোর আগ্রহ আমার নেই।

তদ্রূপ কোন শাহের বউ হয়ে সম্রাজ্ঞী সাজার অভিলাষও আমার হয় না। যে ভাইয়ের প্রতিটি দিবানিশি কাটে অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে জিহাদরত অবস্থায়, তার বোন কোন শাহের রাজপ্রাসাদে রাজরাণী হয়ে বিলাস-ব্যসনে বিভোর হতে পারে না। আমাকে আপনি পরিষ্কার করে বলুন, খাওয়ারিজম শাহের তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে তার সাথে আমার বিয়ে হলে এখানকার মুসলিম ও গযনী সালতানাতের কোন কল্যাণ হবে কি? যদি তা হয়, তবে যে কোন দিন আমি আবুল আব্বাসকে বিয়ে করতে সম্মত আছি।"

"খাওয়ারিজমের সৈন্যদেরকে জিহাদে ব্যবহার করার সুযোগ আছে।" বললেন সুলতান মাহমূদ। ছোট ছোট মুসলিম রাজ্যের শাসক এবং মুসলিম রাজা-বাদশাহরা পরস্পর বিরোধে লিপ্ত। কোন শক্তিশালী প্রতিপক্ষের আক্রমণ আশঙ্কা ঘনীভূত হলেই কেবল মুসলিম বাদশাহরা কয়েকজন মিলে মৈত্রী গড়ে তোলে। ইসলামের স্বার্থে এরা কখনো কোন জোট বা মৈত্রী গড়তে আগ্রহী নয়।

মুসলিম শাসকরা পরস্পর বিরোধে লিপ্ত। এই সংঘর্ষ আর বিরোধকে অতি সংগোপনে ইন্ধন জোগাচ্ছে ইহুদী-নাসারা গোষ্ঠী। আমি পরস্পর বিচ্ছিন্ন মুসলিম শাসকদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই। খাওয়ারিজম একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। কিন্তু আমি খবর পাচ্ছি, খাওয়ারিজমের ভেতরে ভেতরে চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। মনে হয় আবুল আব্বাস এ ব্যাপারে মোটেও অবগত নয়। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন আবুল আব্বাসকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারে। এমনও হতে পারে, আমি যখন আমার সৈন্যঘাটতি পূরণে ব্যস্ত, এই সুযোগে খাওয়ারিজমের সৈন্যরা গযনী আক্রমণ করে বসবে। আমি যে কোন অবস্থায় ওদের প্রতিরোধ করতে পারবো; কিন্তু আমার সৈন্য সংখ্যা নিতান্তই কম। তা ছাড়া এটা তো হবে স্রেফ গৃহযুদ্ধ। দু'টি মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধে ইসলামের শক্তি ক্ষয় হবে আর এই সুবিধা নেবে অমুসলিমরা। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এখন গযনীর সাথে যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধে সবচেয়ে উপকৃত হবে হিন্দুস্তানের পৌত্তলিক শাসকরা।"

"আপনি যদি মনে করেন, আবুল আব্বাসের স্ত্রী হয়ে আমি তাকে আলাফতোগীনের কুমন্ত্রণা ও চক্রান্ত থেকে রক্ষা করতে পারবো, তাহলে এই বিয়েতে আমার কোন আপত্তি নেই।" বললো নাহিদ।

"এটি তুমিই ভালো বলতে পারবে। আচ্ছা, তুমি যখন তার ভাইয়ের স্ত্রী ছিলে, তখন তার উপর তোমার কেমন প্রভাব ছিলো? তখন কি তার সাথে তোমার কোন জানাশোনা ছিলো?" বললেন সুলতান।

"তখন ছিলো আমার একনিষ্ঠ ভক্ত।" বললো নাহিদ।

ওকে আমি খুবই আদর করতাম। সে আমার স্নেহ-মমতার জন্যে উদগ্রীব ছিলো। কারণ, অনেক আগেই তার মাতৃবিয়োগ ঘটে। এরপর তার পিতা নিহত হন। ছোট্ট আবুল আব্বাসকে মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের শূন্যতা অনুভব করতে দিইনি আমি। সে বেশির ভাগ সময় আমার কাছেই থাকতো। শাহজাদা ছিলো সে। কিন্তু শাহজাদা হলেও মানবিক মায়ামমতার ঘাটতি শান-শওকত দিয়ে পূরণ হয় না। সে আমাকে মা ও বড় বোনের মতোই শ্রদ্ধা করতো। প্রথমে সে বিয়ে করলো। কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার অপর এক স্ত্রীকে ঘরে তুললো। কিন্তু তবুও মনের প্রশান্তির জন্য প্রাণ খুলে দুঃখ-সুখের কথা বলতে সে আমার কাছেই ছুটে আসতো। কিন্তু তার ভাইয়ের ইন্তেকালের চার মাস পর যখন আমি তাদের প্রাসাদ ছেড়ে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, ভাইজান, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, পরিণত একটি যুবক হয়েও সে তখন শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদছিলো। তার ভাইয়ের মৃত্যুতেও সে এতোটা কান্নাকাটি করেনি।"

"তাহলে তুমি তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজের কজায় নিয়ে আসতে পারবে। তার হৃদয়ে শুধু গযনী সালতানাতের নয়– ইসলামের মমতা তৈরী করতে হবে। আমার সালতানাতকে ঝুঁকিমুক্ত করার চেয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে গজিয়ে ওঠা হিংস্র শয়তানগুলোকে কাবু করাই আমার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।"

"তার মন-দেমাগ যদি বাদশাহীর তখ্‌তে বসে বিগড়ে না গিয়ে থাকে, তাহলে আশা করি, আমি তাকে পথে আনতে পারবো। বললো নাহিদ। আপনার সদিচ্ছা পূরণে এবং ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমি আমার আবেগ-অনুভূতি কুরবানী দিতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করবো না। আমি খাওয়ারিজমের সেনাবাহিনীর দৃষ্টি কাফেরদের প্রতি ঘুরিয়ে দেবো। আমি আপনার সাথে রণাঙ্গনে জিহাদে যেতে পারবো না বটে; কিন্তু আপনার জিহাদে শক্তিবৃদ্ধিতে জীবন তো দিতে পারবো।"

“নাহিদের কথাবার্তা শুনে সেদিনই প্রচুর উপহার-উপঢৌকন দিয়ে সুলতান মাহমূদ আবুল আব্বাস মামুনের কাছে পয়গাম পাঠালেন, পূর্ব প্রস্তাব ঠিক থাকলে সে সুলতানের ছোট বোন নাহিদের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

এক মাসের মধ্যে আবুল আব্বাস ও নাহিদের বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু এ বিয়ে তো বিয়ে নয়, এই বিয়ে সুলতানের জন্য ভয়াবহ এক টর্নেডোতে রূপান্তরিত হলো, যে টর্নেডো গোটা মুসলিম বিশ্বকেই নাড়িয়ে দিল। শুধু ডাঙায় নয়– সুলতান মাহমূদকে এর মূল্য দিতে সমুদ্রেও যুদ্ধ করতে হলো। উভয় পক্ষের হাজারো নৌকা জলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো। ভয়াবহ এই যুদ্ধে আগে চালানো হলো অতিসূক্ষ্ম চক্রান্তের খেলা। যে কূটনৈতিক চক্রান্তের ঘুটি উভয়পক্ষই চেলে ছিল বিয়ের আসরে।

বিয়ে হয়ে গেল। অনেকটা সাদামাটাভাবেই সুলতান তার আদরের ছোট বোন নাহিদকে খাওয়ারিজমের তরুণ বাদশা আবুল আব্বাসের বন্ধনে তুলে দিলেন। আবুল আব্বাস খুশী মনে নতুন বউ নিয়ে বাড়ীতে ফিরে বিশাল আকারে ওলীমার আয়োজন করলেন।

খাওয়ারিজ শাহের এই তৃতীয় বিয়েতে রাজধানী জুরজানিয়াকে এমন আলোকসজ্জায় সাজানো হলো যে, রাতের রাজধানীও দিনের মতোই আলো ঝলমলে রূপ পরিগ্রহ করলো। প্রতিবেশী সব মুসলিম শাসকদের দাওয়াত করা হলো। হাজার হাজার মেহমানের পদভারে স্পন্দিত রাজধানী।

সুলতান মাহমূদের পক্ষ থেকে সুলতানের পরিবর্তে তাঁর সেনাবাহিনীর দুই প্রবীণ সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ এবং সেনাপতি আলতানতাশ প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তাদের সাথে ছিলো আরো কয়েকশত সৈনিক। এদের ছাড়াও ছিলেন গোয়েন্দা প্রধান ও নাশকতা প্রতিরোধ ইউনিটের চিফ কমান্ডার।

বিশাল এই আয়োজনে খাওয়ারিজ রাষ্ট্রের অন্যতম প্রদেশ বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন হাজির হলেন বিশেষ জাঁকজমক নিয়ে। আবুল আব্বাসের সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অফিসার ও সেনাপতিরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত। বুখারা অঞ্চলের সেনাপতি খমরতাশ আর সেনাবাহিনীর অন্যতম প্রভাবশালী সেনাপতি আবুল আব্বাসের দ্বিতীয় শ্বশুর সেনাপতি আবু ইসহাক গর্বিত ভাবভঙ্গি নিয়ে অনুষ্ঠানে সমাসীন। ঘটনাক্রমে খাওয়ারিজমের এই তিন

মহারথি পাশাপাশি আসনে উপবিষ্ট এবং প্রত্যেকের চেহারাতেই আনন্দ-উচ্ছ্বাসের বদলে চাপা উত্তেজনা ও ক্ষোভ পরিস্ফুট। দৃশ্যত তারা সবাই সুলতান মাহমূদের দুই প্রতিনিধির সাথে হাসিমুখেই হাত মেলালেন; কিন্তু কুশল বিনিময়ের পরই তারা সুলতানের প্রতিনিধিদের থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে আসন নিলেন। তাদের পাশেই গ্রাম্য বেশে আগে থেকেই বসা ছিলেন সুলতান মাহমূদের বিশেষ ইউনিটের দুই দক্ষ পরিচালক। এদেরকে বিশেষ দিক-নির্দেশনা ও দায়িত্ব দিয়ে বিশেষ উদ্দেশ্যে বিয়ে অনুষ্ঠানে পাঠিয়েছিলেন সুলতান মাহমূদ।

"তোমরা মনে করো না, আমার বোনকে বিয়ে করে আবুল আব্বাস আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে গেছে।" বললেন সুলতান মাহমূদ। হতে পারে আবুল আব্বাস আমার সাথে সত্যিকার অর্থেই সুসম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী; কিন্তু তোমরাই তো খবর দিয়েছো, ওখানকার প্রশাসনও সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে অগ্নুৎপাতের জন্য লাভা তৈরী হচ্ছে। চক্রান্ত ও প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের কানাঘুষা চলছে। সেখানে গিয়ে তোমরা নিজেদেরকে আলতানতাশ ও আলতাঈ এর সফরসঙ্গী হিসেবে পরিচয় দেবে না, বরং তোমরা থাকবে সাধারণ বেশে। পরিচয় দেবে সমরকন্দের ব্যবসায়ী হিসেবে। সেখানে বহু লোকের সমাগম হবে, খেলতামাশা, আতশবাজী হবে। এসব খেলতামাশার প্রতি তোমরা মনোযোগী হবে না। তোমাদের দৃষ্টি থাকবে পর্দার অন্তরালে অতি সংগোপনে যে চক্রান্তের খেলা শুরু হয়েছে, সেদিকে। তিনজন লোকের পেছনে তোমরা ছায়ার মতো লেগে থাকবে। তাদের কথা সরাসরি শুনতে না পারলেও তাদের চালচলন, ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে চেষ্টা করবে তারা আসলে কী করতে চাচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

তিনজনের মধ্যে একজন হলো, বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন, দ্বিতীয়জন আবুল আব্বাসের দ্বিতীয় শ্বশুর সেনাপতি আবু ইসহাক, তৃতীয়জন বুখারা অঞ্চলের সেনাপতি খমরতাশ।

এই দুজনকে এর চেয়ে বেশী সতর্ক ও জ্ঞান দেয়ার কোনই প্রয়োজন ছিলো না। কারণ এরা উভয়েই দুটি গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা শাখার প্রধান। তারাই খাওয়ারিজমের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কথা তাদের গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। এই দুই ব্যক্তি যখন জুরজানিয়ার

বিয়ে অনুষ্ঠানে হাজির হলেন, তাদের দেখে কারো বোঝার উপায় ছিলো না, এরা সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা শাখার প্রধান এবং মাটির নিচের ঘটনাবলীও এরা দিব্যচোখে দেখতে পারে। তারা একনজর তাকালেই যে কারো ভেতরের মনোভাবও বুঝতে পারে। তারা উভয়েই ব্যবসায়ীদের মতো ঢিলেঢালা পোশাকে সজ্জিত ছিলো।

উভয়েই আলাফতোগীন, খমরতাশ ও আবু ইসহাকের পিছনের সারিতে গিয়ে বসলেন। রাতের প্রজ্জ্বলিত মশালের আলোয় ঘোড়দৌড় শুরু হবে হবে অবস্থা। বিশাল মাঠের চতুর্দিকে শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। এক পাশে বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে বাদশা, নতুন রাণী এবং রাষ্ট্রীয় অতিথিদের আসন। তরবারী প্রতিযোগিতা, মল্লযুদ্ধ ছাড়া নানা ধরনের সামরিক কলা-কৌশল প্রদর্শনীর আয়োজন সম্পন্ন।

হঠাৎ তীব্র ও উচ্চ রণসঙ্গীত বাজিয়ে জানানো হলো নব বরবেশী বাদশা আবুল আব্বাস ও নতুন রাণীবেশী নাহিদার আগমনীবার্তা। আবুল আব্বাস নববধূ নাহিদাকে নিয়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন। নাহিদা দীর্ঘাঙ্গি, সুন্দরী যুবতী। তার প্রতিটি পদক্ষেপে রাজকীয় গাম্ভীর্যতা ও অবয়বে দীপ্তিময় আভা। যুবক বাদশা আবুল আব্বাসও অপূর্বসাজে সজ্জিত।

দৃঢ় পদক্ষেপে নাহিদাকে নিয়ে তিনি রাজকীয় আসনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। সেনাবাহিনীর বাদক দল আকাশ-বাতাস মুখরিত করে আগুন ঝরানো বাজনা দিচ্ছে। চতুর্দিকে লাখো জনতার কণ্ঠে হর্ষধ্বনি। মহামান্য বাদশা আবুল আব্বাস দীর্ঘজীবী হোক, সুখময় হোক তাদের নতুন দাম্পত্য, দীর্ঘতর হোক মামুনী শাসন। আবুল আব্বাস ও নাহিদার পিছনে পিছনে আবুল আব্বাসের প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীও রাণীর পোশাকে সজ্জিত হয়ে আসছিলো। তবে তাদের চেহারায় তেমন কোন জৌলুস ছিলো না, ছিলো না কোন আনন্দ-ফুর্তি আবেগ ও উচ্ছ্বাসের চিহ্ন।

সুলতান মাহমূদ তাঁর বোনের বিনিময়ে শুধু খাওয়ারিজম শাহকে নয়– গোটা খাওয়ারিজম সালতানাতকেই খরিদ করতে চাচ্ছে। বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বললো আবুল আব্বাসের দ্বিতীয় শ্বশুর এবং সেনাবাহিনীর অন্যতম সেনাপতি আবু ইসহাক।

আবু ইসহাকের এ কথায় পিছনের দিকে তাকালেন বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন। তাদের পেছনেই সুলতান মাহমূদের দুই শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তা ব্যবসায়ী বেশে বসে পরস্পর কথা বলছে।

"আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?" স্মিত হেসে পিছনের দুজনকে জিজ্ঞেস করলেন গভর্নর আলাফতোগীন।

উভয়েই স্মিতহাস্যে আলাফতোগীনের প্রত্যুত্তরে মাথা দোলালেন। তারা উভয়েই মাথা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিলেন আলাফতোগীনের ভাষা তারা বুঝতে পারছেন না। অথচ তাদের মাতৃভাষাই ছিলো ফারসী। আলাফতোগীন ফারসী ভাষাতেই তাদের পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। আলাফতোগীন, খমরতাশ ও আবু ইসহাক প্রত্যেকেই নানাভাবে তাদের পরিচয় জানার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু দুই গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিপুণতার সাথেই তাদের বোঝাতে সক্ষম হলেন, তাদের কোন কথাই তারা বুঝতে পারছেন না। এক পর্যায়ে তাদের একজন বললেন, 'ফিরকতাগ'। ফিরকতাগ জুরজানিয়া থেকে পূর্বদিকে অনেক দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ী এলাকার নাম। ওখানকার ভাষা ছিলো ভিন্ন।

"এরা আমাদের ভাষা বোঝে না"। দুসঙ্গীকে বললেন বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন। আমি ওদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। ঠিক আছে...। আবু ইসহাক! আপনি কি যেনো বলতে চাচ্ছিলেন?"

"বলছিলাম, এ বিয়ে শুধু আবুল আব্বাস আর নাহিদার মধ্যে হয়নি। এই সম্পর্কের মাধ্যমে গোটা খাওয়ারিজমকেই বোনের বিনিময়ে খরিদ করতে চাচ্ছে সুলতান মাহমূদ। এখান থেকে সুলতান মাহমূদ আর তার বোন আবুল আব্বাসকে আঙুলের ফাঁকে ঘোরাবে, আঙুলের ইশরায় নাচাবে। সে বুঝতেই পারবে না 'খাওয়ারিজমের উপর গযনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আপনি কি এমন ন্যাক্কারজনক অধীনতা মেনে নেবেন আলাফতোগীন?"

"আরে, সেই সময়টা আসতে দাও না"। বললেন আলাফতোগীন। খাওয়ারিজমের মাটিতে কোন গযনী সৈন্যের পা পড়লে ওদের চিহ্নও কেউ খুঁজে পাবে না।"

"আগে থেকেই এজন্য প্রস্তুতি নেয়া দরকার।" বললেন সেনাপতি খমরতাশ।

"সেনাবাহিনী আপনার নিয়ন্ত্রণে। সৈন্যদেরকে আপনি নিজের আয়ত্তে রাখুন।"

"দেখো, এসব কথা কি এখানে আলোচনা করা ঠিক হবে?" উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন সেনাপতি আবু ইসহাক।

"চিন্তার কারণ নেই। আমাদের সবচেয়ে কাছে বসা লোক দু'জন আমাদের ভাষা বোঝে না।" বললেন সেনাপতি খমরতাশ।

"ওরা আমাদের ভাষা না বুঝুক, ডানে-বামে কথা চলে যেতে পারে। সতর্কতার বিকল্প নেই।" বললেন আলাফতোগীন।

আচ্ছা আবু ইসহাক! আবুল আব্বাসের উপর আপনার মেয়ের কি কোন প্রভাব আছে?"

"আছে বৈকি। কিন্তু এখন কতটুকু থাকবে সেটাই চিন্তার বিষয়। মাহমূদের বোন নাহিদা খুবই চালাক। মনে হয় এখন আর আমার মেয়ে তার প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে না।

"তাদের পিছনে বসে সুলতান মাহমূদের দুই গোয়েন্দা কর্মকর্তা তাদের কথাবার্তা শুনছিলো। আলাফতোগীন ও তার সাথীরা যখনই তাদের দিকে তাকাতো, তখনই তারা উভয়কেই ময়দানের খেলা দেখায় মগ্ন দেখতে পেতো। তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে লাখো দর্শক জনতার হৈ চৈ আর উল্লাস ধ্বনিতে গোটা এলাকা সরগরম। এরই মধ্যে সুলতান মাহমূদের দুই গোয়েন্দা গভর্নর আলাফতোগীন ও তার সাথীদের কর্থাবার্তা শোনার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু তারা বেশীক্ষণ আর সেই বিষয়ে আলাপ করলো না। প্রসঙ্গ বদল করে অতি সাধারণ মজলিসী কথাবার্তা বলতে শুরু করলো। কিন্তু প্রাথমিক *কথাবার্তা শুনেই সুলতানের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বুঝতে পেরেছিলো এরা এই বিয়েতে মোটেই খুশী হতে পারেনি।* ভয়ঙ্কর কোন চক্রান্তের আয়োজনে তারা ব্যস্ত। অচিরেই তারা বাদশা আবুল আব্বাসের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেবে।

মাঝরাত পর্যন্ত চললো আবুল আব্বাসের বিবাহোত্তর জাকজমকপূর্ণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। মাঝরাতের পর অনুষ্ঠান শেষে সবাই যার যার মতো ঘরের পথ ধরলো। দূরের অতিথিরা তাদের জন্য নির্দিষ্ট অতিথিশালায় ঘুমোতে গেলো।

সবাই যার যার মতো শয়নকক্ষে চলে গেলেও বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন, প্রবীণ সেনাপতি আবু ইসহাক ও সেনাপতি খমরতাশ একই কক্ষে সমবেত হলেন। মধ্যরাতের পর হঠাৎ ভেতর থেকে তাদের কক্ষের দরজা খুলে একজন বোরকা পরিহিতা মহিলা প্রবেশ করলো। ঘরে প্রবেশ করেই মহিলা তার চেহারার নেকাব খুলে ফেললো। এই মহিলা আর কেউ নয়, আবুল আব্বাসের দ্বিতীয়া স্ত্রী সেনাপতি আবু ইসহাকের কন্যা আলজৌরী।

গতরাতের সব কথাই আমি জানতে পেরেছি। একটি আসনে বসতে বসতে বললো আলজৌরী। নাহিদার বাসর রাতের জন্য যে সেবিকাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো, তাকে আমি আগেই হাত করে নিয়েছিলাম। সে আমার কথামতো বাসর রাতে আবুল আব্বাস ও নাহিদার কথাবার্তা শোনার জন্য দরজার সাথে কান লাগিয়ে রেখেছিলো। সে রাতে তার দায়িত্ব ছিলো আবুল আব্বাসের দরজার পাশে থাকা। ফলে তাকে দরজায় কান লাগিয়ে বসে থাকতে দেখেও কারো কিছু বলার ছিলো না।

সেবিকা বুদ্ধি করে কক্ষের একটি জানালার একটি পাল্লা ঈষৎ খুলে রেখেছিলো। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবুল আব্বাস নিজেই সেবিকাকে ডেকে ভেতরে নিয়ে নেয়। সেবিকার উপস্থিতিতেই নাহিদা ও আবুল আব্বাসের কথাবার্তা চলতে থাকে। সেবিকার মুখে যা শুনলাম, তা আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি। নাহিদা আবুল আব্বাসের ঘরে শুধু বউ হয়েই আসেনি– সে একটি কঠিন উদ্দেশ্য এবং ফাঁদ হয়ে এসেছে।

আবুল আব্বাসও তাকে শুধু বউ মনে করে না। আবুল আব্বাসের কথাবার্তা থেকে অনুমিত হচ্ছে, সে নাহিদার প্রেমে অন্ধ এবং নাহিদাকেই সে মনে করে মনের সম্রাজ্ঞী।

সে যুগের রাজকীয় সংস্কৃতি এবং রাজ-রাজাদের একান্ত সেবিকাদের জন্য তাদের বাসর ঘরের একান্ত কথাবার্তা শোনার বিষয়টি বর্তমানের আলোকে উদ্ভট মনে হলেও সে যুগে তা মোটেও অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো না। সেবিকা আলজৌরীর টোপ গিলে আলজৌরীকে আবুল আব্বাস ও নাহিদার যেসব অন্তরঙ্গ কথাবার্তা পাচার করেছিলো, তা ছিলো অনেকটা এরকম–

আবুল আব্বাসের উদ্দেশে নাহিদা বললো, "আবুল আব্বাস! একজন তৃতীয় স্ত্রীর প্রয়োজনে যদি তুমি আমাকে বিয়ে করে থাকো, তাহলে খোলাখুলি

আমাকে সেই কথা বলে ফেলো। তোমার প্রেমকে হৃদয়ের মণিকোঠায় ধারণ করে আমি অনুতাপের কান্না কেঁদে নেবো।"

"না না নাহিদা! তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিলো। নয়তো স্ত্রী হিসেবে নারীর অভাব আমার ছিলো না। কেননা, তুমি আমার ভাইয়ের স্ত্রী থাকা অবস্থাতেও তো আমাকে প্রাণাধিক স্নেহ করতে।"

"তখন ঠিকই তোমাকে ভালোবাসতাম। তবে সেই স্নেহ-ভালোবাসা ছিলো ভিন্ন। মূর্তি সংহারী এক মুজাহিদের বোনের মধ্যে চারিত্রিক স্খলন থাকতে পারে না। স্বামীকে সে ধোঁকা দিতে পারে না। তখন তোমার চলাফেরা ও কথাবার্তা সবকিছুই আমার ভালো লাগতো। সেটি ছিলো একজন গুণমুগ্ধ ভাবীর দেবরের প্রতি পবিত্র মমত্ববোধ, যার মধ্যে কোন পঙ্কিলতা ছিলো না।"

"তাহলে আমি কি এটাই বুঝবো যে, আমাকে তোমার খুব ভালো লাগতো বলেই তুমি আমাকে বিয়ে করেছো?" নাহিদার উদ্দেশ্যে বললো আবুল আব্বাস।

"না, আমি শুধু এজন্য তোমার সাথে বিয়েতে রাজী হইনি। বললো নাহিদা। তোমার যেমন স্ত্রীর অভাব ছিলো না, বিয়ের প্রশ্নে আমারও পুরুষের ঘাটতি ছিলো না। গযনী সালাতানাতে শত শত বীর বাহাদুর সুশ্রী যুবক আমাকে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলো। তোমাকে বিয়ে করার মধ্যে আমার ভালোবাসা ছাড়া আরো উদ্দেশ্য আছে। আমি শুধু তোমার জন্য ভালোবাসাই নিয়ে আসিনি, এনেছি একটি পবিত্র পয়গাম। এ পয়গাম কোন জাগতিক পয়গাম নয় কিংবা আমার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কোন রাজকীয় বার্তাও নয়। এ পয়গাম আল্লাহর দেয়া পয়গাম।

আবুল আব্বাস! তুমি কি এ ব্যাপারে আমার সাথে একমত হবে না যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গযনীকে মূর্তি সংহারীদের শহর বলে জানবে? একথা কি তুমি অস্বীকার করতে পারবে যে, সালতানাতে গযনী প্রতিবেশী মুসলিম রাজন্যবর্গের জন্য কাঁটা হয়ে বিরাজ করছে? তারা সবাই মিলে ইসলামের এই আলোকিত অধ্যায়কে কালিমাযুক্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে?"

"তোমার এই কথাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।" বললো আবুল আব্বাস। তুমি যা বলছো তার সবই সত্য। কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য তো আরো অনেক সময় পাওয়া যাবে। আজকের শুভ রাতে তুমি

এসব জটিল বিষয়ের অবতারণা করছো কেন? তুমি কি আমার প্রেম-ভালোবাসা, আবেগ-উচ্ছ্বাস সবকিছুকে আজ রাতেই রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিতে চাও?”

“হ্যাঁ, তুমি যদি তাই মনে করো, তবে আজ রাতেই আমি তোমাকে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিতে চাই। কারণ, বিয়ের প্রথম রজনীটি যে কোন মানুষের জন্য খুবই পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ। সে কথা তুমি জানো আবুল আব্বাস! বাসর রাত তোমার জন্য নতুন কিছু ন। আমার জন্যও এ রাতটি জীবনের প্রথম নয়। আমি তোমার প্রেম-ভালোবাসা, আবেগ-উচ্ছ্বাস কিছুতেই নষ্ট হতে দেবো না। আমাকে পেয়ে যদি তোমার জীবনের স্বপ্নগুলো আরো রঙিন হয়ে থাকে, তাহলে সেই রঙিন স্বপ্নগুলোকে আমি স্বযত্নে আরো বর্ণিল করে তুলবো। আমার মনের গহীনে পুষে রাখা জটিল কথাগুলো আমাকে বলতে দাও আর তোমার স্বপ্নগুলো আমাকে বুঝবার অবকাশ দাও। এখনও তো রাত অনেক রয়ে গেছে। জীবনে আরো কতো রাত আসবে। আমি তোমার প্রতিটি রাতকেই মোহনীয় করে তুলবো। কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে আমার কটি কথা শুনে নাও।

আজকের যে রাতে আমরা সুখসাগরে সাঁতার দিতে যাচ্ছি, এ রাতটি গযনীর হাজারো কন্যা-জায়া-জননীর জন্য বিষাদে ভরা। গযনীর হাজারো যুবতী আজকের এ রাতেও তাদের প্রাণপ্রিয় স্বামীদের বিরহ যাতনা নিয়ে নির্ঘুম নিষ্পেষণে অতিবাহিত করছে, যাদের স্বামীরা আর কোন দিন তাদের কাছে ফিরে আসবে না। আল্লাহর সেই সৈনিকেরা আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিতে আল্লাহু আকবার স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে হিন্দুস্তান গিয়েছিলো। সেখানে গিয়ে তারা সম্পূর্ণ বৈরী আবহাওয়া ও প্রতিকূল পরিবেশে আটকে পড়ে। যেখান থেকে তাদের অনেকের পক্ষেই ফিরে আসা সম্ভবপর হয়নি। যাওয়ার আগে তারা শপথ করে গিয়েছিলো, তারা যেখানেই যাবে, সেখানে মসজিদ আবাদ করবে, আল্লাহর জমিন থেকে মূর্তিপূজাকে উৎখাত করবে। তারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে দিয়েছে। আমি আজ রাতের সকল প্রেম-ভালোবাসা, সুখ ও আনন্দকে তাদের পবিত্র ত্যাগের জন্য উৎসর্গ করছি...।

আবুল আব্বাস! এদের বিপরীতে তুমি সেইসব ক্ষমতালিপ্সু রাজন্যবর্গের রাজসিকতার দিকে তাকিয়ে দেখ, যাদের ক্ষমতালিপ্সার জন্য প্রতিটি মুসলিম

জনপদ মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে। প্রতিটি মুসলিম রাজ্যেই বিরাজ করছে গৃহযুদ্ধ। আজকের এই পবিত্র রাতে যদি তুমি আমার কথা ধৈর্য সহকারে শোন, তাহলে মুসলিম রাজ্যগুলোতে ভাইয়ের তরবারী ভাইয়ের মাথা দ্বিখণ্ডিত করতে থাকবে। ভাইয়ের ধনুক থেকে ছোঁড়া তীরে ভাইয়ের বুক ঝাঁঝরা হতেই থাকবে। আজকের এই পবিত্র রাতে আমার সেইসব মা-বোন ও তরুণী স্ত্রীদের কথা মনে পড়ছে, যাদের সকল সুখ-আহ্লাদ, স্বপ্ন-সাধনা ক্ষমতালোভী রাজন্যবর্গের অন্যায় বিদ্বেষের আগুনে জ্বলেপুড়ে ভষ্ম হয়ে গেছে। আবুল আব্বাস! তুমি একজন টগবগে যুবক। আমিও যুবতী। এসো, ক্ষণিকের জন্য আমরা বাসর রাতের রঙিন স্বপ্ন ও যৌবনের উচ্ছ্বাস পাশে রেখে কয়েকটি জরুরী কথা আলোচনা করি।

আবুল আব্বাস! তুমি কি আমাকে বলবে, খাওয়ারিজম শাহ্ কেন আজো গযনী আক্রমণ করেনি? তোমার জান্নাতবাসী পিতা কেন হত্যার শিকার হয়েছিলেন? তুমি কি জানো, গযনী আক্রমণ করার জন্য তাকে উস্কানী দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তিনি কিছুতেই গযনী আক্রমণ করতে সম্মত হননি। ফলে তাকে হত্যা করা হলো। তোমার বড় ভাই পিতার অকাল মৃত্যুতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। দিন দিন তার দেমাগ খারাপ হতে লাগলো। আমাকে বিয়ে করার প্রথম রাতেই আমি তাকেও এসব কথাবার্তাই বলেছিলাম। তিনি আমার প্রতিটি কথা হৃদয়ের মণিকোঠায় গেঁথে নিয়েছিলেন।”

“আচ্ছা নাহিদা! তুমি কি একথা জানতে যে, ভাইয়াকে নাকি তোমার ভাই মাহমূদ বিষ পান করিয়েছিলো? সুলতান মাহমূদের অধীনতা সে মেনে নেয়নি বলেই নাকি তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে?”

“তুমি কি একথায় বিশ্বাস করো?” জিজ্ঞেস করলো নাহিদা।

“ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু আমার মধ্যে সংশয় ঠিকই তৈরী হয়েছিলো।” বললো আবুল আব্বাস।

“এখানে সংশয়-সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যে সমরনায়ক শত্রুবাহিনীর সংখ্যার তুলনায় এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-পঞ্চমাংশ সৈন্য নিয়ে সব সময় শত্রুদের প্রবল সামরিক শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে

সক্ষম, তার মতো বীর বাহাদুর কাউকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে পারে না। এটা কাপুরুষের কাজ, বীর পুরুষের নয়।

আমার ভাইয়ের যদি প্রয়োজন হতো তোমার ভাইকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার, তাহলে তিনি জুরজানিয়া এসে এখানকার প্রতিটি ইট বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারতেন এবং তোমার ভাইকে কয়েদ করে জিন্দানখানায় ভরে রাখা তাঁর পক্ষে মোটেও কঠিন ব্যাপার ছিলো না। আমি তোমাকে বলছিলাম, আমাকে বিয়ে করে আনার পর আমি যখন দেখতে পেলাম, এখানে গযনী সালতানাতের বিরুদ্ধে রণপ্রস্তুতি চলছে, কতিপয় কুচক্রী তোমার ভাইকে গযনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ানোর উস্কানী দিচ্ছে, তখন তোমার ভাইকে আমি এ ভয়াবহতা ও ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে বোঝালাম। তিনি আমার কথায় আশ্বস্ত হলেন এবং কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে পা দিতে রাজী হলেন না।

অবশ্য আমারও এ ব্যাপারে সন্দেহ হতো, তোমার ভাইকে এমন কোন বিষ হয়তো খাওয়ানো হয়েছে, যা খুব ধীরে ধীরে শরীরের ভেতরে বিষক্রিয়া ঘটিয়েছে। ফলে দিন দিন তার অসুখ বেড়েই যাচ্ছিল। যদি সত্যিই তাকে বিষ খাওয়ানো হয়ে থাকে, তবে সেই কুচক্রীরাই তাকে বিষ খাইয়েছে, যারা খাওয়ারিজম ও গযনীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধানোর চেষ্টা করছিল।

"তোমার মতে কারা সেই কুচক্রী? কে এই বিষ প্রয়োগের সাথে জড়িত?" নাহিদার প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো আবুল আব্বাস।

"মূল কাজটি মুসলমানরাই করেছে। কিন্তু ওদের পিছনে হাত রয়েছে ইহুদী ও ফিরিঙ্গীদের" বললো নাহিদা। ইহুদী ও খৃস্টান চক্রান্তকারীদের সম্মিলিত চক্রান্তের ফসলই মুসলিম দেশসমূহের মধ্যকার গৃহযুদ্ধ। তাছাড়া কারামতি উপজাতিদেরও এতে হাত আছে। কারণ, আমার ভাই কারামতিদের শীর্ষনেতাকে খতম করে ওদের আখড়া গুড়িয়ে দিয়েছিলেন।"

"নাহিদা! আমি অকালে নিহত হতে চাই না।" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো আবুল আব্বাস।

"এমনটি বলো না। বরং বলো, আমি আল্লাহর পথে নিহত হতে চাই।" বললো নাহিদা।

"দেখছো না, আমার ভাই বারবার হিন্দুস্তানের প্রতিকূল পরিবেশে গিয়ে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে চায়। আমিও এটিই চাই এবং আল্লাহ ও তাই

ভালোবাসেন। তুমি আমার ভাইয়ের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রণাঙ্গন চষে বেড়াও। আল্লাহর পথে তোমাকে উৎসর্গ হতে দেখলে আমি আমার সকল সুখ-স্বপ্ন কুরবান করে দিতেও প্রস্তুত। যদি তুমি এতোটা না-ই পারো, অন্তত গযনী সালতানাতের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা না চালিয়ে গযনীর সাথে মৈত্রী সম্পর্ক শক্তিশালী করো।"

"ঠিকই বলেছো নাহিদা। এ মুহূর্তে সুলতানের একজন শক্তিশালী মিত্র দরকার। কারণ, তাঁর সামরিক শক্তি খুবই দুর্বল হয়ে গেছে।" বললো আবুল আব্বাস।

"তোমার কথা পুরোপুরি ঠিক নয়। গযনীর শক্তি এতোটা দুর্বল হয়ে যায়নি, যতোটা তোমরা মনে করছো।" বললো নাহিদা। এখনো যথেষ্ট সৈন্য রয়েছে গযনীতে। তাছাড়া হিন্দুস্তানী সৈন্যদের ব্যারাক সম্পূর্ণ অব্যবহৃত। তাদেরকে কখনো হিন্দুস্তানের কোন যুদ্ধে ব্যবহার করা হয় না। তাদেরকে এদিকে ব্যবহার করার জন্য রিজার্ভ রাখা হয়েছে।

গযনী সুলতানের অধীনে ওরা খুবই সুখে আছে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে মুসলমান হচ্ছে। হাজার হাজার গযনীবাসী স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছে। এরপরও যে সামান্য ঘাটতি আছে, তাকে পুষিয়ে নেয়ার মতো আত্মশক্তি ও মনোবল গযনী সেনাদের রয়েছে। কাজেই গযনী সালাতানাতকে কোন বহিঃশত্রুর আগ্রাসন থেকে রক্ষার জন্য সুলতান মাহমূদের কোন সামরিক শক্তির সাথে মৈত্রী গড়ে তোলা জরুরী এই ভুল ধারণা মনের ভেতর থেকে দূর করে দাও। সুলতানের চেয়ে বরং তোমার একজন শক্তিশালী মিত্রের খুব প্রয়োজন।"

"তোমার ভাইয়ের সাথে আমি মৈত্রী স্থাপন করবো ঠিক; কিন্তু তার অধীনতা মেনে নেবো না। সে যদি খুৎবায় তার নাম উচ্চারণের প্রস্তাব করে, তবে তো আমি কখনোই তা মেনে নেবো না। নাহিদা! তোমাকে আজ একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, তোমার প্রতি ভালোবাসা ছাড়াও আমার তোমাকে বিয়ে করার অন্যতম উদ্দেশ্যে তোমার ভাইয়ের সাথে মজবুত মৈত্রী গড়ে তোলা। কারণ, ভেতরে বাইরে আমি চরম শত্রুবেষ্টিত। এমতাবস্থায় তার মতো একজন শক্তিশালী মিত্রের আমার খুবই প্রয়োজন। আমি আশা করি, তিনি বন্ধুত্বের হক পুরোপুরিই আদায় করবেন।"

"তাঁর কাছ থেকে বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর অধিকার আদায় করার দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি আবুল আব্বাস। কিন্তু মৈত্রী বড় কথা নয়। মৈত্রী তখনই অর্থবহ হবে, যখন যে কোন দুর্যোগ ও বহিরাক্রমণে খাওয়ারিজম ও গযনীর সৈন্যরা একত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবে।"

"এমনটিই হবে নাহিদা, এমনটিই হবে।" বললেন আবুল আব্বাস।

এরপর আবুল আব্বাস নাহিদাকে বুকে জড়িয়ে আবেগপূর্ণ কথাবার্তা ও আচরণ করতে শুরু করলেন। সেবিকা আলজৌরীকে জানাল, সে মনে করেছিল, যে নারী বাসর রাতে রসকষহীন জীবনমৃত্যু যুদ্ধ-জিহাদের মতো নীরস ওয়াজ নিয়ে মেতে উঠেছিলো, সেই নারীর মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা, আবেগ-সোহাগের বালাই থাকতে পারে না। কিন্তু এক পর্যায়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের কথায় বিরতি দিয়ে নাহিদাও আবুল আব্বাসের কামোদ্দীপক বাসনায় এভাবে সাড়া দিলো যে, তার প্রতিটি শব্দ ও বাক্য ছিল উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনায় ভরপুর। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে আবুল আব্বাসকে কামনার উচ্ছ্বসিত আবেগ ও কামোদ্দীপক উত্তেজনাপূর্ণ কথায় নেশাগ্রস্ত করে ফেললো। ত্রিশের কোঠায় পা দেয়া নাহিদা যেনো সতেরো বছরের তরুণীতে রূপান্তরিত হলো। তার প্রতিটি হাসি ও কথায় যেন টপকে পড়ছিলো মোহনীয় মধুময় সুধা। এমনই যাদুমাখা ছিলো নাহিদার প্রতিটি কথা, যেন তা কঠিন সীসাকেও মোমের মতো গলিয়ে দিতে সক্ষম ছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে আবুল আব্বাসকে শান্ত-সুবোধ শিশুর মতোই প্রেমের অক্টোপাসে বেঁধে ফেলেছিলো নাহিদা। নাহিদার এই দুর্দান্ত তৎপরতার কাছে মনে হলো আবুল আব্বাস নিতান্তই আনাড়ী বালক।

বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন সেবিকাকে দেয়ার জন্য আলজৌরীর হাতে দুটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। আলজৌরীকে বললেন, তুমি সেবিকাকে বাগে রেখে ওর কাছ থেকে আবুল আব্বাস ও নাহিদার মধ্যকার সব কথাই জানতে চেষ্টা করবে। গুরুত্বহীন কথা হলেও তা শুনতে অবহেলা করবে না।"

আলজৌরী এরপর কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। আলজৌরী চলে যাওয়ার পর আলাফতোগীন আবু ইসহাক ও খমরতাশকে বললেন, "আমি আগেই তোমাদের বলেছিলাম, এই বিয়ের মধ্যে গভীর উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। কোন উদ্দেশ্য ছাড়া মাহমূদ তার আদরের বোনটিকে আবুল আব্বাসের তৃতীয় স্ত্রী করে দুইটি সতীনের সংসারে পাঠায়নি।"

"এই মৈত্রী কিছুতেই হতে দেয়া যাবে না।" বললেন আবু ইসহাক। খাওয়ারিজম শাহ আবুল আব্বাস একটা নারীলোভী তরুণ। একের পর এক নারীসঙ্গ লাভের লিপ্সা তাকে অন্ধ বানিয়ে ফেলেছে। আমরা তার বিশ্বস্ত প্রধান মন্ত্রী আবুল হারেসকে আমাদের পক্ষে নিয়ে নেবো।"

"আরে সাবধান! আবুল হারেস খুবই ভয়ঙ্কর লোক।" বললেন আলাফতোগীন। আবুল হারেসের সাথে এসব নিয়ে কোন কথাই বলা যাবে না। সে মামুনী খান্দানের পোষা লোক। মামুনী খান্দানের প্রতি পরম বিশ্বস্ত। যা কিছু করার আমাদেরকেই করতে হবে। আবুল আব্বাস যদি এই নারীর অন্ধভক্তে পরিণত হয়, তবে তাকে বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। আবুল আব্বাস রাজনীতিতে এখনো বালক। সে এখনো বুঝতেই পারছে না, মাহমূদ তার বোনের বিনিময়ে খাওয়ারিজম কিনে নিতে চায়।"

"সেনাবাহিনীকে আমাদের হাতে রাখতে হবে।" বললেন সেনাপতি খমরতাশ। সৈন্যদের অধিকাংশই কিন্তু খাওয়ারিজম শাহের প্রতি বিশ্বস্ত। রাজধানী জুরজানিয়ায় সেনাবাহিনী কম। অধিকাংশ সৈন্য আমার অধীনস্ত রাজ্য বুখারা ও দক্ষিণাঞ্চল হাজারাশিপে অবস্থান করছে। এসব সৈন্যকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে।

এ ব্যাপারে তোমরা আমাকে একটু সময় দাও। একটা না একটা পথ আমি ঠিকই বের করে ফেলব। গৃহযুদ্ধের জন্য সৈন্যদের প্রস্তুত করতে অভিজ্ঞ লোকের দরকার। বললেন আলাফতোগীন।

খাওয়ারিজমের রাজধানী জুরজানিয়া থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে সাগরের তীরবর্তী হাজারাশীপে ছিলো সে দেশের সবচেয়ে বড় সেনা শিবির। দীর্ঘদিন ধরেই খাওয়ারিজম রাষ্ট্রের অধিকাংশ সৈন্য সেখানে অলস সময় কাটাচ্ছিল। তখন চতুর্দিকেই ছিল যুদ্ধের ঘনঘটা। কিন্তু খাওয়ারিজম কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধে না জড়ানোর কারণে এসব সৈনিক দীর্ঘদিন যুদ্ধ থেকে দূরে ছিল। সেনাবাহিনীর কমান্ডার ও সিপাহীরা দিনে-রাতে গল্প-গুজব, আড্ডা, খেল-তামাশা করে বেকার সময় অতিবাহিত করছিল। যুদ্ধ না থাকায় তাদের চর্চা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারটিও হয়ে পড়েছিল গৌণ। অধিকাংশ সৈনিক ছিলো ধর্মে-কর্মে উদাসীন, আরাম-আয়েশে আসক্ত। কমান্ডারদের সিংহভাগ গা ভাসিয়ে দিয়েছিল বিলাসিতায়।

হঠাৎ একদিন দীর্ঘ শশ্রুমণ্ডিত আপাদমস্তক সবুজ জুব্বায় ঢাকা এক দরবেশরূপী ফকীর হাজারাশীপ সেনা ব্যারাকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। দরবেশরূপী লোকটির মাথায় সবুজ কাপড়ের পাগড়ী। পাগড়ীতে হাজার দানার দীর্ঘ তসবীহ জড়ানো। তার গলায়ও ঝুলছিলো রং-বেরঙের হাজার দানার দীর্ঘ তসবীহ। তার এক হাতে একটি লাঠি আর অপর হাতে একটি কিতাব। দরবেশরূপী ফকির উচ্চ আওয়াজে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জপতে জপতে দৃঢ়পায়ে হাঁটছিলো আর থেকে থেকে তার হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করছিলো।

হাজারাশীপে অবস্থানকারী সৈন্যরা এ ধরনের কোন ফকির-দরবেশ কখনো দেখেনি। বিস্ময়কর এই লোকটির পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-অনুষ্ঠান দেখে ব্যারাকের বাইরে থাকা কিছু সংখ্যক সৈনিক তাকে অবাক বিস্ময়ে দেখছিল। দেখতে দেখতে একটা ভিড় লেগে গেল এবং দরবেশকে ঘিরে বহু উৎসুক সৈনিক জমা হয়ে গেল। দরবেশ সৈন্যদের ভিড়ে দাঁড়াল এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললো, "সাগরতীর ডুবে যাবে, পাহাড় ফেটে যাবে... আসমান থেকে আগুন ঝরবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'

এ কথা বলে দরবেশ তাকে ঘিরে দাঁড়ানো সৈনিকদের কারো প্রতি না তাকিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করলো। বিকট আওয়াজে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে দরবেশ যখন প্রচণ্ড শক্তিতে তার লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করলো, অভূতপূর্ব এই ঘটনায় অভিভূত হয়ে সৈন্যরা তার পথ ছেড়ে দিল।

দরবেশের এসব কর্মকাণ্ডে সম্মোহিত হয়ে কিছু সৈনিক তার পিছু পিছু চলতে লাগল। এক সৈনিক দরবেশের হাতে একটি রৌপ্যমুদ্রা গুঁজে দিলে অন্যেরাও দরবেশকে টাকা-পয়সা দেয়ার জন্য পকেট হাতড়াচ্ছিল। কিন্তু গুঁজে দেয়া রৌপ্যমুদ্রাটিকে দরবেশ মুখে পুড়ে দাঁতে কামড়ে থেতলে আকাশে ছুঁড়ে মারলো।

মুদ্রার প্রতি দরবেশের এই অনাসক্তি দেখে সবাই যার যার টাকা আবার পকেটেই রেখে দিল। কিন্তু উপস্থিত সবাই দরবেশের এই কাণ্ডে সম্মোহিত হয়ে গেল। কারণ, তারা ভেবেছিল লোকটি হয়তো কোন অভাবী ফকির।

এমন সময় দু'জন লোক খুব দ্রুত পায়ে দরবেশের পথে এসে থামল। তারা সৈন্যদের নিবৃত্ত করতে বললো, সাবধান, দয়া করে আপনারা কেউ পীর

বাবাকে কষ্ট দেবেন না। তাকে কেউ কোন টাকা-পয়সা দিতে চেষ্টা করবেন না। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরিয়ে পড়লে তা কখনো বিফলে যাবে না। তাকে কেউ বিরক্ত করবেন না। তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। তিনি হয়তো গায়েবী নিদর্শন দিতে এসেছেন।

পনেরো-ষোল বছর আগে তাকে একবার দেখা গিয়েছিল। আপনাদের হয়তো মনে আছে, পনেরো বছর আগে সমরকন্দে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। সেই ভূমিকম্পের দু'দিন আগে সমরকন্দের অলি-গলিতে তাকে ঘুরতে দেখা গেছে।

তখনও তিনি এভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র জিকির করতে করতে বলছিলেন–'সমরকন্দের জমিন গোনাহ্গারদের বোঝা আর সহ্য করতে পারছে না।' সব ভেঙে যাবে, ধুলোয় মিশে যাবে।' কিন্তু তখন তার কথা কেউ বুঝতে পারেনি। দু'দিন পর বাবাজী শহর থেকে উধাও হয়ে গেলেন। তার উধাও হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গোটা সমরকন্দ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিলো। শহরের সকল সরাইখানা ও পানশালা মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল।"

দুজনের আরেকজন বললো, 'পনেরো বছর পর হঠাৎ আজ এখানে তাকে দেখা যাচ্ছে। এখনো তিনি সেই দিনের মতোই জিকির ও ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। আল্লাহ মালুম, তিনি যা বলছেন তা হবেই হবে। জানা নেই, কোন পাহাড় ভেঙে পড়ে কিংবা কোন জায়গায় আকাশ থেকে আগুন ঝরে। কিন্তু এটা ঠিক বিপর্যয় একটা ধেয়ে আসছে, বিপদ একটা না একটা ঘটবেই। এই দরবেশ বাবার কথা মিথ্যা হবার নয়।"

একথা শোনামাত্র উপস্থিত সৈন্যদের চেহারা ভয়ে-আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেল। তাদের একজন সাহস করে বললো, "এই দরবেশের কাছ থেকে কি জানার কোন উপায় নেই, বিপদ কোন দিক থেকে আসবে এবং কেন আসবে? এই বিপদ ঠেকানোর কোন পথ আছে কি না?"

আতঙ্কগ্রস্ত সৈন্যরা ভয়াবহ বিপদের কথা শুনে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে পরস্পর অবস্থার ভয়াবহতা আরো ছড়িয়ে দিল এবং কোন বাক্য ব্যয় না করেই নিজ নিজ ব্যারাকে ফিরে এলো। কিছুক্ষণের মধ্যে বাতাসের সাথে এই খবর গোটা সেনা শিবিরে ছড়িয়ে পড়ল। এক দরবেশ পনেরো বছর আগের

সমরকন্দের মতো ভয়াবহ বিপর্যয় ও ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখে মুখে এই দুর্যোগের খবর আরো ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ হয়ে গোটা শিবিরে ছড়িয়ে পড়লো। শিবির জুড়ে এই ফকিরের ভবিষদ্বাণীই হয়ে উঠলো আলোচনার একমাত্র বিষয়। প্রত্যেকের মুখেই একই কথা, এই ফকীরের কাছ থেকে এই বিপদ থেকে মুক্তির বিষয়টি কিভাবে জানা যায়? কেন, কোনদিক থেকে আসবে এই বিপদ?

পরদিন সেনা শিবিরে এ খবর ছড়িয়ে পড়লো, গতকালের ভবিষ্যদ্বাণী করা দরবেশকে আজকে সমুদ্রতীরের একটি জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করতে দেখা গেছে। খবর শোনামাত্র কয়েকজন উৎসাহী সৈনিক সমুদ্র তীরের দিকে রওনা হলো। সৈন্যরা সাগর তীরে গিয়ে দেখতে পেলো, সেখানে একটি ছোট্ট তাঁবু খাটানো রয়েছে। তাঁবুর পাশেই তিন-চারজন লোক বসে আছে। সৈন্যরা সেখানে গিয়ে শুনতে পেল, তাঁবুর ভেতর থেকে ভেসে আসছে দরবেশের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জিকিরের আওয়াজ।

সেই সাথে তারা শুনতে পেলো, রক্তের বন্যা... থামিয়ে দাও, থামিয়ে দাও।

তাঁবুর বাইরে বসে থাকা লোকেরা সৈন্যদের জানালো, তারা সারা রাত এখানেই কাটিয়েছে। দরবেশ রাতভর বিরতিহীনভাবে এই জিকির চালিয়েছেন এবং মাঝে মধ্যেই তার লাঠি সাগরের পানিতে ডুবিয়ে এখানকার পানির গভীরতা পরিমাপ করেছেন।

তারা আরো জানালো, দরবেশের পা ধরে তারা মিনতি করে জানতে চাচ্ছিলো আসলে বিপদ কি ধরনের হতে পারে। তাদের অনুরোধে দরবেশ তাদের আসমানের প্রতি তাকাতে বললেন। তারা দিব্যচোখে দেখেছে, আসমানের তিনটি তারা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গোটা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারার টুকরোগুলো দূর-দূরান্তে গিয়ে মাটিতে আঁছড়ে পড়েছে। এরপর দরবেশ আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখনো সময় আছে, ফিরে এসো, আসমানের এই গজবকে থামিয়ে দাও।'

তারা সৈন্যদের আরো জানালো, আমরা দরবেশ বাবার সেবা করার জন্য এখানে এসেছি। কিন্তু তিনি আমাদের দিকে তাকিয়েও দেখছেন না। সৈন্যরা তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে দরবেশের তীব্র চিৎকারের জিকির শুনছিলো এবং তাঁবুর

বাইরে অপেক্ষমাণ লোকদের মুখে দরবেশ সম্পর্কে নানা তথ্য অবহিত হচ্ছিল। বাইরে অপেক্ষমাণ লোকদের বক্তব্যও দরবেশের তীব্র জিকির শুনে সৈন্যরা দরবেশকে আল্লাহর জীবন্ত পয়গামবাহী দূত ভাবতে শুরু করল।

এই সৈন্যরা ব্যারাকে ফিরে গিয়ে গতকালের অনেকের দেখা দরবেশকে আরো রহস্য পুরুষে পরিণত করল।

পরদিন ব্যারাকের আরো সৈন্য আর শহরের বহু লোক দরবেশকে দেখার জন্য সমুদ্র তীরবর্তী তাঁবুর পাশে জমায়েত হলো। দেখতে দেখতে তাঁবুর জায়গাটি সৈনিক এবং শহরের লোকদের জন্য তীর্থস্থানে পরিণত হলো।

লোকজন সমুদ্রতীরে গিয়ে তাঁবুর বাইরে দাঁড়াতো। তাঁবুর ভেতরে দরবেশের উচ্চ আওয়াজে জিকির শুনতে পেতো, সেই সাথে দরবেশ তিলাওয়াত করতো কেয়ামত দিবস সম্পর্কীয় আয়াতসমূহ। থেকে থেকে দরবেশ বলছিল, "রক্তের প্লাবন ধেয়ে আসছে, মানুষ মানুষকে হত্যা করবে।... দেশের বাদশা নারীর গোলামে পরিণত হবে'।"

* * *

সুলতান মাহমূদের দুই গোয়েন্দা কর্মকর্তা বিয়ে অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসে সুলতানকে জানালো, তারা বিয়ে অনুষ্ঠানে বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন, সেনাপতি আবু ইসহাক ও সেনাপতি খমরতাশ এর কথাবার্তা শুনেছে। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা সুলতানকে জানালো, আবুল আব্বাসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এ তিন ক্ষমতাধর ব্যক্তি চক্রান্ত করছে। অচিরেই তারা একটা কিছু ঘটাবে।"

সুলতান তাদের কথা শুনে পরামর্শ দিলেন, তোমরা আবুল আব্বাসের রাজমহল জুরজানিয়া এবং বুখারায় তোমাদের কয়েকজন গোয়েন্দাকে নিয়োগ করো, যাতে তারা ওদের চক্রান্তের খবর সময়মতো আমাদের অবহিত করতে পারে।"

সুলতানের নির্দেশে চার-পাঁচজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দাকে জুরজানিয়া ও বুখারায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। তারা জুরজানিয়া গিয়ে সুলতানের বোন নাহিদার সাথেও যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হলো। কিন্তু তারা বারংবার খবর

দিচ্ছিলো, আবুল আব্বাসের পক্ষ থেকে সুলতানের বিরুদ্ধে কোন ধরনের বিরূপ তৎপরতার আশঙ্কা নেই। আসলে রাজধানীতে চক্রান্তকারীদের কোন তৎপরতা ছিলো না। চক্রান্ত চলছিলো হাজারাশীপ ও বুখারায়।

হাজারাশীপের সমুদ্রতীরের ঝুপড়ীসম তাঁবুতে বসে দরবেশরূপী ফকির হাজারাশীপ সেনাশিবিরের সৈন্যদের মধ্যে অভাবনীয় প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।

ওদিকে হাজারাশীপ থেকে শত মাইল দূরবর্তী বুখারা রাজ্যের সমুদ্রতীরে অনুরূপ আরেক দরবেশের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এই দরবেশও সমুদ্রতীরে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করছিলো। বুখারার এই দরবেশ তার তাঁবুতে একা ছিলো না, তার সাথে ছিলো আরো বহু শিষ্য মুরীদ। মুরীদের মধ্যে কয়েকজন পুরুষ আর কয়েকজন নারী।

মাত্র কয়েক দিনেই দরবেশের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো যে, এই বুযুর্গ ব্যক্তি এমন একটি ওষুধ এবং তাবিজ দেয়, যা ব্যবহার করলে মানুষ কখনো বার্ধক্যের শিকার হয় না– দীর্ঘজীবন লাভ করে।

মানুষ মাত্রই দীর্ঘজীবন ও দীর্ঘ যৌবন প্রত্যাশা করে। সেনাদের প্রতিটি মুহূর্ত উৎকর্ণ থাকতে হয় কখন যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। যুদ্ধ মানেই মৃত্যু, মৃত্যুর হাতছানি।

দীর্ঘজীবন ও যৌবন লাভের দাওয়াই এবং তাবিজের কথা সেনাশিবিরে পৌঁছামাত্র এ খবর এ কান ও কান হতে হতে শিবিরময় ছড়িয়ে পড়লো। মৃত্যু আতঙ্কে ভীত সৈন্যরা এ খবরে খুবই প্রভাবিত হলো। দলে দলে সৈন্যরা সমুদ্রতীরে দরবেশের তাঁবুতে ভিড় করলো।

উভয় সৈন্যশিবিরে সৈন্যরা সমুদ্রতীরের অবস্থান নেয়া দুই দরবেশের তাঁবুতে জমায়েত হতে লাগলো। উভয় দরবেশ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললো, "তোমরা আল্লাহর পথের সৈনিক। তোমরা সুন্দর সঠিক পথে আছো। কিন্তু তোমাদের চারপাশে যেসব মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে, ওদের কেউ সঠিক পথে নেই। ওরা নামে মাত্র মুসলমান। তাদের কেউ কেউ তোমাদেরকে গোলামে পরিণত করতে তৎপর। প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রকে তোমরা মুসলমান মনে করে যদি তাদের উপর ভরসা করো, তাহলে তোমাদের উপর এমন গজব পড়বে যে, তোমাদের কোন নামগন্ধ থাকবে না।

উভয় সেনাশিবিরে দরবেশরূপী দুই ফকির তাদের সম্মোহনী ক্ষমতাবলে সৈন্যদেরকে এতোটাই প্রভাবিত করলো যে, সৈন্যরা তাদের কথা অমোঘ সত্য বলে হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করলো।

এক রাতে আলাফতোগীন তার খাস কামরায় উপবিষ্ট। তার সামনে অপরিচিত দু'জন লোক। তাদের কারো চেহারা ছবি স্থানীয় লোকদের মতো নয়। তারা মুসলমানও নয়। উভয়েই বিদেশী ইংরেজ।

"আপনাদের এই কৌশল শেষ পর্যন্ত কি ফল বয়ে আনবে?" উপস্থিত ফিরিঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন।

"আপনি কেন আমাদের সাহায্য করেছেন?" ফিরিঙ্গীদের একজন আলাফতোগীনকে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো। সৈন্যদেরকে আপনার আস্থাভাজন বানিয়ে আপনি খাওয়ারিজম রাজ্যের অধিপতি হতে চান?" এই উদ্দেশ্যেই তো আপনি আমাদের সহযোগিতা করেছেন, তাই না?"

আমরা এখানে এসে সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি, তারা খাওয়ারিজম শাহের বিরুদ্ধে কিংবা জুরজানিয়ার সৈন্যদের বিরুদ্ধে তরবারী ধরতে মোটেও সম্মত নয়। কোন ধরনের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘোর বিরোধী তারা।

আমরা হাজারাশীপ ও বুখারার সৈন্যদের ভেতরের খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছি, তারা অভ্যন্তরীণ সংঘাত তো দূরের কথা প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও যুদ্ধবিগ্রহে আগ্রহী নয়। এখানকার সকল সৈন্যদেরকে মৌলিকভাবেই এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, মুসলমান কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে তরবারী ধরতে পারে না। এজন্য আমাদেরকে সর্বাগ্রে হাজারাশীপ ও বুখারাতে যেসব সৈন্য রয়েছে, তাদের মন থেকে ইসলামের আদর্শিক বিশ্বাস দূর করতে হবে।

"কল্পনা ও সংশয়বাদিতা এমন এক অস্ত্র, যা দিয়ে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি ধসিয়ে দেয়া যায়। সব মানুষই ভবিষ্যতে ঘটিতব্য এবং ঘটমান ঘটনাবলীর কারণ জানতে চায়। এটা মানুষের একটি স্বভাবজাত দুর্বলতা।

মানুষের আরেকটি দুর্বলতা হলো আবেগ ও বিস্ময়। সকল মানুষ বিস্ময়কর কথাবার্তা ও ঘটনাকে শুনতে ও দেখতে পছন্দ করে এবং আবেগকে বিবেকের উপর বিজয়ী করে ফেলে। মানুষের এই আবেগ ও বিস্ময়ানুভূতিকে সহজেই প্রভাবিত করা যায়। যে মানুষ যতো বেশী মূর্খ ও অশিক্ষিত, সে ততো বেশী

আবেগপ্রবণ ও আবেগাশ্রয়ী। মানুষের তৃতীয় দুর্বলতা হলো প্রত্যেকেই চির যৌবন ও অমরত্ব লাভ করতে চায়।

আমরা আপনাদের সেনাবাহিনীর কমান্ডার ও সৈনিকদের এই মানবিক দুর্বলতাগুলোকে দুই কৃত্রিম দরবেশের দ্বারা কাজে লাগাচ্ছি। আমাদের দুই দরবেশরূপী মনোবিজ্ঞানী সিপাহী ও কমান্ডারদের ধর্মানুভূতি ও ধর্মবিশ্বাসের জায়গায় সংশয় ও কল্পনাবিলাস ঢুকিয়ে দেবে। উভয় দরবেশ কথায় কথায় ধর্মের বিধান উল্লেখ করে কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়। কিন্তু তার প্রতিটি কথার মর্ম সম্পূর্ণ ইসলামের পরিপন্থী। আমাদের এই দুই বিশেষজ্ঞ আপনাদের সৈন্যদের ধর্মানুরাগ অক্ষুণ্ন রেখেই প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক ও সৈন্যদের প্রতি অবিশ্বাস ও সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম।

ধর্মবিশ্বাসে আমরা খৃস্টান। কিন্তু আপনাদের ধর্মের প্রতিটি বিধিবিধান সম্পর্কে আমরা অবগত। আমরা আপনাদের সৈন্যদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করেছি। আমাদের প্রশিক্ষিত মুসলিম অনুচরেরা আপনাদের সেনাশিবিরগুলোর অলিগলি ঘুরে ঘুরে নানা গুজব ছড়িয়ে দিচ্ছে। তারা এ কথা খুবই সাফল্যের সাথে প্রচার করছে, খাওয়ারিজমকে সুলতান মাহমূদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার নেতৃত্বের উপযুক্ত একমাত্র ব্যক্তিত্ব বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন।

খাওয়ারিজম শাহ্ আবুল আব্বাস এবং তার নতুন স্ত্রী নাহিদা সম্পর্কে এমনই দুর্নাম ছড়ানো হয়েছে যে, সৈন্যরা আবুল আব্বাসকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। আমরা আশা করছি, অল্পদিনের মধ্যেই সৈন্যরা আবুল আব্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য উন্মত্ততা শুরু করবে।

"আপনার দু'জন সহকারী সেনাপতি– যারা আবুল আব্বাসের কট্টর ভক্ত ছিলো– দু'জন প্রশিক্ষিত তরুণীকে তাদের পিছনে লাগিয়ে দিয়ে আমরা তাদেরকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। আপনার হয়তো জানাই ছিলো না, এই দুই প্রভাবশালী সেনাকর্মকর্তা আপনাকে মোটেও পছন্দ করতো না। এখন তারাও আপনাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে। এ ছাড়াও যদি আপনার কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে আমাদের বলতে পারেন। আমরা আপনাকে আর্থিক, সামরিক ও পরিবহনের জন্য উপযুক্ত জন্তু দিয়ে সহযোগিতা করতে পারি।

“সেটি এখনই নয়।” বললেন আলাফতোগীন। এখনই যদি আপনাদের এসব সহযোগিতা নিই, তাহলে খাওয়ারিজম শাহ্ জেনে যেতে পারে। আমি একটা সুযোগের অপেক্ষা করছি, যাতে আমি আবুল আব্বাসের বিরুদ্ধে সৈন্যদের বিক্ষুব্ধ করে আমার পক্ষে নিয়ে আসতে পারি। আমি যদি খাওয়ারিজম শাহের গদি উল্টে দিতে পারি, তাহলে আপনাদের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে।

“আমরা আপনার কাছে কোন প্রতিদান চাই না।” বললো অপর ফিরিঙ্গী। আমরা শুধু আপনার বন্ধুত্ব চাই। আপনার সাথে আমাদের শাসনতান্ত্রিক বন্ধুত্ব ও মৈত্রীস্থাপন হলেই বুঝতে পারবেন, গির্জা ও মসজিদের সম্পর্ক কতোটা হৃদ্যতাপূর্ণ। আমাদের এই স্বর্গীয় বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর পথে সুলতান মাহমূদই একমাত্র বাধা। এই ঝগড়াটে লোকটির বিনাশ খুবই জরুরী।”

“আমিও তার ধ্বংস চাই।” বললেন আলাফতোগীন। এই যুদ্ধবাজ লোকটি তার সাম্রাজ্যকে আরো বিস্তৃত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

“আপনি হয়তো জানেন, আপনার সৈন্যরা কোন মুসলিম রাষ্ট্রের সৈন্যদের সাথেই যুদ্ধ করতে সম্মত নয়। বিশেষ করে গযনীর সৈন্যদের সাথে যুদ্ধের কথা তারা ভাবতেই পারে না।” বললো এক ফিরিঙ্গী।

“সৈন্যদের এই মনোভাব আবুল আব্বাসের তৃতীয় স্ত্রী নাহিদার প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের চোখ আবুল আব্বাসের শয়নকক্ষের ভেতরের খবরও রাখে। আবুল আব্বাস তার আগের দুই স্ত্রীকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে সুলতান মাহমূদের বোনের প্রেমে পড়ে নিজের বিবেক-বুদ্ধি খুইয়ে ফেলেছে। এমনও হতে পারে, আবুল আব্বাস গযনীকে সামরিক সহযোগিতা দিয়ে বসবে; কিন্তু সে কিছুতেই গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না।”

“অনিন্দ্য সুন্দরী দুই তরুণী বুখারার শাসক আলাফতোগীনসহ দুই ফিরিঙ্গীকে সুরা ঢেলে দিচ্ছিল। এই দুই তরুণী ছিলো ফিরিঙ্গীদের সঙ্গী। আলাফতোগীন শরাবের নেশার চেয়ে তরুণীদের রূপ সৌন্দর্যে বেশী আসক্ত হয়ে পড়েছিলো। সে বারবার তরুণীদের দিকে তাকাচ্ছিলো। তরুণীদের ভুবনমোহিনী মুচকি হাসি আর মনকাড়া চাহনীতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো। এদিকে দুই ফিরিঙ্গী অতিকৌশলে নেশাগ্রস্ত আলাফতোগীনের মন-মগজে

খাওয়ারিজমের একচ্ছত্র অধিপতি তথা বাদশাহ্ হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করে তুলেছিল।

গযনী থেকে নাহিদার একান্ত ফুটফরমায়েশের জন্য জেবীন নামের মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তিকে পাঠানো হলো। নাহিদা আবুল আব্বাসকে জানালো, জেবীন ছিলো আমার একান্ত কর্মচারী। ভাইয়া তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। জেবীন খুবই বিশ্বস্ত এবং সমঝদার।

সত্যিকার অর্থেই জেবীন ছিলো অনুগত, ভদ্র, মেধাবী এবং পরিচ্ছন্ন মনের মানুষ।

কয়েক দিনের মধ্যেই জেবীন আবুল আব্বাসের মন জয় করতে সক্ষম হয়। জেবীন আবুল আব্বাসের রাজপ্রাসাদের অন্যান্য কর্মচারী ও সেবক-সেবিকার উপর নজরদারী এবং তাদেরকে বশে রাখার ব্যাপারে খুবই দক্ষতার পরিচয় দেয়। অবশ্য একাজে আগে থেকেই জেবীন ছিলো পরীক্ষিত এবং অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ।

একদিন বিকেল বেলায় প্রাসাদের বাগানে বসেছিলো নাহিদা। জেবীন নাহিদার সামনে মাথা নীচু করে দু'হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলো। অবস্থাদৃষ্টে যে কেউ মনে করবে, সে নাহিদার কথা শুনছে। বস্তুত জেবীন বলছিলো আর নাহিদা গভীর মনোযোগ দিয়ে জেবীনের কথা শুনছিলো।

"একটা কিছু ঠিকই ঘটে চলছে নাহিদা! আমাদের লোকেরা বুখারা ও হাজারাশীপ থেকে যেসব খবর আনছে, তা থেকে বোঝা যায় ওখানে কোন শয়তানী কারসাজী শুরু হয়েছে। হাজারাশীপের নদীর তীরে এক ফকির আস্তানা গেড়েছে, সে নাকি বিস্ময়কর সব ভবিষ্যদ্বাণী করছে। সে এমন ধরনের চক্রান্তমূলক কথাবার্তা বলছে যে, সেনাবাহিনীর সব লোক তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। সে এক হাতে কুরআন শরীফ আর একহাতে তসবীহ নিয়ে সারাক্ষণ ওয়াজ করে।"

"একথা কি নিশ্চিতভাবে বলা যাবে, সে সত্যিই কোন দুনিয়াবিমুখ ওলী ব্যক্তি নয়?" জিজ্ঞেস করলো নাহিদা।

সে আলেম বটে; কিন্তু দুনিয়াবিমুখ নয়, বরং দুনিয়ামুখী। সে কোন দীনদার আলেম নয়, কুরআনের আড়ালে সে আসলে খ্রিস্টবাদ ছড়াচ্ছে এবং গণমানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

গযনী সালাতানাতের বিরুদ্ধে বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে সে। কুরআন শরীফের আয়াত পড়ে পড়ে সে বলছে, গযনী ও আশেপাশের সকল মুসলিম রাজ্যগুলো এবং এগুলোর শাসকগোষ্ঠী নামকাওয়াস্তে মুসলমান। ইসলামের নামের আড়ালে ওরা সবাই ক্ষমতালোভী। একমাত্র সত্যিকার মুসলিম ও মুসলমানের দেশ খাওয়ারিজম।"

"সে কি খাওয়ারিজম শাহীর বিরুদ্ধেও কোন কথাবার্তা বলে?"

"না, প্রকাশ্যে সে খাওয়ারিজম শাহীর বিরুদ্ধে বলে না।" বললো জেবীন। কিন্তু সৈনিক ও কমান্ডারদের আচার-আচরণ ও কথাবার্তা এবং তাদের মনোভাব খাওয়ারিজম শাহীর জন্য খুবই ভয়ানক।...

বুখারার পার্শ্ববর্তী নদীতীরেও এমন এক দরবেশ আস্তানা গেড়েছে। সেখানে শুধু দরবেশই নয়, তার সাথে রয়েছে কিছুসংখ্যক পুরষ ও সুন্দরী নারী। বুখারা জুড়ে এ খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে যে, দরবেশ এমন এক তাবিজ ও ওষুধ দেয়, যা সেবন ও ধারণ করলে মানুষ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে এবং জীবনে কখনো বার্ধক্য স্পর্শ করে না। ওই দরবেশের সাথে যেসব সুন্দরী তরুণী রয়েছে, রাতের বেলায় তাদেরকে সেনাকমান্ডারদের সাথে আপত্তিকর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় নদীতীর ও জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

বুখারার সেনাদের কথাবার্তায়ও মারাত্মক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। ওই ফকিরকে ঘিরে ওখানে মানুষের সমাগম এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, ওখানে রীতিমতো মেলা জমে গেছে। ওই ফকিরও কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াজ করে আর গযনী সালতানাতের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে।

মোদ্দাকথা হলো, গযনী ও খাওয়ারিজমের মধ্যে একটা শক্তিশালী শত্রুতা তৈরীর অপচেষ্টা চলছে। আমাদের লোকেরা উভয় সেনা শিবিরের সৈন্যদের সাথে উঠাবসা করে এবং ফকিরের মুরীদ সেজে তাদের কথাবার্তা শুনেছে এবং সৈন্যদের মনোভাব চিন্তা-ভাবনার খবর নিয়েছে।

যে বুখারা ও হাজারশীপের সাধারণ সৈন্যরা কোন কাজকর্ম না থাকায় অলস বসে বসে সারাক্ষণ অশ্লীল কথাবার্তা ও নোংরা আলাপচারিচায় সময় কাটাতো, তাদের প্রত্যেকের মুখে এখন গযনীর প্রতিটি প্রাসাদ থেকে ইট খুলে নেয়ার বিষোদগার। গযনীর ধ্বংসই এখন আলোচনার একমাত্র বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া একথাও শোনা গেছে, ওখানে বহু নারীর সমাগম হয়েছে।

যারা অনেকটা জ্ঞাতসারেই দেহ ব্যবসার পসরা সাজিয়ে সৈনিক ও যুবকদের চরিত্র হনন করছে।

আমাদের একজন গোয়েন্দা এমন এক তরুণীর সাথে মিলিত হয়েছিলো। সে জানিয়েছে, এসব তরুণী শুধু দেহ ব্যবসাই করে না, এরা গযনী সালতানাত ও খাওয়ারিজম শাহ আবুল আব্বাসের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াচ্ছে। পর্দার অন্তরালে এসব দেহপসারিণীদের সম্পর্ক রয়েছে ওই দুই দরবেশের সাথে। তাদের কথাবার্তায় এ বিষয়টি একেবারে দিবালোকের মতো পরিষ্কার।...

আমাদের এক গোয়েন্দা বলেছে, বুখারার ফকিরের সাথে থাকা এক তরুণী একদিন নদীর তীরে তাকে একাকী পেয়ে ঘনবনের দিকে নিয়ে যায় এবং তাকে প্রেম নিবেদন করে। তখন ছিলো সন্ধ্যা। বেলা ডুবে গেলে তরুণী তার গলা জড়িয়ে ধরে প্রেম নিবেদন করে তার পরিচয় জানতে চায়। আমাদের গোয়েন্দা নিজেকে খাওয়ারিজম সেনাবাহিনীর কমান্ডার বলে পরিচয় দেয়। সেনাকমান্ডারের পরিচয় পাওয়ার পর তরুণী এমনভাবে নিজেকে তার সামনে মেলে ধরলো যে, সে যেনো যুগ যুগ ধরে তাকেই ভালোবাসে।

আমাদের গোয়েন্দা জানিয়েছে, এসব তরুণী খুবই সুন্দরী ও প্রশিক্ষিত। আমাদের গোয়েন্দা বলেছে, 'আমার যদি কর্তব্যবোধ না থাকতো, আর আল্লাহর কাছে জবাবদিহির প্রশ্ন ও পাপাচারের শাস্তির ভয় না হতো, তাহলে এই তরুণীকে আমি জীবনসঙ্গিনী করার জন্য সম্ভব সবকিছুই করতাম।' আমাদের গোয়েন্দা আরো বলেছে–

তরুণী তার মধ্যে কামোদ্দীপনা জাগিয়ে দিয়ে গলা জড়িয়ে বললো, "তোমাদের খাওয়ারিজম শাহ তো তার তৃতীয় স্ত্রীর গোলামে পরিণত হয়েছে। গযনী সুলতানের বোন নাহিদা খাওয়ারিজম শাহের জ্ঞানবুদ্ধি সবই গিলে ফেলেছে। সে এখন আঙুলের ইশারায় খাওয়ারিজম শাহকে নাচাচ্ছে।"

"আমাদের গোয়েন্দা তরুণীকে জিজ্ঞেস করলো, "রাজমহলের কথা তুমি কিভাবে জানলে?"

তরুণী জানালো, "আমি রাজমহলেরই রক্ষিতা ছিলাম। কিন্তু গযনী সুলতানের বোন নাহিদাকে আবুল আব্বাস বিয়ে করার পর একের পর এক সুন্দরী তরুণীদের আগমন শুরু হয়। প্রতিদিন দলে দলে গযনী থেকে সুন্দরী তরুণীরা খাওয়ারিজমে আসতে শুরু করে। নাহিদা একেক রাতে আবুল

আব্বাসের কাছে একেক সুন্দরীকে হাজির করে। নাহিদার চক্রান্তের কারণে আবুল আব্বাস হারেমের সকল সেবিকা ও রক্ষিতাকেই তাড়িয়ে দিয়েছে।" একথা বলে তরুণী কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং বলে... তুমিই বলো, এখন আমরা কোথায় যাবো?

"আমাদের বেঁচে থাকার এখন একটাই পথ।" আচ্ছা, তুমি কি আমাকে আশ্রয় দিতে পারো? আমাকে কি এই পঙ্কিল পথ থেকে বাঁচাতে পারবে? একথা শুনে আমাদের গোয়েন্দা তাকে সান্ত্বনা দিলো এবং পরবর্তীতে তার সাথে আবারো মিলিত হওয়ার কথা বলে সেখান থেকে সরে এলো।

এই ঘটনা থেকেই আপনি আন্দাজ করতে পারেন, সেখানে কী চলছে।" বললো জেবীন।

"আমাদের গোয়েন্দারা আরো খবর দিয়েছে, বুখারার গভর্নর আলাফতোগীনের প্রাসাদে দু'জন ভিনদেশী লোক বসবাস করছে, এদের চামড়া দেখে মনে হয় তারা ফিরিঙ্গী ইংরেজ। এরা ধর্মীয়ভাবে ইহুদীও হতে পরে কিংবা খৃষ্টানও হতে পারে। এখন আপনিই আমাদের বলুন, আমাদের কি করতে হবে? আপনি কি খাওয়ারিজম শাহকে এ ব্যাপারে জানাবেন, এখানে এসব ঘটছে?"

"না, তাকে এসব ব্যাপারে জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, এসব খবর আমি তাকে জানালে আমাকে জবাব দিতে হবে এসব খবর আমি কি করে কার মাধ্যমে পেলাম।"

"আবুল আব্বাস আমার হাতে আছে। আমি তাকে বলতে পারতাম, আপনি হাজারাশীপ ও বুখারার সকল সৈন্যকে রাজধানীতে বদলী করুন এবং রাজধানীর সৈন্যদেরকে সেখানে বদলী করুন। এরফলে এক জায়গায় থেকে থেকে সৈন্যরা অলস ও নিষ্কর্ম হয়ে যাবে না। কিন্তু এ মুহূর্তে তাকে এমন কোন পরামর্শ দেয়া ঠিক হবে না। ওখানকার সৈন্যরা দুই ফকিরের সংশ্রবে যেভাবে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে, এখানকার সৈন্যরা সেখানে গেলে এরাও খারাপ হয়ে যাবে।

তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ হলো, তোমরা কৌশলে ওই দুই ফকিরকে গায়েব কিংবা হত্যা করে ফেলো। গযনীতে এমন কিছু ঘটলে এদের গ্রেফতার করে শাস্তির মুখোমুখি করা যেতো। কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়। আচ্ছা,

আমাদের লোকেরা কি এদের হত্যা করার মতো ক্ষমতা রাখে? জেবিনকে জিজ্ঞেস করলো নাহিদা।

"ফকির দু'জনকে হত্যা করা আমাদের গোয়েন্দাদেরকে জন্য তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। আমাদের দরকার এ ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতা।" বললো জেবীন।

"ঠিক আছে, আমি এই নির্দেশ দিলাম। তোমাদের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারটিও আমি নিশ্চিত করবো। তবে এই কাজের সাথে সাথে গযনী সুলতানের কাছে খবর পাঠিয়ে দাও, আমার নির্দেশে দুই চক্রান্তকারী ফকিরকে হত্যা করা হচ্ছে এবং হাজারাশীপ ও বুখারাতে যা ঘটছে এর বিস্তারিত খবরও দিয়ে দাও।" জেবিনকে বললো নাহিদা।

* * *

কয়েকদিন পর নদীর তীরবর্তী দরবেশের আস্তানা থেকে লোকজন বাড়ী ফিরতে শুরু করে। রাত বাড়ার সাথে সাথে দরবেশের আস্তানা থেকে লোকজন সরে যেতে থাকে।

এক পর্যায়ে সাধারণ মানুষের ভিড় কমে যায়। অর্ধরাতে সাধারণ মানুষের ভিড় কমে যাওয়ায় দেহপসারিণী তরুণীরা খদ্দের সাথে নিয়ে দূরের নদী তীরের ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে চলে যায়।

দরবেশের আস্তানায় মানুষের ভিড় কমে গেলেও দু'জন লোক আস্তানার ধারে পাশেই ঘোরাফেরা করছিলো। দরবেশ বাইরের মশাল নিভিয়ে দিয়ে তাঁবুর ভেতরে চলে গেল। তাঁবুর বাইরে দু'জন প্রহরী প্রহরা দিচ্ছিলো। প্রহরী দু'জন প্রহরা দেয়ার লক্ষ্যে অনড় বসে ছিলো আর অজ্ঞাত দুজন লোক তাঁবুর অদূরে থেকে প্রহরীদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করছিল। তাদের একজন সঙ্গীর উদ্দেশ্যে বললো–

"মনে হয়, তাঁবুর বাইরে অপেক্ষমাণ এই লোক দু'টি দরবেশের প্রহরী। এরা তাঁবুর সম্মুখ থেকে সরবে না।"

"এরা তাঁবুর ভেতরে চলে গেলে আমাদের কাজ কঠিন হয়ে যাবে।" বললো অপরজন।

"একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে।" বললো প্রথমজন। তুমি ওদের কাছে গিয়ে নিজেকে সেনাবাহিনীর কমান্ডার পরিচয় দেবে আর এমনভাবে নিজেকে উপস্থাপন করবে যে, তুমি দরবেশের খুব ভক্ত। আর এদিকে আমি কাজ সমাধা করার চেষ্টা করবো।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি সঙ্গীর কথামতো প্রহরীদের কাছে গিয়ে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক গল্প জুড়ে দেয়। লোকটি যখন নিজেকে সেনাবাহিনীর কমান্ডার হিসেবে পরিচয় দেয়, তখন দরবেশের প্রহরীরা তার সাথে কথা বলতে বেশ উৎসাহবোধ করে। লোকটি প্রহরীর উদ্দেশ্যে বললো, বাবাজী হয়তো শুয়ে পড়েছেন, এখানে আমরা কথা বললে তার ঘুমের ব্যাঘাত হবে, আমাদের একটু দূরে গিয়ে কথাবার্তা বলা উচিত।

এই বলে সে দুই প্রহরীকে একটু দূরে সরিয়ে নিলো।

দরবেশ চতুর্দিকে পর্দা ঘিরে দিয়েছিলো। অপরদিকে তার সঙ্গী অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তাঁবুর পিছনে চলে গেলো এবং হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে ভেতরটা দেখে নিলো।

তাঁবুর ভেতরের মশালের আলোয় সে দরবেশকে পরিষ্কার দেখতে পেলো। দরবেশরূপী কুচক্রী দেদারছে শরাব গিলছে। গোয়েন্দা যে দিকটা উঁচু করে দরবেশকে দেখছিলো, এ দিকটায় ছিলো দরবেশের পিছন দিক। এই দুই আগন্তুক ছিলো গযনীর দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা।

গোয়েন্দা খুব ধীরে ধীরে তাঁবুর একটি রশি খুলে নিলো এবং হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে পড়ল। দরবেশ তখন প্রচুর মদ গিলে বেহুঁশ। গোয়েন্দা দু'পায়ের উপর ভর করে রশিতে ফাঁস তৈরী করে দরবেশের গলায় ছুঁড়ে দিলো এবং একটানে ফাঁস আটকে ফেলল। দরবেশের মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হওয়ার অবকাশ ছিলো না।

মুহূর্তের মধ্যেই দরবেশের দেহ নিথর হয়ে গেল। দরবেশরূপী মদ্যপের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গোয়েন্দা হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর পিছন দিক দিয়ে দূরে চলে গেলো। এদিকে তার সঙ্গী দরবেশের দুই প্রহরীর সাথে জমিয়ে গল্প করছিল। হঠাৎ তারা পেঁচার ডাক শুনতে পেলো।

পেঁচার আওয়াজ শুনে দরবেশের দুই প্রহরীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার দু'জন সঙ্গীর সাথে এসে মিলিত হলো এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল করে

অন্ধকারে তাদের গন্তব্যে পা বাড়াল। পেছনে পড়ে রইলো হাজারাশীপের সেনাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী চক্রান্তকারীর মরদেহ।

তাদের পরবর্তী গন্তব্য বুখারা। কিন্তু বুখারা হাজারাশীপ থেকে অনেক দূরে। তাদের পক্ষে রাতারাতি বুখারায় পৌঁছে বুখারার দরবেশরূপী কুচক্রীকে হত্যা করা সহজ ব্যাপার ছিলো না।

একে তো বুখারার দূরত্ব অপর দিকে হাজারাশীপের দরবেশের মতো বুখারার দরবেশ তার তাঁবুতে একাকী অবস্থান করতো না। তার সাথে থাকতো আরো কয়েকজন পুরুষ ও নারী। তবুও এই দুই গোয়েন্দা তাদের কর্তব্য পালনে রাতের অন্ধকারে বুখারার পথে ঘোড়া হাঁকাল।

তারা নদীর তীর ধরে দ্রুতগতিতে বুখারার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। যেতে যেতে এক পর্যায়ে নদীর ওপারে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলো। সেখানে নদী ছিলো বেশ চওড়া। চওড়া হওয়ায় বোঝা যাচ্ছিল নদীর গভীরতা সেখানে কম হবে।

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে দুই গোয়েন্দা তাদের ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দিলো। নদীর মাঝখানটা ছিলো যথেষ্ট গভীর। সেখানে ঘোড়াকে সাঁতরিয়ে পার হতে হলো। হাজারাশীপ থেকে বুখারার দূরত্ব ছিলো প্রায় শত মাইলের কাছাকাছি।

* * *

পরদিন ভোর হতে না হতেই হাজারাশীপের সর্বত্র খবর ছড়িয়ে পড়লো, রাতের অন্ধকারে কে বা কারা নদী তীরের তাঁবুতে দরবেশকে হত্যা করেছে। অজ্ঞাত ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন দরবেশ। এ খবর মুহূর্তের মধ্যে শহরময় ছড়িয়ে পড়ল এবং ছড়িয়ে পড়লো সেনাশিবিরে। খবর পেয়ে ছোট-বড় অফিসার, সকল সৈনিক ও সাধারণ মানুষ নদীতীরে অবস্থিত দরবেশের আস্তানায় ভিড় জমালো।

দরবেশের মৃত্যু সংবাদের সাথে সাথে এ খবরও ছড়িয়ে পড়লো যে, গযনীর গোয়েন্দারাই দরবেশকে হত্যা করেছে। কারণ, দরবেশ গযনীর সৈন্য ও গযনী শাসকের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতেন। গযনী সৈন্যদের হাতেই দরবেশ নিহত হয়েছেন, এ কথা সবাই বিশ্বাস করলো। এ খবর হাজারাশীপ সৈন্যশিবিরে বিদ্বেষের আগুন ধরিয়ে দিল।

এই হত্যাকাণ্ডকে ব্যবহার করে গযনী সালতানাতের বিরুদ্ধে হাজারাশীপের সৈন্যদের উত্তেজিত করতে আরো ভয়াবহ প্রচারণা চালানোর সুযোগ পেলে কুচক্রীরা।

সবার মুখে মুখেই একথা উচ্চারিত হতে থাকলো, দরবেশ যে বিপদের কথা বলছিলেন, এই বিপদ এখন মাথার উপরে এসে গেছে। সাধারণ মানুষ ও সৈন্যরা তো আগেই ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলো, এখন দরবেশের নিহতের ঘটনায় কমান্ডাররা পর্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সেই সাথে কমান্ডাররা গযনী সালতানাতের বিরুদ্ধে ক্ষোভে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলো।

* * *

পরদিন সূর্যাস্তের সাথে সাথে গযনীর অকুতোভয় দুই গোয়েন্দা তীব্রগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রায় শত মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে বুখারার উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল। পথিমধ্যে তারা মাঝে-মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য যাত্রাবিরতি দিয়ে তাদের বয়ে নেয়া ঘোড়াকে বিশ্রাম দিয়েছে এবং খাবার খাইয়েছে। বুখারার উপকণ্ঠে পৌঁছে গোয়েন্দা দু'জনের একজন শহরে প্রবেশ করে বুখারায় বহুরূপী ফকিরের বেশ ধারণ করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণরত গযনী গোয়েন্দাদের খুঁজতে শুরু করলো।

শহরে প্রবেশ করে গোয়েন্দা বুখারায় নিযুক্ত দুই গোয়েন্দার একজনকে পেয়ে গেলো। স্থানীয় গোয়েন্দাদেরকে তাদের পরিকল্পনা জানিয়ে, এখন তাদের কি করতে হবে তা বুঝিয়ে দিল।

"খাওয়ারিজমের দরবেশরূপী নিঃসঙ্গ প্রতারককে হত্যা করা সহজ ছিলো। কিন্তু এখানকার কুচক্রী একাকী নয়। আমরা তাকে দেখেছি, সে তাঁবুতে একাকী থাকে বটে; কিন্তু তার তাঁবুর পাশেই রয়েছে সঙ্গীদের তাঁবু।" জানালো স্থানীয় গোয়েন্দারা।

"অন্যরা জেগে গেলে আমরা পাকড়াও হবো কিংবা মারা পড়বো এটাকে সমস্যা মনো করো না।" বললো স্থানীয় দুই গোয়েন্দার একজন। আমাদেরকে পাঠানোর আগে যে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিলো, তা একবার স্মরণ করো। আমরা ইচ্ছা করলে সুলতানকে ধোঁকা দিতে পারবো বটে; কিন্তু মহান আল্লাহ্‌কে আমরা কিছুতেই ধোঁকা দিতে পারবো না। বললো অন্যজন।"

এই ভণ্ড প্রতারক কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে এবং মুসলমানদেরকে পরস্পর শত্রু বানিয়ে ফেলছে তা তোমরা সবই প্রত্যক্ষ করেছো। তোমরা জানো, এই চক্রান্তের মূলে রয়েছে ফিরিঙ্গী খৃস্টান ও ইহুদীচক্র। এরা যা করছে, তা ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করছে।

গভর্নর আলাফতোগীন খাওয়ারিজমের বাদশা হওয়ার জন্য কুরআনের অবমাননা করছে। ধর্মের প্রয়োজনে পবিত্র কুরআরে মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে গিয়ে আমাদের জীবন বিলিয়ে দেয়া উচিত। বললো আগন্তুকদের একজন।

ঠিক আছে, আর কথা নয়, এবার চলো। বললো স্থানীয় গোয়েন্দা।

তিনজন তিনটি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে চতুর্থ সঙ্গীকে সাথে নেয়ার জন্য শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে অন্যজনকেও পেয়ে গেলো। তাকে সাথে নিয়ে সবাই নদীর তীরবর্তী দরবেশের আস্তানার দিকে রওনা হলো।

এরা চারজন নদী তীরের একটি ঘন জঙ্গলে তাদের ঘোড়াকে বেধে রেখে দরবেশের আস্তানার দিকে যখন রওনা হলো, তখন সাধারণ মানুষ সেখান থেকে ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। এরা চারজন দর্শনার্থীদের ভিড়ের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগলো।

এবার দর্শনার্থীরা সেখান থেকে চলে গেল। রয়ে গেলো শুধু নারীদের নিয়ে স্ফূর্তি করার আগ্রহী সেনাকর্মকর্তাদের দু'-চারজন। রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেলো নারীদের দেহ ব্যবসা এবং সেনা কর্মকর্তাদের আমোদফুর্তি।

দরবেশরূপী কুচক্রীর তাঁবু থেকে দূরে গিয়ে নদী তীরের ঝোঁপ-ঝাড়ের আড়ালে যখন প্রশিক্ষিত তরুণীরা তাদের ইপ্সিত নাগরদের নিয়ে ফুর্তিতে মেতে উঠে, তখন ফকিরের আস্তানায় নীরবতা নেমে আসে।

আস্তানায় নীরবতা নেমে এলে গযনীর চার গোয়েন্দা ধীরপায়ে ফকিরের তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল। ফকিরের তাঁবু ছিলো চতুর্দিকে মোটা পর্দা দিয়ে ঘেরা। ভেতরে প্রদীপ জ্বলছিলো।

পা টিপে টিপে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে গযনীর চার গোয়েন্দা ফকিরের তাঁবুতে উঁকি দিতে গেলে একজন কিছু একটার সাথে হোঁচট খায়। তাতে হাত দিয়ে সে বুঝতে পারে এটি মটকা। মটকাতে হাত দিয়ে ঘ্রাণ শুকে সে বুঝে

নেয়, এটি জ্বালানী তেলে ভর্তি। এমতাবস্থায় দুজন ফকিরের তাঁবু ঘেঁষে বসে পড়ল।

এরা পর্দা ফাঁক করে ভেতরে দেখতে পেলো, অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় ফকিররূপী কুচক্রীর পাশে প্রায় উলঙ্গ এক সুন্দরী তরুণী বসে তাকে মদ ঢেলে দিচ্ছে। ফকির ও তরুণী উভয়েই দেদারছে মদ গলাধঃকরণ করছে। এক গোয়েন্দা তেলভর্তি মটকাটা উল্টে দিয়ে তাঁবুর পর্দা ভিজিয়ে দিলো আর অন্যরা ধারালো খঞ্জর হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল।

হঠাৎ এদের দু'জন পর্দা উঁচু করে ফকির ও তরুণী কিছু বুঝে উঠার আগেই তাদের মুখ চেপে ধরলো। ফকির ও তরুণী উভয়েই ছিলো মদের নেশায় বুঁদ। প্রতিরোধ তো দূরের কথা তাদের পক্ষে একটু শব্দ করারও অবকাশ হলো না।

মুহূর্তের মধ্যে দুই গোয়েন্দা ধারালো খঞ্জর ফকির ও তরুণীর বুকে বিদ্ধ করলো। একবার খঞ্জর বুকে বিদ্ধ করে টেনে বের করে পুনর্বার বিদ্ধ করতেই ফকির ও তার সঙ্গীনি তরুণীর ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। নীরবে এদের খতম করে দু'জন বাইরে বেরিয়ে এলো। অপর দুজন তাঁবুর বাইরে অপেক্ষা করছিল।

অপেক্ষমাণ এক গোয়েন্দা অত্যধিক ক্ষুব্ধ হয়ে মটকার জ্বালানী তেল অন্যান্য তাঁবুতেও ছিটিয়ে দিতে লাগলো। পার্শ্ববর্তী তাঁবুর বাসিন্দারা এতোটাই নিশ্চিন্তে গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিলো যে, তাদের কেউ এদের কোনকিছুই টের পেল না। সব তাঁবুতে তেল ছিটিয়ে দিয়ে ফকিরের তাঁবু থেকে প্রদীপ এনে সব তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিল। জ্বলন্ত তাঁবুর ভেতরে ঘুমন্ত বাসিন্দাদের আর্তচিৎকার শুরু হওয়ার আগেই তারা দ্রুত পায়ে জায়গা ত্যাগ করে ঘোড়া নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিল।

* * *

দু'দিন পর নাহিদাকে খবর দেয়া হলো, দরবেশরূপী কুচক্রীদের ইহলীলা সাঙ্গ করে দেয়া হয়েছে। বুখারায় যেসব সেনাসদস্য অবস্থান করছিলো, তাদের কর্মকান্ড ছিলো জনগণের বিপক্ষে এবং আতংকজনক। বুখারাতেও ফকিররূপী ধর্মগুরুর হত্যাকাণ্ডকে গযনী বাহিনীর নৃশংসতা হিসেবে প্রচারিত হয়। এ খবরে বুখারার সৈন্যরা গযনীর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

এদিকে বুখারা ও হাজারাশীপের কথিত ধর্মতাত্ত্বিকের নিহতের ঘটনা এবং সেখানকার সেনাদের গযনীবিরোধী বিক্ষোভের খবর সুলতানের কাছে পৌঁছালো সাত দিন পর।

সুলতানের কাছে প্রথম খবর পৌঁছালো নাহিদার তৎপরতার কথা। দ্বিতীয় খবর এলো নাহিদার নির্দেশে হাজারাশীপ ও বুখারার কথিত ধর্মগুরুদের হত্যা করা হয়েছে।

এসব খবর শুনে সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন সুলতান। তার ভাবনা শেষ হতে না হতেই খবর এলো নাহিদার পক্ষ থেকে আরেকজন দূত জরুরী খবর নিয়ে এসেছে।

এই দূত জানালো, আবুল আব্বাসের নিযুক্ত বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন বুখারায় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে এবং বুখারা ও হাজারাশীপের সকল সৈন্যকে সেনাপতি আবু ইসহাক এবং সেনাপতি খমরতাশ বিদ্রোহী করে তুলেছে। রাজধানী জুরজানিয়ায় যে সামান্যসংখ্যক সৈন্য রয়েছে, তারা আবুল আব্বাসের পক্ষে বটে; কিন্তু বিপুল বিদ্রোহী সৈন্যের আক্রমণে প্রতিরোধ করার মতো শক্তি তাদের নেই।

এ খবর শুনে তাৎক্ষণিকভাবে সুলতান মাহমূদ আবুল আব্বাসের নামে পয়গাম লিখালেন। ঐতিহাসিকদের মতে সুলতানের লেখা এই পয়গামের ভাষ্য ছিলো অনেকটা এমন–

"আমার বিশ্বাস, আপনার বিরুদ্ধে ধেয়ে আসা বিদ্রোহ আপনার পক্ষে দমন করা অসম্ভব। কারণ, একে তো আপনার বয়স কম, দ্বিতীয়ত এ ধরনের বিদ্রোহ দমনের অভিজ্ঞতাও আপনার নেই। আপনার ক্ষমতাচ্যুতি কিংবা বিদ্রোহীদের হাতে আপনি নিহত হওয়ার আগেই আপনাকে আমার সহযোগিতা করা উচিত। কিন্তু এই সাহায্য ও সহযোগিতা তখনই করা সম্ভব, যখন আপনার স্বাধীনতা ও স্বাধিকার অক্ষুণ্ন রেখেই আপনি আমার অধীনতা কবুল করে নেবেন এবং আমার নামে খুতবা জারি করবেন।

আমার অধীনতা স্বীকার করে নিলেও আপনার স্বাধীকার ও স্বাতন্ত্রবোধ বজায় রাখা হবে। এই অধীনতা স্বীকার করে নিলে আপনার বিশেষ উপকার এই হবে যে, আমি আপনার ক্ষমতা বহাল রাখার জন্যে আমার সবচেয়ে চৌকস সেনাদল আপনার নিরাপত্তা রক্ষায় রাজধানী জুরজানিয়ায় মোতায়েন

করতে পারবো। দ্বিতীয়ত তারা শুধু আপনাকেই নিরাপত্তা দেবে না, আপনার গোটা রাষ্ট্রের নিরাপত্তাব্যবস্থা আপনার নিয়ন্ত্রণে এনে দেবে।

আপনাকে সতর্ক করে দিতে বাধ্য হচ্ছি যে, এ ব্যাপারে যদি আপনার পরামর্শ একান্তই দরকার হয়, তাহলে শুধু প্রবীণ উজির আবুল হারেসের সাথেই আপনি পরামর্শ করতে পারেন। এ ব্যাপারে বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন ও সেনাপতিদের সাথে যদি পরামর্শ করেন, তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করবে।

আপনি এতোটাই অনভিজ্ঞ যে, আপনাকে ঘিরে আপনার রাষ্ট্রের চারপাশে কী ঘটছে, আপনি এ ব্যাপারে একেবারেই বেখবর। শত শত মাইল দূরে গযনীতে বসেও আমি জানতে পারছি, বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে আপনি একেবারেই সঙ্গীহীন। আশা করবো, এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে আপনি অযথা কালক্ষেপণ ও সময় নষ্ট করবেন না।"

* * *

খ্যাতিমান ঐতিহাসিক বায়হাকী লিখেছেন, গযনী সুলতানের লেখা এই পয়গাম খাওয়ারিজম শাহ আবুল আব্বাসের কাছে পৌঁছুলে তিনি এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্য রাষ্ট্রের সকল গভর্নর ও সেনাপতিদের সভা ডাকলেন। এ সভায় বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন, সেনাপতি আবু ইসহাক, সেনাপতি খমরতাশও বাদ পড়লো না।

এহেন পরিস্থিতিতে আবুল আব্বাস সুলতান মাহমূদের অধীনতা গ্রহণের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি পয়গামটি কাউকে না দেখিয়ে সভায় শুধু এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, গযনী শাসক সুলতান মাহমূদ তার অধীনতা কবুল করে নিয়ে খুতবায় তার নাম পাঠ করার প্রস্তাব করেছেন।

বৈঠকে উপস্থিত একমাত্র উজির আবুল হারেস ছাড়া সকল সেনাপতি ও গভর্নরই প্রস্তাব মেনে নেয়ার বিপক্ষে মতামত দিলেন। রাজধানীর রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের খবর বৈঠক শেষ হতে না হতেই দ্রুত সকল সেনাশিবিরে পৌঁছে গেলো। খবর পাওয়ামাত্রই সেনারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিল।

আবুল আব্বাস বিদ্রোহের কথা শুনে সৈন্যদের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করে বিদ্রোহ আপাতদৃষ্টিতে প্রশমন করলেন। সেদিনের বৈঠক সিদ্ধান্ত ছাড়াই মুলতবী হয়ে গেল। চারদিন পর আবারো বৈঠক ডাকা হলো।এবার বৈঠকে আবুল আব্বাস ঘোষণা করলেন, গযনীর অধীনতা মেনে নেয়া হবে না। গযনী সুলতান যদি খাওয়ারিজম আক্রমণ করে বসে, তাহলে তুর্কী খানদের কাছ থেকে সহযোগিতা নেয়া হবে। এজন্য তুর্কি খানদের সাথে সহসাই মৈত্রীচুক্তি করা হোক এবং সেই চুক্তিকে গোপন রাখা হোক।

ঐতিহাসিক বায়হাকী লিখেছেন, আবুল আব্বাসের এই সিদ্ধান্তের খবর গযনীর গোয়েন্দারা সুলতানকে যথাসময়ে জানিয়ে দিল। সুলতান খবর পেলেন, আবুল আব্বাস তার প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে তুরস্কের খানদের সাথে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করতে যাচ্ছেন।

এ খবর শুনে সুলতান মাহমূদ সৈন্য এবং পাঁচশত জঙ্গী হাতির বহর নিয়ে খাওয়ারিজমের নিকটবর্তী বলখ পৌছে আবুল আব্বাসকে খবর পাঠালেন, সুলতানের প্রেরিত পয়গাম না মানলে গযনী বাহিনী জুরজানিয়া আক্রমণ করবে।

সুলতানের সেনাসমাবেশের খবর শুনে তুর্কিস্তানের খান শাসকরা খাওয়ারিজম শাহের সাথে সামরিক সহযোগিতা চুক্তি করতে অস্বীকৃতি জানালো।

তুর্কিস্তানের খান শাসকরা বলখে এসে সুলতানকে খাওয়ারিজম আক্রমণ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করলো। কিন্তু সুলতান তাদের কথায় সম্মত হলেন না। তিনি তার অভিপ্রায়ে অবিচল রইলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে তুর্কি খানেরা আবুল আব্বাসকে গিয়ে সুলতানের প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী করালো। সেইসাথে খাওয়ারিজম জুড়ে সুলতানের নামে খুতবা দেয়ার প্রস্তাব পাশ করালো।

সুলতানের দাবী পূরণে আবুল আব্বাস সম্মত হওয়ায় সুলতান বলখ থেকে তাঁর সেনা বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিলেন।

সুলতান মাহমূদের সময়কার বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক আবু নসর মুহাম্মদ আল উতবী ছিলেন সুলতানের একজন ঘনিষ্টজন। উতবী বহু সফরে সুলতানের সহযাত্রী ছিলেন। সুলতানের পক্ষে তিনি কয়েকবার বিভিন্ন রাষ্ট্রে

দূতের ভূমিকাও পালন করেছেন। উতবী তার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ সম্বলিত প্রামাণ্যগ্রন্থ কিতাব আল ইয়ামিনীতে লিখেছেন–

"আবুল আব্বাস সুলতানের প্রস্তাব মেনে নিতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কারণ তিনি স্বাধীনতা ও স্বাধিকার হারানোর আশঙ্কা করছিলেন। কিন্তু তার উজির আবুল হারেস তাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, সুলতানের প্রস্তাব মেনে নেয়ার মধ্যে এতোটা ক্ষতি নেই, যতটুকু ক্ষতি সেনাবিদ্রোহে হবে। সর্বোপরি সম্মত সুলতানের প্রস্তাব মেনে নিতে আবুল আব্বাসকে নাহিদা করাতে জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

নাহিদা আবুল আব্বাসকে আশ্বস্ত করতে বলেছিলেন–

"আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, আমার ভাই আপনার স্বাধীনতা কখনো হরণ করবেন না। তিনি আপনাকে তার মিত্র এবং আপনাকে বিদ্রোহের আশঙ্কা থেকে নিরাপদ করতে চান।"

"আমি বুঝতে পারছি না, কে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে? আমার সেনাদের প্রতি আমার আস্থা আছে।" নাহিদার উদ্দেশে বললেন আবুল আব্বাস।

"আপনি ভুল ধারণা পোষণ করছেন। সেনাবাহিনী থেকে আপনার আস্থা এবং আপনার প্রতি সৈন্যদের বিশ্বস্ততা বিনষ্ট করে দেয়া হয়েছে।"

"কে সেনাদের মন থেকে আমার আস্থার বিলোপ ঘটিয়েছে?"

"আপনার গভর্নর আলাফতোগীন, সেনাপতি আবু ইসহাক এবং সেনাপতি খমরতাশ।" বললেন নাহিদা।

এদের পশ্চাতে রয়েছে ফিরিঙ্গী খৃস্টান ও ইহুদী কুচক্রী গোষ্ঠী। আপনাকে বুঝতে হবে, সুলতান মাহমূদের সহযোগিতা ছাড়া আপনার বাদশাহী টেকানো অসম্ভব। আপনি আত্মশ্লাঘায় না ভুগে আমার কথায় বিশ্বাস করুন। আপনি দয়া করে গযনী সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করে নিন।"

চিন্তা-ভাবনার পর অবশেষে আবুল আব্বাস সুলতানের আনুগত্য মেনে নিতে সম্মত হলেন এবং সুলতানের নামে খুতবা পাঠের ঘোষণা জারি করলেন।

সুলতানের নামে খুতবা পড়ার হুকুমনামা হাজারাশীপ ও বুখারায় পৌঁছুলে সৈন্যদের মধ্যে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব থেকেই সৈন্যদেরকে

সুলতানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছিল। এবার তার নামে খুতবা পড়ার হুকুমনামা ক্ষোভের আগুনে যেন ঘি ঢেলে দিলো।

বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন সৈন্যদের ছোট বড় কমান্ডারদের ডেকে এনে বললো, দরবেশগণ যে বিপদাশঙ্কার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এই বিপদ এখন গযনী সেনাবাহিনীর রূপধারণ করে আসছে। যে করেই হোক এ বিপদ আমাদের রুখতেই হবে। নয়তো আমাদের ও তোমাদের মা-বোনেরা গযনীর লুটেরা হিংস্র বাহিনীর দাসী-বাঁদীতে পরিণত হবে।

হিন্দুস্তানকে লুণ্ঠনকারী সুলতান মাহমূদ এখন খাওয়ারিজমকে লুণ্ঠনের জন্য এবং এখানকার মুসলিম নারীদের বাঁদী-দাসীতে পরিণত করে গযনী নিয়ে যাওয়ার জন্য আসছে। পরিতাপের বিষয়, খাওয়ারিজম শাহ আবুল আব্বাস নিজেই এই ভয়ঙ্কর লুটেরাকে ডেকে আনছেন। গযনীর লুটেরাদের প্রতিরোধ করতে হলে সর্বাগ্রে আমাদেরকে খাওয়ারিজম শাহী খতম করে সেনাশাসন জারি করতে হবে।

আলাফতোগীন সেনাকমান্ডারদের উদ্দেশে বললেন, প্রত্যেক কমান্ডার নিজ নিজ ইউনিটের সেনাদের বলে দাও, দরবেশগণ তোমাদের যে ভাগ্য বদলের কথা বলেছিলো, সেই দরবেশদের হত্যাকারী খুনীরা এখন তোমাদের ভাগ্য বরবাদ করতে আসছে।

ওদিকে হাজারাশীপের সৈন্যদেরকেও সেনাপতি আবু ইসহাক এবং সেনাপতি খমরতাশ একইভাবে গযনী সুলতান ও আবুল আব্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উন্মাদনায় উত্তেজিত করে বিদ্রোহে ইন্ধন দিলো।

* * *

এই ঘটনার কয়েক দিন পরের ঘটনা। আবুল আব্বাসের একান্ত সংবাদবাহক এসে তাকে খবর দিলো, তুর্কিস্তানের কয়েকজন খান আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। তাদের সাথে গভর্নর আলাফতোগীনও রয়েছেন। তারা লেকের পাড়ের বাগানে অপেক্ষা করছেন। গভর্নর আলাফতোগীন তাদের মর্যাদা দেয়ার জন্য মহামান্য শাহকে নিজে তাদের অভ্যর্থনা জানানোর অনুরোধ করেছেন।

খবর শুনে আবুল আব্বাস তার একান্ত প্রহরীদেরকে সওয়ারী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। এমন সময় নাহিদার কাছে খবর গেলো, বাদশা আবুল আব্বাস বাইরে কোথাও যাচ্ছেন। তিনি দৌড়ে আবুল আব্বাসের খাস কামরায় পৌছুলে আবুল আব্বাস তাকে বললেন তিনি কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাচ্ছেন। নাহিদা আবুল আব্বাসকে বাইরে যেতে নিষেধ করলেন।

"তুর্কিস্তানের মেহমান এসেছে। তাদের সম্মানে আমি নিজে অভ্যর্থনা জানাতে যাচ্ছি। অসুবিধা কী? তাদের সাথে গভর্নর আলাফতোগীন রয়েছেন।"

"না, আপনি যাবেন না। এমনই যদি হতো, আলাফতোগীন দূত পাঠালো কেন? সে নিজেই তো আসতে পারতো।" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আবুল আব্বাসকে বললেন নাহিদা।

"আরে, এই মহিলাদের নিয়ে যতো সমস্যা। এখানে তুমি সমস্যার কী দেখলে? ঘাবড়ে যাচ্ছো কেন নাহিদা?"

"আল্লাহ্র দোহাই লাগে আবুল আব্বাস! তুমি এখন বাইরে যেয়ো না। আমার মন বলছে, বাইরে কোন বিপদ অপেক্ষা করছে।"

নাহিদা আবুল আব্বাসের হাত ধরে বললেন, "আবুল আব্বাস! জীবনে কোনদিন আমি তোমাকে কোথাও যেতে নিষেধ করিনি। আজ তোমাকে করজোড় মিনতি করছি। তুমি বাইরে যেয়ো না। কোন জরুরী কাজের বাহানা করে যাওয়া বাতিল করে দাও।"

"ধুত্তরী! আমি মহিলা নাকি?"

"না, তুমি মহিলা হবে কেন? পুরুষ হলেও আজ একজন অবলা নারীর কথা রাখো। আজ আমার এই অনুরোধটুকু রক্ষা করো" বলে কেঁদে ফেললেন নাহিদা। আমি বাইরে ভয়ঙ্কর বিপদাশঙ্কা করছি।"

"স্মিত হেসে আবুল আব্বাস নাহিদার উদ্দেশে বললেন, প্রেমের টানে এতোটা উতলা হয়ে যাওয়া ঠিক নয় নাহিদা। আমাকে আমার অবস্থান থেকে নামিয়ে দিও না তুমি! বাইরে ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

"আবুল আব্বাসকে বাইরে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে না পেরে বিপদাশঙ্কায় নাহিদার হিতাহিত জ্ঞান হারানোর উপক্রম হলো। আবুল আব্বাস নাহিদাকে পাশ কেটে বাইরে বেরিয়ে পড়লে নাহিদাও দৌড়ে বেরিয়ে এলেন।

ততোক্ষণে আবুল আব্বাসকে বহনকারী ঘোড়ার গাড়ী নিরাপত্তা রক্ষীদের ভিড়ে চলে গেছে। উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত নাহিদাকে তার একান্ত সেবিকা ও দাসীরা বোঝাতে ও সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু নাহিদার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ক্রমেই বেড়ে চললো।

এর কিছুক্ষণ পরেই রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে বহুসংখ্যক অশ্বারোহীর দৌড়ঝাপের শব্দ শোনা গেলো। সেই সাথে সেনাদের তাকবীর ধ্বনি ভেসে এলো।

আবুল আব্বাস হয়তো ফিরে এসেছেন এই আশায় নাহিদা দৌড়ে তার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু বিধি বাম, আসলে এরা ছিলো বিদ্রোহী সেনা, যারা রাজপ্রাসাদকে ঘেরাও করেছিলো। বিদ্রোহী সেনারা শ্লোগান দিচ্ছিলো, নারীলিপ্সু খাওয়ারিজম শাহীর পতন হয়েছে, গযনী গোলামকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, খাওয়ারিজম শাহী আলাফতোগীন জিন্দাবাদ...।

নাহিদার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো। তিনি মাথা দু'হাতে ধরে কোনমতে নিজের বিছানায় গিয়ে পড়ে গেলেন। ইত্যবসরে রাজপ্রাসাদ দখলের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে সর্বপ্রথম নৃশংসতার শিকার হলেন আবুল আব্বাসের বিশ্বস্ত উজির আবুল হারেস। তাকে নির্মমভাবে কুপিয়ে খুন করলো আলাফতোগীনের লেলিয়ে দেয়া সৈন্যরা। তারা আবুল হারেসকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হলো না, তার শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেললো।

রাজপ্রাসাদের ভেতর-বাইরের সবখানে হাজারাশীপ ও বুখারার সৈন্যরা ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলো। কিন্তু আলাফতোগীনের নির্দেশে নির্বিচারে হত্যা ও লুটতরাজ থেকে বিরত রইল সৈন্যরা। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে আবুল আব্বাসের বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী ও অনুগত ভৃত্যদের খুঁজে খুঁজে বের করে এনে হত্যা করা হলো। রাজধানী জুরজানিয়াতে নিযুক্ত সৈন্যদের দু'টি ইউনিট বিদ্রোহী-সেনাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু তাদের সৈন্যসংখ্যা এতোটাই কম ছিলো যে, বিদ্রোহীরা তাদের সবাইকে ঘেরাও করে অস্ত্রসমর্পণে বাধ্য করল। এরপর যে ডেপুটি সেনাপতির নির্দেশে বিদ্রোহীদের মোকাবেলার জন্য এই ইউনিটের সৈন্যরা প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তুলেছিলো, তাকে এবং তার অধীনস্ত সকল কমান্ডারের ধরে ধরে হত্যা করলো।

বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন বিজয়ী এবং রাজার বেশে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলো। সে ছিলো স্বঘোষিত বাদশা। এই বাদশাহ হওয়ার প্রতি জুরজানিয়া ও খাওয়ারিজমের সাধারণ মানুষের কোনই আগ্রহ ছিলো না। দেশের সাধারণ মানুষ তাকে কখনো রাজার আসনে বসানোর উপযুক্ত মনে করেনি।

রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে গভর্নর আলাফতোগীন খাওয়ারিজম শাহের রাজকীয় মসনদে আসীন হয়ে ফরমান জারি করল, "দেশব্যাপী ঘোষণা করে দাও, খাওয়ারিজম শাহীর পতন হয়েছে, আজ থেকে আলাফতোগীন খাওয়ারিজমের বাদশা এবং আবুল আব্বাস নিহত হয়েছে।"

অবশেষে নাহিদার আশঙ্কাই সত্যে পরিণ হলো। তুর্কিস্তানের খানের আগমনের মিথ্যা খবর দিয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে বাইরে এনে আলাফতোগীনের নির্দেশে বিদ্রোহী সৈন্যরা সরলমতি আবুল আব্বাসকে হত্যা করল।

সময়টা ছিলো ৪০৭ হিজরী সনের ১৫ শাওয়াল মোতাবেক ১০১৮ খৃস্টাব্দের ১৭ মার্চ।

ঐতিহাসিক বায়হাকী ও গারদিজী লিখেছেন, বিদ্রোহী সেনাদের রাজমহলে প্রবেশ করতে দেখে নাহিদার একান্ত কর্মচারী জেবীন– যে প্রকৃতপক্ষে গযনী সুলতানের একজন পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত গোয়েন্দা ছিলো– দৌড়ে নাহিদার কক্ষে প্রবেশ করলো। জেবীন নাহিদার কক্ষে গিয়ে দেখে নাহিদা বিছানায় পড়ে বিলাপ করছে–

"আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম, মৃত্যু তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেলো"। এমতাবস্থায় জেবীন নাহিদার জীবনাশঙ্কা বোধ করলো। সে নাহিদাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, চিন্তা করো না শাহজাদী, যে করেই হোক আমরা তোমাকে গযনী নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো। যা ঘটে গেছে এ নিয়ে বিলাপ করে বিদ্রোহী সেনাদের তোমার প্রতি মনোযোগী করো না। বিপদে ধৈর্য ধরো এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে স্বাভাবিক হও।"

নাহিদা শরীর থেকে রাজকীয় পোশাক ছুঁড়ে ফেলে অতি সাধারণ সেবিকাদের পোশাক গায়ে জড়িয়ে মাথায় উড়না দিয়ে সাধারণ বেশে প্রাসাদ তাগ করে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। এ কাজে তাকে পথপ্রদর্শন করছিলো তারই একান্ত কর্মচারী জেবীন।

সাধারণ সেবিকার রূপ ধারণ করে ছদ্মবেশে নিজের কক্ষ ত্যাগের উদ্দেশ্যে নাহিদা চৌকাঠে পা রাখতেই তার মুখোমুখী হলো আলজৌরী।

"তোমার খাওয়ারিজম শাহীর রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে নাহিদা! পালাবে কোথায়? বাইরে গেলে বিদ্রোহী সেনাদের হাতে খুন হবে, নয়তো উত্তেজিত সৈন্যরা তোমাকে টেনে ছিড়ে ফেলবে।" ভর্ৎসনামাখা কণ্ঠে বললো আলজৌরী।

"শোন নাহিদা, আমার কথা মেনে আমার সাথে এসো। আমি হারেমে তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওখানে থাকলে তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।

আর ভালো চাইলে, তুমি আমার বাবাকে বিয়ে করতে পারো। এখন তো আর তোমার পক্ষে গযনী ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। এখানে বন্দী থাকার চেয়ে আমার বাবার চতুর্থ স্ত্রী হয়ে থাকা অনেক ভালো হবে।"

"আলজৌরী!" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন নাহিদা। আমার গযনী ফেরার জন্য মোটেও তাড়া নেই। অচিরেই দেখতে পাবে গযনীর সিংহের দল এখানে পৌঁছে যাবে... ।"

হঠাৎ ব্যাঘ্র মূর্তি ধারণ করে গলা চড়িয়ে আলজৌরীর উদ্দেশ্যে নাহিদা বললো–

"শয়তানী, সরে যা আমার সামনে থেকে। আমি এখনো শাহজাদী। গযনীর সিংহ সুলতান মাহমূদের বোন আমি। এখনো আমার ভাই মরে যায়নি।

ভুলে গেছো তুমি কার মেয়ে? এক নিমকহারাম সেনাপতির মেয়ে তুমি। ক্ষমতার উদগ্র লিপ্সা যাকে পরিণতির কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। যাও, গিয়ে ওদের বলো, সাহস থাকলে ওরা যেনো আমাকে হত্যা করে, নয়তো জেলখানায় বন্দী করে। এরপর তুমি নিজ চোখেই বাপের নিকমহারামীর পরিণাম এবং স্বঘোষিত শাহের ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখতে পাবে।"

ঠোঁটের কোনে বিদ্রূপাত্মক হাসি এবং বাঁকা চাহনী দিয়ে আলজৌরী সেখান থেকে চলে এলো।

এই ফাঁকে জেবীন নাহিদাকে বললো, আসুন শাহজাদী, আমরা এই ফাঁকে এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি।

"না জেবীন! আমি চুপিসারে পালিয়ে যাবো না। আমি ধোঁকাবাজ প্রতারক, নিমকহারাম চক্রান্তকারী খাওয়ারিজম শাহীর মুখোমুখী হবো।"

একথা বলে ঝড়ের বেগে কক্ষ ছেড়ে বাইরের দিকে পা বাড়ালেন নাহিদা। কিন্তু জেবীনকে তার পিছু পিছু দৌড়াতে দেখে দাঁড়িয়ে বললেন, "জেবীন! আমার ভবিষ্যৎ আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দাও। তুমি আমার ধারে কাছে থাকলে ওরা তোমাকে জ্যন্ত রাখবে না। তুমি বরং খবর নাও, এখানকার পরিস্থিতির সংবাদ দিতে কেউ গযনী রওনা হয়ে গেছে কি না। যদি কাউকে খুঁজে না পাও, তাহলে নিজেই চলে যাও। আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে নাও।"

* * *

খাওয়ারিজম শাহের মসনদে বসে আলাফতোগীন নানা শাহী ফরমান ঘোষণা করছিলো, যে মসনদে কয়েক ঘন্টা আগেও বসেছিলেন আবুল আব্বাস। আলাফতোগীনের দরবারে কিছু লোক দু'হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে ছিলো। এদের অধিকাংশই ছিলো সেনাবাহিনীর লোক। আবুল আব্বাসের শাসনব্যবস্থাপনায় জড়িত কেউ সেখানে ছিলো না। আলাফতোগীনের দরবারে কিছুটা শোরগোলের মতো নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থা বিরাজ করছিল। হঠাৎ দরবারে পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেলো মানুষের ভিড় ঠেলে সদ্যবিধবা রাণী নাহিদা বাঘিনীমূর্তি ধারণ করে আলাফতোগীনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

"ওহ্, নাহিদা! নাহিদার দিকে তাকিয়ে বললো আলাফতোগীন। তোমার ব্যাপারে আমি কোন কিছু চিন্তা করারই অবসর পাইনি।

"নাহিদা, আমি জানি, তুমি প্রাণ ভিক্ষা চাইতে এসেছো। তুমি হয়তো বুঝতে পারোনি, তোমার স্বামীকে কিন্তু তুমিই হত্যা করিয়েছো। তুমি তার উপর ছলনার জাদু চালিয়ে তাকে গযনীর কেনা গোলামে পরিণত করেছিলে। খাওয়ারিজমের স্বাধীনচেতা জনতা, খাওয়ারিজমের আত্মমর্যাবোধসম্পন্ন সেনাবাহিনী কোন বহির্দেশের গোলামী কখনো বরদাশত করে না। দেখতেই পাচ্ছো, সমগ্র জাতি ও সৈন্যরা মিলিত হয়ে আমাকে বুখারা থেকে টেনে এনে এই মসনদে বসিয়েছে। এখন আমি তাদের ইচ্ছাতেই শুধু এই মসনদ ছাড়তে

পারি। জাতি আমার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করছে, যেকোন মূল্যে এই দায়িত্ব আমি পালন করবো।"

"প্রাণ ভিক্ষা নয়, আমি প্রাণ দিতে এসেছি বেঈমান!" হুংকার দিয়ে বললেন নাহিদা।

তোমার জানা উচিত, আমি যা করেছি, তা আল্লাহ্ ও এখানকার সাধারণ মুসলমানদের ঈমানের সার্থে করেছি। তাদের ধর্ম, ইজ্জত, সম্ভ্রম ও মর্যাদার সাথে করেছি।

বেঈমান! তুমি নিজে যেমন পবিত্র কুরআনের অসম্মান করেছো, ফিরিঙ্গিদের দিয়েও পবিত্র কুরআনের অবমাননা করিয়েছো। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সবকিছু দেখেন, আল্লাহ্র কাছে তুমি কিছুই লুকোতে পারবে না।

বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যার ফুলঝুরি দিয়ে সরলপ্রাণ জনতা ও সৈন্যদের বিভ্রান্ত করতে পারলেও অচিরেই জেনে যাবে, জনতা তোমাকে এখানে আনেনি, তুমি জনতা ও সৈন্যদেরকে ধোঁকা দিয়ে এখানে এসেছো। তুমি যদি জাতির কাছে এতোটাই প্রিয় ব্যক্তি হতে আর এতোটাই সম্মানী ব্যক্তি হতে, তাহলে প্রতিটি গলি আর প্রতিটি বাড়ির সামনে সৈন্য মোতায়েন করেছো কেন? শহরের লোকদেরকে তোমাকে অভ্যর্থনা জানানোর সুযোগ দিচ্ছো না কেন? তোমার এই রাজকীয় অভিষেকের দিনে শহরে মৃত্যুর মাতম কেন? শহরের মানুষ তোমার বিজয়ের জয়ধ্বনী করছে না কেন? শহরের চতুর্দিকে সেনারা টহল দিচ্ছে কেন?"

হঠাৎ দরবারে এক কোন থেকে গর্জন শোনা গেলো, "হুঁশ করে কথা বলো মহিলা। তুমি কি জানো না, খাওয়ারিজম শাহের সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছো?"

"খাওয়ারিজম শাহ! সে তো ছিলো আমার স্বামী। এই খুনীরা আমার স্বামীকে হত্যা করেছো। কিন্তু আমার আল্লাহ্ মরেননি। তিনি অবশ্যই এই খুনের প্রতিশোধ নেবেন।

আলাফতোগীনের উদ্দেশ্যে সাহিদা চিৎকার করে বললো, আলাফতোগীন! সেনাবাহিনীর সহযোগিতা ও ছত্রছায়ায় তুমি খাওয়ারিজমের বাদশাহী করার মতলব নিয়ে যদি এই মসনদ দখল করে থাকো, তবে আমি তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, অচিরেই তোমার এই দিবাস্বপ্ন কর্পুরের মতো উবে যাবে। আর যে ছাতার আশ্রয়ে ক্ষমতার আশায় খুনের নেশায় তুমি উন্মত্ত হয়ে আছো, অচিরেই

এমন তুফান দেখতে পাবে, যাতে তোমার এসব আশ্রয় খড়কুটোর মতো বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে না।

খাওয়ারিজম শাহের মসনদ একটি পবিত্র মসনদ। মসনদের যোগ্য ব্যক্তি ছাড়া এখানে কারো বসার অধিকার নেই। তুমি মামুনী খান্দানের জুতা বহন করে তোষামোদী করে গভর্নরের পদে পৌঁছেছিলো। মামুনী খান্দান তোমার চক্রান্তকে আমলে না নিয়ে তোমাকে বুখারার গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত করেছিলো। কিন্তু তুমি সেই পুরস্কারের মর্যাদা রাখতে পারলে না। তোমার সীমাহীন লোভ, হিংসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর বেঈমানী তোমার ভাগ্যে আজীবন কয়েদখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পঁচে পঁচে দুর্গন্ধ ছাড়ানোর পরিণতি লিখে দিয়েছে। এটাই হয়তো তোমাকে বরণ করতে হবে।"

"নিয়ে যাও ওকে! বেচারী পাগল হয়ে গেছে। ওকে তার নিজস্ব কক্ষে রেখে বাইরে প্রহরা বসিয়ে দাও। তার নিজস্ব শয়ন কক্ষেই তাকে নজরবন্দী করে রাখো। আমি সুলতান মাহমূদকে লিখে পাঠাবো, তুমি যদি খাওয়ারিজমের উপর আগ্রাসন চালাও, তাহলে তোমার বোনের থেতলানো দেহ দেখতে পাবে। নাহিদাকে তোমরা মুক্তিপণ হিসেবে রাখতে পারো। তার উপর কোন ধরনের অত্যাচার করো না। মানুষ যাতে একথা বলতে না পারে, খাওয়ারিজম শাহী আলাফতোগীন এক বিপন্ন বিধবা অসহায় নারীর উপর জুলুম করেছে।

'ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তোমার কবরের উপরেও থুতু ছিটাবে।' ভর্ৎসনামাখা কণ্ঠে বললেন নাহিদা। যে সেনাবাহিনীর জন্ম হয়েছিলো কাফের-বেঈমানদের বিরুদ্ধে ঈমানদারদের পক্ষ হয়ে লড়াই করার জন্য, সেই সেনাদেরকে তুমি নিজ ভূমি জয় করার ভ্রাতৃঘাতি হানাহানিতে প্ররোচিত করেছো। যে সেনারা সব সময় উৎকর্ণ থাকতো নির্দেশের জন্য, তাদেরকে তুমি এখন শাসক বানিয়ে দিয়েছো, এখন আর এই সেনাবাহিনীর একদিনও যুদ্ধ করার যোগ্যতা নেই।

অতঃপর উর্দ্ধতন কোন সেনাপতির নির্দেশে কয়েকজন সৈন্য নাহিদাকে দু'দিক থেকে হাত ধরে তার কক্ষে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

সেই সময়কার বিখ্যাত ঐতিহাসিক আলফজলী তার লেখা কিতাব 'আছারুল উজারা' গ্রন্থে লিখেছেন–

"চার মাস পর্যন্ত আলাফতোগীন খাওয়ারিজমে চরম দুঃশাসন চালায়। গোটা খাওয়ারিজমব্যাপী সে ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং নিজেকে ইসলামের পতাকাবাহী ও ইসলামের সেবক ঘোষণা করে। কিন্তু কারো মুখ থেকে যদি তার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র বিরোধিতামূলক শব্দ বের হতো, তাকেই ধরে এনে হত্যা করতো।

দেশব্যাপী আবাসিক এলাকায় সারাক্ষণ সেনাবাহিনী টহল দিতো। কারো পক্ষ থেকে বিরোধিতার সামান্য সংশয় জাগ্রত হলেই তাকে ধরে এনে হত্যা করতো। ফলে দিন দিন সাধারণ মানুষের জীবন, মান সংকীর্ণ হয়ে এলো। খাদ্যসামগ্রীর দাম আকাশচুম্বি হলো। জনজীবনে নেমে এলো চরম হতাশা। কিন্তু সেনাবাহিনীর লোকেরা রাজকীয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। দেশের উন্নত ও শ্রেষ্ঠ সব উৎপাদন তাদের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হলো। লাখ লাখ মুসলিম জনতাকে সেনাবাহিনী তাদের গোলামে পরিণত করলো।

প্রশ্ন হতে পারে দীর্ঘ চারমাস পর্যন্ত সুলতান মাহমূদ কী করলেন? কারণ, আলাফতোগীনের সফল অভ্যুত্থানের খবর তো তিনি চতুর্থ দিনেই পেয়ে গিয়েছিলেন।

সুলতান মাহমূদের সামনে তখন দু'টি সমস্যা ছিল।

প্রথমত কাশ্মীর বিপর্যয়ের পর সৈন্যঘাটতি তখনো পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সেই সাথে সুলতান এমন বিপুল শক্তি নিয়ে খাওয়ারিজম আক্রমণ করতে চাচ্ছিলেন, যাতে তিনি এক অভিযানেই গোটা খাওয়ারিজম কব্জায় নিয়ে নিতে পারেন। দ্বিতীয়ত তিনি তার ছোট বোন নাহিদাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন, যাতে আক্রমণের সময় প্রতিপক্ষ নাহিদার সামনে মানবিক কোন দুর্বলতা উত্থাপন করে তাকে মানসিকভাবে ঘায়েল করতে না পারে।

'আছারুল উজারা' গ্রন্থে লেখা হয়েছে, নাহিদাকে জীবন্ত উদ্ধারের ব্যাপারটি সুলতান তার উপদেষ্টা পরিষদে এই বলে উত্থাপন করেন-"সম্মানিত উপদেষ্টাবৃন্দ! আমার ভগ্নিপতি ও অগণিত নিরপরাধ মুসলমান হত্যার প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে আমার বুকে। আমর আদরের ছোট বোনটি আবারো বৈধব্যের শিকার হয়েছে। এখন যদি আমি এদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক অভিযানের নির্দেশ দিই, তাহলে সেটি আমার ব্যক্তিগত সার্থোদ্ধারের জন্য বলে অভিহিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। ইতিহাস হয়তো বলবে, আমি ব্যক্তিগত হিংসা

চরিতার্থ করতে গিয়ে দুটি ভ্রাতৃপ্রতীম মুসলিম বাহিনীকে সংঘাতে লিপ্ত করে খুন ঝরিয়েছি। আপনারা গোটা ব্যাপারটি সামনে রেখে আমার করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিন। এই বিদ্রোহ ফিরিঙ্গীরা ঘটিয়েছে এবং একটি সুন্দর শান্তিপূর্ণ মুসলিম দেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। কিছুদিন পরে হয়তো দেখা যাবে, গোটা খাওয়ারিজমে ফিরিঙ্গীরা ছেয়ে গেছে। এই অঞ্চলে ফিরিঙ্গীদের উপস্থিতি গযনী ও ইসলামের জন্য কেমন হতে পারে, এ বিষয়টি আপনাদের অজ্ঞাত নয়।

"নাহিদা আমাদের গর্বের ধন, তার সাথে গযনীর ইজ্জত-আব্রুর প্রশ্ন জড়িত।" বললেন সুলতানের উজির। আমাদের প্রথম কাজ হবে তাকে ওখান থেকে বের করে আনা। আমরা আগে আক্রমণ করলে তার খুন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া আমরা যে কোন ধরনের আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিলে তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হতে পারে। আমরা আলাফতোগীনকে পয়গাম দিতে পারি, সে যেন নাহিদাকে সসম্মানে গযনী পাঠিয়ে দেয়। যদি সে তা না করতে চায়, তাহলে কমান্ডো পাঠিয়ে আগে তাকে বন্দীদশা থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হোক। এরপর খাওয়ারিজমে সেনাভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে।"

উপদেষ্টাদের সবাই উজিরের কথা সমর্থন করলেন। অতঃপর আরো কিছু ব্যাপারে শলাপরামর্শের পর সর্বসম্মতিক্রমে একটি পরিকল্পনা তৈরী করা হলো। আলাফতোগীনের নামে নাহিদাকে সসম্মানে গযনী পাঠিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করে একটি পয়গাম পাঠানো হলো।

* * *

গযনী ও খাওয়ারিজমের মধ্যে দূরত্ব তখন প্রায় পাঁচশত মাইল। তন্মধ্যে অধিকাংশ এলাকা পাহাড়ী আর বাকীটা মরুময় পাথুরে এলাকা। মরু এলাকাকে তখনকার দিনে 'সাহরায়ে গায' বলে ডাকা হতো।

দূতের যেতে আসতে প্রায় কুড়ি দিন সময় লেগে গেলো। নাহিদাকে ফেরত পাঠানোর পয়গামের জবাবে আলাফতোগীন বললো, নাহিদার মুক্তি পেতে হলে গযনী সুলতান তাকে খাওয়ারিজম শাহ্ বলে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তার সাথে কোন ধরনের যুদ্ধ করা হবে না এই মর্মে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করতে হবে।"

নাহিদাকে নিরাপদে ও সসম্মানে রাখা হয়েছে, তা প্রমাণ করার জন্য আলাফতোগীন নিজে গযনীর দূতকে নাহিদার আবদ্ধ কক্ষ দেখিয়ে দেয় এবং দূতের সাথে নাহিদার সাক্ষাত করায়। আলাফতোগীনের নির্দেশে বন্দী নাহিদার কক্ষ খুলে দূতের সাথে তার কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়।

নাহিদার সাথে দূতের সাক্ষাত পরবর্তীতে গযনীর প্রেরিত কমান্ডোদের জন্য উপকারে আসে। নাহিদার একান্ত কর্মচারী জেবীন জুরজানিয়ার পতন ও আবুল আব্বাসের নিহত হওয়ার সংবাদ নিয়ে নাহিদার নির্দেশে গযনী এসে পড়েছিলো। সে জুরজানিয়ার রাজপ্রাসাদের সকল নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল।

নাহিদাকে উদ্ধারের জন্য পাঁচজন কমান্ডো নির্বাচিত করা হলো। তন্মধ্যে জেবীন ছিলো পঞ্চম।

* * *

পাঁচ কমান্ডো অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে জুরজানিয়া পৌঁছে গেল। তারা জুরজানিয়া গিয়ে একটি সরাইখানায় রাত যাপন করলো। পাঁচজনের পাঁচটি ঘোড়া ছাড়াও তারা একটি অতিরিক্ত ঘোড়াও সাথে নিল।

রাজধানী জুরজানিয়া ও আবুল আব্বাসের রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত জেবীন এই কমান্ডো অভিযানে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করল। সে এক কমান্ডোকে সাথে নিয়ে শহরের ভেতরে ঢুকে রাজপ্রাসাদের আঙিনায় চলে এলো। তারা আসার সময় শহরময় সকল রাস্তায় বিদ্রোহী দখলদার সেনাদের টহলরত অবস্থায় দেখতে পেল। তারা সারাদিন ছদ্মবেশে শহর ও রাজপ্রাসাদের বাইরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আবার সরাইখানায় ফিরে গেল।

পরদিন গযনীর পাঁচ কমান্ডো যখন সরাইখানা থেকে বের হলো, তখন তাদের পরনে ছিলো খাওয়ারিজম বাহিনীর উর্দি। তাদের হাতের বল্লমে খাওয়ারিজম সেনাদের পতাকা। এই পতাকা ছিলো খাওয়ারিজম বাহিনীর বিশেষ ইউনিটের প্রতীক। তারা বিশেষ বাহিনীর বিশেষ সৈন্য হিসেবে মাথা উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে পথ অতিক্রম করছিলো। প্রত্যেকেই ছিল অশ্বারোহী এবং পাঁচজনের সাথে একটি অতিরিক্ত ঘোড়াও জিনবাঁধা ছিলো। তাদের

ঘোড়াগুলোর চাল-চলনেই বোঝা যাচ্ছিল এগুলো সেনাবাহিনীর বিশেষ ইউনিটের দীর্ঘ প্রশিক্ষিত ঘোড়া। শহরের পথ অতিক্রম করার সময় টহলরত অশ্বারোহী সৈন্যদের সাথেও তাদের সাক্ষাত হলো। তারা একই বাহিনীর সমগোত্রীয় ভাইয়ের মতো স্মিত হাসি দিয়ে তাদেরই পরিচিত নিয়মে সম্ভাষণ জানালো।

শহরের বাসিন্দারা এমনিতেই সেনাশাসনে ভীত-বিহ্বল ছিল। তদুপরি বিশেষ বাহিনীর বিশেষ ঘোড়ায় আরোহী সৈন্যদের দেখে পথ ছেড়ে পাশে দাঁড়িয়ে তাদের যাবার পথ করে দিচ্ছিল এবং সম্মানসূচক সালাম দিচ্ছিলো। বস্তুত এই পাঁচ কমান্ডো ছিলো গযনী বাহিনীর বিশেষ দলের সদস্য। তাদের বহনকারী ঘোড়াগুলোও ছিল প্রশিক্ষিত। এ ছাড়া তারা খাওয়ারিজম বাহিনীর পোশাক ও পতাকাধারী বল্লম ধারণ করেছিলো বলে বিশেষ বাহিনীর মতো করে এগিয়ে যেতে তাদের কোন বেগ পেতে হয়নি। কারণ, তারা প্রত্যেকেই ছিলো উপযুক্ত ও প্রশিক্ষিত। তাছাড়া তারা আগেই জেনে নিয়েছিলো খাওয়ারিজমের বিশেষ বাহিনীর রীতিনীতি।

জেবীনের দেখানো পথে অনায়াসেই গযনীর পাঁচ কমান্ডো আবুল আব্বাসের রাজপ্রাসাদের সদর দরজায় চলে গেল। এই পাঁচ কমান্ডো ভয়ানক অভিযানে নেমেছিলো। তারা জানতো, ধরা পড়লে তাদের কী ভয়ঙ্কর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু সকল ভয়-শঙ্কাকে দু'পায়ে দলে তারা সদর দরজায় গিয়ে রাজমহলের ভেতরে প্রবেশ করলো।

রাজমহলের প্রহরীরা এই কমান্ডোদেরকে তাদের বাহিনীর বিশেষ ইউনিটের সদস্য মনে করে কোন ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ না করে পথ ছেড়ে দিল। জেবীন তার সঙ্গীদেরকে একটি ঘোর অন্ধকার পথে নাহিদার কক্ষে নিয়ে গেল। মহলের ভেতরেও দখলদার সেনাদেরকে কয়েক জায়গায় সতর্ক প্রহরা দিতে তাদের নজরে পড়ল। কিন্তু গযনীর এই অকুতোভয় কমান্ডোরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে সামনে অগ্রসর হলো।

রাজপ্রাসাদের একটি জায়গায় গিয়ে জেবীন সঙ্গীদের দাঁড় করিয়ে অতিরিক্ত ঘোড়াটি ও একজন সঙ্গীকে নিয়ে আরো এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জেবীন ও তার সঙ্গী ঘোড়া থেকে নেমে নাহিদার কক্ষের সঙ্গে লাগোয়া সেবিকার কক্ষে প্রবেশ করল। কক্ষের সামনে প্রহরী দাঁড়ানো। এর পরেই নাহিদার কক্ষ। কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে জেবীন স্থানীয় ভাষায় প্রহরীদেরকে

বললো, "দরজা খোল, বন্দী মহিলাকে শাহে খাওয়ারিজম আলাফতোগীনের একটি পয়গাম শোনাতে হবে।"

প্রহরী দরজা খুলে দিতেই চকিতে তারা দু'জন প্রহরীকে টেনে কক্ষের ভিতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল এবং তরবারীর আগা প্রহরীদের বুকে ধরে তার গায়ের উর্দি খুলতে বাধ্য করলো। এরপর কাপড় দিয়ে প্রহরীদের হাত-পা বেঁধে তাদের মুখে কাপড় গুঁজে পিঠমোড়া করে বেধে মেঝেতে উপুড় করে ফেলে রাখল। সেই সাথে বললো, আমরা গযনীর কমান্ডো, একটু শব্দ করবে তো এক আঘাতেই মেরে ফেলবো।

প্রহরীর গা থেকে খুলে নেয়া একটি উর্দি নাহিদাকে দিয়ে সেটি দ্রুত পরে নেয়ার জন্য অনুরোধ করল দুই কমান্ডো।

মুহূর্তের মধ্যে নাহিদা প্রহরীর উর্দি পরে সৈনিকের বেশে তাদের সাথে বাইরে বেরিয়ে এলো। কমান্ডো দু'জন সেই কক্ষ থেকে বের হয়ে বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়ে দ্রুত এসে অশ্বারোহণ করল এবং নাহিদাকে সাথে থাকা অতিরিক্ত ঘোড়াটিতে সওয়ার হওয়ার জন্য ইশারা করল।

নাহিদা ছিলেন অশ্বারোহণে অভ্যস্ত এবং প্রশিক্ষিত। কমান্ডোদের ইশারা পেতেই তিনি এক লাফে দক্ষ সৈনিকের মতোই ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। এরা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের সঙ্গীদের সাথে মিলিত হয়ে বিনা বাধায় সদর দরজা পেরিয়ে আসতে সক্ষম হলো।

ফেরার পথে শহরের পথ অতিক্রম করার সময় আগের মতোই তাদের চাল ছিলো বিশেষ বাহিনীর মতো। খুব দৃঢ়তার সাথেই তারা মূল শহর থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলো। তারা যখন শহরের সীমানায় দাঁড়িয়ে গাছগাছালীর আড়ালে এসে পড়ল, তখন সবাই এক সাথে উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাঁকালো।

নাহিদাও প্রশিক্ষিত কমান্ডোদের সাথে সমানতালে অশ্ব হাঁকিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি অভিজ্ঞ কমান্ডোদের মোটেও অনুভব করতে দেননি, তিনি নিতান্তই একজন অবলা নারী। তিনি কমান্ডোদের মতোই সমানতালে এই দুঃসাহসী অভিযানে নারীত্বের সকল দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে অশ্ব ছোটালেন। এই অভিযানে তিনিও কমান্ডোদেরই একজন সঙ্গী।

* * *

ইত্যবসরে সুলতান মাহমূদ সৈন্য ঘাটতি অনেকাংশেই দূর করে ফেলেছিলেন। কয়েক মাস যাবত মসজিদের ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে জুমআর দিনে ঘোষণা করা হচ্ছিলো, রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও দীনের সার্থে সেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবকের তীব্র প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ইমামদের এই ঘোষণার ফলে হাজার হাজার তরুণ যুবক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়। স্বেচ্ছাসেবকরা প্রত্যেকেই নিজের ব্যবহার্য ঘোড়া কিংবা উট সাথে নিয়ে এসেছিল। যারা সশরীরে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগদান করতে পারেনি, তারা তাদের উট কিংবা ঘোড়া সেনাবাহিনীর প্রয়োজন মিটানোর জন্য দিয়ে দিয়েছিল।

প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সুলতান মাহমূদ যখন খাওয়ারিজমের বিরুদ্ধে অভিযানের নির্দেশ দিলেন, তখন তার সেনাসদস্যের সংখ্যা অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলিয়ে এক লাখের উপরে এবং প্রশিক্ষিত জঙ্গী হাতির সংখ্যা পাঁচশতেরও বেশী।

সুলতান তাঁর সৈন্যদের বলখ পর্যন্ত নিয়ে থামতে বললেন। বলখে পৌঁছার পর তার সামনে ছিলো বিশাল বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী মরুময় অঞ্চল। মরুময় বিজন এলাকার যাত্রাপথের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য সুলতান পূর্ব থেকেই বিজন এলাকা দিয়ে প্রবাহিত তুরমুজ নামক স্থানে নদীর তীরে বিশ হাজার বড় নৌকা তৈরী করিয়ে রেখেছিলেন। অকসাস নামক এই নদীর প্রবাহ ছিলো খাওয়ারিজমের দিকে।

সুলতানের গোটা বাহিনী তাদের হাতি, ঘোড়া, উট, সৈন্য তথা আসবাবপত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামসহ বিশ হাজার জাহাজবাহী নৌকায় বোঝাই করা হলো।

নদীর ভাটির প্রবাহের সাথে বিশাল এই নৌকা বহর এগিয়ে চলল। এই নদীর ইতিহাসে এটিই ছিল কোন রাজশক্তির সবচেয়ে বড় সেনাভিযান ও নৌমহড়া।

সুলতানের এই নৌবহর হাজারাশীপ উপকূল অতিক্রম করে খাওয়ারিজমের রাজধানী জুরজানিয়ার অদূরে গিয়ে যাত্রাবিরতি করলো। সৈন্যরা নৌবহর থেকে নেমে ডাঙায় শিবির স্থাপন করলো।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, দখলদার আলাফতোগীনের কাছে সুলতান মাহমূদের বিশাল নৌবহর ও সেনাসমাবেশের খবর গেলো। তখন অনাক্রমণ চুক্তি করার জন্য একজন দূতকে দিয়ে সুলতান মাহমূদের কাছে পয়গাম পাঠালো।

কিন্তু ক্ষুব্ধ সুলতান আলাফতোগীনের সন্ধিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। সেই সাথে তিনি এমন কিছু কঠিন শর্তের উল্লেখ করে সন্ধিপ্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন, যার ফলে আলাফতোগীন ঘাবড়ে গেলো। অগত্যায় মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য আলাফতোগীন গোটা খাওয়ারিজমের সৈন্যদের এক জায়গায় জড়ো করে দেখে তাদের সংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ হাজার।

দখলদার আলাফতোগীন সেনাবাহিনীর সবচেয়ে যোগ্য ও অভিজ্ঞ পাঁচ-ছয়জন সেনাপতিকে হত্যা করিয়েছিলো শুধু আবুল হারেস ও আবুল আব্বাসের প্রতি আনুগত্যের অপরাধে। তাছাড়া সেনাবাহিনীর বহু তেজস্বী কমান্ডারকেও বিদ্রোহের আশঙ্কায় আলাফতোগীন হয় অন্তরীণ, নয়তো হত্যা করিয়ে ফেলেছিলো। ফলে খাওয়ারিজম বাহিনীতে সুলতানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো যোগ্য সেনাপতি ও কমান্ডারের অভাব দেখা দেয়। সার্বিক অবস্থা আন্দাজ করতে পেরে আলাফতোগীন প্রমাদ গুণতে শুরু করে।

কিন্তু পরাজয়ের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে- এটা বোঝার পর আলাফতোগীনের অনুসারীরা মরিয়া হয়ে মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হয়। যুদ্ধের প্রথম দিকের মোকাবেলা সুলতানের চড়া মূল্য দিতে হয়।

সুলতানের অগ্রবর্তী বাহিনী সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আলতাঈর নেতৃত্বে মূলশিবির থেকে অনেকটাই সামনে অবস্থান নিয়েছিলো।

আলতাঈর সৈন্যরা যখন ফজরের নামাযের জামাতে শরীক হলো এবং সকল সৈন্য একসাথে জামাতে নামায আদায় করছিলো, তখন আলাফতোগীনের সহযোগী সেনাপতি খমরতাশ তার গোটা বাহিনী নিয়ে আলতাঈ সহযোদ্ধাদের উপর হামলে পড়ে।

আলতাঈ ছিলেন ইতিহাসখ্যাত সেনাপতি। জীবনে অসংখ্যবার চরম দূরাবস্থার মধ্যেও তিনি পরাজয়কে জয়ে পরিণত করেছিলেন। কৌশলী ও অভিজ্ঞ সমরনায়ক হিসেবে ইতিহাস তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। যার নাম

সুলতান মাহমূদের সমপর্যায়ে উচ্চারিত হয়। সেদিন তিনি তার শিবিরে সকল যোদ্ধাদের নিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্তেই ফজরের নামায আদায় করছিলেন।

শত্রুবাহিনী হয়তো জানতো, সুলতানের সৈন্যরা রণাঙ্গনেও জামাতে নামায আদায় করে থাকে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য মদখোর খমরতাশ তার দলবল নিয়ে পূর্ব থেকে অদূরে অবস্থান নিয়েছিলো।

যেই দেখলো, আলতাঈর তামাম সৈন্য নামায পড়ছে, ঠিক তখন এক সাথে হাজার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে খমরতাশ নামাযরত সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সুলতানের এই সৈন্যরা ছিলো একেবারেই অপ্রস্তুত। তাদের কারো পক্ষেই প্রতিরোধ করা সম্ভব হলো না। ফলে সুলতানের নির্বাচিত চৌকস সৈন্যদের বিরাট অংশ নিহত হলো। সেনাপতি আলতাঈ মুষ্টিমেয় কয়েকজন কমান্ডার ও সহযোদ্ধা নিয়ে কোনমতে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হলেন।

সুলতান মাহমূদ এই অযাচিত অতর্কিত আক্রমণ ও হতাহতের খবর শুনে তার রিজার্ভ বাহিনীকে খমরতাশের বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। এরা অগ্রসর হয়ে জানতে পারলো, খমরতাশ আলতাঈর সহযোদ্ধাদের কচুকাটা করে চলে গেছে।

সুলতানের এই রিজার্ভ বাহিনী ছিলো তার একান্ত নিরাপত্তা ইউনিট। এই ইউনিটের প্রতিজন সদস্য যেমন ছিলো ভিন্নতর শক্তির অধিকারী, তেমনি তাদের সওয়ারীগুলোও ছিল অন্য সওয়ারীর চেয়ে তেজস্বী। এরা অগ্রসর হয়ে যখন দেখল, খমরতাশ আলতাঈর বাহিনীকে তছনছ করে চলে গেছে, তখন তারা ওদের পিছু ধাওয়া করলো। খমরতাশের সৈন্যরা তখনো খুব বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। আকস্মিক আক্রমণের অস্বাভাবিক সাফল্যের পর তাদের মনোবল দারুণ বেড়ে গিয়েছিল এবং অভিযান শেষে অনেকটা আয়েশে কিছু পথ অগ্রসর হয়ে খমরতাশের সৈন্যরা আরাম করার জন্য যাত্রাবিরতি করল।

এই এলাকাটি ছিল মরুময়। হঠাৎ পশ্চাৎদিকে ধূলি উড়ার আলামত দেখতে পেল খমরতাশ। সে বুঝে গেল সুলতানের বাহিনী হামলার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। খমরতাশ তার সৈন্যদেরকে জবাবী আক্রমণে প্রতিহতের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিল। প্রতিপক্ষ বাহিনীকে খমরতাশের সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়ে তৈরী হয়ে গেল।

সুলতানের সৈন্যরা খমরতাশের বাহিনীকে ঘেরাও করার চেষ্টা করলো আর খমরতাশের সৈন্যরা ঘেরাও ভাঙার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলো। কিন্তু সুলতানের এই বাহিনীর ঘেরাও থেকে বের হওয়া খমরতাশের সৈন্যদের পক্ষে সম্ভব হলো না।

চলন্ত ও দূরন্ত সুলতানের এই সৈন্যদের সংখ্যা নিরূপণ করা খমরতাশের পক্ষে সম্ভব হলো না। খমরতাশের সৈন্যরা ঘেরাও থেকে বের হওয়ার জন্য দৌড়-ঝাঁপ পাড়ছিলো আর সুলতানের বাহিনীর হাতে ঘায়েল হচ্ছিল। পলায়নপর সৈন্যদের সাথে গযনী বাহিনীর মোকাবেলা বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। অল্প সময়ের মধ্যে সকল শত্রু সৈন্যকে ঘায়েল করে খোদ খমরতাশকে পাকড়াও করে ফেললো সুলতানের সৈন্যরা। মুখোমুখী সংঘর্ষে খুবই করুণ পরিণতি বরণ করতে হলো খমরতাশের। গ্রেফতার হয়ে সে সুলতানের দরবারে নীত হলো।

* * *

রাতের বেলা সুলতান মাহমূদ সৈন্যদেরকে নতুনভাবে বিন্যাস করলেন। সৈন্যদের এক অংশকে নদীর তীরে মোতায়েন করে তাদেরকে নির্দেশের অপেক্ষায় রাখলেন। তিনি তাদের বললেন, নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে তোমরা নৌবহর নিয়ে রাজধানী জুরজানিয়ার নিকটবর্তী গিয়ে শিবির স্থাপন করো।

পরদিন সুলতান মাহমূদ কোন তৎপরতা না চালিয়ে নিষ্ক্রিয় রইলেন। তিনি শত্রুবাহিনীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, এখনই আক্রমণের জন্য তিনি প্রস্তুত নন।

আলাফতোগীন কোন বিশেষজ্ঞ সমরবিশারদ ছিল না। তার অন্যতম সেনাপতি খমরতাশ ছিল বন্দী। সেনাপতি আবু ইসহাককে আলাফতোগীন নদী তীরের কোন এক জায়গায় রিজার্ভ রেখেছিল। তাছাড়া সে গুরুত্বপূর্ণ ও অভিজ্ঞ সেনাপতিদের হত্যা করিয়ে ফেলেছিল।

আলাফতোগীন সুলতানের রণকৌশল বুঝতে সক্ষম হলো না। তাছাড়া সুলতানের সেনাবিন্যাস সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। সুলতানের সেনাবিন্যাসের কোন খোঁজখবর না নিয়েই নিজেকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান এবং

সুলতানের বাহিনী অপ্রস্তুত রয়েছে ভেবে আক্রমণ করে বসে। এই আক্রমণ ছিল ৪০৮ হিজরীর সফর মোতাবেক ১০১৭ সালের ৩ জুলাই।

'আছারুল উজারা' নামক ইতিহাস গ্রন্থে 'আলফজলী' এই যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনায় লিখেছেন, এই আক্রমণে আলাফতোগীন নিজে নেতৃত্ব দিয়েছিল। সে ছিল তার সেনাবাহিনীর সবচেয়ে সামনে। সে ডান বাম কোন দিকে খেয়াল না করেই আক্রমণ করে বসে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এই আক্রমণে আলাফতোগীনের সাধারণ যোদ্ধারা সাহসিকতার সাথে লড়াই করে। তারা গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দিচ্ছিল এবং গযনী বাহিনীকে আল্লাহ্‌র প্রিয় দুই বুযুর্গের হন্তারক বলেও স্লোগান দিচ্ছিল। তাদের হৃদয়ে খুবই সূক্ষ্মভাবে গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণা জন্মাতে সক্ষম হয়েছিল।

এই ঘৃণা ও ক্ষোভ শক্তিতে পরিণত হলো। শুধু বীরত্ব ক্ষোভ ও খুনের নেশায় যদি সামরিক লড়াইয়ে বিজয়ী হওয়া যেতো, তবে এই বিজয় পাওনা ছিলো আলাফতোগীনের। কিন্তু অপরিমেয় ক্ষোভ থাকার পরও নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখে সমরকৌশলে বিজয় নিশ্চিত করেছিলেন সুলতান। তাঁর রণকৌশল ছিল দূরদর্শী এবং সময়োচিত।

সুলতান মাহমূদ যুদ্ধের শুরুতে ঘোড়া থেকে নেমে দু'রাকাত নামায পড়লেন এবং নামায শেষে আলাফতোগীনের ডান বাহুতে হস্তিবাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন।

আলাফতোগীনের সৈন্যরা তখনো হস্তিবাহিনীর কোন সদস্যকে দেখেনি। হঠাৎ তাদের ডান বাহুকে হস্তিবাহিনী আক্রমণ করলো। জঙ্গী হাতিগুলো এগিয়ে আসার সাথে সাথে বিকট চিৎকার করছিল। হাতির চিৎকারে আকাশও যেনো কেঁপে উঠছিল।

খাওয়ারিজমের সৈন্যরা কখনো হস্তিবাহিনীর মোকাবেলা করেনি। বিশালদেহী জঙ্গি হাতির দানবীয় চিৎকার ও দৈত্যের মতো এগিয়ে আসার ভাব দেখেই আলাফতোগীনের সৈন্যরা ভড়কে গেল। তারা জানতো না হাতি দেখতে যদিও ভয়ানক; কিন্তু এদের দুর্বলতাও প্রকট।

সুলতান হস্তিবাহিনীর ডানে বামে পদাতিক সৈন্য এবং পেছনে অশ্বারোহী সৈন্যদের নিযুক্ত করলেন।

জঙ্গি হাতিগুলো যখন শত্রুসেনাদের দিকে দৌড়ে এগুচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল জমিন দুলছে। আলাফতোগীন তার সেনাদের উজ্জীবিত করার সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করলো। কিন্তু সৈন্যরা হাতির ভয়ানক চিৎকার ও কাণ্ডকারখানা দেখে ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ল।

হস্তিবাহিনীর দুটি হাতি শত্রুযোদ্ধাদের মধ্যভাগে চলে গেল। মধ্যভাগে অবস্থান করছিল সেনানায়ক আলাফতোগীন। আলাফতোগীনের মধ্যভাগের যোদ্ধারা বীরবিক্রমে মোকাবেলা করলো কিন্তু এক পর্যায়ে আলাফতোগীনের দেহরক্ষী বাহিনীর মধ্যে ভাঙন দেখা দিল।

দিন শেষে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধের অবসান হয়ে গেল। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ভেবে আলাফতোগীন পালিয়ে গেল; কিন্তু রণাঙ্গন থেকে তার পক্ষে নিষ্ক্রান্ত হওয়া সম্ভব হলো না। সুলতানের সৈন্যরা তাকে ঘেরাও করে পাকড়াও করে ফেলল।

* * *

জুরজানিয়া ছিল রাজধানী। বিদ্রোহী খলনায়ক আলাফতোগীন গ্রেফতার ও পরাজিত হলেও বিজয়কে অর্থবহ করার জন্য সুলতানের প্রয়োজন ছিল রাজধানী কব্জা করা।

নদীর তীরে অপেক্ষমাণ সৈন্যদেরকে তিনি নৌবহরে রাজধানী জুরজানিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সুলতানের সৈন্যরা প্রায় চারহাজার নৌকায় আরোহণ করে রাজধানীর দিকে রওনা হলো।

সুলতানের নৌবহর জুরজানিয়ার নিকটবর্তী হলে তারা দেখতে পেলো তাদের সম্মুখ দিক থেকে অন্তত ত্রিশহাজার সৈন্যের বিশাল এক নৌবহর এগিয়ে আসছে।

তখন ভোরের সূর্য পূর্বাকাশে উঁকি দিচ্ছে। ত্রিশ হাজার নৌকার আরোহীর এই বিশাল নৌবহর ছিল আলাফতোগীনের সহযোগী সেনাপতি আবু ইসহাকের নেতৃত্বে। আলাফতোগীন এই সৈন্যদের রিজার্ভ রেখেছিল। সুযোগমতো সে এদের তলব করতো। কিন্তু এদের তলব করার আর সুযোগ হয়নি। এর আগেই আলাফতোগীন সুলতানের সেনাদের হাতে ধরা পড়ে এবং তার বাহিনী শোচনীয় পরাজয়ের মুখোমুখী হয়।

সেনাপতি আবু ইসহাক খবর পেয়েছিল, সুলতানের একদল সৈন্য নদীতীরে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে। সে বুঝতে পারলো, এদের পথ ও গন্তব্য রাজধানী জুরজানিয়া। আবু ইসহাক ভাবলো, জুরজানিয়ার সাধারণ লোক তাদের বিদ্রোহে ক্ষুব্ধ।

এমতাবস্থায় প্রতিপক্ষের জুরজানিয়া আক্রমণ করলে স্থানীয় সৈন্যদের মধ্যে ভাঙন দেখা দিতে পারে। তাছাড়া রাজধানীতে অনেকের পক্ষে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে। এরচেয়ে বরং সকল সৈন্য নিয়ে রাজধানীর বাইরেই শত্রুবাহিনীর মোকাবেলা করা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। যেই চিন্তা সেই কাজ। সেনাপতি আবু ইসহাক ত্রিশহাজার নৌকায় তার অনুগত সৈন্যদের সওয়ার করে মোকাবেলার জন্য এগিয়ে এলো।

সুলতানের নৌবহর অগ্রসর হয়ে বুঝতে পারলো, শত্রুবাহিনী নৌযুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। বস্তুত উভয় নৌবহর মুখোমুখি হতেই নৌযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধের ধরন ছিলো অনেকটা মল্লযুদ্ধের মতো।

একটি নৌকা অপর নৌকার মুখোমুখি হলে শত্রুসেনাদের উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষ লাফ দিয়ে শত্রু নৌকায় গিয়ে মল্ল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছিল। নৌকা পরস্পর টক্কর দিচ্ছিল আর যোদ্ধারা একে অন্যের উপর আঘাত হানতে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। আর আহত ও নিহত যোদ্ধাদের তাজা রক্তে লাল হচ্ছিল নদীর পানি।

এক সংবাদবাহক এসে সুলতান মাহমূদকে খবর দিলো, জুরজানিয়ায় গযনী সৈন্যদের সাথে আলাফতোগীনের একাংশের নৌযুদ্ধ চলছে। খবর শোনামাত্রই সুলতান অশ্বারোহী বাহিনী এবং উষ্ট্রারোহী ইউনিটকে নৌসেনাদের সহযোগিতার জন্য অভিযানের নির্দেশ দিয়ে নিজেও অশ্বপৃষ্ঠে রওনা হলেন। এই সৈন্যরা যখন অকুস্থলে পৌছলো, তখন যুদ্ধ প্রায় স্তিমিত হয়ে এসেছে এবং নদীর মধ্যে উভয় সেনাদের মাল্লাবিহীন নৌকা পরস্পর টোকাটুকি করছে।

উষ্ট্রারোহী সৈন্যরা নদীর তীর থেকে শত্রুসেনাদের নৌকা চিহ্নিত করে শত্রুদের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। কোন কোন অশ্বারোহী তো এমন বীরত্ব প্রদর্শন করলো যে, ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দিলো, কিন্তু পানির পরিমাণ বেশী ও নদীতে স্রোত থাকার কারণে তারা তেমন সুবিধা করতে পারলো না।

সুলতান ঃ হমূদ নদীতীরে পৌঁছে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়া সকল অশ্বারোহীকে তীে ঃ নিয়ে এলেন।

এদিকে সুলতা। মাহমূদের বাহিনীর সাথে দখলদার আলাফতোগীন বাহিনীর যুদ্ধ এবং আলাফতোগীনের গ্রেফতারীর খবর শুনে রাজধানী জুরজানিয়ার সাধারণ অধিবাসীরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। এ সম্পর্কে তৎকালীন ঐতিহাসিক ইসকান্দারয়র লিখেছেন, 'রাজধানী জুরজানিয়ার মানুষ আলাফতোগীনের বারো মাসের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো।

জুরজানিয়ায় আইনের শাসন বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। ন্যায়নিষ্ঠা ও ইনসাফের নামগন্ধও ছিলো না আলাফতোগীনের সেনাশাসনে। প্রত্যেক নাগরিকের ঘাড়ের উপর গ্রেফতারীর খড়্গ সব সময় ঝুলন্ত থাকতো। সাধারণ সৈনিকের কথাও তখন রাজকীয় ফরমানের মর্যাদা পেয়েছিল।

নির্যাতিত-নিপীড়িত জুরজানিয়ার সাধারণ লোকজন যখন জানতে পারলো, খমরতাশ ও আলাফতোগীন গযনী বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছে এবং এখন আবু ইসহাকের অনুগত সৈন্যদের সাথে নদীতে গযনী সেনাদের যুদ্ধ চলছে।

এ খবর শোনার সাথে সাথে গযনীর আবাল-বৃদ্ধ হাতের নাগালে তরবারী-বল্লম-নেজা-দা-বটি-লাঠি যাই পেয়েছে নিয়ে নদীর তীরের দিকে দৌড়াতে শুরু করে দিলো এবং পথিমধ্যে নগররক্ষায় যেসব সৈন্য সামনে পেলো, তাদের উপর হামলে পড়লো।

দিনব্যাপী চললো এই নৌযুদ্ধ। সূর্য ডোবার কিছুক্ষণ আগে শহরের লোকেরা যখন গযনী সেনাদের সাহায্যের জন্য বেরিয়ে এলো এ খবর শোনামাত্র তীরে দাঁড়িয়ে নির্দেশদাতা সেনাপতি আবু ইসহাক পালোনোর উদ্যোগ নিল।

কিন্তু তার পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। পলায়নপর আবু ইসহাককে পাকড়াও করে তার সেনাবাহিনীর লোকেরাই গযনী বাহিনীর হাতে সোপর্দ করলো। আর সাধারণ লোকজন গিয়ে গযনী সেনাদের সহযোগিতা করতে শুরু করলো। তারা খাওয়ারিজম বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণেও কুণ্ঠাবোধ করলো না।

ঐতিহাসিক বায়হাকী ও ইবনে ইস্কান্দার লিখেছেন, দখলদারদের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন সুলতান মাহমূদ। ক্ষুব্ধ সুলতান নদীর তীরব্যাপী উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া

ছুটিয়ে তীরন্দাজদের আরো বেশী করে সঠিক নিশানায় তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। রাগে-ক্ষোভে তার মুখ থেকে ফেনা বেরিয়ে আসছিলো।

দিনের শেষে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও রাতভর চললো শত্রুসেনাদের গ্রেফতারী এবং গযনীর আহত ও নিহত সেনাদের একত্রিত করার কাজ। আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছিল।

রাতের বেলায়ই শহরের শীর্ষ কর্মকর্তা এবং গণমান্য লোকেরা এসে সুলতানের কাছে ওইসব অপরাধীদের পাত্তা জানিয়ে দিচ্ছিল যারা কোন না কোনভাবে আলাফতোগীনের বিদ্রোহের সাথে জড়িত ছিলো এবং আবুল আব্বাসকে হত্যার পেছনেও যাদের হাত ছিলো।

সেই রাত্রেই ওইসব চিহ্নিত অপরাধীদের পাকড়াও অভিযান শুরু হয়ে গেল।

* * *

পরদিন প্রথম প্রহরে দখলদার খলনায়ক আলাফতোগীন, সেনাপতি আবু ইসহাক ও সেনাপতি খমরতাশকে সুলতানের সামনে পেশ করা হলো। তৎকালীন ঐতিহাসিক বায়হাকী, উতবী এবং গরদীজী লিখেছেন, সুলতান মাহমূদকে ইতোপূর্বে এমন ক্ষুব্ধ অবস্থায় কখনো দেখা যায়নি।

ধৃত বিদ্রোহীদের নায়কদের তিনি যে শাস্তি দিলেন, তাতে হয় তো তার অন্তরাত্মাও কেঁপে উঠেছিলো। সুলতান মাহমূদকে কোন অবস্থাতেই অত্যাচারী বলার সুযোগ নেই। কিন্তু এদের অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে তিনি হয়তো নিজের ক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি।

হে জালেমের দল! তোমরা শুধু আবুল আব্বাসের হন্তা-ই নও। ক্ষুব্ধকণ্ঠে ধৃতদের উদ্দেশ্যে বললেন সুলতান। ক্ষুব্ধ সুলতান যখন কথা বলছিলেন, তার মুখ থেকে রাগে-ক্ষোভে থুতু বেরিয়ে আসছিলো। তার সারা শরীর ক্ষোভে থরথর করে কাঁপছিলো। তিনি ক্ষুব্ধকণ্ঠে আবারো বললেন–

এই দুই মুসলিম দেশের হাজারো নিরপরাধ সেনার জীবনহানির অপরাধে তোমরাও অপরাধী। তোমাদের ক্ষমতালিপ্সা আর বেঈমানীর কারণে এতোগুলো মানুষের জীবনহানী ঘটেছে। তোমাদের অনুগত সৈন্যদের

প্রাণহানির হিসেব করে দেখো, এরা না তোমাদের সৈন্য ছিলো, না আমার সৈন্য ছিলো। এরা ছিলো ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী সৈনিক। এরা ছিলো আল্লাহর সিপাহী। তোমরা ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত করতে এদের হত্যা করিয়েছো।

ক্ষুব্ধ সুলতান রাগে-ক্ষোভে বসা থেকে দাঁড়িয়ে বললেন, ওহে নিমকহারামের দল! তোমরা ওই খুন দেখোনি, যে খুন মরুর মাটি শুষে নিয়েছে। সেই রক্ত দেখোনি, যে রক্ত নদীর পানিতে ভেসে গেছে। তোমরা দেখোনি তোমাদের কারণে ময়দানে ক্ষতবিক্ষত যেসব সৈনিক তড়ফাতে তড়ফাতে মৃত্যুবরণ করেছে।

হে বিদেশী ফিরিঙ্গীদের পা-চাটা গোলামের দল! হে সত্যের ঝাণ্ডাবাহী সৈনিকের ঘাতক, হে ধোঁকাবাজ প্রতারক গোষ্ঠী! তোমরা হাতে পবিত্র কুরআন নিয়ে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়েছো। হে ভণ্ডের দল! নিজেদের সাচ্চা মুসলমান দাবী করে তোমরা সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকা দিয়েছো। তোমরা মহাপরাক্রম আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছিলে। ভুলে গিয়েছিলে মহান আল্লাহ্ কখনো মজলুমের ফরিয়াদ ফিরিয়ে দেন না।

হে হতভাগার দল! নিজেদের স্বকীয়তা ইহুদী-নাসারাদের হাতে বিকিয়ে দিয়ে তোমরা গোটা জাতির ভাগ্যকে বেঈমানদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলে। তোমাদের জ্ঞানবোধ ফিরিঙ্গী বেশ্যদের হাতে তুলে দিয়ে শুরার মাতলামীতে হারিয়ে গিয়েছিলে। তোমাদের দিল-দেমাগে ক্ষমতা ও মসনদের মোহ্ আসন গেড়ে বসেছিলে।

তোমরা ঈমান বিক্রি করে দিয়েছিলে? হে ঈমান বিক্রেতা বেঈমানেরা! আমি মূর্তি হন্তারক আর তোমরা সেই মূর্তির জীবন্ত প্রতীক! হিন্দুস্তানের মূর্তিগুলোকে আমি যেভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো করেছি, তোমাদেরকেও আমি সেভাবেই টুকরো টুকরো করে ফেলবো। হিন্দুদের মাটি-পাথরের দেবতাগুলোকে আমি যেভাবে ঘোড়ার পায়ে পিষেছি, তোমাদেরকেও সেভাবে পিষে ফেলবো।

হে বেঈমান নিমকহারামের দল! রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তোমাদের বিপুল অংকের ভাতা দেয়া হতো এইজন্য যে, তোমরা জনগণের সেবা করবে, নিজ দেশ ও দেশের মানুষের ঈমান-ইজ্জতের হেফাযত করবে, ইসলামের বিরুদ্ধে দুশমনদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাত করবে, ইসলামের হেফাযতের জন্য নিজের

জীবন বিলিয়ে দেবে। কিন্তু কর্তব্য ভুলে গিয়ে তোমরা নিজ দেশকেই দখল করেছো। ধর্মের দোহাই দিয়ে জাতির জীবন-সম্ভ্রম বিকিয়ে দিয়েছো। গণমানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছো, মানুষের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিয়েছো।

হে বেঈমানেরা, আমি যদি তোমাদের উচিত শিক্ষা না দিই, হাজারো মজলুমের বিদেহী আত্মা আমাকে অভিশাপ দেবে।' যাও এদেরকে ময়দানে নিয়ে চাবুক লাগাও।'

শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই ধৃত দেশদ্রোহীদের শাস্তি দেখার জন্য সেখানে ভিড় জমাল। গোটা ময়দান লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। আলাফতোগীন, আবু ইসহাক, খমরতাশ ও তাদের সহযোগীদের হাজারো জনতার বেষ্টনীর মধ্যে ময়দানের মাঝখানে নিয়ে সুলতানের কমান্ডোরা চাবুক দিয়ে পেটাতে শুরু করলে হাজারো মজলুমের হর্ষধ্বনিতে গোটা এলাকা কেঁপে উঠলো।

বিদ্রোহীদের চার চারজন করে ভাগ করে চাবুক লাগানোর পর তাদের সবাইকে একটি চৌবাচ্চায় দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো আর রাজধানীর লোকদের বলা হলো, তারা যেনো দল বেঁধে এদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে এবং ভর্ৎসনাস্বরূপ এদের উপর থুতু ছিটিয়ে দেয়। লোকজন এদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় কেউ কেউ তাদের উপর ঢিল নিক্ষেপ করল এবং কেউ কেউ পাথর ছুঁড়ে মারলো। অনেকেই তাদের গালি-গালাজ করে একপাশে দাঁড়ালো।

এরপর সুলতান মাহমূদ এমন নির্দেশ দিলেন, তাতে গোটা ময়দানে পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, সুলতান এমন কঠোর নির্দেশ দিতে পারেন!

সুলতান মাহমূদ এরপর নির্দেশ দিলেন, এদের প্রত্যেকের কাঁধ বরাবর বাজুসমেত হাত কেটে দাও। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই সুলতানের কমান্ডোরা তরবারী নিয়ে দৌড়ে এলে অপরাধীরা এদিক সেদিক দৌড়াতে চেষ্টা করলো এবং চিৎকার করে করে সুলতানের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলো। কিন্তু সুলতানের মনে তখনও ছেয়ে ছিলো নিরপরাধ সেইসব সিপাহীদের মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য, যারা এদের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে।

তাতে সুলতান ক্ষান্ত হলেন না। তিনি আগেই পনেরোটি জঙ্গীহাতি একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। এবার তিনি নির্দেশ দিলেন, জঙ্গী হাতিগুলোকে এদের পিষে মারার জন্য ছেড়ে দাও।

প্রতিটি হাতিকেই পরিচালনা করছিলো একেকজন মাহুত। তারা হাতিকে দৌড়ালো। অপরাধীদের সবার পায়ে ছিল ডাণ্ডাবেড়ী। ওরা এদিক সেদিক সরে যাওয়ার চেষ্টা করল বটে; কিন্তু মাহুতরা হাতিগুলোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওদের সবাইকে পিষে ফেললো।

এরপর এদের নিষ্পিষ্ট মৃতদেহগুলো গলায় রশি বেঁধে আবুল আব্বাসের কবরের পাশে নিয়ে যাওয়া হলো। আবু আব্বাসের কবরের পাশে আগেই কাঠের খুঁটি পুঁতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন সুলতান। দণ্ডিত দেশদ্রোহী হন্তারকদের মৃতদেহগুলোকে তিনি আবুল আব্বাসের কবরের পার্শ্ববর্তী কাঠের খুঁটিতে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

এদিকে শহরে সুলতানের ধরপাকড় আরো কয়েক দিন অব্যাহত থাকল। অভিযুক্তদের পাকড়াওয়ের পর অভিযোগ প্রমাণিত হলে একই শাস্তি দেয়া হলো। টানা কয়েকদিন ধরপাকড় করার পর সুলতান এই অভিযান বন্ধের নির্দেশ দিলেন।

সুলতান মাহমূদ সেনাপতি আলতানতাশকে খাওয়ারিজমের শাসক ঘোষণা করলেন এবং আরসালান জাযেবকে শাসকের সহকারী নিযুক্ত করলেন এবং খাওয়ারিজমকে গযনী সালতানাতের অধীন করে নিলেন। সেনাধ্যক্ষ আলতানতাশ ও তার ডেপুটি আরসালান জাযেব গোয়েন্দা তৎপরতা ও গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে খুবই দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছিলেন।

বর্তমান যুগে গোয়েন্দা বিভাগ বলতে যা বোঝায়, সুলতান মাহমূদের এ বিভাগ ছিল এরই পুরাতন রূপ। এ বিভাগের কর্মীদের মুশরেফ বলা হতো। শত্রু দেশে সে দেশেরই যেসব নাগরিককে গোয়েন্দা চর বানানো হতো, তাদেরকেও মুশরেফ নামে ডাকা হতো। ঐতিহাসিক বায়হাকী লিখেছেন, মুশরেফদেরকে সুলতান মাহমূদ মোটা অংকের ভাতা, উচ্চ প্রযুক্তি এবং আকর্ষণীয় পুরস্কার ও উপঢৌকন দিতেন। তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে তিনি ভিন্নভাবে ভাতা দিতেন। বায়হাকী লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ এমন দূরদর্শী ও বিচক্ষণ লোকদের গোয়েন্দা এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করতেন যে, তারা

শত্রুদেশে সেই দেশের শাসকগোষ্ঠী ও রাজা-বাদশাহর শ্বাস-প্রশ্বাসের খবরও বলে দিতে পারতো।

আলতানতাশ ও আরসালান জাযেব প্রাথমিক পর্যায়ে গযনী থেকে কয়েকজন গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে নিয়ে এলেন। এরপর এরাই স্থানীয়দের থেকে লোক নির্বাচন করে গোটা খাওয়ারিজমব্যাপী তাদের গোয়েন্দাজাল বিছিয়ে দিলো।

দূরদর্শী, অতিসতর্ক, তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন লোকদের ব্যবহার করে ইহুদী ও খৃস্টান কুচক্রীরা যেসব চক্রান্তের জাল বিস্তার করে রেখেছিল, অস্বাভাবিক কম সময়ের মধ্যে সকল দুষ্কৃতকারীকে চিহ্নিত করলেন আলতানতাশ ও আরসালান জাযেব। তারা মূল চক্রান্তকারী ও কুচক্রীদের স্থানীয় সহযোগীদের চক্রান্তের হোতাদের মতোই শাস্তি দিলেন।

শহর-বন্দর-গ্রাম-গঞ্জে বসবাসকারী সকল লোকদের আস্থা ফিরিয়ে আনা হলো। তাদেরকে সকল সামরিক শাসনতান্ত্রিক অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করা হলো এবং তাদের জীবন-সম্পদ ও ইজ্জত আব্রুর হেফাযতের দায়িত্ব সরকারের কাঁধে তুলে দেয়া হলো। ফলে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ফিরে এলো আস্থা ও বিশ্বাস।

খাওয়ারিজমের শাসনব্যবস্থা পুনর্বহালের পর সুলতান যখন গযনী ফিরে আসছিলেন, তখন যেখানে গযনী ও খাওয়ারিজম বাহিনীর প্রথম মোকাবেলা হয়েছিল। সেখানে এসে তিনি থেমে গেলেন।

জায়গাটিতে তখনো শিয়াল-শকুন এবং লাওয়ারিশ কুকুর মৃতদের হাড়-গোড় তালাশ করছিল। সুলতান মাহমূদ তার ঘোড়া থামিয়ে ফাতেহা পড়ে নিহত সৈন্যদের জন্য দুআ শুরু করলেন।

দীর্ঘক্ষণ পর তিনি যখন হাত নামিয়ে আনলেন, তখন তার চোখের পানিতে বুক ভেসে যাচ্ছিল এবং কণ্ঠ দিয়ে হেঁচকি দিয়ে কান্নার আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল। বস্তুত 'বেঈমান কাফেরদের জন্য অত্যন্ত কঠোর আর ঈমানদার স্বজাতির জন্য অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী' সেই ঐতিহাসিক শাশ্বত বাণীর বাস্তব নমুনা ছিলেন সুলতান মাহমূদ।

## গযনীর তুফান

দিল্লী থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় দু'শ মাইল দূরে গঙ্গা নদীর তীরবর্তী একটি শহরের নাম কন্নৌজ। সুলতান মাহমূদের শাসনামলে কন্নৌজ ছিল একটি শক্তিশালী হিন্দুরাজ্যের রাজধানী। ওখানকার মহারাজা ছিল রাজ্যপাল। উত্তর হিন্দুস্তানে কন্নৌজের রাজকুমারদের অনেক কদর ছিল।

দিল্লী থেকে আশি মাইল দূরে যমুনা নদীর তীরবর্তী মাথুরা ছিল হিন্দুদের একটি মহাতীর্থস্থান। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্ব থেকে মাথুরা হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান। হিন্দুদের কৃষ্ণ মহারাজ নাকি মাথুরাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজো পর্যন্ত মাথুরায় প্রতিবছর হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর সমাবেশ ঘটে। তীর্থযাত্রীরা ওখানে গিয়ে পূজা-অর্চনা করে তাদের ভাষায় পাপের স্খলন ঘটায়।

মাথুরায় একটি কেন্দ্রীয় মন্দির ছাড়াও ছোট বড় আরো কয়েকটি মন্দির ছিল। এসব মন্দির শক্ত পাথরের গাঁথুনী দিয়ে তৈরী। এসব মন্দিরের ছিল বহু গোপন কক্ষ। এ মন্দিরের ভেতরের চোরাগলিতে হারিয়ে গেলে অজানা কারো পক্ষে বেরিয়ে আসা সহজ ব্যাপার ছিলো না।

মাথুরা শহরের চারপাশ ছিল শক্ত দেয়ালে ঘেরা। শহরের ভেতরে একটি মজবুত দুর্গ ছিল। মাথুরা কোন স্বাধীন রাজ্য ছিল না। মাথুরার নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল কন্নৌজের মহারাজা এবং পার্শ্ববর্তী মহাবন রাজ্যের রাজার উপর।

মহাবন রাজ্যের রাজার নাম ছিল কুলচন্দ্র। এরা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী আরো কয়েক রাজ্যের মহারাজারা মাথুরার নিরাপত্তা রক্ষায় তাদের কিছু সেনাসনদস্যকে এখানে নিয়োগ করেছিল।

মাথুরার নিকটবর্তী রাজ্য মহাবন ছিল একটি জঙ্গলাকীর্ণ রাজ্য। রাজধানীর নাম ছিল মহাবন। মহাবনের অবস্থান ছিল মাথুরা থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে যমুনা নদীর তীরে।

সুলতান মাহমূদের সময় এই রাজ্য ছিল খুবই শক্তিশালী ও বিত্তশালী। কিন্তু সুলতান মাহমূদ এসব রাজ্যের রাজাদের কাছে দানবের মতোই আতঙ্কে পরিণত হয়েছিলেন। সুলতান ইতোমধ্যে থানেশ্বর পর্যন্ত দখল করে সেখানে

নিজস্ব সেনা চৌকি স্থাপন করেছিলেন। পাঞ্জাবের মহারাজা ভীমপাল মুখোমুখী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সুলতানের সাথে মৈত্রীচুক্তি করেছিলেন। ছোট ছোট রাজ্যের রাজা ও রায়বাহাদুররা তো সুলতানের নাম শুনলেই ভয়ে কাঁপতো।

১০১৭ সালে সুলতান মাহমূদ যখন খাওয়ারিজমকে গযনী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন, তখন মাথুরাতে চলছিল বাৎসরিক তীর্থ উৎসব ও পুণ্যার্থী সমাবেশ। সে বছর মাথুরায় এতো বিপুল পুণ্যার্থীর সমাবেশ ঘটেছিল যে, মনে হচ্ছিল সারা ভারতের সকল হিন্দুই যেন মাথুরায় এসে জমায়েত হয়েছিল।

শহরের প্রধান মন্দির এবং যমুনা নদীর বিস্তীর্ণ তীরবর্তী এলাকায় সমবেত মানুষদের মনে হচ্ছিল যেন পিঁপড়ার চাক। পিঁপড়ার মতোই গোটা শহর এবং যমুনা তীরে লোকজন গিজ গিজ করছিল। হাজার হাজার নারী-পুরুষের পদভারে প্রকম্পিত ছিল মাথুরা নগরী।

শহরের কোন জায়গা খালি ছিল না। শহরের বাইরেও কয়েক মাইল পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের তাঁবু আর তাঁবু। দূরবর্তী এলাকা এমনকি বনবাদারের ধারে-পাশে রঙিন বাহারী তাঁবুগুলো ছিল রাজা-মহারাজাদের পরিবার-পরিজনের। কোন হিন্দু রাজা-মহারাজা এ বছরের মাথুরা গমন থেকে বিরত থাকেননি।

রাজা-মহারাজাদের তাঁবুগুলোর পাশেই ছিল তাদের নিরাপত্তাকাজে নিয়োজিত সৈন্য-সামন্তদের তাঁবু। তাদের সাথে জঙ্গী হাতি ও ঘোড়াও ছিল। রাজা-মহারাজারাও যমুনার পুণ্যস্নান এবং মাথুরার প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন।

সবচেয়ে বেশী বাহারী এবং বিশাল এলাকা জুড়ে তৈরী হয়েছিলো কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপাল এবং পাঞ্জাবের মহারাজা ভীমপালের তাঁবু। তাদের তাঁবুতে কেউ গিয়ে বলার অবকাশ ছিল না, এগুলো সাময়িক তৈরী বরং এসব তাঁবুর রাজকীয় গঠনশৈলী এবং জাঁকজমকে মনে হতো কোন রাজপ্রাসাদ। রাজকীয় তাঁবুগুলো নানা রঙের ফানুস, রেশমী কাপড়ের পর্দা ও ঝালরে সাজানো।

রাজা মহারাজাদের রাণী এবং তাদের রক্ষিতা সেবিকা দাসদাসীরাও তাদের সাথে ছিল। ছিল নাচ গান আমোদ ফূর্তির জন্য বাদক ও নর্তকী দল। কিন্তু মাথুরার প্রধান পুরোহিত ও পণ্ডিতদের হাভভাব দেখে কারো পক্ষেই নাচ

গানের মতো আমোদ ফুর্তির আসর গরম করা সম্ভব হলো না। অন্যান্য বছর কয়েক সপ্তাহব্যাপী এখানে মেলা বসতো। প্রতি রাতেই বসতো নাচগানের আসর। সাধারণ মানুষেরাও নাচ গানের আসর জমাতো।

রাজা-মহারাজাদের উদ্যোগে নাচ গানের পাল্লা হতো। কিন্তু এবারের হাজার হাজার মানুষের এই সমাবেশে কোন আনন্দ-ফুর্তির আমেজ ছিলো না। কেমন যেন উদাস উদাস ভাব, সবার মধ্যেই এক ধরনের চাপা বেদনার সুর। এক ধরনের যাতনার অভিব্যক্তি সবার চেহারায়।

তীর্থযাত্রী হিন্দুদের এই হতাশা ক্ষোভের মূল কারণ ছিলেন সুলতান মাহমূদ। সুলতান মাহমূদ ছিলেন হিন্দুদের জন্য জীবন্ত আতঙ্ক, ঘৃণা আর ত্রাসের নাম। মাথুরার প্রত্যেক পুরোহিতের কণ্ঠে ছিল এমন আওয়াজ–

"বিষ্ণুদেব আর কৃষ্ণদেবীর অভিশাপ থেকে তোমরা কেউ রেহাই পাবে না। দেবদেবীদের অপমান অপদস্থ করিয়ে তোমরা কি করে জীবন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছো? কি করে তোমরা রাতের বেলায় নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারো এবং পেটপুরে আহার করতে পারো? যে পর্যন্ত তোমরা গযনীর প্রতিটি ইট খুলে না নেবে আর মাহমুদ গযনবীর তাজা রক্ত দিয়ে কৃষ্ণমাতার পা ধুইয়ে না দেবে, ততোদিন পর্যন্ত তোমরা দেব-দেবীদের অভিশাপ থেকে রেহাই পাবে না। এখন গঙ্গাজল ও যমুনা জলও তোমাদের পাপ ধুইয়ে সাফ করতে পারবে না।"

পুরোহিতের এ ধরনের আতঙ্কজনক কথাবার্তার কারণে পূজারীরা সরাসরি কৃষ্ণমূর্তির চোখের দিকে তাকাতেও ভয় পেতো। পূজারীরা যখন মূর্তির পায়ে মাথা রেখে পূজা-অর্চনা করতো, তখন বিগলিত চিত্তে তাদের দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতো। মন্দিরের শাখাধ্বনি ও ঘণ্টাগুলোর আওয়াজও যেন উদাস হয়ে পড়েছিল। এগুলোর মধ্যে পূজারীরা অনুভব করতো এক ধরনের হতাশার সুর।

ছোট শিশু-সন্তানের মায়েরা তাদের শিশুদেরকে দেবদেবীদের অভিশাপ থেকে বাঁচানোর জন্য দেবদেবীদের পায়ে তাদের পরিধেয় অলঙ্কারাদি খুলে নজরানা দিতো। প্রত্যেকটি সামর্থবান পুরুষ পূজারী মূর্তিদের সামনে হাতজোড় করে শপথ করছিল, যে করেই হোক তারা মূর্তির অসম্মান ও দেবদেবীদের অমর্যাদার প্রতিশোধ নেবে। অনেকেই চিৎকার করে বলতো, এখন মাহমুদ হিন্দুস্তানে এলে আর তাকে ফিরে যেতে দেবো না।

কন্নৌজের রাজা রাজ্যপাল যখন পূজা করার জন্য কৃষ্ণমূর্তির সামনে গেলেন, তখন তার একান্ত নিরাপত্তারক্ষী জগন্নাথও সঙ্গে ছিল। জগন্নাথ ছিল শক্ত-সুঠাম-দীর্ঘদেহী সুদর্শন যুবক। তার চেহারা-ছবিতে যৌবনের দীপ্তি প্রস্ফুটিত ছিল। তার মুচকি হাসিতে দুর্নিবার আকর্ষণ এবং তার চাহনী ছিল জাদুময়।

জগন্নাথ ছিল আক্ষরিক অর্থেই একজন দক্ষ ক্ষণজন্মা যোদ্ধা। তরবারী চালনায় ও তীরন্দাজিতে তার পারদর্শিতা ছিল কিংবদন্তিতুল্য। কন্নৌজের মহারাজার কাছে জগন্নাথের প্রায় দু'বছর হয়ে গেছে। প্রথম দর্শনেই জগন্নাথ মহারাজার হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলো।

একবার এক জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় কন্নৌজের মহারাজা হরিণ শিকার করতে এসেছিলেন। মহারাজা একটি হরিণকে তাক করে তীর ছুঁড়লে তীর ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগেই হরিণ স্থান ত্যাগ করে। এ সময় হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হলো জগন্নাথ।

মহারাজার নিরাপত্তারক্ষীরা হরিণটিকে স্থানচ্যুত করার জন্য তাকে গালমন্দ করেই ক্ষান্ত হলো না, রীতিমতো হুমকি-ধমকিও দিলো। জগন্নাথ মুচকি হেসে মহারাজাকে বললো, আমি যদি দুরন্ত হরিণকে তীরবিদ্ধ করতে না পারি, তাহলে আপনি আমার ঘোড়া নিয়ে নেবেন এবং আমাকে পাহাড়ের উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবেন।

সবাই জানে, হরিণ যখন দৌড়াতে থাকে, তখন এতো দ্রুত ও দীর্ঘ লাফ দেয় যে, মনে হয় হরিণটি যেনো বাতাসে উড়ছে। একটি চলন্ত হরিণের একেকটি লাফের পরিধি হয় অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ গজ এবং মাটি থেকে সাত/আট হাত উপড়ে উঠে যায় হরিণ।

মহারাজা জগন্নাথের কথায় মজা করার জন্য তার নিজেরে ধনুক এবং একটি মাত্র তীর দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আবার কোন হরিণ আমাদের নজরে এলে আমরা সেটিকে তাড়িয়ে দেবো, তখন তুমি সেটি শিকার করবে। তুমি যদি এক তীরে হরিণটি শিকার করতে ব্যর্থ হও, তাহলে কিন্তু আমরা তোমার ঘোড়া ঠিকই ছিনিয়ে নেবো।

তাদের বেশী দূর যেতে হলো না। হঠাৎ এক জায়গায় সাত-আটটি হরিণ পেয়ে গেলেন তারা। মহারাজার নির্দেশে তার লোকেরা হৈ চৈ করলে হরিণ

দৌড়ে পালাতে লাগল। পলায়নপর হরিণের পেছনে জগন্নাথ ঘোড়া ছোটালো। তার পেছনে মহারাজাও ঘোড়া ছোটালেন। ছুটন্ত হরিণ যেন বাতাসে ভর করে উড়তে লাগল।

জগন্নাথ তার ঘোড়ার বাগ দাঁতে কামড়ে ধরল এবং ধনুক সামনে নিয়ে তাতে তীর ভরে নিক্ষেপ করল। একটি ছুটন্ত হরিণ মাটি স্পর্শ করে আর লাফ দিতে পারলো না। একটু উপরে লাফ দিয়েই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আর সঙ্গী হরিণগুলো দৌড়ে পালিয়ে গেল। ততক্ষণে জগন্নাথের ঘোড়াও আহত হরিণের পাশে এসে দাঁড়াল। উড়ন্ত হরিণের শিরদাঁড়ায় জগন্নাথের ছোঁড়া তীর বিদ্ধ হওয়ায় হরিণটি আর লাফ দিতে সক্ষম হলো না। অতঃপর মহারাজা রাজ্যপালও তার কাছে পৌঁছে গেলেন।

আমি বিজিরায়ের সেনাবাহিনীর একজন কমান্ডার ছিলাম মহারাজ। নিজের পরিচয় দিতে রাজ্যপালের উদ্দেশে বললো জগন্নাথ। বিজিরায় সুলতান মাহমূদের মোকাবেলায় এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করলেন যে, তার অর্ধেক সেনা মারা গেলো আর বাকী অর্ধেক মাহমুদের কাছে বন্দী হয়ে গেল। এতে আমার মন বিষাদে ভরে গেলো। আমি সেখান থেকে লাহোর চলে এলাম।

কিন্তু এখানকার সৈন্যরাও সুলতানের কাছে পরাজিত হলো। বর্তমানে লাহোরের রাজা সুলতান মাহমূদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ। আমি একজন সৈনিক। সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কমান্ডার ছিলাম।

আমি এখন কোন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন রাজার সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাই। আমি শুনেছি, কন্নৌজের রাজপুতদের আত্মমর্যাদাবোধ আছে। আজ আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্যই আমি এই জঙ্গলে প্রবেশ করেছিলাম।

মহারাজা তার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে বুঝতে পারলেন, এই সুদর্শন যুবক শুধু তীর-তরবারীতেই পারদর্শী নয়, তার মাথায় বুদ্ধিও আছে। সে যেমন মেধাবী, তেমনই দূরদর্শী। মহারাজা জগন্নাথের বুদ্ধিমত্তা ও সামরিক পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে জগন্নাথকে তার একান্ত নিরাপত্তারক্ষী দলে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

জগন্নাথ ছিলো গোড়া হিন্দুবাদী। সে মাহমুদ গযনবী ও অন্যান্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় গালমন্দ করতো এবং চরম শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে তোলার ব্যাপারে

সে ছিলো একজন তুখোড় বক্তা। বর্তমানে সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানদের যেমন একান্ত রাজনৈতিক উপদেষ্টা থাকে, জগন্নাথকেও কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপাল তার একান্ত উপদেষ্টার পদে আসীন করেছিলেন।

মহারাজা জগন্নাথের জন্য বিশেষ ধরনের চমকদার পোশাক তৈরী করালেন। মহারাজা যখন দরবারে আসীন হতেন, তখন জগন্নাথ মহারাজার পেছনে পূর্ণ রাজকীয় জাঁকজমক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, তার হাতে থাকতো স্বর্ণের প্রলেপ দেয়া বর্শা। মহারাজা যেখানে যেতেন, জগন্নাথ তার সাথে থাকতো। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, জগন্নাথ মহারাজের আভিজাত্যের অংশে পরিণত হলো।

রাজ্যপালের ছিলো তিন রাণী। রাণীদের নিরাপত্তার দায়িত্বও ছিল জগন্নাথের উপর।

কোন রাণী কোথাও গেলে জগন্নাথ ঘোড়ায় চড়ে রাণীর পিছু পিছু যেতো। রাণীমহলেও জগন্নাথ ছিলো রাজকীয় আভিজাত্যের প্রতীক।

মহরাজা রাজ্যপাল মাথুরার প্রধান মন্দিরে পূজার জন্য প্রবেশ করলেন। তার পিছু পিছু জগন্নাথও পূজামণ্ডপে প্রবেশ করল। মহারাজা মর্মর পাথরের তৈরী কৃষ্ণমূর্তির পায়ে মাথা রেখে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা করছিলেন আর শপথ করছিলেন তিনি মাহমুদ গযনবীর কর্তিত মস্তক এই মন্দিরে দেবীর পদতলে এনে রাখবেন। তখন পেছন থেকে মূর্তির প্রতি করজোড় নিবেদন করে জগন্নাথ বললো, আর আমি দেবীর শপথ করছি, যদি মাহমুদকে এখানে না আনতে পারি, তাহলে নিজের মাথা নিজেই দেবীর চরণে বলিদান করবো।

জগন্নাথের কথা শুনে চকিতে পেছন ফিরে মহারাজা জগন্নাথকে দেখলেন। জগন্নাথ দুচোখ বন্ধ করে হাতজোড় করে ভজন আওড়াচ্ছিল। এমতাবস্থায় মন্দিরের প্রধান পুরোহিত তাদের সামনে দিয়ে সুগন্ধি লোবানের তশতরীতে রাখা ধূপের পাত্র ঘুরিয়ে নিল। মহারাজা ধূপের পাত্র থেকে লোবানের ভস্ম নিয়ে কপালে লাগাল। মহারাজা গলা থেকে অত্যন্ত উচ্চে মূল্যের হারটি খুলে মূর্তির পায়ে রেখে দিলেন।

মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণের এই অচ্যুত হীরে-মোতির দরকার নেই, কৃষ্ণদেবীর প্রয়োজন তাজা টাটকা চমকানো রাঙা রক্ত। ভারতমাতা তার সুপুত্রদের কাছ

থেকে তাজা খুন প্রত্যাশা করে। ভারতমাতার সম্ভ্রমহানী ও বেইজ্জতির জন্য মহারাজাদের উচিত ছিল জগত-সংসার ত্যাগ করে বনবাসী হয়ে যাওয়া।

অবশ্যই আমরা এর প্রতিশোধ নেব। বললেন মহারাজা। মাহমুদ গযনবীর কর্তিত মস্তক এই মন্দিরের সদর দরজায় ঝুলন্ত দেখা যাবে। বললেন মহারাজা রাজ্যপাল।

* * *

দিনের বেলা মাথুরার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া গঙ্গা নদীতে তীর্থযাত্রী স্নানকারীদের এতোটাই ভিড় ছিল যে, কোথাও এক বিঘত ফাঁকও ছিলো না। ফলে মহিলাদেরকে অনেকটা দূরে গিয়ে গঙ্গাস্নানের পর্ব সারতে হতো। তীর্থযাত্রীদের মাথুরাগমন ও পূজা উদযাপনের অন্যতম একটি অংশ ছিল গঙ্গাস্নান। আজো হিন্দুদের ধর্মমতে গঙ্গা ও যমুনা নদী সকল পাপ ধুয়ে মুছে তীর্থযাত্রীদের পবিত্র করে দেয়। অনেক হিন্দু পুণ্যার্থী নাভী সমান গঙ্গাজলে নেমে পূজা-অর্চনার নানা মন্ত্র জপ করে।

এ বছরে রাজা-মহারাজাদের রাণীগণ এবং তাদের একান্ত রক্ষীতারা সাধারণ প্রজানারীদের সাথে দিনের বেলায় গঙ্গাস্নানে অংশগ্রহণকে অবমাননাকর মনে করে তারা রাতের বেলায় নিরিবিলি গঙ্গাস্নানের পর্ব সেরে নিতো।

এক সন্ধ্যায় কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপালের কনিষ্ঠা স্ত্রী চম্পাকলি মহারাজাকে বললেন, তিনি আজ সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করতে আগ্রহী। পুণ্যকাজে মহারাজা তাকে বারণ করতে পারেন না। তাই তিনি জগন্নাথকে বললেন, সে যেনো আজ রাত কিছুটা গভীর হলে ছোট রাণী চম্পাকলিকে গঙ্গাস্নানের জন্য যমুনায় নিয়ে যায়। বড় দুই রানীকে জগন্নাথ একরাত আগেই গঙ্গাস্নান করিয়ে এনেছে। বড় দুই রাণীকে নিয়ে জগন্নাথ যমুনা তীরে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। রাণীদ্বয় স্নান শেষ করে এলে তাদের নিয়ে জগন্নাথ তাঁবুতে ফিরে আসে।

চম্পা বড় দুই রাণীর সাথে যায়নি। সে যুবতী ও সুন্দরী। অপর দুই রাণী বয়স্কা। মহারাজ তাদেরও সাথে এনেছিলেন। কারণ, তারা উভয়েই ছিলেন তার সন্তানের মা। মহারাজার উপর চম্পার প্রভাব ছিল বেশী। অন্য দুই রাণী এজন্য চম্পার প্রতি ঈর্ষাকাতর ছিল।

এ ঘটনার প্রায় দু'বছর আগে কোন এক ব্যবসায়ীর উপঢৌকন হিসেবে চম্পা মহারাজার কাছে আসে। চম্পা কোন কুলীন ঘরের কন্যা ছিল না। কিন্তু বংশগতভাবে সে ছিল সুন্দরের অধিকারিণী। বংশে সৌন্দর্যের প্রতীক ছিল চম্পাকলি।

মহারাজার এক জায়গীরদারের নজর পড়েছিল চম্পার প্রতি। সে চম্পাকে পাওয়ার জন্য চম্পার বাবাকে বিপুল অর্থসম্পদ উপঢৌকন দিয়ে চম্পাকে স্ত্রী হিসেবে রাখার অঙ্গীকার করে হাতিয়ে নেয়। জায়গীরদার রীতিমতো শাদীর উৎসব আয়োজনও সম্পন্ন করে।

কিন্তু সবশেষে সে চম্পাকে কন্নৌজ নিয়ে গিয়ে মহারাজাকে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করে। মহারাজা চম্পাকে দেখে রাজপ্রাসাদে রক্ষিতা হিসেবে রাখার পরিবর্তে প্রথা অনুযায়ী চম্পাকে বিয়ে করে ফেলেন। মহারাজার বয়স তখন পঞ্চাশেরও বেশী। আর চম্পার বয়স মাত্র সতেরো-আঠারো।

অস্বাভাবিক সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী চম্পা প্রথম দিন থেকেই অর্ধবয়স্ক রাজার হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আর আগের রাণীদ্বয় প্রাসাদে পুরনো আসবাবপত্রের মতোই শুধু শোভা বর্ধনের পর্যায়ে উপনীত হলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হতেই চম্পাকলি তাদের প্রাসাদোসম রাজকীয় তাঁবু থেকে বের হলো। তার সাথে ছিল একজন একান্ত সেবিকা। জগন্নাথ চম্পার জন্য বাইরে অপেক্ষমাণ ছিল। চম্পা তাঁবু থেকে বেরিয়ে সেবিকাকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে যেতে থাকলে জগন্নাথ তাদের অনুসরণ করলো। তারা যেতে যেতে মাথুরার চারপাশে সাময়িকভাবে তৈরী হাজারো তাঁবু এলাকা পেরিয়ে গঙ্গা নদীর সেই স্থানে এসে পৌছল, যেখানে চম্পাকলির গঙ্গাস্নান করার করা।

এই জায়গাটি ছিল সাধারণ মানুষের জন্য নিষিদ্ধ। এখানটায় কোন জনমানুষের সমাগম ছিলো না। চম্পাকলি তার একান্ত সেবিকাকে বললো, তুমি ওখানে চলে যাও, যেখানে সাধারণ প্রজাদের কন্যা-জায়া-বধূরা স্নান করে। জগন্নাথ নদীর পানি থেকে কিছুটা দূরেই থেমে গেল।

সেবিকা অন্ধকারে দূরে চলে গেল। চম্পাও স্নানের উদ্দেশ্যে পানির দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু সে স্নান না সেরে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো।

"এদিকে এসো জগন! আমার সেবিকা চলে গেছে। ওকে আমি দেরী করে আসতে বলেছি।" জগন্নাথকে ডেকে বলল চম্পা।

চম্পার ডাকে জগন্নাথ তার পাশে এগিয়ে গেল। জায়গাটি ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। তদুপরি ঝোপঝাড়ে ভরা। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছিল এক শ্মশানের চিতায় কোন হিন্দুর মরদেহ সৎকারের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তার সামনে দিয়ে নদীর বুক চিড়ে এগিয়ে যাচ্ছিল দুটি নৌকা। নৌকাগুলোকে মনে হচ্ছিল জ্বলন্ত মশাল যেনো পানির উপর সাঁতার কেটে এগুচ্ছে। চম্পা জগন্নাথকে দুর্বাঘাসের উপর বসিয়ে নিজের মাথা জগন্নাথের উরুতে রেখে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

"জগন! তুমি পাশে না থাকলে আমি এই রাজাকে হয় বিষ খাওয়াতাম, নয়তো নিজেই বিষ পান করতাম। জগন্নাথের আঙুলে বিলি কেটে চম্পা বলল। কিন্তু আমি দেখছি, রাজাকে তুমি এতোটাই ভালোবাসো যে, তুমি কোন অবস্থাতেই তাকে ছাড়তে চাও না।

এই রাজমহল আর তার রাজার চাকরীই কি তোমার কাছে জীবনের সবচেয়ে প্রিয়? কিন্তু আমার কাছে এই রাজপ্রাসাদ, এই রাজকীয়তা, রাণীর বেশ একেবারেই পানসে, অসহ্য। তুমি আমার সঙ্গে থাকলে আমি জগতের মানুষকে দেখিয়ে দিতাম, জীবনের কাছে এসব রাজপ্রাসাদ-রাজকীয়তা নেহায়েতই তুচ্ছ। তুমি সাথে থাকলে আমি বনবাসেও থাকতে রাজি। মাটির ডেড়াও আমার কাছে এই প্রাণস্পন্দনহীন প্রাসাদের চেয়ে উত্তম।

আচ্ছা জগন! তুমি এই বন্দিশালা থেকে কেন বের হও না? তুমি কেনো আমাকে এই প্রাসাদের ঘেরাও থেকে মুক্ত বাতাসে নিয়ে যাও না? কতো দিন পর্যন্ত আমরা এভাবে চুরি চুপকি করে মিলিত হবো?"

"একথা তো তুমি আমাকে শতবার বলেছো। আর আমি প্রতিবারই তোমাকে বলেছি, একটু ধৈর্য ধরো, সুযোগের অপেক্ষা করো; সময়-সুযোগ হলে আমি ঠিকই তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবো। চম্পাকলির চেহারায় আলতোভাবে হাত বোলাতে বোলাতে বললো জগন্নাথ।

আজ আবারো আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এসব আবেগ বেশীক্ষণ থাকে না। আজ যদি তুমি আমার হাত ধরে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাও, তবে কদিন পরেই তুমি আবার এই প্রাসাদ ত্যাগের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠবে। জানো, পৃথিবীতে আমার দুহাত জমিনও নেই। আমার হাতে কোন অর্থকড়িও

নেই। বলতে গেলে আমার অবস্থা অনেকটা অপরাধীর মতো। এমতাবস্থায় আমাকে যেখানেই পাকড়াও করা হবে, সেখানেই হত্যা করা হবে।'

তুমি তো ভেরা থেকে এসেছো, সেখানে মুসলিম শাসন চলছে। আমরা যদি পালিয়ে ওখানে চলে যাই আর সেখানে গিয়ে মুসলমান হয়ে যাই, তাহলে মুসলমানরা কি আমাদের ঠাঁই দেবে না?

আমার এখন ধর্মের প্রতিও বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। বলে উঠে বসতে বসতে চম্পাকলি বললো, জানো আমি ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে মহারাজাকে বিষ পান করাতে পারি। মরে গেলে তুমি আমাকে নিয়ে চলে যাবে। রাজা মরে গেলে আমাদের আর পাকড়াও করার কে থাকবে?

ওই যে চিতায় আগুন দেখতে পাচ্ছো, দূরের শ্মশানে মরদেহ পোড়ানোর আগুনের দিকে ইশারা করে চম্পাকে জগন্নাথ বললো, মহারাজা মারা গেলে তোমাকে চিতার আগুনে পুড়ে সতীদাহ হতে হবে। তোমাকে জীবন্ত মহারাজের চিতায় তুলে দেয়া হবে। আমার উপর বিশ্বাস রাখো চম্পা, আমি তোমাকে ধোঁকা দেবো না।'

তুমি তো ভেরাতে গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো, তাই না? আচ্ছা, ওরা কি খুব বেশী শক্তিশালী আমাদের রাজপুতরা তাদের পরাজিত করতে পারছে না কেন?'

"হ্যাঁ, গযনীর সৈন্যরা খুবই শক্তিশালী। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা যতো কম থাকে, তাদের শক্তি ততোই বেশী থাকে। মুসলমান সৈন্যরা মহারাজা ভীমপালের হাঁটু ভেঙ্গে দিয়েছে। এখন তার কাছ থেকে খিরাজ নিচ্ছে।

কাশ্মীরে পরাজিত হয়ে ফেরার সময় সুলতান মাহমূদের হাতে সৈন্য খুব কম ছিল এবং সবাই ছিল আহত। কিন্তু এসব মুষ্টিমেয় আহত সৈন্য মহারাজ ভীমপালের এলাকা দিয়ে অতিক্রম করার সময়ও অর্ধমৃত এই সৈন্যদের উপর আক্রমণ করে সুলতান মাহমূদসহ তাদের বন্দী করার সাহস হয়নি ভীমপাল মহারাজার।

জগন্নাথ, তুমি তো ধর্মের খুবই ভক্ত। যদি কিছু মনে না করো, তাহলে আমি আজ তোমাকে দু'টি কথা বলতে চাই। জগন্নাথের কোমর পেঁচিয়ে ধরে বললো চম্পাকলি। দেখো জগন! পুরোহিতরা আমাদেরকে দেবদেবীদের অভিশাপের ভয় দেখায়। তারা বলে, মুসলমানরা আমাদের যেসব দেবদেবীর

মূর্তি ধ্বংস করে দিয়েছে, যেসব মন্দির মিসমার করে দিয়েছে, সেইসব আমাদের অভিশাপ দেবে।...

কিন্তু এতোটা সময় পেরিয়ে গেলো, আমি তো কোথাও দেবদেবীদের অভিশাপ পড়ার কথা শুনলাম না। বরং আমি তো দেখছি গযনী বাহিনী আমাদের উপর অভিশাপ হয়ে আসছে।

আমি শুনেছি, মুসলমানরা এমন প্রভুর ইবাদত করে, যিনি নিরাকার, কেউ তাকে দেখতে পায় না। আমার তো মনে হয় সেই খোদা-ই হয়তো সত্য খোদা। আমরা ছোটকাল থেকে থানেশ্বরের বিষ্ণুদেব সম্পর্কে শুনেছি, যারা বিষ্ণুদেবের পূজা করে, তারা কখনো পরাজিত হয় না। কিন্তু গযনী সুলতানের আক্রমণ থেকে সেই বিষ্ণুদেবকেও কেউ রক্ষা করতে পারলো না। পূজারীদেরও বাঁচাতে পারলো না কেউ।

দেবতা নিজেও পারল না নিজেকে রক্ষা করতে। তুমি কি এসব দেবদেবীকে বিশ্বাস করে পূজা করো।'

'তুমি জীবনবিমুখ হয়ে বিষিয়ে উঠেছো। ফলে ধর্ম সম্পর্কে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছো। এজন্য ধর্ম সম্পর্কে যাচ্ছেতাই বলছো চম্পা।' চম্পার রেশমী চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললো জগন্নাথ। ধর্ম সম্পর্কে তোমার মনে যা ইচ্ছা বলো, কিন্তু আমার ভালোবাসায় সন্দেহ পোষণ করো না।'

"তোমার প্রতি আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। তুমি প্রেমের প্রশ্নে আমাকে যতো কঠিন পরীক্ষায়ই করো না কেন, আমি ঠিকই শতভাগ উতরে যাবো। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে আমি কোন ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি নই।' জগন্নাথকে বললো চম্পা।

ইত্যবসরে সেবিকা গলা খাকারী দিয়ে তার উপস্থিতি জানান দিল। চম্পা রাণী বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করল। জগন্নাথ তার জায়গায় বসে রইল। কিছুক্ষণ পর রাণী জগন্নাথকে ডাকার উদ্দেশ্যে রাণীদের ব্যবহার্য বিশেষ আওয়াজ দিল এবং সেবিকাকে নিয়ে আগে আগে হাঁটতে শুরু করল।

* * *

পরদিন মহারাজা রাজ্যপাল জগন্নাথকে ডেকে বললেন, জগন্নাথ, আজ তোমার ছুটি। তুমি স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াতে পারো।'

জগন্নাথ মহারাজার অনুমতি নিয়ে রাজকীয় পোশাক পরিধান করে কোমরে তরবারী ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

মাথুরা জুড়ে লাখো মানুষের সমাগম। চতুর্দিকেই মানুষ আর মানুষ। গোটা মাথুরা এলাকা যেনো এক বিশাল মেলায় পরিণত হলো। উৎসব উপলক্ষে জায়গায় জায়গায় গনক, জ্যোতিষী ও সাধু-সন্ন্যাসীরা তাদের মজমা বসিয়ে মানুষদের গোল লাগিয়ে লাগল। অনেক জায়গায় কবিয়ালরা গানের আসর জমালো, নর্তকীরা নাচের আসর জমালো, কেউ বা শারীরিক নানা কসরত খেলা দেখিয়ে দর্শক শ্রোতা ও আগত লোকদের মাতিয়ে রাখল।

লোকজন জ্যোতিষী ও গণকদের কাছে তাদের হাত দেখিয়ে তাদের ভাগ্য জানার চেষ্টা করছিল। সাধুরা মজমা জমিয়ে পুণ্যার্থীদের প্রসাদ বিতরণ করছিল। জগন্নাথ প্রতিটি মজমাতে একটু উঁকি দিয়ে ঘটনা আঁচ করে আবার অন্যখানে উঁকি দিচ্ছিল।

যেতে যেতে সে একটি গাছের নিচে দু' সাধু সন্তুকে বসা দেখল। তাদের শুধু আব্রুটুকু ঢাকা আর সারা শরীর উলঙ্গ। গা জুড়ে ধূপ ভস্মের প্রলেপ। মাথায় দীর্ঘ চুল। চুলগুলো ছাই-ভস্মে জটবাঁধা। তাদের দীর্ঘ দাড়িও জটবাঁধা। জটাধারী এই সাধু সন্তুদের ঘিরে বহু লোকের মজমা।

জগন্নাথ এই মজমায় গিয়ে উঁকি দিল। সে ভেতরের অবস্থা দেখা ও বোঝার জন্য দাঁড়াতেই এক লোক সাধুদের জিজ্ঞেস করল–

'সাধুবাবা! আমাদেরকে ওই দুরাচার ম্লেচ্ছাদের কথা কিছু বলুন, যারা পাহাড়ের ওপাশ থেকে এসে আমাদের মন্দিরগুলোকে ধ্বংস করে চলে যায়?"

"মুসলমানরা.......। এরা লোভী। সম্পদের লোভেই এরা ভারতে আসে। তাই এরা আমাদের মন্দিরের সম্পদ লুট করে চলে যায়। এরা আমাদের কোন দেবদেবীকে ভয় করে না। ওরা জানে না, মহাভারতে বাসুদেব ও বিষ্ণুদেবের যে ক্রোধের কথা বলা হয়েছে তা সত্য।

দেবদেবীর ক্রোধ অবশ্যই মুসলমানদের উপর পড়ছে যদিও এখন তা আমাদের উপর পড়ছে। গযনীর বাদশা মাহমুদ খুবই জালেম ও আগ্রাসী। সে যেদিকে অভিযান চালায়, বানের পানির মতো আসতে থাকে, তার সামনে কেউ

দাঁড়াতে পারে না, জঙ্গীহাতিও পালিয়ে যায়। নদীর তীব্র স্রোতও তার পথ রুখতে পারে না। পাহাড়ও তার অগ্রাভিযান থামাতে পারে না।

এই সন্ন্যাসী মুসলমানদের বদনাম করছিল। কিন্তু মুসলমানদের সম্পর্কে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিচ্ছিল। এই সন্ন্যাসী তীর্থযাত্রীদেরকে গযনী বাহিনীর এমন কিছু ভয়াবহ অভিযানের কথা বললো, যা শুনে আতঙ্কে শ্রোতাদের চোখ উল্টে যাওয়ার অবস্থা হলো।

জগন্নাথ নীরবে দাঁড়িয়ে সবকিছুই শুনছিল। কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে জগন্নাথের উপর সন্ন্যাসীর চোখ পড়লে হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে সন্ন্যাসীর যবান বন্ধ হয়ে গেলো এবং কালবিলম্ব না করেই আবার সন্ন্যাসীর কথা চলতে থাকল।

এক পর্যায়ে সন্ন্যাসী দেবদেবীদের ক্রোধ থেকে বাঁচার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করল। কিছুক্ষণ পর জগন্নাথ ওখান থেকে সরে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে একটি পুরনো মন্দিরের সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়াল জগন্নাথ। সেখানে দাঁড়িয়ে সেই দুই সন্ন্যাসীকে জগন্নাথ আসতে দেখতে পেলো। তাদের দেখেও জগন্নাথ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল। এই মন্দিরটি ছিল পরিত্যাক্ত। এর কিছু অংশ ভগ্নস্তূপে পরিণত হলো। হঠাৎ সে শুনতে পেল 'তাশ!'

ডাক শুনেও সে থামল না এবং পেছনে ফিরেও দেখলো না, আবার সে শুনতে পেল, 'তাশ! তাশকীন!'

একমনে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল জগন্নাথ। উভয় সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে উঠতে বললো, 'আরে' আমীর বিন তাশকীন!' এবার দাঁড়াল জগন্নাথ এবং তার চেহারায় ক্ষোভের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো।

'আরে এখানে কেউ শুনতে পাবে না। ভয় করো না।' বললো দুই সন্ন্যাসী।

জগন্নাথরূপী তাশকীন সন্ন্যাসী হিশাম সমরকন্দীর কানে কানে বললো, 'হিশাম সমরকন্দী! কেউ না শুনলেও আমার নাম ধরে ডাকা তোমাদের উচিত হয়নি। তোমরা নির্বোধ হয়ে গেলে নাকি? এখানে বসো। আমি আমার হাত দেখাচ্ছি।

আমার হাত ধরে দেখতে থাকবে এবং কথা বলতে থাকবে। তোমরা দুজন ছাড়া এখানে আরো কি কেউ আছে?”

“আরো দু'জন আছে। জবাব দিল সন্ন্যসীরূপী হিশাম। ওরাও কায়সের মতোই মুশরেফ তথা গোয়েন্দা। তারাও সন্ন্যাসীরূপেই অবস্থান করছে।'

বহির্দিশে গোয়েন্দাকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে গযনী সালতানাতে 'মুশরেফ' বলে ডাকা হতো। সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা বিভাগের অভিজ্ঞ কর্মকর্তারা স্থানীয় লোকদেরও তাদের পক্ষে চর নিয়োগ করতো এবং তাদেরকে বিপুল আর্থিক ভাতা দিতো।

সন্ন্যাসীরূপী এই দুজনের নেতা ছিল গযনীর গোয়েন্দা বিভাগের অন্যতম কর্মকর্তা হিশাম সমরকন্দী। মাথুরায় ভারতের বিপুলসংখ্যক হিন্দু সমাবেশ ঘটতে যাওয়ার খবর শুনে তাকে মুলতান থেকে মাথুরায় পাঠানো হয়। সে স্থানীয় লোকদের সাথে নিয়ে সন্ন্যাসীরূপে তীর্থযাত্রী হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে আরো আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে লাগল।

হিশামের সঙ্গী সন্ন্যাসীরূপী অপর গোয়েন্দা ছিল মুলতানের অধিবাসী কায়েস। তারা দু'জন ছাড়াও আরো দু'জন মুলতানী মাথুরায় তৎপর ছিল। তারা হিন্দু সমাবেশের কোথাও ছদ্মবেশ ধারণ করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

হিশাম ভিড়ের মধ্যে জগন্নাথরূপী আমীর বিন তাশকিনকে চিনে ফেলে। কারণ, তারা উভয়েই ছিল গযনীর অধিবাসী। কিন্তু কর্মসূত্রে হিন্দুস্তানে এই তাদের প্রথম সাক্ষাত। কিন্তু কায়েস তাশকীনকে চিনতো না। এরা প্রত্যেকেই স্থানীয় হিন্দুদের রীতি-রেওয়াজ ও কৃষ্টিকালচার নিপুণভাবে রপ্ত করেছিল। হিন্দু ধর্মের খুটিনাটি সম্পর্কেও তারা ছিল জ্ঞাত।

'তোমার ঠিকানা কোথায়? তাশকীনকে জিজ্ঞেস করল হিশাম। কাজের কাজ কিছু করতে পেরেছো?

“আমি চলে যাচ্ছি! হিন্দুর বেশ ধারণ করে এখানে এসেছিলাম, এখন কাজ শেষ করে চলে যাচ্ছি।” বললো তাশকীন।

আরে! তুমি আমাদের কাছে নিজেকে আড়াল করছো কেন? হেসে বললো হিশাম। আমি তোমাকে মহারাজা কন্নৌজের সাথে দেখেছি। তুমি হয়তো তার নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছো। তোমাকে দেখে কিন্তু তুমি যে

আমাদের তাশকীন তাতে মোটেও সন্দেহ হয়নি। তোমাকে তো আমি উস্তাদ মনে করি।"

"আমাদের তিনজনের একসঙ্গে এক জায়গায় বসে থাকা ঠিক হচ্ছে না।" বললো তাশকীন। কায়স! তুমি একটু ঘোরাফেরা করো। রাতে আবার আমরা একসঙ্গে মিলিত হবো।"

কায়েসের চলে যাওয়ার পর আমের বিন তাশকীন হিশামের উদ্দেশ্যে বললো, হিশাম! তুমি তো আস্ত একটা বোকা দেখছি। তুমি স্থানীয় লোকদের উপর এতোটাই আস্থা ও বিশ্বাস রাখো যে, আমার মতো স্পর্শকাতর অবস্থানে থাকা ব্যক্তির কথাও তুমি তাকে জানিয়ে দিলে? তাকে কি তুমি গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরীক্ষা করেছো? সে কি কোন জটিল কাজ সমাধা করেছে?'

"লোকটি নির্ভরযোগ্য। অবশ্য তাকে এখনো স্পর্শকাতর কোন কাজে ব্যবহার করিনি।" বললো হিশাম।

"আল্লাহ যেনো তাকে নির্ভরযোগ্য রাখেন। বললো তাশকীন। তবে মনে রাখবে হিশাম! আমাদের কাজ খুবই স্পর্শকাতর ও জটিল। তুমি তো জানো এ কাজে নিজের আবেগ, উচ্ছ্বাস, অনুভূতিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আর এই আবেগ সে-ই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যার মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমান আছে এবং যারা আমাদের মতো জাতির প্রতি দায়বদ্ধ।

হিন্দুস্তানের কোন মুসলমানের উপর এতোটা ভরসা করা যায় না। এসব লোক দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত। এরা হিন্দুদের প্রভাবে খুব অল্প সময়েই প্রভাবিত হয়ে যায়। এরা হিন্দুদের কুসংস্কার ও হিন্দু কালচার খুব সহজেই গ্রহণ করে ফেলে। নিজেদের অক্ষমতা ও নানা অসুবিধার শিকার হলে এরা হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার জন্য উদগ্রীব হয়ে যায়।

এখানকার কোন মুসলমানকে নির্ভরযোগ্য মনে হলেও আমার মতো জটিল কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের তথ্য দেয়া ঠিক নয়। কারণ, এখানকার হিন্দু শাসকরা সামান্য সন্দেহ হলেই মুসলমানদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়, তাদের নির্বিচারে হত্যা করে।'

'ঠিক আছে, আমি ওকে আরো পাকাপোক্ত করে নেবো।' বললো হিশাম।

'হিশাম, এ লোক আমাকে কন্নৌজের মহারাজার সাথে দেখেছে। এখন সে আমার পরিচয়ও জেনে গেছে। সে যদি কোন কারণে হিন্দুদের হাতে ধরা পড়ে

অথবা হিন্দুদের পক্ষ থেকে লোভনীয় কোন উপঢৌকনের টোপ পায়, তাহলে সে আমাকে ধরিয়ে দিতে পারে। যে কোন অবস্থায় তার জন্য আমি মোটা অংকের শিকার।

একটু ভেবে দেখো! আমি কন্নৌজের মহারাজার একান্ত নিরাপত্তা রক্ষী। সবাই আমাকে জগন্নাথ বলেই জানে। এমতাবস্থায় আমাকে যদি কেউ স্বরূপে ধরিয়ে দিতে পারে, তাহলে মহারাজা তাকে তার দেহের ওজন পরিমাণ হীরা-জহরত উপঢৌকন দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না।'

'তুমি যদি তাকে সন্দেহ করো, তাহলে আজই আমি তাকে হত্যা করে লাশ গায়েব করে ফেলবো।' বললো হিশাম। আমি এখন আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। আমি দুঃখিত।'

'না, সংশয়ের বশীভূত হয়ে কারো জীবনহানি ঘটানো ঠিক হবে না।' বললো তাশকীন। এর চেয়ে বরং তার উপর কড়া দৃষ্টি রাখো এবং তাকে ঈমান ও উদ্দেশ্যে সম্পর্কে আরো পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করো।'

'আমরা যা করছি, তা তোমার কাছে কি ভালো লেগেছে?' তাশকীনের কাছে জানতে চাইলো হিশাম। এখানকার সাধারণ মানুষজনকে মন্দিরের পুরোহিত এবং পণ্ডিতরাই আতঙ্কিত করে ফেলেছিল। এর উপর আমরা আতঙ্কের মাত্রাটি আরো বাড়িয়ে দিলাম।

এখানকার লোকেরা হিন্দু সাধু-জ্যোতিষী-সন্ন্যাসী- গণকদের সর্ব্যৈব মিথ্যা কথাগুলো সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আমরা সন্ন্যাসীরূপ ধারণ করে তাদের বোঝাচ্ছি, মাহমূদ গযনবীর কাছে জিন ভূত থাকে। এসব জিন-দানবেরা সামরিক-বেসামরিক সব ধরনের প্রতিপক্ষকে গ্রাস করে আর সামনে দুর্গ-দেয়াল-পাহাড়-পর্বত যাই থাকুক না কেন সবকিছু তছনছ করে ফেলে...।

এর ফলে এখানকার মা-বোন-স্ত্রীরা তাদের স্বামী-পুত্র ভাইদের সেনাবাহিনীতে যেতে দেবে না। তারা কিছুতেই চাইবে না, তাদের ঘর উজাড় করে আপনজনেরা বেঘোরে মুসলমানদের হাতে প্রাণ বিজর্সন দিক...। আচ্ছা তুমি ওখানে কী করছো তাশকীন?"

"কন্নৌজের মহারাজার ভবিষ্যত পরিকল্পনা জানার ও বোঝার চেষ্টা করছি।' বললো তাশকীন। মহারাজা সুলতানের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ। যেসব

রাজা-মহারাজা গযনী বাহিনীর হাতে পরাজতি হয়েছে, তাদের খুবই গালমন্দ করে। এখানে ভারতের অধিকাংশ রাজা-মহারাজারা এসেছে। তাদের একটা বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে তারা ভবিষ্যত কর্মসুচী ঠিক করবে। তখন বোঝা যাবে, তারা কী করতে চায়?"

"সুলতানের পক্ষে এখনই কোন অভিযানে বের হওয়া সম্ভব নয় তুমি কি সেই খবর জানো তাশকীন? বললো হিশাম।

'হ্যাঁ, খাওয়ারিজমে সুলতানের খুবই রক্তক্ষয়ী একটি যুদ্ধ করতে হয়েছে। হিশামের অসমাপ্ত কথা পূর্ণ করে বললো তাশকীন। এসব খবর যথাসময়েই আমি পেয়েছি।

সুলতানও জানেন, লাহোরের মহারাজা ভীমপাল কন্নৌজের মহারাজাকে সুলতানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য উৎসাহ দিচ্ছে। আমার এখানে আসতে হয়েছে কন্নৌজের মহারাজার তৎপরতা জানার জন্য।

এরা কি গযনী আক্রমণ করতে চায়? না ভারতের সব রাজা মহারাজারা ঐক্যবদ্ধ সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে সুলতানকে হুমকি দিতে চায়? এরা হয়তো সম্মিলিতভাবে সেনা সমাবেশ করে সুলতানকে পরাজতি করার চেষ্টা করবে। আমার কাজ হলো এখানকার রাজা মহারাজাদের সামরিক শক্তির আন্দাজ করা এবং এরা কি সামরিক কৌশল নেয় তা জানা।"

"ও, এজন্যই হয়তো আমাদের বলা হয়েছে, মাথুরার হিন্দু সমাবেশে জনগণের মধ্যে গযনী বাহিনী সম্পর্কে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে।"

"এখন তুমি চলে যাও। বললো তাশকীন। মনে রেখো, স্থানীয় গোয়েন্দা মুশরেফদের উপর এতোটা নির্ভরশীলতা ঠিক নয়। এদেরকে কৌশলে ব্যবহার করো।"

* * *

সে দিন সন্ধ্যায় চতুর্দিক অন্ধকার করে কাকের চোখের মতো নীল হয়ে গেল আকাশ। সেদিন মাথুরায় আগত সকল রাজা-মহারাজাদের দাওয়াত ছিল কন্নৌজের মহারাজার আস্তানায়।

মহারাজা কন্নৌজের রাজকীয় তাঁবুতে নানা বর্ণের ফানুস ও বাহারী শামিয়ানা দিয়ে সাজানো হলো। কন্নৌজ মহারাজার তাঁবু ছিলো বিশাল জায়গা

জুড়ে। এর ভেতরে নিরাপত্তারক্ষী, রাণীদের থাকার কক্ষ, রাজার বৈঠকখানা, মহারাজার আরামের কক্ষ, সেবক সেবিকাদের থাকার কক্ষ, নর্তকী, গায়ক বাদকদলের জন্য আলাদা থাকার রুম ছিল। তাঁবু তো নয়, যেন বিশাল ময়দান জুড়ে এক রাজমহল।

জিয়াফত অনুষ্ঠানে রাজা মহারাজাদের শরাব পান করানোর জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল সুন্দরী যুবতী ও প্রশিক্ষিত তরুণী। এরা অর্ধনগ্ন পোশাকে সজ্জিত হয়ে রাজ-মহারাজাদের আপ্যায়ন করছিল।

অধিকাংশ রাজা-মহারাজাদের সাথে ছিলো দু-তিনজন করে রাণী। অনেক রাজা-মহারাজার একান্ত নিরাপত্তারক্ষীও তাদের সাথেই ছিল। আমীর বিন তাশকীন একান্ত নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কন্নৌজের মহারাজার পেছনে সশস্ত্র অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল। খাবার-দাবার চলার সময় চম্পারাণী আড়চোখে বারকয়েক জগন্নাথরূপী আমীর বিন তাশকীনকে দেখে নিল। কিন্তু তাতে তাশকীনের কোন ভাবাবেগ ঘটলো না, সে মন্দিরের পাথুরে মূর্তির মতোই নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল।

আহারপর্ব শেষ হলে বাদ্যযন্ত্রের বাজনা শুরু হলো। বাজনার আওয়াজ যখন উচ্চাঙ্গে উঠলো, তখন মঞ্চের এক কোণ থেকে সাদা ওড়না গায়ে জড়িয়ে পায়রার মতো পাখনা মেলে নাচের মুদ্রায় দৃশ্যমান হলো এক নর্তকী।

ঠিক এই সময়ে বজ্রপাতের মতো গর্জে উঠলো এক রাশভারী কণ্ঠ– "বন্ধ করো এসব পাপাচার!"

সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেলো বাদকদলের উন্মাতাল বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আর নিমিষেই অদৃশ্য হয়ে গেলো নর্তকী।

সবাই অবাক চোখে দেখলো মঞ্চের মাঝখানে মাথুরার বড় মন্দিরের প্রধান পুরোহিত অগ্নিমূর্তি ধারণ করে দণ্ডায়মান। ক্ষোভে তার ঠোঁট কাঁপছে। দুচোখে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। প্রধান পুরোহিতের এই অগ্নিমূর্তি দেখে রাজা-মহারাজা ও রাণীদের এই প্রমোদ মহলে নীরবতা নেমে এলো। আবারো ধ্বনিত হলো গম্ভীর কণ্ঠ "স্বঘোষিত নির্ভীক মহারাজা ভীমপাল গযনীর সুলতানের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজতি হয়ে তার সাথে অধীনতামূলক চুক্তি করেছে। তোমরা কি এর জন্য উৎসব করছো?' ক্ষুব্ধ পুরোহিত কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে বললো।

তোমরা কি দেবদেবীদের অপমানের আনন্দ-উৎসব করছো? তোমাদের ধর্মালয় মন্দিরগুলোর উপর দিয়ে মুসলমানরা তাদের জঙ্গী ঘোড়া ছুটিয়েছে এজন্য কি তোমরা নর্তকীদের সাথে নিয়ে এসেছো?

রাজপুতদের তাজা রক্ত বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এজন্য আনন্দ করছো তোমরা? নর্তকী নাচিয়ে কী আনন্দ করবে, তোমরা নিজেরাই পায়ে নূপুর আর হাতে চুড়ি পরে নাচো...।"

"আমাদের ক্ষমা করে দিন পণ্ডিত মহারাজ।" এক রাজা দাঁড়িয়ে দু'হাত জোড় করে বললো। আজ আমরা এই ফায়সালা করার জন্যই একত্রিত হয়েছি– গযনী বাহিনীকে কী করে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দেয়া যায়?"

"তোমাদের সবার উপর শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেবের গজব আসি আসি করছে। তোমাদের কারণেই আবারো ভারতের মাটিতে অগণিত মুহাম্মদ বিন কাসিম জন্ম নিচ্ছে। এ কারণে তোমরা দেবদেবীদের অভিশাপ থেকে রেহাই পাবে না।"

পণ্ডিতের কথা শেষ হতে না হতেই আকাশে তুমুল মেঘের গর্জন শোনা গেল। সন্ধ্যার আগ থেকেই আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছিল এবং চারদিকে নেমে এসেছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। হালকা বিজলীও চমকাচ্ছিল। কিন্তু মেঘের তর্জন গর্জন বেড়ে দেখতে দেখতে তীব্র হয়ে উঠলো আকাশের গর্জন। এরই মধ্যে পণ্ডিত রাজা-মহারাজাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছিল এবং তাদেরকে সনাতন ধর্ম রক্ষায় অবহেলা ও উদাসীনতার জন্য দোষারোপ করছিল। রাজা মহারাজাদেরকে পণ্ডিত দেবদেবীদের অভিশাপের ভয় দেখাচ্ছিল।

হঠাৎ ঝুলন্ত ঝাড়বাতিগুলো খুব জোরে দুলে উঠলো এবং টাঙানো শামিয়ানার সাথে হোঁচট খেলো। শামিয়ানাগুলো উপরে উঠে গেল তীব্র বাতাসের ধাক্কায়। দেখতে দেখতে এমন তীব্র বাতাস বইতে শুরু করলো যে, তাঁবুগুলোকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে তীব্র বাতাস রূপ নিলো প্রচণ্ড ঝড়ের। ঝড়ের তাণ্ডবে জ্বলন্ত ফানুসগুলো নিচে আছড়ে পড়ল এবং চতুর্দিকে তেল ছড়িয়ে পড়ল, শামিয়ানাগুলো ছিঁড়তে শুরু করলো। জ্বলন্ত ফানুস ও জ্বলন্ত মশালের আগুনে ছিড়ে পড়া শামিয়ানা ও তাঁবুতে আগুন ধরে গেল। প্রচণ্ড ঝড়ের সাথে এমন তীব্র বিজলী ও কানফাটা মেঘের গর্জন ও বজ্রপাত শুরু হলো, যেনো আসমান ভেঙে পড়তে শুরু করেছে।

ভেঙেপড়া ফানুস এবং মশালের আগুনে ছিঁড়ে যাওয়া তাঁবুর কাপড়ে আগুন ধরে গেলে বাতাস তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল। আগুনের ধোঁয়া আর তীব্র ঝড় ও ঘুটঘুটে অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখার উপায় ছিলো না।

এরই মধ্যে পণ্ডিতের কণ্ঠে শেষবাক্য উচ্চারিত হলো, এই দেখো বিষ্ণুদেবের অভিশাপ ঝড়ের রূপে এসে গেছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব ও আতঙ্কিত সকল রাজা-মহারাজা নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য যে যেদিকে পারল দৌড়াতে শুরু করল। কিন্তু ততক্ষণে বজ্রপাত ও বিজলীর সাথে শুরু হয়েছে ভারি বর্ষণ।

তীব্র ঝড়ের শনশন আওয়াজ, ভারি বৃষ্টি আর মেঘের গর্জনের সাথে বর্জপাতের আওয়াজ মিলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হলো।

অদূরে বাঁধা রাজা-মহারাজাদের হাতি ও ঘোড়াগুলো আতঙ্কিত চিৎকার ও হ্রেষারব করতে লাগল। অবস্থা আরো গুরুতর হয়ে উঠলো। প্রবল বৃষ্টি যখন তাঁবুর জ্বলন্ত আগুন নিভিয়ে দিল এবং তুফানে ছেঁড়া-ফাটা তাঁবুর খুঁটি উড়তে শুরু করলো।

রাজা-মহারাজাদের একান্ত নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের মনিবদেরকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণবাজী রেখে সবাই দৌড়ে অকুস্থলে পৌঁছালো। এরই মধ্যে শোনা যাচ্ছিল মহারাজা কন্নৌজের দরাজ কণ্ঠ, জগন্নাথ! যেখানেই থাকো, চম্পারাণীকে মন্দিরে নিয়ে যাও।'

সেখান থেকে মন্দির ছিল অনেক দূরে। সবাই যে যার মতো করে শহরের দিকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটছিল। গোটা তাঁবু এলাকায় দৌড় ঝাপ শুরু হয়ে গেল।

এমতাবস্থায় তুফানের আঘাতে ঘন গাছগাছালীতে আকীর্ণ মাথুরার গাছপালগুলো ভেঙে পরতে শুরু করেছে। ভাঙা গাছের ডাল মাটিতে আঁছড়ে পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। তাশকীন রাজার বলার আগেই চম্পাকে তার আয়ত্ত্বে নিয়ে এসেছিল এবং কাঁধে তুলে মন্দিরের দিকে ছুটছিল।

শহরের চতুর্দিকে আগত লাখো হিন্দু তীর্থযাত্রীর অস্থায়ী তাঁবু ছিল। অনেক লোক তাঁবু ছাড়াই খোলা আসমানের নিচে আসবাবপত্র নিয়ে অবস্থান নিয়েছিল। এসব লোক তাদের আসবাবপত্র ঝড়ের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে

জীবন বাঁচাতে ঝড়ের শুরুতেই শহরের দিকে দৌড়াতে শুরু করে দিল। শহরবাসী তীর্থযাত্রীদেরকে আশ্রয় দেয়ার জন্য ঘরবাড়ীর দরজা খুলে দিয়েছিল। মাথুরার প্রতিটি মন্দির ছিল খোলা। মানুষজন মন্দিরেও আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করছিল।

ঝড়ের তাণ্ডব তখন বেড়েই চলছে। সেই সাথে তীব্র বৃষ্টি, বিজলী আর বজ্রপাতের সাথে আহত-আতঙ্কিত মানুষের আর্তচিৎকার শুরু হয়ে গেল।

আতঙ্কিত শিশু, নারী ও আহতদের চিৎকারে গোটা মাথুরা এলাকা যেনো নরকে পরিণত হলো।

দৃশ্যত এ তুফান যেনো কেয়ামত হয়ে উঠেছিল। এই তুফানের মধ্যে হিশামের সহযোগী মুলতানের অধিবাসী কায়েস নদীর তীর থেকে শহরের দিকে আসছিল। সে ছিল একাকী। তীব্র তুফানের আওয়াজ, বিজলীর ঝলক আর মেঘের গর্জনের মধ্যে অতি নিকট থেকে তার কানে ভেসে এলো কোন নারী বা শিশুর আর্তচিৎকার।

বিজলীর আলোয় তার সামনের একটি গাছের গোড়ায় একটি নারীর মতো নজরে পড়লো এবং ওখান থেকে আবারো আর্তচিৎকার শোনা গেল। আর্তচিৎকার শুনে তীব্র বাতাসের ধাক্কা সামলে কায়েস সেদিকে দৌড়াল। গিয়ে ডালপালা উড়ে যাওয়া একটি গাছের গোড়ায় এক মহিলাকে আতঙ্কিত অবস্থায় দেখতে পেল। মহিলা ভয়ে তীরবিদ্ধ পাখির মতো কাঁপছে।

ভয় পেয়েছো? তুমি এখন আর একা নও, আমি তোমার সাথে আছি। আতঙ্কিত নারীকে অভয় দিতে বললো কায়েস।

এই আতঙ্কিত নারী ছিল এক পুণ্যার্থী কিশোরী। সন্ধ্যায় সে গঙ্গাস্নান করতে নদীতে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় ঝড় শুরু হয়ে যায়। সবাই যখন জীবন বাঁচানোর জন্য দৌড়াতে লাগলো, তখন অন্ধকারের মধ্যে সে সঙ্গীদের হারিয়ে ফেলেছিল। কায়েসকে দেখে আতঙ্কিত কিশোরী তাকে জড়িয়ে ধরলো।

আকাশের তীব্র গর্জন, চোখ ধাঁধানো বিজলী ও ঝড়ের প্রচণ্ডতায় কায়েসের মতো টগবগে যুবকের চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলার উপক্রম হলো। এমন সময় তাদের অতি কাছে একটি গাছের উপর ঘটলো তীব্র শব্দে বজ্রপাত। আতঙ্কিত তরুণী বজ্রপাতের আওয়াজে মা বলে চিৎকার করে কায়েসের শরীরে এভাবে লেপ্টে গেলো, যেনো সে কায়েসের শরীরে বিলীন হয়ে নিজেকে রক্ষা করবে।

তীব্র ঝড়কে দেবতার ক্রোধ বিশ্বাস করে মাথুরার মন্দিরগুলোতে একটানা ঘন্টা ও শাখা বাজতে শুরু করল। ঝড়ের এই বিপদে মন্দিরের শিঙ্গাগুলোর বেসুরো আওয়াজ যেন আক্রান্ত বাঘের গর্জন।

মন্দিরের পূজারী ও পণ্ডিতেরা কৃষ্ণ ও বাসুদেব মূর্তির পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মন্দিরগুলোর পণ্ডিতেরা 'হরি হর মহাদেব' জয় হরিহর জগদিশ' ধ্বনি করছিল। সকল হিন্দুই এই ঝড়কে দেবতাদের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ বলে বিশ্বাস করেছিল।

ঘরে ঘরে হিন্দুদের যেসব মূর্তি ছিলো, অধিবাসীরা সেইসব ক্ষুদ্র মূর্তির সামনে হাতজোড় করে আবেদন নিবেদন করছিল। বস্তুত এটি দেবতাদের ক্রোধ, না আল্লাহ্র ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ এটা বুঝার ক্ষমতা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী হিন্দুদের ছিলো না। বেসুরো সিংগার আওয়াজ ঝড়ের ভয়াবহতাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল।

সকল রাজা-মহারাজা, তাদের সেনাবাহিনীর বীর সেনাপতি ও কমান্ডাররাও এই ঝড়ের ভয়াবহতায় থরথর করে কাঁপছিল। তারা এই ঝড়কে মনে করেছিল জিনভূত ও দেও-দানবদের সংহারী যুদ্ধ। মনে হচ্ছিল, এই ঝড় দুনিয়াকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবে।

* * *

কায়েস আতঙ্কিত তরুণীকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঝড়ের মধ্যেই একটি জরাজীর্ণ মন্দিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তরুণী কায়েসের গলা জড়িয়ে ধরে কায়েসের গালের সাথে তার চেহারা মিশিয়ে রেখেছিল। তরুণী ছিল অনেকটাই অচেতন। বিজলীর চমক আর বজ্রপাতের শব্দে সে খানিকটা হুঁশ ফিরে পেতো।

তীব্র ঝড়ের মধ্যে কায়েস তরুণীকে কাঁধে নিয়ে এগুতে পারছিলো না, তার পা উপড়ে যাচ্ছিল। ঝড়ের ঝাপটায় গাছের ডালপালা নুয়ে পড়ে কায়েসকে আঘাত করার উপক্রম হল। বারবার সে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, তবুও সে তরুণীকে কাঁধ থেকে ফেলে দেয়নি।

এমন সময় প্রচণ্ড এক বজ্রপাত ঘটলো। সেই সাথে কাছে এমন এক ভয়ানক চিৎকার শোনা গেল, যাতে কায়েসেরও জ্ঞান হারানোর উপক্রম হলো।

সম্পূর্ণ বেহুঁশ না হলেও কিছুটা অপ্রকৃস্থ অবস্থায় কায়েস বিজলীর আলোকে তার সামনে দেখতে পেলো দু'টি আতঙ্কিত হাতি শূর উঁচিয়ে এদিকে দৌড়ে আসছে। অবস্থা এমন যে, তার অবস্থান থেকে হাতির দূরত্ব ছিল মাত্র বিশ/ত্রিশ গজ।

আতঙ্কিত হাতি দুটো পাশাপাশি আসছিল। এর আগেই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে কাঁধে বোঝা নিয়ে কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হতে গিয়ে কায়েসের চলৎশক্তি ফুরিয়ে আসছিল। আতঙ্কিত হাতি দু'টো ভয়াবহ তীব্রতায় চিৎকার করে পাশাপাশি দৌড়ে আসছিল।

অবস্থা বেগতিক দেখে হাতির পায়ে পিষ্ট হওয়া থেকে বাচতে কায়েস শরীরের অবশিষ্ট সবটুকু শক্তি দিয়ে ডান দিকে দৌড় দিল। কিন্তু কয়েক কদম এগোতেই পা পিছলে পড়ে গেল এবং কাঁধের তরুণীকে দূরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

নিজে হাতির পায়ে পিষ্ট হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েই গড়িয়ে কিছুটা সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। এমন সময় হাতি তার উপর দিয়ে চলে গেল। ছুটন্ত হাতির একটি পা এসে পড়ল তার পাঁজরে।

বিজলীর ঝলকানিতে সহায়তাকারী হাতির পদপিষ্ট হয়েছে দেখে তরুণী চিৎকার দিয়ে এসে কায়েসের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং পরম মমতায় কায়েসের মাথাটা কোলে নিয়ে বললো, 'তুমি ঠিক আছো? ঠিক আছো কি না বল, কথা বলো। তরুণীর মমতাময়ী স্পর্শে কায়েস চোখ মেলে তাকাল এবং উঠে বসল! কিছুক্ষণ পর কায়েস তরুণীকে বলল, ঠিক আছে, আমার কিছু হয়নি।

* * *

অনেকক্ষণ পর তারা একটি ভগ্নস্তূপের মতো পুরনো মন্দিরে পৌছল। মন্দিরটি ছিল জমিন থেকে অনেক উঁচুতে। কায়েস ও হিশাম, আমীর বিন তাশকীনের সাথে এই ভগ্নমন্দিরেই মিলিত হয়েছিল।

তরুণীকে বগলদাবা করে নিয়ে কায়েস মন্দিরের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে থাকল। এক পর্যায়ে তরুণী কায়েসের পাঞ্জা ছাড়িয়ে বলল, আমাকে ছাড়, আমি নিজেই উঠতে পারব।

তখনো তুফানের তীব্রতা এতটুকু কমেনি। কিন্তু কায়েসকে স্বেচ্ছায় হাতির পদতলে পড়তে দেখে তরুণীর সাহস বেড়ে গিয়েছিল। তারা দু'জন পরস্পর কোমর পেঁচিয়ে ধরে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে অন্ধকারের মধ্যেই একটি পরিত্যক্ত কক্ষে প্রবেশ করল।

কক্ষে পৌছে ঝড় তুফানের তীব্রতা থেকে নিরাপদ বোধ করলে তরুণী অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়ে কায়েসের পা জড়িয়ে ধরে পায়ে মাথা রেখে কৃতজ্ঞতা জানাল।

'আরে, একি! আমাকে গোনাহগার বানিও না তুমি! পরম আদরে পা থেকে তরুণীর মাথা তুলতে তুলতে বললো কায়েস। ঘটনার আকস্মিকতা এবং ঘোরতর জীবনহানিকর বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে কায়েসের আবেগ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গেল।

সে নিজের পরিচয় গোপন রাখার ব্যাপারটি একদম বিস্মৃত হয়ে তরুণীকে এমন ভাষায় কথা বললো যে, তার আত্মপরিচয় এক নিমিষেই উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। কায়েস আরো বললো, 'আমাদের ধর্মে মানুষ মানুষকে সিজদা করা পাপ। মানুষ মানুষের পায়ে সিজদা দিতে পারে না। মানুষ একমাত্র নিরাকার আল্লাহ্‌কে সিজদা দিতে পারে।"

'তুমি কি মুসলমান?" বিস্ময়াভিভূত হয়ে বললো তরুণী।

"আমি যদি বলি যে, আমি মুসলমান, তাহলে তুমি আমাকে তেমনই ঘৃণা করবে, যেমন একজন হিন্দু মুসলমানকে ঘৃণা করে?"

'ঘৃণা? তোমাকে ঘৃণা করবো আমি? তুমি না হলে তো আজ আমি বেঁচেই থাকতাম না...। আচ্ছা, তুমি মুসলমান হলে তো এই তুফান যে দেবতাদের অভিশাপ তা বিশ্বাস করবে না।"

"আমি তোমার ধর্মকে অসম্মান করতে চাই না।" বললো কায়েস। এটা আসলে আমার প্রভুর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। সে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ পাথরের তৈরী মূর্তির পূজারীদের উপর বর্ষিত হচ্ছে। এই ঝড় আল্লাহ্‌র নির্দেশে হচ্ছে। সেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আমি শক্তি ও সাহস পেয়েছি। যার ফলে এমন কঠিন অবস্থার মধ্যেও আমি তোমাকে কাঁধে তুলে এখানে নিয়ে আসতে পেরেছি।

কায়েস সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে গঙ্গাতীরে গিয়েছিল। তার পরনে ছিল একটি লেঙ্গুট মাত্র। তার মুখে ছিল কৃত্রিম দাড়ি এবং সারা শরীরে ছাইভস্ম মাখানো ছিল। ঝড়োবৃষ্টি তার শরীরের কৃত্রিম সব আবরণ ধুয়ে ফেলল এবং লেঙ্গুট কোথাও খুলে পড়ে গেল।

তরুণী তা'কে জিজ্ঞেস করল, তুমি বিবস্ত্র কেন?

সে তরুণীর প্রশ্নের জবাবে জানাল, তুফানের আগমুহূর্তে সে নদীতে গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিল। তীরে কাপড় রেখে সে গঙ্গাস্নানে নেমেছিল। এরপরই তুফান শুরু হয়ে যায় এবং ঝড় তার তীরে রাখা কাপড় উড়িয়ে নিয়ে যায়। অতঃপর জীবন বাঁচাতে সে এদিকে দৌড়াতে শুরু করে।

কায়েস তরুণীকে জানালো, সে মাথুরায় মেলা দেখতে এসেছিল। সে তরুণীকে জিজ্ঞেস করল, তোমার বাড়ী কোথায়?"

জবাবে তরুণী বুলন্দ শহরের কোন একটা জায়গার নাম বললো। তরুণী আরো জানালো, তাদের গোটা পরিবারই এই উৎসবে এসেছে। তার বাবাও তাদের সাথে আছে। শহরের বাইরে ছিল তাদের তাঁবু।

কায়েস তরুণীকে জানাল, এখন আর সেখানে কোন তাঁবু পাওয়া যাবে না এবং গোত্রের কোন লোককেও সেখানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আজ রাত এখানেই কাটাতে হবে।

যদি কিছু মনে না করো, তাহলে আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আবেদনের সুরে থেমে থেমে বললো তরুণী।

'তুমি একজন তরুণ যুবক। আর আমি তরুণী। এখনো আমার বিয়ে হয়নি...। রাতটা আমাদের এখানেই কাটাতে হবে।'

তরুণীর কণ্ঠে ছিল নিজেকে সমর্পণের আবেদন।

কায়েস বলল, দেখো, আমি নিজের জন্য তোমাকে তুলে আনিনি। তোমার মা-বাবার কাছে তোমাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যই তোমাকে এনেছি...। আমি তোমার কাছ থেকে একটা প্রতীজ্ঞা নিতে চাই।... আমি যে মুসলমান একথা কাউকে জানাতে পারবে না। আমি মুসলমান জানতে পারলে হিন্দুরা আমার সাথে খুবই দুর্ব্যবহার করবে। আমি জগদিশ নামে পরিচয় দেবো।'

তরুণীর নাম ছিল ঊষা। ইতোমধ্যে তাদের উভয়েই উভয়ের প্রকৃত নাম জেনে গেছে। ঊষা কায়েসের প্রতিটি শর্ত এবং প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য শপথ করে নিল।

অতঃপর তারা সেই ভগ্নমন্দিরেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল। ক্লান্ত-শ্রান্ত যুবতী ঊষার দুচোখ ভেঙে ঘুম আসলেও বারবার তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। তুফানের ভয়ে ভাঙেনি, ভাঙছিল পরিচয় পাওয়া এই ভিন্নধর্মী মুসলমান যুবকের সংস্পর্শে রাতযাপনের ভয়ে।

আধো ঘুম আধো জাগ্রত অবস্থায় রাতের দ্বিপ্রহর কাটিয়ে শেষ প্রহরে ঊষার এমন ভারী ঘুম এলো যে, সে যখন ঘুম থেকে চোখ খুললো, তখন তার কক্ষ দিনের আলোয় আলোকিত হয়ে গেছে।

কায়েস সেই কক্ষের দরজায় বসে ঘুমন্ত ঊষাকে দেখছিল। রাতের ঝড় রাতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সকাল বেলায় সূর্য উঠলো ঝলমলে আকাশে প্রখর রৌদ্র-প্রতাপ নিয়ে। গত রাতের কেয়ামতের আলামত দিনের বেলার আকাশে মোটেও ছিল না।

ঘুম থেকে উঠে অনেক বিস্ময়ে ঊষা কায়েসকে দেখছিল এবং কায়েসও মুগ্ধনয়নে ঊষার দিকে তাকিয়ে ছিল। কায়েস অবাক হচ্ছিল ঊষার রূপ-সৌন্দর্য দেখে। জীবনে সে এমন সুন্দরী মেয়েলোক দেখেনি।

আর ঊষা অবাক হচ্ছিল কায়েসের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও তার রূপ-যৌবন, দৈহিক সৌন্দর্য ও সুঠাম-সবল দেহসৌষ্ঠব দেখে। সবচেয়ে বেশী বিস্ময়ের কারণ ছিল, এমন একটি টগবগে তরুণ তার মতো তরুণীকে কাছে পেয়েও একটু স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। অথচ কোন হিন্দু যুবকের বেলায় এমনটি ভাবা যেতো না।

বিস্ময়ের ঘোর দূর হতেই নীরবতা ভেঙে কায়েস ঊষার উদ্দেশে বললো, এখন তোমার বাবা-মাকে খুঁজে বের করার পালা। উঠো, এখন তাদের খুঁজতে বের হই।

ঊষার তখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। সে শোয়া থেকে উঠার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলো না। ঊষার চোখে কৃতজ্ঞতাবোধ ছাড়াও অন্য ব্যাপার ছিল। কায়েস তাকে আবারো তাড়া দিল। কিন্তু তবুও সে উঠলো না। কায়েস তার দিকে অগ্রসর হয়ে কাছে গিয়ে বসল। পূর্ববৎ শোয়া অবস্থায়ই ঊষা বললো,

"তুমি আমাকে জীবন দিয়েছো। তুমি কি এভাবে বাকী জীবনটা আমাকে নিরাপত্তা ও সুখ দিতে পারো না?"

ঊষার এ কথায় কায়েস কোন জবাব দিলো না।

"দেখো, তুমি আমাকে রাতের বেলায় আকস্মিক পেয়েছো, এটা আমার কাছে স্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়।" বললো ঊষা। এটাও আমার কাছে স্বাভাবিক ঘটনা নয় যে, তুমি এরপরও আমার গায়ে হাত দাওনি।

তুমি আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেও সেই বুড়োটার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না, যার সাথে আমার বিয়ের কথা পাকাপোক্ত হয়ে রয়েছে। দয়া করে তুমি আমাকে সাথে নিয়ে যাও...। হিন্দু নারীদের জীবন পুরুষের পদতলেই থাকে।

হিন্দু মেয়েদের পিতা-মাতা যার সাথে ইচ্ছা বিয়ে দিয়ে দেয়। স্বামী যদি মারা যায়, তাহলে সহমরণ হিসেবে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিতে হয়। যদি তা না করে, তাহলে আজীবন বিধবার বেশ ধারণ করে এই মাথুরার মন্দিরে কাটাতে হয়।

এখানে আসার পর এক বিধবা বান্ধবীর সাথে আমার দেখা হয়েছে। স্বামী মারা যাওয়ার পর দু'বছর যাবত সে এখানে আছে। মুখে সবাই বলে সে সতী-সাধ্বী জীবন যাপন করছে। কিন্তু বান্ধবীটি আমাকে জানিয়েছে, প্রতি রাতেই তাকে কোন না কোন পুরোহিতের সাথে থাকতে হয়। কায়েস...! তুমি আমাকে সাথে নিয়ে চলো। আমি বাকী জীবন তোমার সেবাদাসী হয়ে কাটিয়ে দেবো।

কায়েস ছিল টগবগে যুবক। একটি যুবককে এক পরমা সুন্দরী নিজেকে সমর্পণ করছে। দীর্ঘ সময় বহু কষ্টে সে নিজেকে নীরব এই মোমের কাছে না গলে ধরে রেখেছিল। কিন্তু সরব আগুনের শিখায় কায়েসের না-গলা ধৈর্যের শিকল গলে গেলো।

সে তরুণীকে এড়ানোর জন্য বললো, না, আমি আমানতের খেয়ানত করতে পারি না। তবে তোমার এই আবেদনও প্রত্যাখ্যান করতে পারছি না। ... আমার হৃদয়টা চিরে যদি দেখো, তাহলে সেখানে একমাত্র তোমারই ছবি আঁকা হয়ে গেছে, এখানে আর কারো ঠাঁই নেই। তোমাকে আমি আর কারো হাতে তুলে দিতে পারবো না। ঠিক আছে, এখন উঠো, চলো।"

ওরা টিলাসম মন্দির থেকে বের হয়ে বাইরের অবস্থা দেখে হয়রান হয়ে গেল। গত রাতের ঝড় ভয়ানক অবস্থা ঘটিয়ে গেছে। গত সন্ধ্যায়ও যেখানে ছিল তাঁবুর সারি, সেখানে আজ আর তাঁবুর কোন চিহ্ন নেই। লোকজন এদিক-সেদিক তাদের আসবাব পত্র তালাশ করছে। সকল তাঁবু লণ্ডভণ্ড। এলোপাতাড়ি গাছপালার ভাঙ্গা ডালপালা সারা এলাকা জুড়ে ছড়ানো। আর চতুর্দিকে শুধুই ধ্বংসের চিহ্ন, আর থৈ থৈ পানি।

কায়েস উষাকে সাথে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরের উপর থেকে নিচে নেমে এলো। তারা উষার বাবা-মার খোঁজে কিছুদূর এগোতেই উচ্চকণ্ঠে ভেসে এলো, "উষা, উষা"!!

উষা চিৎকার শুনে ওখানেই দাঁড়িয়ে গেল। সে কায়েসকে বললো, এই তো আমার বাবা! এখন আর আমাদের পক্ষে পালানো সম্ভব নয়।"

দীর্ঘদেহী, চওড়া বুকওয়ালা, বিশাল গোঁফধারী শক্ত সামর্থবান এক মধ্যবয়সী লোক দৌড়ে এসে উষাকে জড়িয়ে কোলে তুলে নিলো। উষাও তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললো, বাবা এর নাম জগদীশ। সেই গত রাতে আমার জীবন বাঁচিয়েছে। গতরাতে সে আমাকে নদীর তীর থেকে বেহুঁশ অবস্থায় তুলে এনে এই মন্দিরে রেখে রাতভর জাগ্রত থেকে পাহারা দিয়েছে। উষা এক নিঃশ্বাসে গতরাতের পুরো ঘটনা তার বাবাকে জানাল।

উষার কথা শুনে তার বাবা জগদীশরূপী কায়েসকে জড়িয়ে ধরে বললো, বলো বাবা, তুমি কী চাও? তোমাকে আমি উপহার দেবো। তুমি স্বর্ণ চাইতে পারো, ইচ্ছা করলে আমার ঘোড়াটিও চাইতে পারো। যাই চাও, আমি তোমাকে দিয়ে দেবো।"

"আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। একাজ আমি কোন পুরস্কারের লোভে করিনি। পুরস্কার যদি দিতেই চান, তবে আপনার এই মেয়েটিকেই আমাকে দিয়ে দিন। বললো কায়েস। কারণ, কাউকে না কাউকে তো আপনার এই মেয়ে দিতেই হবে। এটাই হবে আমার জন্য সবচেয়ে দামী পুরস্কার। আমি কেমন মানুষ তা এই সময়ের মধ্যে আপনার মেয়ে ঠিকই জেনে গেছে।

কায়েসের কথা শুনে উষার বাবা নীরব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো, তোমার মতো বীর বাহাদুর যুবকদের আমি সম্মান করি। তোমার দেহ সৌষ্ঠব খুবই সুন্দর। যথার্থ অর্থেই তুমি সুপুরুষ। আমি সেনা অফিসার।

বংশগতভাবেই আমরা সৈনিক। তোমার মতো সুপুরুষ যুবকের হাতে আমার মেয়েকে তুলে দিয়ে আমি তোমাকে সেনাবাহিনীতে চাকরী দিতে পারি। কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনীর এক উচ্চ কর্মকর্তার সাথে আমার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, এ প্রস্তাবকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। এ দাবী ছাড়া তুমি অন্য কিছু বলতে পারো।"

"আপনি কোন সেনাবাহিনীতে আছেন?" জানতে চাইলো কায়েস।

"আমি বুলন্দশহরের রাজার সেনাবাহিনীতে আছি।" জবাব দিল ঊষার বাবা।

কায়েস উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই ঊষার বাবার সাথে সেনাবাহিনী সম্পর্কে আলাপ শুরু করে দিল। এক পর্যায়ে ঊষার বাবা সুলতান মাহমূদ সম্পর্কে কথা বলতে লাগল। সে বললো, তাকে পরাজিত ও বন্দী করার জন্যই ভগবান এখনো আমাকে জীবিত রেখেছেন।

বংশগতভাবে এবং পেশাগতভাবে সৈনিক হওয়ার কারণে যুদ্ধ ও সেনাবাহিনী সম্পর্কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা বলছিল ঊষার বাবা। কিন্তু কায়েসের মনে তখন এসব বিষয়ের চেয়ে ঊষার আগ্রহই প্রবল। ঊষার বাবা কায়েসের সাথে ঊষার বিয়ের ব্যাপারে যখন অসম্মতি জানালো, তখন কায়েস একেবারে চুপসে গেল। তার চেহারা মলিন হয়ে গেলো। মনে হচ্ছিল তার দেহ থেকে যেনো আত্মা বের করে নেয়া হয়েছে।

কায়েস ভাবতে লাগলো। কুড়িয়ে পাওয়া রত্ন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে ঊষার বাবা।

ঊষাকে হারানোর যন্ত্রণা কায়েসের বোধজ্ঞান ও কর্তব্য চিন্তাকে ছাপিয়ে তার মানসিক দুর্বলতাকে তুঙ্গে তুলে আনলো এবং তাকে আবেগতাড়িত করে ফেললো।

ঊষার বাবা যদি কায়েসকে বিদায় করে দিতো কিংবা ঊষাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতো, তাহলে কায়েস হয়তো এতোটা প্রভাবিত হতো না। কিন্তু অনিন্দ্যসুন্দরী ও নিবেদিতা কান্তিময় চেহারার অধিকারিনীক ঊষা তার চোখের সামনেই আবেদনময়ী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল। ঊষার বাবা খুবই সৌজন্য এবং সৌহার্দ্য মনোভাব নিয়ে কায়েসের সাথে কথাবার্তা বলছিল আর কায়েস ভাবছিল ঊষাকে পাবার ফন্দি কীভাবে করবে।

এক পর্যায়ে ঊষার বাবা গযনীর গোয়েন্দা প্রসঙ্গে আলাপ শুরু করে দিল। বললো, 'এরা খুবই ভয়ানক, আমাদের মেলার মধ্যেও এরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা আমাদের দুর্বলতাগুলো সময়ের আগেই মাহমুদকে জানিয়ে দেয়। ফলে মাহমূদ আমাদের দুর্বল জায়গাগুলোতেই আঘাত করে।

আমাদের সেনাবাহিনীতে গযনীর গোয়েন্দা পাকড়াও করার জন্য মোটা অংকের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আমি যদি কোন মুসলিম গোয়েন্দাকে ধরতে পারি, তাহলে তাকে আমি জীবিতাবস্থায় আমার রাজার কাছে পেশ করবো না। তার মাথাটা কেটে নিয়ে যাবো।

একথা শুনে চিন্তিত কায়েসের চিন্তার অবসান হয়ে গেল। সে এবার ঊষাকে পাবার একটা সোজা পথ পেয়ে গেল। এদিকে ঊষা একথা শুনে তার বাবার আড়ালে দাঁড়িয়ে কায়েসের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মুচকি হাসল।

এই মুচকী হাসি ঊষাকে পাবার কায়েসের আকাঙ্ক্ষাকে আরো তীব্র করে তুললো। কায়েস বলে বসলো, "আমি যদি আপনাকে দু'-তিনজন মুসলিম গোয়েন্দা ধরিয়ে দিই, তাহলে কি আমি আপনার কাছে যা দাবী করেছি তা দেবেন?"

আরে তুমি গযনীর গোয়েন্দা পাকড়াও করবে কিভাবে?"

"এ ব্যাপারে আপনি আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।" বললো কায়েস। আপনি তাদের ধরবেন এবং তাদের জীবিত রাখবেন। তাদের জীবিত রাখলে এদের দেয়া তথ্য দিয়ে আপনি গযনীর আরো গোয়েন্দাদেরকে ধরতে পারবেন।"

"কবে ধরিয়ে দেবে তুমি?" জানতে চাইলো ঊষার বাবা। ওরা কোথায় আছে?"

"এখনই ধরিয়ে দেবো...। আজকের মধ্যেই।" জবাব দিল কায়েস।

"ওরা এই মেলাতেই আছে। যদি আমি তাদের ধরিয়ে দিতে না পারি, তাহলে আপনি আমার মাথা উড়িয়ে দেবেন।"

"সত্যিই যদি তুমি তাদের ধরিয়ে দিতে পারো এবং ধরা পরার পর ওরা গযনীর গোয়েন্দা প্রমাণিত হয়, তাহলে মাথুরার বড় মন্দিরে অনুষ্ঠান করে আমার মেয়েকে আমি তোমার হাতে তুলে দেবো। কিন্তু রাজার কাছ থেকে

পুরস্কার কিন্তু আমি নেবো। তাতে আমার প্রমোশন হবে। আমি আরো বেশী সৈন্যের কমান্ডার হয়ে যাবো।"

"ঠিক আছে, আমি রাজি। আমার সাথে চলুন।"

* * *

গত একটি রাত কায়েসের সাথে হিশাম ও তাশকীনের কোন দেখা-সাক্ষাত হয়নি। হিশাম ও তার আরো দুই সহকর্মী দিনের বেলায় হন্যে হয়ে কায়েসকে খুঁজছিল। তারা সাধুর বেশ ধারণ করেই তুফানের মধ্যে এক মন্দিরে রাতযাপন করেছে।

সন্ধ্যায় কায়েস তাদের আস্তানায় ফেরেনি। তাই দিনের বেলায় তার সহকর্মীরা তাকে তালাশ করতে লাগল। গত রাতের তুফান সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়ার ফলে সেখানে কাউকে খুঁজে পাওয়া সহজ ছিলো না। সারা শহরের গলি ঘুপছিতে হাজার হাজার মানুষ ঠাঁই নিয়ে ছিলো। শহর ও শহরতলী কাদা পানিতে একাকার হয়ে পড়েছিল।

দুপুরের দিকে এক সঙ্গীর সাথে হিশামের দেখা হলো। সে হিশামকে জানালো কায়েসকে সে দেখেছে। সে সাধুর বেশে নেই। সে এমন পোশাক গায়ে জড়িয়েছে যে, দেখে এটিকে তার নিজের পোশাক মনে হয়নি। তার সাথে আরেকজন লোক আছে। লোকটির অবয়ব ও শারীরিক গঠন থেকে বোঝা গেছে সে সেনাবাহিনীর কোন কর্মকর্তা। তার কোমরে তরবারী ঝুলানো। পোশাকে কয়েকটি পদবীর চিহ্ন। লোকটিকে দেখে আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছে। একথা শুনে হিশাম তার সঙ্গীকে বললো, "তুমি আমাদের সাথীদেরকে লুকিয়ে যেতে বলো।"

কায়েসের এক সঙ্গী কায়েসকে দূর থেকে দেখেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। কারণ, কায়েসের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল সন্দেহজনক। তার সঙ্গে থাকা লোকটির ভাবভঙ্গিতে সন্দেহ আরো প্রকট হয়ে উঠেছিল। এসব গোয়েন্দাদের স্বভাব হলো এরা সবকিছুকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। কায়েসের অবস্থা সংশয়পূর্ণ হওয়ায় সে কায়েসের দৃষ্টির আড়ালে থেকে সেখান থেকে সটকে পড়েছিল।

উষার বাবা কায়েসকে সাথে করে তাদের স্বজনদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তারা ঝড়ের মধ্যে যেখানে রাতযাপন করেছিল। সেখানে সে কায়েসকে তাদের কাপড়-চোপড় পরিয়ে তার সঙ্গীদের ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

সঙ্গীর কাছে কায়েসের সন্দেহজনক অবস্থার কথা শুনে তাশকীনের সতর্কবাণী মনে পড়ল হিশামের। তাশকীন তাকে স্বপক্ষের স্থানীয় গোয়েন্দাদের উপর বেশী আস্থা ও নির্ভরতা না রাখার পরামর্শ দিয়েছিল। কারণ, এখানকার মুসলমানরা দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুদের শাসনাধীনে থাকার ফলে হিন্দুদের খাতির তোয়াজ করার অভ্যাসের কারণে সহজেই হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়।

হিশাম তার গোপন আস্তানায় গিয়ে শরীর থেকে সন্ন্যাসীর বাহ্যিক রূপ খুলে ফেলল। শরীরে লাগানো ছাই-ভস্মের প্রলেপ ধুয়ে ফেলল এবং হাজার দানার মালা, ত্রিশূল, লাঠি এবং জটবাঁধা কৃত্রিম দাড়ি খুলে কাপড় বদল করে হিন্দু সৈনিকের পোশাক গায়ে জড়াল। সে একটি খঞ্জর কোমরে গুঁজে কায়েসের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর হিশাম কায়েসকে দেখতে পেল। উষার বাবার সাথে একটি পুরনো দালানের বাইরে আঙিনার একটি খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে সে বসে আছে। হিশাম ভিন্নপথে পুরনো দালানের ভেতরে প্রবেশ করে এদিকে এলো যে কক্ষের বাইরে কায়েস বসে আছে।

কক্ষের একটি জানালার দিকে পিঠ দিয়ে কায়েস ও উষার বাবা বসা ছিল। তারা বাইরের দৃশ্য এবং গমনাগমনরত লোকজনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। হিশাম নিঃশব্দে সেই জানালার কাছে গিয়ে বসে পড়ল। হিশামের বসার জায়গা থেকে কায়েস ও উষার বাবার দূরত্ব তিন-চার হাত মাত্র।

"আপনি হতাশ হবেন না। আমরা ওদেরকে অবশ্যই পেয়ে যাবো। ওরা তিনজন। তিনজনকেই ধরে ফেলা যাবে।" উষার বাবার উদ্দেশ্যে বললো কায়েস।

এ তিনজনের কথা আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু চতুর্থজনের কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।" বললো উষার বাবা। তুমি দাবী করছো, কন্নৌজের মহারাজার একান্ত নিরাপত্তা রক্ষী দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিটিই গযনীর চর। তাছাড়া তুমি তার সামনে না যাওয়ার কথা বলছো।

আমি ভাবছি, মহারাজার একান্ত লোকের বিরুদ্ধে কিভাবে অভিযোগ করবো যে, সে গযনীর চর! কারণ, কন্নৌজের মহারাজা খুবই দূরদর্শী ও পরাক্রমশালী মহারাজা।"

"তাকে পাকড়াও করার ব্যাপারেও আমি আপনাকে কৌশল বলে দেবো।" বললো কায়েস।

"জানালার আড়ালে বসে হিশাম তার জামার নিচ থেকে ধীরে ধীরে খ রটি বের করল। খঞ্জরের আগা বিষে ডোবানো ছিল। এমন বিষ যে কারো শরীরে এর একটু আঁচড় লাগলেই মুহূর্তের মধ্যে মারা যাবে সে।

হিশাম খঞ্জরটি হাতের আড়াল করে দাঁড়াল এবং পূর্ণশক্তি দিয়ে খঞ্জরটি ছুঁড়ে মারল। খঞ্জরটি সোজা গিয়ে কায়েসের পাঁজরে বিদ্ধ হলো। খঞ্জরবিদ্ধ কায়েস উহ্ বলে দাঁড়াল বটে; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল। হিশাম এক মুহূর্ত দেরী না করে জানালার পাশ থেকে সটকে পড়ল এবং অন্য কক্ষে চলে গেল।

ঊষার বাবা ছিল প্রশিক্ষিত সেনাকর্মকর্তা। সে বুঝে ফেলল খঞ্জর কোন দিক থেকে আসতে পারে। সে পুরনো দালানের ভেতরের দিকে দৌড়াল। কিন্তু ততক্ষণে হিশাম অন্য দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে কায়েসের পাঁজর থেকে খ রটি তুলে নিয়ে রাস্তার মানুষের মধ্যে মিশে গেল।

ঊষার বাবা পুরনো দালানের মধ্যে হত্যাকারীকে তালাশ করতে লাগল। আর এদিকে হিশাম যেদিক থেকে এসেছিল ওদিকে চলে গেল। ঊষার বাবা হয়রান হয়ে পুরনো দালানের ভেতরে-বাইরে হত্যাকারীকে তালাশে ব্যস্ত রইল। ততক্ষণে কায়েস মরে গেছে।

* * *

সেই রাতে প্রধান মন্দিরের পুরোহিত সকল রাজা-মহারাজাদের মন্দিরে ডেকে পাঠালো। রাজা-মহারাজাদের ডেকে এনে প্রধান পুরোহিত বললো, 'আমি আপনাদেরকে এই সোনা-রুপার স্তূপ দেখাতে এনেছি।

সোনা-রুপা ও নগদ টাকার বিশাল স্তূপ রাজাদের দেখিয়ে পুরোহিত বললো, গত রাতে তুফানের সময় আমি আপনাদের মাহফিলে ছিলাম। সেই সময় সম্পর্কে মন্দিরে পূজারত পুরোহিতরা আমাকে জানিয়েছে, কৃষ্ণ দেবতার

চোখ প্রথমে নীল বর্ণ ধারণ করে, পরে সাদা এবং রক্তবর্ণ ধারণ করে। এরপরই তার চোখ থেকে এই ভয়াবহ তাণ্ডব ছড়িয়ে পড়ে। মন্দিরের সকল শাখা-ঘণ্টা নিজে থেকেই বাজতে শুরু করে। এর পরপরই শুরু হয়ে যায় ভয়াবহ তুফানের তাণ্ডব।...

"আপনারা কি দেবতাদের ইঙ্গিত বোঝেন না? গত রাতের তুফান ছিল দেবতাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। রাতেই মন্দিরে লোকজন জড়ো হয়ে গিয়েছিল। হাজারো পূজারী দেবীর পদতলে মাথা রেখে কান্নাকাটি করেছে। আমি পরিষ্কার ইঙ্গিত পেয়েছি, যে পর্যন্ত মাহমুদের মাথা কেটে কৃষ্ণদেব ও বাসুদেবের পদতলে রাখা না হবে, ততোদিন পর্যন্ত দেবতাদের ক্ষোভ প্রশমিত হবে না।

গত রাতে এখানে বহু লোক হতাহত হয়েছে। আপনাদেরও হয়তো এমন পরিণতি বরণ করতে হবে। আমি সকল পূজারীকে বলে আসছি, যে পর্যন্ত হিন্দুস্তানে ইসলামের ক্রমসম্প্রসারণের পথ রুদ্ধ করা না হবে, ততোদিন দেবতাদের অভিশাপ আসতেই থাকবে।

আমি পূজারীদের বলেছি, মুসলমানদেরকে চিরদিনের জন্য পরাজতি করার জন্য বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। মন্দিরে আসা সকল নারী তাদের পরনের অলংকার এবং পুরুষেরা তাদের নগদ অর্থের স্তূপ করে ফেলেছে।

এ অর্থ এখনই আমি আপনাদের হাতে তুলে দেবো না। আপনাদের সেনারা যখন গযনীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে, তখন সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার বহন করার বোঝা থেকে আমি আপনাদের নিষ্কৃতি দেবো।

যুদ্ধের পুরো ব্যয়ভার বহন করবে মাথুরার প্রধান মন্দির। কারণ, আপনাদের জয় আমার জয়, আপনাদের পরাজয় আমার পরাজয়। ভগবান আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি আপনাদের অন্তরে সনাতন ধর্মের মর্যাদা, ভালোবাসা এবং ইসলামের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি কি না!"

মনে রাখবেন, সেই দলই বিজয় লাভ করে, যাদের হৃদয়ে শত্রু ও শত্রুবাহিনীর ধর্মের প্রতি ঘৃণা আছে। ঘৃণা একটি বিরাট শক্তি। এতো দূরে এসেও মুসলমানরা আপনাদের পরাজিত করে যায় এর মূল কারণ হলো তাদের অন্তর আপনাদের প্রতি ঘৃণায় ভরা থাকে।

মুসলমানরা আমাদের ধর্মকে মিথ্যা মনে করে। এখন আপনাদেরই প্রমাণ করতে হবে আমাদের ধর্ম সত্য। আপনাদেরকে গযনী সেনাদের উপর আসমানী গযব হয়ে উঠতে হবে।"

দীর্ঘ জ্বালাময়ী বক্তৃতায় প্রধান পুরোহিত রাজা মহারাজাদের অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা এবং ইসলাম বিদ্বেষে উস্কে দেয়ার পব আশ্বাসবাণী শোনালো, "ভগবান আমাকে ইশারা দিয়েছে মুসলমানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে।"

দীর্ঘ ভাষণের পর পণ্ডিত বসে পড়লে লাহোরের মহারাজা জয়প্যাল, কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপাল, মহাবনের রাজা কুয়াল চন্দ্র ছাড়াও বুলন্দশহরসহ ছোট বড় সকল রাজা-মহারাজাদের সেই ঐতিহাসিক বৈঠক হলো, যে বৈঠকের কারণে মুসলমান মাহমুদকে ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিল। সুলতান মাহমূদ রাজাদের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের বিপরীতে এমন ঐতিহাসিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, সমরবিশারদগণ সেই অভিযানকে অভাবনীয় বলে অভিহিত করেন।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিক স্যার আর্লস্টেন লিখেছেন, "সুলতান মাহমূদ গযনী থেকে মাথুরা পর্যন্ত প্লাবনের মতো একটির পর একটি দুর্গ জয় করে এগিয়ে এলেন এবং শেষ পর্যন্ত কন্নৌজের মাথুরাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করলেন।"

তৎকালীন ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তার এই অবিস্মরণীয় সাফল্য ও বিজয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তার গোয়েন্দা বাহিনীর। তিনি ভারতের রাজা মহারাজাদের সমর প্রস্তুতির পূর্ণ খবর জায়গায় বসেই পেয়ে যেতেন। যার ফলে তিনি বিদ্যুদ্বেগে অগ্রাভিযান চালাতেন এবং প্রতিপক্ষকে অপ্রস্তুত অবস্থায় এসে চেপে ধরতেন।

* * *

লাহোরের মহারাজা ভীমপাল এবং কালাঞ্জর (কোটলী কাশ্মীর) এর রাজা জানকি বাহ্‌মী সুলতান মাহমূদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল যে, ভীমপাল গযনীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার সামরিক তৎপরতা চালাবে না। হিন্দুস্তানে গযনী সৈন্যদের যতো ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন

হবে সেই সহযোগিতা দিতে বাধ্য থাকবে। কোটলী কাশ্মীরের রাজারও সুলতানের সাথে একই ধরনের চুক্তি হয়েছিল।

১০১৭ সালের বর্ষা মওসুমের পূজা উৎসবে হিন্দুস্তানের অন্যান্য রাজাদের মতো এই দুই রাজাও মাথুরার প্রধান মন্দিরে বসে গযনী বাহিনীকে পরাজিত করে গযনীকে ধ্বংস করার নীলনক্সা প্রণয়নে শামিল ছিল।

রাজা ভীমপাল সেই রাজাদের বৈঠকে পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি প্রকাশ্যে থাকবেন না, কিন্তু অন্তরালে সবধরনের সহযোগিতা করবেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, তিনি ও তার খান্দান এ পর্যন্ত সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে তিনবার লড়াই করেছে, আর কেউ তা করেনি।

এসব যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির সবই তার নিজস্ব তহবিল থেকে নির্বাহ করতে হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়েই তাকে সুলতান মাহমুদের সাথে অধীনতামূলক চুক্তি করতে হয়েছে।

এই মহাপরিকল্পনার শীর্ষ দায়িত্ব দেয়া হলো কন্নৌজের মহারাজার উপর। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এই মহাপরিকল্পনার দায়িত্ব পালনের সবচেয়ে উপযুক্ত ছিলেন কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপাল।

তিনি ছিলেন দক্ষ সমরবিশারদ। তার সামরিক শক্তিও ছিলো অন্যাদের চেয়ে বেশী। উত্তর ভারতে কন্নৌজের মহারাজাকে সম্মানের চোখে দেখা হতো। বস্তুত তাই সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ডারের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো কন্নৌজের মহারাজার উপর।

মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রত্যেক রাজা-মহারাজা তাদের অর্ধেক সৈন্য সম্মিলিত বাহিনীতে দেবে আর বাকী অর্ধেক সৈন্য নিজেদের হাতে বিভিন্ন দুর্গের সুরক্ষা এবং সুলতান মাহমুদের জবাবী আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

সম্মিলিত বাহিনী পেশোয়ারের দিকে অগ্রাভিযান চালাবে এবং সুলতান মাহমুদকে খায়বর দুর্গের পার্শবর্তী ময়দানে মুখোমুখি হতে বাধ্য করা হবে। এর আগে সৈন্যদের কিছু অংশ বিভিন্ন পাহাড়ী গিরিপথে নিয়োগ করা হবে। যাতে সুলতান মাহমুদের বাহিনীকে আগমন পথেই চোরাগুপ্তা আক্রমণ করে দুর্বল করে দেয়া হবে।

এই পরিকল্পনায় সবাই ঐক্যমত্য পোষণ করে। সব রাজা-মহারাজা কৃষ্ণ ও বাসুদেব মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রত্যেকেই নিজেদের জীবনও সম্পদ অকাতরে ব্যয় করবে।

আমীর বিন তাশকীন কন্নৌজের মহারাজার একান্ত নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে বৈঠকে হাজির ছিল। শুধু কন্নৌজের মহারাজা নয়, আরো কয়েকজন রাজা মহারাজার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীও নির্বিকার মূর্তির মতো নিজ নিজ রাজাদের পেছনে দণ্ডায়মান ছিল।

মাথুরা থেকে প্রায় একশ মাইল দূরে পূর্ব-উত্তরে রামগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত বুলন্দশহর। তখন এটি ছিল একটি রাজ্যের রাজধানী। বলন্দ শহরের রাজা হরিদত্ত এই মহাবৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের এক পর্যায়ে রাজা হরিদত্ত বললেন, মুসলমানরা কেন প্রতিবারই সাফল্য পায়, প্রতিক্ষেত্রেই তাদেরই কেন জয় হয়।

আমাদেরকে ভাবতে হবে কোন জাদু বলে মুসলমানরা জয়লাভ করে, আর আমাদের মধ্যে কী ঘাটতি রয়েছে....। আজ আমি আপনাদেরকে তাদের একটি গুণ সম্পর্কে অবহিত করতে চাই। গযনীর গোয়েন্দাব্যবস্থা খুবই জোরদার। গোয়েন্দারাই গযনী বাহিনীর সবচেয়ে বড় শক্তি।

আমি আপনাদের একথাও বলে দিতে পারি, এখানেও গযনীর গোয়েন্দা রয়েছে এবং আমাদের সব কথাই সে শুনছে। গতরাতের ঝড়ে বেশ কিছু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে, জানা গেছে, আজ একজন গযনী গোয়েন্দাকে তার সহকর্মীরাই হত্যা করেছে।

আমার এক সেনাকর্মকর্তা ঘটনাক্রমে এক গযনীর গোয়েন্দার আসল রূপ জানতে পেরেছিল। সেই গোয়েন্দা তার তিন সহকর্মীকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে এক খঞ্জরের আঘাতে সে মারা যায়। হত্যাকারীকে ধরা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তা থেকেই আপনারা বুঝতে পারেন মুসলমানদের গোয়েন্দাব্যবস্থা এবং তাদের শক্তি কত। রাজা হরিদত্ত ঊষার বাবার কাছে শোনা কায়েসের ঘটনা সবিস্তারে ব্যক্ত করলেন এবং ঊষা ও কায়েসের মধ্যে ঘটে যাওয়া আকস্মিক আকর্ষণ, উদ্ধার ও একজন অপরজনকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতার কথাও সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। অবশেষে রাজা হরিদত্ত বললেন, 'মৃত গোয়েন্দা এমন

এক গযনী গোয়েন্দার কথা জানিয়েছে, যার নাম উল্লেখ করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। কারণ, সেই গোয়েন্দা এমন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, যদি অভিযোগ সত্য না হয়, তাহলে আমাদের মধ্যে শত্রুতা, ভুল বোঝাবুঝি ও অনৈক্য সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

রাজা হরিদত্ত আড়চোখে একবার আমীর বিন তাশকীনের দিকে তাকালেন। আমীর বিন তাশকীন নির্মোহ নির্বিকার চিত্তে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। হরিদত্তের কথায় সে ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল বটে; কিন্তু দৃশ্যত ভাবলেশহীন নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েকজন রাজা-মহারাজা হরিদত্তকে আলোচিত গোয়েন্দার নাম উল্লেখ করার তাকীদ দিলেন। কিন্তু রাজা হরিদত্ত বললেন, বিষয়টি তিনি আগে ব্যক্তিগতভাবে নিরীক্ষা করবেন। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হলে সেই গোয়েন্দাকে সবার সামনে হাজির করবেন।'

রাজা-মহারাজাদের সেই ঐতিহাসিক বৈঠক শেষে কন্নৌজের মহারাজা রাজা হরিদত্তকে বললেন, যেহেতু তাকে সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর চীফ কমান্ডার এর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, এজন্য এতো উঁচু পর্যায়ে কোথায় গযনীর গোয়েন্দা রয়েছে বিষয়টি তার জানা খুবই দরকার।

রাজা হরিদত্ত বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ, আমীর বিন তাশকীন তাদের সাথেই আসছিল। ঝড় মহারাজাদের তাঁবুগুলো উড়িয়ে নেয়ার পর শহরে তাদের জন্য বাড়ি খালি করানো হলো।

মহারাজা কন্নৌজের জন্য যে বাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছিল, তিনি সেই বাড়িতে রাজা হরিদত্তকে নিয়ে গেলেন এবং জগন্নাথরূপী আমীর বিন তাশকীনকে ছুটি দিয়ে দিলেন।

চম্পা ছিলো কন্নৌজ মহারাজার সবচেয়ে প্রিয় রাণী। সে মহারাজার আগমন অপেক্ষায় প্রহর গুণছিল। রাজা হরিদত্তকে সাথে নিয়ে মহারাজা তার কক্ষে প্রবেশ করলে চম্পারাণী আপ্যায়নের শুরুতেই তাদের শরাব ঢেলে দিল এবং মহারাজার সান্নিধ্যে বসে গেল। রাজা হরিদত্ত সন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতে চম্পার দিকে তাকালে মহারাজা রাজ্যপাল হরিদত্তের সংশয়পূর্ণ দৃষ্টি বুঝে ফেললেন। কারণ, চম্পার উপস্থিতিতে রাজা হরিদত্ত আসল কথা না বলে প্রসঙ্গ ঘোরানোর চেষ্টা করছিলেন।

মহারাজা চম্পার উদ্দেশে বললেন, 'আমরা দুজন একটা জরুরী বিষয়ে কথা বলবো, তুমি কিছুক্ষণের জন্য অন্য ঘরে থাকো।

চম্পা মহারাজার নির্দেশে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো বটে; কিন্তু কী কথা হবে তাদের মধ্যে? এই কৌতূহলে সে দরজার আড়ালে তাদের কথাবার্তা শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল।

'আমি আপনাকে এই কথাই বলতে চাই যে, মন্দিরে আমি যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিলাম' বলে কথা শুরু করলো রাজা হরিদত্ত। আমার এক সামরিক কর্মকর্তা আমাকে জানিয়েছে, জগন্নাথ নামের আপনার একান্ত নিরাপত্তারক্ষী আসলে জগন্নাথ নয়, আমীর বিন তাশকীন। সে গযনীর উচ্চ পর্যায়ের একজন দক্ষ গোয়েন্দা। যে গোয়েন্দা ওদেরই কারো হাতে নিহত হয়েছে, সেই আমার কর্মকর্তাকে একথা বলেছিলো। হয়তো আমার একথা আপানার পছন্দ নাও হতে পারে। তবে...।

'আপনার কথা আমার কাছে মোটেও মন্দ মনে হয়নি' হরিদত্তের অসম্পূর্ণ কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দিলেন মহারাজা। কিন্তু ব্যাপারটি আমার কাছে বিস্ময়কর লাগছে যে, কোন ভিনদেশের গোয়েন্দা আমাকে এভাবে ধোঁকা দিতে পারে। আমি আপনার এই অভিযোগকে মোটেও অস্বীকার করবো না, বিষয়টি আমি এখনই যাচাই করবো।"

রাজা হরিদত্ত আরো বললেন, সুন্দরী নারী আপনার জন্য অভাব হওয়ার কথা নয়। আমি এ কথাও জানতে পেরেছি, আপনার প্রিয় চম্পারানী ও আপনার এই ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীর মধ্যে গোপন সম্পর্ক রয়েছে। সেদিন আপনার ছোট রাণীর যে সেবিকা রাণীর সাথে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল, তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেই আপনি এর সত্যতা যাচাই করতে পারবেন। আমার সন্দেহ হয়, চম্পা ও এই নিরাপত্তারক্ষী দু'জনে আপনার জন্য একটা মায়াবীনি প্রতারণা হয়ে বিরাজ করছে।"

'হরিদত্ত! আমাকে বিষয়টি একটু খোলাসা করে বলুন। আমি এখনই সেবিকাকে আপনার সামনে ডেকে আনছি। আর সকালেই আপনি নিরাপত্তারক্ষী ও চম্পার লাশ দেখতে পাবেন।'

বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর জন্য আমি আমার সেই সামরিক কর্মকর্তাকে সাথেই নিয়ে এসেছি। সে বাইরে দাঁড়ানো আছে। আপনি গোয়েন্দা

সম্পর্কে তার মুখেই শুনতে পারেন, বলে রাজা হরিদত্ত চম্পা ও তাশকীনের গো ান সম্পর্কের বিস্তারিত বলতে শুরু করলো।

দুই রাজার একান্ত কথোপকথন দরজার আড়াল থেকে শুনে চম্পা পা টিপে টিপে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে এলো এবং বিদ্যুদ্বেগে তাশকীনের কক্ষে প্রবেশ করল।

"এখনই বের হও এবং ঘোড়া বের করো'। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তাশকীনকে বললো চম্পা। আমাদের দু'জনের গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে।"

"কী রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে? কী বলছো তুমি?" চম্পাকে উৎসুক্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো তাশকীন।

"আরে এতোকিছু জানতে চেয়ো না, আগে পালানোর ব্যবস্থা করো। আবারো উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো চম্পা। বুলন্দশহরের রাজা হরিদত্ত মহারাজাকে বলেছে, তুমি জগন্নাথ নও গযনীর মুসলমান আমীর বিন তাশকীন।... সে মহারাজাকে আমাদের দু'জনের গোপন সম্পর্কের কথাও জানিয়ে দিয়েছে। মহারাজা এখনই আমার একান্ত সেবিকাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

"তুমি কি আমাকে ধরিয়ে দিতে এসেছো, না আমাকে এখান থেকে বের করে দেয়ার জন্য এসেছো?" চম্পাকে জিজ্ঞেস করল তাশকীন।

"বেশী কিছু জিজ্ঞেস করে সময় নষ্ট করো না। জলদি করো। আমি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে এসেছি। তাড়াতাড়ি করো। আমাকে একটা চাদর দাও। আমি আমার শরীর ঢেকে ফেলবো। জলদি করো, ওরা হয়তো তোমাকে খুঁজতে এখানে এসে যাবে।"

"ওরা যা বলছে, তা ঠিকই আছে চম্পা।" এতোদিন আমি তোমার কাছেও আমার প্রকৃত পরিচয় গোপন করেছিলাম। আমি মুসলমান। আমার নাম আমীর বিন তাশকীন। এ কথা শোনার পরও কি তুমি আমার সাথে যাবে? ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাবে?"

"আমি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে এবং তোমার সাথেই মরতে এসেছি। ধর্ম আমার কাছে বড় বিবেচ্য বিষয় নয়। এখন তুমিই আমার সব। তুমি যা বিশ্বাস কর আমিও তাই করি। আর দেরী নয়, জলদি কর, আমাকে চাদরটা দাও।'

তাশকীন একটি চাদর চম্পার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে কোমরে তরবারী ঝুলিয়ে নিল এবং তার বিশেষ খঞ্জরটিও কোমরে গুঁজে নিল। এরপর চম্পাকে নিয়ে আস্তাবলের দিকে অগ্রসর হলো।

এদিকে মহারাজা ক্ষুব্ধকণ্ঠে তার দ্বাররক্ষীদের নির্দেশ দিলেন, এক্ষুনি চম্পা ও তার একান্ত নিরাপত্তারক্ষী জগন্নাথকে হাজির করা হোক।

তাশকীন একটি অন্ধকার জায়গায় চম্পাকে দাঁড় করিয়ে রেখে যেখানে সামরিক ঘোড়া বাঁধা থাকে, সেদিকে অগ্রসর হলো। সেনাদের মধ্যে জগন্নাথরূপী তাশকীনের মর্যাদা এমন ছিল যে, তার নির্দেশ কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই সবাই মানতে বাধ্য ছিল। এই অবস্থান সে অনেকটা নিজের আচরণ, বুদ্ধিমত্তা এবং পদবী দিয়ে তৈরী করে নিয়েছিল।

সে ঘোড়ার সহিসকে বললো, খুব তাড়াতাড়ি তুমি ঘোড়াটিকে জীন বেধে দাও।

এদিকে রাজমহল তল্লাশি করে মহারাজাকে জানানো হলো, চম্পা রাণীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ বলতে পারছে না তিনি কোথায় আছেন।

মহারাজা নির্দেশ দিলেন, জগন্নাথ ও চম্পারাণীকে দ্রুত খুঁজে বের করো। ওরা যদি পালাতে চেষ্টা করে, তবে যেখানেই পাবে সেখানেই ওদের খতম করে দেবে।

মহারাজার নির্দেশ পেয়ে তার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দশবারজন সৈনিক দৌড়াল। তখন রাত অন্ধকার হয়ে গেছে। একটি জ্বলন্ত মশাল থেকে তারা আরো তিন-চারটি মশাল জ্বালিয়ে নিল।

এদিকে তাশকীনের ঘোড়ায় তখন জীন বাঁধা হয়ে গেছে। সে দ্রুত ঘোড়াটিকে নিয়ে চম্পাকে যেখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, ওখানে পৌছল। সে চম্পাকে তার পেছনে আরোহণ করিয়ে যেই পালানোর জন্য ঘোড়াকে ঘুরালো, তখন দেখতে পেল চার-পাঁচটি মশাল জ্বালিয়ে একদল অশ্বারোহী দৌড়ে এদিকে আসছে।

শহরের প্রধান গেট খোলা ছিল বটে; কিন্তু এ মুহূর্তে প্রধান গেট দিয়ে তাদের বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। তাশকীন আবার ঘোড়া ঘুরিয়ে ছুটতে শুরু করলেই রাজার নিরাপত্তা রক্ষীরা তাকে হুমকি দিল।

দাঁড়িয়ে যাও, নয়তো এক্ষুনি তীর ছোঁড়া হবে। কিন্তু তাশকীন দাঁড়াবার পাত্র নয়। সে থামল না, ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। একটু এগুতেই চম্পা আর্তচিৎকার দিয়ে উঠলো। চিৎকার দিয়ে চম্পা বললো, আমার পিঠে দুটি তীর বিদ্ধ হয়েছে। বলেই সে ঘোড়া থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল।

আরো একটু এগুতেই তাশকীনের ঘোড়া হ্রেষারব করে উঠলো এবং তার গতি শ্লথ হয়ে গেল। তাশকীন বুঝতে পারল ঘোড়াও তীরবিদ্ধ হয়েছে। ঘোড়া যখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল তখন ছুটন্ত ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল তাশকীন। তার দু'পাশ দিয়ে শোঁ শোঁ করে দুটি তীর ছুটে গেল। ভাগ্যগুণে তার মাথা অক্ষত রয়ে গেল।

এরপর একটি সংকীর্ণ গলিতে ঢুকে পড়ল তাশকীন এবং পশ্চাদ্ধাবনকারীদের আগেই গলির দু-তিনটি মোড় পেরিয়ে গেল। এ সময়ে চম্পার কথা তার ভাবার অবকাশ ছিল না। কারণ, বিষাক্ত তীরের আঘাতে ততোক্ষণে বেচারী হয়তো মরে গেছে। চম্পার খুনের বদলা নেয়ারও তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ, সে এসেছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে, এজন্য নিজেকে রক্ষা করে যে করেই হোক গযনী পৌঁছাই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য।

তাশকীন জানতো, শহরের সীমানা প্রাচীরের একটি অংশ একেবারে নদীর তীর ঘেঁষে রয়েছে। তখন বর্ষাকাল, এমনিতেই নদীতে পানি ছিল বেশী। তদুপরি পূর্বরাতের প্রবল বর্ষণে নদীর পানি সীমানা ছুঁই ছুঁই করছিল। তাশকীনকে পশ্চাদ্ধাবনকারীরা ধর ধর, গেল গেল, ওই দিকে, এ দিকে, ইত্যাকার চিৎকার ও চেঁচামেচি করে আসছিল।

তাশকীন ইতোমধ্যে একটি দালানের উপরে উঠে গেল, যে দালানের ছাদ সীমানা প্রাচীরের বরাবর যুক্ত ছিল। নীচে নিরাপত্তা রক্ষীদের হৈ চৈ শুনে সীমানা প্রাচীরের উপরে অবস্থানরত দুই প্রহরী তাশকীনের পথ আগলে দাঁড়াল। তাশকীন এক প্রহরীর কাছে গিয়ে তরবারী ওর পেটে ঢুকিয়ে দিলে অপর প্রহরী দৌড়ে পালাল।

এদিকে মশালধারী সৈন্যরা সীমানা প্রাচীরের কাছে চলে এলো। তাশকীন দেয়ালে উঠে নদীর দিকে অগ্রসর হলো এবং যেখানে দেয়াল একেবারে নদীর তীর ঘেঁষে সেখানে পৌঁছে, সে সীমানা প্রাচীরের উপর থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পশ্চাদ্ধাবনকারীরা আর তার নাগাল পেল না।

* * *

মাথুরা থেকে গযনীর দূরত্ব প্রায় সাতশ মাইল। পথিমধ্যে অন্তত সাতটি বড় নদী রয়েছে। তাছাড়া বেশীর ভাগ পথই ছিল পাহাড়ী। তৎকালীন ঐতিহাসিকদের মতে একজন সক্ষম মানুষের পক্ষে এ পথ পাড়ি দিতে অন্তত তিনমাস সময়ের প্রয়োজন ছিল।

* * *

সুলতান মাহমূদ গযনবী এর আগেই খাওয়ারিজমকে গযনী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। খাওয়ারিজমের অনুগত সৈন্যদেরকে তিনি গযনী সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাছাড়া খাওয়ারিজম যুদ্ধে লোকবলের ঘাটতি পূরণে তিনি সেনাবাহিনীতে ভর্তির বিষয়টিতে জোর দেন।

তিনি মসজিদে মসজিদে এই ঘোষণা জারি করেন যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময় হিন্দুস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হতে চলেছিল। কিন্তু সেখানকার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর মুসলমানরাও এখন পৌত্তলিকতার পদতলে পিষ্ট হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, মুসলমানদের আয়ের উৎসগুলোকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য সেখানে প্রতিনিয়ত সামরিক শক্তি সঞ্চয় করছে।

ইসলামের পয়গামকে দুনিয়ার কোণে কোণে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত।

সেই সাথে হিন্দুস্তানের বুতখানাগুলো থেকে বুত অপসারণ করে অগণিত বনী আদমকে পৌত্তলিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করাও আমাদের ঈমানী কর্তব্য। পৌত্তলিকতা এমন এক ভয়ানক চক্র, এদেরকে যদি ধ্বংস করে দেয়া না যায়, তবে এরা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কঠিন মুসীবত হয়ে দেখা দেবে।'

মসজিদগুলোতে ইমাম ও খতীবগণ সুলতানের এই ঘোষণার আলোকে মানুষকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে উৎসাহিত করতেন। কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে আবেগময়ী ভাষায় প্রদত্ত খতীব ও ইমামদের এসব উজ্জীবনীমূলক বক্তব্য শুনে সাধারণ মুসলমানরা উজ্জীবিত হলেন এবং দেশের প্রতিটি জনপদে তার এই ঘোষণা আলোচনার প্রধান বিষয়ে পরিণত হলো।

সুলতান আরো ঘোষণা করলেন, রাষ্ট্র পরিচালনা খুবই স্পর্শকাতর এবং কঠিন কাজ। এই কঠিন দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা আমার উপর অর্পণ করেছেন। শুধু শাসন করা সুলতানের কাজ নয়। জাতি ও গণমানুষের জীবন-জীবিকা সুচারুরূপে চালানোর জন্য সহায়তা করা, তাদের সঠিক নিরাপত্তা দেয়া এবং জাতির মান-মর্যাদা সমুন্নত রাখা সুলতানের অন্যতম কর্তব্য। তবে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো, এই পরিমাণ সামরিক শক্তি সঞ্চয় করা দরকার ইসলামের শত্রুরা যতো শক্তিশালী হোক না কেন যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। কোন মুসলিম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর যদি জুলুম-অত্যাচার হতে থাকে, তবে যে কোন মুসলিম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উচিত মজলুমদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া এবং দেশ ও জাতিকে নিয়ে মজলুমদের নিরাপত্তা বিধানে জিহাদ করা।

এই মুহূর্তে আমার খুব দরকার জাতির সিংহ-শার্দূলদের সহযোগিতা। হে গযনীর সিংহ শার্দূলেরা! তোমরা এসো! আমি তোমাদের নিয়ে মৃত্যুর আগে এই কর্তব্য পালন করতে চাই।"

সুলতান মাহমূদ যেমন ছিলেন একজন বিচক্ষণ ক্ষণজন্মা সমরনায়ক, তেমনই ছিলেন একজন দক্ষ শাসক। হিন্দুস্থানের বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি যে সহায়-সম্পদ কজা করতেন, এগুলোর একটি অংশ তিনি সেনাদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন এবং একটি বড় অংশ খরচ করতেন শিক্ষা ও জনগণের সেবায়, গণমানুষের জীবন-মান উন্নয়নে। তার শাসিত সালতানাতে যেহেতু গণমানুষ সুখ-সাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করতো। এজন্য সুলতানের প্রতিটি নির্দেশেই ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করত।

১০১৭ সালের শেষ দিকে তিনি সেনাবাহিনীতে নতুন লোক ভর্তির জন্য দেশব্যাপী মহড়া শুরু করে দিলেন। তিনি তার সেনা কমান্ডারদের বলতেন, আমাকে আমার পিতার উপদেশ পালন করতে হবে।

তিনি বলতেন, তোমাকে হিন্দুস্তানের বুতখানাগুলো ধ্বংস করে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। আমি স্বপ্নেও বারবার এ কাজের জন্য তাগিদ পেয়েছি। আমার পীর ও মুর্শিদ শায়খ আবুল হাসান খিরকানীও এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। মনে হয় আমার জীবন আর বেশী দিন নেই। মৃত্যুর আগে আমি এই কাজটি শেষ করে যেতে চাই।

* * *

বেশ কিছু দিন থেকে সুলতান হিন্দুস্তান থেকে নতুন খবরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি একথা জানার জন্য উদগ্রীব ছিলেন যে, হিন্দুস্তানের রাজা মহারাজারা তার বিরুদ্ধে জঙ্গী তৎপরতা চালাচ্ছে। ১০১৭ খৃষ্টাব্দ শেষ হলো। ১০১৮ সাল শুরু হয়ে গেলো। কিন্তু তখনও তিনি নতুন কোন সংবাদ পাচ্ছিলেন না।

একদিন তাকে খরব দেয়া হলো, হিন্দুস্তান থেকে আমীর বিন তাশকীন নামের একজন লোক এসেছে।

'তাশকীন এসেছে!' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন সুলতান। তাকে জলদি এখানে নিয়ে এসো।

তাশকীন যখন সুলতানের কক্ষে প্রবেশ করল, তখন তাকে দেখে বিস্ময়ে সুলতান পেছনে সরে গেলেন। তার চেহারা নীল হয়ে গিয়েছিল এবং তাকে মনে হচ্ছিল একটি জীবন্ত কংকাল।

তার শরীরে ধুলোর আস্তরণ। চেহারা দেখে মোটেই চেনা যাচ্ছিল না, এটিই তুখোড় গোয়েন্দা আমীর বিন তাশকীন। তার কোমর ভেঙে গিয়েছিল। সে পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে পারছিলো না। সুলতান তাকে একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসালেন এবং শীঘ্রই তার জন্য খাদ্য পানীয় আনার জন্য নির্দেশ দিলেন।

'আমি তিন মাসের পথ দেড় মাসে অতিক্রম করেছি সুলতান। কাঁপা কাঁপা ক্ষীণকণ্ঠে বললো তাশকীন। মাথুরাতে আমার ধরা পড়ার উপক্রম হয়েছিল। আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতে আমি বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি।

আমি এক পর্যায়ে একটি ঘোড়া চুরি করে মরতে মরতে বেঁচে গেছি এবং পালিয়ে এসেছি। ঘোড়ার প্রয়োজনে একটি নিরপরাধ লোককে হত্যা করতে হয়েছে। সাঁতরে প্রমত্তা নদী পার হতে হয়েছে। দেড় মাস পর্যন্ত আমি ঘোড়ার উপরই খেয়েছি এবং ঘোড়ার উপর বসেই ঘুমিয়েছি...। আপনি একটি হিন্দুস্তানের মানচিত্র আনান।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাশকীনের জন্য খাদ্য-পানীয় হাজির করা হলো। সুলতানের নির্দেশে তাশকীন কিছুটা খাদ্য এবং পানীয় পান করে শরীরটাকে একটু তাজা করে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে বসলো।

হিন্দুস্তানের সকল রাজা-মহারাজারাদের নাম ধরে ধরে তাশকীন বলতে লাগল, যারা ম.থুরার মন্দিরের বিশেষ বৈঠকে শরীক হয়েছিল। তাশকীন সুলতানকে তাদের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা জানিয়ে মানচিত্রে হাত দিয়ে দেখাতে লাগল, কোথায় কন্নৌজ মাথুরা, বুলন্দশহর এবং মহাবন।

তাশকীন সুলতানকে জানাল, এলাকাটি ঘন জঙ্গলাকীর্ণ হওয়া ছাড়াও প্রমত্তা গঙ্গা ও যমুনা নামের দু'টি নদী খুবই ভয়ানক। অতঃপর মাথুরা ও মহাবন। বুলন্দশহরের আশে পাশের ছোট ছোট দুর্গগুলোর অবস্থান দেখিয়ে বললো, এগুলোতে সম্মিলিত বাহিনীর বাইরে প্রত্যেক রাজা-মহারাজারা তাদের অর্ধেক সৈন্যকে প্রহরায় নিয়োগ করবে।

আপনি ভীমপালের পিতা জয়পালকে পেশোয়ারের যে ময়দানে পরাজিত করেছিলেন, সম্মিলিত বাহিনী এখানে এসে আপনার মোকাবেলা করতে চায়। তারা লুঘমান পর্যন্ত প্রতিটি গিরিপথে ওদের সৈন্য বসিয়ে রাখবে, আমাদের সেনাদের ঘায়েল করতে এবং চোরাগুপ্তা হামলা করে আমাদের জনবল ধ্বংস করে দিতে। তারপরও যদি আমাদের সৈন্যরা বাঁধা পেরিয়ে এগিয়ে যায়, তবে ছোট ছোট দুর্গগুলোর রিজার্ভ সৈন্যরা আমাদের সেনাদের পথরোধ করবে।'

'লাহোরের ভীমপালের ইচ্ছা কী?' তাশকীনকে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

"ভীমপাল আপনাকে খুব ভয় করে। তবে নেপথ্যে সে ওদের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতায় আছে।" বললো তাশকীন।

"এমনটি তো তার করা উচিত।' বললেন সুলতান। কারণ, পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করতে কে না চাইবে? হিন্দুস্তানের রাজপুতরা খুবই সাহসী ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। তাশকীন! তুমি কি বলতে পারো কবে নাগাদ সম্মিলিত বাহিনী একত্রিত হবে এবং অভিযান শুরু করবে?'

'ওদের প্রস্তুত হতে কমপক্ষে এক বছর লাগবে সুলতান। অবশ্য মাথুরার প্রধান পুরোহিত দ্রুত অভিযানের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে তাকীদ দিচ্ছে।

'ওরা লুঘমান আর পেশোয়ারে পৌছার জন্য আমরা অপেক্ষা করবো না।' বললেন সুলতান। আমরা মাথুরা ও কন্নৌজেই ওদের মুখোমুখি হবো...। তাশকীন। তুমি পুরো একমাস বিশ্রাম করো। তোমার শরীরের উপর দিয়ে মারাত্মক ধকল গেছে। এ কাজের জন্য তোমাকে মোটা অংকের পুরস্কার দেয়া হবে। অচিরেই পুরস্কার তোমার বাড়ীতে পৌছে দেয়া হবে। বললেন সুলতান।

তুমি চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে শরীরটাকে ঠিক করে নাও। এরই মধ্যে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি।

সুলতান মাহমূদ সব সময় তার সেনাপতি ও সেনা কমান্ডারদের বলতেন, শত্রুদেরকে তাদের প্রস্তুতিরত অবস্থাতেই গিয়ে আক্রমণ করবে। এবারও তিনি সেনাপতি এবং কমান্ডারদের ডেকে বললেন, শত্রুদেরকে প্রস্তুতরত অবস্থায় গিয়ে পাকড়াও করতে হবে।

শত্রুদের কখনো আক্রমণের সুযোগ দেয়া যাবে না। আমি আপনাদের আগেই বলেছি, হিন্দুস্তানের সকল রাজা-মহারাজা আমাদের বিরুদ্ধে মহা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা তাদেরকে এমন অবস্থায় গিয়ে পাকড়াও করতে চাই, যখন তারা সম্মিলিত বাহিনী তৈরীর জন্য সফরে থাকবে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে মাথুরা।

আমীর বিন তাশকীন আমাকে জানিয়েছে, মাথুরার বুতকে নাকি খুবই পবিত্র মনে করা হয় এবং মাথুরাই হলো তাদের প্রধান দেবতা শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি। শ্রীকৃষ্ণকে হিন্দুরা পয়গম্বর মনে করে।

তাশকীন আমাকে বলেছে, মাথুরায় শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বানানো হয়েছে মর্মর পাথর দিয়ে এবং কৃষ্ণমূর্তির দুটো চোখ নাকি খুবই দামী হীরের তৈরী। গোটা হিন্দুস্তানের হিন্দুরাই নাকি কৃষ্ণমূর্তির পূজার জন্য মাথুরা গমন করে।'

আমাদেরকে দ্রুত অভিযানে নামতে হবে। এবার আমরা পাঞ্জাব হয়ে যাবো না। পাঞ্জাবের মহারাজা আমাদের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সে পূর্বের অবস্থানে নেই। রাজা ভীমপালও নাকি এই আক্রমণ প্রস্তুতিতে পুরোপুরি সহযোগিতা দিচ্ছে।

এবার আমাদের সফর হবে কাশ্মীর হয়ে। পাঞ্জাবের পাশ দিয়ে অবস্থিত কাশ্মীরের পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে আমরা অগ্রসর হবো।

তোমাদের মনে রাখতে হবে, পথে আমাদের অন্তত সাতটি নদী পার হতে হবে। ছোট বড় অনেক পাহাড় ও জঙ্গল দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। আরো মনে রাখতে হবে, আমরা নিজের দেশ থেকে অনেক দূরে গিয়ে লড়াই করবো। সেখানে আমাদের কোন রসদ সাহায্য মিলবে না এবং কোন আসবাবপত্রের চালানও আমরা পাবো না। রাস্তা থেকেই আমাদের রসদ সংগ্রহ করতে হবে।

সুলতান মাহমূদ হিন্দুস্তানের মানচিত্র সামরিক কর্মকর্তাদের দেখিয়ে বললেন, 'আমরা এই পথ দিয়ে অগ্রসর হবো। মাথুরা আমাদের লক্ষ্যবস্তু হলেও শুরুতে আমরা মাথুরাকে এড়িয়ে যাবো। মাথুরা আক্রমণের আগে আশপাশের ছোট ছোট রাজ্য ও দুর্গগুলোকে দখল করে নেবো।

আমাদের এ অভিযান কিন্তু সহজ হবে না। বললেন সুলতান। আমাদেরকে জীবন বাজি রাখতে হবে। কন্নৌজের মহারাজা, ভীমপালের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুনেছি, সে নিজে যেমন লড়তে পারে, তেমনি সৈন্যদেরকেও লড়তে জানে।

আমাদের যেসব গোয়েন্দা মাথুরার উৎসবে উপস্থিত হয়েছিল, তারা গণমানুষের মধ্যে গযনী সৈন্যদের সম্পর্কে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। সেখানে লাখো মানুষের জমায়েত হয়েছিল। সাধারণ লোকেরা এতোটাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে, গযনী সৈন্যদের আগমন খবর শুনলে ওরাই মানুষজনকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলবে।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, কারো ধর্মীয় পবিত্র স্থানে আক্রমণ হলে অনুসারীরা জীবন বাজি রাখতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করে না।"

সুলতান মাহমূদ সেনাপতি ও কমান্ডারদের জরুরী দিক-নির্দেশনা দিয়ে মাত্র তিন দিন প্রস্তুতির সময় দিয়ে চতুর্থ দিন রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন।

১০১৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার মোতাবেক ৪০৯ হিজরী সনের ১৩ জুমাদিউল আউয়াল গযনী থেকে তাঁর সৈন্যরা রওনা হয়। এই অভিযানে তার সৈন্যসংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য পাওয়া যায়। উতবী লিখেছেন, এই অভিযানে সুলতান মাহমূদের নিয়মিত সৈন্য ছিল এগারো হাজার আর স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা কুড়ি হাজার। কিন্তু বাস্তবতার বিচারে তা যৌক্তিক মনে হয় না।

ঐতিহাসিক ফারিশ্‌তা লিখেছেন, মাথুরা অভিযানে সুলতান মাহমূদের সৈন্যসংখ্যা ছিল একলাখ অশ্বারোহী এবং বিশ হাজর পদাতিক। এই বিশাল বাহিনী তিনি তুর্কিস্তান, খাওয়ারিজম, খুরাসান এবং প্রতিবেশী মুসলিম রাজ্যগুলো থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। গবেষক প্রফেসর মুহাম্মদ হাবীব বলেছেন, মাথুরা অভিযানে সুলতান মাহমূদের সৈন্যসংখ্যা ছিল একলাখ সওয়ারী ও পদাতিক এবং বিশহাজার ছিল স্বেচ্ছাসেবী।

বিশাল এই সেনাবহর প্রায় কয়েক মাইল দীর্ঘ ছিল। বিশাল এই বাহিনী সিন্ধু ও ঝিলম নদী ভরা বর্ষায় পার হয়েছিল। গরুগাড়ী ও ঘোড়াগাড়ী এবং মালবাহী গাড়ীগুলোকে নদী পারাপারের জন্য নৌকার সেতু বানানো হয়েছিল।

এই অভিযানে সুলতান একজন দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন অনুভব করলেন। তিনি বর্তমান কোটলী কাশ্মীর (কালাঞ্জর) এর রাজার কাছে এই পয়গাম দিয়ে দূত পাঠালেন যে, কন্নৌজ পর্যন্ত পৌঁছাতে তার একজন দক্ষ রাহবার (পথ প্রদর্শক) এর প্রয়োজন। কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীও দূতের সাথে পাঠালেন সুলতান।

'গযনীর সুলতান আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।' কোটলী কাশ্মীরের (কালাঞ্জর) রাজার দরবারে হাজির হয়ে রাজার উদ্দেশ্যে বললো সুলতানের প্রেরিত দূত। সুলতান আপনাকে সেই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যে চুক্তিতে আপনি গযনীবাহিনীর যে কোন প্রয়োজন পূরণে সহযোগিতা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সুলতান আরো বলেছেন, আমার গন্তব্য অন্যদিকে, আপনি আমার এই বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আপনার রাজ্যে আসতে বাধ্য করবেন না। আপনি যদি স্বাধীনতা ও স্বাধিকার বজায় রাখতে চান, তবে দ্রুত আমার প্রয়োজন পূরণ করে দিন।

আমাকে এমন একজন রাহ্‌বার দিন, যে কোন অবস্থাতেই আমাকে ধোঁকা দেবে না। তার যে কোন ধরনের ধোঁকাবাজী বা চালাকীকে আমি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা মনে করবো।'

সুলতানের পয়গাম শুনে রাজা চিন্তায় পড়ে গেলেন। দূত আবারো বললো, সুলতানের সাথে যে পরিমাণ সেনা রয়েছে, আপনার রাজ্যে হয়তো এ পরিমাণ মানুষও নেই।

কোটলী কাশ্মীরের রাজা চিন্তা দীর্ঘায়িত না করে তখনই তার ছেলে শাহীকে কারো মতে মালীকে দূতের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। রাজার ছেলে সুলতানের কাছে পৌঁছালে তিনি শাহীকে বললেন, তুমি সবচেয়ে কম সময়ে যাওয়া যায় এমন পথ দিয়ে আমাদের নিয়ে চল।

পথিমধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট দুর্গ পড়লো। সুলভান এগুলোকে অবরোধ করে দুর্গপতিদের বললেন, তোমরা দুর্গ আমাদের কাছে হস্তান্তর করে দাও। অধিকাংশ দুর্গপতি অবরোধের আগেই সাদা পতাকা উড়িয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল।

সুলতান মাহমূদ প্রত্যেক দুর্গ থেকে প্রয়োজন মতো মালসাম্রগী নিয়ে প্রতিটি দুর্গে কিছুসংখ্যক নিয়ন্ত্রণকারী রেখে সামনে অগ্রসর হলেন এবং এসব দুর্গের হিন্দু সৈন্যদেরকে ঠেলাগাড়ি ও রসদ পরিবহনের কাজে লাগালেন।

ইবনুল জাওযী লিখেছেন, মাথুরা অভিযানে সুলতানের সামনে যতো ছোট এবং মাঝারী দুর্গ পড়েছিল, সবই জয় করে তিনি সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ঐতিহাসিক স্যার আর্লস্টিন লিখেছেন, যেসব বনভূমিতে বাতাসও পথ হারিয়ে ফেলতো, সেইসব বনভূমি দিয়ে অনায়াসে সুলতান তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। পাঞ্জাব এলাকার পাঁচটি নদী যেনো তিনি উড়াল দিয়ে পেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং প্লাবনের মতোই বুলন্দ শহরে উপনীত হন।

পূর্বপরিকল্পনা মতো মাথুরাকে এড়িয়ে গেলেন সুলতান। ১০১৮ সালের ২ ডিসেম্বর তিনি যমুনা নদী পার হলেন। যমুনা পার হওয়ার পর তার সামনে এলো সারসভা দুর্গ। তিনি দুর্গ অবরোধের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু দুর্গ অবরোধ সম্পন্ন হওয়ার আগেই দুর্গপতি তার পরিবার-পরিজন নিয়ে পালিয়ে গেল। দুর্গপতি পালিয়ে গেলে দুর্গের সৈন্যরা কোনরূপ বাধাবিপত্তি না দিয়ে সবাই হাতিয়ার ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করলো। এতে সুলতান ত্রিশটি জঙ্গীহাতি পেলেন।

এ পর্যন্ত এসে তার একটি ক্যাম্প দরকার ছিল। সুলতান বিনাযুদ্ধেই কাঙ্ক্ষিত ক্যাম্প পেয়ে গেলেন। এই দুর্গকে সুলতান তার রসদাগার বানিয়ে নিলেন এবং দুর্গের ধনাগার থেকে তিনি খাজনা হিসেবে পেলেন দশ লাখ দিরহাম।

সারসভাকে রসদাগার করে সুলতান বুলন্দশহরের দিকে রওনা হলেন। তাদের অবস্থান থেকে বুলন্দশহর অন্তত একশো মাইল দূরে ছিল। সেখানে পৌঁছাতে তাদের দুটি নদী পেরিয়ে যেতে হবে। একটি গঙ্গা, অপরটি গঙ্গা নদীর শাখা রামগঙ্গা। সুলতান রসদপত্র রাখার জন্য সুরক্ষিত দুর্গ হাতে পাওয়ার কারণে তিনি রসদপত্রকে আর টেনে নেয়া সমীচীন মনে করলেন না। তিনি শুধু অস্ত্র ও সেনাদের সাথে নিলেন। কয়েদীদের দিয়ে নৌকার সেতু তৈরী করিয়ে সৈন্যসামন্ত পার করে বুলন্দশহর অবরোধ করলেন।

বুলন্দ শহরের শাসক ছিল হরিদত্ত। এই হরিদত্ত কন্নৌজের মহারাজাকে বলেছিলেন, তার একজন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা জানিয়েছে, কন্নৌজের মহারাজার একান্ত কর্মকর্তা জগন্নাথ আসলে মুসলমান এবং গযনী সুলতানের

দক্ষ গোয়েন্দা। চম্পারাণীর সাথে তার গোপন সম্পর্ক রয়েছে। হরিদত্ত হিন্দুস্তানের অন্যান্য রাজা-মহারাজাদের মতোই মন্দিরের বৈঠকের পর অঙ্গীকার করেছিল হিন্দুধর্ম ও মহাভারতের পৌত্তলিকতা বজায় রাখতে সে জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করবে। কিন্তু বুলন্দশহরের অধিবাসীরা যখন জানতে পারলো, গযনীর সৈন্যরা অবরোধ করেছে, তখন সাধারণ লোকজনের মধ্যে দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়ে গেল। শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক। চারদিকে দেখা দিল হৈ চৈ। এই আতঙ্ক ছড়িয়েছিল গযনীর কৌশলী গোয়েন্দারা।

সুলতান মাহমূদ দুর্গের প্রধান ফটকে তার লোকজন পাঠিয়ে ঘোষণা করালেন, শহরের সকল সশস্ত্র লোকেরা যদি হাতিয়ার ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে শহরকে ধ্বংস্তূপে পরিণত করা হবে।

জঙ্গীহাতিগুলোকে প্রধান ফটকে ধাক্কা মেরে ফটক ভাঙার জন্য সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিলেন সুলতান। রাজা হরিদত্ত এই অবস্থা দেখে দুর্গের প্রধান ফটক খুলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। তার পেছনে দশ হাজার সেনাও হাতিয়ার ফেলে দিয়ে হাত উঁচু করে এসে রাজার পেছনে দাঁড়াল। হরি দত্তকে সুলতানের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে সুলতানের উদ্দেশ্যে সে বললো–

"আমি নিজের, আমার জাতিগোষ্ঠী ও জনগণের নিরাপত্তা চাই। আমি এবং আমার এই দশ হাজার সৈন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণে আগ্রহী। দয়া করে আপনি আমাদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করুন।"

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, আসলে এই দশ হাজার সৈন্য ছিল না। এদের অধিকাংশই ছিল সাধারণ নাগরিক। তারাই হরিদত্তকে বাধ্য করেছিল শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যেনো তিনি শান্তিচুক্তি করেন। যদি রাজা তা না করেন, তাহলে নাগরিকরা তাদের অনুগত সৈন্যদের দিয়ে প্রধান ফটক খুলে দেয়ার ব্যবস্থা নেবে। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, রাজা হরিদত্ত ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

* * *

সুলতান মাহমূদ দশ হাজার লোকের এই বাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণ করলেন এবং রাতের বেলায় গঙ্গা নদী পারাপারে তাদের ব্যবহার করলেন। নদী পেরিয়ে তিনি মাথুরাকে পাশ কাটিয়ে মহাবনের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি

আগেই খবর পেয়েছিলেন মহাবনের রাজা কুয়ালচন্দ্র যুদ্ধের জন্য তার সৈন্যদেরকে প্রস্তুত করে রেখেছেন। ঘন জঙ্গল ছিল স্থানীয় শাসক কুয়াল চন্দ্রের বিরাট সহায়ক। তার সেনারা জঙ্গী হাতিগুলোকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল।

সুলতান মাহমূদ জঙ্গলকে এড়িয়ে তার সেনাদের একটি বড় অংশকে জঙ্গলের দুই প্রান্তে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি শুধু অগ্রবর্তী দলকে জঙ্গলের ভেতরে এমনভাবে প্রবেশ করালেন দেখে মনে হবে তারা মহাবনের সেনাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে একেবারেই বেখবর।

সুলতানের অগ্রবর্তী সেনারা যখন জঙ্গলের মাঝামাঝি স্থানে পৌছল তখন কুয়ালচন্দ্র তার সৈন্যদেরকে আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে দিল। সুলতানের অগ্রবর্তী দলের সকল সৈন্য ছিল অশ্বারোহী। আক্রমণ শুরু হতেই তারা সবাই জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল। জঙ্গল ছিল খুব ঘন। এখানে তীরন্দাজদের তীর তেমন কার্যকর কোন ভূমিকা রাখার সুযোগ ছিল না। ওরা যখনই তীর ছুঁড়তো সুলতানের যোদ্ধারা খুব সহজেই তাদের লক্ষ্যচ্যুত করে ফেলতো।

এমতাবস্থায় হঠাৎ করে কুয়াল চন্দ্রের সৈন্যদের উপর ডানবাম এবং পেছন দিক থেকে অতর্কিত আক্রমণ শুরু হলো। শত্রুদের উপর স্বগোত্রীয়দের ত্রিমুখী আক্রমণ শুরু হতেই সুলতানের অগ্রবর্তী সৈন্যরা এদিক ওদিক সটকে পড়ল। হিন্দু সৈন্যদের তখন সুলতানের সৈন্যদের হাতে কাটা পড়া নয়তো পালিয়ে প্রাণ বাঁচানো ছাড়া বিকল্প কোন পথ ছিল না।

ঐতিহাসিক স্যার আর্লস্টিন এই যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে লিখেন, এতো বিশাল জঙ্গল হওয়ার পরও গযনীর হাজার হাজার সৈন্য কুয়ালচন্দ্রের সৈন্যদের খোঁজে জঙ্গলে চিরুণী অভিযান চালাল। জঙ্গলের পিছনে ছিল গঙ্গানদী। যে গঙ্গানদী পেরিয়েই পথ ঘুরে সুলতানের বাহিনী কুয়ালচন্দ্রের বাহিনীকে পেছন দিক থেকে ঘিরে ফেলে। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে কুয়াল চন্দ্রের সৈন্যরা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল; কিন্তু তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় ছাড়া অধিকাংশই সুলতানের সৈন্যদের হাতেই প্রাণত্যাগ করল।

রাজা কুয়ালচন্দ্রকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। মুসলিম সৈন্যরা যখন বিজয়ী বেশে তার প্রাসাদে প্রবেশ করল, তখন রাজপ্রাসাদের পাহারাদার তাদের জানাল, রাজার ছিল একজনই মাত্র স্ত্রী ও একটি মাত্র সন্তান। তিনি তরবারী দিয়ে উভয়কে হত্যা করে নিজেই নিজের তরবারী বুকে বিদ্ধ করে আত্মহত্যা করেন।

রাজমহলের পাহারাদার মুসলিম সৈন্যদেরকে প্রাসাদের ভেতরে নিয়ে তাদের মৃতদেহ দেখাল। মহাবন থেকে একশ পঁচাশিটি হাতি এবং বিপুল পরিমাণ সোনাদানা সুলতানের হস্তগত হলো।

মাথুরা সম্পর্কে সুলতানের দুধর্ষ গোয়েন্দা আমীল বিন তাশকীন তাকে জানিয়ে দিয়েছিল, মাথুরা শহরের প্রতিরক্ষাদেয়াল খুবই মজবুত। কন্নৌজ মহারাজার দু'টি সেনাদলই মূলত মাথুরার নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। মহাবনের রাজাও তাদের সহযোগিতা করেন। সারসভা ও বুলন্দশহরের শাসকরা এমন আত্মশ্লাঘা অনুভব করতো যে, কেউ তাদের উপর বহিরাক্রমণ করে মাথুরা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। কারণ, প্রকৃতিগতভাবে যমুনা ও গঙ্গা নদী মাথুরার সুরক্ষার ব্যবস্থা বিরাট সহায়ক ছিল।

ইতিহাস বলে, সুলতান মাহমূদ অত্যন্ত বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে আগে চারপাশের ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে পরাজিত করে পথের সব বাধা-বিপত্তি দূর করেন। এরপর প্রতিবন্ধক মহাবনের সামরিক শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে মাথুরার দিকে অগ্রসর হন।

তিনি দূর থেকে মাথুরা শহরকে দেখে বিস্মিত হয়ে দারুণ! দারুণ!! বলে চিৎকার করেন। এরপর একদিন তিনি গযনীর গভর্নরকে মাথুরা শহরের সৌন্দর্য এবং হিন্দুদের নির্মাণনৈপুণ্য সম্পর্কে লিখেন, মাথুরা নগরীর স্থাপনা ও নির্মাণশৈলী এখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাসের মতোই মজবুত ও বাহারী। এখানকার অধিকাংশ ধর্মীয় স্থাপনা মর্মর পাথরে তৈরী। গঠনশৈলী দেখেই বোঝা যায়, এসব মন্দির ও ইমারত যেনতেন ভাবে তৈরী হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে বছরের পর বছর সময় ও বহু শ্রমের বিনিময়ে এসব স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। এসব স্থাপনা তৈরীতে হিন্দুরা কোটি কোটি দিনার খরচ করেছে। মন্দিরগাত্রে নিপুণ কর্মকৌশলে ফুটিয়ে তুলেছে হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাস। কোন কোন স্থাপনা তৈরীতে হয়তো শত বছরও ব্যয় করা হয়েছে। বস্তুত এই শহরের রূপ-সৌন্দর্য আমার পক্ষে কোন ভাষায়ই বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

মাথুরা পর্যন্ত পৌঁছাতে সুলতানের তেমন কোন জনবল ব্যয় করতে হয়নি, যার ফলে অনেকটা নিশ্চিত ও দৃঢ়চিত্তে তিনি মাথুরার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। মহাবনের পালিয়ে আসা সৈন্যদের অনেকেই মাথুরা শহরে পৌঁছে মুসলিম সৈন্যদের সম্পর্কে ত্রাস ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল। অপরদিকে গোয়েন্দা হিশাম ও তার সঙ্গীরাও লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল।

মহাবন থেকে পালিয়ে আসা সৈন্যরা মাথুরায় এসে লোকজনের মধ্যে এমনই ভীতি ছড়িয়ে দিলো, 'গযনী বাহিনীর সামনে বিশাল বটবৃক্ষও টিকে থাকতে পারবে না।'

এসব আতঙ্ক ছড়ানোর ফলে শহরের অধিবাসীরা প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা না করে জীবন বাঁচাতে এবং বিপদ অপসারণের জন্য মন্দিরগুলোতে গিয়ে জমায়েত হয়ে বিপদঘণ্টা বাজাতে শুরু করলো।

গযনীর সৈন্যরা মাথুরা শহর অবরোধ করলে সামান্য প্রতিরোধ হলো বটে; কিন্তু তা গযনী বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে বানের খড়কুটোর মতোই ভেসে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই খুলে গেল শহরের প্রধান গেট। সুলতান মাহমূদ বিজয়ীবেশে শহরে প্রবেশ করে প্রথমেই গেলেন মাথুরার প্রধান মন্দিরে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেবের অতি মূল্যবান মূর্তি প্রতিস্থাপিত ছিল। এই মূর্তিগুলো ছিল খুবই মূল্যবান উপাদানে তৈরী। এ দুটি মূর্তির গঠন ছিল অস্বাভাবিক সুন্দর। খুবই দামী ও উজ্জ্বল হীরে দিয়ে বানানো হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেবের মূর্তি। কৃষ্ণমূর্তির দুটি চোখ ছিল দীপ্তিময় হীরের দ্বারা গঠিত। পাঁচটি বিশাল মূর্তি ছিল সম্পূর্ণ সোনার তৈরী এবং এগুলোর চোখে ছিল দামী হীরে। এই হীরের তৎকালীন বাজার মূল্য ছিল পঞ্চাশ হাজার দিনার।

সবচেয়ে ছোট মূর্তিটিতে পাঁচশ কেজি সোনা ছিল। একটি মূর্তিকে গলিয়ে পাওয়া গিয়েছিল ৯৮০০০ (আটানব্বই হাজার) গ্রাম সোনা। এ ছাড়া একশ মূর্তি ছিল সম্পূর্ণ রুপার তৈরী।

বিজয়ী সুলতান মাহমূদ পাথরের মূর্তিগুলোকে ভেঙে ফেললেন এবং সোনার মূর্তিগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে গলিয়ে ফেললেন। হিন্দুদের এই পবিত্র শহর থেকে পৌত্তলিকতার বিষময় উপাদান দূর করতে তিনি কুড়ি দিন মাথুরা শহরে অবস্থান করলেন। এই কুড়ি দিন পর্যন্তই শহরের বিভিন্ন স্থাপনা জ্বলছিল এবং মাথুরা শহর একটি ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

এদিকে মহারাজা কন্নৌজ সুলতানের আগমন খবর শুনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে জোর চেষ্টা চালাতে লাগলেন। কারণ, সুলতানের পরবর্তী লক্ষ্য কন্নৌজ। এবার কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপালের পালা।

**তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত**

[চতুর্থ খণ্ডের জন্য অপেক্ষা করুন]

সুলতান মাহমুদ গজনবীর ঐতিহাসিক
সিরিজ উপন্যাস ৩

# ভারত অভিযান
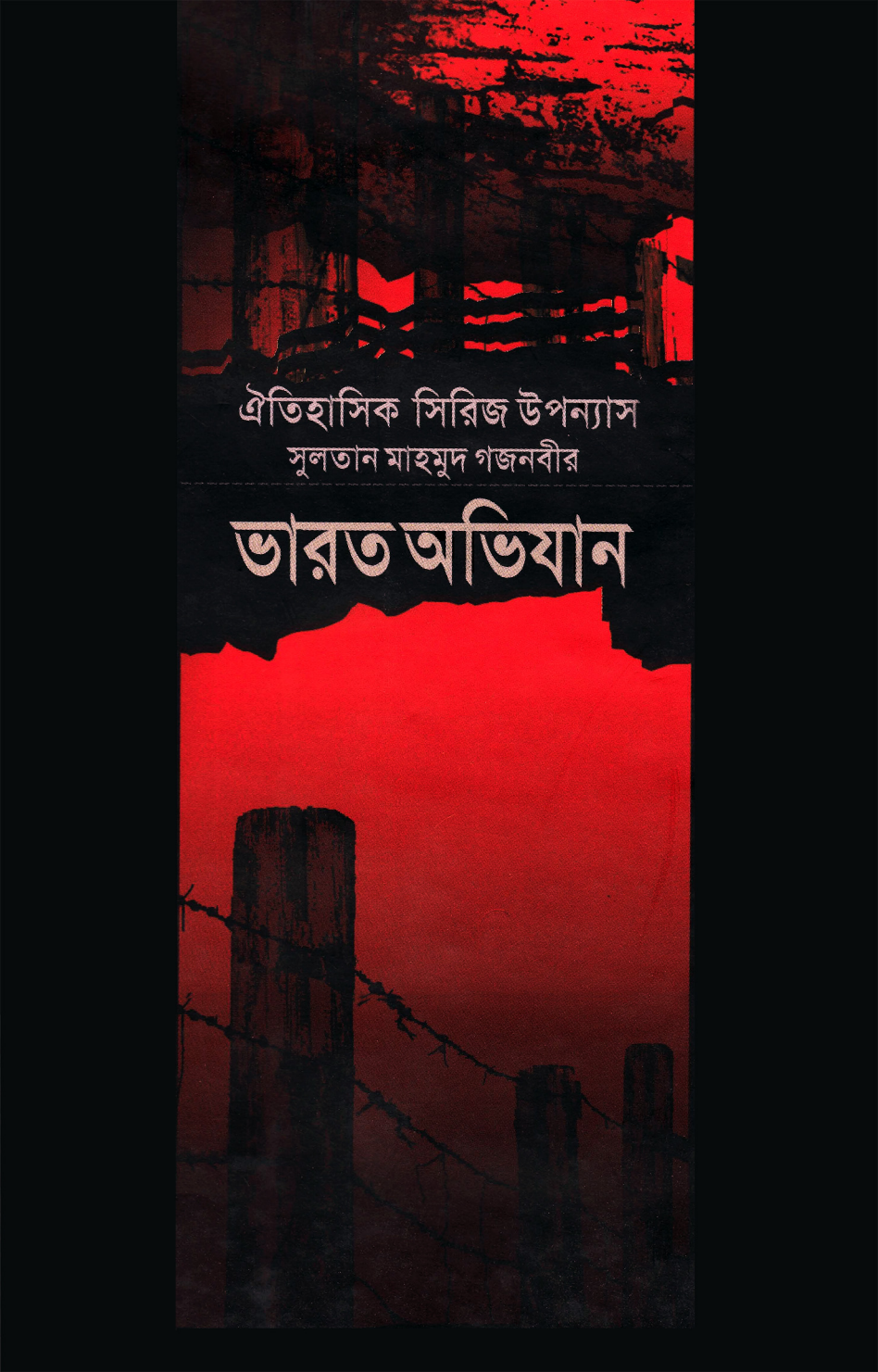
VAROT OVIJAN : 1
ISBN 984-70109-0000-3 SET

ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস
সুলতান মাহমুদ গজনবীর
ভারত অভিযান

# ভারত অভিযান - ৪

# ভারত অভিযান

(চতুর্থ খণ্ড)

এনায়েতুল্লাহ

অনুবাদ
শহীদুল ইসলাম

এদারায়ে কোরআন
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর — ২০০৮

**প্রকাশক** ▶ **আরিফ বিল্লাহ্**, এদারায়ে কুরআন, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, স্বত্ব ▶ সংরক্ষিত, প্রচ্ছদ ▶ নাজমুল হায়দার
কম্পিউটার কম্পোজ ▶ এম. হক কম্পিউটার্স, মুদ্রণ ▶ সুবহান প্রিন্টিং প্রেস
মোবাইল ঃ ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

মূল্য ঃ একশত ষাট টাকা মাত্র

**BHAROT OVIJAN-3** : Writer Enayatullah, Translated by Shahidul Islam, Published by Edara-e- Quran, 50 Banglabazar, Dhaka-1100, Printed by Subhan Printing Press. Date of Publication September 2008.

**RICE TAKA ONE HUNDRED SIXTY ONLY**

**ISBN 984-70109-0000-3 SET**

# উৎসর্গ

বঙ্গবীর মীর নেছার আলী তিতুমীর, যিনি স্বদেশীয় জাতীয়তা, ইসলামী ইতিহাস ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার জন্যে এবং দখলদার বেনিয়াদ ইংরেজদের বিতারণের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, যার ফলে ইংরেজ দখলদার গোষ্ঠী অনুভব করেছিল এ দেশকে আর বেশীদিন পদানত রাখা সম্ভব হবে না।

—অনুবাদক

# প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! 'এদারায়ে কুরআন' কর্তৃক প্রকাশিত সুলতান মাহমূদ এর ভারত অভিযান সিরিজের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। এজন্য আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং পাঠক মহলকে জানাচ্ছি মোবারকবাদ। নিয়মিত বিরতি দিয়ে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের চেষ্টার কোন ক্রটি ছিল না কিন্তু দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও মুদ্রণ সামগ্রির উচ্চমূল্য আমাদের টুঁটি চেপে ধরেছে। ফলে কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে এই সিরিজের প্রকাশনা।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে মাহে রমজান '০৮ এর বইমেলা উপলক্ষে এই সিরিজের চতুর্থ খণ্ডটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে সুখানুভব করছি।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতার পরও আমরা এ খণ্ডটি আগেরগুলোর চেয়ে আরো সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তবুও মুদ্রণ প্রমাদ ভুল-ক্রটি থাকা স্বাভাবিক। বিজ্ঞমহলের কাছে যে কোন ক্রটি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের মতো চতুর্থ খণ্ডটিও পাঠক-পাঠিকা মহলে আদৃত হলে আমাদের সার্বিক প্রয়াস সার্থক হবে।

—প্রকাশক

# লেখকের কথা

"মাহমূদ গজনবীর ভারত অভিযান" সিরিজের এটি চতুর্থ খণ্ড। উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতান মাহমূদ গজনবী সতের বার ভারত অভিযান পরিচালনাকারী মহানায়ক হিসেবে খ্যাত। সুলতান মাহমূদকে আরো খ্যাতি দিয়েছে পৌত্তলিক ভারতের অন্যতম দু' ঐতিহাসিক মন্দির সোমনাথ ও থানেশ্বরীতে আক্রমণকারী হিসেবে। ঐসব মন্দিরের মূর্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন মাহমূদ। কিন্তু উপমহাদেশের পাঠ্যপুস্তকে এবং ইতিহাসে মাহমূদের কীর্তির চেয়ে দুষ্কৃতির চিত্রই বেশী লিখিত হয়েছে। হিন্দু ও ইংরেজদের রচিত এসব ইতিহাসে এই মহানায়কের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে তাঁর সুখ্যাতি চাপা পড়ে গেছে। মুসলিম বিদ্বেষের ভাবাদর্শে রচিত ইতিহাস এবং পরবর্তীতে সেইসব অপইতিহাসের ভিত্তিতে প্রণীত মুসলিম লেখকরাও মাহমূদের জীবনকর্ম যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের বোঝার উপায় নেই, তিনি যে প্রকৃতই একজন নিবেদিতপ্রাণ ইসলামের সৈনিক ছিলেন, ইসলামের বিধি-বিধান তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। জাতিশত্রুদের প্রতিহত করে খাঁটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও দৃঢ় করণের জন্যেই নিবেদিত ছিল তার সকল প্রয়াস। অপলেখকদের রচিত ইতিহাস পড়লে মনে হয়, সুলতান মাহমূদ ছিলেন লুটেরা, আগ্রাসী ও হিংস্র। বারবার তিনি ভারতের মন্দিরগুলোতে আক্রমণ করে সোনা-দানা, মণি-মুক্তা লুট করে গজনী নিয়ে যেতেন। ভারতের মানুষের উন্নতি কিংবা ভারত কেন্দ্রিক মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা তার কখনো ছিলো না। যদি তৎকালীন ভারতের নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য করা এবং পৌত্তলিকতা দূর করে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার একান্তই ইচ্ছা তাঁর থাকতো, তবে তিনি কেন মোগলদের মতো ভারতে বসতি গেড়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতেন না? ইত্যাকার বহু কলঙ্ক এঁটে তার চরিত্রকে কলুষিত করা হয়েছে।

মাহমূদ কেন বার বার ভারতে অভিযান চালাতেন? মন্দিরগুলো কেন তার টার্গেট ছিল? সফল বিজয়ের পড়ও কেন তাকে বার বার ফিরে যেতে হতো গজনী? ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জবাব; ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ সৈনিক সুলতান মাহমূদকে তুলে ধরার জন্যে আমার এই প্রয়াস। নির্ভরযোগ্য দলিলাদি ও বিশুদ্ধ ইতিহাস ঘেটে আমি এই বইয়ে মাহমূদের

প্রকৃত জীবন চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রকৃত পক্ষে সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর মতোই মাহমূদকেও স্বজাতির গাদ্দার এবং বিধর্মী পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে একই সাথে লড়াই করতে হয়েছে। যতো বার তিনি ভারত অভিযান চালিয়েছেন, অভিযান শেষ হতে না হতেই খবর আসতো, সুযোগ সন্ধানী সাম্রাজ্যলোভী প্রতিবেশী মুসলিম শাসকরা গজনী আক্রমণ করছে। কেন্দ্রের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বাধ্য হয়েই মাহমূদকে গজনী ফিরে যেতে হতো। একপেশে ইতিহাসে লেখা হয়েছে, সুলতান মাহমূদ সতের বার ভারত অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু একথা বলা হয়নি, হিন্দু রাজা-মহারাজারা মাহমূদকে উৎখাত করার জন্যে কতো শত বার গজনীর দিকে আগ্রাসন চালিয়ে ছিল।

সুলতান মাহমূদের বারবার ভারত অভিযান ছিল মূলত শত্রুদের দমিয়ে রাখার এক কৌশল। তিনি যদি এদের দমিয়ে রাখতে ব্যর্থ হতেন, তবে হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকতাবাদ সাগর পাড়ি দিয়ে আরব পর্যন্ত বিস্তৃত হতো।

মাহমূদের পিতা সুবক্তগীন তাকে অসীয়ত করে গিয়েছিলেন, "বেটা! ভারতের রাজাদের কখনও স্বস্তিতে থাকতে দিবে না। এরা গজনী সালাতানাতকে উৎখাত করে পৌত্তলিকতার সয়লাবে কাবাকেও ভাসাতে চায়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময়ের মত ভারতীয় মুসলমানদেরকে হিন্দুরা জোর জবরদস্তি হিন্দু বানাচ্ছে। এদের ঈমান রক্ষার্থে তোমাকে পৌত্তলিকতার দুর্গ গুড়িয়ে দিতে হবে। ভারতের অগণিত নির্যাতিত বনি আদমকে আযাদ করতে হবে, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে হবে।"

আলবিরুনী, ফিরিশ্‌তা, গারদিজী, উতবী, বাইহাকীর মতো বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ তৎকালীন সবচেয়ে বড় বুযুর্গ ও ওলী শাইখ আবুল হাসান কিরখানীর মুরীদ ছিলেন। তিনি বিজয়ী এলাকায় তার হেদায়েত মতো পুরোপুরি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি নিজে কিরখানীর দরবারে যেতেন। কখনও তিনি তাঁর পীরকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠাননি। উপরন্তু তিনি ছদ্মবেশে পীর সাহেবের দরবারে গিয়ে ইসলাহ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি আত্মপরিচয় গোপন করে কখনও নিজেকে সুলতানের দূত হিসেবে পরিচয় দিতেন। একবার তো আবুল হাসান কিরখানী মজলিসে বলেই ফেললেন, "আমার একথা ভাবতে ভালো লাগে যে, গজনীর সুলতানের দূত সুলতান নিজেই হয়ে থাকেন। এটা প্রকৃতই মুসলমানের আলামত।"

মাহমূদ কুরআন, হাদীস ও দীনি ইলম প্রচারে খুবই যত্নবান ছিলেন। তাঁর দরবারে আলেমদের যথাযথ মর্যাদা ছিল। সব সময় তার বাহিনীতে শত্রু পক্ষের চেয়ে সৈন্যবল কম হতো কিন্তু তিনি সব সময়ই বিজয়ী হতেন। বহুবার এমন হয়েছে যে, তার পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ময়দানে দু'রাকাত নামায আদায় করে মোনাজাত করতেন এবং চিৎকার করে বলতেন, "আমি বিজয়ের আশ্বাস পেয়েছি, বিজয় আমাদেরই হবে।" বাস্তবেও তাই হয়েছে।

অনেকেই সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী আর সুলতান মাহমূদকে একই চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বীর সেনানী মনে করেন। অবশ্য তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একই ছিল। তাদের মাঝে শুধু ক্ষেত্র ও প্রতিপক্ষের পার্থক্য ছিল। আইয়ুবীর প্রতিপক্ষ ছিল ইহুদী ও খৃস্টশক্তি আর মাহমূদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল হিন্দু পৌত্তলিক রাজন্যবর্গ। ইহুদী ও খৃস্টানরা সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর সেনাদের ঘায়েল করতো প্রশিক্ষিত সুন্দরী রমণী ব্যবহার করে নারী গোয়েন্দা দিয়ে আর এর বিপরীতে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে এরা ব্যবহার করতো শয়তানী যাদু। তবে ইহুদী-খৃস্টানদের চেয়ে হিন্দুদের গোয়েন্দা তৎপরতা ছিল দুর্বল কিন্তু সুলতানের গোয়েন্দারা ছিল তৎপর ও চৌকস।

তবে একথা বলতেই হবে, সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর গোয়েন্দারা যেমন দৃঢ়চিত্ত ও লক্ষ্য অর্জনে অবিচল ছিল, মাহমূদের গোয়েন্দারা ছিল নৈতিক দিক দিয়ে ততোটাই দুর্বল। এদের অনেকেই হিন্দু নারী ও যাদুর ফাঁদে আটতে যেতো। অথবা হিন্দুস্তানের মুসলিম নামের কুলাঙ্গররা এদের ধরিয়ে দিতো। তারপরও সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর চেয়ে সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা কার্যক্রম ছিল বেশি ফলদায়ক।

ইতিহাসকে পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য, বিশেষ করে তরুণদের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশনের জন্যে গল্পের মতো করে রচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থ। বাস্তবে এর সবটুকুই সত্যিকার ইতিহাসের নির্যাস। আশা করি আমাদের নতুন প্রজন্ম ও তরুণরা এই সিরিজ পড়ে শত্রু-মিত্রের পার্থক্য, এদের আচরণ ও স্বভাব জেনে এবং আত্মপরিচয়ে বলীয়ান হয়ে পূর্বসূরীদের পথে চলার দিশা পাবে।

এনায়েতুল্লাহ
লাহোর।

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

## খুন কন্নৌজ আঘাতের পূর্বাঘাত

বর্তমান গযনী শহর তিন দশক ধরে একের পর এক পরাশক্তির আগ্রাসনে পর্যুদস্ত। দখলদার রাশিয়ার কবল থেকে দীর্ঘদিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর মুক্ত হয়ে মরার উপর খাড়ার ঘা এর মতো গৃহযুদ্ধের বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আবারো আমেরিকার আগ্রাসনের শিকার হয়েছে সুলতান মাহমূদের প্রিয় ভূমি গযনী। হয়েছে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের পরীক্ষাগার। বিশ্বের সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর বোমাগুলোর বিস্ফোরণস্থল বানানো হয়েয়ে সুলতান মাহমূদের গযনীকে। ইসলাম বিদ্বেষী ইহুদী খ্রিস্টানদের হাইড্রোসেন বোমার গবেষণগারে পরিণত হয়েছে অমিততেজী স্বাধীন ঈমানদীপ্ত সুলতানের জন্মভূমি। শুধু গযনী নয় গোটা আফগানিস্তানের প্রতি ইঞ্চি জমি আজ বহুজাতিক বাহিনীর নিক্ষিপ্ত বোমা ও গোলার আঘাতে বিষাক্ত।

হাজার বছরের স্থাপনা ও ইসলামী ঐতিহ্যের চিহ্নগুলো বছরের পর বছর ধরে চলে আসা যুদ্ধান্মদনায় ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে। সেই সুলতান মাহমূদের দুর্বার অভিযান আর স্বজাতি ও ইসলামকে সুউচ্চে উচ্চকিত করার সেই সোনালি দিনগুলো আজকে শুধুই স্মৃতি। মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই পার্থিব স্বার্থে স্বজাতির চিহ্নিত দুশমনদের সাথে বিনাশী দোস্তিতে মত্ত। জাতির ঘাড়ে চেপে বসেছে কথিত দেশপ্রেমিকের বেশে বিদেশী বরকন্দাজ। তবে গযনীর মাটি এখনো সম্পূর্ণ ভুলে যায়নি হয়নি তার অতীত।

এখনো গযনীর মাটিতে একদল আল্লাহর সৈনিকের পদচারণা রয়েছে। সুলতানি না থাকলেও মাহমূদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই একদল অমিত সাহসী যোদ্ধা বিদেশী দখলদারদের বিতাড়িত করে গোটা আফগানিস্তানকে পুনর্বার

ইসলামী পতাকার ছায়াতলে আনার জন্যে অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে। বিগত তিনদশক ধরেই গযনী ও সংশ্লিষ্ট এলাকার মায়েরা তাদের সন্তানদের পায়ে বেড়ি না বেঁধে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে। আজো শত শত কন্যা জায়া জননী তাদের পিতা স্বামী সন্তান ভাইকে ইসলামের জন্যে উৎসর্গ করছে। বিলীন হয়ে যায়নি সুলতান মাহমূদের স্মৃতি, হারিয়ে যায়নি সুলতান মাহমূদের অভিযান। একদল মর্দেমুজাহিদ নিজেদের জীবন ও দেহের তাজা খুন ঢেলে দিয়ে নতুন করে রচনা করছে ত্যাগ ও জীবন দানের নতুন ইতিহাস। ঈমান ও ইসলামকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার নতুন অধ্যায়।

একজন মূর্তি সংহারীর জন্মভূমি হিসেবেই শুধু ইতিহাসে গযনী স্মরণীয় ছিল না। গযনী খ্যাতি পেয়েছিল সেখানকার অসাধারণ স্থাপত্য কীর্তি ও অসংখ্য শৈল্পিক ধাচে নির্মিত দালান কোঠা ও বড় বড় অট্টালিকার জন্যে।

সুলতান মাহমূদ কন্নৌজ বিজয়ের পর হিন্দুস্তান থেকে গযনী ফিরে এসে তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নির্মাণশিল্পীদের দিয়ে গযনীতে মর্মর পাথরের একটি ঐতিহাসিক মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেই সাথে মসজিদ সংলগ্ন স্থানেই গড়ে তুলেছিলেন সর্বাধুনিক কারিকুলাম ও তথ্যসমৃদ্ধ একটি বিশ্ববিদ্যালয়। সেই সময়ের সব জ্ঞান-বিজ্ঞানই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চর্চিত হতো।

এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল মথুরা জয়ের স্মারক হিসেবে। হিন্দুস্তান অভিযানে যেসব মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেছিল তাদের স্মৃতি হিসেবে তিনি সুউচ্চ মিনার নির্মাণ করেন। কারণ, মথুরা ভারতের হিন্দুদের কাছে এমনই পবিত্র যেমনটি মুসলমানের কাছে মক্কা মদীনা।

মথুরা হিন্দুদের দেবতা শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি। মথুরার প্রধান মন্দিরের মূর্তিগুলোকেও পবিত্র বলে মনে করা হতো।

মসজিদ তৈরি করার জন্যে দেশ-বিদেশ থেকে নামী-দামী নির্মাণ শিল্পীদের আনা হলো। তারা সুলতান মাহমূদের কল্পনা ও ভাবনার চেয়েও বেশী সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করে ফেলল। সুলতান মাহমূদ মসজিদের দেয়াল গাত্রের বিভিন্ন কারুকার্যে সোনা-রুপা গলিয়ে কারুকার্যকে আরো দৃষ্টিনন্দন করে তুললেন। মসজিদের ভেতরে সুদৃশ্য গালিচা বিছানো হলো। মসজিদ সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করা হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একটি যাদুঘরও তৈরী করা হলো। সেখানে সংরক্ষণ করা হলো বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন।

সুলতান মাহমূদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্যে আলাদা তহবিল গড়ে তুললেন।

মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে সুলতানের আগ্রহ দেখে গযনীর বিত্তশালী ব্যক্তি ও সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও তাদের রুচি ও আভিজাত্যের সমন্বয়ে বহু মসজিদ, নান্দনিক স্থাপত্যশৈলীর বাড়ি নির্মাণ করলেন। ফলে গযনী শহর আধুনিক স্থাপত্য শিল্প ও ইমারতে জাকজমকপূর্ণ হয়ে উঠলো। সুলতান মাহমূদ ও তার প্রিয় গযনীবাসীর এই উন্নতি এমনিতেই হয়নি। এ জন্যে তাকে একের পর এক অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছে।

আধুনিক গযনী গড়ে ওঠার মূলে হাজারো গযনীবাসীর জীবন যৌনব বিসর্জন দিতে হয়েছে। গযনীর হাজার হাজার মর্দেমুজাহিদদের লাশ গযনী থেকে দূরে বহু দূরে বুলন্দশহর, মথুরা, মহাবন, কন্নৌজের মাটিতে, গঙ্গা যমুনার স্রোতধারায় ভেসে গেছে। যমুনা গঙ্গার তীরে হাজারো মুজাহিদের লাশ কবর দিতে হয়েছে। যাদের চিহ্নও কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে। সেইসব মর্দেমুজাহিদ হিন্দুস্তানের কুফরীর জগদ্দল পাথর থেকে সেখানকার নির্যাতিত নিপীড়িত সাধারণ মানুষদের মুক্তি দেয়ার এক অদৃশ্য বাসনা নিয়ে স্ত্রী, পুত্র, পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে গযনী থেকে শত শত মাইল দূরবর্তী হিন্দুস্তান অভিযানে শরীক হয়েছিলেন। তাদের ঈমানী শক্তি, বিজয়ের জয়দীপ্ত ব্যাকুলতা, আল্লাহর বাণীকে কুফরস্তানে উচ্চকিত করার আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে স্থির থাকতে দেয়নি। তাদের হৃদয়ে ছিল আল্লাহ্ প্রেমের আগ্নেয়গিরি। বুকের ভেতরে ছিল কুফরী নির্মূলের দাবানল। ঈমানের উত্তাপ তাদেরকে আমৃত্যু লড়াই করে যেতে অনিঃশেষ শক্তি সঞ্চার করেছিল।

১০১৮ সালের শেষ দিকে সুলতান মাহমূদের সৈন্যরা মথুরা থেকে বুলন্দশহর পর্যন্ত প্লাবনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এখনো ওই অঞ্চলের মানচিত্র খুলে ধরলে তাদের দুর্ধর্ষ অভিযানের কথা বিস্ময়কর মনে হয়। এমনও হয়েছে একটি অভিযান চালাতে গিয়ে তাদেরকে প্রমত্তা গঙ্গা কয়েকবার পাড়ি দিতে

হয়েছে। সমর বিশারদগণ অভিভূত হয়ে যান গযনী থেকে তিন মাসের দূরত্বে এসে এমন কঠিন ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করে শত বেড়াজাল ডিঙিযে একের পর এক দুর্গ ও যুদ্ধে জয়লাভ করলো কিভাবে তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোন যুদ্ধবাজ জেনারেলের পক্ষে সম্ভব ছিলো না বলে তারা অকপটে স্বীকার করেছেন। এজন্য দরকার ছিল অস্বাভাবিক ধীশক্তির দূরদর্শী সামরিক জ্ঞান ও অলৌকিক শক্তিতে বলীয়ান কোন নেতৃত্বের। বাস্তবে এসব গুণাবলীর সমন্বয় ছিল সুলতান মাহমূদের মধ্যে। সুলতান মাহমূদ শুধু একজন সমরনায়কই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ, খোদাভীরু শাসক। নিজেকে যিনি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধির উর্ধ্বের মনে করতেন না।

মথুরা ছিল সুলতান মাহমূদের জন্যে খুব মূল্যবান টার্গেট। যে কোন মূল্যে হিন্দুরা মথুরাকে সুলতানের কব্জা থেকে রক্ষার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলো। কিন্তু সুলতান হিন্দুদের সকল দর্প চূর্ণ করে মথুরাকে দখল করে নেন এবং হাজার হাজার বছরের প্রাচীন মূর্তি গুড়িয়ে দেন। মথুরার ঐতিহাসিক দেবমন্দিরে মুসলমানরা আযানের উচ্চকিত করে এবং মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তর ঘটায়।

মথুরা বিজয়ের পর ক্লান্ত শ্রান্ত যোদ্ধাদের খানিক বিশ্রাম দেয়ার জন্যে সুলতান সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এই অবসরে তিনি কন্নৌজ অভিযানের প্রস্তুতি নেন। সেনাবাহিনীকে নতুন করে বিন্যাস করেন।

কন্নৌজ সম্পর্কে গোয়েন্দারা সুলতানকে খবর দিয়েছিল, কন্নৌজ বিজয় সহজসাধ্য হবে না। কারণ, হিন্দুস্তানের অন্যান্য রাজা মহারাজাদের কাছে কন্নৌজের মহারাজা অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী।

বাস্তবেও কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপাল ছিলেন বুদ্ধিমান। এ কারণে কন্নৌজ আক্রমণের আগে সুলতান মাহমূদ সৈন্যদের কিছুটা বিশ্রাম দিয়ে তাদের ক্লান্তি দূর করে নতুন করে সেনা কমান্ড সাজানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। কন্নৌজ আক্রমণের আগেই তিনি আশপাশের এলাকায় তার গোয়েন্দাদের ছড়িয়ে দিলেন।

তার গোয়েন্দাদের পাঠানো তথ্য মতে কন্নৌজের আগে আরো দুটো ছোট্ট রাজ্যের অস্তিত্ব পাওয়া গেলো। এই রাজ্য দুটোর শাসকেরা মহারাজা ছিলো না, তাদেরকে রায়বাহাদুর বলা হতো। এরা ছিল বড় রাজত্বের করদাতা ছোট্ট

সামন্তরাজা। নিজেদেরকে রাজা হিসেবে ঘোষনা দেয়ার অধিকার তাদের ছিল না। কিন্তু তারা সীমিত আকারে সৈন্য লালন পালন ও কর আদায় করতে পারতো। এই রায়দের একজন ছিলেন রায়চন্দ্র। রায়চন্দ্র ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি ছোট্ট রাজ্য ছিল কন্নৌজ রাজা রাজ্যপালের অধীন।

সুলতান মাহমূদের স্থানীয় গোয়েন্দাদের খবরে জানা যায়, লাহোরের মহারাজা ভীমপালও এই অঞ্চলেই অবস্থান করছেন। রাজা ভীমপাল এই অঞ্চলের রাজাদেরকে সুলতানের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তুলছেন এবং তাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। রাজা ভীমপালের পক্ষে সুলতান মাহমূদের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব ছিলো না। কারণ, তিনি ছিলেন সুলতানের কাছে বশ্যতা স্বীকারকারী অধীনতামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ। ভীমপাল সুলতানের সাথে কোনরূপ যুদ্ধ না করার চুক্তি করেছিলেন এবং সুলতানের সেনাবাহিনীকে সব ধরনের সহযোগিতা করার ব্যাপারটিও চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

সুলতান মাহমূদ ভীমপালকে খুঁজে বের করে জীবিত গ্রেফতার করে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু গোয়েন্দারা গভীর অনুসন্ধান করেও ভীমপালকে কোথাও খুঁজে পায়নি।

মথুরা থেকে প্রায় দেড়শ মাইল দূরে গঙ্গা নদীর ডান তীরে ছিল কন্নৌজ শহর। আর যমুনা নদীর ডান তীরে ছিল মথুরা শহর। ফলে সুলতান মাহমূদকে উভয় নদী অতিক্রম করতে হয়েছিল। কিন্তু নিরাপদে নদী পারাপারের জন্য সুলতানকে পথের কাঁটাস্বরূপ সকল হিন্দু রায় ও ছোট্ট ছোট্ট রাজাদেরকে অস্ত্রমুক্ত করতে হয়েছিল। অন্যান্য হিন্দু রাজাদের নিরস্ত্র না করলে আশংকা ছিল এরা সবাই মিলে কন্নৌজ অবরোধে ব্যস্ত সুলতানের বাহিনীর উপর পেছন থেকে আক্রমণ করে বসবে। সুলতান খুব দ্রুত অভিযান চালাতে চাচ্ছিলেন, যাতে কন্নৌজের সৈন্যরা প্রতিরোধ ব্যবস্থা অতটা শক্তিশালী না করতে পারে।

পথিমধ্যে যমুনা নদীর বাম পাড়ে মনুজ নামের একটি ছোট্ট দুর্গ ও রাজ্য ছিল। সে সময় এটিকে ব্রাহ্মণ দুর্গ নামেও ডাকা হতো। কন্নৌজ ও মনুজের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র সাতাশ মাইল। মনুজ ছিল হিন্দু রাজপুতদের আবাসস্থল। এরা ছিল স্বভাবজাত লড়াকু। এদের মেয়েরা পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহে পিছপা হতো না। মনুজের রাজপুতেরা ছিল কন্নৌজ রাজার খুবই বিশ্বস্ত। রাজা

রাজ্যপাল মনুজের রাজপুতদের সাথে সামরিক সখ্য গড়ে তুলেছিলেন। তাদের মধ্যে পারস্পারিক সামরিক সহযোগিতা চুক্তিও বিদ্যমান ছিল।

একদিন মনুজের কিছু অধিবাসী যমুনা নদীতে গোসল করছিল। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও নদীতে গোসল করছিল। সাধারণত তারা সকাল বেলায় গোসল সেরে নেয়াটাকে ধর্মীয় অনুসঙ্গ মনে করে। মনুজ দুর্গের অবস্থান ছিল একেবারে নদীর তীর ঘেঁষে। হঠাৎ মহিলাদের মধ্যে চেচামেচি শুরু হয়ে গেল। তারা নদী থেকে হাচড়ে পাছড়ে উঠে বাড়ীর দিকে দৌড়াতে শুরু করল। মহিলাদের আর্তচিৎকার শুনে পুরুষেরা দৌড়ে এলো। তারা মনে করল হয়তো নদীতে কোন জলহস্তি কিংবা কোন জলজ প্রাণী দেখে মহিলারা আতংকিত হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ভুল ভেঙ্গে গেল। তারা নদীর পানিতে স্রোতের সঙ্গে মানুষের মরদেহ ভেসে আসতে দেখতে পেল এবং নদীর পানির রংও তাদের কাছে পরিপবির্তত মনে হলো।

প্রথমে তারা মাত্র কয়েকটি মরদেহ দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তাদের চোখে পড়ল সারি সারি লাশ। যেনো নদীতে পানি নয় শুধু মরদেহ প্রবাহিত হচ্ছে।

নদীর জলে স্নানরত যে ক'জন পুরোহিত ও পণ্ডিত শ্রেণীর লোক ছিল, তারা নদীতে হাঁটু গেড়ে বসে ভজন আওড়াতে শুরু করল। তারা ভয় ও আতংকে কাঁপছিল। তাদের কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছিল ভজন।

এই অবস্থা দুর্গের দেয়ালের উপর থেকে প্রহরীরা যখন দেখতে পেল, তাদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। রাজুপুতেরা ভীতু ছিলো না। যুদ্ধ বিগ্রহে তাদের মধ্যে কোন বেশ উৎসাহী ছিল। কিন্তু এতো বিপুল সংখ্যক মানুষের মরদেহ তাদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করল। তারা এটিকে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে অনুমান করল।

যে সব পুরোহিত নদী থেকে উঠে এসেছিল, তারা মন্দিরে এসে ঘণ্টা বাজাতে শুরু করল। মন্দিরের বিশেষ ঘণ্টার আওয়াজ শহরে আতংক ছড়িয়ে দিল। রাজা রায়চন্দ্রের কাছে যখন খবর পৌছালো, তিনি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্যে দ্রুত দুর্গ প্রাচীরে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাজার সাথে তার একান্ত নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও দরবারী লোকজনও দুর্গ প্রাচীরে সমবেত হলো।

অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রাজা তার নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও দরবারীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমরা কি জানো এসব মরদেহ কোত্থেকে এসেছে?

এসব মরদেহ মথুরা ও মহাবনের অধিবাসীদের। তোমরা কি শোনানি, মুসলমানরা মথুরা ও মহাবন দখল করে ওখানকার সকল মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছে?

রাজা রায়চন্দ্র দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে দেখতে পেলেন, লোকজন নদীতে লাশের সারি দেখে আতংকিত হয়ে দিক বিদিক দৌড়ে পালাচ্ছে।

আতংকিত মানুষদের দেখে রাজা রায়চন্দ্র তার সঙ্গীদের বললেন, দেখো, কাপুরুষদের কাণ্ড! নদীতে ক'টা মরদেহ দেখে ভয়ে নদী ছেড়ে পালাচ্ছে। এরা জানে না, এমন কাপুরুষের পরিচয় দিলে আমাদের সবার মরদেহ এভাবেই নদীতে ভেসে যাবে এবং আমাদের মেয়েরা মুসলমানদের বাঁদী দাসীতে পরিণত হবে।

দেখতে দেখতে মন্দিরে ঘণ্টা, শিংগার ফুৎকার ও ঢাকঢোলের আওয়াজ আরো অত্যুঙ্গে উঠলো। আতংকিত মানুষেরা ঘরে বাইরে সর্বত্র 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' ধ্বনি বলে চেচাতে লাগলো। ভীত সন্ত্রস্থ মহিলারা ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। শহরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো দ্রুত সংক্রামক এক আতংক। অবস্থা দেখে রায়চন্দ্রের নিজের চেহারাও কালো হয়ে গেল। এক পর্যায়ে রাজা বলতে বাধ্য হলেন,

'বন্ধ কর এসব বাদ্য-বাজনা ও ঘণ্টা বাজানো! কি সব মাতম শুরু করেছো? রাজপুতেরা কার লাশ দেখে এমন মাতম শুরু করেছে? মন্দিরের পুরোহিতদের ডেকে আমার কাছে নিয়ে এসো। প্রহরীদের নির্দেশ দিলেন রায়চন্দ্র।

নির্দেশ শুনে রায়চন্দ্রের সৈন্যরা দৌড়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে সব ধরনের ঘণ্টা ও ঢাকঢোলের বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। শহরে নেমে এলো নীরবতা।

দুর্গ প্রাচীর থেকে রাজা রায়চন্দ্র নীচে নেমে জনসাধারণের সাক্ষাতের জন্যে সংরক্ষিত তার দরবারে গিয়ে বসলেন।

কিছুক্ষণ পর রাজদরবারের দু'জন পুরোহিত এবং তাদের সঙ্গে আরো একজনকে রাজার সম্মুখে হাজির করা হলো। তৃতীয় ব্যক্তির কাপড় চোপড়সহ

পুরো শরীর ছিল জবজবে ভেজা এবং তার অবস্থা ছিল একেবারে বিধ্বস্ত। রায়চন্দ্রকে জানানো হলো, এই লোকটিকে নদী থেকে জীবন্ত উদ্ধার করা হয়েছে। সে এক প্রস্ত কাঠ খণ্ডকে আঁকড়ে ধরে ভেসে আসছিল। রায়চন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, এই লোক কোথাকার? কোত্থেকে এসেছে সে?

লোকটি ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, এসব মরদেহ মহাবনের সৈন্যদের। আমিও মহাবনের সেনাবাহিনীর সদস্য। আমাদেরকে গোয়েন্দারা খবর দিয়েছিল, 'মুসলিম সৈন্যরা একের পর এক দুর্গ জয় করে আমাদের দিকে আসছে এবং তাদের গন্তব্য মথুরার দিকে।'

মহারাজা আপনি জানেন, মহাবন কী ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ এবং কতো দূর পর্যন্ত জঙ্গল বিস্তৃত। আমাদের মহারাজা কুয়ালচন্দ্র সকল সৈন্যদেরকে সারা জঙ্গল জুড়ে ছড়িয়ে দিলেন এবং তীরন্দাজদেরকে গাছে চড়িয়ে দিলেন। হস্তি বাহিনীকে জঙ্গলের একপাশে দাড় করিয়ে দিলেন। যাতে নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে মুসলিম সৈন্যদের পিষে মারার জন্য অগ্রসর হতে পারে। কারণ এই জঙ্গল হয়েই মুসলমানদের অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল।

এমনই ছিল আমাদের রণপ্রস্তুতি; কিন্তু কি করে কি ঘটে গেল এর পরের ঘটনা আমি আপনাকে কিছুই বলতে পারবো না।

হঠাৎ এক সময় জঙ্গলের দিকে মুসলমানদের কিছু সংখ্যক সৈন্যের উপস্থিতি দেখা গেল। আমাদের সৈন্যরা সামান্য সংখ্যক মুসলিম সৈন্য দেখে উত্তেজনায় চিৎকার শুরু করে দিল, 'একজনকেও জীবিত ফেরত যেতে দেবো না; সবাই ঘিরে ফেলো। এদেরকে জীবন্ত ধরে নিয়ে মথুরার মন্দিরের সামনে দাহ করা হবে'; ইত্যাদি বলে আমাদের সেনারা তুমুল চিৎকার শুরু করল।

কিন্তু দেখতে দেখতে অল্প সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। তিন দিক থেকেই ঝড়ের মতো ধেয়ে আসলো মুসলিম বাহিনী। তিন দিক থেকেই গোটা জঙ্গলকে ঘিরে ফেলল। যে হস্তিবাহিনীর হাতিগুলোকে মুসলমানদের পিষে মারার জন্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, এগুলো আর্তচিৎকার করে দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করল। আমাদের যে সব সৈন্য গাছে চড়ে বসেছিল মুসলিম তীরন্দাজদের তীরবিদ্ধ হয়ে এরা নীচে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। এক পর্যায়ে আমাদের সৈন্যরা পালাতে শুরু করল। আর মুসলিম

সৈন্যরা আমাদের পিছু ধাওয়া শুরু করল। ওরা গোটা জঙ্গল শত্রুমুক্ত করে অগ্রসর হচ্ছিল। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা জঙ্গলের সকল বৃক্ষরাজি সমূলে উপড়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

পলায়নপর সৈন্যরা ছিল তিন দিক দিয়ে বেষ্টিত। ডানে বামে এবং সামনের দিকে বেষ্টন করে আসছিল মুসলিম বাহিনী। আমাদের সৈন্যদের পক্ষে পিছনে সরে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কিন্তু জঙ্গলের পিছন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে যমুনা নদী। উপায়ন্তর না দেখে জীবন বাঁচাতে আমাদের সৈন্যরা দলে দলে নদীতে ঝাপিয়ে পড়তে শুরু করল। অক্ষত আহত সকল সৈন্যই যমুনা নদীতে ঝাপিয়ে পড়ল। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হলো না। মুসলমান তীরন্দাজরা নদীর তীর থেকে সাতরানো সৈন্যদের উপর তীর নিক্ষেপ শুরু করল আর তীর বিদ্ধ হয়ে আমাদের সৈন্যরা নদীতে ডুবতে থাকলো

মুসলিম সৈন্যরা আমাদের একজন যোদ্ধাকেও সাতরে ওপাড়ে উঠতে দেয়নি। যারা জীবন বাঁচাতে লম্বা ডুব দিয়েছিল। তাদের কাউকেই আর ভাসতে দেখা যায়নি। আমি একটি ভাসমান কাঠ মাথার উপর দিয়ে নিজেকে কোন মতে আড়াল করে ভাসতে ভাসতে এ পর্যন্ত এসেছি। এখানে এসে আমি তীরে পৌঁছার চেষ্টা করি। এরপর মহাবনে কি ঘটেছে আমি বলতে পারবো না মহারাজ!

তুমি বলতে না পারলেও আমি বলতে পারি। আমার কাছে শোন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন রাজা রায়চন্দ্র। তোমাদের রাজা কুয়ালচন্দ্র তার স্ত্রী সন্তানসহ আত্মহত্যা করেছেন। তার সেনাবাহিনীর সকল খ্যাতি মুসলমানরা কব্জা করে নিয়েছে এবং গযনীর সুলতান মাহমূদ মহাবনের সকল মন্দির থেকে দেবদেবীদের প্রতিমা অপসারণ করে গুড়িয়ে দিয়েছে। ওখানকার লোকেরা এখন মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনী নয়, আযান শুনতে পাচ্ছে।

হরে রাম, হরে রাম, সেখানে উপস্থিত দুই পুরোহিতের কণ্ঠ চিড়ে বেরিয়ে এলো। প্রধান পুরোহিত বললো, এ সব নাচ্চার লোকদের উপর ভগবান এমন গজব ফেলবেন যে, এদের মৃতদেহ শিয়াল শকুনে কাড়াকাড়ি করে খাবে। কৃষ্ণবাসুদেবের গযব থেকে এদের শিশু সন্তানেরাও রক্ষা পাবে না।

মহারাজ! এ মুহূর্তে হরিহরি মহাদেব খুব মূল্যবান ত্যাগ চাচ্ছেন। দেবতার গযব থেকে বাঁচতে হলে আপনাকে দেবীর চরণে একজন কুমারী বলিদান করতে হবে। আমি আপনাকে হিসাব করে বলে দেবো, আপনাকে আর কি কি করতে হবে। আকাশের তারকাদের গতিপথ বদলে গেছে। আমি এখনই আপনাকে বলে দিচ্ছি। এখন পূর্ণিমা চলছে। সামনে অমাবশ্যা। সামনের সময়টা খুবই খারাপ। এখন থেকেই বিশেষ পূজাপার্বন শুরু করতে হবে। আমি আপনার ভাগ্য গুণে দেখব। ক্ষতিকর কিছু থাকলে সেটিকে সরানোর ব্যবস্থা করবো।

মহারাজ! দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে বিলম্ব হলে বলিদানে কালক্ষেপণ করলে দেবীরা রুষ্ট হয়ে মুসলিম সন্তান জন্মাদান করতে শুরু করবেন। আমাদের দেবদেবীদের কোলকে ম্লেচের সন্তান ধারণ থেকে পবিত্র রাখার জন্যে আমাদের মহাদেবের চরনে একাধিক কুমারী বলি দিতে হবে।

পুরোহিতের কথায় রাজা রায়চন্দ্রের চেহারা থমথমে হয়ে উঠলো। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল পুরোহিতের কথায় তিনি শুধু বিরক্তিবোধই করছেন না, রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। ক্ষোভে উত্তেজনায় তার দীর্ঘ গোঁফ কাঁপছিল। তিনি কঠোর দৃষ্টিতে পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে পুরোহিতকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

"থামুন! আপনি কি এটা বুঝাতে চান সুলতান মাহমূদের সাথে যুদ্ধের ফায়সালা মন্দিরে হবে? কুমারী বলি দিলে কি হবে? আপনি এদেরকে ক'দিন আপনার কাছে রাখবেন এরপর বলি দিয়ে দেবেন? তাতে কি যুদ্ধ জয় হবে? আপনি কেন বলেন না, এখানকার প্রতিটি মানুষকে লড়াই করতে হবে।

ছি! ছি! মহারাজ! পুরোহিত দু'হাতে কান ধরে বললো, একথায় আপনি ধর্মের অবমাননা করছেন! এটিতো ব্রাহ্মণদের দুর্গ। ব্রাহ্মণরা তো ভগবানের সন্তান। আমরা যা জানি, আপনি তা জানেন না। আপনি আকাশের নক্ষত্রের গতিপথ বদলাতে পারবেন না। বলিদান আপনাকে করতেই হবে।

বলিদান! বলিদান! রাগ উপচানো কণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন রাজা! বলি শুধু দু'তিন জন কুমারীর হবে না, এখানকার ছোট বড় প্রতিটি মানুষই রক্ত দেবে। রাজপুতদের প্রতিটি কুমারীই জীবন বিলিয়ে দেবে।

মনে রাখবেন পণ্ডিতজী! এই দুর্গকে লোকেরা ব্রাহ্মণদের দুর্গ বলে। এটি কিন্তু রাজপুতদের কেল্লা। রাজপুতেরা শত্রুর মোকাবেলায় একটি ভাষাই বুঝে, হয় শত্রুর মৃত্যু নয়তো নিজের আত্মদান। দরকার হলে রাজপুতেরা বিজয়ের জন্যে ধর্মকেও বিসজর্ন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

মহারাজ! প্রজাদের উপর একটু রহম করুন। বললো পুরোহিত। আমি যে কথা বলছি তা মেনে নিন। ধর্মকে বিসর্জন দেয়ার কথা আর মুখে আনবেন না।

আমাদের পায়ে আর ধর্মের শিকল দিবেন না, পণ্ডিতজী! রাজধানী বেহাত হয়ে যাচ্ছে, লোকজন ক্ষুধা পিপাসায় মারা যাচ্ছে। আমাদের হাতে গড়া এই জীবন সংসার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অথচ আপনাদের মতো ধর্মীয় নেতৃবর্গ আপনাদের ঢোলই বাজাচ্ছেন। কারণ, আপনাদের কখনো রনাঙ্গনে গিয়ে শত্রুর মুখোমুখি লড়াই করতে হয় না। মন্দিরে বসে বসে আপনাদের রসনা তৃপ্তিতে কোন বেঘাত ঘটে না, আর আপনাদেরকে মিষ্টি মণ্ডা খাইয়ে দিতে এবং শরীর মর্দনের জন্যে কুমারী তরুণীরও অভাব হয় না।

মহারাজ! মথুরার ধবংসযজ্ঞের খবর শুনে আর নদীতে ভাসমান বিপুল মরদেহের সারি দেখে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো পুরোহিত। আপনি বুঝতে পারছেন না, আপনি আমাকেই অসম্মান করছেন না, আপনার নিজের ধর্মের অবমাননা করছেন।

কোন ধর্মের কথা বলছেন আপনি? পণ্ডিত মহারাজ! আপনি কি সেই ধর্মের কথা বলছেন, যে ধর্মকে লাথি মেরে বুলন্দ শহরের রাজাসহ দশ হাজার হিন্দু মুসলমান হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি মহারাজ! তারা তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য ধর্ম ত্যাগ করেছে। বললো পুরোহিত। ওরা সবাই ছিল কাপুরুষ। মুসলমানদের তরবারীর জোর দেখে ওদের হাতে গ্রেফতার নয়তো নিহত হওয়ার ভয়ে এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে।

না, আপনার কথা ঠিক নয় পণ্ডিত মহাশয়! এরা শুধু আতংক ও কাপুরুষতার জন্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। তারা দেখে নিয়েছে, হিন্দুদের মন্দিরের বিশাল বিশাল দেব-দেবীর মূর্তি এবং ভগবানদের তারা না নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছে, না তাদের কোন পূজারী রাজা প্রজাকে রক্ষা করতে পেরেছে।

রাজা রায়চন্দ্র ও পুরোহিতের বাক-বিতণ্ডার সময় সেখানে রাজার কুমারী বোন শিলা এবং যুবতী কন্যা রাধা উপস্থিত ছিল। দাঁড়ানো ছিল রাজার স্ত্রী রাণী লক্ষ্মী দেবী।

একপর্যায়ে শিলাকুমারী পুরোহিতের উদ্দেশ্যে বললো, পণ্ডিতজী মহারাজ! হিন্দুস্তানের নারীরা কি মন্দিরের অন্ধ প্রকোষ্টে পুরোহিতদের হাতে জীবন বিসর্জন দেয়ার জন্যই দুনিয়াতে এসেছে?

এখন আর কোন কুমারীকে বলিদান করা হবে না। গুরু গম্বীর আওয়াজে বললেন রাণী লক্ষীদেবী। আপনি যদি মনে করে থাকেন, মুসলমানদের এই ধ্বংসাত্মক আক্রমন দেবদেবীদের অভিশাপ। তাহলে এই অভিশাপ আমরা মোকাবেলা করবো।

রাণীর মুখেও রাজার কথার প্রতিধ্বনি শুনে রাগে ক্ষোভে উভয় পুরোহিত বিড় বিড় করতে করতে রাজার সম্মুখ থেকে চলে গেল। রাজা রায়চন্দ্রের বোন শিলা রাজার উদ্দেশ্যে বললো, দাদা! আপনি কি কখনো একথা ভেবেছেন গযনীর সুলতানকে যদি কোনভাবে হত্যা করা যায় তাহলে তার আক্রমণের আশংকা পুরোপুরিই শেষ হয়ে যাবে?

শুধু এটা কেন, আমাদেরকে অনেক কিছুই ভাবতে হচ্ছে শিলা। এই আক্রমণ প্রতিরোধের সম্ভাব্য সব দিকই আমি ভেবেছি। আমরা একটা কঠিন সময় অতিক্রম করছি। মাহমূদকে হত্যা করা সহজ ব্যাপার নয়। তবুও এ বিষয়টি আমি ভেবে দেখবো। সবার আগে আমাদেরকে এখন মহারাজা কন্নৌজের কাছে যেতে হবে। গযনীর সুলতান মথুরায় বসে থাকবে না এবং ওখান থেকেই গযনী ফিরে যাবে না। নিশ্চয়ই সে এদিকেও অভিযান চালাবে।

রাজা রায়চন্দ্র কন্নৌজ রওয়ানা হওয়ার জন্যে তার নিরাপত্তারক্ষীদের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন।

* * *

রাজা রায়চন্দ্র, রাণীলক্ষী রৌ, বোন শিলা এবং কুমারী মেয়ে রাধাকে সঙ্গে নিয়ে তখনই কন্নৌজের পথে রওয়ানা হলেন। রায়চন্দ্রের সাথে তার কতিপয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, উজীর এবং নিরাপত্তারক্ষী। মাত্র সাতাইশ মাইল দূরে কন্নৌজ। সন্ধ্যার আগেই তারা কন্নৌজ পৌঁছে গেলেন।

রাতেই রাজা রায়চন্দ্র সার্বিক অবস্থা নির্য়ে কন্নৌজ মহারাজা রাজ্যপালের সাথে আলোচনা করলেন। মহারাজ রাজ্যপাল তাকে বললেন−

আমরা সামান্য শক্তি নিয়ে উন্মুক্ত ময়দানে মাহমূদের বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করতে পারবো না। মহাবন ও মথুরা থেকে যে সব লোক পালিয়ে এসেছে, তারা জানিয়েছে, উন্মুক্ত ময়দানে গযনী বাহিনীর মোকাবেলা করা অসম্ভব। আমাদের কেল্লাবন্দি হয়ে লড়াই করতে হবে। আমার আশাংকা হচ্ছে, মাহমূদ আপনাকেও অবরোধ করবে। কিন্তু তার মূল দৃষ্টি কন্নৌজের দিকে। সে যদি আপনাকে অবরোধ করে তাহলে পেছন থেকে আমি আক্রমণ চালিয়ে ওদের দুর্বল করে দেয়ার চেষ্টা করবো। আর যদি সে সরাসরি কন্নৌজ অবরোধ করে, তাহলে আমি আপনার কাছে আশা করবো, আপনি ওদের পিছন দিকে আক্রমণ অব্যাহত রাখবেন।

মুনাজের রাজা রায়চন্দ্র নিজেদের ব্যর্থতার জন্যে ক্ষোভে আক্রোশে উত্তপ্ত অবস্থায় ছিলেন। সকল ঐতিহাসিকগণই একবাক্যে একথা লিখেছেন, মুনাজের রাজপুত বংশের বীরত্বগাথা ছিল সে যুগে কিংবদন্তিতুল্য। রাজপুতদের মেয়েরাও পুরুষদের মতো লড়াই করতে জানতো। তারা ছিল খুবই আত্মভিমানী বীরদর্পী। উন্মুক্ত ময়দানে রাজপুতদের কাবু করার ব্যাপারটি সহজসাধ্য ছিল না। ব্রাক্ষণের প্রতি রাজপুতদের কিছুটা উষ্মা ছিল। রাজা রায়চন্দ্র যে ব্রাক্ষণ পুরোহিতদের ধর্মোপদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তা ছিল পুরোহিতদের কাপুরুষতার বিপরীতে বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ।

* * *

রাজা রায়চন্দ্রের বোন শিলা ও কন্যা রাধা উভয়েই ছিল কুমারী এবং সুন্দরী। তাদের রূপ সৌন্দর্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল বহুদূর পর্যন্ত। মহারাজা রাজ্যপালের ছেলে লক্ষণ পাল। কিন্তু রায়চন্দ্র শিলার বিয়ে লাহোরের রাজা

ভীমপালের ছোট ভাই তারালোচনের সাথে ঠিক করে রেখেছিলেন। মাহমূদ গযনীর এবারের ভারত অভিযান না হলে এতো দিনে এই বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে যেতো।

রাতের বেলায় রাজা রায়চন্দ্র এবং মহারাজা রাজ্যপাল রাজপ্রাসাদে যখন মাহমূদ গযনীর আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে পরিকল্পনা আঁটছিলেন এবং তাদের মন্ত্রীবর্গও সামরিক কর্মকর্তারা আক্রমণ প্রতিরোধের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল তখন রাজ্যপালের ছেলে লক্ষণ পাল রাজপ্রাসাদের বাগানের এক অন্ধকার কোনে দাঁড়িয়ে একজনের আগমনের অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণ পর দু'জন নারী অন্ধকার ভেদ করে মূর্তির মতো সে দিকেই অগ্রসর হলো। একটু পথ গিয়ে একজন থেমে অপরজনকে বললো, আপনার জন্যে রাজকুমার অপেক্ষা করছেন। আপনি যান।

অপরজন তার হাতে একটি মুদ্রার থলে দিয়ে বললো, কেউ যেন জানতে না পারে আমি এখানে রাজকুমারের সাথে একান্তে মিলিত হতে এসেছি।

এ ছিল রায়চন্দ্রের বোন শিলা। সে রাজমহলের এক সেবিকাকে বলে কয়ে রাজকুমারের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে নিভৃত্বে এখানে এসেছিলো।

শিলা তার ভাবী লক্ষী ও ভাতিজী রাধার অজান্তে রাজকুমার লক্ষণের সাথে একান্তে মিলিত হতে আসে। তারা সবাই রাজা রায় চন্দ্রের সাথে কন্নৌজে এসেছিল।

শিলাকে আসতে দেখে ধীর পায়ে এগিয়ে এলো লক্ষণ পাল। সে শিলার উদ্দেশে বললো, আমার সংশয় ছিলো তুমি আসবে কি-না? আমি কতবার মুনাজে তোমার কাছে পয়গাম পাঠিয়েছি, কিন্তু তুমি প্রতিবারই আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছো আমাকে তোমার পছন্দ নয়। আচ্ছা, আমার মধ্যে কি এমন ঘাটতি আছে, আমি কি তোমার পতি হওয়ার যোগ্য নই? অবশ্য আমি জানি, মহারাজা ভীমপালের ছোট ভাইয়ের সাথে তোমার বিয়ের কথা চলছে, কিন্তু তুমি তো ইচ্ছা করলে এই কথাবার্তা বন্ধ করে দিতে পারো। তুমি কি তাকেই পছন্দ কর?

লক্ষণ! তুমি সুদর্শন যুবক তাতে সন্দেহ নেই। বিয়ের ব্যাপারে আমার নিজস্ব কোন পছন্দ নেই। তবে এটা বলতে পারি এ মুহূর্তে তোমাকে আমার

মোটেও পছন্দ নয় এবং আমার বিপরীতে তোমাকে যোগ্য পাত্রও আমি মনে করছি না। কারণ, গযনীর মুসলমানরা ঝড়ের মতো ধেয়ে আসছে। মথুরা ও মহাবন ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি হাজার হাজার মৃতদেহ নদীতে ভেসে আসতে দেখেছি। মথুরার মন্দিরগুলোতে এখন মুসলমানরা আযান দিচ্ছে। গযনীর সৈন্যরা শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেবের স্মৃতি নিয়ে গেছে। বুলন্দ শহরের দশ হাজার হিন্দু ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। এই সময়ে তোমার মতো রাজকুমার আমার মতো একটি নগণ্য মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে পেরেশান হয়ে গেছো। তোমার মধ্যে কি একটুও আত্মমর্যাদাবোধ নেই? তুমি কি জান না মুসলমানরা এখন মুনাজ ও কন্নৌজ দখল করার প্রস্তুতি নিচ্ছে?

আমি সবই জানি। আমি এসব ব্যাপারে বেখবর নই। কিন্তু তোমার প্রেম আমাকে পাগল করে তুলেছে। আমি যে দিন থেকে জানতে পেরেছি, ইচ্ছা করলেই তুমি বিয়ের সিদ্ধান্ত বদল করতে পারো, সে দিন থেকেই তোমাকে পাওয়ার জন্যে আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বললো রাজকুমার লক্ষণ পাল।

কারো প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। মহারাজা ভীমপালের ভাইয়ের প্রতিও আমার কোন টান নেই, তোমার প্রতিও আমার কোন আকর্ষণ নেই। যার সাথেই আমার বিয়ে হবে আমি তাকেই আমার সবকিছু ঢেলে দেবো।

লক্ষণ পাল ....! আমি ব্যাপারটা ভালো ভাবেই বুঝি, আমার প্রতি আসলে তোমার কোন ভালবাসা নেই। তুমি আমার রূপ সৌন্দর্যকে ভোগ করতে চাও। কিছু দিন পর যখন আমার রূপ সৌন্দর্যে ভাটা পড়বে, তখন আমাকে দূরে ফেলে তুমি অপর কোন সুন্দরীকে ঘরে তুলবে। তোমার বাবাও বৃদ্ধ বয়সে আমার মতো এক তরুণীকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সেই ভালোবাসার চম্পারাণী এখন কোথায়? গযনীর এক গোয়েন্দাকে নিয়ে পালাতে গিয়ে মারা পড়েছে। তুমি তো তোমার বাবার পথেই চলবে। অযথা আমার সাথে প্রেমের অভিনয় করছো কেন?

"তাই যদি মনে করে থাকো, তাহলে আমার খবরে তুমি এখানে এসেছো কেন? জিজ্ঞেস করলো লক্ষণপাল।

আমি এসেছি একটি শর্ত নিয়ে। এই শর্ত যদি পূরণ করতে পারো তাহলে আমি তোমার ঘরের বধু হবো। তখন যদি আমার ভাই তোমার কাছে আমাকে বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায় তবুও আমি তোমার কাছে চলে আসবো।

তাই নাকি? বলো কি তোমার শর্ত? যাই বলবে তাই করে দেখিয়ে দেবো।'

"গযনীর সুলতানকে মথুরায় হত্যা করতে হবে। তুমি কি তা পারবে?"

"মথুরাতে কেন? তাকে আমি যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করবো। তার মাথা কেটে এনে তোমার পায়ে লুটিয়ে দিবো।'

'লক্ষণ! ভুলে যেয়ো না, তুমি মুনাজের এক রাজপুত মেয়ের সাথে কথা বলছো। আমাকে দাদা বলেছেন, মথুরার মন্দিরে ভারতবর্ষের সকল রাজা মহারাজা বাসুদেবের মূর্তির সামনে শপথ করেছিলেন, মাহমূদের দ্বিখণ্ডিত মাথা দেবমূর্তির পায়ে এনে ফেলে দেবে। মাহমূদের রক্তে কৃষ্ণ মূর্তিকে স্নান করাবে। কিন্তু কোথায় গেলো সেই বীরবাহাদুর রাজা মহারাজাদের শপথ! মুসলমানদের আক্রমনের মুখে সবাই শিয়ালের মতো পালিয়ে গেছে। আর রাজা হরিদত্ত তার তরবারী মাহমূদের পায়ের নীচে রেখে দিয়ে দশ হাজার প্রজাকে নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। আর আমাদের পুরোহিতরা যে মাটির উপর কৃষ্ণমূর্তিকে বসিয়ে ছিলো সেই কৃষ্ণমূর্তির পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত ওরা সরিয়ে ফেলেছে।

এই মুসলমানরা সব লুটেরা। এরা মন্দিরগুলো থেকে সোনা লুটতে চায়, এ জন্য সব সময় মন্দির ধ্বংস করে' বললো লক্ষণ।

মাথা ঠিক করে কথা বলো লক্ষণ! বললো শিলা। ভারত মাতার সম্মান রক্ষা করতে পারে একমাত্র রাজপুতেরা। আমি সেই রাজপুতদেরই মেয়ে। যে ব্যক্তি আমার পারিবারিক শিক্ষক ছিলেন, তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী পণ্ডিত। আমি যখন প্রথম মুসলমানদের আক্রমণের কথা শুনলাম, তখন একদিন উস্তাদজীকে বললাম, লোকেরা বলে গযনীর মুসলমানরা লুটেরা। তারা মন্দিরগুলোর সোনাদানা লুট করার জন্যে বারবার ভারতে আক্রমণ চালায়। মুসলমানদের মথুরা দখলের খবর শোনার পর যখন তাকে বললাম, মুসলমানরা কি শুধু লুটতরাজ করতেই এসেছে? না কি তারা আমাদের এলাকাগুলো দখল করে নিতে চায়? তিনি আমাকে বললেন–

লোকেরা ভুল বলেছে। মাহমূদ গযনী লুটেরা নয়। সে আমাদের ধর্ম ধ্বংস করে তার ধর্ম ছড়িয়ে দিতে এসেছে। তোমার মনে রাখতে হবে লুটেরাদের কোন ধর্মজ্ঞান থাকে না। মাহমূদ যদি ভারতের ধন-সম্পদ হাতিয়ে নিতে চাইতো তাহলে রাজা হরিদত্তকে দলবলসহ ইসলামে দীক্ষা দেয়ার কোন প্রয়োজন হতো না।

আমি তাকে আরো জিজ্ঞেস করলাম, মুসলিম নারীরাও কি রাজপুত নারীদের মতো সাহসী? তিনি বললেন, নিজ ভূমি থেকে এতো দূরে এসে লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে নেয় যেসব যুবক, তাদের মায়েরা সাহসী না হয়ে পারে না। নিশ্চয়ই তারা সাহসী। এই দুঃসাহসী মুসলমান মায়েরা তাদের ছেলেদেরকে যুদ্ধে পাঠিয়ে গর্ববোধ করে।

লক্ষণ! তুমি যাকে লুটেরা বলে উড়িয়ে দিচ্ছো, সে কোন সাধারণ লোক নয়। আমি নিজে তার মোকাবেলা করতে চাই, আমি দেশবাসীকে জানিয়ে দিতে চাই, রাজপুত মেয়েরাও কোন কোন পুরুষের চেয়ে বেশী সাহসী। এ মুহূর্তে আমার দরকার তোমার সহযোগিতা। তুমি যদি আমাকে সহযোগিতা না করো, তাহলে সেনাবাহিনীর যে কোন সিপাহীকে আমি সাথে নিয়ে নেবো এবং মাহমূদ গযনীকে হত্যা করবো। এরপর যদি আমি জীবিত থাকি, তাহলে সেই সিপাহীই হবে আমার জীবন সঙ্গী ....। এখন বলো, তুমি কি মাহমূদকে হত্যার অভিযানে আমাকে সঙ্গ দেবে?

হ্যাঁ, তোমাকে পাওয়ার জন্যে আমি তোমার সব শর্ত মানতে প্রস্তুত। বললো লক্ষণপাল।

ভুল বলেছো। আমার জন্যে নয়, বলো, তোমার ধর্ম ও দেশের খাতিরে তুমি আমার সঙ্গ দেবে। বললো শিলা। একাজে যদি পিছ পা হও, তা হলে আমি আমার ভাতিজি রাধা তোমার বোন এমনকি কন্নৌজ ও মুনাজের প্রতিটি তরুণী মুসলমানদের ঘরে থাকবে এবং মুসলমানদের সন্তান জন্ম দেবে।

ঠিক আছে শিলা! আমি মাহমূদকে হত্যা করেই তোমার সামনে দাঁড়াবো।

মথুরায় হত্যা করতে হবে। বললো শিলা। কারণ ওখানেই যদি তাকে হত্যা করা যায়, তাহলে মুসলমানদের অগ্রাভিযান থেমে যাবে, তার সেনাবাহিনী নের্তৃত্বহীন হয়ে পড়বে এবং হতোদ্যম হয়ে গযনী ফিরে যাবে।

লক্ষণ! তুমি একজন অভিজাত ব্রাক্ষণ। আর ব্রাক্ষণদের ধর্মের প্রতি দায়িত্ব অনেক বেশী। আমার দেহে রাজপুতদের রক্ত প্রবাহিত। আমি কোন ভনিতার আশ্রয় না নিয়ে পরিষ্কার তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, তুমি আমাকে যতোটা ভালোবাসো, আমি তোমাকে ততোটা ভালোবাসি না। কিন্তু আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তুমি যদি মাহমূদকে হত্যা করতে পারো, তাহলে সারাজীবন তোমার দাসী হয়ে থাকবো।

এ কাজ করতে গিয়ে যদি আমি মৃত্যুবরণ করি? তাহলে কি করবে? জিজ্ঞেস করলো লক্ষণ।

তাহলে, তোমার জ্বলন্ত চিায় নিজেকে জ্বালিয়ে দেবো, বললো শিলা।

মাহমূদকে হত্যার দৃঢ় সংকল্পে প্রতীজ্ঞাবদ্ধ হয়ে শিলা ও লক্ষণ রাজ দরবারের দিকে অগ্রসর হলো। রাজা রাজ্যপাল মুনাজের রাজা রায়চন্দ্র ও উভয় রাজ্যের সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিকল্পনা করছিলেন বলে দারোয়ান তাদের প্রবেশে বাধা দিলো। কিন্তু বাধা অগ্রাহ্য করে শিলাকে নিয়ে দরবার কক্ষে প্রবেশ করলো লক্ষণপাল। রাজ্যপাল এই অবাঞ্চিত প্রবেশে উষ্মা প্রকাশ করে তাদের বেরিয়ে যেতে বললেন।

আপনারা যে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করছেন, আমরা সে কাজেই এসেছি। বললো লক্ষণ। অনধিকার প্রবেশের জন্যে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনারা যে বিষয়টিই ভেবে থাকুন না কেন, এসব চিন্তা রেখে একটু আমাদের কথা শুনুন। আপনারা কি ভেবেছেন, মাহমূদকে মাথুরাতেই হত্যা করা যেতে পারে? তাকে হত্যা করতে পারলে তার সকল সৈন্যকেই বন্দী করা সম্ভম।

এক আনাড়ী লক্ষণের কণ্ঠে এমন আজব কথা শুনে দরবারে উপবিষ্ট লোকেরা একে অন্যের দিকে দৃষ্টি ফেরালো। লক্ষণের কথা শুনে রাজ্যপালের ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা ফুঠে উঠলো। তিনি বললেন, না, বেটা, এ ব্যাপারটি নিয়ে আমরা কোন চিন্তা-ভাবনা করিনি। বললেন, রাজা রায়চন্দ্র একাজ করার জন্যে যেমন দু সাহসী লোক দরকার তেমনি তাকে বুদ্ধিমান ও দূরদর্শীও হতে হবে।"

এর পাশাপাশি তাকে এমন ব্যক্তিত্বও হতে হবে যে নিজের জাত শত্রু মনে করবে মাহমূদকে। বললো লক্ষণ। বেতনভোগী হত্যাকারী দিয়ে এ কাজ

করানো সম্ভব নয়। বেতনভোগী কর্মচারীকে একাজে পাঠালে দেখা যাবে সে হত্যা করতে গিয়ে ওদের টোপ গিলে টাকা-পয়সা নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ওদের চর হিসেবে থেকে যাবে। একাজ কোন রাজ কুমারের পক্ষেই করা সম্ভব।'

"কে আছে এমন রাজ কুমার? জিজ্ঞাসু কণ্ঠে জানতে চাইলেন রাজ্যপাল।

"সেই রাজ কুমার আপনার সামনেই দাঁড়ানো, বললো লক্ষণ। আমি সেই রাজকুমার ...... লক্ষণপাল।

রাজা রায়চন্দ্র লক্ষণের কাঁধে হাত রেখে বললেন, সাব্বাশ লক্ষণপাল! তুমি তোমার বাবার মাথাকে আরো উঁচু করে দিয়েছো। আজ যদি আমার কোন যুবক ছেলে থাকতো তাহলে আমিও তাকে তোমার সঙ্গে পাঠাতাম।

লক্ষণ! সত্যিই যদি তুমি একাজ করতে পারতে তাহলে গযনীর এই কালসাপও মরতো, আমার সেনাবাহিনীর লোকগুলোর প্রাণ দিতে হতো না।'

আপনি কি এ কাজটিকে মামুলী মনে করছেন? মহারাজ! বিস্মিত কণ্ঠে বললো এক বয়োজ্যেষ্ঠ সেনাপতি। আপনি কি ভাবছেন, রাজকুমার এখানে যেমন নির্বিঘ্নে দাঁড়িয়ে আছে এমন নির্বিঘ্নেই সে মথুরা যাবে আর মাহমূদের বুকে খঞ্জর বসিয়ে দিয়ে নিরাপদে চলে আসবে?

না মোটেও সহজ নয় এ কাজ, তা আমি জানি। কিন্তু ভারতমাতার জন্যে আমি জীবন বিলিয়ে দেয়ার শপথ নিয়েছি। বললো লক্ষণ।

তুমি যেমন শপথ করেছো, মাহমূদও শপথ করেছে ভারতের কোন মন্দির ও রাজধানী সে অক্ষত রাখবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে মাহমূদের হাত খুবই লম্বা। আমাদের কোন কথা কোন সিদ্ধান্তই তার কাছে গোপন থাকে না। আপনারা সবাই জানেন, যে নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে আমরা সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য ও যোগ্য মনে করতাম, রাজমহলের যে সব বিষয় রাজকুমাররা পর্যন্ত জানতে পারতো না, সে তার সব কিছুই জানতো। অথচ সে ছিল গযনী সুলতানের একজন পাকা গোয়েন্দা। বললেন রাজ্যপাল।'

আমি তা জানি। তবে এর পরও আমি তাকে হত্যা করতে যাবো।' দৃঢ়তার সাথে বললো লক্ষণ। অবশ্য এ ধরনের অভিযানের কোন অভিজ্ঞতা ও

ধারণা আমার নেই। আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা আমাকে বলে দিবেন, এই অভিযান আমাকে কি ভাবে চালাতে হবে? বয়স্ক সেনাপতির উদ্দেশ্য বললো লক্ষণ।

লক্ষণের সংকল্প ও দৃঢ়তা দেখে রাজা রাজ্যপাল প্রধান সেনাপতি ও উজিরকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেনো এই অভিযানের জন্যে লক্ষণকে প্রশিক্ষণ দেয় এবং কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে কণ্নৌজের রাজা বললেন, ধরিত্রির সেবা ও ধর্মের কল্যাণের জন্য আমি ভগবানের নামে আমার পুত্রকে উৎসর্গ করছি।'

পরদিন রাজার নিযুক্ত দু'জন অভিজ্ঞ সেনা কর্মকর্তা লক্ষণকে তার অভিযানের জন্যে প্রস্তুত করার জন্যে উদ্যোগ নিলো। প্রশিক্ষকদের একজক লক্ষণের উদ্দেশ্যে বললো-

লক্ষণ! তুমি একজন ডাকাত ও লুটেরার সাথে মোকাবেলা করতে যাচ্ছো, তোমার মাথা থেকে এই চিন্তা বের করে দাও। তোমাদের বুঝতে হবে মাহমূদ সত্যিকার অর্থেই একজন লড়াকু যোদ্ধা। তার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধের একটি ভিন্ন অর্থ আছে। মাহমূদ শুধু যুদ্ধ করতে আসেনি, সাথে নিয়ে এসেছে একটি আদর্শ। তাকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করা সহজ ব্যাপার নয়। আমাদের রাজা মহারাজারা তার দূরদর্শিতার ধারে কাছেও যেতে পারেননি। সেই সাথে তার মুখোমুখি হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলবে, এমনটিও কেউ কল্পনা করেনি।

তোমার একটি কথা মনে রাখতে হবে, একজন পুরুষ যতোই ধর্মানুরাগী হোক না কেন, আসলে সে তো একজন মানুষ। মানুষ হওয়ার কারণে পুরুষের মধ্যে স্বভাবতই থাকে নারীর প্রতি দুর্বলতা। তদ্রূপ মানুষ হিসেবে একজন নারীর জন্যে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা পুরুষ। তোমার লক্ষ্য অর্জনে তুমি সাধু সন্নাসী কিংবা উপজাতির বেশ ধারণ করে তুমি মথুরা যাবে।

তোমরা বহুরূপী বেশ ধারণের অর্থ হবে তুমি বনে জঙ্গলে বসবাসকারী কোন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সর্দার।

তুমি যে গোত্রের গোত্রপতির বেশ ধারণ করবে, সেই গেত্রের লোক সংখ্যা পনেরো হাজার। তুমি সেখানে গিয়ে বলবে, কন্নৌজের মহারাজা তোমার গোত্রের সকল মানুষকে গযনী সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে নিজের পক্ষে নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সর্দার হিসেবে তুমি গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই

করতে রাজি নও। গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই না করে তুমি বরং রাজা হরিদত্তের মতো গোত্রের সকল লোকজনকে নিয়ে মুসলমান হতে চাও।

লক্ষণ! তোমাকে মনে রাখতে হবে, সরাসরি সুলতান মাহমূদ পর্যন্ত যেতে তোমাকে তার লোকেরা দেবে না। তোমাকে বলতে হবে, সুলতানের সাথে তোমার দু'টি একান্ত কথা আছে যা তুমি তার সাথে একান্তে বলতে চাও। এর পরও যদি তারা তোমাকে সুলতানের কাছে নিয়ে না যায়, তখন তুমি তাদের বলবে, গুপ্ত ঘাতকের হাতে সুলতানের নিহত হওয়ার আশংকা আছে। একথা বললে আশা করি, তারা তোমাকে সুলতানের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ করে দেবে।

আপনি বলে ছিলেন নারীর দুর্বলতার কথা' একথা বলে আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন? প্রশিক্ষককে জিজ্ঞেস করলো লক্ষণ।

"তোমার সাথে অন্তত দু'জন সুন্দরী নারী থাকা দরকার। তাদেরকে তুমি নিজের স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেবে রহস্যজনক কণ্ঠে জবাব দিলো প্রশিক্ষক। "তোমার সঙ্গীনী নারীরা যদি বুদ্ধিমতী হয় তাহলে তারা সুলতানের সেনা অফিসারদেরকে একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে শত্রুতে পরিণত করতে পারবে। আমি তো মনে করি, সুলতান নিজেও সুন্দরী নারীদের দেখলে বিমুগ্ধ হয়ে যেতে পারে। সুলতান নিজে যদি তোমার স্ত্রী পরিচয়দানকারী নারীদের নিজের কাছে রাখার আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে কৌশলে তাতে তুমি সম্মতি দেবে তোমার সঙ্গীনীদের কাছে বিষ রাখতে হবে যাতে সুযোগ মতো তারা এই বিষ পানি বা শরবতে মিশিয়ে দিতে পারে। আমরা তোমাকে এমন দু'জন সুন্দরী তরুণী দিয়ে দেবো। তুমি তাদেরকে উপজাতীয় পোষাক পরিয়ে নেবে।

সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক ও প্রবীণ উজির লক্ষণকে তার অভিযান সফল্যের জন্য নানা ধরনের কূটকৌশল শিখিয়ে দিতে শুরু করলো। তারা লক্ষণকে বুঝালো কি ভাবে সে সুলতান মাহমূদকে হত্যা করে সেখান থেকে পালিয়ে আসবে।

লক্ষণ তার প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে অভিযানের দীক্ষা নিয়ে যখন শিলার কাছে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলো, তখন শিলা বললো, অন্য কোন নারীর দরকার নেই। আমি তোমার সাথে থাকবো, আর আমার ভাতিজী রাধা থাকবে। শিলা

রাতের বেলায় তার ভাতিজী রাধাকে তার ও লক্ষণের অভিযানের কথা জানিয়ে বললো, এই অভিযানে আমরা তোমাকে সাথে নিতে চাই।

শিলার প্রস্তাবে রাধা মহা উৎসাহে রাজি হয়ে গেলো। এরপর তিনজন মিলে রাজা রায়চন্দ্রের কাছে উপস্থিত হলো।

রাজা রায়চন্দ্র এই তিনজনকে একসাথে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেখে কিছুটা বিস্মিত হলেন।

বাবা, আমাদের এখানে তরুণীদেরকে মন্দিরে নিয়ে বলিদান করা হয়। আপনিই বলুন, এসব বলিদানের দ্বারা আসলে কি কোন উপকার হয় না? আমিও ফিসি যে বলিদান করতে যাচ্ছি, তাতে আপনার অনেক কিছু অর্জন হবে। রাধা তার বাবা রাজা রায়চন্দ্রের উদ্দেশ্যে বললো, আমাদের ছাড়া লক্ষণপালের সাথে যদি অন্য কোন নারী যায়, তাহলে তারা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাকে ধোঁকা দিতে পারে।

রাজা রায়চন্দ্রের বোন শিলা ও তার ভাতিজী রাধার রূপ সৌন্দর্য ছিল গোটা অঞ্চলে আলোচিত বিষয়। তাদের সাহসিকতার বিষয়টি ছিলো সবার মুখে মুখে। ছোট্ট বেলা থেকেই এই দুই তরুণী অসীম সাহসিকতার অনেক পরিচয় দিয়েছে। এরা যখন লক্ষণের সাথে সুলতান মাহমূদকে হত্যার অভিযানে যেতে চাইলো, তখন একথা শুনে কেউ অবাক হলো না। কারণ, এরা ছিলো অত্যন্ত জাত্যাভিমানী। মাহমূদকে হত্যা করার বিষয়টি তারা কর্তব্য মনে করতো। তারা উভয়ে রাজা রায়চন্দ্রকে লক্ষণপালের সাথে অভিযানে যেতে রাজি করিয়ে ফেললো।

অভিযাত্রী তিনজনের জন্যে এমন এমন উপজাতীয় পোষাক তৈরী করা হলো, বাস্তবে এ ধরনের পোষাকধারী কোন উপজাতীয় গোত্রের অস্তিত্ব এতদঞ্চলে ছিলো না। তাদের সাথে যাওয়ার জন্যে এবং তাদের নিরাপত্তা ও সহযোগিতার জন্যে দু'জন অভিজ্ঞ সেনা কর্মকর্তাকেও সহযাত্রী হিসেবে নেয়ার সিদ্ধান্ত হলো।

শিলা ও রাধার জন্য এমন পোষাক তৈরী করা হলো যে পোষাকে তাদের পেট পিঠ, কাঁধ ও হাতের পুরো অংশ বিবস্ত্র থাকে। হাঁটুর নীচ পর্যন্ত সবটুকু পা খোলা থাকে। তাদের পোষাকের সাথে সঙ্গতি রেখে দু'জন সৈনিকের জন্যও

উপজাতীয় পোষাক তৈরী করা হলো। তাদের মাথা সম্পূর্ণ খোলা রাখা হলো। বিশেষভাবে তৈরী এই উপজাতীয় পোশাক পরার পর তাদের রূপ সৌন্দর্য এমনভাবে ফুটে উঠলো যে, কোন পুরুষের পক্ষে তাদের দিক থেকে চোখ ফেরানো মুশকিল।

লক্ষণ পালকেও অর্ধ উলঙ্গ উপজাতীয় পোষাক পরানো হলো। তাকেও উপজাতীয় পোষাকে সুদর্শন যুবক মনে হচ্ছিল। উপজাতীয় সর্দার হিসেবে মাহমূদ গযনবীকে উপহার দেয়ার জন্যে লক্ষণকে দুটি জ্যান্ত হরিণ, দুটি বাঘের চামড়া, দুটি মৃত মানুষের মাথার খুলি এবং একটি স্বর্ণের মূর্তি দেয়া হলো। মূর্তিটির উপরের অংশ ছিল মানুষের মতো এবং নীচের অংশ ছিল ঘোড়ার দেহের মতো। তাকে বলা হলো, এই মূর্তি দেখিয়ে তুমি বলবে, আমাদের গোত্র এই মুর্তিকে পূজা করে। কিন্তু এখন আমি গোত্রের সকল লোকজনকে নিয়ে মুসলমান হতে চাই।

রাতের প্রথম প্রহরে যার যার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে লক্ষণের কাফেলা মাহমূদ হত্যার অভিযানে কন্নৌজ থেকে রওয়ানা হলো। তারা সিদ্ধান্ত নিলো মহাবনের জঙ্গলে গিয়ে তারা যমুনা নদী পার হয়ে মথুরার সীমানায় প্রবেশ করবে। কন্নৌজ থেকে মহাবনের জঙ্গলের দূরত্ব ছিলো প্রায় শত মাইল। তাদের খাবার দাবার সামগ্রী দুটি গাঁধার উপর বহন করা হল। তারা সিদ্ধান্ত নিল, মহাবনের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তারা মথুরা পৌছবে।

সুলতান মাহমূদ তখনো মথুরায় অবস্থান করছেন। মথুরা তার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল। মথুরা ছিল অসংখ্য মন্দিরের শহর। বিজয় লাভের পর সুলতানের নির্দেশে মুসলিম সৈন্যরা মথুরার মন্দিরগুলোকে অগ্নি সংযোগ করছিলো। মথুরার প্রধান মন্দিরের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে মুসলমান সৈন্যরা আযান দিয়ে জামাতে নামায আদায় করতে শুরু করেছিল। মথুরার হিন্দুরা এতোটা আত্মবিস্মৃত ছিলো না যে, তাদের চোখের সামনে তাদের দেবদেবী ও ধর্মের অবমাননা তারা নীরবে সহ্য করে নেবে। দেবদেবী ও মন্দির ধ্বংসের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এর মধ্যেই কতিপয় হিন্দু কয়েকজন মুসলিম সৈন্যকে ধোঁকা দিতে আত্মহত্যা করে ফেললো। কিছু হিন্দু রাতের অন্ধকারে ধ্বংসাত্মক ঘটনাও ঘটালো। হিন্দুদের চক্রান্তের মূলোৎপাটন করতে সুলতান মাহমূদ নির্দেশ

দিলেন যে, এই শহর ধ্বংস করা ছাড়া হিন্দুদের কাবু করা যাবে না। সুলতানের নির্দেশে তাই শহর ধ্বংসের কাজ শুরু হয়ে গেলো। অপর দিকে সুলতান তার সৈন্যদেরকে কন্নৌজের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্যে প্রস্তুত করতে শুরু করলেন।

একদিন দুপুরের দিকে সুলতানের সামনে তার সকল সেনা কর্মকর্তা, সেনাদের সাথে গযনী থেকে আসা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও ইমাম বসা ছিলেন। সুলতান ঘোষণা করলেন–

অচিরেই আমরা কন্নৌজের দিকে অগ্রসর হবো। অভিযানের প্রস্তুতি ও অভিযান সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করার আগেই আপনাদেরকে আমি কয়েকটি কথা বলা জরুরী মনে করছি। সকল সৈন্যকে একত্রিত করে বক্তৃতা করার সুযোগ এখানে নেই। আপনারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থ সেনাদেরকে আমার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পৌঁছে দেবেন। যারা খতীব ও ইমাম আছেন, তারা নামাযের পর আপনাদের মুসল্লীদেরকে আমার কথাগুলো পৌঁছে দেবেন। আপনারা সৈন্যদেরকে বলবেন–

চলমান যুদ্ধ আমার বা কারো কোন ব্যক্তিগত যুদ্ধ নয়। সেনাদেরও এর মধ্যে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ জড়িত নেই। এটা রাজ্য দখলের লড়াইও নয়। নিতান্তই আমাদের এ অভিযান আল্লাহ ও রাসূলের জন্যে নিবেদিত অভিযান। আমরা এখানে কুফরীর সেই অভিশাপ দূর করতে এসেছি, যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন 'ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করো যতক্ষণ পর্যন্ত না এই কুফরীর সন্ত্রাস দূরীভূত হয়ে যায়।'

আমি যদি বারবার হিন্দুস্তানে এসে হিন্দুদের উপর চড়াও না হতাম, তাহলে সব হিন্দু মিলে এতো দিনে গযনী দখল করে কাবা দখলের জন্য অগ্রসর হতে-শুরু করতো। হিন্দুরা ছাড়া ইহুদীরাও বড় আপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। সব কিছু একসঙ্গে তো আর আমরা সামলাতে পারবো না। কিন্তু আমরা চেষ্টা করলে হিন্দুস্তান থেকে কুফরী দূরীভূত করে এটাকে ইসলামের যমীনে রূপান্তরিত করতে পারি এবং আমরা এ লক্ষ্যেই এখানে এসেছি।

রাজত্বের পরিধি বাড়ানোর কোন লিপ্সা আমার নেই। আপনারা দেখেছেন, লাহোরের মহারাজাদের কয়েকবার আমরা পরাজিত করেছি। কিন্তু আমাদের রাজ্যের সীমানা আমরা লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত করিনি। ......

সকল সৈন্যকে এটা বুঝিয়ে দিন, আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে এখানে এসেছি। আমরা এখানে আল্লাহর পয়গাম ও আমাদের ঈমান নিয়ে এসেছি এবং ঈমানকে লালন ও বিকাশ করছি এ জন্য তিনি আমাদের মদদ করছেন। আমার যদি সোনা দানা সহায় সম্পদের লোভ থাকতো, তাহলে বারবার এতো কষ্টকর অভিযানে আসার দরকার হতো না। একবারেই লুটতরাজ করে সোনাদানা কুক্ষিগত করে নিয়ে গিয়ে গযনীতে বসে আরাম আয়েশ করতে পারতাম। কিন্তু আপনারা দেখেছেন, প্রতিবারই আমি হিন্দুস্তানে আসি আমার জীবনের ঝুঁকিকে উপেক্ষা করে। প্রতিবারই আমার মনে হয় আমার পক্ষে আর গযনীতে জীবন্ত ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা প্রতিটি অভিযানেই আমাকে নতুন জীবন দান করেন। এতে আমার মনে হয়, হিন্দুস্তানে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার অভিযান আমরা শুরু করেছি, আল্লাহ হয়তো আমাদের হাতেই এর পূর্ণতা দেবেন।

এ মুহূর্তে আমি জানতে পেরেছি, কন্নৌজে আমাকে যে কোনভাবে হত্যা করার বহু নীল নকশা তৈরী করা হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে যে কোন জায়গায় কিংবা আমার তাঁবুতে আমি নিহত হতে পারি। কিন্তু আল্লাহর প্রতি আমার শতভাগ ভরসা আছে। আমার মন সাক্ষী দিচ্ছে অন্তত হিন্দুস্তানে আমি নিহত হবো না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ইঙ্গিত। .....

আমি আবারো আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, প্রতিটি সৈন্যকে বলে দিন, নফল নামায রোযা থেকে জিহাদ শ্রেয়। আপনারা জানেন, নামায অবস্থায়ও যদি কারো সামনে সাপ এসে যায় তবে নামায ছেড়ে আগে সাপ মেরে ফেলার হুকুম রয়েছে। কেউ যদি মনে করে শুধু নামায রোযা ইবাদত বন্দেগী করে সে আল্লাহকে খুশী করে ফেলবে তবে সে বড় ভ্রান্তিতে রয়েছে। হিন্দুরূপী এ সব বিষধর সাপকে হত্যা করা ছাড়া আপনাদের কারো পক্ষেই আল্লাহকে খুশী করা সম্ভব নয়।

আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে, হিন্দুস্তানের হিন্দুরা যদি নির্বিবাদে রাজত্ব করতে পারে তাহলে এখানকার মুসলমানরা কিছুতেই তাদের ঈমানী অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারবে না। এই দেশ সব সময়ই মুসলমানদের জন্যে বধ্যভূমি হয়ে থাকবে। আপনারা সাধারণ যোদ্ধাদের বুঝিয়ে দেবেন, তোমাদের

আগে এখানে যুদ্ধ করতে এসে যে সব মুসলমান যোদ্ধা শাহাদাত বরণ করেছে যাদের মৃত লাশ পর্যন্ত দেশের মাটিতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তোমাদেরকে তাদের শাহাদাতের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

আমি আপনাদের সতর্ক করতে চাই, হিন্দুস্তান খুবই বিভ্রান্তিকর জায়গা। এখানকার প্রতিটি মানুষ একেকটি জীবন্ত ধোকা। এখানকার মাটি মানুষ, ভূপ্রকৃতি, সব কিছুই যে কোন যোদ্ধাকে যে কোন সময় ধাঁধার মধ্যে ফেলতে পারে। আপনারা এখানকার নারীদের দেখেছেন। এদের রূপ যে কোন যোদ্ধাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। আমাদের সৈন্যরা যাতে এখানকার নারীদের রূপসৌন্দর্যে বিভ্রান্ত না হতে পারে এ ব্যপারে প্রতিটি মুহূর্তে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। নারীর রূপজৌলুসে মত্ত কোন সেনাদল কখনো বিজয় লাভ করতে পারে না। আপনাারা প্রতিটি সৈনিকের কাছে এ বার্তা পৌছে দিন। সিপাহী হোক আর অফিসার হোক যেই আল্লাহর নাফরমানী করবে, আমি সাথে সাথে তাকে আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দিবো। এমনটি হলে পুরস্কারের পরিবর্তে পরকালে তাকে আগুনে জ্বলে পুড়ে ধ্বংস হতে হবে। কেউ কোন নারী কেলেংকারী করলে তার শাস্তি হবে নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড।

ইমাম ও খতীবগণকে বিদায় করে দিয়ে সুলতান মাহমূদ সেনা কমান্ডার ও সেনাপতিদের সামনে মথুরা থেকে কন্নৌজ পর্যন্ত মানচিত্র মেলে ধরে দেখালেন, কোন পথে তাদের যেতে হবে। চূড়ান্ত অভিযানের পরিকল্পনা করার আগেই তিনি তার বিশেষ গোয়েন্দাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিয়ে ছিলেন। গোয়েন্দা তথ্য ছাড়াও তিনি সেনাবাহিনীর কয়েকজন কমান্ডারকে ছদ্মবেশে কন্নৌজ পাঠিয়েছিলেন পথ ও পারিপার্শিক অবস্থা সরে যমীনে দেখে আসার জন্য। সেনা অফিসারদের উদ্দেশ্যে মানচিত্র দেখিয়ে সুলতান বললেন–

আমাদের গমন পথে মুনাজ নামের একটি ছোট্ট রাজ্য রয়েছে। এটি রাজপুতদের আবাসস্থল। রাজপুতেরা খুবই সাহসী ও লড়াকু জাতি। যুদ্ধ বিগ্রহে হিন্দুস্তানের অন্য কোন জনগোষ্ঠী এদের মোকাবেলা করতে পারে না। এদেরকে আগেই বাগে আনতে হবে। নয়তো আমরা যখন কন্নৌজ অবরোধ করবো তখন ওরা আমাদের পেরেশান করে তুলবে। তিনি আরো জানালেন, গোয়েন্দাসূত্র জানিয়েছে, লাহোরের রাজা ভিমপাল ছদ্মবেশে এই এলাকায়

অবস্থান করছে। সে এই অঞ্চলের ছোট্ট বড় রাজা মহারাজাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ভিমপালের ছোট্ট ভাইও তার সাথেই রয়েছে। ভিমপালকে জীবন্ত গ্রেফতার করতে হবে। খবর এসেছে, ভিমপালের সেনাবাহিনীও এদিকে রওয়ানা হতে যাচ্ছে। আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

মথুরা বিজয়ের সপ্তম দিনে সুলতান মাহমূদ কন্নৌজে রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যুদ্ধকালীন সরবরাহ ব্যবস্থা সফল রাখার জন্য তিনি মথুরায় কিছু সৈন্য রাখলেন এবং যারা যুদ্ধে নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শনে আগ্রহী সেই সব উৎসাহী সৈন্যদেরকে অভিযানের প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিলেন।

* * *

এ দিকে রাত পেরিয়ে সকালের সূর্য তখন পূর্বাকাশে উকি দিচ্ছে। ঠিক সেই সময় কন্নৌজের রাজপুত্র লক্ষণ, শিলা, রাধা ও তার সহযোগী দুই সৈনিককে নিয়ে মহাবনের জঙ্গলের পাশে পৌছাল। তাদের প্রত্যেকের গায়ে বিশেষ ভাবে তৈরী উপজাতীয় পোষক। লক্ষণের গায়ে গোত্রপতির বিশেষ ধরনের পোশাক। মহাবনে পৌছাতে পথিমধ্যে তাদের দু'রাত কাটাতে হয়েছে। এই বনের মধ্যেই তৃতীয় রাতটি কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলো তারা।

সময়টা ছিল অগ্রহায়নের শেষ ও পৌষের শুরু। প্রচণ্ড শীত। তারা এসে যে জায়গাটায় থামলো সেই জায়গাটি রাত হয়ে যাওয়ার কারণে ঠিক মতো দেখে নিতে পারেনি। যমুনা নদী এখান থেকে দূর দিয়ে প্রবাহিত হলেও এসে এখানকার বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বাঁক দিয়ে ঘুরে গেছে। জঙ্গলের ভেতরকার নদীটা অনেকটাই ঝিলের মতো। এখানে তেমন স্রোত নেই। নিথর শান্ত পানি। চারদকি ঘনঝোপ ঝাড়। জঙ্গলী পশুদের মধ্যে এখানে জলহস্তিদের বেশী বসবাস। অত্যধিক শীত ও ঠান্ডার প্রকোপ না থাকলে এতোক্ষণে এদেরকে জলহস্তী গ্রাস করে ফেলতো।

এখানে এসে লক্ষণপালের ছোট্ট দলটি রাত যাপনের জন্য একটি যুতসই জায়গা বেছে নিল। এবং সবাই টানা ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করার জন্য বিশ্রাম

নিতে বিছানো করে শুয়ে পড়লো। রাধা শিলা ও লক্ষণপাল কাছাকাছিই বিছানা করল আর তাদের সাথে আসা দুই নিরাপত্তারক্ষী একটু দূরে বিছানা করে শুলে পড়ল।

সকাল বেলায় ওদের ঘুম ভাঙ্গার পর লক্ষণ বললো–

এখানে নদী পাড়াপাড়ের জন্য ভাড়াটে নৌকা পাওয়া যায়। আমাদেরেকে এখনই নদী পাড় হতে হবে। আমি নদীর তীরে গিয়ে দেখি কোন নৌকার মাঝি পাওয়া যায় কি না।

শিলা বললো, আমিও তোমার সাথে যাবে।

তোমাকে সাথে নেয়া ঠিক হবে না।

ঠিক আছে তোমার সাথে যাবো না কিছু দূর গিয়ে জায়গাটা দেখে ফিরে আসবো।

লক্ষণ ও শিলা পাশাপাশি নদীর তীরের উদ্দেশ্যে হাঁটছিলো।

রাতের বেলায় রাতের অন্ধকারে এলাকাটার অবস্থা বোঝা সম্ভব হয়নি।

সময় ৯টা।

গোটা এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ। ঝোপঝাড়, আর গাছ-গাছালীতে ঠাসা গোটা এলাকা। ভোরের আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ায় তারা জায়গাটি ভালোভাবে দেখতে পেল। এলাকাটি বলতে গেলে সমতল জঙ্গল। টিলা পাহাড়ের কোন চিহ্ন তাদের নজরে পড়লো না।

অনেকক্ষণ ধরে শিলা ও লক্ষণ পাশাপাশি হাঁটছে কিন্তু কেউই কোন কথা বলছে না। এক সময় লক্ষণকে থামিয়ে শিলা জিজ্ঞেস করলো–

তুমি নীরব কেন লক্ষণ? অত্যধিক নীরবতা আতংকের লক্ষণ! তুমি কি ভয় পাচ্ছো?

ভয় নয় শিলা! থেমে শিলার আপাদমস্তকের দিকে একবার দৃষ্টি ফিরিয়ে বললো লক্ষণ। আমি একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছি।

কি নিয়ে চিন্তায় পড়েছো?

ভাবছি তুমি এমনিতেই সুন্দর! এর উপর এই উপজাতীয় পোশাকে তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে তা বলে বুঝাতে পারবো না। আমার প্রশিক্ষক

আমাকে বলেছিলেন, মানুষ যদি তার স্বভাবজাত অবস্থায় থাকে তবে বৃদ্ধ হলেও তার স্বাস্থ্য চেহারায় এতটুকু প্রভাব পড়ে না। শরীর সম্পূর্ণ অটুট থাকে। আকর্ষণীয় দেহাবয়ব অক্ষুন্ন থাকে। আমার মন বলছে, আমরা যদি এই বেশে, এই ঘৃণা, হিংসা, যুদ্ধ বিগ্রহের দুনিয়া ছেড়ে এমন জঙ্গলে নিরিবিলি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম!....

আমি কখনো কল্পনাও করিনি শিলা! তোমার চুল এতোটা রেশমী ও সুন্দর। তুমি রূপসী ঠিক, তাই বলে এমন অনিন্দ সুন্দুরী তা ধারণা করতে পারিনি। তোমার রূপের বর্ণনা দেয়ার মতো ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

লক্ষণের এই কথায় শিলার মধ্যে কোন ভাবান্তর হলো না। সে যেমন ছিলো তেমনই রইলো। লক্ষণ রূপের এই যাদুকরী প্রতিমাকে তার বাহুবন্ধনে জড়িয়ে নেয়ার জন্য তার দিকে দু'হাত প্রসারিত করল। কিন্তু শিলা দু'হাত পিছনে সরে গেল।

আবেগতাড়িত না হয়ে স্বাভাবিক হও লক্ষণ! অত্যন্ত দৃঢ় ও গম্ভীর কণ্ঠে বললো শিলা। লক্ষণ! স্মরণ করো, আমরা কোন উদ্দেশ্যে কি কাজে এখানে এসেছি। নিজের পৌরুষ ও বীরত্বের উপর নারীর রূপ সৌন্দর্যকে সাওয়ার করো না লক্ষণ।। ভুলে যেয়ো না, আমরা মৃত্যুর সাথে খেলা করতে এসেছি।

আমি আমার কর্তব্য বিস্মৃত হইনি রাজকুমারী! আমি জানি, আমরা মৃত্যুর খেলায় নেমেছি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, তোমার মতো অপ্সরীকে নিয়ে মুসলমানরা খেলায় মেতে উঠবে।

হঠাৎ আবেগাপ্লুত হয়ে লক্ষণ বললো–

তোমরা এখানেই থাকো শিলা! আমি একাকী মথুরা যাবো। একাকী গিয়ে সোজা আরব বাহিনীর সেনাপতি মাহমূদকে হত্যা করবো। তোমরা এখান থেকেই ফিরে যাও। আমি একাই মরতে যাবো। কিন্তু যাবার আগে শিলা! একবার, শুধু একটি বার একটু সময়ের জন্য আমাকে জড়িয়ে ধরো। আমি ভয় পাচ্ছি শিলা! আমি আমার মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছি না, ভয় পাচ্ছি ওরা আমাকে হত্যা করে যখন রাধাকে ও তোমাকে নিয়ে যাবে সে সময়টার কথা ভেবে!

লক্ষণ! দূর হও এখান থেকে। বুঝতে চেষ্টা করো, আমি তোমার কাছে নিজেকে বিক্রি করে দেইনি। আমি তোমার সঙ্গ দিয়েছি একটি মহান

উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্য সাধিত হলে আমি নিজেই নিজেকে তোমার পায়ে সোপর্দ করবো। কিন্তু এখন নয় লক্ষণ! তুমি জানো না, একবার যদি তোমার শরীর আমার চুল ও দেহের স্পর্শ পায়, তবে তুমি সব কর্তব্য ভুলে যাবে।

লক্ষণ! আমার চোখে তুমি গযনীর সুলতানকে দেখো, আমার চেহারায় আমার আত্মমর্যাদাবোধ দেখো। যাও লক্ষণ! নদীর তীরে গিয়ে কোন নৌকা আছে কি না তা দেখো, ভুলে গেলে চলবে না, আমাদেরকে যতো শিগগির সম্ভব নদী পার হয়ে যেতে হবে।

শক্ত সুঠাম দেহের অধিকারী যথার্থ সুপুরুষ লক্ষণ। তার শরীরে গঠনই বলে দেয় তরবারী ও অশ্ব চালনায় পারদর্শী যুবক সে। শিলার কথায় তার দেহের ঘুমন্ত পৌরুষ সচেতন হয়ে উঠলো, শিলাকে এক দৃষ্টিতে আপাদ মস্তক দেখে বললো–

ঠিক আছে শিলা! আমি তোমাকে হতাশ করবো না। যে কোন ভাবে নৌকার ব্যবস্থা করে এখনই আসছি আমি।

এই বলে শিলাকে পিছনে রেখে সামনের দিকে দৌড়াতে লাগলো লক্ষণ। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে শিলা লক্ষণের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছ-গাছালির আড়ালে হারিয়ে গেল লক্ষণ।

হঠাৎ পেছনে কোন মানুষের পায়ের শব্দ পেল শিলা। নির্ভয়ে নিরুদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে পেছন ফিরে তাকাল শিলা। শিলা ভাবছিল এই বিজন জঙ্গলে এ সময়ে কে থাকতে পারে! মথুরা এখান থেকে বিশ পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত। মুসলমান সৈন্যরা সেখানে অবস্থান করছে। কিন্তু এখানে কোন জন মানুষের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা না থাকলেও বাস্তবে একজন লোক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শিলার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে। লোকটির চেহারায় কালো দাড়ি। এই এলাকার পোষাকেই লোকটি সজ্জিত। ভরাট চেহারার সবল সুঠাম দেহী একজন যুবক। লোকটি পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে একেবারে শিলার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

শিলা! আমি ভুল করছিনা তো? তুমি কি মুনাজের রাজা রায়চন্দ্রের বোন শিলা না? তুমি তো কোন উপজাতি না। এইমাত্র যে লোকটি তোমার কাছ থেকে চলে গেল সে কি লক্ষণ নয়? গতকাল থেকেই আমি চুপি চুপি তোমাদের লক্ষ্য করছি।

আচ্ছা! তাই নাকি? তুমি কে? খুবই স্বাভাবিক কণ্ঠে জানতে চাইলো শিলা।

লোকটি তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে দাড়ি খুলে ফেললে একজন টগবগে যুবকের চেহারা বেরিয়ে এলো। দেখতে হুবহু লক্ষণের মতো।

ওহ! তারালোচন! তুমি এখানে কেমন করে? অবশ্য তোমার এ সময়ে এখানেই থাকা উচিত।

কিন্তু তোমার এখানে থাকা মোটেও উচিত হয়নি। বললো তারালোচন।

কিছু দিন আগে আমি তোমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে ছিলাম, তখন তোমার সাথে দেখা হয়েছিল। আর একবার তুমি যখন তোমার ভাইয়ের সাথে লাহোর গিয়ে ছিলে তখন তোমাকে দেখেছিলাম। ক'দিন আগে মুনাজে তোমাকে না দেখলে হয়তো এই পোশাকে আমার পক্ষ্যে তোমাকে চেনা সম্ভব হতো না। এই বিজন জঙ্গরে তোমাকে কেউ দেখলে মনে করবে, কোন রাজকুমারীর প্রেতাত্মা তুমি। কিংবা কেউ মনে করবে তুমি এই জঙ্গলের রাণী।

গতকাল থেকেই তোমাদের আমি লক্ষ করছি। তোমার হয়তো জানা আছে এখানে কি করছি আমি। আমি গযনী বাহিনীর গতিবিধি যাচাই করতে এখানে এসেছি। মহারাজা ভীমপাল এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থান করছেন। তোমাদের সাথে রাজকুমারী রাধাকেও দেখলাম। এই বন্যপোশাক পরেছো কেন তোমরা? তোমরা কি কোথাও পালিয়ে যাচ্ছো?

এই যুবক লাহোরের মহারাজা ভীমপালের ছোট ভাই তারালোচন পাল। শিলার সাথে তার বিয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি হওয়ার পথেই ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠায় বিয়ের কাজ বিলম্বিত হয়ে গেল।

এদিকে সুলতান মাহমূদের কাছে ঠিকই সংবাদ পৌঁছে গেল লাহোরের মহারাজা ভীমপাল ও তার ছোট ভাই তারালোচন পাল লাহোর থেকে এসে এই এলাকার রাজা মহারাজাদেরকে সুলতানের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছে।

তারালোচন পাল ঐ কাজেই একবার মুনাজ ও কন্নৌজ ঘুরে এসেছে। ঘুরতে ঘুরতে একদিন তার চোখে পড়ে লক্ষণের এই ছোট কাফেলা।

কাফেলাটি তার কাছে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় এবং লোকগুলোও তার পরিচিত হওয়ায় সে এদের অভিপ্রায় বুঝার জন্য তাদের পিছু নিল। এক পর্যায়ে লক্ষণ শিলার কাছ থেকে চলে যাওয়ার সুবাদে সে শিলার মুখোমুখি হলো। তারালোচন পালের মুখোমুখি হওয়ায় শিলা মোটেও বিব্রতবোধ করলো না। বরং সে অকপটে বলে দিল কোন অভিপ্রায়ে ওরা লক্ষণের এই কাফেলায় শরীক হয়েছে এবং কেন লক্ষণকে তারা সঙ্গ দিচ্ছে।

তোমার ভাই রায়চন্দ্র কি এখন বোন আর কন্যাকেও যুদ্ধে জড়িয়ে ফেললেন? রাজপুতদের কি হয়ে গেলো? তাদের আত্মমর্যাদাবোধ কি গঙ্গার পানি ধুইয়ে নিয়ে গেছে? রাজপুতেরাও কি মুসলমানদের ভয়ে এতোটা ভড়কে গেছে? উষ্মামাখা কণ্ঠে বললো তারালোচন।.....

আমরা তো রায়চন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, মাহমূদ যদি তাকে পরাজিত করে ফেলে তবে আমরা নিশ্চয়ই এর প্রতিশোধ নেবো। এজন্য আমরা সৈন্যদের প্রস্তুত করে রেখেছি। আমরা এ মুহূর্তে সুলতানের মুখোমুখি হচ্ছি না এজন্য যে, যখন একের পর এক যুদ্ধ করে সে ক্লান্ত হয়ে যাবে, তার সৈন্যনা অবসন্ন হয়ে যাবে, আর লোকবল কমে যাবে তখন আমরা এক আঘাতেই তাদেরকে জব্দ করবো। অবশ্য আমরা সুলতানের সাথে চুক্তিবদ্ধ। কিন্তু এই চুক্তি ভাঙ্গার জন্যে আমরা সুযোগের অপেক্ষা করছি। তাকে হত্যা করার কোন দরকার নেই। যদি হত্যা করতেই হয়, তবে লক্ষণপাল ও তার সঙ্গী দুই সৈনিক যাবে, তোমরা এখান থেকেই বাড়ীতে ফিরে যাও।

শিলা তারালোচনকে জানালো, তাদেকে কেউ জোর করে আনেনি। তারাই বরং লক্ষণকে উজ্জীবিত করেছে। রাধা এবং সে কি ভাবে সুলতানকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে কি ভাবে তারা মুসলিম সৈন্যদের ধোকা দেবে সব বিস্তারিত তারালোচনকে জানাল শিলা।

তোমাদের পরিকল্পনা বাস্তব সম্মত নয়। তোমরা যাদের ধোকা দেয়ার চিন্তা করছো তাদেরকে ধোঁকা দেয়া সহজ নয়। তোমরাই বরং ধোকায় পড়ে গযনী চলে যাবে এবং তোমাদেরকে নর্তকীতে পরিণত করা হবে কিংবা কোন সেনা কর্মকর্তার রক্ষিতা হয়ে থাকতে হবে।

শিলা তারালোচনকে রাজপুত নারীদের আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললো, তারা কতোটা কঠোর মনোভাব নিয়ে এই অভিযানে বেরিয়েছে। কিন্তু শিলার কথায় আশ্বস্ত হতে পারলোনা তারালোচন। সে তার হবু স্ত্রীর এই ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারলো না।

এমন কাঙ্ক্ষিত এক অভিযানের মধ্য পথে অনাকাঙ্ক্ষিত বাধা হয়ে দাঁড়ানোতে তারালোচনের উপর ক্ষেপে গেল শিলা। সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তারালোচনকে বললো, আমার যাওয়া যদি সমর্থন করতে নাই পারো, তাহলে তুমি যাও আমার স্থানে। সেই সাহস তো তোমার নেই। চোরের মতো বেশ বদল করে গহীন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছো। তোমরা গযনীর সাথে মৈত্রী চুক্তি করেছো। এটাও তো তোমাদের এক ধরনের কাপুরুষতা। তোমরা যদি কাপুরুষ না হও তাহলে সেনাবাহিনীকে সামনে এনে প্রকাশ্যে মাহমূদকে হুমকি দাও না কেন? বলো না কেন, আমরা আর তোমার অধীনতামূলক চুক্তি পালনে রাজী নই।...

এদিকে মথুরার হাজার বছরের পুরনো মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে, ওদিকে তোমরা তোমাদের শহরে মুসলমানদের আচ্ছা করে আযান দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছো। তোমরা আযানের আওয়াজে বেশ সাচ্ছন্দেই আছো। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। তোমাদের নিষ্ক্রিয়তা আমার আত্মমর্যাদাবোধ একটা কিছু করার জন্যে আমাকে ঘর ছাড়া করেছে।

শিলার কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো তারালোচন। সে বললো, আমি তোমার কথায় সায় দিতে পারছিনা শিলা! যাই বলো, তুমি আমার হবু স্ত্রী। তোমার সাথে আমার বিয়ের বিষয়টি পাকাপাকি হয়ে আছে। আমি কিছুতেই তোমাকে এখান থেকে আর সামনে যেতে দেবো না।

আমি কারো হবু বধূ নই। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো শিলা। যে সুলতান মাহমূদকে হত্যা করতে পারবে আমি হবো তার স্ত্রী। আর সে কাজ একমাত্র লক্ষণ পালের পক্ষেই করা সম্ভব। লক্ষণ যদি সেই কাজ করতে গিয়ে নিহত হয় তবে আমি নিজেই মাহমূদকে হত্যা করবো। নয়তো রাধা সেই কাজ সমাধা করবে। তুমি জেনে রাখো, এই লুটেরার জীবন মৃত্যু এখন আমার হাতের মুঠোয়।

হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে দাঁতে দাঁত পিষে দৃঢ় কণ্ঠে শিলা বললো–

আমার হাত মেহেদীর রঙ্গে নয় মাহমূদের তাজা রক্তে রঙ্গিন হবে। মুনাজের কোন রাজপুত তরুনীকে কোন মুসলমান সেবাদাসীতে পরিণত করতে পারবে না। এটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব। কারণ তোমার বাপ দাদারা মাহমূদের হাতে একের পর এক পরাজয় শিকার করে নিয়ে মাহমূদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করেছে। আর দাসত্ব চুক্তি করে দেশের সম্পদ তোমরা মুসলমানদের হাতে তুলে দিচ্ছো।

তোমার সাথে আমার বিয়ে ঠিক করেছিলো আমার ভাই। কিন্তু আমার সিদ্ধান্তের কথা আজ শুনে রাখো তারালোচন! তোমার মতো কাপুরুষদের আমি ঘৃণা করি। নারী সে রাজপুত হোক আর মজদুরের বংশধর হোক, নারী বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠলে সাগরেও আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। আমার পথ ছেড়ে দাও তারালোচন! তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমার সব স্বপ্নসাধ এখন লক্ষণকে ঘিরে। পৃথিবীতে সম্ভব না হলেও স্বর্গে আমাদের বিয়ে হবে। তুমি এই জঙ্গলেই ঘুরে ঘুরে সময় কাটাও।

তুমি কি ভাবছো আমার পক্ষে এখান থেকে তোমাকে তুলে নেয়া সম্ভব নয়? ক্ষুব্ধ ভঙিতে শিলার দিকে এগিয়ে গেল তারালোচনপাল।

তারালোচনকে এগুতে দেখে শিলা পিছনে ঘুরে দৌড়াতে লাগল। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দৌড়ে শিলা একটি টিলার আড়ালে চলে গেল।

তারালোচন দৌড়ে ওর পিছু পিছু গিয়ে ওকে দেখে ফেললো। তখন শিলা একটি গাছের আড়ালে দাঁড়ানো। জায়গাটি ঘন গাছ গাছালীতে ভরা। নদী এখানে জঙ্গলের ভেতরে চলে এসেছে। জায়গাটি অনেকটা ঝিলের মতো। এখানকার পানি শান্ত। কোন স্রোত বা ঢেউ নেই।

তারালোচন পাল শিলাকে বললো, শিলা তোমাকে শেষ বারের মতো বলছি, তুমি আমার কাছে এসে পড়ো। শিলা তারালোচনকে হুমকির স্বরে বললো, সাহস থাকে তো আমাকে ধরতে এসো। মাহমূদকে খুন করার আগে আমি তোমাকেই খুন করবো। আমি স্বেচ্ছায় কখনো তোমার কাছে ধরা দেবো না। হুমকি দিয়ে শিলা উল্টো পায়ে পেছনের দিকে সরতে শুরু করল। তারালোচনপাল ঠায় দাঁড়িয়েই শিলাকে আত্মসমর্পণের জন্যে আহবান করছিল এবং বলছিলো,

তোমার পক্ষে কাউকে হত্যা করা সম্ভব নয় শিলা! আমি কিছুতেই তোমাকে এখান থেকে পালাতে দেবো না।

শিলা উল্টো পায়ে পিছনেই সরে যাচ্ছিল। হঠাৎ আতংকিত কণ্ঠে তরলোচন বললো, শিলা! শিলা! আর পিছনে যেয়ো না! পড়ে যাবে। যেখানে আছো সেখানেই দাঁড়াও।

না, আমি কিছুতেই তোমার কাছে ধরা দেবো না। শিলা বুঝতে পারেনি; তারালোচন কী ভয়ংকর বিপদ থেকে তাকে সাবধান করছিল। তারালোচন চিৎকার করে বললো, শিলা! শিলা! তোমার পেছনে রাক্ষুসে কুমির।

তখন একটি কুমির মুখ হা করে একেবারে শিলার পেছনেই দাঁড়ানো। এটি হয়তো কোন ঝুপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। ধীরে ধীরে কুমিরটি এগুতে লাগল। কিন্তু শিলা নির্বোধের মতো তখনো পায়ে পায়ে পিছু সরে যাচ্ছিল। আর দু' পা পিছু হঠতেই মুখ হা করা কুমিরটি শিলাকে এক ঝাটকায় মুখের ভেতরে আটকে ফেললো।

আক্রান্ত শিলাকে কুমির ধরার সাথে সাথে শিলা এমন বিকট আর্তচিৎকার করে উঠলো যে, দূরে ঘুমিয়ে থাকা রাধা ঘুম থেকে জেগে উঠল। রাধা ঘুম থেকে জেগে দেখলো তার পাশে শিলা ও লক্ষণ কেউ নেই। অদূরে দু'জন প্রহরী তখনো বেঘুরে ঘুমাচ্ছে। রাধাা তাদের জাগাল এবং তাদের নিয়ে যে দিকে চিৎকার শোনা গেলো সে দিকে দৌড়াতে লাগল।

হঠাৎ কয়েকজনের দৌড়ানোর শব্দ শুনে তারালোচন পাল একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল এবং মুখে আঙুল দিয়ে বিশেষ ধরনের সাংকেতিক আওয়াজ করল।

রাধা তার দুই সৈনিক সঙ্গীকে নিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে পৌছে দেখতে পেল, শিলা একটি কুমিরের মুখের ভেতরে তখনো গোংগাচ্ছে। তার দেহের শুধু মাথা আর একটি হাত বাইরে আছে আর বাকীটা কুমিরের মুখের ভেতরে। শিলার রেশমী চুলগুলো কুমিরের মুখের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ অজ্ঞাত স্থান থেকে দু'টি তীর এসে রাধার সঙ্গী দুই সৈনিকের চোখে বিদ্ধ হলো। উভয়েই আর্তচিৎকার করে দু'হাতে চোখ ধরে মাটিতে বসে পড়ল এবং তাদের

চোখে অন্ধকার নেমে এলো। তারালোচন পালের দুই সঙ্গী তার বিশেষ ইঙ্গিতে লক্ষণের সফর সঙ্গী দু'জনের চোখে তীর ছুড়ে তাদেরকে অন্ধ করে দিল।

রাধা ছিলো দুই সৈনিকের আগে আগে। তাই কোন দিক থেকে তীর এসেছে তা সে দেখতে পেলো না। সে শিলার আর্তচিৎকার শুনে উৎকণ্ঠিত হয়ে সামনের দিকে দৌড়াচ্ছিল। কুমিরের মুখে নারীদেহের অবশিষ্টাংশ দেখে দূরেই থমকে গেল রাধা। অবস্থা দেখে তার মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো, তার চিৎকার করার ভাষাও যেন লোপ পেয়ে গেলো। ঠিক এমন সময় তার পেছনে পেছনে আসা দুই সৈনিকের আর্তচিৎকার শুনে পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেলো তারা উভয়েই তীর বিদ্ধ হয়ে মাটিতে বসে পড়েছে। তখন আর নিজেকে সামলাতে পারলো না রাধা। দাঁড়ানো থেকে জ্ঞান হারিয়ে ঠায় লুটিয়ে পড়ল।

রাধাকে লুটিয়ে পড়তে দেখে তারালোচন পাল রাধাকে ধরার জন্যে এগুতে চাচ্ছিল তখন তার দুই সঙ্গী এই বলে তাকে সতর্ক করলো; সাবধান রাজকুমার! মুসলমান যোদ্ধারা আসছে! আপনি ঝোপের আড়াল থেকে বের হবেন না। সাথে সাথে তারালোচন পাল জায়গা ছেড়ে আরো ঘন ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর গযনী বাহিনীর চার যোদ্ধা ঠিক সেই জায়গাটিতে এসে থমকে দাড়াল যে জায়গাটি থেকে তারালোচন পাল পালিয়ে ছিল।

তরলোচন পালকে যদি তার দুই সঙ্গী সতর্ক না করতো তাহলে তারালোচনকে মুসলিম যোদ্ধারা পাকড়াও করতে পারতো। তা করতে পারলে বিরাট কাজ হতো তাদের। তারালোচনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা ভীমপালের অবস্থান জেনে নিতে পারতো। অল্পের জন্য বিরাট একটি শিকার হাত ছাড়া হয়ে গেল গযনী যোদ্ধাদের।

এরই মধ্যে গযনী যোদ্ধাদের কানে ভেসে এলো ঘোড়া হাঁকানোর শব্দ। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে মুসলিম যোদ্ধাদের কবল থেকে প্রাণ বাঁচাতে উর্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাচ্ছিল তারালোচন পাল ও তার দুই সঙ্গী।

গযনীর চার যোদ্ধার মধ্যে একজন ছিলো ডেপুটি সেনাপতি। আর বাকী তিনজন তার অধীনস্থ তিন কমান্ডার।

এরা ছিলো গোয়েন্দা কাজে লিপ্ত। মথুরা থেকে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েই তারা নদী পার হয়েছে। কন্নৌজ অভিযানের আগে নদী ও আশপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তারা এদিকে এসেছিল। তা ছাড়া মথুরার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে সম্ভাব্য কয়েকটি চৌকি স্থাপনের সুবিধাজনক জায়গা নির্বাচন করার বিষয়টিও তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

তারা যখন নদী পেরিয়ে জঙ্গলের ভেতরের ঝিল সদৃশ নদীর অংশে পৌঁছলো, তখন তাদের নজরে পড়ল একটি অচেতন নারীদেহ। সেখান থেকে খানিকটা দূরে তাদের নজরে পড়ল একটি কুমির। কুমিরটি কিছুটা পানিতে নেমে আছে। কুমিরের মুখে একটি মানুষের হাত ঝুলছে এবং নারীর চুল সদৃশ একটি অবয়ব দেখা যাচ্ছে।

ডেপুটি সেনাপতি কুমিরের দিকে ঘোড়া হাকাল, কিন্তু অশ্বরোহীদের দেখে জলহস্তি পানিতে ডুবে গেল। একটু দূরে পড়ে থাকা অচেতন রাধাকে দেখে সঙ্গীদেরকে ডেপুটি সেনাপতি বললো, মনে হয় অচেতন এই মহিলা কোন জঙ্গলী পরি হবে। একে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে চলো।

রাধাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে তারা এদিক ওদিক দেখতে লাগলো, নিশ্চয় এই নারীর সাথে আরো কেউ থাকতে পারে। আশপাশে চোখ বুলালে তাদের নজরে পড়লো, দু'টি মৃত দেহ। উভয়ের চোখে একটি করে তীর বিদ্ধ। একটু এগিয়ে তারা দেখতে পেলো একটি জায়গায় পাঁচটি ঘোড়া দু'টি খচ্চর এবং দু'টি হরিণ বাঁধা রয়েছে। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পেলো, তিন জায়গায় তিনটি বিছানা বিছানো। সেখানে পড়ে থাকা আসবাবপত্র তল্লাশী করার পর তারা ঝোলাটির ভেতরে তরবারী, খঞ্জর এবং অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা পেল। ঝোলার ভেতরে তারা এমন কিছু জিনিসপত্রও পেলো যেগুলো তাদের মনে ব্যাপক জিজ্ঞাসা ও সন্দেহের জন্ম দিলো। ডেপুটি সেনাপতি ছিলেন বয়স্ক ও অভিজ্ঞ সৈনিক। তিনি অচেতন রাধাকে গভীরভাবে দেখে বললেন, এই তরুণী কোনভাবেই জঙ্গলবাসী কোন উপজাতি নয়। তিনি রাধাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিলেন এবং মাথায় কিছুটা পানি ঢেলে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে রাধা চোখ মেলল। চোখ মেলেই সে উঠে বসে তার পাশে কে বা কারা অবস্থান করছে এ সবের দিকে না তাকিয়েই চিৎকার জুড়ে দিল শিলা! লক্ষণপাল! রাজকুমার! ডাকতে ডাকতে হঠাৎ দৌড় দিল রাধা।

দেরি না করে ডেপুটি সেনাপতি দৌড়ে থাবা দিয়ে তাকে ধরে বললেন, তুমি কোন রাজকুমারকে ডাকছো?:

রাধা কোন কিছু চিন্তা না করেই বলে ফেললো, 'কন্নৌজের রাজকুমার লক্ষণপাল, তোমরা কি তাকে দেখেছো? এটুকু বলেই সে নীরব হয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার কথাবার্তা ও সার্বিক অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল। রাধা বলতে লাগল, আমি কন্নৌজের কাছের একটি উপজাতীয় গোত্রের মেয়ে। আমরা মুসলমান হওয়ার জন্য গযনী সুলতানের কাছে যাবো।

তোমাদের গোত্রের নাম কি? জিজ্ঞেস করলেন ডেপুটি সেনাপতি। তোমাদের গ্রামটি কন্নৌজ থেকে কত দূর?

এ প্রশ্নে রাধা হতবাক হয়ে গেল। এমন প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হলো না। কারণ, তাদের প্রশিক্ষকদের কেউ একথাটি বলেনি, প্রতিটি উপজাতীয় গোত্রেরই একেকটি নাম পরিচয় থাকে। রাধা যখন নিজেকে উপজাতীয় বলে পরিচয় দিলো, তখন ডেপুটি সেনাপতি রাধার উদ্দেশ্যে বললেন,

শোন তরুনী! আমি গযনীর বাসিন্দা। কিন্তু আমি তোমার ভাষায় কথা বলছি। তা থেকে তুমি বুঝে নিতে পারো আমি তোমাদের এলাকার নাড়ি নক্ষত্র জানি। আমি এখনই কন্নৌজ ও আশপাশের সমস্ত এলাকা দেখে এসেছি। আমি কন্নৌজের ধারে কাছে এমন কোন উপজাতি এলাকা দেখিনি যেখানে তোমার মতো সুন্দরী তরুণী থাকতে পারে।

হঠাৎ করে রাধার মধ্যকার রাজপুতের রক্ত জেগে উঠলো। সে ডেপুটি ও সহযোদ্ধাদের হুমকি দিয়ে বললো, সাবধান! তোমরা কেউ আমাকে স্পর্শ না, আমি তোমাদের হাতে ধরা দেবো না। জীবন্ত থাকা অবস্থায় তোমাদের কেউ আমার গায়ে হাত দিতে পারবে না।

আচমকা ডেপুটি সেনাপতি রাধার বাজু ধরে বললেন, তোমার সৌভাগ্য যে তুমি আমার হাতে ধরা পড়েছো। তুমি এতো সুন্দরী! তার উপর এমন অর্ধনগ্ন উপজাতীয় পোশাক পরেছো যাতে রূপ সৌন্দর্য আরো বেশী ফুটে উঠেছে। এ অবস্থায় এই বিজন জঙ্গলে কোন নারী লোভী পুরুষ তোমাকে পেলে তোমাকে মা-বোনের দৃষ্টিতে দেখবে না। আমি তোমাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি,

আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তুমি যদি আমাকে যাচাই করতে চাও, তাহলে আমি তোমাকে এই তিনজনের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো, এদেরকে তুমি ভালোভাবে চিনে নাও। আর যদি তুমি নিজের মঙ্গল চাও, তাহলে বলো: কে তুমি? কোত্থেকে এসেছো? রাজকুমার লক্ষণপাল এখন কোথায় আছে? কে এবং কোন উদ্দেশ্য তোমরা এখানে এসেছো?

হঠাৎ রাধা তার আসবাবপত্রের দিকে ছুটে গেল।

গযনী যোদ্ধারা তার কাণ্ড বেশ মজা করেই দেখতে লাগল। আসবাবপত্রের মধ্য থেকে সে একটি ছোট্ট কৌটা খুলল এবং সেটি থেকে হাতে কিছু একটা নিয়ে আরো দূরে চলে যাওয়ার জন্যে ছুটতে লাগলো।

এক কমান্ডার দৌড়ে তাকে ধরে ফেলল এবং তার হাতের কোটাটি ছিনিয়ে নিয়ে ডেপুটি সেনাপতির কাছে দিল। ডেপুটি সেনাপতি সেটিকে হাতে নিয়ে রাধাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটি বিষ নয় কি? শোন তরুনী তোমার এই দৌড় ঝাপ পালানোর চেষ্টা অর্থহীন। তুমি এখন আমাদের হাতে বন্দী। তোমাকে আমাদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতেই হবে। কি ভাবে তোমার কাছ থেকে জবাব বের করতে হয় তা আমরা জানি। তবে আশা করি নিজের স্বার্থেই তুমি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবে। কারণ, আমরা কখনো অসহায় কোন নারীর ক্ষতি করি না।

ডেপুটি সেনাপতির নির্দেশে এক কমান্ডার রাধাকে তার ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে লাগাম নিজের হাতে নিয়ে নিল। রাধাকে রাখল তার সামনে। যাতে ছুটন্ত ঘোড়া থেকে পালাতে গিয়ে সে আবার কোন দুর্ঘটনা ঘটনানোর অবকাশ না পায়।

এ দিকে নৌকার খোঁজ করতে গিয়ে অনেকক্ষণ নদীর তীর ধরে হেঁটেও লক্ষণপাল কোন নৌকার খোঁজ পেলো না। তার চোখে পড়লো না কোন মাঝি মাল্লা। অবশেষে হতাশ হয়ে ভগ্ন মনে সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে আসতে লাগল।

লক্ষণ যখন ঝিলসদৃশ নদীর তীরের কাছে আসল তখন তার চোখে পড়ল একটি কুমির একটি আস্ত মানুষকে মুখের ভেতর থেকে উপড়ে ফেলছে। কুমিরের খাবারের রীতি হলো বড় কোন শিকার পেলে ওরা আগে সেটিকে

বিশাল মুখ গহবরে আটকে মেরে ফেলে এবং মেরে সেটিকে আবার শুকনো জায়গায় উগড়ে ফেলে রাখে। কয়েকদিনে শিকারটি পচে গলে নরম হওয়ার পর ধীরে ধীরে সেটিকে সাবার করে।

শিলাকে মুখের ভেতরে আটকে মেরে ফেলার পর কুমির পানি থেকে ডাঙ্গায় উঠে তাকে উগড়ে দিচ্ছিল। লক্ষণ পাল দূরে থেকেই দেখতে পেল, যে জিনিসটি কুমির উগড়ে ফেলছে সেটি একটি নারী দেহ। যার পরনে নারীর পোষাক এবং মাথায় দীর্ঘ চুল.... নারীদেহ দেখে তার শরীর কেঁপে উঠলো। সে ভাবতেই পারছিল না, এটি শিলার দেহ হতে পারে। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য লক্ষণ একটি উচু মাটির টিবিসম ছোট্ট টিলার উপরে উঠে এদিকে তাকাল। কুমির তখন শিলাকে সম্পূর্ণ উপরে ফেলেছে। বিশাল জন্তুটার দু'পাটি দাঁতের আঘাত ছাড়া শরীরে তেমন কোন জখম নেই। অনেকটাই অক্ষত শরীর। প্রায় অক্ষত চেহারা। সে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে মরদেহের অবয়ব। হায় এ যে তার ই প্রেমাস্পদ শিলার মরদেহ।

ঠিক এ সময় আরেকটি কুমির দৌড়ে এসে মরদেহটিতে হামলে পড়ল। প্রথম কুমিরটি তার শিকারে ভাগ বসানোকে সহ্য না করে প্রতিপক্ষের উপর হামলে পড়ল। আক্রান্ত কুমির শিলার একটি পা দাঁতে চেপে টানতে লাগল। তখন শিকারী কুমির তার শিকার কব্জায় রাখতে অপর পা ধরে ফেলল। দুই প্রতিপক্ষের টানাটানিতে মরদেহটি শূন্য সোজা হয়ে গেল এবং এক পর্যায়ে উভয় জন্তুর শক্তি প্রয়োগে তা ছিড়ে দুভাগ হয়ে গেল।

অবস্থা দেখে লক্ষণের মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো। সে হাতে মাথা চেপে ধরে টিলার অপর দিকে নীচে নামাতেই তার দুই সৈনিক সাথীকে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলো। নিশ্চল নিথর তাদের দেহ। উভয়ের চোখে বিদ্ধ তীর।

হতবিহবল অবস্থায় লক্ষণ দুই সঙ্গীর লাশের দিকে তাকিয়ে রইল। সে দৃশ্যমান ঘটনার পেছনে কি ঘটেছে কিছুই ঠিক বুঝতে পারছিল না। এ সময় তার কানে ভেসে এলো রাধার আর্তচিৎকার। লক্ষণ পাল!

চিৎকার শুনে ভেসে আসা আওয়াজের দিকে তাকিয়ে লক্ষণ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। রাধা কয়েকজন গযনী সেনার কব্জায় বন্দী। কোন কিছু চিন্তা না করে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে যেই লক্ষণ দৌড় দেয়ার

সিদ্ধান্ত নিল তার কানে ভেসে এলো গযনী বাহিনীর ডেপুটি সেনাপতির হুমকি–

পালানোর চেষ্টা করো না ছেলে! তুমি ঘোড়ার চেয়ে বেশী দৌড়াতে পারবে না। বাঁচতে চাও যদি পালানোর চেষ্টা না করে এ দিকে এসো।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা আন্দাজ করে লক্ষণ পালানোর চেষ্টা থেকে বিরত রইলো। গযনীর তিন কমান্ডার তাকেও বন্দী করে ফেললো এবং ডেপুটি সেনাপতি লক্ষণকে একটি ঘোড়ায় সওয়ার করিয়ে সবাইকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলো। তারা লক্ষণের জিনিসপত্রসহ তাদের ঘোড়া খচ্চর ও হরিণ দুটিও সাথে নিল।

লক্ষণপালকে সবার পেছনে রাখা হলো। লক্ষণের পেছনে তার পাশাপাশি চলতে লাগল দলপতি ডেপুটি সেনাপতি।

ডেপুটি সেনাপতি যেতে যেতে লক্ষণকে বললো, এই তরুণী আমাকে সবই বলে দিয়েছে। তাই তাকে আমরা সসম্মানে মথুরা নিয়ে যাচ্ছি। তুমি তার প্রতি লক্ষ রাখবে কেউ তার গায়ে হাত দেয় কিনা? কিন্তু এই তরুণীর মান সম্মান এখন তোমার হাতে। আমরা চাই তুমি যা বলবে সত্য বলবে। তুমি যদি মিথ্যা বলো, তাহলে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না ওর সাথে কি আচরণ করা হবে। দেখো, যদি আমি এ মুহূর্তে এখানে না থাকতাম, তাহলে এই তিন যোদ্ধা ওকে এতো সম্মানে রাখতো না। নিশ্চয়ই রহস্য উদঘাটনে মারধর করতো। বলো রাজকুমার! কন্নৌজের রাজকুমার উপজাতীয় পোষাকে এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছো?

আপনি আমাদের ছেড়ে দিলে আপনি যা চাইবেন আমরা আপনাকে সেই পরিমাণই উপঢৌকন দেবো, বললো লক্ষণপাল। আপনারা সবাই আমাদের সাথে কন্নৌজ চলুন। আপনাদের সবার ঘোড়াকেই আমি স্বর্ণ দিয়ে বোঝাই করে দেবো।

আরে বোকা ছেলে! আমরা যদি পুরস্কারের লোভী হতাম তাহলে এই সুন্দরী তরুণীই ছিল আমাদের জন্যে পুরস্কারের জন্যে যথেষ্ট। তাছাড়া তোমাদের আসবাবপত্র থেকে আমরা বিপুল পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছি। ইচ্ছা করলে এগুলোও আমরা চারজন ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে পারতাম। তুমি

আমাকে কন্নৌজ নিয়ে যেতে চাচ্ছো। আমরা তো কন্নৌজ থেকেই ফিরছি। আমাদেরকে তোমার কন্নৌজ নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই, আমরাই আমাদের ঘোড়াগুলোকে কন্নৌজের সোনা দানা দিয়ে বোঝাই করে নেবো। তোমার কোন পুরুস্কারের দরকার আমাদের নেই। আমরাই বরং তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাচ্ছি। সত্যি সত্যি তোমার পরিচয় এবং এখানে আসার উদ্দেশ্য বলে দাও এবং পুরস্কারস্বরূপ তোমার জীবন ও এই তরুণীকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে যাও। বললো, ডেপুটি সেনাপতি।

ডেপুটি সেনাপতির তিন সঙ্গীসহ লক্ষণ ও রাধাকে নিয়ে ছোট্ট কাফেলাটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়েই নদী পার হলো। পথিমধ্যে তারা অনেক জঙ্গল ময়দান পেরিয়ে এলো। দিন শেষে রাতের অন্ধকার নেমে আসার পরও তাদের পথচলা বন্ধ হলো না। পথিমধ্যে দীর্ঘ ভ্রমনের ক্লান্তি দূর করার জন্যে তারা এক জায়গায় একটু বিশ্রামের জন্যে যাত্রা বিরতি করল। কিন্তু এই দীর্ঘ পথে রাধার সাথে কেউই কোন কথা বললো না। মথুরার সীমানা পর্যন্ত পৌছতে এই কাফেলার প্রায় অর্ধেক রাত হয়ে গেল।

ডেপুটি সেনাপতি পথিমধ্যে লক্ষণপালের সাথে তেমন কোন কথা বলেননি। তিনি শুধু কয়েকবার বলেছিলেন, সে যেনো সত্যি ঘটনা আড়াল করার অপচেষ্টা না করে। প্রকৃত সত্য বলে দেয়। তাহলে তার ও তার সঙ্গীনীর জীবন ভিক্ষা দেয়া হবে এবং তাদের উপর কোন ধরনের অত্যাচার করা হবে না।

জবাবে লক্ষণপাল ছেড়ে দেয়ার জন্যে তাদেরকে পুরস্কারের লোভ দেখানো ছাড়া আর কিছু বলেনি। কিন্তু মধ্য রাতের দিকে কাফেলা যখন মথুরার সীমানায় পৌছাল তখন লক্ষণপাল এগিয়ে গিয়ে ডেপুটি সেনাপতির হাত ধরে বিনয়ের সাথে বললো,

আমি সত্যি কথা বলে দিচ্ছি ..... আপনি আগে আমার কথা শুনুন। আমি এই কাফেলা নিয়ে আপনাদের সুলতানকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। একথা বলার পর তার আদিঅন্ত প্রস্তুতি ও পরিকল্পনাসহ পুরো ঘটনা সে ডেপুটি সেনাপতিকে জানাল। অবশ্য শিলা কিভাবে কুমিরের শিকারে পরিণত হলো এবং তার দুই সঙ্গী কাদের তীরের আঘাতে নিহত হলো এ

ব্যাপারে সে কিছুই জানাতে পারলো না। লক্ষণ আরো বললো, আপনারা মনে করবেন না, আপনাদের শাস্তির ভয়ে আমি সব কথা বলে দিচ্ছি। কিংবা আমার জীবন বাঁচানোর জন্য আমি আপনাদের সব জানিয়ে দিচ্ছি। আপনার উন্নত নৈতিকতা এবং আদর্শিকতায় বিমুগ্ধ হয়ে বিবেকের তাড়নায় আমি আপনাদের কাছে সত্যি কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমি আপনাদেরকে আমাদের ছেড়ে দেয়ার বদলে বিপুল পরিমাণ উপঢৌকনের প্রস্তাব দিয়েছি। যে কোন পেশাদার সৈনিকের জন্যে এমন মোটা পুরস্কারেরের লোভ সংবরণ করা কঠিন। তাছাড়া সারা দিন কতো জঙ্গল কতো জনমানবহীন মরুময় এলাকা আমরা পেরিয়ে এসেছি। আমার আশংকা ছিলো এই তরুণীকে আপনার সৈন্যরা অক্ষত রাখবে না। কিন্তু দীর্ঘ সফরে আমি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, আপনি ও আপনার সঙ্গীদের কজায় এমন অনিন্দ সুন্দরী তরুণী রয়েছে ইচ্ছা করলেই যাকে আপনারা ভোগ করতে পারতেন। অথচ আপনাদের পথ চলায় মনে হয়েছে আপনাদের সাথে যে এই তরুণী আছে এই বিষয়টি যেনো আপনারা ভুলেই গিয়েছিলেন। অথচ এমন সুন্দরী তরুণী হয়তো আপনারা গযনীতে জীবনেও দেখেননি। অপর দিকে গোটা পথ অতিক্রমের সময় আপনারা আমাদের প্রতি কোন বিরূপ আচরণ তো দূরে থাক একটি কথাও বলেননি। আমি এ থেকে বুঝে গেছি আপনাদের অব্যাহত বিজয়ের রহস্য। যাক, আমি আপনার প্রস্তাব মতো সত্য ঘটনা বলেদিলাম... এবার আপনি আপনার পুরস্কার দিন। আমি শুধু এতটুকু পুরস্কার আপনার কাছে প্রত্যাশা করছি, প্রয়োজনে আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিন কিন্তু এই মেয়েটিকে নিরাপদে তার মা বাবার কাছে পাঠিয়ে দিন। ...

আপনি এই তরুনীর সাহসিকতার দিকটি দেখুন। আপনারা যদি সত্যিকার অর্থেই বীরের জাতি হয়ে থাকেন, তাহলে এক জাত্যাভিমানী পিতার আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন কন্যার সাহসিকতাকে সম্মান করুন। কারণ, এই মেয়েটি এখনো কুমারী। আবেগ ও আত্মমর্যাদাবোধের আতিশয্যে আমাকে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত রাখার জন্যে সে এই অভিযানের সঙ্গী হয়েছিল। মূলত এ জন্য এর কোন কসূর বা অন্যায় নেই। সব কসূর আমার।

আমি তোমাকে এই আশ্বাস দিতে পারি এই তরুণী যেমন আছে তেমনি থাকবে এবং তোমাকেও জল্লাদের তরবারীর নীচে দাঁড়াতে হবে না। বললেন

ডেপুটি সেনাপতি। স্বেচ্ছায় সত্যি ঘটনা বলে দেয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। সেই সাথে অপরিণাম দর্শী আবেগ তাড়িত এই অভিযানের মতো বোকামীতে সম্মতি দেয়ার জন্যে তোমাদের অভিভাবকদের ধিক্কার দিচ্ছি।

রাত পোহালে সকালেই লক্ষণপাল ও রাধাকে সুলতান মাহমূদের সামনে পেশ করা হলো। সুলতান লক্ষণপালের মুখ থেকে তার অভিযানের কথা শুনে বললেন,

তুমি কোন অন্যায় করোনি রাজকুমার। আমরা তোমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেবো না। তোমার মতো সাহসী তরুণের আবেগ, স্বজাতির প্রতি মর্যাদাবোধকে আমরা সম্মান করি। মৃত্যুদণ্ড তো দূরের কথা এজন্য আমরা তোমাদের এতটুকু ভর্ৎসনাও করবো না। তোমাদের মতো আত্মর্যাদাবোধ সম্পন্ন শত্রুকে আমরা অসম্মান করি না। ....

আমাকে হত্যার চেষ্টা করাই তোমাদের সব তৎপরতায় সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল। তোমরা সেই চেষ্টা করেছো। অবশ্য একাজে তোমাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা তোমাদের কৃষ্ণদেবী ও বসুদেবের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আমার জীবন মৃত্যু সম্পূর্ণ আমাদের আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আমরা সেই আল্লাহর ইবাদত করি যার পয়গাম পৌছাতেই আমরা এ দেশে এসেছি। আমরা এ দেশের মানুষের কাছে সেই মহান একক সত্তার পবিত্র পয়গাম পৌছে দিতে চাই। যিনি নিরাকার। যার সত্তা মাটি পাথর কাঠ বা ধাতবের তৈরী নিষ্প্রাণ সত্তা নয়। যিনি পানাহার করেন না। যিনি মানুষের দেয়া খাবার গ্রহণ করেন না। যার কোন স্ত্রী সন্তান নেই। যার কোন উত্তরাধিকার নেই। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। সব কিছুর স্রষ্টা তিনি। মানুষের জীবন মৃত্যু যার ইচ্ছাদীন।

সুলতান মাহমূদ তার দুভাষীকে বললেন, এই তরুণীকে বলে দাও, সে যেন এই তরুণীর বাবাকে গিয়ে বলে, আমি মুনাজের রাজপুতদের বীরত্ব ও বাহাদুরীর অনেক গল্প শুনেছি। কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন কোন জাতির কোন তরুণীকে শত্রু ঘায়েল করার জন্যে অর্ধ উলঙ্গের পোষাক পরে শত্রুকে নারীর মায়াবী ফাঁদে ফেলার জন্যে চক্রান্তের ঘুঁটি বানাতে পারে না। এটা যেকোন মর্যাদাবোধ জাতির বীর পুরুষদের জন্যে চরম লজ্জাস্কর ....।

আর এই তরুণীকে বলো, সে যেনো তার বাবাকে গিয়ে বলে, আমরা অচিরেই কন্নৌজ আসছি। আমাকে হত্যা করার জন্যে সাহস থাকলে সে যেনো আমার মুখোমুখি হয়। এই তরুণীকে আরো বলে দাও, ইচ্ছা করলে তার বাবার কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করতে আমরা তাকে বন্দী করে রাখতে পারতাম। কিন্তু আমরা অপহরণকারী নই। আমরা লড়াকু। প্রতিপক্ষের আনুগত্য আমরা সম্মুখ সমরে শত্রুকে পরাজিত করেই আদায় করে থাকি। কোন নিরীহ লোককে অপহরণ করে কাউকে বেকায়দা ফেলে কাপুরুষের মতো আমরা শত্রুর কাছ থেকে কিছু আদায় করি না।

দুভাষী সুলতানের কথাগুলো লক্ষণের ভাষায় লক্ষণকে বুঝিয়ে দিল। এরপর সুলতান বললেন, এই রাজকুমারকে আরো জানিয়ে দাও, এই বন্দীত্বকে পুঁজি করে আমরা তার কাছ থেকে কন্নৌজের কোন গোপন বা অজানা তথ্যও জানতে চাইবো না। কারণ, আমরা কন্নৌজের সব খবরই জানি। কন্নৌজের ভেতরে বাইরের সব খবরই আমাদের জানা।

লক্ষণপাল অপলক নেত্রে সুলতানের দিকে তাকিয়ে ছিল। আর মনে মনে আতংকগ্রস্ত ছিল, না জানি সুলতান তাদের ব্যাপারে কি ফয়লাসা দেন। রাধাও অবাক বিস্ময়ে সুলতানের চেহারার দিকেই তাকিয়ে ছিল।

সুলতান মাহমূদ দুভাষীর উদ্দেশ্যে বললেন, এদের বলে দাও, এরা যেনো তাদের বাবাকে গিয়ে বলে, যুদ্ধ ছাড়াই যাতে আমাদের হাতে দুর্গ তুলে দেয়। যুদ্ধ করে যদি আমাদের দুর্গ জয় করতে হয় তবে তাদের পরিণতি হবে শোচনীয়।

এরপর সুলতান নির্দেশ দিলেন, এদেরকে তাদের শহরের কাছাকাছি নিরাপদ জায়গায় রেখে এসো এবং তাদের ঘোড়া ও খচ্চর তাদের সাথেই ফিরিয়ে দাও।

আতংক ও ভীত বিহবল অবস্থায় লক্ষণপাল ও রাধা সুলতানের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। দুভাষী যখন তাদের মুক্তির কথা শোনালো তখন ঘটনার আকস্মিকতায় মুক্তির উচ্ছ্বাসে লক্ষণ উঠে গিয়ে সুলতানের হাত ধরে চুমু খেল আর বিস্ফারিত নেত্রে রাধা সুলতানের সৌম্য কান্তিময় গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো। যেনো রাজ্যের বিস্ময় তার চোখের সামনে অভাবনীয় সব দৃশ দেখাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে লক্ষণ পাল ও রাধাকে দশ বারোজন সিপাহীর প্রহরাধীনে তাদের বাড়ীতে পৌছে দেয়ার জন্য পাঠানো হলো। এই দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হলো একজন সেনা কমান্ডারকে। দীর্ঘ সফরের পর এই সেনাদল মুনাজ দুর্গের অদূরে রাধাকে ছেড়ে দিল এবং লক্ষণকে কন্নৌজের কাছের একটি জায়গায় পৌছে দিয়ে মথুরার দিকে ফিরে আসতে লাগল।

ব্যর্থতার গ্লানি ও এক বুক হতাশার বোঝা কাঁধে নিয়ে মুসলিম যোদ্ধাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে লক্ষণ গিয়ে তার বাবা কন্নৌজের রাজা রাজ্যপালের সম্মুখে দাড়াল। ধীরে ধীরে সে জানাল তার সফরের ইতিবৃত্ত। সে আরো বললো–

বাবা আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি, সুলতান মাহমূদের মোকাবেলায় বিজয়ী হওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি কোন অবস্থাতেই তাকে পরাজিত করতে পারবেন না।

মহারাজ! আমি গযনী সুলতানে চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি তার চোখে এক যাদুকরী আকর্ষণ ক্ষমতা রয়েছে। তার সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য এবং কর্মকর্তা কোন মাটির মানুষ নয়। মনে হয় এরা অন্য কোন ধাতুর তৈরী। তাদের অব্যাহত বিজয় ও সাফল্যের রহস্য শুধু যুদ্ধ পারদর্শিতা নয়। গোটা হিন্দুস্তানের কোথাও এমনটি শুনিনি যে, রাধার মতো সুন্দরী শত্রুপক্ষের কোন তরুনীকে নিজের কব্জায় পেয়েও শত্রুপক্ষ এভাবে অক্ষত অবস্থায় সসম্মানে বাবা মার কোলে পৌছে দিতে পারে। সেই সাথে চরমতম শত্রু প্রতিপক্ষের রাজার ছেলেকে বাগে পেয়েও তাকে আটক করে স্বার্থোদ্ধার না করে সসম্মানে বাড়ী পৌছে দেয়ার চিন্তা করতে পারে।

লক্ষণপাল যখন তার বাবা রাজ্যপালকে গযনীবাহিনীর হাতে তার ধরা পরা এবং সুলতানের কাছে নীত হয়ে আবার ফিরে আসার গোটা কাহিনী শোনালো, তা শুনে রাজ্যপালের বিস্ময়ের অবধি রইলো না। এরপর থেকে রাজ্যপালের চিন্তা ভাবনা সম্পূর্ণ বদলে গেলো। তিনি কন্নৌজের গোটা সোনাদানা দুর্গের বাইরে স্থানান্তরিত করার চিন্তা করলেন।

যেই চিন্তা সেই কাজ। সেই দিবাগত রাতেই তিনি কন্নৌজের গোটা সোনাদানা এমনভাবে দুর্গের বাইরে স্থানান্তরের নির্দেশ দিলেন, যাতে এ ব্যাপারটি ঘুণাক্ষরেও কেউ আন্দাজ করতে না পারে।

রাধা যখন তার ও লক্ষণপালের ধরাপড়া এবং সুলতানের কাছে নীত হয়ে মুক্তি পাওয়ার ঘটনা তার বাবার কাছে বর্ণনা করলো, তখন তার বাবা সেটিকে মোটেও বিশ্বাস করলেন না। রাধার বাবা বরং তার কথাকে পাত্তা না দিয়ে বললেন, রাজপুতেরা অবশ্যই ভগ্নি হত্যার প্রতিশোধ নেবে।

এদিকে সুলতান মাহমূদ সেনাবাহিনীর একটি অংশকে মথুরায় রেখে বাকী সৈন্যদের কন্নৌজের দিকে অভিযানের নির্দেশ দিলেন। তিনি মথুরার পাশেই একটি জায়গায় যমুনা নদী পার হলেন এবং নদীর পাড় ধরে মুনাজের দিকে অগ্রসর হলেন।

এদিকে রাজপুতেরা জীবনমরণ লড়াইয়ের জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সুলতানকে তার গোয়েন্দারা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলো, মুনাজের রাজপুতদের সাথেই তাদেরকে সবচেয়ে কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হবে। কারণ, মুনাজের প্রতিটি শিশু ও নারী গযনী যোদ্ধাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত।

## হৃদয়ের আয়নায় তাওহীদের আলো

কন্নৌজের চারপাশে ছিল ঘন-বনজঙ্গল। এ জঙ্গল কোন কোন স্থানে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জায়জায় জায়গায় ছিল পাহাড়, টিলা ও সমতল ভূমি। যমুনা নদীর তীরেই ছিল কন্নৌজ শহরের অবস্থান। কন্নৌজ দুর্গকে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিলো যে দুর্গের এক প্রান্তের দেয়াল ঐতিহাসিকদের ভাষায় যমুনার পানি বিধৌত হতো। সেই যুগে কন্নৌজ দুর্গ ছিল একটি বিখ্যাত দুর্গ। দূর-দূরান্তের মানুষ কন্নৌজের দুর্গ শহরের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতো।

১০১৮ সালে সুলতান মাহমূদ মথুরা থেকে রওয়ানা হয়ে মুনাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। মুনাজ থেকে কন্নৌজের দূরত্ব ছিল প্রায় সোয়াশো মাইল। কন্নৌজ থেকে চার পাঁচ মাইল দুরে ঘন জঙ্গলের পাশে জনমানবহীন এলাকার একটি পাহাড়ের ঢালে উপজাতীয় পোশাকে দু'জন লোক বসেছিল। এদের এক জনের নাম তালাল আর অপরজনের নাম সালেহ। তখন পশ্চিমাকাশে সূর্য শেষ

আলো বিকিরণ করে অস্ত যেতে শুরু করেছে। এমন সময় দু'জনের একজন তার সঙ্গীকে বললো রাতটা আমরা এখানেই কাটিয়ে দেবো।

আমরা কন্নৌজ থেকে এলাম আজ তিন দিন হলো। কিন্তু কোথাও আমরা কন্নৌজ কিংবা কোন হিন্দু রাজা মহারাজার সৈন্যদের দেখা পেলাম না। তার মানে কি এটা যে, আমাদের সৈন্যদের আগমনের খবর পাওয়ার পর কন্নৌজের সৈন্যরা দুর্গের বাইরে আসবে? বললো তালাল।

আমাদের সৈন্যরা আসা পর্যন্ত আমাদেরকে এই অঞ্চলেই থাকা উচিত তালাল ভাই। বললো তালালের সঙ্গী সালেহ।

সে তালালের উদ্দেশ্যে আরো বললো, হায় আমাদের এ অঞ্চলেই থাকতে হবে এবং কন্নৌজের সেনাবাহিনীর বাইরে আসা দেখে এখান থেকে যেতে হবে। সুলতানকে বলা হয়েছে, তিনি যদি মুনাজ আক্রমণ করেন, তাহলে কন্নৌজের সৈন্যরা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। সুলতানকে একথাও বলা হয়েছে, আমাদের মূল লড়াইটা হবে মুনাজ ও কন্নৌজের মাঝামাঝি স্থানে। তাই আমাদেরকে দেখতে হবে কন্নৌজের কোন সৈন্যরা আমাদের সৈন্যদের উপর পেছন দিক থেকে আঘাত হানে!..... আরে তালাল ভাই! মনে হচ্ছে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছো!

নারে সালেহ! এতো জলদী ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার লোক আমি না। আমার মনে হচ্ছে দুর্গের বাইরে এসে লড়াই করার মতো সাহস কন্নৌজ রাজার নেই।

এটাইতো আমাদের নিশ্চিত হতে হবে, আসলেই কি কন্নৌজ রাজার এই সাহস আছে কি না, বললো সালেহ। আমরা হলাম গযনী সুলতানের দুটি চোখ। আমাদেরকে দেখতে হবে এই জঙ্গল ঝুকিমুক্ত না এখানে কোন ঝুকি আছে?

তাহলে এসো এখানেই শুয়ে পড়ি। ঠান্ডাটা একটু বেশী। তবুও রাতটা কোনমতে কাটিয়ে দেয়া যাবে, বললো তালাল।

তালাল ও সালেহ ছিল হিন্দুস্তানী মুসলমান। সালেহ ছিলো সেইসব আরবদের বংশধর যারা মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সাথে হিন্দুস্তানে এসে আর আরব দেশে ফিরে যায়নি। আর তালালের পূর্ব পুরুষরা ছিল অমুসলিম। মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সময় তার পূর্ব পুরুষরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

সুলতান মাহমূদ যখন ভারত অভিযান শুরু করলেন, তখন ভারতের অভ্যন্তরীন অবস্থা জানার জন্যে তার স্থানীয় বিশ্বস্ত লোকের দরকার হলো। একাজে তিনি স্থানীয় মুসলমানদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তার বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখায় অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিলেন।

দেশের ভেতরে থেকে বিদেশী শক্তির জন্যে গোয়েন্দাদের দায়িত্ব পালন করা সাধারণ সৈনিকের মতো সহজ ছিলো না। তরবারী ও অশ্বচালনায় পারদর্শিতা দেখাতে পারলেই সেনাবাহিনীতে ভর্তির সুযোগ পাওয়া যেতো। কিন্তু গোয়েন্দার কাজের জন্যে সৈনিকের মতো অশ্বচালনা ও তরবারীতে পারদর্শিতার পাশাপাশি অত্যন্ত মেধাবী ও দূরদর্শিতা থাকতে হতো। কারণ, গোয়েন্দাকে হতে হয় চলন-বলনে বিশেষ পারদর্শী, থাকতে হয় যে কোন অবস্থা ও পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা। সেই সাথে যে কোন প্রাকৃতিক ও সামাজিক বৈরী পরিবেশে ও পাহাড়, জঙ্গল, মরু, পানি, চরম শীত, প্রচণ্ড গরম তথা সকল প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে কয়েক দিন পর্যন্ত টিকে থাকার মতো দৈহিক সামর্থও তার থাকতে হয়।

গোয়েন্দা কাজের জন্য সব চেয়ে বড় যোগ্যতার ব্যাপার ছিল, গোয়েন্দাকে হতে হতো লোভ লালসাহীন, আবেগ বিরাগ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। গোয়েন্দাদেরকে ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন এবং চিতা বাঘের মতো ক্ষিপ্রতার অধিকারী হতে হয়। সবচেয়ে বেশী থাকতে হতো নির্ভেজাল ঈমান।

হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে আবেগের প্রাবল্য বিদ্যমান ছিল। তখনকার হিন্দুস্তান ছিলো বহু রাজামহারাজাদের শাসনে বিভক্ত হিন্দুস্তানের প্রায় সকল শাসক শ্রেণীই ছিল হিন্দু। হিন্দু শাসকরা কখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলিম অধিবাসীদের বিশ্বাস করতো না।

গযনীর সুলতান মাহমূদ যখন ভারত অভিযান শুরু করেন, তখন থেকে ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেক মুসলনমানকেই হিন্দু শাসকরা গযনী সুলতানের গোয়েন্দা হিসেবে সন্দেহ করতে শুরু করে।

এমন সংশয় সন্দেহের মধ্য থেকেও ভারতে বসবাসকারী তৎকালীন মুসলমানদের কেউ কেউ সুলতান মাহমূদের পক্ষে গোয়েন্দা কাজে অংশ গ্রহণ করে এবং সুযোগ মতো মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে।

অবশ্য তাদের মধ্য অনেকেই হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের জালে আটকে যায় কিংবা আবেগ তাড়িত হয়ে অথবা লোভকে সংবরণ করতে না পেরে তথ্য ফাঁস করে দেয়।

তালাল মাহমূদ ও সালেহ নামের দুই হিন্দুস্তানী ছিলো সুলতান মাহমূদের নিয়মিত গোয়েন্দা দলের সক্রিয় সদস্য। সুলতান মাহমূদকে তার স্থানীয় গোয়েন্দারা জানিয়ে দিয়েছিলো, মথুরা যতো সহজে জয় করা সম্ভব হয়েছে এতোটা সহজে কন্নৌজ জয় করা সম্ভব হবে না। কারণ, যমুনা নদীর তীরবর্তী মুনাজ নামের রাজপুত অধ্যুষিত দুর্গে যখন আক্রমণ করা হবে, তখন পিছন দিক থেকে কন্নৌজের সৈন্যরা আঘাত হানতে পারে। তাই মুসলিম বাহিনীকে গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থান করে শত্রুদের মোকাবেলা করতে হবে। ফলে মুসলিম সৈন্যদের পরাজিত হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। অপর দিকে লাহোরের মহারাজা ভীমপাল এই অঞ্চলের ছোট বড় সকল রাজা মহারাজাকেই জোটবদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। এমনও হতে পারে ভীমপাল নিজেও তার সৈন্যদেরকে এখানে নিয়ে এসে লড়াইয়ে লিপ্ত হবেন।

সুলতান মাহমূদের স্যৈন্যরা অব্যহত লড়াইয়ে ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। বহু সৈন্য ছিল আহত এবং নিহিত হয়েছিল প্রচুর। তা ছাড়া এরা নিজ ভূমি গযনী থেকে প্রায় তিন মাস সফরের দূরত্বে অবস্থান করছিল। এ পর্যায়ে এসে গযনী বাহিনী মারাত্মক ঝুকির সম্মুখীন হয়। তাদের গোয়েন্দাদের প্রেরিত তথ্য মতে তারা গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী হিন্দু ঘনবসতিপূর্ণ চতুর্দিকে শত্রু বেষ্টিত একটি জায়গায় এসে পৌছে। যেখানে তাদেরকে উজ্জীবিত-অক্লান্ত বিপুল সংখ্যক শত্রুসেনার বিরুদ্ধে বৈরী পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে লড়াই করতে হবে।

সুলতান যখন মথুরা থেকে কন্নৌজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, তখন সালেহ ও তালালকে আগে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল তারা যেন কন্নৌজের সৈন্যদের তৎপরতা সম্পর্কে সময় মতো সুলতানকে অবহিত করে।

সালেহ ও তালাল তিন দিন ধরে ছন্নছাড়া উপজাতীয় ছদ্মবেশে কন্নৌজের আশেপাশে ঘুরাঘুরি করেছে। তারা লোক চক্ষুর অন্তরালে উচু গাছ ও পাহাড়ের টিলার উপরে উঠেও কন্নৌজের সৈন্যদের তৎপরতা প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোথাও কন্নৌজের কোন সৈন্যের তৎপরতা তাদের নজরে

পড়েনি। গঙ্গা নদীর তীরে গিয়ে নদীতে চলাচলকারী নৌকাগুলোকেও তারা পর্যবেক্ষণ করেছে কিন্তু কিছুই তাদের চোখে ধরা পড়েনি।

দু'জনের মধ্যে তালাল কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সালেহ অন্যদিনের মতোই ছিল উজ্জীবিত চনমনে। সালেহ্ তার কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে সামান্যতম ত্রুটিও করতে প্রস্তুত নয়।

সময়টা ছিল ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। প্রচণ্ড ঠান্ডা। ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে বাচার জন্যে তারা একটি টিলার আড়ালে যেখানে বাতাস নেই এমন জায়গায় রাত কাটানোর জন্যে শুয়ে পড়ল।

রাতের এক প্রহরের পর সালেহর ঘুম ভেঙ্গে গেল। কোন কিছুর আওয়াজেই মূলত ঘুম ভেঙ্গে গেল তার। ঘুম ভেঙ্গে যেতেই উৎকর্ণ হয়ে কানে ভেসে আসা শব্দের উৎস বোঝার চেষ্টা করল সালেহ্। তারা যে পাহাড়ের ঢালুতে শুয়েছিল সেই পাহাড়ের নীচ দিয়ে কিছু সংখ্যক মানুষের চলাফেরার আওয়াজ শুনতে পেল সে। সে স্পষ্ট বুঝতে পেল ঘোড়ার খুড়ের শব্দ। মাথা উচু করে সে দেখতে পেলো। কিছু সংখ্যক লোক ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। অবস্থা বুঝার জন্য সে হামাগুড়ি দিয়ে কয়েকগজ এগিয়ে এমন জায়গায় ঘাপটি মেরে থাকল যেখান থেকে অশ্বরোহীদের পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। কাফেলার আগে আগে এক লোক মশাল হাতে যাচ্ছে। অনেকগুলো লোক অশ্বরোহী। তাদের সাথে কয়েকটি উটের উপর কি যেন বোঝাই করা হয়েছে।

সালেহ্ দেখতে পেল কাফেলার মাঝামাঝি একজন দীর্ঘ দেহী স্বাস্থ্যবান লোক। লোকটির পোশাক পরিচ্ছদ দেখতে পুরোহিতের মতো। পুরোহিতের পিছনে পাঁচটি ঘোড়া বোঝাই করা। একটি অপরটির সাথে রশি দিয়ে বাধা। প্রথম ঘোড়াটির লাগাম পুরোহিতে হাতে। সবার পেছনের ঘোড়াটির সাথে দীর্ঘ রশি বাধা এবং সেই রশির সাথেই বাধা আরো আটদশজন লোক। তাদের প্রত্যেকের দু'হাত সামনের লোকের কাধে এবং সবার চোখেই পট্টি বাধা। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল পুরোহিত ছাড়া কারো চোখ খোলা ছিলো না। সবাই খুব ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল।

পুরোহিত ক্ষীণ আওয়াজে বলেছিল, চলো চলো, আমি দেখতে পাচ্ছি। চলতে থাকো, পথ পরিস্কার আছে কোন অসুবিধা নেই।

চোখ বাধা এই কাফেলা ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসন হচ্ছিল। সালেহ্ এ ঘটনা দেখে ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে সঙ্গী তালালের কাছে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল এবং কানে কানে বললো, কোন শব্দ না করে হামাগুড়ি দিয়ে আমার সাথে এসো।

এবার তারা দু'জনেই চোখ বাধা এই কাফেলার গমন পথ দেখল। কিন্তু তারা এর কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না কারা কোন উদ্দেশ্যে কোথায় কেন এভাবে যাচ্ছে?

সালেহ্ ও তালাল একটি সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান নিয়ে কাফেলাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। কয়েকশ গজ অগ্রসর হয়ে পুরোহিতের নেতৃত্বাধীন এই কাফেলা থেমে গেল। ওখানে একটি খাড়া দেয়ালের মতো পাহাড় সোজা উপরেরর দিকে উঠে গেছে। সালেহ্ ও তালাল পা টিপে টিপে পাহাড়ের উপর দিয়ে সোজা খাড়া টিলার উপরে গিয়ে দাঁড়াল। তারা যেখানে দাঁড়াল, কাফেলাটি তাদের ঠিক নীচে থেমেছে। তখন নীচের মশালের আলো আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মশালের আলোয় তারা দেখতে পেলো, দেয়ালের মতো খাড়া টিলার বিপরীতে অপর একটি টিলার ভেতর অনেকটা গর্তের মতো ফাঁকা দেখা যাচ্ছে। ফাঁকা জায়গাটা এমন যে একটি ঘোড়া অনায়াসে তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।

পুরোহিত মশাল বাহকের কাছ থেকে মশাল নিয়ে বললো, তোমরা সবাই ঠাঁয় দাড়িয়ে থাকবে আমি এসে তোমাদের নিয়ে যাবো

পুরোহিত মশাল নিয়ে বিপরীত টিলার ভেতরের ফাকা জায়গায় প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর পুরোহিত আবার মশাল হাতে নিয়ে পাহাড়ের গর্তসম ফাঁকা জায়গার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো।

কেউ পট্টির ফাঁক দিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করবে না। কেউ যদি চোখের পট্টি সরিয়ে কিছু দেখতে চেষ্টা করো তবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। পুরোহিত চোখবাঁধা লোকগুলোকে হাত ধরে ঘোড়ার পিঠ থেকে কাঠের তৈরী কিছু বাক্স নামানোর কাজে লাগিয়ে দিল। পুরোহিত একটি মশাল জ্বালিয়ে নিজের হাতে নিলো এবং আরো দুটি মশাল জ্বালিয়ে সে সুবিধা মতো জায়গায় দু'জনকে দাড় করিয়ে দিল। ঘোড়ার পিঠ থেকে চোখবাধা লোকজন বাক্স উঠিয়ে পুরোহিতের

নির্দেশ মতো পাহাড়ের মধ্যকার ফাকা জায়গায় ঢুকাতে লাগলো, তারা বাক্স রেখে আবার অন্য বাক্স নিতে ফিরে আসতো। তাদের কেউ কেউ চোখ বাধা থাকার কারণে বাক্স নিয়ে পড়ে যেতো আবার উঠে পুরোহিতের নির্দেশ মতো চলতো। এভাবে একে একে সবগুলো বোঝাই করা ঘোড়ার পিঠ থেকে বাক্সগুলো নামানো হলো এবং চোখ বাধা লোকগুলোর প্রায় সবাই গর্তের মধ্যেই হারিয়ে গেল। অবস্থা দৃষ্টে তালাল ও সালেহর বুঝতে কষ্ট হলো না, এগুলো অবশ্যই কারো ধন-সম্পদ যা গোপনে লুকানো হচ্ছে। কিন্তু লোকগুলোর চোখ বেধে রাখার ব্যাপারটি তারা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না।

তালাল বললো, পুরোহিত বেশধারী লোকটি কোন ডাকাতদলের সর্দার হবে। আর চোখবাঁধা এই লোকগুলো হয়তো এই ডাকাত ধরে আনার মজদুর। হতে পারে ডাকাত সর্দারের অন্য লোকেরা আরো কোথাও লুটতরাজ করার জন্য চলে গেছে।

তালাল সালেহকে বললো, সালেহ ভাই! এই ডাকাত সর্দার যদি এখানে পাহারা না বসায়, তাহল আমরা দু'জনে যে পরিমাণ উঠাতে পারি সেই পরিমাণ সম্পদ নিয়ে নিতে পারি, কি বলো তুমি?

তালাল ভাই মন ঠিক করে নাও, তালালকে বললো সালেহ। এ সব চোরাই ধনসম্পদ দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। যে কর্তব্য পালনে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে সেই কাজের প্রতি আমাদের মনোযোগ রাখা বেশী দরকার।

আরে তাতো আছেই। আমি কি কর্তব্যে অবহেলা করছি নাকি? বললো তালাল। রাতে তো আর আমরা কোন কাজ করছি না। কোন না কোন ভাবে রাতটা তো আমাদের এখানে কাটাতেই হবে। কাজ যা করার তা তো আগামীকাল দিনের বেলায় করতে হবে। রাতের এই কর্মহীন সময়টা এ কাজে লাগাতে পারি। রাতেই যদি এই লোকগুলো এখান থেকে চলে যায় তবেই না আমরা কাজে হাত দেবো। আমার মনে হয় গুহার ভেতরে কেউ নেই। থাকলে নিশ্চয়ই তারা বাক্স নেয়ার জন্যে গুহার বাইরে আসতো।

না, লুটের সম্পদ নেয়ার জন্যে আমরা কিছুতেই রাতের অন্ধকারে অজানা গুহাতে প্রবেশ করবো না। বললো সালেহ। তালাল ভাই! সম্পদ আর নারীর

লোভ বহু রাজার রাজত্ব ধ্বংস করে দিয়েছে। ধন-সম্পদের প্রতি লোভ করো না। ধুত্তরী! তুমি মানুষ না একটা পাথর। পাগলের মতো কথাবার্তা বলো। তিরস্কারের সুরে সালেহকে বললো তালাল।

সালেহ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় পুরোহিত বেশধারী লোকটি মশাল হাতে নিয়ে গুহার ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো।

পুরোহিত চোখ বাধা লোকগুলোকে হাত ধরে ধরে ঘোড়ার পাশে আনল এবং এক এক করে সবাইকে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করিয়ে দিল। ঘোড়া ছিল কম লোক ছিল বেশী। দু'জন দু'জন করে এক একটি ঘোড়ার উপর বসিয়ে সবার আগের উটে সওয়ার হয়ে পুরোহিত বেশধারী ফিরতি পথ ধরলো।

লোকগুলো যখন অনেক দূরে চলে গেল তখ তালাল সালেহর উদ্দেশ্যে বললো, চলো, ব্যাপারটি কি দেখে আসি।

সালেহ তালালকে একাজে অগ্রসর হতে নিষেধ করলো। শুধু নিষেধই করলো না সে বলতে বাধ্য হলো, তুমি যদি ওখানে যেতে চাও তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করতে বাধ্য হবো।

সালেহর দৃঢ়তা ও কঠোর কথা শুনে তালাল হাসল এবং কথা না বাড়িয়ে উভয়েই শুয়ে পড়ল তখন রাত আর বেশী বাকী নেই।

ভোরের অন্ধকার থাকতেই পুরোহিত কন্নৌজের রাজা রাজ্যপালের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল। এ সময়ে রাজার জেগে থাকার কথা নয়। রাজার শয়ন কক্ষের দরজায় একজন বাদী দাড়ানো ছিল। সে পুরোহিতকে দেখেই রাজার শয়নকক্ষের ভেতরে প্রবেশ করল এবং ফিরে এসে পুরোহিতকে বললো, আপনি ভেতরে আসুন।

পুরোহিত রাজার কক্ষে প্রবেশ করলে রাজা পুরোহিতকে বললেন, কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আপনি আমার পাশে বসুন।

রাতেই ধন-সম্পদের শেষ বাক্সটিও সেই জায়গায় রেখে এসেছি মহারাজ!

যারা বাক্স বহন করেছিল এদের সবাইকে কি কারাগারে বন্দী করা হয়েছে?

এদেরকে কারাগারে বন্দী করার দরকার ছিল না মহারাজ! কারণ, তাদের সবার চোখ আমি কাপড় দিয়ে বেধে দিয়েছিলাম। তারপরও আপনার নির্দেশ

পালনার্থে সবাইকেই বন্দী শালায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। অবশ্য 'আমি কারারক্ষীদের বলে দিয়েছি তাদেকে যাতে আরামে রাখা হয় এবং খাতির যত্ন করা হয়।

পণ্ডিত মশাই! এখন আপনি ছাড়া আর কেউ আমার এই বিশাল সম্পদের খবর জানে না। আপনাকে আমি কোথা থেকে কোন পর্যায়ে তুলে এনেছি এবং কতোটা সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছি এ ব্যাপারটি নিশ্চয়ই বুঝে! আমি আমার সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতিকে পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছুই জানাইনি। আমার ছোট বিবি শকুন্তলাকে আমি কতোটা ভালবাসি আপনি জানেন, কিন্তু তাকেও আমি বুঝতে দেইনি, রাজপ্রাসাদের সকল সোনাদানা আমি দুর্গের বাইরে সরিয়ে দিচ্ছি।

আমার ব্যাপারে মহারাজের পূর্ণ আস্থা রাখা উচিত।

আমি সেই দিন থেকেই আপনার সহায় সম্পদ দুর্গের বাইরে নিতে শুরু করেছি যখন শুনেছি, সুলতান মাহমূদ মথুরা দখল করে নিয়েছে এবং তার পরবর্তী লক্ষ হচ্ছে কন্নৌজ দুর্গ।

আমি যে জায়াগায় আপনার সম্পদ লুকিয়েছি রাজ মহলের সবার চোখের আড়ালে এক রাতে আপনি আমার সাথে গিয়ে সেই জায়গা দেখে এসেছেন। গত রাতে আমি আপনার ধন-ভাণ্ডারের শেষ বাক্সও সেখানে রেখে এসেছি।

তার মানে কি আমার সোনাদানা সংরক্ষণের বিষয়টি নিরাপদে রয়েছে? পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলেন কন্নৌজের মহারাজা।

হ্যাঁ, এমনই সুরক্ষিত হয়েছে যে, আপনি একাকী সেখানে গেলে জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারবেন না। কারণ, আমি সেখানে কোন মানুষকে নিরাপত্তার দায়িত্বে রাখিনি, আমি ওখানকার নিরাপত্তায় রেখেছি সাপ।

আরেকটি কথা আপনাকে আমার বলতেই হচ্ছে, বললেন রাজা। যদি কোন কারণে এ বিষয়টা ফাঁস হয়ে যায় তবে সেই দিনটিই হবে আপনার জীবনের শেষ দিন। আর যদি আপনার আগে আমার মৃত্যু এসে যায়, তবে আমার সাথে আপনাকেও মরতে হবে।

রাজার এ কথায় পুরোহিতের ঠোটের কোণে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠলো। তিনি স্মিত হেসে রাজার উদ্দেশে বললেন,

ধন-সম্পদের লোভ মানুষকে পাষাণ বানিয়ে ফেলে। সম্পদের লোভে অনেকেই স্ত্রী সন্তান এবং ধর্মীয় গুরুকেও শত্রু ভাবতে শুরু করে। মহারাজ! আমার কাছে যে সম্পদ আছে এর কাছে আপনার এ সব ধনসম্পদ খুবই তুচ্ছ। আমার ভজন, আমার পার্থনা, অহোরাত্রী শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমার আত্ম নিবেদন এমন মুল্যবান সম্পদ যে, আপনাদের মতো রাজা মহারাজা, রাজ্যপাট, সেনাবাহিনীর দাপট আমার কাছে পিপিলিকার গড়ে তোলা আহার্যের স্তূপ মনে হয়।

হ্যাঁ, তাই ঠিক! এজন্যই তো আমি আপনাকে আমার এই গোপন রহস্যের ভেদ পুরুষ বানিয়েছি। বললেন রাজা রাজ্যপাল।

* * *

ঐতিহাসিক আল বিরুনী ও ফারিশ্‌তা লিখেছেন, সুলতান মাহমূদকে তার গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, কন্নৌজে গযনী বাহিনীর সাথে হিন্দুরা ভয়ংকর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কন্নৌজ রাজার নানা কাহিনী শুনে সুলতান মাহমূদ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, ক্রমশ সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকা সেনাবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করার জন্যে গযনী থেকে তার জন্যে কোন রসদ ও জনবল সরবরাহের উপায় ছিলো না। তিনি গভীর ভাবে চিন্তা করছিলেন, কন্নৌজ রাজাকে পরাজিত করতে হলে তাকে খুবই সতর্ক ও সার্থক চাল চালতে হবে। অবশ্য মথুরা জয়ের পর তিনি তার সৈন্যদের কিছুদিন বিশ্রাম দিয়েছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন বিজিত এলাকার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পথে পথে তার অনেক সৈন্যকে রেখে আসতে হয়েছে এবং অব্যাহত যুদ্ধে তার বহু সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। ফলে প্রয়োজনের তুলনায় তার জনবল যথেষ্ঠ কম। এ অবস্থায় সৈন্যদের কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ দিলেও সেনাপতি ডেপুটি সেনাপতি ও কমান্ডারদের তিনি ক্ষণিকের জন্য বিশ্রামের সুযোগ দেননি। তাদের প্রতিনিয়ত নিচ্ছিদ্র পরিকল্পনা গ্রহণ এবং শত্রুপক্ষের অবস্থা জানার কাজে ব্যস্ত রেখেছেন। সেই সাথে সাধারণ সৈনিকদেরকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করার জন্য ইমাম ও খতীবদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিযে একের পর এক দুর্গ জয় করার পর সৈন্যসংখ্যা অর্ধেকের চেয়ে নীচে নেমে এলেও তিনি আরো কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা করলেন। আরো কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা করলেন এটা ছিল সুলতান মাহমূদের এক প্রকার উন্মদনা বিজয় এবং কৌশলী চালের সাফল্যের উপর অত্যধিক আস্থার কারণ।

মজার ব্যাপার হলো, যে কন্নৌজ নিয়ে সুলতান মাহমূদ এতটা চিন্তিত বাস্তবে সেই কন্নৌজের অবস্থা ছিল তার ধারণার সম্পূর্ণ উল্টো। যুদ্ধ না করার বাসনায় মহারাজা রাজ্যপাল তার রাজকোষের গোটা সম্পদ রাজধানীর বাইরে পাহাড়ী এক গোপন জায়গায় সরাতে শুরু করেন। সুলতান মাহমূদের অব্যহত বিজয় এবং তার একের পর এক দুর্গ জয়ের ঘটনায় রাজ্যপাল তাকে হারানোর আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কন্নৌজের প্রধান পুরোহিত রাজা রাজ্যপালকে লড়াইয়ের জন্য উৎসাহিত করছিলেন। কিন্তু ১০১৮ সালের সেই ভোর বেলায় কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপাল প্রধান পুরোহিতকে এর কারণও বলেদিলেন। প্রধান পুরোহিত যখন প্রত্যুষে রাজার শয়নকক্ষে গিয়ে জানালেন–

মহারাজ! আপনার সকল ধণভাণ্ডার এখন সুরক্ষিত। এখন আপনি ধনরাজী হারানোর আশংকামুক্ত হয়ে দৃঢ়ভাবে মাহমূদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবেন। আর যদি তা না করেন তাহলে কন্নৌজের প্রধান মন্দিরও মসজিদে পরিণত হবে। আপনার ভুলে গেলে চলবে না, মুসলমানরা যাকে মূর্তি বলে সেগুলোই আমাদের দেবদেবী। এরই মধ্যে আমাদের দেবদেবীদের সাংঘাতিক অবমাননা করা হয়েছে। আপনাকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি, দেবদেবীদের অভিশাপ থেকে বাচার চেষ্টা আপনাকে করতেই হবে।

ভ্রুকুঞ্চিত করে মহারাজা রাজ্যপাল প্রধান পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে বললেন,

আপনি যাদেরকে দেবদেবী বলছেন, এগুলো আসলে মূর্তি। তারা যদি অভিশাপ দিয়ে কাউকে ধ্বংস করতে পারে, তবে অসংখ্য দেবদেবীর অপমান ও অমর্যাদার প্রতিশোধ নিতে মুসলিম সৈন্যদের ধ্বংস করে না কেন? মথুরার মন্দিরের মূর্তি ধ্বংস করে যারা আযান দিতে শুরু করেছে, তাদের উপর তারা বজ্রপাত হয়ে ভেঙ্গে পড়ে না কেন? এই মুসলমানরাই আসলে দেবদেবীদের

অভিশাপ। এরাই অভিশাপ হয়ে হিন্দুস্তানের রাজা মহারাজাদের উপর হামলে পড়ছে।

যে রাজা মহারাজা ধর্মের অমর্যাদা হওয়ার পর কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয় না, তাদের উপর অভিশাপতো পড়বেই। দেখুননা, আপনার মতো শক্তিশালী মহারাজাও তো নিজের ধন ভাণ্ডার নিয়ে ব্যস্ত। বললো প্রধান পুরোহিত।

ধনভাণ্ডার আমি লুকিয়েছি সত্য। কারণ, সুলতান মাহমূদ ধনরত্ন লুট করে গযনী নিয়ে যাবে। আমি তাকে কন্নৌজের ধনভাণ্ডার গযনী নিয়ে যেতে দেবো না। সে এখানে এসে ধনরত্নও পাবে না, আমাকেও খুঁজে পাবে না। সে আমাকে বন্দী করবে তো দূরে থাক আমার টিকিটিও পাবে না। সে পাগলের মতো আমাকে এবং আমার ধনভাণ্ডার তালাশ করবে। কিন্তু সে কিছুই খুঁজে পাবে না। আমাকেও পাবে না, আমার ধনভাণ্ডার পাবে না। সে যখন কন্নৌজ পৌছাবে আমি তখন এমন জায়াগায় থাকবো, যেখানে তার সকল সৈন্য মিলেও আমাকে খুঁজে পাবে না।

আপনাকে না পাক, কিন্তু মন্দিরতো তারা ঠিকই পাবে। তারা মন্দিরগুলো ধ্বংস করবে আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব ধ্বংসযজ্ঞ দেখবো।

মহারাজ! ধনসম্পদের ভালোবাসা আপনাকে কাপুরুষ বানিয়ে ফেলেছে। এজন্য আপনি গযনী সুলতানকে ধোকা দেয়ার চিন্তা করছেন। অথচ আপনি এটা ভাবছেন না, মাহমূদের ভয়ে যদি আপনি এখান থেকে লুকিয়ে পালিয়ে যান, কন্নৌজের সেনাবাহিনী ও লোকেরা আপনাকে ঘৃণা করবে। আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপে যাবে। মহারাজ! আমি আপনাকে ভগবানের দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করুন। কন্নৌজের আবাল-বৃদ্ধ প্রত্যেকেই লড়াই করে মরতে প্রস্তুত। গোটা দেশের মানুষকে আমি অগ্নিস্ফুলিঙে পরিণত করার দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি কন্নৌজের লোকদেরকে জলন্ত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত করবো।

আমাকে ভাবতে দিন পুরোহিত মশাই! আমাকে ভাবতে দিন। অস্থির হয়ে গেলেন মহারাজা রাজ্যপাল। পুরোহিতের কথায় তার চিন্তায় ছেদ পড়লো। তার পরিকল্পনা পুরোহিতের প্ররোচনায় এলোমেলো হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। অবশেষে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে মহারাজা রাজ্যপাল বললেন–

শুনুন পণ্ডিত মহাশয়! আমি অনেক ভেবে চিন্তে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন আপনি চলে যান। আপনাকে সব কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া সব ব্যাপার আপনার পক্ষে বুঝে উঠাও মুশকিল।

পুরোহিত হতাশ ও হতোদ্যম হয়ে চলে গেল। পুরোহিত চলে যাওয়ার পর মহারাজা রাজ্যপাল তার সেনাবাহিনীর সব উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ডেকে বললেন,

"দৃশ্যত মনে হতে পারে আমি কাপুরুষের পরিচয় দিচ্ছি আমি সুলতান মাহমূদের মোকাবেলা না করে আত্মগোপনে চলে যাবো। এটা হবে মাহমূদের জন্যে সব চেয়ে বেশী আঘাত। সে আমার খুঁজে গোটা কন্নৌজ জুড়ে পাগলের মতো আমাকে খোঁজাখুজি করবে। না পেয়ে সে তাড়াতাড়ি কন্নৌজ ছাড়ার চিন্তা করবে না। কারণ এখন পর্যন্ত শক্তভাবে হিন্দুস্তানে তার কারো মোকাবেলার সম্মুখীন হতে হয়নি। সহজেই সব জায়গায় সে বিজয়ী হয়ে গেছে। আমি ভাবছি একের পর এক লড়াই করে এবং বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করে সে যখন মনে করবে হিন্দুস্তানে তার মোকাবেলা করার কেউ নেই এবং তার জনবল বিভিন্ন জায়গায় ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে কমে যাবে তখণ অন্যান্য রাজাদের নিয়ে আমি একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলবো এবং এই কন্নৌজকেই মাহমূদ ও তার সৈন্যদের জন্যে কবরস্থানে পরিণত করবো।

কন্নৌজ রাজা রাজ্যপাল সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে লড়াই না করার নানা যুক্তি উপস্থাপন করছিলেন; কিন্তু তার সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা নীরবে তার বক্তৃতা শোনা ছাড়া কেউ কোন মন্তব্য করছিলো না। তাদের চেহারার অভিব্যক্তি বলে দিচ্ছিল, তারা মহারাজা রাজ্যপালের সিদ্ধান্তে মোটেও সুন্তুষ্ট হতে পারেনি। তবে তারা কেউ রাজার সিদ্ধান্তের বিপরীতে কিছুই বললো না।

এক পর্যায়ে রাজা রাজ্যপাল সকল সেনাকর্মকর্তার উদ্দেশ্যে বললেন, কি ব্যাপার? তোমরা কেউই কোন কথা বলছো না। আমর সিদ্ধান্ত তোমাদের মনপুত হয়েছে তো?

আমাদের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির ব্যাপার নয়। আমাদের কাজ আপনার নির্দেশ পালন করা। আমরা আপনার নির্দেশ পালন করবো, বললো তার প্রধান সেনাপতি। কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে কেউ লড়াই করতে অস্বীকৃতি জানাবে না।

মহারাজ! আসলে কন্নৌজে আপনার সশরীরে উপস্থিত থাকা না থাকার বিষয়টি এ ক্ষেত্রে প্রধান নয়। এখানে মূল বিষয় হচ্ছে, দুটি ধর্মের লড়াই। হিন্দু রাজারা যদি একের পর এক ময়দান ছেড়ে পালাতে থাকেন, তাহলে একদিন গোটা হিন্দুস্তানই মুসলমানদের দখলে চলে যাবে এবং এখানকার সকল মানুষই মুসলমান হয়ে যাবে।

সেনাপতির কথা শোনার পর মহারাজা রাজ্যপাল সেনাপতির দিকে একটি কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এটি সবাইকে পড়ে শোনাও।

কাগজটি ছিল লাহোরের মহারাজা ভীমপালের লেখা একটি চিঠি। যে চিঠিটি তিনি মুনাজের রাজা রায়চন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন। সেই চিঠি মুনাজের রাজা কন্নৌজ রাজার কাছে পাঠিয়ে দেন।

রাজা ভীমপাল রাজা রায়চন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, সুলতান মাহমূদ হিন্দুস্তানের রাজা মহারাজাদের মতো নয়। সে কোন শ্যামলা বাদামী মানুষের নেতা নয়। কিংবা কিছু সংখ্যক মেরুদণ্ডহীন অনুগত মানুষের শাসক নয়। তার কথা শুনলেই বহু তেজস্বী যোদ্ধাও তরবারী ফেলে পালিয়ে যায়। মনে রাখতে হবে তার ঘোড়ার জীন আপনার ঘোড়ার জীনের চেয়ে অবশ্যই মজবুত। সে কখনো এক আঘাতে তৃপ্ত হয়ে যায় না এবং একটি টিলা দখল করেই সে বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়ে না। আপনি যদি তার আক্রমণ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে চান, তবে আমি আপনাকে সতর্ক অনুরোধ করবো, আপনি লুকিয়ে পড়ুন।

রাজা রায়চন্দ্র এই চিঠি কন্নৌজ রাজার কাছে এই পয়গাম দিয়ে পাঠালেন যে, আমি লড়াই করে মৃত্যুবরণ করাকেই প্রাধান্য দেবো। এ ব্যাপারে আপনার করণীয় কি হবে সেটি আপনি ভেবে চিন্তে ঠিক করুন।

আমি জানি, সুলতান মাহমূদ কন্নৌজকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে। কিন্তু এই ধ্বংসস্তূপ তার জন্যেই কবরস্থানে পরিণত হবে এবং এই ধ্বংসস্তূপের উপর আবার নতুন কন্নৌজের জন্ম হবে। সেই কন্নৌজই হবে গোটা হিন্দুস্তানের নিরাপত্তার প্রহরী।

আমি তোমাদের বলা জরুরী মনে করছি, আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ বিষয়টি যাতে সাধারণ সৈনিক ও লোকেরা জানতে না পারে।

রাজার সিদ্ধান্তের কথা শুনে সকল সেনা কর্মকর্তা মাথা নীচু করে রাজার দরবার থেকে বেরিয়ে এলো।

এ ঘটনার পরের রাতের ঘটনা। কন্নৌজের প্রধান পুরোহিত মন্দিরের মূর্তির সামনে পুজা অর্চনায় মগ্ন। তখন রাত প্রায় অর্ধেক পেরিয়ে গেছে। সাধারণত মধ্য রাতে পুরোহিত পূজা অর্চনায় লিপ্ত থাকে না। কিন্তু কন্নৌজ রাজার সিদ্ধান্ত পুরোহিতকে পেরেশান করে তুলে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠে, সুলতান মাহমূদ আসছে। এসেই প্রথমে মন্দিরের মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করছে। এই আশংকায় শংকিত পুরোহিত তার পূজনীয় দেবদেবীদের পায়ে পড়ে আবেদন নিবেদন করছিল, দেবী ঐশ্বরিক শক্তি প্রয়োগ করে যেনো সুলতান মাহমূদকে কন্নৌজে পৌছার আগেই খতম করে দেয়। বিপর্যস্ত মনে দীর্ঘ সময় ধরে পুরোহিত মূর্তির সামনে কান্নাকাটি করে আবেদন নিবেদন করল এবং চিৎকার করে ভজন আওড়িয়ে নানা তন্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করল।

ঠিক এমন সময় মন্দিরের একেবারে গোপন প্রকোষ্ঠে পৌছার দরজা সশব্দে খুলে গেল। কিন্তু একান্ত মনে মূর্তির সামনে আত্মনিবেদনকারী পুরোহিতের কানে দরজা খোলার শব্দ পৌছাল না।

দরজা খোলে একজন নারী পুরোহিতের পেছনে এসে বসল। কিন্তু তখনও পুরোহিত কিছুই টের পেলো না। নারীটি যখন পুরোহিতের কাধে হাত রাখল তখন গা ঝাড়া দিয়ে পেছন ফিয়ে তাকিয়ে পুরোহিত দেখতে পেল তার পেছনে রাজার ছোট রাণী শকুন্তলা দাঁড়িয়ে তাঁর কাঁধে হাত রেখেছে।

অবাক বিস্ময়াভিভূত পুরোহিত মধ্যরাতে শুকুন্তলাকে মন্দিরে দেখে অবাক কণ্ঠে বললো; আরে! ছোট রাণী! আপনি.....? এই গভীর রাতে! অবশ্য পরক্ষণেই বিস্ময় কাটিয়ে পুরোহিত নিজেকে সামলে নিয়ে বললো,... ঠিক আছে আগে দেবীর চরণে মাথা রেখে পদধুলি নিন।

পুরোহিত কি বললো না বললো সে দিকে শকুন্তলা মোটেও ভ্রুক্ষেপ করলো না। মনে হলো তার কানে পুরোহিতের কথা ধ্বনিতই হয়নি। সে গভীর দৃষ্টিতে পুরোহিতের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল। শকুন্তলার তীব্র দৃষ্টিতে পুরোহিতের শরীরে একটা মৃদু কম্পন বয়ে গেল। কারণ পুরোহিত জানতো, শকুন্তলা খুবই দাপটে রাণী এবং রাজার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রিয় রাণী।

তাছাড়া অনিন্দ সুন্দরী শকুন্তলা। শকুন্তলার সৌন্দর্যে যাদুমাখা। পুরোহিতের বুঝতে বাকী রইলো না, এই গভীর রাতে রাণী মন্দিরে পূজা অর্চনা করতে আসেনি। এতোটা ধার্মিক মেয়ে শকুন্তলা নয়। তার আসার ধরন এবং চাহনীর ভাব দেখেই পুরোহিত বুঝে ফেলেছিলেন। শকুন্তলা নিশ্চয়ই কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এই গভীররাতে মন্দিরে এসেছে।

কী ব্যাপার? আপনি আমাকে দেখে এমন ঘাবড়ে গেলেন কেন পণ্ডিত মশাই? এমন সুন্দরী নারী কি আপনি আর দেখেন নি? আপনি যে সব কুমারী মেয়েদের মন্দিরে এনে নিজে ভোগ করেন এবং মানুষদের বলেন, এই কুমারী এখন পবিত্র হয়ে গেছে, ওদের রূপ সৌন্দর্য ও আকর্ষণের চেয়ে আমি মোটেও বেশী আকর্ষণীয় নই।

এসব কথা রেখে আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন সে কথা বললেই বেশী ভালো হয় মহারাণী। আপনি দেখছেন না আমি পূজায় ভজনে লিপ্ত?

পণ্ডিত মহারাজ? যদি আমরা পরস্পর পরস্পরকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা না করি, তাহলে উভয়ের জন্যই তা মঙ্গল হবে। দৃঢ় কণ্ঠে বললো শকুন্তলা। আপনি এসব কিসের পূজা করছেন? এসব দেবদেবীর। যারা দুদিনের মেহমান মাত্র। আপনার হরেকৃষ্ণ আর বাসুদেব মুসলমানদের তো কিছুই করতে পারলো না। কোথায় গেলো আপনার সেই কুমারী বলিদানের ফলাফল? কি লাভ হলো নিরপরাধ এই কুমারীগুলোর জীবন সংহার করে?

আপনিও কি মহারাজের মতো আমাকে ধর্মের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করতে এসেছেন?

না, আমি আপনাকে ধর্মের ব্যাপারে জ্ঞান দিতে আসিনি। আমি এসেছি আপনাকে মহারাজা বানাতে। আপনি শুধু আমাকে বলে দিন, রাজ্যের ধনভাণ্ডার আপনি কোথায় রেখেছেন? আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন। আপনি আর আমি সমস্ত ধনভাণ্ডার নিয়ে কোথাও চলে যাবো। এমনও হতে পারে, আমি আপনাকে কন্নৌজের রাজ সিংহাসনেও বসিয়ে দিতে পারি।

কিসের ধনভাণ্ডার? আমি কোন ধনভাণ্ডারের খবর জানি না।

হ্যাঁ, আমি জানি, আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন কিন্তু আমি জানি আপনি কি করেছেন, ধনভাণ্ডারের খবর আমাকে দিতেই

হবে। আমাকে ধর্ম ও দেবদেবীদের অভিশাপের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। ধর্মকে আমি ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছু মনে করি না। আমি শুধু ধনভাণ্ডার নিতে আসিনি। আপনাকেও সাথে করে নিয়ে যেতে এসেছি।

ধর্ম যাই হোক, ধর্মকে যারা ধোঁকা মনে করে তারা দুনিয়াতে সুখে থাকতে পারে না বললো পুরোহিত। জানেন, গযনীর সুলতান কেন একটির পর একটি বিজয় অর্জন করছে? এর কারণ শুধুই ধর্মের প্রতি ভালোবাসা। সে তো গোটা হিন্দুস্তানের সকল মানুষকেই ইসলামে দীক্ষা দিতে চায়। কিন্তু সে আমাদের ধর্মকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করে।

আমাদের ধর্ম ঘৃণা করার মতোই, বললো শুকুন্তলা। পণ্ডিত মহারাজ! আপনি আমার কথা বোঝার চেষ্টা করুন। আমি জানি বিগত বিশ পচিশ দিন যাবত আপনি রাজ্যের ধনভাণ্ডার কোন অজানা জায়গায় স্থানান্তরিত করেছেন। আপনি ভেবেছেন, আপনি আর মহারাজা ছাড়া এ ব্যাপারটি আর কেউ জানে না। আপনি হয়তো জানেন না, এই রাজ্যের কোন কিছুই আমার কাছে গোপন থাকে না। আপনি যদি এ ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা না করেন, তবে আপনাকে অনেক বেশী মূল্য দিতে হবে।

আপনি কি আপনার স্বামীকে ধোকা দিতে চাচ্ছেন?

কিসের স্বামী? মহারাজা শুধু আমার মতো এক জনের স্বামী নয়। গিয়ে দেখুন, আজ রাত তিনি আর কারো স্বামী। এজন্যই তো আমি আপনার কাছে আসার সুযোগ পেয়েছি। যতক্ষণ আমার রূপ সৌন্দর্য ঠিক আছে ততোক্ষণ পর্যন্ত মহারাজা আমার স্বামী। পণ্ডিত মহারাজ! আপনি জানেন, মানুষ যখন রাজসিংহাসনে বসে মাথায় রাজমুকুট ধারণ করে তখন আর তার মধ্যে মানবীয় আবেগ ভালোবাসা অবশিষ্ট থাকে না। এসব রাজা মহারাজা ধনসম্পদ ও ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুকেই ভালোবাসে না। আমার মতো সুন্দরী কন্নৌজ কন্যা ও বধুদেরকে গযনীর সুলতান বাদী বানিয়ে নিয়ে যাবে এনিয়ে মহারাজের কোন মাথা ব্যাথা নেই। তিনি তার ক্ষমতা ও ধনভাণ্ডার রক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। আপনার আমার জীবন ও ধর্মের ব্যাপারে তার কোন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নেই।

ওসব কথা থাক। মহারাজা যা করার তিনি তা করেছেন। আপনি আমি আমাদের চিন্তা করি। আপনি নিজের প্রতি ও আমার প্রতি মনোযোগ দিন।

আপনি যাই বলুন মহারাণী! আপনাকে আমি ধন ভাণ্ডারের খোঁজ দিতে পারবো না।

তাহলে তো আপনাকে অপহরণ করা হবে, বললো শকুন্তলা। কিন্তু আমি আপনাকে হত্যা করতে চাই না। প্রয়োজনে আমি আপনার দু'চোখ উপড়ে শরীরের চামড়া খসিয়ে গহীন জঙ্গলে ফেলে দেবো। আপনি সেই করুন মৃত্যুর কথা একটু ভেবে দেখুন, কি ভয়ংকরভাবে ধুকে ধুকে আপনাকে এই সুখের দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে।

আপনাকে আমি সহজে মরতে দেবো না। আপনার শরীরে বিষধর পিপড়া, পোকা ছেড়ে দেবো, আপনার জীবন্ত শরীরটাকে শিয়াল, কুকুর, কাক, শকুন ছিড়ে ছিড়ে খাবে। আপনাকে ধুকে ধুকে মরতে হবে।

নীরব নির্বাক অবস্থায় পুরোহিত শকুন্তলার নির্মমতার পরিকল্পনা শুনছিল। এ সব কথা শুনে তার বাকরুদ্ধ হয়ে গেল, তার শরীরটা অবশ হয়ে এলো। যে শকুন্তলা ছিল কন্নৌজের কিংবদন্তিতুল্য সুন্দরী, সেই সুন্দরী শকুন্তলা সাক্ষাত পেত্নীর রূপ ধরে পুরোহিতের সম্মুখে হাজির হলো। ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম কিন্তু কঠোর ভাষায় ধনভাণ্ডার কজা করার জন্য সে পুরোহিতকে গোপন রহস্য বলে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে লাগল।

শকুন্তলা বললো–

হ্যাঁ, অবশ্য আমি যদি আপনার জীবন সংহার না করতেই চাই তবে অন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবো। আমি এখান থেকে সোজা মহারাজার কাছে গিয়ে বলবো, আপনি আমাকে মন্দিরে ডেকে এনে আমার অসম্মান করেছেন, আমার সম্ভ্রমহানির অপচেষ্টা করেছেন। এ জন্য আমি প্রমাণও জোগার করে নেবো। নিজের নখ দিয়েই সারা শরীরে আঁচড় কেটে বলবো, আমি ধস্তাধস্তি করে আমার শরীরে নখের আঘাতে ক্ষত সৃষ্টি করেছেন আপনি।

এমনটি হলে মহারাজা আপনার কোন কথাই শুনবে না। কারণ মহারাজা জানেন, আপনার মন্দিরে কি হয়। মহারাজা জানেন, মন্দিরের প্রত্যেক পণ্ডিত পুরোহিত একেকজন নারীখেকো ....। ধর্মের দোহাই দিয়ে এখানে কুমারী বালিকাদের ধরে এনে তাদেরকে ভোগ করা হয়। প্রতিটি পুরোহিতই একেকটি নারী খাদক। তাই আপনি আমার বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই খাড়া করতে পারবেন

না। মহারাজা তার প্রিয় নারীর গায়ে হাত দেয়ার অপরাধে সোজা আপনাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেবেন। অবশ্য এই মৃত্যুটা হবে আপনার জন্যে খুব সহজ মৃত্যু।

না না রাণী! আমার প্রতি আপনি এতো নিষ্ঠুর হবেন না। আমি আপনাকে অবশ্যই ধনভাণ্ডারের কাছে নিয়ে যাবো। কখন কোন দিন যাবেন আপনি?

এখনই যাবো। তবে আপনাকে মনে রাখতে হবে মহারাজার কাছে যদি আমার এখবর পৌছে তবুও কিন্তু আপনার পরিণতি তাই হবে যা আমি এতোক্ষণ আপনাকে বলেছি। আমি দশজন পুরুষ ও দশজন নারীকে মহারাজার সামনে দাড় করিয়ে বলবো: আপনি আমাকে ধনভাণ্ডারের লোভ দেখিয়ে আপনার সাথে আমাকে পালানোর প্রস্তাব করেন, আমি আপনাকে হাতে নাতে পাকড়াও করার জন্যে আমার লোকজন নিয়ে ধনভাণ্ডার পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

ধনভাণ্ডার নিয়ে যাওয়ার জন্যে তো বহু লোকের দরকার। এই বিশাল কাজ কি এতোটা কম সময়ে এমন গোপনে করা সম্ভব?

আজ আমি শুধু ধনভাণ্ডার দেখে আসবো, এর পর বাকী কাজ গোপনেই করবো আমি। তা কিভাবে করবো, সে চিন্তা আমার। সেই কাজে আপনাকে আমি সঙ্গেই রাখবো। আপনার সাথে আমি প্রতারণা করবো না।

পুরোহিত উঠে দাঁড়াল।

* * *

তালাল ইবরাহীম সেই রাতটি পাহাড়ের ঢলেই কাটাল। সকাল বেলা তালাল সালেহকে বললো, সে পাহাড়ের সেই গুহাটা দেখতে চায়। কিন্তু সালেহ বললো, সবার আগে সে সেই কাজ করতে চায়, যে জন্যে তাদেরকে এখানে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তালাল গুহায় যাওয়ার জন্যে জিদ ধরল। শেষ পর্যন্ত তালালের জেদই বিজয়ী হলো। পুরোহিত যে পাহাড়ী গুহায় চোখ বাধা লোকদের নিয়ে গিয়েছিল। দিনের আলোয় সেই জায়গাটি ভূতুড়ে দেখাচ্ছিল। গুহার কাছের পাহাড়ী ঢালটি ছিল অবাক করার মতো। ঢালের উপরের অংশটি

ছিল খাড়া দেয়ালের মতো। চতুর্দিকে যেন পরিকল্পিত খাড়া দেয়াল। দেয়ালের উপরে নানা গাছ গাছালী ও ঝোপ ঝাড়। ঝোপ ঝাড়ের লতাপাতাগুলো খাড়া হয়ে উপড়ের দিকে না উঠে গর্তের দিকে ঝুকে রয়েছে। ফলে গুহার দিকে ছায়া পড়ে জায়গাটি একটি পরিত্যাক্ত কুয়ার মতো দেখাচ্ছে।

তালাল ও সালেহ্ গুহার ভেতরে চলে গেল। বাস্তবেও যেন এটি একটি কুয়া। যা প্রাকৃতিক ভাবে পাহাড়ের ভেতরে তৈরী হয়ে রয়েছে। কুয়ার মতো জায়গাটিতে কিছু পানি ছিল কিন্তু সেখানে পানির চেয়ে কাদাই বেশী। কূয়ার পাড় দিয়ে চলাচলের জন্যে কিছুটা শুকনো মাটির তৈরী পথের মতো ছিল। তালাল ও সালেহ্ সেই পথ দিয়ে আরো অগ্রসর হলো। কিছুটা অগ্রসর হয়ে তারা দেখতে পেল এটি মাটির তৈরী টিলার মতো। পুরোহিতের লোকেরা এই টিলার আড়ালেই হারিয়ে গিয়েছিল।

উভয়েই মাটির টিলার উপর উঠে দেখল, টিলার ঢালুতে একটি দরজার মতো। দরজাটি ঝুলন্ত লতাপাতা ও গাছ গাছালীতে প্রায় ঢাকা রয়েছে। তারা সেই দরজার মতো জায়গা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলে দেখতে পেল কক্ষের মতো একটি জায়গা। তাতে যে কোন মানুষ খাড়া হয়ে প্রবেশ করতে পারবে। ঘর সদৃশ জায়গাটি ছিল অন্ধকার। অন্ধকার ঘরের মতো জায়গাটিতে উভয়েই হাতড়ে হাতড়ে গুপ্তধন তালশ করল কিন্তু মাটি পাথরের অস্তিত্ব ছাড়া তাদের হাতে আর কোন জিনিসের অস্তিত্ব ধরা পড়ল না।

এই ঘরের মধ্যেই একটি গুহার মতো সুড়ং দেখতে পেল তারা। সুড়ং পথটি এতোটাই অন্ধকার যে সেখানে কি রয়েছে তা আন্দাজ করা অসম্ভব। অনেক্ষণ এখানে কাটানোর পর সালেহ বিরক্ত হয়ে তালালকে বললো, তুমি যদি এখানে থাকতে চাও তো থাকো, আমি চললাম।

ক্ষুব্ধ সালেহকে আর বিরক্ত না করে তালালও একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সালেহর অনুগামী হলো। কিন্তু বার বার সে পিছনে ফিরে ফিরে গুহাটি দেখছিল। তালালের অবস্থা দেখে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিল, কর্তব্য পালনের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। বনের এই কোনটি ছিল অনেকটা ভূতুড়ে এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। সালেহ তালালকে নিয়ে প্রায় চারপাচ মাইল দূরে চলে এলো এবং সেখানে একটি পাহাড়ের উপড়ে উঠে দাঁড়ালো। এখান থেকে তারা

কন্নৌজ দুর্গের ভেতরকার অবস্থা পরিস্কার দেখতে পাওয়া যায়। দীর্ঘক্ষণ তারা পাহাড়ের চূড়ায় দাড়িয়ে কন্নৌজ দুর্গ ও শহরে সৈন্যদের তৎপরতা দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু তারা সৈন্যদের কোন তৎপরতা দেখতে পেল না।

সুলতান হয়তো তখন মুনাজের কাছাকাছি পৌছে গেছেন। কিন্তু এখনো আমরা জন্নৌজের কিছুই দেখতে পেলাম না। সালেহ্ তার সঙ্গী তালালের উদ্দেশ্যে বলল।

দু'জন মানুষ আমরা। আমাদের পক্ষে পায়ে হেটে আর কতটুকু এলাকা দেখা সম্ভব, বললো তালাল। এমনও হতে পারে, কন্নৌজের সৈন্যরা রাতের অন্ধকারে অন্য কোন পথে মুনাজ চলে গেছে।

সব জায়গায়ই আমাদের লোক আছে'– বললো সালেহ। আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, কন্নৌজ থেকে কোন সেনাবাহিনী দুর্গের বাইরে বের হয়নি।

সারা দিন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে রাতের বেলায় তালাল ও সালেহ্ পুনরায় আগের জায়াগায় রাত কাটানোর জন্যে চলে এলো। সালেহ্ তালালকে বললো, সে রাত সেখানে কাটাবে সত্য? তবে অর্ধেক রাত ঘুমাবে এবং বাকী অর্ধেক রাতে সে কন্নৌজের আরো কাছে চলে যাবে। কারণ, রাতের বেলায় কন্নৌজের সৈন্যরা তৎপরতা চালাতে পারে। তারা উভয়েই আগের রাতের জায়গায় শুয়ে পড়ল। সারা দিনের ঘোরাঘুরিতে উভয়েই ছিল ক্লান্ত। ফলে শোয়ার সাথে সাথে উভয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

অর্ধরাতের কিছুটা আগে ঘোড়ার খুড়ের আওয়াজে সালেহের ঘুম ভেঙ্গে গেল। পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্কতার প্রয়োজনে সে তালালকে জাগিয়ে দিল। এদিকে তাদের কানে আরো জোরালো হয়ে উঠলো ঘোড়ার খুড়ের আওয়াজ। একটু পরেই এক অশ্বারোহী নজরে পড়ল। সেই সাথে আলোর মশাল।

মনে হচ্ছে আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেছে। দুই তিনটি ঘোড়ার খুড়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এদের পেছনে হয়তো সেনাবাহিনী আসছে।

তারা উভয়েই হামাগুড়ি দিয়ে এমন একটা জায়গা চলে এলো, যেখানে তাদেরকে কারো পক্ষে দেখা সম্ভব নয় কিন্তু তারা পাহাড়ের ঢালের পাহাড়ের নীচ দিয়ে যাতায়াতকারী সবাইকে পরিস্কার দেখতে পাবে।

কিছুক্ষণ পর তারা দু'জন অশ্বরোহীকে দেখতে পেল। একজনের হাতে একটি মশাল। অশ্বরোহী লোক দু'জন যখন তাদের আরো কাছে এলো, তখন তালাল বললো, মনে হচ্ছে এই লোকটি গত রাতের সেই লোক এবং তার সাথে আসা লোকটি কোন নারী।

হতভাগার দল। সেনাবাহিনীর সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। বললো সালেহ। আগন্তুক অশ্বরোহী কূয়ার মতো পাহাড়ের গুহার কাছে এসে থামল এবং এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে ফাঁকা জায়গায় প্রবেশ করল। আগন্তুকের একজন ছিল পুরোহিত আর অপরজন রাজ্যপালের কনিষ্ঠা স্ত্রী রাণী শকুন্তলা।

তারা উভয়েই ফাঁকা জায়গার ভেতরে গিয়ে দরজার মতো ফাঁকা জায়গা দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

সালেহ ভাই! আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, চলো না ব্যাপারটি কি দেখে আসি, বললো তালাল।

এটা দেখার কি আছে। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছো, একজন নারী আর একজন পুরুষ। নারী লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছে সে কোন সাধারণ মহিলা নয় কোন শাহজাদী হবে হয়তো। জবাব দিল সালেহ।

রাতের এই আগন্তুক নারী কিংবা পুরোহিত কারো প্রতি সালেহর কোন আকর্ষন ছিল না। কিন্তু তালালের মন কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না। সে সালেহর কথার তোয়াক্কা না করে হঠাৎ করে দৌড়ে নীচে নেমে গেল। সালেহ তাকে আটকাতে পারল না। বাধ্য হয়ে সেও নীচে নেমে এলো।

তারা উভয়েই তাদের পরিধেয় কাপড়ের নীচে একটি করে খঞ্জর ও তরবারী লুকিয়ে রাখতো। উভয়েই তরবারী বের করে অত্যন্ত সন্তর্পনে কাদা পানির কিনারা দিয়ে গুহার একেবারে দরজার মতো ফাকা জায়গাটির কাছে চলে গেল।

পুরোহিতের হাতে রাখা প্রজ্জ্বলিত মশাল গুহার ভেতর থেকে বাইরে কিঞ্চিত আলো বিকিরণ করছিলো। পুরেহিত ও শকুন্তলা কেউই কল্পনা করতে পারেনি, এই গভীর রাতে এখানে তারা দু'জন ছাড়া আর কোন মানুষের অস্তিত্ব থাকতে পারে। পুরোহিত ও শকুন্তলা পরস্পর যে কথাবার্তা বলছিল তালাল ও সালেহ গর্তের বাইরে থেকে তা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল।

রানী! এখানেই ধনভাণ্ডার রাখা হয়েছে। আমি আপনাকে আবারো অনুরোধ করছি, আপনি এই লোভে না পড়ে চলে যান। শকুন্তলার উদ্দেশ্যে বললো পুরোহিত।

এখানে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, বললো শকুন্তলা। কি ব্যাপারে? ধনভাণ্ডার কি এই বিছানার নীচে? জিজ্ঞেস করলো শকুন্তলা।

শুনুন রানী! এখন আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে হত্যা করতে পারি। আপনি আমাকে হত্যার হুমকি দিয়ে ছিলেন এবং আমাকে কঠোর শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এখন যদি আমি আপনাকে হত্যা করি, তাহলে বলেন কে আমার হাত থেকে আপনাকে বাঁচাবে? আপনাকে আমি হত্যা করে মরদেহ এমন জায়গায় লুকিয়ে ফেলতে পারি, শতবার তালাশ করেও আপনার মরদেহের কোন চিহ্ন কেউ খুঁজে পাবে না।

খবরদার পণ্ডিত মশায়! হুমকির সুরে বললো রাণী। মনে করবেন না এই নির্জনে আপনি আমাকে অবলা নারী ভেবে প্রতিশোধ নিয়ে নেবেন। পণ্ডিতজী মহারাজ! আমি আবারো আপনাকে বলছি, নিজেকে ধোঁকায় ফেলবেন না।

মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও রাণী! যদি কাউকে ডাকার প্রয়োজন হয় তবে খুব জোরে চিৎকার করতে পারো, তবে কোন লাভ হবে না।

দোহাই পণ্ডিতজী মহারাজ! খঞ্জর বের করবেন না। দয়া করে আমার একটি কথা শুনুন। হাত দরাজ করে প্রার্থনার সুরে বললো শকুন্তলা।

এ সময় গুহার ভেতর থেকে ধস্তাধস্তি ও অস্বাভাবিক কিছু আওয়াজ শোন গেলো। পুরোহিত শকুন্তলার উপর আক্রমণ করছিলো আর শকুন্তলা বাঁচার জন্যে চেষ্টা করছিলো এবং পুরোহিতের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে শকুন্তলা গুহার ফাঁকা জায়গায় দৌড়াচ্ছিলো।

পলায়নপর শকুন্তলাকে ধরার জন্যে পুরোহিত ছুটাছুটি করছিলো। জ্বলন্ত মশালটি তখন এক জায়গায় মাটিতে গেড়ে দেয়া হয়েছিল। বড় একটি ঘরের মতো গুহাটি ছিল মশালের আলোয় আলোকিত।

পুরোহিত শকুন্তলাকে দৌড়াতে দৌড়াতে এক পর্যায়ে গুহায় প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল। এদিকে শকুন্তলাও পালানোর জন্যে গুহার প্রবেশ মুখের দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে থেমে গেল। তারা উভয়েই দেখতে পেল

ভবঘুরে বেদুঈনের বেশে ময়লা ছেড়া পোশাকের দুটি লোক খোলা তরবারী নিয়ে গুহা দাঁড়ানো।

অবস্থা দেখে পুরোহিত ও শকুন্তলা উভয়েরই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। এদিকে তালাল সালেহ ও নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। কোন কথা বলছিল না।

নিজেকে সামলে নিয়ে খুবই দৃঢ়তা ও গম্ভীর কণ্ঠে পুরোহিত বললেন, কে তোমরা? এখানে কিসের জন্য দাড়িয়ে আছো? চলে যাও এখান থেকে। এখানে আমাদের অনেক লোক আছে। ওরা এলে তোমাদের টুকরোও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হাতের খঞ্জর ফেলে দাও, দৃঢ় অথচ সহজ গলায় বললো তালাল। খঞ্জর ফেলে দিয়ে উভয়েই আমাদের সামনে এসো। এখানে তোমরা কি করছো, কি আছে এখানে?

পুরোহিত স্মিত হেসে বললেন, আমরা মুসাফির। আমরা কন্নৌজ যাবো। এই মহিলা আমার বিবি। বাইরে আমাদের ঘোড়া দাঁড়ানো রয়েছে। রাতটা কাটানোর জন্যে আমরা এখানে যাত্রা বিরতি করেছি।

সালেহ নীরবে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তালাল কিছুটা অগ্রসর হয়ে এক ঝটকায় পুরোহিতের হাত থেকে খঞ্জরটা ছিনিয়ে নিয়ে তার তরবারীর আগা পুরোহিতের ঘাড়ে ঠেকিয়ে বললো–

জীবন বাচাতে চাও তো সত্য বলো, এখানে কি আছে? ইচ্ছা করলে আমরাও তা খুঁজে দেখতে পারি, কিন্তু তখন আর তুমি বেঁচে থাকবে না এবং এই নারী থাকবে আমাদের দখলে। তালাল শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি কি বলছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। অতএব পরিণতি কি হতে পারে একটু চিন্তা কর।

এখানে ধনভাণ্ডার আছে। তোমরা যা চাও, তাই আমি তোমাদের দিয়ে দেবো। তোমরা তা নিয়ে চলে যাবে। বললো শকুন্তলা।

হ্যাঁ, এখানে ধনভাণ্ডার লুকানো রয়েছে। সে যা বলেছে তাই সত্য। বললেন পুরোহিত।

এই পাহাড়ে ধনভাণ্ডার কোত্থেকে এলো। আর তোমাদের পরিচয় কি? জানতে চাইলো তালাল।

আমি কন্নৌজের প্রধান মন্দিরের প্রদান পুরোহিত। আর সে কন্নৌজ রাজার স্ত্রী রাণী। তোমরা যদি পুরস্কার নিতে চাও, তবে আমি তোমাদের পুরস্কার দিয়ে দেবো। কিন্তু তোমাদেরকে পুরস্কার নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে। তালালের উদ্দেশ্যে বললো পুরোহিত।

চলে যাবো না থাকবো সেটা আমরা ভেবে দেখবো। এর আগে বলো ধনভাণ্ডার কোথায়? পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলো তালাল। এসো। বলে রাণী শকুন্তলা তালালের বাজু ধরে তাকে নিয়ে গুহার কাছে চলে গেল এবং বললো, আমি তোমাকে ধনভাণ্ডার দেখিয়ে দিচ্ছি।

শকুন্তলার আহ্বানে তালাল তার সঙ্গে চলে গেল। সালেহ্ তাকে বাধা দিল কিন্তু তালাল বাধা মানল না। সালেহ্ তখন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে কি করবে। সে তালালের অনুসরণও করতে পারছে না, আবার পুরোহিতকেও ছেড়ে যেতে পারছে না। কারণ, পুরোহিতকে ছেড়ে দিলে সে হয়তো তার অন্য লোকদের ডেকে নিয়ে আসতে পারে। এদিকে শকুন্তলার মতো সুন্দরী নারীর সাথে তালালের চলে যাওয়াটাকেও সে মেনে নিতে চাচ্ছে না। কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় সালেহ হাতের তরবারী উঠিয়ে পুরোহিতের সামনে দাড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালেহ্ আশংকা করছিল, তালাল জীবিত ফিরে এলেও এই সুন্দরী নারীর কুপ্রভাব তার উপর পড়বেই পড়বে।

শকুন্তলা ও তালাল কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো। তালালের চেহারা ও তার ভাবভঙ্গিই বলে দিচ্ছিল, সে আর গযনী বাহিনীর দৃঢ়চেতা কর্তব্য পরায়ন গোয়েন্দা নয়; সে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন তালাল।

তালাল এসেই পুরোহিতকে বললো, সে যেন বলে দেয় আসলে ধণভাণ্ডার কোথায় আছে?

এ সময় সালেহ হুংকার দিয়ে বললো; তালাল! বেরিয়ে এসো ওখান থেকে।

তালাল সালেহ্'র দিকে একবার তাকিয়ে পুরোহিত ও শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে বললো, তোমরা দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে বসো। এর পর তালাল সালেহকে ওখান থেকে একটু দূরে নিয়ে বললো,

সালেহ্ ভাই! আমার কথাটি মনোযোগ দিয়ে শোন। আমি মোটেও কর্তব্য ভুলে যাইনি এবং কর্তব্য পালনে কোনরূপ অবহেলা করছি না। আমি তোমাকে

ধোঁকা দিচ্ছি না। এখান থেকে আমরা দু'জনে যদি কিছু নিয়ে নেই তাতে ক্ষতি কি?

তালাল! তোমার শরীর থেকে আমি এই মহিলার দুর্গন্ধ পাচ্ছি, সেই সাথে তোমাকে অপবিত্র মনে হচ্ছে। নারীর সবচেয়ে বড় শক্তিই হচ্ছে তার নারীত্ব আর পুরুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো তার পৌরুষত্ব। আমার তখনই সন্দেহ হচ্ছিল ওই মহিলা তোমাকে কোন মন্দ উদ্দেশ্যে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি দাবি করছো, আমাকে তুমি কোনরূপ ধোঁকা দিচ্ছো না।........

কিন্তু আমি মনে করছি এই নারী ও গুপ্তধন তোমার ও আমার মধ্যে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে কেন্দ্র করে তুমি ও আমি এক সময় একে অন্যের প্রতিপক্ষে পরিণত হতে পারি। তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয়, সুলতান মাহমূদের জয় পরাজয় তোমার ও আমার কর্তব্য পালনের উপরই নির্ভর করে।

সালেহ ভাই! আমার কথাটি একটু শোন। আমরা হিন্দুস্তানের মানুষ। গযনীর লোকেরা আমাদের কি দেয়? গযনী সেনাবাহিনীর কাছ থেকে আমরা যে সামান্য পারিশ্রমিক পাই, মৃত্যু ঝুকি নিয়ে এই জটিল কাজের এতটুকু বিনিময় কি যথেষ্ট?

যে দায়িত্ব আমরা কাধে তুলে নিয়েছি, এর প্রতিদান দেবেন মহান আল্লাহ। তালাল! তুমি কেন নিজেক গযনী সেনাদের কর্মচারী মনে করছো। আমরা গযনী বাহিনীর কর্মচারী নই; ইসলামের সৈনিক।

সালেহ ভাই! হাতের কাছে এতো বিপুল সম্পদ পেয়েও তা ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না।

নিজের লক্ষ্যের কথাটি একবার স্মরণ করো তালাল। আমরা কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে শপথ করে ছিলাম কর্তব্য পালনে প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দেবো। কিন্তু কর্তৃপক্ষকে ধোকা দেবো না। আমরা শপথ করেছিলাম, আমাদের পায়ের নীচে যদি স্বর্ণমুদ্রার স্তুপ ঢেরে দেয়া হয় তবুও সেদিকে তাকাবো না। সর্ববস্থায় নিজের ঈমানকে রক্ষা করবো। প্রিয় তালাল ! কখন কার মৃত্যু এসে যায় বলা যায় না। এমনও হতে পারে ঈমানের বিপরীতে এই সম্পদ জীবনে ভোগ করার সময়ই পাওয়া যাবে না, এর আগেই মৃত্যু এসে যাবে।

ঠিক আছে সালেহ ভাই! আমাকে সময় মতো পরীক্ষা করে নিও। এখন তুমি একটু এখানে দাঁড়াও, আমাকে ওখান থেকে কিছু নিয়ে আসার সুযোগ দাও। এই বলে তালাল সালেহর কথায় ভ্রুক্ষেপ না করেই আবার পুরোহিতের কাছে চলে গেল।

তালাল পুরোহিতকে বললো, আমাকে ধনভাণ্ডারের কাছে নিয়ে চলো।

হ্যাঁ, পণ্ডিত মহারাজ! এখন আর আমাদের অপেক্ষা করার সময় নেই। চলুন! তালালের সুরে সুর মিলিয়ে শকুন্তলাও পুরোহিতকে ধনভাণ্ডার দেখিয়ে দেয়ার তাগাদা দিল।

পুরোহিত বসা অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে ফাঁকা দেয়ালের এক জায়গায় আঙুল রেখে তালাল ও সালেহর উদ্দেশ্যে বললো, তোমরা উভয়েই তোমাদের তরবারী বর্শার মতো করে এখানে আঘাত করো।

পুরোহিতের কথায় সালেহ কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না। সে ঠায় নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইল। তালাল অগ্রসর হয়ে সেখানে তরবারী দিয়ে আঘাত করলে তরবারী অর্ধেকেরও বেশী সেখানে দেবে গেল। এবার তালাল সালেহকে আসার জন্যে ডাকল। কিন্তু সালেহ বললো, তোমাদের এই ধনভাণ্ডারের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। সালেহ তরবারী তালালের দিকে নিক্ষেপ করে বললো, এই নাও তরবারী। যা করার তুমিই করো।

পুরোহিত তরবারী উঠিয়ে নিয়ে তালালের তরবারীর পাশে বিদ্ধ করে তালালকে বললো, এখন তরবারী দুটো আরো ডানদিকে দাবিয়ে দাও।

উভয় তরবারী যখন ডান দিকে দাবিয়ে দিল, তখন মাটির একটি চাকার মতো ধীরে ধীরে সরে আসতে শুরু করল। এখানে নিশ্চয় আলগা মাটির কোন দেয়াল আছে। তালাল মাটির দেয়ালটিকে শক্ত করে টান দিলে সেটি গড়িয়ে পড়ে গেল এবং একটি সুড়ং এর মতো ফাঁকা জায়গা বেরিয়ে এলো।

রাণী! তুমি এই সুড়ং পথে ঢুকে পড়ো। রাণীর উদ্দেশ্যে একথা বলে পুরোহিত তালালের উদ্দেশ্যে বললো–

তুমিও এর মধ্যে প্রবেশ কর। আমি মশাল নিয়ে তোমার পেছনে পেছনে আসছি।

সালেহর দিকে তাকিয়ে পুরোহিত বললো, তুমি! তুমি কি ভেতরে যাবে না?সালেহ মাথা নেড়ে বললো–

না, আমি ঢুকবো না।

সালেহর অনাগ্রহ দেখে পুরোহিতের ঠোটের কোণায় স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

রাণী শকুন্তলা, পুরোহিতের কথা শোনেই মাথা নীচু করে সুড়ং এর মধ্যে ঢুকে পড়ল। তার পিছু পিছু তালালও প্রবেশ করল। পুরোহিত তাদের উদ্দেশে বললো, অন্ধকার দেখে তোমরা ভয় করো না।

সালেহ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবছিল, পুরোহিত হয়তো মশাল নিয়ে ওদের পিছু পিছু যাবে। কিন্তু ওরা ভেতরে প্রবেশ করার পর পুরোহিত মশালের দিকে ভ্রূক্ষেপই করল না।

একটু পরেই সুড়ং এর ভেতর থেকে কোন কিছু পিছলে পড়ার শব্দ শোনা গেল। এরপর দুবার ধমকের আওয়াজ শোনা গেল। এরই মধ্যে কানে ভেসে এলো শকুন্তলার ক্ষীণ চিৎকার। এ সময় পুরোহিত আড় চোখে সালেহর দিকে তাকাল। পুরোহিতের ঠোটের স্মিত হাসি তখন আরো প্রলম্বিত হয়েছে।

ততক্ষণে সুড়ং এর ভেতরে শোনা গেল তালালের চিৎকার।

সালেহ ভাই! আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করো।

তালালের চিৎকার শুনে কোন বিপদ মনে করে সালেহ সুড়ং এর ভেতরের দিকে দৌড় দিতে চাচ্ছিল ঠিক তখনই পুরোহিত তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বলল–

তুমি বলেছিলে এ সব ধনভাণ্ডারে প্রতি তোমার কোন আগ্রহ নেই। তাই তুমি এখানেই থাকো। তোমার মতো মানুষের বেচে থাকার দরকার আছে।

সুড়ং এর ভেতর থেকে ক্রমান্বয়ে শকুন্তলা ও তালালের আর্তচিৎকার আরো প্রকট ভাবে আসতে লাগল। চিৎকার শুনে মনে হচ্ছিল তারা সুড়ং এর মধ্যে কোন গভীর গর্তে পড়ে গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সালেহ করণীয় কি বুঝে উঠতে প্যারছিল না। সে এটাও বুঝতে পারছিল না আসলে ভেতরে ওরা কেন চিৎকার করছে। সে নীরবে পুরোহিতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল।

কিছুক্ষণ পর সালেহ পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করল, ওরা ভেতরে চিৎকার করছে কেন? পুরোহিত জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে সালেহকে বললো,

তুমি আমার পেছনে পেছনে এসো। তোমাকে চিৎকারের কারণ দেখাচ্ছি।

পুরোহিত মশাল নিয়ে আগে আগে সুড়ং পথে প্রবেশ করল। সালেহ পুরোহিতকে অনুসরণ করল। পনেরো বিশ কদম অগ্রসর হয়ে পুরোহিত থেমে গেল এবং সালেহর উদ্দেশ্যে বলল, তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও! সাবধান সামনে অগ্রসর হবে না।

পুরোহিত এবার হাতের মশালটিকে নীচের দিকে তাক করাল। সালেহ উঁকি দিয়ে দেখতে পেল, সামনে একটি গভীর কূপ। সেই গভীর কূপ থেকে শকুন্তলা ও তালালের আর্তচিৎকতার ভেসে আসছে। ততক্ষণে তাদের আর্তচিৎকার অনেকটাই ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

পুরোহিত সালেহর উদ্দেশ্যে বলল, চলো, এবার এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। উভয়েই যখন সুড়ং এর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো, তখন পুরোহিত মাটিতে ক্লান্তিতে বসে পড়ল এবং সালেহর উদ্দেশে বলল, এসো, এখানে বসো। এখন বন্ধুর মতো তোমাকে আমি দুটি কথা বলবো।

সালেহ পুরোহিতের কাছে জানতে চাইলো, আগে আমাকে বলো, যা দেখলাম, তা আসলে কি? তুমি তো তাদেরকে ধনভাণ্ডার দেখতে পাঠিয়ে ছিলে?

আরে দোস্ত! আগে বলো, তোমার পরিচয় কি? সালেহকে জিজ্ঞেস করলো পুরোহিত। তুমি যদি পরিচয় দিতে না চাও। তবে আমি তোমার পরিচয় বলে দিতে পারি। আসলে তুমি মুসলমান। অবশ্য মুসলমান হলেও তুমি হিন্দুস্তানী মুসলমান। তবে তোমরা উভয়েই গযনী বাহিনীর গোয়েন্দা। কি? আমি ঠিক বলিনি?

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। পুরোহিতের কথায় সায় দিলো সালেহ। কিন্তু আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

যে গভীর কূপ তুমি দেখেছো, এই কূপের মধ্যে হিন্দুস্তানের সবচেয়ে ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ রয়েছে। যে সাপে এদের ধ্বংস করেছে।

এ গর্ত আমি খুঁড়েছি এবং এর মধ্যে সাপও আমিই রেখেছি। গর্তের উপড়ে খড়কুটা বিছিয়ে তাতে মাটির আবরণ দিয়েছি। এরা সাথে মশাল নিয়ে গেলেও বুঝতে পারতো না, মাটির নীচে গভীর গর্ত রয়েছে, আর সেই গর্তে অপেক্ষা করছে ওদের মরণ! বললো, পুরোহিত।

তাহলে ধনভাণ্ডার কোথায় রেখেছো? পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলো সালেহ।

ওখানেই আছে, তবে ধনভাণ্ডারে যেতে হলে গুহার উপরে কোন পাটাতন রেখে সেটি পেরিয়ে যেতে হবে। অবশ্য এছাড়াও নিরাপদ আরেকটি পথ আছে।

যাক আমাকে আর সেই পথের কথা বলোনা, পুরোহিতকে থামিয়ে দিল সালেহ। তাহলে হয়তো আমিও কর্তব্য ভুলে পথচ্যুত হয়ে যাবো।

অচেনা বন্ধু! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমাকে আমি মূল্যবান তথ্য দিচ্ছি। কারণ, তোমার মধ্যে আমি ধনসম্পদের লোভ দেখিনি। লোকে বলে যেখানে ধনরত্ন লুকানো থাকে সেখানে নাকি অবশ্যই সাপ বিচ্ছু থাকে। যে সাপ বিচ্ছু ধনরত্নকে পাহারা দেয়। কথাটি মোটেও সত্য নয়। লোকেরা এও বলে, গুপ্তধন বিষাক্ত সাপের মতো বিষাক্ত হয়ে থাকে। কেউ যদি গুপ্তধন পেয়েও যায় তবে সাপে পরিণত হয়। একথার কারণ হলো, কেউ যাতে গুপ্তধন ছিনিয়ে নেয়ার সাহস না করে।....

দোস্ত! তুমি এখনো যুবক! তুমি এই দুনিয়ার অনেক কিছুই দেখোনি। আমি অনেক কিছু দেখেছি। অনেক কিছু শুনেছি। আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে অনেক কিছু আছে। আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি অনেক সমৃদ্ধ। দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি বুঝতে পেরেছি যার ভেতরে ধনসম্পদের লোভ লালসা বাসা বাধে সে আর মানুষ থাকে না। এই গুহায় যে সাপগুলো রয়েছে মনে করতে পারো এগুলো মানুষের পাপের ফসল। সাপের একটি দিক হলো লোভ, অপর দিকটি হলো লালসা। আর তৃতীয় আরেকটি দিক আছে যাকে বলা হয় খ্যাতি। প্রতিটি পাপই একটি সাপ। এ সাপগুলো মানুষের পায়ের নীচেই গড়াগড়ি করে। ধর্ম কর্ম ত্যাগ করে ধনসম্পদ পেয়ে যদি মানুষ সব কিছু পেয়ে গেছে বলে উল্লাসিত হয় এবং মনে মনে যদি ভাবে আমি পৃথিবী জয় করে ফেলেছি, তাহলে তার বিবেক অন্ধ হয়ে যায়। বিবেকের অন্ধত্বের কারণে একটু ইঙ্গিতেই

সে এ ধরনের সাপের গুহায় গিয়ে স্বেচ্ছায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আর তার অতি লোভ তার জীবনকেই কেড়ে নেয়। দোস্ত! আমিও ইচ্ছা করলে এই ধনভাণ্ডার হাতিয়ে নিতে পারতাম। আমি ছাড়া আর কেউ এই ধনভাণ্ডারের খবর জানে না। এই ধনভাণ্ডারের যে প্রকৃত মালিক সেই জানে না, ধনভাণ্ডার কোথায় রাখা হয়েছে। কিন্তু যে দিন থেকে এই ধনভাণ্ডার হেফাযতের দায়িত্ব আমার উপর এসেছে আমি পথ ভ্রষ্ট হওয়ার আশংকায় সারারাত পূর্জা অর্চনা করে কাটিয়েছি।

তোমার ধর্ম সত্য হলে এই ধনরাজী তোমাকে বিভ্রান্ত করতে পারতো না বললো সালেহ। আমাকে দেখ না। তুমি আমাকে বলেই দিয়েছো, সাপের গুহার উপরে কোন পাটাতন রেখে গর্ত পেরিয়ে গেলেই ধনভাণ্ডার পাওয়া যাবে। কিন্তু তাতেও এই ধনভাণ্ডারের প্রতি আমি মোটেও আগ্রহবোধ করছি না। আমি আমার কর্তব্য পালনের ব্যাপারেই চিন্তা করছি। সালেহ পুরোহিত আরো বললো, আমার একটি কথা মন দিয়ে শোন পণ্ডিত! তোমাকে দিয়ে আমি আমার কর্তব্য কর্ম পূর্ণ করতে চাই। আমি পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে শপথ করেছি, কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আমি জীবন বিলিয়ে দেবো, কখনো কোন লোভ লালসার শিকার হবো না। এখন তোমার প্রাণ আমার হাতে তুমি যদি আমার প্রশ্নের জবাব না দাও, তাহলে বাধ্য হয়েই আমি তোমাকে সাপের গুহায় নিক্ষেপ করবো।

তুমি কি নিজেকে এতোটাই বুদ্ধিমান মনে করো? এই বলে তীর্যক দৃষ্টিতে সালেহর দিকে তাকিয়ে বললো পুরোহিত,

পুরোহিতের কথায় সালেহ হেসে ফেললো। পরক্ষণেই তার হাসি মিলিয়ে গেল পুরোহিতের চেহারায় বিস্ময়কর আত্মবিশ্বাস দেখে। কারণ, পুরোহিত এক হাতে মশাশল নিয়ে নিয়েছে এবং অপর হাতে তরবারী। পুরোহিতের হাতের মশালের হাতল ছিল তরবারীর চেয়েও অনেক দীর্ঘ। পুরোহিত হঠাৎ এমন দ্রুত উঠে গেল যে, সালেহ তার অবস্থান থেকে নড়তেই পারল না।

এবারে পুরোহিত সালেহকে হুমকি দিল, তোমার হাতেও তরবারী আছে এবার এসো, তুমি তোমার কর্তব্য পালন কর, আর আমি আমার কর্তব্য পালন করি।

সালেহ যখন তরবারী উঠিয়ে পুরোহিতের দিকে অগ্রসর হলো, তখন পুরোহিত দীর্ঘ হাতলধারী জ্বলন্ত মশাল দিয়ে সালেহর চেহারায় আঘাত করল এবং সালেহর চেহারা ঝলসে গেল এবং তার দু'চোখে অন্ধকার নেমে এলো। এবার পুরোহিত চিৎকার দিয়ে বললো, পারলে আমার আঘাত থেকে প্রাণ বাঁচাও।

পুরোহিতের চিৎকার শুনে সালেহ লাফ দিয়ে সেখান থেকে সরে গেল।

পুরোহিত আবারো হুমকি দিয়ে বললো, আমি তোমাকে মোকাবেলা করার পূর্ণ সুযোগ দেবো তুমি তোমার কর্তব্য পালন করতে পার।

সালেহ কৌশল বদল করে পুরোহিতের উপর আঘাত করতে চেষ্টা করছিল কিন্তু প্রতিবারই পুরোহিত মশাল দিয়ে সালেহের আঘাত ঠেকিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু পুরোহিত সালেহর উপর কোন আঘাত হানল না। সালেহ একের পর এক আঘাতের চেষ্টা করে হাফিয়ে উঠলো। সালেহর কয়েকটি আঘাত গর্তের দেয়ালে গিয়ে আঘাত করল। এক পর্যায়ে পুরোহিত এক হাতে মশাল ও অন্য হাতে তরবারী নিয়ে সালেহর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করতে শুরু করল। সালেহ পুরোহিতের প্রতিটি আঘাতই তরবারী দিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু পুরোহিতের প্রচণ্ড এক আঘাতে সালেহর তরবারী হাত থেকে দূরে ছিটকে পড়ল। এবার পুরোহিতের মশালের উত্তাপের চাপে সে পিছু হটতে লাগল। যেই সালেহ পিছিয়ে গিয়ে তরবারী উঠাতে চাইল, তখন পুরোহিত তরবারী দিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল। এবার বাঁচার জন্যে সালেহ বসে গেল। এবার পুরোহিত মশাল দিয়ে সালেহর চেহারায় আঘাত করতে চাইলে সে বসে বসেই আরো পেছনে সরে গেল এবং বসে বসেই পিছনের দিকে সরতে লাগল। পেছন ফিরে সালেহর পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না যে, সে সাপের গুহার পাড়ে চলে এসেছে।

এবার পুরোহিত তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, দেখে নাও, তুমি এখন কোথায় এসে পৌছেছো। তোমার পেছনেও মরণ আগেও মরণ। বলো, বাঁচতে চাও না মরতে চাও।

মরণে আপত্তি নেই, বললো সালেহ। কারণ, আমি ধনরত্নের লোভে মরছি না। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে মরছি। এসো, আঘাত করো পণ্ডিত। মরতে মরতেও লড়ে যাবো।

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে পণ্ডিত বললো, না তোমার মরার দরকার নেই, বাইরে বেরিয়ে এসো। একথা বলে পুরোহিত মশাল নিয়ে গুহার বাইরে বেরিয়ে এলো।

রণক্লান্ত বিধ্বস্ত পরাজিতের মতোই গুহার বাইরে বেরিয়ে এলো সালেহ।

পণ্ডিত গুহা থেকে বাইরে বের হয়ে মশালের হাতল মাটিতে গেড়ে দিয়ে তরবারীটি ছুড়ে ফেলে মাটিতে বসে পড়ল। পণ্ডিত যেন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, সালেহ আর তার উপর হামলা করবে না।

এখানে বসো, অনেকটা নির্দেশের ভঙ্গিতেই সালেহকে বললো পণ্ডিত।

কাবুতে পেয়েও তুমি আমাকে কেন হত্যা করোনি? কেন আমাকে তুমি সাপের গুহায় গড়িয়ে পড়তে পিছু হটতেবাধ্য করেননি? বসতে বসতে সালেহ পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করল।

আমার দৃষ্টিতে হত্যা করার মতো কোন অপরাধ তুমি করোনি। বরং তোমার কর্তব্য পালন আমাকে মুগ্ধ করেছে' বললো পুরোহিত। তুমি আমার মতোই কর্তব্যপরায়ণ এবং নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তোমার মধ্যে লোভ-লালসা নেই। যুদ্ধ বিগ্রহকে আমি ঘৃণা করি। আমি ধর্মের সেবক বটে কিন্তু এক সময় আমি সৈনিক ছিলাম। এর প্রমাণ তুমি হাতে নাতে পেয়েছো। যে ভাবে তুমি আমাকে জব্দ করতে চেয়েছিলে তা কোন সাধারণ লোকের পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব হতো না। ধনভাণ্ডারকে তুমি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছো। এজন্য আমি তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাই।

তুমি যদি আমাকে পুরস্কৃত করতেই চাও, তাহলে সেই জিনিস তুমি আমাকে দাও, যা আমি তোমার কাছে চাই, বললো সালেহ। তোমার এই ধনভাণ্ডার থেকে আমার কিছুই দরকার নেই।

কি চাও তুমি? জিজ্ঞেস করল পুরোহিত।

কন্নৌজে সৈন্যরা কোথায় সুলতান মাহমূদের সাথে মোকাবেলা করার পরিকল্পনা করেছে? তারা কি দুর্গবন্দী হয়ে লড়াই করবে, না দুর্গের বাইরে গিয়ে গযনী বাহিনীর মোকাবেলা করবে?

শোন দোস্ত! আমরা একে অন্যের শত্রু। আমাকে তুমি এমন কোন প্রশ্ন করো না যে প্রশ্নের জবাব দিলে আমার দেশ ও জাতির ক্ষতি হতে পারে এবং

তাতে সুলতান মাহমূদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে পারে। তুমি একজন বিশ্বস্ত দেশ প্রেমিক। এজন্য আমি তোমাকে একটি জরুরী কথা বলে দিতে চাই। শোন বন্ধু! আমি যে কথা তোমাকে বলবা সেটি তোমার জন্যে বিরাট পুরস্কার। তুমি এখান থেকেই চলে যাও এবং ফিরে গিয়ে তোমার সুলতানকে বলো, তিনি যেন কন্নৌজের দিকে অগ্রসর না হোন। আমাদের মহারাজা প্রতীজ্ঞা করেছেন, কন্নৌজে এলে সুলতান মাহমূদকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবেন এবং গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী জায়গাটিকে তিনি গযনী বাহিনীর জন্যে কবরস্তানে পরিণত করবেন।

তোমাদের মহারাজার কাছে কি এমন শক্তিশালী সেনাবাহিনী আছে? পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলো সালেহ।

যদি কোন সেনাবাহিনী শত্রুকে সম্পূর্ণ ধবংস করার দৃঢ় সংকল্প করে তখন সে তার সামর্থ ও শক্তির দিকে তাকায় না। বললো পুরোহিত। পুরোহিত আরো বললো, কন্নৌজের প্রতিটি নারী শিশু পর্যন্ত গযনী সুলতানের উপর মূর্তি ও মন্দির ধ্বংসের প্রতিশোধ নিতে মরিয়া। তাছাড়া কন্নৌজের মহারাজা শুধু একা নন, তার সাথে লাহোরের মহারাজা ভীমপালও রয়েছেন। তার সেনাবাহিনী এখানে পৌছে গেছে।

ভীমপাল এখন কোথায়? তার সৈন্যরাই বা কোথায়?

একথা আমি তোমাকে বলতে পারবো না দোস্ত বললো পুরোহিত। আমি তোমাকে যে কথাটা বলতে চাচ্ছি তুমি এখান থেকে ফিরে গিয়ে তোমার সুলতানকে সতর্ক করো। তাহলে তিনি হয়তো খুশী হয়ে তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। তাকে বলো, এই জঙ্গলাকীর্ণ গোটা এলাকা জুড়ে তার জন্যে মৃত্যুর জাল বিছিয়ে রাখা হয়েছে, এই জাল ছিন্ন করে তিনি বেরিয়ে যেতে পারবেন না। এখানে এলে তার বাহিনীরও সেই অবস্থা হবে, তার বাহিনীর হাতে মহাবনের সৈন্যদের যে অবস্থা হয়েছিল। মহাবনের সৈন্যরা যমুনায় ডুবে মরেছিল, এখন গযনী বাহিনীকেও সেই নদীতেই ডুবে মরতে হবে। ভীমপালের সৈন্যরা ছাড়াও এখানে রয়েছে মথুরা বুলন্দ শহরও মহাবনের পালিয়ে আসা সৈন্যরা। এ সব ফেরারী সৈন্যদের সমন্বয়ে আরেকটি সেনা দল তৈরী করা হয়েছে। এরা সবাই প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে। এখানে এলে তোমাদের সুলতানের পক্ষের দুর্গ অবরোধ করা কোনভাবেই সম্ভব হবে না। ......

দোস্ত! বাস্তবে সুলতান মাহমূদকে এখনো সাত্যিকার প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি। অথচ তার বাহিনী এখন কোন কঠিন মোকাবেলা করার উপযুক্ত নয়। আমাদের মহারাজারা তাকে সুযোগ দিয়েছেন, যাতে তিনি কন্নৌজের জালে এসে পা দেন। তিনি কিন্তু এই জালেই পা দিতে আসছেন। তাই তুমি দ্রুত ফিরে যাও এবং তাকে ফেরাও। তাকে গিয়ে বলো, অনর্থক মানুষের জীবন হানি ঘটানো এবং বিদেশে এনে নিজ দেশের সৈন্যদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়া থেকে তিনি যেন বিরত থাকেন। এখানে এসে জীবন্ত পুড়ে মরার চেয়ে গযনী গিযে রাজার বেশে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়।

এ কথার পর তারা দু'জনই পাহাড়ের কাছেই সমতলে বেঁধে রাখা ঘোড়ার কাছে এলো। দুটি ঘোড়া পাশাপাশি বাধা ছিল। একটিতে সওয়ার হয়ে এসেছিল শকুন্তলা অপরটিতে এসেছিল পুরোহিত।

পুরোহিত সালেহকে একটি ঘোড়া দেখিয়ে বললো, এই ঘোড়াটি শুকুন্তলার। যে গর্তে তোমার সঙ্গীর সাথেই মরেছে। তুমি ওর ঘোড়াটি নিয়ে যাও।

রাতের পর দিনের প্রথম প্রহরে পুরোহিত মহারাজা রাজ্যপালের রাজপ্রাসাদে মহারাজার সামনে উপবিষ্ট। পুরোহিত মহারাজাকে জানালেন, তার অতি প্রিয় রাণী শকুন্তলাকে ধনভাণ্ডার গ্রাস করে ফেলেছে। পুরোহিত গত রাতের শকুন্তলা ও তার মধ্যকার ঘটে যাওয়া পুরো ঘটনা মহারাজাকে বললেন। শকুন্তলার মৃত্যুর ঘটনা শুনেও রাজার মধ্যে কোন ভাবান্তর হলো না। মহারাজা এই ঘটনা শুনে স্মিত হাসলেন এবং পুরো ব্যাপারটি বুদ্ধিমত্তার সাথে সামাল দেয়ার জন্যে পুরোহিতকে ধন্যবাদ জানালেন।

আমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি মহারাজ! উচ্ছাসিত কণ্ঠে বললো পুরোহিত। রাণী শকুন্তলার সাথে গযনীর এক গোয়েন্দাকেও সাপের গর্তে নিক্ষেপ করেছি। আর এক গোয়েন্দাকে প্রতারিত করে জীবন ভিক্ষা দিয়ে বিভ্রান্ত করে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাকে বলে দিয়েছি, তুমি গিয়ে বলবে, তোমাদের সুলতান যেন কন্নৌজের দিকে পা না বাড়ায়।

পুরোহিত সালেহকে যা কিছু বলেছিলেন সবই মহারাজা রাজ্যগালকে বলল। তিনি আরো বললো, মহারাজ! আমি আপনার মর্যাদা ও সম্মানের জন্য

মন্দিরের সম্মান রক্ষার্থে এবং আপনার বিজয়ের জন্যে মিথ্যা বলেছি। আপনি আমার এই মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করে দেখাবেন।

ধনভাণ্ডারের চিন্তা করার দরকার নেই। ভগবানের দয়ায় ধনভাণ্ডার পর্যন্ত কেউ পৌছাতে পারবে না। আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, যে কথা আমি গোয়েন্দাকে বলে দিয়েছি এর ফলে সুলতান মাহমূদ আতংকিত হয়ে পড়বে। এখন আপনি কিছু সৈন্য শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিন। লড়াই করুন মহারাজ! লড়াই করুন!

পণ্ডিত মহারাজ! আপনি এক গোয়েন্দার মাধ্যমে সুলতান মাহমূদকে বিভ্রান্তিকর খবর দিয়ে মারাত্মক ভুল করেছেন বললেন মহারাজা রাজ্যপাল। মহারাজা তখন তার কাছে রক্ষিত ভীমপালের চিঠি পুরোহিতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই চিঠিটি ভীমপাল রায়চন্দ্রকে লিখেছিলেন, রায়চন্দ্র সেটি আমার কাছে একটি নোটসহ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

একি? এটি সেই ভীমপালের চিঠি যাকে লোকে নির্ভিক অকুতোভয় বলে ডাকে! তাচ্ছিল্য মাখা কণ্ঠে বললেন পুরোহিত। ভীতু, কাপুরুষ। এজন্যই তো সে আমাদের এলাকায় ঘুরছে তার ভাইও এখানেই রয়েছে। কিন্তু তার সেনাবাহিনী দিয়ে আমাদের সাহায্য না করে শুধু শুধু গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে উষ্কানী দিচ্ছে। আবার ভয়ও দেখাচ্ছে।

এই চিঠি পড়ে আপনি ভয় পাবেন না মহারাজ!

এই চিঠিতে যা কিছু লেখা আছে তার সবই বাস্তব পণ্ডিত মশাই! বললেন রাজা রাজ্যপাল। আপনি সুলতান মাহমূদকে ভুল তথ্য দিয়েছেন গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে তার জন্যে কঠিন জাল বিছিয়ে রাখা হয়েছে। এখন দেখতে পাবেন সে আরো কোন অসাধারণ কৌশলে তার সৈন্যদেরকে কন্নৌজে পাঠায়।

দেখবেন, সে সাধারণ অভিযাত্রীদের মতো করে তার সৈন্যদের অগ্রসর হতে দেবে না। এখন তার সৈন্যরা বিশাল এলাকা নিয়ে পাশাপাশি সামনে অগ্রসর হবে। তার সৈন্যদের দুই বাহু বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে থাকবে। তার গোটা সৈন্যবাহিনী এক সাথে সামনে এগুবে না। আপনি মাহমূদের রণকৌশল সম্পর্কে জানেন না পণ্ডিত মশাই! মাহমূদ ভয়ংকর চিতাবাঘ! আপনি তার উপস্থিতি তখন টের পাবেন, যখন আপনার ঘাড় তার দাঁতে আটকে যাবে এবং

আপনার শরীর তার পাঞ্জার ভেতরে চলে যাবে। আক্রান্ত হওয়ার আগে কেউ বলতে পারে না, মাহমূদ মাটির নীচ থেকে আক্রমণ করেছেন না গাছের উপর থেকে হামলে পড়েছে।

মহারাজার কথা শেষ হওয়ার আগেই তাকে জানানো হলো, একজন দূত এসেছে। সে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বয়ে এনেছে।

মহারাজা তাকে তাৎক্ষণিক তার কাছে পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।

দূত এসে জানাল, গযনীর সৈন্যরা মুনাজ অবরোধ করতে শুরু করেছে।

আমরা যদি ওদের পেছনে দিক থেকে আক্রমণ করি তাহলে ওদের ক্ষতি সাধন করার কি কোন সম্ভাবনা আছে? দূতের কাছে জানতে চাইলেন রাজ্যপাল।

না, মহারাজ! এমন সুযোগ নেই। গযনী বাহিনীর একটি অংশ মুনাজ অবরোধ করছে, আর একটি অংশ মুনাজ ও কন্নৌজের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁবু না খাটিয়ে সম্পূর্ণ রণপ্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান করছে। রাতের বেলায়ও তারা তাদের ঘোড়াগুলোকে সাথেই রাখে। আমাদের লোকেরা উপজাতীয় লোকদের বেশ ধারণ করে দেখে এসেছে মুসলিম সৈন্যরা বহুদূর পর্যন্ত টহল দিচ্ছে। আমরা সেখানকার প্রতিটি উঁচু গাছ ও উঁচু টিলার উপরে মুসলিম সৈন্যদের অবস্থান নিতে দেখেছি।

এর অর্থ হলো, আমরা যদি মুনাজের সাহায্যে সেনা পাঠাই, তাহলে গযনীবাহিনী পথিমধ্যেই তাদের আটকে দে? জিজ্ঞেস করলেন মহারাজা।

জী হ্যাঁ, মহারাজ! আমাকে বলে দেয়া হয়েছে, আমি যেন আপনাকে মুনাজের দিকে সৈন্য না পাঠাতে বলি, বললো দূত।

পণ্ডিতজী মহারাজ! নিজের কানেই তো অবস্থা শুনলেন, পুরোহিতের উদ্দেশ্যে বললেন কন্নৌজরাজ।

পুরোহিতকে একথা বলে রাজ্যপাল তার সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের ডেকে পাঠালেন। সেনা কর্মকর্তারা এলে তিনি গযনী বাহিনীর অবস্থা সম্পর্কে তাদের অবহিত করে বললেন–তোমরা যদি কন্নৌজকে বাচাতে চাও, তাহলে মুনাজের রাজপুতেরা কি করে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। দেখতে হবে, তারা লড়াই করে না হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্ণ করে। তারা যদি শক্তভাবে

অবরোধের মোকাবেলা করে এবং দুর্গ থেকে বাইরে এসে মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হয় তাহলে তাদের সাহায্য করবে। আর যদি তা না হয় তবে তোমাদেরকে কন্নৌজ বাচানোর চেষ্টা করতে হবে।'

১০১৮ সালের নভেম্বরে সুলতান মাহমূদ মুনাজ দুর্গ অবরোধ করেন। তাকে আগেই গোয়েন্দারা খবর দিয়েছিল মুনাজের রাজপুতেরা তাদের স্বজাতির মর্যাদা রক্ষায় জীবন দিয়ে দিতে প্রস্তুত। এদেরকে যুদ্ধে কাবু করা সহজ ব্যাপার নয়। সারা ভারতে এরা লড়াকু জাতি হিসেবে খ্যাত।

সুলতান যে আবরোধ বেষ্টনী গড়ে তুলেন, তা ছিল তিন দিক থেকে বেষ্টিত। এক দিকে ছিল প্রবাহমান যমুনা নদী। সুলতানকে জানানো হয়েছিল, অবরোধকালে কন্নৌজের সৈন্যরা আক্রমণ করতে পারে। কন্নৌজবাহিনীর আক্রমণ আশংকায় তিনি সৈন্যদের একটি অংশকে মুনাজ ও কন্নৌজের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দেন।

সুলতান যখন তিন দিকের অবরোধ কাজ সম্পন্ন করেন, তখন সালেহ সেই পুরোহিতের ভ্রান্তিকর তথ্য নিয়ে সেখানে হাজির হলো।

সালেহ সেখানে পৌছারপর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান সুলতানকে জানাল, গোয়েন্দা সালেহ এই খবর নিয়ে এসেছে। সালেহ খবর পেয়ে সুলতান মাহমূদ মথুরায় খবর পাঠালেন, ওখানে যে সৈন্যদের রেখে আসা হয়েছে অর্ধেক সেখানে রেখে বাকী সৈন্য অতি দ্রুত মুনাজে পাঠিয়ে দেবে। সেই সাথে সেখানে রেখে আসা সকল জঙ্গী হাতিকেও এরা সাথে নিয়ে আসবে। সে সময় সুলতানের হাতে প্রায় সাড়ে তিনশ জঙ্গি হাতি ছিল। মথুরার রিজার্ভ সৈন্যরা মুনাজ পৌছালে তাদেরকে তিনি মুনাজ ও কন্নৌজের মধ্যবর্তী এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন।

অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থে সুলতান মাহমূদের সতেরো বারের ভারত অভিযানের মধ্যে মুনাজের উল্লেখ নেই। কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থে সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও মুনাজে যে তার এযাবতকালের ভারত অভিযানের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন লড়াই লড়তে হয়েছিল এর বিস্তারিত আলোচনা অনুপস্থিত। মুনাজে ছোট্ট একটি দুর্গজয়ে তার যে শক্তি ক্ষয় করতে হয়েছিল মথুরা মহাবন এবং বুলন্দ শহরের মতো বড় বড় তিনটি লড়াইয়েও এতো শক্তিক্ষয় হয়নি।

মুনাজের রাজপুতদের অবস্থা এমন ছিল যে, সৈন্য ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে পার্থক্য করাই মুশকিল হচ্ছিলো। ছোট ছোট ছেলেরাও সৈন্যদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে নেমেছিল।

ঐতিহাসিক উলবী লিখেছেন, যুদ্ধকালে মুনাজের রাজপুতদের অবস্থা ছিল দড়ি ছেড়া উটের মতো এবং অজেয় দৈত্যের মতো ভয়ংকর।

মুনাজ যুদ্ধের কমান্ড ছিল সুলতানের নিজের হাতে। তিনি সরাসরি রণাঙ্গনে কমাণ্ড দিচ্ছিলেন। তিনি যে দিক দিয়েই তার লোকদেরকে দুর্গ ফটক ভাঙ্গা কিংবা দুর্গ প্রাচীরে ফাটল ধরানোর জন্য পাঠাতেন, দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে তাদের উপর বৃষ্টিরমতো তীর ও বর্শা নিক্ষিপ্ত হতো। গযনীবাহিনীর তীরন্দাজরা অগ্রসর হয়ে দুর্গপ্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান তীরন্দাজ ও বর্শাধারীদের উপর তীর বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করল গযনীর তীরন্দাজদের তীর বিদ্ধ হয়ে যে রাজপুতেরা দুর্গপ্রাচীর থেকে গড়িয়ে পড়তো সাথে সাথে শূন্যস্থান অন্য রাজপুতেরা পূর্ণ করে ফেলতো। দুর্গ প্রাচীর থেকে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে হুমকি ভেসে আসছিল–

'মাহমূদ! বাঁচতে চাইলে ফিরে যাও।'

'হে গযনীর ডাকাতেরা! তোমরা কবরস্থানে এসে গেছো।

এসব হুমকি ধমকির পাশাপাশি নানা অশ্রাব্য গালি গালাজও ভেসে আসছিল দুর্গপ্রাচীর থেকে।

দিনের প্রায় অর্ধেক চলে গেল। অবস্থা দৃষ্টে সুলতান বললেন–

এই দুর্গ সহজে করায়ত্ত্ব করা যাবে না। এজন্য নতুন করে চিন্তা করতে হবে।

অবরোধের প্রথম দিন শেষ হলো। এ দিনে মুসলমানরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হলো। মুনাজ দুর্গের ভেতরের পরিস্থিতি এমন ছিল যে, সেখানকার অধিবাসী নারী পুরুষ আবাল বনিতা এমনকি ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত তীর কামান বর্শা তরবারী হাতে নিয়ে দুর্গপ্রাচীরের উপরে এবং দুর্গের সর্বত্র মহড়া দিচ্ছিল। তারা শ্লোগান দিচ্ছিল, আমাদেরকে দুর্গের বাইরে গিয়ে গযনী বাহিনীর উপর আক্রমণের অনুমতি দেয়া হোক। মুনাজের রাজা রায়চন্দ্র ছিলেন দূরদর্শী ও জাত লড়াকু। তিনি আনাড়ী ছেলে মেয়েদেরকে দুর্গের বাইরে

এমনকি দুর্গপ্রাচীরে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছিলেন না। তিনি আবেগী লোকদের উদ্দেশ্যে বলছিলেন, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি ছাড়া শুধু আবেগের জোরে যুদ্ধ করা যায় না। অবশ্য তোমরা মুনাজের সম্মান। কিন্তু তোমরা জানো না গযনীর সৈন্যরা চোর ডাকাতের দল নয়। ওরা এমন ভয়ংকর যোদ্ধা যাদের সামনে পাহাড়ের মতো শক্ত প্রাচীর কাঁপতে থাকে। তোমাদের প্রশিক্ষিত সৈন্যরা দুর্গপ্রাচীরে রয়েছে। কোন কারণে শত্রু সৈন্যরা যদি দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়ে তখন মুনাজের ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব হবে তোমাদের উপর। মথুরা ও মহাবনের কাপুরুষরা যে ভাবে গযনী সৈন্যদের হাতে দুর্গ তুলে দিয়েছে আমরা সে ভাবে তাদের হাতে দুর্গ তুলে দেবো না।

রাজা রায়চন্দ্রের কথা শোনে সমবেত জনতা শ্লোগান দিতে লাগলো, আমাদেরকে দুর্গের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক, আমরা চরমভাবে প্রতিশোধ নেবো।

নগরবাসীর আবেগ ও উচ্ছ্বাস দেখে রাজা রায়চন্দ্র সমবেত লোকদের থেকে কিছু সংখ্যক লোককে বাছাই করে তার কাছে থাকতে বললেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন, তোমাদেরকে প্রয়োজনের সময় দুর্গের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। রাজার আশ্বাসে জনতার ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হলো।

এদিকে রাজা রায়চন্দ্রের রাজপ্রাসাদে নারীরাও অস্ত্র সজ্জিত হয়ে গেলো। তারা শহরের অন্যান্য নারীদেরকে লড়াইয়ের জন্য সংগঠিত করতে শুরু করল।

রাজপ্রাসাদের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া আর সবার মধ্যেই বিরাজ করছিল যুদ্ধ উন্মাদনা। কিন্তু রাজা রায়চন্দ্রের উর্বশী কন্যা রাধার মধ্যে এই যুদ্ধের কোনই প্রতিক্রিয়া ছিল না। তার অবস্থা অনেকটা এমন ছিল, এই মাটি মানুষের হানাহানির সঙ্গে যেন তার কোনই সম্পর্ক নেই।

আগেই বলা হয়েছে, রাজা রায়চন্দ্রের বোন শিলা ও কন্যা রাধা রাজা রাজ্যপালের ছেলে লক্ষণপালের সাথে সুলতান মাহমূদকে হত্যা করার জন্য অভিযানে বের হয়েছিল। শিলা ও রাধার রূপ সৌন্দর্য ছিল কিংবদন্তিতুল্য। তারা ভেবেছিল তাদের রূপসৌন্দর্যের যাদুকরী আকর্ষণে মুগ্ধ করে তারা সুলতানকে হত্যা করতে সক্ষম হবে।

কিন্তু পথিমধ্যে এক কুমির শিলাকে শিকারে পরিণত করল। যে দৃশ্য দেখে রাধা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। অতঃপর লক্ষণ ও রাধা উভয়কেই গযনীর টহলরত গোন্দোদের হাতে গ্রেফতার হয়ে মথুরায় সুলতান মাহমূদের কাছে পেশ করা হয়।

সুলতান তাদেরকে কোন প্রকার শাস্তি না দিয়ে সসম্মানে নিজ নিজ বাবার কাছে পাঠিয়ে দেন। তখন থেকেই রাধা আমূল বদলে যায়।

ছোট বেলা থেকে রাধা মুলমানদের সম্পর্কে যা শুনে এসেছিল, গযনীর সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে বাড়ীতে ফিরে আসা পর্যন্ত তাদের আচার-আচরণ দেখে রাধার এতো দিনের ধারণা ধারণা বিশ্বাস মিথ্যা প্রমাণিত হলো।

সেই শৈশব থেকেই হিংস্র জন্তুর মতোই রাধার মনে ছিল মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা। সে মুসলমানদের হাতে গ্রেফতারী এড়াতে বিষপানে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। কারণ সে জানতো, তার মতো সুন্দরী তরুণীকে মুসলিম সৈন্যরা শিকারী হিংস্র জন্তুর মতোই ক্ষতবিক্ষত করে ফেলবে। জানতো মুসলিম সৈন্যরা খুবই হিংস্র এবং নারীখেকো।

কিন্তু গ্রেফতার হওয়ার পর অবাক বিস্ময়ে রাধা প্রত্যক্ষ করলো, তাকে ও লক্ষণপালকে গ্রেফতারকারী দলনেতা নিজ কন্যা ও ছেলের মতোই মর্যাদা দিয়েছে। তার চেয়েও বিস্ময়ের ব্যাপার, চরম শত্রু জেনেও সুলতান মাহমূদ তাদের প্রতি সামান্যতম উষ্মা পর্যন্ত প্রকাশ করেননি বরং তাদের জাতীয়তাবোধের ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন এবং কোন প্রকার শাস্তি না দিয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদেরকে তার সেনাসদস্যকে দিয়ে সসম্মানে বাড়ী পর্যন্ত পৌছার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

রাধার বিশ্বাস ছিল মুসলমানরা বাস্তবিকই অসভ্য, তাদের কোন নীতি ধর্ম নেই। রাধার কাছে পৌত্তলিকতার বাইরে কোন ধর্ম মতের অস্তিত্ব ছিল না। আত্মমর্যাদাবোধ ও সম্ভ্রম রাজপুতদের কাছে ছিল জীবনের চেয়ে দামী। কিন্তু ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করার জন্যে জাত্যাভিমানী এই রাজপুত কন্যা নিজের সম্ভ্রমকেও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের ইচ্ছাপোষণ করেছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় সে মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার থাকার পরও তার এই অপরূপ রূপ সৌন্দর্য

নিয়ে কেউ টুশব্দটি পর্যন্ত করেনি। অথচ গোটা অঞ্চল জুড়ে রাধার রূপের প্রশংসা করে না এমন মানুষ একজনও ছিল না।

লক্ষণ গ্রেফতার হওয়ার পর দলনেতাকে তাদের সাথে রক্ষিত সোনাদানা দিতে চাইলো এবং তাদের মুক্তির বিনিময়ে ঘোড়া বোঝাই করে ধন-রত্ন দেয়ার প্রস্তাব করলো। কিন্তু মুসলমান সৈন্যরা বিপুল এই ধনভাণ্ডারের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণবোধ করলো না। বরং তারা লক্ষণের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে কর্তব্য পালনে অবিচল রইলো।

রাধাকে যখন সুলতান মাহমূদের সামনে হাজির করা হলো, তখন সুলতানের চেহারার দিকে তাকিয়ে রাধার মনে প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মে ছিল। সে আশঙ্কা করছিল নিশ্চয়ই সুলতান কোন ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু রাধার সব আশঙ্কা ও কল্পনার বিপরীতে সুলতান তখন বললেন-

"আমরা এই জাত্যাভিমানী শত্রুকন্যাকে সম্মান করি। আমরা তাদের সংকল্পকে মোবারকবাদ জানাই।"

সুলতান মাহমূদ যখন তার সৈন্যদের নিয়ে মুনাজ দুর্গ অবরোধ করলেন, তখন রাধার কানে সুলতানের সেই কথা ধ্বনিত হতে লাগল-

"আমাকে হত্যা করার চেষ্টা তোমাদের অবশ্যই থাকা উচিত। এই চেষ্টার সফলতা ব্যর্থতা তোমাদের কৃষ্ণদেবী বা বাসুদেবের হাতে নয়, সফলতার চাবিকাঠি আমাদের আল্লাহ্র হাতে। তিনি হলেন সেই প্রভু, যার পয়গাম নিয়ে আমরা ভারতে এসেছি।"

এরপর সুলতান তার সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন-

এদেরকে সসম্মানে ওদের শহরের কাছে রেখে আসার ব্যবস্থা করো এবং তাদের ঘোড়া, সোনাদানা সবই দিয়ে দাও।"

সাথে সাথে সুলতানের নির্দেশ কার্যকর করা হলো। রাধা ও লক্ষণপালকে শাহী অতিথির মতোই সেনাপ্রহরায় তাদের শহরের কাছে রেখে আসা হলো।

* * *

সুলতান মাহমূদকে হত্যার মিশনে যাওয়ার আগে রাধা যে আবেগ ও উচ্ছ্বাস নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু ফিরে এসে যখন সে তার বাবাকে মিশনের ব্যর্থতা সম্পর্কে অবহিত করছিলো তখনকার অভিব্যক্তি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। রাধা তার বাবাকে ভিন্ন এক সুরে বললো, আমরা যখন মুসলিম সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হয়ে সুলতান মাহমূদের সামনে নীত হলাম, তখন সুলতান মাহমূদ আমাকে নিজ কন্যার মতোই সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে কথা বললেন। রাধা তার বাবাকে তার গ্রেফতারী এবং লক্ষণ ও তার সাথে সুলতানের কথোপকথনের পুরো ইতিবৃত্ত জানালো। কিন্তু রাধার বাবা রায়চন্দ্র রাধার মানসিক পরিবর্তনের ব্যাপারটি বুঝতে পারেননি। ফলে তিনি রাধাকে বললেন–

আমরা আমাদের এই বেইজ্জতির কঠিন প্রতিশোধ নেবো।'

রাধা অন্য দশটি কুমারী মেয়ের মতো ছিল না। সে যেমন ছিল সুন্দরী তেমনই বুদ্ধিমতি। কিন্তু মিশনের ব্যর্থতা ও গযনী বাহিনী সম্পর্কে তার পরিবর্তিত বাস্তব ধারনার পর তার বাবা যখন মুসলমানের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াইয়ের হুংকার দিলেন, তা শুনে রাধার মাথায় যেন আসমান ভেঙ্গে পড়ল।

স্বভাবগতভাবে রাধা ছিল খুবই আত্মপ্রত্যয়ী এবং সাহসী। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতি তার সবকিছু ওলট পালট করে দিল। দুনিয়ার সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলল রাধা। একাকী নীরব নি:শব্দে দিন কাটাতে লাগল সে।

রাজ দরবার রাজমহল শহরের অলিগলি ভেতর বাহির সবখানে তখন যুদ্ধের সাজ-সাজ রব, গযনী বাহিনীকে প্রতিরোধের হুংকার, রণপ্রস্তুতি। যে কোন দিন গযনীর সৈন্যরা দুর্গ প্রাচীর ভেদ করতে পারে। রাজা রায়চন্দ্র এখন লড়াই ছাড়া আর কোন বিষয়ে কোন কথাই বলেন না।

মন্দিরগুলোতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকজনকে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছিল এবং রক্তাক্ত লড়াই করে মুসলমানদের পরাজিত করার জন্যে জনগণকে প্ররোচনা দেয়া হচ্ছিল। এর ফলে মুনাজের নারী মহলের মধ্যে সৃষ্টি হয় যুদ্ধ উন্মাদনা। তারা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

রাজমহলে রায়চন্দ্রের রক্ষিতারাও পর্যন্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ব্যতিক্রম শুধু রাধা। সে সব কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাজমহলে

একাকী শুয়ে থাকতো। নয়তো দুর্গ প্রাচীরের উপরে ওঠে গযনী সৈন্যদের আগমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকতো।

এক দিন সন্ধ্যার আগে দুর্গ প্রাচীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাধা। সম্পূর্ণ উদাস মন। দূরের আকাশের লালিমায় স্থির তার দৃষ্টি। এমন সময় রাধার কণ্ঠে উচ্চারিত হলো।

"সে এদিক দিয়ে আসবে! জানি না কবে আসবে সে।"

"কে আসবে?" তার পাশের কেউ জিজ্ঞেস করল।

কারো দিকে না তাকিয়ে উদাস মনেই সে জবাব দিল- "মুসলমান; গযনীর সৈন্যরা!"

একথা বলেই হঠাৎ কেদে উঠলো রাধা। আশ-পাশে তাকিয়ে নীরব হয়ে গেল তার কণ্ঠ। রাধা পাশে তাকিয়ে দেখল, এক ঋষী তার পাশেই দাঁড়ানো। এবং সে রাধার কাছে জানতে চাচ্ছিল কে আসবে? অথচ রাধা এমনই উদাস-আনমনা ছিল যে, এতো কোলাহল ও হট্টগোলের মধ্যেও সে নিজেকে একাকী ভেবে ছিল।

এই ঋষি সম্পর্কে রাধা জানতো। অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদাবান লোক এই ঋষি। মুনাজের প্রধান পুরোহিতও তাকে দেখলে দু'হাত জড়ো করে কুর্ণিশ করে। ঋষি ধর্মীয় গুরু হওয়ার পাশাপাশি খ্যাতিমান একজন চিকিৎসকও। মানুষকে ধর্মের দীক্ষা দেয়ার পাশাপাশি তিনি মানসিক রোগী ও ভূত-প্রেতের আছর করা লোকদের চিকিৎসা করেন। মানুষকে ভূত-প্রেতের অত্যাচার প্রভাব থেকে হেফাযত করেন। এমন একজন মহামনীষীকে কাছে দেখেও যে রাধার উল্লাসিত হওয়ার কথা ছিল সেই রাধার কাছে ঋষির উপস্থিতি অসহ্য মনে হলো। মনে মনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হলো রাধা।

ঃ রাজকুমারী কি মুসলমানদের আগমনের অপেক্ষা করছেন?"

বিনীত কণ্ঠে রাধাকে জিজ্ঞেস করলেন ঋষি।

আমি যার জন্যেই অপেক্ষা করি? আপনি আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছেন কেন?" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো রাধা।

হস্তক্ষেপ করিনি রাজকুমারী! এসেছি আপনার দুঃখে শরীক হতে। আমি জেনেছি, আমাদের রাজকুমারীর উপর ভৌতিক আছর পড়েছে যার চিকিৎসা আমাকে করতে হবে। মহারাজ আমাকে বলেছেন, আপনি মথুরা থেকে ফিরে আসার পর থেকেই মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অবশ্য হওয়ারই তো কথা।

আমি জানি রাজকুমারী! মুসলমানরা মানুষ নয়, হায়েনার মতো হিংস্র। এরা মানুষ খাওয়ার জন্যই এদেশে আসে। আপনি না বললেও আমি জানি, ওরা আপনার সঙ্গে কি আচরণ করেছে। এরা সোনা-দানা হীরা জহরত আর নারীর জন্যে পাগল। এই নারী আর ধনরত্নের জন্যেই এরা বারবার হিন্দুস্তানে আসে।

মিথ্যা কথা! সবই মিথ্যা। উত্তেজিত কণ্ঠে বললো রাধা।

আপনি যা বলছেন, তারা আমার সাথে এমন কোন আচরণ করেনি। তারা নারী লোভী নয়। গযনী সুলতানের দরবারে আমি একজনও নারী দেখিনি। আমার বাবার মতো রাজা মহারাজাদের দরবারেই নারী বেশী থাকে। বাবার মতো রাজাদের পেছনে দাঁড়িয়ে সুন্দরী তরুণীরা পাখা দোলায়। তাদের সেবা করে তরুণীরা। সুন্দরী তরুনীরাই তাদের ঘুম পাড়ায়, ঘুম থেকে জাগায়। মিথ্যা কথা। মুসলমানরা হিংস্র জন্তু নয় প্রকৃতই মানুষ। বরং ভালো মানুষ। তারা আমাদের দেয়া সোনাদানা গ্রহণ করেনি।

ঋষি জ্ঞানী লোক, পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ। সে রাধার কথার বিরোধিতা না করে বরং তার সাথে সহানুভূতি ও স্নেহমাখা কথা বলতে শুরু করলেন। মায়া ও মমতার পরশ দিয়ে ঋষি রাধার ক্ষোভকে কিছুটা প্রশমিত করে ফেললেন। অবস্থা এমন হলো যে, কয়েক দিনের নীরব নিস্তব্ধ হয়ে ওঠা রাধা কথা বলতে বলতে ঋষির সাথে হাঁটতে শুরু করল।

এরপর থেকে প্রতিদিন ঋষি রাধার কাছে আসতে শুরু করলেন। দীর্ঘ সময় রাধা ঋষীর সাথেই ব্যয় করে। তার সাথে নানা বিষয়ে কথা বলে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলে ঋষি বুঝতে পারলেন, রাধা ঠিকই মুসলমান আছরে আক্রান্ত। তা ছাড়া রাধার মধ্যে একটা প্রচণ্ড ভীতিও কাজ করছে।

রাধা ঋষিকে জানাল, প্রতি রাতেই সে সেই কুমিরকে স্বপ্নে দেখে, কুমিরের মুখে শিলার মরদেহ ঝুলছে এবং কুমিরের মুখ থেকে তাজা রক্ত ঝরছে। তখন আতংকিত হয়ে রাধা চিৎকার দিয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠে এবং তার সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়।

রাধার এই আতংক দূর করার চিকিৎসা ছিল তার সাথে কথা বলে মনের আতংক দূর করে ফেলা। ঋষী নানা বিষয়ে রাধার সাথে কথা বলে তার মন থেকে কুমিরের ভয় এবং মুসলমান প্রীতি দূর করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু রাধার শারীরিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে আরো খারাপ হতে লাগল। রাজা রায়চন্দ্র যুদ্ধের ব্যস্ততার জন্যে রাধার প্রতি মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। তিনি রাধার সুচিকিৎসার জন্যে ঋষীকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন।

ঋষী ছাড়াও রাধার চিকিৎসার জন্যে আরো খ্যাতিমান অভিজ্ঞ বৈদ্য আনা হলো। কিন্তু রাধার শারীরিক অবস্থার আরো অবণতি ঘটল। এক পর্যায়ে রাধা ওষুধ পথ্য খাওয়া ছেড়ে দিল। ঋষি ছাড়া আর কাউকেই সে কাছে ঘেষতে দিতো না। ঋষিই হয়ে উঠলেন তার বিশ্বস্ত সঙ্গী। একদিন রাধা ঋষিকে বললো–

ঋষীজী! মুসলমানদের সুলতান আমাকে বলেছিল, জয় পরাজয় তোমাদের কৃষ্ণদেবী ও বাসুদেবের হাতে নয়, জয় পরাজয় আমাদের আল্লাহর হাতে.....।

এখন তো আমি তার প্রতিটি কথারই বাস্তব প্রতিফলন দেখছি। আচ্ছা, ওই ঝিলের জল কুমিরটি কি মুসলমানদের আল্লাহ? যে শিলাকে খেয়ে ফেলেছে?

আমাদের দুই সৈনিককে কে হত্যা করলো? আমরাই বা কেন গ্রেফতার হলাম?

হরিকৃষ্ণের জন্ম ভূমির ধ্বংসস্তূপ আমি দেখে এসেছি। সেখানকার মূর্তিগুলোর ভাঙা টুকরো আমি দেখেছি। এরাই না আমাদের দেবদেবী, আমাদের ভগবান! এদের যদি কোন শক্তি থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই মুসলমানরা তাদের আক্রমণ করার আগেই ধ্বংস হয়ে যেতো।

রাধার ইসলাম ধর্মের সততার প্রতি আকর্ষণ এবং পৌত্তলিকতার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখে ঋষি নানা যুক্তি ও ঘটনা বলে রাধাকে পৌত্তলিকতার বিশুদ্ধতা

বোঝাতে লাগলেন। তিনি রাধাকে এমন সব ঘটনাবলী শোনালেন, যেগুলো কোন সচেতন ও চিন্তাশীল মানুষের কাছে যৌক্তিক ও সত্য বলে মনে হয় না। পৌত্তলিকতার বিপরীতে ঋষি ইসলাম ধর্মকে অসত্য এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য নানান অযৌক্তিক কথা কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন। একপর্যায়ে ঋষি বলতে লাগলেন, মুসলমানরা মিথ্যুক, লুটেরা প্রতারক, ধোঁকাবাজ, হিংস্র।'

আপনি তাদের যাই বলুন, আমি নিজ চোখে যা দেখেছি, তাকে তো আর মিথ্যা বলতে পারি না।' ঋষির কথার জবাবে বললো রাধা। 'আমার সাথে লক্ষণপাল ছিল। একপর্যায়ে সেও বলেছিল, রাধা! আমি মুসলমানদের অব্যাহত বিজয়ের রহস্য বুঝে ফেলেছি। সে বলেছিল, আমি মুসলমানদের মধ্যে নারী ও মদের ব্যবহার দেখিনি। এটাই তাদের বিজয়ের অন্যতম কারণ।

রাধা ঋষিকে জানালো, যে দিন মুসলমানরা আমাদের বিদায় করে দেয়, সে দিন খুব ভোরে আমাকে ও লক্ষণকে জাগিয়ে দিয়ে ছিল। আমরা ঘুম থেকে জেগে দেখি তখনো সূর্য উঠতে অনেক দেরী। চারদিকে তখনো অন্ধকার। ঠিক সেই সময় কোত্থেকে জানি সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর আওয়াজ ভেসে আসছিল। আমরা ভেবেছি, এটা হয়তো তাদের ভাষার কোন সঙ্গীত হবে। আওয়াজটা আমার কাছে খুবই চমৎকার লাগছিল।

আমি আমার পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করলাম–

কেউ কি গযনীর ভাষায় গান করছে?

পাহারাদার আমাকে জানাল, এটি গানের আওয়াজ নয়। এটি আযানের আওয়াজ। এই শব্দগুলো আমাদের আল্লাহর শব্দ।

আমি আযানের কোন শব্দই বুঝতে পারিনি কিন্তু আযানের ধ্বনী যেন আমাকে যাদুর মতো মুগ্ধ করল। একটু পরে আমি দেখলাম, মথুরায় অবস্থানকারী সকল সৈন্য একটি খোলা জায়গায় সমবেত হলো এবং সারি বেধে দাঁড়াল। একলোক সবার সামনে দাঁড়িয়ে কখনো ঝুকছে, কখনো দাঁড়াচ্ছে আবার কখনো মাটিতে মাথা আনত করে রাখছে। আর বাকীরা তাকে অনুসরণ করছে। আমি পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করলাম, সবাই ওখানে এমন করছে কেন? প্রহরী জানাল, এটাই আমাদের ইবাদত।

ঋষিজী! মুসলমানদের এই ইবাদত আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। পাহারাদারকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমরা কার ইবাদত কর? তোমাদের সামনে তো কোন মূর্তি নেই?.....

পাহারাদার বললো, আমরা যার ইবাদত করি, তিনি থাকেন আমাদের হৃদয়ে। তিনি সব জায়গাই বিরাজ করেন। তিনি আমাদের রব। তিনিই আমাদের জয়ী করেন। আমরা যখন তার ইবাদতে ত্রুটি করবো, তার নির্দেশ পালন করা থেকে বিরত থাকব তখন সব ক্ষেত্রেই আমাদের পরাজয় ঘটতে থাকবে।'

ঋষি রাধার কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। রাধা অনবরত কথা বলেই যাচ্ছিল। রাধা বললো,

তোমাদের সুলতান হয়তো এই ইবাদত করেন না? কারণ, তিনি তো সুলতান।

পাহারাদার জানাল, সুলতানও এই ইবাদতে রয়েছেন। তিনি হয়তো সৈনিকদের মধ্যে কোথাও রয়েছেন। তিনিও সাধারণ সৈনিকদের মতোই মাথা নত করে ঝুকে সিজদা দেন। ইবাদতের সময় তিনি আর সুলতান থাকেন না।

ঋষিজী! আমরা ছোট বেলা থেকেই দেখছি, আমাদের পিতা মহারাজ যদি কখনো মন্দিরে যান তখন সবাইকে মন্দির থেকে বের করে দেয়া হয়।

ঋষিজী! বলুন তো? আসলে সত্য কোনটি?....আমাদের কি কোন রব নেই?

রাধার প্রশ্নের জবাবে ঋষি বলতে লাগলেন, পৌত্তলিক ধর্মে কাকে রব মনে করা হয়। কিন্তু রাধা ঋষির কথায় অনাস্থা প্রকাশ করে বললো, তাহলে কুমিরই কি আমাদের রব? না, কুমির আমাকে প্রতি রাতেই ভয় দেখায়, সে রব হতে পারে না। রব আমার অন্তরে বিরাজ করছেন।

* * *

মহারাজ! রাজকুমারী পাগল হয়ে গেছে। রাধার কাছ থেকে উঠে গিয়ে রাজা রায়চন্দ্রকে জানালেন ঋষি। মনে হয় মথুরায় মুসলমানরা তাকে এমন কিছু পান করিয়েছে, যার প্রভাব তার শরীর থেকে এখনও যায়নি। এই রোগের চিকিৎসা আমার সাধ্যের বাইরে মহারাজ! রাজকুমারী তার ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে গেছে। এখন সে নানান অহেতুক কথা বলতেই থাকে। অনেক সময় কথা বলতে বলতে নীরব হয়ে যায়। অনেক সময় বিকট চিৎকার দিয়ে তার চেহারা কাপড় বা হাতে ঢেকে ফেলে। অধিকাংশ সময়ই বলতে থাকে, 'আমার রব আমার হৃদয়ে এসে গেছে'। এটা সেই মুসলমানদের আছর মহারাজ!

ঠিক আছে। তাকে আর আপনার চিকিৎসা করার দরকার নেই। তাকে তার অবস্থাতেই থাকতে দিন।' বললেন রাজা রায়চন্দ্র। আমি সুলতান মাহমূদের মাথা কেটে এনে তার সামনে ফেলে দেবো। তখন ঠিকই দেখবেন তার মন থেকে মুসলমানদের রব চলে যাবে। এখন এসব নিয়ে ভাববার অবসর আমার নেই ঋষিজী! গযনী বাহিনী অনেক কাছে চলে এসেছে।" বলে রাজা রায়চন্দ্র রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রাজার সাথে যখন ঋষি রাধার ধর্ম বিদ্বেষী হওয়ার কথা বলেছিলেন, তখন সেখানে উপস্থিত ছিল আরো দু'জন বৈদ্য ও দু'জন সেবিকা। রাধার ধর্ম বিদ্বেষের কথা শুনে তারা কানে আঙ্গুল দিলো।

ঠিক এ সময় রাধা হঠাৎ করে বিছানা থেকে উঠে বাইরের দিকে ছুটতে লাগল। রাধাকে দৌড়ে বেশী দূর যেতে দেয়া হয়নি। তাকে ধরে ফেলা হলো। তখন রাজারায় চন্দ্র রাজ প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছেন।

রাধার মা'কে রাধার বাইরে চলে যাওয়ার কথা জানানো হলো। এই খবর শুনে রাধার মা খুবই উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ, তখন মুসলমানরা অবরোধ করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় রাধা বেরিয়ে গেল নির্ঘাত সে নিহত হবে। তিনি মেয়ের এই অবস্থা দেখে বৈদ্যকে বললেন,

আপনারা ওকে এমন কোন ওষুধ দিন, যা সেবনে সে অচেতন হয়ে থাকবে। হুঁশ হলে আবার সেই ওষুধ খাইয়ে তাকে অচেতন করে রাখা হবে। রানীর নির্দেশে বৈদ্যরা রাধাকে একটি ওষুধ খাইয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে রাধা অচেতন হয়ে গেল। তারপর কক্ষের দরজা বাইরে থেকে আটকে দিয়ে সবাই রাধার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো।

* * *

অবরোধের প্রথম দিন অতিবাহিত হলো। দিন রাতের মধ্যে এক মুহূর্তও বিশ্রাম করেননি সুলতান মাহমূদ। এক সময় তিনি দুর্গের পিছনে নদীর পাশে চলে গেলেন। নদী দুর্গের প্রাচীর স্পর্শ করে প্রবাহিত হচ্ছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে সুলতান তার কমান্ডারদের বললেন, প্রতিটি পদাতিক ইউনিট থেকে দুই বা চারজন করে দক্ষ ও সাহসী সৈনিককে বাছাই করো এবং তাদের সমন্বয়ে ভিন্ন একটি দল গঠন করে তাদেরকে রিজার্ভ সৈন্যদের সাথে অবস্থান করতে বলো।

অবরোধের দ্বিতীয় দিন গযনীর সৈন্যরা আবারো দুর্গের প্রধান ফটক ভাঙার জন্যে আক্রমণ চালালো। কিন্তু দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে রাজপুতেরা বর্শা বল্লম ও তীরের তুফান ছুটিয়ে দিলো। বিপুল ক্ষয় ক্ষতি হলো মুসলিম বাহিনীর। কিন্তু দুর্গ ফটক ভাঙার কোনই অগ্রগতি করা সম্ভব হলো না। এরপরও ফটক ভাঙার চেষ্টায় বিরত দিলেন না সুলতান। এভাবে টানা সাত দিন চললো ফটক ভাঙার চেষ্টা আর রক্তাক্ত আক্রমণ প্রতি -আক্রমণ।

সপ্তম দিন শেষে সন্ধ্যার পর সকল পদাতিক ইউনিট থেকে বাছাইকরা রিজার্ভ সৈন্যদেরকে তার অনুগামী হতে নির্দেশ দিলেন সুলতান। এই বাহিনীতে সৈন্য ছিল তিনশ'য়ের কিছু বেশী। সুলতান এই যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বললেন–

গযনী ও ইসলামের মর্যাদার প্রশ্নে তোমাদেরকে আজ কঠিন ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। ইসলাম এখন তোমাদের জীবন প্রত্যাশা করে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করো তবে সে তার ইউনিটে ফিরে যেতে পারো। রাতের এই অন্ধকারে আমি ফেরত যাত্রীকে দেখতে পাবো না। আমি এজন্য কারো প্রতি সামান্যতম বিরাগভাজনও হবো না।......

হে আল্লাহর সৈনিকেরা! আল্লাহ ছাড়া রাতের এই অন্ধকারে তোমাদের কেউ চিনতে পারছে না। কেয়ামতের দিনও আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তোমাদের চিনতে পারবে না।' একথা বলে সুলতান দীর্ঘক্ষণ নীরব হয়ে গেলেন। এরপর বললেন,

এখন কি আমি ধরে নিতে পারি, তোমরা সবাই আমার সাথে রয়েছো?

সমস্বরে আওয়াজ ওঠলো, 'আমরা সবাই আপনার সাথে আছি সুলতানে মুহতারাম! আমরা তো জীবন বিলিয়ে দেয়ার জন্যই আপনার সাথে এসেছি। আপনি নির্দেশ করুণ সুলতান! আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।

আজ তোমরা আমার নির্দেশে নয়, আল্লাহর নির্দেশে লড়াই করবে।" বললেন সুলতান। আজ রাতের এ লড়াইয়ে এই কুফরিস্তানে আল্লাহর নাম প্রচারিত হবে। শোন বন্ধুরা! এই দুর্গের পেছনে যে দুর্গ প্রাচীর রয়েছে, সেটি একেবারে পানি ছুয়ে রয়েছে। তোমাদের হাতে দুর্গ প্রাচীর ভাঙা এবং সুড়ঙ্গ খননের সরঞ্জাম দেয়া হচ্ছে, তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজন পানিতে নেমে দুর্গ প্রাচীরের নীচ দিয়ে সুড়ং করবে।

এখন সেখানে বেশী পানি নেই। এ সময়ে বেশী পানি থাকে না। কিন্তু পানি ঠাণ্ডা থাকে। যারা সাঁতার জান না, তারা নদীতে নামবে না। তোমাদের ঝুকি হলো, দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে শত্রুরা যদি তোমাদের দেখে ফেলে তাহলে তোমাদের উপর বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করবে।

দুর্গ প্রাচীর কতটুকু চওড়া তা আন্দাজ করতে তোমাদের কষ্ট হবে না। অর্ধেক প্রাচীর পর্যন্ত যদি তোমরা সুড়ং করতে পারো দেখবে বাকী অর্ধেক পানিই করে ফেলবে।

প্রায় তিন শতাধিক মৃত্যুঞ্জয়ী পদাতিক সৈন্য থেকে সুলতান পঞ্চাশজনকে আলাদা করলেন। রাতে লড়াইয়ের তীব্রতা থেমে গিয়েছিল। অন্ধকারের কারণে তীরন্দাজরা তীর নিক্ষেপে ক্ষান্ত হয়ে পড়েছিল। অবশ্য দুর্গ প্রাচীরের উপরে এবং বুরুজগুলোতে রাতেও তৎপরতা ছিল।

সুলতান ছিলেন দুর্গ প্রাচীর থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে। তিনি বীর সৈন্যদের আল্লাহর উপর সোপর্দ করে তাদেরকে দুর্গ প্রাচীর ঘেষে নদীর কিনারা দিয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

* * *

রাজপুতেরা নদীর দিক থেকে আক্রমণের আশংকামুক্ত ছিল। কারণ, গযনী বাহিনীর কাছে নদী পথে আক্রমণের কোন সাজ সরঞ্জাম ছিল না। এ পর্যন্ত

তারা নদীপথে কোন আক্রমণ পরিচালনা করেনি। ফলে রাজপুতেরা এদিক থেকে আক্রমণের ব্যাপারে পূর্ণ-ঝুঁকি মুক্ত ছিল।

অথচ গযনী বাহিনীর পঞ্চাশজন জীবন ত্যাগী যোদ্ধা নদীর দিক থেকেই আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হচ্ছিল। এই পঞ্চাশ অভিযাত্রী উঁচু নলখাগড়া ও গাছগাছালীর আড়াল দিয়ে দুর্গ প্রাচীর কিছুটা দূরে থাকতেই নদীতে নেমে পড়ল। ধনুক তরবারী ছাড়াও তাদের সাথে ছিল শাবল আর খুন্তি কোদাল। নদীর পানি ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। নদীর তীরের কাছে পানি কোমর পর্যন্ত। মাঝে মধ্যে গর্তের মতো ছিল, যেখানে পানির পরিমাণ গলা বা বুক পর্যন্ত ছিল। যোদ্ধারা পরস্পর হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হচ্ছিল।

এক সময় তারা ঠিকই দেয়ালের কাছে পৌঁছে গেল। নদীর তীরবর্তী দেয়ালটি খাড়া ছিল না, ছিল ঢালু। ফলে দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে নীচের সবকিছু পরিষ্কার দেখা যেতো। কিন্তু রাতের অন্ধকারে উপর থেকে প্রাচীরের নীচের কোন কিছু দেখার উপায় ছিল না।

আল্লাহর নাম দিয়ে পঞ্চাশজন যোদ্ধা পানিতে দাঁড়িয়ে দুর্গ প্রাচীরের পাথর খোলার চেষ্টা শুরু করে দিল। কিন্তু একদম নিঃশব্দে কোনকিছু করার উপায় ছিল না। শাবল ও খুন্তির আঘাতের আওয়াজ দুর্গ প্রাচীরের উপর পর্যন্ত চলে যাচ্ছিল। কিন্তু সুড়ংকারীদের সুবিধা এই ছিল যে, পানিতে প্রাচীরে শাবল মারার আওয়াজ প্রতিধ্বনীত হয়ে এমন তরঙ্গ শব্দ সৃষ্টি হচ্ছিল, সেখানে আসলে কি হচ্ছে তা সহজে কারো পক্ষে বোঝার উপায় ছিল না।

দুর্গ প্রাচীর ভাঙতে গেলে খুন্তি শাবলের আওয়াজ হবে এ বিষয়টি সুলতান আগেই আন্দাজ করেছিলেন। তিনি পঞ্চাশজনের বাহিনীকে ওখানে পাঠানোর পরই তাদের প্রাচীর ভাঙার আওয়াজকে ছাপিয়ে দেয়ার জন্যে লড়াইরত সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখে ছিলেন, তারা সবাই যাতে এক সাথে হৈ-হুল্লা করে উঠে এবং দফ-নাকাড়া বাজাতে শুরু করে।

সম্মুখ ভাগে মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড শোরগোল, দফ নাকাড়ার বাজনা ও শ্লোগান শোনে দুর্গের সকল রাজপুত এদিকে এসে জড়ো হলো। তাদের ভাব ছিল নিশ্চয় এদিক থেকে গযনী বাহিনী চূড়ান্ত আঘাত হানছে। এই হৈ-হুল্লা আক্রমণের পূর্ব ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

ওদিকে কোন প্রতিবন্ধকতার শিকার না হওয়ায় পঞ্চাশজন যোদ্ধা নিশ্চিন্ত মনে দুর্গপ্রাচীর থেকে পাথর খুলতে লাগল। ঘন্টা খানিক পরেই তারা প্রাচীর ভেদ করে মাটির স্পর্শ পেয়ে গেল। সুড়ং খনন করে এর আয়তন বড় করা তেমন মুশকিল ছিল না; কিন্তু অসুবিধা সৃষ্টি করল পানি। পাথর খোলার সাথে সাথে খালি জায়গা নদীর পানিতে ভরে যাচ্ছিল।

পঞ্চাশজন লোক এক সাথে খনন করার কারণে সুড়ং ছিল যথেষ্ট বড়। তারা দ্রুত খনন কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। খননের এক পর্যায়ে বিশাল একটি পাথর দেখা দিল। খননকারীদের কাছে শক্ত ও মজবুত শাবল ছিল। তারা সেই শাবল দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করে সেই পাথরকেও মূল কাঠামো থেকে খুলে ফেলল। বিশাল পাথর খোলার সাথে সাথেই দুর্গের আলো দেখা গেল। এ সময় খননকারীরা দ্রুততার সাথে অন্য পাথর খুলে দিলে প্রায় পনেরো বিশ হাত চওড়া সুড়ং তৈরী হয়ে গেল। সুড়ং এতোটা উঁচু হলো যে, একজন মানুষ সোজা দাঁড়িয়ে অনায়াসে এর ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে।

শেষ পাথরটি খোলে ফেলার সাথে সাথেই দুর্গের ভেতরে পানি ঢুকতে শুরু করল।

এমন সময় দুর্গের ভেতরের কেউ পানি দেখে চিৎকার শুরু করে দিল। ততক্ষণে খননকারীদের খননকাজ শেষ। তারা শত্রুদের উপস্থিতি টের পেয়ে পিছু হটতে শুরু করল।

কিন্তু রাজপুতেরাও ছাড়ার পাত্র নয়। শত্রুর উপস্থিতি টের পেয়ে তারা মশাল উচু করে এদিকে দৌড়ে এলো। রাজপুতেরা ছিল বর্শা ও তরবারী সজ্জিত। তখনই উভয় পক্ষের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল। গযনীর সৈন্যরা তো পানিতেই ছিল রাজপুতেরা দলে দলে এসে পানিতে ঝাপিয়ে পড়তে শুরু করল। পানির মধ্যে শুরু হয়ে প্রচণ্ড লড়াই। এ সময়ের মধ্যে সুড়ং পথে দিয়ে রাজপুতেরা মশাল হাতে নিয়ে আসতে শুরু করলে মশালের আলোয় শত্রু মিত্র পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল।

এ দিকে সুলতান মাহমূদ সুড়ং খননকারীদের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। তিনি তাদের অবস্থা জানার জন্য কয়েকজন সৈন্যকে প্রেরণ করলেন। তারা এসে খবর দিল নদীর মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

খবর শুনে সুলতান একটু অগ্রসর হয়ে দেখলেন, নদীর মধ্যে অসংখ্য মশাল জ্বলছে, যেন নদীতে চলছে মশাল মিছিল। এ সময় তিনি বাকী সৈন্যদেরকে নদীতে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের সাথে মশালও দিয়ে দিলেন। এ সময় সুলতান মাহমূদ কমান্ডারদের বললেন–

মনে হচ্ছে আমার যোদ্ধারা সুড়ং খনন কাজ শেষ করে ফেলেছে, এই সুড়ং পথেই হয়তো রাজপুতেরা নদীতে নেমেছে। যাও, তোমরা গিয়ে বাস্তব অবস্থা দেখে আমাকে জানাও।

নদীর পানি সুড়ং পথে তীব্র বেগে দুর্গে প্রবেশ করছিল। আর সেই পথ দিয়ে রাজপুতেরা দুর্গের বাইরে আসছিল। কমান্ডারগণ এগিয়ে দেখল, নদীতে অসংখ্য মশাল নাচছে এবং আহত নিহত সৈন্যরা নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

এদিকে সুলতান মাহমূদ ভাবছিলেন, সুড়ং পথে দুর্গের ভেতর তার সৈন্যদের প্রবেশ করানো যায় কিনা। এমন সময় সুড়ং খননকারী এক আহত যোদ্ধা ফিরে এসে সুলতানকে জানাল।

সুড়ং পথে ভেতরে সৈন্য পাঠানো যাবে না সুলতান! এমনটি করলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।"

বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করে নদীতে যুদ্ধরত সকল যোদ্ধাকে তিনি ফিরিয়ে আনতে নির্দেশ দিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী ইতিহাসিকগণ যারা প্রতিদিনের ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন তা অনেক দীর্ঘ।

সেসব বর্ণনার সারমর্ম হলো, গযনীর অকুতোভয় যোদ্ধারা ব্যাপক রক্তক্ষয় করে দুর্গ প্রাচীরের দু'জায়গায় ভাঙন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু রাজপুতেরা এমন বীরত্ব ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল যা দেখে সুলতানের কণ্ঠে ইশ্ ইশ্ ধ্বনী উচ্চারিত হলো। তিনি রাজপুতদের বীরত্বও ত্যাগের মহোৎসব দেখে বিস্মিত হলেন।

সেখানে গযনীর সৈন্যরা ভাঙা প্রাচীর দিয়ে দুর্গের ভেতরে গিয়ে আক্রমণের কথা ছিলো সেখানে রাজপুতেরা বাইরে বেরিয়ে এসে গযনী সৈন্যদের উপর আক্রমণ করে আবার দুর্গে ফিরে যাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, রাজপুত সৈন্যরা এক পর্যায়ে দুর্গে ফটক খোলা রেখেই বাইরে এসে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে আবার দুর্গে ফিরে যেতো।

এই অবস্থা দেখে এক পর্যায়ে সুলতান মাহমূদ কমান্ডারদের বললেন, এরা বাহাদুর কিন্তু কিছুটা নির্বোধ। এরা নির্বিচারে নিজেদের শক্তি খরচ করছে। তাই আক্রমণ না করে এখন শুধু প্রতিরোধ করো। আর তাদের শক্তিক্ষয় করতে দাও।'

দুই প্রতিপক্ষে মধ্যে যখন এমনই মরণপণ যুদ্ধ চলছে, রাজা রায়চন্দ্রের কুমারী কন্যা রাধাকে তখন একাধারে ওষুধ খাইয়ে অচেতন করে রাখা হচ্ছিলো। যখনই রাধা হুঁশ ফিরে পেতো, তার কণ্ঠে অতি ক্ষীণ আওয়াজে উচ্চারিত হতো! আল্লাহ্ আমার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। একথা শোনার সাথে সাথে রাজকীয় বৈদ্য পুনরায় রাধাকে সংজ্ঞাহীনের ওষুধ খাইয়ে দিতেন।

এভাবে চব্বিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পঁচিশতম দিনে সুলতান মাহমূদ সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, দুর্গের প্রাচীরের উপরে এবং ভাঙা অংশগুলোতে তীব্র আক্রমণ করে দুর্গের ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করবে এবং দুর্গ ফটক খোলে রাজপুতেরা বাইরে এলে প্রচণ্ড আক্রমণ করে দুর্গ ফটক খোলা রাখার চেষ্টা করবে।

পঁচিশতম দিনের লড়াই ছিল চূড়ান্ত লড়াই। ইতোমধ্যে রাজপুতেরা তাদের বিপুল শক্তি ক্ষয় করে ফেলেছে। গযনীর সৈন্যরা যখন সব কয়টি দুর্গ-ফটকের ভাঙা অংশ এবং দুর্গ প্রাচীরের উপর একযোগে আক্রমণ করে বসল, তখন রাজপুতেরা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। মুসলমানরা দুর্গে প্রবেশ করে দেখতে পেল শত্রুদের জনবল একেবারেই কম।

রাজপুতেরা তখন মোকাবেলা করার চেয়ে আত্মহত্যাকেই বেশী প্রাধান্য দিচ্ছিল। অনেক রাজপুত পরিবার পরিজন সবাইকে ঘরে বন্দি করে আগুন ধরিয়ে দিল এবং আত্মীয় স্বজন ও পরিবার-পরিজনসহ আগুনে আত্মহুতি দিল। বাইরের রাজপুতদের সামনে কোন হিন্দু নারী নজরে পড়লেই হল সে দৌড়ে গিয়ে তাকে হত্যা করছিল। মুনাজের বহু সৈন্য উঁচু দুর্গ-প্রাচীর ও বুরুজ থেকে নীচে ঝাপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করল।

সুলতান মাহমূদ যখন দুর্গে প্রবেশ করলেন, তখন এক কথায় দুর্গের ভেতরের সবখানে আগুন জ্বলছে এবং সেই আগুনে রাজপুতেরা ভস্ম হচ্ছে। বলা চলে মুনাজের সব অধিবাসী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। শুধু রাজমহলটি ছিল অক্ষুণ্ন। রাজমহলে কেউ অগ্নি সংযোগ করেনি।

গযনীর সৈন্যরা রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করে দেখতে পেল জায়গায় জায়গায় মরদেহের স্তুপ। রাজপুতেরা একে অন্যকে হত্যা করেছে। খুব ঠাণ্ডা মাথায় তারা এই পরাজয়ের গ্লানি থেকে বাঁচার জন্যে আত্মহুতির পথ বেচে নিয়েছে। রাজমহলের রক্ষিতা ও নর্তকীদের দেহেও খঞ্জর তরবারী বিদ্ধ অবস্থায় দেখা গেল। রাজমহল তল্লাশী করে রাজা রায়চন্দ্র এবং রানীর মরদেহ তাদের শয়নকক্ষের পালঙ্কের উপর পাওয়া গেল।

গযনীর সৈন্যরা রাজমহলের প্রতিটি কক্ষ তল্লাশী করলো। কোথাও জীবন্ত কাউকে পাওয়া যায় কি-না। কিন্তু সব কক্ষেই তারা দেখতে পেলো মৃত মানুষের মরদেহ। সব কক্ষই ছিল খোলা। কিন্তু একটি কক্ষ ছিল বাইরের দিক থেকে বন্ধ। ছিটকিনী খুলে সৈন্যরা দেখতে পেলো এক তরুণী মৃতপ্রায় অবস্থা বিছানায় শুয়ে আছে। মানুষের আওয়াজ পেয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটি ধীরে ধীরে চোখ মেললো এবং ক্ষীণ একটি আওয়াজ করল।

আওয়াজ শুনে উপস্থিত সৈন্যরা তার কাছে গিয়ে বুঝলো তরুণীটি মৃত নয়, তবে মারাত্মক অসুস্থ।

অসুস্থ রাধা অস্পষ্ট আওয়াজে জিজ্ঞেস করলো-

তোমরা কি মুসলমান সৈনিক? তোমাদের সুলতান কোথায়? তাকে ডেকে আনো। আমি তার কাছে বলতে চাই, আমি তার আল্লাহর নাম নিয়েই মরছি। আমি তার হাতে চুমু খেয়ে মরতে চাই।

জীবন্মৃত তরুণীর কণ্ঠে একথা শুনে গযনীর যোদ্ধারা বিস্মিত হলো। একটি অসুস্থ শত্রু মেয়ের জন্যে এই অবস্থায় সুলতানকে এখানে আনা ঠিক হবে না মনে করে সৈন্যরা রাধার কথায় তেমন গুরুত্ব দিল না। রাধা যখন দেখতে পেলো তার কথায় এদের কাছে কোন গুরুত্বপাচ্ছে না, তখন হতাশাগ্রস্থ হয়ে তাদের দিকে কতোক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। এরই মধ্যে তার মাথা নীচের দিকে ঢলে পড়লো। সাথে সাথেই নিথর হয়ে গেলো রাধার হৃদকম্পন। বস্তুত রাধা আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে গযনী বাহিনীর সৈন্যদের সাক্ষী রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় হলো।

* * *

ব্যাপক রক্তপাত জীবনহানির পর গণ আত্মহত্যার মাধ্যমে মুনাজের রাজপুতেরা দুর্গ মুসলমানদের কব্জায় ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাই অগ্নি সংযোগ করে দুর্গের সকল বাড়ী ঘর ধ্বংস করে দিল। রাজপুতদের কাছ থেকে মুনাজ দুর্গের নিয়ন্ত্রণ নিতে সুলতান মাহমূদকে লড়তে হলো জীবনের অন্যতম কঠিনতম লড়াই। এতে ব্যাপক জনশক্তিও কুরবানী দিতে হলো।

মুনাজ দুর্গ দখলের পর সুলতান মাহমূদের লক্ষ ছিল কন্নৌজ দুর্গ। কিন্তু কন্নৌজ সম্পর্কে তার কাছে পরস্পর বিরোধী খবর আসছিল। উভয়বিদ সংবাদের মধ্যে কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা তা যাছাই করা মুশকিল বিষয় হয়ে উঠছিল।

গোয়েন্দা সালেহ্ সুলতানকে জানিয়ে ছিল, মুনাজ ও কনৌজের মধ্যবর্তী জায়গায়ই হবে তাদের সাথে কঠিন মোকাবেলা। কিন্তু পরে যা খবর আসছিল তাতে জানা যাচ্ছিল মুনাজ ও কন্নৌজের মধ্যবর্তী স্থানের কোথাও হিন্দু সৈন্যদের কোন চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না।

মুনাজ যুদ্ধে সুলতানকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এজন্য তিনি তাৎক্ষণিক অগ্রাভিযানের নির্দেশ না দিয়ে কিছুটা সময় নিতে চাচ্ছিলেন। যাতে ক্লান্ত ও আহত যোদ্ধারা একটু বিশ্রাম নিয়ে নিতে পারে।

কয়েকদিন মুনাজে অবস্থান করার পর সেনাপতিগণ সুলতানকে পরামর্শ দিলেন, অভিযানের নির্দেশ দিয়ে দেয়া হোক! বিলম্ব করলে অবশেষে ভীম পালের সৈন্যরা এসে শত্রু বাহিনীর শক্তি বাড়িয়ে দিতে পারে।

বাস্তবতা ও ঝুকির আশংকা বিবেচনা করে সুলতান কন্নৌজের দিকে অভিযানের নির্দেশ দিলেন। তিনি গোটা বাহিনীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে একটি অংশকে যমুনা নদীর তীরে ঘেষে এবং অপর একটি অংশকে গঙ্গা নদীর তীর ঘেষে সামনে অগ্রসর হতে বললেন। অগ্রবর্তী দলকে খুবই শক্তিশালী করা হলো। মাঝে থাকলেন তিনি নিজে বেশীরভাগ সৈন্য নিয়ে; আর পেছনে রাখলেন একটি রিজার্ভ বাহিনী। প্রতিটি ইউনিট পূর্ণ রণপ্রস্তুতি নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল।

১০১৮ সালের ২০ ডিসেম্বর মোতাবেক ৪০৯ হিজরী সনের ৮ শাবান কন্নৌজ পৌঁছলেন সুলতান। তিনি গোটা দুর্গ অবরোধ করলেন। কিন্তু খুবই হাল্কা প্রতিরোধের মুখোমুখি হলো মুসলিম সৈন্যরা। অনেকটা নির্বিঘ্নে অবরোধ আরোপ করতে দেয়াকে তিনি কন্নৌজ শাসকদের একটা কূটচাল মনে করে রিজার্ভ সৈন্যদেরকে পূর্ণ সতর্ক থাকতে বললেন। বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন এবং বাইরের আক্রমণ সম্ভাবনা যাছাই করার জন্যে বহুদূর পর্যন্ত তিনি পর্যবেক্ষক ও গোয়েন্দাদের ছড়িয়ে দিলেন। তার প্রবল আশংকা ছিল হিন্দুরা অবশ্যই পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবে। কিন্তু সুলতান মাহমূদের সকল আশংকা-উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে অবরোধের দ্বিতীয় দিনই কন্নৌজের দুর্গবাসী সাদা পতাকা উড়িয়ে দিল।

* * *

সুলতান মাহমূদ প্রথমে চৌকস একটি ইউনিটকে দুর্গের ভেতরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর একই সাথে আরো দু'টি সেনা ইউনিটকে ভেতরে পাঠালেন। এরা ভেতরে যাওয়ার সাথে সাথেই ভেতরের অবস্থার খবর এসে গেলো যে, ভেতরে কোন ধরনের সংঘর্ষ বাঁধার সম্ভাবনা নেই। তখন সুলতান নিজে কন্নৌজ দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করলেন।

সুলতান ভেতরে প্রবেশ করলেন। কন্নৌজ সৈন্যদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল অবরোধ আরোপের আগেই কন্নৌজের মহারাজা পরিবার পরিজন নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে গেছেন। সুলতান মাহমূদের নির্দেশে হিন্দু সেনাপতি ও কমান্ডারদের জিজ্ঞেস করা হলো, রাজ্যের ধন-ভাণ্ডার কোথায়? তারা তাদের জানা মতে ধনভাণ্ডারের অবস্থান জানালো; কিন্তু সেখানে তল্লাশী করে কিছুই পাওয়া গেল না।

সুলতান রাজমহলকে ধ্বংস করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং প্রধান মন্দিরের সব মূর্তি ভেঙে ফেলার হুকুম দিলেন।

খাজানা না পাওয়ার কথা চাউড় হলে সালেহ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে গ্রেফতার করিয়ে আনলো। পুরোহিতকে যখন ধনভাণ্ডারের কথা জিজ্ঞেস করা হলো তখন তিনি সুলতানকে জানালেন– ধন-ভাণ্ডারের খবর আপনার সালেহ

নামক গোয়েন্দা জানে। কিন্তু সেখানে হয়তো এখন আর কিছুই নেই। মহারাজা হয়তো সবই সাথে নিয়ে গেছেন।

ঐতিহাসিক আবুল কাসিম ফারিশ্‌তা লিখেছেন, "সুলতান মাহমূদের এই বিজয় কোন সাধারণ বিজয় ছিল না। কন্নৌজ বিজয় ছিল রাজনৈতিক বিচারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কন্নৌজ বিজয়ের ফলে ভারতের বিশাল অংশ সুলতানের দখলে চলে এলো।

## সিমনতাশের বেহালা

১০১৭ সাল মোতাবেক ৪১০ হিজরী। সুলতান মাহমূদ মথুরা থেকে কন্নৌজ পর্যন্ত বিস্তর এলাকা জয় করে বিজয়ী বেশে গযনী ফিরে এলেন। সুলতানের বিজয়ী বাহিনী ফেরার আগেই গযনী খবর পৌঁছে গিয়েছিল, এবার সুলতান কয়েকজন রাজা মহারাজাকে পরাজিত করেছেন এবং ও বহু রাজ্য জয় করে দেশে ফিরছেন।

সুলতানের ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে গযনীর আবাল বৃদ্ধসহ সব মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে এলো। সাধারণ লোকেরা আনন্দে শ্লোগান দিচ্ছিল, বিজয়ী সৈন্যরাও হর্ষধ্বনি করছিল। নারীরা দূরে দাঁড়িয়ে বিজয়ী সেনাদের শুভেচ্ছা জানচ্ছিল।

গযনীর অধিবাসীরা যখন উনপঞ্চাশ হাজার হিন্দু বন্দির বিশাল সারি এবং সাড়ে তিনশত জঙ্গী হাতির দীর্ঘ লাইন দেখল তখন আনন্দের আতিশয্যে খুশীতে নাচতে শুরু করল। গযনীর শিশুরা পর্যন্ত সুলতানের পথ আগলে দাঁড়িয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল। গযনীর উল্লসিত মানুষের হর্ষধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠেছিল।

অনেক গোড়া ঐতিহাসিক এবং পরবর্তীকালের ইতিহাসবিদ লিখেছেন, মথুরা, মহাবন, মুনাজ ও কন্নৌজ বিজয়ের পর সুলতান মাহমূদ গযনী পৌছে নির্দেশ দিলেন–

যেসব ধন সম্পদ হিন্দুস্তান থেকে আনা হয়েছে, শাহী মহলের বাইরের খালি জায়গায় সেগুলোকে রেখে দেয়া হোক। সৈন্যরা যখন সংগৃহীত

সোনাদানা মণিমুক্তা এক জায়গায় স্তুপাকারে রাখলো, তা দেখে গর্ব ও অহংকারে মাহমূদের মাথা উঁচু হয়ে গিয়েছিল।

এতটা বাস্তব যে, কন্নৌজ বিজয়ের পর গযনী ফিরে সুলতান মাহমূদ অর্জিত সকল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তার বাসভবনের সামনে স্তুপাকারে রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু সে সময়কার অন্যতম ঐতিহাসিক যমখ্শরী এবং আবু আব্দুল্লাহ লিখেছেন, "কন্নৌজ, মথুরা, মহাবন ও মুনাজ বিজয়ের পর গযনী ফেরার সাথে বিজয়োল্লাসে উদ্বেলিত গযনীবাসির উৎসাহ ও আগ্রহের আতিশয্য দেখে সুলতান মাহমূদ যুদ্ধ লব্ধ সকল সম্পদ রাজমহলের বাইরে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবং এসব সম্পদ দেখিয়ে তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "এসব সম্পদ তোমাদের, তোমাদের জীবন মান উন্নয়নে এ সম্পদ ব্যয় করা হবে।"

বাস্তবেও তিনি এই অঢেল সম্পদ গযনীর অধিবাসীদের জাতীয় জীবন উন্নয়নে ব্যয় করেছিলেন। এই যুদ্ধের পর তিনি মর্মর পাথরের একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই মসজিদের সাথে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মসজিদের নাম রেখেছিলেন "আসমানী মহল"।

মসজিদটি রূপ-সৌন্দর্যে ছিল অনুপম। এই মসজিদ নির্মানে তিনি বহু জায়গার বিখ্যাত সব স্থাপত্যবিদ এনে জড়ো করেছিলেন। মসজিদের দেয়াল এবং ছাদে যে সব নক্সা উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন সেগুলোতে স্বর্ণ ও রৌপ্য গলিয়ে কারুকাজকে আরো মনোমুগ্ধকর করা হয়েছিল। মিনারগুলোর উপরিভাগে দেয়া হয়েছিল স্বর্ণের প্রলেপ।

বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তিনি প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে রূপান্তরিত করেছিলেন। মসজিদের ভেতরে আকর্ষণীয় কারুকার্যময় গালিচা বিছানো হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিভিন্ন ভাষার অসংখ্য গ্রন্থরাজী সংগ্রহ করে সেগুলোকে স্থানীয় ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়েছিলেন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার একটি অনন্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল সুলতান মাহমূদের বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বের নানা জায়গা থেকে তিনি বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের এখানে জমায়েত করেছিলেন এবং তাদের জন্যে খুবই উচ্চ মানের সম্মানী ভাতা বরাদ্দ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরও নিয়মিত বৃত্তি দিতেন।

বিভিন্ন যুদ্ধে শাহাদত বরণকারীদের সন্তানদেরকে সেখানে বিনা খরচে শিক্ষা দেয়া হতো এবং তাদের ও পরিবারের সার্বিক ব্যয় সরকারী ভাণ্ডার থেকে নির্বাহ করা হতো।

ঐতিহাসিক আবুল কাসিম ফারিশ্‌তা এবং আল বিরুনী লিখেছেন, জামে মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় মথুরা ও কন্নৌজ বিজয়ের স্মারক হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিল। অধিকাংশ ঐতিহাসিক সুলতান মাহমূদের সোমনাথ বিজয়কে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু সুলতান মাহমূদের দৃষ্টিতে মথুরা বিজয় ছিল সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মথুরা ছিল হিন্দুদেবতা হরিকৃষ্ণের জন্মভূমি। হিন্দুদের কাছে মথুরা ছিল মুসলমানদের মক্কা মদীনার মতোই পবিত্র স্থান।

এই অভিযানে সুলতান মাহমূদ যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করেছিলেন এর মধ্যে স্বর্ণ-মুদ্রা ছিল ত্রিশ লাখ। আর মণিমুক্তা হীরা জহরত ও স্বর্ণের টুকরোর কোন হিসাব ছিল না। পঞ্চান্ন হাজার হিন্দু গ্রেফতার হয়েছিল এবং সাড়ে তিনশ হাতি গযনী বাহিনীর হাতে এসেছিল। ঘোড়া ও তরবারীর তো কোন হিসাবই ছিল না।

ঐতিহাসিক ফারিশ্‌তা লিখেছেন, বিপুল ধন-সম্পদ ছাড়াও এই অভিযানে সুলতান মাহমূদ হিন্দুস্তান থেকে তিনটি বিস্ময়কর জিনিস এনেছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল ময়নার মতো পাখি, একটি হাতি এবং একটি পাথর।

মথুরা থেকে কন্নৌজ যাওয়ার পথে বিস্ময়কর এই হাতিটি তার হাতে এসেছিল। যমুনার ডান তীরে আসাঈ নামক একটি ছোট রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের শাসক ছিলেন চন্দ্র রায়। সুলতান মাহমূদকে তার গোয়েন্দারা জানিয়ে ছিল রাজা চন্দ্ররায়ের কাছে এমন বিশালদেহী একটি হাতি রয়েছে যে, এমন হাতি গোটা হিন্দুস্তানে আর কোথাও আছে বলে জানা যায়নি। শুধু বিশালদেহী হিসেবেই এই হাতিটি বিখ্যাত নয়, এটি নাকি শত্রু শিবিরে গিয়ে আতংক ছড়াতে খুবই পটু। অন্যান্য হাতির মতো এটি শত্রু বাহিনীর তীর বর্শার আঘাতে আহত হয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করে না।

কৌশলগত কারণে এই হাতিটি গযনী বাহিনীর জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। সুলতান মাহমূদ আসাঈ দুর্গ অবরোধ করে রাজা চন্দ্ররায়কে হাতিটি হস্তান্তরের জন্য পয়গাম পাঠালেন। পয়গামে বললেন–

হাতিটি হস্তান্তর করে দিলে খুবই সহজ শর্তে অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে।"সুলতানের পয়গামের জবাবে রাজা চন্দ্ররায় বললেন-

"রাজধানী থেকেও হাতিটি আমার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। জীবন থাকতে আমি এই হাতি হাতছাড়া করবো না।"

তারপর রাজা চন্দ্ররায় এবং গযনী বাহিনীর মধ্যে শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। দুই বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ চলছে, এমন সময় চন্দ্ররায়ের বিশালদেহী হাতিটি রাজকীয় ভঙ্গিতে সুলতান মাহমূদের কাছাকাছি চলে এলো। হাতির উপরে যেসব আরোহী সওয়ার ছিল গযনী সৈন্যদের তীর বিদ্ধ হয়ে মরে গিয়ে হাতির হাওদায় পড়েছিল। হাতিকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোন মাহুত ছিল না। হাতিটি স্বেচ্ছায় যখন সুলতানের অবস্থানের দিকে এলো তখন সেটির চাল ছিল একেবারেই শান্ত নিরীহ।

কাঙ্খিত হাতিকে এদিকে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে আসতে দেখে সুলতান মাহমূদ সেটিকে কব্জা করার নির্দেশ দিলেন। সুলতানের নির্দেশে দু'জন যোদ্ধা জীবনের ঝুকি নিয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে হাতির হাওদায় উঠে গেল এবং হাতিটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল।

বিনা প্ররোচনায় বিনা নির্দেশনায় নিজ থেকে হাতি গযনী বাহিনীর কাছে চলে আসায় সুলতান মাহমূদ বললেন-

ঃ এই হাতি আল্লাহ আমাদের দান করেছেন।"

সুলতান এই হাতির প্রাপ্তিতে খুশী হয়ে এটির নাম দিয়েছিলেন "খোদা দাদ।"

ঐতিহাসিক ফারিশ্‌তা লিখেছেন- সুলতান মাহমূদের আনা বিস্ময়কর পাখিটির বৈশিষ্ট্য ছিল, পাখির পিঞ্জিরা কোন ঘরে বা বাড়ীতে রাখলে সেই বাড়ীতে কেউ বিষ নিয়ে প্রবেশ করতে পারতো না। পাখি বিষের অস্তিত্ব টের পেলেই পিঞ্জিরায় অস্থিরভাবে ছটফট করতো। যেনো সে পিঞ্জিরা ভেঙে বেরিয়ে যাবে এবং বিশেষ ধরনের আওয়াজ করতো। লোকেরা পাখির এই আওয়াজ ও অস্থিরতা দেখে তল্লাশী করে লুকিয়ে রাখা বিষ খুঁজে বের করে নিতো। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ বিস্ময়কর এই পাখিটি উপঢৌকন স্বরূপ বাগদাদের খলীফাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ফারিশ্‌তা লিখেছেন, যে পাথরটি সুলতান মাহমূদ ভারত থেকে নিয়ে এসেছিলেন, এটির বৈশিষ্ট্য ছিল, এই পাথর চুবিয়ে ক্ষত স্থানে পানি দিলে ক্ষত খুব দ্রুত শুকিয়ে যেতো।

* * *

এই অভিযান থেকে গযনী ফেরার পর সুলতান মাহমূদ একটি ছোট্ট কাফেলা নিয়ে তার শায়খ ও মুর্শিদ তথা আধ্যাত্মিক গুরু ও শায়খ আবুল হাসান কিরখানীর উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। মুর্শিদের দরবারে পৌছার আগেই তিনি কাফেলার সঙ্গীদের থামিয়ে দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তখন তিনি ছিলেন খুবই সাধারণ পোশাক পরিহিত। এই পোশাকে অপরিচিতদের পক্ষে সুলতান মাহমূদকে চেনা সম্ভব ছিল না। শায়খের আস্তানার অনেক দূরেই তার নিরাপত্তা রক্ষীদের রেখে একাকী পায়ে হেটে মুর্শিদের দরবারে হাজির হলেন সুলতান। শায়খ ও মুর্শিদের দরবারে তিনি কখনো রাজকীয় বেশভূষা নিয়ে উপস্থিত হননি। মুর্শিদের দরবারে গিয়ে তিনি তার হাতে চুমু দিয়ে মাথা নীচু করে বসে পড়লেন।

'সেই সময়টি স্মরণ করুন সুলতান! এককার যখন আপনি পরাজিত হয়ে হিন্দুস্তান থেকে ফিরে এসেছিলেন। সুলতানকে দেখে প্রথমেই বললেন শায়খ আবুল হাসান কিরখানী। তিনি আরো বললেন, তখন আপনি ছিলেন বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত। আপনার অগণিত সৈন্য নিহত হয়েছিল। আপনার সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। ভেঙে গিয়েছিল আপনার মনোবল। আপনাদের বিপন্ন মনে করে আপনার শত্রুরা আপনার উপর শকুনের মতো ঝাপিয়ে পড়েছিল। তখন আমি আশংকা করেছিলাম, আপনি না আবার মনোবল হারিয়ে শত্রুদের মোকাবেলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া থেকে বিরত থাকেন।.......

জয় পরাজয় আল্লাহর হাতে সুলতান! যে পরাজয় স্বীকার করে নেয় পরাজয় তার ভাগ্যলিপি হয়ে ওঠে। আর সেই পরাজয় স্বীকার করে নেয় যার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। শহীদদের মিশনকে এগিয়ে নেয়া ছাড়া আপনি তাদের রক্তের ঋণ কিছুতেই শোধ করতে পারবেন না।.....

শহীদদের ত্যাগকে সম্মান করা আপনার কর্তব্য। যারা বুক টান করে মৃত্যুকে পরওয়া না করে শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত করে হিন্দুস্তানে গিয়েছিল, কিন্তু তারা আর গযনীতে ফিরে আসেনি, তাদের আত্মত্যাগ ভুলে গেলে এর শাস্তি দুনিয়াতেই আপনাকে ভুগতে হবে। কারণ, এরা আপনার নির্দেশে যায়নি, গিয়েছিল আল্লাহর পয়গাম ছড়িয়ে দিতে, আল্লাহর বিধানকে বুলন্দ করতে।"

"শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে আমি তাদের স্মারক হিসেবে গযনীতে একটি জামে মসজিদ এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে নির্মাণ কাজ শুরু করে দিতে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি। বিনীত কণ্ঠে মুর্শিদকে জানালেন সুলতান। তাদের স্মৃতিস্বরূপ আমি একটি স্মৃতি মিনার নির্মাণ করাচ্ছি। শহীদদের পরিবার বর্গের জন্য সরকারী ভাতার ব্যবস্থা করেছি এবং তাদের সন্তানদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছি।"

"এসবই ভালো কাজ। তবে আমার ক'টি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন সুলতান।' বললেন শায়খ কিরখানী। তারপর কিরখানী বললেন,

বিজয়ের পর গযনীর লোকেরা আপনাকে এভাবে অভ্যর্থনা দিয়েছে, যাতে মনে হয় আপনি যেন আসমান ছুয়ে নীচে নেমে এসেছেন। আমি শুনেছি আপনার পথে নারীরাও ফুল ছিটিয়েছে। কবিরা আপনার প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছে, শিল্পীরা আপনার প্রশংসায় সঙ্গীত গেয়েছে। রাজ দরবারে অসংখ্য লোক এসে আপনার হাতে চুমু দিয়ে আপনাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিজয়ী আখ্যা দিয়েছে।.......

এ মুহূর্তে আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না, যেগুলো আপনার দৃষ্টিতে আজ ফুলের মতো কোমল মনে হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে সেগুলো ফুল নয় বরং কাঁটা। কবি শিল্পী আর তোষামোদকারীরা আপনার যে প্রশংসা করছে আসলে সেগুলো প্রশংসা নয় মধুতে মেশানো বিষ। বিষ মধু বলে আপনাকে পান করানো হচ্ছে।......

আল্লাহ না করুন, আজ যদি কোন কারণে আপনি ক্ষমতাচ্যুত হন তাহলে এই প্রশংসাকারীরা সমস্বরে কোরাশ তুলবে যে, প্রকৃতপক্ষে মাহমূদ এমনটিরই উপযুক্ত। সুলতানী করার মতো কোন যোগ্যতাই তার মধ্যে ছিল না। তখন এরা সেই লোকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে ক্ষমতার মসনদে যাকে তারা দেখবে....।

তোষামোদ ও প্রশংসা ক্ষমতা ও মসনদের ঘুণ পোকার মতো। দৃশ্যত শত্রুর চেয়ে লুকিয়ে থাকা এই ঘুণ অত্যন্ত ভয়ংকর। খুব সন্তর্পণে ক্ষমতার তখ্‌তকে ভেতর থেকে ফোকলা করতে থাকে। আপনি যে রাতে বিজয়ের আনন্দ উৎসব করতে গযনীর লাখো অভিজাত শ্রেণীর লোককে দাওয়াত দিয়ে ভোজনের আয়োজন করেছিলেন, ভুলে গিয়েছিলেন সেই রাতে গযনীতেই বহু লোক দুঃখে- শোকে শুকনো রুটি খেয়ে অর্ধাহারে এক বুক কষ্ট নিয়ে ঘুমিয়েছে। এমনও হয়তো অনেক লোক ছিল, সেই রাতে যাদের পেটে এক টুকরো রুটিও যায়নি।.....

তোষামোদকারীরা হয়তো আপনাকে সেকথাই বুঝিয়েছে, গযনী সালতানাতের লোকেরা খুবই সুখে আছে এবং সবাই আপনার প্রশংসা করছে। মাহমূদ! নিজের বিবেকের আয়নায় নিজের চেহারা দেখবেন এবং জনতার চেহারা তোষামোদীদের চোখে নয় নিজের চোখে দেখবেন। একাকী আপনাকে ভাবতে হবে, আপনি গযনীর শাসক নন। ব্যক্তিগতভাবে আপনিও গযনীর অন্য দশটি মানুষের মতোই একজন মানুষ। অতএব অন্য দশজনের যে অবস্থা আপনাকেও তেমনই থাকতে হবে। নাগরিকদের চোখই হতে হবে আপনার চোখ।

শাসন, রাজত্ব আর কূটচাল পাশাপাশি থাকে মাহমূদ। ক্ষমতা লোভী তোষামোদী লোকেরা শাসকের সাথে প্রতারণা করে আর শাসক জনগণের সাথে প্রতারণা করে। একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে, অপরাধ ও সৎকাজ হাত ধরাধরি করে চলে। যে শাসক বা সুলতান তার চোখে তোষামোদীদের টুপি পরিয়ে রাখে এবং কানে প্রশংসাবাণীর সীসা ঢেলে দেয়, সে আল্লাহর কাছে অপরাধী বিবেচিত হয়।....

যে আল্লাহ্ আজ আপনাকে ক্ষমতা ও মর্যাদা দান করেছেন, তিনি এই ক্ষমতা আপনার কাছ থেকে ছিনিয়েও নিতে পারেন। তোষামোদীদের প্রশংসা বাণীর চেয়ে মজলুম ও অত্যাচারিতের দীর্ঘশ্বাস আল্লাহর কাছে অনেক বেশী দ্রুত পৌঁছে। হিন্দুস্তানের বিজয় আপনার প্রজাদের সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্যও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনটি যেন না হয় সোনা-রূপা আপনাকে একদেশদর্শী করে দেয়। যে সম্পদ আপনার

কজায় এসেছে, তা আল্লাহর অনুগ্রহ ও আমানত। এ সম্পদ আপনার ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র থেকে আপনাকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং বহি:শত্রুদের প্রতি আপনার কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে।....

সাম্প্রতিক বিজয়ের জন্যে আমি আপনাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমি অনুভব করছি হিন্দুস্তানের বিজিত এলাকাগুলোয় আযানের ধ্বনি মুখরিত হয়। আপনাকে আবারো সেই সব জায়গায় যেতে হবে। যেসব স্থানে কালসাপের মাথা এখনো থেতলে দেয়া সম্ভব হয়নি। আমি ভবিষ্যতের একটা চিত্র পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি, যদি হিন্দুদের মাথা গুড়িয়ে দেয়া না যায় তাহলে কুচক্রী এই হিন্দুজাতি ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত অব্যাহত রাখবে।.... ঠিক আছে এখন আপনি গযনী ফিরে যান, গিয়ে আগামী যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিন।"

"সম্মানিত মুর্শিদ! আপনি যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, এই দিক নির্দেশনা আমার খুব বেশী প্রয়োজন ছিল। কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেই আমার জীবন কেটে যাবে এই বাস্তবতা আমি হৃদয়ে গেথে নিয়েছি, এ বিষয়ে আমার মধ্যে কোন সংশয় সন্দেহ নেই। আমার দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কারণ হলো, স্বজাতির লোকেরা আমার সবচেয়ে ভয়ানক শত্রু। স্বজাতির প্রতিবেশী শাসকরা আমাকে ধ্বংস করার জন্যে এক জোট হয়েছে। গৃহযুদ্ধে আমাকে বারবার প্রচুর রক্ত ঝরাতে হচ্ছে।"

"একটা পার্থক্য আপনাকে বুঝতে হবে সুলতান! বললেন আবুল হাসান কিরখানী। এক পক্ষ হলো আপনার সালতানাতের শত্রু। এই শত্রুপক্ষ আপনার কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চায়। আর এক পক্ষ হলো এমন শত্রু যারা ইসলামকে দুর্বল করে দিতে তৎপর। এদেরকেই বলা হয় গাদ্দার। আপনাকে ব্যক্তিগত শত্রু এবং ইসলামের শত্রুদের পার্থক্য বুঝতে হবে। আপনার ক্ষমতা ও মর্যাদার বিরোধিতার কারণে কাউকে জীবিত রাখবেন না। আপনার স্ত্রী কন্যা পুত্র আপন ভাইও যদি ইসলামের ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হয় তবে তাকে বেচে থাকার সুযোগ দেবেন না।

কাশগরের শাসক কাদের খান, তার প্রতিবেশী শাসক আবুল মনসুর আরসালান খান এবং তোগা খান আপনার সালতানাত দখল করার জন্যে পায়তারা করছে। ওরা আবারও গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এরা ইসলামী

খেলাফতকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। খৃষ্টানরা এদেরকে সহযোগিতা করছে। এরা যদি মাথা তুলে এদের মাথা গুড়িয়ে দিন। তবে গুড়িয়ে দেয়ার আগে ওদের এটা বোঝার সুযোগ দেবেন যে তারা ভুলপথে ছিলো।"

* * *

গযনী সালতানাতের মোটামুটি ইতিবৃত্ত হলো, পূর্ব তুর্কিস্তানের শাসক এলিকখান ছোট ছোট রাজ্যগুলোর শাসকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে সুলতান মাহমূদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে বিপর্যস্ত করার অব্যাহত চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। (এই সিরিজের প্রথমও দ্বিতীয় খণ্ডে এদের বিরুদ্ধে সুলতান মাহমূদের একাধিক যুদ্ধের কথা বিবৃত হয়েছে।)

ইতোমধ্যে এলিক খানের মৃত্যু হয়েছে। তার স্থলে ক্ষমতাসীন হয়েছে তার ভাই আবুল মনসুর আরসালান খান।

আরসালানকে আল আসমও বলা হতো। আসম অর্থ বধির। সে কানে মোটেও শুনতো না। এজন্য তাকে আসম নামে ডাকা হতো। কাশগরের শাসক ছিল কাদের খান। তার প্রতিবেশী রাজ্যের শাসক ছিল তোগাখান। এগুলো ছিল একেকটি ছোট্ট ছোট্ট সামন্ত রাজ্য। এরা সবাই ছিল বাগদাদের অধীন। তখন বাগদাদের কেন্দ্রীয় খেলাফতের গুরুত্ব অনেকাংশেই কমে গেছে। বাগদাদের খলীফা কাদের বিল্লাহ আব্বাসী নিজেও ছিলেন একজন ক্ষমতালোভী। কাদের বিল্লাহ নিজেই পর্দার অন্তরালে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে এসব সামন্ত শাসকদেরকে গৃহযুদ্ধে ইন্ধন যোগাতেন।

* * *

সুলতান মাহমূদ মথুরা ও কন্নৌজ বিজয় শেষে যখন গযনীতে ফিরে এলেন তখন কাদের খান আরসালানের রাজমহলে এসে উপস্থিত হলো। সাথে কাদের খানের তরুণী মেয়ে আকসীও এলো। রাতের বেলায় যখন কাদের খান ও আরসালান খাছ কামরায় একান্ত আলোচনায় মগ্ন তখন কাদের খানের যুবতী

কন্যা আকসী আরসালানের ষোড়শী কন্যা সিমনতাশ রাজ মহল সংলগ্ন বাগানে পায়চারী করছিল।

সুনসান নীরব নিস্তব্ধ রাত। ঝিঁঝি পোকার গুঞ্জন ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। এই নির্জনতার মধ্যে মৃদুলয়ের একটি মনকাড়া সুর বাতাসে ভেসে আসছিল। সেই মৃদু আওয়াজ ছিল একটি বেহালার সুরলহরী। সেই মনকাড়া সুরের সাথে কারো গুনগুনানীর শব্দও শোনা যাচ্ছিল। বেহালার মৃদু আওয়াজ ও গুনগুনানীর শব্দের মধ্যে এক ছিল মায়াবী আকর্ষণ। যে কাউকে এই বেহালার সুর মুগ্ধ বিমোহিত ও তন্ময় করে দিতে সক্ষম ছিল।

মন মাতানো এই সুরের স্রষ্টা ছিল একজন দৃষ্টিশক্তিহীন বেহালাবাদক। সিমনতাশই এই বেহালাবাদকে বাগানের এক কোণে বসিয়ে রেখেছিল এবং আকসীকে নিয়ে আনমনে বাগানে পায়চারী করছিল। দৃষ্টিহীন বেহালা বাদক প্রায় বছর দেড়েক থেকে আরসালানের রাজ দরবারে অবস্থান করছে। আরসালানের যুবতী কন্যা সিমনতাশ সঙ্গীত খুবই পছন্দ করতো। এক কথায় সে ছিল সঙ্গীতপ্রিয়।

এক দিন দৃষ্টিহীন বেহালাবাদক রাজমহলের কাছে এসে তার বেহালায় সুর তুললো। সিমনতাশ বেহালার সুরে মুগ্ধ হয়ে তাকে রাজমহলে ডেকে পাঠাল। আরসালান দৃষ্টিহীন শিল্পীর কণ্ঠে একটি সঙ্গীত শোনার পরই তাকে রাজ দরবারের শাহী শিল্পী হিসেবে মনোনীত করে ফেললেন।

আবুল মনসুর আরসালান তার কন্যাকে খুবই স্নেহ করতেন এবং তার সঙ্গীত প্রিয়তাকেও তিনি পছন্দ করতেন। এই সুবাদে সিমনতাশ মাঝে মধ্যেই তার পিতার জ্ঞাতসারে রাজদরবারের এই শিল্পীকে তার ঘরে ডেকে পাঠাতো। এ ব্যাপারে সিমনতাশের বাবা আরসালান ছিল খুবই উদার।

"সিমনতাশ! শুনছো, শুনতে পাচ্ছো, কি সুন্দর সুর! সত্যি পাগল করার মতো। উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে সুরের আওয়াজে মুগ্ধ হয়ে সিমনতাশকে বললো আকসী। মনে হচ্ছে, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।

"জানো আকসী! যার সুর ও বেহালার বাজনা তোমাকে পাগল করে তুলছে, সেই শিল্পী দৃষ্টিহীন। বান্ধবী কাদের কন্যাকে বললো আরসালান কন্যা। আল্লাহ তার চোখে আলো দেননি কিন্তু কণ্ঠে দুনিয়ার যাদুকরী আওয়াজ

দিয়েছেন। আব্বা অনুমতি দেন না বলে, নয়তো আমি এই শিল্পীকে সুলতান মাহমূদের দরবারে নিয়ে যেতাম।"

"আরে তা কেন? এই শিল্পীকে তুমি সুলতান মাহমূদের দরবারে নিয়ে যেতে চাও কেন? সুলতান মাহমূদের সাথে তোমার কি কাজ?" জিজ্ঞেস করলো আকসী।

"কি আর হবে। এক মুসলমানের সাথে আরেক মুসলমানের যে সম্পর্ক থাকে আমারও তার সাথে একই কাজ। আমি এই দৃষ্টিহীন শিল্পীর সঙ্গীতের মাধ্যমে সুলতান মাহমূদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতাম। তুমি কি শোননি, তিনি হিন্দুস্তানের কতো হিন্দু রাজাকে পরাজিত করেছেন এবং কতো মূর্তি ভেঙেছেন?"

"তাতে তোমার খুশী হওয়ার কি আছে? বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো আকসী। সুলতান মাহমূদ তো তোমার ও আমার খান্দানের শত্রু সে যেসব হাতি ঘোড়া ঢাল তলোয়ার হিন্দুস্তান থেকে নিয়ে এসেছে, সেসব তো আমার ও তোমার খান্দানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে। মনে হয় তুমি তোমার খান্দানের ইতিহাস জানো না সিমন!"

"আমার বংশের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে আমি পূর্ণ অবগত; আমার অতীত সম্পর্কে অবগত বলেই আমি সুলতান মাহমূদের গুণগ্রাহী" বললো সিমনতাশ। তিনি আমাদের শত্রু নন, বরং আমার ও তোমার পরিবার তার শত্রু। সুলতান মাহমূদ ইসলামের পতাকাবাহী। তিনি একজন সফল মূর্তি সংহারী। তুমি হয়তো জানো না তিনি হিন্দুস্তানের কতোজন হিন্দু রাজা মহারাজাকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। কিন্তু তিনি সেখানে রাজত্ব করার জন্যে থেকে যাননি।"

"তার এসব যুদ্ধ ও অভিযানতো হিন্দুস্তানের ধন সম্পদ লুট করার জন্যে সিমন! ধন-সম্পদ হাতিয়ে নিতেই সে বারবার হিন্দুস্তানে হানা দেয়। এবার তো সে হাতি বোঝাই করে সোনা দানা নিয়ে এসেছে। সে অগণিত সোনাদানা সাধারণ মানুষ ও তার সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। আর এখন সে আমাদেরকে তার গোলামে পরিণত করার তৎপরতা চালাচ্ছে।

"আরে! আমিতো তার বন্দী হতেও প্রস্তুত।' উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বললো সিমনতাশ।

"তোমার মধ্যে কোন আত্মমর্যাদাবোধ নেই সিমন! তিরস্কারভরা কণ্ঠে বললো আকসী। তুমি না এলিক খানের ভাতিজী! যে এলিক খান আজীবন সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। তোমার আব্বা কি এ ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলেননি?"

"আমি সবই জানি আকসী। আমার চাচা এলিকখান সুলতান মাহমূদের সাথে প্রতিটি যুদ্ধেই পরাজিত হয়েছেন এবং পালিয়ে জীবন রক্ষা করেছেন। এ ব্যাপারে আমার আব্বার আর কি বলার আছে? আমার আব্বাতো বধির। তিনি তাই শুনতে পান যা তাকে শোনানো হয়।

"তুমি তোমার বাবাকে নির্বোধ মনে করো? বিস্ময়মাখা কণ্ঠে জানতে চাইলো আকসী। মনে হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তোমার মধ্যে শুধু রূপ সৌন্দর্যই দিয়েছেন, আত্মমর্যাবোধ ও জ্ঞানগরিমা দেননি। গযনী ও খোরাসানের মধ্যে তোমার মতো সুন্দরী দ্বিতীয়টি হয়তো নেই। কিন্তু তোমাকে রূপের রানী মনে হলেও জ্ঞান বুদ্ধিতে একেবারে শূন্য মনে হয়।

"আমাকে নির্বোধ বলতেই পারো কিন্তু আমার গৃহ শিক্ষককে তুমি কিছুতেই নির্বোধ বলতে পারবে না। আমার শিক্ষক একজন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাগর। তিনি আমাকে আমার খান্দানের ইতিহাস বলেছেন। তিনি আমাকে বলেছেন, বাবার মধ্যে দূরদর্শীতার অভাব আছে। আমি বলেছিলাম এটাতো তার অক্ষমতা যে তিনি শুনতে পান না। আমার শিক্ষক বললেন, শ্রবণশক্তি দুর্বল হওয়াটাই আসল কথা নয়। মূলত যারাই ক্ষমতার মসনদে বসে তারাই বধির হয়ে যায়। তারা মনে করে সবই তারা শোনে; কিন্তু তখন তাদরেকে রূঢ় বাস্তব ঘটনা ও কঠিন সত্য কথাগুলো শোনানো হয় না।....

ক্ষমতাসীনরা মনে করে তারা সবই দেখছেন কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে দেয়া হয়। তারা মনে করে তারাই সঠিক চিন্তা করছে, কিন্তু সঠিক বিষয়টি তারা ভাবার অবকাশ পায় না। তাদের মেধা মননে ভিন্ন চিন্তা চাপিয়ে দেয়া হয়।....

আকসী! আমার শিক্ষক একদিন আমাকে বললেন, তোমার চাচা এলিকখান বধির ছিলেন না তিনি ছিলেন যথেষ্ট বিবেক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কিন্তু গযনী জয় করার ভূত তার মাথায় চেপে বসেছিল এবং সুলতান

মাহমূদকে পরাজিত করে বন্দী করার খায়েশ তাকে পেয়ে বসেছিল। ফলে বাস্তব পরিস্থিতি যে কানে শোনার কথা ছিল তার কানে সেই বাস্তব কথা আর কখনো প্রবেশ করেনি। যে বাস্তব দৃশ্য তার দেখার কথাছিল তিনি তা দেখতে পাননি। যে বাস্তবতা তার বোধ-বুদ্ধিতে অনুভব করার কথা ছিল তা তিনি অনুভব করতে পারেননি।

তিনি গযনীকে তার রাজ্যের অধীন করার নেশায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এ ধরনের সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। ফলে এলিকখানও তার প্রজাদের সাথে মিথ্যাচার শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি নানা মিথ্যা বলে তার প্রতিবেশী শাসকদের প্রভাবিত করতে লাগলেন, মসজিদের খুতবায় মিথ্যা বলতে লাগলেন। কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে মিথ্যা বলতে শুরু করলেন। তিনি তার সেনা ও প্রজাদের বলতে লাগলেন, 'সুলতান মাহমূদ একজন লুটেরা। সে তার রাজ্য বিস্তারের জন্যেই এসব লুটতরাজ করে। এলিকখান মিথ্যা শপথ করে নিজের লিপ্সা চরিতার্থ করতে গিয়ে ভ্রাতৃঘাতি লড়াইয়ের সূচনা করলেন। ফলে মুসলমানদের ঐক্য ভেঙে গেল। মুসলিম শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল। এর বিপরীতে কুফরী শক্তি আরো শক্তিশালী হলো।....

আমার শিক্ষক আমাকে এও বলেছেন, সুলতান মাহমূদ যদি তার সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতি আগ্রহী হতেন, তাহলে প্রতিবেশী ছোট্ট ছোট্ট রাজ্যগুলো দখল করে নেয়ার মতো সামরিক শক্তি তার সব সময়ই ছিল। তুর্কিস্তানের খানদেরকে তার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করানো তার জন্যে মোটেও কঠিন ছিল না। কিন্তু এসবে তার দৃষ্টি ছিল না। সুলতান মাহমূদের দৃষ্টি ছিল অন্যত্র।...

মুহাম্মদ বিন কাসিম ভারতের যে অঞ্চলে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, ভারতের হিন্দু শাসকরা সেইসব এলাকার মুসলমানদের জীবন সংকীর্ণ করে ফেলেছিল এবং মুসলমানদেরকে ইসলাম ও ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। ফলে সেই এলাকার মসজিদগুলো ধ্বংস হয়ে মন্দিরের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা হারিয়ে ফেলেছিল আত্মপরিচয়। সুলতান মাহমূদ একবার আদিষ্ট হলেন–

"তুমি হিন্দুস্তানের নিবনিবু ইসলামের আলোকে প্রজ্জ্বলিত করো।"

জানো আকসী! সুলতান মাহমূদের একজন আত্যাত্মিক গুরু আছেন। তিনি হলেন শায়খ আবুল হাসান কিরখানী। জ্ঞান প্রজ্ঞা দূরদর্শিতায় তিনি এতোটাই প্রাজ্ঞ যে, ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে তা তিনি অনেকটা নির্ভুলভাবে অনুমান করতে পারেন। সাধারণ মানুষরা যা কাল্পনাও করে না, তার দেমাগ অবলীলায় সেইসব বিষয় চিন্তা করে। তিনি সময়ের গতি বুঝেন এবং সমাজের পরিবর্তন ও করণীয় সম্পর্কে আগে থেকেই মানুষকে সর্তক করেন। সেই কিরখানী সুলতান মাহমূদকে বলেছেন– " কুফর এবং স্বজাতির গাদ্দারদেরকে সর্বাগ্রে তোমাকে খতম করতে হবে....।

আমার শিক্ষক বলেছেন, যখন ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন তাদের ক্ষতস্থান থেকে ঝড়ে পড়া প্রতি ফোঁটা রক্তে যমীন কেঁপে ওঠে। আসমান কাঁদে এবং আল্লাহর ফেরেশতাগণ কাঁদে।"

"সিমনতাশ! তুমিতো এর আগে কখনো এমন কথা বলোনি। আকসী সিমনতাশের মুখ দু'হাতে চেপে ধরে বললো। এ বয়সে তোমার এসব ভারিক্কি কথাবার্তা শোভা পায় না। তোমার শিক্ষক হয়তো তোমাকে ভুল শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তো দেখছি এই বয়সেই তোমাকে দরবেশে পরিণত করতে চান। এমন একটি সুন্দর রাতে, এমন সুন্দর সুর লহরীও গানের মধ্যে তুমি কেমন যেন রুক্ষ শুষ্ক হয়ে যাচ্ছো সিমন!"

"হৃদয় যখন আলোয় আলোকিত হয়ে যায় তখন এমনটিই হয়ে থাকে আকসী! আমাকে তুমি রুচিহীন বলছো। আসলে আমি রুচিহীন নই। আমার রুচির জন্যই তো এই দৃষ্টিহীন শিল্পী রাজ দরবারের রাজকীয় শিল্পীতে পরিণত হয়েছে। আমি হৃদয় আলোকিত করার যে কথাগুলো বলেছি, এসবই আমি পেয়েছি আমার শিক্ষকের পাঠ ও এই দৃষ্টিহীনের সঙ্গীত থেকে। আমি সব সময়ই এই শিল্পীর বেহালার তারে ভিন্ন কিছু অনুভব করি। এই শিল্পীর সঙ্গীত সব সময় আমাকে অপার্থিব পয়গাম শোনায়।"

"সঙ্গীত? সঙ্গীতের মধ্যে আবার তুমি কি পয়গাম আবিস্কার করো সিমন?" জানতে চাইলো আকসী।

"সে কথা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না। তবে তা আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করি।"

দৃষ্টিহীন শিল্পী ধীরলয়ে বেহালা বাজাচ্ছিল এবং কেমন যেন আবেশ জড়ানো সুরে গুণগুণাচ্ছিল। কখনো শিল্পীর কণ্ঠের চেয়ে বেহালার আওয়াজ আবার কখনো বেহালার আওয়াজের চেয়ে শিল্পীর কণ্ঠ উচ্চকিত হচ্ছিল। এক সময় সিমনতাশ ও আকসী পায়চারী করতে করতে দৃষ্টিহীন শিল্পীর কাছে চলে এলো। কিন্তু শিল্পী আপন মনে সঙ্গীত ও বেহালায় মগ্ন ছিল। সে কারো উপস্থিতি মোটেও টের পেলো না।

"তুমি তোমার বাবাকে এ বিষয়টি বোঝাতে পারবে যে, সুলতান মাহমূদ তার সাম্রাজ্য বিস্তারে উৎসাহী নয়? আকসী সিমনতাশকে প্রশ্ন করলো। তোমার আব্বা কি বিশ্বাস করবেন সুলতান মাহমূদের সার্বিক যুদ্ধ উন্মাদনা ইসলামের জন্যে?"

"না, আমি হয়তো তা পারবো না। তাছাড়া আব্বাকে এ ব্যাপারে বোঝানোর প্রয়োজনও আমি বোধ করি না। বললো সিমনতাশ। আব্বা হয়তো সুলতান মাহমূদের বিরোধিতা করেন বটে কিন্তু তিনি হয়তো সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন না। তিনি শত্রুতা করেন ঠিকই বিরোধিতাও করেন, সেজন্য সুলতানের কোন সহযোগিতাও করবেন না।"

"আমি তোমাকে একটি গোপন কথা বলতে চাই সিমন" বললো আকসী। তোমার আব্বা কিন্তু সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন।"

"তাই না-কি! তাহলে আমি তাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখবো।" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো সিমনতাশ।

"মাথা ঠিক করো সিমন! কিছুটা উষ্মামাখা কণ্ঠে বললো আকসী। কোন তুর্কি মেয়ের জন্যে এমন আত্মমর্যাদাহীন হওয়া শোভা পায় না। তুমিতো দেখছি মানসিকভাবে গযনীর বাদী হয়ে গেছো।"

হঠাৎ দৃষ্টিহীন শিল্পীর বেহালার আওয়াজ বেতাল হয়ে গেলো যেন কেউ বেহালার তারে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। বেহালাটি একটু বেসুরো উঁচু আওয়াজ তুলে স্তব্ধ হয়ে গেলো।

"সুলতান মাহমূদ এখন ভয়ংকর একটি শক্তি। সে যেভাবে হিন্দুস্তানের রাজ্যগুলো দখল করেছে এভাবে তুর্কিস্তানের সবগুলো রাজ্যও দখল করে নেবে। তুমি দেখোনি কি ভাবে খাওয়ারিজম দখল করে নিলো। তুমি কি ভুলে গেছো এখন কে খাওয়ারিজম শাসন করছে? বললো আকসী।

"সুলতান মাহমূদের বিখ্যাত সেনাপতি আলতানতাশ এবং তার ডেপুটি আরসালান জাযেব। জানো এরা গযনীর কসাই। তারা যাকেই গযনীর প্রতিপক্ষ মনে করছে তাকেই হত্যা করেছে।"

"তাহলে আমার ও তোমার আব্বা কি করতে চান?" জানতে চাইলো সিমনতাশ।

"তারা খোরাসানের উপর আক্রমণ করতে চান।" বললো আকসী। সুলতান মাহমূদের কাছে খবর পৌঁছার আগেই তারা খোরাসানকে কব্জা করে নিবেন। কিন্তু সুলতান মাহমূদ যখন জবাবী আক্রমণ করবেন, তখন সেই আক্রমণ কে প্রতিরোধ করবে?"

"কেন? তোমার আব্বা আবুল মনসুর, আমার আব্বা কাদের খান এবং বুখারার শাসক তোগা খান মাহমূদের মোকাবেলা করবেন। তুমি জানো না, সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে তুর্কিস্তানের সকল শাসকদের জোটবদ্ধ করা হচ্ছে।" বললো আকসী।

সিমনতাশ হাসতে লাগল, যেন তার হাসি আর শেষ হবে না। তার হাসি ছিল বিদ্রূপাত্মক! দীর্ঘ হাসির পর সিমনতাশ আকসীর উদ্দেশে বলল, কতিপয় টিকটিকি আর নেংটি ইঁদুর মিলে কি সিংহের মোকাবেলা করতে পারে?"

"তোমার এই সিংহের যদি জীবনই না থাকে, তবে কি মোকাবেলা করতে পারবে না?" রহস্যময় কণ্ঠে বললো আকসী।

"জীবনই থাকবে না মানে?" বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল সিমনতাশ।

তাকে খোরাসান আক্রমণের আগেই হত্যা করা হবে। কথাটি মুখ ফসকে বলে ফেললো আকসী। সাথে সাথে প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে আকসী বললো। তোমার বেহালাবাদকের মনে হয় ঘুম পেয়েছে, নয়তো চলে গেছে। আর তো বেহালার সুর শোনা যাচ্ছে না।'

ঠিক তখনই আবার দৃষ্টিহীন বেহালাবাদকের বেহালার মৃদু সুর বাজতে শুরু করল। সেই সাথে বাদকের অনুচ্চ কণ্ঠের হালকা আমেজের কণ্ঠও কানে ভেসে এলো।

সিমন! তোমার বেহালাবাদক হঠাৎ নীরব হয়ে গিয়েছিল কেন? সে কি আমাদের কথা শোনার জন্যে বাজনা বন্ধ করে দিয়েছিল?"

আকসী! একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বেহালাবাদকের ব্যাপারেও তোমার এতো ভয়? বললো সিমনতাশ। এই দৃষ্টিহীন লোকটির বেহালা ছাড়া জগতের আর কোন কিছুর প্রতি কোন আগ্রহ নেই।

আকসী সিমনতাশের হাত ধরে তাকে আরো কিছুটা দূরে নিয়ে গিয়ে বলল, তুমি জানো না সিমন! সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দারা সব জায়গায় থাকে। আমার আব্বা তার দরবার থেকে দুই গোয়েন্দাকে পাকড়াও করে জল্লাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমার তো মনে হয় তোমার আব্বার দরবারেও গযনীর গোয়েন্দা আছে।"

"তা হয়তো থাকতে পারে। কিন্তু দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী একজন জাত বেহালা পাগল কখনো গোয়েন্দা হতে পারে না। কিন্তু তুমি যে বললে সুলতান মাহমূদকে হত্যা করা হবে! কিভাবে কখন তাকে হত্যা করা হবে?"

সম্ভবত আজই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে।' বললো আকসী। সিমন! আমার তো মনে হয় তোমার গৃহ শিক্ষক হয়তো গযনীর গোয়েন্দা। গোয়েন্দা না হলে তুর্কিস্তানের এমন ভয়ংকর শত্রুকে সে ইসলামের পতাকাবাহী বলতে পারতো না। তুমি যদি তোমার আব্বার জীবন বাঁচাতে চাও, তাহলে তোমার গৃহ শিক্ষকের কথা আর বিশ্বাস করো না। এই ধূর্ত বুড়োটা তোমাকে বিভ্রান্ত করছে।"

সুলতান মাহমূদকে হত্যার কথা শুনে সিমনতাশের কণ্ঠণালী যেন শুকিয়ে এলো। সে আর কোন কথাই বলতে পারছিল না। আকসী একের পর এক কথা বলেই যাচ্ছিল এবং আনন্দে ভেঙ্গে পড়ছিল।

দীর্ঘক্ষণ পর অত্যন্ত বিধবস্ত কণ্ঠে সিমনতাশ বললো,

আকসী! আমাদের এখন যাওয়া দরকার। অনেক রাত হয়েছে। তুমি তোমার ঘরে চলে যাও, আমি দৃষ্টিহীন এই লোকটিকে তার ঘরে দিয়ে আসি।"

আরে, তুমি যাবে কেন? কোন চাকরানী কর্মচারীকে বলো ওকে দিয়ে আসুক।

কিন্তু সিমনতাশ আকসীর কথার কোন জবাব না দিয়েই বেহালাবাদকের দিকে অগ্রসর হলো।'

* * *

রাজ প্রাসাদের কাছেই একটি ঘরে থাকতে দেয়া হয়েছিল দৃষ্টিহীন সঙ্গীত শিল্পীকে। সিমনতাশ শিল্পীর হাত ধরে তাকে তার থাকার ঘরে নিয়ে গেল। পথিমধ্যে তাদের মধ্যে কোন কথাই হয়নি। কিন্তু শিল্পীকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে সিমনতাশ বের হতে যাচ্ছে তখন শিল্পী সিমনকে থামতে অনুরোধ করে বললো–

আপনি শাহজাদী! আর আমি আপনার এক নগণ্য সেবক।' উদাস কণ্ঠে বললো শিল্পী। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনাকে একটি কথা বলতে চাই। আমার এখন এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।"

কেন? তোমার চলে যেতে হবে কেন? প্রশ্ন করলো সিমনতাশ।

কাদের খানের শাহজাদী আমাকে গযনীর গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করেছেন। সিমন শাহজাদী......। রাজত্ব শাসন এসব ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র কোন আগ্রহ নেই। আমার পৃথিবীটাতে শুধু আছে নিকষ অন্ধকার আর আমার এই বেহালার সুর। চোখের অন্ধকারকে আমি বেহালার তারের সাহায্যে আলোকিত করে রাখি।"

না না, আকসী তোমাকে গোয়েন্দা বলেনি। হঠাৎ করে তোমার বেহালা একটু ঝাঝালো আওয়াজ করে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তুমিও নীরব হয়ে গিয়েছিলে, তাই সে ভেবেছিল তুমি হয়তো আমাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছিলে।

কাদের খানের কন্যার মুখে সুলতান মাহমূদকে হত্যার কথা শোনে আমার হাত কেঁপে ওঠে এবং হাতের আঙ্গুল .........বেহালার তারে আঘাত হানে। ফলে হঠাৎ করে ঝাঝালো আওয়াজে বেহালাটি কর্কশ হয়ে ওঠে। সেই সাথে আমার কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে যায়।"

সুলতান মাহমূদ খুন হলে পৃথিবীতে কি কেয়ামত ঘটে যাবে? এজন্য তোমার হাত কেঁপে উঠবে কেন? জিজ্ঞেস করলো সিমনতাশ।

সুলতান হোক আর সাধারণ সৈনিকই হোক, কারোরই অন্যায় খুনের শিকার হওয়া স্বাভাবিক নয় শাহজাদী! আমি জানি, আপনি সুলতান মাহমূদকে প্রাণাধিক শ্রদ্ধা করেন। সুলতান নিহত হলে আপনি যেমন কষ্ট পাবেন, তদ্রুপ আমিও কষ্ট পাবো শাহজাদী। কারণ, আপনার মতো আমিও সুলতান মাহমূদকে ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী মনে করি।"

“সুলতানের প্রতি তোমার সুধারনা তোমার মধ্যেই থাকুক। এ নিয়ে এখানকার কারো সাথে কথা বলো না। দৃষ্টিহীন শিল্পীকে সতর্ক করে দিল সিমনতাশ।

শাহজাদী! কে তাকে হত্যা করবে, কখন হত্যা করবে? উদ্বিগ্নকণ্ঠে জানতে চাইল শিল্পী।

এ বিষয়টি এখনো আমার জানা সম্ভব হয়নি, জবাব দিল সিমনতাশ। ঠিক আছে। আমি এখন যাই, তুমি বিশ্রাম করো।”

আর একটু সময় থাকো শাহজাদী! তুমি আমাকে রেখে গেলেই আমি আরাম করতে পারবো না। একথা শোনার পর আমার পক্ষে আর ঘুমানো সম্ভব হবে না।

“না ঘুমিয়ে দুশ্চিন্তা করে কি হবে? তার কি কোন উপকার করা তোমার পক্ষে সম্ভব? বললো সিমনতাশ। তোমার পক্ষে তো আর এই গৃহ যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব নয়, তুমি তো সুলতানকে খুনীদের হাত থেকে বাচাতে পারবে না।”

আপনি যদি আমাকে এ ব্যাপারে তথ্য দিতে পারেন, তাহলে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার আগেই আমি গযনী গিয়ে সুলতানকে আগেভাগেই সতর্ক করবো।”

তুমি আসলেই একজন আবেগী মানুষ। দৃষ্টিহীন শিল্পীর কথায় হেসে ফেললে সিমনতাশ। তুমি তো দেখতে পাও না। এতদূর গযনীর পথ তুমি কি করে যাবে?”

পড়েমরে এক ভাবে চলে যাবো শাহজাদী। তাও যদি না পারি, তবে এই এলাকায় আমার কিছু শিষ্য আছে তাদের কাউকে পাঠিয়ে দেবো।”

তুমি কি এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ? তুমি যা বলছো তা কি তুমি করে দেখাতে পারবে? একটু দৃঢ় কণ্ঠে শিল্পীকে জিজ্ঞেস করলো সিমনতাশ।

আপনি আসল কথাটি আমাকে বলেই দেখুন না শাহজাদী। বাকীটা আমি আপনাকে করে দেখিয়ে দেবো। শাহজাদী! সুলতান মাহমূদ সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার কথা জানার পরই কেবল আমি শ্রদ্ধা ও আস্থার কথা বলেছি।

আমাদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয়েছে, তা যেন কেউ জানতে না পারে। শিল্পীকে সতর্ক করে দিল সিমনতাশ।

* * *

দৃষ্টিহীন বেহালাবাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করতে করতে সিমন তার মাকে ডাকল, মা! মা! আব্বা কি আমাদের বংশের অপমৃত্যুর ধারাটাকেই তাজা রাখতে চায়?"

কি হয়েছে বেটি?"

মা! তুমি কি জানো না, কাশগরের খান এখানে কি জন্যে এসেছে?

খোরাসানের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে শত্রুবাহিনী। এজন্য কাদের খান আব্বাকে চাচা এলিকখানের পথেই চালিত করতে এসেছে। অথচ চাচার মৃত্যুর দুঃখটা এখনো দগদৃগে ঘায়ের মতোই আমাদের পীড়া দিচ্ছে। মা! তুমি কি আব্বাকে এ পথ থেকে ফেরাতে পারবে?"

মা মেয়ের মধ্যে যখন এসব কথাবার্তা হচ্ছিল ঠিক সেই সময় আবুল মনসুর আরসালান খান দরজা ঠেলে সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। মা মেয়ে দু'জনই উঁচু আওয়াজে কথাবার্তা বলছিল। ফলে তা শুনতে পেয়ে আরসালান খান চোখ বড় বড় করে মা মেয়ের দিকে তাকাল।

আরসালান খানকে প্রবেশ করতে দেখে সিমনতাশের মা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

মনে হচ্ছে তোমরা কোন জটিল বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলে? স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলো আরসালান খান। সিমনতাশের মা স্বামীর কানে মুখ লাগিয়ে বললেন, "আপনি শুধু আমাদের বাহ্যিক চেহারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনি যদি আমাদের মনের ভেতরের দৃশ্য দেখতে পেতেন, তাহলে সেখানে আপনার নজরে পড়তো ইসলামের নিবেদিত প্রাণ সৈন্যদের ক্ষতবিক্ষত লাশ, আপনি দেখতে পেতেন ইসলামের পতাকা কিভাবে রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে। আপনি আমাদের চোখের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, সেখানে আপনি দেখতে পাবেন একই ধর্মের অনুসারী একই আল্লাহর ও একই রসূল সা.-এর কলেমা পাঠকারী মানুষ একে অন্যের রক্তে কিভাবে হোলি খেলছে।'

"চুপ করো। রাজকীয় কর্মকাণ্ড নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। গর্জে উঠলেন আবুল মনসুর। আমি কি করবো না করবো, এ ব্যাপারে দখলদারী করার দুঃসাহস তোমরা কোত্থেকে পেলে?"

"হ্যাঁ, এখন আমি কিছু বললেই দুঃসাহস হয়ে যায়। আর যখন আমার দেহে তাজা রূপ-যৌবন ছিলো, তখন শত মন্দকথা বললেও তা দুঃসাহস হতো না। ঝাঝালো কণ্ঠে বললেন সিমনতাশের মা। এখন তো আর আমাকে প্রয়োজন নেই। পাঁচ পাঁচটি সুন্দরী যুবতী আপনাকে সব সময় ঘিরে থাকে। এজন্যই আল্লাহ আপনার কান বধির করে দিয়েছেন, চোখেও টুপি এটে দিয়েছে। মাথাটাও ওই ছুকড়িরা দখল করে নিয়েছে। এখন আর আপনার পক্ষে নিজের বুদ্ধিতে কোন কিছু চিন্তা করা সম্ভব হয় না। আপনি কি কখনো ভেবেছেন, যে দুই ছুকড়িকে তুহ্ফা হিসেবে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে, কি উদ্দেশে কেন এদের এখানে পাঠানো হয়েছে?

"সে যাই হোক। তোমাকে আমি যে অধিকার ও সুবিধা দিয়েছি, তা আমি আর কাউকে দেইনি। বললেন আবুল মনসুর। তুমি জানো না বেগম! আমরা সুলতান মাহমূদকে জানতে দিচ্ছি না, আমরা শক্তি সঞ্চয় করছি এবং ধীরে ধীরে একটি সম্মিলিত বাহিনী তৈরীর চেষ্টা করছি। মাহমূদ এটা জানতে পারলে খাওয়ারিজমের মতো আমাদেরকেও গিলে ফেলতে চাইবে। তুমি জানো না বেগম! সুলতান মাহমূদ এখন কতো বিপুল শক্তির অধিকারী।"

"আব্বু আপনাকে একথা কে বলেছে যে সুলতান মাহমূদ আপনার রাজ্য গিলে ফেলার জন্যে শক্তিশালী হয়েছে? বাবার কানে মুখ লাগিয়ে উচ্চ আওয়াজে বললো সিমনতাশ। এই ধারণা হয়তো আপনাকে তুর্কিস্তানীরা দিয়েছে। তুর্কিরা আপনাকে দাবার ঘুটির মতো ব্যবহার করছে।"

"ও কথা বলো না বেটি! কাদের খানের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। সে যা বলে ভেবে চিন্তে খোঁজ খবর নিয়েই বলে। লোকটিকে আমার বিশ্বস্ত মনে হয়।'

"বিশ্বস্ত তো মনে হবেই। কারণ আপনার কাছে তার বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে সে তার যুবতী কন্যাকে সাথে করে নিয়ে এসেছে। শ্লেষাত্মক ভঙিতে বললেন সিমনের মা। ওই ছুকড়ি যেভাবে সেজেগুজে হাতমুখ নাড়িয়ে আপনার গায়ের সাথে গা মিশিয়ে কথা বলছিল, তার সবই আমি দেখেছি। একটা খেমটা মাথাড়ির আহ্লাদের জন্যে আপনি কি গোটা সেনাবাহিনীকে গযনী বাহিনীর হাতে জবাই করে ফেলতে চান?"

"আব্বু! রক্ষয়ী এই গৃহ যুদ্ধের এ পথে ক্ষতি ছাড়া আর কি পেয়েছি আমরা? চাচা এলিকখান গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে আতংক নিয়ে রাজ্য শাসন করেছেন। চাচীতো বলেছেন, চাচাকে পরাজিত করার পরও সুলতান মাহমূদ তার রাজ্য দখল করেননি।" বললো সিমনতাশ।

মা ও মেয়ে দু'জন আবুল মনসুরের দু'কানে মুখ লাগিয়ে উচ্চ আওয়াজে আবুল মনসুরকে বোঝাতে চেষ্টা করলো, তিনি যেন কিছুতেই কাদের খানের প্ররোচনায় পা না দেন। আবুল মনসুর তাদরেকে যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু মা ও মেয়ের যুক্তির কাছে আবুল মনসুরের যুক্তি টিকতে পারছিল না।

এক পর্যায়ে আবুল মনসুর আল্লাহর দোহাই দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা আমার কথা শোন। আমি চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ গেছি। একদিকে সুলতান মাহমূদ আর এক দিকে কাদের খান ও তোগা খান। আমি যদি এদের কথা না শুনি তাহলে এরা আমার ক্ষতি করবে, আর যদি এদের কথা শুনি তাহলে আমাকে সুলতান মাহমূদের শত্রুতা মেনে নিতে হয়।"

"সুলতান মাহমূদের সাথে আপনার শত্রুতার দরকার কি? আপনি তার সাথে দোস্তি করে ফেলুন, তাহলেই তো সমস্যা দূর হয়ে যায়। বললেন সিমনের মা।

" মাহমূদ আমাদের খান্দানের শত্রু। বংশের চিহ্নিত শত্রুকে আমি দোস্ত বানাতে পারি না।.....হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন আবুল মনসুর। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন- "তোমরা জেনে রাখো, আমার খান্দানকে অপদস্থ করার প্রতিশোধ আমি অবশ্যই মাহমূদের কাছ থেকে নেবো।......এখন আর আমার পক্ষে পিছিয়ে আসা সম্ভব নয়। আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আমাদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত।"

"এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে কি সুলতান মাহমূদকে হত্যার পরিকল্পনাও আছে আব্বু? প্রশ্ন করলো সিমন। ঠিক এ সময় মা মেয়ে একজন অপরজন দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে দিয়ে ক্ষীণ আওয়াজে সিমন তার মাকে বললো-

মা, তুমি ভাবভঙ্গি বদল করে আব্বুর কাছ থেকে তাদের পরিকল্পনা জানার চেষ্টা করো।'

‘মেয়ের কথায় তার মা ভাবভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে ফলে বললো– আপনি যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে আর সেটি পরিবর্তনের কথা আমরা বলবো না। বরং আপনি পরিকল্পনামতো এগিয়ে যান। আমরা আপনাকে সাহস যোগাবো।’

কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনারা? আমাদেরকেও বলুন। যাতে আমরাও আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।’ মা ও মেয়ের কৌশলে আটকে গেলেন আবুল মনসুর। তিনি কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন এবং কাদের খান তোগা খান এবং তার সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ পরিকল্পনা এবং যুদ্ধের আগেই সুলতান মাহমূদকে হত্যার চক্রান্তের কথা সবিস্তারে বলে দিলেন।

* * *

পরদিন কাদের খান যখন আবুল মনসুরের রাজমহল থেকে সুলতানের বিরুদ্ধে চক্রান্তের নীল নক্সা শেষে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন সিমনতাশ দৃষ্টিহীন সঙ্গীত শিল্পীকে তার ঘরে ডেকে এনে বললো– “তুমি বলেছিলে, আমি যদি সুলতানের বিরুদ্ধে সংগঠিত চক্রান্তের ব্যাপারে তোমাকে জানাতে পারি তাহলে তুমি এ খবর নিয়ে গযনী চলে যেতে পারবে। আমার জিজ্ঞাসা হলো, এ ব্যাপারে কিসের ভিত্তিতে আমি তোমার উপর ভরসা করবো? কে যাবে গযনী খবর নিয়ে?”

“আসলে আমার কাছে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যা দিয়ে আমি আপনার কাছে আমার বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে পারবো।’ জবাব দিলো দৃষ্টিহীন শিল্পী। তবে আমি যা বিশ্বাস করি আপনিও যদি তা-ই বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনার উচিত আমার উপর আস্থা রাখা।

“বার্তা নিয়ে গযনী কে যাবে? সে কথা দয়া করে আপনি জানতে চাইবেন না। আপনি শুধু একটি ঘোড়া সংগ্রহ করে দেবেন এবং সেই ঘোড়ার লাগাম আমার হাতে তুলে দেবেন। আমি কিছু দিন আপনার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবো, কিছু দিন পর আবার আপনার কাছেই ফিরে আসবো।’

'কুরআন শরীফ নিয়ে তাতে চুমু দিয়ে দৃষ্টিহীন শিল্পীর হাতে তুলে দিয়ে সিমনতাশ বললো- "এটি জগতের সবচেয়ে পবিত্র কিতাব কুরআন। এটি হাতে নিয়ে শপথ করো, তুমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে।"

"না শাহজাদী! কসম করা ঠিক হবে না' বললো শিল্পী। কসম করলেই অন্তর আয়নার মতো পরিষ্কার হয়ে যায় না। দেখা যায়, বেঈমান মোনাফেক লোকেরাই বেশী কসম করে। আপনার দেয়া এই কুরআন শরীফ আমার সাথে থাকবে। আমার এটির দরকার আছে। ফিরে এসে এটি আপপনাকে ফেরত দেবো।......কবে নাগাদ আমার লোক পাঠাতে হবে? শাহজাদী?"

"আজই! আজই তোমার লোককে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তোমার লোক কি আজ রওয়ানা হতে পারবে? জানতে চাইলো সিমনতাশ।

"তা পারবে। বললো অন্ধ শিল্পী। কিন্তু আপনাকে ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বলতে হবে পয়গাম কি?"

"মনোযোগ দিয়ে শোন।" বললো সিমন।

'তোমার লোককে সুলতানের সাথে সাক্ষাত করে বলতে হবে, কাদের খান, তোগা খান ও আবুল মনসুর মিলে শীঘ্রই খোরাসানে আক্রমণ চালাবে এবং আপনাকে গোপনে হত্যা করাবে। সুলতানকে একথাও বলতে হবে, এক শাসক কন্যা তার বাবার বিরুদ্ধে গিয়ে আপনার সহযোগী হিসেবে এই ঝুঁকিপূর্ণ পথে নেমেছে। তিনি যেন আমার প্রতি বিন্দুমাত্র সংশয় না করেন বরং বিদ্রোহী এই কন্যাকে ইসলামের এক নগণ্য সেবিকা মনে করেন।

সেই সাথে সুলতান যেন আমাকে নিজের সন্তানের মতোই মনে করেন। সুলতানকে বলতে চাই, আমি জানি এরা তিনজন সম্মিলিতভাবেও আপনাকে কাবু করতে পারবে না, সুলতান হয়তো এক আক্রমণেই এদের সবাইকে ধরাশায়ী করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু তাতেও তো প্রচুর রক্তক্ষয় হবে, জীবন হানি ঘটবে।

গযনী, খোরাসান, খাওয়ারিজম, বলখ, বুখারার সেই মায়েরা ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে যুবক সন্তানদের মৃত্যু দেখে আজো পর্যন্ত কাঁদে। সন্তান হারা মায়েরা নিজ সন্তানকে হারিয়ে যেভাবে কান্না করে, তাদের দীর্ঘশ্বাসে আজো আকাশ

বাতাস কেঁপে ওঠে.....। সুলতানকে আরো বলতে হবে, আমার পিতা আবুল মনসুর কাদের খান ও তোগা খানকে ভয় করে। সুলতান নিজে থেকে মৈত্রীর পয়গাম পাঠিয়ে আমার বাবার অন্তর থেকে এই আতংক দূর করতে পারেন। আমার এই আহ্বানকে নিজ কন্যার আবেদন মনে করে অগণিত যোদ্ধাকে ভ্রাতৃঘাতি লড়াইয়ে নিহত হওয়া থেকে সুলতান বাঁচাতে পারেন।...

আমার বাবার মৃত্যুতে নিজের এতীম হয়ে যাওয়ার জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই। আমার মায়ের বৈধব্যতেও আমি বিন্দুমাত্র পরিতাপ করবো না। আমার শত দুঃখ ও অনুতাপ শুধু সে কারণে যাদের জীবন দেয়ার কথা ছিল কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে তারা ভ্রাতৃঘাতি লড়াইয়ে অর্থহীন ভাবে জীবন দিচ্ছে। পক্ষান্তরে তাতে কুফরী শক্তি আরো শক্তিশালী হচ্ছে।”

“তুমি কি আমার সব কথা মনে রাখতে পারবে শিল্পী? আমি তোমাকে যেভাবে বললাম তুমি কি সেভাবে গযনীর সুলতানকে বলতে পারবে? বললো সিমনতাশ।

“জী হ্যাঁ। আপনি যেভাবে বলেছেন, আমি ঠিক সেভাবেই বলবো এবং সেইভাবেই বার্তা সুলতানের কাছে পৌছে যাবে। সিমনতাশকে আশ্বস্ত করতে বললো শিল্পী।

“আমি আস্থা রাখতে পারছি না। তুমি একজন জাত শিল্পী। গঙ্গীত নিয়ে তুমি সারাক্ষণ ডুবে থাকো। তুমি আমার আবেগ ও অনুভূতি অনুভব করতে পারবে কিনা তাই আমি ভাবছি। নিজের ভাবনায় ডুবে থাকা কোন লোক জগতের অন্য কিছু বুঝে উঠতে পারে না। তোমার পক্ষে বোঝা কঠিন, ক্ষমতার মোহে কিভাবে শাসকরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করে হানাহানিতে লিপ্ত করে। অথচ এর নেপথ্যে থাকে শুধুই শাসকদের ক্ষমতার লোভ।

‘সিমন শাহজাদী! এখন সাহিত্য করার সময় নয়। অর্থহীন সংশয় ঝেড়ে ফেলে আমাকে বলুন সুলতানের কাছে কি বার্তা পৌছাতে হবে? আমাকে এতোটা নির্বোধ মনে করবেন না শাহজাদী! আমি সব কিছুই বুঝি এবং সব কিছুই অন্যকে বোঝাতে পারি।’

"ঠিক আছে শিল্পী। তুমি চলে যাও। সুলতানকে গিয়ে বলো, তিনি যেন আমার আব্বার কাছে মৈত্রীর পয়গাম পাঠান এবং গযনী বাহিনী যেন তার বেচে থাকাকে নিশ্চিত করে।

* * *

কিছুক্ষণ পর শহর থেকে একটি ঘোড়া বের হলো। ঘোড়াটির লাগাম ধরে আছে একজন দৃষ্টিহীন লোক। লোকটির এক হাতে ঘোড়ার লাগাম অন্য হাতে একটি লাঠি। তার কাঁধে ধনুক ঝুলানো থলের মধ্যে তীরের ফলা। তার ঘোড়াটি পূর্ণ যুদ্ধ সাজে সজ্জিত। লোকটিকে খুব কম লোকেই চেনে। যারা তাকে চিনে ঘোড়ার লাগাম ধরে যুদ্ধ সাজে কাধে তীর ধুনুক নিয়ে তাকে হাঁটতে দেখে তারা হাসছে।

এই ঘোড়াওয়ালা আর কেউ নয় রাজ দরবারের বেহালাবাদক। সে এই অবস্থায় শহরের প্রধান গেট পেরিয়ে গেল। বেহালা বাদক ঘোড়াকে টেনে নিয়ে গেল কিছুদূর। তারপর শহর থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে সে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলো। আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সে হাতের লাঠিটি ফেলে দিয়ে ঘোড়াকে তাড়া করলো। কিন্তু খুব দ্রুত সে ঘোড়াকে দৌড়াতে দিল না। নিজের আত্মবলের উপর নির্ভর করে দৃষ্টিহীন শিল্পী অশ্বারোহন করার দুঃসাহস করলো। অবশ্য ঘোড়াটি তাকে নিয়ে ঠিক পথেই অগ্রসর হতে লাগল।

পনেরো ষোল মাইল পর দেখা দিল ঘনবন। এই বনে সাধারণত শাহী দরবারের লোকেরা শিকার করতে আসে। জঙ্গলকীর্ণ এই জায়গাটি বহু উচু নীচু টিলা ও খানা খন্দকে রয়েছে। এলাকাটিতে হরিণের খুব বিচরণ। সাধারণত হরিণ শিকারের জন্যেই এলাকাটি বিখ্যাত।

এখানকার হরিণগুলো বেশ বড় এবং স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকে। হঠাৎ করে দৃষ্টিহীন শিল্পীর ঘোড়ার সামনে দিয়ে একটি আহত হরিণ পালাচ্ছিল। হরিণটির গায়ে দু'টি তীর বিদ্ধ। শিল্পী আহত হরিণের পিছু ধাওয়া করল। হরিণটি আহত হওয়ায় বেশী দৌড়াতে পারছিল না। শিল্পীর ঘোড়া হরিণের কাছাকাছি পৌছতেই তীরদান থেকে একটি তীর নিয়ে ধনুকে ভরে ছুড়তেই হরিণটির পেছনের পায়ে নিক্ষিপ্ত তীর আঘাত হানল। এবার আর হরিণটি দৌড়াতে পারল না। একটি লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

আহত হরিণটিকে ধাওয়া করছিল একদল শিকারী। কিন্তু তারা ছিল হরিণ থেকে অনেক দূরে। শিল্পী যখন তীর বিদ্ধ করে হরিণের গতি থামিয়ে দিয়ে হরিণের কাছে গিয়ে থামল ততোক্ষণে হরিণের পিছু ধাওয়াকারী শিকারী দল শিল্পী ও হরিণের কাছে পৌছে গেল। দৃষ্টিহীন শিল্পী হরিণের পিছু ধাওয়াকারী শিকারী দলটিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে বললো–

"আমি আপনাদের থেকে পালিয়ে আসা হরিণটিকে ফেলে দিয়েছি।' একথা তার মুখে উচ্চারিত হলো বটে কিন্তু শিকারী দলকে দেখে মনে মনে সে ঘাবড়ে গেল। কারণ, সে শিকারী দলটিকে চিনে ফেলেছিলো।

শিকারী দলের লোকজনও দৃষ্টিহীন লোকটিকে দেখে বিস্মিত হলো। কারণ, শিকারী দলের দলপতি ছিল কাদের খান। তার পিছনের ঘোড়াতেই সওয়ার ছিল কাদেরখানের সফর সঙ্গী কন্যা আকসী। আর অন্যেরা ছিল কাদের খানের উপদেষ্টা আর নিরাপত্তারক্ষী। কাদের খান যে দিন আবুল মনসুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথিমধ্যে হরিণ শিকারে মেতে ওঠেছিল সেই দিনই দৃষ্টিহীন শিল্পী আবুল মনসুরের কন্যার সহযোগিতায় সুলতানকে হত্যার চক্রান্তের খবর নিয়ে রওয়ানা হয়েছিল।

কাদের খান প্রথমে হরিণের গায়ে একটি তীর বিদ্ধ করে আর দ্বিতীয় তীরটি বিদ্ধ করে তার মেয়ে আকসী। কিন্তু দু'টি তীর বিদ্ধ হওয়ার পরও হরিণ ছুটে পালাতে সক্ষম হয় কিন্তু ঘটনাক্রমে আহত হরিণটি; অন্ধ বেহোলা বাদকের সামনে পড়ে যাওয়ায় সে চূড়ান্ত আঘাত হানে এবং একটি তীর বিদ্ধ করতেই হরিণটি মাটিতে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

শিল্পীকে দেখে কাদের খান বলে বসলেন, "আরে তুমি কি সেই দৃষ্টিহীন সঙ্গীত শিল্পী না? যে আবুল মনসুরের রাজ প্রাসাদে আমাদের মন কাড়া সঙ্গীত শুনিয়েছিলে?"

শিল্পীর তবলা তার ঘোড়ার জিনের সাথেই বাধা ছিল। আকসী তার ঘোড়া শিল্পীর ঘোড়ার কাছে নিয়ে তবলার বাধা পুটলাটা খুলতে শুরু করল। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল শিল্পী। কারণ এতোক্ষণে পুটলা খোলে তার তবলা বেহালা আকসী বের করে ফেলেছে। এখন আর এদের কাছে বিষয়টি অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, সে সেই দৃষ্টিহীন সঙ্গীত শিল্পী নয়।

আব্বু! আমার শুরু থেকেই লোকটিকে সন্দেহ হচ্ছিল সে নিশ্চয়ই গোয়েন্দা হবে। নয়তো কোন দৃষ্টিহীন লোকের পক্ষে কি হরিণকে তীর বিদ্ধ করা সম্ভব?" বললো আকসী।

কাদের খান তরবারী বের করার নির্দেশের কণ্ঠে বললেন, 'বাঁচতে চাও তো তোমার আসল পরিচয় বলো।'

কাদের খানের নিরাপত্তারক্ষীরা সঙ্গীত শিল্পীকে চতুর্দিকে ঘেরাও করতে চাচ্ছিল ঠিক সেই সময় অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে শিল্পী তার ঘোড়ার জিন টেনে ঘোড়াকে সজোরে তাড়া করল। ঘোড়াটি ছিল প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর ঘোড়া। ইঙ্গিত পেতেই ঘোড়া উর্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করল। তাদের সন্দেহভাজন এক শিকারীকে পালাতে দেখে কাদের খান তার নিরাপত্তা রক্ষীদের বলল 'ওকে পাকড়াও করো।'

কাদের খানের নিরাপত্তা রক্ষীরা ঘোড়ার বাগ শামলিয়ে শিল্পীর পিছু ধাওয়া করতে করতে সে অনেক দূর চলে গেল। প্রাণপণ চেষ্টা করেও কাদের খানের নিরাপত্তারক্ষীরা আর শিল্পীর নাগাল পেল না।

শিল্পী আসলে ছিল একজন দক্ষ অশ্বারোহী। সে তার ঘোড়ার গতি শিথিল হতে দিলো না। ঘোড়া উর্ধশ্বাসে লাফিয়ে লাফিয়ে উড়ে চললো। অনেক দূর গিয়ে শিল্পী পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলো তাকে ধাওয়াকারীরা অনেক পেছনে। ধাওয়াকারীরা এক পর্যায়ে হতাশ হয়ে পিছু ধাওয়া ত্যাগ করে ফিরে যেতে শুরু করল।

* * *

দিনের শেষ প্রহরে আবুল মনসুর খবর পেলেন যে, কাদের খান সকালে তার দলবল সহ বিদায় নিয়ে ছিল সে একটি হরিণ শিকার করে আবার ফেরত এসেছেন। কাদের খানের ফেরত আসার খবর শুনে সে দৌড়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখা মাত্রই কাদের খান অভিযোগ করলেন, তোমার দরবারে যে অন্ধ সঙ্গীত শিল্পী ছিল সে আসলে অন্ধ ছিল না, সে পূর্ণ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী। আজ সকালেই সে এখান থেকে পালিয়ে গেছে।

'সে নিশ্চয়ই সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা হবে। সে হয়তো আমাদের গত রাতের কথাবার্তা শুনে থাকবে।

আমরা যে ঘরে কথা বলেছি এর ধারে কাছেও ছিল না। আমাদের কথা কিভাবে শুনবে। যাই হোক, কিভাবে এ খবর তার কাছে গেল সেটি জানার চেষ্টা করবো। সে গত রাতে কোথায় ছিল সেটিও খুঁজে বের করবো।

"বেশী খোঁজার দরকার নেই চাচা! আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার মেয়ে সিমনতাশই তাকে সব বলেছে। বললো কাদের খানের মেয়ে আকসী। কারণ, তার সাথে আমি কথা বলে দেখেছি সে সুলতান মাহমূদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। তাছাড়া আপনার বুড়ো গৃহ শিক্ষকের প্রতিও আমার সন্দেহ হয়। লোকটি নিশ্চয়ই নিমকহারাম।

ঘটনার আকস্মিকতায় আবুল মনসুর বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলেন। তিনি জানেন, তার কন্যা সিমনতাশ সুলতান মাহমূদকে খুবই ভালোবাসে, সে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে তার পিতা ও সহযোগীদের যুদ্ধ প্রস্তুতির ঘোর বিরোধী! অবশ্য গৃহ শিক্ষকের ব্যাপারে তার এমন কোন ধারনা ছিল না।

কিন্তু কাদের খান ও কাদের খানের মেয়ে আকসী আবুল মনসুরের উপর চাপ সৃষ্টি করল যে, সে যেন তাদের উপস্থিতিতেই তার মেয়ে ও গৃহ শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু আবুল মনসুর তার মেয়েকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। তিনি মেয়ের বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। তবুও তাদের উভয়কেই ডেকে পাঠানো হলো। সিমনতাশকে যখন জানানো হলো, তার প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী প্রকৃতপক্ষে অন্ধ ছিল না। একথা শুনে সিমনতাশের বিস্ময়ের অবধি রইল না। সে একথা কিছুতেই বিশ্বাস করছিল না।

আমি একথা বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না শিল্পী অন্ধ নয় চক্ষুষ্মান।

এ ক্ষেত্রে আর বেশী কিছু করার নেই ভেবে কাদের খান বৃদ্ধ গৃহ শিক্ষককে বললেন, শোন গুরুজী– "তুমি যার নিমক খাচ্ছো, আড়ালে আবডালে তার গাদ্দারী করছো। তুমি যদি বলো, ওই বেহালা বাদক এখান

থেকে কি খবর নিয়ে পালিয়েছে, তা হলে আমরা তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। নয়তো তোমাকে খুবই কঠিন মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে।"

কাদের খানের এই হুমকিমূলক বাক্য শুনে সিমনতাশ তার সামনে দাঁড়িয়ে বললো–

"খবরদার! আমার গুরুজী সম্পর্কে এখানে যদি আর একটি অবমাননাকর শব্দ উচ্চারিত হয় তবে আমি বলতে পারি না এখানে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। আপনারা জেনে রাখুন, আমরা কাশগড়ের কেনা গোলাম নই।"

"গুরুজী হাতে সিমনতাশকে সরিয়ে দিয়ে কাদের খানের উদ্দেশ্যে বললেন–

"সামান্য এক টুকরো এলাকার রাজত্ব তোমাকে খোদায় পরিণত করেনি কাদের খান! আমি সুলতান মাহমূদের সহযোগী নই, আমি সত্যের পূজারী। আমি সঙ্গীত শিল্পীকে শুরু থেকে অন্ধ ভেবেই আসছি, এখনো অন্ধই মনে করি। সেই সাথে তোমাদেরকেও আমি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মনে করি। ওই দৃষ্টিহীন লোকটি যদি গযনী সুলতানের গোয়েন্দা হয়ে থাকে তবে সে দৃষ্টি অন্ধ ছিল কিন্তু তার অন্তর অন্ধ ছিল না। তার হৃদয়-অন্তর ছিল আলোকিত। আমি ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না। কি খবর নিয়ে সে এখান থেকে চলে গেছে তাও আমি জানি না, তবে এটা বলতে পারি যদি সে কোন খবর নিয়েই গিয়ে থাকে তবে সে একজন পাক্কা মুসলমান।

কাদের খান আবুল মনসুরের কানের কাছে মুখ নিয়ে উচ্চ আওয়াজে বললো, 'এই বুড়োটাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিন। এই বুড়ো ভেতরে ভেতরে আমাদের শিকড় কাটছে।'

কাদের খানের কথা শুনে আবুল মনসুর গুরুজীর দিকে তাকালেন। পারিবারিক শিক্ষক গুরুজীর দিকে তাকালে তার মনের আয়নায় ভেসে উঠলো, এই বয়স্ক লোকটি আমার পিতার শিক্ষক ছিলেন। আমাকে পড়িয়েছেন তিনি। আর এখন তিনি আমার মেয়ে সিমনতাশের গৃহ শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন।

আবুল মনসুরের দিকে তাকিয়ে তার কানে কানে সিমনতাশ বললো–

আপনি কাদের খানের কথা মানবেন? না আল্লাহর হুকুম মানবেন? আপনি যদি দুনিয়াকে প্রাধান্য দেন, তাহলে আমি বলে দিতে পারি পরাজয় আপনার

বিধিলিপি হয়ে গেছে। আপনি যদি গণ বিদ্রোহের আশংকাকে আমল না দেন তাহলে এই বুড়োকে কয়েদখানায় বন্দি করতে পারেন। একথা বলে সিমনতাশ রাজ দরবার থেকে বেরিয়ে এলো।

এবার আবুল মনসুর স্বমূর্তি ধারণ করে কাদের খানের উদ্দেশে বললেন, কাদের খান! আমি আপনার সাথে সামরিক চুক্তি করেছি এবং যৌথ যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু আপনার সব হুকুম আমি মানতে বাধ্য নই। আমাকে এতোটা দুর্বল ভাবার কারণ নেই যে আপনার প্রতিটি নির্দেশ মানতে আমি বাধ্য।

"ওহ্! বোঝা যাচ্ছে, আপনি সুলতান মাহমূদকে ভয় করেন।" বললেন কাদের খান। আপনার কি বিশ্বাস হয় না, আমি আর তোগাখান যে কোন মূল্যে আপনার সঙ্গ দেবো?

"আমি সুলতান মাহমূদকে ভয় করছি না। আমার হৃদয়ে এখনো আল্লাহর ভয় কিছুটা রয়েছে। ক্ষমতার মোহ আমাকে এতোটা অন্ধ করেনি, যার হাতে আমার তিন পুরুষ শিক্ষা নিয়েছে, আমি নিজে যার কাছ থেকে জীবনের দীক্ষা পেয়েছি, এই বৃদ্ধ বয়সে শুধু সন্দেহের কারণে তাকে জেলখানায় বন্দী করবে। আপনি এখন চলে যেতে পারেন, যাওয়ার সময় আপনি বিশ্বাস রাখতে পারেন, যুদ্ধের প্রশ্নে আমি আপনাদের সাথেই রয়েছি এবং থাকবো।" এই বলে আবুল মনসুর গুরুজীকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলে গুরুজী দৃঢ়পদে গর্বিত ভঙ্গিতে দরবার কক্ষ ত্যাগ করলেন।

সুলতান মাহমূদকে তার গোয়েন্দা কি খবর দেবে? জিজ্ঞাসু কণ্ঠে আবুল মনসুর একথা বলে নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাবে বললেন, বড়জোর এ খবর দেবে, আমরা তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছি। এটা তার কাছে গোপন কোন খবর নয়, সে জানে আমরা তার শত্রু। তাই সে খোরাসানের নিরাপত্তা রক্ষার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছে। এতে আপনার ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই, আমাদের প্রস্তুতিতে বেশী সময় ব্যয় করা যাবে না।

আবুল মনসুরে একথা ও সার্বিক অবস্থা দেখে কাল বিলম্ব না করে কাদের খান তখনই সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

গুরুজী রাজদরবার থেকে বের হয়ে সোজা সিমনতাশের কাছে চলে এলেন। তিনি সিমনতাশকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি শিল্পী দৃষ্টিহীন নয়?

সিমনতাশ গুরুজীকে জানালো–

আমিতো তাকে দৃষ্টিহীনই মনে করতাম। সুলতান মাহমূদকে একটি পয়গাম পাঠানোর কথা সিমনতাশ স্বীকার করে বললো, শিল্পী আমাকে জানিয়ে ছিল, সে না গিয়ে অপর কোন ব্যক্তিকে পাঠাবে।"

"সামনে ঘোরতর বিপদের আশংকা দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহর মেহেরবানী ছাড়া এ মহাবিপদ থেকে আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না সিমনতাশ।' বললেন গুরুজী।

"এজন্যই তো আমি খবর পাঠিয়ে দিয়েছি, যাতে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ প্রতিরোধ করা যায়। বললো সিমনতাশ। প্রয়োজনে আমি নিজেও গযনী যেতে প্রস্তুত। তাতে যদি আমার কঠিন শাস্তিও ভোগ করতে হয় তাও আমি পরওয়া করব না।

এতোদিন অভিজ্ঞ গুরু সিমনতাশকে বাস্তবতার নিরিখে ইতিহাসের আয়নার যে বাস্তবতা উপলব্ধি করার দূরদর্শীতা শিক্ষা দিয়ে ছিলেন, এখন সেই শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে সিমনতাশের দৃঢ় প্রত্যয়ীও তার প্রতিটি প্রদক্ষেপে।

* * *

যে আলাভোলা সাদাসিধে যুবকটি আবুল মনসুরের দরবারে তবলা বেহালা নিয়ে মাথা নুইয়ে অন্ধ দৃষ্টিহীনের মতো আনা গোনা করতো আর বেহালা ও তবলার বাজনার সাথে মনোহরী কণ্ঠের গান গেয়ে সবার প্রিয় পাত্রে পরিণত হয়েছিল। বিশেষ করে শাসক আবুল মনসুরের কিশোরী কন্যা সিমনতাশের একান্ত বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল, সংকটময় মুহূর্তে সেই যুবকই মারাত্মক এক সংবাদ নিয়ে খোরাসানের পাহাড় জঙ্গল উচু-নীচু পাহাড়ী পথে বীরের মতো তেজোদীপ্ত ভঙ্গিতে অশ্বারোহী হয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এ সময় তার মাথা উচু বুকটা যেন ফুলে প্রশস্ত হয়ে গেছে। কারণ, সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর সুলতানের কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে সে তার ঘোড়াটিকে বিশ্রাম দিচ্ছিল এবং পানি ঘাস খাইয়ে নিচ্ছিল।

ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মনের আনন্দে এমন মনোহারী কণ্ঠে গান গাইতো তার ঘোড়াটিও গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে আরো দ্রুত দৌড়াতো। কারণ তার আরপাকড়াও হওয়ার আশংকা নেই। সে গযনীর সীমানায় প্রবেশ করেছে। অবশ্য গযনী তখনো বহু দূর।

গযনীর সীমানায় পৌছে শিল্পী প্রতিটি সেনা চৌকিতে ঘোড়া বদল করে নিচ্ছিল। কিন্তু নিজের বিশ্রামের প্রতি তার কোন খেয়াল ছিল না। কখন সে গাযনী পৌছাবে সেটিই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য।

দিন রাত এক নাগাড়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে সে গযনীর দিকে এগুচ্ছিল। তার খেয়াল ছিল না আজ কোন দিনের সূর্য ডুবে কোন দিনের সূর্য অস্ত গেল কিংবা সূর্য উঠে কোন দিনের সূচনা হলো। তার একমাত্র দৃষ্টি কখন গযনী পৌছাবেঁ। এভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে একদিন তার চোখে পড়ল গযনীর সবচেয়ে উঁচু মিনারটি।

গযনী পৌছে শিল্পী যখন সেনাপ্রধানের কাছে হাজির হল তখন অনেক রাত। প্রথমেই জানাল সে কি খবর নিয়ে খোরাসান থেকে বিরতিহীন সফর করেছে।

সুলতান মাহমূদ আগেই এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন বাইরে থেকে কোন গোয়েন্দা যদি মধ্য রাতেও আসে সাথে সাথে আমাকে খবর দিবে।

শিল্পীরূপী এই গোয়েন্দার চেহারা দেখে এবং তার মুখে দু'চারটি কথা শুনেই সেনাপতি সুলতান মাহমূদকে খবর দিলেন। শিল্পীরূপী গোয়েন্দা আবু জাফর সুলতানকে মূল খবর বলার আগেই জানাল, সে একজন অন্ধ হিসেবে আবুল মনসুর আরসালান খানের দরবারে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। এ কারণে শুধু রাজ দরবার নয় তার ঘরের ভেতরে পর্যন্ত অবাধ যাতায়াত ছিল।

জাফর সুলতান মাহমূদকে জানালো, কাশগরের শাসক কাদের খান এবং বলখের শাসক তোগা খান এবং আবুল মনসুর আরসালান খানের সৈন্যরা যৌথভাবে খোরাসানের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে খোরাসান কব্জায় নেয়ার চক্রান্ত করেছে। সেই সাথে যে কোন ভাবে সুলতানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে।

"আবুল মনসুর আরসালানখান গযনীর সাথে বংশগত শত্রুতা দূর করে ফেলতে চাচ্ছিল। কিন্তু কাদের খান ও তোগাখান তাকে এতোটাই আতংকিত করে ফেলেছে যে, সে ইচ্ছা অনিচ্ছায় ওদের চক্রান্তে শামিল হয়েছে। আবু জাফর বললো, আমার মনে হয়, আপনি যদি আবুল মনসুরকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেন, তাহলে হয়তো সে এই চক্রান্ত থেকে পিছিয়ে আসতে পারে।

"আবুল মনসুরের সেনাধ্যক্ষদের ব্যাপারে কিছু বলতে পারো?" আবু জাফরকে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

সেনারা তুর্কি মেয়েদের মোহে মোহগ্রস্ত। কাদের খান আবুল মনসুরের সেনাকর্মকর্তাদেরকে সুন্দরী মেয়েদের জালে আটকে রেখেছে। কাদেরখান বারবার আবুল মনসুরের কানে একথাই বলছে এখনই যদি সুলতান মাহমূদের উপর যৌথ আক্রমণ করে থামিয়ে দেয়া না হয় তাহলে আমাদের মতো ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে সে গিলে ফেলবে। কাদের খান আবুল মনসুরকে বুঝিয়েছে, সুলতান মাহমূদ হিন্দুস্তান থেকে বিজয়ী হয়ে এসেছে বটে কিন্তু তার সমর শক্তি মারাত্মক ভাবে দুর্বল হয়ে গেছে। এই সুযোগে অতি সংগোপনে খোরাসান আক্রমণ করে সেখানে মজবুত কেন্দ্র বানিয়ে নিয়ে ছোট ছোট আক্রমণ অব্যাহত রাখতে হবে।

"আবুল মনসুরের সেনা বাহিনীর মধ্যে কখন থেকে পরিবর্তন এসেছে? নাকি এলিখ খানের সময় সেনা বাহিনীর অবস্থা যেমন ছিল তেমনই আছে? আবু জাফরকে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

মাননীয় সুলতান! এলিখ খান আমাদের সেনাদের হাতে যে সব সৈন্যদের হত্যা করিয়েছিল, সেই সৈন্য ঘাটতি আবুল মনসুর পুরো করেছে। সম্মানীত সুলতান! এ প্রসঙ্গে আমি আবুল মনসুরের একমাত্র কন্যা সিমনতাশের উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি। আবুল মনসুরের একমাত্র কন্যা সিমনতাশ যেমন তার বয়োজ্যেষ্ঠ গৃহশিক্ষকের ভক্ত অনুরূপ তার পিতা মাতার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল। স্ত্রী কন্যা এক হয়ে আবুল মনসুরের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেছে যাতে আপনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি উদ্যোগী না হন।

সিমনতাশ খুব সুন্দরী ফুটফুটে চনমনে একটি মেয়ে। আমি তার নিজের কণ্ঠে একথা বলতে শুনেছি– আমি সুলতান মাহমূদের কাছে তাঁর বাদী হয়ে থাকাটাকেও জীবনের সৌভাগ্য বলে মনে করবো।

"মেয়েটির কি বিয়ে হয়নি?" জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

"জী না, এখনো বিয়ে হয়নি।" বললো আবু জাফর। সেই সাথে সিমনতাশ তার কাছে যে পয়গাম দিয়েছিলো তাও জানিয়ে দিলো। এ কথা শুনে সুলতান মাহমূদ গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

সুলতান মাহমূদ আবু জাফরকে বিপুল পুরস্কার ও সম্মান দিয়ে বিদায় করলেন। সাথে সাথে তিনি ডেকে পাঠালেন, তার যুবক ছেলে মাসউদ আলমকে। মাসউদকে ডেকে তিনি বললেন–

তোমাকে আবুল মনসুর আরসালান খানের কাছে যেতে হবে এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার জন্যে তাকে রাজী করাতে হবে। তাকে বলতে হবে, আমাদের সাথে যুদ্ধ করলে তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাকে একথাও বুঝাতে হবে, সে যদি গযনীর সাথে মৈত্রী চুক্তি করে তাহলে গযনী তাদেরকে সামরিক নিরাপত্তা দেবে। সুলতান মাহমূদ মাসউদ বিন মাহমূদকে আরো প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন তার সাথে আর কে কে যাচ্ছে।

পরদিনই মাসউদ রওয়ানা হয়ে গেল। দু'জন সামরিক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা তার সঙ্গী হিসেবে ছিল, আর নিরাপত্তার জন্য তার সঙ্গী হিসেবে রওয়ানা হলো বিশজন নির্বাচিত অশ্বারোহী। তাদের এই সফর ছিল স্বাভাবিকভাবে বারো তেরো দিনের। আবুল মনসুরের সম্মানে তুহফা উপঢৌকন বহন করার জন্যে কয়েকটি উট ও বোঝাই করে তাদের কাফেলার সাথে দেয়া হলো।

আবুল মনসুরের শাসনাধীন রাজ্যের সীমানায় পৌছে মাসউদ শহর থেকে কিছুটা দূরে তাবু ফেললেন এবং আবুল মনুসরের কাছে তাদের আগমনি সংবাদ দিয়ে একজন দূত পাঠালেন,

সুলতান মাহমূদের ছেলে মাসউদ বিন মাহমূদ আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চায় এবং কিছু জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চায়।'

পরদিন রাজকীয় বেশ ভূষা নিয়ে আবুল মনসুর মাসউদ বিন মাহমূদকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এলেন। আবুল মনসুর এলে উপহার-উপঢৌকনের হাতবদল হলো। এই সুযোগে মাসউদ তার বাবার পয়গাম আবুল মনসুরের হাতে তুলে দিলেন।

“আমি আপনার পিতার প্রশংসা না করে পারি না, তার গোয়েন্দা ব্যবস্থা খুবই সুন্দর। গযনীর অন্ধ লোকেরাও প্রয়োজনের সময় চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠে। ‘কোন বধির যদি আমাদের সাথে চুক্তি করে তবে অন্ধ যেমন চক্ষুষ্মান হয়ে যায় তেমনি বধির ও শুনতে শুরু করে। বধির হওয়ার কারণে আবুল মনসুরের কানে উচ্চ আওয়াজে একথা বলা হলো। মাসউদের এ কথাকে আবুল মনসুর ভালোভাবে নিতে পারেননি। তিনি ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্টি মাখা কণ্ঠে বললেন;

শাহজাদা! তোমার বাবা তোমাকে অশ্বারোহণ ও তরবারী চালানো শিখিয়েছে বটে কিন্তু সম্মানিত লোকদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় সেই শিক্ষা দেয়নি। আমি সেই অন্ধ ব্যক্তির কথা বলছিলাম, যে অন্ধ হিসেবে আমার রাজ দরবারে দীর্ঘ দিন কাটিয়েছে, অথচ সে তোমার বাবার একজন বিশ্বস্ত চক্ষুষ্মান গোয়েন্দা। সেই অন্ধরূপী শিল্পীই হয়তো তোমার বাবাকে খবর দিয়েছে, এখানে গযনী সালতানাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। যার ফলে তোমাকে মৈত্রী চুক্তির পায়গাম দিয়ে পাঠানো হয়েছে।”

“মুহতারাম! আমি পয়গাম নিয়ে এসেছি, কোন দরখাস্ত নিয়ে আসিনি.....।

আমি বুঝতে পারিনি আপনি যে দৃষ্টিহীনের কথা বলছেন সে আমাদের সংবাদদাতা ছিল। দেখুন, আমি আপনার সাথে সাদামাটা কথা বলতে এসেছি, আপনি যদি আপনার রাজ্যকে শান্তিপূর্ণ নিরাপদ রাখতে চান তাহলে কাদের খান ও তোগা খানের মৈত্রী ত্যাগ করুন। আপনাদের তিনজনের সম্মিলিত বাহিনীও আমাদের ছয়শত হাতির মোকাবেলা করতে পারবে না। আপনার বড় ভাই এলিক খানের পরিণতির কথা নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি।

“আমাদের কি তাদের ভয় দেখাতে এসেছেন? উষ্মামাখা কণ্ঠে বললো আরসালান খানের সঙ্গে আসা এক সেনাধ্যক্ষ। আপনি কি আমাদের এতোটাই দুর্বল ভাবছেন যে, আমরা আতংকিত হয়ে আপনাদের বশ্যতা স্বীকার করে নেবো?”

আবুল মনসুর যেহেতু বধির ছিলেন এজন্য তার সেনাধ্যক্ষ আর মাসউদের মধ্যে কি কথাবার্তা হচ্ছিল, তা তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন না। তিনি উভয়কেই বড় বড় চোখ করে দেখছিল আর তার সঙ্গীদের অনুরোধ করছিলেন এরা কি কথা বলছে তা তার কানে বলার জন্য।এক পর্যায়ে উচ্চ আওয়াজে আবুল

মনসুর তার সেনাপতিকে বললেন, তোমরা কি কথাবার্তা বলছো আমাকেও শোনাও।

"গযনীর প্রতিনিধি বলছে, আপনি যদি কাশগড় ও বলখের সাথে বন্ধুত্ব ত্যাগ না করেন, তাহলে তারা আমাদের উপর আক্রমণ করে সব কিছু ধ্বংস করে দেবে।

একথা শুনে আবুল মনসুর ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে মাসউদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, শাহজাদা শোন! তুমি যদি আমাদের হুমকি ধমকি দিয়ে তোমাদের সাথে মৈত্রী করতে এসে থাকো, তাহলে চলে যাও। গিয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে এসো।

"একথা শুনে মাসউদ আবুল মনসুরের কানে মুখ লাগিয়ে উচ্চ আওয়াজে বললো, যে রাজ্যের শাসক বধির আর তার সেনাপতি মিথ্যাবাদী হয় আর সেই রাজ্যের প্রজাদের দুর্ভাগ্যের সীমা থাকে না। সম্মানিত আমীর! আপনার সেনাপতি আপনাকে মিথ্যা কথা বলছে। আমি একথা বলিনি। সেনাপতিরা যদি এভাবে আপনার শাসন কাজে হস্তক্ষেপ করতে থাকে তাহলে তো আপনার রাজ্যের অবস্থা খারাপ হতে বাধ্য। এভাবে আপনার রাজত্ব বেশিদিন টিকে থাকবে না। মাসউদ উচ্চ আওয়াজে কিছুক্ষণ কথা বলার পর আবুল মনসুরকে অনেকটা আশ্বস্ত করতে সক্ষম হলো যে, সে কোন শক্তি বা ক্ষমতা দেখাতে আসেনি, সত্যিকার অর্থেই তার সাথে মৈত্রী ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যেই এসেছে।

একপর্যায়ে আবুল মনসুর মাসউদকে বললেন, ঠিক আছে, যেহেতু তুমি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম নিয়ে এসেছো, এনিয়ে আমরা একটু চিন্তা করি, আর তুমি ক'দিন মেহমান হিসেবে আমাদের এখানে থাকো। আমরা তোমাকে রাজকীয় মেহমানদারীর ব্যবস্থা করবো। তুমি ইচ্ছা করলে শিকারও করতে পারো।

* * *

আবুল মনসুরের সাথে মাসউদ বিন মাহমূদের কথাবার্তা শেষ হলো। আবুল মনসুর তার প্রাসাদে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই শাহী লোকজন রান্নাবান্না ও থাকা খাওয়ার রাজকীয় সাজসরঞ্জাম নিয়ে মাসউদের তাবুতে উপস্থিত হলো। রাজকর্মচারীরা এসে নতুন করে মেহমানের জন্যে বিশাল এক শাহী তাঁবু তৈরী করল এবং রাজকীয় বাবুর্চী উন্নত মানের খাবার দাবারের ব্যবস্থা করল।

একদিন পায়চারী করতে করতে মাসউদ তাঁবু থেকে কিছুটা দূরে চলে এলে একজন রাজ কর্মচারী পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে মাসউদকে সালাম দিয়ে বিনয়ের সাথে বললো,

"সম্মানিত শাহজাদা! আপনাকে আমি একটি গোপন কথা বলতে এসেছি। আগামী কাল আপনি শাহী মহলের সংরক্ষিত বনে শিকারের জন্যে যাবেন, সেখানে শাহজাদী আবুল মনসুর আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্যে অপেক্ষা করবেন।"

আমাকে কি বনের মধ্যে হত্যা করা হবে, না তাঁবুতে হত্যা করা হবে? একথাটা পরিষ্কার বলে দিলেই হয়।

মুহতারাম শাহজাদা! এমনটি কেন ভাবছেন? আপনার দেহরক্ষীরা তো আপনার সাথেই থাকবে। এখানে আপনাকে হত্যা করার দুঃসাহস কারো নেই।'

দৃষ্টিহীনতার কৌশলী অভিনেতা গোয়েন্দা আবু জাফর সুলতানকে বলেছিলো। আবুল মনসুরের একমাত্র কন্যা সিমনতাশ তার বাবার কার্যক্রমের বিরোধী। সুলতান মাহমূদ মাসউদকে বিদায় করার আগে একথাটিও বলে দিতে ভুল করেননি। সুলতান বলেছিলেন, আবুল মনসুরের যুবতী কন্যা সিমনতাশ গযনী সালতানাতের অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী এক নারী। সে তার পিতার কর্মকাণ্ডের ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু একজন শাহজাদী পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে কিছুই করতে পারে না। শাসন কার্যে সেনাবাহিনীর কর্তা ব্যক্তিদের উপর শাহজাদীর কোন প্রভাব খাটে না। সুলতানের এই ধারণার কারণে মাসউদ সিমনতাশকে তেমন গুরুত্ব দেননি। আবুল মনসুরের এক কর্মচারী যখন মাসউদকে জানাল, তাদের সংরক্ষিত বনে শাহজাদী তার সাথে সাক্ষাত করতে আসবে, এটিকে তিনি কোন চক্রান্ত কিংবা সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখেননি।

পরদিন সকালের 'নাশ্তার পর বেলা যখন অনেকটা উপরে উঠে গেলো তখন শাহ্জাদা মাসউদ পাঁচ ছয়জন নিরাপত্তারক্ষী সাথে নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে বের হলেন। অন্যান্য নিরাপত্তাকর্মী ও উপদেষ্টাদের তিনি সাথে নেননি। তার নিরাপত্তা রক্ষীদেরকে তিনি তার চতুর্দিকে এভাবে ছড়িয়ে দিলেন, যাতে কেউ তার উপর মারণাঘাত না করতে পারে। মাসউদ বিন মাহ্মূদ ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে ধনুকে তীর ভরে চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বনের ভেতরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। মাসউদ যতই বনের ভেতরে প্রবেশ করলেন, বন ততই ঘন এবং সবুজ লতাগুল্ম ভরা উচু-নীচু টিলা ঝোপঝাড় দেখতে পেলেন। তিনি এভাবে অগ্রসর হতে লাগলেন যে, তার চতুর্পাশে তার দেহ রক্ষীদের ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন।

চলতে চলতে তিনি এমন একটি জায়গায় এলেন, জায়গাটি একটি সমতল ভূমি, অনতি দূরে উচু একটি টিলা। সমতল জায়গাটিতে মনোমুগ্ধকর লতানো ফুলগাছ বড় বড় গাছগুলোকে জড়িয়ে রেখেছে। সেখানে একটি খোলা জায়গায় মাসউদ একটি মেয়েকে দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। মেয়েটির পাশে একটি ঘোড়া দাঁড়ানো। একটি একহারা ছোট গাছে ঘোড়াটিকে বেধে রাখা হয়েছে। মেয়েটির কাঁধে ধনুক ঝোলানো। কোমরের বন্ধনীতে তরবারী আটকানো। এমন মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে সুন্দরী মেয়েটিকে অসম্ভব সুন্দর লাগছে। প্রকৃতির রূপ আর তরুণীর রূপলাবণ্যে যেন একাকার হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তরুণীটি যেন এই বনের সৌন্দর্যেরই অংশ! তরুণীর মুখটি অনিন্দ্য সুন্দর বটে কিন্তু তার চাহনী ও দাঁড়ানোর ভঙ্গি অত্যন্ত গম্ভীর। স্থির দাঁড়িয়ে সে আগন্তুক যুবকের দিকে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মাসউদ তরুণীকে দেখে পনেরো বিশ হাত দূরে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং চতুর্দিকটি ভালোভাবে দেখে নেয়ার চেষ্টা করলেন।

"আপনি যদি মাসউদ বিন মাহমূদ হয়ে থাকেন তাহলে নিঃসংকোচে এগিয়ে আসুন। এখানে আপনার কোন বিপদ হবে না, কোন ঝুকি বা আশংকা নেই। আমি সিমনতাশ। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

মাসউদ ঘোড়ার বাগ ধরে দৃঢ় পায়ে সিমনতাশের দিকে এগিয়ে গেলেন। সিমনতাশ কাল বিলম্ব না করে তাকে নিয়ে ঘাসের উপর মুখোমুখি হয়ে বসে পড়ল।

“কোন তরুণীর আহ্বানে এখানে আসাটা আমার জন্যে শোভনীয় ছিল না। কিন্তু আমি জানি আপনি গযনী সালতানাতের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী। “আপনাকে ভুল ধারনা দেয়া হয়েছে। আসলে আমি গযনী সালতানাতকে ভক্তি করি না, আমি উভয় দুনিয়ার যিনি সুলতান তার পূজা করি। আমি সেই রসূল স.-এর অনুসারী গযনীর সুলতান যার অনুসারী। আমি এই নীতিতে বিশ্বাস করি যে, একই কালেমায় বিশ্বাসী মুসলমান আরেক মুসলমানকে হত্যা করতে পারে না।”

“এক ভাই যদি শুধু ক্ষমতা ও রাজত্বের মোহে আরেক ভাইকে খুন করতে চায়, এ ব্যাপারে তোমার কি বক্তব্য?”

“এমন খুনীর বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। এমন খুনীর বিরুদ্ধে জিহাদ করা সক্ষমের জন্যে ফরয।” বললো সিমনতাশ।

“তাই যদি মনে কর, তাহলে তোমার বাবাও তো এদের মধ্যেই পড়েন। আমি এজন্যেই তার কাছে মৈত্রী চুক্তির পয়গাম নিয়ে এসেছি। আমি এসেছি এ জন্য যাতে তার বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া আমাদের জন্যে ফরয কর্তব্যে পরিণত না হয়। তুমি যা বিশ্বাস করো এবং যা বললে এই নীতি ও আদর্শের উপর তোমার বাবাকে কি আনতে পারো না?”

“না, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। বললো সিমনতাশ। এজন্যই আমি আপনাকে এখানে আসতে বলেছি। আমার বাবাও সেইসব ঈমান বিক্রেতাদের একজন যাদের বিরুদ্ধে গযনী সুলতানের জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া ফরয হয়ে গেছে। আপনি হয়তো আমার কথায় আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন এই ভেবে যে, কোন মেয়ে কি বাবার বিরুদ্ধে এমন কঠোর মনোভাব পোষণ করতে পারে? কিন্তু যে আবেগের বশীভূত হয়ে আমি আমার জন্মদাতার বিরুদ্ধাচরণ করছি তা যদি আপনি এতটুকু গভীরভাবে চিন্তা করেন তাহলে ঠিকই রহস্যটা বুঝতে পারবেন। আমি আপনার কাছে এই নিবেদন করতে এসেছি, কাদের খান ও তোগা খানের সৈন্যরা আমাদের সৈন্যদের সাথে একত্রিত হয়ে একটি সামরিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার আগেই আপনারা আমাদের রাজধানী অবরোধ করে কব্জা করে নিন। তাতে অন্তত অহেতুক অনেকগুলো মানুষের মরণ ঠেকানো যাবে।.........

আমাদের সেনাবাহিনী আপনাদের সেনাবাহিনীর তুলনায় খুবই নগণ্য ও দুর্বল। তা না করে যদি আপনাদেরকে তিনটি বাহিনীর মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয় তাহলে এর আগে গৃহযুদ্ধে যেমন উভয় পক্ষের বিপুল জনবল ক্ষয় হয়েছে এবং বহু লোকের প্রাণহানি ঘটেছে এক্ষেত্রেও তাই হবে।"

"শোন সিমন! হিন্দুস্তানে সুলতান যেভাবে আক্রমনাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, এভাবে কোন মুসলিম রাজ্যের উপর আক্রমণ করবেন না। আমাদের উদ্দেশ্য রাজ্য দখল নয়, কাফেরদের মোকাবেলায় একটি শক্তিশালী ইসলামী সামরিক শক্তি গড়ে তোলা। তোমাদরে রাজ্য দখলের ইচ্ছা থাকলে সুলতান আমাকে মৈত্রীর পয়গাম দিয়ে পাঠাতেন না।

"আমার আব্বা কখনো মৈত্রী চুক্তি করবেন না। তিনি যদিও আপনাকে মৈত্রীর কথা বলে আশ্বস্ত করেছেন, কিন্তু কাদের খানের প্ররোচনা ও নানাবিধ সুবিধা ভোগী সেনা কর্মকর্তারা আব্বাকে মৈত্রীচুক্তি করতে দেবে না। আব্বা এখন এইসব বেইমান সেনাদের মানসিকভাবে হাতে বন্দী। কারণ, আব্বা কানে শুনেন না। তাকে যা শোনানো হয় তাই তিনি শুনেন। এর বাইরে নিজ থেকে তিনি কিছুই শুনতে পান না। অনেক ব্যাপারেই ভালো মন্দ বিচার করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

হঠাৎ সিমনতাশ নীরব হয়ে গেল। কোন পাকা শিকারী যেমন গভীর বনের ভেতরে শিকারের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকায় সিমনতাশও একদিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাসউদের একটি হাত ধরে টেনে একটি গাছের আড়ালে ঠেলে দিল। লতাগুল্ম গাছটিকে পেচিয়ে দেয়ালের মতো তৈরী করেছে।

সিমনতাশ মাসউদকে বলল, দয়া করে আপনি এখান থেকে এক চুলও নড়বেন না। চতুর্দিকে কড়া নজর রাখবেন। একথা বলে লতাগুল্মোর মধ্যে সিমন আড়াল হয়ে গেল। মাসউদ আকস্মিক এই ঘটনায় অবাক বিস্ময়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে নিজের কানেই ধনুক থেকে তীর ছোড়ার শব্দ পেল। সে কান খাড়া করে তার উৎস বুঝতে চেষ্টা করল। ইত্যবসরে বিকট আর্তচিৎকার তার কানে ভেসে এলো। এমন সময় মাসউদ মুখে আঙ্গুল দিয়ে সিটি বাজাল। সিটির আওয়াজ শুনে তার তিনচার নিরাপত্তা রক্ষী তরবারী কোষমুক্ত করে তার কাছে চলে এলো। মাসউদ তার সামনের সবুজ সমতল

ভূমিতে এক ব্যক্তিকে তীর বিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পেল। ঠিক এ সময় সিমনতাশ মাসঊদের সামনে এসে বলল, 'আমার সাথে আসুন।'

মাসউদ তার নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে তীর বিদ্ধ লোকটির দিকে অগ্রসর হলো। ততোক্ষণে তীর বিদ্ধ লোকটি মাটিতে বসে পড়েছে এবং ব্যথা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

সিমনতাশ তার কোমর থেকে একটি খঞ্জর বের করে আহত লোকটির ঘাড়ে তাক করে বলল,

"যদি সত্য বলো, তাহলে তোমাকে ঘোড়ায় উঠিয়ে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তীর বের করে চিকিৎসা করাবো। আর যদি মিথ্যা বলো তাহলে এই গাছের সাথে তোমাকে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। চিন্তা করো তুমি কোনটি করবে? দৃঢ় কণ্ঠে আহত লোকটির উদ্দেশ্যে বললো সিমনতাশ।

আহত লোকটি করুণ চাহনী দিয়ে সিমনতাশ ও মাসঊদকে দেখে বললো–

"আমি সুলতান মাহমূদের ছেলেকে হত্যা করতে এসেছিলাম।"

"কে তোমাকে বলেলে সুলতান মাহমূদের ছেলেকে এই জঙ্গলের ভেতরে পাওয়া যাবে?" প্রশ্ন করল সিমনতাশ।

"আমাকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার সাথে আরো এক লোক ছিল সে পালিয়ে গেছে।" বললো তীরবিদ্ধ লোকটি।

কার পরিকল্পনা এটি?

এটি কাশগড়ের শাসক কাদের খানের পরিকল্পনা। এ ব্যাপারে তিনি সম্মানিত আমীর আবুল মনসুরের সাথে কথাবার্তা বলে নিয়েছিলেন।

"আব্বা কি বলেছিলেন?"

"তিনি বলেছিলেন, আমি সুলতান মাহমূদের ছেলেকে ভেবেচিন্তে জবাব দেয়ার জন্যে কয়েক দিন এখানে থাকতে বলেছি। সে হয়তো কোন না কোন দিন শিকারের জন্যে বের হবে, তখন তোমরা তোমাদের কাজ সারতে পারবে। তার সঙ্গে এমন দু'জন কর্মচারী পাঠাবে, যারা তার শিকারে যাওয়ার আগেই তোমাদের খবর দিতে পারে।"

“ওকে ঘোড়ার পিঠে ফেলে নিয়ে চলো” মাসউদের এক নিরাপত্তা রক্ষীকে নির্দেশের সুরে বললো সিমনতাশ। সে মাসউদকে বললো, এই বিষয়টিই আমি আপনাকে বুঝানোর জন্যই এখানে আসতে বলেছিলাম। আমি বলতে চাই, আপনি আর এক মুহূর্তও এখানে অবস্থান করবেন না। আপনার নিরাপত্তা কর্মীদেরকে সতর্ক রাখবেন। ঘটনাক্রমে আমি টিলার নীচের সমতল ভূমিতে এই লোকটিকে উঁকি ঝুকি মারতে দেখে ফেলেছিলাম। তার ধনুকটিও আমার দৃষ্টিতে পড়ে গিয়েছিল। এই জায়গাটি শাহী খান্দানের শিকারের জন্যে নির্দিষ্ট। এখানে শাহী খান্দান ছাড়া আর কেউ আসতে পারে না। আমি একটি ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে থেকে ওর উপর তীর চালিয়ে ছিলাম বলে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। নয়তো অস্বাভাবিক কিছু ঘটে যেতে পারতো, যা শুধু আমার নয় গোটা রাজ্যের জন্যে স্মরণীয় কলংক হতো।”

এখন আমাকে তুমি কি করতে বলো?” জানতে চাইল মাসউদ বিন মাহমূদ।

আপনি আমার আব্বার আশ্বাসের অপেক্ষা না করে আজই গযনী ফিরে চলুন। আমার মনে হচ্ছে আমাদের মোলাকাত হবে রণাঙ্গনে।”

তুমি কি রণাঙ্গনে আমার সাথে সাক্ষাত করবে?”

হয়তো বা তাই।” কথা শেষ করতে না করতেই সিমনতাশের দু'চোখ গড়িয়ে পড়লো অশ্রুধারা।

“আরে তুমি কাঁদছো সিমন? তোমার মতো সাহসী মেয়ের কান্না শোভা পায় না সিমন।”

'দুঃখিত? আমি একটা পাগল। চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে ধরা গলায় বললো সিমন। কিছুক্ষণ নীবর থেকে মাসউদের দু'হাত ধরে ঝাকুনী দিয়ে সিমনতাশ বললো, বলুন? আমি কি পাগল নই? আমার গৃহশিক্ষকও হয়তো পাগল? ধোকা ও প্রতারণার রাজ্যে সত্যের পথিকরা পাগলই তো হবো। এমন এক যুবরাজের সাথে আমার বিয়ের কথা পাকাপাকি করে রাখা হয়েছে, যার একহাতে শরাবের বোতল আর এক হাত সুন্দরী তরুণীদের পেলব দেহ বল্লরীর উত্তাপের স্বাদ নিতে ব্যস্ত থাকে। সে এমন এক ব্যক্তি, জাতি ও ধর্মীয় দায়িত্ববোধ সম্পর্কে যার কোনই চিন্তা-ভাবনা নেই। একজন পুরুষ ও শাহজাদা

হিসেবে তার যে একটা কর্তব্য আছে তার দিল দেমাগে এর কোন ছাপ নেই।.....

সিমনতাশের একহাতে ছিল ধনুক আর অপর হাতে ছিল খঞ্জর। সে উভয়টি মাসউদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আমার বিয়ে এগুলোর সাথে হয়ে গেছে মাসউদ। এদুটো জিনিসই আমার ভালোবাসার নমুনা। নারী শুধু পুরুষের বিনোদন আর প্রদর্শনীর জিনিস নয়। এই ধনুক আর খঞ্জর একজন নারীরও অলংকার হতে পারে।"

"আরে! তুমি এমন সব কথা বলছো কেন সিমন? সিমনতাশের হতাশা ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সাহস ও আশার সঞ্চার করতে মাসউদ বললো,

যে নারীর হাতে ধনুক আর কাঁধে তীরদান থাকে তার চোখে হতাশার অশ্রু মানায় না সিমন! সেতো তার জাতি ও কওমের জন্যে অনুকরণীয়ও সৌভাগ্যের প্রতীক।...সিমন। এখানে এভাবে কি আমাদের দাড়িয়ে থাকা ঠিক হবে?

ওহ! আমি ভুলে গিয়েছিলাম কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমি। আমি আবারো আপনাকে বলছি, আপনি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যান। দ্রুত আপনার গযনী পৌছা দরকার।

আপনাকে হয়তো সেই অন্ধ বেহালাবাদক গোয়েন্দা অনেক কিছুই বলেছে! সে আমার পয়গামও হয়তো গযনী সুলতানের কাছে পৌছিয়েছে।"

"সে কতটুকু কি করেছে, তা তুমি নিজেই তাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারো।"

মাসউদ একজন নিরাপত্তাকর্মীকে বললো, আবুজাফরকে ডেকে আনো।" ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই এক অশ্বারোহী যুবক ঘোড়া হাঁকিয়ে তাদের কাছে চলে এলো। সে ঘোড়া থেকে নেমে যখন মাসউদের কাছে এলো, তার আসার চালে মনে হচ্ছিল গোটা এলাকাটা দুলছে।

"ওকে কি চিনো জাফর? সিমনতাশের প্রতি ইঙ্গিত করে জাফরকে জিজ্ঞেস করলো মাসউদ।

"আবু জাফর সিমনতাশের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো, সিমনতাশও তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে নি:শব্দে জানিয়ে দিলো তাদের মধ্যকার জানা শোনার বিষয়টি।

"তোমাকে চিনতে কিন্তু আমার বেশ কষ্ট হয়েছে।' জাফরের দিকে ইঙ্গিত করে বললো সিমনতাশ। তুমি কি আমার পয়গাম সুলতানের কাছে পৌঁছিয়েছো?"

"অক্ষরে অক্ষরে হুবহু তোমার প্রতিটি কথা আমি সুলতানকে বলেছি।' জবাব দিলো আবু জাফর।

"জাফর একজন বড় মাপের গোয়েন্দা। সে নিরাপত্তা বাহিনীর লোক নয়। এই সফরে তাকে আমার উপদেষ্টা হিসেবে পাঠানো হয়েছে।......সিমন, ওই আহত লোকটিকে কোথায় পাঠিয়েছো?"

"ওর ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না, আমার বাবার কাছে নিয়ে যাবো, না চিকিৎসকের কাছে পাঠাবো। ও হ্যাঁ, আমার এখন যাওয়া দরকার। ওরা হয়তো অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। জানি না জীবনে আর কোন দিন তোমার সাথে দেখা হবে কিনা। হলেও কোথায় হবে। মৈত্রী প্রস্তাবের জবাব তুমি ইতোমধ্যে পেয়ে গেছো, তাই আজই তোমার গযনীর পথে রওয়ানা হওয়া উচিত।

"সিমনতাশ মাসউদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এক লাফে অশ্বারোহণ করে এমনভাবে ঘোড়াকে তাড়া করলো যে, ঘোড়াটি হরিণের মতো উর্ধশ্বাসে লাফিয়ে লাফিয়ে উড়ে চললো। মাসউদ এক পলকে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। মুহূর্তের মধ্যেই সিমনতাশ বনের মধ্যে হারিয়ে গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত তার অশ্বখুড়ের আওয়াজ কানে ভেসে এলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো মাসউদ সে দিকে তাকিয়ে রইল।

"মুহতারাম শাহজাদা! আপনি কি অনুমান করতে পারছেন এই মেয়েটি মুসলিম ঐক্যের প্রশ্নে কি পরিমাণ আবেগপ্রবণ।" বললো গোয়েন্দা ও মাসউদের উপদেষ্টা আবু জাফর। আবু জাফর আরো বললো, আমি সিমনতাশের সংশ্রবে অনেক দিন সময় থেকেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দিয়েছি। আমি তাকে যতটা জানি আর কেউ তাকে এতটা জানে না। আমি নিশ্চিত বলে দিতে পারি, গযনী সালতানাতের কল্যাণে এই মেয়ে বিস্ময়কর কিছু ঘটিয়ে দেবে।'

“অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাসঊদের মানসিক অবস্থা স ম্পূর্ণ বদলে গেল। তিনি তার নিরপত্তাকর্মীদের বললেন, চলো।

সাথীদের নিয়ে পাহাড়ী উপত্যকা থেকে সমতল ভূমিতে নেমে এলেন মাসউদ। তার সকল নিরাপত্তারক্ষী তার কাছে ফিরে আসার পর তিনি শহরের দিকে রওয়ানা হলেন। মাসউদ তীব্র বেগে শহরে দিকে ঘোড়া হাঁকালেন।

তীরবিদ্ধ লোকটিকে ঘোড়ার পিঠে রেখে এক সৈনিক শহরের প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল, এসময় সিমনতাশের ঘোড়া আহত লোকটিকে বহনকারী ঘোড়াকে অতিক্রম করে সামনে চলে গেল। আহত লোকটির ক্ষতস্থান থেকে তখনো রক্ত ঝরছে।

“আবুল মনসুর আরসালান খান তার রাজ দরবারে উপবিষ্ট। মাসউদ বিন মাহমূদ কোন আগমন সংবাদ না দিয়েই আবুল মনসুরের রাজ দরবারে হাজির হলেন। তার পেছনে তার এক নিরাপত্তারক্ষী আহত লোকটিকে কাধে করে বয়ে নিয়ে এল এবং মাসঊদের ইঙ্গিতে আহত লোকটিকে রাজ দরবারের মেঝেতে শুইয়ে দিলো। আহতের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে রাজদরবার রঞ্জিত হয়ে উঠল।

“ আরে! একি মাসউদ বিন মাহমূদ?

জিজ্ঞেস করলেন আবুল মনসুর।

“এটাই হলো আমার মৈত্রীর পয়গামে আপনার দেয়া জবাব? আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি, আপনার জবাবের জন্য আমাকে বেশী দিন আপেক্ষা করতে হয়নি।

“আবুল মনসুর রাগে ক্ষোভে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, এ সবের রহস্য কি? সুলতান মাহমূদ কি তার ছেলেকে রাজ দরবারের আদব শেখায়নি?”

“না, আমার বাবা আমাকে রাজ দরবারের আদব শেখানোর অবকাশই পাননি।” মাসঊদ তার পাশে দাড়ানো আবুল মনসুরের সেনাপাতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার মুনীবকে জানিয়ে দাও! আমার বাবাকে কাফের বেঈমান গাদ্দার ও স্বজাতির ঈমান বিক্রেতারা ছেলেকে আদব-কায়দা শেখানের সুযোগ

দেয়নি। আমরাতো যুদ্ধে যুদ্ধে লড়াই করে করে তীর-তরবারীর সংঘাতের মধ্যেই বড় হয়েছি।”

আবুল মনসুর তার সেনাপতির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। সেনাপতি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে উচ্চ আওয়াজে মাসউদ এর কথাই পুনরাবৃত্তি করল। আবুল মনসুর ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে মাসউদের প্রতি তাকিয়ে বললেন; “হিন্দুস্তানের মণিমুক্তা আর সোনা-দানা এই যুবকের দেমাগ খারাপ করে দিয়েছে। সে আমাদেরকে তার বাবার জঙ্গী হাতির ভয় দেখাতে এসেছে।

“মাসউদ আবুল মনসুরের সেনাপতির উদ্দেশ্যে বললেন, আপনার মুনীবকে বলুন, জঙ্গি হাতির কোনই শক্তি নেই। ঈমানের শক্তিই প্রধান শক্তি। আমরা যদি আমাদের সবগুলো জঙ্গি হাতি আপনাদেরকে দিয়েও দেই তবুও আমাদেরকে আপনারা পরাজিত করতে পারবেন না।

অতিথিকে যারা ধোকা দিয়ে হত্যা করতে চায়, তাদের সঙ্গে রণাঙ্গনেও মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

আবুল মনসুরের সেনাপতি যখন মাসউদের একথা তার কানের কাছে উচ্চ আওয়াজে শোনাল, তখন বিড়বিড় করতে করতে আবুল মনসুর তার আসনে বসে পড়লেন।

মাসউদ কাল বিলম্ব না করে আর কোন কথা না বলে আবুল মনসুরের দরবার থেকে বেরিয়ে গযনীর পথ ধরলেন।

* * *

সঙ্গীদের নিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত মাসউদ গযনী ফিরে এলেন। সফরের ইতিবৃত্ত এবং মাসউদকে আবুল মনসুরের চক্রান্তমূলক হত্যা চেষ্টার কথা শুনে সুলতান মাহমূদ মাসউদকে বললেন,

“ক্ষমতার নেশা মানুষের মস্তিষ্ক ও বিবেকের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছে। আমি মৈত্রীর পয়গাম পাঠিয়ে আমার নৈতিক কর্তব্য পালন করেছি, এখন আর আমার মনের মধ্যে কোন নৈতিক চাপ থাকবে না।

অবশ্য একটা মানসিক উদ্বেগ আমাকে পেয়েই বসছে, সেটা রীতিমতো আমাকে বিচলিত করছে। আমাদের আক্রমণের ভয়ে কন্নৌজ রাজা পালিয়ে গিয়েছিল। সে তার সহায় সম্পদ আগেই লুকিয়ে ফেলেছিল। তখন আমার সম্পদের প্রয়োজন ছিল না। কন্নৌজের নিয়ন্ত্রণ কব্জা করাই ছিল আমার কাছে মুখ্য। সেটি আমি সহজেই করতে পেয়েছিলাম। কিন্তু হিন্দুস্তান থেকে খবর আসছে রাজ্যপাল কন্নৌজে কর্মরত আমাদের কর্মকর্তাদের কাছে তার জীবন ভিক্ষা দেয়ার আবেদন জানিয়েছে এবং আজীবন গযনীর বশ্যতা স্বীকার করে অনুগত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু লাহোরের মহারাজা ভীমপাল অন্যান্য রাজা মহারাজাদের নিয়ে রাজপালকে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত মোকাবেলার আয়োজন করছে। এ অবস্থায় আমার উচিত দ্রুত সেখানে যাওয়া; কিন্তু কাশগড়ও বুখারার কেউটে সাপগুলোর মাথা থেতলে দেয়াটাও জরুরী হয়ে পড়েছে।

তুমি বলছো আবুল মনসুরের কন্যা তোমাকে অনুরোধ করেছে আমরা যাতে দ্রুত তার বাবার রাজ্য দখল করে নেই। আমার স্বজাতির এই পুণ্যবতী কন্যার আকাঙ্ক্ষা ইনশাআল্লাহ আমি পূরণ করবো। দুই কারণে আমাদেরকে এখন বুখারা ও কাশগড়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হচ্ছে। প্রথমত এরা যৌথভাবে আমাদের ক্ষতি করার অপেচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এদের আড়ালে খ্রিস্টশক্তি এখানে শক্তি সঞ্চয় করছে। কাশগড় ও বুখারার শাসকরা এখন খ্রিস্টান কুচক্রীদের পুতুলে পরিণত হয়েছে। মূলতঃ আমার আশংকা সেটাই। কাশগড় ও বুখারার শাসকদের আমি চিনি, এরা আমাদের জন্য কোন আতংকের বিষয় ছিল না। কিন্তু আমরা এখন এদের দমন না করলে এদের কাধে সওয়ার হয়ে খ্রিস্টশক্তি এই আঞ্চলকে তাদের কলোনীতে পরিণত করবে। তারা এখানে সামরিক আখড়া গড়ে তুলবে। আমাদের মূল যুদ্ধ তো ইসলামের বৈরী শক্তির সাথে। আমার ধারনা আবুল মনসুর ও কাদের খান খোরাসানের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করতে পারে বটে; কিন্তু আক্রমণের দুঃসাহস করবে না। তবে ওরা হামলা করুক আর নাই করুক আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার।”

সুলতান মাহমূদের এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। দুই মাস পর তার কাছে খবর এলো, কাশগড় বুখারা ও বেলাসাগুণের সৈন্যরা একত্রিত হয়ে বলখের

দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বেলাসাগুন ছিল আবুল মনসুরের রাজধানী। সুলতান মাহমূদ আগে এই তিন রাজশক্তির মৈত্রীকে বেশী গুরুত্ব দেননি। কিন্তু যখন এদের অগ্রাভিযানের খবর এলো তখন তার মধ্যে পেরেশানী দেখা দিল। কাশগড়, বুখারা ও বেলাসাগুন ছিল খোরাসান থেকে অনেক দূরে। বুখারা থেকে খোরাসানের পথ খুলল ভালো ছিল না। তাছাড়া পথিমধ্যে একটি বড় নদী ছিল।

"তাদের অগ্রাভিযান প্রমাণ করে এই তিন বাহিনী বহু দিন আগে থেকেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।" সুলতান মাহমূদ তার একান্ত উপদেষ্টা ও সামরিক কমান্ডারদের বললেন। এমন দুর্গম অভিযান কঠিন প্রস্তুতি ছাড়া হতে পারে না।

সুলতান মাহমূদ মোটেও খেয়াল করেননি কাশগড় থেকে খোরাসানের পথের যতো উপজাতীয় জনগোষ্টী ছিল কাদের খান তাদেরকে সম্পদের লোভ ও ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালিয়ে নিজের পক্ষে নিয়ে এসেছিল! এসব পাহাড়ী উপজাতীয় জনগোষ্টী ছিল খুবই হিংস্র লড়াকু ও যুদ্ধবাজ। এরা ইসলামের কিছুই জানতো না। নিজেদের মনগড়া ধর্মকর্ম পালন করতো; যা ছিল ইসলামের একত্ববাদের ধারণার পরিপন্থী পৌত্তলিকদের অনুরূপ।

"এদের সম্পর্কে আমার জানা আছে। আমি এদেরকে বলখ থেকে দূরের ময়দান এলাকায় লড়াইয়ে প্রবৃত্ত করবো। এদের সহযোগী উপজাতীদের ব্যাপারেও আমার জানা আছে। ওরা লড়াকু হওয়ার কারণ হলো, সবসময় পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত থাকে। তবে এদের দুর্বলতা হলো, পাহাড়ী এলাকা ছাড়া এরা লড়াইয়ে বেশী সুবিধা করতে পারে না। তাদের ঘোড়াগুলোও পাহাড়ী অঞ্চলেই দৌড়ঝাপ করতে অভ্যস্থ।

গযনী থেকে বলখের দূরত্বও কম ছিল না। আবু জাফরের কাছে সংবাদ শুনেই সুলতান খোরসানের সৈন্যদেরকে বলখ থেকে কিছুটা দূরে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন! খোরাসানে বেশী হাতি ছিল না। সম্ভাব্য যুদ্ধের আশংকায় তিনি গযনী থেকে তিনশ জঙ্গীহাতি খুব দ্রুত খোরাসান নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

সুলতান মাহমূদের এসব প্রস্তুতির কথা মাত্র দু'জন ঐতিহাসিক লিখেছেন। একজন উলবী আর অপরজন ইবনুল আছীর। তারা লিখেছেন,এ যুদ্ধে সুলতান

মাহমূদ তার সমর শক্তির প্রদর্শনের একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। যাতে পাহাড়ী উপজাতিরা এবং স্বজাতির গাদ্দার শাসকেরা আর কোন দিন তার দিকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর দুঃসাহস না করে।

* * *

কাদের খান, তোগা খান ও আবুল মনসুরের সৈন্যরা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। তারা রসদ ও প্রচুর যুদ্ধসামগ্রী নিয়ে এসেছিল। পাহাড়ী উপজাতির লোকেরা তাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছিল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, পাহাড়ী উপজাতির লোকেরা ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়া দৌড়াতে পারতো এবং দৌড়ঝাপ করে লড়াই করতে অভ্যস্থ ছিল। সুলতান মাহমূদের শত্রুরা উপজাতিদের এই বিশেষ বৈশিষ্টের জন্যে গর্ব করতো। তাছাড়া তিন বাহিনী মিলে তাদের সেনাশক্তিও ছিল প্রবল।

ঐতিহাসিকদের মতে সুলতান মাহমূদের সৈন্য সংখ্যা তিন বাহিনীর সমানই ছিল। অবশ্য সুলতান মাহমূদের প্রতিপক্ষের কাছে কোন হাতি ছিল না। তাছাড়া সুলতান মাহমূদের কাছে অন্তত চারশ রথ ছিল, এই রথগুলো তিনি হিন্দুস্তানের পরাজিত সৈন্যদের কাছ থেকে কব্জা করে ছিলেন। সুলতান মাহমূদ এগুলো ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন না, কিন্তু পাহাড়ী উপজাতিদের কথা চিন্তা করে রথগুলো সাথে নিয়েছিলেন। যাতে পাহাড়ী লড়াকুদের বিরুদ্ধে এগুলো ব্যবহার করে ফায়দা উঠানো যায়।

এগুলো ছিল খুবই হালকা ধরনের এক প্রকার বাহন। সামনে একটি ঘোড়ার কাধে রথ জুড়ে দেয়া হতো। রথের মধ্যে দু'জন সৈন্য থাকতো, একজন ঘোড়া হাঁকাতো আর অপরজনের হাতে থাকতো বর্শা-তরবারী তীর ধনুক। সুলতান মাহমূদ ছোট দু'টি রথ ইউনিট তৈরী করেছিলেন। এবার উভয় রথ ইউনিটকে খোরাসানের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন সুলতান মাহমূদের সৈন্যরা ছিল উচ্চমানের সামরিক প্রশিক্ষণে শিক্ষিত। তাদের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকতা এবং রণাঙ্গনের

কঠিন সময়েও এক দল অপর দলের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতো। যুদ্ধের কঠিন অবস্থাতেও সুলতান মাহমূদের কোন সামরিক ইউনিট অপর ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন হতো না। ফলে সুলতান মাহমূদের সৈন্যদেরকে কখনো বিশৃঙ্খল হতে দেখা যেতো না।

এসব রণাঙ্গনীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হওয়ার পরও এই যুদ্ধ প্রস্তুতি সুলতান মাহমূদকে পেরেশান করছিল। কারণ, হিন্দুস্তানে তার প্রচুর সংখ্যক অভিজ্ঞ সৈন্য শাহাদাত বরণ করে। ধরে আনা হিন্দুদেরকে সামরিক বাহিনীতে সুযোগ দিয়ে তিনি জনবলের ঘাটতি অনেকটা পূর্ণ করেছিলেন। হিন্দু ইউনিটের সৈন্যদেরকে প্রচুর সুযোগ সুবিধা দিয়ে রেখেছিলেন তিনি। এরা ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে ঈমানের দীক্ষা নিচ্ছিল। কিন্তু এরপরও এদেরকে কখনো তিনি হিন্দুস্তানের কোন অভিযানে নিয়ে যেতেন না।

সুলতান মাহমূদ বলখ পৌছে বিশ্রাম পরিহার করে সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করতে শুরু করলেন। কোন ইউনিট কোন দায়িত্বে কি কাজ করবে তিনি তা বুঝিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু বেশী সময় নিয়ে খুব মনোযোগ ও চিন্তা-ভাবনা করে সৈন্যদের দায়িত্ব বন্টনের সময় তিনি পেলেন না। তার কাছে খবর পৌছে গেল, শত্রু বাহিনী ককেসাস নদী পেরিয়ে আসছে। ককেসাস নদীর অবস্থান ছিল বলখ থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে। সুলতান মাহমূদকে তার সেনা কর্মকর্তারা পরামর্শ দিলেন, শত্রুরা নদী পাড় হওয়া অবস্থাতেই ওদের উপর হামলে পড়া উচিত। কিন্তু সুলতান মাহমূদ বললেন, ওদেরকে নিরাপদে নদী পেরিয়ে আসতে দাও। এরপর নদী আমাদের সহযোগী বিবেচিত হবে। নদী থেকে আমরা সুবিধা নিতে পারবো। নদী পাড় হওয়ার খবরে সুলতান মাহমূদের নিশ্চিত ধারনা হলো, শত্রুবাহিনী বলখেই আসবে।

সুলতান মাহমূদ গযনী বাহিনীকে দু'ভাগ করলেন। বলখ থেকে ডানে পাঁচ মাইল দূরে এক অংশকে রেখে অপর অংশটিকে বলখের পাচ মাইল বামে রেখে নদীর দিকে অগ্রসর হতে বললেন। হস্তি বাহিনীর সাথে তিনি একশ রথ ও একটি পদাতিক ইউনিটকেও পাঠালেন। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল; তারা সুলতানের নির্দেশের অপেক্ষা করবে এবং যে কোন মূল্যে শত্রু বাহিনীর দৃষ্টি থেকে নিজেদের আড়াল রাখবে।

এই সেনা বিন্যাসের চতুর্থ দিন শত্রু বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের দেখা পাওয়া গেল। সুলতান মাহমূদকে যখন এই খবর দেয়া হলো, তিনি খবর শুনেই কিবলা মুখী হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে প্রথমেই নির্দেশ দিলেন শত্রু বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের উপর কেউ একটি তীরও চালাবে না। তিনি যখন এই নির্দেশ দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই তাকে জানানো হলো, শত্রু বাহিনীর এক গোয়েন্দাকে পাকড়াও করে আনা হয়েছে। সুলতানের নির্দেশে গোয়েন্দাকে তার সামনে হাজির করা হলো।

"হ্যা সুলতান আমি বেলাসাগুনের গোয়েন্দা বটে; কিন্তু একটি সংবাদ আপনাদেরকে দিতে এসেছি, আপনাদের কোন তথ্য নিতে আসিনি।'

"কি খবর নিয়ে এসেছো?"

"খবরটি আপনার ছেলে মাসঊদের জন্য। আপনি জলদী তাকে এখানে ডেকে নিয়ে আসুন।'

"মাসঊদকে যখন ডেকে আনা হলো, তখন গোয়েন্দা সুলতানের উপস্থিতিতেই বললো, তাকে আবুল মনসুরের মেয়ে সিমনতাশ এই মৌখিক সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছে যে,

আমি আপনাকে বলেছিলাম যুদ্ধক্ষেত্রেই হয়তো আমাদের সাক্ষাত হবে। আমার আব্বার সেনাকর্মকর্তাদের স্ত্রী এবং রক্ষিতাদের সাথে আমিও রণাঙ্গনে এসেছি। আমাদের অবস্থান হলো, আমার আব্বার সৈন্যরা ডান পাশে এবং বুখারার সৈন্যরা আছে বাম পাশে আর কাদের খানের সৈন্যরা মাঝে। আমাদের সৈন্যদের কমান্ড আমার পিতা নিজে দিচ্ছেন। উপজাতিদেরকে তিন বাহিনীর মধ্যে ভাগ করে নেয়া হয়েছে। আপনার আব্বা আমাদের সৈন্যদের অবস্থা জানার পর তিনি তার বাহিনীকে কিভাবে সাজাবেন তা ভালো বুঝবেন। আমি আপনাকে অনুরোধ করবো; আমাদের বাহিনীর দিকে অগ্রসর হতে। আমি জীবিত আপনার কাছে পৌছার চেষ্টা করবো। আর যদি জীবিত না থাকি তবে দু'আ করবেন। আল্লাহ হাফেয!"

গোয়েন্দা আরো বললো, শাহজাদী আমাকে ফিরে না গিয়ে আপনাদের সাথে থাকতে বলেছেন।

“শোন মাসউদ! গোয়েন্দাকে কক্ষের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে মাসউদের উদ্দেশ্যে সুলতান বললেন, “এটা কি প্রেম ঘটিত ব্যাপার? যদি এমন কিছু হয়ে থাকে তাহলে আমি তোমাকে ও দিকে পাঠাবো না।”

“ব্যাপারটা অনেকটাই আবেগাশ্রিত। কিন্তু এতে কোন ব্যক্তিগত আবেগ কিংবা ছেলেমানসিকতা নেই আব্বা হুজুর।” জবাব দিলেন মাসউদ। “আপনি আমাকে নিঃসংকোচে ওদিকে পাঠাতে পারেন। আমি সিমনতাশের পরিবর্তে তার বাবার সাথে সাক্ষাতেব চেষ্টা করবো। সিমনের এই পয়গাম প্রতারণা নয়। আবু জাফরের কাছে আপনি এই মেয়ে সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছেন। আমিওতো সিমনতাশের সম্পর্কে আপনাকে পরিষ্কার একটা ধারণা দিয়েছি।’

* * *

এই যুদ্ধ প্রস্তুতির পঞ্চম দিনে টকটকে লাল সূর্যটা পৃথিবীর বুকে আলো বিকিরণ করছিল মাত্র। ঠিক সেই সময় উভয় শিবিরের সৈন্যরা আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনী দিয়ে নিজেদেরকে তরতাজা করে তুলছিল। উভয় পক্ষ ছিল প্রতিপক্ষের রক্তপিপাসু।

সিমনতাশ শত্রুপক্ষের সেনা বিন্যাসের যে প্রক্রিয়ার কথা বলেছিল শত্রু বাহিনী ঠিক সেভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল। যুদ্ধের সূচনাস্বরূপ অশ্বারোহী সংবাদবাহী দূতেরা জরুরী খবর পৌছানোর জন্য উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাঁকাচ্ছিল। সুলতান মাহমূদ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এসব দূতের মাধ্যমে জরুরী পয়গাম পাঠিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতেন। দূতদের বহন করা সংবাদে শত্রু পক্ষের অবস্থানও তাদের যুদ্ধ পরিকল্পনা বুঝা যাচ্ছিল। কাদের খানের সৈন্যরা ছিল মাঝে এবং অনেকটা দূরে। দৃশ্যত শত্রুপক্ষের অগ্রাভিযানের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, তারা সুলতান মাহমূদের সৈন্যদেরকে ঘেরাও করতে চায়।

আবুল মনসুরে সৈন্যরা যে দিকে ছিল সুলতান মাহমূদ তার ছেলে মাসউদকে ভ্রাম্যমান কমান্ডার হিসেবে সেদিকে পাঠিয়ে দিলেন। তোগাখানের সৈন্যদের দিকে আরেকজন তেজস্বী সেনাপতিকে কমান্ডারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন! শত্রু বাহিনীর একটি দলের সাথে অপর দলটির দূরত্ব ছিল প্রায় দেড়

দুই মাইল। এই শূন্য জায়গা দিয়ে সুলতান মাহমূদের সৈন্যরা সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। সুলতান অশ্বরথ এবং হস্তি ইউনিটকে অনেক আগেই ডানে বামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তোগাখান ও আবুল মনসুরের সৈন্যরা সুলতানের হস্তিবাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে ছিল।

সুলতান মাহমূদ শেষ নির্দেশ দিয়ে তার দূতদের পাঠিয়ে দিলেন। ততোক্ষণে সূর্য অনেক উপরে উঠে গেছে; কিন্তু দুইপক্ষের সৈন্যদের দৌড় রণাঙ্গনে যে ধুলি উড়ালো তাতে সূর্যের আলো ধুলির আস্তরণের মধ্যে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ যেন আসমান যমীন কাঁপতে শুরু করল। সুলতান মাহমূদ ডানে বামে-আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে দিলেন। উভয় বাহুতে উভয় দিক থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হলো। সুলতানের আক্রমণকারীরা ছিল হাতি, রথ ও পদাতিক সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী। গযনী বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে উপজাতির দুর্ধর্ষ লড়াকুরা তাদের মতো করে প্রতিরোধ গড়ে তুললো। তারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বল্লম ও তীরের সাহায্যে আক্রমণ প্রতিহত করতে চাইলো; কিন্তু এমন চতুর্মুখী আক্রমণে তারা তাদের প্রতিপক্ষ চিহ্নিত করতেই হিমশিম খাচ্ছিল।

এদিকে কাদেরখানের কাছে কোন তথ্য পৌছল না, তাদের দু'পাশে কি ঘটছে। দুই বাহু থেকে তার কাছে কোন বার্তা পৌছাচ্ছিল না। তাকে একথা বলার কোন ব্যবস্থা ছিল না যে, তার সহযোগী দুই প্রান্তের যোদ্ধারা ঘোড়ার গাড়ি ও হাতির পায়ে পিষ্ট হচ্ছে।

ডান পাশের আবুল মনসুরের অবস্থা ভালো ছিল না। তার সৈন্যদের উপর এক দিক থেকে মাসউদের নেতৃত্বে আক্রমণ হলো। আবুল মনসুরের সৈন্যরা যখন এ দিকে মনোযোগী হলো তখন তাদের পেছনে দিক থেকে উন্মত্ত জঙ্গি হাতি আকাশ বাতাশ কাঁপিয়ে বিকট চিৎকার করে হামলে পড়ল। এক সাথে হস্তিবাহিনী ও রথ ইউনিট এবং পদাতিক সৈন্যরা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করল। রথ ইউনিটের মনোযোগ ছিল উপজাতিদের উপর। যখনই কোন উপজাতি তাদের মতো করে মোকাবেলা করতে সারি থেকে বের হতো তখন তার দু'দিকে দুই রথ আরোহী সৈন্য দৌড়ে যেতো এবং রথগাড়ীর উপর থেকে বর্শা বা তীর চালিয়ে সেই উপজাতিকে ধরাশায়ী করে ফেলতো।

সন্ধ্যার আগে একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে মাসউদ রণাঙ্গনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল। তার পেছন দিক থেকে তিনটি ঘোড়া উর্ধশ্বাসে ছুটে আসছিল। একজনের হাতে ছিল সাদা পতাকা। মাসউদের নিরাপত্তা রক্ষীরা ওদের দিকে ঘোড়া হাঁকাল। কারণও এমন লড়াইয়ে সাদা পতাকাও প্রতারণা হতে পারে। মাসউদের নিরাপত্তারক্ষীরা তিন অশ্বারোহীকে ঘেরাও করে মাসউদের কাছে নিয়ে এলো। তিনজনের মধ্যে একজন ছিল সিমনতাশ। সে তার মাথা মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে ছিল। আর গায়ে পুরুষ সৈন্যের পোশাক পরে ছিল। মাসউদের কাছাকাছি এসেই এক লাফে সিমনতাশ ঘোড়া থেকে নেমে মাসউদের কাছে গিয়ে তাকে সালাম করল। তার অপর দুই সঙ্গী ছিল সেনাবাহিনীর লোক।

বহু কষ্টে আপনার অবস্থান জানতে হয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সিমনতাশ। আমার আব্বা পালানোর চেষ্টা করছেন, কিন্তু তার এক সেনাপতি তাকে মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছে। আব্বা সৈন্যদের মধ্য ভাগ অনেক পেছনে নিয়ে গেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে সে পরাজিত হয়েছে। কাদের খানের এক দুত তার কাছে সংবাদ নিয়ে এসেছে বলখের দিকে অগ্রাভিযান সে বন্ধ করে দিয়েছে এবং সহযোগিতার জন্যে সে তার সৈন্যদেরকে ডানে বামে ভাগ করে পাঠাচ্ছে। সে বলে পাঠিয়েছে, হতাশ হবেন না, মাহমূদের বাহিনীকে আমরা ঘেরাও এর মধ্যে ফেলে দিচ্ছি।. ...

জানেন মাসউদ? কিভাবে আমি তোমার অবস্থান জেনেছি এবং এখানে পৌছতে সক্ষম হয়েছি? সে কথা অন্য দিন বলা যাবে। এখন একথা বলতে চাই, একটু সাহস করলেই আমাদের মধ্যভাগের রিজার্ভ সৈন্যদের আপনারা পাকড়াও করতে পারেন। অপর পাশের সৈন্যদের অবস্থা কি আমি বলতে পারবো না। আমি শুধু আমাদের সৈন্যদের কথা বলছি।"

গভীর চিন্তার পড়ে গেলেন মাসউদ।

"কি চিন্তা করছেন? আমাব ঘোড়া বহু লাশ মাড়িয়ে এসেছে। মৃতদের মধ্যে যেমন গযনীর সৈন্য আছে, বুখার. ও তুর্কিস্তানীও আছে। সবাইকে দেখলে তো মুসলমানই মনে হয়। ওরা সবাই মুসলমান।

স্বজাতির এই রক্তক্ষরণ এবং জীবনহানি বন্ধ করুন মাসউদ! আমি যা বলছি তা করুন। কাদের খানের পাঠানো সৈন্যরা এসে পড়লে এই নির্মম হত্যা যজ্ঞ বন্ধ করা যাবে না। কাদের খানের সৈন্যরা আসার আগেই আমাদের রিজার্ভ বাহিনীকে আপনার মুঠোতে নিয়ে নিন।" উত্তেজিত ও উচ্চকণ্ঠে কথাগুলো বললো সিমনতাশ।

"তুমি কি আমার সাথেই থাকবে? জিজ্ঞেস করলেন মাসউদ। "না। আমি এখনই চলে যাচ্ছি। আপনি আসুন........ বলে সিমনতাশ এক লাফে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে ধুলোবালির অন্ধকারে হারিয়ে গেল। সে মাসউদকে তার বাবার অবস্থানের কথা বলে গেল।

* * *

এদিকে কাদের খানের অগ্রাভিযান থেমে গেল। সে তার সৈন্যদেরকে দু'ভাগে ভাগ করে তোগাখান ও আবুল মনসুরের সহযোগিতার জন্যে পাঠাচ্ছিল। কাদের খান এ কাজ করছে বলে সুলতান মাহমূদের কাছে এ খবর যখন পৌছলো তখন রাত অন্ধকার হয়ে গেছে। তখন আর আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। সুলতান তার যুদ্ধ পরিকল্পনা পরিবর্তন করলেন। অন্ধকারের মধ্যেই মাসউদ ও অন্যান্য সেনাপতিদের কাছে পয়গাম পাঠালেন,

"যুদ্ধের সর্বশেষ অবস্থা কি আমাকে দ্রুত জানাও।"

মাসউদ তার অবস্থানে ছিল না। মাসউদের পরিবর্তে তার একজন ডেপুটি পয়গাম গ্রহণ করল! মাসউদ একশ বাছাই করা সৈনিক ও কিছু সংখ্যক কমান্ডারকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে আবুল মনসুরের হেডকোয়ার্টারে গেরিলা আক্রমণের জন্যে চলে গিয়েছিলেন। এটা ছিল মারাত্মক একটি গুপ্ত হামলার পরিকল্পনা। দিনের বেলার যুদ্ধেই আবুল মনসুর যুদ্ধ জেতার ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, তার অধিকাংশ যোদ্ধাই নিহত নয়তো মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল। সুলতান মাহমূদ এভাবেই তাদের উপর আক্রমণ করিয়ে ছিলেন যে, তাদের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব ছিলো না। আবুল মনসুর তার কন্যার নিদের্শনা মতো নদীর তীরবর্তী এলাকায় চলে গিয়েছিল। আবুল মনসুরের সাথে তার একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি, কয়েকজন উপদেষ্টা তিন স্ত্রী

এবং কিছু সংখ্যক নিরাপত্তা রক্ষী ছিল এবং কয়েকজন দূত ছিল। আবুল মনসুর যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে তার উপর আক্রমণের সুযোগ ছিল না।

মাসউদ অনেক দূরের ঘোর পথ অতিক্রম করে আবুল মনসুরের অবস্থানে পৌঁছলেন। কাছাকাছি গিয়ে তিনি দু'তিনটি মশাল জ্বলতে দেখলেন। তিনি তার সঙ্গীদের দিক নির্দেশনা দিয়ে তাদেরকে ছড়িয়ে দিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। আবুল মনসুরের দু'জন মাত্র নিরাপত্তা রক্ষী পাহারা দিচ্ছিল। তারা একে অন্যকে বললো উভয়েই ঘোড়া দৌড়ের আওয়াজ শুনেছে! অপরজন বললো, তুমি ঠিকই বলেছো, আমারও তো তাই মনে হলো। এদের একজন একটি মশাল উঁচু করে দুবার ডানে-বামে ঘুরিয়ে আবার দুইবার উপরে নীচে করে একটি তাবুর কাছে গিয়ে নীচু স্বরে কি যেন বললো, সেই তাঁবুতে সিমনতাশ শুয়েছিল। সিমনতাশ ডাক শুনেই বাইরে বেরিয়ে এলো এবং পাহারাদারকে বললো, "তুমি সামনে চলে যাও।"

যেহেতু গোটা ব্যাপারটিই ছিল পরিকল্পিত এবং সিমনতাশের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাই রাতের গুপ্ত হামলা তেমন ঝুকিপূর্ণ ছিল না। আবুল মনসুরের সেনাপতি এবং সৈন্যরা নিজ নিজ তাবুতে শুয়ে ছিল। দিনের বেলার যুদ্ধে আহতদের গগনবিদারী আর্তচিৎকার তাদের কানে পৌছাচ্ছিল না। রক্ত ও লাশের গন্ধ থেকেও তারা ছিল অনেকটা দূরে। তারা এই আত্মতৃপ্তিতে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল যে, তাদের সৈন্যদের মাড়িয়ে কেউ তাদের পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হবে না। কিন্তু ঈমান বিক্রেতা পিতার ঈমানদীপ্ত কন্যাই তার জন্যে মারাত্মক এক ঝুকি হিসেবে অবস্থান করছিল।

মাসউদ তাঁবুতে প্রবেশ করে একটি মশাল উঠিয়ে আবুল মনসুরের তাঁবুতে প্রবেশ করে তাকে ঘুম থেকে জাগালো। ঘুম থেকে জেগে মাসউদকে দেখে আবুল মনসুর হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন। এদিকে মাসউদের নিরাপত্তা রক্ষীরা আবুল মনসুরের নিরাপত্তারক্ষীদের জাগিয়ে এক জায়গা জড়ো করলো এবং তার সেনাপতিকেও পাকড়াও করল। আবুল মনসুর মাসউদকে বললেন, আমি পরাজয় মেনে নিলাম; কিন্তু আমার মেয়েকে তোমরা বন্দী করো না। মাসউদ তার কথার কোন জবাব দিল না।

* * *

তখন রাত প্রায় অর্ধেক পেরিয়ে গেছে। সুলতান মাহমূদ গোটা রণাঙ্গণ চক্কর দিয়ে মাত্রই তার তাঁবুতে ফিরেছেন। ঠিক সেই সময় তাকে জানানো হলো, মাসঊদ আবুল মনসুরকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছে।

একথা শুনে সুলতান দৌড়ে তাবুর বাইরে চলে এলেন। কারণ, তার জন্যে এ খবর কোন সাধারণ খবর ছিল না। আবুল মনসুরের সাথে তার কন্যা সিমনতাশও ছিল। তিনি তাদেরকে তার তাঁবুতে নিয়ে গেলেন।

"সুলতান কি আমার বন্ধুত্ব গ্রহণ করবেন?" মাথা নত করে আরয করলেন আবুল মনসুর।

"আমি তো তোমার কাছে বন্ধুত্বের পয়গামই পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি দোস্তী কবুল না করে বরং আমার ছেলেকে হত্যা করার অপচেষ্টা করেছিলে? এর পরও কি তোমার উপর আমার আস্থা রাখা সম্ভব? উল্টো প্রশ্ন করলেন সুলতান। তুমি যে আবারো ধোঁকা দিবে না, এটি আমি কিভাবে বিশ্বাস করবো? এখন আর তোমার বলার কিছু নেই, তুমি এখন আমার বন্দী।

"আপনি ঠিকই বলেছেন, 'এখন আর আমার কিছু বলার নেই। তবুও আমি আপনার বন্ধু হতে চাই; আপনার অনুগ্রহ প্রত্যাশা করি। আমি কখনো আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইনি। কিন্তু...... আমি এক প্রকার বাধ্য ও অক্ষম হয়ে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি সুলতান!

আব্ল মনসুর অপরাধ স্বীকার করে নেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, চতুর্মুখী চাপে পড়ে আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হয়েছি।

সিমনতাশ পাশেই দাঁড়িয়ে সুলতান ও তার বাবার কথোপকথন শুনছিল। সে সামনে অগ্রসর হয়ে সুলতানের সামনে হাটু গেড়ে বসে সুলতানের হাতে চুমু খেয়ে বললো, "আপনার হৃদয়ে আমার জন্যে কি একটুও দয়ার জায়গা নেই সুলতান? সে একবার মাসঊদের দিকে তাকিয়ে এবং আরেকবার সুলতানের দিকে তাকিয়ে বললো,আমি আমার পিতার প্রতিশ্রুত মৈত্রী পাকাপাকি করতে পারি।"

"সুলতান মাহমূদ সিমনতাশের ইঙ্গিত বুঝে আর কোন কথা বললেন না।'

সিমনতাশের কথা শুনে আবুল মনসুরও বললেন, হ্যাঁ, সুলতান! আমার কাছে এখন এই একমাত্র জামিন আছে। এই আমার একমাত্র সন্তান। সে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাকে নিষেধ করেছিল। আপনি একে আপনার মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করুন।'

কথা না বাড়িয়ে সুলতান মাহমূদ সেই সময়েই আবুল মনসুরের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং মাসউদের সম্মতিতে সিমনতাশকে তার সাথে বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেই সিমনও মাসউদের বিয়ে সম্পন্ন হলো! তখন ছিল ১০২০ সাল।

আবুল মনুসর রাতেই তার সৈন্যদেরকে লড়াই থেকে বিরত থাকার নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন। সুলতান মাহমূদ আবুল মনসুরকে বন্দীত্বের অবস্থান থেকে মেহমানের মর্যাদা দিয়ে দিলেন। আবুল মনসুরের বন্দীর খবর পেয়ে কাদের খান ও তোগা খান ময়দান থেকে পালিয়ে গেল।

দু'বছর পর এরা দু'জন এসে সুলতানের কাছে আত্মসমর্পন করে বশ্যতা স্বীকার করে নিল।

# দেবতা পুরোহিতকে গিলে ফেললো

কালাঞ্জর, কন্নৌজ ও গোয়ালিয়র একই পরম্পরার তিনটি শহর। এই তিন শহরের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল হিন্দুদের কাছে মহাপবিত্র গঙ্গা ও যমুনা নদী। গঙ্গা যমুনা ছাড়াও আরো ছোট ছোট কয়েকটি নদী এগুলোর বুক চিড়ে বিভিন্ন দিকে প্রবাহমান ছিল।

সুলতান মাহমূদের শাসনামলে এসব এলাকা ছিল ঘন বনজঙ্গলে আকীর্ণ। তাছাড়া পাহাড় টিলা ও গিরিখাদের অন্ত ছিল না। এই তিনটি শহর একই সারিতে প্রায় শ দেড়শ মাইল দূরে দূরে ছিল। সুলতান মাহমূদ যখন ভারতের অধিকাংশ এলাকায় জীবন্ত আতংক হয়ে ওঠেছিলেন তখন এই তিনটি শহর ছিল তিনটি বিশাল বিশাল রাজধানী।

কন্নৌজ সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে মথুরা, বুলন্দশহর মুনাজসহ ছোট বড় কয়েকটি রাজ্য দখল করে নেয়ার পর কন্নৌজকেও সুলতান মাহমূদ জয় করে নিয়েছিলেন। কন্নৌজের খ্যাতিমান প্রতাপশালী মহারাজা রাজ্যপাল পরাজয় ও ধরা পড়ার আশংকায় গযনী বাহিনী কন্নৌজ অবরোধ করার আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন।

কালাঞ্জর সম্পর্কে এতটুকু বলে নেয়া উচিত, কোটলী কাশ্মীরের আলোচন কালে কালাঞ্জরের নামও এসেছে। তখন জায়গাটির নাম ছিল কালাঞ্জার। বর্তমানে এটিকে কোশী বলেই ডাকা হয়। এখন আমরা যে জায়গাটির আলোচনা করবো তা আসলে কালাঞ্জর।

১০১৮ সালের শেষ দিকে কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপাল সুলতান মাহমূদের মোকাবেলার আগেই রাজধানী ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছিলেন। তিনি কন্নৌজ ত্যাগ করে কালাঞ্জর কন্নৌজ ও গোয়ালিয়রের সীমানা ছাড়িয়ে আরো নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিয়েছিলেন। রাজধানী ত্যাগ করার আগে রাজার সকল ধন-সম্পদ সোনাদানা এমন জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম জায়গায় লুকিয়ে রেখে ছিলেন যেখানে সাধারণত লোকজনের আনাগোনা নেই। রাজার এই গুপ্ত ধনের খবর জানতো শুধু কন্নৌজের প্রধান পুরোহিত।

সুলতান মাহমূদের এক গোয়েন্দার প্রস্তাবে এই পুরোহিতকেই ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। কন্নৌজ পৌঁছে রাজার ধন-সম্পদ সম্পর্কে আর কারো কাছে কোন তথ্য পাচ্ছিলেন না সুলতান মাহমূদ।

"আমরা জানতে পেরেছি তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যে মহারাজার ধন-সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলে। তাই যদি হবে তাহলে মহারাজা তোমাকে না জানিয়েই চলে গেছেন এটা কি করে সম্ভব?" পুরোহিতকে প্রশ্ন করলেন গযনী বাহিনীর এক সেনাপতি।

"ধন-সম্পদের প্রতি যাদের বেশী ভালোবাসা থাকে সে মানুষের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। জবাব দিল পুরোহিত। যে রাজা নিজের দেবদেবী ও মন্দির অবমাননা, ধ্বংস ও অমর্যাদার জন্যে ফেলে রেখে নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে তার কাছে একজন পুরোহিত কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য রাখে না। তার ধন রত্নের প্রতি যদি আমার আগ্রহ থাকতো তাহলে তো সকল ধন সম্পদ আজ আমার কজায় থাকতে পারতো। কিন্তু আমি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করিনি আপনি ইচ্ছা করলে আমার সাথে যেতে পারেন। আমি আপনাকে সেই জায়গা দেখিয়ে দিতে পারবো। মন্দিরে অবশিষ্ট যা কিছু ছিল তা তো আপনার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।"

"তুমি কি এখন ইসলাম গ্রহণ করবে? জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।"

"না, যেভাবে আপনার লোকেরা পাথরের মূর্তি মনে করে আমাদের দেবদেবীদের ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে আমাকেও সেভাবে টুকুরো টুকরো করে ধুলার সাথে মিশিয়ে দিন। আমি কোন অবস্থাতেই আমার ধর্ম ত্যাগ করবো না। আপনি যদি আপনার ধর্মের প্রতি সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকেন তবে অপর ধর্মের পণ্ডিতদের সাথে নিশ্চয়ই ভালো আচরণ করবেন। আমার বিশ্বাস আপনার ধর্মের মর্মবাণীও তাই বলে।"

"আমি তোমাদের ধর্মের পুরোহিতদেরকে আমার পায়ে পড়ে মাথা ঠেকাতে দেখেছি। কিন্তু আমি তোমার সাহস ও ধর্ম নিষ্ঠাকে সম্মান করি। গাদ্দার যে ধর্ম বা জাতিরই হোকনা কেন সে নিন্দার পাত্র।...ঠিক আছে পণ্ডিত? বলো, তুমি আমার কাছে কি প্রত্যাশা করো।"

"আমার প্রতি যদি অনুগ্রহের ইচ্ছা হয় তাহলে আমাকে আমার অবস্থার উপরে ছেড়ে দিন। আমি নিজের চোখে নিজ ধর্মের অমর্যাদা দেখে সহ্য করতে পারবো না। হয় আমি নিজেকে গঙ্গা মায়ের হাতে সপে দেবো, নয়তো জঙ্গলে গিয়ে বাকীটা জীবন জঙ্গলেই কাটিয়ে দেবো।"

"ঠিক আছে, যাও পণ্ডিত! জ্বলন্ত ফটকের মাঝ দিয়ে তুমি চলে যেতে পারো। তবে কখনো যদি তোমার রাজার সাথে দেখা হয় বলবে, "লড়াকু কোন শাসক তার প্রজা ও জাতির সাথে কখনো বেঈমানী করে না।"

পুরোহিত মাথা নীচু করে সুলতানকে কুর্ণিশ করে আর কোন কথা না বলে চলে গেল।

১০১৮ সালের ২ ডিসেম্বর সুলতান মাহমূদ কন্নৌজ অবরোধ করেন। কন্নৌজ রাজা রাজ্যপাল কখন রাজধানী ত্যাগ করে চলে গেলেন তা কেউই বলতে পারেনি। কন্নৌজ রাজার পিছু ধাওয়া করার কোন প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। কন্নৌজ জয় করার কয়েক দিন পরই সেনাপতি আবুল কাদের সালজুকীকে কন্নৌজের শাসক নিযুক্ত করে সুলতান মাহমূদ গযনী ফিরে গেলেন।

যে পুরোহিত গঙ্গাজলে আত্মবিসর্জন দেবে নয় তো জঙ্গলবাসী হয়ে দিন কাটাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে শহর থেকে বের হয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বহু দূরে চলে গেল। সে অনেক দূরে এসে ঘোড়াকে নদীর মধ্যে নামিয়ে দিল। নদী গভীর ছিল বটে কিন্তু কোন স্রোত বা তরঙ্গ ছিল না। ঘোড়া তাকে সামনে থেকে সামনেই এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল কিন্তু পুরোহিত গঙ্গা জলে আত্মবিসর্জন করলো না। এক সময় ঘোড়া নদী সাঁতরে তাকে গঙ্গার অপর তীরে নিয়ে গেল। এপাড়টি ছিল ঘন জঙ্গল। পুরোহিত ঘোড়াকে বিশ্রাম এবং ঘাস খাওয়ার জন্যে ছেড়ে দিল। অনেকক্ষণ পর সে আবারো ঘোড়ার উপর আরোহণ করে গভীর জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হলো। জঙ্গলের ভেতরে কোথাও ছিল ঘন ঝোপ-ঝাড় আর কোন জায়গা খালি ময়দান। পথিমধ্যে পুরোহিত আরো দু'তিনটি ছোট নদীও পাড় হয়ে এলো। কয়েকটি পাহাড়ী ঢালও সে অতিক্রম করল।

এক সময় সূর্য ডবে গেল। নেমে এলো রাতের অন্ধকার। কিন্তু পুরোহিতের ঘোড়া তখনও চলতেই থাকল। এক পর্যায়ে পুরোহিত আর এগুতো পারল না। বনছিল ঘন। সে ঘোড়া থেকে নেমে শুকনো গাছের লতাপাতা, মরা ডাল মরা গাছ টেনে-হেচড়ে জমা করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। সময়টা ছিল প্রচণ্ড শীতের। শীতের প্রকোপ এবং রাতের বেলায় হিংস্র জীব-জন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে চতুর্দিকে ডালাপালা জমা করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এর মাঝে পুরোহি বসে থাকল। তাতে সে শীত থেকেও বাঁচলো এবং আগুনের ভয়ে হিংস্র জীব-জন্তুও তার ধারে কাছে আসার সাহস করলো না।

সকাল বেলায় আবার সে ঘোড়য় সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলো। এক পর্যায়ে পুরোহিত এমন এক জায়গায় পৌছাল যেখানে লতাগুল্ম সকল গাছ গাছালীকে পেচিয়ে দুর্ভেদ্য দেয়াল তৈরী করেছে। তাছাড়া এই লতাগুল্মের নীচেই গভীর খাদ। আর উঁচু গাছগুলোর ডালপালা এভাবে নীচে ঝুকে রয়েছে যে এগুলোর ভেতর দিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

এই অসম্ভবকে সম্ভব করেও ধীরে ধীরে ঘোড়া অগ্রসর হলো। কঠিন জায়গাটি বহু কষ্টে পারি দেয়ার পর আবারো জঙ্গলের ঘনত্ব কমে এলো। সামনে দু'টি পাহাড়ের ঢালে ময়দানের মতো একটা জায়গা দেখা গেল। দুই পাহাড়ের ঢালে পৌছে পুরোহিত একটি পথের সন্ধান পেল। এই পথটি দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে পাহাড় দুটিকে পৃথক করেছে। এই জায়গাটি অতিক্রম করার পর আরো একটি পাহাড়ী পথ এলো। যেটি কখনো খাড়া দেয়ালের মতো উপরে চলে গেছে আবার কোথাও খাড়া পাহাড়ের ঢালের মতো নীচে নেমে এসেছে। পাহাড়ী এলাকাটি পাড় হওয়ার পর বহু দূরে তার চোখে পড়ল কিছু তাঁবুর উপর। অনেকগুলো তাবু থেকে একটু দূরে দুটি বাহারী সুন্দর তাঁবু তার নজরে পড়ল। তাঁবুর অদূরে কিছু সংখ্যক ঘোড়াও খচ্চর বাধা। পুরোহিত ঘোড়ার বাগ টেনে ঘোড়াকে চাবুক মারল, ঘোড়া উর্ধশ্বাসে ছুটে চললো, কিন্তু ততক্ষণে কয়েকজন লোক তীর ধনুক নিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়াল।

"আরে এতো দেখছি পণ্ডিতজী মহারাজ! পিছন থেকে একজন চিৎকার দিয়ে বলল। আসুন! আসুন! আপনি কিভাবে এলেন? বাইরে কিছুটা শোরগোল

কথাবার্তা শুনে রাজ্যপাল তার তাবু থেকে বেরিয়ে এলেন। তার সাথে তার রানী ও ছেলে লক্ষণপালও বেরিয়ে এলো। এই জায়গাতেই মহারাজা রাজ্যপাল কন্নৌজ ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রানী ও লক্ষণপাল ছাড়া রাজা তিনজন নর্তকীকেও সাথে নিয়ে এসেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশজন একান্ত বিশ্বস্ত সৈন্য তিনি সাথে নিয়েছিলেন তার নিরাপত্তার প্রয়োজনে। এ ছাড়াও ছিল কয়েকজন কাজের লোক।

মহারাজা যে এ জায়গায় এসেছেন সে খবর পুরোহিতের জানা ছিল। জানা না থাকলে এখানে কারো পক্ষেই পৌঁছা সম্ভব ছিল না।

পুরোহিত ঘোড়া থেকে নামলে রাজ্যপাল তাকে হাত ধরে তার তাবুতে নিয়ে গেলেন। রানী ও লক্ষণপাল অবস্থা দৃষ্টে একজন অপরজনের চোখের দিকে তাকাল। তাদের চেহারায় উদ্বেগ আর হতাশা। হতাশ মনেই তারা নিজ নিজ তাঁবুতে চলে গেল।

"আপনি কি আমাকে জিজ্ঞেস করার সাহস রাখেন, আপনার রাজধানী এখন কোন অবস্থায় আছে? রাজাকে প্রশ্ন করলো পুরোহিত। আপনি কি একথা শোনার শক্তি রাখেন, মুসলমানরা কন্নৌজের মন্দিরগুলোকে কিভাবে ধ্বংস করেছে?

পুরোহিতের এসব কথা শুনে মহারাজা কন্নৌজ তার প্রতি ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। রাজার মধ্যে কোন ধরনের পরাজয়ের গ্লানি কিংবা অসহায়ত্বের চিহ্ন ছিল না।

"আমি যখন কন্নৌজ ছেড়েছি তখন গোটা কন্নৌজই জ্বলছিল' বললো পুরোহিত। মন্দিরগুলো থেকে মুসলিম সৈন্যরা হরিকৃষ্ণের মূর্তি টেনে হেচড়ে বাইরে নিক্ষেপ করছিল এবং অন্য সৈন্যরা উল্লা[illegible]গুলোকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছিল। আর আপনার রাজমহলে.........।

"থাক থাক, আপনি আমার জন্যে নতুন কোন খবর নিয়ে আসেননি পণ্ডিত মহাশয়! পুরোহিতকে থামিয়ে দিয়ে বললেন রাজা রাজ্যপাল। এ ব্যাপারে আমি আপনার সাথে অনেক কথা বলেছি। আমি আগেই জানতাম গযনীর সুলতান মাহমূদ লড়াইয়ে একজন পাকা লোক। আমি এ জানতাম কন্নৌজে যখন তার

সাথে লড়াই করার মতো কেউ থাকবে না, এবং আমাকেও সে তল্লাসী করে কোথাও পাবে না, তখন তার ক্ষোভ আরো বেড়ে যাবে; আর এই ক্ষোভ প্রশমিত করতে সে কন্নৌজে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। সহজ জয়ে খুশী হওয়ার মতো ব্যক্তি সে নয়। আমি সুদূর প্রসারী চিন্তায় আমার শাহী মান-মর্যাদা আর কন্নৌজ শহরকে ধ্বংস হতে দিয়েছি। তদ্রূপ মন্দিরগুলোর ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেও আমার বিশেষ পরিকল্পনা আছে।"

"তা হয়তো ঠিক, কিন্তু আপনি আপনার ধনরাজি ধ্বংস হতে দেননি।" শ্লেষমাখা কণ্ঠে বললো পুরোহিত।

"পণ্ডিতজী! আপনার বিগড়ে যাওয়া দেমাগ ঠিক করার কোন চিকিৎসা আমার কাছে নেই। প্রত্যেক ব্যাপারে আপনি ধর্মকে টেনে আনেন। আমি জানি আপনি বলবেন, প্রজা সাধারণও রাজধানীর চেয়েও ধনসম্পদ আমার কাছে বেশী প্রিয়। কিছুক্ষণের জন্যে দেমাগ থেকে ধর্মের ভূত নামিয়ে ফেলুন। আমার সেই প্রশ্নের জবাব দিন; যে জন্যে আমি আপনাকে কন্নৌজ রেখে এসেছিলাম। আপনি সেই কাজ কতটুকু করতে পেরেছেন? আমার উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে?

"না, যে জন্যে আপনি বারোজন বিশেষ লোককে আমার কাছে রেখে এসেছিলেন সে কাজের কিছুই আমি করতে পারিনি। আপনি যে বারোজন লোক আমাকে দিয়ে এসেছিলেন; আপনি বলেছিলেন এরা সিংহের চেয়েও হিংস্র, এরা কোন মানুষকে ভয় করে না। ভগবান এদেরকে তৈরীই করেছে মানুষ হত্যার জন্যে। আপনি বলেছিলেন, এরা খুবই দূরদর্শী, যে কাউকে ধোকায় ফেলার জন্যে এদের জুড়ি নেই। এরা অনায়াসে মানুষ হত্যা করে গায়েব করে ফেলতে পারে, কেউ কোন নাম চিহ্নও খুঁজে পায় না। আপনি বলেছিলেন, এদেরকে দিয়ে আমি যেনো সুলতান মাহমূদকে হত্যা করাতে চেষ্টা করি। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে তার বড় বড় সেনা কর্মকর্তাদেরকে খুন করাতে বলেছিলেন, এও বলেছিলেন এদের দ্বারা কোন কোন ব্যক্তিকে খুন করতে হবে।"

"হ্যাঁ বলেছিলাম। আমি অধীর আগ্রহে শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি, আপনি কোন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিয়েছেন?

"একজনকেও খুন করাতে পারিনি।' জবাব দিলো পুরোহিত। আমি আপনার দেয়া বারোজন দুঃসাহসী লড়াকুকে গরীব শ্রমজীবীর বেশে আমার কাছেই রেখেছিলাম। মুসলমান সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই লুটতরাজ শুরু হয়ে গেল। চারদিকে শুরু হলো খুনোখুনি আর অগ্নি সংযোগ। আমি দেখলাম, সেই বারো জনের মধ্যে দশজনই হাওয়া হয়ে গেছে। আমি মনে করেছিলাম এরা হয়তো তাদের কর্তব্য পালনে বেরিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর আমি অবশিষ্ট দু'জনকে চলে যাওয়া দশজনের খোজ খবর নেয়ার জন্যে পাঠালাম। এরা এসে খবর দিলো, কর্তব্য পালনতো দূরের কথা ওরা অন্যান্যদের সাথে লুটতরাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এবং তাদের কয়েক জন শহর থেকেই চলে গেছে। আমি থেকে যাওয়া দু'জনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কি কাউকে হত্যা করতে পারবে?"

তারা জবাব দিলো, মহারাজা নিজে ধনসম্পদ নিয়ে শহর ত্যাগ করে চলে গেছেন। এই অবস্থায় আমরা কার জন্যে কাকে খুন করে নিজেদের জীবন ঝুকিতে ফেলবো? এক পর্যায়ে এরা দু'জনও আমার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেল।'

একথা শোনার পর মহারাজা রাজ্যপালের মাথা নীচু হয়ে গেল।

"মহারাজ! আমি এদেরকে নিমক হারাম বলতে চাই না।' বললো পুরোহিত। কারণ, তারা যার নিমক খেয়েছিল তিনি সেখানে ছিলেন না, কাজেই তারা জীবনের ঝুকি নেয়াটাকে সংগত মনে করেনি।

তাছাড়া আরেকটি ব্যাপার আছে মহারাজ! কোন বাদশাকে হত্যা করলেই তো তার সৈন্যদের পরাজিত করা যায় না, যদি সেই সৈন্যরা কোন আদর্শের পূজারী হয় এবং তাদেরও যদি আত্মমর্যাদাবোধ থাকে। আমি এখনও আপনাকে অনুরোধ করবো, যেসব সৈন্যদেরকে আপনি কন্নৌজ ছেড়ে বাড়ীতে চলে যাওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন, এদেরকে এক জায়গায় জড়ো করে প্রস্তুত করুন। বারীকে আপনার রাজধানী ঘোষণা করুন, তাহলে সুলতান মাহমূদকে দেশছাড়া করা আপনার পক্ষে অসম্ভব হবে না। কারণ, যুদ্ধে যুদ্ধে কমতে কমতে গযনীর সৈন্য সংখ্যা এখন আর বেশী নেই। এ দিকে মহারাজা ভীমপাল গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন, কালাঞ্জরের রাজা গুন্ডা আপনার সহযোগী হবে। এদের

সহযোগিতায় সামান্য সংখ্যক মুসলিম সৈন্যকে আপনি ইচ্ছা করলে পিষে ফেলতে পারেন। আপনি জানেন, লোকেরা আপনার ক্ষমতা ও সিংহাসনকে খুব্ই মর্যাদার চোখে দেখে।"

"সবার আগে আমার দরকার লুকানো ধন-সম্পদ সেখান থেকে বের করে আনা। এরপর আমি চিন্তা করবো কি করা যায়। সারা জীবন এভাবে চুপ করে বসে থাকা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

* * *

এরপর একদিন এক রাতের সফর শেষে কন্নৌজ রাজ রাজ্যপালের কাফেলা সেখানে পৌছালো পুরোহিত রাজার ধন-সম্পদ যেখানে লুকিয়ে রেখে ছিল। জায়গাটি ছিল পাহাড়ী কিন্তু উপর থেকে নীচের দিকে একটা ফাকা জায়গা ছিল। ফাকা জায়গাটা ছিল দেখতে অনেকটা কুয়ার মতো। পাহাড়ী গাছ গাছালি হেলে পড়ে শূন্য জায়গাটিতে ছায়া বিস্তার করে রেখেছিল। গুহার পাড়েও ছিল লতাগুল্ম জাতীয় গাছগাছালী। এগুলো গুহার উপর হেলে পড়ে দেয়ালের মতো তৈরী করেছে। গুহার ভেতরে কিছুটা পানির মতো ছিল। অবশ্য পানির চেয়ে কাদামাটিই ছিল বেশী। গুহার পাড় দিয়ে উপর থেকে যাওয়ার একটি ছোট্ট-রাস্তার মতো ছিল। রাস্তার দু'পাশে ছিল খাড়া পাহাড়। মূলত রাস্তাটি অনেকটাই ছিল বৃক্ষ লতাগুল্মে ঢাকা। গর্তের শুরুতেই একটি সুড়ং পথের মতো ছিল। আর সুড়ং পথের মুখটি ছিল খোলা। সুড়ং পথটি কিছু অগ্রসর হয়ে অরেকটি গর্তের মুখে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওখানেই লুকানো ছিল কন্নৌজ রাজের ধন সম্পদ। কিন্তু ধনসম্পদের গর্তে যাওয়ার পথে একটি গভীর গর্ত খোড়া হয়েছিল, যে গর্তের ভেতরে রাখা হয়েছিল বিষাক্ত সাপ বিচ্ছু। সাপ বিচ্ছুর গর্তের উপর হালকা পাটাতন দিয়ে ঘাসের ধারা ঢেকে দেয়া হয়েছিল। যাতে কেউ গুপ্ত ধনের দিকে অগ্রসর হলে সাপের গর্তের উপরে পা রাখলেই পাটাতন ভেঙে সাপের গভীর গর্তে পড়ে যায়য়।

কন্নৌজ রাজ্যের একান্ত অনুগত নিরাপত্তারক্ষী এবং তার পরিবারবর্গ ও পণ্ডিত মিলে একটি ছোট্ট কাফেলা বিজন এই পাহাড়ী জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায়

উপস্থিত হলো। তাদের কাফেলায় অনেকগুলো খচ্ছর গাধা এবং ঘোড়া ছিল। পুরোহিত যখন এই জায়গায় রাজার ধন-সম্পদ লুকাতে এসেছিল তখন রাতের অন্ধকারে কিছু সংখ্যক লোককে চোখ বেধে খচ্চর ও ঘোড়ার পিঠে করে লোকগুলোকে একটি রশি দিয়ে বেধে এনেছিল। কিন্তু এখন আর কারো চোখ বাধা ছিল না এবং গুপ্ত ধনের গুহায় যাওয়ার আগে সাপের গভীর গর্তে যাতে কেউ পড়ে না যায় তাই একটি লম্বা চওড়া কাঠের তক্তা সেটির উপর রেখে দেয়া হলো। আগে পুরোহিত গুপ্তধনের গুহায় প্রবেশ করল এবং পরে অন্যান্য রাজকর্মচারীদেরকে ডেকে নিল। কর্মচারীরা বাক্স ভর্তি ধনভাণ্ডার গুহা থেকে বাইরে এনে গাধা ও খচ্চরের পিঠে বোঝাই করছিল। কন্নৌজের রাজা মহারাজারা বংশানুক্রমে যে ধনরত্ন সোনাদানা জমা করেছিল মহারাজা রাজ্যপাল সেগুলোকেই গণ মানুষের চক্ষুর আড়ালে একমাত্র প্রধান পুরোহিতের জ্ঞাতসারে তার মাধ্যমে এ জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন।

বাপ দাদাদের সঞ্চিত সম্পদের সাথে মহারাজা রাজ্যপালের আমলে আরো বিপুল বিত্ত যুক্ত হয়েছিল। মনের পর মন সোনা রুপা, সোনার মোহর এবং মণিমুক্তা ছিল। বাক্সের ভেতরে ভরা এসব ধনরাজি গুহা থেকে বের করে আনতে বিশ গুণের মত লোককে কয়েকবার গুহার ভেতরে প্রবেশ করে বাক্স বাইরে এনে গাধা খচ্চর বা ঘোড়ার পিঠে উঠাতে হয়েছে। শেষ বাক্সটি যখন গর্ত থেকে বের করে এনে বহনকারী জন্তুর পিঠে বেধে দেযা হলো, তখন পুরোহিত বাক্স বহণকারীদেরকে পুনরায় গর্তের ভেতরে নিয়ে গিয়ে নিজে বাইরে চলে এলো এবং সাপের গর্তের উপর রাখা তিনটি তক্তা খুব দ্রুততার সাথে টেনে এ পাশে নিয়ে এসে এগুলোকে শক্তির জোড়ে গর্তের বাইরে নিয়ে এলো। বাইরে এসে বললো–

"চলুন মহারাজ!"

রাজা রাজ্যপাল বললেন। "ওরা কোথায়?"

"ওরা আর কখনো বাইরে আসতে পারবে না।" বললো পণ্ডিত। ওদেরকে গর্তের ভেতরে ঢুকিয়ে তক্তা বের করে ফেলেছি। এরা যদি বাইরে বের হতে চায় তাহলে সাপের গর্তের ভেতরে পড়বে। এক দু'জন গর্তে পড়লে আর কেউ বাইরে বের হওয়ার দুঃসাহস করবে না। ক্ষুধা পিপাসায় গুহার ভেতরেই মারা যাবে।

এদেরকে এভাবে হত্যা না করে মোটা অংকের পুরস্কার দিয়ে কি খুশী করা যায় না? যেন তারা আর আমার ধনরত্নের প্রতি লোভ না করে। বললেন মহারাজা রাজ্যপাল। ওদের অসহায় অভিপাশ না নিলে হয় না?"

"মহারাজ! এই সম্পদের জন্য আপনি আপনার রাজত্ব আত্মমর্যাদা সবই বিসর্জন দিয়েছেন, অনুরূপ এই বিত্ত বৈভব দেখে ওরা আমাকে আপনাকে এবং রানী ও রাজকুমারকে হত্যা করার চিন্তা করতেই পারে। এতো বিশাল সম্পদ থেকে সামান্য কিছু নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না। দেখুন না, সম্পদ জড়ো করতে আপনি কি আপনার প্রজাদের প্রতি কখনো দয়া পরবশ হয়েছেন? মানুষ যখন ক্ষমতার মসনদে বসে এবং মাথায় রাজমুকুট রাখে তখন প্রজাদের দুঃখ ও অভাবের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে আরো বেশী ধনরত্ন এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রতি। তখন সেই ক্ষমতাবান লোকেরা বুঝে ঠিকই কিন্তু বিবেক দিয়ে চিন্তা করে না। আজ আপনি এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন। আপনি ভীতু শিয়ালের মতো লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, আপনার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত স্বগোত্রীয় এবং স্বধর্মীয় প্রজাদেরকে শত্রুদের দয়ার উপর ছেড়ে এসেছেন।

"পণ্ডিত মহাশয়! বারবার আপনি আমাকে অপমান করছেন। দেখবেন আমি আপনাকে একটা কিছু করেই আমার সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণ করবো। বললেন মহারাজা রাজ্যপাল।

"হ্যাঁ, এজন্য তো আমি এখনো আপনার সাথে রয়েছি যে, আপনি একটা কিছু করে দেখাবেন।" বললো পুরোহিত।

আপনি কি ভুলে গেছেন, কন্নৌজে সিংহাসন হিন্দু জাতির গর্ব, অহংকার আত্মমর্যাদা, রণাঙ্গনের বীরত্ব, জ্ঞান বিজ্ঞান ও হিন্দুস্তানের মর্যাদার প্রতীক। হিন্দুস্তানের সকল রাজা মহরাজা আপনাকে তাদের নেতা মনে করে। আপনি নিজেও তা উপলব্ধি করেন। তাই আমি চাই আপনি এই জঙ্গল থেকে বের হোন।

ঠিক আছে পণ্ডিত মশাই! আপনি যা চান তাই হইবে। বললেন রাজ্যপাল।

এখন চলুন মহারাজ। এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

মহারাজের জয় হোক। রাজাকে উদ্দেশ্য করে পুরোহিত বললো।

পুরোহিত যখন তক্তা টেনে গর্তে প্রবেশকারীদের বের হওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়ে চলে এলো, তখন গর্তের ভেতরে আটকেপড়া লোকগুলো কাতর কণ্ঠে পুরোহিতকে ডাকছিল। কিন্তু পুরোহিত ও রাজা রাজ্যপাল তখন ধন-রত্ন বোঝাই করা ঘোড়া ও খচ্চরগুলোকে সারি করে বেঁধে সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলো। ক্রমশ বাড়ছিলো তাদের মধ্যে ও গর্তে আটকে পড়াদের মধ্যে দূরত্ব। ক্ষীণ হয়ে আসছিল তাদের করুণ আর্তনাদ।

এরপর রাজা ও পুরোহিতের দুর্গম কঠিন জঙ্গলাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে হচ্ছিল যেখানে সাধারণ মানুষের যাতায়াত দুঃসাধ্য, শুধু বনের হিংস্র জীব জন্তুরাই যেখানে অবাধে বিচরণ করে।

পণ্ডিতজী! আপনার মহানুভবতায় আমার মাথা আপনার কাছে ঝুঁকে আসছে। আমি আপনাকে এমন বিরল পুরস্কারে ভূষিত করতে চাই যা কেউ কোনদিন আমার কাছ থেকে পায়নি এবং পাবার কল্পনাও করতে পারে না। পুরোহিতে উদ্দেশে বললেন রাজ্যপাল। আপনি নিজেই বলুন। আমি আপনাকে কি পুরস্কার দিতে পারি?"

"একটা পুরস্কার অবশ্য আছে, যে পুরস্কার আজ পর্যন্ত কোন রাজা বাদশা কোন সুহৃদ বন্ধু কিংবা আস্থাভাজনকে দেননি। এবার আপনি ইচ্ছা করলে তা দিতে পারেন।"

বলুন পণ্ডিত মশাই! কি সেই পুরস্কার? অবশ্যই তা আমি আপনাকে দেবো বলুন! অবশ্যই বলুন!

"সেই পুরস্কার হলো গযনী সুলতানের দ্বিখণ্ডিত মস্তক।" বললো পুরোহিত।

"পুরোহিতের কথা শুনে মহারাজা রাজ্যপালের হাসি পেল। এ মাথা যদি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে হিন্দুস্তান ভবিষ্যত আক্রমণের শিকার হওয়া থেকে শুধু নিরাপদ হবে না, হিন্দুস্তানে ইসলামের প্রচার প্রসারও চিরদিনের জন্যে রুদ্ধ হয়ে যাবে, বললো পুরোহিত। সুলতান মাহমূদের মৃত্যুতে আমাদের এই ভারতমাতা চিরদিনের জন্যে পবিত্র হতে পারে। অবশ্য আমার আশঙ্কা হয় আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকেও আমাদের মতো মুসলমানদের

প্রতিরোধে লড়াই করতে হবে। যুদ্ধ বিগ্রহ হবে, ভারতমাতার সুপুত্রদের রক্ত ঝরবে, তবুও ইসলাম এই মাটি থেকে চিরবিদায় হবে না। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে যদি ভগবান সত্যিকারের বুদ্ধিমত্তা দান করেন, তাহলে তারা এভাবে যুদ্ধ করে মরবে না বরং মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করতে অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবে। আমরা যদি ভারতমাতার উপর থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করতে নাও পারি; কিন্তু এদের বিরুদ্ধে যদি হিন্দুদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পারি তবুও আমাদের কর্তব্য কিছুটা পালিত হবে। যাতে কোন হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করা তো দূরে থাক কোন মুসলমানের সংস্পর্শে যাওয়াটাকেও এতটুকু ঘৃণা করবে যেন সে অপবিত্র হয়ে গেছে।"

"পণ্ডিত মহারাজ! আপনি সবসময় সব কথাতেই ধর্মের কথা টেনে আনেন। কিন্তু আমি নিজেই এখন ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে গেছি। হরিহরি মহাদেব আর হরিকৃষ্ণ আমাদের কি উপকারটা করতে পারলো, বলুন তো? আপনি আমাদের সব সময় দেব-দেবীদের ক্ষোভের ভয় দেখান, তাদের কি শুধু ক্ষোভ ক্রোধই আছে? তাদের মধ্যে কি দয়া মায়া নেই? প্রতিটি যুদ্ধে শুধু মুসলমানরাই জয়ী হচ্ছে। আমাদের লোকেরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেও একটি ক্ষেত্রেও বিজয় অর্জন করতে পারছে না। আপনার সেই মহাদেবের ক্রোধ কি একবারও ওই মুসলমানদের উপর গিয়ে পড়তে পারে না?"

"মহারাজ! এটা হলো দেব-দেবীদের রহস্য। মানুষ যখন দেবদেবীদের নির্দেশ পালন করে না, তখন তাদের মনের মধ্যে দ্বিধা সংশয় সৃষ্টি করে দেয়। ফলে তারা আপনার মতো ভগবানের বিরুদ্ধে দেবতাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে।

ধনরত্ন বোঝাই ঘোড়া ও অন্যান্য ভারবাহী জন্তুগুলো ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। গভীর অরণ্য দিয়ে পথ চলার কারণে দূর থেকে তাদের কানে ভেসে আসছিল সিংহের গর্জন এবং হায়েনার চিৎকার। মাঝে মাঝে বাঘের হুংকারও শোনা যাচ্ছিল। ঘোড়া ও ভারবাহী খচ্চরগুলো ঘন বনজঙ্গলের দুর্গম পথ মাড়াতে মাড়াতে ভীত বিহ্বলতার মধ্য দিয়েই অগ্রসর হচ্ছিল। পথ চলতে চলতে মহারাজা রাজ্যপাল বললেন,

"আমি আমার রাজ্যের মন্দিরগুলো হিরা মণিমুক্তা দিয়ে সাজিয়েছি, ঋষী, পণ্ডিত সাধু সন্ন্যাসীদের আমি দুহাতে উপহার উপঢৌকনও দিয়েছ এবং সেবা

করেছি। তাদের সকল নির্দেশ ও চাহিদা পূরণ করেছি। আপনার মন্দিরের সকল মূর্তিগুলোকে আমি মণিমুক্তা-সোনা দিয়ে কারুকার্য করে তুলেছি এবং সবচেয়ে দামী সুগন্ধি দিয়ে গোসল করিয়েছি....

কিন্তু কোথায় আজ আমার সেইসব সেবার পুরস্কার? কোথায় আজ আমার সিংহাসন? কোথায় আমার রাজমুকুট, রাজত্ব? যে কন্নৌজ রাজের জয়গান গাইতো সারা হিন্দুস্তান, সেই রাজসিংহাসনের জাকজমকপূর্ণ দাপট এখন কোথায়? আমার মাথায় কেন এমন বুদ্ধি এলো যে, আমি কন্নৌজে মুসলিম বাহিনী প্রবেশের আগেই রাজত্ব ত্যাগ করে পালিয়ে এলাম? পালাতে আমাকে কে প্ররোচিত করলো?

"ধনরত্নের প্রতি অত্যধিক ভালোবাসাই আপনাকে রাজধানী ও সিংহাসন ত্যাগে প্ররোচিত করেছে মহারাজ? বললো পুরোহিত। তাছাড়া আপনি মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা করার মানসিক শক্তি ওদের সাথে মোকাবেলা না করার আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

"ওসব কথা রাখেন পণ্ডিতজী! আমার প্রশ্নের সত্যিকার জবাব আপনি দিতে পারবেন না। আমিও জানি না আমার প্রশ্নের জবাব কি হবে? বললেন রাজা রাজ্যপাল।

"পণ্ডিতজী! আজো পর্যন্ত আপনি আমাকে বুঝাতে পারেননি, সনাতন ধর্মটা আসলে কি? ধর্ম বলতে আমি শুধু এতটুকু বুঝেছি, কোন রাজা যদি কোন মন্দিরে যাতায়াত করে তাহলে প্রজারা তাকে ভালো জানে, তাকে ধর্মানুরাগী ভাবে। এই বয়সে আমি বুঝতে পেরেছি, ধর্মের নামে প্রজা সাধারণকে ধোঁকা দেয়া খুব সহজ। ক্ষমতাসীনদের হৃদয়ে ধর্মপ্রীতি থাক আর না থাক কিন্তু ধর্মানুরাগী ভাব দেখালেই প্রজারা বিগলিত হয়ে যায়। সারা হিন্দুস্তান জুড়ে কন্নৌজ রাজের প্রশংসা করার প্রধান কারণ হলো, আমার বাপদাদার আমল থেকে কন্নৌজের প্রধান মন্দিরের মূর্তিগুলোকে জাফরান মিশানো মেশকে আম্বর দিয়ে গোসল করানো হতো। বাপদাদার আমল থেকে চলে আসা এই ধর্মীয় রীতিকে আমিও চালু রেখেছিলাম। এজন্যই লোকেরা আমাকে কন্নৌজের যোগ্য উত্তরসূরী মনে করে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। আমি রীতি অনুযায়ী বছরে কয়েকবার বিশেষ অনুষ্ঠানে মন্দিরে পূজা দিতাম বটে কিন্তু এগুলো করতাম

নিছক প্রথা পালনের জন্যে। এই ধর্মের প্রতি কখনোই আমার কোন অনুরাগ ছিল না। সনাতন ধর্ম কখনো আমার অন্তরে প্রশান্তি দিতে পারেনি।"

"আপনি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন মহারাজ?"

'হ্যাঁ আমি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছি পণ্ডিত। পথভ্রষ্ট আমি আজ হইনি। আপনার কি স্মরণ নেই মথুরার প্রধান মন্দিরের প্রধান মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আপনাকে আমি বলেছিলাম, আমার সাথে আপনি কখনো ধর্ম নিয়ে কথাবার্তা বলবেন না। এসব দেবদেবীর নাম আমার সামনে উচ্চারণ করবেন না। হ্যাঁ, হিন্দু রাজা মহারাজাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোল এবং গযনীর সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, এ ধরনের কাজের কথা বেশী করে বলুন। এতে কিছু ফায়দা হলেও হতে পারে। কিন্তু ওসব কথায় তো কাজ হলো না। সম্মিলিত বাহিনী গঠন করেও তো শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে হলো। শুনেছি, লাহোরের মহারাজা জীবন্ত মানুষ জবাই করে দেবদেবীদের নামে উৎসর্গ করেছে। একটি যুবতী মেয়েকে বলি দিয়ে তার তাজা রক্ত দিয়ে দেবদেবীদের পা ধুইয়ে দিয়েছে কিন্তু তার পরও তো তারা মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়েছে।"

"আপনি যাই মনে করুন না কেন, আমাদের ধর্মের যাদুকরী প্রভাব আমি আপনাকে দেখিয়ে দেবো" বললো পুরোহিত।

"অনেক হয়েছে পণ্ডিতজী! আমাকে আর আপনার ধর্মের কারিশমা দেখাতে হবে না। আমি আপনার ধর্মের কারিশমা দেখে ফেলেছি। বললেন মহারাজা রাজ্যপাল।

"আমাকে একথাটি বুঝান তো, মুসলমানরা এতো দূর থেকে সামান্য কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে এসেছে, তাদের না আছে প্রয়োজনীয় রসদসামগ্রী, না আছে কোন সাহায্যের ব্যবস্থা। তারপরও কীভাবে একেরপর এক রাজ্য দখল করে নিচ্ছে। প্রতিটি যুদ্ধে তারাই বিজয়ী হচ্ছে? হিন্দুরা কেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরাজিত হচ্ছে? আমি জানি, আপনার কাছে এর কোন সদুত্তর নেই।"

কিন্তু আমি আপনাকে এর জবাব বলে দিতে পারি। আপনার হয়তো মনে আছে, একবার আমার লোকেরা একজন মুসলমান গোয়েন্দাকে ধরে এনেছিল। তখন আপনি আমার কাছেই ছিলেন। আমি সেই গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমাদের সেনাবাহিনী এবং তোমার সঙ্গীরা কোথায় আছে? এবং

তোমার সুলতানের পরবর্তী টার্গেটি কি? আপনার হয়তো মনে আছে, সে কি জবাব দিয়েছিলো।

"জী হ্যাঁ, আমার স্মরণ আছে। বললো পুরোহিত। সে বলেছিল, আমার শরীরকে যদি টুকরো টুকরোও করে ফেলো, তবুও আমি তোমাদের কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না। জবাব দেবো না।"

"এছাড়া সে কি আর কিছু বলেনি?" জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বললেন রাজা।

আমি তাকে সোনার বড় একটি টুকরো দেখিয়েছিলাম, সেটি তাকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, রাজমহলের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটাকে তার সাথে বিয়ে দেয়ার লোভ দেখিয়েছিলাম। এমনকি সুন্দরী এক মেয়েকে তার কাছে পাঠিয়েও দিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুতেই সে প্রলুব্ধ হচ্ছিল না। বরং সে বিদ্রূপের হাসি হেসে বলেছিল, "মহারাজা! এসব সোনাদানা দিয়ে আমার ঈমান খরিদ করতে পারবেন না। এমন নোংরা বহুগামী নর্তকী দিয়ে আমাকে বিভ্রান্ত করতেও পারবেন না। ঈমানকে এসব দিয়ে কেনা যায় না। আমার প্রভুর কাছে আমি এসবের চেয়ে অনেক বেশী পুরস্কার পাবো, ন্যূনতম সত্তরজন কুমারী সুন্দরী নারী আল্লাহ আমাকে দেবেন। তাছাড়া মণিমুক্তা হীরা জহরাত দিয়ে সাজানো একটি প্রাসাদ আমাকে দেয়া হবে। আপনার এক টুকরো সোনা দিয়ে আমি এত বড় পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হতে পারি না। এটাই আমার ঈমান ও বিশ্বাস।

এরপর আপনি একটি বাক্স নিয়ে এলেন। এটির মধ্যে ছিল একটি বিষাক্ত সাপ। আপনি বিষাক্ত সাপটি দেখিয়ে বলেছিলেন, তুমি যদি কথা না বলো, তাহলে আগামীকাল একটি বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ করে এই সাপটি ছেড়ে দেয়া হবে। বিষাক্ত সাপটি তোমাকে ছোবল দেবে, বিষাক্ত সাপের একের পর এক দংশনে তোমাকে ধুকে ধুকে মরতে হবে। কিন্তু তাতেও সেই গোয়েন্দার মধ্যে সামান্যতম ভাবান্তর দেখা গেলো না। সে বরং আপনার হুমকির জবাবে বলেছিলো, "দুনিয়ার কোন সাপ বিচ্ছু ঈমানকে ছোবল দিতে পারে না।"

তখন আমি রেগে গিয়ে বলেছিলাম, ঠিক আছে আগামীকালই দেখা যাবে ঈমানকে বিষাক্ত সাপ ছোবল দিতে পারে কি-না।.......

এর পরদিন আপনি একটি ছোট্ট কক্ষে তাকে আটকে বিষাক্ত সাপটি কক্ষে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। লোকটি বিষাক্ত সাপের দংশনে ছটফট করতে করতে মারা

গেল কিন্তু একটিবারও বাঁচার জন্য উহ্ শব্দটা পর্যন্ত করলো না। তার সেনাবাহিনী সম্পর্কে কোন কথা বললো না।

"হ্যাঁ মহারাজা! আমার মনে আছে আমিই তাকে একটি কক্ষে ভরে বিষাক্ত সাপ দিয়ে হত্যা করেছিলাম।"

"এটাই তো মুসলমান! আর এমনই হলো তাদের ঈমান। আছে হিন্দুদের মধ্যে এমন কেউ? পণ্ডিতজী! ঈমান জিনিসটা কি?"

"আমরা যেটাকে ধর্ম বলি, এটাই হচ্ছে ঈমান", বললো পুরোহিত। এমন ঈমান আমাদের মধ্যেও সৃষ্টি হতে পারে।

"সবই কথার কথা পণ্ডিত মশাই, সবই ফাঁকা বুলি" বললেন, মহারাজা রাজ্যপাল। "আপনি শুধুই কথায় কথায় ধর্মের দোহাই দেন। সারাক্ষণ ধর্ম ধর্ম জপেন। আর সাপ নিয়ে খেলা করেন। আপনি সাপ ধরে সাপকে বশ মানাতে এবং সাপকে পালতে পারেন। মূলত এগুলো সাধারণ মানুষকে চমক দেখানোর খেলা মাত্র। এসবের মধ্যে ধর্মের কিছু নেই।

মহারাজা রাজ্যপাল সর্বপ্রথম যখন তার ধনভাণ্ডার গুপ্ত স্থানে লুকানোর চেষ্টা করছিলেন তখন সুলতান মাহমূদ খুবই সতর্কতার সাথে তার সেন্যদের নিয়ে কন্নৌজের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সুলতানকে বলা হয়েছিল, কন্নৌজে তাকে সবচেয়ে কঠিন মোকাবেলার সম্মুখীন হতে হবে। কোন গোয়েন্দা তাকে বলতে পারেনি, প্রকৃতপক্ষে কন্নৌজে কোন মোকাবেলা হবে না। মহারাজা রাজ্যপাল মাত্র কয়েকজন সৈন্য রাজধানীতে রেখে নিজে রাজ্য ত্যাগ করবেন এটা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। এটা কেউ চিন্তাও করেনি যে, সাধু বেশধারী এই পুরোহিত চক্রান্ত করে সুলতান বা তার সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হত্যার নীল নক্সা করেছিল।

পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, প্রথম যখন এই পুরোহিত রাজার সম্পদ লুকাতে যায় তখন গযনীর দুই গোয়েন্দা তা দেখেছিল। লোভে পড়ে একজন মারা গিয়েছিল কিন্তু অপরজনের সাথে পুরোহিতের অনেক কথা হয়। সেই সূত্রেই পুরোহিত গোয়েন্দাকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয় যে, কন্নৌজে কয়েক মহারাজার সৈন্য একত্রিত হয়েছে, এখানে তোমাদের বাহিনী এলে সবাইকে হিন্দু সৈন্যরা পিষে ফেলবে।

গোয়েন্দা সালেহ সেই সংবাদকে সত্য মনে করে সুলতানকে এই খবর দিয়ে আরো বেশী সতর্ক হতে পরামর্শ দিয়েছিলো। ফলে সুলতান অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চতুর্দিক বিবেচনা করে গুণে গুণে প্রতিটি কদম ফেলেছিলেন। এই ফাঁকে মহারাজা রাজ্যপাল কন্নৌজ থেকে পালানোর সুযোগ পেয়েছিলেন। পুরোহিত চেয়েছিলো, একটা সময়ে সে রাজ্যপালকে যুদ্ধে প্ররোচিত করতে পারবে। কিন্তু রাজ্যপাল যুদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। সুলতান মাহমূদ যদি তার স্বভাবসুলভ দ্রুতগতিতে কন্নৌজের দিকে অগ্রসর হতেন, তাহলে রাজ্যপাল ফেরার হওয়ার আগেই তিনি কন্নৌজ পৌঁছে যেতে পারতেন। কিন্তু পুরোহিতের বিভ্রান্তিকর তথ্য সুলতান মাহমূদকেও প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়। তিনি সম্ভাব্য কঠিন মোকাবেলার প্রস্তুতিস্বরূপ খুব সতর্ক ও সচেতনভাবে ধীর-স্থিরভাবে অগ্রসর হচ্ছিলেন। যাতে দ্রুততার কারণে শত্রুপক্ষ মুসলিম বাহিনীর কোন ক্ষতি করতে না পারে।

অবশেষে রাজা রাজ্যপাল ও পুরোহিত তাদের লুকানো ধনরাজী তাদের কাঙ্ক্ষিত ঠিকানা পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম হলো। রাজ্যপাল যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে প্রাকৃতিক ভাবেই একটি গর্তের মতো জায়গা ছিলো। সেটিকে আরো খনন করে এবং আরো গভীর করে রাতের বেলায় রাজ্যপালের নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যে অতি বিশ্বস্ত চার পাঁচজনকে দিয়ে সেই গর্তে ধনরত্ন রাখা হলো।

এর পরবর্তী রাতে রাজ্যপালের তাঁবুতে জমজমাট নাচগানের আসর বসলো। শরাবের আয়োজন রাজার সাথেই ছিলো। রাতের অন্ধকারে প্রচুর মশাল জ্বালিয়ে বিজন জঙ্গল ভূমিকে রাজপুরী বানিয়ে ফেলা হলো। বাদক দলের বাজনার তালে তালে রাজার বিশেষ নর্তকীরা দেহ উজাড় করে নাচলো গাইলো। রাজার সকল নিরাপত্তারক্ষীকেই প্রচুর পরিমাণে উপহার উপঢৌকন দেয়া হলো। বিশেষ করে যারা ধন-রত্ন লুকানোর কাজে জড়িত ছিলো তাদেরকে রাজ্যপাল বিপুল পরিমাণ সোনাদানা দিয়ে খুশী রাখতে চাইলেন। কারণ, এখন রাজ্যপালের জীবন সম্পদ তাদের বিশ্বাস ও আস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

রাতের এই আসরে দু'জন লোক অনুপস্থিত ছিলো। একজন পণ্ডিত আর দ্বিতীয়জন তার প্রথম ও প্রধান রাণী। মহারাজা রাজ্যপাল এই দুজনের

অনুপস্থিতিকে কিছুই মনে করেননি। পুরোহিত তার তাঁবুতে পূজা-অর্চনায় লিপ্ত ছিলো। সে ছোট দু'টি পুতুলের মতো মূর্তি তার সাথে নিয়ে এসেছিল। পুরোহিত যখন পূজায় মগ্ন এমন সময় রাণী তার তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। বড় রাণীর দেহে বার্ধক্যের ছাপ পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। মহারাজা এই রাণীকে বেশ গুরুত্ব দিতেন, যেহেতু রাজার স্থলাভিষিক্ত রাজকুমার লক্ষণ পালের জন্মদাতা মা তিনি। রাণী এসে পুরোহিতের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন।

"মহারাণী! আপনি কি বুঝতে পেরেছেন মহারাজার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি? রাণীকে জিজ্ঞেস করলো পুরোহিত। এটা কি আনন্দ উৎসব আর শরাব পান করে নর্তকী নাচানোর সময়?"

"না আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এখন আমি মহারাজাকে নিয়ে ভাবছি না। আমার সকল মনোযোগ এখন রাজকুমারকে কেন্দ্র করে। আমার কলিজার টুকরো রাজকুমারের ভবিষ্যত অন্ধকার। বারী এখনো আমাদের হাতে আছে। ইচ্ছা করলে আমরা একে কন্নৌজের মতো রাজধানীতে রূপান্তরিত করতে পারি। কারণ, কন্নৌজ আর আমাদের পক্ষে ফিরে পাওয়া অসম্ভব। ..... আমি তো মনে করছি মহারাজার মাথা বিগড়ে গেছে। আমি তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলেই তিনি আমাকে ধমকে দেন।

"তোমার সাথে রাজনীতির কি সম্পর্ক? পণ্ডিত মহারাজ! এ সময়ে আপনি কি কিছু করতে পারেন না? আপনি যাদুটোনা করে কিছু একটা দেখান না। আপনার তো অনেক ক্ষমতা আছে।"

"হ্যাঁ, রাণী। আমিও তাই ভাবছিলাম। মহারাজার চিন্তা চেতনাকে কাবু করতে হবে। বললো পুরোহিত। আমি হিসাব করে দেখেছি, দেবীর চরণে একটি নর বলি দেয়া দরকার। একটি কুমারীর রক্ত ঝরাতে হবে।"

"কুমারী মেয়ে কোথায় পাওয়া যাবে?"

"তেমন মেয়ে আমি দেখেছি। ওই যে সবচেয়ে ছোট নর্তকীটা আছে না, যার নাম নদী।"

"আপনি তাই করুন। আপনি যখন চাইবেন তখনই ওকে বলি দিতে পারেন। ও সুন্দরী ও তরুণী। হ্যাঁ এমন মেয়েকেই নর বলি দেয়া উচিত। বললেন রাণী।

* * *

বারী কন্নৌজ থেকে দুই তিন দিনের দূরত্বে গঙ্গা নদীর তীরবর্তী একটি জনপদ। এলাকাটি ছিল কন্নৌজের অধীনস্থ। অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, কন্নৌজ ত্যাগ করে কিছুদিন দুর্গম জঙ্গলে স্বেচ্ছা নির্বাসনে কাটানোর পর মহারাজা রাজ্যপাল বারীকে তার রাজধানী করেছিলেন এবং তার ছেলে লক্ষণপালকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। লক্ষণপাল সেখানে গিয়ে বারীকে পরিপূর্ণ রাজধানীতে পরিণত করার জন্যে বিভিন্ন ধরনের ইমারত নির্মাণ করেছিল। মহারাজা রাজ্যপাল আগেই তার সেনাবাহিনীকে বারী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাসনে থাকাবস্থায় তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না আসলে তিনি কি করবেন। কারণ, সুলতান মাহমূদের আতঙ্ক তার মনে ভূতের মতোই গেড়ে বসেছিলো। ঐতিহাসিক আলজওযী তো একথাও লিখেছেন, পর্দার অন্তরালে মহারাজা রাজ্যপাল ইসলাম গ্রহণের প্রতিও আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

স্বেচ্ছা নির্বাসনে মহারাজার প্রায় মাস দুয়েক কেটে গেছে। এ সময় একরাতের ঘটনা। হঠাৎ করে আকাশে গর্জন শোনা গেল। সেই সাথে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে এলো। শুরু হলো তীব্র বাতাস। এ সময় পণ্ডিত তার তাঁবুতে পূজা অর্চনায় লিপ্ত ছিল। হঠাৎ এক সময় ধারে কাছেই কোথাও বজ্রপাত ঘটলো এবং বিদ্যুৎ চমকানোর তীব্র আলোয় সবার চোখে অন্ধকার নেমে এলো। ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলকে জঙ্গলকে মনে হচ্ছিলো ধবধবে সাদা আলোয় আলোকিত ময়দান। এমন প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত শুরু হলো, মনে হচ্ছিল আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি শুরু হয়েছে। এ সময় মহারাজা রাজ্যপাল ছিলেন সেই গর্তে যে গুহায় তিনি তার সমস্ত সহায় সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন। তিনি যখন তার তাঁবুর দিকে রওয়ানা হলেন, তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি আর ঝড়ো হওয়ার কারণে তার পক্ষে আর সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হলো না।

এমন ঝড়ো বৃষ্টি শুরু হলো, যেন আসমান ফেটে পড়েছে। তীব্র বৃষ্টির মধ্যে ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলকানী আর বজ্রপাতে সবারই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠছিল। গুহার ভেতরে একটি মশাল জ্বলছিল, আর গুহার বাইরে তার বেঁধে রাখা ঘোড়াগুলো ভয় আতঙ্কে হ্রেষারব শুরু করছিল। ঠিক এ সময় পুরোহিত গুহায় ঢুকে ভেতরে চলে গেল। পুরোহিত রাজাকে বললো–

"আমি বৃষ্টি শুরু হতেই আপনার তাঁবুতে গিয়েছিলাম। সেখানে আপনাকে না পেয়ে এখানে এসেছি। আপনার জন্যে সব সময়ই আমার মন উদ্বিগ্ন থাকে।

দেখতে দেখতে বৃষ্টির জোর আরো তীব্রতর হলো। এমন অবস্থা ঘণ্টাখানিক চলার পর গুহার বাইরের লোকজনের মধ্যে চিৎকার চেচামেচি শুরু হলো। বেঁধে রাখা ঘোড়া ও গাধাগুলো আতঙ্কে তীব্র হ্রেষারব শুরু করে দিল। গুহার বাইরে লোকজনের মধ্যে শুরু হলো দৌড়ঝাপ। ঝড়ের শনশন আওয়াজ আর বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ আর মানুষের আর্তচিৎকার মিলে তৈরী হলো ভয়ানক এক অবস্থা। এ সময় চিৎকার চেচামেচির সঙ্গে কানে ভেসে এলো- বন্যা এসে গেছে, ঢল নেমেছে, তাঁবুর খুঁটিগুলো উপড়ে ফেলো...।

বাইরের শোরগোল শুনে গুহার মুখ থেকে রাজা ও পণ্ডিত দেখতে পেলেন, ঠিকই পানি গুহার দিকেও গড়িয়ে আসছে। সেই সাথে ভয়ানক বিদ্যুৎচমক ও বজ্রপাতের শব্দ। এর মধ্যে লোকজন দিগ্বিদিক দৌড়াচ্ছে।

এক সময় লক্ষণপাল দৌড়াতে দৌড়াতে গুহার মধ্যে এসে পড়ল। গুহাটি ছিল দুটি পাহাড়ের মাঝখানে। তাদের জানা ছিল নীচের এলাকাটিতে উপর থেকে বন্যার মতো পানি নেমে আসে। দেখতে দেখতে পানির স্রোত আরো বেড়ে গেলো। এ অবস্থায় মহারাজার নিরাপত্তা রক্ষীরা জীবন বাঁচানোর জন্যে উঁচু জায়গার দিকে দৌড়াচ্ছিল।

এক সময় গুহার ভেতরেও পানি প্রবেশ করতে শুরু করলো। কিন্তু গুহার মুখ উঁচু থাকার কারণে ভেতরে বেশী পানি প্রবেশ করলো না।

এমন সময় পুরোহিত মহারাজার উদ্দেশ্যে বললো-

"মহারাজ! এটাই হরিহরি মহাদেবের ক্রোধ। মহাদেবের কাছে আত্মসমর্পণ করুন, ক্ষমা চান, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন। আপনি কি জীবনে কখনো এমন বৃষ্টি দেখেছেন?"

"মহারাজা পুরোহিতের কথা শুনে অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়লেন। উন্মাদের মতো হাসি। দীর্ঘ অট্টহাসি হেসে তিনি বললেন, আরে এই বৃষ্টি আমার কি ক্ষতি করবে, এই বিদ্যুৎচমক আর বজ্রপাত আমার কি ধ্বংস করবে? নিয়ে যাও তোমার এসব ধন-সম্পদ।

রাজার কথা শুনে পুরোহিত বৃষ্টি ও তুফানের মধ্যে গলা চড়িয়ে বললো, "আপনার কি হয়েছে মহারাজ! বাইরে দৈত্য-দানব চিৎকার করছে এটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করুন। দেবতার এই ক্রোধকে অনুভব করার চেষ্টা করুন। আমি যা বলি তা করুন, হাত জোর করে ক্ষমা ভিক্ষা চান, আমি মুখে যা আওড়াচ্ছি আপনিও তা বলতে থাকুন।

পুরোহিতের কথা শুনে মহারাজা আরো হাসলেন। অনতি দূরে দাঁড়ানো নওজোয়ান দু'সাহসী যোদ্ধা লক্ষণপাল ভয়ে আতঙ্কে কী যেন বিড়বিড় করে বলছিল আর দু'হাত লম্বা করে দেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছিল। হঠাৎ সে আর্তচিৎকার করে বলে উঠলো—

"ওই যে দেখো, এটা কি আসছে...?

মহারাজা ও পুরোহিত একই সঙ্গে গুহার সম্মুখের দিকে তাকালে দেখতে পেলেন বিশাল এক অজগর যার মাথাটা একটা গরুর মাথার মতো বিশাল, গুহার ভেতরের দিকে ঢুকছে। লক্ষণপালের হাতে তরবারী ছিল সে তরবারী কোষমুক্ত করে ফেলল। অজগরটি খুব ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে গুহার ভেতরের দিকে আসছিল। হয়তো পানির স্রোত সেটিকে আপন ঠিকানা থেকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে। এ ধরনের অজগর সাধারণ স্যাঁতসেতে কাদাপানিতে থাকে। যদি সেখানটায় আহার না পাওয়া যায় তাহলে ডাঙ্গায় চলে আসে। এ ধরনের অজগরের স্বভাব হলো এরা জীবন্ত মানুষ কিংবা জীবন জন্তু আস্ত গিলে ফেলে। এরপর দুই তিন মাস পর্যন্ত আর কোন আহার করে না। ঠাঁয় পড়ে থাকে।

অজগরটি লম্বায় অন্তত দশ হাত হবে। লক্ষণপাল যখন সেটিকে মারার জন্যে তরবারী কোষমুক্ত করে প্রস্তুতি নিল তখন পুরোহিত তাকে আঘাত না করার নির্দেশ দিলো। মহারাজা রাজ্যপাল সাপ দেখে নিজ অবস্থান থেকে কয়েক কদম পিছনে সরে এলেন। পুরোহিত কালবিলম্ব না করে মশালটিকে হাতে নিয়ে অজগরটির সামনে তুলে ধরলো। অজগরটি তখনো পুরোপুরি গুহায় প্রবেশ করেনি।

পুরোহিত জানতো এ ধরনের অজগর বিষাক্ত নয়, এরা ছোবল মারে না। ক্ষুধা পেলেই কেবল আহার করতে কোন জীবজন্তুকে গিলে ফেলতে চেষ্টা

করে।

মহারাজা তখন পুরোহিতকে বললেন, পণ্ডিতজী মহারাজ! আপনি তো সাপ ধরতে এবং নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারদর্শী? এটিকেও কি আপনি কাবু করতে পারবেন?"

পুরোহিত তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল অজগরের দিকে। পুরোহিত অজগর ও নিজের মধ্যে মশাল দিয়ে একটি আড়াল সৃষ্টি করেছিল। এ অবস্থাতেই পুরোহিত মহারাজার দিকে না তাকিয়েই বললো, মহারাজ! এটি যদি পৃথিবীর অজগর হয়ে থাকে তবে আমি অবশ্যই এটিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারবো। কিন্তু মহারাজ! এটি সাধারণ কোন অজগর সাপ নয়, এটি দেবতা। এরপর পণ্ডিত একটি মন্ত্র বলে মহারাজাকে এটি আওড়াতে বললো। সেই সাথে বললো, মহারাজ! হরি কৃষ্ণ আপনার দ্বারা বড় ধরনের কোন কাজ নিতে চান।

কিছুটা ভীতবিহ্বল অবস্থায় মহারাজা ও লক্ষণপাল পুরোহিতের মন্ত্র আওড়াতে থাকল। পণ্ডিত মশালের হাতল ধরে আগুনের শিখাকে অজগরের মুখের সামনে ধরে রাখল। এর ফলে অজগরটি সামনে অগ্রসর না হয়ে সেখানেই কুণ্ডলী পাকাতে শুরু করল। ফাঁকে ফাঁকে অজগরটি মাথা উঁচু করে এদিক ওদিক দেখতে চেষ্টা করছিল। পুরোহিত লক্ষণপালকে বললো, গুহার ভেতরে মোটা একটা রশি আছে সেটা নিয়ে এসো।

লক্ষণ দৌড়ে গুহার ভেতরে গিয়ে সেখান থেকে মোটা লম্বা একটি রশি এনে পুরোহিতের হাতে ধরিয়ে দিল। রশি আনার পর পুরোহিত লক্ষণপালকে মশালটি দিয়ে বললো, এটি সাপের সামনে ধরে রাখবে। পুরোহিত রশিটি দিয়ে ফাঁদ তৈরী করল। অজগর মশালের কারণে সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। অজগর যখন আবার মাথা উঁচু করল পুরোহিত তখন রশির তৈরী ফাঁদ অজগরে মাথার উপর দিয়ে নিক্ষেপ করলে অজগরের মাথা ফাঁদে আটকে গেল। এবার পুরোহিত রশি টান দিল। তাতে ফাঁদ আটকে অজগরের মুখ খুলে গেল এবং অজগরের বিশাল দেহ কাঁপতে শুরু করল। পুরোহিত তখন এক লাফে অজগরের উপর উঠে পড়ল এবং রশিটি টেনে শক্ত করে সাপের কুণ্ডলী পাকানো শরীর বেধে ফেলল। এবার সাপটির আর নড়াচড়া করার ক্ষমতা থাকল না। পুরোহিত ঠিকই সাপকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিল।

এক পর্যায়ে বৃষ্টির তীব্রতা কমতে শুর করল। পুরোহিত নানা কথায় মহারাজাকে বুঝাতে চেষ্টা করল এটি সাপ নয় সাপের রূপ ধারণ করে দেবতা এসেছেন। সব শুনে মহারাজা নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। পুরোহিত তাকে বললো, আপনার আর বাইরে বের হওয়ার দরকার নেই। বাইরের পরিস্থিতি আমরা সামলাবো। আপনি গুহার ভেতরেই শুয়ে বিশ্রাম নিন, আরামে একটু ঘুমিয়ে নিন।

* * *

পরদিন সূর্য যখন অনেক উপরে ওঠে গেছে তখন মহারাজার ঘুম ভাঙল। তিনি চোখ খুলে গুহার চতুর্পাশটা দেখলেন। সেখানে তখন পণ্ডিত ছিল না, পুরোহিতের রশিতে বাধা সাপও ছিল না। লক্ষণপালকে গুহার কোথাও দেখা গেল না।

অনেকক্ষণ পর পুবোহিত গুহায় প্রবেশ করলে মহারাজা জিজ্ঞেস করলেন, "গত রাতের অজগর সাপটি কি মেরে ফেলা হয়েছে?"

"এটি অজগর নয় মহারাজা! এটি দেবতা! বললো পুরোহিত। দেবতা আপনাকে সে কথাই বলতে এসেছিলেন যে কথা আমি দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি। শুরুতে আমিও অজগরটিকে সাপই মনে করেছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, এতো বড় অজগরকে বশে আনা কোন মানুষের সাধ্যের ব্যাপার নয়। আমি দেবতার ইঙ্গিত পেয়ে সেটিকে রশি দিয়ে বেধে ফেলি যাতে আপনারা আতঙ্কিত না হন।

আপনি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তখন রাজকুমারও চলে গেলেন। নির্জন পরিবেশ পেয়ে অজগর রূপধারণকারী দেবতা আমাকে তার আসল রূপ দেখাল। আমি তার সাথে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেবতা আমাকে বললেন, মন্দিরের ধ্বংস এবং আমাদের অবমাননা বন্ধ করাও এবং এর কঠিন প্রতিশোধ নাও। আমরা খুবই কষ্ট পাচ্ছি। আমরা যখন মর্তে আসি তখন বিদ্যুৎ চমকে চমকে আমাদের পথ দেখায় এবং বৃষ্টি আমাদের পথ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেয়। আমরা এসব বিদ্যুৎপাত ও বজ্রপাত মুসলমানদের উপরও ফেলতি পারি কিন্তু আমরা তা না করে তাদেরকে সনাতন ধর্মে ফিরে আসার অবকাশ

দেই...। দেবতা আমাকে জোর দিয়ে বলেছেন, তুমি তোমার রাজাকে বলো, রাজধানী থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে আযানের ধ্বনি বন্ধ করতে। আযানের আওয়াজের কারণে আমরা খুবই অশান্তি বোধ করছি।"

"আচ্ছা! আপনার দেবতা পরে কোথায় চলে গেলেন?"

"যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানেই চলে গেছেন।" জবাব দিলো পুরোহিত। আমি তার পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেছি। আপনার পক্ষ থেকেও ক্ষমার জন্যে আমি তার কাছে করজোড় নিবেদন করেছি। কিন্তু তিনি আপনার প্রতি খুবই নারাজ। তিনি বলেছেন, তার সৃষ্টি বিদ্যুৎপাত এখানকার পাহাড় পবর্ত পুড়ে ফেলার জন্যে এসেছিল। আমাদের সবাইকে জ্বালিয়ে ভষ্ম করতে এসেছিল। দেবতা বলছিলেন, তোমাদের রাজার ধন-সম্পদ মাটি চাপা দেয়া উচিত। যাতে আর কোনভাবেই উদ্ধার করতে না পারে। কিন্তু আমি এসব শুনে তার পায়ে পড়ে নিবেদন করেছি, বহু অনুনয় বিনয় করে তাকে রাজি করিয়েছি। অবশেষে তিনি একটি নর্তকীর বলিদানের বিনিময়ে আমাদের ধ্বংস করা এবং আপনার ধন-রত্ন মাটি চাপা দেয়া থেকে বিরত রইলেন। তার ইঙ্গিতে বলিদানের জন্যে আমি নর্তকীও নির্বাচন করে ফেলেছি।

"কোন নর্তকী!' জানতে চাইলেন মহারাজা।

"নদী।"

"না। তা হবে না পণ্ডিতজী! আমি কোন অবস্থাতেই নদীকে নরবলি হতে দেব না।"

"আপনি গযনীর সুলতানের মোকাবেলা করতে পারেন নি; সেখানে আপনি দেবতাদের মোকাবেলা কি ভাবে করবেন?" উষ্মামাখা কণ্ঠে বললেন মহারাণী। দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে নদীকে বলি দিতেই হবে?"

"তুমি চুপ থাকো, ধমকে উঠলেন মহারাজা।"

"পতি কোন দেবতা না কিন্তু দেবতা পতি হতে পারে, আমাকে দেবতাদের নির্দেশ মানতে পতির বিরুদ্ধাচরণ হলেও তা করতে হবে।" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন মহারাণী।

"পিতা মহারাজ! আমাকে আপনি তরবারী চালনা শিখিয়েছেন, ছেলের তরবারীতে পিতার মাথা দ্বিখণ্ডিত হোক আমাকে সে রকম কাজে বাধ্য করবেন

না।" কাছেই দাঁড়ানো রাজপুত্র লক্ষণপাল তার বাবার উদ্দেশ্যে দৃঢ়কণ্ঠে বললো। কোন সুপুত্র পিতার পথভ্রষ্টতার জন্যে তার দেশ জাতি ও ধর্মকে বিসর্জন দিতে পারে না। পণ্ডিতজী যা বলছেন তাই হবে।"

পিতা মহারাজ! আমি ভালো করেই জানি, আপনি আপনার ধর্মত্যাগ করেননি কিন্তু আপনি গযনী সুলতানের ভয়ে এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন যে, আপনার মনমস্তিষ্ক থেকে এই আতঙ্ক দূর করতে পারছেন না।"

মহারাজা রাজ্যপাল যখন রাণী ও একমাত্র পুত্রের চরম সীমাহীন ঔদ্যত্য এবং তাদের কণ্ঠে জীবনের হুমকি উচ্চারিত হতে দেখলেন তখন চুপসে গেলেন। তিনি আর কোন কথাই বললেন না। তিনি পণ্ডিতের কাছে একথাও জিজ্ঞেস করার সাহস পেলেন না, দেবতাগণ শুধু তাকেই ধ্বংস করার শপথ কেন নিয়েছে? মথুরা কন্নৌজের চেয়েও পবিত্র নগরী ছিল। সেটা কৃষ্ণমহারাজের জন্মভূমি। থানেশ্বরের মন্দির ও হিন্দুদের কাছে একটি পবিত্র জায়গা ছিল। সেখানে এখন শাখা ঘণ্টার ধ্বনির বদলে আযানের ধ্বনি গুঞ্জরিত হচ্ছে, কিন্তু দেবতারা তো সেখানকার কোন রাজাকে অজগর সেজে এসে ভয় দেখাননি?"

মহারাজা প্রত্যক্ষ করলেন, তার রাণী ও রাজকুমারের উপর দেবতাদের ক্রোধের আতঙ্ক গেড়ে বসেছে। তখন আর কোন কথা না বলে তিনি যে গুহার ভেতরে তার ধনরত্ন রেখেছিলেন সেখানে চলে গেলেন।

এই তো হলো হিন্দুদের ধর্ম। কন্নৌজের প্রধান মন্দিরের সামনের বিজয়ী কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছিল এই ধ্বনি। এই আওয়াজ ছিল সেই প্রধান খতীবের যিনি সুলতান মাহমূদের সাথে গযনী থেকে এসেছিলেন।

গযনীর সৈন্যদের সাথে সব সময়ই কিছুসংখ্যক ইমাম ও ধর্মীয় পণ্ডিত ব্যক্তি থাকতেন। তারা সৈন্যদের নামাযের ইমামতি করতেন এবং সৈন্যদের ধর্মীয় বিধিবিধান সম্পর্কে অবহিত করতেন।

গযনীর খতীব কন্নৌজের প্রধান মন্দিরের বেধিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল ভাঙা মূর্তির টুকরো। আর তার সামনে ছিল গযনীর বিজয়ী সৈন্যদের একটা অংশ। তার পেছনে কন্নৌজের বন্দী সৈন্যরা দাঁড়িয়ে ছিল।

খতীব জলদগম্ভীর কণ্ঠে আবারো উচ্চারণ করলেন, বন্ধুগণ! দেখে নাও, এই হলো হিন্দুদের ধর্ম। ওদের পূজনীয় মাটি পাথরের দেব-দেবী ভাঙা টুকরো এখন তোমাদের পায়ের নীচে। আল্লাহ্ এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তোমরা কোন রাজ্য জয় করার জন্যে কিংবা লুটপাট, মারামারি করার জন্যে এখানে আসোনি। তোমরা এখানে এসেছো, এই বাতিল ধর্মের শিকড়সহ উপড়ে ফেলতে। হয়তো তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এজন্য আমরা হিন্দুস্তানকে কেনো বাছাই করেছি? এর জবাব হলো, আরব দেশের এক ক্ষণজন্মা বীর মুজাহিদ মুহাম্মদ বিন কাসিম নির্যাতিতা একজন মুসলমান তরুণীর আহ্বানে ভারতে এসেছিলেন। তিনি নির্যাতিতা তরুণীকে উদ্ধার করতে এসে এখানকার এক জালেম অত্যাচারী রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি এখানকার অধিবাসীদের জন্যে ত্রাস ও আতঙ্ক হয়ে বিরাজ করেননি। তিনি ও তার সঙ্গীরা এদেশের মানুষের কাছে এ সত্য প্রমাণ করেছিলেন, মুসলমানদের তরবারী পাহাড়ের চূড়া কেটে ফেলতে পারে কিন্তু তাদের আচার-ব্যবহার পাথরকেও মোমের মতো গলিয়ে দিতে পারে...।

মুহাম্মদ বিন কাসিম এখানকার পাথরসম কঠিন মনের অধিকারী পৌত্তলিকদের হৃদয় গলিয়ে তাদের অন্তর জয় করেছিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম এখানকার পাথরদিল মানুষগুলোকে মোমে পরিণত করেন, ফলে এখানকার মূর্তিগুলো নিজ থেকেই ধ্বংস হতে শুরু করে। হিন্দুরা মুহাম্মদ বিন কাসিম ও তার সঙ্গীদের উত্তম চরিত্র, বৈষম্যহীন সাম্যের নীতি, আদর্শিক জীবন এবং উচ্চ মানসিকতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখে যুগের পর যুগ ধরে চলে আসা নিষ্পেষিত নির্যাতিত হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হতে শুরু করে। ফলে ভারতের পশ্চিম উত্তরাংশের মানুষ ইসলামের আলোয় আলোকিত হলো। একই সাথে ইসলামের আলো গোটা ভারত জুড়ে বিকশিত হতে শুরু করে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুসলিম কেন্দ্রীয় শাসকের মধ্যে এমন পরিবর্তন সাধিত হলো যে, ইসলামের বীর মুজাহিদ দিগ্বিজয়ী অবিস্মরণীয় বিন কাসিম কেন্দ্রীয় শাসক তাকে অপরাধী বানালো। মুহাম্মদ বিন কাসিম এক লম্পট খলিফার ব্যক্তিগত শত্রুতার শিকারে পরিণত হলেন।

বিন কাসিম হিন্দুস্তান ত্যাগ করার পর এখানকার হিন্দু শাসকরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো এবং হিন্দুদের ক্রমবর্ধমান প্রাবল্যে এক সময়

মসজিদগুলো পুনরায় মন্দিরে রূপান্তরিত হতে শুরু করলো। সেই সাথে হিন্দু শাসকরা এখানকার মুসলমানদের জীবন সংকীর্ণ করে তুললো। অবস্থা এমন হলো যে, মুসলমানদের জীবন ধারণই হয়ে পড়লো কঠিন। হিন্দুরা মুসলিম নিধনকে মিশন হিসেবে গ্রহণ করলো। ফলে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ নওমুসলিমরা আবারো পৌত্তলিকতায় ফিরে গেলো। আর প্রকৃত মুসলমানরা জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন হলো.......।

গযনীর বীরযোদ্ধা ভাইয়েরা! তোমরা শুধু গযনীর পতাকা বহন করছো না, তোমরা ইসলামের পতাকা বহন করছো। যে জমিন এক সময় দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছিল সেটি পুনরায় দারুল কুফরে পরিণত হলো। সত্যের উপর মিথ্যা বিজয়ী হতে শুরু করলো।

তোমরা পৌত্তলিকতা কী জিনিস সেটি বুঝতে চেষ্টা করো। হিন্দু জাতি সাপের মতো। বিষধর সাপের মতোই এদের স্বভাব। এরা সাপকে পূজা করে। এরা আল্লাহর একক সত্তা সম্পর্কে কোনই ধারণা রাখে না। যে গঙ্গা ও যমুনা নদীকে তোমরা কয়েকবার এপার ওপার করেছো, এই নদী দুটিকেও এরা দেবতা মনে করে। এই নদী দু'টির অপরিষ্কার পানিকেও এরা পবিত্র মনে করে পূজা করে। এরা গঙ্গা যমুনায় গোসল করে মনে করে গঙ্গা যমুনার পানি সব পাপকে ধুইয়ে ফেলেছে। আকাশের বিদ্যুৎপাত বজ্রপাতকে দেবতার ক্রোধ বলে বিশ্বাস করে এবং সে সময় হিন্দুরা মন্দিরের ঘণ্টা বাজাতে শুরু করে। কোন বড় অজগর সাপ দেখলে সেটিকে পূজা করতে থাকে। হিন্দু নামের জ্ঞানপাপীগুলো তাদের দেবদেবীদের খুশী করতে জীবন্ত তরুণী কিশোরীকে হত্যা করে দেবতার নামে উৎসর্গ করে দেবতাদের খুশী করতে চেষ্টা করে। তোমরাই বলো, মানুষের রক্তে পাথরের মূর্তির পা ধোয়াকে কি কোন সজ্ঞান মানুষ সমর্থন করতে পারে? এটাকে কি আদৌ ইবাদত বলা যায়?........

ইসলামের সৈনিকেরা! তোমরা এখানে হিন্দু পুরোহিত পণ্ডিতদের এই মূর্খতার মূলোচ্ছেদ করতে এসেছো। তোমরা যদি এই জমিন থেকে পৌত্তলিকতা সমূলে উৎখাত করতে না পারো তাহলে এই জমিনে কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতিকে এরা ধর্মজ্ঞান করে। এ কারণে এরা সব সময়ই মুসলমানদের

শিকড় কাটতে থাকবে। সত্যিকার অর্থে হিন্দুত্ব কোন ধর্ম নয়। হিন্দু ঠাকুর পুরোহিত ও পণ্ডিতেরা সাধারণ হিন্দুদেরকে দেবদেবীর ভয় দেখিয়ে তাদের মনগড়া ভ্রান্ত ধারণাকেই ধর্ম হিসেবে চালিয়ে দিয়েছে। যুগ যুগ ধরে এখানকার মানুষ অন্ধের মতো মণি-ঋষী ঠাকুর-পণ্ডিত ও পুরোহিতদের বানানো রীতি-রুসমকেই ধর্ম বলে বিশ্বাস করছে।

এদের ধর্ম যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এদের যে সব দেবদেবীকে তোমরা গুড়িয়ে দিয়েছো, যাদের ভগ্নাবশেষ তোমাদের পায়ের নীচে পড়ে আছে এদেরকে বলো না, তাদের উৎখাতের প্রতিশোধ নিতে। সেই ঝড়তুফানের রাতে বিদ্যুৎপাত ও বজ্রাঘাত হয়েছে, তোমরা তখন নির্বিঘ্নে ঘুমিয়েছো, আর ওরা সেটিকে দেবতার ক্রোধ ভেবে রাতভর পেরেশান হয়ে পূজা-অর্চনা করেছে। বলো, রাতের তুফান কি তোমাদেরকে সামান্যতম আতঙ্কিত করেছে? ঝড় বৃষ্টিকে কি মুসলমানরা ভয় করতে পারে? কিন্তু সেই রাতে তোমরা যদি হিন্দুদের অবস্থা দেখতে তাহলে তোমাদের হাসি পেতো, ওরা সারারাত রাম রাম হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ জপতে জপতে নির্ঘুম কাটিয়েছে...।

বন্ধুগণ! সত্য-সততা এবং ঈমান ও ইহসান তোমাদের শক্তি। ঈমানের শক্তির সামনে কোন মিথ্যার দুর্গ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তোমাদের যে রক্ত এ জমিনে পড়েছে তা ফুলের মতোই খুশবো ছড়াবে এবং এই জমিন আল্লাহর নূরে আলোকিত হবে।"

* * *

মুসলমানদের কন্নৌজ বিজয়ের ডংকা দেড়শো মাইল দূরের কালাঞ্জর ও একই দূরত্বের গোয়ালিয়র পর্যন্তও পৌছে। কন্নৌজ থেকে কিছু হিন্দু সেনা কালাঞ্জর পৌছে এ খবর আগ্নেয়গিরির মতো ছড়িয়ে দিলো যে, মুসলমানরা কন্নৌজ দখল করেছে এবং সেখানকার মহারাজাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কালাঞ্জরের রাজা গুন্ডা কয়েক পক্ষকাল থেকে শুধু শুনে আসছিলেন, অমুক রাজ্য মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে। অমুক রাজা মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে। অমুক রাজা রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গেছে। গুন্ডা আরো শুনতে পাচ্ছিলেন, অমুক রাজ্যের রাজা হাতিয়ার ফেলে দিয়ে সুলতান মাহমূদের কাছে

আত্মসমর্পণ করেছে। অমুক রাজা সুলতান মাহমূদের সাথে মৈত্রি চুক্তি করেছে। রাজা গুন্ডা এভাবে সুলতান মাহমূদের অগ্রাভিযানের প্রতি দৃষ্টি রাখছিলেন। এখন তো সুলতান মাহমূদ বলতে গেলে তার দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত। কারণ, সেই অমিততেজী গযনীর যোদ্ধাদের কাছে দেড়শো মাইলের দূরত্ব তেমন দূরত্ব ছিল না। রাজা গুন্ডা এ খবর পাওয়ার পরপরই গোয়ালিয়র যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

রাজা গুন্ডা যখন গোয়ালিয়র পৌছলেন, তখন তিনি জানতে পারলেন, তার আসার আগেই কন্নৌজ পতনের খবর গোয়ালিয়র পৌছে গেছে। গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন এ ব্যাপারে অবগত। রাজা গুন্ডা কন্নৌজ পতনের সংবাদে চিন্তিত হওয়ার পাশাপাশি ক্ষুব্ধও ছিলেন। তিনি কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপালের মোকাবেলা না করে পালিয়ে যাওয়াটাকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। অথচ সংবাদবাহীরা তাই বলছিলো। লোকজন বলছিলো, রাজধানীতে মাত্র কিছু সংখ্যক সৈন্য অবস্থান করছিল। মুসলিম সৈন্যরা অনায়াসে কোন প্রতিরোধের মুখোমুখি না হয়েই শহরে প্রবেশ করে। রাজাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। গযনী বাহিনী শহরে প্রবেশ করেই ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে।

কালাঞ্জরের রাজা গুন্ডা আর গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন দু'জনে মিলে একটি যৌথ পরিকল্পনা করলো যে, গোয়েন্দাদের মাধ্যমে সুলতান মাহমূদের প্রতি নজর রাখা হবে এবং গযনী সুলতানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হবে তিনি কন্নৌজেই অবস্থান করেন না ফিরে যান? সুলতান মাহমূদ যদি কন্নৌজ অবস্থান করে তাহলে তার উর সেখানেই আক্রমণ করা হবে এবং এই আক্রমণে লাহোরের রাজা ভীমপালের সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

কালাঞ্জরের মহারাজা তখনো গোয়ালিয়রে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় কন্নৌজ রাজদরবারের এক উর্ধ্বতন অফিসার সেখানে পৌছল। এই কর্মকর্তা কালাঞ্জর হয়ে গোয়ালিয়র পৌছে। কালাঞ্জর গিয়ে এই কর্মকর্তা শুনতে পায় কালাঞ্জরের রাজা গুন্ডা গোয়ালিয়র চলে গেছেন। কর্মকর্তা সঙ্গে সঙ্গেই গোয়ালিয়র রওয়ানা হয়ে যান।

গোয়ালিয়র পৌছে কন্নৌজের সেই কর্মকর্তা রাজা গুন্ডা ও রাজা অর্জুনকে জানায়, "কন্নৌজের মহারাজা কন্নৌজ অবরোধের আগেই নিরুদ্দেশ হয়ে

গিয়েছিলেন। গযনীর সুলতান মাহমূদ  কন্নৌজ পৌছে যখন খাজাঞ্চীখানা খুললেন, তখন সেখানে কিছুই পাওয়া গেল না। রাজমহলের রাণীদের অলঙ্কারগুলোও ছিল নিরুদ্দেশ। সেই সাথে রাজমহলও ছিল লোকশূন্য। দুর্গে সৈন্যও ছিল হাতে গোনা।

'এর অর্থ হলো, মহারাজা রাজ্যপাল শত্রুকে দেখার আগেই নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন, বললেন কালাঞ্জরের রাজা গুন্ডা। সেই সাথে তিনি সেনাবাহিনীর একটি অংশও সাথে নিয়ে গেছেন।'

হিন্দুজাতি কি তার এই অপরাধ ক্ষমা করতে পারবে? বললেন গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন।

"এটা কি জানা সম্ভব হয়নি তিনি কোথায় গিয়েছেন?" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সেই কর্মকর্তার কাছে জানতে চাইলেন অর্জুন।

"না, তা জানা সম্ভব হয়নি।" জবাব দিলো কর্মকর্তা। আর দ্বিতীয় খবর হচ্ছে, সুলতান মাহমূদ  গযনী ফিরে গেছেন।

"তার সেনাবাহিনী কোথায়?" জানতে চাইলেন অর্জুন।

"কিছুসংখ্যক এখানে রয়েছে আর কিছুসংখ্যক তিনি সাথে নিয়ে গেছেন।

"এমন তো নয় যে, মহারাজা রাজ্যপাল গোপনে সুলতান মাহমূদের সাথে কোন প্রকার চুক্তি করে বসেছেন?" উষ্মামাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন রাজা অর্জুন। আর এই চুক্তি মতে তার সাথে নেয়া সৈন্যদেরকে তিনি প্রয়োজনের সময় মাহমূদের সাহায্যের জন্য দিয়ে দেবেন?

"যেহেতু আমরা এর কিছুই এখনো জানি না, তাই আমাদেরকে ভেবে চিন্তে পদক্ষেপ নিতে হবে" বললেন রাজা গুন্ডা। রাজা রাজ্যপালকে আমরা গোটা হিন্দুস্তানের একজন অভিভাবক মনে করতাম, কিন্তু লোকটি ধারণাতীত কাপুরুষতার পরিচয় দিলো। মথুরা, মহাবন, বুলন্দশহর আর মুনাজের সৈন্যবাহিনী প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। শুধু লাহোরের রাজা ভীমপালের দিকে এখনও একটু তাকানো যায়। কিন্তু তিনিও তো আবার গযনীর মাহমূদের সাথে চুক্তি করে বসে আছেন। তাই তিনি সরাসরি আমাদের সঙ্গ দেবেন না।

"তবুও আমরা এখানে বসে তো তামাশা দেখতে পারি না, বললেন, রাজা অর্জুন। দেশ ও ধর্মের জন্যে আমাদেরকে প্রয়োজনে সব কিছু ত্যাগ করতে

হবে। মুসলানদেরকে এতো সহজে আমরা হিন্দুস্তান শাসন করতে দেবো না। মুসলমানদের শাসন মানেই হলো, শুধু রাজ্য শাসনই নয় আমাদের ধর্মকর্ম সবই হারাতে হবে।

ঐতিহাসিক গারদিজী, ইবনুল আছির, স্মিথ এবং ফারিশতা লিখেছেন, কালাঞ্জর ও গোয়ালিয়রের রাজা যৌথভাবে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং তারা সিদ্ধান্ত নেন যেভাবেই হোক কন্নৌজের রাজা রাজ্যপাল কোথায় আছেন তাকে খুঁজে বের করতে হবে। আর রাজা ভীমপালের কাছে দূত পাঠানো হবে। তাকে বলা হবে তিনি যেনো মাহমূদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকেন, যাতে মাহমূদকে সহজেই পরাজিত করা যায়।

সুলতান মাহমূদ গযনী যাওয়ার আগে কন্নৌজের শাসনভার সেনাপতি আবুল কাদেরের কাঁধে ন্যস্ত করে যান। গযনীর ইতিহাসে দু'জন সেনাপতি বেশী খ্যাতি পেয়েছেন। একজন আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আলতাঈ আর অপরজন আরসালান জাযেব। আবুল কাদেরের আলোচনা তেমন পাওয়া যায়নি। কিন্তু বেশী আলোচিত ব্যক্তিত্ব না হলেও দায়িত্ব পাওয়ার পর সেনাপতি আবুল কাদের কন্নৌজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রশাসন এভাবে বিন্যস্ত করেছিলেন যে, কন্নৌজকে তিনি অজেয় দুর্গে পরিণত করেছিলেন।

মহারাজা কন্নৌজের খোঁজ পাওয়া সহজসাধ্য ছিল না। পুরোহিত মহারাজা রাজ্যপালকে অজগর দেবতা দিয়ে আতঙ্কিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তাছাড়া রাণী ও রাজকুমারের চরম ঔদ্ধ্যত্ব তার সবচেয়ে প্রিয় নর্তকী নদীর বলিদান তাকে চরমভাবে হতাশ করে ফেলেছিল। তিনি এরপর থেকে খুবই কম কথাবার্তা বলতেন।

একদিন রাজকুমার গুহাভ্যন্তরে মহারাজার শয়নকক্ষে গিয়ে মহারাজাকে বললো, বারীকে রাজধানী বানানোর জন্যে আমাকে অনুমতি দিন পিতৃমহারাজ! আমি সেখানে প্রস্তুতি নিয়ে সুলতান মাহমূদকে কন্নৌজ থেকে বিতাড়িত করবো এবং পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবো। রাজ কুমার আরো বললো, সে গোয়ালিয়র, কালাঞ্জর এবং লাহোরের রাজাদেরকে সঙ্গে নেবে।

"তুমি কি মনে করো সুলতান মাহমূদ তোমাকে নতুন রাজধানী তৈরীর অবকাশ দেবে? জানতে চাইলেন রাজা রাজ্যপাল। তুমি কি জানো, তার

গোয়েন্দাদের জাল সর্বত্রই বিস্তৃত। সে যখনই জানবে, বারীতে আমরা যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখনই সে সেখানে আঘাত হানবে।

"তাহলে কি করবো? এভাবে আমরা কি জঙ্গলেই সারাজীবন লুকিয়ে থাকবো? অনেকটা উত্তেজিত কণ্ঠে বললো রাজকুমার লক্ষণপাল।

"আমি একটি নিরাপদ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছি" বললো রাজা। আমি সুলতান মাহমূদের সাথে যোগাযোগ করে কন্নৌজ চলে যাবো। তাকে বলবো, আপনার যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় আমরা দিয়ে দেবো এবং আপনার অধীনতাও স্বীকার করে নেবো। তবে তিনি যেনো বারীতে আমাদের নতুন রাজধানী তৈরীর অনুমতি দেন। আমি তার সাথে এমন চুক্তি করতে চাই যে, কখনো তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না, প্রয়োজনের সময় তাকে সৈন্য সাহায্য দেবো।"

"না, আপনার এই চিন্তা ঠিক নয়। আপনি এমন প্রস্তাব নিয়ে কন্নৌজ গেলে সে আপনার কাছে পুরো ধনভাণ্ডার চেয়ে বসবে। ধন-সম্পদ তার হাতে তুলে না দিলে আপনাকে সে হত্যা করবে।

এমনটি না হলেও আমরা আপনাকে যেতে দিতে পারি না। কারণ, আমরা আর আপনার উপর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। আপনার অন্তরে গযনীর সুলতান এমনভাবে আসন গেড়ে বসেছে যে, আপনি সনাতন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করেছেন।

"ওহ্, তার মানে আমি কি তোমাদের হাতে বন্দি?" জানতে চাইলেন রাজা।

"পণ্ডিতজী বলেছেন, আপনার উপর কোন শয়তান ভূতের আছর পড়েছে।" বললো রাজকুমার লক্ষণপাল। তিনি বলেছেন, এই অপছায়া নর্তকী বলি দানের দ্বারা অপসারিত হবে। পণ্ডিতজী আরো বলেছেন, ভগবান যখন কারো উপর তার ক্রোধ বর্ষণ করতে আসেন, তখন ধর্মের প্রতি তাকে বিদ্বেষী করে তোলেন।

"ধর্ম... ধর্ম...ধর্ম...। এই ধর্ম ধর্ম করে আমি নিঃশেষ হয়ে গেলাম। জেনে রাখো, আমি কারো কয়েদী নই। তুমি বারী চলে যাও, পারলে রাজধানী হিসেবে বারীকে প্রস্তুত করো। মনে রাখবে, আমি তোমার পিতা। তুমিই একমাত্র আমার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো পুত্র। আমি যে বিষয়টি তোমার জন্যে নিরাপদ মনে করবো তাই করবো।"

* * *

পুরোহিত তার তাঁবুটিকে মহারাজার তাঁবু থেকে একটু দূরে স্থাপন করাল। মহারাজার তাঁবুর মতো পুরোহিতের তাঁবুতেও ছিল তিনটি কক্ষ। একটি কক্ষে সে পূজা অর্চনা করতো। তার তাঁবুতে কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। সে যখন তার কক্ষে নর্তকী নদীকে ডেকে পাঠালো, তখন সে বুঝতে পারলো মহারাজা কেন নদীকে বলি না দেয়ার ব্যাপারে এতোটা কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন।

নদীকে যখন পুরোহিত ডেকে পাঠালো নদী এতে বেশ আশ্চর্যান্বিত হলো। কারণ, পুরোহিতরা কখনো কোন নর্তকীর সাথে কথা পর্যন্ত বলে না; তার তাঁবুতে ডেকে পাঠানো তো দূরের কথা! ডাক পেয়ে নদী পুরোহিতের তাঁবুতে হাজির হলো।

"নদী! তুমি পাপের একটা জীবন্ত মূর্তি। তোমার মৃত্যু হলে পরজন্মে তুমি শূকর কিংবা শিয়ালের রূপ ধারণ করবে। তোমার সেই পুনর্জন্ম হবে দুঃখ শোকে ভরা। তোমার অন্তরাত্মা সব সময় দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকবে। প্রথম জন্মকে স্মরণ করে করে তুমি দুঃখের সাগরে ভাসবে। এতো পাপ করার পরও জানি না হরিহরি মহাদেব তোমার প্রতি এতোটা প্রসন্ন কেন হয়ে গেলেন! তিনি তোমাকে নিজের স্ত্রী বানানোর ইচ্ছা পোষণ করেছেন। দেবতাদের ইচ্ছাই নির্দেশ। নদী! তুমি হয়তো বর্তমান জীবন ত্যাগ করতে চাইবে না কিন্তু তুমি যখন আকাশের রাণী হবে তখন তোমার অন্তর আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে।"

"এটা কি করে সম্ভব পণ্ডিত মহারাজ?"

"আমরা তোমাকে দেবতার পায়ে উৎসর্গ করতে যাচ্ছি" বললো পণ্ডিত। এ চাঁদের বারোতম রাতে দেবতা তোমাকে নিতে আসবেন। তোমার রক্ত এই জমিনে ফেলে দেয়া হবে। এ রক্ত মাংস নিয়ে তুমি দেবতার কাছে যেতে পারবে না। কারণ, তোমার এই রক্ত মাংস পবিত্র নয়।"

"আমি বুঝে ফেলেছি মহারাজ! আপনি আমার মাথা কেটে ফেলবেন।" আতঙ্কিত কণ্ঠে বললো নদী। না না মহারাজ! আমি এমন মরণ মরতে চাই না।"

"না চাইলেও তোমাকে মরতে হবে নদী। স্বজাতির ধর্ম আর মহারাজার কল্যাণে তোমাকে জীবন উৎসর্গ করতেই হবে।

নদী পালিয়ে যাওয়ার জন্য এদিক সেদিক তাকাচ্ছিল। পণ্ডিত তাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললো, দেবতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করলে তোমার চেহারায় কাটার মতো শত শত টিউমার হবে। পেত্নীর মতো কালো হয়ে যাবে তোমার শরীর। আর দুর্গন্ধে তোমার কাছে কেউ যেতে চাইবে না। তখন তুমি মহারাজার প্রিয়ভাজন তো দূরের কথা কাছে থাকার অনুমতি পর্যন্ত পাবে না। মহারাজার লোকেরা তোমাকে জঙ্গলে ফেলে আসবে। তোমার চোখ দুটো মরা মানুষের মতো সাদা হয়ে যাবে। কোমর বেঁকে যাবে। তুমি ঠিক মতো হাঁটতেও পারবে না।

"এসো নদী। এই তো সামনেই দেবতা রয়েছেন। একটু দেখে নাও।"

পুরোহিত নদীকে অপর কক্ষে নিয়ে গেল এবং ঘাসে ভরা একটি জায়গা থেকে ঘাসগুলো সরালে একটি গর্ত দেখা গেল। পণ্ডিত নদীকে সামনে নিয়ে গর্তের ভেতরটা দেখালো। গর্তের ভেতরে বিশাল এক অজগর কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিল, নদী অজগর দেখে চিৎকার করে উঠলো।

"এটাই তো দেবতা যা তোমাকে নেয়ার মেহমান" বললো পুরোহিত।

"আপনি কি আমাকে গর্তের এই অজগরের মুখে ফেলে দেবেন?" কম্পিত কণ্ঠে জানতে চাইল নদী।

পুরোহিত একটি ফুল নদীর নাকের কাছে ধরে বললো, এটার ঘ্রাণ নাও। এটি দেবতা তোমাকে দিয়েছেন।

পুরোহিত একটি ফুল নর্তকীর নাকের কাছে তুলে ধরলো। নর্তকী সেটির ঘ্রাণ নিলে তার শরীর শিথিল হয়ে এলো এবং সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। পুরোহিত নদীকে ধরে অন্য কক্ষে শুইয়ে দিল। এরপর পুরোহিত ঘাস দিয়ে অজগরটিকে ঢেকে দিলো।

এরপর কেটে গেলো তিনচার দিন। এ কয়দিন রাত হলেই একটি মানুষ ছায়ার মতো তাঁবুর আশপাশে পা টিপে আসা যাওয়া করেছে। এক রাতে সে পুরোহিতের তাঁবু ঘেঁষে দাঁড়াল। সে পুরোহিতের তাঁবুর সাথে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এর পরদিন ছায়া মূর্তিটি মহারাজার তাঁবুর পাশে গিয়ে দাঁড়ালে মহারাজার নিরাপত্তা রক্ষীদের কেউ কিছু একটা অস্তিত্ব টের পেয়ে চেটিয়ে উঠলো, কে কে ওখানে? হুঁশিয়ারী শোনা মাত্রই ছায়ামূর্তিটি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অন্ধকারের মধ্যে রাজার নিরাপত্তা রক্ষীদের ছোঁড়া তীর ছায়া মূর্তিটির পাশ দিয়ে শনশন করে এসে মাটিতে বিদ্ধ হলো। ছায়ামূর্তি জঙ্গলী জন্তুর মতোই ঝোপের মধ্যে হারিয়ে গেল। একটু পড়েই শোনা গেল শেয়ালের ডাক। মহারাজার নিরাপত্তা রক্ষীরা মনে করলো, এটি ছিলো শিয়াল! তারা কোন বিপদাশঙ্কা বাদ দিয়ে ছায়ামূর্তিকে খোঁজাখুঁজি না করে আবার নিশ্চিন্ত মনে নিজেদের জায়গায় পায়চারী করতে লাগলো।

এর কয়েক দিন পর মহারাজা রাজ্যপাল দু'জন নিরাপত্তারক্ষীকে ডেকে পাঠালেন। উভয়েই নিরাপত্তা বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। এরা মহারাজার অতি বিশ্বস্ত।

সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার পর থেকে এরা দু'জন সবসময় রাজার সঙ্গে থেকেছে এবং মহারাজার সুখ-দুঃখের সঙ্গী। এদের আনুগত্যও প্রশ্নাতীত। মহারাজার জন্যে এরা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করবে না। এমনই তাদের আচার-ব্যবহার।

মহারাজার এই দুর্দিনেও এরা দু'জন মহারাজাকে এই আশ্বাস দিয়েছে, মহারাজার যে কোন সিদ্ধান্ত তারা মাথা পেতে নেবে এবং যে কোন বিপদে তাদের জীবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

মহারাজা তাদের বললেন, "আমি কন্নৌজ গিয়ে সুলতান মাহমূদের আনুগত্য মেনে নিতে চাই। কারণ, তার সাথে বৈরীতা করে আমি আমার ভবিষ্যত গড়তে পারবো না।"

মহারাজা চাচ্ছিলেন সুলতান মাহমূদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে বারীকে রাজধানী রূপে গড়ে তুলতে। কিন্তু পণ্ডিত মহারাণী ও রাজকুমার লক্ষণপাল তার এই সিদ্ধান্তের ঘোরতর বিরোধী ছিল।

এক রাতে মহারাজা তার রাজকীয় পোশাক ত্যাগ করে সাধারণ প্রজার বেশ ধারণ করলেন। অনুরূপ পোশাক তার বিশ্বস্ত দুই সঙ্গীকেও পরালেন। চোখে মুখে মাথায় খেটে খাওয়া শ্রমিকের মতো করে মেটে রঙের প্রলেপ দিলেন। তারা তিনজন যখন বেশ বদল করছিল তখন পণ্ডিত রাজার তাঁবুর দিকে আসছিল এবং দূর থেকে তাদের বেশ বদলের দৃশ্য দেখে পণ্ডিতের মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো। সে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে গেল, আর অগ্রসর হলো না। সে এমন

গোবেচারার ভাব করলো যে, কিছুই দেখেনি। পণ্ডিত সন্ধিগ্ধ মনে সেখান থেকেই ফিরে এলো।

* * *

বেশ ভূষা বদল করার পর মহারাজা ও তার একান্ত দুই সঙ্গী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সাধারণ পথ এড়িয়ে বনভূমির দিকে অগ্রসর হলো। কন্নৌজের দিকে যাওয়ার জন্য সেখানে একটি মাত্র পথ ছিল। আর এই পথটি ছিল দু'টি পাহাড়ের মাঝ দিয়ে। জায়গাটি ছিল ঘন গাছগাছালি ও ঝোপঝাড়ে ভরা। তিনজন অশ্বারোহী একটি পাহাড়ের আড়ালে চলে যাওয়ায় তাঁবুর শিবির তাদের আড়ালে হয়ে গেল। তাঁবুর আড়ালে গিয়ে তারা অনেকটাই স্বস্তির সাথে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

তারা যখন দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল তখন সামনে থাকা মহারাজার ঘোড়া হঠাৎ কিছু একটা দেখে ভড়কে উঠলো এবং হ্রেষারব করে পিছপা হতে শুরু করল। এই অবস্থা দেখে মহারাজার এক সঙ্গী বললেন, ঘোড়া হয়তো সাপ দেখেছে। সাপ দেখলেই ঘোড়া ভয়ে এভাবে কাঁপতে থাকে।

দেখতে দেখতে অপর দু'টি ঘোড়াও ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতে শুরু করলো।

হঠাৎ করে পাহাড়ের ঝোপের আড়াল থেকে এক গুরুগম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল, "ফিরে যাও। মনের ইচ্ছা ত্যাগ করো। যেখানে যাচ্ছ, সেখানে তোমাদের অপমানজনক মৃত্যু অপেক্ষা করছে।"

থেমে থেমে এই আওয়াজ আসছিল। সেই সাথে ক্ষীণ আওয়াজে মন্দিরের ঘণ্টা ধ্বনির মতো ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। সকল হিন্দুর কাছেই এই ঘণ্টার আওয়াজ পরিচিত। সাধারণত মন্দিরেই এমন ঘণ্টা বেজে থাকে।

"এটা কোন ইহলোকের আওয়াজ মনে হয় না।" বললো মহারাজার এক সঙ্গী।

হঠাৎ ঘন একটি ঝোপের ভেতর থেকে একটি প্রকাণ্ড অজগর সাপ মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। সেই সাথে সেটি ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো।

অজগরকে সামনে অগ্রসর হতে দেখে ঘোড়া তিনটি ভয়ে ভড়কে গিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ডানে বামে দৌড়াতে লাগলো। এ অবস্থায় ঘোড়া লাগামহীন হয়ে পড়লো। কিন্তু মহারাজা ও তার দুই সফরসঙ্গী ছিল অশ্বচালনায় পারদর্শী। এমতাবস্থাতেও তারা সবাই ঘোড়ার পিঠে নিজেদেরকে সংহত রাখতে সক্ষম হলো। তারা ঘোড়াকে থামানোর চেষ্টা না করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত দৌড়ানোর সুযোগ দিল।

* * *

অশ্বারোহী পালিয়ে যাওয়ার পর অজগরটি শিকার হারিয়ে আরেকটি ঝোপের ভেতরে প্রবেশ করল। একটি গর্তের মতো গুহা থেকে ঘন সবুজ ঘাস ও গুল্মের ভেতর থেকে পণ্ডিত মাথা উঁচু করল এবং গুহা থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের ঢালে এসে দাঁড়াল। সেখানে দাঁড়িয়ে এদিক সেদিক মাথা দোলাতে লাগলো। সে মনে মনে আফসোস করতে লাগলো তিনো অশ্বারোহী তার নাগালের বাইরে চলে গেছে। ব্যর্থতায় পণ্ডিত আকাশের দিকে তাকিয়ে সেখানেই স্থির দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ কোত্থেকে একটি লোক এসে পণ্ডিতের সামনে উদয় হলো।

পুরোহিত তাকে চিনতো। লোকটি ছিল অর্ধবয়স্ক এক সৈনিক। লোকটি তরবারী কোষমুক্ত করে উদ্যত কণ্ঠে পুরোহিতকে বললো, "যদি বাঁচতে চাও তাহলে বলো নদী কোথায়?"

"তুমি এখানে কোত্থেকে এলে? হুমকির সুরে বললো পণ্ডিত। ভালো চাও, তবে এখান থেকে চলে যাও। নয়তো মহারাজাকে বলে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবো।"

"তোমার আর রাজার জীবন এখন আমার হাতে।" বললো সৈনিক। আমি জানতে চাই, নদীকে তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছো? আমি তাকে বলি দিতে দেবো না। নদীর খোঁজ না দিয়ে তুমি এখান থেকে জীবন নিয়ে পালাতে পারবে না পণ্ডিত!

পণ্ডিত তাকে দেবদেবীদের অভিশাপ ও ক্রোধের ভয়ভীতি দেখাতে লাগল এবং বলতে লাগল নদীকে দেবতার সন্তুষ্টির জন্যে বলি দিতে হচ্ছে। তাকে

দেবতা পছন্দ করেছেন। পৃথিবীর মতো নোংরা জায়গা থেকে বিদায় নিয়ে সে তখন থাকবে দেবতার স্ত্রী হয়ে আকাশে। তাতে তুমি বাঁধ সাধছো কেন?

পণ্ডিত যখন এসব কথা বলছিল, ঠিক সেই সময় তার পেছনের ঝোপ থেকে মাথা উঁচু করে উঁকি দিল বিশাল অজগর। অজগরটি মাথা উঁচু করে নিঃশব্দে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। মধ্যবয়সী লোকটি অজগরকে আসতে দেখল কিন্তু সে পণ্ডিতকে সতর্ক না করে নিজে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে লাগল। অজগরটি অগ্রসর হয়ে তার সামনে দাঁড়ানো পণ্ডিতের একটি পা মুহূর্তের মধ্যে মুখের ভেতরে পুরে নিল। পণ্ডিত আর্তচিৎকার দিয়ে উঠলো। অজগর পণ্ডিতকে উপরে উঠিয়ে জমিনে একটা আছাড় দিল। অজগর সাপও কুমিরের মতো খাবার আস্ত গিলে ফেলে। অজগর অনেকটা সময় নিয়ে ধীরে ধীরে শিকার পুরোটাই গিলে ফেলে। পণ্ডিতকে যখন ধীরে ধীরে অজগর গিলতে শুরু করল তখন সে চিৎকার করে সৈনিককে বলতে লাগলো, ভাই! দয়া করে তরবারী দিয়ে সাপটিকে কেটে ফেলো, ভগবানের দোহাই আমাকে উদ্ধার করো, জীবন বাঁচাও।"

"আরে এটা না তোমার দেবতা পণ্ডিতজী! বললো সৈনিক। আমি জানি কখন থেকে তুমি এটিকে দেবতা জ্ঞানে পুষে আসছো। আমি মহারাজার প্রতি বিশ্বস্ত, আমি তোমার সুহৃদ নই। আমি সব জানি। তোমার দেবতা আমার মহারাজার পথ রুখতে পারেনি।"

"আরে ভাই! এসব কথার সময় নয়, তুমি আগে এসে তরবারী দিয়ে এটার মাথা কাটো, আমাকে বাঁচাও।"

চিৎকার করে বারবার বলছিল পণ্ডিত।

"আগে বলো নদীকে কোথায় রেখেছো?"

"হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি। ব্যথায় কোঁকরানো কণ্ঠে বললো পণ্ডিত। কিন্তু আগে অজগরটিকে কেটে ফেলো।

"নদী কোথায় বলো। তোমার কাছে একটা নর্তকী তেমন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ না হতে পারে কিন্তু ওকে আমি নিজের বোন মনে করি। সে ছিল একটি এতীত মেয়ে। আমার মা বাবা তাকে লালন পালন করে অধিক সুখের আশায় মহারাজার হাতে তুলে দেয়। আমি ওকে এতোটাই আদর সোহাগ করতাম

আর সে আমাকে এতোটাই ভালবাসতো যে ওর ভালোবাসার টানে আমি মহারাজার কাছে চলে আসি। আমি মহারাজার কাছে এসে তরবারী চালনা ও তীর নিক্ষেপে নৈপুণ্য দেখালে তিনি তার একান্ত নিরাপত্তা বাহিনীতে আমাকে চাকরী দিয়ে দেন। সেই থেকে আমি প্রকাশ্যে মহারাজার কিন্তু আড়ালে নদীর নিরাপত্তা বিধানে কাজ করছি। কারণ, নদী আমার সহোদরা বোনের মতোই প্রিয়।

"তাহলে শোন! কোকাতে কোকাতে বললো পণ্ডিত, আমার তাঁবু থেকে দু'শগজ পূর্বদিকে যাবে। ওখানে দু'টি টিলার মাঝখানে গেলে ডানপাশের টিলার মধ্যে একটি গুহার মতো দেখতে পাবে। এর ভেতরে প্রবেশ করলে দেখতে পাবে খুব সাজানো গোছানো একটি জায়গা। যেনো একটি স্বর্গ। তুমি জায়গাটি দেখলে সেখানেই থেকে যেতে চাইবে। সেখানেই তুমি নদীকে পাবে...। আমি তো নদীর কথা তোমাকে বলে দিলাম। এখন সামনে এসো, সাপটাকে তোমার তরবারী দিয়ে কেটে ফেলো, আমাকে উদ্ধার করো...।"

"তুমি তোমার কুকর্মের শিকার হয়েছো পণ্ডিত। তোমার ধোঁকাবাজি আর প্রতারণা তোমাকে গিলে ফেলছে। কারণ, আমি নিশ্চিত জানি এটা নিছকই একটা অজগর, দেবতা নয়। অজগর দেবতা হতে পারে না।" বলে সৈনিকটি একটি অট্টহাসি দিয়ে তরবারী কোষবদ্ধ করে পণ্ডিতের দেয়া তথ্য মতো নদীর খোঁজে ছুট দিলো।

* * *

অজগরটি বারবার পণ্ডিতকে মাটির উপর আছড়াতে আছড়াতে আধমরা করে ফেলল এবং ডান পাটি ছেড়ে দিয়ে মাথাটি মুখের ভেতরে নিয়ে নিল। পণ্ডিত ইতোমধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। অজগর এবার পণ্ডিতের মাথা মুখে পুড়ে নিয়ে আছাড় দিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে পণ্ডিতকে গিলতে শুরু করল।

অর্ধ বয়স্ক সৈনিক অনেকটা দূরে তার ঘোড়াকে বেধে রেখেছিল। সে দ্রুত ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে পণ্ডিতের বলে দেয়া জায়গার দিকে ঘোড়া হাঁকাল। পণ্ডিতের বলে দেয়া জায়গাটির আলামত ছিল পরিষ্কার। তাতে কোন জটিলতা

সৈনিক অগ্রপশ্চাত না ভেবেই দ্রুত পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করল। গর্তের ভেতর দিকটা অনেক ফাঁকা। সেখানে মখমলের দামী কাপড়ের বিছানা বিছানো। একপাশে কয়েকটি মূর্তি বসিয়ে রাখা হয়েছে এবং বিছানার এক প্রান্তে সুগন্ধী আগর বাতি জ্বলছে। সারা গুহা লুবানের সুঘ্রাণে ভরে আছে।

নদী সৈনিককে দেখে এমন ভাবে তাকিয়ে রইলো যেনো সে তাকে চেনে না। সৈনিক ছিল বয়স্ক এবং অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। সে সহজেই বুঝতে পারল নদীকে কোন ওষুধের দ্বারা অবচেতন করে রাখা হয়েছে। নয়তো একাকী থাকা অবস্থায় সে নিশ্চয়ই এখান থেকে বেরিয়ে যেতো। সৈনিক যখন তাকে নদী বলে ডাকল, নদী তার ডাক শুনে মোহনীয় ভঙ্গিতে একটি মুচকি হাসি দিল।

সৈনিক অযথা সময় নষ্ট করতে চাচ্ছিল না। সে বয়স্ক হলেও শরীরের কাঠামো ছিল শক্ত। সে নদীকে পাজা কোলে করে কাঁধে তুলে নিল এবং বাইরে এনে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিল এবং নিজেও ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে এক হাতে নদীকে আর অপর হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল।

মহারাজার ছেলে লক্ষণপাল তার পিতা রাজ্যপালকে খুঁজছিলো। বাবার খোঁজে সে পণ্ডিতের তাঁবুতে গেল কিন্তু সেখানে তার বাবাকে পাওয়া গেল না। লক্ষণপাল জানতো পণ্ডিত নদীকে কোথায় রেখেছে। সেখানে গিয়ে সে নদীকেও দেখতে পেল না। শিবিরে ফিরে এলে এক সৈনিক তাকে জানাল, সে পণ্ডিতকে পাহাড়ের ওই দিকে যেতে দেখেছে। লোকটি আরো জানাল, পণ্ডিত একটি বিশাল পোটলা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

লক্ষণপাল সৈনিকের দেখানো পথে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলো। পথিমধ্যেই তার চোখে পড়লো পোটলা টেনে হেঁচড়ে নেয়ার চিহ্ন। এই চিহ্ন দেখে দেখে লক্ষণপাল সেখানে চলে গেল। যেখানে অজগর তখনো পণ্ডিতকে গিলে শেষ করতে পারেনি। অর্ধেকের চেয়ে বেশী শরীর মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলেছে। তখনো পণ্ডিতের পা দুটো অজগরের মুখের বাইরে ঝুলছে।

লক্ষণপাল অবস্থা দেখে সাথে সাথে তরবারী কোষমুক্ত করে অজগরটিকে কুপিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। কিন্তু পণ্ডিতকে অজগর যে পরিমাণ মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলেছিল সেখান থেকে তাকে আর বের করে আনা সম্ভব হলো

না। লক্ষণপাল অদূরে পড়ে থাকা একটি মোটা কাপড় ও রশি দেখতে পেল। রশিটা দেখেই সে চিনতে পারলো এই রশিটাই সে সেদিন পণ্ডিতকে দিয়ে ছিল যা দিয়ে ফাঁস তৈরী করে পণ্ডিত অজগরকে বশে আনতে সক্ষম হয়। অজগরটির দিকে তাকিয়ে সেটিকেও সে চিনতে পারল। কিন্তু লক্ষণপাল রশি অজগর আর পণ্ডিতের সাপের পেটে যাওয়ার পরিস্থিতি দেখে বুঝে উঠতে পারছিল না, এখানে আসলে কি ঘটেছে এবং কেনই বা ঘটেছে।

* * *

মহারাজা রাজ্যপাল অনেক দূরে গিয়ে তার সঙ্গীদের সাথে মিলিত হলেন। তার ঘোড়াটি অজগর দেখে ভীত হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে এক পর্যায়ে দৌড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মহারাজা ও তার সঙ্গীদের ঘোড়াগুলো সাপ দেখে ভয় পেয়ে তীব্রগতিতে দৌড়ানোর ফলে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু তারা যে পথ সারা দিনে অতিক্রম করতেন সেপথ অর্ধেক দিনেই অতিক্রম করলেন। তারা সোজা কন্নৌজের দিকেই অগ্রসর হতে থাকলেন।

* * *

এদিকে নদীকে নিয়ে বয়স্ক সৈনিক সারা দিন এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করলো এবং নদীকে পণ্ডিতের খাওয়ানো ওষুধের প্রভাবমুক্ত করার চেষ্টা করলো। সন্ধ্যার কিছুটা পর নদী তার প্রকৃত অবস্থায় ফিরে আসতে শুরু করল। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সময় নদী তার জ্ঞাতি ভাইয়ের সাথে এভাবে কথা বলছিল যেন সে একটা গভীর স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে। পণ্ডিত এমন কোন ওষুধ খাইয়েছিল যার প্রভাবে নদী তার স্বাভাবিক বোধ শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। সম্বিত ফিরে আসার পর নদীর স্পষ্ট মনে পড়লো, পণ্ডিত তাকে বলেছিল, দেবতাকে খুশী করার জন্যে সে নদীকে বলি দেবে। এরপরের বিষয়গুলোকে সে স্বপ্ন বলে মনে করলো।

"আরে পণ্ডিত নিজেই তো তার দেবতার খোরাক হয়ে গেছে।" বললো বয়স্ক সৈনিক। সে একটি অজগর ধরে রেখেছিল। অজগর ছেড়ে দিয়ে সে

মহারাজার পথ রোধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু অজগর শেষ পর্যন্ত পণ্ডিতকেই গিলে ফেললো।”

“মহারাজা এখন কোথায়?” জানতে চাইলো নদী।

“মহারাজা কন্নৌজ চলে গেছেন। তিনি মুসলমানদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করবেন।” বললো সৈনিক।

“মুসলমানদের সাথে মৈত্রীচুক্তি করতে গেছেন!” বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো নদী।

“হ্যাঁ, তাই। এর মধ্যেই মহারাজার মঙ্গল।” বললো সৈনিক। আমার মতো মহারাজাও বুঝে গেছেন, পণ্ডিত পুরোহিত ঠাকুরদের তৈরী হিন্দুধর্ম আসলে একটা ধোঁকা। আসলে এসব দেবদেবী যুদ্ধের ময়দানে কোনই সাহায্য করতে পারে না। মহারাজা তো প্রকাশ্যেই বলছেন, মুসলমানরা একে একে আমাদের ঐতিহ্যবাহী সব মন্দির ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমাদের দেবদেবীরা তাদের কিছুই তো করতে পারলো না। বরং দেবদেবীদের মূর্তিগুলোকে ওরা ঘোড়ার পায়ে পিষে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। তাতেও কি দেবদেবীদের উচিত ছিল না, নিজেদের এই অপমান অপদস্থের জন্যে মুসলমানদের শাস্তি দেয়া?”

“তুমিও কি সনাতন ধর্মের প্রতি বিরূপ হয়ে গেছো দাদা?” জিজ্ঞেস করলো নদী।

“আচ্ছা নদী! বলতো আমাদের ধর্মটা আসলে কি? রাজা মহারাজাদের আনন্দ দেয়া আর তাদের-সুখ-আহ্লাদের জন্যে আমাদের মতো মানুষের জীবন বিলিয়ে দেয়াই কি আমাদের ধর্ম নয়? এসব ব্যাপারে তো আমাদের কখনো ভাবতে দেয়া হয়নি। এখন সময় এসেছে এসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করার। আমাদের ভাবতে হবে আসলে আমরা কোথায় যাচ্ছি, কোথায় যাবো। কালাঞ্জর এখান থেকে এখনো দেড় দিনের পথ। চলো আগে সেখানেই যাই। সেখানে গিয়ে আমরা রাজ দরবারে আমাদের উপস্থাপন করবো। কেউ যদি আমাদের ঠাঁই দেয় তবে সেখানে থেকে যাবো, নইলে অন্য কোন জায়গার জন্যে বেরিয়ে পড়বো।”

নদী ও তার সৈনিকরূপী জ্ঞাতি ভাই সারা দিন রাত পথ চলল। রাত শেষে সকালের দিকে তারা কালাঞ্জরের উপকণ্ঠে পৌঁছলো। তারা যে সময় কালাঞ্জর পৌঁছল ঠিক সেই সময়ে মহারাজা রাজ্যপাল কন্নৌজের সীমানায় প্রবেশ করলেন। তার অপর দুই সঙ্গীও সাথে ছিল। তাদের সবার পেশাক পরিচ্ছদ ছিল অতি সাধারণ মানুষের মতো।

মহারাজা যখন তার ভগ্নপ্রায় রাজধানী দেখলেন, তখন তার মনের মধ্যে বিরাট এক ধাক্কা লাগল। গোটা শহরটিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তখনও পর্যন্ত কোন কোন বাড়ীতে আগুন জ্বলছিল। ভগ্নস্তূপের মধ্য দিয়ে মহারাজা অগ্রসর হলেন এবং প্রধান মন্দিরের সামনে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামলেন। তার দিকে চোখ তুলে তাকানোর মতো একটি লোকও ছিল না। মহারাজা মন্দিরের মূল বেদীতে উঠলেন। মন্দির স্থির। সেখানে পূজারীদের কোন তৎপরতা নেই। জনশূন্য মন্দির থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে এলো, অথচ এখানটায় সবসময় লুবানের গন্ধে সুরভি থাকতো।

মহারাজা মন্দিরের ভেতরে গিয়ে দেখলেন সব শূন্য। না ছিল সেখানে দেবদেবী না ছিল দেবদেবীর মূর্তি। তিনি মন্দিরের ভেতরের কক্ষে প্রবেশ করলেন।

এক পর্যায়ে স্বগতোক্তির মতো তার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি জানি না এটা কি দেবতাদের অভিশাপের বহিঃপ্রকাশ যে আমরা আমাদের শহর থেকে উচ্ছেদ হলাম; আমাদের শহর ধ্বংস হয়ে গেলো? এটা কি আমার কোন অপরাধের ফসল? আমি বুঝতে পারছি না, আমরা মিথ্যা, না আমরা সত্যিকার পথে আছি? এখানে পূজা-অর্চনায় দেবদেবীদের সাথে আমার নামও তো উচ্চারিত হতো।"

'সত্য সেই খোদা, যিনি ভজন ও ঘণ্টা ধ্বনির উর্ধ্বে।' তার পেছন থেকে উচ্চারিত হলো।

আওয়াজ শুনে মহারাজা ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন, এক লোক তার ভাষায় একথা বলছে। লোকটি আরো বললো, কন্নৌজের রাজা কি ভগ্নস্তূপের মধ্যে নিজের জাঁকজমক এবং ভ্রান্তধর্মের ধ্বংসাবশেষ দেখছেন? মহারাজা কি এসব থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্যে এসেছেন?

"আরে তুমি, সংগ্রাম? তুমি এখানে? এখানে কি করছো তুমি?" চেনা লোকটির নাম উচ্চারণ করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন মহারাজা?

"যারা বেশ বদল করে এখানে আসে তাদের প্রকৃত রূপ আবিষ্কারের কাজ করি আমি।" জবাব দিলো সংগ্রাম। এখন আর সংগ্রাম নই আমি, উসমান। আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আপনি আমাকে গাদ্দার বলতে পারেন। কিন্তু মহারাজা নিজেই যদি জাতির সাথে গাদ্দারী করতে পারেন তাহলে...?"

"না, সংগ্রাম। আমি এখানে কাউকে গাদ্দার বলতে আসিনি। আমি গযনী সুলতানের সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি।"

"সুলতানতো গযনী চলে গেছেন। এখানে এখন দায়িত্ব পালন করছেন সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকী" বললো উসমান।

"ঠিক আছে, আমাকে তুমি তার কাছেই নিয়ে চলো।"

* * *

সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকীকে যখন জানানো হলো, এই ব্যক্তি কন্নৌজের মহারাজা, তখন তিনি একথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কিন্তু তাকে যখন নিশ্চিত করা হলো, এই ব্যক্তিই কন্নৌজের মহারাজা, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজা কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন?"

"সুলতানের শাসনকে মেনে নিতে এসেছি, তার কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে এসেছি।" বললেন রাজা রাজ্যপাল। আপনি এখন ইচ্ছা করলে আমাকে বন্দী করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে হত্যাও করতে পারেন।"

"একজন মহারাজাকে এই বেশে আমি দেখতে চাই না।" বললেন সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকি। আপনার শরীর যদি রক্তে রঞ্জিত থাকতো তাহলে আমি দেখে খুশী হতাম, মনে করতাম, আপনি আপনার রাজ্যের জন্য লড়াই করেছেন; কিন্তু আপনি এসেছেন ভিন্ন বেশে। আমি আপনাকে একজন মহারাজা হিসাবে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, আপনাকে সম্মান করছি।"

কাদের সেলজুকি তার সহকর্মীদের নির্দেশ দিলেন, "মহারাজাকে গযনীর শীর্ষ উমারা অভিজাতদের পোশাক পরিয়ে এখানে আনা হোক এবং তার সফর সঙ্গীদেরকে রাজকীয় অতিথি হিসাবে সম্মান দেয়া হোক।"

কিছুক্ষণ পর মহারাজা রাজ্যপাল গোসল করে শরীরে মাখানো ধুলো ময়লা পরিষ্কার করে সুন্দর রাজকীয় পোশাক পরিধান করে সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকির সামনে হাজির হলেন। আব্দুল কাদের সেলজুকি মহারাজাকে জিজ্ঞেস করলেন–

“আপনি যে গযনী সুলতানের আনুগত্য করবেন এবং নিজেকে বন্দী থেকে মুক্ত ভাবছেন এর বিনিময়ে আপনার কাছে এমন কি আস্থার জিনিস আছে যার প্রেক্ষিতে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করবো?”

“আপনারা নিশ্চয় এখানে আমার খাজাঞ্চীখানা শূন্য পেয়েছেন। আমি সব ধন-সম্পদ এবং রাষ্ট্রীয় ধন-ভাণ্ডার আমার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার রাজ্যে বারী নামক আরেকটি জায়গা আছে এবং সেখানে আমার কিছু সৈনিকও রয়েছে। আপনি যদি এ ব্যাপারে আমাকে আশ্বাস দেন বারীতে আমি পুনর্বার আমার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবো তাহলে আমি আপনাদেরকে এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার পরিশোধ করবো এবং বার্ষিক করও দেবো। তাছাড়া আপনাদের সাথে মৈত্রী চুক্তিও স্থাপন করবো।”

“আপনি রাজধানী ত্যাগ করেছিলেন কেন? জিজ্ঞেস করলেন সেলজুকী।

“এ প্রশ্নের জবাব দেয়া আমার পক্ষে কঠিন। এর জবাব ভবিষ্যতের জন্যে থাক। এর কারণ জানাটা খোশামোদী হবে। আমি আমার দেবতাদেরকেও কখনো তোষামোদ করিনি।”

“আপনি কি ইসলাম গ্রহণ করবেন?”

“ধর্মের ব্যাপারে আমি খুবই বিরক্ত” বললেন মহারাজা। আপনার আচার-ব্যবহারে আমি এতোটাই মুগ্ধ হয়েছি যে, কোন দিন হয়তো আমার অন্তর আমাকে বলে বসতেও পারে তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি ওসব কথা বলতে চাই না। আপনি আমার আবেদনের ব্যাপারে চিন্তা করুন।”

“আমি গযনী সুলতানের পক্ষে আপনার আবেদন মঞ্জুর করলাম” বললেন সেনাপতি আব্দুল কাদের। আপনি নতুন করে রাজ্য গঠন করুন, তবে আমার কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা বারী গিয়ে আপনার কার্যক্রমের ব্যাপারে খোঁজ খবর নেবে। এখনই আপনার সাথে লিখিত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাবে।

আপনার যুদ্ধব্যয়ের ক্ষতি পূরণের পরিমাণ এবং বার্ষিক কর সুলতান নিজে নির্ধারণ করবেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পয়গাম দিয়ে আজই আমি দূত পাঠিয়ে দেবো।"

* * *

এদিকে নদী তার জ্ঞাতি ভাইয়ের সাথে কালাঞ্জর পৌছে গেল। সৈনিক কালাঞ্জরের রাজাকে জানাল, মহারাজা রাজ্যপাল গযনীর আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ার জন্যে কন্নৌজ গেছেন। একথা শুনে কালাঞ্জরের রাজা গুণ্ডা ক্ষোভে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। তখন গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুনের কাছে পয়গাম পাঠালেন, "আমরা যা আশঙ্কা করেছিলাম অবশেষে তাই ঘটেছে। রাজ্যপাল গযনীর আনুগত্য স্বীকার করে মুসলমানদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করেছে।

এখন রাজ্যপালকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের আর কোন গত্যন্তর নেই। আর রাজা ভীমপালকে সাথে নিয়ে চিরদিনের জন্য গযনীর সুলতানকে খতম করা ছাড়া আমাদের আর বিকল্প কোন পথ নেই। আসুন আমরা শেষ এবং চূড়ান্ত লড়াইয়ে নেমে পড়ি।"

# গযনীর সম্ভ্রম

১০১৯-২০ খ্রিস্টাব্দের হজ্জ মৌসুমের আর কয়েকটি মাস মাত্র বাকি আছে। হজ্জে যাওয়ার জন্যে হজ্জগমনেচ্ছুক যাত্রীরা প্রস্তুতি শুরু করেছেন। তখনকার দিনে এক একটি অঞ্চল থেকে হাজারো যাত্রী একত্রিত হয়ে গন্তব্যে যাত্রা শুরু করতেন। তখনকার দিনে আজকের মতো উড়োজাহাজ ছিলো না। হজ্জযাত্রীরা উট, গাধা, ঘোড়া কিংবা পায়ে হেঁটে দল বেধে হজ্জ যাত্রা করতেন। হজ্জযাত্রীদের সাথে ব্যবসায়ীরা থাকতেন। কেউ কেউ স্ত্রী-সন্তান নিয়ে হজ্জ কাফেলায় অংশগ্রহণ করতেন।

কাফেলা যতো বেশী বড়ো হতো যাত্রীরা ততো বেশী নিরাপদ বোধ করতো। আর কাফেলা যতো ছোট হতো ততোই বাড়তো নিরাপত্তাহীনতা। কারণ প্রায়ই হজ্জ কাফেলার উপর সঙ্গবদ্ধ ডাকাত দলের আক্রমণ হতো। এজন্য সবার চেষ্টা থাকতো বড় কাফেলার সঙ্গী হওয়ার। তাই কাফেলা যতোই সামনে অগ্রসর হতে থাকতো পথে পথে বিভিন্ন এলাকার মুসাফিররা কাফেলার সাথে যুক্ত হতো। ফলে দিন দিন কাফেলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতো।

ডাকাতেরাও কম যেতো না। ডাকাত দলও বিশাল বিশাল ডাকাত কাফেলা গড়ে তুলতো। এক সময় এশিয়া মাইনর থেকে যাওয়া হজ্জযাত্রীদের লুটতরাজ করতে খ্রিস্টান রাজশক্তিগুলো লুটেরাদের সঙ্গে তাদের নিয়মিত সেনাদেরও নিয়োগ করতো।

আবুল কাসিম ফারিশ্‌তা বহু ঐতিহাসিকের সূত্র উল্লেখ করেছেন, হাম্মাদ বিন আলী নামের এক লোক ছিল সুলতান মাহমূদের শাসনামলে আরব অঞ্চলের সবচেয়ে কুখ্যাত ও শক্তিশালী ডাকাত সর্দার। এই ডাকাত সর্দার পশ্চাদপদ আরব বেদুঈনদের একত্রিত করে বিশাল এক ডাকাতগোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল। তার এই ডাকাত দল সারা বছরই বিভিন্ন কাফেলায় লুটতরাজ করতো। তার ডাকাত দল ছিল নিয়মিত একটা সেনাবাহিনীর মতোই শক্তিশালী এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এই ডাকাতগোষ্ঠী আবর দেশের সীমানাবর্তী এলাকাগুলোয় হজ্জযাত্রীদের কাফেলাতেও লুটতরাজ চালাতো এমনকি যুবতী মেয়েদের পর্যন্ত তুলে নিয়ে যেতো। ডাকাত সর্দার হাম্মাদ বিন আলীর ডাকাতরা গযনীর কয়েকটি হজ্জ কাফেলাও লুট করেছিলো।

সুলতান মাহমূদের কানেও এ খবর পৌঁছেছিল। কিন্তু হিন্দুস্তানের যুদ্ধ আর স্বগোত্রীয় কুচক্রী শাসকদের শক্রতার করণে তিনি ডাকাত দল নির্মূলের প্রতি মনোযোগ দিতে পারেননি। তাছাড়া এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে অনেক বাঁধা-বিপত্তিও ছিল। কারণ, গযনীর যেসব হজ্জ কাফেলা লুটতরাজের শিকার হয়েছিল এর ঘটনাস্থল ছিল আরব এলাকায়। যে এলাকা ছিল গযনীর রাষ্ট্র সীমানা থেকে অনেক দূরে অন্য শাসকদের নিয়ন্ত্রণে। অন্যের সীমানায় গযনী থেকে শত শত মাইল দূরের কোন ডাকাত দলের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোটাও ছিল তার জন্যে দুরূহ ব্যাপার।

ঐতিহাসিক ফারিশ্তা লিখেছেন, সুলতান মাহমূদের শাসনামলে বাগদাদের কেন্দ্রীয় খলীফা ছিলেন আল কাদের বিল্লাহ আব্বাসী। তখন মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় শাসন বাগদাদ কেন্দ্রিক ছিল। তখন নামে মাত্র খেলাফত ছিল। মূলত খেলাফত তখন রাজতন্ত্রের মতোই ক্ষমতার মসনদে পরিণত হয়েছিল। আলকাদের বিল্লাহ একটি এলাকার শাসকও ছিলেন। তিনি তার শাসনাধীন এলাকার বিস্তৃতির জন্যে সচেষ্ট ছিলেন। যদিও কেন্দ্রীয় খলীফা হিসেবে এটা ছিল একেবারেই তার জন্য অন্যায় ও বেমানান। তার এই প্রচেষ্টা ছিল পর্দার অন্তরালে। ক্ষমতালিপ্সু আর দখলদারদের জন্যে মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করাটা সাধারণ ঘটনা। বস্তুত ক্ষমতালিপ্সু হওয়ার কারণে মুসলিম সালতানাতের ভেতরে নানান ভাঙ্গাগড়ায় খলীফার নেপথ্য হাত থাকতো। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজেই গোলযোগের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করতেন। এ কারণে সুলতান মাহমূদের সাথে তার একটা দ্বন্দ্বও ঘটে গিয়েছিল।

বহু ঐতিহাসিক বলেছেন, খলীফা আল কাদের বিল্লাহ জানতেন হাম্মাদ বিন আলীর নেতৃত্বে আরবের বহু বেদুঈন গোষ্ঠী ডাকাতিতে লিপ্ত। কিন্তু তিনি সবকিছু জেনেও চোখ বুজে থাকতেন।

১০১৯-১০২০ সালের হজ্জ মৌসুমে যখন হজ্জ কাফেলা প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন বাগদাদে ডাকাত সর্দার বিন আলী খলীফার একজন সেনাপতির কক্ষে অবস্থান করছিল। তার সাথে ছিল দু'টি সুন্দরী যুবতী। সেনাপতি যুবতীদের দেখে মুচকি হাসছিল। যুবতী দু'জন ছাড়া, ডাকাত সর্দার হাম্মাদ বিন আলী আরো বহু উপহার উপঢৌকন সাথে নিয়ে এসেছিল।

কিছুক্ষণ পর দুই তরুণী আর উপহারগুলো অন্য কক্ষে চলে গেল। সেনাপতি ও ডাকাত সর্দার হাম্মাদ শুধু সেই কক্ষে থাকল।

খলীফার মন-মানসিকতা ও মেজাজ-মর্জি এখন কেমন হচ্ছে সম্মানিত সেনাপতি! জিজ্ঞেস করল হাম্মাদ। কারণ হজ্জের মৌসুম তো আসছে।

"খলীফার মেজাজ আমার হাতে"। বললো সেনাপতি। আমি জানতাম মওসুম শুরু হওয়ার আগে তুমি আসবে। আমার অংশ যদি তুমি ঠিক মতো পৌঁছে দাও তাহলেই হলো। তুমি খলীফার চিন্তা করো না। খলীফা ক্ষমতা আর গদির প্রেমিক। তার চারপাশে এমন দরবারী লোকজন দরকার এবং আছেও যারা তাকে ধারণা দেবে, খলীফা সারা দুনিয়ার বাদশা, দুনিয়ার সিংহ ভাগের রাজত্ব তার অধীন। প্রজারা তার রাজত্বে অত্যন্ত খুশী। তোষামোদির এ কাজ আমরা দক্ষতার সাথে করছি। খলীফা যেসব ব্যাপারে খুশী থাকে আমরা তাকে তেমনটাই রাখতে চাই। আমরা ধারণা দিয়েছি, তুমি একজন বিরাট বড় ব্যবসায়ী। যার ব্যবসা গযনী থেকে হিন্দুস্তান এবং আরব থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত।

"এখন আমি আমার ব্যবসা গযনী পর্যন্ত বিস্তৃত করতে চাই। ওখান থেকে আমি খবর পেয়েছি হাজারো লোকজনের কাফেলা হজ্জের জন্য আসছে। ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা নাকি আরো বাড়বে। আমাকে জানানো হয়েছে, এই কাফেলার মধ্যে হিন্দুস্তান থেকে আনা মূল্যবান অনেক ধন-সম্পদ আসছে...। আচ্ছা সেনাপতি সাহেব, একথা কি ঠিক গযনীর সুলতান হিন্দুস্তান খালি করে সব ধন-সম্পদ নিয়ে এসেছে?

"আরে তার পাঠানো উপহার তো খলীফার কাছেও পৌঁছেছে।" জবাব দিলো সেনাপতি। এটা ঠিক সুলতান মাহমূদ  হিন্দুস্তান থেকে এই পরিমাণ সোনাদানা, মণিমুক্তা সোনা-রুপার মুদ্রা নিয়ে এসেছে যা তোমার আমার মতো মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না।"

"আমাকে বলা হয়েছে, সে নাকি তার সেনাবাহিনীকে এসব ধন-সম্পদের অংশ  থেকে বিনা হিসাবে দুহাতে ঢেলে দিয়েছে।" বললো হাম্মাদ। এই সেনাদের আত্মীয়-স্বজনরাই এ বছর হজ্জ করতে আসছে। হিন্দুস্তানের অনেক দামি দামি জিনিস তারা হজ্জে নিয়ে আসবে। এগুলো আবার আরব দেশের

বাজারে বিক্রির জন্যে অনেকেই নিয়ে আসছে। তাছাড়া সুলতানের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে যে ব্যবসায়ীরা মাল পত্র কিনে সেই ব্যবসায়ীরা ও এই হজ্জ কাফেলার সাথে আসছে। এমন ধন-সম্পদে প্রাচুর্যময় কাফেলা আমার জীবনে একটিও পাইনি। খবর শোনার পর থেকেই আমি এই কাফেলার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছি। আমি আপনার কাছে এজন্য এসেছি, আমি নিশ্চিত হতে চাই, যদি গযনীর এই কাফেলার উপর হাত দেই তাহলে খলীফা না আবার আমার ঘাড় কাটার ব্যবস্থা করে। কারণ সে তো সুলতান মাহমূদকে ভয় পায়।"

"আরে কি বলছো তুমি? আমি তোমাকে বলিনি খলীফা তো তোমাকে ব্যবসায়ী বলেই জানে, বললো সেনাপতি। কে জানবে গযনী কাফেলাকে তুমি লুট করেছো?... অবশ্য তোমাকে একটা ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কাফেলা অনেক বড় হবে, তোমার কাফেলাতেও জনবল বেশী থাকতে হবে। হতে পারে সুলতান মাহমূদ কাফেলার সাথে সেনাবাহিনীর কোন ইউনিট পাঠিয়ে দিতে পারে। শুনেছি, সে নাকি একজন পাক্কা মুসলমান। হজ্জযাত্রীদেরকে সে খুবই সম্মান করে এবং হজ্জ যাত্রীদের সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করে।"

"এখন আমিও ইচ্ছা করলে বিরাট বাহিনী গড়ে তুলতে পারি। কারণ সকল উপজাতি বেদুঈন আমার নিয়ন্ত্রণে। সাত আটশ লোক সহজেই আমি নিয়ে আসতে পারবো, বললো হাম্মাদ। মাননীয় সেনাপতি! আপনি তো বেদুঈন কবিলাগুলো সম্পর্কে জানেন... এরা জন্ম থেকেই যোদ্ধা। এরপরও আমি সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হবো না। আমি তো সুযোগ বুঝে হঠাৎ ঝটিকা আক্রমণ করে সব লুটে নেবো।"

"হ্যাঁ, কোন পাহাড়ী এলাকায় সুবিধাজনক জায়গায় অতর্কিত আক্রমণ চালাবে... এই তো?" বললো সেনাপতি।

"না না, পাহাড়ী জায়গা কেন, কায়েদ মরু অঞ্চলে। আপনি কেমন সেনাপতি? কায়েদ মরু অঞ্চল সম্পর্কে বুঝি আপনার ধারণা নেই। কায়েদ মরু অঞ্চলে যখন কোন কাফেলার উপর আক্রমণ হবে তখন কাফেলার লোকজন খালি ময়দান পেয়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু লুকানোর মতো কোন জায়গা তারা পাবে না। কায়েদ মরু অঞ্চল সম্পর্কে আমি জানি। সেখানে

একটা জায়গা আছে যেখানে অসংখ্য বালিয়াড়ী। এই জায়গা সম্পর্কে আমার কবিলা অবগত। কোন অপরিচিত লোক ওখানে পথ হারিয়ে ফেললে তার পক্ষে বালিয়াড়ীর প্যাক মাড়িয়ে পথ পাওয়া কঠিন। এই স্থানে গযনীর বাহিনীও সুবিধা করতে পারবে না। আমার সাথে যেসব বেদুঈন কবিলার লোক আছে এরা মানুষ নয়, মানুষরূপী দৈত্য। আপনি আমাকে খলীফার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিন। তার খেদমতেও আমি কিছু উপহার পেশ করতে চাই।"

খলীফা আল কাদের বিল্লাহ তার খাস কামরায় উপবিষ্ট ছিলেন। তার একান্ত বিশ্বস্ত সেনাপতি তাকে বলছিল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাম্মাদ বিন আলী তার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছে। হাম্মাদের নিয়ে আসা বিপুল উপহার উপঢৌকন খলীফার সামনে পেশ করা হলো। সেনাপতি হাম্মাদ বিন আলীর দীর্ঘ গুণকীর্তন করলো। সেই সাথে বললো, হাম্মাদ বিন আলী অনেক কাজের লোক। সে সকল বিদ্রোহী বেদুঈন গোষ্ঠীগুলোকে আপনার তাবেদার বানিয়ে ফেলছে এবং সে এসব বেদুঈন গোষ্ঠী থেকে আপনার সেনাবাহিনীর জন্যও লোক সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। প্রয়োজনের সময় এসব বেদুঈন আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে।"

'এসব বেদুঈন খুবই স্বাধীনচেতা ও উগ্র। আমি শুনেছি এরা নাকি বিভিন্ন কাফেলা লুটে নেয় এবং অনেক তরুণী মেয়েদের অপহরণ করে এনে বিক্রি করে দেয়' বললেন খলীফা।

'জনাবে আলী মুহতারাম, এসব হচ্ছে ওদের দেয়া অপবাদ, যারা হাম্মাদ বিন আলীর জনপ্রিয়তা এবং তার শক্তির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তোষামোদীর চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ বললো সেনাপতি।

"আসলে প্রতিটি জনপ্রিয় লোকই পরশ্রীকাতর ঈর্ষাপরায়ণদের গলার কাটা হিসেবে বিবেচিত হয়। আপনারও হয়তো শত্রু আছে যখন দেখে আপনার প্রজারা আপনার নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করে দেয়। তখন হিংসুটেদের গায়ে জ্বালা শুরু হয়। ওরা অস্বস্তিবোধ করে। হাম্মাদ বিন আলী সকল বিদ্রোহী বেদুঈন গোষ্ঠীগুলোকে তার অনুগত বানিয়ে ফেলেছে এবং সে আপনার একজন অন্ধ ভক্ত। সমস্ত বেদুঈন গোষ্ঠীগুলোকেই সে আপনার অনুগত বানিয়ে ছাড়বে।"

"আমীরুল মু'মিনীন! সেনাপতির অনুগত আরেক তোষামোদকারী দরবারী আমলা বললো, এই বয়সেও আপনারা চেহারা মোবারকে যৌবনের দীপ্তি বিদ্যমান। হাম্মাদ বিন আলী আপনার জন্যে যে তুহ্‌ফা এনেছে তা আপনি রাতে আপনার হারেমে দেখতে পাবেন।

"আপনিই এই হাদিয়া উপযুক্ত" বললো সেনাপতি।

"হাম্মাদ বাইরে অপেক্ষা করছে। আপনি হাম্মাদকে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়ে তাকে সম্মানিত করুন।"

"তাকে আর বাইরে অপেক্ষমাণ রাখা হলো কেন? সারা জগতের বাদশার মতো শাহী মেজাজে বললেন খলীফা। তাকে আমি আমার সাথে বসিয়ে সম্মানিত করবো।"

খলীফার অনুমতির সাথে সাথে হাম্মাদ বিন আলীকে খলীফার সামনে হাজির করা হলো। সে ছিল প্রকৃতপক্ষেই জাত আরব। তার চেহারা ছিল টকটকে লাল আর চোখ ঘন কালো। বয়স পৌঢ়ত্বের কাছাকাছি; কিন্তু শরীরের গাঁথুনী এতোটাই মজবুত যে, তখনো দেখতে যুবকের মতো। তার চেহারার মধ্যে সেই সব আরবের দ্যুতি ছিলো যারা রোমানদের গর্ব খর্ব করে তাদের অহংকার ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছিল। যারা আরবের সীমানার বাইরে সাগর পাড়ি দিয়ে ইসলামের ঝাণ্ডা ইউরোপের বুকে গেড়ে দিয়েছিল। হাম্মাদের বাহু ছিলো লম্বা, কাঁধ চওড়া। বুক ও বাহু পেশীবহুল মাংসল।

সে যখন খলীফার কক্ষে প্রবেশ করল তখন তার পায়ের নীচে পৃথিবীটা যেনো দুলছিল। তার ঠোঁটে ছিল ঈষৎ হাসির রেখা এবং চেহারায় পৌরুষের দীপ্তি। তার চেহারার গভীর দৃষ্টি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদের দ্বারা কারো সন্দেহ করার উপায় ছিল না এই লোকটি লুটেরাদলের সর্দার।

হাম্মাদ বিন আলী প্রবেশ করতেই খলীফা দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এগিয়ে এসো হাম্মাদ বিন আলী। আল্লাহর কসম! তোমার চেহারা দেখেই আমি বুঝে ফেলেছি তুমি খেলাফতের মর্যাদা রক্ষার একজন নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক। লুটতরাজকারী বেদুঈন লোকগুলোকে বশে এনে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে তুমি ইসলাম ও খেলাফতের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছো।"

"আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার নগণ্য একজন প্রজা মাত্র বললো হাম্মাদ। প্রজাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিটা আছে, যে আপনার আনুগত্য না করার ধৃষ্টতা দেখাবে। আপনি ঠিকই বলেছেন, এই অধম খেলাফতের একজন নগণ্য সৈনিক। আপনার খেদমতে আমার জীবন এবং সমগ্র বেদুঈন গোষ্ঠীগুলোর আনুগত্য পেশ করতে এসেছি।

খলীফা হাম্মাদ বিন আলীকে এমনভাবে তার পাশাপাশি বসালেন যেন কেউ অবচেতন মনে কোন কেউটে সাপ তার জামার আস্তীনে ভরে ফেলল।

* * *

বাগদাদের খলীফার প্রাসাদ যেমন তোষামোদকারী ভোগবাদী আমলা, সেনাপতি আর দরবারীদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। খেলাফত একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। খলীফা ভোগবিলাসিতায় আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছিলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে জাতি ধর্মের সমূহ ক্ষতি হলেও তারা নিজেদের ভোগবাদিতা ও ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে থাকাটাতেই বেশী গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিলেন। ঠিক তখন সেদিনকার আন্দালুস তথা আজকের স্পেনের অবস্থাও এমনই হয়ে পড়েছিল। তৎকালীন আন্দালুসিয়ার রাজধানী কর্ডোভা চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রকারীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। স্পেন বিজয়ী তারেক বিন যিয়াদের হাড়মাংস হয়তো তখন মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল। তার আত্মা হয়তো পরিবর্তিত আন্দালুসকে জয় করার জন্য মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সকল জাহাজ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, ফিরে আসার সব ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সেই তারেক বিন যিয়াদের আন্দালুস তখন তোষামোদকারী, ক্ষমতালিপ্সু স্বার্থপর দরবারী ও আমত্যবর্গের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল।

যেদিন বাগদাদের খলীফার দরবারে এক লুটেরা ডাকাত সর্দারকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল, ঠিক সেই সময় আন্দালুসিয়ায় চলছিল ক্ষমতার মসনদ দখলে চাচা ভাতিজার দ্বন্দ্ব।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর প্রায় অধিকাংশ খলীফার যুগেই তোষামোদকারী ও চাটুকারদের একটি গোষ্ঠী খলীফাদের ঘিরে রেখেছে। তারা কখনো শাসকদের সত্যিকার পথে পরিচালিত হতে দেয়নি। প্রশংসা আর ভোগ

বিলাসিতায় শাসক গোষ্ঠীকে লিপ্ত রেখে নিজেদের জাগতিক স্বার্থ উদ্ধার করেছে। আর এই সুযোগে ইসলামের শত্রুরা ইঁদুরের মতো ক্ষমতার শিকড় কেটেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব তোষামোদকারীদের প্ররোচনায় অযোগ্য অসৎ লোকেরা শাসনকার্যের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করেছে। আর খেলাফতের ছত্রছায়ায় বসে এরা খেলাফতের বিরুদ্ধে সব ধরনের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র এবং ধ্বংসাত্মক কাজ করেছে।

ইতিহাস সাক্ষী, অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাও তাদের বিবেক বিক্রি করে দিয়েছেন। ফলে আন্দালুসে যখন ইসলামের প্রদীপ নিষ্প্রভ হয়ে আসছিল বাগদাদেও খেলাফতের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে রাজতন্ত্রের রূপ ধারণ করছিল। ফলে হাম্মাদ বিন আলীর মতো ডাকাত সর্দার বাগদাদের খলীফার কাছে পাচ্ছিল বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর মর্যাদা। অপর দিকে সত্যিকার মুসলমান ও ইসলাম প্রেমিক সুলতান মাহমূদ  ছিলেন এদের সবার জন্যেই গলার কাঁটা।

* * *

হাম্মাদ বিন আলীর সাথে চারজন নিরাপত্তারক্ষী ছিল। তাদের একজন ছিল তুর্কী বংশোদ্ভূত ইরতেগীন। দু'বছর আগে সে হাম্মাদের ডাকাত দলে ভিড়ে যায় এবং হাম্মাদের অতি বিশ্বস্ত সঙ্গী ও নিরাপত্তা রক্ষীতে পরিণত হয়।

অন্যান্য বছরের মতো সেই বছর গযনীতেও একটি হজ্জ কাফেলা মক্কা যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিল। প্রস্তুতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল কিভাবে বেশী লোক হজ্জ কাফেলাতে জড়ো করা যায়। এর ফলে ডাকাত ও লুটেরাদের হাত থেকে নিরাপদে থাকা যায়। গযনী ছাড়াও আরো বহু দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে গযনীর হজ্জ কাফেলায় শরীক হচ্ছিল। এ উপলক্ষে বহু উট, ঘোড়া এবং গরুর বেচাকেনা হচ্ছিল। ঘোড়ার গাড়ি ও গরুর গাড়ি তৈরীর ধুম পড়ে গিয়েছিল গযনীতে। অনেকটা মেলার আকার ধারণ করেছিল হজ্জ যাত্রীদের আয়োজনে। এই মেলায় হাম্মাদ বিন আলীর লোকজনও ঘোরাফেরা করছিল। তারা পর্যবেক্ষণ করছিল কাফেলার সাথে কতজন লোক যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং মালপত্র কি পরিমাণ যাবে। যে সব লোক যাবে তাদের কি লড়াইয়ের শক্তি থাকবে কি-না।

মাস দেড়েক পরে হজ্জ কাফেলার রওয়ানা হওয়ার কথা। কাফেলার যাওয়ার পথে আরব এলাকায় মরু অঞ্চলে একটি মরুদ্যান পড়ে। মরুদ্যানটি ছিল যথেষ্ট বিস্তৃত এবং গাছপালা সজ্জিত। সেখানে বহু অভিযাত্রী তাঁবু ফেলেছিল। রাতের বেলায় বহু মশাল জ্বলছিল। যেন তাঁবুর শহর। তাঁবু থেকে একটু দূরে কয়েকজন লোক আসর বেধে বসেছিল। আসরের এক জায়গায় গালিচা বিছানো ছিল। সেখানে বসেছিল হাম্মাদ বিন আলী। সেখানেও মশাল ও বাতি জ্বলছিল।

আসরের মাঝখানে এক নর্তকী নাচছিল। হাম্মাদের সাথে আরো তিন চারজন সুন্দরী যুবতী বসেছিল এবং এরা অন্যদের শরাব পেশ করছিল। যুবতীদের কাঁধ পেট ছিল অর্ধনগ্ন। তাদের পরিধেয় পাগড়ির মতো পোশাকে ছিল তারকা খচিত। এদের চালচলন এমন ছিল যেন মরুর উপর এরা সাঁতার কাটছে। সবার সামনে কয়েকটি আস্ত খাসী ভুনা করে রাখা হয়েছিল।

নর্তকীর নাচ আর বাদকদের বাজনার তাল মিলিয়ে মরুভূমির মধ্যে একটা মন মাতানো সুরের আবহ তৈরী করেছিল। সেই রাতটি যেন ছিল আলিফ লায়লার রহস্য রজনীর মতোই রহস্যে ঘেরা একরাত। মরুভূমির এই অংশটি ছিল সাধারণ গমন পথ থেকে অনেকটা দূরে। এটাই ছিল হাম্মাদ বিন আলীর জগৎ। মরুভূমির মধ্যে যে নৈসর্গিক মরুদ্যান ছিল এটিকেই হাম্মাদ বিন আলী তার শিষ্যদের আবাসস্থলে পরিণত করেছিল। হাম্মাদ বিন আলী ছিল এই জগতের সর্দার, রাজা বাদশা। এখানে হাম্মাদ ছাড়া জগতের আর কারো কোন হুকুম চলতো না।

সেই রাতে তার পাশে যারা বসেছিল তারা ছিল বিভিন্ন আরব বেদুঈন স্বাধীন গোত্রগুলোর সর্দার। যারা কোন খলীফার শাসন মানতো না। তাদের উপর কারো কোন হুকুম চলতো না। তাদের চেহারা ছবিই বলে দিচ্ছিল তারা কোন আইন কানুনের ধার ধারে না এবং তারা আল্লাহ রাসূলকেও ভয় করে না। বেদুঈনদের এই সমাবেশে সুন্দরী এই তরুণীদের মনে হচ্ছিল এরা অন্য কোন জগতের বাসিন্দা।

হাম্মাদ বিন আলীর এ রাত এভাবেই ভোগ বিলাসিতা আর শরাব পানের মধ্যে কেটে গেল। সকাল বেলা যখন সূর্য উঁকি দিল, তখন সব লোক সবুজ

বৃক্ষের ছায়ায় টাঙানো তাঁবুতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। মরুভূমিতে আগুন জ্বালিয়ে সূর্য যখন ডুবে গেল তখন তারা সবাই জেগে উঠলো এবং গত রাতের মতো আজো সেই আসরে গিয়ে জমায়েত হলো। কিন্তু পরের রাতে আর নর্তকী ছিলো না। অবশ্য শরাব পানকারিণীরা যথারীতি উপস্থিত ছিল।

"বন্ধুগণ!" বেদুঈন সর্দারের উদ্দেশ্যে হাম্মাদ বিন আলী বললো, হজ্জ কাফেলার যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে। দূরের লোকজন এরই মধ্যে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। এবার বিরাট বড় এক শিকার আসছে। এই শিকার হলো গযনীর হজ্জ কাফেলা। এই কাফেলার সাথে গযনী বাহিনীর অর্জিত হিন্দুস্তানের গনীমতের ধন-সম্পদ আসছে। তোমরা এর আগেও গযনীর কাফেলা লুটেছো কিন্তু তেমন কোন সম্পদ পাওনি। আমি খবর পেয়েছি এ বছর যে কাফেলা আসছে এটা লুট করতে পারলে তোমাদের সারা জীবনের কামাই হয়ে যাবে। কিন্তু এই কাফেলায় হাত দেয়া সহজ ব্যাপার নয়। কাফেলায় কমপক্ষে হাজার দেড়েক লোক থাকবে, সবাই থাকবে অস্ত্রসজ্জিত। তাছাড়া তাদের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনীর লোকজনও থাকবে। দু'একশ লোকের পক্ষে এই কাফেলায় হাত দেয়া সম্ভব নয়। আমাদের সবাইকে মিলে একটি সংঘবদ্ধ সেনাবাহিনীর মতো আক্রমণ করতে হবে...। তোমরা সবাই কি বলতে পারো, তোমরা প্রত্যেকেই কতোজন করে লোক সাথে আনতে পারবে?"

"এক হাজার" একজন হাত তুলে বললো।

"ছয়শ" আরেক গোত্রপতি হাত তুলে বললো।

"চারশ"" বললো আরেকজন।

একে একে সব গোত্রপতি বললো কতোজন লোক আনতে পারবে। সব মিলে সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচ হাজার।

"মনে রেখো, আমাদের দরকার সিপাহী যোদ্ধা। পাঁচ হাজার যুবক দিয়ে আমাদের কোনই কাজ হবে না" বললো হাম্মাদ বিন আলী। হয়তো আমাদের যুদ্ধ করার দরকার নাও হতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি বাগদাদ থেকে এসেছি। খলীফার এক সেনাপতি আমাকে বলেছে, গযনীর সুলতান মাহমূদ হাজীদের খুব সম্মান করে এবং তাদের সেবা যত্নের প্রতি খুবই খেয়াল রাখে। বিরাট এই কাফেলার নিরাপত্তার জন্যে সে হয়তো কোন সেনা ইউনিটও পাঠিয়ে দিতে পারে।"

প্রত্যেক গোত্রপতি হাম্মাদকে এই বলে আশ্বস্ত করলো, তারা এমন লোকদেরই আনবে যারা গযনীর সেনাবাহিনীকেও কচুর মতো কেটে ফেলবে।

"তোমরা যদি সত্যিই সৈনিকের মতো শক্তি নিয়ে আসতে পারো তাহলে তোমাদেরকে আমি বাড়তি আরেকটি পুরস্কার দেবো।" বললো হাম্মাদ। হাম্মাদের পাশেই বসা ছিল এক সুন্দরী তরুণী। বিগত এক বছর যাবত এই তরুণী হাম্মাদের সাথে ছিল। হাম্মাদ তরুণীর মাথায় হাত রেখে বললো, এ হলো গযনীর সুন্দরীদের নমুনা। গযনীর কাফেলা থেকেই আমি একে পেয়েছি। এবার এমন বহু সুন্দরী আসছে। অনেকেই আসছে গোটা পরিবার পরিজন নিয়ে। কাজেই বহু সুন্দরী থাকবে এবারের কাফেলায়। এমন পুরস্কার তোমরা আর কোথাও পাবে না।"

তরুণীটি তখন মুচকি হাসছিল। কিন্তু গযনীর কাফেলা থেকে তরুণীদের অপহরণের কথা শুনে তার চেহারা লাল হয়ে গেল।

হাম্মাদ এরপর বলতে শুরু করলো, কোথাও কোন মোক্ষম সুযোগে গযনীর কাফেলার উপর আক্রমণ করা হবে। হাম্মাদের পেছনেই দাঁড়ানো ছিল তার বডিগার্ড ইরতেগীন। মরুর এই মজলিসে কোন নিরাপত্তারক্ষীর দরকার ছিল না। কিন্তু হাম্মাদ এই মরুরাজ্যের রাজা। রাজার মর্যাদা বুঝানোর জন্যে তার পেছনে একজন নিরাপত্তারক্ষীকে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো।

হাম্মাদ যখন বেদুঈন গোত্রপতিদের সাথে কথা বলছিল তখন তরুণী আড়চোখে কয়েকবার তাকিয়েছিল ইরতেগীনের প্রতি। ইরতেগীনের চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু যখন গযনীর কাফেলা থেকে তরুণীদের অপহরণের কথা বললো ডাকাত সর্দার হাম্মাদ, তখন তরুণী গভীরভাবে তাকালো ইরতেগীনের দিকে। তরুণী দেখলো, একথা শোনার পর ইরতেগীনের চেহারা পুরো বদলে গেছে। যেন তার কোন মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।

বেদুঈন গোত্রপতিরা মিলে গযনীর হজ্জ কাফেলা লুটে নেয়ার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করলো এবং কিয়াদ নামক মরু অঞ্চলকেই তারা একাজের জন্যে উপযোগী বলে সাব্যস্ত করলো।

* * *

সেই রাতের ভিন্ন একটি পর্ব। হাম্মাদ বিন আলী গভীর ঘুমে অচেতন। তার পাশের তাঁবুতে সবিলা নামের হাম্মাদের এক রক্ষিতা শুয়ে ছিল। কিন্তু তার দু'চোখে ঘুম নেই। এই সবিলা জন্মসূত্রে গযনীর মেয়ে। সারা ডাকাতপল্লী যখন ঘুমের ঘোরে নীরব নিস্তব্ধ তখনো নিজের তাঁবুতে দুচোখের পাতা এক করতে পারছিলো না সবিলা। রাতের এই ডাকাতপল্লী যেন তখন মৃত নগরী। সবাই নির্বিঘ্নে অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘুমাবেই না কেন, এই ডাকাতদের দুনিয়ার কোন ভয় তো তাদের ছিল না। না তাদের উপর চলতো কোন শাসকের শাসন। তাদের উপর কেউ রাতের বেলায় হানা দেবে এমন দুঃসাহস আরব কেন পৃথিবীর কোন জনগোষ্ঠীরও তখন ছিলো না। এমনই ভয়ঙ্কর হিংস্র ছিল এরা। তাদের এখানে রাতের বেলায় পাহারার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

নির্ঘুম সবিলা বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। কিছুই দেখা গেলো না। জন মানুষের কোন সাড়া শব্দ নেই। কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার এসে শুয়ে পড়লো সবিলা। কিছুক্ষণ পর আবার বিছানা ছেড়ে উঠলো সবিলা। এক অসহনীয় অস্থিরতা তার বুকে। কোন মতেই সেটা তাকে ঘুমাতে দিচ্ছিল না। আবার তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকাল সে। বাইরের দিকে তাকাতেই আড়াআড়িভাবে থাকা দু'টি খেজুর গাছের ফাঁকে তার দৃষ্টি আটকে গেল। রাত অন্ধকার, কিন্তু তারা ভরা আকাশ। কিছুটা তারার আলো যেন অন্ধকার রাতের মধ্যে আলোর আভাস ছড়িয়েছে। সবিলা হঠাৎ দেখতে পেলো একটা ছায়া মূর্তি। তার দৃষ্টি একটি জোড়া খেজুর গাছের মধ্যে এসে স্থির হয়ে গেছে। সবিলার বুঝতে বাকি রইলো না এই তার কাঙ্ক্ষিত আগন্তুক। সে একটি পুরুষের আলখেল্লা গায়ে জড়িয়ে খুব সন্তর্পণে তাঁবুর বাইরে বের হয়ে খেজুর বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হলো।

সবিলা অগ্রসর হলে আগন্তুক ছায়া মূর্তিটি খেজুর গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ঘন খেজুরবীথির দিকে অগ্রসর হলো। কিছুক্ষণ পর ঘন খেজুরবীথির মধ্যে মিলিত হলো দু'জন। ছায়ামূর্তিটি আর কেউ নয় সবিলার অতি পরিচিত তার কথিত স্বামীর দেহরক্ষী ইরতেগীন।

রাতের বেলা যখন বেদুঈন গোত্রপতিদের মদের আসর শেষ হলো তখন সুযোগ বুঝে এক ফাঁকে সবিলা ইরতেগীনকে বলেছিল, "আজ রাতে তুমি পানির ধারের জোড়া খেজুর গাছটার কাছে এসো। তোমার সাথে আমার জরুরী কথা আছে।"

ইরতেগীন ও সবিলার মধ্যে গোপনে সাক্ষাতের মতো কোন সম্পর্ক ছিলো না। এমন সম্ভাবনাও ছিল না তাদের মধ্যে। সম্পর্ক বলতে শুধু এতটুকু তারা একজন অপরজনকে দেখলে মুচকি হাসতো। তাছাড়া এক সময় উভয়েই ছিল একই মালিকের মালিকানাধীন ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী। এই লুটেরা জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের কারো দূরতম কোন সম্পর্ক বা পরিচয় ছিল না। এরা দু'জনকে একই কাফেলা থেকে অপহরণ করে এনেছিল এই ডাকাত গোষ্ঠী।

সবিলা ছিল গযনী সেনাবাহিনীর উট ইউনিটের এক সৈনিকের মেয়ে। তার বাবা সেনাবাহিনীর শুধু একজন উট চালকই ছিলো না, সে ছিল সুলতান মাহমূদের একজন গুণমুগ্ধ সিপাহী। এই সৈনিক সুলতান মাহমূদের সাথে দুইবার হিন্দুস্তান অভিযানে গিয়েছিল। সে যেমন ছিল ধার্মিক তেমনই ছিল দেশ, জাতি ও ইসলামের জন্যে উৎসর্গিত প্রাণ। সন্তানদেরকে সে সব সময় বলতো, ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম। ইসলামকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। তার বাবা তাদেরকে সময়ে সময়ে যুদ্ধ ও জিহাদের নানা গল্প শোনাতো। ছোটবেলা থেকে শোনা এ গল্পের চেতনা সবিলার রক্তে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সবিলার তেরো বছর বয়সেই তার পিতৃবিয়োগ ঘটে। সেনাবাহিনীর উটর পরিচালক ইউনিটের সৈনিক সবিলার পিতা এক যুদ্ধে নিহত হয়। মৃত্যুর পর সবিলার মা তার স্বামীর জানা শোনা এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সবিলার সৎ পিতার আগের সন্তান ছিলো। তাদেরকেই সে আদর স্নেহ করতো, সবিলা ও তার ছোট এতীম দুই ভাইয়ের ভাগ্যে আর তেমন আদর স্নেহ জুটেনি। তার মায়ের পক্ষেও তাদের প্রতি যথার্থ যত্ন নেয়ার অবকাশ ছিলো না। কারণ এই নতুন স্বামীর সাথে বিয়ে হওয়ার পর আবারো সবিলার মায়ের দুটি বাচ্চা হয়। এদের এবং সবিলার বৈপিত্রেয় সন্তানদের নিয়েই সবিলার মাকে ব্যস্ত থাকতে হতো।

সবিলার বয়স যখন ষোল সতেরো তখন তার সৎপিতা বয়স্ক এক লোকের সাথে তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়। সবিলা ছাড়াও এ লোকের আরো দুজন স্ত্রী ছিল।

সবিলার এই স্বামী ছিল বিত্তবান সম্মানী লোক। সে অবাধে মদ্যপন করতো। ইরতেগীন ছিল সবিলার স্বামীর কেনা গোলাম।

সবিলাকে তার সৎ বাবা এই বয়স্ক লোকটির সাথে বিয়ে দিয়ে মোটা অঙ্কের পণ নিয়েছিলো। আসলে এটা বিয়ে ছিলো না ছিল এক প্রকার বিক্রি।

ইরতেগীন ছিল তুর্কি বংশজাত। শৈশব থেকেই গোলামীর শেকলে বাধা তার জীবন। যৌবনে পদার্পণ করার সাথে সাথে ইরতেগীনের দেহের অঙ্গ সৌষ্ঠব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। যৌবনের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে। তার তখনকার মালিক ইরতেগীনের সুঠাম দেহসৌষ্ঠবে মুগ্ধ হয়ে তাকে অশ্বারোহণ, তীরন্দাজী ও তরবারী চালনা শিখিয়ে ইরতেগীনকে তার দেহরক্ষীতে রূপান্তরিত করে। সেই যুগে কারো সাথে একজন দেহরক্ষী রাখাটা বিরাট মর্যাদা ও সম্মানের বিষয় ছিল।

সেই মুনীবের মৃত্যুর পর তাকে আরেক ধনী ব্যক্তি কিনে নেয়। সেই লোক কয়েক বছর পর এক ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করে এবং মেয়ের বিনিময়ে ইরতেগীনকে ব্যবসায়ীর হাতে দিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত এই লোকও ইরতেগীনকে বিক্রি করে দেয়। শেষ বার তাকে খরিদ করে সবিলার কথিত ধনী স্বামী। সবিলার স্বামীর একান্ত দেহরক্ষী ও সেবক হিসেবে যতটুকু সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক ইরতেগীনের সাথে সবিলার এতটুকুই পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল।

প্রায় বছর খানে আগে সবিলার স্বামী সবিলাকে সহ একটি সফরে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে গোটা কাফেলাকেই ডাকাতদল ঘিরে ফেলে। কাফেলার লোকেরা প্রথমে মোকাবেলা করলো বটে কিন্তু তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতিয়ার ফেলে দিতে বাধ্য হলো। কিন্তু এই দলের মধ্যে একমাত্র ইরতেগীন তখনো একাকী লড়ে যাচ্ছিল। সে তার ঘোড়াকে জায়গা বদল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মোকাবেলা করে যাচ্ছিল। ডাকাতদলের লোকেরা তাকে বশে আনতে পারছিল না। এই অবস্থা দেখে ডাকাত দলের সর্দার ঘোষণা করলো ওকে হত্যা না করে জীবিত পাকড়াও করে আনো।

কাফেলার লোকজন হতাশ হয়ে পড়েছিল। বহু ডাকাতের সাথে একা ইরতেগীন মোকাবেলা করছিল। শেষ পর্যন্ত ইরতেগীনকে কাবু করতে না পেরে ডাকাতেরা তার গোড়াকে আহত করে বেকার করে তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে

বন্দী করে ফেললো। ডাকাত দল কাফেলার সমস্ত মালপত্র কেড়ে নিল। সেই সাথে তারা হাতিয়ে নিলো অমূল্য দু'জন মানবসম্পদ। তন্মধ্যে একজন ইরতেগীন আর অপরজন সবিলা।

নিজের অস্বাভাবিক সৌন্দর্যই ছিল সবিলার জন্যে সবেচেয়ে বেশী দুর্ভাগ্যের কারণ। সে ছিল অবলা নারী। শত কান্নাকাটি করেও মুক্তি পেলো না। ডাকাতরা তাকে নিয়ে গেলো। আর ইরতেগীনকে হাতে পায়ে রশি দিয়ে বেধে ঘোড়ার পিঠে ফেলে দিল। তবুও সে বারবার ডাকাতদের হুকমি দিচ্ছিল, "তোমরা কাপুরুষের মতো আমাকে এভাবে না বেধে দু'জন দু'জন করে আমার মোকাবেলায় এসো। যদি আমি টিকতে না পারি তবে নিয়ে যেয়ো।" কিন্তু ডাকাতরা সর্দারের কথায় ইরতেগীনকে মোকাবেলার সুযোগ না দিয়ে কয়েকজন মিলে ঝাপটে ধরে তাকে বেধে ফেলতে সক্ষম হলো। ফলে ইরতেগীনের আর করার কিছুই রইলো না।

কয়েক দিনের সফরের পর ইরতেগীন ও সবিলাকে হাম্মাদ বিন আলীর সামনে পেশ করা হলো। এই ডাকাত দলটি ছিল হাম্মাদের নিয়ন্ত্রিত। সবিলা তো কোন কথাই বলতে পারছিল না। কিন্তু ইরতেগীন হাম্মাদকেও হুমকি দিচ্ছিল।

কিন্তু হাম্মাদ ছিল কথার যাদুকর। নানা কথায় অল্প সময়ের মধ্যেই সে ইরতেগীনের ক্ষোভকে প্রশমিত করে তাকে শান্ত করে ফেলল। স্বাভাবিক হলে নানা কথাবার্তায় ও নিজের পরিচয় দিয়ে ইরতেগীন যখন জানাল সে ছিল গোলাম। এ পর্যন্ত সে তিন মুনীবের হাত বদল হয়েছে। এ কথা শুনে হাম্মাদ তাকে সস্নেহে কাছে বসালো এবং বললো–

"আজ থেকে তুমি কারো গোলাম নও। এখানে তুমি বাদশা। তুমি একজন সুলতান। তোমার উপর কেউ খবরদারি করবে না। আমি আমার লোকদের কাছে শুনেছি সবাই মিলেও নাকি তোমাকে বশে আনতে তাদের ঘাম ঝরাতে হয়েছে। তখনই আমি তোমাকে আমার একান্ত দেহরক্ষী হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি ছাড়া তোমার মর্যাদা আর কেউ দিতে পারবে না।"

"তুমি কি আমাকে তোমার মতোই ডাকাত বানাতে চাও?" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানতে চাইলো ইরতেগীন।

"তুমি কি গোলাম থাকাই পছন্দ করো? স্বাধীন জীবনের স্বাদ নেয়ার ইচ্ছা কি তোমার কাছে পছন্দ নয়?" উল্টো প্রশ্ন করলো হাম্মাদ।

অনেক কথার পর হাম্মাদ শেষ পর্যন্ত ইরতেগীনকে সম্মত করালো সে হাম্মাদের একান্ত দেহরক্ষী হয়ে তার সাথে স্বাধীন ভাবে থাকবে।

হাম্মাদ যখন জানতে পারলো, ইরতেগীন ছিল সবিলার স্বামীর দেহরক্ষী যে মেয়েকে তার দল অপহরণ করেছে। তখন সে সবিলাকে বললো–

"তুমি যদি আমার কাছে রাণীর মর্যাদায় থাকতে চাও, তবে তোমার স্বামীর দেহরক্ষীকে আমার সাথে থাকতে রাজী করাও; নয়তো তোমাদের উভয়ের পরিণাম খুব খারাপ হবে।"

"একথা শুনে সবিলা ইরতেগীনকে আলাদা জায়গায় নিয়ে বললো– "আমার দিকে তাকিয়ে তুমি এদের সাথেই থাক। সবিলা তাকে আরো জানালো, হাম্মাদ এ প্রশ্নে তাকে কি হুমকি দিয়েছে। ইরতেগীন হাম্মাদের যাদুকরী কথায় মুগ্ধ হয়েই তার সাথে থাকতে সম্মত হয়েছিল। সবিলার করুণ মিনতি ও তার চোখের অশ্রু ইরতেগীনকে হাম্মাদের সাথে থাকতে বাধ্য করলো। তার এ ইচ্ছা আরো দৃঢ় হলো।

হাম্মাদ পরদিনই ইরতেগীনকে একটি তাজী ঘোড়া উপহার দিল এবং সবিলাকে রক্ষিতা হিসেবে নিজের কাছে রাখল। আর ইরতেগীনকে বললো, তোমার ডাকাতি করতে হবে না। তুমি সব সময় আমার সাথে আমার একান্ত প্রহরী হিসেবে থাকবে।

কিছু দিনের মধ্যেই এরা ডাকাত দলের রীতিনীতির সাথে মিশে গেল। ইরতেগীন যেহেতু হাম্মাদের একান্ত দেহরক্ষী ছিল এজন্য তাকে ডাকাতিতে শরীক হতে হতো না।

সে সময়কার অধিকাংশ আরব বেদুঈন জনগোষ্ঠী ছিল হিংস্র ও লড়াকু। এরা নিজ গোত্রের গোত্রপতিকে ছাড়া পৃথিবীর আর কারো কোন হুকুমের পরওয়া করতো না। কিন্তু হাম্মাদ বিন আলীকে সব বেদুঈনই মানতো এবং সম্মান করতো। এরা তাকে মুকুটহীন বাদশা মনে করতো। কারণ তৎকালীন খলীফা এবং খলীফার যেসব কর্মকর্তা হাম্মাদকে গ্রেফতার করে এই দুর্ধর্ষ ডাকাত দলকে নির্মূল করে দিতে পারতো, হাম্মাদ তাদের সবাইকে এবং বিশেষ

করে খলীফাকে তার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী বানিয়ে নিয়েছিলো। ফলে নির্বিঘ্নে এসব ডাকাত বেদুঈন গোষ্ঠী রাহাজনীও লুটতরাজে লিপ্ত থাকতে পেরেছিল। খলীফার কাছে হাম্মাদকে উপস্থাপন করা হয়েছিল একজন খ্যাতিমান বেদুঈন ব্যবসায়ী হিসেবে। আরো বলা হয়েছিল, হাম্মাদ সকল বেদুঈন জনগোষ্ঠীকে তার অনুগত বানিয়ে ফেলেছে, যেসব লোক বাগদাদের খেলাফতের শাসনকেও স্বীকার করতে নারাজ।

এভাবেই যেতে লাগল সবিলার দিন। সবিলাকে এক অর্থে হাম্মাদ রাজরাণী বানিয়ে দিল। আর ইরতেগীনকেও যথার্থ অর্থেই স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করার সুযোগ দিল। দিনে দিনে তারা উভয়েই সন্ত্রাসী ও বেদুঈন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। সবিলা ও ইরতেগীনের মধ্যে প্রতিদিনই দেখা হতো। তাদের মধ্যে সম্পর্কের বড় উপাদান ছিল তারা উভয়েই অপহৃত হয়ে বেদুঈন সর্দারের হাতে নীত হয়েছিল। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তারা উভয়েই ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিল।

রাতের অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে সাবিলা ইরতেগীনের সাথে সাক্ষাত করতে এলো। তাদের মধ্যে এটাই ছিল প্রথম সাক্ষাত। গোপন সাক্ষাতের প্রস্তাবে ভাবনায় পড়ে গেলো ইরতেগীন। সাবিলা তাকে কেন রাতের বেলায় একান্তে সাক্ষাত করতে বললো? সে কি তার মুনিবের সাথে বেঈমানী করতে চায়? সে কি কোন অভিসারের জন্যে ইরতেগীনকে সম্মত করাতে চায়?

এদিক সেদিক সতর্ক চোখ রেখে একটি খেজুর ঝোপের মধ্যে গিয়ে সাবিলাকে একটু শক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো ইরতেগীন।

কী ব্যাপার সাবিলা? এমন কি জরুরি কথা আছে, যেটা তুমি দিনের বেলায় তোমার তাঁবুতে ডেকে বলতে পারলে না, রাতের বেলায় এখানে নিয়ে এসেছো সে কথা বলতে?

দেখো ইরতেগীন! আমি তোমাকে আমার মৃত স্বামীর গোলাম মনে করে সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে এখানে ডাকিনি। তুমি নিজেকে আমার গোলাম মনে করো না এবং হাম্মাদ বিন আলীরও গোলাম মনে করো না। বললো সাবিলা।

আমি তোমার ভিতরের গোলামীর জিঞ্জির ছিড়ে এক স্বাধীন সক্ষম পুরুষকে জাগাতে এসেছি। আমি তোমার মধ্যে এমন মানুষকে জাগাতে এসেছি যে মানুষ কারো গোলামী করে না, যে শুধু আল্লাহর গোলামী করে। যে মানুষ নিজের দেশ ও ধর্মের জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়।

এসব কি বলছো সাবিলা? ম্লান হেসে ইরতেগীন বললো– মনে হচ্ছে তুমি স্বপ্ন দেখছো, ঘুমের ঘোরে কথা বলছো।

না না, আমি কোন স্বপ্ন দেখছি না ইরতেগীন! আমি ঘুমের ঘোরেও কথা বলছি না। আমি একথাই তোমাকে বলতে এসেছি, আমি জেগে উঠেছি। আমি এখন ডাকাত সর্দারের রক্ষিতা নই। আমি এখন গযনীর সেই

শহীদ সৈনিকের মেয়ে সাবিলা। যার পিতা জিহাদে শাহাদত বরণ করেছে। কিন্তু এতোদিন সেই সাবিলা মরে গিয়েছিল। কারণ, আমার বাবার শাহাদতের পর আমার মা যখন এক ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেছিল। সেই অর্থলোভী লোকটি আমার যৌবনের শুরুতেই টাকার লোভে তোমার মালিকের কাছে বিয়ের নামে আমাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। তোমার মুনীবের কাছে বিক্রি হওয়াটাকে জীবনের নিয়তি ভেবে আমি আমার আশৈশব লালিত নারীর সত্তাকে গলাটিপে মেরে ফেলেছিলাম।

অবলা নারী আর গোলামের বিধিলিপি এমনই হয়ে থাকে। বললো ইরতেগীন।

তুমি যেমন তোমার দুর্ভাগ্য দেখেছো। আমিও আমার ভাগ্যের নির্মম পরিণতি সহ্য করেছি। কিন্তু এ নিয়ে আমার কোন দুঃখ নেই। কারণ, গোলাম হিসেবেই আমার জন্ম হয়েছিল। বেদুঈন গোত্রের সাথে এখানে ওখানে যাযাবর অবস্থাই আমি বড় হয়েছি আর এক হাত থেকে অন্যের হাতে বিক্রি হয়েছি।

অবশ্য আমি একবার শুনেছিলাম, ইসলাম কোন মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখার অনুমতি দেয় না। একথা শুনে আমি হেসে ছিলাম। কারণ, মুসলমান আমীর উমারারাই তো মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখে।

এরা ভোগবিলাসে মত্ত অবাধ্য মুসলমান। বললো সাবিলা। ইসলামের দৃষ্টিতে কাউকে গোলাম বানিয়ে রাখা মস্তবড় অপরাধ। তোমার মুনিবের সাথে আমার বিয়েটাও ছিল এমনই একটা অপরাধ। প্রকৃত পক্ষে এটা বিয়ে ছিলো না। রীতিমতো একটা লেনদেন। পয়সার বিনিময়ে সৎপিতা নামের ওই অসৎ লোকটা আমাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। প্রথমে এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। সব সময় আমার মন উদাস থাকতো। কিন্তু একপর্যায়ে নারীর ভাগ্য এমনই হয় ভেবে সব মেনে নিলাম। নিজেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক করে নিলাম। সয়ে নিলাম সবকিছু। নিজের সুখ স্বপ্ন সোহাগ আহ্লাদকে নিজ হাতে দাফন করে হাসি খুশী থাকতে এবং যা ভাগ্যে জুটেছে তাই নিয়ে সুখী হতে চেষ্টা করলাম। তখন হয়তো কখনো আমাকে হাসতে দেখেছো তুমি। কিন্তু এটা আমার স্বতস্ফূর্ত হাসি ছিলো না। এটা

ছিলো দামী অলঙ্কার ও দামী কাপড়ে মোড়ানো কৃত্রিম হাসি। আমার এই বিক্রি হওয়ার মূলে ছিল আমার যৌবন আর রূপ। সেই বণিক টাকা দিয়ে আমার শরীরটা কিনে নিয়েছিল। কিন্তু আমার শরীরটা দামী কাপড় ও অলঙ্কারে মোড়ানো থাকলেও অন্তরটা দিন রাত গুমড়ে কাঁদতো।

ঠিক বলেছো। তোমার মতো মেয়ের বিয়ে তোমার মতোই কোনো সুন্দর যুবকের সঙ্গে হওয়া উচিত ছিলো। বললো ইরতেগীন।

এখন আমি আমার এই মন্দ নিয়তি আর অসম বিয়ের কান্না কাঁদছি না ইরতেগীন! আমার বাবা বেঁচে থাকাবস্থায় কখনো আমি বিয়ে করবো এমনটি চিন্তাও করিনি। কারণ বাবা আমার মনে একটাই চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, আমি একজন মুসলমান। আমাকে জীবন ও সম্পদের লোভ ত্যাগ করে কুফর খতম করতে হবে। কখনো কখনো আমার মনে হতো, হিন্দুস্তানের মূর্তিগুলো যেন আমাকে হুমকি দিচ্ছে। কারণ, আমার বাবা দু'বার হিন্দুস্তান গিয়েছিলেন। তিনি হিন্দুস্তানের বহু মন্দিরের ধ্বংসযজ্ঞ নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বিজিত মন্দিরে মুসলমানদের আযানও শুনেছেন। আমার বাবা সেই সব মুজাহিদদের একজন যাদের জীবন রণাঙ্গণেই বেশি কেটেছে। সেই বাবার রক্ত আমার দেহে প্রবাহিত ইরতেগীন!

সাবিলা! তুমি কি ভুলে গেছো আমরা কোথায় বসে এসব কথা বলছি? কেউ যদি দেখে ফেলে আর হাম্মাদকে জানিয়ে দেয় তবে হাম্মাদ আমাদেরকে হাত-পা বেধে মরুভূমিতে ফেলে রাখবে। মরুভূমির মৃত্যুর কষ্ট যে কী তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না সাবিলা!

আমাকে আগে এ কথাটি বলো, আজ রাতে তোমার এই অতীতের কাহিনী আমাকে কেন শোনাচ্ছো? তুমি যদি নিজের স্বাধীন সত্তাকে মেরেই ফেলে থাকো তবে আবার জাগিয়ে তুলছো কেন? যে শিকল এখন তোমার গলায় লেগেছে, তা আর ছেড়া সম্ভব নয়। আমি তো দেখছি তুমি বেশ সুখেই আছো?

হ্যাঁ, ইরতেগীন! এখানে আমি বেশ সুখেই ছিলাম। আমি যদি শুধু হাড়মাংসের অনুভূতিহীন পুতুল হতাম তাহলে এ নিয়ে আমার সুখী না

থাকার কোন কারণ থাকতো না। কিন্তু আজ রাতে আমার পুতুল সর্বস্ব জীবন চাপা পড়ে আমার ভেতরে আবার সেই কৈশোরের স্বাধীনসত্তা জেগে উঠেছে। এক ডাকাত সর্দারের রক্ষিতার স্থলে আগের সেই বীর মুজাহিদ কন্যার সত্তা ফিরে এসেছে। যার কারণে আমি তোমাকেও জাগাতে এসেছি, কারণ তোমার সাহায্য ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।

আমি কি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে পালিয়ে যাবো? জানতে চাইলো ইরতেগীন। এটা কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়!

না, পালানোর ব্যাপার নয়। আমি এখান থেকে পালাতে চাই না। কিন্তু তোমাকে পালাতে হবে...।

শোন ইরতেগীন! তুমি যখন আমার স্বামীর গোলাম ছিলে, তুমি জানো তখন তোমার সাথে আমার কি সম্পর্ক ছিলো? তোমার হয়তো মনে আছে, একবার আমার স্বামী তোমাকে কোথাও পাঠাতে চাচ্ছিল, তখন তুমি ছিলে খুবই অসুস্থ। কিন্তু আমার স্বামী বলছিল পথের মধ্যে তুমি মারা গেলেও তোমাকে যেতে হবে। তখন আমি তোমাকে এই দুর্দশা থেকে রক্ষা করেছিলাম।

এজন্য আমার স্বামীর সাথে আমাকে লড়াই করতে হয়েছিল। আমি তাকে বলেছিলাম, যে লোকটি অসুখের কারণে উঠে দাঁড়াতে পারে না, তাকে তুমি কিভাবে এমন কষ্টকর দীর্ঘ সফরে পাঠাচ্ছো? সেদিন আমি তোমাকে পাঠাতে বাঁধা দিয়ে বাড়িতে রেখে ডাক্তার ডেকে তোমার চিকিৎসা করিয়েছিলাম। তুমি জানো না, তোমার প্রতি এই মানবিক মমতা দেখানোর কারণে আমার স্বামীর কাছে আমাকে কতো কটু কথা শুনতে হয়েছে।

সবই আমার মনে আছে সাবিলা! মুনিব এজন্য আমাকেও অনেক গালমন্দ করেছিল। সে তো আমাকে এতটুকু পর্যন্ত বলেছিল, তোর আর সাবিলার মধ্যে এমন মাখামাখি যেন আর কখনো দেখা না যায়। যদি দ্বিতীয়বার এমনটি ঘটে তবে তুই ভালো করেই জানিস গোলামের শাস্তি ও পরিণতি কি ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে...।

ওই সময়ের চেয়ে এই ডাকাতদের সাথে আমি বেশ ভালো আছি সাবিলা! এখানে আর কিছু না পাই, অন্ততঃ আমাকে কেউ গোলাম বলে তাচ্ছিল্য করে না।

তবে তুমি যদি ভীষণ কোন কষ্টে থেকে থাকো, তোমার উপকারের প্রতিদান দিতে আমি জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবো না সাবিলা!

এরপর দীর্ঘ সময় ইরতেগীনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রইলো সাবিলা। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে ইরতেগীনের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছিল সে। মরুভূমির সেই রাতটি ছিল নীরব নিস্তব্ধ। মনে হচ্ছিল তাঁবুর পল্লী যেন প্রাণহীন মূর্তির পল্লী। সেই রাতে মরুর শিয়ালগুলোও যেন ডাকতে ভুলে গিয়েছিল, ঘুমিযে পড়েছিল শিয়ালের পাল। কিন্তু সাবিলার বুকের মধ্যে বারবার জেগে উঠছিল কৈশোরের ঈমানের স্ফূলিঙ্গ।

কী ব্যাপার! নীরব হয়ে গেলে কেন সাবিলা? বলো কি বলতে চাও। এই গোলামকে একবার পরীক্ষা করে দেখো। বললো ইরতেগীন।

ভাবছি, তুমি আমার কথার আসল অর্থ বুঝবে কি না। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো সাবিলা। যাক, তবুও বলছি। শোন...। আমি নিজের জন্যে তোমার কাছে কিছুই চাই না। তোমার কাছে কোন প্রতিদানও প্রত্যাশা করি না। তুমি কি হাম্মাদ বিন আলীর কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলে, যে কথাগুলো সে বেদুঈন সর্দারদের বলছিলো? সে গযনীর হজ্জ কাফেলা লুটে নিতে চায়।

তুমি কি তা রুখতে পারবে? বিস্মিত কণ্ঠে বললো ইরতেগীন। এখনো কি মন থেকে গযনীর মায়া দূর করতে পারোনি?

গযনীর স্মৃতি আমি মন থেকে বিদায় করে দিয়েছিলাম। কিন্তু গযনীর সম্ভ্রম আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। হাম্মাদ গযনীর হজ্জ কাফেলা লুটে নেয়ার কথা বলছিল, তাতে আমার মনে কোন আঘাত লাগেনি। কিন্তু সে যখন আমার মাথায় হাত রেখে বললো–

এ হলো গযনীর সুন্দরী মেয়েদের নমুনা। ঐ কাফেলা লুটতে পারলে একে তোমরা পাবে। আর এর মতো অনেক সুন্দরী সেই কাফেলায় থাকবে, যেগুলো তোমাদেরকে উপহার স্বরূপ দেয়া হবে; তখন আমার শরীর কেঁপে উঠলো। যেন প্রচণ্ড হিম শীতল কোন বাতাস আমার শরীরের শিরায় শিরায় ঢুকে গেছে। কিংবা হঠাৎ জমিন কেঁপে উঠেছে।

তখন আমার মুজাহিদ বাবার চেহারা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তার সেইসব কথা আমার কানে বাজতে লাগলো, যেসব কথা তিনি

আমাকে বারবার বলেছেন। কিন্তু আমি অবলা নারী। আমি অসহায়। তবুও হাম্মাদের কথার তীরে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটছে। অসহায়ের মতো আমি শুধুই ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছি। কিছুই করার ছিল না আমার।

ও আচ্ছা! তার কথায় ক্ষেপে গিয়েই হয়তো তখন তুমি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলে?

হ্যাঁ, এজন্যই তোমার দিকে তাকিয়েছিলাম। কারণ, আমার বুকে তখন প্রতিশোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল। আর তখন আল্লাহ ছাড়া আমার পাশে কেউ ছিল না। কিন্তু তোমার চেহারা দেখে বুঝা যাচ্ছিল, হাম্মাদের কথায় তোমার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই হয়নি। তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, একান্তে তোমাকে ডাকবো এবং তোমার মধ্যেও গযনীর সম্ভ্রম ও মর্যাদার আগুন জ্বেলে দেবো, যে গযনী তোমার মতো বীর যুবককে জন্ম দিয়েছে।...

আমি এটাও ভেবেছি, আমি নিতান্তই এক অসহায় মেয়ে। ডাকাতদের এই পল্লীতে ডাকাত সর্দারের আমি কিছুই বিগড়াতে পারবো না। একথা ভেবে আমি যন্ত্রণাটা সামলে নেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু হাম্মাদ তাঁবুতে গিয়েই আমার দিকে চরম আসক্তি নিয়ে তার নোংরা হাত বাড়ালো এবং আমাকে কাছে টেনে নিল। আমি যখন তার শরীরের উষ্ণতা অনুভব করলাম, তখন আমার মধ্যে আবার সেই আগুন জ্বলে উঠলো।

ইরতেগীন এতোটাই নীরব ছিলো যেন সে কোন কিছুই শুনছিলো না। তাই তাকে পরখ করার জন্যে সাবিলা জিজ্ঞেস করলো– আমার কথা শুনতে পাচ্ছো ইরতেগীন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনোযোগ দিয়েই তোমার কথা শুনছি সাবিলা! বুঝতে পারছি তোমার প্রতিশোধের আগুন এখন অনিয়ন্ত্রিত এবং তোমাকে সেটা ক্রমেই অস্থির করে তুলেছে।

শোন ইরতেগীন! হাম্মাদ আমাকে আজ রাতেই বলেছে– সাবিলা! শুনেছি গযনীর সুলতান মাহমূদ নাকি নিজেকে মূর্তিবিনাশী বলে বড়াই করে। এই বলে সে একটা অট্টহাসি দিয়ে বললো, আসলে সে একটা লুটেরা।

আমার মতো সেও একটা ডাকাত। দেখবে একদিন আমি সেই মূর্তি বিনাশীর মূর্তিই ভেঙে দেবো।

একথা শোনার পর আর আমি স্বাভাবিক থাকতে পারলাম না। সে যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো, তখন আমি তার খঞ্জরটি হাতে তুলে নিলাম। তখন আমার হাত কাঁপছিল। বাইরের মশালের আলোয় আমি তার বুক ঠিকই চিহ্নিত করতে পেরেছিলাম। আমি চাচ্ছিলাম একই আঘাতে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে। কিন্তু আমার অজান্তেই আমার হাত স্থির হয়ে গেল। আমার মনের মধ্যে হঠাৎ একথা উঁকি দিলো, এতো আমি গযনীর বাদশা আর গযনীর অমর্যাদার প্রতিশোধ নিচ্ছি। এই ভাবনার সাথে সাথেই কোন অদৃশ্য শক্তি যেনো আমার হাত ধরে থামিয়ে দিল।...

আমার কানে যেনো ধ্বনিত হলো–

একা এই লোকটিকে হত্যা করে তুমি নিজে যেমন বাঁচতে পারবে না, গযনীর বহু নিস্পাপ তরুণীর সম্ভ্রমও বাঁচাতে পারবে না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এই হিংস্র জীবগুলো তাদের নেতা হত্যার জন্যে তোমার ওপর কি নির্মম প্রতিশোধ নেবে, এটা একটু চিন্তা কর, ভেবে দেখো।

তখন আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। এরপর আমি গভীরভাবে চিন্তা করলাম, নানাভাবে বিষয়টাকে বোঝার চেষ্টা করলাম। বুঝতে পারলাম, আমি কোন অন্যায় কাজ করছি না। এজন্যই হয়তো আমার বিবেক আমাকে সঠিক সময়ে সঠিক দিশা দিচ্ছে। হয়তো বা তাতে মহান প্রভুর ইঙ্গিত আছে। তখন হঠাৎ আমার মনে পড়লো, আরে, আমি তো তোমাকে আসতে বলে রেখেছিলাম। তখনই ভেবে রেখেছিলাম, এ ব্যাপারে তোমার সাথে আলাপ করে কিছু একটা করবো।...

ইরতেগীন! গযনীর আর কোন মেয়েকে যেন ডাকাতদের রক্ষিতা হতে না হয়, সে চেষ্টাটা তো আমরা করে দেখতে পারি। সুলতান মাহমূদ কোন ডাকাত কিংবা লুটেরা নন। আমি হজ্জ কাফেলার সাথে আসা মেয়েদের ইজ্জত বাঁচিয়ে নিজের কাফফারা আদায় করতে চাই।

তুমি কি আমাকে দিয়ে হাম্মাদ বিন আলীকে হত্যা করাতে চাও?

না, জবাব দিল সাবিলা। এই একজনকে হত্যা করে তেমন কিছু অর্জিত হবে না। হাম্মাদ মারা গেলেও এই ডাকাতেরা গযনীর হজ্জ কাফেলা লুট করবে।

আমি চিন্তা করেছি, যে করেই হোক তুমি এখান থেকে চলে যাবে। আমি এখানেই থাকবো। আমিও যদি তোমার সাথে চলে চাই, তাহলে এরা আমাদের পিছু ধাওয়া করবে। তুমি পুরুষ। দ্রুত ঘোড়া চালাতে পারবে, সফরের কষ্টও ক্লান্তি সহ্য করতে পারবে। আমি হয়তো ততোটা পারবো না। তখন আমি হয়ে যাবো তোমার জন্যে একটা বোঝা। পালানোর গতি যদি শ্লথ হয়ে যায় তাহলে আমরা উভয়েই ধরা পড়বো।

আমি একা পালালেও এরা পিছু ধাওয়া করতে পারে। বললো ইরতেগীন। কারণ, আমি একাকী চলে গেলেও তাদের এই আশঙ্কা হবে যে, আমি গযনী গিয়ে সুলতান মাহমূদকে কাফেলা লুটের খবর দিয়ে দেবো। তখন হয়তো তিনি কাফেলার সাথে সেনাবাহিনীর দু'একটি ইউনিট পাঠিয়ে দেবেন।

এই আশঙ্কা হয়তো আছে। তবুও তোমাকে যেতে হবে। বললো সাবিলা। ঝুঁকি তো আমাদের নিতেই হবে।...

তুমি যে ভয় পাচ্ছ তা সঠিক। চিন্তা করো, তোমার কোন মেয়ে নেই, তোমার কোন বোন নেই। আজ যদি আমি তোমার বোন হতাম তাহলে আমার জন্যে তো তুমি জীবন দিয়ে দিতে।

ইরতেগীন! গযনীর প্রতিটি মেয়েই তোমার বোন, তোমার মা। আমি জানি গযনীর মাটি তোমাকে কিছুই দেয়নি। সেখানে তোমাকে গোলাম মনে করা হতো। আমি বুঝি যে দেশের শাসক তার প্রজাদের ভুখা নাঙা রাখে এবং আল্লাহর দেয়া অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখে, সে দেশের মানুষের মন থেকে দেশের প্রেম ও ধর্মের ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায়। সেখানে ভাই ভাইয়ের শত্রুতে পরিণত হয়।...

আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, তুমি যদি সুলতান মাহমূদ পর্যন্ত পৌছতে পারো, আর তাঁর কাছে বলো যে, আমি গোলাম ছিলাম, তাহলে তিনি তোমাকে বুকে জড়িয়ে নেবেন। এরপর আর তোমাকে গোলাম থাকতে হবে না। তুমি সুলতানের কাছে এবং আল্লাহর কাছে সম্মানিত মানুষ বিবেচিত হবে।

নিজের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলো ইরতেগীন! নিজ দেশ ও ধর্মের মেয়েরা সেই দেশের সম্ভ্রম। সেই জাতি ধ্বংস ও বেইজ্জতির শিকার হয় যারা তাদের মেয়েদের ইজ্জতের মর্যাদা দেয় না।

আমি তোমার একটা কথা বুঝতে পারছি না। ইরতেগীন বললো। আমার মধ্যে তো এর আগে কেউ দেশ প্রেম জাগিয়ে তুলেনি। আমার এসবের কি প্রয়োজন? আমি তো শ্রমের বিনিময়ে এই লুটেরাদের কাছে থেকেও ভালো বোধ করছি। এখন তুমি যা বলছো, তা করতে আমি অস্বীকারও করছি না। কারণ তুমি মজলুম হওয়ার পর এখনও তোমার ঈমান মজবুত রয়েছে। আমি আগেই বলেছি, তোমার উপকারের প্রতিদান আমি অবশ্যই দেবো। এখন বলো, আমাকে কি করতে হবে?'

এখান থেকে এভাবে তুমি পালিয়ে যাবে, যাতে কেউ টেরই না পায়। গযনীর পথ তো তুমি চেনো। আশা করি পনেরো বিশ দিনের মধ্যে তুমি গযনী পৌছে যেতে পারবে।

তুমি পৌছার আগেই যদি গযনীর হজ্জ কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায় তবে তাদের ফেরাবে এবং কাফেলার দায়িত্বশীলদেরকে যথা সম্ভব বোঝাতে চেষ্টা করবে সামনে তাদের কি বিপদ অপেক্ষা করছে।

তাদেরকে বলবে, তুমি সুলতানের কাছে যাচ্ছো। তুমি গিয়ে যদি কাফেলাকে গযনীতেই পাও, তাহলে সরাসরি সুলতান মাহমূদের কাছে চলে যাবে।

সুলতানকে বলবে, এই হজ্জ কাফেলার ওপর পাঁচ হাজার বেদুঈন ডাকাত হামলা করবে। সুলতানকে বলবে, গযনীর এক মজলুম কন্যা এ খবর দিয়ে পাঠিয়েছে যে, হজ্জ কাফেলাকে বাঁধা দেয়া সম্ভব নয়, কিন্তু ডাকাতদের গতিরোধ করা সম্ভব। এই কাফেলার সাথে যথেষ্ঠ পরিমাণ সেনা সদস্য না পাঠালে বাবেল ও বাগদাদের বাজারে গযনীর কন্যা জায়ারা বাদী হিসেবে বিক্রি হবে। সুলতানকে বলবে, হজ্জ কাফেলা থেকে যদি একটি মেয়েও অপহৃত হয় তাহলে আল্লাহ্ সুলতানকে ক্ষমা করবেন না।

ঠিক আছে, আমি সব বলবো সুলতানকে। বললো ইরতেগীন। তুমি দুআ করো আমি যেন জীবিতাবস্থায় সেখানে পৌছতে পারি। কিন্তু তুমি কি এখান থেকে বের হবে না? এই জংলীগুলোর কাছে তোমাকে ফেলে রেখে আমি কি করে চলে যাবো?

তুমি চলে যাও, যাও ইরতেগীন! যদি জীবিত থাকি তাহলে এই দেহ ও শরীর নয় আমার হৃদয় ও আত্মার অধিকারী হবে তুমি। তখন তুমি না, আমি

হবো তোমার বাঁদী। আশা করি তুমি গযনী পৌছে যাবে। কারণ, তুমি কোন অপরাধ করছো না, আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন।

তুমি কি এই জংলীগুলোকে কোনভাবে আমার পিছু ধাওয়া করা থেকে বিরত রাখতে পারবে?

সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। এখন এদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখে নিয়েছি। তোমার আগের মুনিবের কথা মনে আছে না? সে ছিল আমার স্বামী। তার অন্য স্ত্রীদেরকেও তুমি চিনতে ও জানতে। তুমি এটাও জানতে রাজপ্রাসাদের মতো সেই হাবেলীতে কি ভয়ানক চক্রান্ত হতো।

আসলে যেখানে সম্পদ ও নারী থাকে, সেখান থেকে সততা, ভদ্রতা আর শালীনতা দূর হয়ে যায়। আমি এই শয়তান জগতের একটি অংশ হয়ে গেছি। ফলে অনেক শয়তানীও আমি শিখে ফেলেছি।

গোগীল নামের এক গোত্রপতিকে তুমি চেনো। এই গোগীলই বলেছে, ডাকাতিতে সে এক হাজার লোক নিয়ে আসবে। এই লোকটিকে আমি ঘৃণা করি। এই লোকটি আমাকে প্রস্তাব করেছিল, হাম্মাদের সঙ্গ ত্যাগ করে আমি যেন তার সাথে চলে যাই। আমি তার প্রস্তাবের জবাবে বলেছিলাম–

আমি হাম্মাদের স্ত্রী নই বটে, তবে হাম্মাদকে আমি ধোঁকা দিতে পারবো না। সে প্রথমে আমাকে লোভ দেখায় এবং পরে হুমকিও দিয়েছিল। তার প্রস্তাবে রাজী না হলে আমাকে সে অপহরণ করবে। সে এও বলেছিলো, আমি যদি হাম্মাদকে একথা বলে দেই তাহলে সে আমাকে খুন করিয়ে ফেলবে।

এখন আমি এর প্রতিশোধ নেবো এবং এদের মধ্যে একটা গণ্ডগোল বাঁধানোর চেষ্টা করবো।

এখানকার কথা থাক ইরতেগীন! তুমি এখান থেকে কবে যাচ্ছো?

এখনই যাবো। এ ব্যাপারে তুমি আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করো না। তুমি তাঁবুর ভেতরে চলে যাও। দেখো, এখন রাতের শেষ প্রহর চলছে।

আবেগে সাবিলা ইরতেগীনের দু'হাত নিজের হাতে নিয়ে তার চোখে লাগাল এবং চুমু খেয়ে ধীরে ধীরে তার তাঁবুর দিকে চলে গেল।

* * *

রাতের শেষ প্রহরে তাঁবুর এই পল্লীতে মধ্যরাতের মতোই নীরবতা। পল্লীর লোকদের মধ্যে জেগে ওঠার কোন তাড়া ছিল না। ইরতেগীন ছিল এই ডাকাতপল্লীর মুকুটবিহীন সম্রাট হাম্মাদের একান্ত দেহরক্ষী। তাকে গোটা তাঁবু এলাকা জুড়ে সর্বত্র টহল দিতে হতো যে কোন ঘোড়া বা উট বাঁধন মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারতো সে। যে তাঁবুতে খাবার দাবার থাকতো, সেখান থেকে ইচ্ছেমতো খাবার উঠিয়ে নিলেও তাকে কিছু বলার কেউ ছিলো না।

ইরতেগীন যখন দেখলো সাবিলা তার তাঁবুতে ফিরে গেছে তখন সে তার নিজের তাঁবুতে গেল। সেখান থেকে বর্শা, তীর ধনুক ও তরবারী তুলে নিল। কিছু পরিধেয় কাপড়ও সাথে নিয়ে খাবার দাবারের তাঁবুতে চলে গেল। সেখান থেকে একটা পুটলীতে খাবার ও পানির পাত্র নিয়ে একটি উটের বাঁধন খুলে সেটির গলায় এগুলো বাঁধলো। উটের সাথে প্রয়োজনীয় সবকিছু বেঁধে নিয়ে সে উটকে তাড়া করল।

সাবিলা তার তাঁবুর পর্দা একটু ফাঁক করে সবই দেখছিল। গোটা তাঁবু এলাকাটাই তখন কালো কালো স্তূপের মতো মনে হচ্ছিল। সাবিলার বুকটা দুরুদুরু কাঁপছিল। একটু পর সাবিলা দেখতে পেলো, তাঁবুর এলাকা থেকে একটি উট ধীরে ধীরে বাইরে চলে যাচ্ছে। মনের অজান্তেই তখন সাবিলার ঠোঁটে উচ্চারিত হতে লাগলো দু'আ কালাম। দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যে উটটি অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

মনের মধ্যে একটা চরম অস্থিরতা নিয়ে বিছানায় গিয়ে দু'হাতে মুখ চেপে পড়ে রইল সাবিলা। কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল টেরই পেলো না।

* * *

সাবিলা যখন ঘুম থেকে জাগলো তখন ভরদুপুর। তার শরীরটা খুবই অবসন্ন। জোর করে বিছানা ছেড়ে বসল সাবিলা। রাতের ঘটনা মনে হতেই তার বুকটা ধুকধুক করে উঠলো। খুব ভয় ভয় লাগছিল সাবিলার। মনে হচ্ছিলো, ইরতেগীন তাকে ধোঁকা দিয়ে হাম্মাদকে সবই বলে দিয়েছে।

সে তার তাঁবু থেকে বের হয়ে ইরতেগীনের তাঁবুর পর্দা উঠিয়ে দেখল। না, তাতে ইরতেগীন নেই। তার হাতিয়ার এবং কাপড়-চোপড়ও সেখানে ছিল না। সাবিলা ইরতেগীনের তাঁবু থেকে যখন বের হচ্ছে ঠিক সেই সময় হাম্মাদ তার তাঁবু থেকে বের হলো। সে সাবিলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, ইরতেগীনের তাঁবুতে সে কেন গিয়েছিল?

চোখে মুখে আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে সাবিলা বললো, আমি ইরতেগীনকে দেখতে গিয়েছিলাম সে তাঁবুকে আছে কি নেই। আমার আশঙ্কা হচ্ছে সে জীবিত নেই, তাকে খুন করা হয়েছে।

খুন? মনে হচ্ছে তোমার মাথা ঠিক নেই। এখানে কে কাকে খুন করবে? বিস্মিত কণ্ঠে বললো হাম্মাদ।

করতে পারে। তুমি জানো না। গোগীল খুন করতে পারে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, গোগীল ইরতেগীনকে গায়েব করে ফেলেছে। এখন আমার পালা। আমি তোমাকে একথা বলার সুযোগই পাইনি।

তুমি যখন আমাকে এই তাঁবুতে নিয়ে এসেছিলে, তখনই একবার গোগীল আমাকে কুপ্রস্তাব দিয়েছিলো, লোভও দেখিয়েছিল। লোভে কাজ না হওয়ায় আমাকে হুমকি দিয়ে বলেছিল আমি যেন তোমাকে ত্যাগ করে তার সাথে চলে যাই। কিন্তু আমি তাকে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমি আমার মুনিবকে ধোঁকা দিতে পারবো না।

এরপর সে গতকাল আবার এসেছিল। গত রাতে তুমি যখন তোমার তাঁবুতে চলে গিয়েছিলে আমি আমার তাঁবুতে না গিয়ে একটু ঝর্ণার পাশটায় পায়চারী করছিলাম। আমি জানতাম না গোগীল আমার পিছু নিয়েছে। সে আমার কাছে এসে আমাকে নানাভাবে প্ররোচিত করে অপহরণ করতে চাইলো। আমি তাকে বাধা দিলে সে আমার দিকে হাত বাড়ালো। নিজেকে একাকী ভেবে আমি ভীষণ ভড়কে গিয়েছিলাম কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে জানি ইরতেগীন এসে উপস্থিত হলো। আসলে আমার অজান্তেই সে আমার নিরাপত্তার জন্যে ধারে কাছেই কোথাও অবস্থান করছিল।

গোগীল ইরতেগীনকে গোলাম বলে খুব গালমন্দ করলো এবং সেখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলো। কিন্তু ইরতেগীন বললো–

তুমি জানো না গোগীল! সাবিলা আমার মুনিব। আমার মুনিবের জন্যে আমি জীবন দিয়ে দেবো। কিন্তু ওকে নিয়ে যেতে দেবো না।

তখন গোগীল ইরতেগীনকে উদ্দেশ্য করে বললো, আজ রাতই তোর জীবনের শেষ রাত। যা, যদি জীবিত থাকতে চাস, তাহলে মুনিবের তাঁবুতে গিয়ে ঘুমা, নয়তো খতম হয়ে যাবি। এরপর গোগীল ফুসফুস করতে করতে চলে গেলো। ইরতেগীন গোগীলের ক্ষোভ ও হুমকিকে পাত্তা না দিয়ে আমাকে আমার তাঁবুতে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলো। আমি জানি গোগীল খুবই হিংস্র। সে নিশ্চয় আজ রাতের মধ্যেই ইরতেগীনকে খুন করে গায়েব করে ফেলেছে।

সাবিলার কথা শুনে হাম্মাদ বিন আলী ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো এবং বাঘের মতো হুংকার ছাড়তে লাগলো। সেই সাথে সে গোগীলকে ডেকে পাঠালো।

আমি জানি গোগীল! তুমিও একটি গোত্রের সর্দার। কিন্তু তুমি কি ভুলে গেছো আমি কে? ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গোগীলের উদ্দেশ্যে বললো হাম্মাদ।

আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো, আমার লোকটিকে তুমি ফিরিয়ে দাও।

কাকে ফিরিয়ে দেব? জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বললো গোগীল।

ইরতেগীনকে। সে আমার একান্ত নিরাপত্তারক্ষী। গত রাতে যে তোমার ও সাবিলার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো?

হাম্মাদের ক্ষোভ ও প্রশ্নের কারণ বুঝতে না পেরে গোগীল দারুন বিস্মিত ও অবাক হলো। হাম্মাদের এমন প্রশ্নের কোন কূল কিনারা খুঁজে পাচ্ছিল না। কেন? কিসের ভিত্তিতে হাম্মাদ তাকে এমন প্রশ্ন ও অভিযোগ করছে। ক্ষোভই বা দেখাচ্ছে কেন?

গোগীলের যখন এই অবস্থা তখন এই সুযোগে সাবিলা হাম্মাদের কানে কানে বললো, ধূর্ত গোগীল এখন সবকিছু এড়িয়ে যাওয়ার জন্য না জানার ভান করছে। সাবিলার এ কথায় হাম্মাদ গোগীলের ওপর আরো বেশি ক্ষেপে গেল।

সে গোগীলের উদ্দেশে বললো, গোগীল! একটি গোলাম ও রক্ষিতার জন্যে আমার সাথে শত্রুতা বাঁধাতে তুমি একটুও চিন্তা করছো না? অথচ এ

মুহূর্তে আমাদের মধ্যে জোটবদ্ধতা ও ঐক্য খুবই প্রয়োজন। আমি ইচ্ছা করলে সাবিলার মতো দশটি রক্ষিতা তোমাকে এনে দিতে পারি। কিন্তু ওকে তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য আমার নিরাপত্তা রক্ষীকে গায়েব করে দিয়েছো। তুমি কেমন সর্দার? কোন সরদারের পক্ষে কি একাজ করা মানায়? আমার সাথে শত্রুতা বাঁধিয়ে তুমি সর্দারী করতে পারবে? তুমি কি মনে করো তোমার পক্ষে এরপরও জীবিত থাকা সম্ভব?

এমন ঘটনার সাথে আদৌ জড়িত ছিল না গোগীল। তাই এ অভিযোগ সে মেনে নিতে পারছিল না। কথায় কথায় অনেক কথা হয়ে গেলো। তর্ক-বিতর্কে উভয়েই উভয়ের প্রতি চরম আক্রোশে ফেটে পড়লো।

এক পর্যায়ে হাম্মাদ সব গোত্রপতিদেরকে একত্রিত করে সাবিলাকে বললো, তুমি যা বলেছো, তা এদেরকে শোনাও। সাবিলাও কোন প্রকার জড়তা ছাড়া হুবহু যে কথা হাম্মাদকে বলেছিলো তাই সর্দারদের শুনিয়ে দিলো।

সাবিলার কথা যাচাই না করেই হাম্মাদ তার প্রতি এমন অভিযোগ আনায় রাগে ক্ষোভে গোগীল এই বলে জমায়েত থেকে উঠে গেলো–

ঠিক আছে, আজ থেকে আমার সাথে আর আমার কবিলার সাথে তোমার কোন সম্পর্ক থাকবে না।

ক্ষোভে অপমানে গোগীল উঠে যেই চলে যেতে শুরু করলো, অমনি হাম্মাদ তার পাশে দাঁড়ানো এক প্রহরীর কাছ থেকে ধনুক ছিনিয়ে নিয়ে তীর দান থেকে একটি তীর ধনুকে ভরলো এবং কালবিলম্বন না করে গোলীলের দিকে ছুঁড়ে দিলো। তীরটি গোগীলের পিঠে বিদ্ধ হয়ে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেলো। সাথে সাথেই গোগীলের দেহটা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

সেদিন রাতেই হাম্মাদ বিশেষ একটি অনুষ্ঠান ও গণজমায়েত করে গোগীলের জায়গায় আরেকজনকে গোগীল গোত্রের গোত্রপতি ঘোষণা করলো। সেই জমায়েতে হাম্মাদ বললো, আমার ক্ষুব্ধ প্রতিশোধের জন্য আমি তোমাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি। আমি জানতাম আমার লোককে আমি ফিরে পাবো না। কারণ গোগীল তাকে খুন করে গায়েব করে দিয়েছে। তবুও তোমাদের সবার স্বার্থে আমাকে এই কঠোর কাজটি করতে হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে কোন গোত্রপতির দ্বারা এমন ঐক্য বিনষ্টকারী ঘটনা না ঘটে এবং নেতৃত্বের অবস্থান থেকে কেউ বিচ্যুত না হয়।

* * *

সাজানো অপরাধে গোগীল যখন হাম্মাদের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে নিহত হলো, ততোক্ষণে ইরতেগীন দ্রুত উট তাড়া করে অনেক দূর চলে গেছে। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও ইরতেগীন যখন দেখলো কেউ তার পিছু ধাওয়া করছে না, তখন সে স্বাভাবিক গতিতে সামনে চলতে লাগলো। রাতভর সে উর্ধ্বশ্বাসে উট হাঁকিয়েছে। রাত পেরিয়ে ভোরের আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে বার বার পিছনের দিকে তাকিয়ে ইরতেগীন দেখছিল তাকে কেউ তাড়া করছে কি না। কিন্তু সূর্য অনেকটা উপড়ে উঠে যাওয়ার পরও পিছু ধাওয়াকারী কাউকে না দেখতে পেয়ে সে নিশ্চিন্ত মনে যথাসম্ভব দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছার সিদ্ধান্ত নিলো।

এদিকে হাম্মাদ সকল গোত্রপতিকে গযনীর হজ্জ কাফেলা সম্পর্কে ধারণা দিল। সবশেষে নির্দেশ দিলো, আগামীকাল তোমরা সবাই নিজ নিজ গোত্রের লোকদেরকে কিয়াদ নামক জায়গায় জড়ো করবে। সে দিনই সকল বেদুঈন গোত্রপতি তাদের লোকজন নিয়ে কিয়াদের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো। হাম্মাদও জায়গা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলো।

হাম্মাদ যখন তার স্থায়ী ঠিকানায় পৌঁছলো তখন গযনী থেকে তার পাঠানো এক লোক খবর নিয়ে এলো। আগন্তুক তাকে জানালো, গযনীর হজ্জ কাফেলায় লোক অনেক বেড়ে গেছে। বিপুল সংখ্যক ব্যবসায়ীও এই কাফেলায় যোগ দিয়েছে।

সে হাম্মাদকে আরো জানালো, পথে পথে এই কাফেলার সঙ্গে আরো অনেক লোক যোগ দেবে। তবে হাম্মাদের সংবাদবাহক একথা বলতে পারেনি, হজ্জ কাফেলার নিরাপত্তার জন্য গযনীর সুলতান সেনাবাহিনীর কোন ইউনিটকে কাফেলার সঙ্গে পাঠাচ্ছেন কি না।

* * *

হেযায পর্যন্ত সেনাবাহিনীর কোন ইউনিটকে কি করে আমি পাঠাবো? সুলতান মাহমূদ হজ্জ কাফেলার এক প্রতিনিধিকে বলছিলেন। আমার হাতে তো সৈন্য খুবই সীমিত। তাছাড়া সীমান্তের অবস্থা ভালো না। এজন্য উচিত দেশের প্রতিটি লোকেরই সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়া।

হজ্জ কাফেলার একটি প্রতিনিধি দল সুলতান মাহমূদের কাছে গিয়ে আবেদন করেছিলো, এবারের হজ্জ কাফেলা অনেক বড়। তাছাড়া বহু ব্যবসায়ী অনেক মূল্যবান পণ্য নিয়ে হজ্জ কাফেলায় শরীক হয়েছেন। সার্বিক দিক বিবেচনা করে নিরাপত্তার স্বার্থে কাফেলার সাথে একটি সেনা ইউনিট থাকা দরকার।

আমি জানি, প্রতি বছরই হজ্জ কাফেলা ডাকাত ও লুটেরাদের হাতে নাজেহাল হয়। হজ্জযাত্রীদেরকে আমি সব ধরনের সেবা দিতে চেষ্টা করি; কিন্তু মক্কা পর্যন্ত এদের সাথে কোন সেনা ইউনিট পাঠানোর ব্যাপারটি আমার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে– বলছিলেন সুলতান। যেহেতু অনেক বড় কাফেলা, তাই তাতে অশ্বচালনাকারী এবং যুদ্ধ করার মতো বহু লোক নিশ্চয় আছে। তাছাড়া সেনাবাহিনীর অনেকেই এবার হজ্জে যাচ্ছে। আপনাদের উচিত হবে সবাই সশস্ত্র থাকা। প্রত্যেকেরই তীর-ধনুক, ঢাল-তরবারী সাথে রাখা প্রয়োজন। এতো বড় কাফেলাকে কেউ লুট করার সাহস পাবে বলে আমার মনে হয় না। কাফেলা ছোট হলে লুট হওয়ার আশংকা থাকে। আমার মনে হয় আপনারা নির্ভয়েই যেতে পারেন।

হজ্জ প্রতিনিধিদলকে বিদায় করে সুলতান মাহমূদ তার সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের ডাকলেন। এবং তার উপদেষ্টাদেরও ডেকে পাঠালেন। সবাই একত্রিত হলে তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন— হজ্জ প্রতিনিধিদলকে আমি হতাশ করে ফিরিয়ে দিয়েছি। তারা হজ্জ পালন করতে যাচ্ছেন। আমার উচিত ছিলো তাদের আবেদনে সাড়া দেয়া। কিন্তু আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন, এ মুহূর্তে সেনাবাহিনীর এখানে থাকা বেশি প্রয়োজন। হিন্দুস্তান থেকেও খারাপ সংবাদ এসেছে। কন্নৌজের দুর্গপতি রাজ্যপাল কন্নৌজে নিয়োজিত আমাদের সেনাপতির  কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে মৈত্রীচুক্তির আবেদন করেছে এবং যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির ভর্তুকি ও খাজনা দিতে অঙ্গীকার করেছে। এর বিনিময়ে বেড়া নাশক স্থানে সে নতুন করে রাজধানী পত্তনের অনুমতি চাচ্ছে।

কিন্তু এতে লাহোর, গোয়ালিয়র ও কালাঞ্জরের রাজারা ক্ষেপে গেছে। তারা রাজ্যপালের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। এরা রাজ্যপালকে তাদের সহযোগী করে আমাদের সাথে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করতে চাচ্ছিলো। জানা

নেই, এই পরিস্থিতিতে কোন দিন আবার আমাদেরকে হিন্দুস্তান রওয়ানা করতে হয়।

* * *

হজ্জ কাফেলা রওয়ানা হওয়ার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিল। যে প্রতিনিধিদল সুলতান মাহমূদের কাছে নিরাপত্তা বাহিনীর আবেদন নিয়ে গিয়েছিল তারা ফিরে এসে সবাইকে বললো—সুলতান সবাইকে অস্ত্রশস্ত্র সাথে নিয়ে যেতে বলেছেন। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বিভিন্ন অভিযানে সেনাদল ব্যস্ত থাকায় হজ্জ কাফেলার সাথে সেনাদল দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এ সংবাদ পাওয়ার পর হজ্জ কাফেলার লোকদের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করার জন্য আরো দু'দিন সময় বাড়ানো হলো। দু'দিনপর পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাবে।

পরদিন যথারীতি সুলতান মাহমূদ তার কক্ষে বসা। এমন সময় দারোয়ান এসে খবর দিলো, ইরতেগীন নামের এক লোক দীর্ঘ সফর করে খুবই করুন অবস্থায় এখানে এসেছে। সে এসেই বলেছে, হজ্জ কাফেলাকে যাত্রা মুলতবী করতে বলো, আর জলদী আমাকে সুলতানের কাছে নিয়ে চলো। জরুরী বার্তা আছে।

হজ্জ সংশ্লিষ্ট যেকোন ব্যাপারে সুলতান মাহমূদ ছিলেন খুবই সতর্ক। তিনি হাজীদের ব্যাপারে অন্যসব কাজ মুলবতী রেখে আগে তাদের বিষয়াদি দেখতেন।

সংবাদ বাহকের কাছে হজ্জ সংশ্লিষ্ট খবর শুনে তিনি তাৎক্ষণিক নির্দেশ দিলেন, আগন্তুককে আমার কাছে নিয়ে আসা হোক।

ইরতেগীন প্রায় জীবন্ত লাশে পরিণত হয়েছিল। তার মুখ চরম ফ্যাকাসে হয়ে পরেছিল এবং চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। ঠিকমতো পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে পারছিল না। তাকে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসানো হলো এবং তাৎক্ষণিক পানীয় ও খাবার সামনে হাজির করা হলো। কিছুটা পানীয় এবং খাবার গ্রহণের পর তার শরীরে সতেজতা ফিরে এলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে সুলতানের উদ্দেশ্যে বললো—

গযনী ও খোরাসানের সুলতানের কাছে গোস্তাখী মাফ চেয়ে নিচ্ছি। বিগত পঁচিশ দিনের মধ্যে আমি একদণ্ড দাঁড়ানোর অবকাশ পাইনি। প্রথমে যাত্রা শুরু করেছিলাম উটে সওয়ার হয়ে। কিন্তু পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছে এক লোককে উটটি দিয়ে তার কাছ থেকে ঘোড়া নিয়ে নিয়েছি।

এভাবে পথিমধ্যে আরো দু'বার ঘোড়া বদল করেছি। ক্লান্ত-শ্রান্ত আমার আধমরা ঘোড়াগুলো অন্যদের দিয়ে তাদের কাছ থেকে তাজা ঘোড়া নিয়ে ঘোড়ার পিঠেই খাবার খেয়েছি, ঘোড়ার পিঠেই রাত কাটিয়েছি, এক মুহূর্তও বিশ্রাম নেইনি। ফলে দেড় মাসের দূরত্ব আমি মাত্র পচিশ দিনে অতিক্রম করেছি।

সেই কথাটি বলো, যে কথা বলার জন্য এমন কষ্ট শিকার করে তুমি আমার কাছে এসেছো? মমতামাখা কণ্ঠে বললেন সুলতান।

আপনি যদি হজ্জ কাফেলার সাথে দুই ইউনিট সেনা পাঠাতে না পারেন তাহলে এবারের হজ্জ যাত্রা মুলবতী করে দিন। কারণ, হজ্জ কাফেলাকে লুটে নেয়ার জন্যে ডাকাত ও লুটেরা দল একটি পূর্ণ সেনাবাহিনীর শক্তি নিয়ে কিয়াদ মরুভূমিতে অবস্থান করছে। বাগদাদের খলীফার আশির্বাদ আছে এই ডাকাতদের প্রতি। বলা চলে খলীফা নিজেই ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছেন। বললো ইরতেগীন।

কি বলছো তুমি, বাগদাদের খলীফা ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন?

গযনীর সুলতানের যদি এক নগণ্য গোলামের কথা পছন্দ না হয় তবে গোলাম ক্ষমা প্রার্থনা করছে। সরাসরি খলীফার পৃষ্ঠপোষকতা যদি নাও থাকে তবে তার দরবারের সেনাপতি ও কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চয় আছে। তাও যদি বাস্তবে না ঘটে থাকে তবে আমার একথা মোটেও মিথ্যা মনে করবেন না। হেযায়ের সকল লুটেরা বেদুঈন গোষ্ঠী হাম্মাদ বিন আলীর নেতৃত্বে কিয়াদ মরুভূমির যে জায়গাটি বেশি টিলাও বালিয়াড়ীতে ভরা সেখানে জড়ো হয়েছে গযনীর হজ্জ কাফেলা লুটে নেয়ার জন্য। এরা শুধু পণ্যসামগ্রীই লুট করবে না, হজ্জ কাফেলার সাথে থাকা সকল যুবতী নারীদের অপহরণ করবে।

ডাকাত সর্দার হাম্মাদ বিন আলী সম্প্রতি বাগদাদ থেকে এসেছে। আমি হাম্মাদের সাথে ছিলাম। হাম্মাদ প্রথমে খলীফার সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং

প্রভাবশালী সেনাপতির সাথে সাক্ষাত করে। তার পর আরো দু'জন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার সাথে দেখা করে। পরবর্তীতে এরাই ডাকাত সর্দার হাম্মাদ বিন আলীকে খলীফার কাছে নিয়ে যায়। খলীফার একান্ত বিশ্বস্ত সেনাপতি ডাকাত সর্দার হাম্মাদকে একজন আন্তর্জাতিক মানের বেদুঈন ব্যবসায়ী বলে খলীফার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তারা খলীফাকে জানায়, হাম্মাদের ব্যবসা আরব থেকে গযনী পর্যন্ত বিস্তৃত। শুধু তাই নয় সে খলীফার শাসন বিরোধী এবং বিদ্রোহী সকল আরব বেদুঈন জনগোষ্ঠীকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে খলীফার ভক্ত বানিয়ে ফেলেছে।

ইরতেগীন সুলতান মাহমূদকে হাম্মাদ বিন-আলী কিভাবে কোন প্রক্রিয়ায় গযনীর হজ্জ কাফেলা লুটে নেয়ার চক্রান্ত করেছে সবকিছু বিস্তারিত জানালো। হাম্মাদ কিয়াদ অঞ্চলে কতোজন বেদুঈনকে একত্রিত করেছে তা জানাতেও ভুললো না ইরতেগীন। ইরতেগীন জানালো, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, গযনীর কাফেলা লুট করার জন্যে হাম্মাদ পাঁচ হাজার লড়াকু বেদুঈনকে প্রস্তুত করে রেখেছে।

পাঁচ হাজার ডাকাত জড়ো হওয়ার কথা শুনে সুলতান মাহমূদ বেশ অবাক হলেন।

এতো বিপুল সংখ্যক ডাকাত দলের একত্রিত হওয়ার অর্থ হলো, ডাকাতের লোকেরা গযনীতে এসে কাফেলার লোকসংখ্যা দেখে গেছে। তারা জেনে গেছে কাফেলার সাথে ব্যবসায়ীরাও আছে এবং তারা হিন্দুস্তানের নামী দামী মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে। ডাকাতের লোকেরা এটাও দেখে গেছে, কাফেলায় হজ্জযাত্রীদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক সেনাবাহিনীর লোকজন রয়েছে যারা মোকাবেলা করতে সক্ষম।

আপনি ঠিক বলেছেন সুলতানে মুহতারাম! ডাকাতের সংবাদ বাহক বলেছে, কাফেলায় দেড় দু'হাজার লোক হতে পারে– বললো ইরতেগীন।

আসলে কাফেলায় নিয়মিত কোন সেনা নেই। সৈনিকদের যদি হজ্জ করার সুযোগ হতো তাহলে সবার আগে আমি হজ্জ করতাম। বললেন সুলতান।

সুলতান এ খবরে গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি বললেন, হজ্জগামী কাফেলাকে আমি বাধা দিতে পারি না। যদিও আমার হজ্জে যাওয়ার সুযোগ

হয় না. কিন্তু হজ্জযাত্রীদের সবধরনের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা আমার কর্তব্য। হজ্জযাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে আমি দেশের নিরাপত্তাকেও ঝুঁকিতে ফেলতে কুণ্ঠাবোধ করবো না।

একথা বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন এবং ইরতেগীনের দিকে গভীর ভাবে তাকিয়ে বললেন—

আমি তো এ পর্যন্ত তোমার নাম পরিচয় পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলাম না। তুমি আসলে কে? কি তোমার পরিচয়? তুমি বলছো, ডাকাত দলের সর্দারের একান্ত ব্যক্তি ছিলে তুমি। এরপরও আমাদের প্রতি তুমি এতো দরদ কেন অনুভব করলে? তুমি কি আল্লাহর সেই সৈনিককে ধোঁকা দিতে পারবে, যার ভয়ে হিন্দুস্তানের মন্দিরগুলোর মূর্তিগুলো পর্যন্ত ভয়ে কাঁপে?

আমি নিজ থেকে আসিনি মহামান্য সুলতান! গযনীর এক শহীদ সৈনিকের হতভাগ্য কন্যা আমাকে পাঠিয়েছে। জঘন্য প্রতারণার শিকার হয়েছে সে। তার জীবনের কাফফারা দিয়ে সে গযনীর অন্যান্য মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে চায়। বললো ইরতেগীন।

সে গযনীর বিপদগ্রস্ত সম্ভ্রমকে রক্ষা করতে সুলতানকে আগে-ভাগেই ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে আহবান জানাচ্ছে।

আমি গোলামের পুত্র গোলাম। আমি ঔরসজাতভাবে তুর্কি বাবার সন্তান। কিন্তু গযনীতে আমার জন্ম হয়েছিল।

যে মেয়ে আমাকে পাঠিয়েছে তার নাম সাবিলা। তার বাবা আপনার সেনাবাহিনীর উট ইউনিটের একজন সৈনিক ছিল। সে যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেছে। এই শহীদের মেয়ে আমার হৃদয়ে গযনীর মমতা তৈরি করেছে। সুলতানের যদি শোনার অবসর থাকে তবে আমার জীবনবৃত্তান্ত শুনতে পারেন।

ইরতেগীন তার জীবন কাহিনী এবং সাবিলার জীবনকাহিনী সবিস্তারে সুলতানকে শোনালো। একথাও সে সুলতানকে জানালো, সাবিলা কিভাবে তার জীবন বাঁচিয়েছিল এবং কিভাবে সাবিলা তার মনে গযনীর মমতা জাগিয়ে তুলেছে। সবিলার গল্প শুনে সুলতানের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল।

যে জাতির কন্যারা এমন দুরবস্থায় থাকার পরও জাতির মর্যাদা ও নিজের আত্মসত্তাকে লালন করে হৃদয়ের মধ্যে ঈমানের স্ফুলিঙ্গ নিভে যেতে দেয়নি, সে জাতিকে কোন শক্তিই দারিয়ে রাখতে পারে না। সামনে উপবিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে সুলতান বললেন, তোমরা যদি নতুন প্রজন্মকে ঈমান থেকে সরিয়ে পাপের সাগরে ডুবিয়েও দাও, তবুও এক সময় না এক সময় ঈমানের স্ফুলিঙ্গ এই জাতির মধ্যে জ্বলে উঠবে। ঈমানের প্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নেই। আবেগাপ্লুত সুলতান ইরতেগীনের প্রতি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—

তুমি গোলাম নও ইরতেগীন! এসো, এগিয়ে এসো। সুলতান তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বললেন—

আমরা সবাই গোলাম। তবে কোন মানুষের গোলাম নই আমরা, আমরা সবাই আল্লাহ ও তার রাসূলের গোলাম। এই গোলামী কোন অপমান নয় এই গোলামীতেই রয়েছে মুসলমানদের প্রকৃত মর্যাদাও সম্মান। সুলতান দরাজ কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, হজ্জ কাফেলা অবশ্যই যাবে এবং দুই ইউনিট সেনাও এই কাফেলার সাথে থাকবে। গযনী রাষ্ট্রের সীমানা পাহারার ব্যবস্থা আল্লাহ নিজে করবেন।

* * *

সুলতান অনেকটা আবেগাপ্লুত হয়ে বলে ফেলেছিলেন হজ্জ কাফেলার সঙ্গে সেনাবাহিনী থাকবে। কিন্তু বাস্তবে তিনি কখনো আবেগের বশীভূত হয়ে সেনাদের পরিচালনা করেননি।

কিছুক্ষণ পর তিনি দু'জন সেনাপতি এবং তার সামরিক উপদেষ্টাদের ডাকলেন। তারা এলে তিনি দেশের সীমান্তের অবস্থা, সেনাবাহিনীর অবস্থা এবং হিন্দুস্তান থেকে আসা সামরিক সংবাদের ওপর আলোচনা পর্যালোচনা করলেন। তিনি এব্যাপারটিও আলোচনায় আনলেন, যদি পাঁচ হাজার প্রশিক্ষিত ডাকাত আমাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হয়ে থাকে, তবে এদের মোকাবেলায় কি পরিমাণ সৈন্য পাঠাতে হবে?

সুলতান বললেন, বেদুঈনরা খুবই লড়াকু হয়ে থাকে। এরা ঘোড়া ও উটকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মোকাবেলা করতে জানে এবং পালানোর পথটি

সবসময় পরিষ্কার রাখে। এজন্য হজ্জ কাফেলার সাথে ঝটিকা বাহিনীর একটি ইউনিট এবং তীরন্দাজ বাহিনীর একটি ইউনিট পাঠাতে হবে।

সেই সময়ের ইতিহাস ঘাটাঘাটি করেও এ বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়া যায়নি, হজ্জ কাফেলার সাথে যে সেনা ইউনিট দু'টি সুলতান মাহমূদ পাঠিয়েছিলেন, এর নেতৃত্বের ভার কাকে দিয়েছিলেন। একটি সূত্রে জানা যায়, তিনি গযনীর তৎকালীন প্রধান বিচারপতি কাযিউল কুযযাতের কাধে এ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

অবশ্য এ বিষয়টি পরিষ্কার যে তৎকালে যারা প্রধান বিচারপতি হতেন, তাদেরকে সামরিক বিদ্যায়ও পারদর্শী হতে হতো। তারা শুধু ধর্মীয় বিষয়েই ফয়সালা দিতেন না, সামাজিক রাজনৈতিক সব ব্যাপারেই প্রধান বিচারপতির ফায়সালা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহাসিক ফারিশ্তা লিখেছেন, তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবু মুহাম্মদকে সুলতান মাহমূদ হজ্জ কাফেলা এবং সেনাবাহিনীর চীফ কমান্ডারের দায়িত্ব দিয়ে হজ্জে পাঠিয়েছিলেন। তিনি প্রধান বিচারপতির হাতে প্রয়োজনীয় খরচ ছাড়াও আরো অতিরিক্ত ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়েছিলেন, ডাকাতদের সাথে সংঘর্ষে না গিয়ে এই ত্রিশ হাজার দিরহাম ডাকাত সর্দারকে দিয়ে হজ্জ কাফেলা নিরাপদে যাওয়া আসার জন্যে ডাকাত সর্দারের সাথে প্রধান বিচারপতি নিরাপত্তা চুক্তি করে নেন।

সুলতান যখন হজ্জ কাফেলার নিরাপত্তার জন্যে এমন নিরাপদ ব্যবস্থা নিলেন, তখন হজ্জ কাফেলায় আরো লোক শামিল হলো। লোকের সংখ্যা বেড়ে গেলো আরো কয়েক হাজার। এর ফলে তা হয়ে গেলো স্মরণকালের সবচেয়ে বড় হজ্জ কাফেলা। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এই অঞ্চল থেকে আগে এতো বড় হজ্জ কাফেলা একসাথে যাওয়ার কথা কখনো শোনা যায়নি।

হজ্জ কাফেলাকে বিদায় জানাতে সুলতান মাহমূদ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কাফেলার নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে কথা বললেন এবং অনেক দূর পর্যন্ত কাফেলার সাথে সাথে তিনিও ভ্রমণ করলেন। কাফেলা ছিল কয়েক মাইল দীর্ঘ। সুলতান ঘোড়া দৌড়িয়ে কাফেলার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত

প্রদক্ষিণ করলেন এবং হাত উঁচু করে যাত্রীদের অভিবাদন জানালেন এবং মুচকি হেসে তাদের সালামের জবাব দিলেন। কাফেলা যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জভ্রমণ শেষে ফিরে আসতে পারে সেজন্য জন্য দু'আ করলেন।

অবশেষে তিনি একটি উঁচু জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন এবং হজ্জ কাফেলার শেষ ব্যক্তিটি তাকে অতিক্রম করে যাওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতি হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাতে থাকলেন।

এক পর্যায়ে তাঁর কণ্ঠ থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। তিনি বললেন– এই কাফেলায় যারা হজ্জ করতে যাচ্ছেন তারা কতইনা সৌভাগ্যবান! আল্লাহ তাদের সবাইকে হেফাযত করুন।

নিরাপত্তা আয়োজনের প্রাণপুরুষ ইরতেগীন প্রধান বিচারপতির পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে কাফেলার সাথেই রওয়ানা হলো।

* * *

কিয়াদ মরুভূমির একটি জায়গায় অসংখ্য উঁচু-নীচু টিলা ছিল। যেগুলোর আকৃতি ছিল উঁচু দেয়ালের মতো। আবার কোনটার আকৃতি ছিল খাড়া পিলারের মতো। এগুলোর মধ্য দিয়েই লোকজন যাতায়াতের জন্যে পথ তৈরি করে নিয়েছিল। জায়গাটি ছিল খুবই ভয়ংকর। পাহাড় টিলার মারপ্যাচে বহু লোক সঠিক পথ হারিয়ে ফেলতো।

ডাকাতির জন্যে এই জায়গাটিকেই বেছে নিয়েছিল হাম্মাদের দল। হাম্মাদের ডাকাতদল এই ভয়ঙ্কর জায়গাটির অনতিদূরে তাঁবু ফেলে অবস্থান নিয়েছিল। অন্তত পাঁচহাজার বেদুঈন জড়ো হয়েছিল ডাকাত দলে। এসব বেদুঈন যেমন ছিল দুঃসাহসী তেমনই লড়াকু এবং যুদ্ধ ও অশ্বারোহণে পটু। এদের কোন ধর্মকর্ম ছিল না। গোত্রপতিদের নির্দেশ মানাকেই এরা ইবাদত মনে করতো। বেদুঈন গোত্রপতিদের প্রধান সর্দার হাম্মাদকে এরা আল্লাহর বিশেষ প্রতিনিধি বলে বিশ্বাস করতো। এরা বিশ্বাস করতো হাম্মাদের মতো সর্দারের উপর কোন তীর তরবারী কাজ করে না। ডাকাতী ও লুটতরাজকে এরা বৈধ পেশা হিসেবেই বিশ্বাস করতো। তাদের দৃষ্টিতে এটি কোন দুষ্কর্ম ছিল না।

হাম্মাদ বিন-আলীর সাথে এই ডাকাতের তাঁবুতেই অবস্থান করছিল সাবিলা। ভেতরে ভেতরে খুবই বিধ্বস্ত ছিল সে। অধীর আগ্রহে সাবিলা অপেক্ষা করছিল হজ্জ কাফেলার জন্যে। এক দিন রাতের বেলায় এক বেদুঈন এসে যখন খবর দিলো—'হজ্জ কাফেলা খুবই বড় এবং কাফেলার সাথে সেনাবাহিনীও আসছে'—শুনে আবেগ উত্তেজনায় সাবিলার সারা শরীর কাঁপছিল। এক বেদুঈন এসে হাম্মাদকে জানালো, হজ্জ কাফেলা কয়েক মাইল দূরে তাঁবু ফেলেছে।

এই ভয়ংকর কিয়াদ মরু অঞ্চলকে নিজের শাসনাধীন অঞ্চল মনে করতো হাম্মাদ বিন-আলী। যেনো এই মরুভূমির বাতাসও তার কথা শুনে। এজন্য সে এই বিশাল কাফেলা ডাকাতির ক্ষেত্রে বাড়তি কোন সতর্কতা এবং প্রস্তুতি নেয়নি। সে ভাবছিল যতো বড় কাফেলাই হোক না কেন লুটেরাদের তীব্র আঘাত ও হামলা সামলানোর ক্ষমতা ওদের আদৌ নেই।

কিয়াদ মরুভূমির এই ভয়ংকর জায়গাটিতে পৌঁছার আগেই ইরতেগীনের পরামর্শে প্রধান বিচারপতি কাফেলার গতিরোধ করলেন এবং রাতেই সেনা কমান্ডাদের নিয়ে ডাকাতদের প্রতিরোধের কৌশল নির্ধারনে সলাপরামর্শ করলেন। তারা ঠিক করলেন প্রতিটি টিলার ওপর তীরন্দাজ থাকবে। রাতের বেলায় তিনি ডাকাত দলের সংখ্যা ও সার্বিক পরিস্থিতি জানার জন্যে একটি অনুসন্ধানী দলও পাঠালেন। কিন্তু তিনি আক্রমনাত্মক ভূমিকার বদলে আত্মরক্ষার কৌশলকে প্রাধান্য দিলেন। এজন্য তিনি দিনের বেলায় একটি প্রতিনিধি দলকে হাম্মাদের কাছে মৈত্রী ও সমঝোতার প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। আর রাতের বেলায় গোটা কাফেলাকে সতর্কাবস্থায় রাখলেন এবং কড়া পাহারার ব্যবস্থাও করলেন।

সকাল বেলায় প্রধান বিচারপতি ও কাফেলার নেতাদের পক্ষ থেকে ডাকাত সর্দার হাম্মাদ বিন আলীর কাছে দু'জন অশ্বারোহী দূতকে পাঠানো হলো। তারা গিয়ে হাম্মাদকে প্রস্তাব দিলো, কাফেলাকে যদি নিরাপদে মক্কা যেতে এবং গযনী ফিরতে দেয়া হয় তাহলে তোমাকে পাঁচ হাজার দিরহাম উপঢৌকন হিসেবে দেয়া হবে।

প্রস্তাব শুনে হাম্মাদ ভয়ানক ক্ষেপে গেল এবং এ প্রস্তাবকে সে খুবই অপমানজনক মনে করে বললো—

পাঁচ হাজার দিরহাম? পাঁচ হাজার দিরহাম দিয়ে তোমরা আমার পায়ের ধুলোও কিনতে পারবে না। তোমরা আমাকে অপমান করতে এসেছো। আমি ভিক্ষা করি না।

হাম্মাদ ডাকাতদের দিকে ইঙ্গিত করে দূতদের বললো-তোমাদের নেতাকে গিয়ে আমার শক্তি ও জনবলের কথা বলবে। বলবে এদেরকে কি আমি এক দিরহাম করে দিয়ে ফিরে যেতে বলবো?

তোমাদের কাফেলার সকল ধনসম্পদ আমার। আর সকল যুবতী মেয়েরও মালিক আমি। সম্পদ ও যুবতী মেয়েদেরকে আমার হাতে সোপর্দ করে নিরাপদে তোমরা চলে যেতে পারো।

হাম্মাদ বিন আলী! নিজের শক্তির উপর এতোটা অহংকার করে ফেরাউন সেজো না! আমরা তোমার কাছে কোন আবেদন নিয়ে আসিনি, বন্ধুত্বের পয়গাম নিয়ে এসেছি। বললো এক দূত। সে আরো বললো, হতে পারে কাফেলার লোকজন সবকিছু নিয়েই মক্কায় যাবে। তাদের কিছুই হবে না। উল্টো তোমার লোকদের রক্তে মরুভূমির বালু রঙিন হবে।

একথা শুনে হাম্মাদের ক্ষোভ আরো বেড়ে গেল। সে গর্জন করে বললো, চলে যাও তোমরা। এক্ষণই আমার সামনে থেকে চলে যাও। আমরা কোন মেহমানকে হত্যা করি না, নয়তো এই ধৃষ্টতার জন্যে তোমাদের মাথা উড়িয়ে দিতাম।

অবশেষে দূতেরা ফিরে এলো। পথিমধ্যে তাদের দেখা হলো ইরতেগীনের সাথে। ইরতেগীন দূতকে জিজ্ঞেস করলো, হাম্মাদ কী জবাব দিয়েছে? জবাব শুনে ইরতেগীন হাসলো এবং তীর-ধনুক নিয়ে একটি উঁচু টিলার উপরে চড়ে বসলো।

ডাকাত সর্দার হাম্মাদকে ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে মৈত্রীচুক্তি করার জন্যে প্রধান বিচারপতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন সুলতান। এজন্য তিনি নগদ ত্রিশ হাজার দিরহাম প্রধান বিচারপতির হাতে তুলেও দিয়েছিলেন। কিন্তু এতোগুলো দিরহাম ডাকাত সর্দারকে দেয়া ঠিক মনে করেননি প্রধান বিচারপতি। এজন্য তিনি পাঁচ হাজার দিরহামের প্রস্তাব দিয়ে দূত প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন এতো বড়ো ডাকাতদলের সর্দার পাঁচ হাজার

দিরহামের প্রস্তাবকে অপমান মনে করবে। তবুও তিনি তাই করলেন এবং পরোক্ষভাবে ডাকাতদের উস্কানি দিয়ে বললেন- এসো, ক্ষমতা থাকলে ডাকাতি করে যাও।

প্রধান বিচারপতি ফিরে আসা দূতদের কাছে হাম্মাদের জবাব শুনে তখনই সেনাদের কৌশলগত জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং গোটা কাফেলাকে পূর্ণ রণপ্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিলেন।

অপমানজনক প্রস্তাবে হাম্মাদ বিন আলী প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলো। ডাকাত সর্দারদের একত্রিত করে গিয়ে কাফেলার উপর আক্রমণের নির্দেশ দিলো।

হজ্জ কাফেলা অবস্থান করছিল টিলার বাইরে। কাফেলার সকল পুরুষ উট ও ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিল। আর মেয়েরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা বিধানের জন্যে দু'আ করতে শুরু করলো।

ডাকাত সর্দার হাম্মাদ একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ডাকাতদলের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। তার ডানে ছিল দু'জন নিরাপত্তারক্ষী এবং তার আগে আগে একটি কালো পতাকা নিয়ে এক বেদুঈন যাচ্ছিল। ডাকাতদের নেতারা ছিল কুচকুচে কালো এবং ভয়ংকর। সাবিলা দূরের একটি টিলার উপরে দাড়িয়ে ডাকাত দলের অবস্থা এবং হজ্জকাফেলার অবস্থান দেখার চেষ্টা করছিল।

ডাকাতদলকে আসতে দেখে ইরতেগীন উঁচু টিলা থেকে নেমে নীচু টিলার আড়ালে আড়ালে সেই স্থানে চলে গেল, যে পথ দিয়ে ডাকাত দল অগ্রসর হচ্ছিল। একসময় তার নজরে পড়ল ডাকাত সর্দার হাম্মাদ বিন-আলী। হাম্মাদ মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে অহংকারী মেজাজে অগ্রসর হচ্ছিল। কিছুটা কাছাকাছি আসার পর ইরতেগীন তার ধনুকে একটি তীর ভরে হাম্মাদের চেহারা তাক করে ছুড়ে দিল। নিক্ষিপ্ত তীর গিয়ে হাম্মাদের কানপট্টিতে আঘাত হানল। তীর বিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে একটা চিৎকার দিয়ে হাম্মাদ ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ল। হাম্মাদের নিরাপত্তারক্ষীরা সর্দারের এই অবস্থা দেখে অবাক ও বিস্মিত। তখনো তারা ব্যাপারটি বুঝে উঠতে পারেনি কি হয়েছে। ইতোমধ্যে আরেকটি তীর এসে পতাকা বহনকারীর বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেল এবং পতাকা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এ সময় ইরতেগীন দৌড়ে একটি টিলার উপরে উঠে গগন বিদারী চিৎকার করে বললো—

আল্লাহ্‌র কসম' আমি হাম্মাদকে হত্যা করেছি। গযনীর সম্ভ্রমের কসম! বেদুঈনদের পতাকা মাটিতে পড়ে গেছে।

সর্দারকে তীর বিদ্ধ হয়ে মরতে দেখে এবং পতাকা মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখে ডাকাতরা আতংকিত হয়ে পড়লো এবং তাদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিলো। এই সুযোগে প্রধান সেনাপতি সেনাবাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন।

ইরতেগীন আগেই প্রধান সেনাপতি আবু মুহাম্মদকে বলেছিল, সে হাম্মাদকে চিনে এবং হাম্মাদকে ধরাশায়ী করাই হবে তার প্রথম কাজ।

প্রধান বিচারপতি ইরতেগীনকে বলেছিলেন, তুমি যদি হাম্মাদকে হত্যা করতে পারো, তাহলে বুক ফাঁটা চিৎকার দিয়ে তা সবাইকে জানিয়ে দিয়ো।

ইরতেগীনের পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত। সে সময় মতো হাম্মাদকে তীরবিদ্ধ করতে সক্ষম হয় এবং বেদুঈনদের পতাকাবাহীকে ধরাশায়ী করে উঁচু আওয়াজে সবাইকে জানিয়ে দেয়।

এরপর যুদ্ধ বলতে যা হচ্ছিল তাহলো বেদুঈনদের গণহত্যা। লড়াকু বেদুঈনরা তাদের ঝাণ্ডা ও সর্দারকে হারিয়ে আতংকিত হয়ে পড়েছিল। তারা আক্রমণের চেয়ে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট ছিল বেশি। সেনাদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে বেদুঈন ডাকাতেরা টিলার আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু টিলাগুলো তাদের জন্য মরন ফাঁদ হয়ে উঠলো। টিলার উপরে অবস্থানকারী তীরন্দাজদের তীরবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ছিল একের পর এক বেদুঈন। আর কেউ পালিয়ে যেতে চাইলে সৈন্যরা তাকে তাড়া করে মেরে ফেলছিল।

ডাকাত ও গযনী বাহিনীর মধ্যে যখন চলছে মরণযুদ্ধ, আহতদের আর্তচিৎকার, ঘোড়া ও উটের হ্রেষাধ্বনি ও কোলাহলের মধ্যেই একটি নারী কণ্ঠের ডাক চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল– ইরতেগীন! ইরতেগীন! অবলা এই নারী ছিল সাবিলা। তাকে গযনীর এক সৈনিক ঘোড়ায় তুলে না নিলে সে হয়তো ঘোড়ার পায়ে পিষ্ঠ হয়েই মারা যেতো।

দিনের প্রথমভাগে শুরু হওয়া এই লড়াই দুপুরের দিকেই শেষ হয়ে গেল। প্রধান বিচারপতি যুদ্ধ শেষে নিরাপদে কাফেলাকে মক্কায় নিয়ে গেলেন। যাওয়ার পথে প্রধান বিচারপতি ইরতেগীনের উদ্দেশ্যে বললেন—তুমি আর এখন থেকে গোলাম নও, স্বাধীন। আর সাবিলা! তুমি গযনীর মর্যাদার প্রতীক, ইসলামের সম্মান। ইসলাম এ ভাবেই কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে।

## চতুর্থ খন্ড সমাপ্ত
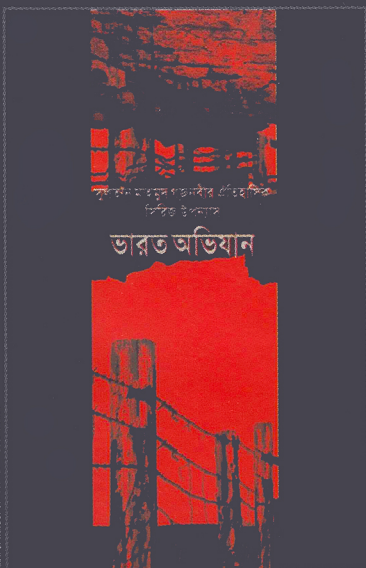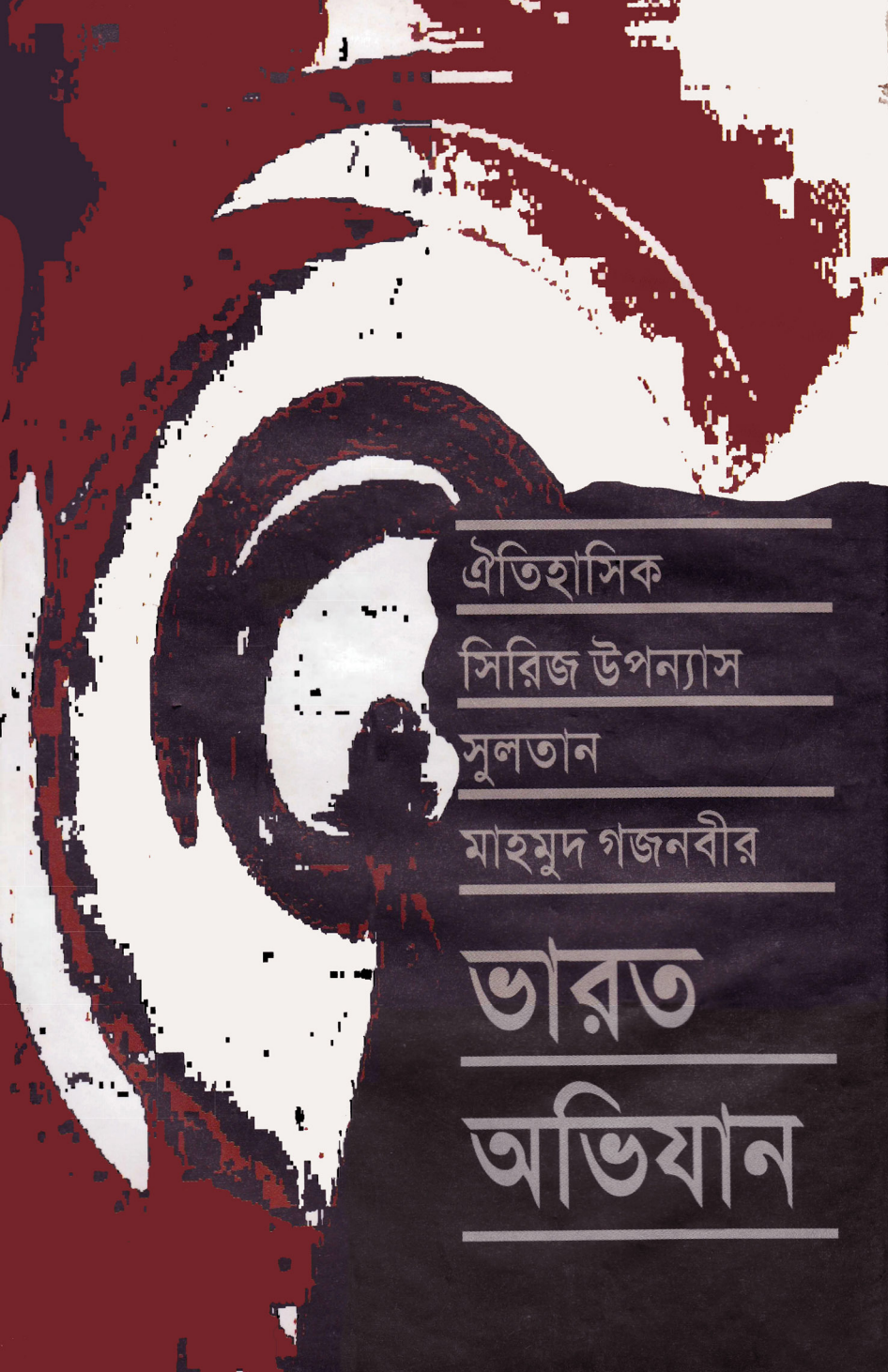
এদারায়ে কুরআন
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা।

VAROT OVIJAN : 1
ISBN 984-70109-0000-3 SET

ঐতিহাসিক
সিরিজ উপন্যাস
সুলতান
মাহমুদ গজনবীর
ভারত
অভিযান

# ভারত অভিযান - ৫

# ভারত অভিযান

## (পঞ্চম খণ্ড)

এনায়েতুল্লাহ

অনুবাদ

**শহীদুল ইসলাম**

**গবেষক**, সম্পাদক, গ্রন্থকার

এদারায়ে কুরআন

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল — ২০০৯

**প্রকাশক** ▶ **আরিফ বিল্লাহ,** এদারায়ে কুরআন, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০,  **প্রচ্ছদ** ▶ নাজমুল হায়দায়
কম্পিউটার কম্পোজ ▶ এম. হক কম্পিউটার্স, মুদ্রণ ▶
ফারিয়া প্রিন্টিং প্রেস, মোবাইল ঃ ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

**মূল্য ঃ একশত ষাট টাকা মাত্র**

**BHAROT OVIJAN-5 :** Writer Enayatullah, Translated by Shahidul Islam, Published by Edara-e- Quran, 50 Banglabazar, Dhaka-1100, Printed by Rafia Printing Press. Date of Publication April 2009.

**PRICE TAKA ONE HUNDRED SIXTY ONLY**

**ISBN 984-70109-0000-3 SET**

# উৎসর্গ

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পিলখানার বিডিআর সদর দফতরে চক্রান্তমূলক হত্যাকাণ্ডে নিহত সেনা অফিসারদের রূহের মাগফিরাত এবং প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত সকল সদস্যের ঐক্য, সংহতি ও সাফল্য কামনায়- যারা হবে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়-

'শির দেগা নাহি দেগা আমামা'

এর মূর্ত প্রতীক।

—অনুবাদক

# প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! 'এদারায়ে কুরআন' কর্তৃক প্রকাশিত সুলতান মাহমূদ এর ভারত অভিযান সিরিজের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। এজন্য আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং পাঠক মহলকে জানাচ্ছি মোবারকবাদ। নিয়মিত বিরতি দিয়ে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশের ঐকান্তিক ইচ্ছা আমাদের ছিল। কিন্তু নানাবিধ কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের বিলম্বের কারণে অনেক আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা ও সুহৃদ আমাদের তাকিদ দিয়েছেন, কেউ কেউ তো রীতিমতো অসন্তোষ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বস্তুত সম্মানিত পাঠকদের এই তাগাদা, ক্ষোভ একজন প্রকাশক হিসেবে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। কারণ সিরিজের গোটা উপাখ্যানটি পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়বোধ আমার আছে। সেই সাথে একটি প্রিয় সিরিজের অপঠিত অংশের জন্যে একজন উৎসাহী পাঠকের মধ্যে কতোটা তাড়না থাকে এই অনুভূতিটুকুও আমাকে তাড়িয়েছে। মোদ্দাকথা হলো, বিলম্ব বিলম্বই। কোনর জবাবদিহিতাই বই সামনে পেশ করা ছাড়া পাঠকের আহত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। অতএব শত যৌক্তিক কারণ থাকার পরও সবার কাছে দুঃখপ্রকাশ করছি।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে পঞ্চম খণ্ডটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে সুখানুভব করছি।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতার পরও আমরা এ খণ্ডটি আগেরগুলোর চেয়ে আরো সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তবুও মুদ্রণ প্রমাদ ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। বিজ্ঞমহলের কাছে যে কোন ত্রুটি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের মতো পঞ্চম খণ্ডটিও পাঠক-পাঠিকা মহলে আদৃত হলে আমাদের সার্বিক প্রয়াস সার্থক হবে।

—প্রকাশক

# লেখকের কথা

"মাহমূদ গজনবীর ভারত অভিযান" সিরিজের এটি পঞ্চম খণ্ড। উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতান মাহমূদ গজনবী সতের বার ভারত অভিযান পরিচালনাকারী মহানায়ক হিসেবে খ্যাত। সুলতান মাহমূদকে আরো খ্যাতি দিয়েছে পৌত্তলিক ভারতের অন্যতম দু' ঐতিহাসিক মন্দির সোমনাথ ও থানেশ্বরীতে আক্রমণকারী হিসেবে। ঐসব মন্দিরের মূর্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন মাহমূদ। কিন্তু উপমহাদেশের পাঠ্যপুস্তকে এবং ইতিহাসে মাহমূদের কীর্তির চেয়ে দুষ্কৃতির চিত্রই বেশী লিখিত হয়েছে। হিন্দু ও ইংরেজদের রচিত এসব ইতিহাসে এই মহানায়কের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে তাঁর সুখ্যাতি চাপা পড়ে গেছে। মুসলিম বিদ্বেষের ভাবাদর্শে রচিত ইতিহাস এবং পরবর্তীতে সেইসব অপইতিহাসের ভিত্তিতে প্রণীত মুসলিম লেখকরাও মাহমূদের জীবনকর্ম যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের বোঝার উপায় নেই, তিনি যে প্রকৃতই একজন নিবেদিতপ্রাণ ইসলামের সৈনিক ছিলেন, ইসলামের বিধি-বিধান তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। জাতিশত্রুদের প্রতিহত করে খাঁটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও দৃঢ় করণের জন্যেই নিবেদিত ছিল তার সকল প্রয়াস। অপলেখকদের রচিত ইতিহাস পড়লে মনে হয়, সুলতান মাহমূদ ছিলেন লুটেরা, আগ্রাসী ও হিংস্র। বারবার তিনি ভারতের মন্দিরগুলোতে আক্রমণ করে সোনা-দানা, মণি-মুক্তা লুট করে গজনী নিয়ে যেতেন। ভারতের মানুষের উন্নতি কিংবা ভারত কেন্দ্রিক মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা তার কখনো ছিলো না। যদি তৎকালীন ভারতের নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য করা এবং পৌত্তলিকতা দূর করে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার একান্তই ইচ্ছা তাঁর থাকতো, তবে তিনি কেন মোগলদের মতো ভারতে বসতি গেড়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতেন না? ইত্যাকার বহু কলঙ্ক এঁটে তার চরিত্রকে কলুষিত করা হয়েছে।

মাহমূদ কেন বার বার ভারতে অভিযান চালাতেন? মন্দিরগুলো কেন তার টার্গেট ছিল? সফল বিজয়ের পড়ও কেন তাকে বার বার ফিরে যেতে হতো গজনী? ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জবাব; ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ সৈনিক সুলতান মাহমূদকে তুলে ধরার জন্যে আমার এই প্রয়াস। নির্ভরযোগ্য দলিলাদি ও বিশুদ্ধ ইতিহাস ঘেটে আমি এই বইয়ে মাহমূদের

প্রকৃত জীবন চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রকৃত পক্ষে সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর মতোই মাহমূদকেও স্বজাতির গাদ্দার এবং বিধর্মী পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে একই সাথে লড়াই করতে হয়েছে। যতো বার তিনি ভারত অভিযান চালিয়েছেন, অভিযান শেষ হতে না হতেই খবর আসতো, সুযোগ সন্ধানী সাম্রাজ্যলোভী প্রতিবেশী মুসলিম শাসকরা গজনী আক্রমণ করছে। কেন্দ্রের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বাধ্য হয়েই মাহমূদকে গজনী ফিরে যেতে হতো। একপেশে ইতিহাসে লেখা হয়েছে, সুলতান মাহমূদ সতের বার ভারত অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু একথা বলা হয়নি, হিন্দু রাজা-মহারাজারা মাহমূদকে উৎখাত করার জন্যে কতো শত বার গজনীর দিকে আগ্রাসন চালিয়ে ছিল।

সুলতান মাহমূদের বারবার ভারত অভিযান ছিল মূলত শত্রুদের দমিয়ে রাখার এক কৌশল। তিনি যদি এদের দমিয়ে রাখতে ব্যর্থ হতেন, তবে হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকতাবাদ সাগর পাড়ি দিয়ে আরব পর্যন্ত বিস্তৃত হতো।

মাহমূদের পিতা সুবক্তগীন তাকে অসীয়ত করে গিয়েছিলেন, "বেটা! ভারতের রাজাদের কখনও স্বস্তিতে থাকতে দিবে না। এরা গজনী সালাতানাতকে উৎখাত করে পৌত্তলিকতার সয়লাবে কাবাকেও ভাসাতে চায়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময়ের মত ভারতীয় মুসলমানদেরকে হিন্দুরা জোর জবরদস্তি হিন্দু বানাচ্ছে। এদের ঈমান রক্ষার্থে তোমাকে পৌত্তলিকতার দুর্গ গুড়িয়ে দিতে হবে। ভারতের অগণিত নির্যাতিত বনি আদমকে আযাদ করতে হবে, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।"

আলবিরুনী, ফিরিশ্‌তা, গারদিজী, উতবী, বাইহাকীর মতো বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ তৎকালীন সবচেয়ে বড় বুযুর্গ ও ওলী শাইখ আবুল হাসান কিরখানীর মুরীদ ছিলেন। তিনি বিজয়ী এলাকায় তার হেদায়েত মতো পুরোপুরি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি নিজে কিরখানীর দরবারে যেতেন। কখনও তিনি তাঁর পীরকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠাননি। উপরন্তু তিনি ছদ্মবেশে পীর সাহেবের দরবারে গিয়ে ইসলাহ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি আত্মপরিচয় গোপন করে কখনও নিজেকে সুলতানের দূত হিসেবে পরিচয় দিতেন। একবার তো আবুল হাসান কিরখানী মজলিসে বলেই ফেললেন, "আমার একথা ভাবতে ভালো লাগে যে, গজনীর সুলতানের দূত সুলতান নিজেই হয়ে থাকেন। এটা প্রকৃতই মুসল[illegible] আলামত।"

মাহমূদ কুরআন, হাদীস ও দীনি ইলম প্রচারে খুবই যত্নবান ছিলেন। তাঁর দরবারে আলেমদের যথাযথ মর্যাদা ছিল। সব সময় তার বাহিনীতে শত্রু পক্ষের চেয়ে সৈন্যবল কম হতো কিন্তু তিনি সব সময়ই বিজয়ী হতেন। বহুবার এমন হয়েছে যে, তার পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ময়দানে দু'রাকাত নামায আদায় করে মোনাজাত করতেন এবং চিৎকার করে বলতেন, "আমি বিজয়ের আশ্বাস পেয়েছি, বিজয় আমাদেরই হবে।" বাস্তবেও তাই হয়েছে।

অনেকেই সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী আর সুলতান মাহমূদকে একই চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বীর সেনানী মনে করেন। অবশ্য তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একই ছিল। তাদের মাঝে শুধু ক্ষেত্র ও প্রতিপক্ষের পার্থক্য ছিল। আইয়ুবীর প্রতিপক্ষ ছিল ইহুদী ও খৃস্টশক্তি আর মাহমূদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল হিন্দু পৌত্তলিক রাজন্যবর্গ। ইহুদী ও খৃস্টানরা সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর সেনাদের ঘায়েল করতো প্রশিক্ষিত সুন্দরী রমণী ব্যবহার করে নারী গোয়েন্দা দিয়ে আর এর বিপরীতে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে এরা ব্যবহার করতো শয়তানী যাদু। তবে ইহুদী-খৃস্টানদের চেয়ে হিন্দুদের গোয়েন্দা তৎপরতা ছিল দুর্বল কিন্তু সুলতানের গোয়েন্দারা ছিল তৎপর ও চৌকস।

তবে একথা বলতেই হবে, সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর গোয়েন্দারা যেমন দৃঢ়চিত্ত ও লক্ষ্য অর্জনে অবিচল ছিল, মাহমূদের গোয়েন্দারা ছিল নৈতিক দিক দিয়ে ততোটাই দুর্বল। এদের অনেকেই হিন্দু নারী ও যাদুর ফাঁদে আটতে যেতো। অথবা হিন্দুস্তানের মুসলিম নামের কুলাঙ্গররা এদের ধরিয়ে দিতো। তারপরও সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর চেয়ে সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা কার্যক্রম ছিল বেশি ফলদায়ক।

ইতিহাসকে পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য, বিশেষ করে তরুণদের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশনের জন্যে গল্পের মতো করে রচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থ। বাস্তবে এর সবটুকুই সত্যিকার ইতিহাসের নির্যাস। আশা করি আমাদের নতুন প্রজন্ম ও তরুণরা এই সিরিজ পড়ে শত্রু-মিত্রের পার্থক্য, এদের আচরণ ও স্বভাব জেনে এবং আত্মপরিচয়ে বলীয়ান হয়ে পূর্বসূরীদের পথে চলার দিশা পাবে।

এনায়েতুল্লাহ
লাহোর।

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

# রত্না হলো রাজিয়া

কন্নৌজ এখন গযনীর দখলে। গযনী বাহিনীর সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকী কন্নৌজের গভর্নর। কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপাল গযনী বাহিনী কন্নৌজ অবরোধের আগেই কন্নৌজ ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে গিয়েছিলেন। কন্নৌজে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পর রাজা রাজ্যপাল ছদ্মবেশে কন্নৌজ এসে মুসলিম শাসক সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকীর কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন এবং তার লোকদের পুনর্বাসনের জন্যে আব্দুল কাদেরের কাছে রাড়ী নামক স্থানে বসতি স্থাপনের অনুমতি চাইলেন। সেই সাথে আবেদন করলেন, তাকে সেখানে নগর স্থাপনের অনুমতি দেয়া হোক এবং রাড়ীকে রাজধানী করে পুনরায় তার সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করার সুযোগ দেয়া হোক।

গভর্নর আব্দুল কাদের সেলজুকী রাজা রাজ্যপালের আবেদনে সাড়া দিলেন। তিনি বললেন-

আপনাকে আমি রাড়ীতে রাজধানী গড়ে তোলার অনুমতি দিচ্ছি! কিন্তু পরাজয় স্বীকার করার পর মুসলিম শাসনাধীন থাকতে হলে আপনাকে যে সব শর্ত মেনে নিতে হবে সেগুলো সুলতান মাহমূদ ঠিক করবেন এবং তিনিই নির্ধারণ করবেন আপনাকে কি পরিমাণ যুদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং বাৎসরিক খাজনার পরিমাণ কি হবে? তাছাড়া আপনি কি কি সুবিধা ভোগ করতে পারবেন, আপনার কোন কোন বিষয় আমাদের কর্তৃত্বে থাকবে তাও সুলতানই নির্ধারণ করবেন।

যে কোন শর্ত মেনে নিয়ে মুসলিম শাসনাধীনে থেকে রাজা রাজ্যপাল তার লোক লস্কর নিয়ে কন্নৌজের পরিবর্তে রাড়ীকে রাজধানী করে রাজত্ব পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নিলেন। যাতে তার অস্তিত্বও টিকে থাকে এবং তার অনুগত সৈনিক ও প্রজারা নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারে।

রাজ্যপাল স্বেচ্ছায় কন্নৌজ এসে গযনী সুলতানের অধীনে রাড়ীকে রাজধানী করে নিজের লোকদের পুনর্বাসন করতে চান- এ খবর দিয়ে সেই দিনই গযনী সুলতানের কাছে দূত পাঠালেন কন্নৌজের শাসক আব্দুল কাদের সেলজুকী।

খবর পেয়ে দূতের কাছে আদিঅন্ত সবকিছু জেনে সুলতান মাহমূদ রাজ্যপালের জন্যে পালনীয় শর্তাদি ঠিক করে দিলেন। সুলতান যে সব শর্ত দিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল–

'রাজ্যপাল কখনো গযনীবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবেন না। গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে কাউকে প্ররোচনা দেয়া বা সামরিক সহযোগিতা করতে পারবেন না।

নতুন রাজধানীতে রাজা রাজ্যপালের যে সব সৈনিক থাকবে তারা শুধু অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কাজ করবে; কিন্তু তারা থাকবে গযনীর নিয়ন্ত্রণে। স্বায়ত্তশাসনের মতো রাজ্যপাল সুবিধাদি ভোগ করবেন, প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা ট্যাক্স ইত্যাদি উসূল করবেন। কিন্তু তার সবকিছু থাকবে গযনী সরকারের কাছে জাবাদেহিমূলক। রাজ্যপালের উপর যদি কোন বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তবে গযনী বাহিনী তাকে সাহায্য করবে। মোটকথা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবে রাজ্যপালের উপর। তবে সার্বিক নিরাপত্তা ও সামরিক কর্তৃত্ব থাকবে গযনী বাহিনীর হাতে! বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ ও রাড়ীর নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবে গযনী বাহিনীর কাছে।

গযনী সুলতানের দেয়া সব শর্তই রাজা রাজ্যপাল মেনে নিলেন এবং তিনি সুলতানকে নির্ধারিত অংকের ক্ষতিপূরণ ও বার্ষিক খাজনা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

স্বেচ্ছায় গযনীর গভর্ণর আব্দুল কাদেরের কাছে আত্মসমর্পণের পর রাজ্যপাল নিজেই বলেছিলেন, গযনী বাহিনী কন্নৌজ অবরোধ করার আগেই তিনি তার রাজ্যের সকল রাজকীয় সম্পদ অজ্ঞাত স্থানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। অতএব সুলতান মাহমূদকে ধার্য করা ক্ষতিপূরণ দিতে তার কোন আপত্তি নেই এবং তাতে তার কোন বেগও পোহাতে হবে না।

সুলতানের নির্দেশ মতো গভর্ণর আব্দুল কাদের রাজ্যপালের কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও বার্ষিক খাজনা উসূল করে নিলেন। সুলতান মাহমূদ গভর্ণর আব্দুল কাদের সেলজুকীকে নির্দেশ দিলেন, 'রাজা রাজ্যপালের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তার সম্পর্কে সবধরনের সংবাদ সব সময় গযনী পাঠাতে থাকবে।

সুলতানের এই নির্দেশ থেকে বুঝা যায়, রাজা রাজ্যপাল সম্পর্কে সুলতানের মধ্যে একটা কৌতুহল ছিল। অথবা রাজা রাজ্যপালের মনোভাবের উপর তিনি নির্ভর করতে পারছিলেন না। কারণ, রাজ্যপাল সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে

নেয়ায় সেখানকার অন্যান্য হিন্দু রাজাদের মধ্যে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। সুলতান মাহমূদ প্রকারান্তরে চাচ্ছিলেন রাজা-রাজ্যপালকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে। যাতে করে সে পুনর্বার শক্তি সঞ্চয় করে গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ না পায়।

মহারাজা রাজ্যপাল বশ্যতা স্বীকার করে যুদ্ধ ক্ষতিপূরণ ও সুলতানকে বাৎসরিক খাজনা পরিশোধ করে গযনী সরকারের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে ছিলেন বটে, কিন্তু এতে সারা হিন্দুস্তান রাজ্যপালের শত্রুতে পরিণত হলো। তৎকালীন হিন্দুস্তানের পার্শবর্তী মহাশক্তি তিন শক্তিধর হিন্দুরাজা রাজ্যপালের এতোটাই শত্রুতে পরিণত হলো যে, তারা রাজ্যপালকে হত্যা করার চেষ্টায় মেতে উঠলো।

রাজ্যপালের শত্রুদের মধ্যে কালাঞ্জরের রাজা গোবিন্দ ছিল অন্যতম। দ্বিতীয় ছিল গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন, তৃতীয় লাহোরের মহারাজা তরলোচনপাল। লাহোরের মহারাজা ভীমপাল তখন বৃদ্ধ ও অসুস্থ। ফলে তার ছোট ভাই তরলোচনপালকে লাহোরের রাজা ঘোষণা করা হয়। তরলোচনপাল রাজত্বের আসনে বসে কালাঞ্জর ও গোয়ালিয়রের রাজাদের সাথে হাত মিলিয়ে নতুন উদ্যমে গযনীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করল।

অবশ্য রাজা তরলোচনের বড় ভাই ভীমপাল সুলতান মাহমূদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে সুলতানের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল এবং গযনীর সুলতানকে বাৎসরিক খাজনা পরিশোধ করে গযনীর বিরুদ্ধে কোন ধরণের সামরিক তৎপরতায় যোগ দিবে না বলে চুক্তিতে সই করেছিল। ফলে রাজা তরলোচন পালের পক্ষে প্রকাশ্যে গযনী সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব ছিলো না। কিন্তু গোপনে সে রাজা গোবিন্দ ও অর্জুনের সাথে মৈত্রী গড়ে তোলে এবং তিন রাজ্যের সেনাবাহিনী গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

তরলোচনপাল তার সৈন্যদের প্রকাশ্যে না এনে কন্নৌজ থেকে দূরে একটি ঘন জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছিল। সে অন্য রাজাদের বলেছিল তার সেনারা প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। প্রয়োজনের সময় সে তার সেনাদের প্রকাশ্যে নিয়ে আসবে। প্রকৃতপক্ষে তরলোচনপালের সামরিক প্রস্তুতি এবং লাহোর থেকে তার সেনাদের এনে কন্নৌজের কাছের কোন জঙ্গলে লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটি ছিল অন্যান্য হিন্দু রাজাদের জন্য একটা গোলক ধাঁধা। তারা তরলোচনপালকে ঠিক বিশ্বাসও করতে পারছিল না, আবার তার বাহিনীকে এ দিকে নিয়ে আসার ব্যাপারটিকে অস্বীকারও করতে পারছিল না।

অবশ্য এই তিন রাজা মনে প্রাণে চেষ্টা করছিল, রাজা রাজ্যপালকে তাদের পক্ষে আনতে এবং গযনীর বশ্যতা প্রত্যাখ্যান করে তাদের কাতারে শামিল করতে। কিন্তু রাজ্যপাল ইচ্ছা করেই এসব রাজাদের সাথে সবধরণের যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি তাদের দেয়া কোন সংবাদ যেমন গ্রহণ করতেন না, তিনিও তাদের সাথে কোন ধরনের যোগাযোগের চেষ্টা করতেন না। এর কারণ ছিল, গযনী সরকার তার তৎপরতা পর্যবেক্ষণের জন্য রাজ্যপালের নতুন রাজধানী রাড়ীতে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়োগ করে রেখেছিল এবং সামরিক বাহিনীর কয়েকজন কমাণ্ডার পর্যায়ের ব্যক্তি সব সময় রাড়ীতে অবস্থান করে রাজ্যপালের সার্বিক কাজ কর্ম ও তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করতো।

রাড়ীতে গযনী বাহিনীর যে ক'জন সেনা কমান্ডারকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিল কমান্ডার যুলকারনাইন। কমান্ডার যুলকারনাইন ছিল হিন্দুস্তানের যুদ্ধে সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞতার অধিকারী। সে হিন্দুস্তানের প্রায় সবগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তাছাড়া দীর্ঘ দিন সে লাহোর ও মুলতানে অবস্থান করেছিল। ফলে অনায়াসে যুলকারনাইন স্থানীয় ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারতো। স্থানীয় ভাষা জানার কারণে হিন্দুদের মনোভাব সে ভালো বুঝতে পারতো। এজন্য যুলকারনাইনকে রাড়ীতে মহারাজা রাজ্যপালের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

যুলকারনাইন ছিল দীর্ঘদেহী সুদর্শন যুবক। একটা স্মিতহাসি সব সময় তার মুখে দেখা যেতো। সে যে কোন মানুষের সাথে খুব সহজেই মিশতে পারতো, ফলে হিন্দুদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যুলকারনাইন।

ঘটনাক্রমে এই যুলকারনাইন এক হিন্দু তরুণীকে বিয়ে করেছিল। এই তরুণীর নাম ছিল রত্মা। অবশ্য যুলকারনাইনের সাথে বিয়ের আগেই রত্না তার নাম বদল করে রাজিয়া রেখেছিল। এই রত্মাকে যুলকারনাইন পেয়েছিল মথুরায়। এক ভয়ানক পরিস্থিতিতে রত্মা যুলকারনাইনের সান্নিধ্যে আসে।

সুলতান মাহমূদ যখন মথুরা আক্রমণ করেছিলেন তখন ছিল পূজার মৌসুম। পূজা দেয়ার উদ্দেশ্যে হাজার হাজার হিন্দু ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে মথুরায় এসে জমায়েত হয়েছিল। পুরো মথুরা শহর আগতদের তাঁবুতে ভরে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ এক রাতের তুফান ও ঘূর্ণিঝড় গোটা শহর লন্ডভণ্ড করে ফেলে। তাঁবু উড়িয়ে নেয়। শত শত মানুষ গাছ কিংবা বিধ্বস্ত ঘর বাড়ির নিচে চাপা পড়ে মারা যায়। প্রচণ্ড ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় মথুরা নগরী।

ঠিক সেই ঝড়ের দু'দিন পর গযনীবাহিনী মথুরা আক্রমণ করেছিল। হিন্দু বাহিনীর সাথে শহরের বাইরে গযনী বাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। মথুরার আকাশে তখন শকুনের উড়াউড়ি আর বাতাসে মৃত লাশের গন্ধ। সর্বত্র ভগ্নস্তূপ। মথুরার সৈন্যরা গযনী বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

এক রাতে পাহারার জন্যে যুলকারনাইন দুই সঙ্গীকে নিয়ে শহরের বাইরে টহল দিচ্ছিল। ভয়াবহ পরিস্থিতি সবখানে। যত্রতত্র গাছপালা ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মৃত মানুষের দেহ। হাজার হাজার তাঁবুর জঞ্জাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সর্বত্র। শহরের ভেতরে ও বাইরে বহু লোক দুই বাহিনীর সংঘর্ষের সময় পদপিষ্ট হয়ে মারা পড়ে।

ঘোর সন্ধ্যার অন্ধকারে টহলরত অবস্থায় হঠাৎ যুলকারনাইনের কানে ভেসে এলো কারো পালানোর শব্দ। যুলকারনাইন ভেসে আসা শব্দের দিকে ঘোড়া হাঁকাল। ঘোড়ার খুঁড়ে শব্দ শুনে পলায়নপর লোকটি থেমে গেল এবং চিৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করল। যুলকারনাইন ঘোড়া থেকে নেমে দেখল, ভেঙ্গে পড়া একটি গাছের আড়ালে একটি তরুণী মেয়ে নিজেকে লুকাতে চেষ্টা করছে। যুলকারনাইন হাত বাড়িয়ে যেই মেয়েটিকে ধরতে গেল, মেয়েটি গলা চড়িয়ে কান্না শুরু করল। দেখেই বুঝা যাচ্ছিল মেয়েটি ভয় ও আতংকে কাঁদছে।

যুলকারনাইন মেয়েটির আরো কাছে গিয়ে তাকে যখন টেনে দাঁড় করাল, তখন বুঝতে পারল, মেয়েটি যুবতী, সম্ভবত কুমারী।

আমাকে মেরে ফেলো– আতংকগ্রস্ত কণ্ঠে বললো মেয়েটি। আমার গায়ে হাত দিয়ো না, আমাকে মেরে ফেলো। আমাকে তুমি তুলে নিয়ো না– নিবেদনের সুরে বললো মেয়েটি।

এখানে আমরা কোন মেয়েকে হত্যা করতে আসিনি– বললো যুলকারনাইন। আমরা নারী ও মেয়েদের মর্যাদা দিতে এসেছি। তাদের জীবন বাঁচাতে এসেছি। আমরা অসহায় জীবন ও ইজ্জতের হেফাযত করতে এসেছি। বলো মেয়ে? তুমি কোথায় যেতে চাও, আমরা তোমাকে সেখানেই পৌছে দেবো।

আমি কোথাও যেতে চাই না, আমি মরতে চাই। আমাকে হত্যা করে আমার মা বাবার কাছে পৌঁছে দাও– কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো তরুণী।

তোমার মা বাবা কি মারা গেছে?

হ্যাঁ, তারা উভয়েই মারা গেছে। আমি যে স্থান থেকে দৌড়ে পালিয়ে এসেছি, সেখানে তাদের মরদেহ পড়ে আছে। আমার একটি যুবক ভাই ছিল সেও মারা গেছে।

এই মেয়েটি বহু দূর থেকে তার মা বাবা ও ভাইয়ের সাথে মথুরা এসেছিল পূজা দিতে। ঝড়ের দিন তাদের তাঁবু বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তার যুবক ভাইটি গাছ চাপা পড়ে মারা যায়। আর দু'দিন পর যুদ্ধ শুরু হলে তার বাবা ও মা ভীত সন্ত্রস্ত ছুটন্ত মানুষের ভিড়ে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ঠ হয়ে মারা যায়। যুদ্ধ শুরু হলে মেয়েটিকে তার মা বাবা এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। ফলে সে বেঁচে যায়।

গযনী সৈন্যদের এদিকে আসতে দেখে সে আতংকে কেঁপে উঠে, চরম আতঙ্কে দৌড়ে পালাতে গিয়ে পড়ে যায়। তার মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে সে ভাঙ্গা গাছের আড়ালে বসে পড়ে। যুলকারনাইন এসে তাকে ধরে দাড় করায়। এই অবস্থায় মেয়েটিকে রেখে যাওয়া সমীচীন মনে করেনি যুলকারনাইন। সে মেয়েটিকে আশ্বস্ত করতে চায়। কিন্তু মেয়েটি তার পায়ে পড়ে মিনতি করতে থাকে–

আমি কুমারী। পরপুরুষের হাতে নিগৃহীত হওয়ার চেয়ে আমার মরে যাওয়া ভালো। দয়া করে তুমি আমাকে মেরে ফেলো।

যুলকারনাইন কিছুতেই তরুণীকে নিজের সাথে নিয়ে যেতে পারছিল না, বাধ্য হয়েই যুলকারনাইন তাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। তাও অসম্ভব হওয়ায় এক পর্যায়ে সে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিল। যুলকারনাইন তাকে বার বার অভয় দিতে দিতে বলছিল–

এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে যাওয়াটা হবে আমাদের জন্যে অন্যায়। বিশ্বাস করো, আমাদের হাতে তোমার কোন ধরনের নির্যাতিত হওয়ার আশংকা নেই। নারীর মর্যাদা রক্ষাকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেই। তোমার গায়ে কেউ হাত দেবে না। তোমার আতংকিত হওয়ার কোন কারণ নেই। তুমি নির্ভয়ে আমার সাথে এসো।

মেয়েটিকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে যুলকারনাইন তার উর্ধতন সেনা কমান্ডারের কাছে এলো। সময়টা ছিল খুবই জটিল। এ সময় কোন অসহায় মেয়েকে সেবা দেয়ার অবকাশ ছিল না। কমান্ডার যুলকারনাইনকে বললেন, একে তোমার কাছে রাখতে চাইলে রাখতে পারো, নয়তো কোন হিন্দুর কাছে রেখে আসতে পারো। তবে সতর্ক থাকবে এ যেনো তোমার কর্তব্য পালনে কোন ধরনের ত্রুটির কারণ না হয়।

অবশ্য সে দিন এই অসহায় হিন্দু তরুণী যুলকারনাইনের কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি সৃষ্টি করতে পারেনি। তার কর্তব্য কর্মে কোন বাধা হয়নি, তবে তার জীবনের বাঁধনে আটকা পড়ে এই তরুণী! হয়ে পড়ে জীবন সঙ্গিনী।

সেই রাতের বাকী সময়টা তরুণী যুলকারনাইনের তাঁবুতেই কাটায়। যেহেতু যুলকারনাইন ছিল কমান্ডার। এজন্য তার জন্য ছিল স্বতন্ত্র তাঁবু। সেই তাঁবুতে পড়ে মেয়েটি কাঁদতে থাকল এবং তাকে মেরে ফেলার জন্যে অনুরোধ করতে লাগল। যুলকারনাইন তাকে নানাভাবে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তরুণী কিছুতেই আশ্বস্তবোধ করছিল না। এক পর্যায়ে ক্লান্ত হয়ে মেয়েটির চোখ বন্ধ হয়ে এলো। ঘুমিয়ে পড়ল সে। ঘুম থেকে জেগে সে যখন যুলকারনাইনের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখতে পেল না তখন নিজের মধ্যেও কোন অস্বাভাবিকতা অনুভব করল না। তার মনে হলো মা বাবার সান্নিধ্যে যেভাবে ঘুমাতো সেভাবেই ঘুমিয়েছে সে।

এমন অবস্থা দেখে তরুণী যুলকারনাইনকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার? আমাকে কি তোমার মনে ধরেনি?

তোমাকে যদি ভালো না লাগতো, তাহলে আমার সাথে না রেখে তোমাকে অন্য কোন স্থানে রেখে আসতাম। বললো যুলকারনাইন। তুমি বলছিলে না, তুমি কুমারী। আমি বলছিলাম– হ্যাঁ, তুমি খুবই সুন্দরী। আমি তোমাকে একজন পবিত্র মেয়েই মনে করেছি এবং পবিত্র রাখারই মনস্থির করেছি। এখন মন থেকে সব ভয় ঝেড়ে ফেলে বলো– কোথায় যেতে চাও?

তরুণী কোন কথা না বলে দীর্ঘ সময় যুলকারনাইনের দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় তার দু'পা জড়িয়ে ধরে পায়ে মাথা ঠেকালো। যুলকারনাইন দ্রুত তার পা সরিয়ে নিয়ে বললো– আমাদের ধর্মে কোন মানুষকে অপর মানুষের সেজদা করার অনুমতি নেই। তুমি আমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে আমাকে গোনাহগার বানিও না। বলো, কোথায় যেতে চাও তুমি?

তরুণী একটি দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বললো, মেয়ে হয়ে জন্মালে মা বাবার ঘর ছেড়ে একদিন না একদিন কারো না কারো ঘরে যেতেই হয়। আমার মা বাবা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন তুমিই বলো, আমি কি করবো? কোথায় যাবো?

আমার সাথে থাকতে চাইলে তোমাকে তোমার ধর্মত্যাগ করতে হবে, বললো যুলকারনাইন। কিন্তু তোমর ধর্ম-ত্যাগ করলে অল্প দিনের মধ্যেই তুমি অনুভব করতে পারবে, ধর্মত্যাগ করে তুমি ভালই করেছো।

যুলকারনাইনের মুখে ধর্মত্যাগের কথা শুনে তরুণী চিন্তায় পড়ে গেল। যুলকারনাইন তরুণীকে বুঝতে দিতে চাচ্ছিল না, সে তরুণীর প্রেমে পড়ে গেছে। তরুণী ছিল খুব সুন্দরী, চলন বলনে মার্জিত। তরুণীর মুখের ভাষা ও কণ্ঠস্বর যে

কারো হৃদয় রাজ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করার মতো আকর্ষণীয়। যুলকারনাইন অনুভব করছিল, এই তরুণীকে তার বিয়ে করে ফেলা উচিত। নয়তো এই মেয়ে তার কর্তব্য কাজে বাধা হয়ে উঠতে পারে। এমনিতেও যুলকারনাইনের মনে প্রচণ্ড একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। সে কিছুতেই এই তরুণীকে হারাতে চাচ্ছিল না কিন্তু হিন্দু একটি মেয়েকে সাথে রাখা এবং তাকে বিয়ে করাও সম্ভব ছিল না।

আমি তোমর উপর কোন শর্ত চাপিয়ে দিচ্ছি না। তোমাকে অসহায় পেয়ে আমি তোমার মনের বিপরীতে কোন কিছু করতে বাধ্য করছি না। যদি চলে যেতে চাও, তবে বলো, কোথায় যেতে চাও?

আমাকে হরিকৃষ্ণের পায়ে বসিয়ে দাও, বাকী জীবন মন্দিরে দেবীর পূজা করে কাটিয়ে দেবো।

তরুণীর মুখে একথা শুনে যুলকারনাইনের রক্তে আগুন ধরে গেল। সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো– নিজেকে কেন ধোঁকা দিচ্ছো। এসব মন্দিরে কি হয় তা সবাই জানে। এসব রহস্য আর গোপন নেই যে, দেব-দেবীর নামে জীবন উৎসর্গকারিণী কুমারীদেরকে সব সময় মন্দিরের পুরোহিতরা রক্ষিতার মতো ব্যবহার করে। এই মন্দিরে গিয়ে তোমাকেও তো পুরোহিতদের রক্ষিতা হয়েই কাটাতে হবে। তোমাদের পাথরের গড়া দেবদেবী আসলে একটা ধোঁকা। কেন নিজে এই নোংরা জীবন বেছে নিতে চাচ্ছো। তোমার বয়স কম, জীবন জগত সম্পর্কে তোমার ধারণাও কম। এজন্যই তোমার প্রতি আমি এতটা দরদ দেখাচ্ছি। নয়তো তুমি তো আমার কাছে একজন বিধর্মী মেয়ে ছাড়া কিছুই নও। তোমার মতো একজন তরুণীই তো আর গোটা হিন্দুস্তান নয়। আমি এতো দূর থেকে শুধু তোমার মতো একটি তরুণীকে পাওয়ার জন্যে আসিনি। আমি এসেছি তোমাদের এই পূজনীয় মূর্তি ধ্বংস করতে। তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে দেখো, তোমাদের দেবদেবীদেরকে আমরা টুকরো টুকরো করে ফেলে রেখেছি। মানুষ এগুলোকে পায়ে পিষে আসা যাওয়া করছে।

যুলকারনাইনের কথা শুনে তরুণী গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। কারণ সে ধর্মীয় আবেগ তাড়িত হয়েই তো মা বাবার সাথে ভারতের এক কোণ থেকে মথুরায় পূজা দিতে এসেছিল। তখন তার মনে হিন্দুত্ববাদের আবেগ ছিল প্রবল। তাই ধর্ম ত্যাগের কথা শুনে সে চিন্তায় পড়ে গেলো।

যুলকারনাইন বললো, তুমি যেখানে যেতে চাও, সেখানেই তোমাকে পৌছে দেয়া হবে। কিন্তু কোন মন্দিরে তোমাকে থাকতে দেয়া হবে না।

ঝড়ের তাণ্ডব, যুদ্ধের বিভীষিকা, মা বাবা ভাইয়ের মৃত্যু আর অগণিত মৃতের লাশ দেখে তরুণী এতোটাই আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, যুলকারনাইনের তাঁবু থেকে বাইরে যাওয়ার সাহস সে পাচ্ছিল না। তা ছাড়া বিগত একরাতের নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কারণে যুলকারনাইনের প্রতি যে আস্থা জন্মেছে সেই আস্থা ও আশ্রয় সে হারাতে চাচ্ছিল না। মনের অজান্তেই তরুণীর কাছে যুলকারনাইনই হয়ে পড়ে ছিল আস্থা ভরসা ও নির্ভরতার মূর্তপ্রতীক।

এভাবে কেটে গেল তিন চার দিন। এ কয় দিনের মধ্যে তরুণী আর যুলকারনাইনের তাঁবু থেকে বের হলো না। কিন্তু নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কেও সে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারল না। এ দিকে যুলকারনাইনকে মথুরা ত্যাগ করে আরো সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। যুলকারনাইন যখন তরুণীকে একথা জানাল তখন তরুণী কোন কিছু চিন্তা না করেই বললো– তুমি যেখানে যাও, আমাকেও সেখানে নিয়ে চলো।

বিগত তিন চার দিনে তরুণী অনুভব করলো এবং প্রত্যক্ষ করলো, সুন্দর সুঠামদেহের অধিকারী আকর্ষণীয় এই যুবক বাস্তবে একটা পাথর হৃদয়ের মানুষ নয়তো ফেরেশতা। এ তিন চার দিনে একটি বারও তার দিকে হাত বাড়াবে দূরে থাক একটু স্পর্শও করেনি। তাই রওয়ানা হওয়ার আগে সে যুলকারনাইনকে বললো, আমার ব্যাপারে যা করতে হয় তুমি সেই ব্যবস্থা করো, আমি কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে যাবো না। প্রয়োজনে আমি ধর্ম ত্যাগ করতেও রাজি।

তরুণীর কণ্ঠে ধর্মত্যাগের আগ্রহ শুনে যুলকারনাইনের মনে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। সে দিনই এক ফাঁকে তরুণীকে সেনাবাহিনীর ইমামের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। ইমাম তাকে কলেমা পড়িয়ে ইসলামে দীক্ষা দিলেন এবং তার নতুন নাম দিলেন রাজিয়া।

তরুণীর নাম ছিল রত্মা। এবার সে রত্না থেকে রাজিয়া। রত্মার ইসলাম গ্রহণের ফলে সেনাপতি নিজেই উদ্যোগী হয়ে যুলকারনাইনের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিলেন। সেনাবাহিনীর সাথে থাকা আরো কয়েকজনের স্ত্রীরা এসে নতুন বধুকে বরণ করে নিল। রাজিয়াকে তাদের কাছে অর্পণ করে যুলকারনাইন তার কর্তব্য পালনে সেনাদলের সাথে অভিযানে চলে গেল।

অভিযান থেকে ফিরে এলে যুলকারনাইনকে রাজিয়া সম্পর্কে জানানো হলো, নওমুসলিম রাজিয়া তাকে ফেরেশতার মতোই পবিত্র মানুষ বলে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ইসলামের হুকুম আহকাম বিশেষ করে নামায পড়তে গিয়ে এই তরুণী কেমন জানি হাঁপিয়ে ওঠে এবং তার কাছে নামায কঠিন মনে হয়। অথবা এমনও

হতে পারে এই তরুণী অন্তর দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেনি। তার মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। নিজের জীবন বাঁচানোর তাকিদেই হয়তো সে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে।

মথুরা জয়ের পর এক বছর চলে গেছে। যুলকারনাইন এখন রাড়ীতে মহারাজা রাজ্যপালের উপদেষ্টা হিসেবে অবস্থান করছে। রাজ্যপাল বাহ্যত নামে রাজা থাকলেও তার সেই দাপট ও কর্তৃত্ব ছিল না। সে এখন আর একজন লড়াকু রাজা নয়, প্রকৃতই একজন পুতুল রাজা মাত্র। অঢেল বিত্তবৈভবের কারণে সে রাজার হালতেই চলতো বটে। কিন্তু আগের জাঁকজমক আর ছিল না।

অবশ্য নর্তকীর নাচ বাদকদের বাজনা ছাড়া মহারাজার দিন কাটতো না। ফলে রাজ্য হারা রাজা হলেও এসব আয়োজনের কোন ঘাটতি ছিল না রাজ্যপালের। রাড়ীতে রাজ্যপাল অল্প দিনের মধ্যেই একটি রাজ প্রাসাদ গড়ে তুলেন এবং রাজমহলের এসব গান বাজনায় গযনীর কমান্ডার ও উপদেষ্টাদেরও দাওয়াত দেন। কিন্তু গযনী সরকারের কোন কর্মকর্তা রাজার গান বাজনাও নৃত্যগীতে অংশগ্রহণ করেন না।

রাড়ীতে পূর্ব থেকেই একটি মন্দির ছিল। সেটিতে আগে জৌলুস না থাকলেও রাজধানী ঘোষণার পর মন্দিরটি জৌলুসপূর্ণ হয়ে ওঠে। দলে দলে পূজারীরা মন্দিরে পূজা দিতে ভীড় করে। হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জায়গা থেকে মন্দিরে এসে আস্তানা গেড়ে বসে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞ পুরোহিত।

সুলতান মাহমূদের নির্দেশে তার কর্মকর্তারা রাজ্যপাল ও হিন্দুদের পূজা অর্চনায় কোন প্রকার বিধি নিষেধ আরোপ করেনি। সুলতান নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, হিন্দুদের কাছে যেন ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয় এবং তাদের সামনে ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়।

গযনীর নিয়োজিত কর্মকর্তা ও সেনারা দাওয়াতী কাজ যথারীতি চালু করেছিল। ফলে দু'চারজন করে হিন্দু প্রতিদিনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল।

এ দিকে যুলকারনাইন তার স্ত্রী রাজিয়াকে বলেছিল, সে যেনো হিন্দু মহিলাদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে। সে যেনো হিন্দু মহিলাদের বলে ইসলাম কতটা সুন্দর। ইসলামের রীতি নীতি কতো মানবিক এবং মুসলমানদের আচার আচরণ ও চরিত্র কতো পবিত্র। সে যেনো হিন্দু মহিলাদের জানায়, ইসলামের অনুশাসন এমনই সুন্দর যে, তা মানুষকে পবিত্র করে তোলে।

রাজিয়া ইসলামের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীর গুণগ্রাহী ছিল। সে মুসলমান পুরুষদের উন্নত নৈতিকতা নিজের জীবনে অনুভব করেছিল। ফলে হিন্দু কোন মহিলা এলে সে তার জীবনের কাহিনীই বর্ণনা করতো।

এদিকে গযনীতে সুলতান মাহমূদ প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিলেন। তিনি তার প্রতিবেশী গযনী বিরোধী মুসলমান শক্তিগুলোকে রণাঙ্গনে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিলেন। অবশ্য শত ব্যস্ততার মধ্যেও তার একটি কান সব সময় হিন্দুদের দিকে উৎকর্ণ হয়ে থাকতো। কারণ হিন্দুস্তানের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তিনি মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলিম যোদ্ধাকে রেখে এসেছিলেন। যাদের চতুর্দিকে অবস্থান করছিল বিপুল শক্তির অধিকারী হিন্দু রাজা মহারাজারা। যারা এক ফুৎকারে গযনীর এই সৈন্যদেরকে উড়িয়ে দেয়ার জন্য রাত দিন চেষ্টা-সাধনা করছিল। মেতে উঠে ছিল গযনী বিরোধী নানা আয়োজনে। মথুরা ছিল হিন্দুদের হৃৎপিণ্ডের মতো। এই হৃৎপিণ্ডে ইসলামের খঞ্জর বিদ্ধ হয়েছিল। ফলে বুকের মধ্যে বিদ্ধ খঞ্জর নিয়ে হিন্দু রাজা মহারাজাদের নীরব নির্বিকার বসে থাকার উপায় ছিল না।

সুলতান মাহমূদ কয়েকটি কঠিন অভিযান পরিচালনার পর অনুভব করতে পেরেছিলেন, হিন্দুজাতি মুশরিক ও বহু দেবদেবীর পূজারী হলেও এরা ভীতু নয়, লড়াকু। সুলতান প্রত্যক্ষ করে ছিলেন হিন্দুরা অকাতরে তাদের জাতি ও ধর্মকে টিকিয়ে রাখার জন্যে জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তাদের প্রধান দুর্বলতা সেনাপতিদের অদূরদর্শিতা। তারা কৌশলের চেয়ে জনবল এবং আবেগের উপর বেশী নির্ভর করে। রণাঙ্গনে মাথার চেয়ে শক্তিকে বেশী ব্যবহার করে। নির্ভিক চিত্তে হামলে পড়া এবং প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ করাকেই তারা মনে করে লড়াই।

পক্ষান্তরে সুলতান মাহমূদ লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সব সময়ই শক্তির চেয়ে কৌশলকে বেশী গুরুত্ব দিতেন। তিনি দারুণ কার্যকর কৌশলে শক্তির ব্যবহার করতেন। ফলে তিনগুণ চারগুণ প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করেও তিনি অনায়াসে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারতেন। ইতিহাসবিদগণ এ কারণেই পৃথিবীর ক্ষণজন্মা সমরবিদদের অন্যতম স্থানটি সুলতান মাহমূদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন। সুলতান মাহমূদ তাই বিশ্ব ইতিহাসে একজন দূরদর্শী সমরনায়ক হিসেবে বিবেচিত।

সুলতান মাহমূদের যুদ্ধ কৌশল সব সময় প্রতিপক্ষকে ফাঁদে আটকে ফেলতো। তখন শত্রুপক্ষের সামনে দুটি পথই খোলা থাকতো। লড়াই করে জীবন দিতে হতো, নয়তো হাতিয়ার ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পনের পথ বেছে নিতে হতো।

ধর্মীয় ভাবাবেগের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরা কম ধর্ম অনুরাগী ছিলো না। বলা চলে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মের আবেগ ছিল

মুসলমানদের চেয়ে বেশী। মুসলমানরা অদৃশ্য আল্লাহর ফরমান বিশ্বাস করে লড়াই করতো। আর হিন্দুরা তাদের দৃশ্যমান দেবদেবীদের সম্মান রক্ষার জন্যে জীবন উৎসর্গ করতো।

হিন্দু ধর্ম যে ভ্রান্ত এমন ধারণা তারা কখনোই মনে স্থান দিতো না। তারা বংশপরস্পরায় মূর্তিপূজাকেই একমাত্র সঠিক ধর্ম বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতো। সেই সাথে শৈশব থেকে মনের মধ্যে গেঁথে নিতো রূপকথার মতো দেবদেবীদের নানা কাহিনী। বাস্তবতা ও যুক্তির বিচারে এগুলো প্রত্যাখ্যানযোগ্য হলেও হিন্দু মণী ঋষি ও পুরোহিতেরা যুগ যুগ ধরে সাধারণ হিন্দুদেরকে এসব উপখ্যানই ধর্মের আবরণে পেশ করে আসছিল। পরম শ্রদ্ধায় হিন্দুরা পুরোহিতদের সৃষ্ট এসব কাহিনীকেই ধর্ম পালনের অংশ ভেবে আসছিল।

হিন্দুরা কখনেই বুঝতে চাইতো না, তারা সত্য ধর্মের বিপরীতে মিথ্যার পক্ষ হয়ে লড়ছে। তাদেরকে কেউ বলতো না, সত্য মিথ্যার লড়াইয়ে সত্যের পক্ষেই থাকে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ।

সুলতান মাহমূদের অস্বাভাবিক সামরিক দূরদর্শিতা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর দেয়া বিশেষ এক দান ছিল। আল্লাহ্ তাআলা সুলতান মাহমূদকে এমন সামরিক দূরদর্শিতা, সাহস ও দৃঢ়তা দিয়েছিলেন যার সামনে কঠিন পাহাড়ও ধসে যেতো। সুলতান মাহমূদ বলতেন, সাপ শেষ পর্যন্ত মানুষের হাতেই মারা পড়ে কিন্তু মানুষকে সতর্ক থাকতে হয়, তার অসতর্কতায় সাপ না আবার তাকে দংশন করে বসে। তিনি হিন্দুদেরকে সাপ বিচ্ছুর সাথে তুলনা করতেন। কারণ, বিচ্ছুর মতোই হিন্দুরা সব সময় কিভাবে মুসলমানদের দংশন করবে এ চিন্তায় বিভোর থাকতো।

আমি হিন্দুদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না– সামরিক উপদেষ্টাদের বলছিলেন সুলতান মাহমূদ। কারণ হিন্দুদের সমূলে উপড়ে ফেলা আমার পক্ষে এখনো সম্ভব হয়নি। আমি হিন্দুদের আত্মসমর্পণের উপর নির্ভর করতে পারি না। সাপ-যদি গর্তেও চলে যায় কিংবা সাপকে যদি বাক্সেও ভরে ফেলা হয় তবে তার স্বভাব বদলে যায় না, তার বিষ নিঃশেষ হয়ে যায় না। সুযোগ পেলেই সে ছোবল মারতে পারে।

তিনি প্রায়ই বলতেন, আমাকে আল্লাহ হয়তো এতো বেশী বয়স দেবেন না, যাতে আমি মুহাম্মদ বিন কাসিমের আযাদকৃত যমীনকে পুনর্বার ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসবো। এটাও জানা নেই, আমার পরবর্তী গযনী শাসকরা এ দিকে মনোযোগ দেবে কি না। পরবর্তী শাসকরা যদি হিন্দুদের সাথে সখ্যতা গড়ে

তোলে তা হবে মুসলমানদের সাথে দুশমনী। যতো দিন পৃথিবীতে হিন্দু থাকবে তারা ইসলামকে ছোবল মারবেই এবং হিন্দুস্তানের যমীন মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হতেই থাকবে। হিন্দুস্তানের মজলুম মুসলমানদের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসবে না। যাদের এগিয়ে আসার কথা তাদেরকে হিন্দু শাসকরা মৈত্রী ও বন্ধুত্বের জালে আটকে রাখবে।

সুলতান মাহমূদ বলতেন, হিন্দু শাসকরা বহুগামী স্ত্রীর মতো, যে প্রকাশ্যে স্বামীর পা ধুইয়ে দেয় এবং দৃশ্যত সে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে নিজেকে জাহের করে, কিন্তু স্বামীর আড়াল হলেই সে আরো কয়েক জনের সাথে প্রেম করে। প্রকৃত পক্ষে সে স্বামী বেচারার জন্যে প্রেমের ফাঁদ এবং জীবন্ত প্রতারণা হয়ে সবসময় স্বামীর সাথে প্রতারণা করে। এমন স্ত্রী যে কোন সময় তার প্রেমিকদের মনোরঞ্জনের জন্য স্বামীকে হত্যা করতে দ্বিধা করে না।

সুলতাম মাহমূদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও মুর্শিদ শায়খ আবুল হাসান কিরখানী তাকে বলেছিলেন, মানবেতিহাসে দু'টি জাতি একই মাটি থেকে একই সাঁচে বানানো হয়েছে। এই দু'টি জাতি হলো ইহুদী ও হিন্দু। মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ এদের স্বভাবজাত এবং এদের ধর্মের অংশ। যে যুগে মুসলমানরা এই দুই জাতি সম্পর্কে অসতর্ক হবে কিংবা এই দুই জাতিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সেই যুগ হবে মুসলমানদের পতনের যুগ।

মুসলিম মিল্লাত তখন তাদের আত্মমর্যাদাবোধকে হারিয়ে ফেলবে, তাদের মান মর্যাদা ধ্বংস হয়ে যাবে। শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলিম শাসক গোষ্ঠী মুসলিম জনতাকে প্রজা ভাবতে শুরু করবে। তখনকার শাসক শ্রেণী নাগরিকদের মুখ বন্ধ করে দেবে। ইহুদী ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানরা কিছুই বলার সুযোগ পাবে না। কারণ তখনকার শাসক গোষ্ঠী ইহুদী ও হিন্দুদের মনোরঞ্জন করে ক্ষমতায় থাকতে চেষ্টা করবে। সেই যুগ হবে ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার যুগ। তখন আল্লাহর যমীন মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হতে থাকবে।

সুলতান মাহমূদ খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে তার শায়খের কথা শুনতেন। এ সব কথা শোনার সময় তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো। তাকে দেখে মনে হতো তিনি সেই সময়ের কথা ভেবে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। দুঃখ যন্ত্রণায় তার অন্তর কেঁপে উঠতো। একদিন আবুল হাসান কিরখানী বললেন, এমন একদিন আসবে, যখন তোমার এই রাজ্যে বিধর্মী শক্তি তাদের ইচ্ছামতো শাসন কাজ চালাবে। তোমার রাজ্যে মুনাফিকদের দৌরাত্ম চলবে। গযনী, কান্দাহার, গারদিজ তখন বিধর্মীদের পদপিষ্ট হবে। যাদের কোন দীন ধর্ম থাকবে না, তাদেরকেই একদল মুসলিম দীনের প্রহরী ভাবতে শুরু করবে।

সম্মানিত মুর্শিদ! কম্পিত কণ্ঠে একথা শুনে বললেন সুলতান, সে সময়ের অনাগত সেই জাতির দুর্ভাগ্য আজ আমি কি ভাবে রোধ করতে পারবো? আমাকে এজন্য কি ভূমিকা পালন করতে হবে?

আরে সুলতান! তুমি তো তখন হবে কবরের অধিবাসী। তোমার কবর তাদের কিছুই করতে পারবে না। তোমার আমার কবরের চার পাশেই ভবিষ্যতে রক্তের হুলি খেলার আয়োজন হবে। তখন আর আমাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হবে না। অতএব যা করার এখনই করতে হবে। অবশ্য তুমি তোমার কর্তব্য যথার্থই পালন করছো।

এই প্রেক্ষিতে আজ আমি তোমাকে কি কাজ করা ঠিক হবে না সে ব্যাপারটি বলতে চাচ্ছি। তুমি বার বার মোহময় মায়াবী হিন্দুস্তানে যাচ্ছো। হিন্দুস্তানে রয়েছে সোনা-দানা ও সহায়-সম্পদের চমক এবং হিন্দুস্তানের মেয়েরাও মারাত্মক চমক। এরা কোন প্রকার পর্দা করে না। শুধু মেয়ে নয়, হিন্দুস্তানের প্রাকৃতিক পরিবেশও মোহময়। তুমি, তোমার সেনাপতি ও কমান্ডাররা যদি এসব মোহ-মায়া থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারো, তাহলে তোমাদের পক্ষে সেই দুর্গ তৈরী করা সম্ভব হবে, যে দুর্গ প্রাচীরে মাথা ঠুকে মরবে হিন্দুরা।

সম্মানিত মুর্শিদ! অনেক সময় আমার সৈনিকরা হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করে ফেলে। অবশ্য যেসব মেয়ে বিয়ের আগেই স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষা নেয় তাদেরকেই গযনীর সেনারা বিয়ে করে। আমি কি এই ধারা চালু থাকতে দেবো, না বন্ধ করে দেবো?

শোন মাহমূদ! এই প্রেক্ষিত্রে তোমাকে একটি গল্প বলি– বললেন শায়খ কিরখানী! আমি যখন যুবক, তখন আমার আব্বার একজন বন্ধু প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসতেন। আব্বার এই বন্ধুটি ছিলেন খুবই দূরদর্শী সৎ ও ব্যবসায়ী। একবার তিনি কোন স্থান থেকে একটি চিতার বাচ্চা নিয়ে এলেন। আমি সেই চিতার বাচ্চাটি দেখেছি। লোকটি চিতার বাচ্চাটিকে খুবই আদর করতেন। মনে হতো তিনি একটি বিড়ালের বাচ্চাকে আদর করছেন। আব্বার সেই বন্ধু চিতার বাচ্চাকে তার কোলে বসিয়ে দুধ পান করাতেন এবং নিজের বিছানায় শোয়াতেন।

চিতার বাচ্চাটি যখন বড় হলো, তখন আব্বার ব্যবসায়ী বন্ধু সেটিকে পাখি ও হরিণের গোশত খাওয়াতেন। ব্যবসায়ী যে দিকে যেতেন, চিতার বাচ্চাও সেদিকেই যেতো। মুনীবের সাথে চিতার বাচ্চার খুবই ভালোবাসা জন্মে গিয়েছিল।

একদিন সেই ব্যবসায়ী আমার আব্বার সাথে দেখা করতে এলেন। তার একটি হাত কুনুই থেকে বাজু পর্যন্ত কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, হাতের গোশত চিতার বাচ্চা ছিড়ে খেয়েছে। একথা শুনে আমার আব্বা বললেন, আরে চিতার বাচ্চা না তোমাকে খুবই আপন ভাবতো, তুমি তাকে আদর করতে? ব্যবসায়ী বললো, আদর করেই সে কামড় দিয়েছে। আদর করে কামড়ে দিলেও দাঁত আমার হাঁতে বিধিয়ে ফেলে। ফলে খুব কষ্টে তার দাঁত ছাড়াতে হয়েছে। এতে তার শরীরের অর্ধেক রক্ত ঝরে গেছে।

লোকটি চলে যাওয়ার পর আব্বা আমার উদ্দেশে বললেন, কিছু বুঝলে হাসান?

হিংস্রদের আদরেও হিংস্রতা থাকে। চিতার বাচ্চা তার স্বভাবের কারণে মানুষের বন্ধু হতে অক্ষম, স্বভাবগত কারণে সে মানুষকে শত্রু ভাবতে বাধ্য। মাহমূদ! হিন্দু আর ইহুদীরা হলো সেই চিতার বাচ্চার মতোই হিংস্র। এদের ভালোবাসার মধ্যেও হিংস্রতা রয়েছে। স্বভাবগতভাবেই এরা মুসলমানদেরকে শত্রু ভাবতে বাধ্য। এ থেকে তুমিই সিদ্ধান্ত নাও, মুসলমানরা হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করবে কি না। পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন এই দুই জাতির নারী পুরুষ একে অন্যের শরীরের মধ্যে কোনরূপ বিরূপতা বা শত্রুতা অনুভব করবে না ঠিক, যতটুকু স্বাদ অনুভব করার কথা ততটুকুই করবে বৈ কি? কিন্তু তাতে রক্তের শত্রুতা ও বৈরীতার বিলুপ্তি ঘটবে না। এবং ব্যাপকভাবে আত্মিক মিলনও কখনো ঘটবে না। দৈহিক সম্পর্ক আদর্শিক বিরোধ নিঃশেষ করে না। সেটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। যা কেবল সঠিক সময়েই বুঝা যাবে।

সুলতান মাহমূদ হিন্দু মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি বটে, কিন্তু তিনি সেনাবাহিনীর ইমামদের বলেছিলেন, তারা যেন হিন্দু মেয়েদের ব্যাপারে সেনাদের সতর্ক রাখে। এই সতর্কতা অবলম্বনের পরও পরিস্থিতির কবলে পড়ে অনেক সৈনিকই হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছিল। এমনই এক পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়ে কমান্ডার যুলকারনাইনও রত্মা নামের মেয়েটিকে বিয়ে করেছিল। যে রত্মা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে রাজিয়া নাম ধারণ করেছিল এবং যুলকারনাইনকে তার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিল।

রাজিয়া ছিল একেবারে নিঃস্ব ও নিরূপায়। বাবা মা ভাইকে হারিয়ে আশ্রয় পাওয়ার মতো তার কেউ ছিল না। তার সামনে একমাত্র পথ ছিল মন্দিরে আশ্রয় নেয়া। কিন্তু মেয়েটিকে মন্দিরের অন্ধকার জীবনে ঠেলে দিতে চাচ্ছিল না

যুলকারনাইন। কারণ রত্মার রূপ সৌন্দর্য ও তার অসহায়ত্বের দিকটি যুলকারনাইনকে অনেকটা বাধ্য করে তুলেছিল মেয়েটির দায় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে এবং অন্ধকার জীবন থেকে মেয়েটিকে আলোর পথে নিয়ে আসতে। মেয়েটির অসহায়ত্ব এবং যুলকারনাইনের প্রতি আত্মনিবেদন সেনাবাহিনীর ইমাম ও সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকীকেও মেয়েটির প্রতি দয়াপরবশ করে তুলেছিল। ফলে তারা কেউ যুলকারনাইনের সাথে রাজিয়া ওরফে রত্মার বিয়েতে বাধা দেননি।

সময়ের ব্যবধানে রাজিয়ার বিয়ের সংবাদ সুলতান মাহমূদের কানেও পৌছাল কিন্তু যুলকারনাইনের কর্তব্য নিষ্ঠা এবং রাজিয়ার অসহায়ত্ব ও যুলকারনাইরে কাছে তার স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের কথা শুনে এ ব্যাপারে সুলতানও কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি।

একটা নিয়ম মতো রুটিন মাফিক হিন্দুস্তান থেকে বিভিন্ন সংবাদ নিয়ে গযনীতে দূত পাঠানো হতো। হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জায়গায় গযনী সুলতানের যেসব গোয়েন্দা অবস্থান করছিল তাদের সরবরাহকৃত খবরও সমন্বয় করে গযনী সুলতানের কাছে পাঠানো হতো।

গোয়েন্দাদের পাঠানো তথ্যমতে লাহোরের মহারাজা তরলোচনপাল তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে রাজধানী থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছিল। সে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী কোথাও অবস্থান না করে আরো উত্তরের দিকে কোন পাহাড়ী এলাকায় আত্মগোপন করেছিল। কেন সে রাজধানী থেকে সৈন্য সামন্ত নিয়ে আত্মগোপন করেছিল, তার উদ্দেশ্য ও অবস্থান সম্পর্কে গোয়েন্দারা সঠিক কোন তথ্য উদ্ধার করতে পারেনি।

রাজা তরলোচনপালের ইচ্ছা যাই থাকুক, তার কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছা পূরণের আয়োজন চলছিল কালাঞ্জরে। কালাঞ্জরের রাজা গোবিন্দের রাজ মহলে গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন এবং লাহোরের রাজা তরলোচনপাল মিলিত হলো। তাদের সাথে গোবিন্দ নামের এক অভিজাত হিন্দু এবং কালাঞ্জরের প্রধান পুরোহিতও উপস্থিত ছিল। তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল, মহারাজা রাজ্যপাল তাদেরকে ধোকা দিয়েছে এবং মৈত্রী চুক্তির আড়ালে সে সুলতান মাহমূদের বশ্যতা স্বীকার করে তার গোলামী করছে। তারা আলোচনা করছিল কিভাবে রাজ্যপালকে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়া যায়।

নানামুখী আলোচনা পর্যালোচনা যখন তুঙ্গে ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের কক্ষের বাইরে চুড়ির রিনিঝিনি আওয়াজ শোনা গেল। চুড়ির রিনিঝিনি আওয়াজ শুনে

সবাই উপরের দিকে তাকালেন। তারা ভাবলেন উপর তলায় হয়তো কোন নর্তকী কিংবা মহিলা নাচের ঘুঙুর পরে উঁকি দিয়েছে। কিন্তু চতুর্দিকে দৃষ্টি ঘুরে কক্ষের মধ্যে ঝুলন্ত রেশমী কাপড়ের পর্দায় তাদের দৃষ্টি আটকে গেল। ওই পাতলা পর্দার আড়ালে সাধারণত রাণী বা রাজকুমারীদের কেউ এসে বসতো। সবাই লক্ষ করলো অতি পাতলা পর্দার আড়ালে সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক নারী দাঁড়িয়ে। বিবস্ত্র নারীর অস্তিত্ব দেখে সবার দৃষ্টি অবনমিত হয়ে গেল।

এই নাও, গল্পে গল্পে আর মদের গ্লাসে আসর না মাতিয়ে তোমরা এই চুড়িগুলো পরে নাও! পর্দার ওপাশ থেকে তীর্যক শ্লেষাত্মক বাক্য উচ্চারিত হলো।

কী ব্যাপার? দৃষ্টি নীচের দিকে ফিরিয়ে নিয়েছো কেন? আমার দিকে তাকাও। আমি তোমাদের সম্ভ্রম, আমি ভারত মাতা, আমি ইন্দ্রাদেবী। দেখে নাও আমাকে, আমি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। তোমরা আমাকে এমন বিবস্ত্র করেছো। তোমরা নির্লজ্জ। এখন সব লজ্জার ভান করে দৃষ্টি নীচের দিকে নামিয়ে নিয়েছো কেন?

এই ইন্দ্রাদেবী ছিল মহারাজা গোবিন্দের স্ত্রী, বড় রাণী। রানীর এই অবস্থা দেখে মহারাজা গোবিন্দ রাগে ক্ষোভে অপমানে জ্বলে উঠলো। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গর্জন করে বললো– ভালো চাও তো এখান থেকে চলে যাও শকুন্তলা! শোনে রাখো, শিবাজী এবং হরেকৃষ্ণের অমর্যাদার প্রতিশোধ নিয়েই আমি তোমার কাছে আসবো। যে পর্যন্ত ভারত মাতার বুকে গযনীর একটি সৈন্যও অবশিষ্ট থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত আমি তোমার চেহারাও দেখবো না, তোমাকে স্পর্শও করবো না। ইন্দ্রাদেবীকে রাজা শকুন্তলা নামে ডাকতো।

রাখো তোমার এই শপথ! তাচ্ছিল্য মাখা কণ্ঠে বললো রাণী শকুন্তলা। রাজপুতদের রক্ত আর তোমাদের দেহে প্রবাহিত নেই। শরাবের নেশা রাজপুত রক্তকে পানি করে ফেলেছে। তোমরা যদি সত্যিকার আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন হতে, তাহলে সলাপরামর্শের নামে রাজমহলে বসে শরাবের নেশা করতে পারতে না। তোমরা কেন সেই ময়দানে যাচ্ছো না, যেখানে ভারত মাতার হাজারো সন্তান জীবন দিয়েছে? তোমরা সেই সব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের নীচে পড়ে কেন মৃত্যুবরণ করলে না মুসলমানরা যেসব মন্দির ধ্বংস করেছে?

রাণী! এখনো তুমি এখান থেকে যাচ্ছো না? আমাকে কি কোন ব্যবস্থা নিতে হবে? ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো রাজা গোবিন্দ।

রাজার একথা শুনে কালাঞ্জরের প্রধান পুরোহিত দাঁড়িয়ে গেল। সেই যুগে হিন্দু রাজা মহারাজারা রাজ্য শাসন করতো আর রাজাদের শাসন করতো পুরোহিতেরা। কোন কোন এলাকায় সরাসরি পুরোহিতদের শাসন চলতো। গোটা

হিন্দুস্তান জুড়ে ছিল পুরোহিতদের দাপট। রাজা মহারাজাদের যতো দাপটই থাক না কেন কোন না কোন ভাবে তারা পুরোহিতদের দ্বারা প্রভাবিত হতো। পুরোহিতদের অদৃশ্য শাসন চলতো সবখানে।

কালাঞ্জরের এই বৈঠকে পুরোহিত যখন রানী শকুন্তলাকে পর্দার ওপাশে সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখতে পেল তখন সে রাগে ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো এবং রাজাদের উদ্দেশ্যে বললো– আপনারা বলছেন, রানী এখান থেকে যাচ্ছো না কেন? আমি বলি রাণী এই অবস্থাতেই আমাদের সামনে আসছে না কেন? যাতে আমরা ভালো ভাবে বুঝতে পারি, বিবস্ত্র অর্ধার্মিক আত্মমর্যাদাহীন একটি জাতি কেমন হতে পারে?

সুলতান মাহমূদ ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য দখল করে নিয়েছে দু'বছর হয়ে গেলো। এই দু'বছর, তোমরা আসর বসিয়ে গল্প মারা ছাড়া আর কি করেছো? তাই তোমাদের অস্ত্র সস্ত্র তরবারী এই দেশের নারী ও পুরোহিতদের হাতে দিয়ে তোমরা চুড়ি পড়ে রাজপ্রাসাদে থাকো। নারী আর পুরোহিতরা গিয়ে লড়াই করুক। এখনো তোমাদের নর্তকী আর শরাব নিয়ে রাজমহলে আনন্দ ফূর্তিতে ভাটা পড়েনি। দেবতাদের নামে তোমরা বার বার কসম করেছো, এসব প্রতীজ্ঞা আর কসমও তোমরা রক্ষা করো নি।

এক পর্যায়ে রাণীকে ইঙ্গিত করে পুরোহিত বললো? চলে যাও রাণী! আমি মহারাজাদের কপালে ঘামের ফোটা দেখতে পাচ্ছি। আশা করি, লজ্জার এই ঘাম তাদের রক্তকে গরম করবে।

রাণী চলে গেল বটে, কিন্তু দরবার মহলে নেমে এলো নীরবতা। এই নীরবতার মধ্যেই জন্ম নিলো গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে মারাত্মক এক তুফান। অবস্থা এমন হলো যে, উপস্থিত তিন মহারাজার কেউ কারো প্রতি লজ্জা ও অপমানে তাকাতে পারছিল না।

কন্নৌজ দুর্গে গযনীর সৈন্য সংখ্যা এক হাজারও হবে না– বললো পুরোহিত। তোমরা হামলা করলে লড়াই ছাড়াই তাদেরকে পরাস্ত করতে পারো। তোমাদের বিপুল জনশক্তি দেখে ওরা লড়াই না করেই হাতিয়ার ফেলে দিতে বাধ্য হবে। কারণ, তাদের সাহায্য করার কেউ এখানে নেই। কে আসবে তাদের সাহায্য করতে?

তাদের এই এক হাজার সৈন্যকে হত্যা করলেও কিছু হবে না; গযনী থেকে মাহমূদ ঝড়ের বেগে চলে আসবে– বললো গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন। আর তখন মাহমূদ এসে এমন প্রতিশোধ নেবে যা হিন্দুস্তানের মানুষ কখনো ভুলতে

পারবে না। লড়াই করা এবং লড়াই করানো আপনার সাধ্যের ব্যাপার নয় পণ্ডিত মহারাজ! বললো মহারাজা গোবিন্দ। এ ব্যাপারে আপনার চিন্তার চেয়ে আমাদের চিন্তা আরো গভীর। আমাদের সাময়িক কোন বিজয়ের ব্যবস্থা করলেই চলবে না, চিরদিনের জন্যে মাহমূদের শক্তিকে নিঃশেষ করে দিতে হবে।

আমাদেরকে ভাবতে হবে সবাই মিলে কিভাবে গযনী দখল করা যায়। আমাদের এই প্লাবনের উৎস বন্ধ করতে হবে নয়তো কিছুদিন তা থেমে থাকার পর আবার এই প্লাবন আমাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

আপনাদের পক্ষে গযনী দখল করা সম্ভব নয় মহারাজ! বললো পুরোহিত। লাহোরের মহারাজা তরলোচনপাল এখানে আছেন, তারা দাদা মহারাজা জয়পাল গযনীর উপর কতোবার আক্রমণ করেছেন, কিন্তু তার পরিণতি কি হয়েছে আপনারা সবাই জানেন। এই প্রেক্ষিতে আমি তরলোচনপালকে জিজ্ঞেস করতে চাই, গযনী বাহিনী মথুরাকে এভাবে লন্ডভন্ড করে জনমানবহীন করে ফেলল, বুলন্দশহর মুনাজকে ধ্বংস করে দিল, এখন কন্নৌজকেও ধ্বংস করে দিয়েছে, লাহোরের মহারাজা এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন? তিনি কোথায় জানি তার সৈন্যদেরকে লুকিয়ে রাখলেন আর অন্যদেরকে লড়াই করতে উস্কানি দিয়ে গেলেন।

এ ক্ষেত্রে আমি ভিন্ন কোন চাল দিতে চাচ্ছিলাম, সেটি করার সুযোগ আমার হয়নি– বললো মহারাজা তরলোচনপাল। আমি গযনী বাহিনীর উপর পেছন থেকে আক্রমণ করতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু কোন জায়গাতেই দীর্ঘ সময় মোকাবেলা করতে পারেনি আমাদের কোন সহযোগী বাহিনী। মাহমূদ বলতে গেলে প্রতিদিনই আমাদের একেকটি দুর্গ জয় করে নিয়েছে। কন্নৌজে তো কোন মোকাবেলাই হয়নি। রাজা রাজ্যপাল আগেই রাজধানী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আমিতো শত্রুবাহিনীর পিঠ দেখারই সুযোগ পাইনি।

তরলোচনপাল! বললো মহারাজা গোবিন্দ। আপনার এই চাল আমার মোটেও পছন্দ হয়নি। আপনি যদি আপনার সৈন্যদের গযনী বাহিনীর আগমন পথে নিয়ে আসতেন, তাহলে আর এরা এতো সহজে অগ্রসর হতে পারতো না। তখন পরিস্থিতি ভিন্নতর হতো।

মহারাজা তরলোচনপালের চাল আমি বুঝতে পেরেছি– বললো পুরোহিত। তিনি তার বাহিনীকে লাহোর থেকে এজন্য বাইরে নিয়ে গিছেন, যাতে তার যোদ্ধারা লাহোরের বাইরে থাকে, আর তিনি অন্যদেরকে যুদ্ধে নামাতে পারেন।

পুরোহিতের কথা শুনে তরলোচনপাল ক্ষোভে অপমানে চিৎকার করে বললো− এসব কথা বলে আমাকে অপমান করা হচ্ছে; এমন অপমান বরদাশত করা হবে না।

তরলোচনপালের ক্ষোভ ও প্রতিবাদের মুখে পুরোহিত বললো, ঠিক আছে মহারাজ! আমি শুধু বিষয়টির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্যে কথাটি বলেছিলাম। আপনাকে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এতে যদি লাহোরের মহারাজা অপমানবোধ করে থাকেন তবে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

কিন্তু লাহোরের সেনাবাহিনীকে আপনি খুব শীঘ্রই সম্মুখ সমরে নিয়ে আসবেন এবং শত্রুর মুখোমুখি সেনা সমাবেশ ঘটিয়ে ঘোষণা করবেন, আপনি গযনীর বশ্যতা স্বীকার করেন না এবং গযনীর সাথে আপনার পূর্ব পুরুষের কৃত মৈত্রীচুক্তি আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন।

প্রথমে তিন মহারাজার এই সম্মিলন ছিল একটি ঘরোয়া বৈঠকের মতো। বৈঠকী মেজাজেই কথাবার্তা হচ্ছিল। কিন্তু রাণী শকুন্তলার বিবস্ত্র হয়ে মহারাজাদের উত্তেজিত ও অপমানিত করার পর মহারাজাদের এই বৈঠক হট্টগোলের রূপ ধারণ করে। আর পুরোহিতের উস্কানির পর সবাই এক সাথে উত্তেজিত কথা বলার কারণে রীতিমতো হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। বৈঠকের শুরু থেকেই সেখানে উপস্থিত গোবিন্দ নামের এক বুদ্ধিজীবী সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললো−

আপনারা শান্ত হোন। আপনাদের মতো মহারাজাদের পক্ষে সুলতান মাহমূদকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। আপনারা মাহমূদের কিছুই করতে পারলেন না।

সবাই শুনুন! আমি যা জানি আপনারা কেউ তা জানেন না। আপনারাই তো আমার বিদ্যা বুদ্ধির প্রশংসা করেন। আপনারা জেনে অবাক হবেন, কন্নৌজের বর্তমান গভর্নর আব্দুল কাদের সেলজুকীর সাথে আমার যে পরিমাণ হৃদ্যতা আছে এমন হৃদ্যতা তার সেনাবাহিনীর কারো সঙ্গেও তার নেই। সে আমাকে তার বিশ্বস্ত গোয়েন্দা মনে করে, অথচ তার বুকের ভেতর থেকে কথা বের করে আজ আমি আপনাদের সামনে রাখছি। আমিই বর্তমানে কন্নৌজে আপনাদের চোখ আপনাদের কান। আমি যে কথাগুলো বলছি, আপনারা পারস্পরিক মতভেদ ভুলে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

গোবিন্দের মুখে একথা শুনে সবাই কথাবলা বন্ধ করে তার দিকে মনোযোগী হলো। আসলেই উপস্থিত মহারাজাদের সবাই গোবিন্দের যোগ্যতার

প্রশংসা করতো। তার দূরদর্শিতা বিশেষ করে একজন হিন্দু হয়েও গযনীর গভর্ণরের কাছে নিজেকে বিশ্বস্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারার ব্যাপারটি ছিল সেই সময়কার ইতিহাসে বিরল ঘটনা।

গোবিন্দ এই তিন মহারাজার কাছে সঠিক সময়ে সঠিক সংবাদটি পৌছে দিতো, ফলে সবাই তাকে আপনজন এবং নিজের পক্ষের গোয়েন্দা বলেই বিশ্বাস করতো।

অপর দিকে গোবিন্দ গযনীর গভর্ণর আব্দুল কাদের সেলজুকীরও আস্থা ভাজন ছিল। সেলজুকী তাকে অতি বিশ্বস্ত বন্ধু মনে করতো। সেলজুকীর দরবারে গোবিন্দের অবাধ যাতায়াত ছিল। অথচ গোবিন্দ ছিল একজন গোড়া হিন্দু। আব্দুল কাদির সেলজুকীকে গোবিন্দ বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল, আমি মুসলমান হয়ে গেলে হিন্দুরা আমার সাথে মনের কথা দূরে থাক কাছে ধারেও বসতে দেবে না।

বাস্তবে গোবিন্দ ছিল ডাবল এজেন্ট। সে উভয় দিকের খবরাখবর উভয় দলের কাছেই সরবরাহ করতো। অবশ্য খবর সরবরাহের ব্যাপারে সে নিজে আগে যাচাই বাছাই করতো, কতটুকু তথ্য কোন দলকে দেয়া যাবে, কি পরিমাণ বললে উভয় দলের কাছে খবরটি বিশ্বাসযোগ্য হবে। এই বিষয়টি নির্বাচন করার ব্যাপারটি ছিল খুবই কূটিলতা ও চতুরতার ব্যাপার। এ কাজে গোবিন্দ শতভাগ উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল। প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দ হিন্দু-মুসলমান কারো পক্ষেই কাজ করছিল না, সে অর্থের লোভে দ্বিমুখী চরিত্র ধারণ করে দু'হাতে কাড়ি কাড়ি পয়সা কামাতে ব্যস্ত ছিল। হিন্দু মুসলিম কেউ গোবিন্দের এই দ্বিমুখী চেহারা আবিষ্কার করতে পারেনি। তাই নির্বিঘ্নে গোবিন্দ তার চাতুর্যপূর্ণ কৌশল কাজে লাগিয়ে হিন্দু মুসলিম উভয় শাসকদের আস্থাভাজন রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলো।

এবার সে মহারাজাদের বৈঠকে তাদেরকে বলল, আপনাদেরকে প্রথমেই এই পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে যে, কন্নৌজে মাত্র এক হাজার গযনী সৈন্য রয়েছে বিধায় সেখানে আক্রমণ করা উচিত। আমি বলছি, আপনাদেরকে এই পরিকল্পপনা সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। আপনাদের মনে রাখতে হবে, রাজ্যপালের বর্তমান রাজধানী রাড়ীকে গযনীর সেনারা ক্যাম্প বানিয়ে ফেলেছে। রাড়ীতে এখন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে।

কন্নৌজ থেকে যেসব হিন্দু পরিবার পালিয়ে গিয়েছিল, তারা এখন রাড়ীতে এসে বসতি স্থাপন করেছে। রাজ্যপালের যে সব সৈন্য রাড়ীতে রয়েছে তাদেরকে গযনীর সেনা কমান্ডাররা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। গযনীর সেনাদের আচার ব্যবহার

এতোটাই সন্তোষজনক যে, এ পর্যন্ত শ'খানেক হিন্দু সৈনিক ইসলাম গ্রহণ করেছে। হিন্দুদের অনেক কুমারী মেয়েও ইসলাম গ্রহণ করেছে।

রাজা রাজ্যপালের পুত্র লক্ষণপালও রাড়ীতেই অবস্থান করছে। লক্ষণপাল খুবই পেরেশান। সে মনে মনে মুসলমানদের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ। কিন্তু তার বাবা মুসলমানদের অধীনতা মেনে নেয়ার কারণে তার পক্ষে বাবার বিরুদ্ধে গিয়ে কোন কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। সে আমাকে একথাও বলেছে, সুযোগ পেলে সে তার বাবাকে হত্যা করে হলেও মুসলিম অধীনতা থেকে মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু সে ভয় পায় গযনী বাহিনীর প্রতিশোধকে। কারণ রাজা গযনী বাহিনীর মিত্র। কোন অবস্থাতেই রাজা গযনী শাসকদের বিরুদ্ধে যেতে চায় না। রাজার কথা হলো, সম্মুখ সমরে কোন হিন্দুর পক্ষেই গযনী বাহিনীকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। চক্রান্ত করেও গযনী বাহিনীকে পরাস্ত করা অসম্ভব। তাদের অধীনতা মেনে নিয়ে আমি যে কোন সময়ের তুলনায় ভালো আছি। অকারণে তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে কোন বিপর্যয় ডেকে আনা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

আমি বর্তমানে ভেতরের অবস্থা যতটুকু জানি; তাতে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, রাজ্যপালকে অতি গোপনে হত্যা করতে পারলে হয়তো রাড়ীতে গযনী বিরোধী একটা পরিবেশ তৈরী করা যাবে। তবে এই হত্যা কাণ্ড এমন সংগোপনে ঘটাতে হবে যাতে গযনী বাহিনীর কোন সন্দেহ করার অবকাশ না থাকে যে, এই কাণ্ড চক্রান্তমূলকভাবে কোন হিন্দুর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

গোবিন্দের একথা শুনে মহারাজা গোবিন্দ তার উরুতে থাপ্পর মেরে বললেন, এতক্ষণে তুমি আসল কথাটি বলেছো, আমি একথাটিই ভাবছিলাম। রাজ্যাপালকে যদি হত্যা করা যায় কিংবা সে মারা যায় তাহলে আমরা তার ছেলে লক্ষণপালকে আমাদের সাথে মেলাতে পারবো। সে গযনী বাহিনীর অধীনে থেকেও আমাদের পক্ষে গযনীর বিরুদ্ধে কাজ করতে পারবে। আমরা যখন সম্মিলিত বাহিনী গঠন করবো, তখন সে তার সৈন্যদের নিয়ে রাড়ীতে অবস্থানরত গযনীর গুটিকয়েক কমাণ্ডারকে বন্ধি করে ঘোষণা দিয়ে দেবে, আমি এখন থেকে গযনীর সাথে কৃত মৈত্রী চুক্তি অস্বীকার করলাম। এরপর যদি সুলতান মাহমূদ সেনাভিযান চালায়, আমরা তখন দুর্গ-বন্দি না হয়ে উন্মুক্ত ময়দানে তার সঙ্গে মোকাবেলা করবো।

এ ব্যাপারে আলোচনা পর্যালোচনার পর সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হলো, লক্ষণপালকে হিন্দুদের পক্ষে কাজ করার সুযোগ দেয়ার জন্য রাজা রাজ্যপালকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু কোন রাজা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারলো না, কে রাজ্যপালকে হত্যা করবে এবং কিভাবে করবে?

গোবিন্দ জানালো, রাজ্যপাল কার্যত মুসলমানদের হাতে বন্দি। তার নিরাপত্তা বাহিনীতে সব সময় তিন চারজন গযনী সেনা অবস্থান করে। কাজেই রাজ্যপালকে প্রকাশ্যে হত্যা করে ফিরে আসা সহজ ব্যাপার নয়।

একজন বললো, রাজ্যপালের কোন নর্তকীকে হাত করে তার মাধ্যমে খাবারে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করতে হবে। আরেকজন এটা প্রত্যাখ্যান করে বললো, এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। কোন পেশাদার নর্তকী একাজ করতে মোটেও রাজি হবে না।

এ ব্যাপারে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে– বললো পুরোহিত। আমাকে কালাঞ্জর রাজ্যের দূত হিসেবে মহারাজা রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হোক। আমার সাথে আরো কিছু লোক দেবেন। আমি রাড়ীর বাইরে তাঁবু ফেলে রাজ্যপালকে খবর দিবো যে, কালাঞ্জরের পক্ষ থেকে মহারাজার কাছে দূত এসেছে। দূত তার তাঁবুতেই মহারাজার সাথে মিলিত হতে চান। আমার তাঁবুতে যদি রাজ্যপাল আসে, তাহলে আমি কোন পানীয় বা খাবারে মিশিয়ে তাকে এমন বিষ খাইয়ে দেবো, যা খুব ধীরে ধীরে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে, কেউ কিছুই টের পাবে না।

কয়েক দিন পরই রাজা দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে যাবে। দশ/পনেরো দিনের মধ্যে পেটের পীড়ায় ভুগে সে মারা যাবে। কোন ডাক্তার বদ্যি কাজে আসবে না। বিষ প্রয়োগের বিষয়টি কেউ মাথায়ও আনবে না।

তবে বিষ প্রয়োগের আগে আমি তাকে সম্মত করাতে চেষ্টা করবো, দৃশ্যত তিনি যেন গযনী বাহিনীর মিত্র হয়েই থাকেন এবং সময় সুযোগ মতো বিদ্রোহ করেন। আমি তার মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করবো, আসলে সে আমাদের ধোঁকা দেবে না, গযনী সরকারকে ধোঁকা দেবে। পরিস্থিতি বুঝে আমি সিদ্ধান্ত নেবো, তার বেঁচে থাকা দরকার না মৃত্যু দরকার।

আপনার এই পরিকল্পনায় কোন কাজ হবে না। কারণ, গযনীর কমান্ডাররা তাকে রাড়ীর সীমানার বাইরে যেতে দেবে না– বললো গোবিন্দ। আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন। কিন্তু আমি যতটুকু জানি, আমি গভর্ণর আব্দুল কাদেরের ব্যক্তিগত বন্ধু ও অতি আস্থাভাজন লোক। আমাকেও রাজার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হয় না।

অবশ্য আমার কাছে একটা ফর্মূলা আছে। মহারাজা রাজ্যপাল খুবই নারী পাগল। তার সবসময় নতুন নুতন সুন্দরী মেয়ে না হলে চলে না। আপনি যদি দু'তিনটি সুন্দরী মেয়েকে সাথে নিয়ে যেতে পারেন। আর কোনভাবে রাজার

কানে খবরটি পৌঁছে দিতে পারেন যে, রাজার জন্য অতি সুন্দরী মেয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। তাহলে সে গযনীর শাসকদের অনুরোধ করে, বলে কয়ে আপনার কাছে চলে আসতে পারে।

তোমরা এ ব্যাপারে যে পদ্ধতিই অবলম্বন করোনা কেন, যে কেউ হোক কাজটি যে করে দিতে পারবে এবং প্রমাণ করতে পারবে যে, সে রাজ্যপালকে হত্যা করেছে, আমি তাকে জায়গীর ও সোনাদানা দিয়ে ভরে দেবো। তাকে এমন সুন্দরী মেয়ে জীবনের জন্যে দিয়ে দেবো, যা কোন দিন সে কল্পনাও করতে পারবে না– বললো গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন।

রাজা অর্জুন গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন, গোবিন্দ! তুমি ইচ্ছা করলে এ কাজটি করতে পারো। যেহেতু তুমি ওখানে সবার কাছে বিশ্বস্ত, তাই রাজাকে খুন করার কোন না কোন একটি পন্থা তুমি বের করে নিতে পারবে।

পণ্ডিত মশাইও যেতে পারেন। সবাইকে জানিয়েই বলছি, দু'জনের মধ্যে যেই সফল হবে, সেই হবে আমার রাজ্যের সবচেয়ে বড় জায়গীরের মালিক। ভারতের সবচেয়ে সুন্দরী রক্ষিতা থাকবে তার ঘরে। রাজ্যাপালের মৃত্যুর পর আমরা আবার সবাই বসে সিদ্ধান্ত নেবো, আমাদেরকে কি করতে হবে। আপাদত এই কাজটিই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা হোক।

গোবিন্দের এই ফর্মূলা সবার পছন্দ হলো এবং সবাই এক বাক্যে গোবিন্দকেই রাজ্যপালকে খুন করার দায়িত্ব দিল। সেই সাথে রাজা অর্জুনের মতো অন্যেরাও একাজে সফল হলে তাকে মোটা অংকের পুরস্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিল।

তিন মহারাজার এই চক্রান্তমূলক বৈঠকের কয়েক দিন পর দ্বিমুখী গোবিন্দ কন্নৌজে গভর্নর আব্দুল কাদের সেলজুকীর সামনে বসা ছিল। গোবিন্দ গভর্ণর সেলজুকীকে বলছিল, তিন রাজার বৈঠকে কি কি সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই সাথে বললো, মহারাজা রাজ্যপালের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরো সুসংহত করা দরকার।

লাহোরের মহারাজা তরলোচনপালের সৈন্যরা কোথায় অবস্থান করছে? গোবিন্দের কাছে জানতে চাইলেন গভর্ণর সেলজুকী। যতটুকু মনে হয় এখান থেকে খুব দূরে নয়, তবে ঠিক কোথায় তারা অবস্থান করছে তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, বললো গোবিন্দ। এমনও হতে পারে তরলোচনপালের সৈন্যরা এখান থেকে লাহোর ফিরে গেছে। অবশ্য এখন তরলোচনপালই সব চেয়ে বেশি ভয়ংকর লোক।

এরপরও আমি আপনাকে বলতে চাই, সব রাজা মহারাজা এখন রাজ্যপালের প্রাণের শত্রু। তারা সবাই রাজ্যপালকে হত্যার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে। যে কোন দিন রাজ্যপাল কোন আততায়ীর হাতে নিহত হতে পারেন। কারণ, আপনাদের কোন লোকই তার সব নিরাপত্তারক্ষী, দরবারী আমলা এবং রাজমহলের বাসিন্দাদের চেনে না। কিন্তু আমি সবাইকে চিনি। কাজেই আমাকে রাজমহলের ধারে কাছে কোথাও থাকতে দিন; যাতে আমি ওখানকার পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে পারি।

মনে রাখতে হবে, রাজ্যপালের ছেলে লক্ষণপালও তার বাবার ঘোরতর শত্রু। তাকেও রাজার কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে এবং লক্ষণের উপর কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে।

গোবিন্দ ছিল স্বার্থপর। শিক্ষিত চতুর। অর্থলোভী গোবিন্দের কাছে জাতি ধর্মের চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থটাই ছিল বড়। এ জন্য তার কাছে জাতিধর্ম সবই ছিল সমান। শাসক হিন্দু না মুসলমান এটা তার কাছে মুখ্য ব্যাপার ছিল না। সে ছলচাতুরী করে যে কোন শাসককেই পক্ষে নিয়ে আসতে পারতো। কন্নৌজ গযনী বাহিনী দখল করে নেয়ার পর কোন হিন্দুর পক্ষে ওখানকার গভর্ণরের কাছাকাছি যাওয়ার সাহস হয়নি। কিন্তু নিজেকে একজন আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষ ও শাসকদের জন্যে হিতাকাংখী সেজে মুসলিম গভর্নর আব্দুল কাদের সেলজুকীর কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গোবিন্দের কোনই বেগ পেতে হয়নি।

তিন রাজ্যের মহারাজাদের বৈঠকে গোয়ালিয়রের মহারাজা যখন গোবিন্দের প্রশংসা করে বললেন, গোবিন্দ! তোমার পক্ষেই কেবল বাড়ীতে গিয়ে রাজা রাজ্যপালকে খুন করানো সম্ভব। তুমিই পারবে সাফল্যের সাথে এ কাজ করতে। যদি তা করতে পারো, তবে আমার রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় জায়গীরের অধিকারী হবে তুমি। বাকী জীবন রাজার হালতে কাটিয়ে দেবে। সেই সাথে দেশের সেরা সুন্দরী মেয়েটিকে তোমার রক্ষিতা বানিয়ে দেয়া হবে।

বিশাল এই ভূসম্পত্তির প্রতিশ্রুতি ছিল গোবিন্দের জন্য লোভনীয়। ছোট খাটো একটি এলাকার অধিকারী হওয়া কম কথা নয়। মোটামুটি রাজা না হলেও পরগনার শাসক। লোকেরা এমন জায়গীরদারকেও রাজার মতোই সম্মান করে। কর দেয়, খাজনা দেয়। জায়গীরদারের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী থাকে। যখন যাকে ইচ্ছা তাকে ভোগ করতে পারে।

গোবিন্দ একজন অর্থ পিশাচ ও চতুর লোক। এই অঞ্চলের সব রাজ্য শাসকই তার ভক্ত। সবাই গোবিন্দের বুদ্ধি ও মেধার প্রশংসা করে। কিন্তু তাই বলে কেউ তো আর তাকে রাজার মতো কুর্ণিশ করে না। অথচ এসব রাজা মহারাজা কেউ তার মতো এতো প্রখর মেধার অধিকারী নয়। গোবিন্দের মতো লোকেরই রাজা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভারতের বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের ধারা অনুযায়ি এটা অসম্ভব। সাধারণ মানুষ মনে করে রাজ্য শাসন সবার পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে কোন বংশের লোকেরা রাজ্য শাসন করবে।

জায়গীর পাওয়ার লোভ সামলাতে পারলো না গোবিন্দ। সে সুযোগ খুঁজতে লাগলো কি ভাবে রাজ্যপালকে খুন করবে। গভর্ণর সেলজুকীর কাছ থেকে সে অনুমতি আদায় করে নিল। গোবিন্দ রাজার সাথে সাক্ষাত করতে না পারলেও রাজমহলের আশেপাশের এলাকায় বিনা বাধায় ঘোরাফেরা করতে পারবে।

এদিকে গভর্নর আব্দুল কাদের সেলজুকীর জন্যে গোবিন্দের দেয়া তথ্যগুলো ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি গোবিন্দকে বহু মূল্যের পুরস্কার দিয়ে বললেন, তুমি রাড়ী চলে যাও এবং রাজমহলের আশেপাশে থেকে সন্দেহজনক লোকদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখো। সেই সাথে কমান্ডার যুলকারনাইনের কাছে গভর্নর সেলজুকী বার্তা পাঠালেন, কোন ভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি যদি রাজার সাথে সাক্ষাত করতে আসে তবে তাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেবে না।

এর কয়েকদিন পর কালাঞ্জরের পুরোহিত কালাঞ্জরের রাজা গোবিন্দের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাতের জন্যে রাড়ীতে পৌঁছাল। রাড়ীর শহরতলীতে তাঁবু ফেলে কালাঞ্জর রাজার প্রতিনিধি রাজ্যপালের কাছে খবর পাঠালো, মহারাজা গোবিন্দের প্রতিনিধি আপনার সাথে রাজমহলের বাইরে তাঁবুতেই সাক্ষাত প্রত্যাশা করে।

কমান্ডার যুলকারনাইন সংবাদবাহী পুরোহিতকে রাজার কাছে পৌঁছতেই দিল না। পুরোহিত যখন হতাশ হয়ে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলো, তখন গোবিন্দ তার কাছে পৌছাল। গোবিন্দ পুরোহিতকে জানাল, বাস্তবে রাজা রাজ্যপাল এখন মুসলমানদের হাতে বন্দি। বর্তমানে তার উপর বিধি নিষেধের মাত্রা আরো বেড়ে গেছে । হতাশ হয়ে পুরোহিত গোবিন্দকে অনুরোধ করলো, আমি তো ব্যর্থ হলাম। আপনি রাজ্যপালকে হত্যার সমুদয় ব্যবস্থা করুন।

গোবিন্দ মহারাজাদের থেকেও সুবিধা নিতো। গোবিন্দ তার প্রতি রাজাদের আস্থার মাত্রা আরো বাড়ানোর জন্য পুরোহিতকে বললো, আপনি রাজ্যপালের

ছেলে লক্ষণপালকে আপনার সাথে নিয়ে যান। নয়তো রাজা নিহত হলে গযনী বাহিনী লক্ষণপালকে কয়েদ করতে পারে। গোবিন্দ পুরোহিকে জানালো, লক্ষণ একটি যুবক ছেলে। যৌবনের উষ্ণতায় সম্প্রতি সে এমন কিছু কাজ করেছে যে, গযনী বাহিনী তার প্রতি সন্দেহ পোষণ করছে। গযনীর শাসকরা ভাবছে, তারা লক্ষণের চলাফেরার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করবে, অথবা লক্ষণকে নজরবন্দি করে রাখবে।

পুরোহিতকে একথা বলে গোবিন্দ সোজা লক্ষণ পালের কাছে চলে গেল। লক্ষণকেও সে একই কথা শোনাল যা পুরোহিতকে বলেছিল। একথা শুনে গোপনে লক্ষণপাল পুরোহিতের সাথে চলে গেল এবং যাবার সময় গোবিন্দকে বলে গেল, সে যেন তার বাবাকে হত্যার ব্যবস্থা করে। লক্ষণ নিজেও গোবিন্দকে লোভনীয় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিল। লক্ষণের মুখে পুরস্কারের ঘোষণা শুনে গোবিন্দ রাজ্যপালকে হত্যার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলো।

গোবিন্দ গভর্ণর আব্দুল কাদের সেলজুকীকে যে তথ্য দিয়েছিল এসব তথ্য লিখে তিনি দ্রুত একজন সংবাদবাহককে গযনী সুলতানের কাছে প্রেরণ করলেন। সেলজুকী পয়গামে লিখলেন, এখানকার মহারাজাদের উপর আস্থা রাখা যায় না। কাজেই এখানকার কোন উদ্ভুত পরিস্থিতি কিংবা হামলা বা অবরোধ ঠেকাতে একটি অশ্বরোহী ইউনিটকে জলদি পাঠিয়ে দিন। বড় কোন আঘাত হলে যাতে আপনাদের আসা পর্যন্ত শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখা যায়।

একের পর এক ফন্দি এঁটে গোবিন্দ মহারাজা রাজ্যপালের রাজমহলে যাতায়াতের অনুমতি পেয়ে গিয়েছিল। এবার সে রাজ্যপালকে কিভাবে হত্যা করা যায় এ ফন্দি আঁটতে লাগল। হিন্দু হওয়ার সুবাদে হিন্দুদের সাথে সে মেলামেশা বাড়িয়ে দিল। স্থানীয় গোঁড়া হিন্দুদের সাথে সম্পর্ক মজবুত করার জন্যে গোবিন্দ মন্দিরে যাতায়াত বাড়িয়ে দিল। মন্দিরের পুরোহিতদের সাথেও সে গড়ে তুললো গভীর সম্পর্ক। মন্দিরের গোপণ প্রকোষ্ঠে বসে সে পুরোহিতদের সাথে রাজা রাজ্যপাল ও সুলতান মাহমূদ সম্পর্কেও খোলামেলা আলাপ আলোচনা করতো। মন্দিরে গিয়ে গোবিন্দ নিজেকে একজন নিষ্ঠাবান ধার্মিক হিন্দু হিসেবে জাহির করতো।

একদিন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত গোবিন্দকে জানাল, এক হিন্দু মেয়ে মুসলমান হয়ে কমান্ডার যুলকারনাইনকে বিয়ে করেছে। হিন্দু মেয়েরা আমাকে জানিয়েছে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুলকারনাইনের স্ত্রী মুসলমান হয়েছে বটে, কিন্তু তার হৃদয়ে হিন্দুত্ববাদ বহাল রয়েছে। স্বামীকে সে এতোটাই শ্রদ্ধা করে যে,

স্বামীর ধর্মকেই সে নিজের ধর্ম মনে করে। কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে সরে গিয়ে আশপাশের চতুর্দিকে তাকালে তার কাছে হিন্দুত্ববাদই আকর্ষণীয় মনে হয়। সে হিন্দু মহিলাদের জানিয়েছে, তার স্বামী তাকে বলেছে, সে যেন হিন্দু মেয়েদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে। এই সুবাদে সে হিন্দু মেয়েদের সাথে মেলামেশা বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ইসলামের কোন কথাই সে মুখ থেকে বের করে না।

অসহায় এই মেয়েটিকে এই ডাকাতের হাত থেকে মুক্ত করা দরকার। মেয়েটি শৈশব থেকেই ধর্মনিষ্ঠ পরিবারে বেড়ে উঠেছে। ধার্মিক পরিবারের সন্তান হওয়ার কারণে হিন্দুত্ববাদ তার রক্তের শিরায় শিরায় মিশে আছে। কিন্তু কমান্ডার যুলকারনাইন মেয়েটির প্রতি এমন সহানুভূতি দেখিয়েছে যে, মেয়েটি যুলকারনাইনের উপকার ভুলতে পারছে না।

একথা শোনে গোবিন্দের মাথায় দারুণ বুদ্ধি এলো। সে বুঝে নিল এই মেয়েটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। গোবিন্দ ছিল ধূর্ত। চাতুর্যপূর্ণ বুদ্ধিমত্তায় তার কোন জুড়ি ছিল না। সে ভাবনায় পড়ে গেল, এই মেয়েটিকে কি রাজ্যপালের হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার করা যায়?

চিন্তা ভাবনা করে সে একটা পথ আবিষ্কার করে ফেলল। পণ্ডিতকে গোবিন্দ বললো, আপনি আমাকে সেই সব হিন্দু মেয়েদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন যেসব মেয়েদের সাথে এই মেয়েটি মেলামেশা করে।

পণ্ডিত গোবিন্দকে জানালো, মেয়েটি হিন্দু মেয়েদের সাথে শুধু গল্পগুজবই করে না, সে তাদের সাথে স্নান করতে নদীতেও যায়। তার স্বামী এসবকে কিছু মনে করে না। স্বামী মেয়েটিকে খুবই বিশ্বাস করে এবং তার উপর গভীর আস্থা রাখে।

এই আলোচনার কয়েক দিন পর এক দিন দুপুরে রাজিয়া আরো কয়েকজন হিন্দু মেয়ের সাথে নদীতে গোসল করতে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে ছিল বড় বড় অশ্বথ বৃক্ষ ও ঝোপ ঝাড়।

একটি বড় অশ্বথ গাছের নীচে একজন সন্যাসীরূপী বয়স্ক লোক মাথা নীচের দিকে করে বসেছিল। লোকটির ছিল লম্বা দাড়ি এবং মাথার চুল কাধ পর্যন্ত দীর্ঘ। চেহারা ছবি অনেকটা মুসলমানদের মতো। কিন্তু তার পোষাক পরিচ্ছদ হিন্দু সন্ন্যাসী ঋষিদের মতো। রাজিয়া ও তার সঙ্গীনী মেয়েরা যখন লোকটির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন মাথা সোজা করে আঙুল উঁচিয়ে মেয়েদের থামতে ইঙ্গিত করল। মেয়েরা তার ইঙ্গিতে দাঁড়ালো। সাধুরূপী লোকটি তাদেরকে পাশে বসিয়ে রাজিয়ার চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

রাজিয়ার দৃষ্টিও লোকটির চেহারার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। সন্ন্যাসী রাজিয়ার চোখে চোখ রেখে তার দু'টি হাত রাজিয়ার মাথায় রাখল এবং ধীরে ধীরে তার কপালে হাত বুলাতে লাগল। সঙ্গিনী মেয়েরা দেখল, রাজিয়া পলকহীন দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীকে দেখছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে মেয়েটি যেন সম্বিত হারিয়ে ফেলেছে, সে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে সন্ন্যাসীর চেহারার দিকে।

তোমার আত্মা পথ হারিয়ে দিগ্বিদিক ঘুরছে– দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ক্ষীণ আওয়াজে কানে কানে বলার মতো করে রাজিয়ার উদ্দেশ্যে বললো সন্ন্যাসী। সে আরো বললো, তোমার অন্তর এক জায়গায়, আর দেহ আরেক জায়গায়। অন্তর পবিত্র, কিন্তু দেহ অপবিত্র। এক চোখে আলো অপর চোখে ঘোরতর অন্ধকার। পর জনমের অবস্থা খুবই ভয়াবহ। পর জনমে শিয়ালের রূপ ধারণ করবে। মানুষ ধূর্ত শিয়াল বলে ঘৃণা করবে।

হঠাৎ সন্ন্যাসী মাথা ঝাকুনী দিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠার মতো করে বললো– যাও! চলে যাও। ছিঃ! জগতে এমন পাপিষ্ঠ অন্তরও থাকে?

নওমুসলিম অনভিজ্ঞ রাজিয়ার অন্তরে সন্ন্যাসীরূপী এই লোকের সংশয়পূর্ণ কথায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হলো। রাজিয়ারূপী রত্মার অন্তরে শুরু হলো দ্বান্দ্বিক তোলপাড়।

সন্ন্যাসী স্বগতোক্তির মতো করে বলতে লাগল– এক চোখে ঘোরতর অন্ধকার। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা, তুমিও কিছুই দেখবে না। তুমি তা বরদাশত করতেও পারবে না। যাও, চলে যাও। মসজিদ ও মন্দিরের মাঝামাঝি ঘোরতর অন্ধকার। তুমি এই অন্ধকারে হাতড়ে মরবে। নিজের পরিণতির কথা জিজ্ঞেস করো না। যদি জিজ্ঞেস করো, তাহলে মরে যাবে। যদি মরতে না পারো তাহলে পাগল হয়ে যাবে।

সন্ন্যাসীর কথা, তার দৃষ্টি ও ভবিষ্যতবাণী বলার মধ্যে এমন যাদুময়তা ছিল যে, অনভিজ্ঞ রাজিয়া তাৎক্ষণিক বদলে গেলো। কারণ, রক্তমাংসে রাজিয়া ছিল হিন্দু। তাছাড়া বিগত বছরখানেক ধরে রাড়িতে এসে সে হিন্দু মেয়েদের সাথে মেলামেশা করতে থাকে। যার ফলে হিন্দু কৃষ্টি কালচার মনের অজান্তেই তার অন্তরে পুনর্বার বাসা বাধে।

জাতিগতভাবে হিন্দুরা প্রকৃতি পূজারী এবং মানুষের পুনর্জনমে বিশ্বাসী। হিন্দুরা মনে করে মানুষ একবার মরে গিয়ে কৃতকর্মের ভিত্তিতে পুনর্বার পৃথিবীতে পুনর্জন্ম লাভ করে। ধর্মকর্ম পালন করলে মরে গিয়ে মানুষ আবার বিভিন্ন হিংস্র জন্তু জানোয়ারের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসে।

সন্ন্যাসীর এই যাদুকরী বাক্য ও ভবিষ্যতবাণী শুনে রাজিয়া এতোটাই তন্ময় হয়ে পড়ল যে, সে সন্ন্যাসীর সামনে থেকে উঠতেই চাচ্ছিল না। সন্ন্যাসীর কথায় সে বুঝতে পারল, ইসলাম গ্রহণ করে সে মারাত্মক অপরাধ করেছে, যে অপরাধের কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। এই অপরাধের জন্যে পুনর্জন্মে রাজিয়া শিয়ালের রূপধারণ করে দুনিয়াতে আসবে এবং ইতর জানোয়ারের জীবন যাপন করবে।

সঙ্গী মেয়েরা সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করতে লাগলো। তারা সন্ন্যাসীর উদ্দেশে বললো– বাবাজী! এই মেয়ে বুঝে শুনে ধর্ম ত্যাগ করেনি। আপনি তার প্রতি একটু সদয় হোন। কিন্তু সন্ন্যাসী আর কোন কথা বলল না। অনেক্ষণ পর যদিও মুখ খুলল, কিন্তু বজন গাইতে লাগল। অনেক অনুরোধের পর বললো–

এই মেয়েটিকে আর নদীতে নিয়ে যেয়ো না– গম্ভীর কণ্ঠে বললো সন্ন্যাসী। মথুরার জলহস্তি ওকে আস্ত গিলে ফেলার জন্যে এসে গেছে। শুধু শুধু আমি মেয়েটিকে দেখিনি। বাতাসে একটি গন্ধ ভেসে এসেছে, যা দুনিয়ার কোন মানুষ টের পায় না। এই গন্ধ হলো সেই সব পাপিষ্ঠ আত্মার গন্ধ, যে সব আত্মারা পাপের মধ্যে ডুবে থাকে এবং ভেতরে ভেতরে নরকের আগুনে জ্বলতে থাকে।

তোমরা আমার কাছাকাছি এলে এই মেয়েটির দেহ থেকে আমার নাকে এমন গন্ধ লেগেছিল। এজন্য আমার ধ্যান ভেঙ্গে যায়। আমি মেয়েটির প্রতি তাকিয়ে থাকি। আহা! মরার পর যার আত্মা পাপিষ্ঠ হবে, জীবন্ত অবস্থায়ই তা নরকে জ্বলতে শুরু করেছে!

হঠাৎ রাজিয়া রূপী রত্না বলতে লাগল– হ্যাঁ, ঋষি বাবা! আমি সত্যিকার অর্থেই পাপি। আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করেছি। এক লোক আমার অন্তরকে জয় করে নিয়েছিল। ভালোবাসার টানে আমি ধর্মান্তরিত হয়ে তাকে বিয়ে করি। কিন্তু আমার ধর্মকে আমি ভুলতে পারিনি। আমি আসলে কিছুই জানি না সাধু বাবা! আমি একটা মূর্খ। আমাকে এই নরক থেকে বাঁচার পথ দেখান।

কিন্তু যে পাপ তুমি করে ফেলেছো, এর শাস্তি থেকে তুমি কিভাবে মুক্তি পাবে?

কিভাবে এই পাপ থেকে বাঁচতে পারবো, সে কথা আপনি বলে দিন ঋষি বাবা! আপনি অবশ্যই সেই পথের খবর রাখেন। আত্মাকে পাপের শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্যে আমি জীবন্ত চিতায় শুতেও রাজি আছি। পরজনমের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে আমি নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও রাজি।

কি বলবো, বলতেও ভয় করে! তোমার যদি সাহস থাকে তবে শোন। পানি থেকে সব সময় দূরে থাকবে। তোমাকে একটি জীবনের বলিদান করতে হবে!

'দু'চোখ বন্ধ করে খুব ক্ষীণ আওয়াজে কথা বলছিল সন্ন্যাসী। হ্যাঁ, তোমার পাপ মোচনের জন্যে তোমাকে অনেক বড় মানুষের বলিদান করতে হবে। তোমাকে বড় মানুষ খুন করতে হবে। হ্যাঁ, বলা মুশকিল মহারাজাকে বলিদান...।

হ্যাঁ, যেকোন পাপীকে হত্যা করে পাপের স্খলন ঘটাতে হবে। মহারাজাও পাপী, যে মহারাজা তার বাপদাদার ভগবানদেরকে মুসলমানের হাতে ধ্বংস করিয়ে এখন তাদের বন্দী জীবন নিয়ে পরম তৃপ্তিতে আছে।

হ্যাঁ, সে পাপী, বড় পাপীষ্ঠ, মহাপাপী রাজা।

শোন মেয়ে! যদি তোমার পাপের স্খলন চাও, তাহলে এই পাপি রাজাকে খুন করে ফেলো। প্রথমে মহারাজার রক্তের টিপ নিজের কপালে লাগাও, পরে এই টিপের উপরে তোমার পাপিষ্ট স্বামীর রক্তের টিপ লাগাও। এর পর সোজা মন্দিরে চলে যাবে। সেখানে গেলে আলো দেখতে পাবে। এই আলো হবে তোমার মুক্তির ইঙ্গিত।

হত্যা? স্বগতোক্তি করলো রাজিয়া। কেঁপে উঠলো তার সর্বাঙ্গ। না, না! আমি তা পারবো না!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। রাজপুতের মেয়ে একটা পাপিষ্টকে হত্যা করতে ভয় পায়– বললো সন্ন্যাসী। ঠিক আছে, যদি ভয় পাও তবে নদীতে চলে যাও। নদীতে নেমে জলহস্তির পেটে চলে যাও, আর পরজনমে শিয়াল হয়ে ফিলে এসো।

আজ যাকে ছেড়ে দিচ্ছো, সেই মহারাজার পালিত কুকুরেরা তোমাকে ছিড়ে খাবে। এই মহারাজার তীরের আঘাতে তুমি আহত হবে। তীরবিদ্ধ অবস্থায় জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মরবে। তোমার জখমে ঘা হবে। ঘায়ে পোকা হবে। আর পোকার কামড়ে তুমি চিৎকার করে জঙ্গলে দৌড়াবে। যাও! তাই হবে, তাই হবে।

রাজিয়ার সঙ্গীনী এক মেয়ে সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে বললো– সাধু মহারাজ! দেবতাদের অভিশাপ ঠেকানো যায় না। আপনি রাজাকে খুন করার কোন সহজ পন্থা তাকে বলে দিন। যাতে একাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। তার প্রতি দয়া করুন। মহারাজ! ভগবানের কৃপা থেকে তাকে দূরে ঠেলে দেবেন না। রাজিয়া ও সঙ্গীনী মেয়েদের উপর্যুপরী অনুরোধে সন্ন্যাসী মহারাজা রাজ্যপালকে হত্যার যে পদ্ধতি বললো, তা ছিল এমন–

মহারাজা রাজ্যপাল নারী লোভী। রাজিয়া খুবই সুন্দরী যুবতী। ইসলাম ধর্ম প্রচারের নামে সে রাজপ্রাসাদে যাবে এবং সুযোগ মতো মহারাজার খাস কামরায়

ঢুকে পড়বে। যেহেতু রাজিয়া কমান্ডার যুলকারনাইনের স্ত্রী এজন্য তাকে দেখে মুগ্ধ হলেও মহারাজা তার প্রতি হাত বাড়াবে না। কিন্তু রাজিয়াকেই উদ্যোগী হয়ে নিজের রূপ সৌন্দর্য দিয়ে মহারাজাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে হবে, যাতে মহারাজা বুঝে যে, রাজিয়া নিজেই স্বেচ্ছায় মহারাজাকে সঙ্গ দিয়ে ধন্য হতে চাচ্ছে। তাহলে একান্তে মিলনের জন্য রাজাই এগিয়ে আসবে।

রাজিয়া তার শাড়ীর আঁচলে একটি ধারালো খঞ্জর লুকিয়ে রাখবে। সুযোগ মতো সেই খঞ্জর দিয়ে রাজাকে হত্যা করে ঘরে এসে স্বামীকে হত্যা করবে। উভয়ের হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত হলে সোজা মন্দিরে চলে আসবে। মন্দিরে এলে পুরোহিত তাকে দূরে কোথাও নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।

ঋষি মহারাজ! আমি কি এতোটা সাহসী হতে পারবো? কীভাবে খুন করবো আমি? আমার তো হাত কাঁপবে! বললো রাজিয়া।

সন্ন্যাসী তার পাশে রাখা একটি বাক্স হাতড়িয়ে একটি কৌটা বের করল এবং তা থেকে কিছুটা তুলার মতো বের করে একটি কাপড়ের টুকরোতে বাঁধতে বাঁধতে বললো— তুমি যখন রাজাকে হত্যার উদ্দেশ্য ঘর থেকে বের হবে তখন এক গ্লাস পানিতে এই তুলাটি ভিজিয়ে পান করে নেবে। দেখবে তোমার মধ্যে সাহস এসে যাবে। কোনরূপ ভয়-ভীতি থাকবে না।

সেই দিন রাতের বেলায় গোবিন্দ রাড়ির প্রধান মন্দিরে বসা ছিল। তার সামনে দু'জন হিন্দু মহিলা তাকে বলছিল— রাজিয়া দিনের বেলায় তাদের সাথে নদীতে যাওয়ার পরিবর্তে ঘরে ফিরে এসেছিল।

সে আমাকে কোনরূপ সন্দেহ তো করেনি? জিজ্ঞেস করল গোবিন্দ।

আরে আমরা তো আপনাকে আগে থেকেই জানতাম, তার পরও আমাদেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, সেই সন্ন্যাসীরূপী লোকটি আপনিই— বললো এক মহিলা।

আপনার এই সন্ন্যাসীরূপ ধারণ ছিল অকৃত্রিম। আপনার কাজে আপনি শতভাগ উত্তীর্ণ হয়েছেন। এরপর আমরাও রাজিয়াকে কয়েকটি কাহিনী শুনিয়ে এ কাজে সম্মত করিয়ে ফেলেছি— বললো অপর মহিলা।

রাজিয়াকে এই হত্যাকাণ্ডে রাজি করানোর জন্যে এতো জল ঘোলা করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ ধর্মান্তরিত হওয়ার অনুশোচনায় সে এমনিতেই দগ্ধ হচ্ছিল। সে খুঁজে ফিরছিল স্বধর্মে ফিরে গিয়ে পাপ স্খলনের একটা উছিলা। সন্ন্যাসীরূপী গোবিন্দের কথার মধ্যে সে পাপ স্খলনের উছিলা দেখতে পাচ্ছিল।

রাজিয়ার স্বামী যুলকারনাইন তাকে হিন্দু মেয়েদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিল। কিন্তু অপরিপক্ক রাজিয়া যখন হিন্দু মেয়েদের সাথে মিশতে

শুরু করল, তখন হিন্দু মেয়েরা তার মধ্যে বাপদাদার ধর্মকেই পুনরুজ্জীবিত করল। রাজিয়া তার পৈতৃক ধর্মমতকেই পুনরায় আবিস্কার করল এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলো। ইসলাম ধর্ম প্রচার দুরের কথা, ইসলামের কোন কথাই সে কোন দিন হিন্দু মহিলাদের কাছে উচ্চারণ করতে পারেনি।

পরদিন নানা কাজের চাপে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত যুলকারনাইন রাতে ঘরে ফিরে ক্লান্তির কারণে শুয়ে পড়লো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। রাজিয়ার প্রতি ঘুনাক্ষরেও কোন দিন যুলকারনাইনের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। ফলে তার আস্থা পরীক্ষার কোন প্রয়োজনও সে কোন দিন বোধ করেনি।

কিন্তু দিনের বেলায় সন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী রাজিয়াকে অস্থির করে তুলে ছিল। যুলকারনাইন ঘুমিয়ে পড়তেই রাজিয়ার মধ্যে জেগে উঠলো রত্মার বৈশিষ্ট্য। সে পাপ স্খলনের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো।

সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে উঠে সন্ন্যাসীর দেয়া তুলা পানিতে ভিজিয়ে পান করল রাজিয়া।

এতক্ষণ তার মধ্যে যে ভয়, আতংক ও জড়তা ছিল তুলা ভেজানো পানি পান করার পর তার মন থেকে সব ভয় শংকা ও জড়তা দূর হয়ে গেল। এরপর রাজিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে চাঁদের আলোয় পায়চারী করছিল সে। তখন নিজের মধ্যে একটা পাশবিক শক্তি উন্মাদনা টের পেলো সে। রাজিয়া অনুভব করছিল, যেন সে গযনী আক্রমণ করে সুলতান মাহমুদকে খুন করে ফেলবে।

এই ঘটনার এক দিন আগে রাজিয়া তার স্বামী যুলকারনাইনের সাথে বলেছিল, আগামী কাল থেকে সে রাজমহলে যেতে চায়, যাতে সেখানকার মহিলাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে পারে। রাজিয়ার কথা শুনে কমান্ডার যুলকারনাইন এই ভেবে খুবই খুশী হয়েছিল যে, তার প্রিয় স্ত্রী তার কথামতো হিন্দু মেয়েদের মধ্যে নিজ দায়িত্বে ইসলাম প্রচার করছে।

পরদিন যথারীতি রাজিয়া রাজমহলে গেল। রাজমহলের সবাই জানতো রাজিয়া কমাণ্ডার যুলকারনাইনের স্ত্রী। রাজিয়া মেয়েদের এঘর সে ঘর ঘুরতে ঘুরতে সুযোগ বুঝে মহারাজা রাজ্যপালের কক্ষে চলে গেল। রাজা তাকে দেখে খুব খুশী হলেন। খুশীর কারণ এই নয় যে, রাজিয়া তার উপদেষ্টা কমান্ডার যুলকারনাইনের স্ত্রী। খুশীর মূল কারণ রাজিয়া যুবতী এবং অস্বাভাবিক সুন্দরী। রাজা রাজিয়াকে পরম আগ্রহে ও সম্মানে তার পাশে বসাল।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা উভয়ে একে অন্যের সাথে এমন অন্তরঙ্গ ভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল যেন অনেক দিন থেকে তারা পরস্পরের পরিচিত।

রাজিয়ার মধ্যে অপরিচিতের দূরত্ব দূর হয়ে যাওয়ার বড় কারণ হলো সে ছিল মূলত হিন্দু। আর মনে প্রাণে সে হিন্দুই থেকে গিয়েছিল। ফলে একজন জাত হিন্দুর সাথে তার হৃদ্যতা তৈরী হতে বেশী সময় লাগেনি। তাছাড়া রাজিয়া ছিল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের প্রতি মনোযোগী। যত দ্রুত সম্ভব সে রাজার সাথে ভাব জমানোর চেষ্টা করল। রাজাকে আপন করে নেয়ার জন্যে সে নারীত্বের যতটুকু কারিশমা তার মধ্যে ছিল সবটুকুই সে প্রয়োগ করল। কথায় কথায় নিজের রূপ-লাবণ্য রাজার সামনে তুলে ধরার জন্য নিজে থেকেই সে রাজার কাছাকাছি বসল এবং বার বার বিভিন্ন ছুতোয় শাড়ির আঁচল খুলে শরীর ঢাকার ভান করে নিজের দেহকে উন্মুক্ত করে দিচ্ছিল।

রাজা ছিল নারী লোভী। নবাগত রাজিয়ার গায়ে পড়া অঙ্গভঙ্গি তার মধ্যে প্রচণ্ড কামনা সৃষ্টি করল এবং সে রাজিয়াকে একান্তে পাওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে পড়লো। যেহেতু রাজিয়া নিজেই বিশেষ এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে রাজাকে একান্তে পাওয়ার পাঁয়তারা করছিল, ফলে তাদের শরীরী কথাবার্তায় পৌছাতে বেশী সময়ের দরকার হলো না। রাজিয়াকে একান্তে পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল বুড়ো রাজ্যপাল।

রাজিয়াও কালবিলম্ব না করে রাজার একান্ত সান্নিধ্য পাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করে বললো– মহারাজ! অনুমতি দিলে আজ রাতেই আমি আপনার কাছে একান্তে মিলিত হতে আগ্রহী। তবে আমি চাই আমার এই আসা সবার অগোচরে থাকুক এবং কারো দৃষ্টিতে না পড়ুক।

রাজাও তাতে সায় দিলেন। তিনি এও বললেন, আমাদের একান্ত গোপন অভিসারের কথা তোমার স্বামী কমান্ডার যুলকারনাইন জানতে পারলে আমাদের উভয়কেই খুন করে ফেলবে। তিনি রাজিয়াকে রাতের বেলায় আসার জন্যে একটি গোপন পথ দেখিয়ে দিলেন এবং একটি গোপন কক্ষ দেখিয়ে বললেন, আমি রাতের বেলায় এই কক্ষে একাকি থাকবো।

সেই রাতেই রাজিয়া সুরক্ষিত পথে রাজ্যপালের গোপন কক্ষে এসে হাজির হলো। রাজ্যপাল রাজিয়াকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে বললো– তুমি তো শরাব পান করবে না, কারণ হঠাৎ পান করলে এর রেশ অনেক্ষণ থাকবে। তোমাকে যেহেতু তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে হবে এজন্য শরাব পান না করাই ভালো হবে।

রাজিয়া তাকে বললো, হ্যা, ঠিকই বলেছেন। আপনি নিজে নিজেই শুরাহীতে ঢেলে পান করুন। আমি শরাবের গন্ধও সহ্য করতে পারি না। আমার মাথা চক্কর দেবে।

রাজ্যপাল ছিলেন দাঁড়ানো অবস্থায়। দাঁড়ানো থেকে নীচের দিকে ঝুকে তিনি শুরাহীতে মদ ঢালতে লাগলেন। এদিকে রাজিয়া তখনো তুলা ভেজানো পানীয়ের উত্তেজনায় উত্তেজিত। রাজাকে মদের গ্লাসের প্রতি মগ্ন থাকতে দেখে সে শাড়ীর ভাঁজ থেকে খঞ্জরটি বের করে দু'হাত উপরে তোলে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে রাজ্যপালের পিঠে খঞ্জর ঢুকিয়ে দিল।

খঞ্জরের আঘাতে রাজ্যপাল যেই সোজা হয়ে দাঁড়ালো অমনি রাজিয়া খঞ্জর টেনে বের করে সোজা রাজার বুকে আমূল খঞ্জরটি বিদ্ধ করল। রাজার মুখে আর কোন ধরনের শব্দ উচ্চারিত হলো না। ধপাস করে রাজ্যপাল মরা বকরির মতো মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

বুকে বিদ্ধ খঞ্জরটি টেনে বের করে রাজার দিকে তাকাল রাজিয়া। খঞ্জর বিদ্ধ রাজার দেহটি কয়েক বার খেচুনী দিয়ে অসাড় ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ল।

রাজিয়ার অনুভবই হচ্ছিল না, সে কতো বড় একজন ব্যক্তিকে অবলীলায় খুন করে ফেলেছে। রাজ্যপাল তখন শুধু একজন হিন্দু রাজা নন, তিনি গযনী সুলতানের বিশ্বস্ত বন্ধু। সুলতান মাহমূদের সাথে চুক্তি করার ফলে মূলতঃ রাজ্যপাল মুসলমানদের সহযোগী হয়েছে। তাই রাজ্যপালকে হত্যা করার পরিণতি কি ভয়াবহ হতে পারে এর বিন্দু বিসর্গও কোন চিন্তা ভাবনা রাজিয়ার মনে ছিল না। বরং রাজিয়া রাজ্যপালের নিথর দেহ দেখে পরম স্বস্তি বোধ করলো।

হত্যা করার পর খুব ধীর স্থির ভাবে যে শুরাহীতে রাজ্যপাল শরাব পান করতে শরাব ঢেলে ছিল, রাজিয়া আস্তে করে শরাবের গ্লাসটি তার ঠোঁটে ছোয়াল এবং এক নিঃশ্বাসে সবটুকু শরাব গলাধঃকরণ করলো। অতঃপর খুব শান্তভাবেই রাজার কক্ষটির দরজায় ছিটকিনি এঁটে দিয়ে কক্ষ ছেড়ে পথে নামলো এবং লোক চক্ষুর অন্তরালেই নিজের ঘরে পৌছে গেল।

রাজিয়ার ঘরে কোন পরিবর্তন ছিল না। যথারীতি নির্বিঘ্নে ঘুমাচ্ছিল যুলকারনাইন। রাজিয়ার হাতে রক্ত মাখা খঞ্জর। এবার তার স্বামী যুলকারনাইনকে হত্যার পালা।

গভীর ঘুমে যুলকারনাইন। খোলা জানালা দিয়ে চতুর্দশী চাঁদের আলো এসে যুলকারনাইনের ঘুমন্ত চেহারা ও খোলা বুকের উপর পড়ছে। সোজা চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে আছে যুলকারনাইন। নিঃশ্চিন্তে। এখন বুকের উপর একবার খঞ্জর বিদ্ধ করলেই নির্ঘাত মৃত্যু।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় ধীরে ধীরে স্বামীর দিকে এগিয়ে গেল রাজিয়া। রক্তমাখা খঞ্জর তার হাতে। কাছে গিয়ে দু'হাত উপরে তুলে গভীরভাবে ওর ঘুম পরখ করতে লাগল রাজিয়া। নিয়মিত নিঃশ্বাস ফেলায় উঠানামা করছে বুক। এক পলক যুলকারনাইনের চেহারার দিকে তাকাল রাজিয়া।

হঠাৎ যুলকারনাইনের ঠোঁটে দেখা দিল মুচকি হাসি। হয়তো ঘুমের মধ্যে কোন স্বপ্ন দেখে হাসছে সে। অসম্ভব মায়াবী চেহারা। মনকাড়া ওর হাসি। রাজিয়ার দেখা এই জগতের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্পাপ যুবক। হিন্দু মুসলিম সকলের কাছে প্রিয় যুলকারনাইন। উচু নীচু ধনী গরীব সবার কাছে পরম শ্রদ্ধেয় কমান্ডার যুলকারনাইন। এই দূরদেশের চরম শত্রুদের কাছেও যুলকারনাইন একটি পরিচিত মুখ আদরনীয় নাম।

যুলকারনাইনের স্বপ্নময় মিষ্টি হাসি রাজিয়ার মধ্যে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল। নেশার ঘোর কেটে গেল তার। আসলে শরাব পানের কারণে সন্ন্যাসীর দেয়া ঔষধের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিকতা ফিরে এসে ছিলো রাজিয়ার মধ্যে। একটু আগে যে রাজিয়া অবলীলায় মহারাজা রাজ্যপালকে খুন করে এলো, স্বামীকে খুন করতে উদ্যত সেই খুনী রাজিয়ার দেহ হঠাৎ কেঁপে উঠলো– উত্তোলিত হাত থেকে রক্তমাখা খঞ্জরটি পড়ে গেল যুলকারনাইনের পেটের উপরে। আর রাজিয়া হাউমাউ করে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল যুলকারনাইনের বুকের উপরে।

ধড়ফড় করে জেগে উঠলো যুলকারনাইন। ঘটনার আকস্মিকতায় সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে বাতি জ্বালালো। তার বিছানায় রক্তমাখা খঞ্জর দেখে অবাক হয়ে গেল। রাজিয়া তখন দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। যুলকারনাইন আকস্মিক এই অবস্থার কোন কূলকিনারা বুঝে উঠতে না পেরে রাজিয়াকে টেনে তুলে জিজ্ঞেস করলো, এসব কি? এই রক্তমাখা খঞ্জর কোত্থেকে এসেছে? তুমি এভাবে কাঁদছো কেন?

রাজিয়া কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো–'না, আমি তোমাকে হত্যা করতে পারবো না। আমি আমার কলিজায় খঞ্জর চালাতে পারবো না। একথা বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো রাজিয়া।

তখনো যুলকারনাইন ঘটনার মাথামুণ্ডু কিছুই পরিষ্কার বুঝতে পারল না। তবে এতটুকু আন্দাজ করতে পারলো, নিশ্চয় কোন চক্রান্তের শিকার হয়েছে রাজিয়া। যা সে সহজে বলতে পারছে না। একজন কমান্ডার হিসেবে সে যে

হিন্দুদের টার্গেট সে সম্পর্কে সতর্ক ছিল যুলকারনাইন। তাই ঠাণ্ডা মাথায় সে রাজিয়াকে জিজ্ঞেস করলো–

কি হয়েছে রাজিয়া? আমাকে সব খুলে বলো, তোমার কোন ভয় নেই। তুমি কোন অপরাধ করে থাকলেও আমি কিছুই বলবো না। পরিষ্কার করে আমাকে সব বলো।

যুলকারনাইনের আশ্বাস ও উপর্যুপরী অনুরোধে রাজিয়া বললো– আমি কতক্ষণ আগে নিজ হাতে মহারাজা রাজ্যপালকে খুন করে এসেছি। কথা ছিল এরপর তোমাকে হত্যা করবো।

কি বলছো এসব? তোমার মাথা ঠিক আছে? তোমার মতো একটি মেয়ে মহারাজাকে খুন করতে পারে? আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। আসল কথা আড়াল না করে আমার কাছে প্রকৃত ঘটনা খুলে বলো।

রাজিয়া জানালো, আমি দু'জন হিন্দু মেয়ের সাথে নদীতে গোসল করতে যাচ্ছিলাম, পথিমধ্যে সন্ন্যাসীরূপী এক বয়স্ক সাধুকে দেখতে পাই। তারপর রাজিয়া জানালো, সন্ন্যাসী তাকে দেখে কি ভবিষ্যদ্বাণী করলো এবং ইসলাম গ্রহণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হলে তাকে কি করতে হবে। রাজিয়া এও জানালো, হিন্দু মেয়েরা তাকে কি ভাবে রাজ্যপালকে হত্যার জন্যে উদ্বুদ্ধ করলো এবং হত্যাকাণ্ডে যাওয়ার আগে সন্ন্যাসীর দেয়া তুলা ভেজানো পানি পানের কথাও যুলকারনাইনকে জানালো।

রাজিয়া বললো– আমাকে ক্ষমা করে দাও যুলকারনাইন, এই খঞ্জর দিয়ে আমাকে তুমি খুন করে ফেলো। আমি তোমার প্রেমে পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম বটে। কিন্তু তোমার ধর্মকে আমি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারিনি। ধর্ম নয়, আমার হৃদয়ে শুধু তোমার প্রতিই ভালোবাসা ছিল। আমি তোমার শেখানো ইবাদত বন্দেগীর কোনটাই নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারিনি। তুমি আমাকে হিন্দু মেয়েদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দিয়েছিলে কিন্তু আমি হিন্দু মেয়েদের সাথে মেলামেশা করে ইসলাম প্রচারের বিপরীতে হিন্দুত্বকেই আরো বেশি আত্মস্থ করেছি। রাজিয়া বললো, সেই শৈশবকাল থেকেই আমাকে বুঝানো হয়েছে, মুসলমানরা পাপী, অপবিত্র, ঘৃণার পাত্র। আমিও মুসলমানদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়েই বড় হয়েছি। কিন্তু তোমার সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকে তোমাকে আমি ঘৃণা করতে পারিনি। তবে অন্য মুসলমানদের প্রতি আমার কোনই শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়নি।

হঠাৎ দ্রুত পায়ে উঠে রক্তাক্ত খঞ্জরটি যুলকারনাইনের প্রতি বাড়িয়ে দিয়ে রাজিয়া বললো– এই খঞ্জর দিয়ে তুমি আমাকে খুন করে ফেলো। আমি আর বাঁচতে চাই না। আমি যে পাপ করেছি মৃত্যুই এর উপযুক্ত শাস্তি।

যুলকারনাইন রাজিয়ার হাত থেকে খঞ্জর ছিনিয়ে নিয়ে বললো, তোমাকে মরলে চলবে না, বেঁচে থাকতে হবে। অচিরেই তোমার হৃদয়ও বলবে, মুসলমানরা সত্যিকারে অপবিত্র নয়, পবিত্র। ইসলাম কোন মিথ্যা ধর্ম নয় বরং হিন্দুত্ববাদই মিথ্যা। অনেক কথা বলে অনেক কষ্টে যুলকারনাইন রাজিয়াকে শান্ত করলো।

রাত পোহালে যুলকারনাইন রাজ্যপাল নিহত হওয়ার খবর দিয়ে কন্নৌজের গভর্ণর আব্দুল কাদের সেলজুকীর কাছে দ্রূত পাঠালো এবং রাজিয়ার বক্তব্য অনুযায়ী দুই হিন্দু মহিলাকে গ্রেফতার করে আনলো। মহিলা দু'জনকে হুমকি ধমকি ও ভয়-ভীতি দেখানোর পর তারা গোবিন্দের কারসাজির কথা প্রকাশ করে দিল। তাৎক্ষণিক গোবিন্দকে পাকড়াও করা হলো।

কিন্তু চক্রান্তের ব্যাপারে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে এর সাথে সংশ্লিষ্টতার কথা অস্বীকার করলো এবং বললো— এই দুই মহিলার সাথে কখনো আমার কোন কথা হয়নি। গোবিন্দকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেও যখন যুলকারনাইন তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি বের করতে পারলো না, তখন সে দুটি ঘোড়া আনতে বললো। সহকর্মীরা দু'টি ঘোড়া নিয়ে এলে যুলকারনাইন গোবিন্দের দু'পায়ের গোড়ালীতে রশি বেধে দু'টি ঘোড়ার সাথে বেধে দিল এবং দু'জন অশ্বারোহীকে বললো, দু'টি ঘোড়াকে দু'দিকে তাড়া দাও। ঘোড়া দু'টি দু'দিকে চলা শুরু করলেই গোবিন্দের দু'পা ছিড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। সাথে সাথে সে চিৎকার দিয়ে বললো, আমিই রাজাকে হত্যা করেছি। এরপর ঘোড়াকে থামিয়ে গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কেন এ কাজ করেছো?

গোবিন্দ জানালো, কালাঞ্জর ও গোয়ালিয়রের মহারাজা তাকে বড় অংকের পুরস্কার দানের লোভ দেখায়। সে আরো জানায়, কালাঞ্জর ও গোয়ালিয়রের দুই রাজা মিলে কি পরিকল্পনা করেছে। গোবিন্দ এও জানায়, সে এতো দিন দু'মুখী গোয়েন্দাগিরি করে উভয় পক্ষের কাছ থেকেই সুবিধা লাভ করেছে।

খবর পেয়েই সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকী ঝড়ের বেগে রাড়ীতে পৌঁছলেন। তিনি এসে ঘটনার আদি অন্ত সব শুনে গোবিন্দকে ছেড়ে দিয়ে

বললেন, তুমি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করো। ছাড়া পেয়ে গোবিন্দ পালানোর জন্য দৌড়াতে লাগল। আবদুল কাদের সেলজুকী তার এক সহকর্মীর কাছ থেকে একটি তীর ও ধনুক নিয়ে দ্রুত তীরটি গোবিন্দকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তীরটি গিয়ে গোবিন্দের পিঠে বিদ্ধ হলো এবং গোবিন্দ আর্ত চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। সেনাপতি সেলজুকী সৈন্যদের বললেন, ওর মরদেহটিকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে শহরের বাইরে ফেলে এসো।

একজন পরাজিত বশ্যতা স্বীকার করে নেয়া রাজার খুন হয়ে যাওয়াটা সুলতান মাহমূদের জন্যে এমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যে, দ্রুত তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করতে হবে। আসলে পরাজিত রাজা রাজ্যপালের মৃত্যুর চেয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের হিন্দু রাজাদের চক্রান্তের বিষয়টি ছিল গযনী সুলতান ও গযনী বাহিনীর জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে মহারাজা রাজ্যপালের খুনের ব্যাপারটি এবং গোবিন্দের দ্বিমুখী গোয়েন্দাগিরি ও কালাঞ্জর এবং গোয়ালিয়রের হিন্দু রাজাদের চক্রান্তের খবর দিয়ে একজন দ্রুতগামী দূতকে তখনই সেনাপতি সেলজুকী গযনীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়ে দিলেন।

সুলতান মাহমূদ দূতের মুখে এই সংবাদ শুনে সাথে সাথেই সৈন্যদেরকে হিন্দুস্তানে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন।

তিন দিন পর এক ঐতিহাসি লড়াইয়ের জন্যে গযনী বাহিনী হিন্দুস্তানের দিকে রওয়ানা হলো। আর এদিকে গোয়ালিয়র, কালাঞ্জর ও লাহোরের হিন্দু সৈন্যরা চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল। হিন্দু রাজারা জানতো, রাজ্যপালের খুনের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেলে এবং তিন রাজার মিলিত যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর প্রকাশ হয়ে গেলে সুলতান মাহমূদ ঝড়ের বেগে হিন্দুস্তানের দিকে রওয়ানা হবেন। আর এটিই হবে তাদের সাথে গযনী বাহিনীর চূড়ান্ত লড়াই।

# বিস্ময়কর ঘটনা

নয়শ' সত্তর সালের ঘটনা। সুলতান মাহমূদের শায়খ ও মুর্শিদ শায়খ আবুল হাসান কিরখানী একদিন গযনী সুলতানের উদ্দেশ্যে বললেন—

যে যুগের মুসলমানরা হিন্দু ও ইহুদীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সেই যুগটি হবে মুসলমানদের পতনের যুগ। সেটি হবে ইসলামের কালো যুগ। সে যুগেই আল্লাহর এই যমীন মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হবে।

তোমার শাসিত এলাকায় অমুসলিমরা দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। তাদের খেয়াল খুশী মতো শাসনের নামে দুঃশাসন চালাবে। গযনী কান্দাহার কাবুল গার দিজ বিধর্মীদের পায়ের চাপে পিষ্ট হবে। যাদের কাছে ন্যূনতম কোন নীতি নৈতিকতা ও মানবতাবোধ নেই, যারা মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর নির্মম তাদেরকে মুসলমানদের একটি অংশ শুভাকাঙ্ক্ষী ভাবতে শুরু করবে। মাহমূদ! সেদিন তোমার কবর অমুসলিমদের কিছুই করতে পারবে না। বরং তোমার কবরের উপরেও চলবে রক্তের হোলি খেলা। তখন আমাদের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব হবে না। তাই যদি কিছু করতে হয় তবে এখনই করতে হবে।

সুলতান মাহমূদ তার জীবনের সিংহভাগ বাতিলের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে কাটিয়েছেন। অবশেষে এক সময় তার হৃদরোগ দেখা দিল। তিনি চিকিৎসককে কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন, তার এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারটি যেন তার কাছ থেকে কেউ জানতে না পারে। সুলতানকে তার আধ্যাত্মিক গুরু বলেছিলেন, যেহেতু মৃত্যুর পর আমাদের আর করণীয় কিছু থাকবে না, তাই ভবিষ্যত করণীয় কাজটি এখনই করতে হবে। এজন্য সুলতান তার বর্তমানকে ভবিষ্যত রচনার কাজে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তিনি তার আরাম বিসর্জন দিয়ে বিশ্রাম শরীর দেহ  মনকে মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যত বিনির্মাণের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে সেই মরণজয়ী বীরযোদ্ধা ও তার আধ্যাত্মিক গুরুর কবরের চারপাশে আস্তানা গেড়েছে বিদেশী হানাদার বাহিনী। এই হানাদার বাহিনী নিরীহ মুসলমানদের জীবন ও ইজ্জত নিয়ে হায়েনার মতো হিংস্র উন্মত্ততায় মেতে উঠেছে। যাদের কোন নীতি নৈতিকতা নেই, নেই কোন মানবিক বিচারবোধ। অথচ এই দখলকার বাহিনীকেই কথিত মুসলমানরা তাদের ত্রাণকর্তা মেনে নিয়েছে।

কেন? কেন এমনটা হলো? স্বাধীনতা পাগল দীন ও ইসলামের প্রশ্নে আপসহীন এই জাতির আজ কি হলো? কোথায় হারিয়ে গেছে বিশ্বখ্যাত স্বাধীনচেতা মুসলমানদের পরাজয় পরাভব না মানার অমিত তেজ ও সাহস? কেন একদল আফগান সোনালী অতীতকে ভুলে বিলাসিতা ও পার্থিব স্বার্থের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিলো? কেন হাজার হাজার প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা আজ ভূলুণ্ঠিত?

আসলে স্বাধীনতার প্রদীপ জাতির রক্ত পুড়িয়ে আলো বিকিরণ করে। সেই রক্ত আজ বিক্রি হয়ে গেছে। তাদের ঈমানী চেতনা আজ মরে গেছে। শহীদানের রক্ত শুষ্ক মাটি শুষে নিয়েছে, আর নিজেদের অদূরদর্শিতা স্বার্থান্ধতা এবং দলবাজীর মূল্য আজ বিশ্বের মুসলিম উম্মাহকে কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করতে হচ্ছে। ইতিহাসের প্রতি আমরা মোটেও সুবিচার করিনি। কল্পিত ইতিহাস সুলতান মাহমূদের প্রতিও চরম অবিচার করেছে। মুসলিম বিদ্বেষী ইসলামের শত্রুদের চরম বিজয় হয়েছে। যারা ছিল পৃথিবীর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ তাদেকেই তারা খুনী, সন্ত্রাসী লুটেরা হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। তারা মূর্তি সংহারীকেই মূর্তি পূজারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইসলাম বিদ্বেষীরা ইতিহাসের মুখে ছাই দিয়ে চরম মিথ্যাকে সত্য বলে এবং সত্যকে মিথ্যা বলে প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষাকে মুসলমানরা ভুলে গিয়েছে। আর মুসলিম বিদ্বেষী ইসলামের শত্রুরা এ বিষয়টিও মনে রেখেছে, কোন জনগোষ্ঠীকে তার অবস্থান থেকে নিচে নামাতে হবে এবং তাদের সুউচ্চ মর্যাদার আসন থেকে ভূতলে নিক্ষেপ করতে হবে। ইসলামের শত্রুরা সাফল্যের সাথে কঠোর পরিশ্রমী এবং আড়ম্বরহীন জীবন যাপনকারীদেরকে বিলাসী জীবনে অভ্যস্থ করেছে এবং জাগতিক জীবনকে ভোগবাদ ও বস্তুবাদের আধার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের প্রকৃত ইতিহাস থেকেও বিমুখ রাখার মিশনে দারুণ সাফল্য অর্জন করেছে। অজস্র প্রাণ ও রক্তের বিনিময়ে যে ইতিহাস ইসলামের বীর সৈনিকেরা নির্মাণ করেছিলো, সেই ইতিহাসকে মদের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে। সুন্দর ও স্বচ্ছ আবেগকে পাশবিকতার মোড়কে ঢেকে দিয়েছে। ফলে মুসলমানরা ভুলে গেছে কি ছিল তাদের স্বরূপ এবং কি ছিল তাদের কর্তব্য। তাই মুসলমানরা তাদের আসল গন্তব্য ভুলে গিয়ে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে চলতে শুরু করেছে। ফলে যে মাটি মুহাম্মদ বিন কাসিমের সঙ্গীরা জয় করেছিল, যে মাটিতে গযনীর বীর সেনানীদের গন্ধ মিশে গিয়েছিল, বীর সেনানীদের রক্ত ও

দেহের সেই গন্ধই তখনকার মুসলমানদেরকে কুফর ও বেঈমান শক্তির বিরুদ্ধে পাহাড়ের মতো দৃঢ়তায় মোকাবেলা করতে সাহস ও শক্তি যোগাতো।

সে জাতিই তার লব্ধ সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, যে জাতি তার শহীদানের রক্তে লেখা ইতিহাস ভুলে না গিয়ে শহীদানের গড়া ইতিহাস মিটে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। সে জাতিই তার ইতিহাসকে রক্ত ও আবেগ দিয়ে জীবন্ত রাখে, পূর্বসূরীদের ঐতিহ্যকে মুছে যেতে দেয় না। বরং পূর্বসূরীদের ঐতিহ্যকে উত্তরসূরীদের জন্য আরো স্থায়ী ও সমৃদ্ধ করে তোলে।

সুলতান মাহমূদ বাতিল ও ইসলাম বিদ্বেষীদের জন্যে ছিলেন এক জীবন্ত আতংক। সকল ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, সুলতান মাহমূদ ছিলেন সর্বকালের সেরা যোদ্ধা। তার সময়ে বর্তমান পাকিস্তানের মুলতান অঞ্চল কেরামতী নামের একটি ভ্রান্ত ও শিরক মিশ্রিত অনৈসলামিক গোষ্ঠীর আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। কেরামতীরা ওই অঞ্চলে বিরাট সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তারা সুলতান মাহমূদের জন্যে মারাত্মক বাধা হয়ে দাড়ায়। এই বাতিল জনগোষ্ঠীর শিকড় উপড়ে ফেলার জন্যে সুলতান মাহমূদকে একজন সাধারণ যোদ্ধার মতোই জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, কেরামতী বিরোধী লড়াইয়ে সুলতান মাহমূদ এমন কঠিন যুদ্ধ করেছিলেন যে, তার ডান হাত জমাটবাঁধা রক্তের কারণে তরবারীর বাটে আটকে গিয়েছিল। রক্তের পর রক্ত লাগতে লাগতে তা জমাট বেঁধে যায়। সুলতানের মুষ্ঠিবদ্ধ হাত তরবারীর বাট থেকে আলাদা করতে দীর্ঘ সময় গরম পানি ঢালতে হয়েছিল। দীর্ঘ সময় গরম পানি ঢালার পর জমাট বাধা রক্ত ধুইয়ে গেলে তরবারীর বাটে আটকে যাওয়া সুলতানের হাত আলাদা করা সম্ভব হয়।

আজো ইসলামের নামে কুফরী শক্তি মুসলিম বিশ্বকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। বিভ্রান্ত মুসলমানরা ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকদের ক্রীড়নক হয়ে সত্যিকার মুসলমানদের বিনাস সাধনে লিপ্ত। সুলতান মাহমূদের কবর আজ খ্রিস্টান, ইহুদী শক্তির ট্যাংক বোমারু বিমানের ছোড়া হাজারো বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত।

দুর্ভাগ্য ও পরিতাপের বিষয়, তৎকালীন ভারতে অসংখ্যবার অভিযান পরিচালনাকারী বীর মুজাহিদ সুলতান মাহমূদের অভিযানকে মাত্র সতেরোটি অভিযানে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাঁর বিশাল কৃতিত্বকে মুছে ফেলা হয়েছে। বস্তুত একজন খাঁটি সৈনিকের কৃতিত্বকে খাটো করে দেখানোর জন্যেই ইতিহাসের নামে এসব গল্প ফাঁদা হয়েছে। যেগুলোর সাথে বাস্তবতার কোন মিল

নেই। আমাদের কর্তব্য, এই ক্ষণজন্মা বীর যোদ্ধার প্রতিটি পদক্ষেপকে বর্তমান প্রজন্মের সামনে সঠিক ভাবে তোলে ধরা। তাহলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম বুঝতে পারবে, কতোটা বৈরী পরিবেশ ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ এই মর্দে মুজাহিদ ইসলামের জন্য কি বিশাল অবদান রেখে গেছেন। যা কেয়ামত পর্যন্ত যে কোন মুসলমানের জন্যে অনুপ্রেরণার উৎস।

১০২০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৪১২ হিজরী সনের বসন্তকালের শুরুর দিকে গযনী থেকে সুলতান মাহমূদের বাহিনী বন্যার মতো ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। গযনীর সেনা বাহিনীর গতি ক্ষিপ্র ছিল বটে। কিন্তু তাদের জনবল এতোটা ছিল না, যে পরিমাণ জনশক্তি নিয়ে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে কালাঞ্জর গোয়ালিয়র ও লাহোরের সম্মিলিত বাহিনী একত্রিত হয়েছিল। দৃশ্যত এই তিন রাজ্যের সেনা সংখ্যা ছিল গযনী বাহিনীর চেয়ে তিনগুণ বেশী।

সকল ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত, তিন রাজার সেনাদের মধ্যে এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছিল পদাতিক সৈন্য, ছত্রিশ হাজার অশ্বারোহী এবং ছয়শ চল্লিশটি ছিল জঙ্গি হাতি। সেই সময়কার ঐতিহাসিক ফারখী লিখেছেন, কালা র, গোয়ালিয়র ও লাহোরের সম্মিলিত সৈন্যদের মধ্যে এক লাখ বত্রিশ হাজার ছিল পদাতিক সৈন্য, ছয়ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী এবং নয়শ জঙ্গি হাতি।

উল্লেখিত সংখ্যার যে কোন একটিকে সঠিক মনে করলেও একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, গযনী থেকে এবার সুলতান মাহমূদ যে সৈন্য নিয়ে ভারতের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন তাদের সংখ্যা উল্লেখিত সংখ্যার চেয়ে অর্ধেকেরও কম ছিল।

সৈন্য সংখ্যা কম ছাড়াও সুলতান মাহমূদের জন্যে সবচেয়ে বেশী অসুবিধা ছিলো, এবার তিনি এমন এক জায়গায় মোকাবেলার জন্যে রওয়ানা হয়েছিলেন, যে জায়গাটি ছিল চতুর্দিক থেকে হিন্দুবেষ্টিত। এখানকার পরিবেশ, মাটি মানুষ সবই ছিল তার প্রতিকূলে।

কন্নৌজের রাজা রাজ্যপালের নিহত হওয়া এবং তিন রাজার ষড়যন্ত্রের কথা শুনে সুলতান মাহমূদ তার সেনাদের অভিযানের নির্দেশ দিয়ে দেন। অবশ্য গযনী সেনাদের জন্যে হিন্দুস্তানের একজন পরাজিত রাজার মৃত্যু তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। কিন্তু রাজা রাজ্যপাল গযনী সুলতানের অনুগত এবং মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ থাকার কারণে ব্যাপারটির রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। তার চক্রান্তমূলক হত্যার ব্যাপারটি ছিল সুলতান মাহমূদের জন্যে একটি পরিষ্কার বার্তা। যে বার্তা চোখে আঙুল দিয়ে বলে দিচ্ছিল, হিন্দুরা এবার সুলতান মাহমূদকে চ্যালেঞ্জ করার

জন্যে শক্তি সঞ্চয় করেছে। কন্নৌজে নিয়োজিত আব্দুল কাদের সেলজুকী তার পাঠানো সংবাদে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন যে, হিন্দুস্তানের হিন্দু রাজা মহারাজারা একত্রিত হয়ে গযনীর বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।

শায়খ আবুল হাসান কিরখানী ছাড়াও আবু সাঈদ আব্দুল মালেক নামের আরেকজন বিদগ্ধ আলেমেরও ভক্ত ছিলেন সুলতান মাহমূদ। তিনি গযনী থেকে অনেক দূরে বসবাস করতেন। সুলতান মাহমূদ তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্যে কয়েকবার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তাঁর কাছে গেছেন।

এবার সুলতান যখন হিন্দুস্তানে যাত্রা করলেন, যাত্রার দ্বিতীয় দিন অগ্রবর্তী বাহিনী থেকে এক কমান্ডার উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাঁকিয়ে সুলতানের কাছে এসে জানালো— আবু সাঈদ আব্দুল মালেক নামের একজন আলেম ও বুযুর্গ আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্যে পথিমধ্যে অপেক্ষা করছেন। এ খবর পেয়ে সুলতান তখনই ঘোড়ায় চড়ে আবু সাঈদের কাছে পৌছলেন এবং ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর কপালে চুমু দিয়ে মোসাফাহা করলেন।

গতকাল আমি জানতে পেরেছি আপনি হিন্দুস্তান যাচ্ছেন— বললেন আবু সাঈদ আব্দুল মালেক। দু'আ করছি আল্লাহ্ এ সফরে আপনাকে সাফল্য দান করুন। এখন আপনাকে আমি কিছু বলবো না। শুধু এতটুকু বলতে চাই, আপনি ইতিহাস রচনা করতে যাচ্ছেন। আপনার এই অভিযান আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য উজ্জ্বল অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এই যুদ্ধকে আপনি ব্যক্তিগত যুদ্ধে পরিণত করবেন না। মনে রাখবেন, রাজত্ব ও বাদশাহী এককভাবে আল্লাহ্ তাআলার। ক্ষমতা ও রাজত্বের নেশা মন থেকে বের করে দিন।

ক্ষমতা ও রাজত্বের নেশা এমন ভয়ংকর যে, এই নেশা যদি কাউকে পেয়ে বসে তাহলে সে দীন ধর্ম সবই ভুলে যায়। ক্ষমতালোভী শাসকরা একথাও ভুলে যায় মুহূর্তের মধ্যে তার মৃত্যু ঘটতে পারে। তাদের কানে মজলুম আর্তের আর্তনাদ পৌছে না। তাদের চোখ অন্ধ হয়ে যায়। প্রজাদের দুর্ভোগ দুর্দশা তাদের চোখে পড়ে না। ক্ষমতা পিপাসু শাসকেরা তাই দেখে এবং তাই শুনে যা তাদের তোষামোদকারী দরবারী মোসাহেবরা দেখায় এবং শোনায়। মোসাহেব ও তোষামোদকারীরা তাই শোনায় যার মধ্যে তাদের স্বার্থ জড়িত থাকে। সুলতান মাহমূদ মাথা নত করে আবু সাঈদ আব্দুল মালেকের কথা শুনছিলেন।

আবু সাঈদ আরো বললেন, আমি বেশী সময় আপনাকে আটকে রাখবো না সুলতান! আপনি কখনো ভুলে যাবেন না, দুনিয়ার সকল বেঈমানদের দৃষ্টি

আপনার উপর। কুফরী শক্তি আপনার মৃত্যুর জন্যে প্রহর গুনছে। আপনার মুসলমান প্রতিবেশীরাও আপনার মৃত্যু কামনা করে। এজন্য আপনার এমন প্রতিজ্ঞা করা উচিত, আপনি মরে গিয়েও যাতে অমর থাকেন। আপনি আপনার কাজ কর্মে অনুকরণীয় আদর্শ রচনা করে মানুষের হৃদয়ে জীবিত থাকবেন। আপনার এমন কাজ করতে হবে যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম আপনার আদর্শিক পথে চলে আপনাকে জীবন্ত রাখে। আপনি যদি হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকদের মাথা গুড়িয়ে দিতে না পারেন, তবে এরা যতো দিন পর্যন্ত হিন্দুস্তানে একজন মুসলমান জীবিত থাকবে ততো দিন পর্যন্ত মুসলিম নির্যাতন অব্যাহত রাখবে।

দুআ করুন হযরত! আল্লাহ্ তাআলা যেন আপনাদের প্রত্যাশা পূরণে আমাকে সফলকাম করেন— বললেন সুলতান মাহমূদ। এবার আমি সফল হলে হিন্দুস্তানে একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবো। সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক সেনাবাহিনীকেও রেখে আসবো।

আল বিদা মাহমূদ! দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে সুলতানকে বিদায় জানিয়ে বললেন আবু সাঈদ। আপনার সাফল্যের জন্যে আমরা কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করছি। দুআ করি আল্লাহ যেনো আপনার সঙ্গে থাকেন এবং আপনাকে সাহায্য করেন।

সুলতান মাহমূদ আবু সাঈদের হাতে চুমু খেয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেলেন।

সুলতান মাহমূদ জানেন, তার অগ্র-পশ্চাৎ ডানে বামে চতুর্দিকে শত্রু। তার সামনে দৃশ্যমান হিন্দু শত্রু আর পেছনে অদৃশ্য মুসলিম শত্রু। কিন্তু তার জানা ছিল না এবার প্রাণঘাতি শত্রু তার সফর সঙ্গী হয়ে তার কাফেলায় মিশে গেছে এবং তার সাথেই যাচ্ছে।

সুলতান মাহমূদ কয়েকজন সেলজুকীকে তার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ার কারণে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে ছিলেন। কারণ বংশানুক্রমে সেলজুকীরা ছিল লড়াকু। সেলজুকীরা ছিল বুখারার পাহাড়ী এলাকার অধিবাসী। সেলজুকীরা তুর্কি ও সামানীদের লড়াইয়ে সামানীদের পক্ষাবলম্বন করেছিল। অন্যভাবে বলা চলে, সামানীরা সেলজুকীদের উস্কানিতেই লড়াই করেছিল। এর পর থেকে সেলজুকীরা একটি সামরিক শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়।

সেলজুকী সরদার লুকমান সেলজুকীর ছেলে ইসরাঈল সেলজুকী বুখারা শাসকদের কাছে যথেষ্ট মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী ছিল। বুখারার শাসক আলাফতোগীনের খুবই প্রিয় পাত্রে পরিণত হয় ইসরাঈল সেলজুকী। তাদের

মধ্যে গড়ে উঠে গভীর হৃদ্যতা। সুলতান মাহমূদ যখন এই কুচক্রীদের দমন করার জন্যে বুখারা আক্রমণ করেন তখন এরা উভয়েই পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

অপর দিকে পূর্ব তুর্কিস্তানের এলিকখান ছিল একটি শক্তিশালী রাজ্যের শাসক। সে সব সময় কাউকে না কাউকে সাথে নিয়ে সুলতান মাহমূদের বিরোধিতায় লিপ্ত থাকতো। কিন্তু যতো বার এলিকখান সুলতান মাহমূদের মুখোমুখী হয়েছে ততোবারই মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য হয়েছে।

সর্বশেষ পরাজয়ের পর এলিকখান যখন তার পরিবার পরিজন নিয়ে পাহাড়ী এলাকায় আত্মগোপন করেছিল তখন ইসরাঈল সেলজুকী এলিকখানের সাথে সাক্ষাত করতে গেল। সর্বশেষ লড়াইয়ে ইসরাঈল সেলজুকীর নেতৃত্বাধীন সেলজুকী উপজাতিরাও এলিকখানের সহযোগী ছিল না।

এলিকখান সবুজ ঘেরা মনোরম প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত পাহাড়ী এলাকায় তাঁবু গেড়ে অবস্থান করছিল। ইসরাঈল সেলজুকী তাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে পৌছে গেল। এলিকখানের তাঁবুতে সুন্দরী নারীও ছিল। নর্তকী ও গায়িকাও ছিল তার সাথে। রাজ প্রাসাদের বিলাসবহুল সব ধরনের আসবাব পত্র ছিল এলিকখানের তাঁবুতে। ইসরাঈল সেলজুকী যখন সেখানে উপস্থিত হলো, তখন এলিকখান তার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। এলিকখানের তাঁবুটি ছিল ছোটখাটো একটা রাজ প্রাসাদের মতো।

এলিকখান পূর্ব থেকেই ইসরাঈল সেলজুকীকে চিনতেন। ইসরাঈল সেলজুকী একজন আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী তাগড়া যুবক। অত্যন্ত মোহনীয় দেহ সৌন্দর্যের অধিকারী ব্যক্তিত্বান তরুণ। ইসরাঈল সেলজুকী ছিল তার গোত্রের সর্দার। তখন সেলজুকী গোত্র ছিল একটি আলোচিত সামরিক শক্তি।

এখন আমার কাছে কেন এসেছো ইসরাঈল? ইসরাঈল সেলজুকীকে জিজ্ঞেস করলেন এলিকখান।

রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসা নেতাদের অবস্থা নিজ চোখে দেখতে এসেছি। তারা কেমন থাকে– কিছুটা তীর্যক ভাষায় জবাব দিলো ইসরাঈল।

আপনার হয়তো এজন্য আমার প্রতি ক্ষোভ আছে, আমি আপনার কোন উপকার করিনি, তাই না? আমিও কিন্তু একথা বলতে পারি, আপনিও আমার কাছে কোন ধরনের সহযোগিত চাননি। আপনি কি নিজেকে এতোটাই শক্তিশালী ভেবে বসেছিলেন যে, আমার সহযোগিতা ছাড়াই আপনি গযনীর মাহমূদকে পরাজিত করতে পারবেন?

আমার বলার প্রয়োজন হবে কেন? তোমার তো নিজ উদ্যোগেই আমার সহযোগিতায় এগিয়ে আসা উচিত ছিল— বললেন এলিকখান।

আসলে ব্যাপারটিতো আপনি এখন যে ভাবে বলছেন তেমন ছিল না। আপনি হয়তো তখন চেয়েছিলেন আমার সহযোগিতা ছাড়াই আপনি সুলতান মাহমূদকে পরাজিত করে গযনী ও বুখারার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যাবেন। অথচ সামানীরা আমার সহযোগিতা ছাড়া কখনো তুর্কিদের পরাজিত করতে পারেনি। সেলজুকীরা যখন সামানীদের সঙ্গ ত্যাগ করেছে তখন সামানীদের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে গেছে। সেই যে তুর্কিরা সেলজুকীদের হাতে মার খেয়েছিল আজ পর্যন্ত সেলজুকীদের নাম শুনলে তুর্কিদের ভয়ে শরীর কাঁপে।

তুমি কি আমাকে পরাজয়ের জন্য তিরস্কার করতে এসেছো? তুমি কি আমাকে দেখতে এসেছো আমি এই পরাজয়ের পর কতোটা দুর্বল হয়ে পড়েছি? বললেন এলিকখান।

না, না, এলিকখান! এতটুকু পরাজয়ে আপনি এতোটা হীনমন্যতার শিকার হবেন না যে, দোস্ত-দুশমনের ভেদাভেদ গুলিয়ে যাবে। মনে রাখবেন, আমাদের শত্রু অভিন্ন। গযনীর মাহমূদ উভয়ের শত্রু। আপনি একাকি ওকে পরাজিত করতে পারবেন না। ইচ্ছা করলে সেলজুকীরাই তাকে পরাজিত করতে পারে। আমি এখন আপনার সাথে এজন্য সাক্ষাত করতে এসেছি মাহমূদের বিরুদ্ধে আপনি আমাদের কতটুকু সহযোগিতা করতে পারেন। আপনি কি আমাদের সৈন্য দিয়ে সহযোগিতা করতে পারবেন?

আপনি সহযোগিতা না করলেও আমি মাহমূদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। আলাফতোগীন আছে আমার সঙ্গে।

মাথা ঠিক করে কথা বলো ইসরাঈল– কিছুটা তাচ্ছিল্যমাখা কণ্ঠে বললেন এলিকখান। এ পর্যন্ত তোমাদের ইতিহাস হলো অন্যদের তোমরা সহযোগিতা করেছো, এবং সহযোগী হিসেবেই লড়াই করেছো। মূল শক্তি হিসেবে লড়াই করোনি। তোমরা মাহমূদের সৈন্যদের সাথে কখনো মুখোমুখি লড়াই করোনি। মাহমূদ জঙ্গি চালে তার চেয়ে তিনগুণ বেশী শক্তিশালী বাহিনীকেও পরাজিত করতে সক্ষম। তার সৈন্যরা কঠিন সংকটেও কখনো বেসামাল হয় না। দীর্ঘ প্রশিক্ষিত ঘোড়ার মতোই আমৃত্যু লড়াই করে। ওরা সামান্য ইঙ্গিতেই বিদ্যুতের গতিতে জায়গা বদল করে কিন্তু আমাদের সৈন্যদের এই গুণ নেই।

এলিকখান! আমি বুঝতে পারছি এবারের পরাজয়ের ক্ষত আপনার রগরেশায় ঢুকে পড়েছে। আতংক ভর করেছে আপনার মনে। মনে হচ্ছে আপনার

কাছে সহযোগিতা প্রত্যাশা করাই উচিত হবে না। যদি খান সর্দারের মনেই এমন আতংক বাসা বেঁধে থাকে তবে খানদের সৈন্যরা তো ভয়ে কম্পমান।

জেনে রাখুন এলিকখান! আমি মাহমূদের বিরুদ্ধে লড়াই করবোই। ওকে আমি আর বাড়তে দেবো না। হিন্দুস্তানের ধন-দৌলত ওকে বিরাট শক্তিশালী করে দিচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে সমরকন্দ বুখারা বলখ তুর্কিস্তান খাওয়ারিজম সবই এক সময় তার দৌলতের গোলামী করতে শুরু করবে। আর অপরাধীর মতো দুর্গম পাহাড়ে আমাদেরকে লুকিয়ে থাকতে হবে।

আমি তো শুনেছি, তোমার সেলজুকী গোত্রের কিছু লোক মাহমূদের সেনা বাহিনীতেও নাকি ঢুকেছে? বললেন এলিকখান।

হ্যা, কয়েকজন সেলজুকীকে ধনসম্পদের লোভ দেখিয়ে কিনতে সক্ষম হয়েছে মাহমূদ। এখন তো তার বাহিনীতে একজন সেনাপতিও সেলজুকী। আব্দুল কাদের নামের এই সেলজুকী শুধু সেনাপতি নয়, হিন্দুস্তানের শাসকও বটে।

তুমি স্বগোত্রের এই লোকগুলোকে নিজ গোত্রে ফিরিয়ে আনতে পারবে না?

আরে, একথা না বলে বলুন যে, তুমি এই সেলজুকীদের হাতে মাহমূদকে হত্যা করতে পারো না? আরে খান! লড়াই শুধু রণাঙ্গনেই হয় না, দেয়ালের আড়ালের লড়াই আরো বেশী শক্ত। আমি মাহমূদকে তার সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকীর হাতেই মারার আয়োজন করেছি। কিন্তু এর আগে একবার আমি তার সাথে ময়দানের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে চাই। যদি পরাজিত হই তাহলে মাহমূদকে হত্যা করার জন্যে সেলজুকী সৈন্যদের ব্যবহার করবো— বললো ইসরাঈল সেলজুকী।

শরাবের পেয়ালা একের পর এক গলদকরণ করছে দুই সর্দার। এলিকখানের সুন্দরী রক্ষিতা দু'জন শরাবের পেয়ালা ভরে দিচ্ছে। এলিকখানের ডানে বামে আরো তিন চারজন রূপসী বসা। ইসরাঈল সেলজুকী এই সুন্দরীদের মতো এতোটা রূপ জৌলুসের অধিকারী না হলেও সুঠাম শক্তিশালী টববগে যৌবনের অধিকারী একজন আকর্ষণীয় যুবক। শরাবের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সে বললো— আমি স্বপ্নে জাগরণে সব সময় নিজেকে গযনীর শাহী কুরসীতে আসীন দেখতে পাই।

ঠিক আছে, দেখা যাবে গযনীর তখতে কে বসে? তুমি ক'দিন আমার এখানে আতিথ্য গ্রহণ করো। মেহমান হিসেবে কয়েক দিন তার এখানে থাকার জন্যে ইসরাঈলকে আমন্ত্রণ জানালেন এলিকখান।

চাঁদনী রাতে রকমারী বুনো ফুলের মনোমুগ্ধকর গন্ধে আনমনে পায়চারী করছিল ইসরাঈল। হাটতে হাটতে সে তার জন্যে নির্ধারিত তাঁবু থেকে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল। এক সময় ইসরাঈল অনুভব করলো, সে একাকী নয়, তার পেছনে কেউ না কেউ আছে।

অতি সন্তর্পণে সে তার খঞ্জরের উপর হাত রেখে আঁড় চোখে এপাশ ওপাশ দেখতে চেষ্টা করলো। সে অনুভব করলো, একটি ছায়ামূর্তি গাছগাছালির ভেতর থেকে এগিয়ে আসছে। তার মনে হলো, ছায়া মূর্তিটি কোন পুরুষের নয়। ইসরাঈল নিঃশংক গলায় জিজ্ঞেস করলো, কে তুমি?

আমি মারয়াম! এগিয়ে এসে বললো এক নারী মূর্তি।

ভয় পাওয়ার কিছু নেই! আমি এলিকখানের ভাতিজী মারয়াম। ইসরাঈল গভীরভাবে তার দিকে তাকিয়ে বললো— আমার তো মনে হয় গতকাল এলিকখানের পাশে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে তুমিও ছিলে। তো এখানে কেন এসেছো?

এটা কি জিজ্ঞেস করার কোন বিষয় হলো? বললো মারয়াম। ভুল বোঝার আগেই আমি আপনার ভুল ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে বলছি— আপনার সুঠাম দেহ আর সর্দারীর মোহে আমি আপনার কাছে আসিনি। আমি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে আপনার সংকল্পে মুগ্ধ হয়ে আপনাকে মোবারকবাদ জানাতে এবং উৎসাহিত করতে। দেখুন, আমি একজন কুমারী মেয়ে। তা ছাড়া আমি খানদের আভিজাত্যের অংশ। কিন্তু খানদের আভিজাত্য মান-মর্যাদা সবই এখন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। চাচা এলিকখান এবারের পরাজয়ের পর মনোবল হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু আমার আত্মমর্যাদাবোধ চাচার এই মনোবল হারানোকে মেনে নিতে পারছে না।

আচ্ছা? গযনীর মাহমূদ কি কোন জিন-ভূত না দৈত্য দানব? যে ব্যক্তি এই মাহমূদকে পরাজিত করে এমন পাহাড়ে পাহাড়ে লুকিয়ে বেড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারবে তার জন্যে আমার সব কিছু কুরবান করে দিতে প্রস্তুত আমি। আমি দেখেছি, আপনার মধ্যে সেই সংকল্প আছে। এজন্য আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে।

আচ্ছা, তাই নাকি? মাহমূদের সাথে শাহজাদীর দুশমনি কেন?

কেন নয়? ইসরাঈল সেলজুকীর সাথে মাহমূদের কি নিয়ে দুশমনী? আপনার সাথে যে কারণে মাহমূদের শত্রুতা, আমার সাথেও এ কারণেই মাহমূদের শত্রুতা।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। এসো এসো, আমরা এক জায়গায় বসে কথা বলি। আসলে শত্রু শত্রুই। কেন শত্রুতা, কেন দুশমনি, এসব বিষয় শত্রুকে পরাজিত করার পরই কেবল আলোচিত হতে পারে।

মারয়াম! তুমি অল্প বয়সী কুমারী তরুণী বটে কিন্তু তোমার চিন্তা ভাবনা আনাড়ী নয়, তুমি তো বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতো কথা বলছো। এতো বিদ্যা বুদ্ধি তুমি কোথায় পেলে?

আরে, প্রয়োজনেই মানুষ বিজ্ঞ হয়ে ওঠে। আমিও প্রয়োজনের তাকিদেই এমনটা হয়ে উঠেছি।

এরপর তারা দু'জন একটি বড় গাছের নীচে বসে কথা বলতে শুরু করলো। দীর্ঘক্ষণ নানা বিষয়ে কথা বলার পর পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেল। এক পর্যায়ে ইসরাঈল মারয়ামকে বললো—

এলিকখানের সাথে কি তোমার ব্যাপারে কথা বলবো?

তোমার মন চাইলে বলো, আমার কোন সমস্যা নেই। তিনি সম্মত না হলেও আমি তোমার কাছে চলে আসবো। তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। আমি আমার ভবিষ্যত তোমার সাথেই বেঁধে ফেলেছি ইসরাঈল! বহুদিন ধরে আমি তোমার মতো দৃঢ়চেতা একজন বীর পুরুষের খোঁজ করছিলাম। আমার স্বপ্নগুলো যার মাধ্যমে বাস্তব রূপ দেয়া সম্ভব। সুলতান মাহমূদকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্যে তুমি আমাকে যে ভাবে ইচ্ছা কাজে লাগাতে পারো, আমাকে সব সময় প্রস্তুত পাবে।

ইসরাঈল এলিকখানের সান্নিধ্যে তিন রাত থাকলো। তিন রাতেই মারয়াম অতি সংগোপনে ইসরাঈলের সাথে সাক্ষাত করলো। শেষ রাতে তারই এক সমবয়সী তরুণী আম্বরীকে মারয়াম ইসরাঈলের সাথে সাক্ষাতের সময় সঙ্গে নিয়ে এলো। মারয়াম যখন ইসরাঈলের সাথে কথা বলতে গেলো, তখন আম্বরী একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরের দিন ইসরাঈল সেলজুকী চলে গেল।

ইসরাঈল চলে যাওয়ার পর আম্বরী মারয়ামকে বললো— তোমার পছন্দ ঠিকই আছে মারয়াম! ইসরাঈলই তোমার জন্যে যোগ্য ব্যক্তি। এমন পুরুষই তোমার প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু একটা কথা মারয়াম! ইসরাঈলকে বিয়ে করে তুমি সুলতান মাহমূদের সাথে শত্রুত তৈরী করছো। অথচ চাচা এলিকখান বলেছেন, তিনি প্রয়োজনে মাহমূদের খান্দানে মেয়ে বিয়ে দিয়ে হলেও তার সাথে মৈত্রী গড়ে তুলবেন। তুমি কি একথা শোননি?

আরে, রাখো এসব কথা। এসব কথাই তো প্রমাণ করে তিনি জীবনের জন্যে হার মেনে নিয়েছেন। এগুলো তার পরাজয়ের পরিণতি। চাচা সুলতান মাহমূদকে এতোটাই ভয় পাচ্ছেন যে, নিজ খান্দানের মেয়ে দিয়ে হলেও তার সঙ্গে আপস করতে চান। কিন্তু ইসরাঈল সেলজুকী আপসহীন। সে কোন অবস্থাতেই মাহমূদের সাথে মৈত্রী করবে না। বললো মারয়াম—

মৈত্রী হয়তো করার সুযোগই পাবে না, পরাজিত হয়ে দৌড়ে পালাবে। কিছুটা তীর্যক কণ্ঠে মারয়ামের উদ্দেশে বললো আম্বরী। দেখবে ইসরাঈলেরও সেই একই পরিণতি হবে যা এলিকখানের হয়েছে। যে পরিণতি কাদের খানের হয়েছে, খাওয়ারিজম শাহীর হয়েছে, কারামতীদের হয়েছে। তোমার সেলজুকী বাহাদুরেরও একই পরিণতি বরণ করতে হবে মারয়াম!

আরে দেখে নিয়ো, ইসরাঈল সবার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে। কিছুটা গর্বিত কণ্ঠে বললো মারয়াম। আম্বরী! তুমি এমন ভাবে কথা বলছো, যাতে গযনী শাসকদের গোলামী ও পরাজয়ের গন্ধ আসে।

আরে শাহজাদী! তুমি আমার কথায় গযনী শাসকদের গোলামী আবিষ্কার করছো কেন, এটা ইসলামের গোলামী বলো। দেখো, তোমরা এই পার্থিব দুনিয়ার কথা বলো, আর আমি সেই দুনিয়ার কথা বলি, মৃত্যুর পর যে দুনিয়াতে আমাদের সবাইকে যেতে হবে। দেখো, মুসলিম শাসকরা পরস্পর লড়াই করে কি পেয়েছে? আসলে তো সেই সম্ভাবনাময় শক্তিকেই বিনষ্ট করছে যে শক্তি ইসলামে শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যয় করার কথা ছিল। খান আর সেলজুকীরা মিলিত হয়ে যদি সুলতান মাহমূদকে পরাজিতও করে তবুও প্রকৃত জয় খান আর সেলজুকীদের হবে না, শক্তিশালী হবে ইসলামের বিরোধী শক্তি।

হেসে ফেললো মারয়াম, তার হাসিতে বিদ্রূপ। সে বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বললো— তোমার মুখে সব সময় ইসলাম ইসলাম। ইসলামের কথা বলতে বলতে তুমি মারা যাবে আম্বরী! তুমি বিশ্বাস করো, একদিন না একদিন আমি গযনী সিংহাসনের রাণী হবো। আর তুমি হবে কোন বুড়ো সেনাপতির বিবি। অবশ্য আমি সেটা হতে দেবো না। তোমাকে আমি তোমার মতোই সুন্দর সুপুরুষ কোন যুবকের সাথে বিয়ে দেবো। সে হবে এমন যুবক যার থাকবে অঢেল সম্পদ আর ক্ষমতা।

আর ইসরাঈল সেলজুকী হবে গযনীর বাদশা। তাই না? তীর্যক কণ্ঠে বললো আম্বরী।

হ্যাঁ আম্বরী! সে তো এখনো বাদশা। তবুও তার সেই সিংহাসন চাই যে সিংহাসনে সুলতান মাহমূদ বসে।

তুমি জেগে জেগে দিবা স্বপ্ন দেখছো মারয়াম!

তুমি হয়তো ঠিকই বলছো আম্বরী! আসলেও আমি স্বপ্নময় ঘোরের মধ্যে আছি। ইসরাঈলকে আমার স্বপ্নগুলোর বাস্তব রূপকার মনে হচ্ছে। জানো, সেই ছোট্ট বেলা থেকেই আমি রানী হওয়ার স্বপ্ন দেখি। রাণী আমাকে হতেই হবে। মাথার উপর রাণীর মুকুট রাখার জন্যে আমি যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি।

* * *

তিন দিন এলিকখানের আতিথ্য গ্রহণ করার পর ফিরে যাওয়ার সময় মারয়ামকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিল ইসরাঈল সেলজুকী।

ইসরাঈলের কথা শুনে এলিক খান বললো— ঠিক আছে ইসরাঈল! মারয়াম তোমাকে পছন্দ করেছে এ খবর আমার অজানা নয়! মারয়ামের বাবাও তোমার কাছে তার মেয়েকে তোলে দেয়ার ব্যাপারে আমাকে অনুমিত দিয়েছে। কিন্তু ইসরাঈল! তোমাকে এই অঙ্গীকার করতে হবে, সুলতান মাহমূদকে পরাজিত করে আমার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তুমি সব ধরনের ঝুঁকি নিতে এবং ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবে।

বয়সের কারণে আর বন্ধুরা আমার সাথে বেঈমানী করার কারণে আমার পক্ষে মাহমূদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব হয়নি। এক পর্যায়ে তো আমি একথাও চিন্তা করেছিলাম, মাহমূদের সাথে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক করে বাকী জীবনটা নির্বিবাদে আরামে কাটানোর ব্যবস্থা করবো। কিন্তু শেষ জীবনে তুমি আমার কাছে আশার আলো হয়ে এসেছো। ইচ্ছা করলে তুমি আমার শেষ জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারো। আমাকে নতুন জীবন দান করতে পারো।

মারয়াম আমার খুব প্রিয়। ছোট্ট বেলা থেকেই সে বলে আসছে সে হবে রাজরাণী। আশা করি তুমি তার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে পারবে।

আপনার প্রত্যাশা আর মারয়ামের রাণী হওয়ার স্বপ্ন আমি পূর্ণ করবো— বললো ইসরাঈল সেলজুকী। এখন পর্যন্ত আমি কখনো মাহমূদের মুখোমুখি হইনি। প্রথমবার তার মুখোমুখি হয়ে যদি সুবিধা করতে না পারি তবে পিছিয়ে আসবো। দ্বিতীয় বারেও যদি আমি তাকে পরাজিত করতে না পারি তাহলে অন্য কৌশল অবলম্বন করবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! আপনার জীবদ্দশাই মাহমূদের পতন ঘটবে। আমার হাতেই তার পতন ঘটবে।

ইসরাঈল সেলজুকী দুঃসাহসী চাতুর্যপূর্ণ কিছু কথাবার্তা বলে এলিকখানের মন থেকে পরাজয়ের আতংক দূর করে দিল এবং মারয়ামকে তখনই বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলো।

* * *

এদিকে নিজ কবিলায় ফিরে আসার আগেই সেলজুকী গোত্রের লোকেরা খবর পেয়ে গেল গোত্র সর্দার ইসরাঈল সেলজুকী নতুন বউ নিয়ে আসছে। আর এই বউ কোন সাধারণ কবিলার মেয়ে নয়, অভিজাত খান শাসক গোষ্ঠী এলিকখানের আপন ভাতিজী।

এলিকখান যদিও পরাজিত ও বিপথগামী এক সরদার ছিল, কিন্তু সেই সময় সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটাও বিরাট সম্মানের বিষয় ছিল। কারণ, সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া সাধারণ ব্যাপার ছিল না। কোন বীরপুরুষের পক্ষেই এমন দুঃসাহসিক উদ্যোগ নেয়া সম্ভব ছিল। এ জন্য তদঞ্চলে এলিকখানকেও একজন সাহসী যোদ্ধা হিসেবে সম্মানের চোখে দেখা হতো।

এদিকে পাহাড়ী এলাকায় সেলজুকীরা গোত্রপতির বিয়ের খবর শুনে গোত্রের সকল লোক একত্রিত হলো। সারি সারি ছাগল, বকরী, উট জবাই হলো। জবাইকৃত পশুর রক্তে নদী বয়ে গেল। রাতভর চললো আমোদ ফূর্তি ও খানাপিনা।

পানাহার ও আমোদ ফূর্তির পর মারয়ামকে সাথে নিয়ে ইসরাঈল একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে গোত্রের লোকদের বললো— হে সেলজুকী সম্প্রদায়ের লোকেরা! শোন, আজ আমি তোমাদের সামনে এমন এক মহান শাহজাদীকে হাজির করেছি, যে সুলতান মাহমূদের রাজ প্রাসাদের প্রতিটি ইট খোলে ফেলার অঙ্গীকার করেছে। শাহজাদী মারয়ামকে তোমরা যেমন রূপের অধিকারী দেখছো, সে ততোটাই গুণ ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারীনী। সেলজুকী সিংহরা! গযনীর প্রাসাদ থেকে প্রতিটি ইট খোলে ফেলার ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে থাক?

একথা শোনে সেলজুকী গোত্রের লোকেরা শ্লোগানের শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুললো।

ইসরাঈল সেলজুকীদের উসকে দেয়ার জন্যে বললো— হিন্দুস্তানের লুণ্ঠনকারী আজও সেলজুকী সিংহদের রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে। আজ তোমরা প্রতিজ্ঞা করো, মাহমূদকে চির নিদ্রায় না পাঠিয়ে তোমরা আর বিছানায় পিঠ লাগাবে না। এখন আমাদের গন্তব্য হবে গযনী।

হে সেলজুকী সিংহরা! ভুলে যেয়ো না তোমাদের কোন ভূখণ্ড নেই। দুনিয়াতে এমন জায়গা নেই, যেটিকে সেলজুকীরা নিজের দেশ বলতে পারে। আমরা জংলী জীব জন্তুর মতো পাহাড়ে জঙ্গলে যাযাবরের মতো বসবাস করছি। অথচ অস্ত্র ও জনবলের দিক থেকে আমরা মোটেও দুর্বল নই। আমরা একটি শক্তি! আমাদের একটা জনগোষ্ঠী আছে। আমাদের আছে প্রচুর সংখ্যক সাহসী যোদ্ধা। আমাদের শক্তিকে অন্যেরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করছে। ইতোমধ্যে আমাদের জনগোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছে। কয়েকজন সেলজুকী গযনীর সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

সুলতান মাহমূদ তাদেরকে হিন্দুস্তানের লুট করা সম্পদের লোভ দেখিয়ে কিনে নিয়েছে। মাহমূদ ইসলামের নামে সবাইকে ধোঁকা দিচ্ছে। অথচ ইসলামের প্রকৃত প্রহরী আমরা। তবে আমরা আগে সেলজুকী, তারপর মুসলমান। মাহমূদ ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন। সে নিজেকে মূর্তি সংহারী বলে প্রচার করে। অথচ বাস্তবে সে নিজেকেই জীবন্ত মূর্তিতে পরিণত করেছে। মাহমূদ আমাদের সবাইকে তার পায়ে সিজদা দিতে বাধ্য করতে চায়। আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করতে রাজি নই। সেলজুকী সিংহরা! আজ তোমরা তোমাদের তরবারীকে তীক্ষ্ণ করে তোলো। প্রস্তুত হয়ে যাও, আমাদের পরবর্তী উৎসব হবে বিজয় উৎসব।

গোত্রপতি ইসরাঈলের ভাষণের পর সেদিন থেকেই পাহাড়ে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ প্রস্তুতি। নিক্ষেপযোগ্য বর্শা তৈরী হতে থাকল। অনেকে তীর ধনুক বানাতে লেগে গেল। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেলজুকীদের একত্রিত করা শুরু হলো। এক মাসের মধ্যে তৈরী হয়ে গেল একটা বিরাট বাহিনী।

ইসরাঈল সেলজুকী এলিকখানের সেনাবাহিনী থেকেও কিছুসংখ্যক সৈন্য তার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করলো। এলিকখানের সৈন্যদের সাথে তার ছেলে আহমদ তোগাখান কমাণ্ডার হিসেবে যোগদান করলো।

গযনী বাহিনীতে আরবাব খান সেলজুকী নামের এক ব্যক্তি একটি সেনা ইউনিটের কমান্ডার ছিল। একদিন তার বাবা তার সাথে সাক্ষাত করতে এলেন। আরবাব খানের বাবা শুধু ছেলের সাথে সাক্ষাত করতে আসেননি, তিনি সাক্ষাতের পাশাপাশি একথাও জানাতে এলেন সেলজুকীরা সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেই সাথে সেলজুকী নেতারা বলছে, যে সব সেলজুকী গযনী বাহিনীতে রয়েছে তাদের উচিত, গযনী বাহিনী ত্যাগ করে ইসরাঈল সেলজুকীর নেতৃত্বে মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এরা যদি তা না করে তাহলে গোত্রের সাথে বেঈমানীর জন্যে কাফের হয়ে মারা যাবে।

আরবাব খান তার বাবার কাছ থেকে ইসরাঈল সেলজুকীর যুদ্ধ প্রস্তুতির বিস্তারিত শোনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আরবাব খান তার উর্ধ্বতন সেনাপতির কাছে গিয়ে জানাল— সেলজুকী গোত্রপতি ইসরাঈল সেলজুকী গযনী সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ খবর এখনই সুলতানকে জানানো উচিত মাননীয় সেনপতি!

কিছুক্ষণ পর আরবাব খান ও তার পিতাকে সুলতানের সামনে হাজির করা হলো।

আমি তোমার ছেলের নৈতিকতাকে শ্রদ্ধা জানাই। কারণ সে তার বাবাকে আসামী করে আমার সামনে হাজির করেছে। আমি বুঝতে পারছি না তাকে কি পুরস্কার দিব? অবশ্য প্রকৃত পুরস্কার তাকে আখেরাতে আল্লাহ তাআলা দিবেন। আরবাব খানের পিতার উদ্দেশ্যে বললেন সুলতান মাহমদু।

সেলজুকী বৃদ্ধ ভয় ও আতংকে কাঁপতে লাগলো। সে আশংকা করছিল কঠিনতম কোন শাস্তি তাকে দেয়া হবে।

যাকে কেউ সত্য পথের সন্ধান দেয়নি, সে যদি বিপথগামী হয়, তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না। আজ তোমার ছেলে তোমাকে সত্য পথ দেখিয়েছে। এখন তুমি আমাকে বলো, ইসরাঈল সেলজুকী কি ধরনের যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছে? আরবাব খানের বাবার উদ্দেশ্যে বললেন সুলতান। তিনি আরো বললেন, তুমি যদি সেলজুকীদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ও তাদের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে কোন কথাই না বল তবুও আমরা তোমাকে জেলখানায় বন্দি করবো না। কারণ, তুমি আমাদের সম্মানিত মেহমান। আমরা তোমাকে সম্মানের সাথে মেহমানদারী করবো। আমরা তোমাকে সসম্মানে বিদায় দেবো। যাতে তুমি বুঝতে পারো, কারা সত্যের অনুসারী। কারা ইসলামের সঠিক আদর্শের অনুগত। আর কারা ইসলামের নামে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তুমি কি সত্য গোপন করে আল্লাহর বিরুদ্ধে যাবে?

সুলতানের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো আরবাব খান। সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো— গোস্তাখী মাফ করবেন সুলতান! আমার বাবা যদি সত্য কথা না বলে, তাহলে আপনার সামনেই তার মাথা কেটে আপনার পায়ে সোপর্দ করবো।

থামো আরবাব খান! তুমি আমার সাথে কোন গোস্তাখী করোনি। গোস্তাখী করেছো তোমার বাবার সাথে। বেচারা তো ইসলামের একটি দিক দেখেছে, তাকে ইসলামের প্রকৃতরূপ দেখার সুযোগ দাও। উচ্চ কণ্ঠে বললেন সুলতান।

বৃদ্ধ সুলতানের কথায় এতোটাই মুগ্ধ হলো যে, সামনে অগ্রসর হয়ে হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে পড়লো এবং কোমর থেকে তরবারী খোলে সুলতানের পায়ের কাছে রেখে বললো— সেলজুকী গোত্রপতি ইসরাঈল খান এলিক খানের ভাতিজীকে সম্প্রতি বিয়ে করে নিয়ে এসেছে এবং এলিকখানের কিছু সৈন্য সাথে নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল সেলজুকী উপজাতিদের একত্রিত করে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সুলতান মাহমূদ আরবাব খানের বাবার সাথে দীর্ঘ সময় কথা বলে প্রয়োজনীয় সব তথ্য জেনে নিলেন এবং তার কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিলেন– এই মুরুব্বীর জন্য শাহী মেহমান খানায় যাবতীয় আপ্যায়ন ও মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা হোক।

বৃদ্ধকে মেহমানখানায় পাঠিয়ে দিয়ে সুলতান আরবাব খানকে কিছু পুরস্কার দিয়ে বললেন— তুমি নিজেকে ইসরাঈলের বিশ্বস্ত লোক ঘোষণা দিয়ে ওখানে কিছু দিন থাকবে। সব কিছু জানা ও দেখা হয়ে গেলে সুযোগ মতো চলে আসবে।

এই ঘটনার পনেরো দিন পর আরবাব খান সেলজুকীদের খবর নিয়ে সুলতানের কাছে ফিরে এলো। সে এসেই সুলতানকে ইসরাঈল সেলজুকীর যাবতীয় প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দিল।

সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীতে দু'জন ছিলেন সেলজুকী সেনাপতি। এদের একজন আরবাব খানের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে প্রশংসা করলেন। আরবাব খান ছাড়াও আরো দু'জন সেলজুকী ছিলেন গযনী বাহিনীর কমান্ডার। একজন সেনাপতি তাদের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করলেন। সুলতান এই দু'জন সেলজুকী কমান্ডারকে ডেকে বললেন, তোমরা দু'জন ইসরাঈলের কাছে চলে যাও। তাকে কৌশলে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এদিকে নিয়ে এসো।

দুই কমান্ডার সেলজুকীদের কাছে গিয়ে কি ভূমিকা রাখবে এবং কখন কি উদ্যোগ নেবে এ ব্যাপারে তাদের বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দিয়ে ইসরাঈলের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে সুলতান সেনাপতিদের ডেকে নির্দেশ দিলেন, যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে সেনাদেরকে বুখারার পাহাড়ী অঞ্চলে রওয়ানার জন্য তৈরী করুন।

* * *

১০১৭ সালের ঘটনা। সেলজুকী বাহিনীর যোদ্ধারা তিরমুজ নামক স্থান দিয়ে ককেসাস নদী পার হলো।

সেলজুকীরা ছিল প্রকৃত অর্থেই লড়াকু জাতি। ফলে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তারা বন্যার পানির মতোই ধেয়ে আসছিল। সেলজুকীরা ছিল উপজাতি।

তাদের নিজস্ব কোন সরকার ব্যবস্থা ছিল না এবং ছিল না প্রথাদুরস্ত প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী। ফলে সেলজুকীরা যে পথে অগ্রসর হচ্ছিল সকল জনপদ তারা লুণ্ঠন করে এবং লোকদের মাঠের ফসল তাদের ঘোড়া উট দিয়ে মাড়িয়ে আসছিল।

তিরমুজ থেকে ষাট মাইল এগুলে আহাঙ্গরা পাহাড়ী এলাকা। সেলজুকী বাহিনী সুলতান মাহমূদের পাঠানো দু'জন প্রশিক্ষিত কমান্ডারের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছিল। আহাঙ্গরা পাহাড়ী এলাকায় এসে সেলজুকী বাহিনী একটি জায়গায় তাঁবু ফেললো। সুলতানের দুই কমান্ডার ইসরাঈল সেলজুকীকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিল, যে এলাকায় সুলতানের সেনাবাহিনী নেই, তারা সেই এলাকা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সেলজুকীরা দীর্ঘ ক্লান্তিকর সফরের পর অসংখ্য তাঁবু ফেলে আহারাদি সেরে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে সবাই ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেল।

মাঝ রাতে তাঁবুগুলোর মাঝখান থেকে একটি মশাল উপরের দিকে উঠে ডানে বামে দোলে উঠলো। এটা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত সংকেত। এই সংকেতের পর চতুর্দিক থেকে তাঁবু এলাকায় এমন হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল যেন পাহাড়ের চূড়া ভেঙ্গে তাঁবুতে শায়িত মানুষগুলোর উপর আঁছড়ে পড়ছে। সুলতান মাহমূদের দুই সেলজুকী সেনাপতি সেলজুকীদের পণ্যসামগ্রীতে আগুন ধরিয়ে দিল এবং আগুনের আলোয় গযনী বাহিনী ঘুমন্ত সেলজুকীদের উপর চড়াও হলো।

সেলজুকীদের তুলনায় সুলতান মাহমূদের পাঠানো সৈন্য সংখ্যা ছিলো খুবই নগন্য। কিন্তু ঘুমন্ত সৈন্যদের পিষে মারার জন্য মাত্র দুটি অশ্বারোহী ইউনিটই যথেষ্ট ছিলো। আসলে সেই ঘুমন্ত তাঁবুপল্লীতে যা ঘটেছিল তা কোন লড়াই ছিল না, ছিল সেলজুকীদের গণ হত্যা। সেলজুকীরা কোন প্রতিরোধ বা আত্মরক্ষার সুযোগ পেলো না, গযনী বাহিনী সেলজুকীদের কচুকাটা করতে লাগল।

সুলতানের পাঠানো দুই সেলজুকী সেনাপতি ইসরাঈল সেলজুকী ও আহমদ তোগা খানকে জীবন্ত পাকড়াও করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ওরা ছিল সাধারণ সেলজুকীদের চেয়ে অনেক সতর্ক। তাঁবুতে আক্রমণ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তারা দু'জন জীবন নিয়ে পালাতে সক্ষম হলো। সকাল বেলায় জ্বলন্ত তাঁবু ও অগণিত লাশের স্তুপের মাঝে ইসরাঈল সেলজুকী ও আহমদ তোগা খানের মরদেহ খুঁজে পাওয়া গেল না।

কয়েক দিন পরে ঘটনা। ইসরাঈল সেলজুকী মারয়ামকে বিয়ের পর যেখানে দাঁড়িয়ে তার গোত্রের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলো— তোমরা সবাই তোমাদের তীর ধনুক ঠিক ঠাক করে নাও, তরবারীকে শান দিয়ে নাও, আমাদের আগামী উৎসব হবে বিজয় উৎসব। পালিয়ে এসে ঠিক সেই টিলার পাদদেশে একটি

তাঁবুতে ভগ্ন হৃদয়ে হতাশ ইসরাঈল বিছানায় পড়ে এপাশ ওপাশ করছিল। আর মারয়াম নিজ হাতে ইসরাঈলকে শরাব পান করাচ্ছিল। আর ইসরাঈলের পাশে বসা ছিল একজন পণ্ডিতধরনের লোক।

জীবনের প্রথম পরাজয়ই শেষ যুদ্ধ নয় ইসরাইল! তুমি এভাবে ভেঙে পড়ো না। কারণ, তোমার অজ্ঞাতসারে অতর্কিত আক্রমণে তুমি পরাজয় বরণ করেছো। আবার নিজেকে শানিত করে প্রস্তুতি নিয়ে মোকাবেলা করো, শেষ বিজয় তোমারই হবে।

ইসরাঈল নীরব। যেনো কোন কথাই তার কানে প্রবেশ করছে না। এ অবস্থা দেখে পণ্ডিত লোকটিকে মারয়াম বাইরে চলে যেতে ইঙ্গিত করলে সে তাঁবুর বাইরে চলে গেলো। এবার ইসরাঈলকে একান্তে পেয়ে তাকে চাঙা করার জন্যে নিজের রূপ যৌবনের যাদুকরী কৌশল প্রয়োগ করতে লাগলো মারয়াম। খুব মায়াবী কণ্ঠে ইসরাঈলকে স্মরণ করিয়ে দিলো, একটু খানি পরাজয়ে তুমি এতোটা ভেঙ্গে পড়েছো? অথচ আমার সাথে প্রথম পরিচয়ের দিনই তুমি বলেছিলে, প্রথম মোকাবেলায় পরাজিত হলেও পরবর্তী মোকাবেলায় তুমি ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে মাহমূদকে শেষ ঠিকানায় পৌছে দেবে।

মারয়ামের উদ্দীপনামূলক কথাবার্তা ও দৈহিক উষ্ণতায় ইসরাঈল যেনো প্রাণ ফিরে পেলো। সে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করলো এবং মারয়ামকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে নতুনভাবে প্রস্তুত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করলো।

কয়েক দিন পর যখন পরাজয়ের অবসাদ ও গ্লানি কাটিয়ে ইসরাঈল আবার সেলজুকীদের একত্রিত করে পুনরায় যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো, তখন খবর এলো— এলিকখান মারা গেছে। মৃত্যুর আগে সে বলে গেছে, ইসরাঈলকে বলবে, সে আমাকে আমার জীবদ্দশায় মাহমূদকে পরাজিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তার পরাজয়ের বর্ণনা শুনে আমি এতোটাই শোকাহত হয়েছি যে, এই বয়সে এতোটা কষ্ট আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হলো না। আমি আমার ছেলে আহমদ তোগা খানকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি। ইসরাঈলকে বলো, সে যেনো আমার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। নয়তো আমার বিদেহী আত্মা প্রেতাত্মা হয়ে তাকে শান্তিতে ঘুমাতে দেবে না।

ইসরাঈল যেনো তোগা খানের সাথে সৌহার্দ্য বজায় রাখে এবং আলাফতোগীনের সাথেও মৈত্রী বজায় রাখে। কারণ, তোমাদের কারো একার পক্ষে মাহমূদকে পরাজিত করা সম্ভব হবে না। আমি আলাফতোগীনকে শীঘ্রই

তার কাছে পাঠাচ্ছি। ইসরাঈল ও আলাফতোগীন দু'জন এক সাথে বসে যেন ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ করে।

বস্তুত আলাফতোগীনের হাতেই এলিকখান এই লিখিত পয়গাম দিয়েছিল। সে পয়গামে আরো জানালো, আলাফতোগীনের সাথে তোমার কাছে আমি দু'জন যুবতীকে পাঠালাম। মারয়াম এদেরকে ভালো ভাবেই জানে। মৃত্যুর আগে আমি তোমাকে একটা গোপন কৌশল বলে দিতে চাই—

আমার সাথে সাক্ষাতে তুমি বলেছিলে, প্রথম আক্রমণে মাহমূদকে পরাজিত না করতে পারলে তুমি অন্য পন্থা অবলম্বন করবে। অন্য পন্থা হিসেবে এই দু'টি মেয়েকে তুমি ব্যবহার করতে পারো। এরা খুবই চতুর ও সতর্ক মেয়ে। সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীতে কয়েকজন সেলজুকী কমান্ডার রয়েছে। এদেরকে এই মেয়ে দুটি দিয়ে তুমি ফাঁদে আটকাতে পারো। মেয়ে দুটিকে গযনী পাঠিয়ে দেবে। এরা সেখানে গিয়ে সেলজুকী কমান্ডারদের বিয়ে করবে। কিন্তু পর্দার অন্তরালে এরা মাহমূদের সেনাবাহিনীতে কর্মরত অন্যান্য সেলজুকীদেরকে তাদের ফাঁদে ফাঁসাতে থাকবে।

এদেরকে বুখারার বাইরের একজন উস্তাদ প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সে ইহুদী। ইহুদীর কথা শুনে মনে করো না, ইহুদী হয়তো আমাদের ক্ষতি করবে। আসলে আমাদের ক্ষতি করবে না, তার লক্ষ্য বস্তু মাহমূদ। সে আমার সাথে ওয়াদা করেছে মাহমূদের সেনাবাহিনীতে কর্মরত সেলজুকীদের খরীদ করতে যতো টাকার প্রয়োজন হয় সে নগদ অর্থ সহায়তা দেবে। এ ব্যাপারে অর্থ খরচের ব্যাপারে তুমি মোটেও চিন্তা করো না। আহমদ তোগা খানও তোমাকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা করবে।

ইসরাঈল যখন তার তাঁবুতে আগত দুই তরুণীকে দেখলো, তখন তার কাছে মনে হলো, রূপ সৌন্দর্যের দিক থেকে এরা মারয়ামের কাছে কিছুই নয়। তবে সুন্দরী।

দুই তরুণী যখন ইসরাঈলের সাথে কথা বলতে শুরু করলো এবং তাদের যাদুকরী অঙ্গভঙ্গি দেখাতে শুরু করলো, তখন মারয়ামের রূপসৌন্দর্য ইসরাঈলের কাছে পানসে হয়ে গেলো। তার হৃদয় থেকে ধীরে ধীরে মারয়ামের প্রেম ফিঁকে হতে শুরু করলো। সেখানে ঝড় তুললো এই দুই তরুণী।

কারণ তরুণী দুজন ছিল পুরুষের মনে কামনা জাগানোর ব্যাপারে পারদর্শী। কিভাবে কথা বলে, অঙ্গ-ভঙ্গি, চাহনী ও হাসি দিয়ে দৃষ্টি ও শরীর প্রদর্শন করে পুরুষের মনে আগুন ধরিয়ে দেয়া যায়, এ ব্যাপারে এরা ছিল দারুণ পারঙ্গম।

দুই তরুণীর সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার পর ইসরাঈল গা ঝাড়া দিয়ে বিছানা ছেড়ে ওঠে পড়লো। তার মন থেকে পরাজয়ের গ্লানি দূর হয়ে গেল এবং সে ফিরে পেলো নতুন শক্তি, নতুন উদ্যম। দুই তরুণী ইসরাঈলের মধ্যে জাগিয়ে দিলো জীবনী শক্তি।

ডুবন্ত মানুষ খড়খুঁটোকে আঁকড়ে ধরেও বাঁচতে চেষ্টা করে। আর সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিতরা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য গোপন চক্রান্ত শুরু করে। ইতিহাস সাক্ষী; বহু খ্যাতিমান বীর পুরুষ যাদেরকে সম্মুখ যুদ্ধে কেউ পরাজিত করতে পারেনি তাদেরকে নারীর ফাঁদে ফেলে অনায়াসে নিঃশেষ করা হয়েছে। বহু ক্ষমতাধর রাজা বাদশাকে নাকানী চুবানী খাইয়েছে নারী। আবার বহু নারী নিজেকে জলাঞ্জলী দিয়ে অধপতনের অতল থেকে উদ্ধার করেছে পতনন্মুখ রাজা বাদশাকে।

সম্মুখ যুদ্ধে বারবার পরাস্ত হওয়ার পর বৃদ্ধ বয়সে কুচক্রী এলিকখান সুলতান মাহমূদকে পরাস্ত করার জন্য ইহুদীদের শরনাপন্ন হয়। ইহুদীরা এলিকখানের পাঠানো দুই তরুণীকে দীর্ঘ দিন প্রশিক্ষণ-দেয়, কিভাবে নারী দেহ প্রদর্শন করে এবং নারীত্বের ছলাকলা দেখিয়ে পুরুষকে ফাঁদে ফেলতে হয়। কিভাবে নারীর ইজ্জত বিকিয়ে দিয়ে কাংখিত পুরুষকে ঘায়েল করতে হয়।

ইহুদীদের হাতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দুই মুসলিম তরুণী হতাশাগ্রস্থ সেলজুকী গোত্রপতি ইসরাঈলকে উজ্জীবিত করে পুনরায় সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে তৈরী করতে এসেছে এবং সেলজুকী মেয়ের পরিচয়ে গযনী বাহিনীর সেলজুকী কমান্ডারদের বিয়ের নামে বিভ্রান্ত করে গযনী বাহিনীর সৈন্যদের দিয়েই সুলতানকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে।

এদিকে আরেক এলিকখানী মেয়ে মারয়াম রাণী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। অথচ এই খান মেয়েদেরই একজন আম্বরী। মারয়ামের মতোই যুবতী সে। একই আলো বাতাস ও পরিবেশে বড় হয়েছে মারয়াম এবং আম্বরী। তাদের পরিবার ও পরিবেশে সুলতান মাহমূদের নাম অত্যন্ত ঘৃণাভরে উচ্চারিত হতো। ছোট বড় সকল এলিকখানী সুলতান মাহমূদকে ধ্বংসের জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকতো। সেই পরিবার ও পরিবেশে বেড়ে উঠেও আম্বরী ছিল ব্যতিক্রম। সমবয়সীরা যখন সুলতান মাহমূদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতো, তখন সেটির মধ্যেও সে খোঁজে পেতো শ্রদ্ধার উপাদান।

আম্বরীর এই ব্যতিক্রমী বিশ্বাস সম্পর্কে ধারণা ছিল মারয়ামের।

আম্বরী একদিন মারয়ামকে দৃঢ়ভাবে বলে ছিলো, তোমাদের এই ঘৃণা বিদ্বেষ আসলে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে না, ইসলামের বিরোধিতায় পর্যবসিত হচ্ছে। সুলতান মাহমূদের বিরোধিতা করে তোমরা বাস্তবে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করছো।

দু'জন খান তরুণীকে যখন বাইরের এক লোক একটি বন্ধ কক্ষে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘ সময় কাটাতো এটি তখন আম্বরীর নজর এড়াতো না। তার চোখের সামনেই প্রতিদিন একটি গোপন কক্ষে ভিনদেশী এক পুরুষের সাথে সময় কাটাতো তারই বয়সী দুই খান তরুণী।

একদিন আম্বরী তরুণীদের জিজ্ঞেস করলো— তোমরা এই ঘরে দীর্ঘ সময় ধরে কি করো? ওই অপরিচিত লোকটি কে? ওরা আম্বরীকে জানালো, তিনি আমাদের গৃহ শিক্ষক। আমরা সেখানে তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করি।

একথা শুনে আম্বরীর খুব আফসোস হলো। সে মনে মনে বললো, দুরের মেয়েদের জন্য বাইরে থেকে শিক্ষক এনে শিক্ষা দেয়া হয়; কিন্তু ঘরের মেয়ে হওয়ার পরও তাকে উস্তাদের কাছে বসতে দেয়া হয় না। অবশ্য আফসোস হলেও পরবর্তীতে আম্বরীর কারণ উদঘাটনে মোটেও কষ্ট হয়নি। এলিকখানের বংশের সবাই আম্বরীকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মনে করতো। কারণ সব সময় তার মুখে থাকতো, ইসলাম দীন পরকাল জান্নাত জাহান্নাম, পাপ পুণ্য ইত্যাকার কথাবার্তা। শাহী খান্দানের অন্যান্য তরুণীদের মতো আম্বরী বিলাস ব্যাসনও আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকতো না। ফলে সবাই তাকে বলতো, ওর মধ্যে আবেগ উচ্ছাস নেই। রাগ অনুরাগহীন নিরামিষ ধরনের একজন নারী আম্বরী।

অথচ আম্বরী ছিলো খান পরিবারে যে কোন তরুণীর চেয়ে অনেক বেশী প্রখর অনুভূতির অধিকারী। কিন্তু তার আবেগ উচ্ছাস ছিল নিয়ন্ত্রিত। অশ্বারোহণও তীরন্দাজী ছাড়া আর কোন কাজ ও খেলাধুলায় সে মনোযোগী ছিলো না। সেই যুগে শাহী খানদানের সব মেয়েরাই অশ্বারোহণ ও তীরন্দাজীতে পারদর্শী হতো। এটাই ছিল সাধারণ রীতি। কিন্ত এ কাজে আম্বরীর পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ। সে পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে ঘোড়া দৌড়াতে এবং ধাবমান ঘোড়ার উপর থেকে নির্ভুল লক্ষ্যবস্তুতে তীর নিক্ষেপে অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। আম্বরীর তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না। এ ব্যাপারে তার কোন জুড়ি ছিল না। প্রায় দিনই সে একাকী ঘোড়া হাঁকিয়ে বাড়ি থেকে বহু দূরে চলে যেতো।

* * *

সেলজুকীরা মারাত্মক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল। জনবল হারানোর পাশাপাশি তাদের বিপুল সংখ্যক উট, ঘোড়া ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু সুলতান মাহমূদ এই বিজয়ে মোটেও নিরুদ্বিগ্ন হতে পারেননি। কারণ তিনি জানতেন, সেলজুকী একটি বিশাল জনগোষ্ঠী। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এদের লোক সংখ্যা বিপুল। তাছাড়া এলিকখানের রাজশক্তি এবং আলাফতোগীন এদের সহযোগী। কাজেই যে কোন সময় এরা একত্রিত হয়ে সীমান্ত এলাকায় আঘাত হানতে পারে। ফলে এদের উপর দৃষ্টি রাখা জরুরি। সুলতান মাহমূদ সীমান্তরক্ষীদের নির্দেশ দিয়ে দিলেন, সীমান্ত চৌকিগুলোর টহল ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হোক এবং যতদূর সম্ভব টহল সেনাদের সীমান্তের বাইরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে সতর্ক রাখা হোক।

সুলতানের এই নির্দেশের পর সীমান্ত চৌকিগুলোর শক্তি বাড়ানো হলো। টহল জোরদার করা হলো এবং সীমান্তের বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত গযনী সৈন্যদের টহলের নির্দেশ দেয়া হলো।

উমর ইয়াজদানী ছিল গযনী বাহিনীর একজন কমান্ডার। তিনটি সীমান্ত চৌকির দায়িত্ব ছিল তার উপর। উকেসাস ইয়াজদানীর কর্মক্ষেত্র। উকেসাস নদীর একেবারে তীরবর্তী একটি চৌকিতে থাকতো উমর ইয়াজদানী। উমর ইয়াজদানীর অধীনস্ত সেনাদের জন্যে সবসময় নদীর তীরে বাধা থাকতো একাধিক নৌকা। নৌকা করেও তারা ওপারের অবস্থা পর্যবেক্ষণে বের হতো। কমান্ডার হিসেবে ইয়াজদানী প্রায়ই একাকী 'টহল দলের' অবস্থা দেখার জন্যে বেরিয়ে পড়তো। যাচাই করতো টহল সেনারা ঠিকমতো কর্তব্য পালন করছে কি না।

একদিন টহল সেনাদের পর্যবেক্ষণে বের হয়ে উমর ইয়াজদানী দূর থেকে লক্ষ করলো, তার টহলদল ঠিক মতোই টহল দিচ্ছে। অশ্বারোহী টহলদল অবিরাম ঘোড়া হাঁকিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। উমর দেখলো, তার দৃষ্টিসীমার বাইরে ওরা গহীন অরণ্যে চলে গেছে। এটাই ছিল স্বাভাবিক। উমর তার অধীনস্থদের কাজে আশ্বস্ত হয়ে উল্টো দিকে ঘোড়া হাঁকাল।

উমর ছিল কমান্ডার। তার কাছে তীর ধনুক রাখার দরকার ছিল না। কিন্তু উমর এসবের ধার ধারে না। ঘর থেকে বের হলে তীর ধনুক, তরবারী তার সাথে থাকবেই। এগুলোকে একজন সৈনিকের সার্বক্ষণিক পোষাক মনে করে উমর। অফিসার ও সিপাহীর ভিন্নতায় বিশ্বাসী নয় উমর ইয়াজদানী।

সীমান্তের এই এলাকাটি ছিল শিকারে জন্যে উপযুক্ত জায়গা। এখানে দল বেঁধে হরিণ, খরগোশ, বনগরু বিচরণ করতো। উমর ইয়াজদানী হরিণ শিকারেও ছিল পটু। প্রায়ই একাকিই শিকার করে নিয়ে আসতো হরিণ খরগোশ ইত্যাদি।

সে দিন টহল সেনাদের গতিবিধি দেখে উল্টো দিকে রওয়ানা হতেই সামান্য দূরে তার চোখ পড়লো কয়েকটি হরিণের উপর। হরিণকে শিকার করতে হলে পেছন দিয়ে কিছুটা পথ ঘুরে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করতে হয়। কিন্তু হরিণগুলো হঠাৎ সেখান থেকে আরো দুরে সরে যেতে লাগল। উমর ইয়াজদানীর মনোযোগ নিবদ্ধ ছিলো হরিণের প্রতি। তার খেয়াল ছিলো না হরিণ তাড়া করে সে সীমানা থেকে কতোটুকু দূরে চলে এসেছে।

এক পর্যায়ে তার চোখে পড়লো পাহাড়ী এলাকা। হঠাৎ হরিণগুলো কান খাড়া করে উর্ধশ্বাসে দৌড়াতে লাগল। মনে হচ্ছে ওরা কোন শত্রুর উপস্থিতি টের পেয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই উমর ইয়াজদানীর কানে ভেসে এলো ছুটন্ত অশ্বখুড়ের আওয়াজ। ধীরে ধীরে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ আরো কাছে এগিয়ে এলো। উমর ইয়াজদানী ঘোড়া থামাল। চতুর্দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সে দেখতে পেলো, একটি ধাবমান অশ্বারোহী ডানে বামে তীর চালাচ্ছে আর তার ঘোড়াটি একে বেঁকে দৌড়াচ্ছে।

হঠাৎ ঘোড়াটি একদিকে ঘুরে গেলে উমর দেখলো, অশ্বরোহী একজন নারী এবং তাকে তাড়া করছে চারটি চিতা বাঘ। মহিলা তার ঘোড়াকে ডানে বামে ঘুরিয়ে চিতাগুলোর উপর তীর চালাচ্ছিল, কিন্তু কোন তীরই চিতাকে আঘাত করতে পারছিল না।

সেই অঞ্চলের চিতাবাঘের হিংস্রতা ছিল প্রবাদতুল্য। অন্যান্য বাঘের চেয়ে ওখানকার বাঘ ছিলো অনেক বেশী শক্তিশালী ও হিংস্র। বাঘের ভয়ে ঘোড়া উর্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছিল। কিন্তু দৌড়াতে দৌড়াতে ঘোড়াটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এ দিকে একটি মেয়ের পক্ষে চারটি চিতাবাঘের মোকাবেলা করা ছিল অসম্ভব। দৃশ্যত চিতাবাঘের আক্রমণ থেকে মেয়েটির বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না। পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করে কাল বিলম্ব না করে ধনুকে তীর ভরে উমর ইয়াজদানী তার ঘোড়া চিতার পেছনে ছুটালো। ততোক্ষণে চিতা ও আক্রান্ত মেয়েটি অনেক দূর চলে গেছে। আর দুটি চিতা মেয়েটির দু'পাশ থেকে ঘোড়াকে আক্রমণ উদ্যত অবস্থায়।

উমর তার ঘোড়াকে ইশারা করতেই সেনাবাহিনীর তাজাদম প্রশিক্ষিত ঘোড়া বাতাসের আগে ছুটতে লাগল। ততোক্ষণে একটি চিতা মেয়েটির ঘোড়ার

গায়ে দু'একটি থাবা মেরে দিয়েছে। এমন নাজুক অবস্থায় তীর চালালে তীর লক্ষভ্রষ্ট হয়ে মেয়েটি আহত হতে পারে, এই আশংকায় তীর না চালিয়ে উমর ইয়াজদানী বিদ্যুৎবেগে মেয়ের ঘোড়াকে আক্রমণকারী একটি চিতার উপরে তার ঘোড়াটি তুলে দিলো। ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে বাঘটি পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘোড়াকে ঘুরিয়ে ধাবমান ঘোড়া থেকে একটি চিতাকে লক্ষ করে তীর ছূড়ল। চিতা একটি আর্ত চিৎকার দিয়ে শিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উল্টো দিকে দৌড়াতে শুরু করল। কিন্তু বেশী দূর যেতে পারলো না, পড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগল।

অপর দুই চিতা সঙ্গী দু'জনের অবস্থা দেখে শিকার ত্যাগ করে জীবন নিয়ে পালালো। চিতার তাড়া না থাকলেও চিতার ভয়ে ভড়কে যাওয়া মেয়েটির ঘোড়া বেলাগাম হয়ে পড়েছিল। সে তখনো জীবনপণ দৌড়াচ্ছে, থামার নাম নেই। উমর ইয়াজদানী লাগামহীন হয়ে যাওয়া ঘোড়াটিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে তার ঘোড়াকে সেই ঘোড়ার পাশে চালিয়ে দিল। এবার সে দেখতে পেলো আরোহী বয়স্ক মহিলা নয়, একজন দারুন সুন্দরী তরুণী। চেহারা ছবি দেখে মনে হয় কোন শাহী খান্দানের মেয়ে।

উমর ইয়াজদানী তরুণীর ঘোড়াকে অতিক্রম করে থাবা দিয়ে ঘোড়ার লাগামটি হাতিয়ে নিয়ে ঘোড়াটিকে থামাতে চেষ্টা করল। বহু কষ্টে সে আতংকগ্রস্ত ঘোড়াটিকে থামাল। তবে আরোহী তরুণীকে মোটেও শংকিত মনে হলো না। হাপাচ্ছিল তরুণী। এভাবে জীবন বাঁচানোর জন্য উমর ইয়াজদানী ক্লান্ত কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা জানালো তরুণীকে। তরুণীর কণ্ঠ শোনে উমর ইয়াজদানী বললো— আচ্ছা! আপনি এলিকখানী?

হ্যাঁ, আপনি?

গযনবী। আমি গযনী বাহিনীর একজন কমান্ডার। একটি হরিণকে তাড়া করে অনেক দূরে এসে পড়েছিলাম। কিন্তু আপনার ঘোড়াকে চিতা বাঘে তাড়া করতে দেখে আমি এ পর্যন্ত এসে গেলাম।

আপনি কি জানেন? আপনার সীমান্ত থেকে আপনি অন্য রাজ্যের কতখানি ভেতরে চলে এসেছেন? মুচকি হেসে বললো তরুণী। আপনি এখন আমাদের সীমান্তের পাঁচ মাইল ভেতরে। আপনি আর আমি কিন্তু পরস্পর শত্রু।

হ্যাঁ শত্রু বটে, কিন্তু প্রধান শত্রু এলিকখান মারা গেছে। জীবিত অবস্থায়ই আমরা তার শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছিলাম। আপনি খানদের কোন অংশের মেয়ে?

আমি শাহী খান্দানের মেয়ে। এলিকখান আমার চাচা ছিলেন। আমার নাম আম্বরী।

আচ্ছা, আপনি তাহলে শাহজাদী।

হ্যাঁ, শাহী বংশের মেয়ে বলেই আমরা একে অন্যের শত্রু।

একজন অপরিচিত তরুণীকে কোন কড়া কথা বল্‌তে আমার ইচ্ছে করছে না। তবে না বলেও পারছি না। শাহজাদী আম্বরী! আপনার বয়স তেমন হয়নি। এই বয়সে কে শত্রু কে বন্ধু, কার রাজনৈতিক কর্মকান্ড ঠিক, কারটি বেঠিক তা নির্ণয় করার মতো জ্ঞান আপনার হয়নি। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, সুলতান মাহমূদের প্রতি আপনাদের যে হিংসা ও শত্রুতা তা মন থেকে দূর করে দিন। ভবিষ্যত প্রজন্মকে একথা শিক্ষা দিন যে, দু'জন মুসলমান একে অন্যের শত্রু হতে পারে না।

আমাকে আপনি শত্রু পক্ষের লোক মনে করবেন না কমান্ডার। আপনার এই উপদেশেরও আমার প্রয়োজন নেই। আপনি কি জানেন? সুলতান মাহমূদকে শত্রু জ্ঞান করি না বলে আমার খান্দানের লোকেরা আমাকে পাগল মনে করে। সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং ন্যায়পরায়ণ সত্যপন্থি সুলতান মাহমূদকে শ্রদ্ধা করি বলেই হয়তো আজ বাঘের আক্রমণ থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য এক শত্রু সেনা কমান্ডারকে আল্লাহ তাআলা সীমান্তের পাঁচ মাইল ভেতরে পাঠিয়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। হ্যায় আল্লাহ! আপনি না এলে এতোক্ষণে চিতাবাঘ আমাকে চিড়ে খেয়ে ফেলতো।

আমি আপনার শত্রুপক্ষের লোক। শত্রুপক্ষের লোক হওয়ার পরও আপনাদের সীমানায় অবৈধভাবে প্রবেশ করেছি। এখন আমার ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কি হবে? আমি কি আপনার বন্দি?

না, না। আপনি বন্দি হবেন কেন? আপনি আমার কাছে সম্মানিত অতিথি। বললো আম্বরী। আপনার যদি তাড়া থাকে তবে এখন চলে যেতে পারেন। আমাকে এক্ষুণি বাড়ি ফিরতে হবে। কারণ বাড়ি থেকে বেরিয়েছি অনেক্ষণ হয়েছে। বাড়ির লোকজন হয়তো আমাকে খোঁজার জন্য বেরিয়ে পড়েছে।

আম্বরী ও ইয়াজদানী একে অন্যের দিকে তাকাল। তাদের মধ্যে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় হলো। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে উভয়েই মুচকি হাসলো। এরপর ঘোড়ার দিক ঘুরিয়ে ক্ষীণ আওয়াজে ইয়াজদানী বললো— খোদা হাফেয, শাহজাদী! ইয়াজদানীর ঘোড়া চলতে শুরু করেছিল। ঠিক সেই সময়ে ডেকে উঠলো আম্বরী।

দাঁড়ান! আগামীকাল কি আপনি এখানে আসতে পারবেন? আমি আগামী কাল এখানে আসবো।

আমাকে পাকড়াও করতে কতোজন লোক আসবে? জানতে চাইলো ইয়াজদানী।

একথা শুনে আম্বরীর মুখ থেকে হাসি উবে গেল। মলীন হয়ে গেল তার চেহারা।

আমার প্রতি এমন সন্দেহ করতে পারলেন আপনি? উদাস কণ্ঠে বললো আম্বরী। অবশ্য আমার পক্ষে আপনাকে নিশ্চয়তা দেয়ার কোন উপায় নেই। আমি আপনাকে ধোঁকা দেবো না একথা কিভাবে বুঝাবো? তবে একথা জেনে রাখুন, আপনি চাইলে আমি আপনার চৌকিতেও হানা দিতে পারি।

দুঃখিত, আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি একথা বলিনি। যাক, আমি কথা দিলাম, আগামীকাল আপনার জন্যে এখানে আসবো।

ইয়াজদানী আর কালক্ষেপণ না করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ইয়াজদানীর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলো আম্বরী।

ঝুকি নিলো ইয়াজদানী। পরদিন জীবনের ঝুকি নিয়ে আম্বরীকে যেখানে পেয়েছিল সেখানে এলো। আম্বরী আগে এসেই দাঁড়িয়ে ছিল। কুশল বিনিময়ের পর নিজ নিজ শখ, রুচি, প্রত্যাশা ও স্বপ্নের কথাই অগ্রাধিকার পেলো। দীর্ঘ আলোচনায় তারা একে অন্যের আদর্শিক জীবনাদর্শে এতোটাই মুগ্ধ হলো যে, দুজনে মিলে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো। এভাবে সীমান্ত পেরিয়ে শত্রু রাজ্যের ভেতরে গিয়ে আম্বরীর সাথে নিয়মিত দেখা সাক্ষাত করতে লাগলো ইয়াজদানী।

সপ্তম দিনের সাক্ষাতে ইয়াজদানী লক্ষ করলো, আম্বরীর মধ্যে আগের মতো এতোটা উৎফুল্ল ভাব নেই। তার চেহারা মলিন এবং বিব্রত। কিছুক্ষণ নীরব থেকে এক পর্যায়ে আম্বরী নিজে থেকেই বললো—

তোমার প্রতি ভালোবাসার টান আমাকে আজো এখানে নিয়ে এসেছে। অথচ এখন আমাদের উভয়ের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ। গতকাল আমাকে রাজমহলের এক সেবিকা বলেছে, প্রতি দিন দীর্ঘ সময়ের জন্যে বাড়ির বাইরে থাকার ব্যাপারটি আমার প্রতি রাজমহলের সবার মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক করেছে। তাই আজ থেকে আমার পেছনে গুপ্তচর লাগিয়ে দেয়া হতে পারে। এমন হলে কিন্তু আমাদের কারোরই প্রাণ বাঁচবে না। অবশ্য নিজের জীবনের ভ্রুক্ষেপ করি না আমি। কিন্তু তোমাকে নিয়েই আমার চিন্তা। একটু সতর্ক থেকো।

কেউ যদি আমাদের দেখে ফেলে তবে আমি আর রাজমহলে ফিরে যাবো না। যদি পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে, তোমার সাথেই চলে যাবো। তুমি কি আমাকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত?

প্রতি দিন জীবনের ঝুকি নিয়ে শত্রু রাজ্যের ভেতরে এসে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করি কি ঠাট্টা করতে? কি মনে করো তুমি? দৃঢ় কণ্ঠে বললো ইয়াজদানী।

এ ব্যাপারে আর বেশী চিন্তা ভাবনার সুযোগ পেলোনা ওরা। উভয়ের কানে ভেসে এলো অশ্বখুড়ের আওয়াজ।

হয়তো আমাকে অনুসন্ধানকারী লোকেরা এসে গেছে— বললো আম্বরী।

ওই যে দেখো— দূরে ধাবমান তিনজন অশ্বারোহীর দিকে ইঙ্গিত করে আম্বরীর উদ্দেশে বললো ইয়াজদানী। দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল এরা এলিকখানের রাজকীয় বাহিনীর সৈন্য। তিন অশ্বারোহীকে এদিকে আসতে দেখে দ্রুত উভয়েই নিজ নিজ ঘোড়ায় সওয়ার হলো। ততোক্ষণে অনুসন্ধানী দল তাদের দেখে ফেলেছে এবং পাকড়াও করতে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়াজদানীকে দ্রুত ঘোড়া হাঁকানোর জন্যে তাড়া দিল আম্বরী। ধাবমান ঘোড়া থেকে তিনটি তীর ছুটে এসে দু'টি আম্বরীর ঘোড়াকে আঘাত করলো। ঘোড়াটি হঠাৎ হ্রেষারব করে লাফিয়ে উঠলো।

পিছন ফিরে ইয়াজদানী দেখলো, আম্বরীর ধরা পড়া নিশ্চিত। সে জীবনের ঝুকি নিয়ে তার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আম্বরীর ঘোড়ার পাশে নিয়ে এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে আম্বরীকে বললো তার ঘোড়ার উপর চলে আসতে। দক্ষ অশ্বারোহীর মতো আম্বরী ধাবমান অবস্থায়ই লাফ দিয়ে ইয়াজদানীর সামনে তার ঘোড়ায় চড়ে বসলো এবং নিজের ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিল। ততোক্ষণে পিছু ধাওয়াকারীদের দূরত্ব কমে গেছে।

ইয়াজদানী একহাতে আম্বরীকে ধরে অপর হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়াকে এমন তীব্র গতিতে একে বেঁকে চালাতে লাগলো যে, পিছু ধাওয়াকারীদের সাথে তার দূরত্ব মুহূর্তের মধ্যে অনেকটা বেড়ে গেল। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর একটি পাহাড়ের টিলা এসে গেল। ইয়াজদানী দ্রুত তার ঘোড়াটিকে পাহাড়ের ওপারে নিয়ে গেল। সেই সাথে সীমান্তও পেরিয় এলো ইয়াজদানী।

ইয়াজদানী আম্বরীকে নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে নিজের ভূখণ্ডে চলে আসার পর আর পিছু ধাওয়া করলো না খান সেনারা। তারা নিজ গন্তব্যে ফিরে গেল। ভাগ্যক্রমে গযনী সুলতানের এক শুভাকাঙ্খী গযনী বাহিনীর এক কমান্ডারের জীবন সঙ্গীনী হয়ে ইসলামের সেবা করার সুযোগ পেয়ে গেল। যা ছিল তার আশৈশব লালিত স্বপ্ন।

* * *

উমর ইয়াজদানী আর আম্বরীর বিয়ের ব্যাপারটি ছিল বছর খানিক পূর্বের ঘটনা। এই ঘটনার এক বছর পর সুলতান মাহমূদ পুনর্বার হিন্দুস্তান অভিযানে বের হলেন। এবার তাঁর ইচ্ছা হিন্দুস্তানের কুচক্রী হিন্দু রাজাদের কোমর ভেঙে দিয়ে হিন্দুস্তানে পরিপূর্ণ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য তিনি সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিক থেকে অফিসার পর্যন্ত সবাইকে অনুমতি দিয়েছিলেন তারা ইচ্ছা করলে এই অভিযানে তাদের স্ত্রী সন্তানদের সাথে নিয়ে যেতে পারে। তিনি হিন্দুস্তানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করে সেখানে স্থায়ীভাবে কিছু সৈন্য রাখার জন্যে এই অনুমতি দিয়েছিলেন।

এবার তার প্রধান টার্গেট ছিল লাহোর। অবশ্য অন্যান্য হিন্দু রাজাদেরও শক্তি নিঃশেষ করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু লাহোরের ক্ষমতাসীন নতুন রাজা তরলোচনপাল বেশী বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। খবর এসেছে, রাজা তরলোচনপাল তার সেনাবাহিনী কন্নৌজ ও মথুরার মধ্যবর্তী কোন অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে গেছে এবং সে অঞ্চলে অবস্থান নিয়ে সে অন্য হিন্দু রাজাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার শক্তি সঞ্চয় করছে।

সুলতানের অনুমতি পেয়ে অনেক সৈনিক, কমান্ডার ও সেনাপতি তাদের স্ত্রী সন্তানদের সাথে নিয়ে রওয়ানা হলো। তখন ইয়াজদানী ছিল কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে। সীমান্তের চৌকি থেকে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল। উমর ইয়াজদানীকে হিন্দুস্তান রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুনে তার স্ত্রী আম্বরীও সাথে যাওয়ার জন্যে বায়না ধরলো। ইয়াজদানী কিছুতেই আম্বরীকে সাথে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিল না। কিন্তু আম্বরীর সবিনয় অনুরোধ ও উপর্যুপরী তাগাদা আর জেদের কাছে হার মেনে আম্বরীকে সাথে নিতে রাজি হলো ইয়াজদানী

আম্বরীর এই সফরে যাওয়ার বায়না ধরার মধ্যে যতোটা না স্বামীর সঙ্গ লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিলো তার চেয়ে বেশী ছিল জিহাদে অংশ গ্রহণের আবেগ। আম্বরী প্রায়ই ইয়াজদানীকে বলতো— আল্লাহর প্রতি আমার খুব অভিমান হয়, আমাকে কেন নারী করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছে? নয়তো আমি তোমাদের মতো তরবারী হাতে নিয়ে বেঈমান দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে ধন্য হতে পারতাম। নারী হয়েও আমার আত্মা সব সময় জিহাদের ময়দানে ঘুরে বেড়ায়।

ওই কাফেরদেকেই তুমি শুধু দুশমন মনে করছো? এদের চেয়ে আরো ভয়ংকর দুশমন নিজ ধর্মের লেবাসধারীরা। কারণ কাফেরদেরকে সবাই চিনে। জানে যে এরা দুশমন। কিন্তু মুসলমান বেঈমানদের অনেকেই চিনে না। এরা মুসলিম পরিচয়ে দৃশ্যত সুহৃদ হয়ে পাশে থাকে, কিন্তু সুযোগ মতো পিঠে খঞ্জর বসিয়ে দিয়ে বলে— আমি আঘাত করিনি। আমি তো তোমার ভাই! এ

ব্যাপারটি তুমি ভালোই জানো। কারণ, খান্দানী ভাবেই তুমি ঈমান বিক্রেতা গোষ্ঠীর মেয়ে। কিন্তু আমি ভেবে অবাক হই, এমন খান্দানের হয়েও তুমি বেঈমানদের বিরুদ্ধে এতোটা ক্ষোভ কিভাবে পোষণ করো? বললো ইয়াজদানী।

শোন! আমার মা ছিলেন খাঁটি ঈমানদার গোষ্ঠীর মেয়ে। আমার বাবা ছিলেন খান রাজবংশের ছেলে। তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমার মাকে জোর করে বিয়ে করেছিলেন। আমার মা জীবনেও খানদের কর্মকাণ্ড সমর্থন করতে পারেননি। আমার জন্মের পর আমি যখন কিছুটা বুঝতে শিখেছি, তখনই আমার মা আমাকে বলতেন, মুসলমানদের লেবাসধারী এই এলিকখান গোষ্ঠী ইসলামের ভয়ংকর শত্রু। শৈশব থেকে মা আমাকে সুলতান মাহমূদের নানা গল্প শোনাতেন। সেই শৈশব থেকেই আমি সুলতান মাহমূদকে আমার আদর্শ বলে মনে করি এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করি।

আমি ছিলাম আমার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। আমার মা প্রায়ই বলতেন, আল্লাহ যদি আমাকে একটি পুত্র দেন তবে তার হাতে আমি এসব ইসলাম দুশমনদের খতম করাবো। দুর্ভাগ্য যে, আমার কোন ভাই হয়নি। মায়ের সেই ইচ্ছা আমি পূরণ করতে না পারলে আমার বেঁচে থেকে কি লাভ? আমি স্ত্রী হিসেবে তোমার সঙ্গী হতে চাচ্ছি না। একজন নারী সৈনিক হিসেবে তোমার সাথে যেতে চাই। তুমি আমাকে নিতে না চাইলে আমি ঘোড়া চালাতে জানি, তীর নিক্ষেপে দক্ষ একথা তুমি জানো। তোমার নেয়ার অপেক্ষা না করে আমি নিজেই সেনাদের পিছু পিছু চলে যাবো। আমাকে একটা কিছু করতেই হবে ইয়াজদানী! আমাকে সেটা করতে দাও। নারী পুরুষের শক্তি। সে শক্তি নষ্ট করে ঘরে আবদ্ধ না রেখে একে সক্রিয় রাখো। হয়তো বা সময়ে কাজে লাগতে পারে।

অবশেষে আম্বরীও হিন্দুস্তানী কাফেলার সঙ্গী হলো। কাফেলার বিস্তৃতি ছিল দুই মাইলের চেয়ে দীর্ঘ। রসদপত্রবাহী ঘোড়ার গাড়ীর দীর্ঘ সারির আগে সৈন্যরা, আর এর পিছনে পালকীতে মহিলারা।

দুর্ভাগ্য বশতঃ একই কাফেলার সহযাত্রী ছিল প্রাণঘাতি কতিপয় শত্রু। এই অজ্ঞাত পরিচয় শত্রু ছিল গযনী বাহিনীর কতিপয় সেলজুকী সদস্য। এরা দীর্ঘ দিন ধরে গযনী বাহিনীতে কর্মরত। কখনো তাদের কোন কাজে সন্দেহ করার মতো কিছু ঘটেনি। তাদের বিশ্বস্ততা ছিল প্রশ্নাতীত। কিন্তু এবারের সফরের কিছু দিন আগে এদের বিশ্বস্ততায় চির ধরে। ভেতরে ভেতরে এরা সাংঘাতিক বেঈমান হয়ে ওঠে। কিন্তু এই ব্যাপারটি ধরা পড়ার মতো কোন কর্মকান্ড কারো চোখে পড়েনি।

প্রায় বছর খানিক আগে রজব ভাই নামের এক সেলজুকী কমাণ্ডার একজন সেলজুকী মেয়েকে বিয়ে করে। তার মতো আরেক সৈনিকও একই সময় আরেক সেলজুকী মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসে। এই দুজনের বিয়ের পর ধীরে ধীরে সেলজুকী সৈন্যরা একটি জায়গায় বসবাসের স্থান করে নেয়।

কেউ জানতো না, এই দুই সেলজুকী সৈনিকের কাছে স্ত্রী পরিচয়ে দুই তরুণীকে পুরস্কার স্বরূপ পাঠানো হয়েছে। এরা পছন্দ করে তাদেরকে বিয়ে করে নিয়ে আসেনি।

একবার কমান্ডার রজব ভাই ও তার এক স্বগোত্রীয় সঙ্গী এক সাথে তাদের পরিবার পরিজনের সাথে ছুটি কাটাতে বুখারার পাহাড়ী এলাকায় গেল। ছুটিতে যাওয়ার পর সেলজুকী গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকেরা এবং একজন দরবেশ লেবাসধারী ব্যক্তি তাদের সাথে সাক্ষাত করতে এলো। সাক্ষাতে নানা কথাবার্তার পর দরবেশ কমান্ডার রজব ভাই ও তার সঙ্গীর সামনে গোত্রপ্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সেলজুকীদের বিরুদ্ধে গযনী বাহিনীর লড়াই ও সেলজুকীদের নির্মমভাবে হত্যা করার বিষয়টি এমন জ্বালাময়ী ও হৃদয়বিদারক ভাষায় বর্ণনা করলো যে, স্বগোত্রীয় ভাইদের করুন মৃত্যুতে তাদের চোখে পানি এসে গেল এবং হত্যাকারী গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের রক্ত টগবগিয়ে উঠলো। কমান্ডার রজব ক্ষোভে দুঃখে বললো, সে আর গযনী বাহিনীতে ফিরে যাবে না।

না, না। তোমার এমনটি করা উচিত হবে না। এটা হবে কাপুরুষতা— বললো দরবেশ ব্যক্তি। তোমাকে সেলজুকী ভাইদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই তোমার গযনী বাহিনীতে থাকা উচিত।

এবার গিয়ে মাহমূদকে আমরা খুন করে ফেলবো— উত্তেজিত কণ্ঠে বললো কমান্ডার রজব ভাই।

তাতে তেমন কোন লাভ হবে না— বললো একজন নেতৃস্থানীয় লোক। তোমাদের কি করতে হবে সেটি আমরা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। তোমাদের গযনী বাহিনীতে যতো সেলজুকী আছে, অতি গোপনে সবাইকে তোমাদের দলে ভেড়াবে। তারা যখন নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠবে ও তোমাদের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে উঠবে তখন তোমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদেরকে জানাবে।

তোমরা প্রশিক্ষিত যোদ্ধা। যুদ্ধের ব্যাপারে তোমরাই অভিজ্ঞ। হিন্দুস্তানের যুদ্ধের ময়দানে সুলতান মাহমূদকে ধোকা দিতে হবে, তার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দিতে হবে। সুলতান মাহমদু থাকলো কি মরলো তাতে কিছু যায় আসে না।

মাহমূদ আগামী কিছু দিনের মধ্যেই হিন্দুস্তানে অভিযান চালাবে। সেই অভিযানে নিশ্চয়ই তোমরা থাকবে। তোমরা তখন হিন্দু বাহিনীর সাথে মিলে গযনী বাহিনীকে পেছন থেকে আক্রমণ করে নিঃশেষ করে দিতে পার।

কিন্তু হিন্দুস্তানে গিয়ে আমরা হিন্দুদের সাথে কি ভাবে যোগাযোগ করবো? আমরা তো কেউ হিন্দুস্তানের ভাষা জানি না! উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো রজব ভাই।

সেই ব্যবস্থা তোমাদের নাগালের মধ্যেই আছে— বললো দরবেশরূপী ব্যক্তি। গযনীতেও এই কাজের বহু লোক রয়েছে। এরা হলো সেই সব হিন্দু, যাদেরকে প্রতিটি যুদ্ধের পর গযনী বাহিনী পাকড়াও করে গযনী নিয়ে এসেছে। এদের বাছাই করে মাহমূদ দুটি সেনা ইউনিট গঠন করেছে। তাছাড়া বিপুল সংখ্যক হিন্দু সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করছে। গ্রেফতারকৃত হিন্দুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে গযনীর বিত্তশালীরা দাস হিসাবে কিনে নিয়ে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছে।

আমরা তোমাদেরকে এমন কয়েকজন হিন্দুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো, যারা তোমাদের ব্যক্তিগত কর্মচারী কিংবা কোচওয়ান হিসেবে সেনাবাহিনীর সাথেই থাকবে। এরা মুসলিম পরিচয় ধারণ করবে। কিন্তু বাস্তবে তারা নিষ্ঠাবান হিন্দু। এরাই হিন্দুস্তানে সব প্রয়োজনে তোমাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। এরা হিন্দু সেনাদের সাথে তোমাদের যোগাযোগ করিয়ে দেবে।

আমরা তাদেরকে এই পরিমাণ ধন-সম্পদ দেবো, যা তারা জীবনে পাবে তো দূরের কথা কল্পনাও করতে পারে না। তাদের সবচেয়ে বেশী প্রাপ্তি হব, তারা গোলামীর জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের জন্ম ভূমিতে ফিরে যেতে পারবে। যুদ্ধের ময়দানে তোমরা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে যে, গোটা গযনী বাহিনী হিন্দুদের সহজ আক্রমণের শিকার হয়ে যায়।

তোমরা মাহমূদের যুদ্ধ কৌশল জানো— বললো আরেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। মাহমূদের আক্রমণ কৌশল অনেক জায়গা নিয়ে হয়ে থাকে। সম্মুখভাগে সে খুবই সামান্য সৈন্য রাখে। অধিকাংশ সৈন্যকে ডানে বামে ছড়িয়ে দিয়ে শত্রুপক্ষকে ডানে বামে এবং পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে। মাহমূদ শত্রুপক্ষকে এগিয়ে আসতে বাধ্য করে। তার গেরিলা যোদ্ধারা রাতের বেলায়ও শত্রুপক্ষকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না।

এবার মাহমূদের যুদ্ধ কৌশলের প্রতি তোমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। তার পরিকল্পনার কথা আগেই হিন্দুদের জানিয়ে দেবে। মাহমূদ যদি কোথাও ফাঁদ তৈরী করে তবে তা যথা সময়ে তোমরা হিন্দু বাহিনীকে জানিয়ে দেবে। তোমরা

তো আগেই জানতে পারবে, এবার যে সেনাপতি তার সাথে যাচ্ছে, সে কতটুকু ঝানু ও অভিজ্ঞ।

তোমরা হয়তো জানো, আবু আব্দুল্লাহ্ আলতাঈ সুলতান মাহমূদের ডান হাত। ইতিহাসে আলতাঈর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভবিষ্যতে মানুষ যখন মাহমূদের নাম উচ্চারণ করবে পাশাপাশি সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ্ আলতাঈর নামও স্মরণ করবে। যুদ্ধের ময়দানে যদি সুযোগ পাও, তাহলে আলতাঈকে খুন করে ফেলবে। হত্যার ক্ষেত্রে দূর থেকে তীর ব্যবহার করবে, তবে কিছুতেই যাতে ধরা না পড়ো। ধরা পড়লে কিন্তু আমাদের সব পরিকল্পনা ধুলিস্যাত হয়ে যাবে।

এজন্যই আমরা সুলতান মাহমূদের হত্যার ব্যাপারে কোন কথা বলি না— বললো দরবেশরূপী ব্যক্তি। কারণ, তাকে আমরা গযনী থেকে হাজারো মাইল দূরে হিন্দুস্তানের ভেতরে হিন্দুদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে চাই। আমরা চাই, গযনী বাহিনীর শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাক এবং বেঁচে থাকা গযনীর সকল সৈন্য হিন্দুদের হাতে বন্দি হোক আর চরম পরাজয়ের গ্লানী নিয়ে মাহমূদ হিন্দুদের হাতে গ্রেফতার হয়ে লাঞ্ছনার শিকার হোক। তোমরা কি জানো, এমনটি ঘটাতে পারলে এরপর গযনীর রাজত্বের অধিকারী হবে সেলজুকীরা? তোমরা কি অনুভব করতে পারো না, সেলজুকী একটি বিরাট শক্তি? দেখবে, বুখারা থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত গোটা অঞ্চল সেলজুকী রাজত্বের আওতায় চলে আসবে। গভীর আবেগ ও উচ্ছ্বাসে বললো দরবেশ।

সেলজুকী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তোমরাই হবে সেনাপতি ও ডেপুটি সেনাপতি— বললো আরেকজন। আমরা এমন দু'জন মেয়েকে তোমাদের স্ত্রী হিসেবে দিচ্ছি, এ ধরনের মেয়ে সাধারণত রাজা বাদশাদের ঘরে শোভা পায়। তা ছাড়া তোমাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে বিপুল ধন-সম্পদ।

প্রথমত কমান্ডার রজব ভাই ও তার সঙ্গীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ উস্কে দেয়া হলো। এরপর গযনী সেনাদের হাতে সেলজুকীদের নিহত হওয়ার ঘটনাটিকে চরম নৃশংস কাহিনী বানিয়ে তাদেরকে গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হলো। সেই সাথে তাদের সামনে হাজির করা হলো দু'জন অপরূপ সুন্দরী যুবতী।

উপজাতি সেলজুকী বংশের কোন যুবকের পক্ষে এমন শিক্ষিত ও অভিজাত মেয়েকে বিয়ে করার বিষয়টি কল্পনা করার সাধ্যও ছিলো না। সুন্দরী দুই যুবতীকে দেখে রজব ও তার সঙ্গীর চোখ ছানাবরা। তাদের সামনে এমন

অর্থসম্পদ রাখা হলো যে এতো বিপুল সোনা দানা একত্রিত করার কথা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। সেই সাথে বিশাল সালতানাতে সেলজুকীদের সেনাপতি ও ডেপুটি সেনাপতি হওয়ার বিষয়টি কমাণ্ডার হিসেবে তাদের কাছে এতোটাই লোভনীয় ছিল যে, বিষয়টি তারা কেবল স্বপ্নে ভাবতে পারতো, কিন্তু কোন দিন বাস্তবে রূপলাভ করার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সেলজুকী সালতানাত হলে এমন অধরা স্বপ্নই তাদের হাতের মুঠোয় ধরা দেবে এই ভাবনায় তারা উৎসাহী হয়ে উঠলো।

এর পরের ঘটনা খুবই দ্রুত ঘটতে শুরু করলো। ছুটি সংক্ষিপ্ত করে সুন্দরী স্ত্রী সাথে নিয়ে কমান্ডার রজব ভাই ও তার সঙ্গী কমান্ডার ফরীদ সেলজুকী গযনী সেনাবাহিনীতে ফিরে এলো। অল্পদিনের মধ্যেই তারা কর্মরত সেলজুকীদেরকে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে সুকৌশলে ক্ষেপিয়ে তুলতে সক্ষম হলো। আসলে সেলজুকীদেরকে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার পেছনে কমান্ডার রজব ও ফরীদের চেয়ে তাদের স্ত্রী পরিচয়দানকারী ইহুদীদের হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুই সুন্দরীর ভূমিকাই ছিলো বেশী।

রজব ও ফরীদের স্ত্রী বাছাই করে করে একেক জন সেলজুকী সৈনিককে তাদের খালি ঘরে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসতো এবং তাদের রূপ সৌন্দর্যের ঝলক দেখিয়ে, নগদ সোনা দানা, ক্ষমতা ও জায়গা জমির লোভ দেখিয়ে সহজেই তাদের ফাঁদে আটকাতে সক্ষম হতো। দুই সুন্দরী সেলজুকী সৈন্যদের ডেকে সেলজুকীদের উপর গযনী বাহিনীর জুলুম, অত্যাচার, গযনী বাহিনীর হাতে সেলজুকীদের নিহত হওয়ার ব্যাপারটি আবেগ, মমতা ও কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে উপস্থাপন করে প্রতিটি সেলজুকী সৈনিকের মনে জাতীয়তাবোধ উস্কে দিতে সক্ষম হয়। ফলে সেলজুকী সৈনিকদের ইসলামী চেতনা বিলীন হয়ে সেখানে জন্ম নেয় প্রতিশোধ প্রতিহিংসা স্বজাতি হত্যা, বঞ্চনার প্রতিশোধ স্পৃহা আর স্বাধীন সেলজুকী সালতানাত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রতিটি সেলজুকীর রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়।

শিক্ষণীয় ব্যাপার হলো, কোন নারী যদি কোন পুরুষের মধ্যকার পৌরুষ ও হিংস্রাতাকে উস্কে দিতে চায় তা সহজেই পারে। কেননা, একজন পুরুষের পৌরুষ, সাহস ও শক্তিকে যখন কোন নারী প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায় তখন পুরুষ মাত্রই সেটিকে অপমানজনক মনে করে এবং প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠে। সেলজুকীদের ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটলো। খুব সহজেই ইহুদীদের ক্রীড়নক দুই সুন্দরী তরুণী তাদের রূপ সৌন্দর্য ও বাক চাতুর্যের ফাঁদে ফেলে সেলজুকীদের গযনী বাহিনীর জন্যে আত্মঘাতি যোদ্ধায় পরিণত করলো।

১০২০ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্ম মৌসুমে সুলতান মাহমূদ যখন পুনর্বার হিন্দুস্তান অভিযানে রওয়ানা হলেন, তার সেনাবাহিনী পরিচয়েই তার কাফেলার অংশ হয়ে গেলো গযনী বাহিনীর চরম শত্রু সেলজুকী কুচক্রী। এদের সহযোগী হিসেবে আত্মপরিচয় গোপনকারী কয়েকজন হিন্দুও রওয়ানা হলো কোচওয়ান ও কমান্ডারদের একান্ত সেবকের বেশ ধারণ করে।

এসব হিন্দু ছিল গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী গোড়া হিন্দু পরিবারের লোক। এদেরকে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া হলো, কখন তাদেরকে কি ভূমিকা পালন করতে হবে।

গযনীর সৈন্যরা যখন হিন্দুস্তানের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করল, তখন এই হিন্দুদের অবস্থা হলো অনেকটা পানি থেকে তুলে নেয়া মাছকে পানীতে পুনর্বার ছেড়ে দেয়ার মতো। হিন্দুস্তানের মাটি মানুষের গন্ধে এরা যেন প্রাণ ফিরে পেলো। তাদের দেমাগ তখন আরো বেশী সক্রিয় ও সতর্ক হয়ে গেলো এবং নিজেদেরকে তারা হিন্দুত্ববাদ রক্ষার অতন্ত্র প্রহরী ভাবতে শুরু করলো। যে কোন মূল্যে সেলজুকীদের দিয়ে সুলতান মাহমূদকে ধ্বংস করার বিষয়ে তারা হয়ে উঠলো ঘরের শত্রুবিভীষণ।

* * *

এদিকে হিন্দুস্তানের অবস্থা খুব দ্রুত গযনী সরকারের প্রতিকূলে চলে যাচ্ছিল। রাড়ীতে মহারাজা রাজ্যপাল এক বিভ্রান্ত তরুণীর হাতে নির্মমভাবে খুন হয়। এই খুনের নেপথ্য শক্তি ছিল তিন হিন্দু রাজার চক্রান্ত। রাজ্যপালের ছেলে লক্ষণপাল ছিল অন্যান্য হিন্দু রাজাদের সহযোগী। কিন্তু রাড়ীর হিন্দু সৈন্যরা ছিল গযনী সরকারের নিয়োগকৃত কমান্ডারদের আজ্ঞাবহ। তাদের পূর্বানুমতি ছাড়া রাড়ীতে রাজ্যপালের এবং তার সেনাদের কোন কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। সর্বক্ষেত্রেই রাজ্যপালের প্রশাসনকে গযনীর কমান্ডারদের কাছে জবাবদেহি করতে হতো। ফলে লক্ষণপালের পক্ষে হাত পা নাড়ানো ছাড়া কার্যত কোন কিছু ঘটানোর সুযোগ ছিল না।

কিন্তু সবসময় মুসলিম আধিপত্য খর্ব করে নিজেদের হারানো গৌরব ও জৌলুস ফিরে পাওয়ার চিন্তায় বিভোর থাকতো লক্ষণপাল।

চক্রান্তমূলকভাবে মহারাজা রাজ্যপাল নিহিত হওয়ার পর চক্রান্ত উন্মোচন করতে রাড়ীতে নিয়োজিত গযনী বাহিনীর লোকেরা চক্রান্তে জড়িত সন্দেহভাজনদের ধরপাকড় শুরু করলে এই ধরপাকড় বিদ্রোহে রূপ নিলো। কিন্তু

ব্যাপক আকারের বিদ্রোহ দমনের মতো জনবল গযনী বাহিনীর হাতে ছিল না। কারণ, রাড়ীকে গযনীর নিয়ন্ত্রনণে রাখার জন্যে মাত্র কয়েকজন সেনা কমান্ডার এবং কর্মকর্তা ছিল।

রাজ্যপাল নিহতের পর ধরপাকড় শুরু হলে লক্ষণপাল তার পক্ষের সেনাদের অতি গোপনে প্রস্তুত করে ফেলে এবং রাতের বেলায় তার নিয়ন্ত্রিত সেনাদের দিয়ে গযনীর কর্মকর্তা ও সেনা কমান্ডারদের গ্রেফতার করে রাড়ীকে স্বাধীন ঘোষণা করে লক্ষণপাল নিজেকে স্বাধীন রাজা ঘোষণা করে। রাড়ীতে নিয়োজিত গযনীর সকল কমান্ডার কর্মকর্তা লক্ষণপালের সেনাদের হাতে গ্রেফতার হলেও কোনভাবে একজন সেনা কমান্ডার পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সে দ্রুত কন্নৌজের দিকে পালাতে থাকে। কিন্তু কন্নৌজের পথে পূর্ব থেকেই হিন্দু সৈন্যরা অবস্থান নিয়েছিল। ফলে এই কমান্ডারও ধরা পড়ে। কন্নৌজ ও রাড়ীর মধ্যখানে যে সৈন্যরা অবস্থান নিয়েছিলো এরা ছিল তিন রাজ্যের সম্মিলিত সৈন্য।

কালাঞ্জরের রাজা গোবিন্দ, গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন, লাহোরের রাজা তরলোচনপালের সৈন্যরা ছাড়াও কন্নৌজের পরাজিত সৈন্যরাও তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। তা ছাড়া রাড়ীর কিছু সৈন্যও এদের সঙ্গে ছিল। মূলত একটি সম্মিলিত বাহিনী ও গণফৌজ তৈরী হয়েছিল গযনীর বিরুদ্ধে। তিন ক্ষমতাধর হিন্দু রাজার সৈন্যরা ছাড়াও বিপুল সংখ্যক যোদ্ধা ছিল স্বেচ্ছা সেবক হিসাবে। এরা হিন্দুত্ববাদ রক্ষা ও ক্রমবর্ধমান গযনী সালতানাতের শক্তিকে নিঃশেষ করে দিতে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। কোন ঐতিহাসিক এদের প্রকৃত সংখ্যা উল্লেখ করতে পারেননি। শুধু এতটুকু বলেছেন, স্বেচ্ছাসেবীদের সংখ্যা ছিল সম্মিলিত তিন বাহিনীর সংখ্যার চেয়েও বেশি।

যে জাতির দেবালয় গুড়িয়ে দিয়ে দেবদেবীদের মূর্তিগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে রাস্তায় মিশিয়ে দিয়েছে গযনী বাহিনী, যে জাতির সবচেয়ে পবিত্র স্থান মথুরার হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী মন্দির ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে মুসলমান সৈন্যরা, সেই জাতি স্বভাবতই মুসলমানদের ব্যাপারে নির্বিকার থাকার কথা নয়। নির্বিকার ছিল না তারা। মুসলমানদের হাতে পরাজিত হিন্দু রাজা মহারাজা এবং এলাকার ছোট বড় প্রতিটি হিন্দু ভেতরে ভেতরে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্যে তৈরী হচ্ছিল।

হিন্দু নারীরা তাদের সখের অলংকারাদি পুরোহিতদের হাতে সঁপে দিয়েছিল, যুদ্ধ তহবিলের ঘাটতি কমাতে। হিন্দু পুরোহিত ঠাকুরেরা সমাজে প্রচার চালাচ্ছিল মুসলমানদের পরাজিত করতে জীবন-সম্পদ উৎসর্গ না করলে হিন্দু জাতি দেবদেবীদের অভিশাপে ধ্বংস হয়ে যাবে।

পুরোহিত ঠাকুররা যা বলে তা আসলে কতটুকু বাস্তব? সাধারণ হিন্দুরা এ ব্যাপারে কখনো প্রশ্ন তুলেনি। হিন্দুরা এ ব্যাপারটিও যাচাই করে দেখার প্রয়োজনবোধ করেনি সুলতান মাহমূদ হিন্দুস্তান আক্রমণের প্রথম দিনেই একদল হিন্দুর সামনে কয়েকটি মূর্তিকে টুকরো টুকরো করে বলেছিলেন— এই দেখো তোমাদের দেবতার অবস্থা! সত্যিই যদি এদের কোন শক্তি থাকে তাহলে এদের বলো, আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে। আমরা যে এদের অপমান করছি এজন্য আমাদের শাস্তি দিতে।

* * *

১০০১ সালে, প্রায় বিশ বছর আগে সুলতান মাহমূদ প্রথম হিন্দুস্তানে মূর্তি ভেঙেছিলেন। এরপর তিনি একে একে মথুরা থানেশ্বর মহাবন কন্নৌজের হাজার বছরের প্রাচীন মন্দিরগুলো ধ্বংস করে এগুলোর টুকরো রাস্তায় ফেলে উপর দিয়ে সেনাবাহিনীর ঘোড়া চালিয়ে দেন। হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল এই মূর্তিরূপী দেবদেবীরাই ভারতের সুখ সমৃদ্ধির নিয়ামক।

এসব দেবদেবীদের মূর্তি না থাকলে কোন হিন্দুর অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু বিগত বিশ বছর ধরে একের পর এক মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করে, হরেকৃষ্ণ হরিদেব এবং দশহাত বিশিষ্ট সরস্বতীর ধ্বংসযজ্ঞের পরও এ পর্যন্ত কোন মুসলমানের কিছুই হলো না। দেবদেবীরা কোনই প্রতিকার কিংবা মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারলো না। এর পরও কুসংস্কার ও কল্পনাবিলাসী হিন্দু জাতিকে চরম ধোঁকাবাজ ঠাকুর ও পুরোহিতেরা অন্ধত্বের এমন গ্যাঁড়াকলে বেঁধে রাখলো যে, হিন্দুরা একটু জোরে বাতাস প্রবাহিত হলেও হাত জোড় করে ভজনা করতে শুরু করে। আর ভাবতে থাকে, এটাই বুঝি দেবদেবীদের ক্রোধ। এরা এমনই অন্ধ ছিল যে, এসব মূর্তির পূজা অক্ষুন্ন রাখার জন্যে ঘরের সকল ধন-সম্পদ অকাতরে ঠাকুরদের হাতে তোলে দিয়েই ক্ষান্ত হতো না, নিজেদের কুমারী মেয়েদেরকে নরবলি দেয়ার জন্যে পুরোহিদের হাতে তোলে দিতো। আজ থেকে কয়েকশ বছর আগে গযনীর মুসলমানদের প্রতি তৎকালীন ভারতের হিন্দুদের যে ক্ষোভ, হিংসা ও শত্রুতার মনোভাব ছিলো হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের তেমন হিংসাত্মক মনোভাব ছিলো না।।

সুলতান মাহমূদের এবারের ভারত অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়লে সুলতান মাহমূদকে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্যে হিন্দুস্তানের সকল রাজা, মহারাজা এবং বিজিত এলাকার সকল হিন্দু প্রজা এক কাতারে শামিল হয়ে মুসলমানদের

পরাজিত করতে ধন-জন এবং জীবন উৎসর্গ করার ঘোষণা দিলো। যে সব পুরুষ অশ্বচালনা, তীরন্দাজী, তরবারী চালনা ও বল্লম চালাতে জানতো তারা সবাই সেনাবাহিনীতে যোগ দিলো। অবস্থা এমন হলো যে, যুবতী মেয়েরা পর্যন্ত মুসলমানদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে গেলো। মন্দিরের ঘণ্টা অনবরত বাজতে থাকলো এবং মন্দিরের শিংগা ভয়ংকর শব্দে চিৎকার করতে লাগলো।

দৃশ্যত গযনীর সৈন্যদের ব্যাপারে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু রাজপুতদের মধ্যে ততোটা আতংক ছিলো না।

রাজপুতেরা হিন্দুত্ববাদ ও হিন্দুদের ঐতিহ্য রক্ষার্থে এবং গযনী বাহিনীকে ঠেকাতে জীবন বিলিয়ে দেয়াটাকে অতি স্বাভাবিক ব্যাপার মনে করতো। রাজপুতনা হিন্দুদের মধ্যে তখন বিরাজ করছিলো জীবন দেয়ার উন্মাদনা। এই যুদ্ধ উন্মাদ স্বেচ্ছাসেবীরা গযনী বাহিনীর সামনে পাহাড়ের মতো প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালো।

তিন মহারাজার সম্মিলিত বাহিনীতে ছিল এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার পদাতিক সেনা, ছত্রিশ হাজার অশ্বারোহী এবং ছয়শ বিয়াল্লিশটি জঙ্গি হাতি।

পেশোয়ার অতিক্রম করার পর থেকেই সুলতান মাহমূদের কাছে নিয়মিত খবর আসছিল হিন্দুদের যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে। গোয়েন্দারা জানিয়ে দিয়েছিল গযনী বাহিনীর তুলনায় শত্রু বাহিনীর সংখ্যা তিনগুণেরও বেশী। আরো খবর আসছিল হিন্দু সেনারা কোথায় কোথায় অবস্থান নিয়েছে।

সুলতান মাহমূদ তার সেনাদল নিয়ে চন্নাব নদী পার হচ্ছিলেন। ঠিক এই সময় খবর এলো, রাড়ীতে লক্ষণপালের সেনারা মুসলমান কর্মকর্তা ও কমাণ্ডারদের বন্দি করে রেখেছে। কন্নৌজ দুর্গও অবরুদ্ধ হওয়ার আশংকা আছে।

ঠিক এর পর পরই খবর এলো, কন্নৌজ অবরোধের সম্ভাবনা নেই। কারণ, মহারাজা অর্জুনও মহারাজা গোবিন্দ বিপুল জনশক্তির বলে খোলা ময়দানেই গযনী বাহিনীর মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। এক গোয়েন্দাকে সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, লাহোরের সৈন্যরা কোথায় আছে?

যমুনার তীরবর্তী কোন ঘন জঙ্গলে— জবাব দিল গোয়েন্দা। লাহোরের সৈন্যরা ঠিক কোথায় তাঁবু ফেলেছে তা জানা সম্ভব হয়নি সুলতান! তবে জানার চেষ্টা অব্যাহত আছে। লাহোরের সেনাদের বিষয়টিই বেশী ঝুকিপূর্ণ। কারণ, এরা কোন দিক থেকে কিভাবে হামলা করবে এখনো বোঝা যাচ্ছে না।

ঠিকই বলেছো তুমি— গোয়েন্দাকে বললেন সুলতান। এদের বিষয়টি আমাকে খুব ভাবনায় ফেলেছে। আমি এদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাই।

তৎকালীন কয়েকটি ইতিহাসগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে ইংরেজ ঐতিহাসিক স্মিত লিখেছেন— রাড়ীতে গযনীর কর্মকর্তারা বন্দি হয়েছে— এ খবর পাওয়ার পর পাঁচটি নদী পাড়ি দিয়ে দুই দিনের মধ্যে সুলতান মাহমূদ রাড়ী এলাকায় পৌঁছে গেলেন এবং কোন বিশ্রাম না নিয়েই রাড়ী আক্রমণ করলেন। আক্রমণের সাথে সাথে সুলতানের কাছে খবর এলো, মুসলিম সৈন্য ও কর্মকর্তাদেরকে হিন্দুরা হত্যা করেছে। একথা শুনে সুলতান রাড়ীকে সম্পূর্ণ মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তাই ঘটলো। রাড়ীতে যে হিন্দুবাহিনী ছিলো এদের পক্ষে প্রাথমিক আক্রমণ সামলানোও সম্ভব হলো না। রাড়ীকে এভাবে ধ্বংস করে দেয়া হলো যে, সেখানে সকল বাড়ি ঘর ভেঙে ফেলা হলো। মন্দিরগুলোকে সম্পূর্ণ ভেঙে চুড়ে ধ্বংসাবশেষও নদীতে নিক্ষেপ করা হলো।

আসল যুদ্ধ তখনো শুরু হয়নি। সুলতানের কাছে অনবরত রাজা গোবিন্দ ও রাজা অর্জুনের সেনাদের খবরাখবর আসছিল। সুলতান মাহমূদ ভাবছিলেন কিভাবে এদের মোকাবেলা করবেন। এক সাথে উভয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বেন, না দুই বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করবেন।

সুলতান যখন এমন চিন্তায় বিভোর তখন প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ সুলতানের উদ্দেশ্যে বললেন— সম্মানিত সুলতান! লাহোরের সেনাদের অবস্থান জানা যায়নি। আশংকা কিন্তু এদের থেকেই বেশী। হতে পারে এরা পেছন থেকে আমাদের উপর হামলা করবে।

সুলতান মাহমূদও প্রধান সেনাপতির মধ্যে যখন এসব কথা হচ্ছিল, তখন হঠাৎ গযনী সেনাদের মধ্যে শোরগোল দেখা দিল। সুলতান মাহমূদ দ্রুত তাঁবু থেকে বেরিয়ে নিরাপত্তা রক্ষীদেরকে বললেন, দ্রুত গিয়ে শোরগোলের কারণ জেনে এসো।

নিরাপত্তারক্ষীরা ঘুরে এসে যে খবর দিলো তাতে বেশ অবাক হলেন সুলতান। নিরাপত্তারক্ষীরা জানালো, চার কমান্ডার ও চার সৈনিক চামড়ার থলের মধ্যে হাওয়া ভরে এগুলোতে ভর করে নদী পারাপারের জন্যে নদীতে ঝাপ দিয়েছে এবং নদী পেরিয়ে গেছে।

সুলতান ও প্রধান সেনাপতি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই আট সেনা হয়তো পালিয়ে গেছে এবং এরা গিয়ে শত্রু বাহিনীতে যোগ দিবে। এদেরকে পিছু ধাওয়ার ব্যাপারটি সহজ ছিলো না। তবুও কয়েকজন সাহসী যোদ্ধাকে নির্দেশ

দেয়া হলো, তারাও যেনো পানির থলের মধ্যে হাওয়া ভরে নদী পেরিয়ে ওদেরকে পাকড়াও করতে চেষ্টা করে। যদি সাহায্যের দরকার হয় তবে যেনো সংকেত দেয়। যাতে আরো সহযোগী পাঠানোর ব্যবস্থা করা যায়।

একে তো শীতের মওসুম, তদুপরী রাতের অন্ধকার। সেই সাথে বরফ শীতল ঠাণ্ডা পানি। রাতের অন্ধকারে ঠাণ্ডা পানিতে সাঁতার কাটা সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু সবকিছুকে উপেক্ষা করে বারো তেরোজন সৈনিক স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে পানির থলিতে হাওয়া ভরে ততোক্ষণে নদীতে নেমে পড়েছে। শীত মওসুম হওয়ার কারণে নদীতে পানি কম ছিল এবং শ্রোতের তীব্রতাও বেশী ছিল না। দশ বারোজনের কাফেলা যখন নদীতে নেমে গেলো, তখন নদীর তীরে আবারো শোরগোল শোনা গেল। সেই সাথে নদীর ওপারে দেখা গেল আগুনের কুণ্ডলী। দেখে মনে হলো কোন বসতীতে আগুন লেগেছে।

অবস্থা দেখে প্রধান সেনাপতি নদীর তীরবর্তী লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, যারা প্রথমে নদী পার হয়েছে এরা কারা? তাকে তাদের নাম পরিচয় জানানো হলো। শুনে প্রধান সেনাপতি বললেন— মুহতারাম সুলতান! যারা প্রথমে নদী পার হয়েছে এরা পালিয়ে যাওয়ার লোক নয়। এদেরকে আমি ভালোভাবেই জানি, খুবই আবেগপ্রবণ। নিশ্চয়ই এরা শত্রুপক্ষের কোন তাঁবুতে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়েছে। আমাকে অনুমতি দিন, আমি দু'টি ইউনিট নিয়ে ওপাড়ে চলে যাই।

কিন্তু যাওয়ার আগে তো জানা দরকার ওখানে কারা আছে এবং কি অবস্থায় আছে? বললেন সুলতান। সেনা ইউনিট তুমি প্রস্তুত রাখতে পারো, যে কোন সময় কাজে লাগতে পারে।

এদিকে নদীর ওপাড়ের শোরগোল ক্রমশ বাড়তে থাকলো। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থলটি ছিল প্রায় তিন মাইল দূরে। সেখানকার শোরগোলের আওয়াজ কিছুটা এখানেও শোনা যাচ্ছিল। কারণ, রাতের পরিবেশ ছিল অনেকটাই শান্ত।

এভাবে কিছুটা সময় কাটার পর এক অশ্বারোহীকে নদীর পানি চিড়ে এ পাড়ের দিকে অগ্রসর হতে দেখা গেলো। লোকটি যখন এপাড়ে উঠে এলো তখন দেখা গেলো গযনী বাহিনীর যে চারজন নদী পেরিয়ে গিয়েছিল সে তাদেরই একজন। লোকটি ঘোড়ার পিঠের উপর বসে নদী পার হলো। লোকটি নদীর মাঝখানে থাকতেই চিৎকার করে বলছিল, সুলতান কোথায়? প্রধান সেনাপতি কোথায়? সবাই হামলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও। আগত এই সৈনিকের চিৎকারে ছিল চরম উত্তেজনা।

তীরে দাঁড়ানো লোকেরা সেই সৈনিককে থামিয়ে দিল। সুলতান ও প্রধান সেনাপতি আগে থেকেই নদীর তীরে ছিলেন। সৈনিককে যখন সুলতানের সামনে হাজির করা হলো, তখন জানা গেল, সে গযনী বাহিনীর একজন কমান্ডার। সে সুলতানকে যা জানলো, তা কিছুতেই সুলতানের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল না।

আগন্তুক কমান্ডার জানালো— গযনী বাহিনীর এক গোয়েন্দা সন্ধার পর এসে তাকে খবর দেয়, নদীর ওপাড় থেকে মাইল তিনেক দূরে লাহোরের সৈন্যরা তাঁবু ফেলেছে এবং তারা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। একথা শুনে সে তার সঙ্গী আরো তিন কমাণ্ডারকে সাথে নিয়ে ওপাড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তাদের এই পরিকল্পনার কথা শোনে আবেগপ্রবণ আরো কিছু সৈনিকও তাদের সহগামী হলো। সবাই মিলে পানির থলের মধ্যে বাতাস ভরে নদী পেরিয়ে শত্রুবাহিনীর তাঁবুতে চলে গেল। সংবাদবাহী গোয়েন্দাকে তারা গাইড হিসেবে সাথেই নিয়ে গেল। তারা সবাই শত্রুবাহিনীর তাঁবুতে গিয়ে ঝটিকা আক্রমণ চালালো।

আবেগ ও উত্তেজনায় কাঁপতে থাকা এই কমান্ডার অতি সংক্ষেপে তাদের অভিযানের কথা জানিয়ে সুলতানকে বললো, বেশী কিছু চিন্তা করার দরকার নেই সুলতান! আপনি সৈন্যদের নিয়ে চলুন, শত্রুকে পরাজিত করার এটাই মোক্ষম সময়।

একথা শুনে আগে থেকেই দু'টি সেনা ইউনিটকে নিয়ে প্রস্তুত থাকা প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈকে অভিযান চালানোর নির্দেশ দিলেন সুলতান। কমান্ডারের নির্দেশে আলতাঈর সহযাত্রী সৈন্যদের সংখ্যা বাড়ানো হলো। সহযোগী হলো আরো দু'টি অশ্বারোহী ইউনিট।

সবাইকে নিয়ে নদী পার হলেন প্রধান সেনাপতি। আগত কমান্ডার তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আলতাঈ যখন চারটি ইউনিট নিয়ে তাঁবু পল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন, তখন অধিকাংশ তাঁবুতে আগুন জ্বলছে। গোটা শিবির জুড়ে চলছে দৌড় ঝাপ আর চেচামেচি। আগুন দেখে আতংকিত হয়ে ঘোড়াগুলো এদিক সেদিক দৌড়াচ্ছে।

অবস্থা দেখে প্রধান সেনাপতি আলতাঈ তার অশ্বারোহী ইউনিটকে গোটা তাঁবু ঘিরে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। শত্রুবাহিনীর অবস্থা তখন খুবই বেসামাল। তাদের আত্মরক্ষার জন্যে পালানো ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। লাহোরের সৈন্যরা যে যার মতো করে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু কোন উট ঘোড়াই তাদের নাগালের মধ্যে ছিল না। ফলে দৌড়ে পালাতে গিয়ে

লাহোরের সৈন্যরা গযনী সেনাদের ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হতে লাগল। যারা প্রতিরোধের চেষ্টা করলো তারা কাটা পড়ল, আর যাদের সামনে পালানো ও প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থাই ছিল না, তারা কোন কিছুর আড়ালে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করতে লাগল।

লাহোরের সৈন্যরা যেহেতু পলায়নপর ছিল এজন্য দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করছিল। আর এদের ধাওয়া করছিল গযনীর সৈন্যরা। কিন্তু রাতের অন্ধকারে একেকজন সৈন্যের পিছু ধাওয়া করে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে না বলে আলতাঈ সবাইকে সতর্ক করে দিলেন। সংবাদবাহী সৈন্যদের বললেন, সবাইকে বলে দাও, তারা যেন কারো পিছু ধাওয়া না করে। তাঁবুর আশপাশে থেকে লড়াই করে। এভাবেই কেটে গেল রাত।

সকাল বেলায় সূর্য উঠার পর দেখা গেল তাঁবু এলাকার ভয়াবহ দৃশ্য। জায়গায় জায়গায় অর্ধদগ্ধ সৈনিক, নিহতদের স্তূপ আর আহতদের কাতরানোর করুণ অবস্থা। অনেক হিন্দু সৈনিক ভয় ও আতংকে হত বিহবল হয়ে ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে আং মরার মতো পড়েছিল। পালানোর সাহস পাচ্ছিল না। ভোরের আলোয় এরা মুসলিম সৈন্যদের হাতে ধরা পড়লো। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সেনাপতি আলতাঈ নিশ্চিত জানতে পারলেন, এরাই হলো সেই লাহোরের সেনাবাহিনী। রাতের বেলায় মহারাজা তরলোচনপালও এদের সাথেই ছিল। কিন্তু মুসলমানদের আক্রমণ টের পেয়ে সেনাপতি ও তরলোচনপাল পালিয়ে যায়।

আগের দিন বিকেলেই লাহোরের এই সেনারা এখানে এসেছিল। এদের নিয়েই বেশী চিন্তিত ছিলেন সুলতান। অবশ্য ধৃত কোন হিন্দু সৈনিক তাদের এখানে নিয়ে আসার কোন কারণ বলতে পারেনি। তবে সৈনিকরা কিছু বলতে না পারলেও গযনী বাহিনীর এতো কাছাকাছি অবস্থান নেয়া থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিল, সুলতান মাহমূদ যদি কারো সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তেন তাহলে তরলোচনপাল পেছন দিক থেকে গযনী বাহিনীকে আক্রমণ করতো।

রাজা তরলোচনপাল ও তার উর্ধ্বতন সেনাকর্মকর্তাদের কাউকে তাঁবুতে পাওয়া যায়নি। লাহোর বাহিনীর কর্মকর্তারা শুধু পালিয়ে যায়নি, ছেড়ে গেছে সকল সেনা আসবাবপত্র, ঘোড়ার গাড়ি। সবই আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সৈন্যরা হয় কাটা পড়েছে নয়তো ধরা পড়েছে কিংবা আহত হয়েছে। ফলে লাহোর বাহিনীর পক্ষ থেকে আর কোনপ্রকার আক্রমণের আশংকা রইলো না।

এক ইংরেজ ঐতিহাসিক তৎকালের মুসলিম ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, তরলোচনপাল রামগঙ্গা নামের একটি খরস্রোতা নদীর ওপাড়ে অবস্থান নিয়ে ছিলো।

এটি ছিল সুলতানের আট সৈনিকের একটি যুগান্তকারী বীরত্বপূর্ণ ঘটনা। মাত্র আটজন যোদ্ধা প্রায় বিশ হাজার সৈন্যের শিবিরে অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করলো। যা ছিল বিশাল এক তাঁবুপল্লী। সুলতান মাহমূদ এই আট যোদ্ধাকে পরদিনই বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করলেন। কারণ, এই আটজনের ঝটিকা আক্রমনের পেছনে কোন উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তার নির্দেশনা ছিলো না। তারা স্বউদ্যোগেই এমনটি করেছিল। ঝটিকা আক্রমনের বিস্তারিত বর্ণনা সেই সময়কার ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে এভাবে লেখা হয়েছে—

কমান্ডাররা বললো, সুলতান প্রায়ই লাহোরের সৈন্যদের ব্যাপারটি আলোচনা করতেন। লাহোর বাহিনীকে তিনি খুবই ঝুকিপূর্ণ মনে করছিলেন। তা ছাড়া রাড়ীতে হিন্দুরা গযনীর সেনা কমান্ডার ও কর্মকর্তাদের হত্যা করেছে। এ নিয়ে সুলতান খুবই বিচলিত ছিলেন। রাজা তরলোচনপালের প্রতি সুলতান ছিলেন খুবই রাগান্বিত। মৈত্রী চুক্তি থাকার পরও সে অন্য হিন্দু রাজাদের গযনীর বিরুদ্ধে উসকানি দিচ্ছে এবং পেছন দিক থেকে গযনী বাহিনীর উপর আক্রমণ করার জন্যে তার সেনাদেরকে লুকিয়ে রেখেছে।

ঘটনাক্রমে সেই দিন সন্ধ্যায় গযনীর এক গোয়েন্দা নদী পার হয়ে এপাড়ে উঠছিল। সে সময় এক কমান্ডার নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ছিল। কমান্ডার ছিল গোয়েন্দার পরিচিত। ফলে বন্ধুকে পেয়ে সে আনন্দ চিত্তেই বলে দিল— বহু প্রত্যাশিত একটি কাজ আমি করে এসেছি। দীর্ঘ দিন অনুসন্ধানের পর আজ আমি লাহোরের সেনা শিবির দেখে এসেছি।

একথা শুনে কমান্ডার আবেগে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সে কথাটি তার তিন সহকর্মী কমান্ডারকে জানালো। তারাও মনের মধ্যে বিরাট উত্তেজনা অনুভব করলো এবং অভিযানের জন্যে তৈরী হয়ে গেল। বিষয়টি এদের পাশে থাকা চার সৈনিক শুনে তারাও সহযাত্রী হতে উৎসাহী হলো। ফলে তৈরী হয়ে গেল আটজনের কাফেলা। কোন উপায় না পেয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে পানির থলের মধ্যে বাতাস ভরে তাতে ভর করে নদী পেরিয়ে গেল তারা। এরাই সংবাদ সংগ্রহকারী গোয়েন্দাকে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উজ্জীবিত করলো। ফলে সেই কমান্ডার ও সেনারা একাকার হয়ে সুলতানের কাছে খবর না পৌঁছিয়েই ঝটিকা অভিযানে বেরিয়ে পড়লো।

যে চারজন কমান্ডার অভিযানে গিয়েছিল এরা ছিল রাতের ঝটিকা আক্রমণে পারদর্শী। তরলোচনপালের শিবিরের নিরাপত্তা বলয়ের ভেতরে গিয়ে তারা প্রথমে দু'জন প্রহরীকে হত্যা করল। এরপর একটি তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিল। সাথে সাথে আগুন জ্বলে উঠলো। তারা দ্রুত কিছু কাপড়ের টুকরোতে আগুন ধরিয়ে সারিবদ্ধভাবে তৈরী তাঁবুগুলোর দিকে নিক্ষেপ করতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে এক সঙ্গে অনেকগুলো তাঁবুতে জ্বলে উঠলো আগুন। অপর দিকে দু'জন সেনা অতি সংগোপনে অনেকগুলো ঘোড়ার রশি খুলে দিল। কয়েকটি ঘোড়াকে খঞ্জর দিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করল। বন্ধনমুক্ত ও আহত ঘোড়াগুলো আতংকিত হয়ে দিগবিদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করলো এবং তীব্র হ্রেষারব করে অপর ঘোড়াগুলোর মধ্যে আতংক ছড়িয়ে দিল।

গযনীর ঝটিকা আক্রমণকারীরা যখন আক্রমণ করেছিলো তখন লাহোরের সেনারা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল। অগ্নি সংযোগের ব্যাপারটি দুর্ঘটনা না শত্রু বাহিনীর আক্রমণ তা বুঝতে তাদের অনেক সময় লেগে গেল। ততোক্ষণে গোটা শিবিরেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। লাহোর বাহিনীর তাঁবু ছিল খুব ঘন। একটির সাথে একটি লাগানো। দুপাশে পাহাড় আর মাঝখানে একটি সংকীর্ণ সমতল জায়গায় গাদা গাদি করে কয়েক হাজার তাঁবু খাটিয়ে ছিল তারা। ফলে দ্রুত একটির আগুন আরেকটিতে ছড়িয়ে পড়ল। ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময় তীব্র বাতাস বয়ে যাওয়ায় আগুন আরো ছড়িয়ে পড়েছিল।

সাফল্যের সাথে লাহোর শিবিরে অগ্নিসংযোগ করে গযনী বাহিনীর মরণজয়ী যোদ্ধারা পাশের পাহাড়ের উপড়ে উঠে গেল এবং দৌড় ঝাপরত হিন্দু সেনাদের উপর এলোপাথাড়ী তীর ছুড়তে লাগলো। তীর ধনুক তারা নিজেদের সাথে নিয়ে গিয়েছিল।

এই সময় একজন কমান্ডারের মাথায় এলো, আমরা যদি আমাদের সেনাবাহিনীকে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে এই অবস্থায় এদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব। একথা সে তার সাথীদের জানিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে নেমে এলোপাথাড়ী ঘুরতে থাকা যে ঘোড়াগুলো দূরে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অগ্নিকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছিল এমন একটি ঘোড়াকে ধরে সেটির পিঠে চড়ে নদীর তীরের দিকে ঘোড়া ছুটাল। এই কমান্ডারই নদী পেরিয়ে এসে প্রধান সেনাপতি ও সুলতানকে খবর দেয়। সুলতান প্রধান সেনাপতিকে চারটি অশ্বারোহী ইউনিটকে নিয়ে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন।

* * *

কালাঞ্জরের রাজা গোবিন্দ তার সেনাদের নিয়ে কালাঞ্জর ছেড়ে আসার খবর সুলতান মাহমূদের কাছে পৌছে যায়। সুলতান এ খবর পেয়ে তার সেনাদেরকেও অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। সুলতান কন্নৌজ থেকে কালাঞ্জরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি খবর পেলেন গোবিন্দের সেনাবাহিনী যমুনা নদী পেরিয়ে এসেছে। সুলতান মাহমূদের সৈন্যরা পথিমধ্যে মাত্র দু'টি বিরতি দিয়ে এলাহাবাদ নামক স্থানের কাছাকাছি পৌছে গেলেন। তাদের অবস্থান থেকে এলাহাবাদ খুব বেশি দূরে ছিল না। এদিকে রাজা গোবিন্দের সেনাদের অবস্থান মাত্র তিন চার মাইল দূরে ছিল।

এই সময় সুলতান মাহমূদের সেনাদের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকা সেই চক্রান্তকারীরা তাদের চক্রান্তের চাল দিতে শুরু করল। চক্রান্তের মূল হোতা ছিল দুই সেলজুকী কমান্ডারের আত্মপরিচয় গোপনকারী স্ত্রী। এরা এই অভিযানে আসার শুরু থেকেই অন্যান্য মহিলাদের থেকে দূরে দূরে থাকতো। কেউ তাদের ব্যাপারে যাতে টের না পায় তাই এ ব্যবস্থা করেছিল তারা। এলাহাবাদ এলাকায় এসে যাত্রা বিরতি করলে এরা সক্রিয় হয়ে উঠে।

এক রাতে আম্বরী পায়চারী করতে করতে তার তাঁবু থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছিল। হঠাৎ তার কানে মানুষের ফিসফিসানির আওয়াজ ভেসে এলো। কেন জানি আম্বরীর মনের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধলো। সে ব্যাপারটি বোঝার জন্য পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে সেই ফিসফিসানির দিকে অগ্রসর হলো। কিছুটা অগ্রসর হলে সে শুনতে পেলো একজন মহিলার অনুচ্চ আওয়াজ। খুবই সতর্কভাবে কথা বলছে। কি বলছে তা পরিষ্কার শুনতে পেল আম্বরী। চাদনী রাত। বাইরে কিছুটা আলো আধারী অবস্থা। আম্বরী শুনতে পেল—

আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না। লাহোরের সৈন্যরা তো ধোঁকায় পড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে— বলছিল এক মহিলা। তোমরা বলছো, মহারাজা গোবিন্দের সৈন্যরা আসছে। তাই যদি সত্যি হয় তবে কোচওয়ান দু'জনকে পাঠিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা কর। যোগাযোগ হয়ে গেলে পরবর্তী কাজ লড়াই শুরু হলে করা যাবে।

আমি কিন্তু সকলকেই সতর্ক করে দিয়েছি। আমাদের কি করতে হবে তাও বলে দিয়েছি— বললো এক পুরুষ।

তুমি কাজের লোক। এজন্যই তো আমি তোমাকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি। আমি তো তোমারই। ও তো শুধু নামের স্বামী আসল স্বামী তুমি। বললো সেই নারী।

এসময় কারো পায়ের শব্দ শোনে পুরুষটি একটু দূরে সরে গেল। আম্বরীও তার জায়গা থেকে কয়েক কদম পিছিয়ে এলো। কিন্তু নারীটিকে চেনার জন্য সে কোন দিকে যায় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখল আম্বরী। যে দিকে মহিলাদের তাঁবু ছিল সেদিকেই মহিলাটি আসছিল। নিজেকে আড়াল করার জন্যে আম্বরী একটি ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল। মহিলা যখন কাছাকাছি এলো, তখন আম্বরী বসা থেকে এমনভাবে দাঁড়াল যাতে মনে হয়, সে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে এসেছিল। মহিলাকে দেখে আম্বরী হতবাক!

দোশীন! আমি ভুল করছি না তো? মহিলাকে চিনতে পেরে বললো আম্বরী।

আরে! আম্বরী না? কার সাথে যুদ্ধে এসেছো? ও! ওই লোকটার সাথে এসেছো মনে হয়, যার সাথে পালিয়ে এসেছিলে? বললো দোশীন।

তুমিও হয়তো পালিয়েই এসেছো? কোন খান মেয়েকে গযনী সৈনিকের সাথে দেখলে আসলে আশ্চর্যই লাগে— বললো আম্বরী।

আচ্ছা! তোমার স্বামী কে? দোশীনকে জিজ্ঞেস করলো আম্বরী।

কমান্ডার রজব ভাই? সে সেনাবাহিনীর কমান্ডার জান না?

এভাবে বলছো কেন? রজব সেলজুকী বলো না। আমি তাকে চিনি। তার সাথেই এসেছো তাহলে? বললো আম্বরী।

আমি অন্য কারো সাথে আসিনি। এসেছি স্বামীর সাথে— বললো দোশীন।

হেসে ফেললো আম্বরী। বললো, আমি চিনি রজবকে। তুমি যার সাথে কথা বলছিলে সে রজব ছিল না। আজ কোন কমান্ডারের এ সময়ে এখানে থাকা সম্ভব নয়। আমার স্বামীও কমান্ডার। আমি জানি তাদের কারো পক্ষে এই মুহূর্তে এদিকে আসা সম্ভব নয়।

দোশীন! যাই করো না কেন বুঝে শুনে করো। সেনাবাহিনীর সাথে থাকতে হলে নিয়ত ঠিক রাখতে চেষ্টা করো।

একথা শুনে দোশীন আম্বরীকে জড়িয়ে ধরে হেসে বললো— তুমি ঠিকই বলেছো আম্বরী। লোকটি আসলে রজব ছিল না। তার এক বন্ধু তার খবর নিয়ে এসেছিল। তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছো? আমি গযনী সালতানাতের অনুগত ও বিশ্বস্ত। যদি গযনী সালতানাতের অনুগতই না হতাম তাহলে এখানে আসতাম না। আমাকে নিজের মতোই মনে করো। আমি গযনী বাহিনীর নিরাপত্তা ও বিজয়ের জন্যে সব সময়ে দু'আ করি— একথা বলে আম্বরীকে একটি হাসি উপহার দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল দোশীন। আম্বরী সেখানেই দাঁড়িয়ে ব্যাপারটি নিয়ে গভীর চিন্তায় পড়ে গেল।

মহারাজা গোবিন্দের সেনাদের অবস্থা জানার জন্য সুলতান মাহমূদ নিজেই এগিয়ে গেলেন। প্রধান সেনাপতি আলতাঈও তার সঙ্গে ছিলেন। সুলতান ঘোড়া থেকে নেমে একটি উঁচু গাছে চড়লেন। মহারাজা গোবিন্দের সেনা বাহিনী দেখে তার চক্ষু ছানাবড়া। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক গারদীজী, ইবনুল আসির ও কারখী লিখেছেন— সুলতান মাহমূদ যখন মহারাজা গোবিন্দের সেনাবাহিনী দেখলেন, তখন তার উদ্বেগ আড়াল করতে পারলেন না। যতদূর দৃষ্টি গেলো সবখানে ছড়িয়ে ছিল সেনা শিবির, হাতি, ঘোড়া। জায়গায় জায়গায় খন্দক খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। ঐতিহাসিক আবুল কাসেম ফারিশতাও একথা সমর্থন করেছেন।

ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সুলতান মাহমূদ গোবিন্দের বিপুল সেনা সমাবেশ দেখে প্রধান সেনাপতিকে বললেন, নিজের দেশ ছেড়ে এতদূর আসাটা উচিত হয়নি। আমাদের জন্য কোন সেনাসাহায্য বা রসদপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। পিছু হটারও কোন ব্যবস্থা নেই। শত্রু বাহিনী তো আমাদেরকে কন্নৌজের দুর্গ পর্যন্তও পৌঁছতে দেবে না। আমাদের দুর্গ বন্দি হয়েই লড়াই করা উচিত।

আমি এই প্রথম সুলতানের কণ্ঠে পিছু হটার কথা শুনলাম— বলে মন্তব্য করেছিলেন আলতাঈ। এরপর সুলতানের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, শত্রু বাহিনীর জনশক্তি বিপুল। কিন্তু আমাদের পিছু হটার চিন্তা ত্যাগ করা উচিত সুলতান!

তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু ঠিক এই পরিমাণ সৈন্য গোয়ালিয়রেরও রয়েছে। ওরাও যদি এখানে এসে পড়ে তাহলে পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে? একথা বলতে বলতে নীরব হয়ে গেলেন সুলতান। কিছুক্ষণ এভাবে থেকে মৃদু মাথা ঝাড়া দিয়ে বললেন, তওবা তওবা! আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন! আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন! হায়! আমি আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলাম। আল্লাহ মহান। তিনিই জয় পরাজয়ের মালিক।

বিপদের সময় সুলতান যা করতেন, গাছ থেকে নেমে এবারও তাই করলেন। কিবলামুখী হয়ে দু'রাকাত নামায পড়লেন। তার সাথে যারা ছিল তারাও নামায পড়লো। তারপর সুলতান শিবিরে ফিরে এলেন।

মহারাজা গোবিন্দের সৈন্যদের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার পদাতিক, ছয়ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, এবং ছয়শো চল্লিশটি জঙ্গি হাতি ছিল। সে ছিল তার রাজধানী থেকে মাত্র এক দিনের দুরত্বে। তার রাজ্যের ছোট বড় সকল ধরনের লোকই যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে শরীক ছিল। গোটা হিন্দু জাতি ছিল ঐক্যবদ্ধ। এদিকে সুলতান মাহমূদের আল্লাহর উপর ভরসা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

সুলতান মাহমূদ শিবিরে গিয়ে সকল কমান্ডার ও ডেপুটি কমান্ডারসহ সেনাকর্মকর্তাদের একত্রিত করলেন। তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, কোন দিন রণাঙ্গনে তোমরা আমাকে হতাশ করনি। খুব কঠিন ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তোমরা শত্রুদের পরাজিত করেছো। দুই গুণ, তিন গুণ জনশক্তির অধিকারী শত্রু বাহিনীকেও তোমরা হাতিয়ার ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছো। কিন্তু আজ তোমাদের সামনে পাহাড় দাঁড়ানো। তোমাদের একজনকে আমি বারোজনের সাথে মোকাবেলা করার নির্দেশ দিতে পারি না। তোমাদেরকে বিশাল হাতির সাথে মোকাবেলা করতে বলতে পারি না।

আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তোমরা এখানে একটা পবিত্র আকাঙ্খা নিয়ে এসেছো। আমি তোমাদের শুধু একথা বলে দিতে চাই, শত্রু বাহিনী যতো প্রবলই হোক না কেন আমাদের পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার কোন জায়গা নেই। পরাজিত হলে আমাদের অধিকাংশই নিহত হবো। আর যারা বেঁচে থাকবে তারা হবে হিন্দুদের কয়েদী। হিন্দুরা গযনীর যে কোন বন্দির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিটি পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে। তাদের দেবদেবীদের অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেবে।

আমরা পরাজিত হলে আমাদের প্রাণ সম্পদের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইসলাম। হিন্দু রাজারা গযনী দখল করে নেবে। তোমরা জীবিত না থাকলে বিজয়ী না হলে গযনী দখল থেকে হিন্দুদের বাধা দেয়ার কেউ থাকবে না। তখন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি হিন্দুরা দখল করে নেবে। আমাদের মা বোন কন্যারা হিন্দুদের বাদী দাসীতে পরিণত হবে। যে গযনী এখন ইসলামী সালতানাতের রাজধানী, হিন্দুরা সেটিকে মূর্তি পূজার রাজধানীতে রূপান্তরিত করবে। এদিকে হিন্দু শত্রু আর ওদিকে ইহুদী ও খৃস্টান শত্রু। ইহুদী ও খৃষ্টশক্তি মিলে আমাদের ক্ষমতালোভী আমীর উমারাদের বিভ্রান্ত করে ভেতরে ভেতরে আমাদের শক্তিকে ফোকলা করে রেখেছে। ফলে আমাদের চতুর্দিকে মুসলিম শাসন থাকলেও তারাও আমাদের ও ইসলামের ঘোরতর শত্রু।

হিন্দুরা যদি একবার গযনী পৌঁছে যেতে পারে তাহলে সকল কাফের বেঈমান মিলে কা'বা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আর এমনটি হলে আল্লাহর কাছে আমাদের সবাইকে অপরাধী সাব্যস্ত হতে হবে।

তাই বলছি বন্ধুরা! আজ তোমরা আল্লাহর নির্দেশে লড়াই করবে। আল্লাহর নাম নিয়ে লড়বে, আল্লাহর সাহায্য নিয়ে লড়বে। আল্লাহর রহমতের প্রতি শতভাগ ভরসা রেখে তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বাকী কাজ আল্লাহ করে দেবেন।

একথা বলার পর সুলতান সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে শুরু করলেন। কোন ইউনিট কোন দিকে থাকবে এবং কিভাবে কোন কৌশলে মোকাবেলা করবে তা কমান্ডারদের বুঝিয়ে দিলেন।

গযনী বাহিনীর অবস্থানের ডান দিকে ছিল যমুনা এবং বাম দিকে ছিল গঙ্গা নদী। দুই নদীর মাঝখানের বিস্তৃতি কোথাও বিশ মাইল কোথাও চল্লিশ মাইল। সুলতান মাহমূদ চাচ্ছিলেন রাজা গোবিন্দের সেনাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করতে; কিন্তু দৃশ্যত এটা সম্ভবপর মনে হচ্ছিল না। তবুও তিনি তার পরিকল্পনা মতো সেনাদের দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়ে বললেন, প্রত্যেক কমান্ডার যেন তাদের অধীনস্ত প্রত্যেক সেনার কাছে তার এই বার্তা ও পয়গাম পৌঁছে দেয়।

* * *

এদিকে আম্বরী দোশীনের তাঁবুটি তখনই চিহ্নিত করে এলো। দোশীনের কার্যক্রমে আম্বরীর দৃঢ় বিশ্বাস হলো, সে শুধু তার স্বামীকেই ধোকা দিচ্ছে না, সুলতান মাহমূদের জন্যও মারাত্মক ধোঁকা হয়ে এসেছে। সেই রাতের প্রথম প্রহরে আম্বরীকে তার স্বামী উমর ইয়াজদানী শত্রুবাহিনীর বিপুলতা এবং সুলতানের উদ্বেগ ও তাঁর ভাষণ সম্পর্কে জানিয়ে দু'আ করতে বলে তখনই তাঁবু ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

আম্বরী তখনো তার স্বামী উমরকে জানায়নি, এখানে এক সেলজুকী কমান্ডারের স্ত্রী হয়ে এসেছে এক খান তরুণী। আম্বরী দোশীনকে ভালো ভাবেই জানতো। জানতো দোশীনের মন মানসিকতা এবং স্বভাবচরিত্র। ফলে সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না দোশীন ও তার সেলজুকী স্বামী গযনী সরকারের প্রতি অনুগত। কারণ, দোশীন ছিল একজন মারাত্মক কূট স্বভাব ও দুশ্চরিত্রের প্রতিমূর্তি। তাই আম্বরী সেই সন্ধ্যার পর থেকেই দোশীনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগলো। আম্বরী তার কর্মচারীকেও বলে দিয়েছিল দোশীনের প্রতি কড়া নজর রাখতে এবং তার তৎপরতা সম্পর্কে সাথে সাথে তাকে জানাতে।

পরের রাতের ঘটনা। সন্ধ্যার পর আম্বরী তার তাঁবুতে একাকি বসে আছে। তার স্বামী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। এমন সময় আম্বরীর কর্মচারী তাঁবুতে ঢুকে তাকে জানালো, সে দোশীনকে নদীর দিকে যেতে দেখেছে এবং তার পিছু পিছু দুইজন কোচওয়ানও নদীর দিকেই যাচ্ছে।

একথা শোনার সাথে সাথে আম্বরী তার কর্মচারীর নির্দেশনা অনুযায়ী নদীর দিকে অগ্রসর হলো। আম্বরী মূল পথ ছেড়ে একটু দূর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। কিছুক্ষণ অগ্রসর হয়েই সে দেখতে পেলো, চারজন লোকের সাথে শুধু দোশীন একা নয় আরেকজন নারীও দাঁড়ানো। আম্বরী একটা ঝোপের আড়াল দিয়ে পা টিপে টিপে তাদের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল এবং তাদের কথাবার্তা পরিষ্কার শুনতে পেলো। তাদের কথা থেকে আম্বরী বুঝতে পারলো, তাদের মধ্যে আসল কথা আগেই হয়ে গেছে। সে শুধু একজনকে বলতে শুনল—

নদীর তীরে নৌকা বাধা আছে, নিঃশব্দে নৌকা পর্যন্ত গিয়ে নৌকার রশি খুলে দেবে। তোমরা যে দিকে যাবে সেদিকেই এখন পানির স্রোত। কিছুক্ষণ ভেসে দূরে গিয়ে বৈঠা চালাবে। প্রহরীরা কিন্তু ওদিকেও যায়, সতর্ক থাকবে। ঘণ্টা খানিকের মধ্যে পৌছে যাবে তোমরা।

মহারাজা অশ্বারোহী সৈন্যদেরকে যেন আমাদের বামপাশে রাখে। তুমি তো আমাদের পথ দেখে এসেছো। এই পথের কথা ভালো ভাবে বুঝিয়ে দেবে। আমরা এপাশেই থাকবো। মহারাজাকে বলবে, এ পাশে আমাদের পক্ষ থেকে তার বাহিনীর উপর কোন আক্রমণ হবে না। তারা একেবারে গযনী বাহিনীর মাঝখানে চলে যেতে পারবে। সুযোগ পেলে আমরাই তীর মেরে সুলতানকে মেরে ফেলবো।

মহারাজাকে আমাদের বাম পাশের অবস্থান পর্যন্ত পৌছার পথ বুঝিয়ে দেবে। আর বলবে, আমাদের সেনারা তার সেনাদের উপর আক্রমণ করে পিছিয়ে আসবে, তারা যেন আমাদের পিছিয়ে আসার কারণে এগিয়ে না আসে। তাহলে কিন্তু সুলতানের ফাঁদে আটকে যাবে। আমাদের আক্রমণকারীরা পেছনে সরে আসলে তারাও যেন পিছিয়ে যায়, নয়তো আমরা উভয় বাহুর আক্রমণের শিকার হবো। যাও, এখন চলে যাও। তোমাদের পুরস্কারের বিষয়টাতো জানাই আছে। ঠিক ঠিক পেয়ে যাবে।

দু'জন লোক নদীর দিকে অগ্রসর হলো। আর দোশীন, অন্য মহিলা ও বাকী দু'জন পুরুষ ভিন্ন পথ ধরলো। আম্বরী তাড়াতাড়ি ঝোপের আড়াল থেকে উঠে দ্রুত তার তাঁবুতে এলো এবং তীর ধনুক এবং একটি খঞ্জর কোমরে গোঁজে তাঁবু থেকে দ্রুত পায়ে নদীর দিকে অগ্রসর হলো। সে তার কর্মচারীকেও তারবারী আর বর্শা নিয়ে তার সঙ্গী হতে বললো।

আম্বরী ছিল অনভিজ্ঞ। কিন্তু সে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। সে এটা বুঝতে পেরেছিল, সুলতান মাহমূদ জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রতারণার শিকার হতে

যাচ্ছেন। কিন্তু কিভাবে এই চক্রান্ত সামাল দেয়া যাবে? এই অভিজ্ঞতা তার ছিল না। সুলতান মাহমূদের প্রতি তার এতোটাই শ্রদ্ধা ছিল যে, আবেগের তীব্রতায় সে তীর ধনুক ও খঞ্জর নিয়ে তার কর্মচারীকে সঙ্গী করে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। নদী খুব বেশী দূরে ছিল না। অতি আবেগ প্রবণ হয়ে পড়ার কারণে তাকে কেউ অনুসরণ করছে কিনা সেই খেয়াল আম্বরীর ছিল না। কত তাড়াতাড়ি সে নদীর তীরে পৌঁছাতে পারবে এটাই ছিল তার লক্ষ্য। ঠিক সময়েই নদী তীরে পৌঁছে গেল আম্বরী।

সে নদী তীরে পৌঁছে দেখল, চক্রান্তকারী দু'জন নৌকায় উঠে পানিতে নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছে। স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে নৌকা। চাঁদনী রাত। বেশী দূর যায়নি নৌকাটি। আম্বরী তাড়াতাড়ি কিছুটা ভাটির দিকে গিয়ে এক হাটু মাটিতে ঠেকিয়ে ধনুকে তীর ভরে ছুড়ে দিল। কাল বিলম্ব না করে বিদ্যুৎ বেগে আরেকটি তীর ছুড়লো আম্বরী। উভয় তীর লক্ষভেদ করলো। কিন্তু ততোক্ষণে ঘটে গেছে অন্য কাণ্ড।

তার পিছনে আসা কর্মচারীর কণ্ঠ চিড়ে বেরিয়ে এলো আর্তচিৎকার। শেষ তীরটা ধনুক থেকে বেরিয়ে যেতে না যেতেই পেছন দিকে তাকিয়ে আম্বরী দেখল, তার কর্মচারীর উপর দু'জন লোক আক্রমণ করেছে। এদের একজন আম্বরীর দিকে দৌড়াতে চাচ্ছে, আর আম্বরীর কর্মচারী বর্শা দিয়ে তাকে আটকাতে চাচ্ছে। কর্মচারী সর্বশক্তি দিয়ে দু'জনের মোকাবেলা করতে চাচ্ছিল। কিন্তু আক্রমণকারী দু'জন ছিল তরবারী ধারী। তাদের যৌথ আক্রমণে কর্মচারী আহত হয়ে গেল।

এক আক্রমণকারী ততোক্ষণে আম্বরীর উপর আক্রমণ করল। কিন্তু আঘাতটি ব্যর্থ হলো। আক্রমণকারী আবার আক্রমণ করলো। এটিও ব্যর্থ করে দিয়ে আম্বরী গলা ছেড়ে চিৎকার শুরু করে দিল। বলতে লাগল— আয়! তোরা নদীর দিকে আয়! একথা বলে সে উল্টো পায়ে পেছনের দিকে সরে গেল এবং চটজলদি একটি তীর ধনুকে ভরে নিল। আম্বরী চাচ্ছিল এদেরকে জীবিত ধরিয়ে দিতে।

ধনুক থেকে তীর বের করে ফেলো মেয়ে। আমরা তোমাকে ছেড়ে দেবো— আম্বরীকে শাসালো এক আক্রমণকারী। আম্বরী ছিলো পাকা তীরন্দাজ। সে ধনুক উপরে উঠিয়ে তীর ছুড়ে দিলো। আক্রমণকারী লাফিয়ে অন্য দিকে সরে গেল। কিন্তু তীর ততোক্ষণে তার উরু ভেদ করে বেরিয়ে গেছে।

অপর আক্রমণকারী আম্বরীর কর্মচারীকে হত্যা করার চেষ্টা করছিল। আম্বরী আরেকটি তীর ওই হামলাকারীকে লক্ষ্য করে ছুড়লো। তারও পায়ে আঘাত হানলো তীর।

তীরবিদ্ধ হওয়ার পর উভয় আক্রমণকারী দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলো; কিন্তু কেউই বেশী দূর এগুতে পারলো না। আম্বরী গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করে দিল। আম্বরীর চিৎকার শুনে প্রহরীরা দৌড়ে এলো। আম্বরী প্রহরীদের জানালো— দু'জন চক্রান্তকারীকে সে তীরবিদ্ধ করেছে। এরা তীরবিদ্ধ হয়ে পালিয়ে যেতে চাচ্ছে। আর দু'জন হিন্দু গোয়েন্দাকে সে তীরবিদ্ধ করেছে। এরা নৌকায় চড়ে শত্রু বাহিনীর কাছে খবর নিয়ে যাচ্ছে। একটা নৌকা ভেসে যাচ্ছে, এর মধ্যে তীরবিদ্ধ দুই লোক রয়েছে। এরা গযনী বাহিনীতে হিন্দুদের চর হয়ে কাজ করে। এক প্রহরী একথা শুনে উচ্চস্বরে চিৎকার করলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে সেখানে পৌঁছে গেল কয়েকজন অশ্বারোহী। তাদেরকে বলা হলো, নদীতে ভাসমান নৌকায় তীরবিদ্ধ শত্রু সেনা আছে, এদেরকে পাকড়াও করো।

নির্দেশ পাওয়া মাত্র কয়েকজন সৈনিক নদীর ভাটির দিকে দৌড়াল এবং দু'জন পানিতে নেমে নৌকায় উঠে সেটিকে তীরে এনে দুই আহতকে নদী তীরে তুলে আনলো। অপর দিকে পলায়নপর তীরবিদ্ধ দুই আক্রমণকারীকেও ধরে ফেললো প্রহরীরা। কিন্তু প্রহরীরা এদেরকে দেখে অবাক হলো। এরা যে তাদেরই সেনাবাহিনীর দু'জন কমান্ডার।

গ্রেফতার করা সবাইকে সাথে সাথে প্রধান সেনাপতি আলতাঈর কাছে নিয়ে গেল প্রহরীরা। যে দু'জন নৌকা করে হিন্দুদের খবর পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল, এরা ছিল পরিচয় গোপনকারী হিন্দু। এরা দুই সেলজুকী কমান্ডারের কর্মচারী পরিচয়ে গযনী বাহিনীর সাথে এসেছিল।

তীরবিদ্ধ দুই কমান্ডার ছিল সেলজুকী কমান্ডার রজব ভাই আর কমান্ডার ফরিদ আফিন্দি। নৌকায় আরোহী দুই হিন্দুর শরীর থেকে তীর খোলে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু কমান্ডার দু'জনকে দেখে সুলতান নির্দেশ দিলেন, যতোক্ষণ না এরা সত্য কথা বলবে, ততোক্ষণ এদের শরীর থেকে তীর খুলবে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুই হিন্দু মুখ খুললো এবং বললো— আমরা অ'সলে হিন্দু। এই দুই সেলজুকী কমান্ডার আমাদেরকে পরিচয় গোপন করে সাথে এনেছে। এখন আমাদেরকে মহারাজা গোবিন্দের কাছে গযনী বাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে খবর নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল।

গ্রেফতারকৃত দুই সেলজুকী কমান্ডারও স্বীকার করলো— তারা ইসরাঈল সেলজুকীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছিল। সুলতান একথা শুনে রাগে ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। বললেন— আল্লাহ যদি আমাদেরকে গযনী ফিরিয়ে নেয়,

তাহলে সবার আগে ইসরাঈল সেলজুকী এবং আলাফতোগীনকে শায়েস্তা করবো।

এই ভয়াবহ চক্রান্তের কথা জানার সাথে সাথে সুলতান দোশীন ও তার সহযোগী তরুণীকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন এবং সকল সেলজুকী সৈন্যকে একত্রিত করে তাদের কাছ থেকে সব অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিলেন। সেলজুকীদের সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে তাদেরকে নজরবন্দি ঘোষণা করে তাদের জন্য পাহারাদার নিয়োগ করলেন। ভয়ঙ্কর চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর আর কোন সেলজুকীর উপর আস্থা রাখা ঠিক হবে না— বলে মন্তব্য করলেন সুলতান।

মহারাজা গোবিন্দের বিশাল সৈন্যবহর দেখে সুলতান মাহমূদ খুবই চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। পরিস্থিতি কিভাবে সামলানো যাবে এই চিন্তায় তিনি ছিলেন পেরেশান। এর মধ্যে নিজ সেনাদের মধ্যে আত্মঘাতি ভয়ঙ্কর চক্রান্তের বিষয়টি তাকে দারুন উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দিল। বাহ্য দৃষ্টিতে কোন উপায় অন্তর না দেখে তিনি নফল নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দরবারে একান্ত মনে খুব কান্নাকাটি করলেন।

সারা রাত কখনো নামাযে কখনো হাতে কুরআন শরীফ নিয়ে আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করলেন সুলতান।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, শেষ রাতে তার মধ্যে এক ধরনের প্রশান্তি দেখা গেলো। তিনি তখনই এক দূতকে ডেকে রাজা গোবিন্দের কাছে পয়গাম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। মনে হলো, সংকট থেকে উত্তোরণের কোন সহজ পথ পেয়ে গেছেন তিনি। তিনি রাজা গোবিন্দের উদ্দেশ্যে লিখলেন— ইসলাম সত্য ধর্ম, আর পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণ মানুষের তৈরি অবাস্তব ধর্ম। ইসলাম গ্রহণ করলে আপনি শান্তি ও নিরাপত্তা পাবেন। যদি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তাহলে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, আপনি আপনার সেনাবাহিনী ও আপনার রাজধানীর উপর কেমন ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসবে।

আপনি যদি নেতিবাচক জবাব দেন, তাহলে সাথে সাথেই আমার সৈন্যরা আপনার উপর আক্রমণ করেবে। আর আপনার রাজধানী অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যে রাজধানী অবরোধের আয়োজন হয়ে গেছে। আমার সৈন্যরা হয়তো সেখানে পৌঁছে গেছে। আশা করি, আপনি আমার সৈন্যদের হাতে আপনার সেনাদের গণহত্যার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করবেন এবং কালাঞ্জরের মন্দির ও শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে হেফাযত করবেন।

এই পয়গাম দিয়ে সুলতান রাজা গোবিন্দের কাছে দূত পাঠালেন। মহারাজা গোবিন্দ ইসলাম গ্রহণ করলেন না বটে, কিন্তু সুলতানের দূতকে সসম্মানে ফেরত পাঠালেন। তিনি সুলতানের সাথে মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সুলতানের সেনা শিবিরের দিকে অগ্রবর্তী সেনাদল পাঠিয়ে দিলেন

সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা ইউনিট সাথে সাথে খবর দিয়ে দিলো, রাজা গোবিন্দের অগ্রবর্তী সেনারা গযনী বাহিনীর দিকে রওয়ানা করেছে। সুলতান প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন গোবিন্দের অগ্রবর্তী বাহিনীর উপর এমন আক্রমণ করেন যে, তার গোটা বাহিনীর মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

প্রধান সেনাপতি আলতাঈ যুদ্ধের ময়দানেই জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন। কোন অবস্থায় কি ব্যবস্থা নিতে হয় এ ব্যাপারে তিনি ইতিহাস বিখ্যাত ছিলেন। অগ্রীম খবর পাওয়া মাত্রই তিনি দুটি অশ্বারোহী ইউনিটকে ডানে বামে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাদের কমান্ড নিজের হাতে রাখলেন।

মহারাজা গোবিন্দের অগ্রবর্তী সেনারা যখন তাদের মুখোমুখি এলো, তখন আলতাঈর নির্দেশে উভয় পাশের সৈন্যরা হিন্দু সেনাদের উপর উভয় দিক থেকে আক্রমণ করলো। আলতাঈ নিজে সেনাদের আক্রমণ পরিচালনা করলেন। ফলে মহারাজা গোবিন্দের অগ্রবর্তী বাহিনীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল। অধিকাংশই নিহত হলো। আর যারা প্রাণে বেঁচে পালাতে সক্ষম হলো, তার গোটা সেনাবাহিনীর মধ্যে আতংক ছড়িয়ে দিল।

সেদিন আর কোন লড়াই হলো না। রাতের বেলায় সুলতান মাহমূদ আবারো আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। সুলতানের আশংকা ছিল, মহারাজা গোবিন্দের সৈন্যরা রাতে নিশ্চয়ই আক্রমণ করবে। কিন্তু রাতে আর কোন আক্রমণের ঘটনা ঘটলো না। নিরাপদেই রাত পোহাল। সুলতান যখন ফজরের নামায শেষ করলেন, তখন প্রধান সেনাপতি তাকে জানালেন— মহারাজা গোবিন্দের সেনাবাহিনীকে রাতের বেলায় কোথাও চলে যেতে দেখেছে আমাদের গোয়েন্দারা।

এটা নিশ্চয়ই ধোকা। এতো বিশাল বাহিনী মোকাবেলা না করে পালিয়ে যেতে পারে না। রাজা গোবিন্দ আমাদেরকে সামনে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। সে আশা করছে, আমরা সামনে চলে গেলে আমাদেরকে উভয় দিক থেকে ঘিরে ফেলবে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, আসলে রাতের অন্ধকারে মহারাজা গোবিন্দের সেনাদের স্থানান্তর গযনী বাহিনীর মোকাবেলার জন্য ছিল না। পালানোর উদ্দেশ্যে তারা রাতেই পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলেছিল। দিনের বেলায় গোবিন্দের অগ্রবর্তী বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা দেখে রাত হতে না হতেই তার মনে হতে লাগলো, এতো দিন গযনী বাহিনীর দুর্ধর্ষতা সম্পর্কে তিনি যা শুনেছেন তাই ঠিক। তিনি গযনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নিজের ও রাজ্যের নিশ্চিত ধ্বংস ডেকে এনেছেন। তার মধ্যে দেখা দিল মারাত্মক আতংক। ফলে তিনি কাল বিলম্ব না করে রাতের মধ্যেই তার সেনাদেরকে শিবির ত্যাগ করার নির্দেশ দেন।

এটি ছিল সুলতান মাহমূদের দুআর বরকত। আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি ও আত্মনিবেদনের ফল। আল্লাহ তার দু'আর বরকতেই প্রবল শক্তির অধিকারী হিন্দু রাজার মনে আতংক সৃষ্টি করে দিলেন। এই হিন্দুরাজা এতোটাই আতংকিত হলেন যে, তিনি মোকাবেলা না করে রাতের অন্ধকারে রণাঙ্গণ ত্যাগ করলেন।

সুলতানের গোয়েন্দারা খবর দিলো, শত্রুবাহিনী শিবির ত্যাগ করে চলে গেছে। তিনি বিষয়টি আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্যে এবং পরিস্থিতি যাচাই করার জন্যে দু'টি সেনা ইউনিটকে সাথে নিয়ে রাজা গোবিন্দের শিবির পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। সত্যিই অবাক করা দৃশ্য। ছাউনী তাঁবু যথারীতি রয়েগেছে; কিন্তু গোটা শিবির ফাঁকা। কোথাও একজন পাহারাদার পর্যন্ত নেই। সুলতান এটিকে ফাঁদ মনে করে অনাকাঙ্খিত আক্রমণ প্রতিহতের জন্যে সেনাদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিলেন; কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও কোন দিক থেকে শত্রুপক্ষের কোন আক্রমণের আলামত দেখা গেলো না।

এক পর্যায়ে সুলতানের কাছে খবর এলো, মহারাজা গোবিন্দের সৈন্যরা কালাঞ্জরের পথে রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছে। সুলতান পিছু ধাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেই সাথে নিজেই গোবিন্দের সৈন্যদের ধাওয়া করার জন্যে বিদ্যুৎ বেগে অগ্রসর হয়ে শত্রু সেনাদের একেবারে কাছে চলে গেলেন। এটি ছিল একটি অতি দুঃসাহসী কাণ্ড। অবস্থা আঁচ করে প্রধান সেনাপতি আলতাঈ আরো চারটি সেনা ইউনিট নিয়ে দ্রুত সুলতানের সাথে যোগ দিলেন, যাতে কোন অনাআঙ্খিত পরিস্থিতি না ঘটে। অবশ্য তেমন কিছু ঘটেনি। বরং গোবিন্দের সৈন্যরা গযনী বাহিনীর তাড়া খেয়ে মালপত্র, হাতি ঘোড়া ত্যাগ করে যে যার মতো জীবন নিয়ে পালিয়ে গেলো।

কোন ঐতিহাসিকই মহারাজা গোবিন্দের মোকাবেলা না করে রাতের অন্ধকারে রণাঙ্গন ত্যাগ করার কারণ বলেননি। ঐতিহাসিক স্মিথ ও উথবী লিখেছেন— আসলে মহারাজা গোবিন্দ গযনী বাহিনীর ভয়ে পালিয়ে যাননি। তার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছিলেন। এটা দেখে তার সেনাকর্মকর্তারা আতংকিত হয়ে পড়ে এবং গযনী বাহিনী পিছু ধাওয়া করলে তারা হাতি ঘোড়া রসদপত্র ফেলেই জীবন নিয়ে পালিয়ে যায়।

অবস্থা এমন হয় যে, সুলতান যখন পিছু ধাওয়া ত্যাগ করে শিবিরে ফিরে আসতে থাকেন, তখন রাজার ছয়শ' জঙ্গি হাতির মধ্যে পাঁচশ আশিটি হাতিই ছিল তার সেনাদের দখলে। বিনা যুদ্ধে এই অস্বাভাবিক বিজয়ের পর সুলতানের অবস্থাও এমন হলো যে, তিনি হিন্দুস্তানে নিয়মিত সরকার গঠন না করেই গযনী ফিরে আসেন। ফিরে আসার ব্যাপারে কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন— সুলতানের কাছে খবর পৌছে যে, সেলজুকীরা বিপুল শক্তি সঞ্চয় করেছে। যে কোন দিন তারা গযনী আক্রমণ করতে পারে। এ খবর শুনে সুলতান হিন্দুস্তানে সরকার প্রতিষ্ঠা না করেই গযনী ফিরে আসেন।

# স্লোগানেই কেল্লা জয়

সুলতান মাহমূদ যখন মহারাজা গোবিন্দকে পরাস্ত করে গযনী ফিরে আসেন, তখন তার সাথে ছিল যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ হিসাবে প্রায় ছয়শ জঙ্গি হাতি, আড়াই হাজার ঘোড়া আর সাত হাজার হিন্দু বন্দি। গযনীর অধিবাসীরা বিজয়ী সুলতান ও সেনাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ঘর ছেড়ে অনেক পথ এগিয়ে গিয়ে ছিল। উল্লসিত জনতার তাকবীর ও স্লোগানে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠছিল। রণ ক্লান্ত দীর্ঘ সফরে শ্রান্ত সৈনিকদের চেহারাও জনতার উল্লাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বন্দিদের দীর্ঘ সারি যখন জনতাকে অতিক্রম করছিল তখন জনতার গগন বিদারী শ্লোগানে যমীন কাঁপতে লাগল।

মুগ্ধ আনন্দিত জনতা হিন্দু বন্দিদের উদ্দেশ্যে নানা ধরনের তিরস্কার করছিল। কেউ কেউ বলছিল— গযনীতে তোমরা আসল খোদার দেখা পাবে। এসব খোদাকে প্রণাম করবে, তাহলে তোমরা মাফ পেয়ে যাবে। কিন্তু গযনীবাসীর এসব তিরস্কার ছিল ফারসী ভাষায়। হিন্দুরা ফারসী বুঝতো না। ফলে জনতার উল্লাস ধ্বনি ও অঙ্গভঙ্গি দেখে বন্দি হিন্দুদের কেউ কেউ অবাক বিস্ময়ে তাকাচ্ছিল, আবার কেউ পরাজিতের শুষ্ক হাসি হাসছিল আবার কারো চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু।

দর্শকদের মধ্যে চারজন লোক কিছুটা ভিন্নভাবে দাঁড়িয়ে তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী সুলতানকে গভীর ভাবে দেখছিল। তাদের কণ্ঠে কোন শ্লোগান ছিল ন। তারা ছিল সম্পূর্ণ নীরব ও গম্ভীর।

সুলতান যখন তাদের অতিক্রম করলেন তখন তারা গযনী সেনাদের তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখছিল। মহারাজা গোবিন্দ মোকাবেলা না করার কারণে গযনী বাহিনীর কোন সৈনিকের প্রাণহানি ঘটেনি। ফলে মনে হচ্ছিল, গযনী থেকে যে পরিমাণ সৈন্য গিয়েছিল, ফিরে আসছিল তার চেয়েও বেশী। অবশ্য সুলতান মাহমূদ কন্নৌজ ও লাহোরে কিছু সৈন্য রেখে এসেছিলেন। ওই দু'টি এলাকার শাসকরা তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল।

লড়াই না করেই ফিরে এসেছে সুলতান। দেখা যাচ্ছে ব্যাপক লুটপাট করে এসেছে— বললো নীরব দর্শক চারজনের একজন।

লড়াই না করলে যুদ্ধ বন্দি এলো কোত্থেকে? এতোগুলো হাতি ঘোড়া আর যুদ্ধ সরঞ্জামই বা কোথায় পেতো? বললো অপর একজন।

এতো লোকের মধ্যে আমি যদি সুলতানকে তীর ছুড়ে জনতার ভিড়ের মধ্যে মিশে যাই তাহলে আমাকে কেউ ধরতে পারবে না। সুলতানের লোভী জীবন এখানেই সাঙ্গ হয়ে যাবে— বললো এদেরই আরেক সঙ্গী।

আরে রাখো! শুধু শুধু একা সুলতানকে হত্যা করলে তার রাজ্য আমাদের দখলে এসে যাবে না। তার যুবক একটি ছেলে আছে। সেও বাবার মতোই যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী। সুলতানকে হত্যা করে কিছু অর্জন হবে না আমাদের। বললো এদেরই আরেকজন।

খুন খারাবীর কথা রাখো। আমাদেরকে সুলতানের সেনাবাহিনীর অবস্থা দেখার জন্য পাঠানো হয়েছে। হিন্দুস্তান থেকে কি পরিমাণ সৈন্য নিয়ে ফিরে এসেছে, তাদের অবস্থা কি, তাই জানা আমাদের কাজ। কারণ ইসরাঈল সেলজুকী ধোঁকায় পড়ে একবার পরাজিত হয়েছে, আমাদের অনেক লোক নিহত হয়েছে। এমন ভুল সে আর করতে চায় না। বললো— চারজনের দল নেতা।

নিজেকে ধোকায় ফেলো না বন্ধু! গযনী সেনাদের শক্তি নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে অনেক বেশী— বললো তাদের অপর একজন।

ধুর, এসব বাজে কথা। একজন সেলজুকী গযনীর পাঁচজন সৈনিকের চেয়েও বেশী শক্তি রাখে। আমি তো আগেই বলেছি, শুধু সুলতানকে যদি খুন করে ফেলা যায়, দেখবে গোটা গযনী বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে যাবে। গযনী বাহিনীর অবস্থা তখন এই ভিক্ষুকের মতোই হয়ে যাবে।

একথা বলে লোকটি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভিক্ষুককে ডাকলো। এই ভিক্ষুক! তোমার সুলতানকে বলো না, যে ধনসম্পদ হিন্দুস্তান থেকে লুট করে এনেছে, এ থেকে তোমাকে কিছু দিয়ে দিক।

পাকা দাঁড়ি, ছেড়া ফাটা ধুলি মলিন কাপড় পরা লোকটি ছিল যথার্থ অর্থেই একজন ভিক্ষুকের প্রতীক। তার এক হাতে একটি পুরনো ক্ষয়ে যাওয়া লাঠি, আর এক হাতে ভিক্ষার ঝুলি। ভিক্ষুক জনতা থেকে কিছুটা ব্যবধানে দাড়িয়ে থাকা এই চারজনের পাশেই দাঁড়িয়ে ভিক্ষার আশায় সমবেত জনতার দিকে উম্মুখ হয়ে তাকিয়ে ছিল। ডাক পেয়ে সে পৃথকভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এই চার দর্শনার্থীর কাছে চলে এলো এবং বললো–

আমি গযনবী নই, একজন সেলজুকী। গযনীর লোকেরা সেলজুকী ফকীরদের ভিক্ষা দেয় না।

আরে তোমার দেহে সেলজুকী রক্ত থাকলে তুমি নদীতে ডুবে মরতে; কিন্তু ভিক্ষা করতে না— তিরস্কার মাখা কণ্ঠে বললো দর্শনার্থীদের একজন। যাও, চলে

যাও এখান থেকে। ইসরাঈল সেলজুকীর ওখানে চলে যাও। সেখানে কোন ভিখারী নেই, সবাই রাজা।

আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম আপনারা সেলজুকী। এজন্যই আপনাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম।

কিন্তু আমরা তোমাকে ভিক্ষা দেবো না। তোমার এই বদ অভ্যাসকে আমরা সমর্থন করতে পারি না— বললো এক সেলজুকী।

এরপর ভিক্ষুক ও চার সেলজুকী দর্শনার্থীর মধ্যে আর কথা এগুলো না। সেনাবাহিনী সেই জায়গা অতিক্রম করার পর দর্শনার্থীরাও যে যার মতো করে চলে গেলো। এরাও জায়গা ত্যাগ করে শহরের পথ ধরলো। কিন্তু ভিক্ষুক তাদের পিছু ছাড়লো না। নিরাপদ দূরত্বে থেকে এই চার সেলজুকীর গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখলো।

* * *

রাজধানীতে ফিরে সুলতান মাহমূদ ঘরে না গিয়ে তার দফতরেই খাবার খেলেন। খাবার খেতে খেতেই তিনি তার অবর্তমানে দায়িত্ব পালনকারী উজিরের কাছ থেকে জেনে নিলেন গযনীর সার্বিক অবস্থা।

উজির সুলতানকে জানালেন— অবস্থা ভালো নয়। সেলজুকীরা আমাদের জন্যে মারাত্মক বিপদ হয়ে উঠছে। ইসরাঈল সেলজুকী বিরাট শক্তি সঞ্চয় করেছে। বুখারা ও আশেপাশের সব লোক তার সঙ্গী হয়ে গেছে। ইসরাঈল সেলজুকীর মধ্যে মানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা আছে। সে বুখারার ক্ষমতালোভী নেতাদেরকে তার পক্ষে নিয়ে এসেছে। সে গোটা সেলজুকী জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে গাদ্দার আলাফতোগীনকে সাথে নিয়ে গযনী আক্রমণের চক্রান্ত করছে।

শুধু এখানেই নয়, সেলজুকী সমস্যা তো এবার আমার সঙ্গেই গিয়েছিল। আল্লাহর রহমতে কমান্ডার উমর ইয়াজদানীর স্ত্রীর অসম সাহসিকতার কারণে আমরা বেঁচে গেছি। যুদ্ধের আগের রাতে এরা রাজা গোবিন্দকে আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ও সেনাদের অবস্থান জানানোর জন্যে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। পরিচয় গোপনকারী দুই কোচওয়ানের ধরা পড়ার ব্যাপারটি সবিস্তারে উজিরকে জানালেন সুলতান।

সেলজুকীরা গযনীতেই আপনাকে হত্যা করার অপচেষ্টা করছে। আজ চারজন সেলজুকীকে আমাদের গোয়েন্দারা গ্রেফতার করেছে– সুলতানকে জানালেন উজির।

এরা কি স্বীকার করেছে আমাকে খুন করার জন্যে এসেছিল? কোথায় এরা?

জী হ্যাঁ, তারা যে মন্দ ইচ্ছায় এসেছিল তা তাদের কাছ থেকে বের করা হয়েছে। কাছেই আছে। আপনি চাইলে তাদের এখানে হাজির করা হবে।

ধৃত চারজনকে সুলতানের সামনে হাজির করা হলো। তাদের পায়ে বেড়ী, মাথা দোলছিল। তাদের কেউই ঠিক মতো দাঁড়াতে পারছিল না। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তাদের উপর যথেষ্ট দখল গেছে। উজীর একজনের নাম উচ্চারণ করে প্রহরীকে বললেন— অমুককে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

একটু পরে সুলতানের কক্ষে প্রবেশ করল একজন ভিক্ষুক। তার পরনে ছেড়া ফাটা ধুলোমলিন কাপড়। মাথায় উষ্কু খুষ্কু লম্বা চুল, দীর্ঘ চুল আর ময়লা মিলে অনেকটাই জটের রূপ নিয়েছে। তার হাতে লাঠি আর কাধে ভিক্ষার ঝুলি।

সম্মানিত সুলতান! এই লোক হলো সেই ভিক্ষুক, যে এদের কথা কাছে থেকে শুনেছে এবং এদের গতিবিধির উপর দৃষ্টি রেখে এদের আস্তানা থেকে সময় মতোএদেরকে ধরিয়ে দিয়েছে। এরা যার বাড়ীতে ছিল সেখানকার তল্লাশী নিয়ে জানা গেছে, লোকটি সন্দেহজনক। এই ভিক্ষুক আসলে গোয়েন্দা বিভাগের একজন দক্ষ কর্মকর্তা।

আমরা যখন দেখলাম আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্যে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছে, তখন ভীড়ের মধ্যে গোয়েন্দাদের ছড়িয়ে দিয়েছিলাম, যাতে কোন নাশকতা কিংবা অনাকাঙ্খিত ঘটনার উদ্ভব না ঘটতে পারে। এই গোয়েন্দা আপনাকে জানাবে কিভাবে সে এদের পাকড়াও করেছে। ভিক্ষুক বেশধারী গোয়েন্দা কর্মকর্তা সুলতানকে জানালো—

মাননীয় সুলতান! আমি দেখলাম, আপনার অভূতপূর্ব বিজয়ে লোকজন আনন্দে আত্মহারা হয়ে লাফালাফি করছে। আনন্দে নাচছে, গাইছে, শ্লোগান দিচ্ছে এবং এলোপাথাড়ী হয়ে ছুটাছুটি করছে, ধাক্কাধাক্কি করছে। কিন্তু এরা চারজন জটলা থেকে কিছুটা দূরে নির্বিকার দাঁড়ানো। দেখে মনে হচ্ছিল, তারা জটিল কিছু ভাবছে এবং এই বিজয় উল্লাসে তারা মোটেও খুশি হতে পারছে না। বরং মানুষের এই উল্লাসে তারা বিরক্ত। আমি তখন ধীরে ধীরে তাদের কাছে গিয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করলাম।

সেলজুকীদের পারস্পরিক কথাবার্তা এবং তার সাথে সেলজুকীদের কথাবার্তার বিস্তারিত সুলতানকে শোনালো গোয়েন্দা।

সব শুনে সুলতান অভিযুক্ত সেলজুকীদের উদ্দেশ্যে বললেন— তোমরা কি তোমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমার কাছে কিছু বলবে? আমি শুনতে পেলাম, তোমরা আমাকে হত্যা করতে এসেছিলে?

না সুলতান! আমরা আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আসিনি— বললো এক সেলজুকী। অবশ্য আমাদের একজন আপনাকে হত্যা করার কথা বলেছিল। কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্য তার ছিল না। ধরা পড়ে যাওয়ার পর আমরা সবই বলে দিয়েছি। আমাদের উপর এতো জুলুম করার দরকার ছিল না। আমরা কিন্তু ধরা পড়ার সাথে সাথেই পরিস্কার করে সব বলে দিয়েছি। আমরা সেলজুকী। সেলজুকীরা মিথ্যা বলে না। আমরা আপনাকে শত্রু মনে করি। আপনি চালাকি করে একবার আমাদের বহু লোককে হত্যা করেছেন।

আমরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছি। আমরা সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবো। আমরা হিন্দুস্তানের মূর্তিপূজক নই, মুসলমান। কিন্তু মুসলমান হলেও আমাদের কোন দেশ নেই, রাজ্য নেই। আল্লাহর যমীনে এমন কোন জায়গা নেই, যাকে আমরা আমাদের দেশ বলতে পারি। আমরা দীর্ঘ দিন ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা চাই আমাদের একটা দেশ হোক। এই দেশের জন্যই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। যেখানে সেলজুকীরাই হবে বাদশা। একটা সেলজুকী রাষ্ট্র হবে।

তোমাদের কথা হয়তো ঠিক। কিন্তু তোমাদের রাষ্ট্র গঠনের জন্যে আমার সালতানাতের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি কেন? যে কোন দুর্বল একটা রাজ্য দখল করে নিলেই পারো।

দুর্বলের কাছ থেকে কিছু কেড়ে নেয়া বীরত্বের ব্যাপার নয়। আপনি আমাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী। আমরা চাচ্ছি আপনার অধীনস্থ কোন রাজ্যে আমাদের রাষ্ট্র গঠন করতে। বিশ্বাস করুন, আপনাকে হত্যা করার কোন ইচ্ছা আমাদের আদৌ ছিল না। আমরা চাচ্ছিলাম, আপনার সামরিক শক্তি দুর্বল করে দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে আপনাকে পরাজিত করতে।

ধন্যবাদ তোমাদেরকে। আমার কাছে ভালো লাগছে যে, মৃত্যুমুখেও তোমরা বীরের মতো অকপটে তা-ই বলছো, যে কথা তোমরা বিশ্বাস করো এবং মনে পোষণ করো— বললেন সুলতান। আমিও তোমাদের সাথে বীর জাতির নেতার মতোই আচরণ করবো। আমার বিরুদ্ধে এবং মুসলিম সালতানাতের বিরুদ্ধে

অন্যায় চক্রান্তকারী হলেও আমি তোমাদের হত্যা করবো না এবং জেলে ঢোকাবো না। তোমাদেরকে আমি শাহী মেহমানের মতোই মর্যাদা দেবো। সুলতান একজন প্রহরীকে ডেকে বললেন— এদের বেড়ী খুলে দাও।

ডান্ডা-বেড়ী খুলতে খুলতে সুলতান বললেন, গযনী বাহিনী সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?

খুব শক্তিশালী বাহিনী— বললো এক সেলজুকী। আমাদের ধারণা ছিল হিন্দুস্তান থেকে আপনার সৈন্যরা দুর্বল ও রণক্লান্ত হয়ে গযনী ফিরবে। কিন্তু যা দেখলাম, নতুন হাতি, ঘোড়া, সাজ সরঞ্জাম নিয়ে আপনার বাহিনী আগের চেয়ে আরো শক্তিশালী হয়ে ফিরেছে।

তোমাদের নেতা ইসরাঈল সেলজুকী কি আমাদের সাথে এখনও যুদ্ধ করবে? জানতে চাইলেন সুলতান।

এ কথার জবাব সেই দিতে পারবে, আমরা এর জবাব দিতে পারবো না। আমাদের কাছে আমাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে পারেন— বললো এক সেলজুকী।

না, আমি আর কিছুই তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবো না— বললেন সুলতান। আমি তোমাদের কয়েকটি কথা বলে দিতে চাই। ফিরে গিয়ে তোমরা তোমাদের নেতা ইসরাঈল সেলজুকীকে আমার সালাম দিয়ে বলবে— আমি তোমাদেরকে পাহাড়ের উপত্যকা ছেড়ে ঝিঝান নদীর তীরবর্তী বিশাল এলাকায় বসবাস করতে দেবো এবং সেখানে তোমরা নিজের মতো করে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে পারবে। তাকে বলবে, একই ধর্মের অনুসারী দু'টি জনগোষ্ঠী যদি একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাতে উভয় গোষ্ঠীই দুর্বল হয়ে পড়বে শক্তিশালী হবে ইহুদী নাসারা গোষ্ঠী। যারা আদিকাল থেকেই মুসলমানদের শত্রু। ইহুদী খৃষ্টানরা আমার যেমন শত্রু তোমাদেরও বন্ধু নয়। সুযোগ পেলে তারা আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবে।

তাকে আরো বলবে, জন্ম মৃত্যু আল্লাহর হাতে। তদ্রুপ জয় পরাজয়ও আল্লাহ হাতে। তোমরা আমার সেনাদের মধ্যে তোমাদের চর ঢুকিয়ে দিয়ে হিন্দু রাজাদেরকে আমার যুদ্ধ কৌশল ও সেনাদের স্থানের খবর দিয়ে আমাকে পরাজিত করতে চেয়েছো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের বন্ধুগোষ্ঠী এলিকখানী এক তরুণীর দ্বারাই তোমাদের সকল চক্রান্ত্র ফাঁস করে দিয়েছেন। তোমরা যদি বাহাদুর জাতিই হবে তাহলে নারী দিয়ে এই চক্রান্ত করতে গেলে কেন? যুদ্ধতো পুরুষের কাজ। হিন্দুদের সাথে মৈত্রী করে তোমরা আমাকে ধোকা

দিতে চাচ্ছিলে। কিন্তু তোমরা কি জানো না, কোন কিছুই প্রকৃত মুসলমানের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তোমাদের নেতাকে বলবে, সে যার হাতে আমাকে পরাজিত করার চক্রান্ত করেছিল, সে আমাকে এতোটাই ভয় পেয়ে গেছে যে, লড়াই করা ছাড়াই হাতি ঘোড়া ফেলে রণাঙ্গণ থেকে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তোমাদেরকেও বলবো, আল্লাহর সামনে নিজেদেরকে পেশ করো।

ইসরাঈলকে বলবে, সে যেনো নির্দ্বিধায় আমার সাথে সাক্ষাত করে। সে যদি না আসতে চায়, তবে আমাকে ডাকলে আমি তার কাছে চলে যাবো। আমার এই কথাগুলো হুবহু তাকে বলবে। যাও, তোমরা মুক্ত।

এই গল্পেই আমরা আগে বলে এসেছি বুখারা ও সমরকন্দের পাহাড়ী এলাকায় ঈঝ নামের একটি উপজাতি বসবাস করতো। এদের কোন নির্দিষ্ট এলাকা ছিল না। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতো এরা। ঈঝ গোত্রের এক নেতার নাম ছিল লুকমান। লোকটি ছিল যেমন সাহসী তেমনই বুদ্ধিমান ও সুপুরুষ। সে নিজেকে সেলজুকী বলতো। লুকমান ঈয্ উপজাতিদের মধ্যে ধীরে ধীরে এতোটাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, সে নিজের পছন্দের নামে একটি স্বতন্ত্র গোত্র করে, গোত্রের নাম দেয় সেলজুকী। ঈঝ গোত্রের অধিকাংশ লোক লুকমানের নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং নিজেদেরকে সেলজুকী বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। সেলজুকী গোত্র ছিল স্বাধীন। তারা কোন নিয়মতান্ত্রিক শাসকের অধীনে ছিল না। গোত্রপতিই ছিল তাদের শাসক।

সেলজুকী গোত্রের জীবন ধারণের প্রধান উপায় ছিল পশুচারণ। এক পর্যায়ে এরা অন্যান্য লোকদের পশু ছিনতাই এবং লোকজনের কাফেলায় ডাকাতি ও লুটতরাজ করতে শুরু করে। এরা খুবই সঙ্গবদ্ধ হয়ে পাহাড়ের দুর্গম এলাকায় থাকতো। তাই কেউ এদের মোকাবেলার চিন্তা করতো না। পরবর্তীতে এরা সুন্দরী মেয়েদেরও অপহরণ করতে থাকে। কিন্তু মেয়েদের অপহরণ করে এরা তাদের উপর কোন জুলুম করতো না। বরং পরম যত্নে তাদের নেতাদের সাথে বিয়ে দিয়ে দিতো। ফলে অপহৃত মেয়েরা তাদের এখানে পরম সুখেই কালাতিপাত করতো।

সেলজুকীরা উপজাতি হলেও তাদের জীবন-যাপন, চলা ফেরা এমন আকর্ষণীয় ছিল যে, অন্যান্য গোত্রের উপজাতি লোকেরাও সেলজুকীদের সাথে মিশতে থাকে এবং নিজেদের সেলজুকী পরিচয় দিতে থাকে। দেখতে দেখতে ষাট সত্তর বছরে এই সেলজুকী গোত্রের পরিধি বিরাট আকার ধারণ করে।

ইতোমধ্যে আরো ভিন্ন গোত্রের লোক এসে সেলজুকী গোত্রে যোগ দেয়, মূল গোত্রের লোকদেরও সন্তান সন্ততি বেড়ে লোক সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

সেলজুকীরা লড়াকু ও দুঃসাহসী হওয়ার কারণে ছোট ও দুর্বল রাজ্যের শাসকরা তাদেরকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগিয়ে দিতো। কারণ সেলজুকীরা রীতিমতো একটি সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তাদের গোত্রে ছিল অনেক যুদ্ধ পারদর্শী সক্ষম যুবক।

তুর্কি ও সামানীদের মধ্যে বিরোধ ছিল দীর্ঘ দিনের। সামানী শাসকরা এক পর্যায়ে সেলজুকীদেরকে তুর্কিদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধে ব্যবহার করে। এরপর সুলতান মাহমূদের কাছে পরাজিত আলাফতোগীন গযনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে সেলজুকীদের সাথে একটি সামরিক চুক্তি করে। এই সামরিক চুক্তির প্রধান কারণ ছিল লকুমান সেলজুকীর মৃত্যুর পর গোত্রের নেতা হয় তার ছেলে ইসরাঈল সেলজুকী। ইসরাঈল সেলজুকী সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসে শোচনীয় পরাজয়ের শিকার হয়।

সুলতান মাহমূদ হিন্দুস্তান থেকে লড়াই ছাড়াই বিজয়ী বেশে ফিরে আসার পর তার উজীর তাকে জানালেন, ইসরাঈল সেলজুকী এখন গযনীর জন্যে মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠেছে। এখনই এই আপদ দমন না করলে আমাদের বহু মূল্য দিতে হতে পারে। সেলজুকী হুমকির প্রমাণ সুলতান গযনীতে পা দিয়ে নিজের চোখেই দেখলেন। কিন্তু নিজের প্রাণঘাতি দুশনদের প্রতি খড়গহস্ত না হয়ে তিনি পরম ধৈর্যধারণ করে ধৃত চার সেলজুকীকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে ইসরাঈল সেলজুকীর কাছে মৈত্রী পয়গাম পাঠালেন।

যে ব্যক্তি আপনাকে হত্যার চক্রান্তে লিপ্ত, যে আপনার সালতানাতের জন্যে বিরাট হুকমী হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার সাথে আপনি সৌজন্য সাক্ষাতের প্রস্তাব করলেন সুলতান! সুলতানের পয়গাম শুনে অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন উজীর।

হ্যাঁ, আমি তাকে দোস্ত বানাতে চেষ্টা করবো। ইসরাঈল সেলজুকী নামের মুসলমান হলেও নিজেকে তো সে মুসলমান বলে দাবী করে। কোন মুসলমানের রক্ত ঝরাতে চাই না আমি। নিজ ভূমি থেকে বহু দূরের দেশ হিন্দুস্তানের পেটের মধ্যে আমি চলে যাওয়ার মতো দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনা করি। সেখানকার মাটি, বাতাস, তরু-লতা পর্যন্ত আমার শত্রু। এটা যেমন এক ধরনের দুঃসাহস, নিজের চিহ্নিত শত্রুদের অপরাধ ক্ষমা করে তাদের কাছে বন্ধুত্বের প্রস্তাব করাও এক ধরনের দুঃসাহস।

অবশ্য এটা আমার ও আমার সঙ্গীদের জন্যে চরম দুঃখের বিষয় যে, আমাকে একই সাথে দুটি শক্তির মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এক দিকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজিত হিন্দুস্তানের বিস্তৃত এলাকা, যা মুসলমানদের কাছ থেকে হিন্দুরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। দারুল ইসলামকে হিন্দুরা দারুল কুফরে পরিণত করেছে, আমি বিন কাসিমের সেই বিজিত এলাকাকে পুনরুদ্ধার করে সেখানে ইসলামের পুনর্জাগরণ করতে চাই এবং ক্রমবর্ধমান পৌত্তলিক অপশক্তির কোমর ভেঙে দিতে চাই।

কারণ, হিন্দু শক্তিকে খতম করতে না পারলে এরা শুধু হিন্দুস্তানের মুসলমানদের জন্যই নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্যই হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। অপর দিকে আছে ইহুদী খৃস্টান অপশক্তি। এই দুই অপশক্তির দ্বারা আমরা বেষ্টিত। আমরা কেন, যে কোন সময় মুসলমানরাই এই দুই অপশক্তির ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়বে কিংবা তাদের ফাঁদে পা দেবে, মুসলমানরা আত্মকলহে জড়িয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে।

আর স্বজাতিও স্বধর্মের ক্ষমতা লোভীরা তো আমার জঘন্য শত্রু। ক্ষমতার মোহ আর রাজত্বের লালসা এদেরকে আমার বিরুদ্ধে লাগিয়ে রেখেছে।

ইসরাঈল সেলজুকী বাস্তবেই একটা সামরিক শক্তি হয়ে উঠেছে। আমি ইচ্ছা করলে এই শক্তি শেষ করে দিতে পারি। বেঈমানরা তাই চায়। কিন্তু আমি কাফের বেঈমানদের আকাঙ্খা পূরণ করতে চাই না। আমি ইসরাঈল সেলজুকীকে আমার শর্ত মানাতে চেষ্টা করবো। প্রয়োজনে আমি একটা এলাকা তাকে দিয়ে দেবো।

* * *

এই ঘটনার বিশ বাইশ দিন পর পাহাড়ের পাদদেশের একটি মনোরম জায়গায় ইসরাঈল সেলজুকী বসেছিল। তার পাশে স্ত্রী মারয়াম এবং অর্ধ বয়স্ক দু'জন লোক। তা ছাড়া যে চার সেলজুকী গযনীতে সুলতান মাহমূদকে হত্যা ষড়যন্ত্রে গ্রেফতার হয়েছিল তারাও ছিল। তারা সেলজুকী নেতা ইসরাঈলকে তাদের গ্রেফতার ও মুক্তি পাওয়ার ঘটনা সবিস্তারে জানালো। তারা এও জানালো, সুলতান মাহমূদ তাদের কি বলে মুক্তি দিয়েছেন এবং ইসরাঈলের কাছে কি পয়গাম পৌঁছাতে বলেছেন।

তোমরা বলছো, সুলতান মাহমূদ আমাদেরকে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটা এলাকা দিয়ে দিতে চায়- বললো ইসরাঈল। আচ্ছা! একথা কি সে

সত্যিকার অর্থেই বলেছে? না তোমাদের প্রতি এই বলে তিরস্কার করেছে? একথা বলার সময় তার ভাবভঙ্গি কেমন ছিল? সে কি গর্ব অহংকারে আমাদের প্রতি তাচ্ছিল্য করে একথা বলেছে?

না সর্দার! জবাব দিল এক সেলজুকী। সে অহংকার নিয়ে একথা বলেনি। যদি তার মনে আমাদের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব থাকতো তাহলে একথা বলতো না। আপনি চাইলে সে আপনার সাক্ষাতে এখানেও চলে আসতে পারে।

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে সেলজুকীরা এখন এমন শক্তি অর্জন করেছে যে, তারা যে কাউকে তাদের শর্ত মানতে বাধ্য করতে পারে— বললো মারয়াম।

মারয়ামের কথা আগেই বলা হয়েছে। সুলতান মাহমূদের আজীবন শত্রু এলিক খানের ভাতিজী এই সুন্দরী তরুণীর চিন্তা ভাবনা ও মন মানসিকতা ছিল এলিক খানের মতোই ইসলাম বিরোধী। সে বিয়ের আগেই ইসরাঈলকে বলেছিল— সুলতান মাহমূদকে যে হত্যা করতে পারবে, তার জন্যে আমি জীবন যৌবন সব কিছু কুরবান করে দিতে প্রস্তুত। ইসরাঈল সেলজুকী সুলতান মাহমূদকে চক্রান্ত করে হত্যা করবে, এই প্রত্যাশায়ই এলিক খান মারয়ামকে ইসরাঈলের কাছে বিয়ে দেয় এবং মারয়ামও এই নেশায়ই ইসরাঈলকে বিয়ে করে যে, ইসরাঈল মাহমূদকে হত্যা করে গযনীর রাজা হবে। আর মারয়াম হবে রাজ রাণী।

কিন্তু মারয়াম এখন বুঝতে পারছিল, ইসরাঈল সেলজুকী সুলতান মাহমূদের প্রস্তাব নিয়ে কিছু একটা ভাবছে। একটি স্বাধীন এলাকা পেয়ে গেলে সে এখন সুলতান মাহমূদের সাথে বিবাদে জড়াতে চাচ্ছে না।

এক পর্যায়ে ইসরাঈল সেলজুকী গযনী থেকে ফিরে আসা চার সেলজুকী ও অর্ধবয়স্ক দুই বিদেশী লোককে বিদায় দিয়ে দিল। তারা চলে গেলে তার কাছে থাকল শুধু স্ত্রী মারয়াম। এই সুযোগে স্বামীর উদ্দেশে মারয়াম বললো—

আমি একথা শুনতে চাই না যে, আপনি সুলতান মাহমূদের সাথে কোন বিষয় নিয়ে সমঝোতা করেছেন। আপনার পরাজিত হওয়ার ব্যাপারটি ছিল একটা দুর্ঘটনা। এখন আপনার এমন শক্তি আছে যে, আপনার কাউকে ভয় করার দরকার নেই। আপনার গোত্রের লোকেরা ছাড়াও আলাফতোগীন আছে আপনার সাথে, তোগাখানও আপনার সহযোগী। এখন আপনার কারো টোপ গেলার দরকার নেই। আপনি ইচ্ছা করলেই যে কারো কাছ থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়ে স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

শোন মারয়াম! আমি জানি, সুলতান মাহমূদকে তোমার ঘৃণা করার কারণ। তোমার রাজ রাণী হওয়ার স্বপ্ন পূরণে সে প্রধান বাধা। আমি তোমার রাজরাণী হওয়ার স্বপ্ন ঠিকই পূরণ করে দেবো। কিন্তু সংঘাতে যাওয়ার আগে আমাদের একটা নিজস্ব ঠিকানা দরকার, যে ঠিকানাটিকে আমরা আমাদের দেশ বলতে পারবো। একটি দেশ হলে আমরা সেখানে নিয়মিত একটি সেনাবাহিনী গঠন করতে পারবো, তাদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবো। সেখানে আমাদের একটা মজবুত দুর্গ থাকবে। এখন তো আমাদের অবস্থা এমন যে, আমাদেরকে কেউ তাড়া করলে আমাদের আত্মরক্ষার কোন জায়গা নেই। আমাদেরকে লোকেরা জংলী যাযাবর, ছিন্নমূল ইত্যাদি বলে ডাকে। এজন্য মাহমূদের কাছ থেকে কিছু একটা আদায় করার সুযোগ দাও আমাকে।

ইসরাঈল সেলজুকীর কথার মর্ম বুঝতে পেরেছিল মারয়াম। কিন্তু তাদের কাছে বসা বিদেশী দুই লোক চাচ্ছিল না মারয়াম ইসরাঈলের কথার মর্ম উপলব্ধি করুক।

রাতের বেলা এই বিদেশী দু'জন লোক একটি দেয়ালের মতো জায়গার আড়ালে বসেছিল। তাদের কাছে ছিল ইসরাঈলের স্ত্রী মারয়াম। মারয়াম দুই বিদেশীকে বলছিল, সুলতান মাহমূদকে হত্যা করার শর্তে আমি তাকে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, সে গযনী শাসকের ফাঁদে পা দেবে। সে আমাকে বলেছে, তাকে যেনো আমি মাহমূদের কাছ থেকে একটা অঞ্চল হাতিয়ে নেয়ার সুযোগ দেই। কিন্তু তার নিয়তের ব্যাপারেই এখন আমার সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, সে মাহমূদের কেনা গোলামে পরিণত হবে।

ইসরাঈল ছাড়া তোমার দৃষ্টিতে নেতৃত্ব দানের মতো এই গোত্রে কি দ্বিতীয় কেউ আছে? মারয়ামকে জিজ্ঞেস করল একজন।

হ্যা, অবশ্যই আছে। আর সে হলো তোগাখান। দরকার হলে তাকে আমি বিয়ে করে নেবো।

আরে! সে আমার জন্যে এতাটাই পাগল যে, যখন শুনলো আমি ইসরাঈলকে বিয়ে করেছি তখন বিষ খেয়ে মরে যেতে চাচ্ছিল। একথা জানতে পেরে আমি তার সাথে সাক্ষাত করি। তখন তার অনেকটা পাগলের মতো অবস্থা। অথচ সে ছিল তার বাবার একমাত্র স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য। কিছু দিন পরেই তার বাবা ম্যারা গেল। সে হলো তার বাবার স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু তার মাথা ঠিক ছিল না। তার এই অবস্থা হোক সেটি আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। ফলে তাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করার জন্যে আমি ইসরাঈল

সেলজুকীর স্ত্রী হওয়ার পরও চুরি করে তোগা খানের সাথে সাক্ষাত করেছি। তাকে সঙ্গ দিয়েছি।

গোপনে গোপনে তার সাথেও আমার স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা আজ পর্যন্ত চালু আছে। এখন আমার মনে হচ্ছে ইসরাঈলের মৃত্যুই হবে আমাদের জন্যে উপকারী। তোগাখানই আমাদের আশা পূরণের যোগ্য ব্যক্তি।

এরা তিনজন চাঁদনী রাতের আলো আধারীর মধ্যে যে জায়গাটায় বসে কথা বলছিল, হঠাৎ সেই জায়গায় একটা ছায়ার মতো দেখা গেল এবং ধীরে ধীরে ছায়াটি দূরে সরে গেল। বিদেশী দু'জনই সেই ছায়া দেখে দাঁড়িয়ে গেল। তারা দেখতে পেল, আকাশের যেখানে চাঁদটা ভাসছে এর নীচ দিয়ে একটা ছায়ার মতো কি জানি সরে যাচ্ছে।

কি হয়েছে? অনুচ্চ স্বরে জিজ্ঞেস করলো মারয়াম।

আমার মনে হয় চাঁদের উপর দিয়ে মেঘ ভেসে গেছে। এজন্য ছায়া পড়েছে— বলেলো একজন বিদেশী।

* * *

পরের দিনের ঘটনা। তখন সকাল বেলার সূর্য উঠে গেছে। মিষ্টি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে সব দিকে। পাহাড়ের সবুজ বৃক্ষ-লতায় ভোরের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। তিন দিকে দেয়ালের মতো পাহাড় ঘেরা একটি ফাঁকা জায়গা। মাঝখানটা সমতল। সমতলের ঠিক মাঝখানে পাশাপাশি তিনটি বড় গাছ। ভারি সুন্দর জায়গা। মাঝখানের গাছটির সাথে যেন পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মারয়াম। তার হাত পেছন মোড়া করে বাধা। আর তার পা ও শরীর একটি রশি দিয়ে গাছের সাথে প্যাঁচানো। তার ডান ও বাম পাশে মারয়ামের গত রাতের গল্পের সঙ্গী দুই বিদেশীও একইভাবে গাছের সাথে বাঁধা। তাদের সামনের ফাঁকা জায়গাটায় ইসরাঈল সেলজুকী পায়চারী করছে। আর তাদের সোজা সামনে দশ বারো গজ দূরে তিন জন তীরন্দাজ ধনুকে তীর ভরে তাদের প্রতি ধনুক তাক করে রেখেছে।

আমি জানতাম তোমরা ইহুদী, তোমরা মুলমানদেরকে পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে দিতে পটু। দুই বিদেশীর উদ্দেশ্যে বললো ইসরাঈল। কিন্তু আমি তা জেনেও কয়েকজন মেয়ে ও কয়েকজন পুরুষকে সুলতান মাহমূদের সৈন্যদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্যে প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ দিয়ে ছিলাম। তোমরা সেই কাজে মনোযোগী না হয়ে অবশেষে আমাকেই হত্যার নীল নকশা করছো। অবশ্য

আমাকে একজন বলেছিল, ইহুদীরা সাপের মতো। এরা নিজ প্রভুকেই ছোবল মেরে বসে। আর এই কাল নাগিনীটাকে দেখো, তার স্ত্রী মারয়ামের প্রতি ইশারা করে বললো ইসরাঈল। এক সাথে সে দু'জনের স্ত্রী হিসেবে কাজ করছে। বিদ্রূপের একটা হাসি দিয়ে মারয়ামের উদ্দেশ্যে বললো— তুমি রাজরানী হতে চাচ্ছিলে? একবারও চিন্তা করলে না, তুমি কার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছো?

আমি তোমাকে শেষ বারের মতো বলছি— সুলতান মাহমূদের ফাঁদে পা দিয়ো না। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো মারয়াম।

হ্যাঁ, যা বলার শেষ বারের মতো বলে ফেলো। আমিও তোমাকে শেষ বারের মতো বলে দিচ্ছি— তুমি আমাকে ধোকা দেয়ার পরও আমি তোগা খানের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখবো। সেই সাথে সুলতান মাহমূদের সাথেও আমার শত্রুতা বজায় থাকবে। একদিন মানুষ গযনী সালতানাতের কথা ভুলে যাবে। সেলজুকী সালতানাতই তাদের কাছে মুখ্য বিষয় হয়ে উঠবে।

ইসরাঈল বুক টান করে মাথা উচিয়ে উদ্যত কণ্ঠে বললো— আমি অবশ্যই সুলতান মাহমূদের কাছ থেকে একটা এলাকা নিয়ে নেবো এবং সেই এলাকাই হবে গযনীর সেনাবাহিনী, সুলতান মাহমূদ এবং গযনী সালতানাতের কবর রচনার উৎস।

তোমার মতো উগ্র, মূর্খ উপজাতি লোকেরা শত্রুর জন্যে গর্ত খুঁড়ে নিজেরাই সেই গর্তে পতিত হয়— বললো এক ইহুদী। শোন ইসরাঈল! তোমার নাম ইসরাঈল রাখা হয়েছে। তোমার গায়ে ইহুদী রক্ত রয়েছে বলে। এই ইহুদী রক্তের মান রাখার জন্যে আমি তোমাকে খুব মূল্যবান একটা কথা বলছি। মনোযোগ দিয়ে শোন।

তুমি ঠিকই বলেছো, আমরা দু'জনই ইহুদী। কিন্তু আমরা দু'জনই আমাদের পোষাক-আশাক মুসলমানদের মতো করে রেখেছি। আমরা তোমাদের ইসলাম সম্পর্কে এতোটুকু জানি, যা তোমাদের ইমাম ও আলেমরাও জানে না। আমরা তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করে দিতে পটু।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ আমরা তোমার হাতে বন্দি। ঘটনা যা ঘটেছে তাহলো, তোমার কোন লোক আমাদের গোপন কথাবার্তা শুনে ফেলেছিল। নয়তো যে চমৎকার কৌশল ও নৈপূন্যের সাথে আমরা তোমার স্ত্রীর হাতে তোমাকে খুন করাতে যাচ্ছিলাম তুমি এর প্রশংসা না করে পারবে না। এটাও দেখেছো, কিভাবে আমরা সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রায় ভাঙ্গন ধরিয়ে ছিলাম এবং মাহমূদের বিরুদ্ধে তোমাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে সফল হয়েছিলাম।

শোন ইসরাঈল! শেষ কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি? তুমি যতোই চেষ্টা করো না কেন, সুলতমান মাহমূদকে তুমি পরাজিত কিংবা খুন কিছুই করতে পারবে না। অচিরেই এক মারাত্মক পরিণতির শিকার হবে তুমি। কারণ মাহমূদ পাক্কা ঈমানদার লোক যাদের ঈমান দুর্বল তারা পাক্কা ঈমানদারদের মোকাবেলায় পরাজিত হতে বাধ্য। কার ঈমান পাকা আর কার ঈমান কাচা এ নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। আমাদের কাজ হলো, দুর্বল সবল সকল মুসলমানদেরকে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত রেখে মুসলিম শক্তি ও ঐক্যকে দুর্বল করে রাখা। সাধারণ সংঘর্ষে দুর্বল ঈমানদারদের পরাজিত হতে হয়, কিন্তু আমরা তাদেরকেই বলি, তোমরাই পাক্কা ঈমানদার। লেগে থাকো বিজয় তোমাদেরই হবে।

অভিশপ্ত ইহুদী। দাঁতে দাঁত পিষে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো হিসরাঈল। আমার সামনে মৃত্যু মুখে দাঁড়িয়েও আমাকে অপমান করছো? যাও, জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবো তোমাদেরকে। কথা শেষ করে দ্রুত এক দিকে সরে গেল ইসরাঈল এবং ধনুক তাক করে থাকা তিনজনকে ইঙ্গিত দিল। মুহূর্তের মধ্যে তিনটি তীর তিনজনের বুকে বিদ্ধ হলো।

আর্তচিৎকার দিয়ে উঠলো মারয়াম। ব্যথায় কুঁকিয়ে উঠলো ইহুদী দু'জন। কিন্তু কেউ বাঁচার জন্যে আকুতি করলো না। কারণ তারা জানে, খুনের চক্রান্তে জড়িত লোকদেরকে ইসরাঈলের মতো লোক কিছুতেই ক্ষমা করবে না। অতএব ক্ষমা ভিক্ষা অর্থহীন।

অতি লোভ আর মারয়ামের রাণী হওয়ার আকাঙ্খার এখানেই সমাপ্তি ঘটলো। সমাপ্তি ঘটলো মারয়াম অধ্যায়ের।

* * *

এরপর কেটে গেল কয়েক মাস। হঠাৎ এক দিন হিন্দুস্তান থেকে গযনী বাহিনীর এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা সুলতানের কাছে খবর নিয়ে এলো। এই খবর পাঠিয়েছেন কন্নৌজে নিয়োজিত গভর্ণর সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকী।

গোয়েন্দা সুলতানকে জানালো, কন্নৌজের গভর্ণর গোয়ালিয়র ও কালাঞ্জরে বহু গোয়েন্দা নিয়োজিত করেছিলো যখন কালাঞ্জরে মহারাজা গোবিন্দ পালিয়ে গেলেন। বিশেষ করে আমি রাজা গোবিন্দের রাজধানী কালাঞ্জরে পৌছার সাথে সাথেই ঋষীর বেশ ধরে সেখানে পৌছি। আমি গিয়ে মন্দিরের পুরোহিতদের আস্তানায় ঠাঁই নিই।

তখন গোটা রাজধানী ছিল ভয় আতংকে কম্পমান। লোকদের মধ্যে এতোটাই আতংক ছড়িয়ে পড়ে ছিল যে, কেউ ঘর থেকে বের হওয়ার সাহস করতো না। মন্দিরের শিংগা ও ঘণ্টাগুলো অবিরত ঘণ্টা বাজিয়ে এই আতংককে আরো ভয়াবহ করে তুলেছিল। আমি দেখিনি, আমাকে জানানো হয়েছে, রাজা গোবিন্দ রাজধানীতে পৌঁছে দুই দিন মন্দিরে ছিলেন। রাজ প্রাসাদে তাকে দেখা যায়নি। কিন্তু দু' দিন পর রাজার অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যায়। তিনি পূর্ণ স্বাভাবিকতা ফিরে পান এবং কেন এমনটি হলো এর কারণ উদঘাটন করতে শুরু করেন।

একদিন ঋষির বেশে আমি শহরের একটি গলি দিয়ে হাটছিলাম। একটি বাড়ির আঙিনায় এক যুবতী মহিলাকে মাটিতে পড়ে কাঁদতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলাম– মা! কাঁদছো কেন?

সে দাঁতে দাঁত পিষে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো– তুমি সন্যাসী সেজেছো? আমার বাচ্চাকে ফিরিয়ে দাও। তার সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, মন্দিরের পুরোহিতরা রাজার এই অবস্থা দেখে পরামর্শ দিয়েছে, তিনটি পাঁচ ছয় মাসের শিশু বলি দিতে হবে।

যেই কথা সেই কাজ। রাজার নির্দেশে শহরে খোঁজ খবর নিয়ে তিন মায়ের কোল খালি করে তিনটি শিশুকে নিয়ে বলি দিয়ে তাদের রক্ত দিয়ে রাজাকে গোসল করানো হয়।

আহা! মহিলাটি কেঁদে কেঁদে আমাকে বলছিল, আমার নিষ্পাপ বাচ্চাটিকে যারা খুন করেছে, তাদের একদিন না একদিন শাস্তি হবেই হবে।

সেই গোয়েন্দা বললো– আমি বেশীর ভাগ সময় মন্দিরেই কাটিয়েছি। পুরোহিতদের সাথে আমার বেশ সখ্যতা গড়ে উঠলো। ফলে আমার পক্ষে রাজ মহলের অভ্যন্তরীণ খবরাখবরও জানার সুযোগ হয়েছিল। সুলতান!

আবেদীন! একথা ভুলে যাও, আমি কোন গযনীর সুলতান বা আদৌ সুলতান কি না। তুমি আমাকে সেই সব না বলা কথা শোনাও, যা কোন বন্ধু একান্ত বন্ধুকে শুনিয়ে থাকে।

জী সুলতান! আমি বলছিলাম, হিন্দুদের মন্দিরের রহস্যজনক, জটিল ও প্রতারণাপূর্ণ কর্মকাণ্ড দেখলে মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। হিন্দু ধর্মে নারীর প্রভাব যথেষ্ট।

অন্ধকার গুহার মধ্যে চামচিকারা যেভাবে ঝাকে ঝাকে থাকে ওখানকার পথে ঘাটে এভাবেই গিজগিজ করে যুবতী নারীরা। একদিন আমি একটি বাড়ীর

অন্ধকার আঙিনা পেরিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার সাথে একটি মেয়ের ধাক্কা লাগল। কাঁদছিল। আমাকে পেয়ে সে অনুরোধ করতে লাগল, দয়া করে এখান থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। আমি আজীবন আপনার দাসী হয়ে থাকবো। আমি মরতে চাই না। রাজার জন্যে আমি জীবন বিলিয়ে দিতে চাই না।

সে ছিল তরুণী। ভয়ে কাঁপছিল সে। আমাকে জড়িয়ে ধরলো। জীবন বাঁচানোর জন্যে আমাকে হাতে পায়ে ধরে অনুনয় বিনয় করতে লাগল। তার কথা শুনে আমার বুঝতে অসুবিধা হলো না, এই তরুণী কারো না কারো কুমারী কন্যা। মন্দিরের পুরোহিতরা তাকে বলী দেয়ার জন্যে তুলে নিয়ে এসেছে।

আমাকে ক্ষমা করবেন সুলতান! তরুণীর অনুরোধে আমি আমার কর্তব্য ভুলে গেলাম। মূলত আমার সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল রাজা গোবিন্দের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। কিন্তু একটা নিরপরাধ মানুষের জীবন এভাবে নষ্ট হতে দেখে আমার মধ্যে মানবিক দায়বোধ সৃষ্টি হলো। আমি মেয়েটিকে যথাসম্ভব আশ্বস্ত করতে বললাম– ঠিক আছে, তুমি শান্ত হও। দেখি তোমার জন্য আমি কি করতে পারি।

আমি মনে মনে আল্লাহর কাছে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ! মানুষের জন্যে এখানে মানুষকে জবাই করা হয়। আমি এই অনর্থক জবাই হওয়া থেকে তোমার এক নগন্য বান্দিকে বাঁচাতে চাই, এর বদৌলতে তুমি আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য সফল করে দাও।

অন্ধকার আঙিনায় হঠাৎ আমি একটু আশার আলো দেখতে পেলাম। মেয়েটি আমাকে তাগাদা দিচ্ছিল আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন। যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যান। তাড়াতাড়ি করুন। আমি মন্দিরের বদ্ধ কক্ষ থেকে পালিয়ে এসেছি। মন্দিরের পুরোহিতরা হয়তো আমাকে খুঁজছে।

মেয়েটি তখন থরথর করে কাঁপছিল।

এমন সময় আমার কানে কারো দৌড়ানোর শব্দ ভেসে এলো। আমি মেয়েটিকে বললাম– তোমাকে নিয়ে তো আমি বিপদে পড়বো। মনকে শক্ত করে এখন কান্না থামাও। এরপর মেয়েটিকে এক হাতে ধরে তাকে নিয়ে একটি দেয়ালের ভাঙ্গা অংশ দিয়ে একটি পরিত্যক্ত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

আমরা ঘরের ভেতরে ঢুকতেই বাইরে থেকে কানে ভেসে এলো, এ ঘরে ঢুকে দেখো। এতো অল্প সময়ের মধ্যে যাবে কোথায়?

সন্ন্যাসীর পোষাকের ভেতরে আমি খঞ্জর লুকিয়ে রেখেছিলাম। সেটি বের করে প্রস্তুতি নিয়ে নিলাম। বাইরে হয়তো দু'জন লোক ছিল। ভাঙ্গা দেয়াল দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল একজন। আমি তখন দরজাবিহীন খালি জায়গাটায় দেয়ালের আড়ালে ওৎপেতে রইলাম। লোকটি ঘরের দরজায় এসেই হাঁক দিল। কে এখানে? ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকারে লোকটিকে ভূতের মতো একটা ছায়া মনে হচ্ছিল। আমি তাকে খঞ্জরের আঘাত না করে এক ঝাপটায় তার ঘাড় পেঁচিয়ে ধরলাম এবং আমার বাহুতে আটকে ফেললাম। তার পক্ষে কোন কথা বলা সম্ভব হলো না।

বাইরে থেকে আওয়াজ এলো– ভেতরে কেউ আছে, না নেই?

আমি বললাম– নেই। তোমরা সামনে দৌড়াও।

মুহূর্তের মধ্যে আমার কানে এলো দৌড়ানোর শব্দ। এদিকে আমি যার গলা আটকে রেখে ছিলাম এমনভাবে তার গলায় চাপ দিলাম যে, সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে কয়েকটা ঝাকুনি দিয়ে নেতিয়ে পড়ল। মৃত্যু নিশ্চিত হলে আমি তাকে ফেলে দিয়ে দ্রুত তার শরীরের কাপড় খুলে মেয়েটিকে পরিয়ে দিলাম। তরুণীর চুলছিল খোলা? এলোমেলো। তা ছাড়া তার চেহারাও বেশ সুন্দর। আমি মেঝেতে হাত দিয়ে ধুলোবালি হাতে নিয়ে তার চেহারায় মাখলাম এবং কাপড় দিয়ে তার মাথা পেঁচিয়ে ফেললাম। আর মৃত পুরোহিতের গলার মালাটি তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে তার লেবাস সূরত সম্পূর্ণ বদলে ফেললাম।

এরপর তাকে নিয়ে সদর রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। আলোকিত প্রশস্ত রাস্তা দিয়েই আমি তাকে নিয়ে প্রধান মন্দিরের একটি পরিত্যক্ত জায়গায় চলে এলাম। এই জায়গাটিতে ময়লা ও শেওলা পরে সবুজ আঁঠার মতো হয়েছিল। আমি এই আঁঠালো ময়লা হাতে নিয়ে মেয়েটির চেহারায় ও চুলে মেখে তাকে পুরোদস্তুর সন্ন্যাসীনীর রূপ দিলাম।

এদিকে মন্দিরের ভেতরে বাইরে তরুণীর খোঁজে দৌড় ঝাপ শুরু হয়ে গেলো। পুরোহিত ও তাদের চেলারা এদিক ওদিক দৌড়াচ্ছিল। আমাদের পাশ দিয়েও অনেকে ছুটাছুটি করেছিলো কিন্তু আমাদের প্রতি কেউ সন্দেহ করেনি এবং সন্যাসী বেশের তরুণীকে কেউ চিনতে পারেনি। এরপর আমি মেয়েটিকে মন্দিরের চৌহদ্দি থেকে বের করে শহরের কাছাকাছি একটি জঙ্গলে নিয়ে গেলাম।

মন্দির থেকে নিরাপদ জায়গায় পৌছলে মেয়েটি আমাকে জানালো, আর দু'এক দিনের মধ্যেই আমাকে বলি দেয়া হতো। মেয়েটি আমাকে আরো

জানালো, তার বাবা কিছুতেই তার বলিদানে সম্মত ছিল না। কিন্তু রাজার একান্ত সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও পুরোহিতরা তাকেও হত্যার এবং তার উভয় মেয়েকেই তুলে নেয়ার হুমকী দেয়। সেই সাথে তাকে সরকারী চাকুরী থেকেও বরখাস্ত করে কঠিন শাস্তি দেয়ার হুমকী দেয়া হয়।

মেয়েটিকে নিয়ে রাতটি আমি জঙ্গলেই কাটালাম এবং দিনের বেলায় তাকে একটি নিরাপদ আস্তানায় রেখে সন্ধ্যার পর তার বাবার সাথে সাক্ষাত করলাম। সাক্ষাতে মেয়েটির বাবাকে জানালাম, তার মেয়ে এখন একটি নিরাপদ আস্তানায় আছে। লোকটি খুবই আতংকিত ছিল। সে আমাকে জানালো, ইতিমধ্যে তার ঘরে তল্লাশী চালানো হয়েছে। তাকে রাজার লোকেরা হুমকী দিয়ে গেছে। যদি তার মেয়েকে খোঁজে না পাওয়া যায় তাহলে তার অন্য মেয়েটিকে তুলে নেয়া হবে। সে আরো জানালো, আমার পক্ষে কোন অবস্থাতেই মেয়েটিকে ঘরে জায়গা দেয়া সম্ভব নয়। কারণ, পালিয়ে আসা মেয়েকে বাড়ীতে পেলে রাজার লোকেরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করবে।

লোকটি আমাবে দেখে খুবই অবাক হলো। কেননা, আমার লেবাস সূরত ছিল সন্ন্যাসীর। একজন সন্ন্যাসী কি করে মন্দিরে বলিদানের জন্যে আটক তরুণীকে পালানোর ব্যা'পারে সহায়তা করতে পারে?

আমি তাকে বললাম, আসলে আমি সন্ন্যাসী নই। তবে আমার আসল পরিচয় তাকে তখনো জানাইনি। আমি তাকে বললাম, আপনি যদি অন্য মেয়েটিকে নিয়েও শংকাবোধ করেন তাহলে তাকেও আমি নিরাপদ জায়গায় পৌছে দিতে পারি।

লোকটি পড়ে গেল দোদুল্যমান অবস্থায়। একদিকে তার দুই সন্তানের জীবন, অপর দিকে তার নিজের অস্তিত্ব। এক পর্যায়ে সে বললো, আমরা সবাই যদি এখান থেকে চলে যেতে চাই তবে তুমি কোথায় নিয়ে যাবে?

আমি বললাম, আমি ইচ্ছা করলে আপনাদেরকে কন্নৌজ দুর্গে পৌছে দিতে পারি।

এক পর্যায়ে লোকটি তার অপর মেয়ে ও স্ত্রীসহ কন্নৌজ চলে যেতে রাজি হলো। সে ছিল একজন উচ্চ পদস্থ রাজ কর্মচারী। ফলে কন্নৌজ যাওয়ার জন্যে একটি ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা সে করে ফেললো। পরে আমি তার দুই মেয়েকেই সন্ন্যাসীর বেশে সাজিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে সওয়ার হয়ে শহরের বাইরের জঙ্গল থেকে রওয়ানা হলাম। আর মেয়েদের বাবা পৃথক ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আমাদের অনুসরণ করলো।

সাধারণত হিন্দুদের স্বভাব হলো, বিপদে পড়লে তারা তাদের স্ত্রী-কন্যাদের ফেলে নিজেদের জীবন নিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু এই লোকটি ছিল ব্যতিক্রম। সে তার মেয়ে দুটোকে প্রাণাধিক ভালোবাসতো। মেয়েদের জীবন রক্ষার্থে সে তার নিজের জীবনও ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

পথিমধ্যে একবার বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় বিরতির আগেই আমরা রাজা গোন্ডার এলাকা অতিক্রম করতে সক্ষম হলাম। তখন মেয়েদের বাবাও আমাদের সাথে মিলিত হলো এবং আমাকে বললো, আমার মেয়ে দুটোর জীবন বাঁচানোর জন্যে সে আমাকে পুরস্কৃত করতে চায়। এজন্য সে তার বাড়ী থেকে প্রচুর সোনা দানা নিয়ে এসেছে। আমি তাকে জানালাম, আমার এসবের দরকার নেই এবং সোনা দানার প্রতি আমার কোন আগ্রহও নেই। কারণ, আমি মুসলমান। আমি কালাঞ্জরে ছদ্মবেশে অবস্থান করছিলাম রাজা গোবিন্দের অবস্থা ও তার যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। এটিই আমার মূল কর্তব্য।

একথা শোনে লোকটি খুশী হয়ে বললো, আরে মহারাজার সব খবরতো তোমাকে আমিই দিতে পারি। কারণ, গুরুত্বপূর্ণ রাজ কর্মচারী ছিলাম আমি। মহারাজা ও রাজপ্রাসাদের সব অভ্যন্তরীণ বিষয় আমার নখদর্পণে। রাজমহলের সদর অন্দর সব খবরই আমি জানি। আমি তোমাকে সবই বলতে পারবো। সে জানালো–

মহারাজা গোবিন্দ রণাঙ্গন থেকে মারাত্মক এক আতংক নিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু এই ভয়ের কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তুমি যেহেতু হিন্দুস্তানে থাক, তাই তুমি হয়তো জানো, আমাদের সাধু সন্ন্যাসী ও যোগী ঠাকুররা এমন কিছু বিষয় জানে, তারা ইচ্ছা করলে যে কারো মাথা খারাপ করে দিতে পারে।

কিছু কিছু যোগী হিমালয়ের শৃঙ্গে চলে যায়। সেখানকার বরফ কখনো গলে না। সেখানে তারা উলঙ্গ অবস্থায় থেকে সাধনা করে। এরা এমন শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয় যে, দূরে থেকেও তারা যে কারো উপর যাদুর খেলা চালাতে পারে।

আসলে মহারাজা গোবিন্দ এতোটা হীনবল ছিলেন না যে, তিনি তিনগুণ সৈন্য থাকার পরও গযনী বাহিনীর মোকাবেলা না করেই রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসবেন। কিন্তু তারপরও যখন মহারাজা পালিয়ে গেলেন, তখন কালাঞ্জরে এতোটাই আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল যে, লোকজন বাড়ীঘর ছেড়ে শহর থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। তখন বাতাসে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল, মানুষ খেকো গযনীর সেনারা এ দিকে ধেয়ে আসছে।

এ অবস্থায় এক যোগী বললো, মহারাজাকে কেউ যাদু করেছে। সে যাদুর প্রভাব মুক্ত করার কাজে লেগে গেল। তিনটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বলি দিয়ে সেই রক্ত পানির সাথে মিশিয়ে মহারাজাকে গোসল করানো হলো।

এক পর্যায়ে যাদুর প্রভাব কেটে গেল। মহারাজা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল। জানা গেল, রাজারই এক রাণী তার ছেলেকে রাজার স্থলাভিষিক্ত করার জন্যে এই যাদু করিয়েছিল। কারণ রাজা সেই রাণীর পুত্রকে তার স্থলাভিষিক্ত না করে অন্য রাণীর পুত্রকে স্থলাভিষিক্ত করার ঘোষণা দিয়েছিল। ফলে রাণী প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে রাজার উপর যাদু চালায়।

রাণীর যাদুর ব্যাপারটি জানতে পেরে রাজা গোবিন্দ অভিযুক্ত রাণীও তার ছেলের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। রাণী মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনে রাজার কাছে আবেদন করে, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাকে মৃত্যু দণ্ড দিলেও তার নিরপরাধ পুত্রকে যেন রাজা ক্ষমা করে দেন। রাজা শর্ত দিলেন, যে যোগী এই যাদু করেছে তার পরিচয় বললে তোমার আবেদন মঞ্জুর করা হবে। রাণী বললো, যে সন্ন্যাসী এখন আপনাকে সুস্থ করেছে সেই সন্ন্যাসীই যাদু করেছিল। বিষয়টি জানার পর রাজা তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। রাজা এই রাণীর সাথে তার পুত্রকেও হত্যা করে এবং সেই যোগী সন্ন্যাসীকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়।

এর পর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রাজাকে বললো– আপনার আশু বিপদ মুক্তির জন্য একটি কুমারী তরুণীকে বলিদান করতে হবে। তারা তরুণীর গুণাবলী বললো, এবং আমার ছোট মেয়েকে নির্বাচন করলো।

অবশ্য আমি আমার মেয়েকে নির্বাচন করার কারণ বুঝতে পেরেছিলাম। পণ্ডিতেরা একবার আমার বড় মেয়েকেও বলি দেয়ার প্রস্তাব করেছিলো। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলাম।

তুমি মুসলিম। তোমরা তো বুঝবে না দেবতাদের অসন্তুষ্ট করলে আমাদের সবকিছুই বরবাদ হয়ে যায়। পণ্ডিতেরা যদি কোন কারণে ক্ষুব্ধ হয় তাহলে আমাদের মাথার উপর আসমান ভেঙে পড়ে। কারণ পুরোহিত আর পণ্ডিতদের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি আর চাওয়া পাওয়াই আমাদের ধর্মের মূলভিত্তি।

মাননীয় সুলতান! এরপর লোকটি আমাকে জানালো, মাথা ঠিক হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে রাজা গোবিন্দ সকল সৈন্যদের একত্রিত করে তাদের বলল, আমার উপর এক যোগী যাদু করেছিল। যাদুর প্রভাবে আমার মাথা ঠিকমতো কাজ করছিল না। আমরা রণাঙ্গণ ছেড়ে আসায় মুসলমানরা হয়তো আনন্দে আত্মহারা যে, তারা বিনা যুদ্ধে বিশাল এক জয় পেয়ে গেছে। এবার আমি নতুন করে গযনী

বাহিনীকে যুদ্ধের আহ্বান করবো। দেখবে? বিজয়ের নেশায় এবার তারা পঙ্গপালের মতো উড়ে আসবে। আর তোমরা ওদের ধরে ধরে বলি দেবে। তোমাদের ঘোড়া ও গরুর গাড়ী ও ঠেলাগাড়ির সামনে দলে দলে ওদের জুড়ে দেবে। ওরা তোমাদের গাড়িগুলোকে গলির মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে। হরি হরিদেব আমাকে ইশারা দিয়েছেন, এবার গযনীর মুসলমানরা এখানে ধ্বংস হতেই আসবে।

রাজা গোবিন্দ অসুস্থতা থেকে ওঠে এমন জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিল যে, তার সেনাদের মধ্যে নতুন করে যুদ্ধ উন্মাদনা দেখা দিল। শুধু সৈন্যরাই নয় সাধারন জনতাও সৈন্যদের সাথে এসে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো।

এরপর রাজা গোবিন্দ গোয়ালিয়রে রাজা অর্জুনের কাছে চলে গেল। কয়েক দিন সেখানে কাটিয়ে এসে বলল, গোয়ালিয়রের সৈন্যদের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছেন তিনি। গোয়ালিয়র থেকে ফিরে সে লাহোর গেলেন। কিন্তু মহারাজা তরলোচনপাল তাকে হতাশ করল। তরলোচন তাকে সামরিক সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানালো। তবে তাকে বহু সংখ্যক সৈন্য যুদ্ধ সরঞ্জাম, অর্থ সম্পদ দিয়ে বিদায় করল। সেই সাথে আরো আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দিল।

সুলতানে আলি মাকাম! সেই হিন্দু কর্মকর্তা আমাকে জানিয়েছে, লাহোরের সৈন্যরা গঙ্গা যমুনার মিলনস্থলে পৌঁছে গেছে। তাদের গন্তব্য কালাঞ্জর।

মহারাজা গোবিন্দ বলেছেন, এবার তিনি মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে গোটা হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পড়বেন এবং হিন্দুস্তানের মাটিতে কোন মসজিদের অস্তিত্ব রাখবেন না এবং কোন মুসলমানকে বেঁচে থাকার সুযোগ দেবেন না।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাজা গোবিন্দ কি ফাঁকা বুলি আওড়াচ্ছে, না যা বলছে তা তার করার সামর্থ আছে?

সে বললো, তা করার সামর্থ তার আছে। সে এতোটাই শক্তি অর্জন করেছে যে, রাজা অর্জুনকে সাথে নিয়ে সে লাহোরও দখল করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কন্নৌজ, রাড়ী, মহাবন, মথুরা, নগরকোট, মুলতান ও বেড়ায় যে সামান্য সংখ্যক গযনীর সৈন্য রয়েছে তাদেরকে দ্রুত নিঃশেষ করে দেয়া হবে। তোমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। এখন তার প্রস্তুতি খুব ব্যাপক। এই অঞ্চলের প্রতিটি নারীও এখন যুদ্ধে শরীক হতে প্রস্তুত।

* * *

এই গোয়েন্দার নাম আবেদনী। গোয়েন্দা আবেদীন সুলতান মাহমূদকে জানালো, সেই হিন্দু রাজ কর্মকর্তাকে তার দুই মেয়েসহ কন্নৌজ পৌঁছে দেয়া হলো এবং কন্নৌজে তার সাথে খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করা হলো। সে গভর্নর ও সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকীকে বহু সোনা দানা উপহার দিয়ে বললো, আমি শুধু এতটুকুই আপনার কাছে আশা করি যেন আমার মেয়েদের কেউ হয়রানী না করে। সেনাপতি তার সোনাদানা কিছুই গ্রহণ করেননি। তিনি তার পরিবার নিয়ে সম্মানজনকভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন।

কিছুদিন কন্নৌজে থাকার পর সে মুসলমানদের আচার-আচরণ ও জীবনাচার দেখে এতোটাই মুগ্ধ হলো যে, কন্নৌজ দুর্গের প্রধান ইমামের নিকট গিয়ে সে তার দুই মেয়েসহ ইসলামে দীক্ষা নিল।

গোয়েন্দা আবেদীন সুলতানকে জানালো, সম্মানিত সুলতান! আমরা সেই হিন্দুর সব কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু তার কথা যাচাই করার জন্য আমরা সেইসব জায়গায় খোঁজ নিয়ে দেখেছি, সে যা বলেছিল তার সবই সত্য।

গোয়ালিয়রে আমাদের যে ব্যক্তি দায়িত্বপালন করছে, সে জানিয়েছে- গোয়ালিয়রে জোরদার যুদ্ধপ্রস্তুতি চলছে। সে আরো জানিয়েছে, হিন্দুরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাদের প্রথম টার্গেট হবে বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করে থাকা গযনী বাহিনীর সৈন্যরা। এরপর হিন্দুস্তানে বসবাসকারী ছেলে বুড়ো, শিশু মহিলা নির্বিশেষে সকল মুসলমান হবে তাদের পরবর্তী টার্গেট। এরপর সারা হিন্দুস্তানের সৈন্যরা গযনীর দিকে অভিযান চালাবে। গোয়েন্দা আরো জানালো, হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। মন্দিরগুলোতে পণ্ডিতেরা মুসলমান হত্যাকে পূণ্যের কাজ বলে প্রচার করছে।

তুমি কি বলতে পারো, তাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি কোন পর্যায়ে আছে? জানতে চাইলেন সুলতান।

অবশ্যই বলতে পারি সুলতান! বললো গোয়েন্দা আবেদীন। হিন্দু রাজাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। যে সব লোক সেনাবাহিনীতে নতুন যোগ দিয়েছে তারা ততোটা গড়ে উঠতে পারেনি। তবে তারা অশ্বারোহণ, তরবারী চালনা ও তীরন্দাজী জানে। কিন্তু নিয়মিত সেনাদের মতো তারা রণাঙ্গনে মুখোমুখী যুদ্ধের উপযোগী হয়নি। এখনো তাদের প্রশিক্ষণ চলছে।

সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকী ও অন্যান্য ক্যাম্পে থাকা কমান্ডারগণ আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে দ্রুত সেনাভিযানের জন্য অনুরোধ করি। তাহলে হিন্দুদের প্রস্তুতি পর্বেই আমরা কাবু করে ফেলতে

পারবো। ওখানকার মুসলমানরা আতংকে আছে, হিন্দুরা না আবার মুসলিম হত্যায় মেতে ওঠে। আমাদের সেনারা তো লড়াই করে প্রাণ দিবে যেহেতু তারা শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত কিন্তু নিরপরাধ একজন মুসলমানের উপর আঘাত এলেও তা হবে আমাদের জন্যে অসহ্যকর।

মাননীয় সুলতান! সাধারণ মুসলমান ও মসজিদগুলোকে আমাদের অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। হিন্দুরা যদি আক্রমণ করে তাহলে মুসলমান মেয়েদেরকে প্রথম সুযোগেই অপহরণ করবে। এমনটি ঘটলে কেয়ামত পর্যন্ত লোকেরা আমাদের ঘৃণাভরে স্মরণ করবে এবং অভিশাপ দেবে।

হ্যাঁ, বুঝেছি। এবার লাহোরে আমাদেরকে অবশ্যই হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং খুব দ্রুত অভিযান চালাতে হবে– বললেন সুলতান।

* * *

সুলতান মাহমূদ তখনই সকল সেনাপতি ও কমান্ডারদের ডেকে ভারতের অবস্থা জানিয়ে দ্রুত সেনাভিযানের প্রস্তুতি নিতে বললেন। এও বললেন, অভিযান হবে খুব দ্রুত এবং সফরে খুব কম যাত্রা বিরতি দেয়া হবে। চলার মধ্যেই আমাদেরকে খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে হবে। আমাদের প্রথম টার্গেট হবে কালা র দুর্গ। আমরা প্রথমেই কালাঞ্জর দুর্গ অবরোধ করবো। অবরোধ আরোপের পর সৈন্যরা কিছুটা বিশ্রাম সেরে নিতে পারবে। সুলতান সেনাপতিদেরকে যাত্রাপথ ও যাত্রা বিরতির জায়গাগুলো ভৌগোলিক মানচিত্রের সাহায্যে দেখিয়ে দিলেন।

সুলতান মাহমূদ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের দিক নির্দেশনা দিয়ে শেষ করতেই ইসরাঈল সেলজুকীর পয়গামবাহী দূত এসে হাজির। ইসরাঈল সেলজুকীর পয়গামবাহী মৌখিক পয়গামে জানালো, সেলজুকী নেতা বলেছে– সুলতান যদি আমাদের সামরিক শক্তির প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমাদেরকে রাষ্ট্রগঠনের জন্যে জায়গা দিতে রাজী হয়ে থাকেন, তাহলে আমি তার জমি গ্রহণ করতে রাজি।

আর যদি তিনি তার সামরিক শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে থাকেন এবং আমাকে ভিখারী মনে করে ভিক্ষা হিসাবে এই প্রস্তাব দিয়ে থাকনে, তাহলে আমি তার এই প্রস্তাব মানতে রাজি নই। আমি আমার জাতির জন্যে একটি ভূখণ্ড অর্জন করার ক্ষমতা রাখি। আমাকে পরিষ্কার করে বলতে হবে, সুলতান কেন আমার প্রতি এই অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন? সুলতানকে মনে রাখতে হবে, গযনী বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার মতো সৈন্যবল আমার আছে।

ইসরাঈল সেলজুকীর বার্তা শুনে সুলতান হেসে বললেন– আমি বিশ্বাস করি, ইসরাঈল সেলজুকীর শক্তি ও সাহস উভয়টিই আছে। কিন্তু বুদ্ধি কিছুটা কম মনে হচ্ছে। তিনি দূতের উদ্দেশ্যে বললেন, তুমি গিয়ে ইসরাঈল সেলজুকীকে বলবে, আমি তাকেও দুর্বল ভাবছি না, নিজেকেও দুর্বল মনে করছি না। আমি আসলে এই অঞ্চলে একটা শান্তিময় স্থিতিশীল পরিবেশ চাই। কারণ আমাদের পারস্পরিক লড়াইয়ে কাফের ও বেঈমানেরাই শক্তিশালী হবে।

ইসরাঈল সেলজুকীকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, এখন আমি হিন্দুস্তান যাচ্ছি। সে যেন আমার আসার জন্যে অপেক্ষা করে। আমি তাকে তার এলাকায় সবচেয়ে প্রভাবশালী বলেই মনে করি। তবে আমার অবর্তমানে যেন গযনীর বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা না চালানো হয়।

এ পর্যায়ে সুলতান মাহমূদ শংকাবোধ করছিলেন, ইসরাঈল সেলজুকী না আবার তার অবর্তমানে গযনী আক্রমণ করে বসে। কারণ? তিনি জানতেন, সেলজুকীরা এমন শক্তি অর্জন করেছে, তারা ইচ্ছা করলে যে কোন ছোট রাজ্যের শাসককে তরবারী দেখিয়ে শর্ত মানতে বাধ্য করার ক্ষমতা রাখে।

এই প্রেক্ষিতে সুলতান মাহমূদ ইসরাঈল সেলজুকীর দূতকে একটি সবুজ-শ্যামল এলাকা দেখিয়ে বললেন, এই এলাকাটি সেলজুকীদের দেয়া হবে এবং সেলজুকীদের সব শর্তই মানা হবে।

ইসরাঈল সেলজুকীর দূত ফিরে গিয়ে সেলজুকীকে সুলতানের বক্তব্য জানালে সে সুলতানের ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে সম্মতি প্রকাশ করলো।

* * *

১০২৩ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। সুলতান মাহমূদ এমন ক্ষিপ্রগতিতে ভারতে প্রবেশ করলেন যে, আজো তার সেনাদের গতির ব্যাপারটি নিয়ে সামরিক বিশেষজ্ঞগণ বিস্ময় প্রকাশ করেন। গযনী বাহিনী যে গতিতে কালাঞ্জরে পৌঁছেছিল, তখনকার পথ-ঘাট, গযনী থেকে কালাঞ্জরের দূরত্ব বিবেচনায় তা অসম্ভব মনে হয়। তখনকার সেনাবাহিনীর গঠন ও পথঘাটের অবস্থা বিবেচনায় যেকোন সফর ছিলো কঠিন ও দুর্গম। এছাড়াও পথিমধ্যে নদী-পাহাড়-জঙ্গল আরো কতো শত বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে গোয়ালিয়র হয়ে যে বিদ্যুৎগতিতে সুলতান মাহমূদ কালা রে পৌঁছেন তা ছিল এক অপার বিস্ময়।

গযনী থেকে গোয়ালিয়র যেতে ছোট নদীগুলো বাদ দিলেও অন্তত পাঁচটি বড় নদী তাকে পার হতে হয়েছে। তন্মধ্যে সিন্ধু, ঝিলম, চন্নাব, রাবী, সালাজ, গঙ্গা, যমুনা এবং গাম্বল নদী ছিল উল্লেখযোগ্য।

গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন ছিলেন কালাঞ্জরের রাজা গোবিন্দের পরম মিত্র। গোয়ালিয়র দুর্গ আজো কালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। সেই যুগে গোয়ালিয়র দুর্গ ছিল কিংবদন্তিতুল্য। দুর্গটি ছিল অত্যন্ত মজবুত শক্ত কাঠামো এবং সমতল থেকে উঁচু জায়গায় অবস্থিত। চতুর্দিকে গভীর খাদের মতো খাল থাকার কারণে গোয়ালিয়র দুর্গ ছিল যে কোন শত্রু আক্রমণে অজেয়।

সুলতান মাহমূদ যখন গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ সম্পন্ন করে ফেলেছেন, তখন রাজা অর্জুন টের পেলেন গযনী বাহিনী এসে গেছে। অবশ্য একটা মোক্ষম সময়ে সুলতান হিন্দুস্তানে পৌঁছাতে সক্ষম হন। দু'দিনের মধ্যে গোয়ালিয়র ও কালাঞ্জরের সৈন্য একত্রিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তারা তখনো অবস্থান করছিল নিজ নিজ রাজধানীতে। তখনো তাদের রণপ্রস্তুতি সম্পন্ন হয়নি।

অবরোধ আরোপ শেষ হতেই সুলতান মাহমূদ বুঝতে পারলেন, এই দুর্গকে কব্জা করা কঠিন। কারণ দুর্গ প্রাচীরের বাইরে যে ঢালু এবং খোলা এলাকা রয়েছে সেখানে কারো পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়ানোই কষ্টকর। তারপরও সুলতান মাহমূদ সৈন্যদের দুর্গ প্রাচীর ও দুর্গ ফটকে আঘাত হানার  নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, সবাই সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চ আওয়াজে তকবীর ধ্বনি দিতে থাকো।

দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে গযনী সেনাদের লক্ষ্য করে তীর বর্ষণ শুরু হলো। কিন্তু তা দিয়ে মোটেও দমাতে পারলো না গযনী বাহিনীকে। তারা দল বেঁধে একসাথে আঘাত করে দুর্গ ফটক ভাঙতে চেষ্টা করলো। দুটি হাতিকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে এদের কাঁধে দীর্ঘ মোটা একটি গাছের কাণ্ড ঝুলিয়ে দিয়ে হাতিকে দুর্গ প্রাচীরের দিকে দৌড়াতো, হাতি ফটকের দিকে এগিয়ে সজোরে ধাক্কা দিতো, কিন্তু তাতেও দুর্গ ফটক ভাঙা সম্ভব হচ্ছিল না। এর পাশাপাশি গযনীর তীরন্দাজরা দুর্গ প্রাচীরের উপরে থাকা তীরন্দাজদের প্রতি তীর ছুঁড়ে ফটকে হামলাকারীদের সহায়তা দিচ্ছিল।

সকল গযনী যোদ্ধাদের সমস্বরে উচ্চারিত 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠছিল। এভাবে হামলা অব্যাহত থাকল চারদিন। পঞ্চম দিনের সূর্য উদয় হতেই দেখা গেল দুর্গে সাদা পতাকা উড়ছে। সাদা পতাকা দেখে সুলতান মাহমূদ লড়াই বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। এদিন দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে গযনী সেনাদের দিকে কোন তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল না। দুর্গের প্রধান ফটক

খোলা ছিল। এ সময় ফটক পেরিয়ে বাইরে এসে থামল একটি পালকি। পালকিটি বয়ে এনেছিল চারজন সেনা। পালকিটি সুলতান মাহমূদের সামনে এনে রাখা হলো। পালকির ভেতর থেকে বের হলো একজন রাজকীয় পোষাক পরিহিত লোক। সে রাজার দূত। রাজা মৈত্রীর বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন। রাজা অর্জুন যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন ইতিহাসে সেই বার্তার কথা এভাবে লিখিত হয়েছে–

গযনীর সুলতান মাহমূদ গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করে টানা চারদিন এমন জোরদার আক্রমণ চালান যে, চারদিন পর পঞ্চম দিনে মহারাজা অর্জুন পালকীতে করে সুলতান মাহমূদের কাছে একজন শান্তি দূত পাঠান।

দূত এসে সুলতানের কাছে জানতে চাইলো, আপনি কি চান এবং আপনার আক্রমণের উদ্দেশ্য কি?

সুলতান বললেন, আমি মুসলমান। আমি আপনাদের আহ্বান করছি মূর্তিপূজা ত্যাগ করে আমরা যে একক সত্তা আল্লাহর ইবাদত করি আপনারাও তাঁর ইবাদত করুন। আপনারা আমাদের মতো ইবাদত করুন এবং গরুকে পূজা না করে গরুকে একটি ভক্ষণযোগ্য পশু মনে করে এর গোশত আহার করুন।

দূত বললো, আমাদের পক্ষে গরুর গোশত খাওয়া সম্ভব নয়। তবে আপনি আপনার কোন পণ্ডিতকে দুর্গে পাঠান, যিনি আপনাদের ধর্মের ব্যাপারটি আমাদের কাছে উপস্থাপন করবেন যদি আপনাদের ধর্ম আমাদের ধর্ম থেকে আরো উত্তম হয়, তাহলে আমরা তা মেনে নেবো।

সুলতান সেনাবাহিনীর একজন ইমামকে একজন দুভাষীসহ দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম রাজা অর্জুনের সাথে কথা বলে বিকেলে ফিরে এসে জানালেন, রাজা বলেছেন, আপনাদের ধর্ম মেনে নিতে পারবো না, তবে আমরা আপনাদেরকে তিন'শ হাতি এবং বিশ মণ রুপা উপঢৌকন দিচ্ছি। এর বিপরীতে আপনারা অবরোধ তুলে নিন।

সুলতান মাহমূদ একথা শুনে পুনরায় রাজা অর্জুনের কাছে বার্তা পাঠালেন, আপনার প্রস্তাব আমরা মানতে রাজি। তবে আমাদের পোষাক পরিধান করে, আমাদের দেয়া তরবারী কোমরে ঝুলিয়ে আপনার বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুলের উর্ধ্বাংশ কেটে আমাদের কাছে অর্পণ করতে হবে। কারণ এটি আপনাদের রীতি। এটা করলেই আমরা মনে করবো আপনি পরাজয় মেনে নিয়েছেন। আমরা নিশ্চিত হতে চাই আপনি এরপর আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করবেন না।

ইতিহাসে পরিষ্কার লেখা আছে, এই সংবাদ নিয়ে যখন সুলতানের দূত রাজা অর্জুনের কাছে গেল, তখন অর্জুন একটি রূপার কুরসীতে সমাসীন ছিলেন। দূত বর্ণনা করল, 'আমি দেখলাম সুদর্শন একটি যুবককে রুপার কুরসীতে সমাসীন। আমি তাকে বললাম, আপনার জন্যে আমি পোষাক নিয়ে এসেছি তা পরিধান করে আঙুল কেটে দিতে হবে।

তিনি বললেন, আপনি গিয়ে বলুন এই কাপড় পরেই আঙুল কাটা হয়েছে।

আমি দুঃখিত। আমি সুলতানকে প্রতারিত করতে পারবো না। আমাদের পোষাকই পরতে হবে।

রাজা অর্জুন অনিচ্ছা সত্ত্বেও পোষাক পরে নিলেন এবং কোমরে গযনী বাহিনীর দেয়া তরবারী ঝুলিয়ে নিলেন। আমি তার এই করুণ অবস্থা দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। তখন আর তাকে আঙুল কাটার কথা বলতে পারলাম না। তিনি নিজেই একজনকে ডেকে বললেন, ছুরি নিয়ে এসো। ছুরি আনা হলে তিনি খুবই স্বাভাবিকভাবে ছুরিটি হাতে নিয়ে নিজের হাতেই বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুলের অগ্রভাগ এক ঝটকায় কেটে ফেললেন এবং একটি কাপড়ে মুড়িয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। সেই সাথে তার কর্তিত আঙুলে ওষুধ মাখা পট্টি বেধে নিলেন। এ সময় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হলেও তার চেহারা ছিল সম্পূর্ণ ভাবান্তরহীন।

তিনি হিন্দুস্তানের রীতি অনুযায়ী আমাকে দামী কাপড়, রৌপ্য ও দু'টি ঘোড়া উপহার দিতে বললেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল জওযী অনুরূপ ঘটনা লিখে আরো যোগ করেছেন, সুলতান মাহমূদের কাছে এমন কনিষ্ঠ আঙুলের বহু অংশ সংরক্ষিত ছিলো। কারণ হিন্দুস্তানের বহু রাজা মহারাজা তার কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে অবশেষে তাদেরই রীতি অনুযায়ী বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙুল কেটে দিয়েছিলেন।

* * *

সুলতান মাহমূদ গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুনকে তার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করলেন এবং আনুগত্যের অঙ্গীকার নিয়ে কালাঞ্জরের দিকে রওয়ানা হলেন। কালাঞ্জর দুর্গের আয়তন ছিল বিশাল। বলা হয়ে থাকে প্রায় লাখ খানেক লোক, বিশ হাজার গবাদি পশু এবং পাঁচশ হাতি সেখানে থাকতো। সুলতান মাহমূদের কাছে এই বিশাল এলাকাকে আক্ষরিক অর্থে অবরোধ করার মতো বিপুল সংখ্যক

সৈন্যের অভাব থাকায় তিনি দুর্গে প্রবেশের সবগুলো প্রবেশ পথ বন্ধ করে দিয়ে কার্যত দুর্গবাসীকে অবরুদ্ধ করলেন। আসলে কালাঞ্জরের দুর্গকে সাধারণ দুর্গ না বলে মজবুত প্রাচীর ঘেরা একটি মহানগর বলাই সঙ্গত।

সুলতান মাহমূদ অবরোধ আরোপ করার পর মহারাজা গোবিন্দের কাছে পয়গাম পাঠালেন। পয়গামবাহী গযনী বাহিনীর বিশেষ ধরনের পোষাকে সজ্জিত হয়ে প্রধান ফটকের কাছে গিয়ে উচ্চ আওয়াজে রাজার উদ্দেশে বললো, 'গযনীর সুলতানের পক্ষ থেকে কালাঞ্জরের রাজা গোবিন্দকে হুশিয়ার করা হচ্ছে। গযনী বাহিনী দুর্গে প্রবেশ করলে কাউকে জীবিত রাখবে না। নিজ প্রজাদের গণহত্যা না করিয়ে রাজা ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন নয়তো আমাদের শর্ত মেনে নিয়ে পরাজয় স্বীকার করে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও কর আদায় করে আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারেন।'

কয়েক দিন এভাবেই চলে গেল। রাজা গোবিন্দ বশ্যতা স্বীকার করে নিতে চাচ্ছিলেন না কিন্তু গযনীর সৈন্যরা যখন আক্রমণ শুরু করলো, তখন কয়েকদিনের মধ্যে তার মনোবল ভেঙে গেল। দুর্গের হাজার হাজার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে মহাবিপর্যয়কর পরিস্থিতির জন্ম দিল। ফলে ইসলাম গ্রহণে সম্মত না হয়ে রাজা গোবিন্দ মৈত্রী চুক্তির জন্য পয়গাম পাঠালেন এবং ক্ষতিপূরণ ও বার্ষিক চাঁদা দেয়ার অঙ্গীকার করে একটি আপোস চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। বশ্যতা স্বীকারের প্রমাণস্বরূপ রাজা গোবিন্দও আঙুলের অগ্রভাগ কেটে সুলতানের কাছে পাঠালেন।

কিন্তু গোবিন্দ গযনী সুলতানের সাথে একটি নির্মম রসিকতাও করলেন। তিনি তিনশ হাতি উপহার হিসেবে দেয়ার কথা বলে সেগুলোকে দুর্গের বাইরে মাহুত ছাড়াই ছেড়ে দিয়ে সুলতানের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনার সৈন্যরা যদি সত্যিকার অর্থে সাহসী হয়ে থাকে তাহলে এগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে বলুন। সুলতান এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন।

গযনী বাহিনীতে তাতারী বা তুর্কী ইউনিট বলে একটি বিশেষ সেনা ইউনিট ছিল। এরা ছিল অত্যন্ত সাহসী, দৈহিক গঠনে বিশাল এবং লড়াকু। সুলতান তাতারী ও তুর্কী সৈন্যদের আহ্বান জানালেন, কারা আছো যে, এই হাতিগুলোকে কব্জা করতে পার?

হাতিগুলোকে মদ খাইয়ে মাতাল করে দুর্গের বাইরে এনে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। মাতাল হাতিগুলো বাঁধনমুক্ত হয়ে গযনী বাহিনীর উপর কেয়ামত বয়ে আনলো। তাঁবু, রসদসহ সবকিছু তছনছ করতে শুরু করলো।

সৈন্যদের মধ্যেও দেখা দিল আতঙ্ক। এ অবস্থায় তাতারী বা তুর্কী ইউনিটের যোদ্ধারা তাকবীর দিয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে হাতি নিয়ন্ত্রণে ঝাপিয়ে পড়ল এবং বহু কষ্টে সব কটা হাতিকেই তারা কব্জা করতে সমর্থ হলো। অবশ্য সুতলতান তাদেরকে নিদের্শ দিয়েছিলেন, তীর-বল্লম, তরবারী যেভাবে পারো এগুলোর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে সেনা শিবির হেফাযত করো। কিন্তু অসীম সাহসী যোদ্ধারা মাতাল হাতিগুলোর একটিকেও হত্যা না করে কাবু করতে সক্ষম হল। দুর্গ প্রাচীরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে কালাঞ্জরের হিন্দু অধিবাসীরা গযনী সেনাদের সাহসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চিৎকার করতে থাকে– বলতে থাকে সাবাশ গযনীর যোদ্ধারা! সত্যিই তোমরা অজেয়, তোমরা সাহসী, তোমরা বীরের জাতি। আমরা তোমাদের প্রণাম করি। নমস্কার জানাই।

মহারাজা গোবিন্দের আত্মসমর্পণের পর সুলতান মাহমূদ গযনী বাহিনীকে লাহোরে নিয়ে গেলেন। সুলতানের লাহোর আগমনের খবর পেয়ে লাহোরের বর্তমান রাজা তরলোচনপাল লাহোর ছেড়ে আজমীর চলে গেল। সুলতান মাহমূদ পুনর্বার লাহোরে প্রবেশ করে লাহোরকে গযনী সালতানাতের অঙ্গ ঘোষণা করলেন এবং তার অত্যন্ত প্রিয় গোলাম ও সঙ্গী আয়াযকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করলেন। আয়ায ছিলেন সুলতান মাহমূদের একান্ত ভৃত্য। ভৃত্য হলেও সুলতান তাকে বন্ধুর মতোই সম্মান ও মর্যাদা দিতেন। অস্বাভাবিক মেধা, বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার অধিকারী আয়াযের নাম সুলতান মাহমূদের সাথে সাথেই উচ্চারিত হয়।

লাহোরে বিপুল সংখ্যক সেনা রেখে সুলতান মাহমূদ ১০২৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ এপ্রিলের দিকে গযনী ফিরে এলেন। এদিকে গযনীর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর শক্তি নিয়ে অপেক্ষা করছিল ইসরাঈল সেলজুকী।

# সোমনাথের ফটকে

লাহোরকে গযনী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে সেখানে আয়াযকে গভর্নর নিযুক্ত করে সুলতান মাহমূদ যখন গযনী ফিরে এলেন তখন তাকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বিনা যুদ্ধে তেমন কোন সংঘর্ষ ছাড়াই বিশাল শক্তির অধিকারী তিনটি রাজ্যকে জয় করে গযনী ফিরে এলেও সুলতানের মধ্যে অন্যান্য বারের মতো বিজয়ের উচ্ছাস দেখা যাচ্ছিল না। তিনি কেমন যেন বিমর্ষ চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। তাকে দেখে বিধ্বস্ত মনে হচ্ছিল।

এই অবস্থা দেখে সুলতানের ডান হাত বলে খ্যাত ইতিহাস বিখ্যাত সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ্ আলতাঈ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুলতান! এবার হিন্দুস্তান থেকে ফিরে আসার পর থেকেই আপনাকে কেমন যেন পেরেশান বলে মনে হচ্ছে। এর কারণ কি?

সেনাপতির জিজ্ঞাসার জবাবে একটা শুষ্ক হাসি দিয়ে সুলতান বললেন, বয়সতো আমার তেমন একটা হয় নি। কিন্তু কিছু দিন থেকেই অনুভব করছি শরীরটা ভেঙে যাচ্ছে, ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে শরীর। সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্তি অনুভূত হচ্ছে।

সুলতানের বয়স তখন পঞ্চান্ন বছর। এটাকে তিনি মোটেও বেশি মনে করছিলেন না।

প্রধান সেনাপতি তখনই চিকিৎসককে ডেকে পাঠালেন। চিকিৎসক এসে সুলতানের স্নায়ু পরীক্ষা করলেন। শরীরের অবস্থা সম্পর্কে কিছু কথা জিজ্ঞেস করলেন। হৃদযন্ত্রের কম্পন পরিমাপ করে বললেন, সুলতানের এখন দীর্ঘ বিশ্রামের দরকার। তার স্নায়ু খুব দুর্বল। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে। সুলতান যদি পূর্ণ বিশ্রাম না নেন, তাহলে সামান্য অসুখও তাঁর জন্যে জীবনহানির কারণ হতে পারে।

আমি আরাম আয়াসের মধ্যে মরতে চাই না– বললেন সুলতান। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর সাথে আমি সাক্ষাত করতে চাই না। আমি নিজেকে বিলাসিতায় ডুবিয়ে দিতে পারি না। শরীরতো মাটির সাথে মিশে যাবে। দেহের শক্তি কমে গেলেও আমি আত্মার শক্তিতে আমার উপর আল্লাহর দেয়া কর্তব্য পালন করে যাবো। শায়খুল আসফান্দ! আপনি বলুন! আমার হৃদযন্ত্র ঠিক আছে তো?

হৃদযন্ত্র অবশ্য ঠিকই আছে– জবাব দিলেন চিকিৎসক শায়খুল আসফান্দ। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আপনার শরীর কোন ধরনের অভিযান, অবরোধ ও যুদ্ধের জন্যে মোটেও উপযোগী নয়। মূলত আপনি এখন যা করছেন এর সবই সম্ভব হচ্ছে আপনার আত্মবলে।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি। বললেন সুলতান মাহমূদ। আমার পীর ও মুর্শিদ শায়খ আবুল হাসান কিরখানী এটাকেই ঈমানী শক্তি বলে অভিহিত করতেন। শরীর মানুষের অনুভূতি অনুযায়ী দুর্বল হয়। দুর্বলতা এবং ব্যথা অনুভূতির দু'রকম বহি:প্রকাশ মাত্র। আপনি কোন ব্যথাকে যতটুকু তীব্র মনে করবেন, ব্যথাটা ঠিক ততটুকুই তীব্র হবে। হেকিম সাহেব! আপনাকে আমার ডেকে আনতে ইচ্ছে করছিল না কিন্তু আবু আব্দুল্লাহ্ ভয় পেয়ে আপনাকে ডেকে এনেছে।

সম্মানিত সুলতান! আপনি শারীরিক দুর্বলতার কথা বলেছিলেন, এজন্যই আমি হেকিম সাহেবকে ডেকে এনেছি– বললেন আবু আব্দুল্লাহ। শারীরিক দুর্বলতা ভালো লক্ষণ নয়।

তোমরা যাই বলো, আমি কিন্তু এটাকে অন্যরকম নির্দশন মনে করছি। আমি অনুভব করছি, আমাকে আমার 'রুহ' বলে দিচ্ছে, 'তোমার যা কিছু করণীয় তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে। হিন্দুস্তানের মূর্তিগুলো আমাকে শান্তিতে ঘুমাতে দেয় না। আমার ভয় হয়, কর্তব্য কাজ সম্পন্ন করার আগেই না আবার আমার দুনিয়া থেকে চলে যেতে হয়।

এই মুহূর্তে আমার বিপুল সমরশক্তির দরকার। অথচ মুসলিম শক্তিগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন। যেসব সরদার, নেতা ও শাসকরা আমার অবর্তমানে গযনীর জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে  তাদের সবাইকে আমার একত্রিত করতে হবে। আমার আশংকা হচ্ছে, আমার জীবন আর বেশি দিন নেই, আমি হয়তো কর্ত্তব্যকর্মগুলো সমাপ্ত করে যেতে পারবো না।

প্রধান সেনাপতি নানা কথায় সুলতানের আবেগকে প্রশমিত করে তাকে আশপাশের বৈরী মুসলিম শক্তিগুলোকে বাগে আনার কিংবা তাদের শক্তি নিঃশেষ করে দেয়ার কৌশল নিয়ে বাস্তবসম্মত উপায় নিয়ে কথা শুরু করলেন। অবশেষে তারা উভয়েই একমত হলেন, তারা তাদের সামরিক শক্তি প্রদর্শন করে প্রতিবেশী বৈরী শক্তিগুলোকে আনুগত্য স্বীকার করে নিতে বাধ্য করবেন। প্রতিবেশীদের মধ্যে সবচেয়ে আশংকাজনক অবস্থানে পৌছে গিয়েছিল ইসরাঈল সেলজুকী।

* * *

১০২৪ সালের প্রথম দিকে সুলতান মাহমূদ এমন বিশাল সেনাদল দিয়ে বলখের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন যে, সেনাদের পায়ের চাপে ঘমীন প্রকম্পিত হচ্ছিল। এই সেনাদলের মধ্যে একজন সৈন্যও পদাতিক ছিলো না। সবাই ছিলো অশ্বারোহী। ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে- সেই সৈন্যদের মধ্যে চুয়ান্ন হাজার ছিল অশ্বারোহী, তাছাড়া তাদের সাথে তেরশ জঙ্গী হাতি ছিল। হাতির উপরে তীর বল্লমে সজ্জিত ছিল আরো প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্য।

সকল সৈন্য অত্যন্ত খোশমেজাজে ধীরস্থিরভ সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। সুসজ্জিত এই সেনাবহর দেখতে অত্যন্ত সুশীল ও সুন্দর হলেও শত্রুদের জন্যে তারা সৃষ্টি করেছিল মরণ আতংক। এই সৈন্যদল ছাড়াও সুলতান মাহমূদের আরো হাজার হাজার সেনা গযনী এবং হিন্দুস্তানের সীমান্ত ও বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন ছিল।

সেনাদের অগ্রভাগে ছিল সুলতানের সংবাদ বাহক দল। প্রতিটি ছোট্ট ছোট্ট রাজ্যে পৌঁছে অগ্রবর্তী দলের সংবাদবাহীরা শাসকদের কাছে গিয়ে বলতো-

গযনীর সুলতান চুয়ান্ন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও তেরোশ জঙ্গি হাতি নিয়ে আসছেন। আপনি যদি আল্লাহর নামে কাফেরদের বিরুদ্ধে সুলতানের অভিযানে শরীক হওয়ার জন্যে সুলতানের সাথে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তার আনুগত্য করতে সম্মত হন তাহলে আপনার ক্ষমতা ও রাজত্ব অক্ষুণ্ন রাখা হবে। নয়তো আপনি গযনী সেনাদের সঙ্গে যেমন আচরণ করবেন সেরকমই আচরণ করা হবে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, বিশাল সেনাবহর ও সমরশক্তি দেখে গযনীর প্রতিবেশী এবং শত্রুতা পোষণকারী সকল শাসক ও ছোট ছোট রাজত্বের অধিকারী আমীর উমারা দামী দামী উপহার উপঢৌকন নিয়ে আগেভাগেই সুলতানের সামনে হাজির হয়ে তার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে নিচ্ছিল এবং তাদের রাজ্যে সুলতানকে স্বাগত জানাচ্ছিল। সুলতান তাদের উপহার গ্রহণ করে এবং তাদের সঙ্গে মৈত্রীত্বের ঘোষণা করে বলতেন, আপনাদের সবাইকে জিহোন নদীর তীরবর্তী কোন জায়গায় দাওয়াত দেয়া হবে। সেখানে আপনাদেরকে উপস্থিত থাকতে হবে। সেখানে আপনাদের সাথে আমার গুরুত্বপূর্ণ কথা হবে এবং আপনাদের সম্মানজনক আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে।

এক পর্যায়ে সুলতান জিহোন নদী পার হয়ে গেলেন। খুতুন নামের একটি রাজ্যের শাসক ছিলেন কাদের খান। তিনি ছিলেন সুলতান মাহমূদের ঘোরতর শত্রু। তাঁর কাছে যখন সুলতানের সমর শক্তির বর্ণনা দিয়ে সংবাদবাহীরা

সুলতানের আনুগত্যের দাওয়াত দিল, তখন কাদের খান কোনরূপ কথাবার্তা না বলে অনেকগুলো উট বোঝাই করে দামী দামী উপহার নিয়ে সুলতানের কাছে হাজির হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলেন।

সুলতান জিহোন নদীর তীরবর্তী একটি জায়গায় সেনাদের যাত্রা বিরতি দিয়ে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং সেই অঞ্চলের সকল আমীর ও শাসকদের দাওয়াত করলেন। সেসব অঞ্চলের মধ্যে সুলতান সবচেয়ে বেশি বৈরী মনে করেছিলেন বলখের শাসক আলাফতোগীন ও সেলজুকী নেতা ইসরাঈল সেলজুকীকে। এরা সম্মিলিতভাবে সুলতানের বিরুদ্ধে একবার যুদ্ধ করেছিল এবং শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছিল।

সুলতান মাহমূদ এদের কাছেও তার দূত পাঠিয়ে দাওয়াত দিলেন।

সুলতানের দূতেরা যখন আলাফতোগীনের কাছে তার পায়গাম পৌঁছাল, তখন আলাফতোগীন চরম অবজ্ঞা ভরে সুলতানের পয়গাম শুনলো। তার পাশে বসাছিল তার সুন্দরী স্ত্রী।

তোমার সুলতান কি তার দাওয়াত কবুল করার জন্যে আমাদের প্রতি অনুরোধ করেছে? দূতের উদ্দেশে বললো আলাফতোগীনের স্ত্রী।

সম্মানিত রানী! গযনীর সুলতান শুধু বলখ ও সমরকন্দের শাসককে তার মজলিসে দাওয়াত করেছেন। তিনি আপনার কথা উল্লেখ করেননি– বললো দূত।

তোমাদের সুলতানের এই দাওয়াতের উদ্দেশ্য কি? জানতে চাইলেন আলাফতোগীন।

দূত বললো, সুলতান চুয়ান্ন হাজার অশ্বারোহী ও তেরো'শ জঙ্গি হাতি নিয়ে এসেছেন। তার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য বোঝা মোটেও কঠিন নয়। আপনার প্রিয় বন্ধু কাদের খান ইতোমধ্যে সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে তার রাজ্যে সুলতানকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। আমি আশা করবো, সুলতানের দাওয়াত গ্রহণ না করে আপনি আপনার সৈন্যদেরকে গণহত্যার শিকার করবেন না।

কাদের খান একটা কাপুরুষ। তোমাদের সুলতানের মোকাবেলা হবে একজন দুঃসাহসী বীরপুরুষ বাদশার সাথে– বললো আলাফতোগীনের স্ত্রী।

সম্মানিত রানী। লড়াই কোন নারীর কাজ নয়। আমি বলখের শাসকের সাথে কথা বলতে এসেছি, আপনার সাথে নয়। বলখের শাসককে পরিষ্কার ভাষায় বলতে হবে তিনি সুলতানের দাওয়াত কবুল করবেন কি-না। দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো দূত।

আমি যাবো! তবে এ ব্যাপারটি এখনই আমি বলে দিতে পারবো না, গযনীর আনুগত্য আমি গ্রহণ করবো কি-না?

অবশেষে আলাফতোগীনও সুলতান মাহমূদের দাওয়াতে হাজির হলেন। কিন্তু তার রানী তার সাথে আসেননি। আলাফতোগীন সাথে করে কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে এলেন।

আপ্যায়ন শেষে সুলতান মাহমূদ সকল সামন্ত শাসকদের একত্রিত করলেন। সুলতান শাসকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেয়ার সময় তার পাশে রাখলেন প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ ও অন্যতম সেনাপতি আরসালান জাযেবকে। আরসালান জাযেব ছিলেন খাওয়ারিজমের গভর্নর। আরসালান ছিলেন শত্রুদের ব্যাপারে অত্যন্ত আপসহীন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে দারুন পারদর্শী। তিনি মনে করতেন, শত্রুদের উপর দয়া করা নিজেকে বিপদে ফেলা ও পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করার নামান্তর।

ঐতিহাসিক ইবনুল আসীর ও ইবনুল জওযীর ভাষ্যমতে, সেদিন সামন্ত শাসকদের উদ্দেশে সুলতান বললেন-বন্ধুগণ! আপনারা আমার সমরশক্তি প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি এখানে তেরো'শ জঙ্গি হাতি নিয়ে এসেছি। আরো বারো'শ জঙ্গি হাতি গযনীতে রয়ে গেছে। এখানে যে পরিমাণ অশ্বারোহী সৈন্য এসেছে এর চেয়ে ঢের বেশি গযনী সালতানাতের বিভিন্ন জায়গায় নিয়েজিত রয়েছে।

আপনারা দেখেছেন, আমি একজন পদাতিক সেনাকেও সাথে আনিনি। এসব সৈন্য কি আপনাদের নিরস্ত্র করতে সক্ষম নয়? কিন্তু আমি আপনাদেরকে সামরিক শক্তির ভয় দেখাতে আসিনি। আল্লাহর ভয় স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি। আমি আল্লাহর পথে জীবনের শুরু থেকেই জিহাদে লিপ্ত রয়েছি। এজন্য তিনি আমাকে এই বিপুল সৈন্যবল দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। এই বিপুল শক্তি অর্জনে আমার ব্যক্তিগত কোন কৃতিত্ব নেই। এসবই একমাত্র আল্লাহর দান।

আমি জানি, আপনারা আমাকে হিন্দুস্তানের লুটেরা এবং ধনসম্পদ ও অর্থ লোভী বলে গালিগালাজ করেন। সত্যিকার অর্থে যদি আমি ধনসম্পদের পূজারী হতাম, তাহলে যে পরিমাণ ধনসম্পদ আমার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সঞ্চিত আছে, এগুলো দিয়ে শুধু আমি কেন আমার ভবিষ্যত তিন পুরুষ আরাম আয়েশে জীবন-যাপন করতে পারতো।

আপনারা জানেন, আমি আপনাদের মতো বিলাসী জীবন-যাপন করি না। আমার গোটা জীবনটাই যুদ্ধে যুদ্ধে রণাঙ্গনে কেটেছে। আমি আরামের বিছানায়

শুয়ে শুয়ে মরতে চাই না। আমি চাই আমার মৃত্যু হোক রণাঙ্গনে। আর হিন্দুস্তানের মাটিতে আমার দেহ মিশে যাক।...

এখানে উপস্থিত আপনারা সবাই আমার ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু আমার বিরোধিতা করলেও আপনারা কিন্তু কখনো সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারেননি। কারণ আপনারা সবাই ক্ষমতার পূজারী। আপনারা কি বলতে পারবেন, খুব আরাম ও সুখের জীবন পেয়েছেন আপনারা? আপনারা দেশের সাধারণ মানুষকে গোলামে পরিণত করেছেন। এজন্য সবসময় গণ-বিদ্রোহের আতংকে থাকেন আপনারা।

বুখারা ও সমরকন্দের শাসক আলাফতোগীন আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আমি জানতে পেরেছি, তিনি সাধারণ মানুষকে খুব অত্যাচার- উৎপীড়ন করেন। কোন একজন নাগরিকও তার প্রতি সন্তুষ্ট নয়। আমি জানি, শাসন ক্ষমতা মানুষের মনে দারুন সুখানুভূতি ও নেশার সৃষ্টি করে। আপনাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছেন যারা ইসলামের অপব্যাখ্যা করে ধোঁকা দিয়ে প্রজাদের শাসন করছেন। এমন শাসকরা নাগরিকদের সামনে নিজেকে ইসলামের প্রহরী বলে সাব্যস্ত করেন বটে; কিন্তু তারা বুঝতে চান না, তাদের চেয়ে বড় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তাআলা। তিনি ইচ্ছা করলে যেকোন সময় যে কারো ক্ষমতার মসনদ উল্টে দিতে পারেন।

জনসাধারণের উপর যুলুম করা, তাদেরকে সম্মান না করা এবং দেশের সাধারণ নাগরিকদের সাথে প্রতারণা করা, ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছাড়ানো কঠিন গোনাহর কাজ। আল্লাহ তাআলা এমন গোনাহ ক্ষমা করেন না। আপনাদের অপরাধের কারণেই হয়তো আজ আল্লাহ আপনাদের উপর আমাকে চাপিয়ে দিয়েছেন।

আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আপনাদের বলে দিচ্ছি, আমি আপনাদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে গোলাম বানাতে আসিনি। আমি আপনাদের রাজ্য দখল করতে আসিনি। আমি আপনাদের বলতে এসেছি, এই যমীনের মালিক আল্লাহ! এই যমীনের উপর শাসক হিসাবে বসবাস করার আপনাদের যেমন অধিকার রয়েছে, একজন নগণ্য-নাগরিকেরও ততটুকুই অধিকার রয়েছে।

আমি আপনাদেরকে ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত করতে এসেছি। আমি আপনাদের কাউকেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার সাথে রণাঙ্গনে নিয়ে যেতে চাই না। রণাঙ্গনের ব্যাপারটি আমি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি। আমি হিন্দুস্তানকে ইসলামী সালতানাতে পরিণত করতে চাই। কারণ, হিন্দুস্তান একসময় ইসলামী

সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হিন্দুস্তান তো সেইসব মুসলমানদের অর্জিত ভূমি যেসব মুজাহিদ মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে নিজেদের জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে বিক্ষুব্ধ সাগর পারি দিয়ে হিন্দুস্তানে এসেছিলেন এবং এখানেই তারা জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

আজ সেই শহীদানের কবরের উপর মন্দির গড়ে উঠছে এবং পৌত্তলিকতার পূজা চলছে। বিন কাসিমের বিজিত এলাকার মসজিদগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে এবং মুসলমান তরুণীদের সম্ভ্রম নিয়ে হুলিখেলা চলছে। হিন্দুস্তানে ইসলামের বাতি এখন প্রায় নিভতে বসেছে।

বন্ধুগণ! আমি একটি ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াইয়ে নেমেছি। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করেন দেখুন, ক্রমবর্ধমান হিন্দুত্ববাদকে যদি আমরা স্তব্ধ করে না দেই, আমরা যদি পৌত্তলিকতার বিষ বৃক্ষ উপড়ে না ফেলি, তাহলে হিন্দুস্তান মুসলমানদের জন্যে কসাইখানায় পরিণত হবে।

আর সেখানকার মসজিদগুলো নোংরা আস্তাবলে পরিণত হবে। আমি আপনাদের কি বলতে চাচ্ছি, তা বুঝতে আপনাদের মোটেও কষ্ট হওয়ার কথা নয়। আপনারা সবসময় আপনাদের কান, চক্ষুও বিবেককে সত্য উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অসাড় করে রেখেছেন। আপনাদের বদ্ধ চোখ, কান ও বিবেকের কপাট আমি খুলতে এসেছি।

এখন আপনাদের সামনে আমি দুটি নির্দেশনা পেশ করছি–

১. প্রথমতঃ আপনারা আপনাদের অর্ধেক সৈন্য আমাকে দিয়ে দেবেন। তাদেরকে আমি হিন্দুস্তানে নিয়ে যাবো। আপনারা সবাই একটি চুক্তিতে সই করবেন যে, আমার অবর্তমানে আপনারা গযনী আক্রমণ করবেন না; বরং গযনীর নিষ্ঠাবান প্রহরীর ভূমিকা পালন করবেন।

২. দ্বিতীয়তঃ নয়তো আমি আপনাদের সবাইকে গ্রেফতার করে আপনাদের শাসিত সবগুলো অঞ্চলকে গযনী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে নেবো। আল্লাহর মেহেরবাণীতে আমার এই শক্তি আছে। ইচ্ছা করলে খুব সহজেই আমার এই কথা আমি বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম।

একথা বলে সুলতান মাহমূদ থেমে গেলেন। তিনি উপস্থিত সবার চেহারার দিকে তাকিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া যাচাই করলেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি বললেন, আমার উপস্থাপিত এই দুই নির্দেশনা যদি কারো পছন্দ না হয় তিনি হাত তুলে তার আপত্তি জানাতে পারেন।

উপস্থিত কোন শাসকই তাদের হাত উপরে উঠানোর সাহস করলো না। সুলতান উপস্থিত সবাইকে মোরাবকবাদ জানিয়ে বললেন, আগামীকাল আপনাদের সামনে মৈত্রী চুক্তির দলিল পেশ করা হবে, সেখানে সবাইকে মোহরাঙ্কিত দস্তখত দিতে হবে।

* * *

পর দিন সকাল বেলায় ফজরের নামাযের পর সুলতান মাহমূদ চুক্তিপত্র লেখার জন্য সরকারী মুহরিরকে নির্দেশ দিলেন। চুক্তিনামা প্রস্তুত হওয়ার পর সুলতান সকল শাসককে তাঁর তাঁবুতে ডাকলেন। এ সময় সুলতানকে জানানো হলো, সমরকন্দ ও বলখের শাসক আলাফতোগীন অনুপস্থিত। তার তাঁবুও খালি। তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তল্লাশী করে জানা গেছে, ভোরের অন্ধকারেই কয়েকজন অশ্বারোহী বুখারার দিকে চলে গেছে।

সুলতানের নির্দেশে কিছুসংখ্যক অশ্বারোহীকে পিছু ধাওয়া করার জন্য পাঠানো হলো। দ্রুতগামী অশ্বারোহীরা পথিমধ্যেই আলাফতোগীনকে পেয়ে গেলো। আলাফতোগীন ছিল নিরাপত্তা প্রহরী বেষ্টিত। সে তার নিরাপত্তা-রক্ষীদেরকে প্রতিরোধের নির্দেশ দিল।

কিন্তু গযনী বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল তার নিরাপত্তা রক্ষীর চেয়ে দ্বিগুণ। গযনীর সৈন্যরা নিরাপত্তা-রক্ষীদের চরম হুমকী দিলে তারা মোকাবেলার সাহস পেলো না। তারা সবাই আত্মসমর্পন করলো। ফলে সহজেই গ্রেফতার হলো আলাফতোগীন। গযনীর সৈন্যরা তাকে এনে সুলতানের সামনে হাজির করলো।

পলাতক আলাফতোগীনকে দেখে সুলতান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন– আমার আহবান উপেক্ষা করে তুমি পালিয়ে গেলে, কিন্তু আল্লাহর পাকড়াও থেকে কি তুমি নিজেকে সরিয়ে নিতে পারবে? আমি তো তোমার উপর আমার আনুগত্যের খড়্গ চাপাতে আসিনি। আল্লাহর আনুগত্যের পয়গাম নিয়ে এসেছি। তোমার পালিয়ে যাওয়ার কারণ কি?

আমি গযনীর আনুগত্য স্বীকার করি না-জবাব দিলো আলাফতোগীন।

একে শিকলে বেঁধে এখনই হিন্দুস্তানে পাঠিয়ে দাও এবং মুলতানের কয়েদখানায় বন্দি করে রাখো। বাকী জীবনটা ওকে সেখানেই কাটাতে হবে।

বাস্তবেও আলাফতোগীনের বাকী জীবন সুলতানের কয়েদখানার একটি ছোট্ট কক্ষেই কাটাতে হয়েছে।

আলাফতোগীন ছাড়া সকল শাসকই চুক্তিনামায় দস্তখত করে তাদের আনুগত্যের অঙ্গীকার ব্যক্ত করলো।

সুলতান মাহমূদ চুক্তিপত্র সম্পাদনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত ঘোষণা করতে যাবেন, ঠিক এই সময় তাকে জানানো হলো– ইসরাঈল সেলজুকীও হাজির হয়েছে।

ইসরাঈল সেলজুকী ইতোমধ্যে দু'বার সুলতানের সাথে টক্কর দিয়ে মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এবার সুলতানের নিয়ে আসা সামরিক শক্তি দেখে সে বুঝতে পেরেছিল তার পক্ষে এদের মোকাবেলায় টিকে থাকা অসম্ভব। মূলত সে আনুগত্য প্রকাশ করতেই এসেছিল। অবশ্য সে সময়কার ঐতিহাসিক প্রামাণ্যগ্রন্থ তাবকাতে নাসেরীতে লেখা হয়েছে–

তুর্কমানী সেলজুকীদের নিয়ে গঠিত একটি সেনা ইউনিটের আগে আগে আসছিল ইসরাঈল সেলজুকী। সে মাথার টুপিটাকে বাঁকা করে রেখেছিল। এটা ছিল তার বীরত্ব ও শক্তির পরিচায়ক। সে তার ঘাড়টা উঁচিয়ে রেখেছিল, তাতে বুঝানো হচ্ছিল সে কাউকে পরোয়া করে না।

ইসরাঈল সেলজুকী যখন সুলতান মাহমূদের সাথে সাক্ষাত করলো, তখন ইসরাঈল সেলজুকীকেও তিনি সেই কথাই বললেন, যা অন্য শাসকদের বলেছিলেন। তাদের পরস্পর কথাবার্তার পর ইসরাঈল সেলজুকী সুলতানের আনুগত্যের ঘোষণা দিল। সুলতান যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাকে কতোজন সৈনিক দিতে পারবে?

সুলতানের প্রস্তাবে ইসরাঈল সেলজুকী যা বলেছিল তা অক্ষরে অক্ষরে ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়েছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গীবন লিখেছেন–

ইসরাঈল সেলজুকী তার তীরদান থেকে একটি তীর বের করে সুলতানের হাতে দিয়ে বললো, এই তীরটি যদি আপনি উত্তর দিকে ছুড়েন তাহলে পঞ্চাশ হাজার তুর্কমানী সেনা আপনার ডাকে সাড়া দেবে। আপনার যদি আরো সৈন্যের প্রয়োজন হয় তাহলে আরেকটি তীর বলকানের দিকে ছুড়ে দেবেন তাহলে আরো পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী আপনার কাছে চলে আসবে।

সুলতান বললেন, তোমার সকল সৈন্যদেরই যদি আমার প্রয়োজন হয় তবে কি করবে?

তাহলে আমার ধনুক আপনি দূতের হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। সে গোটা এলাকায় গিয়ে তা দেখিয়ে ফিরে আসবে। এরপর দেখবেন, দু'লাখ সৈন্য আপনার কাছে চলে আসবে– বললো ইসরাঈল।

ইসরাঈলের ভাবভঙ্গি এবং তার কথাবার্তা শুনে সুলতান মাহমুদ সংশয়ে পড়ে গেলেন। ইসরাঈলের কথার মধ্যে তার সন্দেহ হলো।

নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ 'মজমুআতুল আনসার' এ লেখা হয়েছে– সুলতান ইসরাঈলকে অতিথিদের জন্যে বরাদ্দকৃত তাঁবুতে পাঠিয়ে তার কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তার যথাযথ সম্মানও সেবাযত্ন করতে। ইসরাঈল চলে যাওয়ার পর সুলতান তার সম্পর্কে আরো খোঁজ-খবর নিলেন।

এর মধ্যে কাদের খান সুলতানকে জানালো, সেলজুকীরা সকলের জন্যেই একটা প্রকট সমস্যা হয়ে ওঠেছে। এদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি রক্ষার আশা করা ঠিক নয়।

সুলতানের বিশ্বস্ত ও প্রিয় সেলজুকী সেনাপতি আরসালান জাযেব সুলতানকে বললেন, সেলজুকীদের মধ্যে কোন নীতি নৈতিকতার বালাই নেই। এরা কোন নিয়ম নীতিকেই সম্মান করতে জানে না।

ইসরাঈল সেলজুকীর ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তায় সুলতান পূর্বেই সংশয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। তদুপরি অন্যদের সাথে পরামর্শ করার পর ইসরাঈল সেলজুকীর প্রতি আস্থা না রাখার ব্যাপারেই চূড়ান্ত হিসাবে নেয়া হলো। এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন– ইসরাঈল সেলজুকীকে গ্রেফতার করে কালাঞ্জর দুর্গের বন্দিশালায় পাঠিয়ে দেয়া হোক।

তখনই ইসরাঈলের হাতে হাতকড়া ও পায়ে জিঞ্জির বেঁধে তাকে কাশ্মীরের পথে রওয়ানা করানো হলো। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন– সাত বছর ইসরাঈল কালাঞ্জর দুর্গের বন্দিশালায় আটক ছিল। একবার সে ফেরার হওয়ার চেষ্টা করে জেলখানা থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, কিন্তু বরফের কারণে বেশি দূর যেতে পারেনি। ধরা পড়ে আবার কয়েদ হয়। সাত বছর জেলখানার ঘানি টেনে ইসরাঈল সেখানেই মৃত্যুবরণ করে।

ইসরাইলকে যখন গ্রেফতার করে হাতে হাতকড়া এবং পায়ে জিঞ্জির বেঁধে কাশ্মীরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তার সাথে আসা তুর্কমানী সৈন্যরা পাশেই দাঁড়ানো ছিল। তখন সে তুর্কমানীদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে নির্দেশ দেয়– তোমাদের এখন প্রধান কাজ হলো, গযনীর প্রতিটি ইট ধসিয়ে দেয়া। যাও তোমরা তাই করো।

সুলতান মাহমূদ সেলজুকী নেতাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাদের বসবাসের জন্য তিনি একটা স্বতন্ত্র এলাকা দান করবেন। ইসরাঈল সেলজুকীকে গ্রেফতারের পর তিনি ঘোষণা দিলেন, জিউন ও যরফাশা নদীর মধ্যবর্তী

এলাকাটা সেলজুকীদের বসবাসের জন্য বরাদ্দ করা হলো। তিনি তার কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিলন, সকল সেলজুকী গোত্রের লোকদেরকে এখনই এই এলাকায় নিয়ে আসা হোক।

সুলতানের নির্দেশ মতো চার হাজার সেলজুকী পরিবারকে জিউন ও যরফাশো নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় নিয়ে আসা হলো।

তাদেরকে নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি তুর্কীস্তানী ও তুর্কমানীদের আলাদা করে ফেললেন এবং বহু গযনী সেনা নিয়োগ করলেন। এই প্রথমবার তুর্কমানী ও তুর্কস্তানীরা সুলতান মাহমূদকে সরাসরি দেখার ও তার কথা শোনার সুযোগ পেলো। সুলতানের লোকেরা তাদের বুঝাতে লাগলো, সুলতান মাহমূদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ কি? তিনি কেমন শাসক? কেমন স্বভাবের মানুষ? সুলতানের লোকেরা তুর্কমানীও তুর্কীদের সাথে উঠাবসার কারণে গযনী বাহিনীর নীতি নৈতিকতা এবং সুলতান সম্পর্কে তাদের মনে ইতিবাচক ধারণা জন্মালো।

এরপর একদিন সুলতান তুর্কমানী ও তুর্কিস্তানী সেলজুকীদের উদ্দেশ্যে বললেন– তোমরা গযনী সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে যাও। সুলতানের এই আহবান সফল হলো। খুশি মনে বহু তুর্কি ও তুর্কমানী গযনী বাহিনীতে ভর্তি হয়ে গেলো। ফলে সুলতানের এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্যই সফল হলো। তিনি এবার অনেকটা নিশ্চিন্তভাবে ভারতের দিকে মনোনিবেশ করার সুযোগ পেলেন।

* * *

হিন্দুস্তানের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত গুজরাট রাজ্য। গুজরাট রাজ্যের একেবারে সমুদ্রতীরে অবস্থিত খাটায়ার শহর। সেখান থেকে সত্তর মাইল দক্ষিণের শহরের নাম সোমনাথ। সোমনাথ হলো একটি ঐতিহাসিক প্রাচীন মন্দিরের নাম। হিন্দুস্তানের বিখ্যাত ও প্রাচীন মন্দিরগুলোর মধ্যে সোমনাথ অন্যতম। সুলতান মাহমূদের সময় গুজরাটের গোটা সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় অসংখ্য মুসলমান বসবাস করতো। আজো গুজরাটের আহমদাবাদ এলাকা একটি মুসলিম প্রধান এলাকা।

আহমদাবাদে ১৯৪৭ এর পর থেকে কয়েকবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। এসব দাঙ্গায় হিন্দু সন্ত্রাসীদের হাতে বহু নিরীহ-নিরপরাধ মুসলমানের প্রাণ দিতে হয়েছে। কয়েকটি দাঙ্গায় সেখানকার হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন ও পুলিশের লোকেরা মুসলিম নিধনে হিন্দুদের সহায়তা করেছে বলে বিভিন্ন তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের কোন সরকারই মুসলিম নির্যাতনের বিরুদ্ধে যথার্থ পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

সর্বশেষ ২০০০ সালের দাঙ্গায় বহু মুসলিম নারী ও শিশুকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। অসংখ্য মুসলমানকে গৃহহীন করা হয়েছে। বাধ্য হয়ে সেখানকার হাজার হাজার মুসলমান এখন উদ্বাস্তু শিবিরে মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

সিন্ধু অববাহিকা থেকে নিয়ে আরব সাগর তীরবর্তী গোটা উপকূল অঞ্চলে ছিল অসংখ্য মুসলমানের বসবাস। এসব অঞ্চলে মুসলমানরাই ছিলো সংখ্যাগুরু। এ অঞ্চলের মুসলমানদের আদিপুরুষরা ছিলেন মূলতঃ আরব। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের সময় যে সকল মুসলিম যোদ্ধা হিন্দুস্তানে এসেছিলেন তাদের অধিকাংশই হিন্দুস্তানে স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলেছিলেন।

মুসলমানদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই সোমনাথ ছিল একটি বন্দর এলাকা। এখানে প্রাচীনকাল থেকেই আরব বণিকেরা আসা-যাওয়া করত। বিভিন্ন দেশের জাহাজ এখানে এসে নোঙর করতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর এক দু'জন করে মুসলমান এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের ভারত অভিযানের সময়েও সোমনাথ এলাকায় অনেক মুসলমান বসবাস করত।

সোমনাথ ছিল একটি বিশাল মন্দির। সারা ভারত থেকে হিন্দুরা এখানে পূজা দিতে আসতো। সোমনাথ এলাকার শাসক ছিল কুমার রায়। সে ছিল ভীষণ অত্যাচারী। মুসলমান প্রজাদের উপর খুবই অত্যাচার করতো। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে, প্রতি চাঁদের পূর্ণিমাতে সোমনাথ মন্দিরের মূল বেদীতে একজন মুসলমানকে ধরে বলি দেয়া হতো এবং তার রক্ত দিয়ে মূর্তিগুলোর গা ধুইয়ে দেয়া হতো।

সোমনাথ মন্দিরের গোড়াপত্তন কবে কখন কে করেছিল, ইতিহাসে এর কোন সুনির্দিষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে সোমনাথকেন্দ্রিক কিছু পৌরাণিক কাহিনী। যে কাহিনী খুবই অশ্লীল ও সভ্যতা বিবর্জিত।

বলা হয় চন্দ্র নামের এক দেবতা একবার এক ব্রাহ্মণ প্রজার কয়েকজন মেয়েকে একসাথে বিয়ে করে। এদের মধ্যে রুহানী নামের মেয়েটি ছিল সবচেয়ে সুন্দরী। চন্দ্রদেবতা রূহানীকেই সব সময় কাছাকাছি রাখতো। আর অন্যদের উপেক্ষা করতো। এই অবস্থা দেখে সেই ব্রাহ্মণ একদিন চন্দ্রদেবতাকে বললো সকল মেয়ের সাথেই সমান আচরণ করতে। কিন্তু চন্দ্র তা শুনলো না। ফলে ব্রাহ্মণ দেবতাকে অভিশাপ দিলো। তাতে চন্দ্রদেবতা কুষ্ঠরোগী হয়ে গেল।

এক পর্যায়ে ব্রাহ্মণ শর্ত দিলো, সে তার অভিশাপ তুলে নেবে; কিন্তু চন্দ্রদেবতাকে যমীনে মহাদেব এর কোন চিহ্ন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

হিন্দুদের ধর্মীয় বর্ণনা মতে– ব্রাহ্মণের শর্ত মেনে চন্দ্রদেবতা অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য সমুদ্রতীর ঘেষে একটি জায়গায় বিশাল একটি গোলাকার পাথরে শিবলিঙ্গের প্রতি মূর্তি স্থাপন করে এবং সেটিকে কেন্দ্র করে একটি বিশাল মন্দির গড়ে তোলে। যার নাম দেয়া হয় সোমনাথ। সোম অর্থ চন্দ্র আর নাথ অর্থ প্রভু। এ অর্থে সোমনাথের অর্থ হয় চন্দ্রের প্রভু।

প্রতি চাঁদের পূর্ণিমাতে সাগর কিছুটা উত্তাল হয় এবং সমুদ্র পিষ্ঠ উঁচু হয়ে জোয়ারের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। ফলে সমুদ্রের পানিতে ব্যাপক তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত হয়। হিন্দু পুরোহিতরা এটাকে প্রচার করে, চন্দ্রদেবতা তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রতিমাসেই সোমনাথ মন্দিরের পা ধুইয়ে দেয়। মজার ব্যাপার হলো, একেবারে সমুদ্রতীরে গড়ে উঠার কারণে সবসময়ই জোয়ারের পানিতে সোমনাথের দেয়াল গাত্র প্লাবিত হতো। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার সোমনাথ মন্দিরের পুরনো ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন করে বিশালাকারে মন্দির নির্মাণ করে।

সোমনাথকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের এমন সব পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত আছে যে, এগুলো গ্রন্থিত করলে বিশাল আকারের গ্রন্থ হয়ে যাবে।

বস্তুত সেকালের সোমনাথ মন্দির ছিল স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য নিদর্শন। সমুদ্র তীর খনন করে অনেক গভীর থেকে মন্দিরের দেয়াল উঠানো হয়েছিল। মন্দিরে ৫৬টি স্তম্ভ ছিল। এগুলো ছিল সেগুন কাঠের। সুদূর আফ্রিকা থেকে জাহাজ বোঝাই করে বিশাল আকারের সেগুন গাছ আনা হয়েছিল। সেগুন গাছের ভেতরে লোহা ঢুকিয়ে স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছিল। মন্দিরে শিবের মূর্তিই ছিল প্রধান। এ ছাড়াও ছোট বড় আরো বহু মূর্তি ছিল। সব মূর্তির গায়েই ছিল দামী দামী হীরা ও মণিমুক্তার অলংকার। তাছাড়া সোনা ও রুপার তৈরি মূর্তিও ছিল।

যে কক্ষে মূর্তিগুলো স্থাপন করা হয়েছিল, সে কক্ষে কোন মশাল, প্রদীপ বা বাতি জ্বালানো হতো না। কিন্তু মূর্তির কক্ষ সব সময় আলোকিত থাকতো। আলোর ব্যবস্থার জন্যে কক্ষের উপরে এমনভাবে হীরা ও মুক্তা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল যে, অন্যান্য কক্ষের আলো হীরার মধ্যে পড়লে হীরায় প্রতিবিম্বিত হয়ে মূর্তির দেহ ও ঘর আলোকিত হয়ে যেতো। যেহেতু হীরা ও মুক্তার মধ্যে বিভিন্ন রঙের মিশ্রণ রয়েছে সেহেতু আলোর মধ্যেও বিভিন্ন রঙের প্রতিস্বরণ ঘটতো। তাতে সৃষ্টি হতো একটা অপার্থিব আবহ, যাকে পুরোহিতরা স্বর্গীয় পরিবেশ

বলতো। এই মোহনীয় আলোয় মূর্তিগুলোকে জীবন্ত মনে হতো। পূজারীরা এ কারণে আরো বেশি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়তো। পাথরের মূর্তিগুলোকেই তারা জীবন্ত দেবদেবী বলে বিশ্বাস করতো।

সোমনাথের মূর্তিগুলোর চারপাশে পাঁচ মন ওজনের একটি খাঁটি সোনার শিকল দিয়ে দেয়াল তৈরি করা হয়েছিল।

মন্দিরের প্রতিটি কক্ষেই কম বেশি মূর্তি ছিল। এসব মূর্তির সবগুলোতেই ছিল দামী মণিমুক্তা হীরা জহরত। প্রতিটি কক্ষের দরজায় ছিল খুব দামী কাপড়ের পর্দা। আর তাতে জড়ানো ছিল নানা রকমের হীরা জহরতের জরি।

সোমনাথ মন্দিরের ব্যবস্থাপনা এতোটাই ব্যাপক ও বিশাল ছিল যে, প্রায় দশ হাজার পুরোহিত মন্দির এলাকায় অবস্থান করতো। তারা পর্যায়ক্রমে চব্বিশ ঘণ্টা পূজা-অর্চনায় লিপ্ত থাকতো। মন্দিরের জন্য এক হাজার গ্রাম দান করা হয়েছিল। এসব গ্রামের সকল আমদানী মন্দিরের প্রয়োজনে ব্যয় করা হতো। তাছাড়া হিন্দুস্তানের সকল রাজা মহারাজাই এই মন্দিরে মোটা অংকের অনুদান দিতেন। শুধু তাই না প্রতি চন্দ্র মাসের পূর্ণিমাতে লাখো পূজারী এখানে জমায়েত হতো। তারা মন্দিরে নিজেদের অর্জিত সম্পদের উল্লেখযোগ্য অংশ দান করতো।

সোমনাথ থেকে গঙ্গা নদীর দূরত্ব ছিল অন্তত সাতশ মাইল। সেই সাত'শ মাইল দূর থেকে পানি এনে প্রতি দিন সোমনাথের মূর্তিকে ধৌত করা হতো। এজন্য বিশাল ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। সবসময় পানি আনা-নেয়ার কাজে অশ্বারোহী দল নিয়োজিত থাকতো। এভাবে একটা নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল গঙ্গা জলে মূর্তিদের পবিত্রকরণ কাজে।

সোমনাথ মন্দিরে গান-বাজনা ও নৃত্যগীতের জন্য সবসময় সুন্দরী তরুণীদের প্রস্তুত রাখা হতো। এরা হতো মন্দিরের জন্য উৎসর্গীত। বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এসব সুন্দরী মন্দিরে নৃত্য গীত করতো। তাদের সহায়তা করতো তিন'শ বাদক। বিভিন্ন রাজা মহারাজারাও মন্দিরে সুন্দরী নর্তকী দান করতো। অনেক হিন্দু মা-বাবা তাদের মেয়ে সন্তানকে মন্দিরের সেবাদাসী রূপে উৎসর্গ করে দিতো।

মন্দিরের পুরোহিতরাই ছিল এখানকার রাজা। পুরোহিতদের হুকুমেই চলতো মন্দির। সকল নর্তকী সেবাদাসী পুরোহিতদের দাসানুদাস ছিল। পুরোহিতদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করতো মন্দিরের এসব অবলা নারীদের ভাগ্য।

সোমনাথের প্রধান মূর্তিই হলো শিবের লিঙ্গ যা হিন্দু জাতির যৌনতার প্রতীক। সেবাদাসীরা নিজে থেকেই পুরোহিতদের যৌন লালসা মেটানোর জন্যে নিজেদের উপস্থাপন করতো। আর ভক্তদের দাবী পূরণে প্রকাশ্যেই পুরোহিতরা নারীদের উপভোগ করতো। সোমনাথ ছিল ধর্মীয়ভাবেই একটি অবাধ যৌনতার উন্মুক্ত কেন্দ্র।

তখন পর্যন্ত সোমনাথ সম্পর্কে সুলতান মাহমূদ তেমন কিছু জানতেন না। শুধু সোমনাথের খবরটি তার কানে পৌঁছে ছিল মাত্র। কোন দিন সোমনাথ আক্রমণের চিন্তাও তার মাথায় আসেনি। কারণ গযনী থেকে সোমনাথের দূরত্ব অন্তত সাত'শ মাইল। এই বিশাল এলাকা পাড়ি দিয়ে সোমনাথে আক্রমণ চালানোর ব্যাপারটি আজকাল সহজ মনে হলেও সেই যুগে এত সহজ ছিল না।

* * *

যে সময় সুলতান মাহমূদ তার প্রতিবেশি মুসলিম শাসকদের একত্রিত করে তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা ও আনুগত্যের অঙ্গীকার নিচ্ছিলেন সেই দিনগুলোতে গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন বিভিন্ন মন্দিরে ঋষি ও পুরোহিতদের কাছে ধর্না দিয়ে তাদের অনুকম্পা পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। অর্জুন সুলতান মাহমূদের কাছে চরম পরাজয়ের শিকার হয়েছিলেন। ফলে তার রাজ্যের লোকেরাও তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। এজন্য এক ঋষি তাকে পরামর্শ দিলো, তিনি যেন দামী উপহার উপঢৌকন নিয়ে সোমনাথ মন্দিরে গিয়ে সেখানকার পুরোহিতদের পায়ে পড়ে আবেদন-নিবেদন করে এই বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করেন। ঋষি তাকে আরো জানালো, সোমনাথের পুরোহিতদের সবচেয়ে পছন্দের উপহার হলো সুন্দরী তরুণী। তরুণী ছাড়াও তিনি যেন একজন সুদর্শন যুবক মুসলমানকে সাথে নিয়ে গিয়ে সোমনাথের বেদীতে বলিদান করেন।

পণ্ডিত ও ঋষিদের পরামর্শ অনুযায়ী রাজা অর্জুন সুন্দরী তরুণী ও এক যুবক মুসলমানের তল্লাশী করতে লাগলেন। যে কোন রাজার জন্যে দু'চারজন তরুণী সংগ্রহ করা আর কোন একজন যুবক মুসলমানকে অপহরণ করা মোটেও কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু অর্জুন তখন নামে মাত্র রাজা। বাস্তবে সে রাজ্যহারা ভবঘুরে। তাছাড়া গোয়ালিয়র ও আশেপাশের রাজ্যগুলোতে মুসলিম জনবসতি খুব কম ছিল। অধিকাংশ মুসলমান বসবাস করতো ভেরা, মুলতানও লাহোরে। যুবতী ও সুন্দরী তরুণী এবং একজন সুদর্শন যুবক মুসলমানের ব্যাপারটিও তার জন্যে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

একদিন গোয়ালিয়রের এক পুরোহিতের সাথে রাজা অর্জুনের সাক্ষাত হলো। গোয়ালিয়রে তখন মুসলমানদের রাজত্ব। মন্দিরের অবকাঠামো ঠিক থাকলেও সেখানে কোন মূর্তি ও পূজারী ছিল না। বরং সেখানে মুসলমানরা পাঁচ ওয়াক্ত আযান দিয়ে নামায আদায় করতো। রাজা অর্জুন পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখন কোথায় থাকেন?

জঙ্গলে থাকি– জবাব দিলো পণ্ডিত। মন্দির উজাড় হয়ে গেলেও দেবতার পূজা থেকে তো আর আমাদের কেউ বিরত রাখতে পারবে না। গভীর জঙ্গলে গিয়ে আমরা ক'জন মিলে একটি ঝোপের মধ্যে মন্দির বানিয়ে নিয়েছি। আপনি দেখবেন মহারাজ মুসলমানদের উপর কঠিন বিপদ আসবে। অপবিত্র ম্লেচগুলো সামরিক শক্তিবলে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। এরা হরেকৃষ্ণ মহাদেব ও বিষ্ণুদেবকে পরাজিত করতে এসেছে, দেখবেন এরা জীবন্ত পুড়ে ছাই ভস্মে পরিণত হবে।

ওরা আর জ্বলবে কখন, আমরাইতো জ্বলে ভস্ম হয়ে যাচ্ছি, পণ্ডিত মহারাজ!

আপনি কি এখনো বুঝতে পারেননি মহারাজ হরিদেব মহাদেব ও কৃষ্ণদেব আমাদের উপর খুবই অসন্তুষ্ট? এটা আপনাদের পাপের ফসল। আপনাদের মতো যাদের হাতে সৈন্যসামন্ত ছিল তাদের পাপের কারণেই আজ হিন্দুজাতির এই দুরবস্থা।

রাজা গোবিন্দ আর রাজা তরলোচনপাল আমাকে ধোকা দিয়েছে পণ্ডিতজী! নয়তো গযনীর একটি সৈনিকও জীবন নিয়ে পালানোর সুযোগ পেতো না। আর সুলতান মাহমুদ আমাদের হাতে বন্দি হতো।

আমি শপথ করেছিলাম গযনীর সুলতানকে জীবন্ত পাকড়াও করবো, আর তাকে দিয়ে প্রতিদিন মন্দির ঝাড়ু দেয়াবো। আর সে মন্দিরে আসা পূজারীদের জুতা সোজা করবে.. যাক সেসব কথা। এখন আর এসব বলে লাভ নেই। আমাকে বলা হয়েছে, একটি সুন্দরী তরুণী ও একজন সুদর্শন যুবক মুসলমানকে নিয়ে সোমনাথ গিয়ে তরুণীকে মন্দিরে উপহার দিতে আর যুবককে সোমনাথের বেদীতে বলি দিতে। আর শিবদেবের পায়ে মাথা রেখে রাজত্ব ফিরিয়ে দেয়ার জন্য প্রার্থনা করতে। যাতে শিবদেব আমার রাজত্ব ফিরিয়ে দেন।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন আপনি। আমার মনের কথাটিই আপনি বলে দিয়েছেন। কিন্তু আমার তো মনে হয় না আপনি একাজ করতে পারবেন, বললো পণ্ডিত।

করতে পারবো– বললো রাজা অর্জুন। কিন্তু সুন্দরী তরুণী আর মুসলমান যুবক কোথায় পাবো?

কেন, আপনি কি একেবারে কাঙাল হয়ে গেছেন? রাজা হিসেবে আপনার কাছে নিশ্চয়ই এখনো অনেক ধন-সম্পদ আছে। আপনি চেষ্টা করে যান, শিকারের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।

আছে, আছে পণ্ডিতজী! আমি কেবল রাজ্য হারা হয়ে গেছি। তাছাড়া বাকী সবই আমার আছে। মেহেরবানী করে আপনি আমাকে বলুন, শিকার কোথায় কখন কিভাবে পাওয়া যাবে?

আপনার রাজকুমারীরা কি মাঝে মধ্যে নদীতে স্নান করতে যেতো না? অনুরূপ মুসলিম শাসকদের ছেলেমেয়েরাও প্রায়ই নদীতে গোসল করতে যায়।

গযনীর শাহজাদীরা যায় নদীতে গোলস করতে? কি বলছেন এসব? সুলতান মাহমূদ তো থাকে গযনীতে। এখানে শাহজাদী আসবে কোত্থেকে?

আমি গযনীর শাহজাদীদের কথা বলছি না। আমি বলছি সেসব কর্মকর্তাদের বিবি-কন্যাদের কথা যারা এখানকার দুর্গে বসবাস করে। এদের তরুণীরা প্রহরী সাথে নিয়ে প্রায়ই নদীতে নৌবিহার করতে আসে। আপনি কিছু উপহার উপঢৌকনক দিন, আমি এগুলো আমার বিশ্বস্ত লোকজনকে দিয়ে দু'একজন তরুণী ও দু'একজন যুবক প্রহরীকে অপহরণ করিয়ে নিয়ে আসবো। গোয়ালিয়র এখান থেকে বহু দূর। অপহরণের খবর যতোক্ষণে গোয়ালিয়র পৌঁছাবে ততোক্ষণে আমরা বহু দূর চলে যাবো।

আপনি কি সোমনাথের পথ জানেন? পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করলো রাজা অর্জুন।

আপনি কোথায় রাজত্ব করেন মহারাজ? প্রতিদিনই এ পথ দিয়ে সোমনাথের স্নানের পানি বহনকারী কাফেলা যাতায়াত করে। তারা খুব দ্রুত যাতায়াত করে। আপনি কি কয়েকটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন? অন্তত ছয়টি দ্রুতগামী ঘোড়ার প্রয়োজন হবে।

ঘোড়া যে কয়টা দরকার জোগাড় করা যাবে। আমাকে ঠিক সময় মতো খবর দেবেন তাহলেই হবে– বললো অর্জুন।

গোয়ালিয়র দুর্গে বহু উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মকর্তাদের পরিবার পরিজন বসবাস করতো। তাদের স্ত্রী কন্যারা প্রায়ই দশ পনেরো মাইল দূরে অবস্থিত পদ্মা নদীতে নৌবিহারের জন্য আসতো। একদিন কয়েকজন প্রহরীসহ চার যুবতী নৌবিহারে এলো। তাদের মধ্যে একজন ছিল খুবই সুন্দরী কিশোরী। সে ছিল একজন প্রবীন সেনা কমান্ডারের মেয়ে। তার নাম ছিল শেগুপ্তা। শেগুপ্তার তখনো বিয়ে হয়নি। বিয়ের কথাবার্তা চলছে। তাদের দলে ছিলো পাচঁজন নারী এবং চারজন সেনা প্রহরী।

নদীর তীরবর্তী একটি জায়গা ঘন ঝোপ ঝাড় এবং ঘন গাছ-গাছালীতে পূর্ণ। নদীর তীরটা এখানে ঢালু ও বালুকাময়। মেয়েরা জায়গাটি উপযুক্ত মনে করে এখানেই নেমে পড়লো এবং ঝোপের আড়ালে নদীতে জলকেলীতে মেতে উঠলো। তাদের প্রহরীরা সেখান থেকে একটু দূরে বসে গল্পগুজব করতে লাগলো।

এসময় গেয়ো পোষাকের একটি লোক ভীত বিহ্বল অবস্থায় হাঁপাতে হাঁপাতে প্রহরীদের কাছে গিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো– তিনজন লোক আমার স্ত্রীকে জোর করে নিয়ে গেছে। তারা আমাকে মারপিট করে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমার স্ত্রীকে বিবস্ত্র করে তার সম্ভ্রম হানির চেষ্টা করছে। এরা এখান থেকে বেশি দূরে নয় কাছেই আছে।

আপনারা মুসলমান! আপনারাই মহারাজ! আমাদের জীবন সম্ভ্রমের মালিক আপনারা! আতংকিত কণ্ঠে বললো লোকটি।

সাহায্যপ্রার্থী লোকটির কথা শুনে চার প্রহরী তার দেখানো পথে ছুটতে লাগলো। এরা যখন যথেষ্ট দূরে চলে গেলো তখন গোসলরত মেয়েদের উপর অতর্কিতে হামলে পড়লো ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রাজা অর্জুনের লোকেরা। তারা সেনা কমাণ্ডারের মেয়ে শেগুপ্তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল। অন্য মেয়েরা আতংকিত হয়ে আর্তচিৎকার শুরু করে দিল। গযনীর মেয়েদের চিৎকার শুনে প্রহরীরা যখন বিভ্রান্ত হয়ে তাদের দিকে ফিরে এলো, তখন ঝোপের আড়াল থেকে তাদের তিনজনের পাঁজরে বর্শা বিদ্ধ করলো হিন্দুরা। সাথে সাথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো তিন প্রহরী। আর একজনের উপর লাফিয়ে পড়ে তাকে ঝাপটে ধরে কাবু করে ফেললো।

শেগুপ্তাকে একটি ঘোড়ার পিঠে তোলে এবং বেঁচে থাকা একমাত্র প্রহরী নাসিরুদ্দৌলাকে বেঁধে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে আটটি ঘোড়া এক সাথে ঘনঝোপ ঝাড়ের মধ্যে দ্রুত ছুটতে লাগলো।

এই অশ্বারোহীদের মধ্যে শেগুপ্তাকে নিজের ঘোড়ায় তুলে ধরে রেখেছিল রাজা অর্জুন নিজে। আর নাসিরুদ্দৌলাকে একটি ঘোড়ার পিঠে ধরে রেখেছিল এক শক্ত-সামর্থ জোয়ান। একটি ঘোড়াতে সওয়ার ছিল পণ্ডিত। আর অন্যরা তাদের ভারাটে খুনী। ভাড়াটে খুনীদেরকে রাজা অর্জুন নগদ মুদ্রা দিতে চাইলে তারা বলে– আমাদের কোন নগদ টাকা-পয়সা দেয়ার দরকার নেই, আমরা আপনার খরচে আপনার সাথে সোমনাথ সফর করবো।

শেগুপ্তা ও প্রহরীদের হারিয়ে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে শেগুপ্তার সঙ্গীনীরা যখন গোয়ালিয়র দুর্গে পৌঁছে, ততোক্ষণে রাজা অর্জুনের দল অনেক দূরে চলে গেছে। গোয়ালিয়র দুর্গে কর্তব্যরত গযনীর কর্মকর্তাদের কেউ কল্পনাও করতে পারেনি, রাজ্য হারা ভবঘুরে রাজা অর্জুন এমন ভয়ংকর কিছু একটা ঘটাতে পারে।

দুই দিন আগে দুর্গপতি মুসলিম শাসককে রাজা অর্জুন জানিয়েছিল, সে সোমনাথ যেতে চায়। তাকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক। দুর্গপতি তাকে সোমনাথ যাওয়ার অনুমতি দিলে রাজা অর্জুন দু'দিন আগে সোমনাথের উদ্দেশে দুর্গ ত্যাগ করে।

সন্ধ্যার আগেই পণ্ডিতের দেখানো পথে অর্জুনের দল সেই পথের সন্ধান পেয়ে গেল, যে পথ দিয়ে সোমনাথের পানি বহণকারীরা যাতায়াত করে। এক পর্যায়ে পানি বহনকারী দলকে তারা পেয়ে গেল। পরদিন শেগুপ্তা ও নাসিরুদ্দৌলার বাঁধন খুলে দিয়ে রাজা অর্জুন তাদেরকে বললো– তোমরা যদি মুক্তির চিন্তা ও চেষ্টা করো তাহলে তা হবে অর্থহীন। এর চেয়ে বরং শান্তভাবে আমাদের সাথে থাকো। এটাই হবে তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। নাসিরুদ্দৌলার জিজ্ঞাসার পরও তাদেরকে জানানো হয়নি, কোথায় তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

টানা বিশ দিন পথ চলার পর অর্জুনের দল সোমনাথে পৌঁছলো। অর্জুন ও পণ্ডিত নাসিরুদ্দৌলাকে সোমনাথের প্রধান পুরোহিতের সামনে দাঁড় করিয়ে তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললো– এই তরুণীকে মন্দিরের জন্যে এবং এই যুবককে শিব দেবের নামে বলি দেয়ার জন্যে আপনার চরণে পেশ করছি।

নাসির পণ্ডিত ও অর্জুনের ভাষা বুঝতো কিন্তু শেগুপ্তা তাদের ভাষা বুঝতো না। শেগুপ্তা ফারসী ভাষায় নাসিরকে জিজ্ঞেস করলো– এরা কি বলাবলি করছে? নাসির শেগুপ্তাকে এদের কথাবার্তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলে দিল। নাসিরের কথা শুনে শেগুপ্তা ভীত হওয়ার পরিবর্তে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও রুদ্ররোষে তার ভাষায় হিন্দুদের গালমন্দ করতে শুরু করলো।

শেগুপ্তাকে এভাবে উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে দেখে প্রধান পুরোহিত নাসিরকে জিজ্ঞেস করলো– মেয়েটি কি বলছে?

সে বলছে– আমি তোমাদের শিবদেবের উপর আল্লাহর লা'নত দিচ্ছি। পুরোহিতকে বললো নাসির। আরো জানালো, শেগুপ্তা বলছে, আমরা তোমাদের বহু দেবতাকে পায়ে পিষ্ট করে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ঘোড দৌড়ের মাঠে ছড়িয়ে দিয়েছি। তোমাদের এসব দেবদেবীকে মন্দিরে রাখা অশোভনীয়।

মেয়েটিকে বলো, আমাদের ধর্মকে সে যেন অপমান না করে। ধর্মের অবমাননা আমরা সহ্য করি না– বললো প্রধান পুরোহিত। দেখবে, আমাদের ধর্মের অবমাননার জবাবে শিবদেব গযনীকে ধ্বংস করে দেবেন।

হু! তোমাদের এসব পাথুরে দেবতা আমাদের আল্লাহর মোকাবেলা করবে? আমরা এখন অসহায়, তোমাদের হাতে বন্দি, কিন্তু আমাদের আল্লাহ কোন জড় পদার্থ নন, তাকে কোন প্রকার অসহায়ত্ব স্পর্শ করে না। আমাদের আল্লাহর প্রতিশোধের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করো পণ্ডিত! বললো নাসির।

শেগুপ্তা অস্থির হয়ে নাসিরকে জিজ্ঞেস করছিল এরা কি বলছে? শেগুপ্তাকে পুরোহিতের কথাবার্তা জানিয়ে দিলো নাসির। নাসিরের কণ্ঠে পুরোহিতের কথা শুনে শেগুপ্তা এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো যে চিৎকার করে কথা বলতে লাগল সে। তার মুখের থুথু ছিটকে গিয়ে প্রাধন পুরোহিতের গায়ে পড়তে লাগল। শেগুপ্তা অনবরত হিন্দুদের উপর অভিশাপ দিচ্ছিল।

অর্জুন মহারাজ! এরা তো ভয় পাওয়ার পরিবর্তে আমাদের গালমন্দ করছে– অর্জুনের উদ্দেশ্যে বললো প্রধান পুরোহিত। এরা কি ভাবছে, আমরা এদের গালমন্দে ভীত হয়ে তাদের ছেড়ে দেবো?

আমরা শুধু আল্লাহকে ভয় করি পণ্ডিত! পুরোহিতের উদ্দেশ্যে বললো নাসিরুদ্দৌলা। মৃত্যুকে যদি আমরা ভয় করতাম তাহলে গযনীতেই বসে থাকতাম। আমরা আল্লাহর পয়গাম এখানকার মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে এবং রসূলুল্লাহর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় জীবন দেয়ার জন্যেই হিন্দুস্তানে এসেছি। আমরা জানি, এ মূহূর্তে আমরা অসহায় কিন্তু আমরা এজন্য খুশি যে, আমরা আল্লাহর পথে কুরবান হতে চলেছি। আমার কুরবানীতে তোমাদের কোনই উপকার হবে না, কিন্তু আমি পৌঁছে যাবো সরাসরি আল্লাহর দরবারে।

ওদের বলে দাও, এই মন্দিরেও সেই ধরনের ভয়াবহ বিপদ আসবে যে বিপদ হিন্দুস্তানের অন্যান্য মন্দিরে এসেছে। এদের এটাও বলে দাও, আমার পবিত্র দেহে যদি কোন পৌত্তলিক হাত তোলে তবে আমার আল্লাহ অবশ্যই এর প্রতিশোধ নেবেন– বললো শেগুপ্তা।'

শেগুপ্তার কথা নাসির পণ্ডিতকে জানালো। নাসিরের কথা শুনে পণ্ডিত একটি বাঁকা হাসি দিয়ে বললো— তোমরা এমন জিনিসের পূজা করো, যা তোমরা দেখতে পাও না। তোমরা আসলে অন্ধ। অন্ধকারে বসবাস করছো তোমরা। তোমরা জানো না, এই মন্দির কার তৈরি? যাকে তোমরা পাথর বলছো, তিনি

শিবদেব। এখানে তোমাদের দেহ থেকে যেমন প্রাণ ছিনিয়ে নেয়া যাবে আবার তোমাদের মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার করা যাবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি যা বলছো, এই কথা তোমরা পাথরের মূর্তির মাধ্যমে বাস্তবে ঘটিয়ে দেখাতে পারবে না- পণ্ডিতের উদ্দেশ্যে বললো নাসির। আমি বিশ্বাস করি, মজলুম ও অসহায় এই তরুণী যে ভবিষ্যতবাণী করছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

মহারাজ! এদের সাথে এতো কথা বলা কি খুব জরুরী? না আপনি এদের ধর্ম বদলাতে পারবেন, না ওরা আপনার ধর্ম বদলাতে পারবে? সোমনাথের প্রধান পুরোহিতের উদ্দেশ্যে বললো গোয়ালিয়রের পণ্ডিত।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো! এদের সাথে এতো কথা অর্থহীন। তবে এই যুবককে বলে দেয়া দরকার মনে করি, আগামী চাঁদের পূর্ণিমার দিন তাকে বলি দেয়া হবে। এবং তার রক্ত শিবদেবের পায়ে অর্পণ করা হবে। তাকে আমরা একথা বলে দিতে চাই কারণ আমরা কাউকে ধোঁকায় ফেলে বলি দিতে চাই না। তার জানা থাকা দরকার তাকে যে সোমনাথ কুরবানীর জন্য পছন্দ করেছে এটা যে কোন মানুষের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। এই যুবক খুবই ভাগ্যবান।

শুধু শুধুই নিজেকে ও তোমার দেবতাদেরকে তোমরা ধোকা দিচ্ছো পণ্ডিত! বললো নাসির। তোমাদের শিবদেব কি জানে না, আমাদেরকে ধোকা দিয়ে অপহরণ করা হয়েছে? ধোঁকা দিয়ে আমাদের তিন সাথীকে হত্যা করা হয়েছে? তোমাদের ধর্ম এমন জঘন্য যে, নিরপরাধ মানুষ হত্যাকে সমর্থন করে?

এ সময় প্রধান পুরোহিত তার একান্ত সেবকদের ডেকে বললো, এদের দু'জনকে নিয়ে যাও।

নাসিরকে নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে দ্রুততার সাথে শেগুপ্তাকে নাসির বললো- শেগুপ্তা! গযনীর আত্মাভিমানী মেয়েদের মতো ইজ্জত রক্ষার জন্যে জীবন দিয়ে দেবে তবু ইজ্জত দেবে না। আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো।

নাসির ও শেগুপ্তাকে মন্দিরের একটি খোলা জায়গায় নিয়ে গেলো মন্দিরের সেবকরা। এক সময় নাসিরকে শেগুপ্তার কাছ থেকে ভিন্ন করে ফেলা হলো। প্রত্যেকের সাথে ছিল দু'জন করে প্রহরী।

হঠাৎ শেগুপ্তার উচ্চ কণ্ঠস্বর 'খোদা হাফেজ নাসির!' ভেসে এলো নাসিরের কানে। পর মুহূর্তেই শোনা গেল, ধরে ফেলো, ধরে ফেলো, চিৎকার।

ভেসে আসা আওয়াজের দিকে তাকিয়ে নাসির দেখতে পেলো, সেখানে একটি বড় কূপের উঁচু বেদিতে দাঁড়িয়ে আছে শেগুপ্তা এবং পলকের মধ্যেই সেই কূয়ার মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ল শেগুপ্তা।

এ অবস্থা দেখে নাসিরকে ধরে রাখা দুই প্রহরীও কূপের দিকে দৌড়ালো এবং তাদের চেচাঁমেচিতে আরো বহু লোক জমা হয়ে গেলো। ততোক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। বিশাল আঙিনায় একপাশে একটি মাত্র মশাল জ্বলছে। সমবেত সকল লোক কূপের ভেতর থেকে শেগুপ্তাকে উদ্ধারের জন্যে দৌড়াদৌড়ি করছে।

এক পর্যায়ে একটি দীর্ঘ দড়ি কূপের ভেতর ফেলা হলো এবং সেই দড়ি বেয়ে এক লোক কূপে নেমে গেলো। কিছুক্ষণ পর ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, মরে গেছে!

এমন হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে নাসিরের প্রতি নজর রাখার ব্যাপারটি সবাই ভুলে গেলো। কিছুক্ষণ পর নাসিরের পাহারায় নিয়োজিত লোক দু'জন ভীত বিহবল অবস্থায় এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো, তারা নাসিরকে কোথাও দেখতে পেলো না।

ততোক্ষণে নাসির মন্দিরের চৌহদ্দি পেরিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। মন্দিরের লোকজন যখন শেগুপ্তাকে উদ্ধারের ব্যাপারে ব্যস্ত তখন নাসির চতুর্দিকে তাকিয়ে একদিকে একটা দরজার মতো দেখতে পেলো। ভাগ্যক্রমে সেটি দিয়ে সে বেরিয়ে দেখলো, সামনে খোলা মাঠ। সে দ্রুত খোলা মাঠ পেরুতে দৌড়াতে লাগলো এবং দৌড়ে সে অনেকটা দূরে চলে এলো।

নাসির মন্দির থেকে বেরিয়েই দেখতে পেয়েছিল সামনে সাগর। সাগর দেখে ঠিক এর উল্টো দিকে অগ্রসর হলো। দৌড়াতে দৌড়াতে এক পর্যায়ে তার সামনে পরলো একটি ছোট্ট নদী। এলাকাটি ছিল নাসিরের সম্পূর্ণ অচেনা অজানা। হিন্দু অধ্যুষিত এই এলাকায় কোন মুসলমানের বাড়িতেই কেবল তার জন্যে আশ্রয় হতে পারে। কিন্তু নাসিরের পক্ষে এটা জানার কোন উপায় ছিলো না যে এই এলাকায় কোথায় মুসলিম বসতি রয়েছে। আর সেটাইবা কোন দিকে। আল্লাহর নাম নিয়ে কাল বিলম্ব না করে নাসির নদী পার হয়ে গেলো। নদীতে তেমন পানি ছিলো না।

নদী পার হয়ে নাসির বিরতিহীন পথ চলতে লাগলো। নাসির ভাবছিল সারা রাত যতটুকুই যাওয়া যায় সে পথ চলবে। দিনের আলোয় যা হওয়ার হবে। কিন্তু

দীর্ঘক্ষণ চলার পর তার চোখে পড়লো একটু আলো। আলো লক্ষ্য করে সে অগ্রসর হতে লাগলো। আলোর কাছাকাছি পৌছে নাসির দেখতে পেলো, মসজিদের মতো একটি মিনার সম্বলিত ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। ঘরটি সম্পূর্ণ নির্জন এলাকায়। পাশে আর কোন ঘর নেই। তবে একটু দূরেই একটি বসতির মতো দেখা যাচ্ছে। নাসির পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো সেই বাতি ঘরের দিকে।

নাসিরের মনে হচ্ছিল এটি হয়তো মসজিদ হবে, কিন্তু সে নিশ্চিত হতে পারছিলো না, হিন্দুস্তানের এতোটা ভেতরেও কোন মসজিদ থাকতে পারে। পায়ে পায়ে ঘরটির আঙিনায় এগিয়ে গেল নাসির। গিয়ে দেখে ঘরের ভেতরে প্রদীপের সামনে বসে একজন সাদা শশ্রুধারী লোক কি যেন পড়ছে।

ভেতরে না গিয়ে দরজার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়াল নাসির। এমন সময় তার কানে ভেসে এলো– আসসালামু আলাইকুম.... নাসির জবাব দিলো– 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম...। সালামের পর লোকটি আরো যে কয়টি কথা বললো তার কিছুই নাসিরের পক্ষে বুঝা সম্ভব হলো না। কিন্তু লোকটির মধ্যে ইসলামের অনুশীলন দেখে নাসিরের মধ্যকার সকল ভয়ভীতি দূর হয়ে গেল এবং অনেকটাই নিরাপদবোধ করছিল নাসির।

গযনী..... গযনী। বলে ইশারা-ইঙ্গিতে নিজেকে সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীর লোক বলে পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করল নাসির। শশ্রুধারী লোকটি তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। ঘরটি ছিল প্রকৃত পক্ষেই একটি মসজিদ এবং তিনি ছিলেন সেই মসজিদের ইমাম। তিনি নামাযের পূর্বে নীরবে কোন কিতাব পাঠ করছিলেন। তিনি এই এলাকাতেই থাকতেন। তবে তার কথাবার্তায় নাসির বুঝতে পারলো তিনি প্রকৃতপক্ষে এই এলাকার লোক নন।

ইশারা ইঙ্গিতে ইমাম সাহেবকে নাসির বুঝাতে সক্ষম হলো, সোমনাথের লোকেরা তাকে বন্দি করেছিলো, সেখান থেকে সে পালিয়ে এসেছে। এই মুহূর্তে তার একটি নিরাপদ আশ্রয় দরকার। ইমাম সাহেব আরেকজন লোককে ডেকে আনলেন। সেই লোকটি হিন্দুস্তানের বিভিন্ন ভাষা জানতো। নাসির হিন্দুস্তানের যে ভাষা বুঝতো এবং কথা বলতে পারতো সেই লোকটির কাছে সেই ভাষায় তার অবস্থা বললো। ফলে ইমাম সাহেব বুঝতে পারলেন, নাসিরের উপর দিয়ে কি অত্যাচার বয়ে গেছে এবং এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে তাকে এখন কি করতে হবে?

বস্তুত এখানকার মুসলমানরা সুলতান মাহমুদ সম্পর্কে তেমন কিছু জানতো না। তারা লোক মুখে উড়ো উড়ো কিছু কথা শুনেছে– উত্তর পশ্চিমাঞ্চল থেকে

এক শক্তিশালী লুটেরা বাদশাহ প্রতি বছর হিন্দুস্তানের বিভিন্ন মন্দিরে হামলা করে সেখানকার মূর্তিগুলোকে ভেঙে চুড়ে সোনা দানা লুট করে নিয়ে যায়। হিন্দুস্তানের পশ্চিমাঞ্চল থেকে যারা সোমনাথে পূজা করতে আসে তাদের মুখে তারা এসব কথাবার্তা শুনে আসছে।

নাসির তাদেরকে জানালো, সুলতান মাহমূদ কোন লুটেরা বাদশা নন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান সুলতান। তিনি হিন্দুস্তানে মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সালতানাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে চান। তিনি এখানকার মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি ও মুসলমানদের জীবন নিরাপদ করার জন্যে মন্দির ও মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করেন এবং সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

আমরা আরব বংশোদ্ভূত লোক। আমাদের পূর্ব পুরুষরা ছিলেন আরব। তাঁরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে এ দেশে এসেছিলেন, বললেন ইমাম। তিনি আরো বললেন, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা ডাবেল থেকে ফুল আদম পর্যন্ত গোটা উপকূলীয় এলাকায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই সোমনাথের তখন কোন গুরুত্বই ছিল না। মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রভাব কমে যাওয়ার পর সোমনাথ এতোটা প্রচার পেয়েছে। ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতেরা সোমনাথকে ঘিরে এমনসব কাহিনী ছড়িয়ে দিয়েছে যে, বড় বড় রাজা মহারাজারাও এখন সোমনাথে পূজা দিতে আসে।

সুলতান মাহমূদ যদি সত্যিকার অর্থেই মূর্তি সংহারী হয়ে থাকেন এবং ইসলামের পতাকাবাহী হয়ে থাকেন তবে তার জানা দরকার, এখানে সোমনাথ নামের একটি মন্দিরও আছে এবং হিন্দুরা দাবী করে তাদের দেবদেবীরা এই মন্দির বানিয়েছে।

আপনারা যদি আমাকে একটি ঘোড়া দিতে পারেন, তাহলে আমি গোয়ালিয়র ফিরে না গিয়ে সোজা গযনী চলে যাবো এবং সোমনাথ আক্রমণ করার জন্যে সুলতানকে অনুরোধ করবো।

তুমি হয়তো তোমার উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে সোমনাথ আক্রমণের কথা বলছো, বললেন ইমাম। সেই সাথে তিনি বললেন, তোমার সঙ্গীনী যে মেয়েটি কূপে ঝাপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, হয়ত তারও মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছো তুমি।

ইমাম নাসিরের উদ্দেশ্যে বললেন, তুমি তো এই মন্দিরের প্রকৃত অবস্থা জানো না। এখানে কি ধরনের জঘন্য কর্মকাণ্ড ঘটে তা তোমাকে সবিস্তারে

জানাবো এবং দ্রুত গযনী পৌঁছার জন্য ঘোড়াসহ সংক্ষিপ্ত পথও বলে দেবো। তোমার সুলতানকে জানাবে, সোমনাথ ইসলামের তৌহিদী ঝাণ্ডাকে উপড়ে ফেলার হুমকি দিচ্ছে এবং এখানে অসংখ্য নিরপরাধ মুসলিম তরুণীকে হত্যা করা হয়েছে। জানা নেই, কতোজন মুসলিম তরুণীকে এই মন্দিরে এনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে নাচতে বাধ্য করা হয়েছে এবং মূর্তির সামনে তাদের বলি দেয়া হয়েছে।

আমাদের ঘরে কোন সুশ্রী মেয়ে শিশু জন্মালে সেই শিশুকে কিংবা গোটা পরিবারকেই আমরা নিরাপদ দূরত্বে পাঠিয়ে দেই। তোমাদেরকে যে ভাবে এখানে অপহরণ করে নিয়ে আসা হয়েছে, হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জায়গা থেকে সুন্দরী মুসলিম তরুণীদের অপহরণ করে এখানে এনে জবাই করা হয়। এই মন্দিরটি একটি বিকৃত যৌন-অপকর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এখানকার পুরোহিত ও পণ্ডিতেরা রাত দিন অশ্লীল অপকর্মে লিপ্ত থাকে।

ইমাম সাহেব দুভাষীর মাধ্যমে নাসিরকে সোমনাথের পুরো ইতিহাস, এই মন্দির ঘিরে যেসব অপকর্ম ও কর্মকাণ্ড হয় সবিস্তারে জানালেন। তিনি বললেন তুমি তোমার সুলতানকে বলো, হিন্দুস্তানের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে ইসলামের আলো পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া মোমের মতোই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

ইমাম সাহেব আরো বললেন, হিন্দুস্তানের মুসলমানরা মানবেতর জীবন-যাপন করছে। তারা সবসময় ভয় ও আতংকে দিন কাটাচ্ছে। এখানকার অধিকাংশ মুসলমান হিন্দুদের অত্যাচারে এ এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ আরব দেশে ফিরে যাচ্ছে এবং হিন্দুরা ক্রমশ পরাক্রমশালী হয়ে উঠছে।

ইনশাআল্লাহ আমরা আসবো, সুলতানও আশা করি এখানে অভিযান চালাবেন– ইমামকে আশ্বস্ত করতে বললো নাসির। তখন আপনি দেখবেন, হিন্দুদের কথিত এসব শক্তিধর দেবদেবী টুকরো টুকরো হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে। দয়া করে আমাকে আপনারা একটি ঘোড়া দিন এবং পথের কিছু পাথেয় দিয়ে পথটা বলে দিন।

এদিকে মন্দির জুড়ে শুরু হলো নাসিরের খোঁজাখুঁজি। নাসিরের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটিতে সোমনাথের প্রধান পুরোহিতের কোন উদ্বেগ ছিল না। কিন্তু নাসিরের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটি রাজা অর্জুন ও তার সঙ্গী পণ্ডিতকে খুবই দুশ্চিন্তায় ফেলে দিলো। কারণ তাদের উভয় শিকারই হাত ছাড়া হয়ে গেছে।

মন্দির ও আশেপাশের এলাকায় রাজা অর্জুন ও তার সঙ্গীরা যখন নাসিরকে হন্যে হয়ে খুঁজছে, তখন নাসির সোমনাথ থেকে দশ বারো মাইল দূরে ইমামের

সামনে বসা। ইমাম সাহেব তাকে পেট ভরে খাওয়ালেন। এরপর গ্রামের একজন প্রবীন লোককে ডেকে আনা হলো। এই প্রবীণ এলাকার পথঘাট ও চলাচলের গতিপথ সম্পর্কে অত্যন্ত অভিজ্ঞ।

তাকে ঘোড়া না দিয়ে উট দাও– বললেন প্রবীণ। কারণ তাকে অনেক বড় মরুভূমি ও পাহাড়ী এলাকা অতিক্রম করতে হবে। ঘোড়া এতো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে পারবে না, পথিমধ্যেই মারা যাবে। যাত্রীও মারা যাবে। প্রবীণ নাসিরকে পথ বুঝাতে বুঝাতে বললেন, দুপুর পর্যন্ত তুমি সূর্যকে হাতের ডানে রেখে অগ্রসর হবে এবং দুপুরের পর সূর্যকে বামে রেখে যেতে থাকবে। রাতের বেলায় ধ্রুবতারাকে নাক ও কাঁধের মাঝখানে রেখে পথ চলবে।

পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছানোর পর তোমাকে পাহাড় ঘুরে যেতে হবে। তবে যতোটাই মোড় নিতে হোক না কেন দিনের বেলায় তুমি সূর্য এবং রাতের বেলায় ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে যেভাবে চলতে বলা হয়েছে সেভাবে পথ চলবে। পর দিন রাতের অন্ধকারে নাসির একটি তরতাজা শক্তিশালী উটের পিঠে সওয়ার হয়ে সাথে পর্যাপ্ত রসদ নিয়ে গযনীর উদ্দেশ্য রওয়ানা হলো। কারণ, তাকে যথাসম্ভব দ্রুত গযনী পৌঁছাতে হবে।

* * *

নাসির উটের পিঠে সওয়ার হয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। দিন রাত বিরতিহীনভাবে পথ চলছিল নাসির। উঠের পিঠে বসেই কিছুটা ঘুমিয়ে নিতো। খুব সামান্য সময় সে উটকে বিশ্রাম দিতো।

এদিকে সুলতান মাহমূদ তার সকল প্রতিবেশি রাজ্যের একই চুক্তিতে আবদ্ধ করে প্রত্যেক শাসক ও সরদারের কাছ থেকে কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে গযনী ফিরে এসেছেন। এর ঠিক তিন চার দিন পরের এক বিকেলে তার কাছে খবর পাঠানো হলো, হিন্দুস্তানে নিয়োজিত নাসিরুদ্দৌলা নামের এক সৈনিক এসেছে। সে এখনই সুলতানের সাথে সাক্ষাত করতে চায়।

সুলতান সাথে সাথে তাকে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। নাসিরকে সুলতানের সামনে হাজির করা হলো। তাকে দু'জন প্রহরী ধরে রেখেছিল। কারণ, নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়ানোর মতো শক্তি তার ছিলো না। তার মাথা দুলছিল এবং শরীর মৃতদেহের মতো অসাড় হয়ে পড়েছিল।

নাসিরকে সুলতানের চৌকিতে শুইয়ে দেয়া হলো। সাথে সাথে চিকিৎসক ডাকা হলো। চিকিৎসক নাসিরকে দেখে বললো, রোগী অনেকটা অচেতন এবং তার ঘুমের প্রচণ্ড ঘাটতি রয়েছে। এই মুহূর্তে তার সাথে কোন কথা বলা যাবে না, তাকে বিশ্রাম দিতে হবে। চিকিৎসক তার পাশে বসে মুখের মধ্যে একটু একটু করে মুধ দিতে লাগলেন।

এভাবে কয়েক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর নাসিরের চেতনা ফিরে এলো এবং সে ধীরে ধীরে চোখ মেললো। তখন তাকে উপযুক্ত খাবার ও পানীয় দেয়া হলো। পানাহারের পর সে কথা বলার শক্তি ফিরে পেলো। কথা বলার শক্তি ফিরে এলে সে সুলতানকে জানালো– কিভাবে তাকে এবং শেগুপ্তাকে হিন্দুরা অপহরণ করেছে এবং সে সোমনাথে কি দেখেছে এবং সোমনাথ সম্পর্কে কি শুনেছে। তা ছাড়া পালিয়ে এসে ইমামের সহযোগিতায় কিভাবে সে গযনী পৌঁছেছে তার সবই সুলতানকে সবিস্তারে জানালো নাসির। নাসির আরো জানালো, ওখানকার মুসলমানরা সুলতানের আগমন প্রত্যাশায় প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে। নাসির সেখানকার ইমাম সাহেবের পাগামও পেশ করলো।

আমার মন অনেক দিন থেকেই এমন একটা কঠিন অভিযানের কথা ভাবছিল। নাসিরের পয়গাম শোনার পর হিন্দুস্তানের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন সুলতার মাহমূদ। হিন্দুস্তানের মানচিত্রে ডাভেলের উপর আঙুল রেখে সুলতান বললেন, মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রথম এই জায়গাতেই লড়াই করেছিলেন। আর এই হলো... সোমনাথ।

তখনই প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈকে ডেকে পাঠালেন সুলতান মাহমুদ।

আলতাঈ! আমার মনে হচ্ছে এটা হবে আমার জীবনের শেষ অভিযান! মানচিত্র দেখো... খুবই লম্বা সফর এবং মারাত্মক কষ্টকর। আমি যদি সেখানে পৌঁছতে পারি, তাহলে ইতিহাসে আমি নতুন এক অধ্যায় সংযোজন করবো। আর এই যুদ্ধ হবে আমার জীবনের সকল যুদ্ধের চেয়ে কঠিনতম যুদ্ধ। ভবিষ্যতের লোকেরা সোমনাথের সাথে আমার নামও উচ্চারণ করবে।

আলতাঈ গভীরভাবে মানচিত্র দেখছিলেন। তিনি ইতিহাসের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ সেনাপতি। জলে স্থলে পাহাড়ে মরুভূমিতে সব ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যে যুদ্ধ করার বিরল অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। কিন্তু এতো দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে তিনি সেখানে তার সেনাদের নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন কি-না এ বিষয়টি তাকে ভাবিয়ে

তুললো। আলতাঈর চিন্তায় ছেদ ঘটিয়ে সুলতান বললেন, জানো আলতাঈ! মুহাম্মদ বিন কাসিম কতদূর থেকে এসেছিলেন? আমি তার সেই ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাই।

লাহোর আমাদের নিয়ন্ত্রণে। আমরা সেখান থেকে প্রয়োজনীয় রসদ সামগ্রী নিতে পারবো। মুলতানও আমাদের দখলে। সেখান থেকে আমাদেরকে বিপুলসংখ্যক উট সংগ্রহ করতে হবে। কারণ, পথি মধ্যে বিশাল মরু এলাকা রয়েছে। উট ছাড়া এই দুর্গম পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব হবে না।

চিন্তা করছো কি? ঘাবড়াবার কিছু নেই। সবই আছে আমাদের। প্রধান সেনাপতিকে আশ্বস্ত করতে বললেন সুলতান। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শক্তিশালী ঈমান ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি। দৃঢ় ইচ্ছা ও ঈমানী শক্তি থাকলে সবকিছুই সহজ হয়ে যায়।

সুলতান মাহমূদ ও আলতাঈ উভয়েই মানচিত্রের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং অভিযানের পরিকল্পনা তৈরি করতে লাগলেন।

সুলতান মাহমুদ হয়তো তখনো বুঝতে পারেননি, তিনি এমন এক অভিযান শুরু করতে যাচ্ছেন যাতে তিনি বিজয়ী হলে এটা হবে হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় এবং এই বিজয় সাধিত হলে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে অনুসারীদের সংশয় সৃষ্টি হবে।

১০২৫ সালের ১৮ অক্টোবর মোতাবেক ৪১৬ হিজরী সনের ২২ শাবান সোমনাথের উদ্দেশ্যে রওয়ান হলেন সুলতান মাহমুদ। এসময় তার সাথে কতো জন সৈনিক ছিলো একথা কোন ঐতিহাসিক সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। কেউ বলেছেন, সোমনাথ অভিযানে ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে তিনি গযনী থেকে রওয়ানা করেছিলেন। কেউ বলেছেন, সোমনাথ অভিযানে রওয়ানা করার সময় গযনী থেকে তার সফর সঙ্গী হয়ে ছিলো ত্রিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবী।

হিন্দুস্তানের সীমানায় প্রবেশ করে সুলতান মাহমুদ লাহোরের দিকে না গিয়ে সোজা মুলতানের দিকে অগ্রসর হলেন। বিশাল সেনাবাহিনী দেখে মুলতানের লোকজনের মধ্যে কৌতুল সৃষ্টি হলো। সুলতান এমন বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে কোথায় যাবেন?

১০২৫ সালের ২৫ নভেম্বর মোতাবেক ১৫ রমযান সুলতান মুলতান পৌছেন। নাসিরুদ্দৌলার বক্তব্য শুনে সুলতান মাহমূদ সাথে সাথেই সোমনাথ অভিযানে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন, দুই কারণে–

১. যে কোন বিষয়ে কালক্ষেপণ ছিলো সুলতানের স্বভাব বিরোধী।

২. তখন ছিলো শীতকাল। গরম চলে এলে এই দীর্ঘ সফর তার সেনাদের জন্যে কষ্টকর হয়ে উঠবে, এজন্য তিনি কাল বিলম্ব না করে সোমনাথের উদ্দেশ্যে অভিযানের নির্দেশ দেন।

সুলতানের মুলতান আগমন ছিল খুবই দ্রুত। তিনি মুলতানে পৌঁছেই সেখানে নিয়োজিত গযনীর সরকারী কর্মকর্তাদের একত্রিত করে বললেন, আমাকে খুব তাড়াতাড়ি সোমনাথ পৌঁছার ব্যবস্থা করতে হবে।

সেই সাথে তিনি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিলেন, তার এই অভিযানের কথা যেনো বাইরের কেউ জানতে না পারে? আর পথের সব বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।

বাস্তবে এতো বিশাল সেনাবাহিনীর আগমন ও তাদের গতিবিধি গোপন রাখার ব্যাপারটি সহজ ছিল না। কারণ সুলতানের শত্রুপক্ষের গোয়েন্দারাও সক্রিয় ছিল। সেখানে হিন্দুরাও বসবাস করতো। বাস্তবে মুলতানে তখনো হিন্দু বসতির সংখ্যাই ছিলো বেশি।

গযনী সালতানাতের যেসব কর্মকর্তা মুলতানে নিয়োজিত ছিলো, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দুদের সুন্দরী নারী ও বিপুল টাকা পয়সার লোভে পড়ে ঈমান বিরোধী এবং রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিল। ফলে সুলতান মাহমূদ মুলতান পৌঁছার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই শীর্ষ হিন্দুরা জেনে ফেলেছিল সুলতান মাহমূদ সোমনাথ আক্রমণ করতে যাচ্ছেন।

সোমনাথ মন্দিরের সবচেয়ে বড় শিবমূর্তিটি ছিল তখনকার হিন্দুদের অন্যতম প্রধান দেবতা পুরো হিন্দু জাতির প্রাণ। কারণ শিব ছিল দেবতাদেরও দেবতা। সোমনাথের ধ্বংস তো দূরের কথা সোমনাথের এতটুকু অবমাননাও সহ্য করতে রাজী নয় হিন্দু সম্প্রদায়। মুলতানের হিন্দুরা যখন জানতে পারলো, সুলতান মাহমূদ সোমনাথ যাচ্ছেন, তখন তাদের আত্মা কেঁপে উঠলো। তারা সুন্দরী যুবতীদের ইজ্জত ও সোনার থলের বিনিময়ে সুলতানের সোমনাথ অভিযানের পরিকল্পনা জেনে নিলো। সাথে সাথেই সোমনাথ কর্তৃপক্ষের কাছে এই খবর পৌঁছানোর জন্য দূত পাঠিয়ে দিলো।

শুধু তাই নয়, যেসব ছোট্ট ছোট্ট রাজ্যের হিন্দু রাজাও বড় বড় মহারাজাদের সাথে তখনো পর্যন্ত সুলতান মাহমূদের সংঘর্ষ হয়নি, মুলতানের হিন্দুরা তাদের

কাছেও খবর পৌঁছে দিলো। হিন্দুরা সোমনাথ রাজ্যের শাসক রায় কুমারের কাছে এই বলে খবর পৌঁছালো– তিনি যেনো সোমনাথের বাইরে সুলতান মাহমূদকে ঠেকানোর ব্যবস্থা করেন।

মুলতান পৌঁছে সুলতান মাহমূদ সোমনাথ অভিযানের জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উট ও পানির ব্যবস্থায় মনোযোগ দিলেন। মুলতানে সুলতানের এক বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলো।

বুযুর্গ সুলতানকে বললেন, সম্মানিত সুলতান! আপনি সোমনাথকে সেসব মন্দিরের মতো মনে করবেন না, যেসব মন্দির ইতোমধ্যে আপনি ধ্বংস করেছেন। সোমনাথ দুর্গকেও আপনি সেসব দুর্গের মতো মনে করবেন না, এরই মধ্যে যেসব দুর্গ আপনার বিজিত হয়েছে। আমাদের কা'বার উপর যদি আক্রমণ হয়, কা'বাকে বাঁচানোর জন্যে কি দুনিয়ার সকল মুসলমান জীবন বাজী রাখবে না? সোমনাথের জন্যও হিন্দুস্তানের সকল হিন্দু জীবনবাজী রাখবে। সোমনাথে আপনার কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। এটাকে শুধু একটি মন্দির বা দুর্গ ভাবার কোন অবকাশ নেই। এখানে ইসলাম ও পৌত্তলিকতা মুখোমুখি হবে। আপনি এখানে পরাজিত হলে সেটিকে ইসলামের পরাজয় ভাবা হবে। আর হিন্দুরা আরো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে তাদের শিব দেবতাই সত্য। তারা এটাও প্রচার করবে, শিবদেবের সামনে কেউ টিকতে পারবে না। এর পরিণতি হবে, উপকূল এলাকার দুর্বল মুসলমানরা হিন্দুত্বকে গ্রহণ করবে অথবা তাদেরকে হিন্দুত্ব গ্রহণে বাধ্য করা হবে।

মনে হচ্ছে আমি মারাত্মক ঝুকির মধ্যে পড়তে যাচ্ছি– বললেন সুলতান মাহমূদ।

অবশ্যই, এটা হবে আপনার জীবন ও ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক ঝুকি– বললেন বুযুর্গ। যুদ্ধ সম্পর্কে আপনি ভালো জানেন সুলতান! এ ব্যাপারে আমার তেমন অভিজ্ঞতা নেই। আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, শত্রুরা কিন্তু আপনার ব্যাপারে বেখবর নয়। আপনি গোপনে নিজের চৌকির তল্লাশী নিন এবং নিজের আস্তীনেরও খবর নিন। আপনার নিজের ঘরের শত্রুরাই আপনার জন্যে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

এ ব্যাপারে আপনি কি আমাকে সুনির্দিষ্ট কিছু বলতে পারেন? বুযুর্গকে অনুরোধের স্বরে বললেন সুলতান।

হ্যাঁ, আমার শিষ্যরা আপনার এক কর্মকর্তা সম্পর্কে বলেছে, সে নাকি হিন্দুদের কাছে ঈমান বিক্রি করে দিয়েছে। এই কর্মকর্তা শুরু থেকেই মুলতানে দায়িত্ব পালন করছে। আজ তার ঘরের দিকে আপনি একটু নজর রাখবেন। হয় তার কাছে কেউ আসবে, নয়তো সে কোন জায়গায় যাবে।

* * *

সুলতান মাহমূদ তখনি একজন ডেপুটি সেনাপতিকে সন্দেহভাজন কর্মকর্তার গতিবিধির উপর চোখ রাখার দায়িত্ব দিলেন। ডেপুটি সেনাপতি মধ্য রাতে সুলতানকে খবর দিলো, সন্দেহভাজন কর্মকর্তা একটি লম্বা আলখেল্লা পরে মাথা কাপড়ে ঢেকে এক হিন্দু প্রতাপশালী ব্যক্তির হাবেলীতে প্রবেশ করেছে।

সুলতান নির্দেশ দিলেন, সেই হাবেলীকে ঘেরাও করে প্রাচীর ডিঙিয়ে বাড়ির কেউ বুঝে উঠার আগেই অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করবে। যাতে অভিযোগ অস্বীকার করার সুযোগ না থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে সুলতানের নির্দেশ পালিত হলো। প্রভাবশালী হিন্দুর হাবেলীর মূল ফটকের কড়া না নেড়ে পার্শ্ববর্তী বাড়ির ফটকের কড়া নাড়লো সুলতানের গোয়েন্দা বাহিনী। আর সেই হাবেলীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলা হলো। পার্শ্ববর্তী বাড়ির গেট খুলে দিতেই দ্রুতগতিতে সেই বাড়িতে কয়েকজন সৈন্য প্রবেশ করে তাদের কাছ থেকে জেনে নিলো, পাশের বাড়িতে উপর দিয়ে প্রবেশের পথ কোনটা? তারা জানালো, এদিক থেকে ওই বাড়িতে যাওয়ার কোন পথ নেই। ছাদ থেকে রশি বেয়ে নিচে নামতে হবে।

নির্দেশনা মতো কয়েকজন সৈনিক পাশের বাড়ির ছাদে রশি বেঁধে নিচে রশি ফেলে দিলো এবং একের পর একজন করে দ্রুততার সাথে কয়েকজন সৈনিক বাড়ির উঠানে নেমে পড়লো। প্রথম সৈনিক হাবেলীর উঠানে নামার সাথে সাথেই বাড়ির মধ্য থেকে কেউ তাকে দেখে হুশিয়ারী উচ্চারণ করলো– সাবধান! এখান থেকে চলে যাও, নয়তো প্রাণে বাঁচবে না।

সাথে সাথে হুশিয়ারী উচ্চারণকারীর উদ্দেশ্যে পাল্টা হুমকি এলো– সাবধান! যেখানে আছো সেখানেই থাকো। একটু নড়াচড়া করলেই তীর ছোড়া হবে। আমরা কোন ডাকাত নই, সরকারী লোক।

ততোক্ষণে দশ বারোজন সৈনিক রশি বেয়ে সেই বাড়ির উঠানে নেমে পড়েছে। তারা হুশিয়ারি উচ্চারণকারী ব্যক্তির বুকে তরবারী ঠেকিয়ে বললো, গযনী সরকারের অমুক কর্মকর্তা কোন কক্ষে অবস্থান করছে?

ঠিক সে সময় এক সাথে দু'টি কক্ষের দরজা খুলে গেল, এবং বিষ্ময় ও আতংকগ্রস্ত চেহারা নিয়ে তিন জন লোক বাইরের অবস্থা দেখে আবার ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিতে চাইলো।

কিন্তু এরই ফাঁকে কয়েকজন সৈনিক দরজা ঠেলে কক্ষে ঢুকে পড়লো। অভিযুক্ত গযনীর কর্মকর্তা একটি পালংকের উপরে বসা ছিল। সে সৈন্যদের দেখে ঘরের এক কোণার দিকে লুকাতে চাচ্ছিল। কিন্তু সৈন্যদের একজন অভিযুক্ত কর্মকর্তার পাঁজরে তরবারী ঠেকিয়ে বললো- হাত উপরে উঠিয়ে ফেলো, কোন নড়াচড়া করবে না।

সেই কক্ষের মেঝেতে একটি কাগজ পড়েছিল। সৈন্যরা সেই কাগজটি উঠিয়ে দেখলো, তাতে পেন্সিল দিয়ে একটা নক্সা আঁকা হয়েছে এবং কিছু সাংকেতিক চিহ্ন দেখানো হয়েছে। কাগজের গুরুত্ব বুঝে সৈন্যরা সেটি তোলে সংরক্ষণ করলো।

সেই কক্ষে আরো ছিলো দু'জন সুন্দরী তরুণী। তারা প্রায় অর্ধ নগ্ন। অসম্ভব সুন্দর তাদের দেহাবয়ব। পাশের কক্ষে ছিল চারজন অভিজাত হিন্দু। এরা সবাই মদ পানে লিপ্ত ছিলো। এরা সুলতান মাহমূদের কর্মকর্তার কাছ থেকে তার সফর সূচী জেনে নিয়ে সুলতানের অভিযান ভণ্ডুলের পরিকল্পনা তৈরি করছিলো। আর সুন্দরী তরুণী দু'জন তাদের দেহ ও রূপ দিয়ে গযনীর ঈমান বিক্রেতাকে জোহান্নামের আয়াসে পরিতৃপ্ত করার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলো।

অভিজাত এই হিন্দুরা অভিযানকারী সৈন্যদের সামনে থলে ভরা স্বর্ণমুদ্রা রেখে বললো- আপনারা আমাদেরকে ছেড়ে দিন, যতো স্বর্ণমুদ্রা দরকার আমরা তাই দেবো। প্রত্যেককে একজন করে সুন্দরী নারীও দেবো। এছাড়াও সাত পুরুষ পর্যন্ত নিশ্চিন্তে থাকার মতো ব্যবস্থা আমরা আপনাদের জন্য করে দেবো। বাকী জীবনটাকে সুখে কাটানোর জন্যে আমাদেরকে ছেড়ে দিন। নগদ উপহার নিয়ে জীবনটাকে ভোগ করুন।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও গুরুত্ব তখন আর গ্রেফতারকৃত কর্মকর্তার বুঝতে বাকী রইলো না। অবস্থার আকষ্মিকতায় সে হতবাক হয়ে গেলো। তার মুখে

কোন কথাই উচ্চারিত হলো না। গযনীর সৈন্যদেরকে হিন্দুদের কোন লোভ লালসাই দমাতে পারলো না। তারা সবাইকে গ্রেফতার করে সুলতানের কাছে নিয়ে এলো। সুলতান তখনো জেগে জেগে গোয়েন্দা অভিযানের রিপোর্ট পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

* * *

অভিযানকারীরা অপরাধের আলামত স্বরূপ শরাবের সুরাহী, মুদ্রাভর্তি থলে এবং অর্ধ নগ্ন দুই তরুণীসহ গ্রেফতারকৃত হিন্দুদেরকে সুলতানের সামনে পেশ করলো। সুলতান মদের সুরাহী, থলে ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা, দুই তরুণীর দিকে চোখ বুলালেন। তারপর ছয় বছর ধরে মুলতানে কর্মরত কর্মকর্তার প্রতি তাকালেন। তার মুখ থেকে তখনো শরাবের গন্ধ বেরুচ্ছিলো। অভিযানকারীরা নক্সা আঁকা কাগজটি সুলতানের হাতে তোলে দিলো।

তুমি যদি আনাড়ি হতে, বয়স কম হতো, মূর্খ হতে তাহলে আমাকে বলতে হতো, তুমি কি অপরাধ করেছো– ধৃত কর্মকর্তাকে বললেন সুলতান।

তুমি কি করেছো এবং কি কাজে লিপ্ত হয়েছিলে এর পরিণতি কি হতে পারে এটা তুমি জানো। আমি আশা করবো, তুমি সবকিছু খোলাখুলি বলে দেবে। তোমার অপরাধ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তুমি অমার্জনীয় অপরাধ করেছো। তুমি শুধু সালতানাতে গযনীর বিরুদ্ধাচরণ করোনি, আমার বিরোধিতা করোনি, তুমি ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করেছো। এই অপরাধের কি শাস্তি হতে পারে সে সম্পর্কেও তুমি ওয়াকিবহাল। এখন তুমি ঈমানকে নিলাম করে যা কিছু অর্জন করেছো, তা সবিস্তারে বলে ফেলো। আল্লাহ্ হয়তো তোমাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

যদি না বলো, তাহলে তোমাদের মতো লোকদের কাছ থেকে কিভাবে কথা বের করতে হয় তা যে আমাদের জানা আছে তা তুমি ভালোই জানো। তুমি যাদের সাথে আঁতাত করেছো, আমার হাত থেকে তোমাকে বাঁচানোর ক্ষমতা তাদের নেই। এসব সুন্দরী নারী, মুদ্রার থলে আর শরাবের সূরাহী আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে পারবে না।... বলো ।

সুলতানের কথা শেষ হতে না হতেই সেই বেঈমান কর্মকর্তা সুলতানের পায়ে পড়ে মাথা তার পায়ে রেখে দিলো।

সুলতান দ্রুত তার পা সরিয়ে নিয়ে বললেন– সরে যাও, তোমার নাপাক শরীর আমার পায়ে লাগাবে না। আমি অযু অবস্থায় থাকি, আগামীকাল রোযা রাখবো।

ধৃত হিন্দুদের দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুলতান বললেন– তোমরা কি করছিলে? দেরি না করে দ্রুত বলতে থাকো। এটাই হবে তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। তরুণীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি কক্ষে আটকে রাখো।

হিন্দুদের একজন হাত জোড় করে আবেদন করলো– মহারাজ সুলতান! এই তরুণীদের একজন আমার মেয়ে। আর অন্যজন একজন সম্মাণিত ব্যক্তির কন্যা। এদের কোন অন্যায় নেই।

তোমাদের কি জোর করে সেই বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো? তরুণীদের জিজ্ঞেস করলেন সুলতান। তোমরা কি জানতে কি করতে হবে তোমাদের?

হ্যাঁ, জানতাম আমরা। দৃঢ়কণ্ঠে বললো এক তরুণী। আমাদেরকে জোর করে সেখানে নেয়া হয়নি। এতে আপনি মনে করবেন না, দেহব্যবসা আমাদের পেশা। আমরা অভিজাত ঘরের মেয়ে। আমরা ধর্মের সেবিকা। আমরা যা করেছি, ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেছি। আমরা আমাদের সেইসব ধ্বংস প্রাপ্ত মন্দিরগুলোর প্রতিশোধ নেয়ার শপথ নিয়েছি, যেসব মন্দির আপনি ধ্বংস করেছেন।

তরুণীর কথা শুনে সুলতানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি সেই কর্মকর্তার দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনা মাখা কণ্ঠে বললেন– আমি অধিকাংশ হিন্দুস্তান জয় করেছি, বহু রাজা মহারাজাকে পরাজিত করেছি, হিন্দুদের দেবদেবীদের ভেঙেচুড়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছি। আমার যোদ্ধারা এদের কথিত দেবতাদেরকে পরাজিত করে পদদলিত করেছে; কিন্তু এই অবলা তরুণীদের কাছে তুমি আত্মসমর্পন করে গোটা জাতিকে পরাজিত করার চক্রান্ত করেছো? ছি: তোমার মতো নরাধমকে মাটিতে মিশিয়ে দিলেও উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে না।

আমরা এমন জাতির নারী যে জাতির মেয়েরা স্বামীর মৃত্যুতে নিজেদের স্বতীত্ব প্রমাণ করতে জ্বলন্ত চিতায় আত্মহুতি দেয়। নিজের ধর্ম, জাতি ও দেশের প্রয়োজনে আমরা দেহ বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করি না, বরং দেশ, জাতি ও

ধর্মের জন্য নিজের দেহ ব্যবহারকে আমরা গর্বের বিষয় মনে করি। বললো অপর তরুণী।

এই পৃথিবীতে ইসলাম থাকতে পারবে না, থাকবেও না। এটাই আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের ধর্মীয় পুরোহিতরা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন- তোমাদের শরীরটাকে একটি লোভনীয় বিষ মনে করে তা দিয়ে শত্রুদের ঘায়েল করো। আপনার কাছে আমাদের একটাই আবেদন, যত দ্রুত সম্ভব আমাদেরকে হত্যা করে ফেলুন, আমাদের কষ্ট দিয়ে হত্যা করবেন না।

আমি তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি, নিজ ধর্মের প্রতি ও নিজ জাতির প্রতি তোমাদের প্রতিশ্রুতি ও দায়বদ্ধতার জন্যে। তোমরা সত্যিই তোমাদের জাতি ও ধর্মের জন্যে আত্মনিবেদিতা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অশ্লীলতা ও অনৈতিকতার উপর যে ধর্মের ভিত্তি গড়ে উঠেছে এমন ধর্মের মেয়েরা অশ্লীলতা ও সম্ভ্রম বিক্রি করাকে গর্বের বিষয় মনে করবে এটাই স্বাভাবিক। আমি কথা দিচ্ছি- তোমাদের আবেদন রক্ষা করবো...।

* * *

গ্রেফতারকৃত কর্মকর্তা ও ধৃত হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীরা সুলতানের কাছে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সবকিছু স্বীকার করল। গযনীর কর্মকর্তাকে চক্রান্তকারীরা হাত করে নিয়েছিলো। ফলে এই কর্মকর্তা হিন্দুদের জানিয়ে দিয়েছিলো, সুলতান মাহমূদ সোমনাথ আক্রমণ করতে যাচ্ছেন এবং তার নির্দেশে গযনীর সেনারা গতিপথ নির্ধারণের জন্যে সেদিকে গেছে।

* * *

চক্রান্তকারী এই গোষ্ঠির হিন্দু নেতারা বিভিন্ন রাজা মহারাজা ও সোমনাথ কর্তৃপক্ষের কাছে আগাম প্রস্তুতির খবর পাঠিয়ে দিয়েছে। ঈমান বিক্রেতা সেনাকর্মকর্তা হিন্দুদের জানিয়ে দিয়েছে, গযনী বাহিনী যখন ভাওয়ালপুর, অতিক্রম করে বিকানির ময়দানে পৌঁছবে তখন তাদের উপর রাতের অন্ধকারে যেনো গেরিলা আক্রমণ করা হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

কর্মকর্তা হিন্দুদের আরো পরামর্শ দিয়েছিলো, হিন্দুরা যেনো সবসময় গযনী সেনাদের হয়রানীর মধ্যে রাখে এবং উটগুলোকে মেরে ফেলতে বেশি করে তীর

ছুঁড়ে। গযনী বাহিনী আরো কিছুটা অগ্রসর হলে স্থানীয় অধিবাসীর পরিচয় দিয়ে সুলতানের কাছে অনুরোধ করবে, তারা গযনী বাহিনীকে সংক্ষিপ্ত পথে সোমনাথ নিয়ে যেতে সহযোগিতা করতে চায়। এটি ছিলো সুলতানকে বিভ্রান্ত করার ভয়াবহ চক্রান্ত যা ইতোপূর্বে হাভেলীর অভিযানে ঘটেছিলো।

সুলতান চক্রান্তকারীদের মুখ থেকে সকল চক্রান্তের কথা শুনে, তার স্থানীয় কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিলেন, এই চক্রান্তের সাথে যারা জড়িত, তাদেরকে খোঁজে বের করে একটি ঘরে আমৃত্যু আটকে রাখবে। মৃত্যু হলে তাদের মরদেহগুলো বাইরে ফেলে দেবে। এগুলোকে সম্মানে দাফন করার প্রয়োজন নেই। এদেরকে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন এসব কাফেরেদের সাথেই উঠাবেন।

গাদ্দার কর্মকর্তা সম্পর্কে সুলতান নির্দেশ দিলেন, সেনবাহিনী সোমনাথ রওয়ানা হওয়ার সময় একে একটি শক্তিশালী ঘোড়র সাথে হাত পা বেঁধে রশিতে আটকে দেবে। হেঁচড়ে হেঁচড়ে বেঈমানটা যখন মরে যাবে তখন ফেলে দেবে।

ফরখী ছিলেন সুলতান মাহমূদের সময়ের রাজ কবি। এই কবি সুলতান মাহমূদের সোমনাথ অভিযানের সঙ্গী ছিলেন এবং গোটা অভিযান সম্পর্কে তিনি একটি দীর্ঘ কাব্য রচনা করেছিলেন। তার সেই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে সুলতান মাহমূদের কাছে যখন এই ভয়াবহ চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেলো তখন ছিলো রমযান মাস।

সেই রাতে তারাবিহ'র নামাযের পর দীর্ঘ সময় তিনি নফল ইবাদতে মগ্ন রইলেন। সকাল বেলা তার একান্ত সঙ্গীদের বললেন, আল্লাহ হয়তো আমার দ্বারা বড় কোন কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করাতে চান। এজন্যই তিনি রাতের অন্ধকারে আমাকে আলোর দিশা দেখিয়েছেন, নয়তো রাতের আঁধারে এই কেউটে সাপগুলো আমাকে ছোবল দিতো।

পরিস্থিতি ও পথ পর্যবেক্ষণকারী অগ্রবর্তী দল পোটা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এসে সুলতানকে জানালো– পথিমধ্যে সবচেয়ে বেশি সংকট তৈরি করবে পানি। দীর্ঘ পথের মধ্যে পানি খুবই দুষ্প্রাপ্য।

পানির সংকট মোকাবেলা করতে সুলতান মাহমূদ সোমনাথ রওয়ানা হওয়ার আগে ত্রিশ হাজার উট সংগ্রহ করে সবগুলোতে পানি বোঝাই করেছিলেন। কারণ পথিমধ্যে শুধু সেনাবাহিনী নয় মাল বহনকারী উট ও ঘোড়াগুলোকেও পানি পান করাতে হবে। এজন্য প্রত্যেক অশ্বারোহীর জন্যেই একটি করে পানি বোঝাই উট

বরাদ্ধ করা হয়েছিলো। পানি বোঝাই উট ছাড়াও প্রত্যেক সৈন্যের প্রতি নির্দেশ ছিলো, তারা প্রত্যেকেই যেনো যথাসাধ্য পানি নিয়ে নেয়।

সুলতান মাহমূদ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। কারণ, পথিমধ্যে হিন্দু রাজা মহারাজারা তার বাহিনীর ক্ষতিসাধন করবে এ খবরটি তিনি আগাম জানতে পেরে আগেই সতর্ক প্রস্তুতি নিতে পেরেছেন তিনি।

হিন্দুদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে সুলতান আরো বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে গতিপথ আগেই নির্ধারণ করে নিলেন এবং সেনাবাহিনীকে নতুন ভাবে বিন্যাস করলেন।

তিনি অগ্রবর্তী বাহিনীকেও বিভিন্ন অংশে ভাগ কর দিলেন। অগ্রবর্তী বাহিনীকে পাহারা দিয়ে নেয়ার জন্যে তাদের দু'পাশে নিয়োগ করলেন ভিন্ন ভিন্ন ইউনিট। এরপর রাখলেন ঝটিকা বাহিনী। যারা থাকবে মূল বাহিনী ও অগ্রবর্তী বাহিনীর মাঝখানে। তবে তারা ডানে বামে মূল সেনাবাহিনী থেকে অনেক দূরে থাকবে। যাতে শত্রু বাহিনীকে মূল বাহিনীর ধারে কাছে আসার অনেক আগেই আটকে দেয়া যায়। রসদ ও পানিবাহী ইউনিটকে অগ্র পশ্চাত ডানে বামে শক্ত পাহারা দিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। রাতের বেলায় চলন্ত অবস্থায় বা যাত্রা বিরতিতে গোটা রাত ব্যাপী চতুর্দিকে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা করা হলো।

গযনী বাহিনীর তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিলো। প্রথমত এই বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন স্বয়ং সুলতান মাহমূদ। যার সামরিক দূরদর্শিতা ছিলো বিশ্বখ্যাত। দ্বিতীয়তঃ গযনী বাহিনীর ঝটিকা ইউনিটের সদস্যরা ছিলো সত্যিকার অর্থেই জানবাজ এবং মেধাবী। তৃতীয়ত: প্রতিটি সৈনিক তাদের নেতার জন্যে নয়, ইসলামের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে যুদ্ধ করতো। তাদের সামরিক সাফল্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট ছিলো নিষ্ঠা। খুব দ্রুত এবং নিষ্ঠার সাথে প্রতিটি নির্দেশ পালিত হতো।

৪১৬ হিজরী সনের ১২ই শাওয়াল মোতাবেক ১০২৫ সালের ২৬ নভেম্বর। ঈদুল ফিতরের দু'দিন পর সুলতান মাহমূদ মুলতান থেকে সোমনাথের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাযে মূল খুতবার আগে সুলতান সকল সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, প্রিয় ভাইয়েরা! তোমাদের সবাইকে আমি ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মন থেকে তোমরা এ ভাবনা দূর করে দাও নিজ

মাতৃভূমি থেকে বহু দূরের এক দেশে আমরা ঈদ উদ্‌যাপন করছি। যে যমীনে মুজাহিদদের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে সেই যমীন সকল মুসলমানের। যে যমীনে মুজাহিদের আযান ধ্বনিত হয়েছে সেই জায়গা মুসলমানের আপন ভূমি। এই হিন্দুস্তান কাফেরদের তালুক নয় এতে আমাদেরও অধিকার আছে। হয়তো বা এই ঈদ আমাদের কারো কারো জীবনের শেষ ঈদ। আমরা এমন এক অভিযানে যাচ্ছি যা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের জন্যে অন্তিম পরীক্ষা। হিন্দুরা বলাবলি করছে, মুসলমানরা ধ্বংস হওয়ার জন্যই সোমনাথ যাচ্ছে। তোমাদেরকে এখন এমন এক মূর্তি ধ্বংস করতে হবে হিন্দুরা যেটিকে শক্তি দেবতা হিসেবে পূজা করে। তোমাদেরকে সেখানে প্রমাণ করতে হবে, শক্তির মালিক আল্লাহ! পাথরের মূর্তি কাঠামোগতভাবে শক্ত হতে পারে। কিন্তু এর নিজস্ব কোন শক্তি নেই। হিন্দুদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ করতে হবে।

সুলতান মাহমূদ তার ভাষণে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করলেন–বিন কাসিমের কথা। তিনি বললেন, মুহাম্মদ বিন কাসিম কতো দূর থেকে কতো কষ্টকর পথ পাড়ি দিয়ে হিন্দুস্তান এসেছিলেন। সুলতান বললেন, সোমনাথ মন্দিরে তোমাদের মতো মুসলমানদের ধরে এনে নর বলি দেয়া হয়। মুসলমান তরুণীদের অপহরণ করে সম্ভ্রম লুটে নেয় হিন্দু পণ্ডিতেরা। তাদেরকে সেখানে নগ্ন করে নাচতে বাধ্য করা হয়। মুসলিম তরুণীদের ধরে এনে হিন্দুরা সব ধরনের পাশবিকতার চর্চা করে। এসবের কথা শোনার পরও তোমাদের মনে কি স্বজাতির কন্যা জায়াদের সম্ভ্রম ও জীবন হানির এই পৈশাচিক আখড়া নির্মূল করতে কোন প্রকার দ্বিধা থাকবে? তোমাদের ঈমানী চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধ কি এসব কাণ্ডে সায় দেবে?

সুলতান-নাসিরও শেগুপ্তার ঘটনা সৈন্যদের শুনিয়ে বললেন, সেই নিরপরাধ কুমারী মেয়েটি হায়েনাদের আক্রমণ থেকে নিজের সম্ভ্রম বাঁচাতে কূপে ঝাপ দিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। সেই মেয়েটির আত্মা আমাকে রাতে ঘুমাতে দেয় না। আমি এই নিরপরাধ মুসলিম তরণীর জীবনহানির প্রতিশোধ নিতে চাই।

সুলতান মাহমূদের বক্তৃতা এতোটাই আবেগঘন ও অনুপ্রেরণামূলক ছিলো যে, গোটা সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রতিশোধের আগুন ছড়িয়ে পড়লো, তাকবীরের পর তাকবীর ধবনিতে গোটা ময়দান কেঁপে উঠলো। সৈন্যদের উজ্জীবিত করাই ছিলো সুলতানের উদ্দেশ্য। তাতে তিনি সফল হলেন। পথের দুর্গমতা, কষ্ট ও সম্ভাব্য বাধা প্রতিবন্ধকতার কথা জানিয়ে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সোনাদের তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নিলেন।

* * *

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ তার সেনাদের এভাবে রওয়ানা করালেন যে, তার প্রথম সৈনিক থেকে সর্বশেষ সৈন্যের অবস্থানের দূরত্ব ছিলো প্রায় একশো মাইল। যখন তিনি মরু এলাকায় প্রবেশ করলেন তখন বুঝতে পারলেন, তিনি যাত্রাপথ সম্পর্কে এর আগে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করলেও তাকে যে ধারণা দেয়া হয়েছিলো বাস্তব অবস্থা এর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুলতান অনুভব করলেন, প্রকৃতপক্ষে তার লোকেরা যাত্রাপথের বিপদসংকুল অবস্থার কথা মোটেও বুঝে উঠতে পারেনি।

গযনী সেনারা যখন বিকানীর মরুভূমিতে পৌছলো, তখন রিজার্ভ সৈন্যদের পাহারা দেয়ার জন্যে ডানে বামে যে সৈন্যরা ছিলো, রাতের বেলায় তাদের উপর শত্রু সেনারা গেরিলা আক্রমণ চালালো। কিন্তু হিন্দুরা জানতো না গযনী বাহিনীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা আগে থেকেই নিয়ে রেখেছেন সুলতান মাহমূদ। বিভিন্ন দলে বিভক্ত গযনী বাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান ছিলো। কোন এক ফাঁকে বিশাল এলাকা নিয়ে অগ্রসরমান গযনী বাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়লো শত্রু বাহিনী এবং তারা উট ইউনিটে আক্রমণের প্রস্তুতি নিলো। কিন্তু এর আগেই এদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললো সুলতানের অশ্বারোহী বাহিনীর নিরাপত্তা দল। সকল শত্রু সেনাকে হামলার আগেই হত্যা করলো গযনীর ঝটিকা বাহিনী।

গযনী বাহিনী যখন পাহাড় ও ঘন টিলাময় এলাকায় পৌছলো তখন দিনের বেলায় হিন্দুদের তীরন্দাজ বাহিনীর তীব্র আক্রমণের শিকার হলো। হিন্দুরা টিলার আড়াল থেকে একযোগে তীরবৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলো। তাতে গযনী বাহিনীর বেশ কিছু সওয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

উটের গায়ে তীরবিদ্ধ হলে উটগুলো নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে এলোপাথাড়ী দৌড়াতে লাগলো। হিন্দুরা মনে করছিলো, তাদের পেছন থেকে আক্রমণের আশংকা নেই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে হিন্দুরা পিছন দিক থেকে আক্রমণের শিকার হলো। সংঘর্ষে কিছু হিন্দু মারা গেলো আর কিছু ধরা পড়লো। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সুলতান জেনে নিলেন, পথিমধ্যে আর কোন কোন জায়গায় হিন্দুরা ফাঁদ পেতে রেখেছে? এদের কথামতো তিনি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

তৎকালীন ঐতিহাসিকদের ধারণা মতে, সুলতান মাহমূদকে তখন অন্তত পাঁচশ মাইল মরু এলাকা পাড়ি দিতে হয়েছিলো এর মধ্যে কয়েকটি ছোট বড় নদীও ছিলো। দীর্ঘ মরু এলাকায় কোথাও সবুজের কোন চিহ্ন ছিলো না। ঘোড়াগুলোকে সচল রাখতে দানাদার শুকনো খাবার ও শুকনো ঘাস খাওয়াতে

হতো। ফলে ঘোড়াগুলোর জন্যে অনেক বেশি পানির প্রয়োজন হতো। আর মরুভূমির তপ্ত হাওয়ায় অল্পতেই ঘোড়া তৃষ্ণার্ত হয়ে দুর্বল হয়ে যেতো। কিন্তু উটের কোন সমস্যা হতো না। বেশি সমস্যা হচ্ছিল পদাতিক বাহিনীর। তারা এগুতে পারতো না। বালুতে পা দেবে যেতো। মরুভূমি অতিক্রমের পর সর্বপ্রথম লুধোরাওয়া শহরে গযনী বাহিনীকে শত্রু বাহিনীর মুখোমুখি হতে হলো। হিন্দুরা পূর্বেই খবর পাওয়ায় তারা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলো। মরু পাড়ের এই শহর ছিলো বিশাল এবং বারো ফটক বিশিষ্ট। সুলতান শহর অবরোধ করে এমন তীব্র আক্রমণ চালালেন যে, শহরের লোকেরা ঘাবড়ে গেল। বশ্যতা স্বীকার করে সাদা পতাকা উড়িয়ে শহরের দরজা খুলে দিল।

সুলতান বিজিত শহর থেকে তার প্রয়োজনীয় পানি ও অন্যান্য রসদের ঘাটতি পূরণ করে নিয়ে আবার সোমনাথের দিকে রওয়ানা হলেন। অবশ্য মরু এলাকায় বেশ কয়েকটি জায়গায় গযনী বাহিনী শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবে সবগুলোতেই শত্রুবাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে পরাজিত হয়েছে। অবশ্য গযনী বাহিনীরও অল্পবিস্তর ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে।

দীর্ঘ একমাসে মরু এলাকা অতিক্রম করে ডিসেম্বরের শেষ দিকে গযনী বাহিনী পাটনা এলাকায় পৌঁছলো। এখানে প্রায় বিশ হাজার হিন্দু বাহিনী গযনী বাহিনীর পথ রোধ করে দাঁড়াল। হিন্দুরা গযনী বাহিনীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জানতো, তাই তাদের পুণ্য ভূমিকে বাঁচানোর জন্যে তারা জীবনবাজি রেখে লড়াই করলো। কিন্তু অবশেষে হিন্দুদেরই পতন ঘটলো।

এরপর বর্তমানে যে এলাকাটি আহমদাবাদ নামে পরিচিত সুলতান মাহমূদ সেখানে পৌঁছলেন। সুলতানকে তার অগ্রবর্তী দল ও গোয়েন্দারা খবর দিলো– পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, সোমনাথের রাজার পক্ষে চতুর্দিক থেকে সাহায্যকারী দল আসছে। ফলে সোমনাথ পৌঁছানোর ব্যাপারটি সহজ হবে না।

গযনীর সৈন্যদের অবস্থা তখন খুবই করুণ। দীর্ঘ মরুভূমির কষ্টকর যাত্রাপথেও বার বার তাদের শত্রু বাহিনীর মোকাবেলা করতে হয়েছে। যাত্রাপথের প্রতিটি মুহূর্তেই তাদেরকে থাকতে হয়েছে সতর্ক। কষ্টকর দীর্ঘ পথ বিরামহীনভাবে কম খেয়ে কম ঘুমিয়ে অতিক্রম করায় গযনীর সৈন্যরা ভীষণ ক্লান্ত-অবসন্ন। কারো শরীরই যেনো আর চলতে চায় না। অপর দিকে হিন্দু সৈন্যরা তাজাদম। সতেজ উজ্জীবিত। তারা তাদের ধর্মও স্বাধীনতা রক্ষায় মরণত্যাগী। এ এলাকার মাটি মানুষ সবই তাদের সহযোগী। আর গযনী

বাহিনীর জন্যে এখানকার মাটি মানুষ পরিবেশ পরিস্থিতি সবই বৈরী। তাছাড়া তারা জানে না কোথায় কি আছে?

অবস্থার ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে সুলতান মাহমূদও তার ইতিহাসখ্যাত প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ ছিলেন দারুন উৎকণ্ঠিত। তাদের শরীর জানান দিচ্ছিল কাজটি ঠিক হয়নি। আর যে পারা যাচ্ছে না। তারা নিজেরাও তো যোদ্ধা। অন্যান্য যোদ্ধাদের অবস্থা কি তা তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলেন। ফলে তাদের কপালে দুশ্চিন্তার রেখা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো। ঐতিহাসিক ফরখী কাব্য করে তখনকার অবস্থা বলেছিলেন– গযনীর বিখ্যাত বীর বাহাদুর সৈন্যটিও তখন নিজের দুরবস্থা চেপে রাখতে অন্যকে উজ্জীবিত,ও সাহস যোগাচ্ছিল, আর একে অন্যকে সাহায্য করছিলো। দৃশ্যত তাদের শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলো কিন্তু লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তারা ছিলো বিদ্যুতের মতো গতিময় আর বাঘের মতো ক্ষিপ্র।

সুলতান যখন জানতে পারলেন হিন্দুস্তানের বিভিন্ন এলাকা থেকে সোমনাথ রাজার সাহায্যে সামরিক সাহায্য আসতে শুরু করেছে, তখন তিনি সাহায্য আসার সম্ভাব্য পথগুলো আটকে দিয়ে সৈন্যদেরকে সোমনাথের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। অবশ্য মরুভূমি পেরিয়ে আসার কারণে অশ্বারোহীরা কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলো। সময়টা তখন ছিলো শীতকাল।

* * *

১০২৬ সালের ৬ জানুয়ারি মোতাবেক ৪১৬ হিজরী সনের ৪ যিলকদ সুলতান মাহমূদ সোমনাথের নিকটবর্তী এলাকায় পৌঁছেন। সেখান থেকেই তাকে সোমনাথ অবরোধের প্রস্তুতি নিতে হলো। কিন্তু হিন্দুরা তাকে সোমনাথ অবরোধের সুযোগ না দিয়ে অবরোধ আরোপের আগেই প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর ছিলো। সুলতান মাহমূদ যথাসম্ভব নিজে এবং গোয়েন্দাদের সাহায্যে সার্বিক পরিস্থিতি অনুধাবনের চেষ্টা করলেন। সোমনাথ ছিলো বিশাল এক দুর্গ-বন্দী শহর। সোমনাথের তিন দিক বেষ্টন করে রেখেছিল সাগর। আর স্থলভাগের দিকে খনন করা ছিলো গভীর প্রতিরক্ষা খাল।

সুলতান খবর পেলেন, ইতোমধ্যে সোমনাথ রক্ষার জন্যে সোমনাথের বাইরের দুই হিন্দু রাজার সৈন্যরা এসে দুর্গের বাইরে যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান নিয়েছে। দুর্গের ভেতরে সৈন্যরা ছাড়াও সাধারণ লোকেরাও তীর, ধনুক ও বর্শা নিয়ে দুর্গ প্রাচীরের উপরে অবস্থান নিয়েছে।

শহরের অধিবাসীরা গযনীর সৈন্যদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। শহরে হিন্দু পুরোহিত ও পণ্ডিতেরা প্রচার করলো, গযনীর সুলতান অন্যান্য হিন্দু রাজা-মহারাজাদের পরাস্ত করতে পেরেছে তাদের প্রতি শিবদেব অসন্তোষ ছিলো বলে। এখন শিবদেব মুসলমানদেরকে টেনে হেঁচড়ে তার কোলে নিয়ে এসেছেন। তিনি এখন মূর্তিসংহারীদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। সোমনাথ দুর্গ অবরোধকালে গযনীর সেনাদের উদ্দেশ্যে প্রাচীরের উপর থেকে শহরের লোকেরা বলছিলো, গযনীর পাপীরা! তোমরা মরতে এসেছো! সোমনাথ তোমাদের পাপের প্রতিশোধ নেবে।

বিরামহীন ভাবে মন্দিরের ঘণ্টা বাজছিল। দশ হাজার পণ্ডিত পালাক্রমে পূজায় লিপ্ত ছিলো। সুন্দরী যুবতী সেবাদাসীরা ভজন গাইছিল এবং নর্তকীরা উদ্দাম নৃত্যে মেতে উঠেছিল। শহরের সব মহিলা জড়ো হয়েছিলো মন্দিরে। সোমনাথের রাজা রায় কুমার কখনো দুর্গ প্রাচীরে আবার কখনো রাস্তায় নেমে শহরবাসীকে প্রতিরোধ যুদ্ধে উজ্জীবিত করছিলো। সোমনাথের নিকটবর্তী রাজ্যের রাজা পরমদেব তার সকল সৈন্য সামন্ত নিয়ে সোমনাথ রক্ষার জন্যে অনেক আগেই সেখানে এসেছিল।

হিন্দুদের উত্তেজনা, উৎসাহ ও উজ্জীবিত শক্তি দেখে সুলতান মাহমূদ গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি অনুভব করলেন, নিজেকে এবং গোটা গযনী বাহিনীকে তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে ফেলেছেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তিনি যথা সম্ভব দ্রুত দুর্গ জয়ের পরিকল্পনা করতে লাগলেন।

তিনি প্রধান সেনাপতিকে বললেন, আবু আব্দুল্লাহ! আগামীকাল জুমআর দিন। আমি সকাল বেলায়ই আক্রমণ শুরু করতে চাই। সেনারা যাতে প্রস্তুত থাকে। তিনি আক্রমণের পরিকল্পনা সবিস্তারে প্রধান সেনাপতিকে বুঝিয়ে দিলেন। আলতাঈও চিন্তাগ্রস্ত। তার চেহারাই বলে দিচ্ছিলো, পরিস্থিতি মোটেও তাদের অনুকূলে নয়।

# তারকার পতন ধ্বনি

আজ থেকে প্রায় এগারো'শ বছর আগে তৌহিদী মুসলিম ও পৌত্তলিকতাবাদী মূর্তিপূজারীদের মুখোমুখি সংঘর্ষে সোমনাথ দুর্গের প্রাচীরগুলো কাঁপছিলো। দুর্গের ভেতরে ছিলো হরি-হরিদেবের পূজারীদের ঔদ্ধত্য হুংকার। আর দুর্গের বাইরে ছিলো তৌহিদের জন্য আত্মনিবেদিত গযনী যোদ্ধাদের তাকবীর ধবনি। অবস্থা এতোটাই উত্তেজনাপূর্ণ ছিলো যে, গোটা হিন্দুস্তানই যেন পৌত্তলিকদের জয়ধ্বনি আর তৌহিদের তাকবীর ধ্বনীতে কেঁপে ওঠছিলো। সেদিন সন্ধ্যার পর সুলতান মাহমূদ তার সকল সেনাপতি ও কমান্ডারদের জড়ো করলেন। তিনি সবার চেহারার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন–

তোমাদের চেহারা দেখে আমি যা অনুভব করছি এবং তোমরা যা ভাবছো, সম্ভবত আমার ভাবনাও তোমাদের চেয়ে ভিন্ন নয়। তোমরা কি বলতে পারো কেন আমাদের সবার কাছে মনে হচ্ছে, এই যুদ্ধই আমাদের জীবনের শেষ যুদ্ধ? কারণ হলো, এর আগে আমরা যেসব দুর্গ ও রাজ্য জয় করেছি, তাতে প্রতিপক্ষ ছিলো বিভিন্ন রাজা ও মহারাজারা।

কিন্তু সোমনাথ সেসব রাজা মহারাজাদের কোন রাজ্য বা দুর্গ নয়। এখানে হবে একটি ধর্মের সাথে আরেকটি ধর্মের মোকাবেলা। এখানে তোমরা একটি বাতিল ধর্মমতকে পরাজিত করে সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করতে এসেছো। হিন্দু ধর্ম আমাদের দৃষ্টিতে বাতিল হলেও সেই ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্ম রক্ষায় জীবন বিলিয়ে দিতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করে না। সোমনাথ সারা ভারতের হিন্দুদের জন্যে কা'বার মতো। তোমরা দেখতে পাচ্ছো হিন্দুরা খুবই উজ্জীবিত ও উত্তেজিত। তারা সোমনাথ রক্ষায় জীবন দিয়ে দিতে প্রস্তুত।

আমাদের সমস্যা হচ্ছে এখানকার শহরের ভেতরের কোন খবর আমাদের গোয়েন্দাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। দুর্গের ভেতরের কোন খবরই আমরা জানি না। আল্লাহর দয়ায় আমরা যদি দুর্গে প্রবেশ করতে পারি তখনো আমরা বলতে পারবো না দুর্গের কোথায় কি রয়েছে? আমাদের কেউ বলার নেই, ভেতরে কোন দিক থেকে আমাদের উপর আক্রমণ আসতে পারে? কোন দিক নিরাপদ? আর কোন জায়গা বেশি ঝুকিপূর্ণ? বাইরের কিছু খবর এবং তথ্য আমরা পেতে পারি এবং পাচ্ছি। এরই মধ্যে দুই মহারাজা তাদের সৈন্য সামন্ত নিয়ে

সোমনাথের রাজাকে সাহায্য করতে আসছে। এরা পেছন থেকে আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। আমাদের সেনাদের বিন্যাস সম্পর্কে আমি আগেই তোমাদের অবহিত করেছি। এবার আমি অন্যান্য ঝুঁকি ও আশংকা সম্পর্কে তোমাদের সৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তোমরা অনভিজ্ঞ ও আনাড়ী নও। তোমরা নিশ্চয় জানো, নিজ দেশ থেকে এতোটা দূরে এসে যুদ্ধে আগ্রহী যেকোন বাহিনীকে প্রতিপক্ষ ইচ্ছা করলে অনাহারেই পরাস্ত করতে পারে। এখানকার মাটি, মানুষ সবকিছুই আমাদের বৈরী। এখানে কোন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা কিংবা রসদ পাওয়ার সম্ভাবনা আমাদের নেই। যে তীরটা আমাদের কামান থেকে একবার বেরিয়ে যাবে, সেটির ঘাটতি পূরণের আর কোন ব্যবস্থা আমাদের নেই....।

এই সংঘর্ষ ও যুদ্ধ যদি দীর্ঘায়িত হয় তাহলে রসদ ও জনবলের ঘাটতিতে পড়ে আমরা পিছু হটতে বাধ্য হবো। আমি তোমাদের সতর্ক করে দিতে চাই, ব্যর্থ হয়ে যদি আমাদের পিছু হটতে হয় তাহলে আমাদের সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ফেলবে আর শত্রু বাহিনী আমাদের পিছপা হতে দেবে না। পিছু হটলে আমাদের কারো পক্ষেই জীবন নিয়ে গযনী পৌঁছানো সম্ভব হবে না।

পেরিয়ে আসা মরুভূমির কথা তোমরা ভুলে যেও না। প্রায় দুই মাস লেগেছে আমাদের এই দূরত্ব অতিক্রম করতে। তাই ব্যর্থ হয়ে পিছু হটা সৈন্যদের পক্ষে এই বিশাল মরু পাড়ি দেয়া সম্ভব হবে না।

আমি জানি, তোমরা অনেকেই ভাবছো, গযনী থেকে এতোটা দূরে এসে এই দুর্গম শহরে যুদ্ধে নামা আমাদের উচিত হয়নি। এ ব্যাপারে আমি তোমাদের সাথে একমত। কিন্তু আশা করি আমার মতের সাথেও তোমরা একমত হবে। দীর্ঘ দিনের সাফল্য ও জীবনহানির পরও এই অভিযান ছাড়া আমাদের মিশন অসম্পূর্ণ থাকত। আমাদের কারো জীবনই তো আর সীমাহীন নয়? তোমরা জানো, আমি পৌত্তলিকতার এই বেদীমূলকে ভেঙে সাগরে নিক্ষেপ করতে চাই।

ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন সুলতান! আমি কি জানতে পারি, আমরা গোটা হিন্দুস্তানের সব মূর্তি কি ধ্বংস করে দিয়েছি যে, শুধু সোমনাথের মূর্তি রয়ে গেছে? এটাকে ভেঙে ফেললেই সব মূর্তি শেষ হয়ে যাবে? প্রশ্ন তুললো এক ডেপুটি সেনাপতি।

সোমনাথের মূর্তি ভেঙে ফেললে এবং সোমনাথ ধ্বংস করে দিলে কি হিন্দুদের মূর্তিপূজা শেষ হয়ে যাবে? হিন্দুস্তানের সকল হিন্দু কি মুসলমান হয়ে যাবে? এত দূরে আসার ঝুঁকি আমাদের নেয়া উচিত হয়নি সুলতান!

ডেপুটি সেনাপতির জবাবে প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ গর্জে উঠলেন। তিনি বললেন– আশা করি ডেপুটি সেনাপতি শত্রুদের ভয়ে ভীত হয়ে এসব কথা উত্থাপন করেননি।

সম্মানিত সেনাপতি! আমরা শত্রুদের সংখ্যা দেখে মোটেও ভীত নই। তারেক বিন যিয়াদ সম্পূর্ণ অজানা দেশে পাড়ি দিয়ে পিছু হটার সকল পথ বন্ধ করে দিতে সকল জাহাজ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের কেউ শত্রুদের ভয়ে পিছু হটার চিন্তা করে বলে মনে হয় না।

আমি আমার হিন্দুস্তান অভিযানের শেষ পর্যায়ে এসে মাত্র কিছুদিন আগে জানতে পারি, সোমনাথের মূর্তিকে ভারতের হিন্দুরা সকল দেবদেবীর নেতা বলে বিশ্বাস করে– বললেন সুলতান। আমি যদি ভারত অভিযানের শুরুতে সোমনাথের এই অবস্থার কথা জানতে পারতাম তাহলে আমার অভিযান সোমনাথ থেকেই শুরু হতো।

এ পর্যায়ে সুলতান মাহমূদ সোমনাথের অভ্যন্তরে কি কি অপকর্ম ঘটে এবং সোমনাথের হিন্দুরা সোমনাথকে কেমন পবিত্র স্থান মনে করে তা সবিস্তারে কমান্ডারদের জানালেন।

অবশেষে তিনি জানালেন, আমরা আজ এমন জায়গায় পৌঁছে গেছি, যেখান থেকে পিছু হটা সম্ভব নয়। আমরা যদি আমাদের উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব ভুলে যাই, তাহলে আমাদের লড়তে হবে জীবন বাঁচানোর জন্য। তোমরা লড়াইয়ে অভ্যস্ত এবং অভিজ্ঞ। তোমরা জানো, যে সৈনিক জীবনের জন্যে লড়াই করে সে এগিয়ে যাওয়ার দিকে দেখে না, তার নজর থাকে পেছনের দিকে। আর স্বাভাবিক ভাবেই এমন যোদ্ধারা কখনো জীবন বাঁচাতে পারে না।

আমরা সোমনাথকে ধ্বংস করে এটা প্রমাণ করতে চাই, সত্যের পতাকাবাহী, রসূলে আরাবী স.-এর পয়গামবাহী সৈনিকদের জন্যে কোন যুদ্ধক্ষেত্রই অনতিক্রম্য নয় এবং আল্লাহর পথের সৈনিকদের পথে কোন দুর্গমতাই বাধা হয়ে উঠতে পারে না। যেকোন বাধা তারা নিমিষেই জয় করে নেয়। হতে পারে আমার পর কোন মাহমূদ আমাদের প্রজ্জলিত আলো গোটা হিন্দুস্তানে

ছড়িয়ে দেবে। আর যদি এমনটি সম্ভব না হয়, তাহলে হিন্দুস্তানে মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে সংঘাত লেগেই থাকবে, আর হিন্দুরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের আক্রমণের প্রতিশোধ নেবে এখানকার মুসলমানদের হত্যা করে।

আগামীকাল জুমআর দিন। আমি আশা করবো, আগামীকালের সূর্য উঠার আগেই অবরোধের কাজ সমাপ্ত হবে। তোমরা জানো, যথার্থ অর্থে এখানে অবরোধ আরোপ সম্ভব নয়। কারণ, সোমনাথের তিন দিকেই সমুদ্র, মাত্র একদিকে স্থল। এই স্থলভাগেও রয়েছে গভীর পরিখা। আমাদেরকে দুর্গে আঘাত করতে হবে। তাই আমাদেরকে পরিখা পেরিয়ে যেতে হবে। অবশ্য তা আমরা করতে পারবো ইনশা আল্লাহ। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে তীরন্দাজদের। দুর্গপ্রাচীর ও বুরুজের উপর যেসব হিন্দু রয়েছে তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। দুর্গ প্রাচীরের উপরে উঠার জন্য সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। অবশ্য আমি জানি, আমাদের এসব আয়োজন অনেকটাই আত্মহননের মতোই মনে হবে; কিন্তু এই দুর্গবন্দী শহর জয় করার জন্যে এছাড়া কোন বিকল্প পথ নেই।

১০২৬ সনের ৬ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার পেরিয়ে পর দিন শুক্রবার রাত। এ রাতে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম করেননি সুলতান মাহমূদ। রাতভর তিনি সৈন্যদের কার্যক্রম তদারকি করলেন। সৈন্যরাও রাতের মধ্যেই নিজ নিজ অবস্থানে ঠাঁই নেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিলো।

সুলতান মাহমূদ বারবার সৈন্য ও কমান্ডারদের মনে করিয়ে দিলেন, হিন্দুরা তাদের বিজয়ের জন্যে সুন্দর যুবতী মেয়েদের ব্যবহার করতে পারে। সাবধান! সবাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

* * *

যে সময় সুলতান মাহমূদ তার কমান্ডারদের দিক-নির্দেশনা ও উজ্জীবিত করছিলেন, তখন সোমনাথ দুর্গের ভেতরে শিব মূর্তির সামনে দশ হাজার হিন্দু পুরোহিত নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়ে পূজা করছিলো। এরা মাথা শিবদেবের পায়ে ঠেকিয়ে আর্তনাদ করছিলো। আর মন্দিরের উন্মুক্ত ময়দানে হাজারো যুবতী, নর্তকী নগ্ন বা অর্ধ নগ্ন হয়ে উন্মাতাল নৃত্য করছিলো। নাচতে নাচতে একদল ক্লান্ত হয়ে গেলে এদের জায়গা অন্যেরা দখল করে নিচ্ছিলো। শহরের নারী পুরুষ সবাই শিব মূর্তির বেদীতে মাথা ঠেকিয়ে মুসলমানদের প্রতি শিবদেবের ক্ষোভকে

উস্কে দেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিলো। তাদের বিশ্বাস ছিলো, তাদের শিবদেব একবার ক্ষুব্ধ হয়ে গেলে গযনী বাহিনীকে নিমিষেই ধ্বংস করে ফেলবে।

হিন্দুদের এই আর্তনাদের মধ্যে কোন ধরনের আতঙ্ক ও ভীতির ছাপ ছিলো না। তাদের মধ্যে বিরাজ করছিল চরম ক্ষোভ ও উত্তেজনা। আবেগ, উত্তেজনা ও ক্ষোভে প্রায় পাগল হয়ে পড়ে ছিলো হিন্দু জনতা। সবাই শিব মূর্তির পায়ে মাথা রেখে পণ করেছিলো মুসলিম সৈন্যদের ধ্বংস করে দিতে। তারা এতোটাই পাগল প্রায় হয়ে পড়েছিলো যে, ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ছিলো। তাদের ক্ষোভ এতোটাই আগ্রাসী রূপ ধারণ করেছিলো যে, দেখে মনে হচ্ছিলো, কোন মুসলমান পেলে তারা জ্যান্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।

হিন্দু পুরোহিতরা জনতাকে এই বিশ্বাস দিয়েছিলো, তাদের শিবদেব মুসলমানদেরকে টেনে এখানে নিয়ে এসেছে। এবার মুসলমানদের ধ্বংস অনিবার্য।

হিন্দুদের মধ্যে এমনই উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিলো যে, এক নর্তকী নাচের আসর থেকে দৌড়ে এসে শিবমূর্তির সামনে দাঁড়ালো। তার হাতে ছিলো ছুরি। সে উন্মাদ কণ্ঠে ঘোষণা করলো, আমি শিবদেবের চরণে আমার হৃদয় নজরানা দিচ্ছি। সে এমনিতেই স্বল্পবসনা ছিলো, এবার এক টানে পরনের রেশমী কাপড়টি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গেলো। নর্তকীর এ অবস্থা দেখে মন্দিরের সকল পূজা অর্চনা মুহূর্তের মধ্যেই থেমে গেলো।

নর্তকী হাতের ছুরিটি হঠাৎ তার বাম পাঁজরের নীচে সজোরে দাবিয়ে দিয়ে ডানে টান দিলো, মুহূর্তের মধ্যে তার পেট ফেঁড়ে গেলো এবং রক্তে নীচের দেহ ভেসে গেলো। কিন্তু কেউ তাকে বাধা দিলো না এবং মেয়েটিও পড়লো না। সে তার দু'হাত কাটা পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বললো- কোথায় আমার হৃদয়? আমার হৃদয় তোমরা দেখিয়ে দাও।

এক পুরোহিত দৌড়ে নর্তকীর কাছে পৌছলো। আর তখন নর্তকীর মাথা পুরোহিতের গায়ে ঢলে পড়লো। পুরোহিত নর্তকীর কাটা পেট ধরে তার মাথা নিজের কাঁধে নিয়ে নিলো। নর্তকীর হাত থেকে পড়ে যাওয়া ছুরিটি অন্য এক পুরোহিত নিজ হাতে নিয়ে নর্তকীর হৃদযন্ত্র কেটে হাত উপড়ে তুলে সমবেত জনতাকে দেখালো। পুরোহিত নর্তকীর হৃদপিণ্ডটি মূর্তির বুকে স্পর্শ করে শিবমূর্তির পায়ের কাছে রেখে ঘোষণা করলো, কেউ মনে করো না, সে সামান্য

নর্তকী ছিলো। নর্তকী হলেও তাকে শিবদেব কবুল করেছেন। সে মরেনি, তাকে শিবদেব পূনর্জন্ম দেবেন।

অন্য এক পুরোহিত নর্তকীর মরদেহ তুলে নিয়ে মন্দিরের একটি গোপন কক্ষে রেখে দিলো। আরেক নর্তকী পর মুহূর্তেই দৌড়ে মন্দিরের মূল বেদীতে এসে দাঁড়িয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ফেললো। পুরোহিত তখনো ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলো। নর্তকী এক ঝটকায় পুরোহিতের হাত থেকে ছুরিটি ছিনিয়ে নিয়ে আগের নর্তকীর মতোই এক টানে পেট চিরে পুরোহিতের কাছে আবেদন করলো, তার হৃদপিণ্ডও যেন শিবদেবের পায়ে রেখে দেয়া হয়। এই বলে নর্তকী ঢলে পড়ে ছটফট করতে লাগলো। এই অবস্থাতেই পুরোহিত নর্তকীর হৃদপিণ্ড কেটে শিবমূর্তির পায়ের কাছে রেখে দিল।

দুই নর্তকীর আত্মহুতির পর অন্য নর্তকীরা যে উত্তাল নাচ শুরু করলো, সেই নাচের মধ্যে নাচের তাল, লয়, মাত্রা ঠিক থাকলেও তা ছিল উন্মাদনা। দেখে মনে হচ্ছিল এটাই হবে এদের জীবনের শেষ নাচ। মনে হচ্ছিল নর্তকীদের মধ্যে জিন ভর করেছে। নয়তো কোন মানুষ এতো দীর্ঘ সময় এমন উত্তাল নাচে লিপ্ত থাকতে পারে না। অবশ্য এই নাচের আসরে নাচতে নাচতে কতোজন নর্তকী শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছিলো সেই পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। কিন্তু অনেকেই যে নিজেদেরকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছিলো তা নিশ্চিত।

একদিকে মন্দিরের উন্মুক্ত মঞ্চে ছিলো নর্তকীদের উন্মাত্তাল নাচ, বাদকদলের বিরামহীন বাজনা, অবিরাম মন্দিরের ঘণ্টার আর্তনাদ, অপরদিকে মন্দিরের মূলবেদীতে মূর্তির সামনে ছিলো দশ হাজার পুরোহিতের সমবেত ভজন। বস্তুত সব মিলিয়ে সোমনাথের সেই রাতটিকে ভক্ত পূজারী, পুরোহিত, সৈন্য আর শহরের অধিবাসীরা এক ভয়ঙ্কর কালো রাতে রূপান্তরিত করেছিলো।

মুহূর্তের মধ্যে গোটা শহরে এ খবর ছড়িয়ে পড়লো, দুই নর্তকী নিজ হাতে পেট চিরে তাদের হৃদপিণ্ড শিবদেবের পায়ে নজরানা দিয়েছে। শোনামাত্র গোটা শহরের নারীরা মন্দিরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো এবং ঘাতিনী দুই নর্তকীর দেহ থেকে ঝড়ে পড়া রক্ত আঙুলে নিয়ে নিজেদের কপালে তিলক দেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো।

সোমনাথ শহরের পুরুষেরা যখন তাদের স্ত্রী কন্যা-মাতাদের কপালে রক্তের তিলক দেখলো তখন তাদের উন্মাদনা ও ক্ষোভ আরো উস্কে উঠলো। যুদ্ধের খবর

সরকারি নির্দেশেই সারা শহরে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল। বারবার প্রচার করা হচ্ছিল, মুসলমানদেরকে শিবদেব নিশ্চিহ্ন করা জন্য এখানে টেনে নিয়ে এসেছেন। ভারত মাতার বুকে কোন ম্লেচ বেঁচে থাকতে পারবে না। শিবদেবের পূজারীগণ! ম্লেচদের টুকরো টুকরো করে সাগরে ভাসিয়ে দাও। খবরদার! হুশিয়ার! লড়াই করে যারা মারা যাবে, শিবদেব তাদের পুনর্জন্ম দেবেন।

* * *

উপমহাদেশে ইংরেজ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার পর এখানকার স্কুল কলেজ ও পাঠশালায় ইংরেজদের অনুমোাদিত হিন্দুদের লেখা মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ ইতিহাস পাঠ্য করা হয়। সেসব ইতিহাসে বলা হয়, সুলতান মাহমূদ সতেরো বার হিন্দুস্তানে অভিযান চালিয়ে ছিলেন এবং তার সর্বশেষ অভিযান ছিলো সোমনাথ। সোমনাথ মন্দিরের বড় বড় মূর্তিগুলো ছিলো ভেতরে ফাঁপা এবং ফাঁপা জায়গাগুলো বহু মূল্যবান হিরে জহরত ও মণিমুক্তায় ঠাসা ছিলো। সুলতান মাহমূদ বহু মূল্যবান মণিমুক্তা ও হিরে জহরতের জন্যেই সোমনাথ আক্রমণ করেছিলেন।

বস্তুত ইংরেজ ও হিন্দুরা সুলতান মাহমূদের ঈমানী চেতনা, দ্বীনের দাওয়াত ও জুলুমের অবসান ঘটিয়ে ভারতের অগণিত মানুষকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মর্যাদা ও সম্মানপূর্ণ জীবন উপহার দেয়ার, হিন্দু কুচক্রীদের মুসলিম বিদ্বেষ ও প্রজাপীড়ন উৎখাত, জুলুম অত্যাচার এবং সাধারণ মানুষকে পৌত্তলিকতার অভিশাপ থেকে বাঁচানো এবং শাসকদের গোলামীর উৎসভূমি মন্দিরগুলোকে ধ্বংস করার জন্যে বারবার তিনি হিন্দুস্তানে এসেছিলেন, ধনরত্ন লুটতরাজের জন্য নয়। কারণ এসব মন্দিরের পুরোহিত ও পণ্ডিতেরাই ছিল পৌত্তলিকতার উৎস এবং প্রজাপীড়নের নিকৃষ্ট হাতিয়ার।

ইংরেজ ও হিন্দুরা মুসলিম বীরপুরুষদের বীরত্ব, আদর্শ ও গৌরব গাঁথাকে ম্লান করার জন্যে মুসলিম শাসক ও বীরপুরুষদের চরিত্রে নানাভাবে কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টা করেছে। ইংরেজ ও হিন্দুরা আজো মুসলমানদের তৌহিদী চেতনা ও পৌত্তলিকতা বিরোধী ঈমানী শক্তিকে ভয় করে।

এদেশে ইংরেজরা আসার সাথে সাথে হিন্দুরা তাদের কর্তৃত্বকে মানসিকভাবে মেনে নেয়, অপরদিকে মুসলমানদের তুলনায় ইংরেজরা

হিন্দুদেরকেই বেশী সহায়ক মনে করে। আর মুসলমানদেরকে বৈরী শক্তি বলেই বিশ্বাস করতো। একারণেই হিন্দু ও ইংরেজরা মিলে সর্বশক্তি দিয়ে ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের কৃষ্টিকালচার, ঐতিহ্য, ইতিহাস, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুতেই নিষ্ঠুর হাতে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং বিকৃতি সাধনে লিপ্ত হয়।

সুলতান মাহমূদের সময়কার মুসলিম ইতিহাসবিদগণ বিশেষ করে আলবিরুনী, ফারিশ্‌তা প্রমুখ যে ইতিহাস লিখেছেন, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, তখনকার পরিবেশ, পরিস্থিতি, গযনী থেকে হিন্দুস্তানের দূরত্ব ও পথের দুর্গমতা বিচার করলে কোন অর্থ লোভী, যুদ্ধবাজ লড়াকুর পক্ষে কোন অবস্থাতেই এমন দুরূহ অভিযানে বের হওয়ার কথা নয়। কারণ সার্বিক পরিস্থিতি বিচার করলে গযনী থেকে সোমনাথে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত কোন বিবেকবান সেনানায়কের নেয়ার কথা নয়। এমন অভিযানে বের হতে পারে সেই যে হয়তো মানসিক ভাবে বিকারগ্রস্ত, উন্মাদ, বাস্তবজ্ঞানহীন অথবা অব্যাহত বিজয়ে আত্মহারা কোন আগ্রাসী শাসক, নয়তো সমরবিদ্যায় অতুলনীয় যোগ্যতার অধিকারী কোন দূরদর্শী জেনারেল।

সমর বিশেষজ্ঞরা সুলতান মাহমূদের সোমনাথ অভিযানকে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের রুশ অভিযানের সাথে তুলনা করেন। অতি মাত্রায় আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে নেপোলিয়ন রাশিয়া গিয়ে ফাঁদে আটকে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হন। সুলতান মাহমূদও দৃশ্যত সোমনাথ অভিযানে নিশ্চিত পরাজয় এবং সৈন্যদেরকে আত্মহুতির দিকেই ঠেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার অস্বাভাবিক দূরদর্শিতা, আদর্শিক দৃঢ়তা এবং সত্যিকারের বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্বের কারণে সেদিন গযনী বাহিনীকে নিশ্চিত নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে বিজয়ীর আসনে সমাসীন করেছিলেন কিংবদন্তী সুলতান মাহমুদ।

সুলতান মাহমূদ সোমনাথের ঐতিহাসিক মূর্তিকে ধ্বংস করে হিন্দুদের মিথ্যা চন্দ্রদেবতার কাহিনীকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করে তাওহীদের বাণী উচ্চকিত করা জন্যেই এই ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে বেরিয়েছিলেন।

মূলত সোমনাথের যুদ্ধ ছিল হিন্দুবাদ ও তাওহীদের মধ্যকার একটি চূড়ান্ত লড়াই। দুইটি জাতির আদর্শিক লড়াই। আদর্শিক লড়াই না হলে উভয় পক্ষ বিজয়ের জন্যে এভাবে জীবন বিলিয়ে দিতে পারতো না।

১০২৬ সালের ৭ জানুয়ারি মোতাবেক ৪১৬ হিজরী সনের ৫ যিলকদ শুক্রবার। রীতি অনুযায়ী অন্যান্য দিনের মতো ফজরের আযান ধ্বনীত হলো। গযনীর সেনারা নামাযের জন্য জামাতে শরীক হলো। সুলতান মাহমূদ নিজেও সেনাদের সাথেই এক ফাঁকে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন।

ইমাম সাহেব আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে গযনী বাহিনীর বিজয়ের জন্যে দুআ করলেন। নামাযের পর গযনীর সৈন্যরা সোমনাথের মন্দির কেন্দ্রিক দুর্গ অবরোধ করলো। এই অবরোধের মধ্যে ঐতিহাসিকদের মতো চমক সৃষ্টি করেছিলো গযনী সেনাদের সমন্বিত তাকবীর ধ্বনি। তাকবীর এতোটাই প্রাণবন্ত ও উচ্চকণ্ঠ ছিলো যে, গযনীর সেনাদের তাকবীর ধ্বনি সোমনাথ দুর্গে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিলো। গযনী সেনাদের প্রচণ্ড তাকবীর ধ্বনি শুনে দুর্গ প্রাচীরে হাজার হাজার হিন্দু এসে সমবেত হলো। হিন্দুরাও মুসলিম সেনাদের বিপরীতে জয়হিন্দু, জয় সোমনাথ, জয় শিবদেব বলে চিৎকার শুরু করলো।

সুলতান মাহমূদ এদিন কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে নির্দেশ করার পরিবর্তে অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে গোটা এলাকা পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং সেনাদের নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। তার একান্ত বার্তা বাহকদল তাকে অনুসরণ করছিলো এবং তার প্রতিটি নির্দেশ যথাযথভাবে উদ্দিষ্ট কমান্ডারের কাছে পৌছে দিচ্ছিলো।

অবরোধ আরোপের পর প্রথম সমস্যা দেখা দিল খাল। সোমনাথকে তিন দিকে ঘিরে রেখেছিলো সাগর আর এক দিকে ছিল স্থল। সেদিকে আবার গভীর খাল খনন করে একটি মাত্র পথ রেখে সোমনাথ দুর্গকে অজেয় করে রেখেছিল হিন্দুরা। এই খালই গযনী সেনাদের জন্যে কাল হয়ে দেখা দিল। কারণ দুর্গ প্রাচীর ও বুরুজের উপর থেকে গযনী বাহিনীর উপর তীরবৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল যাতে তারা একটি মাত্র স্থান দিয়ে খাল পার হতে না পারে।

সুলতান মাহমূদ খালের পাড়ে গযনী বাহিনীর হাজার হাজার তীরন্দাজকে দাঁড় করিয়ে দুর্গ প্রাচীরে অবস্থানরত হিন্দুদের প্রতি বিরামহীন তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। গযনী বাহিনীর কামানগুলো ছিল হিন্দুদের কামান অপেক্ষা বেশী শক্ত। তাদের নিক্ষিপ্ত তীর হিন্দুদের নিক্ষিপ্ত তীরের চেয়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়তো।

গযনী সেনাদের আকস্মিক তীব্র তীরবৃষ্টিতে দুর্গপ্রাচীরের হিন্দুরা জীবন বাঁচাতে মাথা নীচু করতে বাধ্য হলো। ফলে তাদের তীরের তীব্রতা হ্রাস পেলো।

এই সুযোগে গযনীর সেনারা উটের পিঠে করে নিয়ে আসা পাথরগুলো খালের মধ্যে নিক্ষেপ করছিল। এই ব্যাপারটি ছিল অনেকটা এক জায়গা থেকে মাটি এনে অন্য জায়গার নদী ভরাট করার মতো।

হিন্দুরা যখন দেখলো, তাদের প্রতিরক্ষা খাল গযনীর সেনারা ভরাট করতে শুরু করেছে, তারা জীবন উৎসর্গ করে গযনী বাহিনীর তীরের আঘাতের তোয়াক্কা না করে দুর্গ প্রাচীর থেকে গযনীর তীরন্দাজ ও পাথরবাহী সেনাদের উপর তীর নিক্ষেপের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। অবস্থা এমন হলো যে, মুসলিম তীরন্দাজদের তীর বিদ্ধ হয়ে শতে শতে হিন্দু দেয়ালের উপর থেকে পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু তাতেও হিন্দুদের তীর আক্রমণে কোন ভাটা পরিলক্ষিত হচ্ছিল না, মুহূর্তের মধ্যে সেই শূন্যস্থান অপর হিন্দুরা দখল করে নিচ্ছিল। হিন্দুরা মুসলমানদের ঠেকাতে জীবনের কোন পরোয়াই করছিল না। তারা গযনী বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হলো।

প্রতিরক্ষা খাল তখনো অর্ধেক ভরাট হয়েছে মাত্র। এমন সময় গযনীর তীরন্দাজ সেনারা লক্ষ্য করলো, হিন্দুদের বেপরোয়া তীরাঘাতে তাদের সহযোদ্ধা ভাইয়েরা নিহত হচ্ছে। তখন তাদের রক্ত টগবগিয়ে উঠলো এবং গযনীর তীরন্দাজরা প্রতিরক্ষা খালে ঝাপিয়ে পড়ে একে অন্যের হাত ধরে খালের অপর পাড়ে ঠাঁই করে নিলো। তারা জীবন বাজি রেখে একেবারে দুর্গপ্রাচীরের এতোটাই কাছে চলে গেলো যে দুর্গপ্রাচীরের উপরে দাঁড়ানো প্রতিটি ব্যক্তিকে আলাদা আলাদা ভাবে তারা সনাক্ত করতে সক্ষম। এমতাবস্থায় তারা জীবনের সর্বশক্তি দিয়ে হিন্দুদের প্রতি তীর নিক্ষেপ শুরু করলো।

গযনীর তীরন্দাজদের এই দুঃসাহসী ভূমিকায় শক্তি সঞ্চার করেছিল গযনী সেনাদের সম্মিলিত তকবীর ধ্বনি। গযনীর তীরন্দাজদের উপর ঠিক মাথার উপর থেকে শিলা বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল কিন্তু তারা তীরবিদ্ধ হয়েও প্রতিপক্ষের প্রতি বিরামহীন তীর নিক্ষেপ করেই যাচ্ছিল। মূলত তখন উভয় পক্ষের মধ্যে তীরযুদ্ধই হয়ে উঠেছিল মূল। হিন্দুরা চাচ্ছিল প্রতিরক্ষা খালকে কার্যকর রাখতে আর গযনী সেনারা চাচ্ছিল প্রতিরক্ষা খালটি ভরাট করে দুর্গে আক্রমণ ব্যবস্থাকে অবারিত ও সাচ্ছন্দময় করতে। যাতে তারা সহজে দুর্গ প্রাচীর পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারে, খালের প্রতিবন্ধকতা না থাকে।

এক পর্যায়ে খালের কিছুটা অংশ ভরাট হয়ে গেল। যাতে চারটি ঘোড়া একসাথে সমান্তরাল ভাবে খাল ডিঙাতে পারবে। ঠিক সেই সময় চারজন যোদ্ধা

হাতে কুড়াল নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে খাল পেরিয়ে দুর্গ প্রাচীরের দিকে ঘোড়া হাঁকাল। তাদের লক্ষ দুর্গ প্রাচীরের একটি ছোট ফটক।

তারা চাচ্ছিল দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেলে কুড়াল দিয়ে দরজা তারা ভেঙে ফেলতে পারবে। কিন্তু দু'জন দরজা পর্যন্ত যাওয়ার আগেই তীরবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল আর অপর দু'জন দরজা পর্যন্ত পৌঁছলো বটে কিন্তু দরজায় কুঠারাঘাত করার আগেই দুর্গ প্রাচীরের উপরে অবস্থানরত দ্বাররক্ষীদের বর্শার আঘাতে ধরাশায়ী হলো।

প্রতিরক্ষা খাল কিছুটা ভরাট ও ঘোড়া দৌড়ে যাওয়ার উপযোগী হওয়ায় বাধভাঙ্গা বানের মতো গযনীর সেনারা দুর্গ প্রাচীরের দিকে ধাবিত হলো। তাদের কারো কারো হাতে ছিলো দীর্ঘ মই। দেয়ালে মই ঠেকিয়ে যাতে দ্রুত গযনীর সেনারা দুর্গ প্রাচীরের উপর ওঠে যেতে পারে এজন্য তারা দুর্গ প্রাচীরের উচ্চতার সমান মই নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। আর এই মই বহনকারীদেরকে শত্রুসেনাদের তীরাঘাত থেকে রক্ষার জন্যে পেছন দিক থেকে গযনীর তীরন্দাজ সেনারা দুর্গপ্রাচীরে অবস্থানরত শত্রুসেনাদের প্রতি তীব্র তীর নিক্ষেপ করছিল যাতে তীর নিক্ষেপরত হিন্দুরা জীবন বাঁচাতে মাথা নীচু করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তীরন্দাজ হিন্দুরা মাথা নীচু করে তীর নিক্ষেপ বন্ধ করেনি। তারা একের পর এক তীর বিদ্ধ হচ্ছিল বটে কিন্তু গযনীর মইবাহী সেনাদের অগ্রগতি রোধ করার চেষ্টায় মোটেও ত্রুটি করেনি।

দৃশ্যত দুর্গ ফটক পর্যন্ত পৌঁছার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু এমতাবস্থায়ও কয়েকজন জানবাজ গযনী সেনা দুর্গফটকের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তারা দুর্গ ফটকের ফাঁক দিয়ে বুরুজে অবস্থানরত তীরন্দাজ ও দ্বাররক্ষীদের দিকে তীর নিক্ষেপ করার সুযোগও পেয়েছিল। এই সুযোগে কয়েকজন দেয়ালে মই দাঁড় করাতে সক্ষম হলো কিন্তু বিধি বাম। যেই মই বেয়ে দুর্গপ্রাচীরের উপরে উঠতে যাচ্ছে তাকেই তীর ও বর্শাবিদ্ধ হয়ে গড়িয়ে পড়তে হচ্ছে।

এদিকে যখন দুর্গপ্রাচীরে চড়ার চেষ্টা চলছিল, অপরদিকে সমুদ্রের পানিপথেও তখন গযনীর সেনারা দুর্গপ্রাচীরে চড়াও হওয়ার চেষ্টা করছিল। সমুদ্রের পানিপথেও চলছিল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। কারণ সোমনাথ দুর্গের দুই-তৃতীয়াংশই ছিল পানিবেষ্টিত। গযনীর একজন ডেপুটি সেনাপতি পানিপথের সুযোগ নিয়ে দুর্গ প্রাচীরের উপরে উঠার দুঃসাহসী উদ্যোগ নিয়েছিল। গযনী

সেনাদের কোন নৌকা ছিল না। কিন্তু দুর্গের পাশের সমুদ্র তীরে জেলেও সেনাদের শত শত নৌকা সারি সারি বাধা ছিল। গযনীর এক ডেপুটি সেনাপতি তার ইউনিট নিয়ে কিছু সংখ্যক মই নৌকায় তুলে জেলে মাল্লাদেরকে দুর্গ প্রাচীরের দিকে নৌকা চালানোর নির্দেশ দিল। কিন্তু গযনী সেনাদের এই উদ্যোগও দুর্গপ্রাচীরে পাহারারত হিন্দুসেনাদের চোখে পড়ে গেল। ফলে তারা আগুয়ান গযনী সেনাদের প্রতি দুর্গপ্রাচীরের উপর থেকে তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। তীর আসতে দেখে হিন্দু মাঝি মাল্লারা প্রাণ বাঁচাতে সাগরে ঝাপিয়ে পড়তে লাগলো। ফলে গযনী সেনাদের অনভ্যস্ততা সত্ত্বেও নৌকার হাল ধরতে হলো। সাগরেও শুরু হয়ে গেলো তীব্র লড়াই।

সেদিন ছিল জুমআর দিন। জুমুআর সময় প্রায় হয়ে যাচ্ছে। তখনও চলছে খাল ভরাটের কাজ। কারণ খাল যতোটা বেশী ভরাট করা যাবে, আক্রমণও পশ্চাৎপসারণের কাজটা ততোটাই সহজ হবে। এ সময় উভয় বাহিনীর সৈন্যরা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছিল। ঠিক জুমআর সময়ের আগে আগে সুলতান মাহমূদ হাত উঠিয়ে আল্লাহর কাছে বিশেষ মোনাজাত করলেন এবং মোনাজাত শেষ করে ঘোড়ায় চড়ে চিৎকার করে করে আক্রমণ আরো তীব্র করার জন্য সেনাদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। তিনি তার অবস্থান থেকে অনেক সামনে অগ্রসর হয়ে সেনাদেরকে উজ্জীবিত করার জন্যে চিৎকার করে সঙ্গ দিচ্ছিলেন।

এমন সময় হিন্দুরা দুঃসাহসের পরিচয় দিল। তারা একটি ফটক খুলে দিল। দুর্গের ভেতর থেকে অশ্বারোহীরা বর্শা হাতে নিয়ে বিদ্যুৎবেগে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে গযনী সেনাদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানলো। তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলো বটে কিন্তু মুসলমানদেরকে দুর্গপ্রাচীর থেকে দূরে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলো।

সুলতান মাহমূদ তার সেনাদের নির্দেশ দিলেন, খোলা ফটক দিয়ে দুর্গের ভেতরে ঢুকে যাও। নির্দেশ পেয়েই বহু যোদ্ধা এক সাথে দুর্গ ফটকের দিকে ঘোড়া হাঁকালো কিন্তু ভেতর থেকে এতো বিপুল পরিমাণ হিন্দু সেনা গযনী সেনাদের ঠেকানোর জন্য ফটক আগলে দাঁড়ালো যে তাদের পক্ষে ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব হলো না। দুর্গ ফটকের সামনেই দুই বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বেধে গেল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, অবস্থা এমন ছিলো যে, উভয় পক্ষের যোদ্ধারাই ছিলো মরা ও মারার জন্যে মরিয়া। গযনীর সেনারা শপথ করেছিলো 'হয় মৃত্যু

নয়তো বিজয়'। মুসলমানদের এই শপথের অগ্নিবাণ হিন্দুরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে রোধ করছিলো।

দুর্গের ভেতরে খবর ছড়িয়ে পড়লো, গযনীর সেনারা দুর্গের প্রধান ফটক খুলে ফেলেছে। খবর পেয়ে দুর্গ প্রাচীরে ছড়িয়ে থাকা তীরন্দাজ হিন্দুরা প্রধান ফটকের উপরে এসে সমবেত হয়ে নীচে মুসলমানদের লক্ষ্য করে তীরবৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করলো।

দুর্গপ্রাচীরে এ খবরও ছড়িয়ে পড়েছিলো, মুসলিম যোদ্ধারা দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। খবর শুনে দুর্গপ্রাচীরের উপরে থাকা সৈন্যরা নীচে নেমে এলো মুসলমানদের প্রতিরোধ করতে। অপর দিকে দুর্গ প্রাচীর খালি দেখে গযনী সেনারা দেয়ালে ঠেকিয়ে একের পর এক দুর্গপ্রাচীরে উঠতে শুরু করলো। এক পর্যায়ে দুর্গ প্রাচীরেও শুরু হয়ে গেলো দুই বাহিনীর মধ্যে হাতাহাতি লড়াই।

এদিকে মন্দিরেও খবর পৌঁছে গেলো, মুসলিম সেনারা দুর্গে ঢুকে পড়েছে। একথা শুনে যেসব পুরোহিত, ঠাকুর ও পণ্ডিত স্বাভাবিক পূজা-অর্চনা করছিলো, এরা সবাই মূর্তির পায়ে মাথা রেখে গড়াগড়ি করে রোদন করতে লাগলো। মন্দিরের প্রধান ফটক খোলা থাকার কারণে মুসলমানদের নারায়ে তাকবীর ধ্বনি মন্দিরের পূজারীদের কানে পৌঁছে গেল। পণ্ডিত পুরোহিতরা ছিলো ধর্মের কাণ্ডারী। এরা লড়াই করতে জানতো না। সুলতান মাহমূদ মন্দির ও মন্দিরের মূর্তি ধ্বংস করতেন কিন্তু কোন পূজারী বা পুরোহিতের গায়ে হাত তুলতেন না।

সোমনাথ মন্দিরের পণ্ডিত পুরোহিতদের কানে যখন গযনী সেনাদের তকবীর ধ্বনিত হতে লাগলো, তখন তাদের পূজার ধ্যান ছুটে গেলো। তখন হাজারো পুরোহিতের কিছু সংখ্যক পূজা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালো। তারা দেখলো নৃত্যরত নর্তকীদের নাচ থেমে গেছে। তাদের চেহারা ফ্যাকাসে তারা ভীত সন্ত্রস্থ। পণ্ডিতেরা যখন দেখলো তাদের জীবনের শেষ সময় এসে গেছে তখন নৃত্যত্যাগী সুন্দরীদের সাথে করে প্রত্যেকেই মন্দিরের গোপন প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়লো এবং তাদের সাথে আদিম উল্লাসে মেতে উঠলো। কিন্তু দুর্গের সাধারণ হিন্দুদের অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা পণ্ডিতদের এই পৈশাচিকতার বিন্দু বিসর্গও জানতো না।

সোমনাত দুর্গের সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে তেমন ভয়-ভীতি ছিলো না। পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মহিলারাও মুসলিম যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিলো। বৃদ্ধা মহিলারা সমবেত হয়েছিলো মন্দিরে। তারা মূর্তির

বেদিতে মাথা ঠেকিয়ে রোনাজারী করছিলো। তারা মুসলমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে দেবদেবীদের সাহায্য প্রার্থনা করছিলো।

* * *

দুর্গফটক খুলে দেয়ার চালটি ছিলো সোমনাথ দুর্গের রাজা রায়কুমারের। রাজা রায়কুমার ইতোমধ্যে অনেকটাই সফল হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, দুর্গফটক খুলে দিয়ে তিনি গযনী বাহিনীকে আরো বেশী পর্যুদস্ত করতে পারবেন। কিন্তু রায় কুমারের প্রতিপক্ষ ছিলেন তার চেয়েও আরো বেশী দূরদর্শী জেনারেল। যে কোন বিপর্যয় থেকেও শিক্ষা নিয়ে তাৎক্ষণিক বিপর্যয় ঠেকিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনার মতো পারদর্শী ছিলেন গযনীর সুলতান।

গযনীর সুলতান ও তার প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ দুর্গফটক খুলে দেয়ার সাথে সাথেই কিছু সেনাকে দুর্গফটকের উপরের বুরুজ ও মরিচায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারা সেখান থেকে কার্যকর ভাবে তীর নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয় তাদের সহায়তায় অন্য সেনারা মই বেয়ে দুর্গপ্রাচীরে উঠতে থাকে।

মহারাজা রায়কুমার এই অবস্থা দেখে বিপুল সংখ্যক সেনাকে দুর্গফটকের দিকে ঠেলে দিলেন। সংখ্যাধিক্য হওয়ায় তারা মানবঢাল তৈরী করে মুসলিম সেনাদেরকে দুর্গফটকের বাইরে ঠেলে নিয়ে গেলো। আর এ দিকে রাজার নির্দেশে দুর্গ ফটক বন্ধ হয়ে গেলো। এবার হিন্দু সৈন্যদের আর ভেতরে ফেরার কোন পথ থাকলো না। তারা সোমনাথের জন্য আত্মবিসর্জন দিতে লাগলো। একে একে সবাই মুসলিম যোদ্ধাদের হাতে নিঃশেষ হয়ে গেল।

দুর্গফটক বন্ধ করে দিয়ে সকল হিন্দু যেসব মুসলিম যোদ্ধা দুর্গ ফটকের উপরের বুরুজে অবস্থান নিয়েছিলো তাদের উপর হামলে পড়লো। এমতাবস্থায় প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গযনীর যোদ্ধারা লড়াই করে জীবন বিসর্জন দিলো। বুরুজ দখলকারী মুসলমানদের কাবু করার পর হিন্দুরা মই বেয়ে দুর্গ প্রাচীরে উঠে আসা বন্ধ করতে গযনী সেনাদের প্রতিরোধে লিপ্ত হলো। হিন্দুদের প্রবল তীর ও বর্শা বর্ষণের কারণে তারা একে অন্যের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগলো। দুর্গ প্রাচীরে আরোহণ সচেষ্ট মুসলিম সেনাদের কারো পক্ষেই জীবন নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব হলো না।

সুলতান মাহমূদ দেখলেন, সূর্য দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে চলে গেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তিনি আরো খেয়াল করলেন তার যোদ্ধাদের মধ্যে আহতের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। এমতাবস্থায় তিনি দুর্গ প্রাচীরের কাছে থাকা সেনাদেরকে পিছিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন এবং যুদ্ধে বিরতি ঘোষণা করলেন।

রাতব্যাপী সুলতান এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমালেন না। তিনি সেনাপতি ও কমান্ডারদের দিক-নির্দেশনা দিলেন। ঘুরে ঘুরে আহতদের চিকিৎসার খোঁজ খবর নিলেন এবং যেসব যোদ্ধা বহিঃশত্রুদের পথরোধ করার জন্য শিবির থেকে দূরে অবস্থান করছিলো তাদের সাথেও সাক্ষাত করলেন। মনে মনে তিনি কিছুটা চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। দৃশ্যত তার কাছে বিজয় সুদূর পরাহত মনে হচ্ছিল। কিন্তু তাতেও তিনি হতোদ্যম হলেন না। বস্তুত হতোদ্যম হয়ে রণেভঙ্গ দেয়ার ব্যক্তি তিনি ছিলেন না।

পরদিন সূর্য উঠার সাথে সাথেই নব উদ্যমে তিনি সেনাদেরকে দুর্গ প্রাচীরে আঘাত হানার নির্দেশ দিলেন। সেই সাথে সেনারা মই বেয়ে দুর্গ প্রাচীরে উঠার চেষ্টা করলো কিন্তু হিন্দুরা তাদের কোন চেষ্টাই সফল হতে দিলো না। সারাদিন চললো আঘাত প্রত্যাঘাত। কিন্তু কোন পক্ষেরই তেমন সফলতা এলো না। দিন শেষে সুলতান সেনাদের ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন।

* * *

১০২৬ সালের ৯ জানুয়ারি। মহারাজা রায়কুমার একটি দুঃসাহসী চাল দিলেন। তিনি ভোরের সূর্য উদিত হওয়ার আগেই দুর্গফটক খুলে দিলেন। খোলা দরজা দিয়ে দুর্গের ভেতর থেকে দু'টি সেনাদল বের হয়ে মুসলিম শিবিরে আঘাত হানলো। হিন্দুরা ভেবেছিলো, মুসলিম যোদ্ধারা হয়তো তখনো ঘুমিয়ে আছে, নয়তো প্রস্তুতিতে লিপ্ত রয়েছে। বস্তুত সময়টা ছিলো ফজরের নামাযের। গযনীর সেনারা নামায শেষ করেছিলো মাত্র। হিন্দুরা ছিলো অশ্বসজ্জিত পক্ষান্তরে গযনী সেনাদের পক্ষে অশ্বারোহণের জন্য ঘোড়ার কাছে যাওয়ার অবকাশ ছিলো না। এমতাবস্থায়ও সুলতান মাহমূদ দূতের মাধ্যমে খবর ছড়িয়ে দিলেন হিন্দু সেনাদেরকে ঘেরাও করে ফেল। হিন্দুরা অত্যধিক দুঃসাহস নিয়ে হামলে পড়েছিলো। তারা বুঝতে পারলো না তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলা হচ্ছে।

গযনীর একটি প্রহরী দল হিন্দু সেনাদেরকে মূল শিবিরে আঘাত হানার আগেই পথরোধ করে দাঁড়ালো। আর এদিকে হিন্দুদের উপর ডান ও বাম দিক থেকে প্রচণ্ড আঘাত হানা হলো। কিন্তু হিন্দুরা ছিলো মরিয়া। তারা মরণত্যাগী হয়ে লড়তে শুরু করলো ফলে তাদের পরাস্ত করতে মুসলিম সেনাদেরকেও ঘাম ঝরাতে হলো। অবশেষে কিছু হিন্দু সেনা ঘেরাও ডিঙিয়ে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হলো, আর তাদের জন্য পুনরায় খুলে গেলো দুর্গফটক। তারা ভেতরে চলে গেলো। কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধা পলায়নপর হিন্দুদের পিছু ধাওয়া করলে সুলতান তাদের নিষেধ করলেন। কারণ খোলা ফটক মুসলিম যোদ্ধাদের জন্যে মরণ ফাঁদে পরিণত হতে পারে।

হিন্দু সেনাদের দুঃসাহসিকতায় সুলতান মাহমূদকে তাঁর রণকৌশল পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করলো। হিন্দুদের মোকাবেলায় সুলতান মাহমূদ অত্যন্ত অভিজ্ঞ হলেও সোমনাতের হিন্দুদের রণকৌশল ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের নারীশিশু বৃদ্ধ আবাল বণিতা সকলেই ছিলো ধর্মীয় ভাবাবেগে উন্মাদ। হিন্দুদের আগ্রাসী তৎপরতায় যুদ্ধের পরিণতি নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন সুলতান। তিনি গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন। ঠিক এই মুহূর্তে তার কানে ভেসে এলো শোরগোলের আওয়াজ। এ ধরনের শোরগোলের সাথে সুলতান পরিচিত।

মুহূর্তের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন, অন্য একটি ফটক খুলে সোমনাথ দুর্গ থেকে দু'টি অশ্বারোহী দল ও একটি পদাতিক দল দ্রুতগতিতে ধেয়ে এসে গযনী সেনাদের উপর হামলে পড়েছে। কিন্তু এবার আর ডানবাম দিক থেকে হিন্দুদের ঘিরে ফেলার কৌশল অবলম্বনের কোন সুযোগ হিন্দুরা রাখেনি। কারণ, দুর্গ প্রাচীর ও বুরুজের উপর থেকে অসংখ্য তীরন্দাজ তাদের সহায়তা করছিলো যাতে গযনী বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলতে না পারে।

প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ ঘেরাও কাজে নিয়োজিত সেনাদের পিছনে সরে আসার নির্দেশ দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন হিন্দুসেনারা এগিয়ে এলে দুর্গ প্রাচীর ও তাদের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাবে। তখন দুর্গ প্রাচীরে অবস্থানরত তীরন্দাজদের তীরবৃষ্টির আওতামুক্ত হয়ে গযনীর সেনারা হিন্দুদের ঘেরাও করতে সক্ষম হবে এবং দুর্গ ফটক অতিক্রম করারও সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মহারাজা রায়কুমারের দেমাগ অস্বাভাবিক কৌশলী চাল দিচ্ছিল, তার প্রতিটি যুদ্ধ চালই ছিলো নিপুণ ও কার্যকর। রায়কুমার তার সেনাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তোমরা কোন অবস্থাতেই দুর্গপ্রাচীরের তীরন্দাজদের

আওতার বাইরে যাবে না। রায়কুমার আবু আব্দুল্লাহর চাল অকার্যকর করে দিলেন। হিন্দু সেনারা তাদের আওতার বাইরে এলো না।

হিন্দু সেনারা সামনে অগ্রসর না হয়ে ডানে বামে ছড়িয়ে পড়লো এবং অবরোধকারী সেনাদের উপর খণ্ড খণ্ড হামলা করতে লাগলো। হিন্দুরা অবরোধ ভাংতে এবং গযনী বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি বাড়ানোর প্রচেষ্টা করছিল। এক পর্যায়ে হিন্দুদের উত্তেজনা উন্মাদনায় রূপ নিলো। এমন সময় দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে গযনী সেনাদের কানে ভেসে এলো মহিলাদের চিৎকার। সোমনাথ দুর্গের হিন্দুমহিলারা তাদের যোদ্ধাদের আরো উত্তেজিত ও উৎসাহিত করতে সমস্বরে চিৎকার করে নানা ধ্বনি দিচ্ছিলো। তারা বলছিলো– 'সোমনাথের সুপুত্ররা! তোমরা ম্লেচদের কচুকাটা করে ফেলো, নয়তো এরা তোমাদের মাবোনদের অপহরণ করে নিয়ে যাবে। এদের নিঃশেষ করে ফেলো, না হলে আমাদের কারো রক্ষা নেই...।'

রণাঙ্গনের অবস্থা এতোটাই মুসলমানদের জন্যে শোচনীয় হয়ে পড়লো যে, সুলতান মাহমূদ কেন্দ্রীয় কমান্ড তার একান্ত বিশ্বস্ত কয়েকজন সেনাকর্মকর্তার কাঁধে ন্যস্ত করে একটি চৌকস বাহিনী নিয়ে নিজেই আক্রমণকারী হিন্দুদের প্রতিরোধে লিপ্ত হলেন।

ঐতিহাসিক আলবিরুনী ও আবুল কাসিম ফারিশতা লিখেছেন– এ সময় গযনী বাহিনীর জন্যে সবচেয়ে অসুবিধা সৃষ্টি করেছিলো দুর্গ প্রাচীর থেকে আসা তীর ও বর্শা। এ সময় সুলতান মাহমূদ নিজেকে এবং গোটা গযনী বাহিনীকে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। কারণ সুলতান মাহমূদের উপর শত্রুদের একটি তীরই গযনী বাহিনীকে পরাস্ত করার জন্যে যথেষ্ট ছিলো।

প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ সুলতানের এই বেপরোয়া অবস্থা দেখে দ্রুত একটি তীরন্দাজ ইউনিটকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা দুর্গ প্রাচীরের কাছাকাছি গিয়ে প্রাচীরের উপর অবস্থানরত তীরন্দাজদের নিশানা করে তীর নিক্ষেপ করতে থাক। তীরন্দাজরা যখন দেখতে পেল সুলতান মাহমূদ তার প্রতিরক্ষাব্যুহ ভেঙ্গে সম্মুক ভাগে আক্রমণ চালাচ্ছেন, তখন তারা জীবনের পরোয়া না করে একেবারে দুর্গ প্রাচীরের কাছে গিয়ে হিন্দুদের উপর প্রচণ্ড তীর চালাতে লাগলো। হিন্দুদের নিক্ষিপ্ত বর্শায় একের পর এক গযনীর তীরন্দাজ ধরাশায়ী হচ্ছিলো কিন্তু তবুও তাদের তীর নিক্ষেপে কোনরূপ বিচ্যুতি ঘটলো

না। অবস্থা এমন হলো যে, বাতাসে উভয় পক্ষের নিক্ষিপ্ত তীরে তীরে সংঘর্ষ ঘটতে লাগলো।

আবু আব্দুল্লাহর এই চালে এতটুকু কাজ হলো যে, দুর্গ প্রাচীরের হিন্দু তীরন্দাজদের লক্ষ্য সুলতান মাহমূদের দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরে গেলো। সেই সাথে গযনীর অন্য যোদ্ধারা যখন দেখলো, তাদের সহযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করছে, তীরন্দাজদের এই আত্মত্যাগে তারাও উজ্জীবিত ও শত্রুদের বিরুদ্ধে এমন উত্তেজিত হলো যে, কমান্ডারের নির্দেশের অপেক্ষা না করে নিজেরাই অগ্রগামী হয়ে দুর্গ প্রাচীরে অবস্থানরত হিন্দু সেনাদের প্রতি প্রচণ্ড তীর বর্ষণ করতে লাগলো। তীব্র তীর বৃষ্টিতে টিকতে না পেরে শত্রুসেনারা দুর্গ প্রাচীর থেকে নেমে যেতে শুরু করলো এবং বহু সংখ্যক হিন্দু সেনা তীরবিদ্ধ হয়ে দুর্গ প্রাচীরের বাইরে গড়িয়ে পড়লো।

এর ফলে যেসব হিন্দু সেনা দুর্গের বাইরে এসে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিলো তারা স্বগোত্রীয় তীরন্দাজদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো।

এদিকে সুলতান মাহমূদ তখনো বেপরোয়া ভাবে সামনের শত্রুসেনাদের কচুকাটা করতে ব্যস্ত। তার যেন আর কিছুর খবর নেই। প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ মুহূর্তের জন্যেও সুলতানের উপর থেকে দৃষ্টি সরাননি। তিনি সুলতানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন। সুলতান মাহমূদকে দৃশ্যত আবেগতাড়িত মনে হলেও তিনি মোটেও অসচেতন ছিলেন না, তীব্র লড়াইরত অবস্থায়ও তিনি এমনভাবে তার যোদ্ধাদের পরিচালনা করলেন যে, শত্রুসেনারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো।

আবু আব্দুল্লাহ যখন দেখলেন, হিন্দুসেনারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তখন তিনি একটি অশ্বারোহী ইউনিটকে দুর্গপ্রাচীরের দিক থেকে আক্রমণের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। দ্বিমুখী উপর্যুপরি আক্রমণে হিন্দুসেনারা হতোদ্যম হয়ে পড়লো। এতোক্ষণ তারা মুসলমানদের বিপর্যস্ত করে রেখেছিলো কিন্তু এখন গযনী সেনাদের হাতে কচুকাটা হতে লাগলো।

এদের মধ্যে যারা ঘেরাও ডিঙ্গাতে পেরেছিলো তারা দুর্গ ফটকের দিকে অগ্রসর হতে চাচ্ছিলো কিন্তু মহারাজা রায়কুমার এতোটা বোকা ছিলেন না যে, গুটিকয়েক সেনার জীবন বাঁচাতে তিনি ফটক খুলে দেয়ার মতো মারাত্মক ঝুঁকি নেবেন। কারণ তিনি দুর্গ প্রাচীরের উপরে সুরক্ষিত বুরুজে দাঁড়িয়ে রণাঙ্গনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এ মুহূর্তে প্রধান ফটক

খুলে দিলে প্লাবনের পানির মতো গযনী সেনারা দুর্গে প্রবেশ করবে, তাদেরকে কোন অবস্থাতেই ঠেকানো যাবে না। তিনি বের হয়ে যাওয়া সেনাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। যেসব হিন্দু সেনা এই অভিযানে শরীক হয়েছিলো তাদের কারো পক্ষেই আর দুর্গে ফিরে যাওয়া সম্ভব হলো না এবং জীবন নিয়েও পালিয়ে যাওয়ার অবকাশ পেলো না কেউ। সবাইকে গযনী বাহিনীর হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হলো।

সুলতান মাহমূদ কখনো নির্বিচারে হত্যার পক্ষে ছিলেন না। তিনি বিজয়ের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ছাড়া কোন শত্রু সেনাকে হত্যা করতেন না। কিন্তু এদিন হিন্দুদের কাবু করার সাথে সাথে প্রধান সেনাপতি সকল কমান্ডারের কানে এ খবর পৌঁছে দিয়েছিলেন, আমাদের কোন যুদ্ধবন্দীর দরকার নেই, সবাইকে হত্যা করে ফেলো। শত্রুদের যেখানে যে অবস্থায়ই পাও নিঃশেষ করে ফেলো।

কারণ এই পর্যায়ে গোটা যুদ্ধের অবস্থাই বদলে গিয়েছিলো। মরো এবং মারো এটাই হয়ে উঠেছিলো উভয় পক্ষের অঘোষিত লক্ষ্য। এমতাবস্থায় যুদ্ধবন্দীদের সামলানোর ব্যাপার একটি বাড়তি ঝামেলা হয়ে পড়তো। তখন শত্রুসেনাদের বন্দী করার চেয়ে তাদের তরতাজা ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্র বেশী প্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে উঠেছিলো। গযনী বাহিনী শত্রুসেনাদের পরাস্ত করে তাদের তাজাদম ঘোড়া ও অস্ত্রগুলো কব্জা করলো। যুদ্ধ যখন শেষ হলো তখন কোথাও শত্রু সেনাদের কাউকে আর দেখা গেলো না।

* * *

দিন শেষে রাতের বেলায় সুলতান মাহমূদ সকল সেনা কর্মকর্তা, কমান্ডার ও ডেপুটি কমান্ডারদের সমবেত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কি এর আগের কোন যুদ্ধে হিন্দুদেরকে এমন দুঃসাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখেছেন?

এদের আবেগ ও উন্মাদনা দেখেই বুঝা যায় সোমনাথ মন্দিরকে এরা কতোটা পবিত্র জ্ঞান করে। আমি আপনাদের সবাইকে একথা বলতে ডেকেছি, আপনারা নিজ নিজ ইউনিটের সেনাদের বলবেন, তোমরা হিন্দুসেনাদের আবেগ উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা দেখো এবং তা নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ করো।

আমি সেইসব সেনাদের মোবারকবাদ জানাচ্ছি, যারা আজ নির্দেশের অপেক্ষা না করে নিজেরাই উদ্যোগী ও অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে শত্রুসেনাদের কাবু

করেছিলো। আল্লাহ তাআলা তাদের এই সাহসী ভূমিকার যথার্থ প্রতিদান দেবেন। আমি চাই সেনাদের এই আবেগ ও উচ্ছ্বাসে যেন কোনরূপ ভাটা না পড়ে। আমি বলতে পারবো না, আগামীকাল কি ঘটবে, তাও বলতে পারবো না, যুদ্ধের পরিণতি কি হবে! তবে আমি আমার সেনাদের কাছে পয়গাম পৌঁছে দিতে চাই, আমরা যদি এ যুদ্ধে পরাজিত হই, তাহলে ভবিষ্যতের লোকেরা বলবে, হিন্দুদের দেবদেবীরাই সত্য, মানুষের জীবনমৃত্যু তাদেরই হাতে। ইসলাম আসলেই কোন সত্য ধর্ম নয়। ভবিষ্যত প্রজন্ম আমাদেরকে লুটেরা ও খুনী সন্ত্রাসী বলবে। আমাদেরকে জীবন দিয়ে হলেও ইসলামের সততা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই যুদ্ধকে আপনারা অন্য দশটি যুদ্ধের মতো মনে করবেন না। আগামী দিন হয়তো বিগত দিনের চেয়ে আরো রক্তক্ষয়ী হবে এবং আরো বেশী ধৈর্য ও সাহসের পরীক্ষা দিতে হবে। আপনাদেরকে ইতিহাস সৃষ্টি করতে হবে। এমন ইতিহাসের জন্ম দিতে হবে কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ যখনই গযনী বাহিনীর আলোচনা করবে সাথে সাথে আসবে সোমনাথের নাম। মানুষ বলতে বাধ্য হবে, গযনীর সিংহশাবকেরা সোমনাথের পাথরের মূর্তিগুলোকে তাদের পায়ে পড়তে বাধ্য করেছিলো।

এরপর সুলতান সেনাকর্মকর্তাদেরকে যুদ্ধ সম্পর্কে জরুরি দিক-নির্দেশনা দিয়ে বললেন– আমাদেরকে অতি দ্রুত এই যুদ্ধের ইতি টানতে হবে, কারণ আমাদের লোকবল ও রসদ দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। লোকবল ও রসদের ঘাটতি পূরণ করার মতো কোন ব্যবস্থা আমাদের নেই। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ যথেষ্ট দূরদর্শী ও সাহসী। অবশ্য তারা আমাদের উপর আক্রমণ না করে যদি আত্মরক্ষামূলক কৌশল নিতো আর অবরোধ প্রলম্বিত করতে বাধ্য করতো, তাহলে তাদের কোন জনবলই হারাতে হতো না, এক সময় রসদসামগ্রী নিঃশেষ হয়ে আমাদেরকে অভুক্ত থেকেই মরতে হতো। শত্রু বাহিনী এই কৌশলের আশ্রয় নেয়ার আগেই আমাদেরকে শহরে প্রবেশ করতে হবে। তবে আমরা আহত ক্ষুধার্ত বিড়ালের মতো নয় সিংহের মতো শহরে প্রবেশ করতে চাই।

এ রাতেও গযনী বাহিনীর কোন সদস্য ঘুমাতে পারেনি। সারারাত তারা রণপ্রস্তুতিতে কাটিয়েছে।

* * *

সেনা কর্মকর্তাদের বিদায় করার পর সুলতানকে জানানো হলো, এক বৃদ্ধ ঋষি এক তরুণীকে নিয়ে এসেছে। সে সুলতানের সাথে সাক্ষাত করতে চায়। ঋষি জানিয়েছে, তারা সোমনাথ মন্দির থেকে এসেছে।

সুলতান তাদেরকে ডাকালেন। তিনি ভেবেছিলেন, এরা মহারাজা রায়কুমারের কাছ থেকে কোন পয়গাম নিয়ে আসতে পারে, হয়তো যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব নিয়ে এরা আসতে পারে নয়তো কোন হুমকি ধমকি কিংবা চক্রান্তের বীজও এদের আগমনে থাকতে পারে। কাজেই এদের কাছ থেকে তা জানার জন্যেই সাক্ষাত হওয়া দরকার। ঋষি ও তার সঙ্গীনীকে সুলতানের সামনে পেশ করার আগেই তাদের দেহ তল্লাশী করা হয়েছে।

বৃদ্ধ ঋষির গায়ে ছিলো আজানু লম্বিত চৌগা। তার চুল মেয়েদের ন্যায় দীর্ঘ, দাড়ি ও গোঁফ ছিল লম্বা। সে ছিলো যথার্থই বয়স্ক, তার চুলদাড়ি শ্বেত শুভ্র। কিন্তু ঋষির চেহারায় ছিলো আভিজাত্যের ছাপ ও দীপ্তি। সাধারণত হিন্দুদের চেহারা এমন দীপ্তিময় হয় না।

সুলতান মাহমূদ ঋষির চেহারা ছবি দেখে মুগ্ধ হলেন। ঋষির সঙ্গী তরুণী ছিলো আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা। এক পর্যায়ে বৃদ্ধ ঋষি তরুণীর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে দিলেন। সুলতান মাহমূদ তরুণীকে এক পলক দেখলেন, তার মনে হলো, এমন সুন্দরী তরুণী দ্বিতীয়টি তিনি কখনো দেখেননি। সুলতানের দৃষ্টি অনুপম সুন্দরীর প্রতি হঠাৎ যেনো থমকে গেলো। চকিতে তরুণীর চেহারা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বৃদ্ধ ঋষিকে সুলতান জিজ্ঞেস করলেন– 'আপনি কেনো এসেছেন?' আপনাকে কি মহারাজা পাঠিয়েছেন? স্থানীয় একজন মুসলমান দুভাষীর মাধ্যমে ঋষির সাথে কথা বলছিলেন সুলতান।

আমি মহারাজার কাছ থেকে কোন পয়গাম নিয়ে আসিনি। দৃঢ়তার সাথে বললো বৃদ্ধ ঋষি। বৃদ্ধের কথার মধ্যে ভাবগাম্ভীর্য ও তীব্র সম্মোহনী শক্তি রয়েছে তা লক্ষ্য করলেন সুলতান। সুলতান তার প্রথম বাক্য থেকেই বুঝতে পারলেন, এই ঋষি কোন সাধারণ মানুষ নয়।

আমি মহারাজার পয়গাম নিয়ে আসিনি বটে তবে তার অনুমতি নিয়েই এসেছি। মহারাজাই চারজন অশ্বারোহী সহ আমাকে দুর্গ থেকে বের করে পথ বলে দিয়েছেন। অবশ্য আমি নিজের পক্ষ থেকে আপনার দরবারে একটি পয়গাম নিয়ে এসেছি। আমি সোমনাথ মন্দিরের পণ্ডিত নই। আমি প্রতি বছর পনেরো বিশ দিনের জন্যে এখানে আসি। আমার মূল ঠিকানা হিমালয়ের

পাদদেশে। সেখানে সারাবছর বরফ জমে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারো আমি যখন এখানে এসেছি ঠিক এর দু'দিন পরই আপনি এখানে এসেছেন, বললো ঋষি।

বিগত কয়েক দিনে আপনি দেখেছেন, সোমনাথ দুর্গের অধিবাসীরা কি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে আছে। এ কয়দিনে হওয়া আপনার ক্ষয়ক্ষতির দিকে একটু দৃষ্টি দিন। কত যোদ্ধাকে আপনার হারাতে হয়েছে! আসলে আপনার এই ক্ষয়ক্ষতির কারণ সোমনাথবাসীর ক্ষোভ ও জিঘাংসা নয় প্রকৃত পক্ষে সোমনাথ মন্দিরের মহাদেব-এর ক্ষোভই মানুষের রূপ ধারণ করে আপনার সেনাদের উপর আপতিত হয়েছে। যে দেবতার পা সাগরে আর মাথা আসমানে অধম সেই মহাদেব এর একজন খাস পূজারী।

আপনি কি আপনাদের দেবতা সম্পর্কে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন? আর এই তরুণীকে কি আপনাদের রীতি অনুযায়ী উপঢৌকন হিসেবে নিয়ে এসেছেন? মুচকি হেসে বললেন সুলতান।

নিজে নিজেকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলবেন না সুলতান। আমি আপনাকে ভয় দেখাতে আসিনি এবং কোন উপঢৌকন দিতেও আসিনি। আমি এসেছি আপনার উপকার করতে, আপনাকে মুক্তি দিতে। এ জন্য আমি একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

শিবদেব এর শক্তি সম্পর্কে আপনি জ্ঞাত নন। শিবদেব তার শক্তির সামান্য আমাকে দান করেছেন। আমার অর্জিত সামান্যটুকু এতোটাই নগণ্য যেমন সমুদ্রের মধ্যে এক ফোঁটা পানি কিংবা মরুভূমির একটি বালুর কণা। আপনি যদি চান তবে আমি এই কণা পরিমাণ অর্জিত শক্তির দাপট দেখাতে পারি। তা দেখলে আপনি শিবদেব-এর মহাশক্তির পরিমাণ আন্দাজ করতে পারবেন।

আর এই তরুণী? জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

এই তরুণী জীবিত নয় মৃত। এটি একটি মৃত আত্মার খাঁচা মাত্র। আপনাকে হয়তো কেউ এখনো জানায়নি, যারা মারা যায় তাদের সবার আত্মা সোমনাথে চলে আসে। এই আত্মাটি অনেক দূর থেকে এসেছিল। আমি এটিকে এখানে নিয়ে এসেছি। আপনি যদি বিশ্বাস না করেন, তবে আমি এটিকে বাতাসে ঝুলিয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে পারি।

একথা বলেই ঋষি তরুণীর মাথা তার হাতের তালুতে নিয়ে তরুণীর চোখে চোখ রেখে বিড়বিড় করে কি যেন বললো। এর সাথে সাথেই তরুণীর মাথা দুলতে লাগলো। এরপর ঋষি তরুণীকে পাজাকোলা করে উঁচিয়ে ধরে বললো, তুমি এখন পালঙ্কের উপর শুয়ে আছো। দু'পা ও মাথা সোজা করে শুয়ে পড়ো। তরুণীর দু'পা এমন ভাবে সোজা হয়ে গেলো যেন সে পালঙ্কের উপর শুয়ে আছে। এ পর্যায়ে ঋষি তার দু'হাত তরুণীর দেহের নিচ থেকে সরিয়ে ফেললো। বিস্ময়কর ভাবে তরুণী শূন্যে ভাসতে লাগলো। ঋষি এবার তরুণীর উড়না দিয়ে তাকে আপাদমস্তক ঢেকে দিলো।

সুলতান মাহমূদের দুই প্রহরী তাঁবুর দরজার ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিলো। ঋষি তাদের একজনকে হাতের ইশারায় নির্দেশ দিলো, তরবারী বের করে তরুণীর পেটে এমনভাবে আঘাত করো যাতে মেয়েটি দুভাগে ভাগ হয়ে যায়।

প্রহরী ঋষির নির্দেশ বুঝতে পেরে সুলতানের দিকে তাকালো। কারণ সুলতানের নির্দেশ ছাড়া তার পক্ষে কিছু করার অবকাশ ছিলো না। সুলতান চোখের ইশারায় বললেন, ঋষি যা বলছে করো।

প্রহরী তরবারী কোষমুক্ত করে পূর্ণশক্তিতে আঘাত করলো। কিন্তু কিছুই কাটলো না। তরবারীর আঘাতে শুধু কাপড়টি গিয়ে তরবারী সাথে মাটিতে ঠেকলো। অবাক করার মতো তরুণীর দেহাবয়বের কোন অস্তিত্ব চাদরের ভেতরে ছিলো না।

এই অবস্থা দেখে বিস্ময়ে প্রহরীর চোখমুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো। কিন্তু সুলতান তা দেখে মুচকি হাসলেন।

এখানে কোন দেহ ছিলো না। বললো ঋষি। এটি ছিলো আত্মা। তরবারী দিয়ে আপনি দেহ কাটতে পারেন কিন্তু আত্মা দেহাতীত, আত্মাকে কাটা যায় না। মহামান্য সুলতান! আপনি যদি চান তাহলে অল্প সময়ের জন্যে আমি আপনাকেও আত্মার জগতে পাঠিয়ে দিতে পারি, যেখান থেকে এই তরুণীর রূহ এসেছে।

ঐতিহাসিক ইবনুল জাওযী ও ইবনে যফির তৎকালীন দু'জন ঐতিহাসিকের বর্ণনা উল্লেখ করে লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ একবার তার আধ্যাত্মিক গুরু শায়খ আবুল হাসান কিরখানীর দরবারে উপস্থিত। শায়খ তাকে বললেন, হিন্দুস্তান যাদুগীর ও সাধু সন্ন্যাসীদের স্বর্গভূমি। এমন যেনো না হয় যে, আপনার

যেসব সেনাপতি ও কর্মকর্তা হিন্দুস্তানের বিজিত এলাকায় বসবাস করে তারা যাদুগীর ও সাধু সন্ন্যাসীদের হাতে বন্দী হয়ে পড়ে। হিন্দুরাও ইহুদী খ্রিস্টানদের মতো মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সুন্দরী ললনাদের ব্যবহার করে। মাকড়সা যেমন মশা মাছিকে তার জালের ফাঁদে আটকে হত্যা করে হিন্দুরাও সুন্দরী রূপসীদের ফাঁদে ফেলে মুসলিম ক্ষমতাবানদের নিঃশেষ করে ফেলে।

সুলতান মাহমূদ নিজেও ছিলেন তীক্ষ্ণধী আলেম। আলেমদের সাথে ছিলো তার গভীর সখ্য ও হৃদ্যতা। তিনি নিজেও হিন্দুস্তান সম্পর্কে গভীর পড়শোনা করেছেন। তাছাড়া অসংখ্য যুদ্ধে হিন্দুস্তানের বহু শিক্ষিত লোককে যুদ্ধবন্দী করে তিনি গযনী নিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের কাছ থেকেও প্রচুর তথ্য তিনি আত্মস্থ করেন। হিন্দুস্তানীদের অনেক যাদুটোনার ক্ষমতা ও যোগীদের সাধনার ফলাফল দেখে তিনি বিস্ময়াভিভূত হতেন। বিশ্বাস করাই কঠিন হতো কোন মানুষ এতোটা ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে! তিনি হিন্দুস্তানী যোগীদের সাধনার এমন ঘটনাও শুনেছেন, কোন কোন যোগী নাকি আধা ঘন্টা পর্যন্ত নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিয়ে সারা শরীরের রক্তপ্রবাহ ও হৃদকম্পন স্তব্ধ করে দিতে পারে। দীর্ঘ সময় পরে আবার দেহে প্রাণ ও হৃদকম্পন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। যোগবাদ প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরনো সাধনা। যোগীরা যোগবাদ দিয়ে অসুস্থ মানুষকে যেমন সুস্থ করতে পারে আবার সুস্থ লোককেও অসুস্থ বানিয়ে ফেলতে পারে।

ঋষি তরুণীকে দৃশ্যত গায়েব করে দিয়ে সুলতানকেও কিছুক্ষণের জন্য আত্মার জগতে পাঠানোর উদ্দেশ্যে তার দিকে অগ্রসর হলো। সুলতান মুচকি হেসে হাতের ইশারায় তাকে থামতে বললেন। ঋষি তাতেও না দমলে এক প্রহরী ঋষিকে ধরে থামিয়ে দিল। এ সময় দুভাষী ঋষিকে বললো, সুলতানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ শোভনীয় নয়।

সুলতান দু'ভাষীর উদ্দেশ্যে বললেন, ঋষিকে বলে দাও, সে তো সামান্য সময়ের জন্য আমাকে রূহের জগতে পাঠাতে পারে কিন্তু আমি সব সময়েই রূহের জগতে বিচরণ করতে পারি। আর এই তরবারী দিয়ে যদি আমি ঋষির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি তবে ঠিকই তরুণীর দেহ দৃশ্যমান হয়ে যাবে। তাকে বলে দাও, এক্ষুণি যেন তরুণীকে দৃশ্যমান করে। আমি এখানে যোগীদের খেলা দেখতে আসিনি।

এরপর বৃদ্ধ ঋষি তরুণীর উড়নাটি দু'হাতে নিয়ে একটি ঝাড়া দিয়ে দু'হাত প্রসারিত করলে চাদরটি দীর্ঘায়িত হলো আর তরুণী এর আড়াল থেকে দৃশ্যমান

হয়ে উঠলো। তরুণীর চোখে মুখে আবেশমাখা। সুলতান ঋষিকে তাঁবুর বাইরে নিয়ে যেতে প্রহরীদের নির্দেশ দিলেন। প্রহরীরা ঋষিকে ধরে তাঁবুর বাইরে নিয়ে গেলো।

ঋষিকে তাঁবুর বাইরে নিয়ে যাওয়ার পর সুলতান দুভাষীর মাধ্যমে তরুণীকে জিজ্ঞেস করলেন, এই বুড়ো কেন তোমাকে নিয়ে এখানে এসেছে, তা পরিষ্কার বলে দাও। যদি না বলো, তাহলে তোমাকে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে।

তরুণী একথা শুনে দীর্ঘ সময় সুলতানকে পর্যবেক্ষণ করলো এবং কিছুটা বিস্ময় ও আতঙ্কভাব তার চেহারায় ফুটে উঠলো। অতঃপর বললো–

আমাকে বলা হয়েছে, আপনি মুসলমানদের বাদশা...। আপনি কেমন বাদশা? আমাকে হাতে পেয়েও আপনি আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছেন; অথচ আামি এমন এক তরুণী যাকে হাত ছাড়া করতে চায় না কোন রাজা-মহারাজা। আপনি জানেন না, আামি রাজা মহারাজাদের কাছে কি মূল্যবান রত্ন?

দেখো, আমি যে জন্যে সোমনাথ আক্রমণ করেছি এ সম্পর্কে আমি মোটেও অসতর্ক নই। আমি জানি আমার মিশন কিভাবে সফল করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে কি কি বাধা বিপত্তি আসতে পারে। তরুণীর উদ্দেশ্যে বললেন সুলতান।

আমি তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি, এই বুড়োকে কি পাঠানো হয়েছে, না সে নিজের ইচ্ছায় এখানে এসেছে? তোমার রূপ সৌন্দর্য আর তোমার রূপের কূটনীতিতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। হিন্দু রাজাদের মতো আমরা মদ-নারীতে আসক্ত নই। আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না। তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও, তাহলে তোমাকে সসম্মানে ফেরত পাঠানো হবে।

তরুণী দুভাষীর দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি বাইরে চলে যান। দুভাষী সুলতানকে বললো, তরুণী আমাকে বাইরে চলে যেতে বলছে।

একথা শুনে সুলতান রাগত ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি যদি এখানে মরতে এসে থাকো, তাহলে এক্ষুণি আমি তোমার মৃত্যুর ব্যবস্থা করছি। তবে এই মৃত্যু তরবারীর আঘাতে হবে না, তোমার দু'পা দু'টি ঘোড়ার সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে আর ঘোড়াকে দুর্গ ফটকের দিকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। দুর্গ ফটক পর্যন্ত যাওয়ার আগেই তোমার দেহ দুভাগ হয়ে যাবে আর হাড় থেকে মাংস খসে খসে পড়বে।

একথা দুভাষীর মাধ্যমে শোনার পর তরুণী আতঙ্কিত হয়ে পড়লো এবং বললো, তাকে সোমনাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মহারাজার কাছে নিয়ে যায়, মহারাজা তাকে এই বৃদ্ধ ঋষির সাথে আসতে এবং তার নির্দেশ মেনে চলার হুকুম করেন। আমাকে বলা হয়েছে, তোমরা যদি গযনী সুলতানের তাঁবু পর্যন্ত যেতে পারো তাহলে ঋষি ঋষির কাজ করবে, তোমার কাজ হবে রূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ করে নিজেকে সুলতানের জন্য মেলে ধরা। সুলতান যেহেতু পুরুষ তাই সে নিশ্চয়ই মদ ও নারীভোগ করে থাকে। সুলতানকে রূপের যাদুতে আটকে তার পানীয়ের মধ্যে আংটির টোপের ভেতরের বিষয় মিশিয়ে দেবে। তরুণীর ডান হাতের মধ্যমায় একটি স্বর্ণের দৃষ্টিনন্দন আংটি ছিলো। সে এটির টোপ খুলে দেখালো এর ভেতরে সামান্য তুলা আছে, যাতে রয়েছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিষ। এই বিষই সুলতানের পানীয়ের মধ্যে মেশানোর কথা ছিলো।

দুর্গের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে সে বললো, মন্দিরে এক দিকে চলছে নর্তকীদের নাচ ও আরাধনা আর অপর দিকে পুরোহিত পণ্ডিতেরা মন্দিরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নর্তকী ও সেবাদাসীদের নিয়ে তাদের সাথে পাশবিকতায় মেতে উঠেছে; আর বলছে, শিবদেব তোমাদের ইজ্জতের নজরানা চাইছেন। অধিবাসীদের সম্পর্কে তরুণী বললো, প্রতিটি নাগরিকই শহর ও মন্দির রক্ষার জন্যে তাদের জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত কিন্তু দুঃসাহসী হলেও তাদের মধ্যে এখন আতঙ্কও বিরাজ করছে।

আমি এই মন্দিরের সবচেয়ে দামী সেবিকা। আমাকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। দেখতেও আমি সবচেয়ে সুন্দরী। সাধারণ হিন্দুরা এই মন্দির, পণ্ডিত ও আমাকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে। কিন্তু আমি জানি এই মন্দির, সেবাদাসী ও পুরোহিত পণ্ডিতেরা কতোটা পবিত্র। আমার কোন রীতি ধর্ম নেই। আপনি আমাকে যৌনদাসীরূপে গ্রহণ করুন। এ মুহূর্তে আপনার কাছে এটাই আমার প্রত্যাশা ও নিবেদন। আমি জীবন দিয়ে আপনার সেবা করবো কারণ প্রভুর সেবা ও মনোরঞ্জন আমার ধর্ম। আমার আর কোন ধর্ম নেই।

সুলতান মাহমূদ তরুণীর সাথে কথা আর দীর্ঘ না করে বৃদ্ধ ঋষিকে তাঁবুর ভেতরে ডেকে এনে বললেন, আমি বিগত পঁচিত বছর ধরে হিন্দুস্তানে আসা যাওয়া করছি। তুমি কি বুঝতে পারোনি, আমি হিন্দুস্তানের যোগী সন্ন্যাসীদের যাদুটোনা ও যোগসাধনা সম্পর্কে অনবহিত নই। আমি তোমাদের মতো মাটির নিষ্প্রাণ মূর্তির পূজারী নই ঋষি! আমি একটি পবিত্র ধর্মের অনুসারী। আমরা ধর্ম

ও রাজত্ব রক্ষার্থে আমাদের মা বোনদের ইজ্জতের সওদা করি না বরং যে কোন নারীর সম্ভ্রম রক্ষার্থে আমরা জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করি না। আমরা তোমাদের মতো আমাদের তরুণীদের উলঙ্গ করে নাচাই না এবং শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করতে মা-বোনদের শত্রু শিবিরে প্রেরণ করি না।

কার ধর্ম সত্য আর কোন ধর্ম অসত্য আমি এখানে এই নিয়ে বিতর্ক করতে আসিনি সুলতান! দৃঢ়কণ্ঠে বললো ঋষি। আমাদের মেয়েরা ধর্মের জন্য নিজেদের জীবন ও ইজ্জত কুরবান করে দেয় এটা আমাদের ধর্মের শিক্ষা। আপনার চেয়ে আমার বয়স ঢের বেশী সুলতান। আপনি আপনার সেনাবাহিনীর দিকে তাকিয়ে দেখুন না, তারা প্রত্যেকেই কি আপনার মতোই ঈমানদার? আপনি কি তাদের ঈমান রক্ষার জন্য সব সময় তাদের পাশে থাকবেন?

আপনার অবর্তমানে ঠিকই আমাদের তরুণীরা আপনার সেনাদের ঈমান তাদের রূপ জৌলুসে কিনে নেবে।

আমি যে উদ্দেশ্যে এসেছিলাম, আমার পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। তাই জীবনের শেষ লগ্নে আপনাকে কিছু সত্য কথা বলে দিচ্ছি। আপনি একদিন থাকবেন না, কিন্তু আমাদের তরুণীরা থাকবে, তারা ঠিকই ইজ্জতের বিনিময়ে আপনার লোকদের দাসে পরিণত করবে। কারণ তাদেরকে আমরাই এ শিক্ষা দিয়ে থাকি। আপনি আমাকে হত্যা করে ফেলুন, এই তরুণীকেও মেরে ফেলুন বা আপনার যৌনদাসী রূপে রেখে দিন। একথা বাস্তব, হিন্দুরা ভারত মাতার কোলে ইসলামের উত্থান ঠেকাতে যা যা করণীয় এর সবকিছুই করবে। এক সময় ঠিকই ভারতের সীমানা থেকে ইসলাম বিতাড়িত হবে।

সুলতান মাহমূদ বৃদ্ধ ঋষির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। তার মধ্যে না ছিলো ক্ষোভের লক্ষণ না ছিলো উদ্বেগ। তিনি স্মিত হাসছিলেন। বৃদ্ধ ঋষি বললো, মৃত্যুর আগে আমি আপনাকে মহারাজা রায়কুমারের একটি প্রস্তাব পেশ করছি। মহারাজা রায়কুমার বলেছেন, আপনার যতো ধন- দৌলত সোনা দানা ও এমন সুন্দরী দরকার সবই আপনার তাঁবুতে পৌঁছে দেয়া হবে যদি আপনি যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে ফিরে যান। আমি আপনাকে এই প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছি, আপনার ফিরে যাওয়ার পথে আমাদের কোন সেনা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। যদি আমার প্রস্তাব আপনার মনোপুত না হয় তবে আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে আরো তিন মহারাজার সৈন্যসামন্ত এখানে এসে পৌঁছে যাবে, তারা আপনাদের উপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবে, তখন হিন্দু সমরশক্তি ও সোমনাথের মাঝখানে আপনি দু'দিকের

আক্রমণে ফেঁসে যাবেন। তখন হয়তো আপনার বাহিনীর কি পরিণতি হয়েছিলো এ খবরটি গযনীবাসীকে জানানোর জন্যেও আপনার কোন সেনা জীবন নিয়ে পালাতে পারবে না।

চুপ কর! হিন্দুস্তানের কুত্তা...! ভাবভঙ্গিতে ঋষির কথা অনুধাবন করে গর্জে উঠলো এক প্রহরী এবং সে উত্তেজিত হয়ে তরবারী বের করে ফেললো।

সুলতান মাহমূদ হাতের ইশারায় প্রহরীকে শান্ত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, 'আরে! একি করছো তুমি! এই বৃদ্ধ আমাদের বন্দী নয়, মেহমান। সে রাজার দূত হয়ে এসেছে।

সুলতান ঋষিকে বললেন, মাফ করবেন জনাব, আমার এই সৈনিক আপনার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছে, এজন্য আমি আপনার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি।

আমাদের কোন মহারাজার সামনে যদি এমন গোস্তাখী করা হতো, তাহলে এমন ঔদ্ধত্যের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হতো। বললো বৃদ্ধ ঋষি।

'আমরা এ মুহূর্তে আমাদের মহান প্রভু আল্লাহর দরবারে রয়েছি, বললেন সুলতান। এখানে কেউ কারো প্রভু কিংবা প্রজা নয়। তাই কেউ কাউকে হত্যা করার অধিকার রাখে না। এই সৈন্যরা আমার নির্দেশে এখানে আসেনি, আল্লাহর নির্দেশে এসেছে। আমাকে শুধু এদের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমি তাদের আবেগ, ক্ষোভ ও উল্লাসকে শিকল বন্দী করতে পারি না।

একথা বলতে বলতে সুলতান দাঁড়িয়ে এক প্রহরীকে বললেন, এই বৃদ্ধ ও তার সঙ্গী তরুণীকে পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে দুর্গের প্রধান ফটকের কাছে পৌঁছে দিয়ে আস। যাওয়ার সময় সুলতান ঋষির উদ্দেশ্যে বললেন, রাজাকে গিয়ে বলবেন, সোমনাথকে একটি নষ্ট নর্তকী আর এক বুড়ো যোগী ও কিছু সোনাদানার বিনিময়ে রক্ষা করা যাবে না। আমরা এখান থেকে জীবন নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে আসিনি। ঋষি বাবু, আপনার এই নষ্টা মেয়েটিকে নিয়ে যান।

বৃদ্ধ ঋষি দীর্ঘক্ষণ এক পলকে সুলতানের দিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ সে সামনে অগ্রসর হয়ে সুলতানের ডান হাত ধরে চুমু খেয়ে বললো– আমি দিব্যি সুলতানের বিজয় দেখতে পাচ্ছি। একথা শেষ করেই সে দ্রুত মেয়েটিকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল।

* * *

সোমনাথের বিজয়ের ঘটনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করলে হাজার পৃষ্ঠা লেগে যাবে। হিন্দুরা জীবন সম্পদ করার পাশাপাশি চক্রান্তমূলক বহু অপচেষ্টা করেছে গযনী বাহিনীর সেনাদের বিভ্রান্ত করতে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এ যুদ্ধে গযনী সেনারা যে দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা ইতিহাসে বিরল। এছাড়া সুলতান মাহমূদের সোমনাথ অভিযানের তুলনা ইসলামের ইতিহাসের দু'একটির সাথে তুলনা করা চলে। মহাভারতের ইতিহাসে এটি ছিলো একটি অতুলনীয় স্মরণীয় যুদ্ধ। কিন্তু হিন্দু-ঐতিহাসিকগণ এই যুদ্ধকে গুরুত্বহীন করতে খুব কাটছাট করে তা বর্ণনা করেছেন।

যে রাত সুলতানের কাছে বৃদ্ধ ঋষি এসেছিলো, সুলতান মাহমূদের জীবনে সেই রাতটি ছিলো একটি স্মরণীয় রাত। তার কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছিলো, ইতোমধ্যে দুই হিন্দু মহারাজার সৈন্য মুসলিম বাহিনীকে ঘেরাও করার জন্যে অগ্রসর হচ্ছে। সুলতান সারারাত তার কমান্ডার ও সেনাদেরকে দুর্গ প্রাচীরে কার্যকর হামলার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

সুলতান বাইরের আক্রমণ আশঙ্কায় আগেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছিলেন কিন্তু তিনি অবাক হলেন, এই দুইটি বাহিনী এতোটা নীরবে কি করে এতোটা কাছে পৌঁছে গেলো!

সুলতান তার দূরদর্শিতায় হিন্দুদের আক্রমণ কৌশল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈকে বললেন, এখন হামলা করবেন না, আমদের পেছন দিক থেকে যখন আক্রমণ হবে তখন ভেতরের সৈন্যরা ফটক খুলে বেরিয়ে এসে আমাদের উপর আক্রমণ করবে, আপনি দু'বাহুকে যথাসম্ভব ছড়িয়ে দিন। ফটক খুলে যেতেই ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করতে হবে।

পিছন দিক থেকে আসা দু'মহারাজার সেনাদের মধ্যে এক দলের নেতৃত্বে ছিলেন মহারাজা পরমদেব। কোন কোন ঐতিহাসিক তার নাম ভ্রম্মদেব লিখেছেন আর অপরজন ছিলেন দেবআশ্রম।

পিছন দিকের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে যে সেনা ইউনিট সুলতান মাহমূদ নিয়োগ করেছিলেন, তার নেতৃত্বে ছিলেন সেনাপতি আবুল হাসান। এক পর্যায়ে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে সুলতান তাদের কাছে পৌঁছলেন। তখন অবস্থা খুব সঙ্গীন। সুলতান সেনাপতিকে বললেন, মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়িয়ে দুই বাহু দিয়ে আক্রমণ করো। সুলতান একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তখন উভয় দিকে সৈন্যরা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে গেছে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে অশ্বারোহী সৈন্যের ঘোড়া। গযনী সেনাদের নারায়ে তাকবীরে জমিন কাঁপছে।

এদিকে হামলা হতেই সোমনাথ দুর্গের প্রধান ফটক খুলে গেলো। বহু সংখ্যক সেনা দুর্গ থেকে বের হয়ে অবরোধকারীদের উপর একসাথে হামলে পড়লো। এবার হিন্দুরা নয় গযনী সেনারা ঘেরাও হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সুলতানের চেহারা মলিন হয়ে গেল। কারণ উভয় রাজার সৈন্যরা তাদের বাহুতে আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলো। দ্রুতই তারা কৌশল বদল করে নিতে সক্ষম হলো।

অবস্থা এমন হলো যে, এটাকে কোন গতানুগতিক যুদ্ধ বলার অবকাশ ছিলো না। রীতিমতো একটা ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞ। উভয় দিকের সৈন্যরাই হতাহত হচ্ছিল। জীবন দিতে আর জীবন নিতেই যেনো উভয় সেনাদল মরিয়া হয়ে পড়লো। অবশ্য প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ এমন অবস্থাতেও সাফল্যের সাথেই দুর্গ থেকে আসা হিন্দুসেনাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করছিলেন। এভাবে চলে গেলো দিনের অর্ধেক। সুলতান দেখলেন তার কোন চালই আশানুরূপ ফলপ্রসূ হচ্ছে না। দৃশ্যত গযনী বাহিনীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে। কারণ হিন্দু সেনারা একেতো তাজাদম তদুপরি তারা নিত্য নতুন সৈন্য দিয়ে ঘাটতি পূরণ করে নিচ্ছে।

যুদ্ধের অবস্থা যখন চরম হতাশাজনক ঠিক এমন সময় সুলতান লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নীচে নেমে দু'রাকাত নফল নামায পড়লেন। এমনটি তিনি এবারই প্রথম করেননি। আরো বহু বার করেছেন এবং নামাযের পরই যুদ্ধের পরিস্থিতি বদলে যেতে দেখা গেছে। এবারও তিনি দু'রাকাত নামায পড়লেন। নামাযে তার দু'চোখ গড়িয়ে পড়লো অশ্রু। সেনাপতি আবুল হাসান তার কাছেই দাঁড়ানো। সুলতান নামায শেষ করে সেনাপতি আবুল হাসানের হাত ধরে উচ্ছাসের সাথে বললেন, "আবুল হাসান! বিজয় আমাদের!" তিনি আবুল হাসানকেও অশ্বারোহণ করার কথা বলে গযনী বাহিনীর পতাকা আরো উঁচু করে ধরার নির্দেশ দিয়ে নিজে সাধারণ সৈনিকের মতোই লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে গেলেন। সেনারা তখন চিৎকার দিয়ে একে অপরকে জানিয়ে দিলো, গযনীর যোদ্ধারা! সুলতান নিজে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছেন, এগিয়ে যাও, মুশরিকদের কেটে ফেলো।

অন্যান্য যুদ্ধের মতো সুলতান হাতে তরবারী নেয়ার পর যুদ্ধের কায়া বদলে গেল। ঐতিহাসিক ফারিশতা লিখেছেন, সুলতান মাহমূদের নেতৃত্বের এই হামলা এতোটাই ভয়াবহ ছিলো যে, অল্পক্ষণের মধ্যে দুই রাজার সৈন্যদের মধ্যকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো এবং গযনীর কিছু সংখ্যক যোদ্ধা উভয় রাজার রক্ষণভাগে আক্রমণ করে তাদের ঝাণ্ডা গুড়িয়ে দিলো। ফলে উভয় রাজা জীবন বাঁচাতে রণাঙ্গন ছেড়ে পালালো। এরপর শুরু হলো উভয় রাজার সৈন্যদের কচুকাটা। কিছুক্ষণের মধ্যে পাঁচ হাজার হিন্দু সৈন্যের মরদেহ গযনী সেনাদের ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হতে লাগলো। কিছু সংখ্যক হিন্দু সেনা পালানোর চেষ্টা করলো কিন্তু গযনীর সিংহশাবকেরা তাদের পালাতে দিলো না। তরবারীর আঘাতে সবাইকে ধরাশায়ী করে ফেললো।

* * *

যুদ্ধরত অবস্থাতেও সুলতানের কাছে প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহর দুর্গ থেকে আসা হিন্দুদের মোকাবেলার পুনঃপুনঃ রিপোর্ট আসছিলো। এদিকের যুদ্ধ শেষ হলে সুলতান আবু আব্দুল্লাহর কাছে খবর পাঠালেন, তুমি যুদ্ধ করতে করতে ওদের না বুঝতে দিয়ে পিছিয়ে এসো। প্রধান সেনাপতি এই কৌশল অবলম্বন করলে সোমনাথ দুর্গের সৈন্যরা গযনী বাহিনীর উপর চাপ বৃদ্ধি করার লোভে অনেক খানি এগিয়ে এলো। এ পর্যায়ে সুলতান সেনাপতি আবু হাসানকে নির্দেশ দিলেন, তুমি দুর্গপ্রাচীর থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে হিন্দুদের উপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করো। তখন দুর্গের ফটক বন্ধ ছিল।

গযনী বাহিনী যখন হিন্দুদের উপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করল, তখন তারা জানতে পারলো তাদের সহায়তার জন্যে রাজা ব্রহ্ম ও রাজা দেবআশ্রমের নেতৃত্বে যে দুটি সেনাদল এসেছিলো তাদের সবাই নিহত হয়েছে এবং তারা এখন গযনী বাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে রয়েছে। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে হিন্দুদের মনোবল ভেঙ্গে গেল। ঝিমিয়ে পড়লো তাদের আক্রমণের তেজ। তখন হিন্দু সেনারা আত্মরক্ষার লড়াইয়ে লিপ্ত হলো এবং পিছিয়ে এসে দুর্গে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু গযনীর সেনারা তাদের পিছনে সরে যাওয়ার অবকাশ দিলো না। সামনে যাওয়া মাত্রই কচুকাটা করছিলো।

অপরদিকে গযনীর একদল প্রশিক্ষিত সৈনিক দুর্গ প্রাচীর ও ফটক ভাঙ্গার কাজে লেগে গেল। যেসব হিন্দু দুর্গপ্রাচীরের উপরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের অবস্থা

পর্যবেক্ষণ করছিলো এরা চিৎকার শুরু করে দিলো, সোমনাথের সব সেনা মারা গেছে। মুহূর্তের মধ্যে সারা শহরে এখবর ছড়িয়ে পড়লো। এ খবর শুনে যেসব সেনা দুর্গের ভেতরে ছিল তারা দুর্গের পেছন তথা সমুদ্রপাড়ের ফটক খুলে নৌকা করে পালাতে শুরু করে দিলো। এ খবর সুলতান মাহমূদের কানে পৌঁছলে তিনি বললেন, ওপাশের সেনা ইউনিট যেন নৌকা কব্জা করে ওই ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করে।

নির্দেশ পৌঁছা মাত্রই ওইপাশে কর্তব্যরত সেনা ইউনিট কিছু নৌকা কব্জা করে পলায়নপর হিন্দুসেনাদের উপর তীর বর্ষণ শুরু করলো আর কিছু সেনা নৌকায় আরোহণ করে সমুদ্রের দিকের ফটকে পৌঁছে গেল। ফটক ছিলো খোলা এবং সেখানে কোন নিরাপত্তারক্ষী ছিলো না। ফলে বিনা বাধায় তারা দুর্গে প্রবেশ করলো।

এদিকে তখন প্রধান দুই ফটক খুলে ফেলা হয়েছে। কারো কারো মতে শহরের চোরা গলিতে গযনী সেনাদের নাস্তানাবুদ করার জন্যে হিন্দুরাই দুর্গ ফটক খুলে দিয়েছিলো।

বস্তুত দুর্গে তখন গযনী সেনারা দলে দলে ঢুকে পড়েছে। শহরের অধিবাসীরা তাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু সবাই কাটা পড়ছে। শহরের হিন্দুরা উপর থেকে তীর ছুঁড়ে অনেক গযনী সেনাকে আহত করেছে। বহু হিন্দু মহিলা ছাদের উপর থেকে গযনী সেনাদের উপর পাথর ছুঁড়ে হতাহত করেছে। এই অবস্থা দেখে কিছু সেনা কয়েকটি বাড়ি ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলে হিন্দুরা আতঙ্কিত হয়ে প্রতিরোধের আশা ত্যাগ করে আত্মরক্ষার জন্যে ছুটাছুটি শুরু করে। শহরের লোকদের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে সোমনাথের সকল প্রতিরোধ যোদ্ধা নিহত হয়েছে। যারা দুর্গের ভেতরে ছিলো তারাও সমুদ্র পথে পালিয়ে গেছে। এ খবর শোনার পর সাধারণ হিন্দুদের প্রতিরোধ যুদ্ধ থেমে যায়। তারা পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে যে যার মতো করে জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যুদ্ধ থেমে যায়।

এ যুদ্ধে সোমনাথ ও বাইরে থেকে আসা যোদ্ধারা মিলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার হিন্দু নিহত হয়। প্রায় চার হাজার হিন্দু সমুদ্রপথে পালাতে চেষ্টা করে কিন্তু তাদের অনেকেই তীরাঘাতে নিহত হয়। কেউ সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ে মারা যায়। নৌকা উল্টে অনেকের সলিল সমাধি ঘটে।

১০২৬ সালের ৯ জানুয়ারি ৪১৭ হিজরী সনের ১৬ যিলহজ্জ সোমনাথ মন্দির সুলতান মাহমূদের করতলগত হয়।

* * *

বিজয়ী সুলতান সোমনাথ মন্দির এবং মন্দিরের কারুকার্য দেখে অভিভূত হন। তখনকার সোমনাথ মন্দির ছিলো ভারতীয় স্থাপত্য শৈলীর অনুপম নিদর্শন। সোমনাথ মন্দিরের সিঁড়িতে হাজারো পুরোহিত পণ্ডিত হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। সুলতান পণ্ডিতদের এমন অবস্থা দেখে দুভাষীর মাধ্যমে বললেন, ওদেরকে বলো হাত গুটিয়ে নিতে, আমি সোমনাথের মূর্তি নই। এদের বলে দাও, তাদের উপর কোন অত্যাচার করা হবে না।

সুলতান মন্দিরের সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে উঠতে এক প্রহরীকে একটি সামরিক অস্ত্রভাণ্ডারের কুড়াল আনার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি মন্দিরের মূলবেদিতে আরোহণ করে মন্দিরের প্রধান শিবমূর্তির নাক ভেঙ্গে ফেললেন। সেনাদের নির্দেশ দিলেন, এই মূর্তিটিকে ভেঙ্গে ফেলো। সমবেত হাজার হাজার পণ্ডিত পুরোহিত আর্তচিৎকার করে উঠলো। শীর্ষস্থানীয় পুরোহিতেরা সুলতানের কাছে শিবমূর্তি না ভাঙ্গার জন্যে অনুরোধ করলো। তারা সুলতানের পায়ে পড়ে নিবেদন করলো, মন্দিরের সকল গোপন ভাণ্ডার আমরা আপনার পায়ে লুটিয়ে দেবো, দয়া করে এই শিবমূর্তি ও মন্দির অক্ষত রাখুন।

সুলতান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তাদের বললেন, গযনীর হাজার হাজার মায়ের বুক খালি করে এবং বোনকে বিধবা ও শিশুকে এতিম করে আমি এখানে সওদা করতে আসিনি। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, সুলতানের দুই সেনাপতিও তার বড় ছেলে মাসউদ পণ্ডিতদের আবেদন মেনে নেয়ার জন্য সুলতানকে প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সুলতান তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, তোমরা কি আমার আখেরাত বরবাদ করে দেয়ার চেষ্টা করছো? আমি চাই, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আমাকে ডেকে বলুন, সবচেয়ে বড় মূর্তি সংহারী কোথায়? তাকে হাজির করো। আল্লাহ তাআলা যেন এভাবে না ডাকেন, সোনাদানার বিনিময়ে যে মূর্তিপূজারীদের মূর্তিদান করেছিলো সেই ব্যবসায়ী মাহমূদকে আমার সামনে হাজির করো। এই আহ্বানকে আমি ভয় পাই। ইতিহাস আমাকে মূর্তিপূজা সহায়ক না বলে মূর্তি সংহারী বলে অভিহিত করুক, এটা কি ভালো নয়?

সুলতান নির্দেশ দিলেন, শিবমূর্তির দু'টুকরো গযনী যাবে। একটি আমার বাড়ির সামনে রাখা হবে আর অপরটি রাখা হবে গযনী জামে মসজিদের সামনে। আর অন্য দুটি অংশ মক্কা মদীনায় পাঠানো হবে। অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন, সুলতানের নির্দেশ মতো শিবমূর্তির চারটি টুকরো সেভাবেই পাঠানো হয় এবং তা আজো সেভাবেই সংরক্ষিত আছে।

শিবমূর্তিকে ভেঙ্গে মন্দিরের বাইরে নিয়ে এলে সোমনাথ মন্দিরের কারুকার্যময় সেগুন কাঠের গায়ে দাহ্যপদার্থ ছিটিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। মুহূর্তের মধ্যে মহাভারতের হিন্দুদের গর্ব ও ঐতিহ্যের চন্দ্রদেবতার দেবালয় আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠলো। বিশাল অগ্নিকুণ্ডলী ধোয়া আর পোড়ার শব্দে হিন্দুদের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ছাইভস্মে পরিণত হলো। যে দেবতারা ছিলো হিন্দুদের মতে জীবনমৃত্যুর মালিক তারা আজ নিজের অস্তিত্বকেই রক্ষা করতে পারলো না।

সোমনাথের মহারাজা রায়কুমার ছিলেন নিখোঁজ। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। সুলতান মাহমূদের সেনারা মন্দির থেকে যেসব সোনাদানা মণিমুক্তা সংগ্রহ করেছিলো বর্তমানের মূল্যে তা কয়েকশ হাজার কোটি টাকা মূল্যমান ছিলো।

মন্দির যখন জ্বলছিল, সুলতান তখন দুর্গ প্রাচীরে উঠে একটি বুরুজে দাঁড়িয়ে চারদিকের দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। শহরের বহু জায়গা থেকে আগুনের কুণ্ডলী উঠছে। দলে দলে হিন্দু অধিবাসী ফটক গলে শহর ছেড়ে যাচ্ছে। তাদেরকে কেউ বাধা দিচ্ছে না। চতুর্দিকে রক্ত আর রক্ত। শহরের বাইরে শুধু লাশ আর লাশ। চারদিকে রক্ত আর লাশের স্তূপ। দুর্গের বাইরে অনেক আহত লোক উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে, কেউ কেউ মাথা উঁচু করে আবার পড়ে যাচ্ছে। আহতরা সবাই হিন্দু সেনা। তাদের সেবা তো দূরে থাক, যারা শহর ছেড়ে যাচ্ছে, তারা আহত সেনাদের তাকিয়ে দেখারও প্রয়োজন বোধ করছে না।

গযনী সেনারা সহযোদ্ধাদের লাশগুলো উঠিয়ে এনে এক জায়গায় জড়ো করছে আর আহতদের তুলে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে। সুলতান মাহমূদের দৃষ্টি রণাঙ্গনের চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করছিলো। না জানি তার মনের মধ্যে কি ভাবনা তখন বিরাজ করছিল। তিনি দেখতে পেলেন, দুর্গের ফটক পেরিয়ে দলে দলে হিন্দু নারীপুরুষ ছেলে বুড়ো কন্যা জায়া দুঃখভারাক্রান্ত মনে দুর্গ ছেড়ে

যাচ্ছে। এই অবস্থা দেখে তিনি পাশে দাঁড়ানো একসেনা কর্মকর্তাকে বললেন, নীচে গিয়ে দুর্গ ফটকে ঘোষণা করে দাও, গযনীবাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে কোন শহরবাসীকে শহর ছেড়ে যেতে হবে না। সাধারণ নাগরিকদের উপর গযনী বাহিনী কোন জুলুম করবে না। এ সময় সুলতান আপন মনেই স্বগোতোক্তি করলেন– এরা কি এখনো বুঝতে পারেনি, জয় পরাজয় জীবনমৃত্যুর মালিক এসব পাথুরে মূর্তির হাতে নয় লা শারিক আল্লাহর হাতে? তার একথার কোন জবাব কারো মুখে উচ্চারিত হলো না।

সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা শাখা স্থানীয় কয়েকজনকে গোয়েন্দা বিভাগে নিয়োগ দেয়। তারা জানায়, যেসব সেনা গযনী বাহিনীর উপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করেছিলো, তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলো রাজা পরমদেব। এই আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে গযনী বাহিনীর তিনহাজার সেনাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। স্থানীয় গোয়েন্দারা জানালো, সোমনাথ থেকে একশ বিশ মাইল উত্তরে গন্দভী নামক স্থানে রাজা পরমদেবের রাজধানী অবস্থিত। গন্দভী চারদিক থেকে সাগর বেষ্টিত।

এই আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সুলতান মাহমূদ এতোটাই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, তিনি তাৎক্ষণিক গন্দভী অভিযানের নির্দেশ দিলেন। সুলতান সেখানে পৌছে দেখলেন, গন্দভী দুর্গে পৌছা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ চতুর্দিকেই অথৈই পানি। অবশ্য একপাশে পানি কিছুটা কম। আরো খবর পাওয়া গেলো, পরমদেব নিজেই নিজেকে দুর্গবন্দী করে রেখেছে।

আবুল কাসিম ফারিশতা লিখেছেন, একরাতে সুলতান মাহমূদ কুরআন কারীম তেলাওয়াত করলেন। কিছু বিশেষ আয়াত পাঠ করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে সাহায্যের জন্য মোনাজাত করলেন। পরদিন সকালে দেখা গেলো, সমুদ্রের পানি অনেক কমে গেছে। যেদিকে পানি কমছিল সেদিকের এলাকাটিতে পানি নেই বটে, কিন্তু অনেক কাদা। সুলতান তার সেনাদেরকে কাদার মধ্য দিয়ে অভিযানের নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও সেনাদের সাথে দুর্গের কাছে পৌছে গেলেন।

গযনী বাহিনী দুর্গে আক্রমণ পরিচালনার কিছুক্ষণের মধ্যেই দুর্গফটক খুলে গেল। দুর্গে প্রবেশ করে জানা গেল, রাজা পরমদেব সমুদ্রপথে পালিয়ে গেছেন। গন্দভীর হিন্দু সেনারা সোমনাথ যুদ্ধে গযনী বাহিনীর ভয়ঙ্কর আক্রমণে বিপর্যস্ত

হয়ে হাজার হাজার সহযোদ্ধাকে হারিয়ে মাত্র কিছুসংখ্যক প্রাণ নিয়ে গন্দভীতে পালিয়ে আসতে পেরেছিল। এরা এমনিতেই ছিলো হতোদ্যম হীনবল। তারা প্রতিরোধের কোন চেষ্টা না করেই আত্মসমর্পণ করলো। সুলতান গন্ধভী দুর্গ লোকশূন্য করার নির্দেশ দিলেন।

সুলতান এ দুর্গে কিছুদিন অবস্থান করলেন। জায়গাটি ছিলো বর্তমান গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত। এখানকার আবহাওয়া ছিলো খুবই স্বাস্থ্যকর এবং পরিবেশ খুবই মনোমুগ্ধকর। সুলতানের জায়গাটি খুব পছন্দ হলো। তিনি এটি গযনী সালতানাতের কেন্দ্রীয় রাজধানী করার মত ব্যক্ত করলেন।

সুলতান তার ছেলে মাসউদকে বললেন, তুমি গযনী চলে যাও। সেখানকার প্রশাসনের দায়িত্ব তোমার হাতে নাও, আমি এখানেই থাকতে চাই।

আপনি এখানে থেকে গেলে সেলজুকী ও খোরাসানীরা কি বলবে না সুলতান মাহমূদ ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেছে? বললেন মাসউদ। অথচ বহু রক্ত ক্ষয়ের বিনিময়ে আমরা খোরাসান জয় করেছি।

আপনি এখানকার কোন স্থানীয় লোককে এই অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করুন সুলতান! প্রস্তাব করলো সুলতানের এক উপদেষ্টা। কারণ গযনীর অবস্থা এমন যে, আপনার অনুপস্থিতিতে তার কেন্দ্রীয় মর্যাদা ও গুরুত্ব ধরে রাখতে পারবে না।

অনেক চিন্তা ভাবনা করে অবশেষে উপদেষ্টাদের পরামর্শ মেনে নিলেন সুলতান। তিনি পুনরায় সোমনাথ দুর্গে ফিরে গেলেন। যথেষ্ট যাচাই বাছাই করে অবশেষে রাজা দেবআশ্রমকে সোমনাতের গভর্নর নিযুক্ত করে তিনি গযনী ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে সেনাদের নির্দেশ দিলেন।

সুলতান নবনিযুক্ত গভর্নর দেবআশ্রমকে জানালেন, তিনি মুলতানের পথে ফিরে যেতে চান না। অন্য কোন সহজগম্য ও কম দূরত্বের পথে তিনি গযনী ফিরতে চান, তবে তার অন্য কোন পথ জানা নেই।

গভর্নর দেবআশ্রম সুলতানকে রানকোচ হয়ে বেলুচিস্তানের মাঝ দিয়ে গযনী যাওয়ার পথের কথা জানালেন। কারণ বেলুচিস্তান পৌঁছে গেলে সুলতান সহজেই গযনী পৌঁছতে পারবেন।

এ সময় রাজা দেবআশ্রমের রানী সেখানে উপস্থিত ছিল। রানী বললো, আমরা সুলতানকে এমন দুজন গাইড দেবো যারা সহজেই আপনাদের নিয়ে

যেতে পারবে। কারণ রানকোচের পর যে মরু এলাকা সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত লোকের পক্ষে পানির উৎস খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

* * *

বিজয়ী আবেশে ফিরে যাচ্ছিল গযনী বাহিনী। তাদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কয়েক হাজার সহযোদ্ধাকে হারিয়ে ছিল গযনী সেনারা। সহযোদ্ধাদের লাশগুলো সোমনাথ দুর্গের বাইরে একটি খোলা জায়গায় গণকবর দেয়া হয়। বহু আহত যোদ্ধাও ছিল কাফেলায়। ছিলো মাল পত্র ও মালে গনীমত বোঝাই বহুসংখ্যক উট। সাধারণ যোদ্ধারা এখন আর তাকবীর ধ্বনী দিচ্ছিল না, তারা সমস্বরে রণসঙ্গীত গেয়ে সানন্দে পথ অতিক্রম করছিল। সোমনাথ যাওয়ার পথে তারা যে ভয়ঙ্কর মরুভূমি অতিক্রম করেছিলো, এই মরু ভয়াবহতার কথা তাদের আজীবন মনে থাকবে। এখনও তাদের সামনে ছিল জীবনহরণকারী মরুভূমি কিন্তু বিজয়ানন্দের উষ্ণতায় তাদের মধ্যে মরুকষ্টের যাতনা ছিলো না।

পথ চলতে চলতে বিজয়ী গযনী বাহিনী ভয়ঙ্কর মরুতে প্রবেশ করল। তিনদিন মরুর মধ্যেই তাদের চলে গেছে কিন্তু এর মধ্যে কোথাও এক ফোঁটা পানির সন্ধান পাওয়া গেল না। এবার সুলতান মাহমূদ সেনাদেরকে বেশী করে পানি বহনের নির্দেশ দেননি। ফলে সেনারা তাদের আহারের জন্যে যে পরিমাণ পানি সঙ্গে এনেছিল তা ফুরিয়ে গেছে। ঘোড়া ও উটগুলো পিপাসার্ত হয়ে পড়েছিল। হিন্দু রাজা তাদের পথ দেখিয়ে নেয়ার জন্য যে দুজন গাইড দিয়েছিল এরা আশ্বাস দিয়েছিল এমন পথে কাফেলাকে নিয়ে যাবে, যে পথে অঢেল পানির উৎস রয়েছে। গাইডদের যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, পানি কোথায়? তারা আশ্বাস দিলো আগামীকাল নিশ্চয়ই আমরা পানির কাছে পৌছে যাবো। কিন্তু চতুর্থ দিনও এভাবেই তপ্ত মরুর মধ্যেই কেটে গেলো পানির দেখা পাওয়া গেল না।

পঞ্চম দিন সেনাদের অধিকাংশই তৃষ্ণা পিপাসায় কাতর হয়ে গেল। অনেকের মাথা চক্কর দিতে লাগল। ঘোড়াগুলো হারিয়ে ফেলল চলার শক্তি। সুলতান মাহমূদ প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ ও সেনাপতি আবুল হাসানকে বললেন, আমার কেন যেন গাইডদের ব্যাপারে সন্দেহ হচ্ছে, ওদের ডেকে আনো। পিপাসায় দুই গাইডেরও মাথা দুলছিল। তাদেরকে সুলতানের সামনে হাজির করা হলে সুলতান তাদের জিজ্ঞেস করলেন—

তোমরাও তো পিপাসায় কষ্ট পাচ্ছো, তোমাদের অবস্থা তো আমাদের সেনাদের চেয়ে আরো খারাপ, তোমরা বলছিলে এই মরুভূমিতে পানির অভাব নেই। কোথায় পানি?

পানি ঠিকই আছে সুলতান! তবে পানি পর্যন্ত আপনাদের পক্ষে জীবন নিয়ে পৌঁছা সম্ভব নয়। জবাব দিলো এক গাইড।

তোমরা কি জেনে শুনেই আমাদেরকে পানি থেকে দূরে নিয়ে এসেছো?

জী হ্যাঁ সুলতান! আমরা জেনে বুঝেই একাজ করেছি।

তাহলে তোমরা কি আমাদেরকে বিপথে নিয়ে আসার জন্যেই গাইড সেজেছিলে? তোমরা কি জানো না, তোমাদের এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড?

আমরা বিলক্ষণ তা জানতাম সুলতান! আমরা শিবদেবের সম্মানে আমাদের জীবন উৎসর্গ করেই সোমনাথ থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম। আপনার কি মনে নেই, যখন মহারাজা দেবআশ্রম আপনাকে রাস্তার কথা বলছিলেন, তখন পাশে থাকা রাণী বলেছিলেন, তিনি আপনাকে এমন গাইড দেবেন, যারা আপনাকে এমন পথে নিয়ে যাবে যেপথে পানির কোন অভাব নেই। তিনি অবশ্য আপনার সাথে ওয়াদা করেছিলেন আপনাকে সৎ পথপ্রদর্শক দেবেন। কিন্তু আমরা দু'জন তার ওয়াদাকে ভঙ্গ করে আপনাদেরকে পানি থেকে দূরে নিয়ে এসেছি। আমরা রাজা দেবআশ্রমের সাথে সোমনাথ রক্ষার্থে আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছিলাম কিন্তু আমরা সোমনাথ পৌঁছে দেখি সোমনাথের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। এরপর আমরা একটি রাতও ঘুমাতে পারিনি। বহুবার আপনাকে হত্যার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোন সুযোগ পাইনি। অবশেষে যখন শুনলাম, আপনার গাইডের দরকার, তখন আমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় আপনাদের গাইড হওয়ার জন্য নিজেদের পেশ করলাম এবং খুব সাফল্যের সাথেই আমরা আমাদের কাজ করতে পেরেছি। আমরা শুধু আপনাকে নয়, আপনার গোটা বাহিনীকেই পানি থেকে দূরে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। এখন আপনার গোটা বাহিনীর বিরুদ্ধেই আমরা প্রতিশোধ নিতে পেরেছি। আগামীকাল পানির অভাবে আমরা এমনিতেই মরে যাব। কাজেই আপনার মৃত্যুদণ্ড বরং আমাদের মৃত্যুকে আরো সহজ করবে কিন্তু আপনার গোটা বাহিনীকেই জীবন দিয়ে সোমনাথ ধ্বংসের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

সুলতান তাৎক্ষণিক এই দুই নরাধমকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। দুই সেনা কর্মকর্তা সাথে সাথে তরবারী দিয়ে ওদের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল।

* * *

দুই গাইড যা বলেছিলো তা ছিলো খুবই বাস্তব। সত্যিকার অর্থেই গোটা বাহিনীর অবস্থা পানির অভাবে শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। অধিকাংশ সেনা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় দুলছিল, কারো কারো শুরু হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুযন্ত্রণা।

ষষ্ঠ দিন শেষে রাতের বেলায় সেনা শিবিরের ঘোড়াগুলো তৃষ্ণায় ছটফট করছিল আর আর্তচিৎকার করে হ্রেষারব করছিল। ভারবাহী উটগুলোর গতিও শ্লথ হয়ে এসেছিল। সেনারা ঘোড়া ও উটের উপর বসে থাকার সামর্থটুকুও হারিয়ে ফেলেছিল। সুলতান এশার নামাযের পর এমন করুণ অবস্থার মধ্যে শিবিরের বাইরে খোলা জায়গায় এসে কয়েক রাকাত নফল নামায পড়লেন। নামাযরত অবস্থায়ও সুলতানের কানে ভেসে আসছিল পিপাসার্ত উট ঘোড়া ও সেনাদের আর্তচিৎকার। অনেক সেনার কণ্ঠের আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। তারা যেন কান্নার সামর্থটুকুও হারিয়ে ফেলেছিল।

সুলতান গোটা সেনাবাহিনীও ভারবাহী জন্তুদের করুণ অবস্থা সামনে রেখে আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে মোনাজাত শুরু করলেন। সুলতান এতোটাই কাঁদলেন যে, এক পর্যায়ে তাঁর কণ্ঠ থেকে আর কোন আওয়াজ বের হচ্ছিল না। কারণ, তিনি জানতে, আজ রাতে যে সেনারা তার সাথে আছে এভাবে পানিহীন অবস্থা থাকলে আগামী রাতে হয়তো তাদের অর্ধেকও বেঁচে থাকবে না।

সুলতানের দু'আ শেষ হতেই রাতের অন্ধকার আকাশে হঠাৎ একটি তারা ভেঙে পড়লো এবং অন্ধকার ভেদ করে একটি আলোর ঝলক একদিকে নেমে হারিয়ে গেলো। তা দেখে সুলতানের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, আল্লাহ তাআলা আমাদের ইশারা দিয়েছেন, আগামীকালের মধ্যেই ইনশাআল্লাহ আমরা পানির দেখা পাবো।

মরুভূমিতে এ কয়দিন তারা কোন পাখি উড়তে দেখেনি। কিন্তু সকাল বেলায় সুলতানের কানে উড়ন্ত পাখির কলরব ভেসে এলো। সুলতান আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন এক ঝাক পাখি উড়ছে। তিনি পাখির ঝাঁকের দিকে এক পলকে তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন পাখির ঝাকটি অনেকটা দূরে গিয়ে নীচে

নেমে গেছে। সুলতান উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, এগুলোই পানির পাখি। পাখিগুলো সেদিকেই গেছে। যেদিকে তারা ভেঙে পড়েছিল। সুলতান সূর্যের আলো প্রখর হওয়ার আগেই সবাইকে ওদিকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

প্রায় দ্বিপ্রহরের আগে আগে যখন গোটা কাফেলার অবস্থাই সঙ্গীন, বহু সেনার মধ্যে মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে ঠিক তখন তাদের নজরে এলো পানির অস্তিত্ব। এ পানি পানি নয়, রীতিমতো একটি ঝিল। ঘোড়াগুলো পানির গন্ধ পেয়ে লাগামহীন হয়ে পানির দিকে দৌড় দিলো। সেনারা অনেকেই পানিতে মাথা ভিজিয়ে শরীরে পানি ছিটালো আর প্রাণভরে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করল। কাফেলার সকল প্রাণি ও সেনা তৃপ্তিভরে পানি পান করে বিশ্রামের জন্য সেখানেই তাঁবু ফেললো এবং অবশিষ্ট দিন ও রাত আহারাদী সেরে বিশ্রাম করে শরীরটাকে তাজা করে নিল। সেই সাথে প্রত্যেকের সামর্থানুযায়ী পানি সাথে করেও নিয়ে নিলো।

* * *

তখনও গযনী বাহিনীর কষ্টের শেষ হয়নি। এবার তারা অজানা অচেনা পথে কোন জানাশোনা গাইড ছাড়াই অগ্রসর হচ্ছিল। এখন রাতের বেলা আসমানের তারা আর দিনের বেলা সূর্যই ছিলো তাদের পথ চেনার উপায়।

দু'দিন এভাবে চলার পর তারা একটি পল্লীর দেখা পেলো এবং স্থানীয় এক লোককে গাইড হিসেবে সাথে নিল। এই অজানা অচেনা গাইড গযনী বাহিনীকে সিন্ধু নদীর এমন কূলে নিয়ে গেল যেখানে নদীর গভীরতা ও প্রশস্ততা ছিলো অনেক বেশী।

এই গাইড সিন্ধু নদীর তীর ঘেঁষে কাফেলাকে একটি জটিল এলাকায় নিয়ে গেল আর সেখানে পৌঁছতেই সন্ধ্যা নেমে এলো। বাধ্য হয়েই গযনী বাহিনী সেখানে রাতযাপনের জন্য তাঁবু ফেললো। কিন্তু গভীর রাতে গযনী শিবিরে শুরু হয়ে গেল হৈ চৈ কোলাহল। পরিস্থিতি আঁচ করে সুলতান গাইডকে তলব করলেন, কিন্তু গাইডকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেলো, শিবিরের একটি অংশে অজ্ঞাত লোকেরা হামলা করেছিল। কিন্তু সতর্ক গযনীর সেনারা আক্রমণকারী কয়েকজনকে ঘেরাও করে ধরে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাদের কয়েকজন আহত হয়েও পালানোর শক্তি হারিয়ে

ফেলে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেলো, এই এলাকাটি হিন্দু জাঠদের এলাকা হিসেবে পরিচিত। এলাকাটি আমরকোটের অংশ। ধৃত জাঠরা জানালো, তাদের একটা চোটখাটো রাজত্ব আছে। জাঠরা খুবই দুঃসাহসী লড়াকু। লুটতরাজ করাই তাদের প্রধান পেশা।

ধৃতজাঠরা আরো জানালো, তাদের রাজা জানতে পেরেছিল গযনী বাহিনী সোমনাথ ধ্বংস করে সেখানকার সব সোনাদানা নিয়ে যাচ্ছে। ফলে সেই রাজাই এই গাইডকে কৌশলে পাঠিয়েছিলো। গাইড রাজার নির্দেশ মতো গযনী বাহিনীকে আক্রমণের উপযোগী জায়গায় এনে রাতের অন্ধকারে গায়েব হয়ে যায়। পরদিন দিনের বেলায় গযনী বাহিনী যখন রওয়ানা হলো, হঠাৎ পেছন দিকে জাঠদস্যুরা অতর্কিতে আক্রমণ করে দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে পালিয়ে গেলো। এভাবে কয়েকবার আক্রান্ত হওয়ার পর সুলতান কাফেলার গতি থামিয়ে ধৃতজাঠদের এনে জিজ্ঞেস করলেন, জাঠদের রাজধানী এখান থেকে কতোটা দূরে? ধৃত জাঠরা জানালো, 'জাঠদের নির্দিষ্ট কোন রাজধানী নেই। আপনি জাঠদের ধ্বংসের পেছনে পড়লে লজ্জিত হবেন। কারণ তারা কোথাও এক জায়গায় এক সাথে থাকে না। দুর্গ বা স্থায়ী নিবাস তৈরীও তাদের স্বভাব বিরোধী।

সুলতানের মনোভাব বুঝে তার সেনাপতিগণ তাকে পরামর্শ দিলেন, গযনীর সেনা সংখ্যা অনেক কমে গেছে। তাছাড়া দীর্ঘ কষ্টকর সফরের কারণে অবশিষ্ট সেনাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে লড়াই কিংবা আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সামর্থ নেই। এই এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা ও জনমানুষ সম্পর্কে আমাদের কোনই ধারণা নেই। জানা নেই এখানে আমরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে পরিণতি কি হয়? এমতাবস্থায় ধৃতকয়েদীদের উপরও ভরসা রাখা কঠিন। তাই যথাসম্ভব দ্রুত আমাদের উচিত গযনী পৌছার চেষ্টা করা।

সুলতান সেনানায়কদের যৌক্তিক পরামর্শ ও বাস্তবতা মেনে নিলেন। কিন্তু জাঠদের পরপর আক্রমণে বিপর্যস্ত গযনী সেনাদের প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির মোকাবেলা করতে না পারায় সুলতান রাগে ক্ষোভে দাঁতে দাঁত কামড়ে ক্ষোভ হজম করতে বাধ্য হলেন।

* * *

সোমনাথ জয় করে অজানা পথে গযনী পৌছতে গযনী বাহিনীর যে দুঃসহ যন্ত্রণা, অজানা শত্রুদের গেরিলা আক্রমণ এবং অচেনা মরুভূমিতে টানা ছয় সাতদিন পানিহীন পিপাসায় ছটফট করতে হয়েছে, যে কষ্ট সহ্য ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে এই কুরবানী ও ক্ষয়ক্ষতি ছিলো যে কোন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের চেয়েও আরো বেশী। দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর ফিরতি সফর শেষে ১০২৬ সালের ৬ এপ্রিল মোতাবেক ৪১৭ হিজরী সনের ১০ সফর সুলতান মাহমূদ সোমনাথ জয়ী বেঁচে থাকা সেনাদের নিয়ে গযনী পৌছেন। গযনীর সীমানায় পৌছা মাত্রই তিনি ঘোড়া থেকে নেমে দু'রাকাত শোকরানা নামায আদায় করলেন। এ নামায যুদ্ধ জয়ের জন্য নয় বহু ত্যাগ জীবনহানি ও সম্পদ হারিয়ে হলেও আল্লাহ তাআলা যে বিজয়ী কাফেলাকে শেষ পর্যন্ত গযনী পৌছার তওফিক দিয়েছেন এ নামায ছিলো এরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য।

সেনাদের সোমনাথ জয় করে আসার খবর শুনে গোটা গযনীর আবাল বৃদ্ধ বণিতা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আনন্দে মেতে উঠলো। মহিলারা বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে বিজয়ী সেনাদের কাপড় নেড়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। ছোট শিশুরা আনন্দে নেচে গেয়ে উল্লাস প্রকাশ করছিল।

গযনী ফিরে রাতের বেলায় সুলতান মাহমূদ তার দেহে অস্বাভাবিক ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভব করলেন। অবশ্য ক্লান্তি এর আগেও তার অনুভূত হতো কিন্তু এবার তার মনে সাক্ষ্য দিচ্ছিল তার শরীর কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। প্রত্যেকবার যুদ্ধ থেকে ফেরত আসার পর সুলতানের একান্ত চিকিৎসক তার শারীরিক অবস্থা পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করতেন। চিকিৎসক এবারও রাতের বেলায় এসে সুলতানের দেহের অবস্থা জানার জন্য তাঁর রক্ত সঞ্চালন বুঝতে হাতের নার্ভ টিপে ধরলেন। এর পর বুকের হৃদকম্পন বুঝার জন্য বুকে হাত রাখলেন। সুলতানকে নানা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। সবকিছু বুঝে শুনে চিকিৎসকের কপালে ভাঁজ পড়লো। চিকিৎসক সুলতানের দেহের নাজুক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি সুলতানকে বললেন– সম্মানিত সুলতান! আপনার দেহের অবস্থা দেখে আমি যতোটা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, এমন চিন্তা আপনার মধ্যে দেখা গেলে আপনার দৈহিক অবস্থার কখনো অবনতি ঘটতো না। আপনি খুবই অসুস্থ সুলতান! কমপক্ষে আপনাকে এক বছর বিরতিহীন বিশ্রাম নিতে হবে।

আমার আবার কি হয়েছে? আপনি কি শুনেননি, আমি কোত্থেকে এসেছি, কি করে, কতো যাতনা সহ্য করে দীর্ঘ দিনের কঠিন সফর শেষ করেছি। সফরের এই ধকলকে আপনি অসুস্থতা বলছেন?

জী সুলতান! আমি সত্যিই বলছি, আপনি অসুস্থ। আপনার কাছে উট আর ঘোড়ার পার্থক্য করা যেমন সহজ আমার কাছে সুস্থ ও অসুস্থতার ব্যবধান অনুধাবন করা এমনই সহজ।

এ সময় সুলতানের বেগম সাহেবা এবং তার এক কন্যা পাশে দাঁড়ানো ছিলেন। চিকিৎসকের কণ্ঠে অসুখের কথা শুনে তারা জানতে চাইলেন- কি রোগ হয়েছে সুলতানের? চিকিৎসক তাদের আশ্বস্ত করতে বললেন, না তেমন মারাত্মক কিছু নয়।

সুলতান স্ত্রী ও কন্যার উদ্দেশ্যে বললেন, আরে তোমরা শুধু শুধু দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছো। এ কিছু না। সফরের ক্লান্তি আর কি? যাও তোমরা এ ঘর থেকে চলে যাও, আমি চিকিৎসকের সাথে কিছু প্রশাসনিক কথা বলবো।

স্ত্রী ও কন্যা সেই কক্ষ থেকে চলে যাওয়ার পর সুলতান চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কি রোগ হয়েছে শাইখুল আসফান্দ?

আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে গেছে সুলতান! আমি বহু আগেই এ ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক ও অবহিত করেছি সুলতান! এখন প্রায়ই আপনার বুকে ব্যথা হয়, কণ্ঠনালী ফুলে যায় তা কি আপনি অনুভব করেন না সুলতান?

আমি আপনাকে ভয় দেখানোর জন্যে বলছি না, শুধু সতর্ক করার জন্য বলছি। কারণ, এখন থেকে সতর্ক না হলে পরবর্তীতে অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়বে। আপনার যক্ষ্মা রোগ হয়েছে সুলতান। তবে এটা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে।

আরে যক্ষ্মা রোগ আমার কি আর বিগড়াবে?

সম্মানিত সুলতান! এটাকে আপনি শরীরের ঘুণ পোকা মনে করতে পারেন। ঘুণ পোকা যেমন ভেতর থেকে কাঠ খেয়ে শেষ করে ফেলে, যক্ষ্মা রোগও তেমনি দেখা যায় না কিন্তু ভেতরে ভেতরে শরীরের সবকিছুকে নষ্ট করে দেয়। এখন থেকে যদি আপনি কঠিন পরিশ্রমের কাজ না করে পূর্ণ বিশ্রামে থাকেন

এবং মাথা থেকে সব জটিল চিন্তা দূর করে দেন তাহলে আশা করা যায় রোগটি আর বাড়বে না। বর্তমানে আপনার শরীরের কাঠামো ভেঙে যাচ্ছে।

আপনি কি আত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন? শাইখুল আসফান্দ?

আত্মিক শক্তিতে আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি সুলতান। কিন্তু আত্মিক শক্তি ততোক্ষণই সক্রিয় থাকে যতক্ষণ দেহ আত্মাকে ধারণ করার সামর্থ রাখে। দেহ আত্মাকে ধারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে আত্মা দেহ পিঞ্জিরার বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়।

আমি হিন্দুস্তানের এমন সব যোগী সন্ন্যাসীকে দেখেছি, যাদের আত্মিক ক্ষমতা এতোটাই বিস্ময়কর যে, সাধারণ মানুষ সেইসব ক্ষমতাকে অপার্থিব বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। যোগীরা আমাকে বলেছে, এ ধরনের ক্ষমতা ইচ্ছা করলে যে কেউ অর্জন করতে পারে। যোগীদের চেয়ে কি আমার আত্মশক্তিকে হীন মনে করেন আপনি? চিকিৎসকের উদ্দেশ্যে বললেন সুলতান।

সম্মানিত সুলতান! আপনি যাই বলুন না কেন, আমি তবুও বলবো, যক্ষ্মা যদি আপনার শরীরকে ভেতর থেকে ফোকলা করে ফেলে তবে সেই আত্মিক শক্তি কোত্থেকে পয়দা হবে?

দৈহিক শক্তি নয় আত্মিক শক্তির বলেই আমি সোমনাথের মতো কঠিন যুদ্ধ জয় করেছি এবং ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক দীর্ঘ সফরও করেছি। আমার মনে আছে সোমনাথ অভিযানে যাওয়ার আগেই আপনি আমাকে বিশ্রাম নেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তখন হয়তো আমাকে পরীক্ষা করে আপনি এই রোগের উপস্থিতি ধরতে পারেননি। আসলে রোগটি তখনও আমার মধ্যে ছিলো। এখন আপনি এটিকে স্বনামে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। অবশ্য আমি এটাকে একটা সাধারণ রোগই মনে করে আসছি। আজ আমি আপনার কাছ থেকে একটা প্রতিশ্রুতি নিতে চাই শাইফুল আসফান্দ! আমার এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার কথাটি কেউ যেনো জানতে না পারে।

এখনও পর্যন্ত আমি এটাকে যক্ষাই বলছি সুলতান! কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে এটা পাকস্থলীর রোগ। যদি তাই হয় তবে কিছু দিনের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে, তখন পরিষ্কার বোঝা যাবে এটি যক্ষ্মা না পাকস্থলীর রোগ। তবে আমি আপনাকে করজোড়ে নিবেদন করছি, এখন থেকে আপনি নিয়মিত বিশ্রাম, ওষুধ ও পথ্যের প্রতি মনোযোগী হবেন।

'আরে শাইখ!' আমি মরে গেলে কি আর ক্ষতি হবে! আমার ছেলেরা এখন বড় হয়েছে, আশা করি তারা সালতানাতকে সামলে নিতে পারবে।

আপনার খান্দানে সালতানাত চালানোর মতো লোকের অভাব হবে না। আরো বহু সুলতান হয়তো জন্ম নেবে কিন্তু মাহমূদ আর কেউ হবে না। আর কোন মূর্তি সংহারী জন্ম নেবে না। সবাই হয়তো আল্লাহ্ ও রাসূলের নামের উপরই সালতানাত চালাবে কিন্তু আল্লাহর নামে নিজেকে উৎসর্গ করার মতো শাসক আর পাওয়া যাবে না। হিন্দুস্তানের পাথুরে ভগবানদের টুকরো করে এনে গযনী শাহী মসজিদের পথে ছড়িয়ে দেয়ার শক্তি আর কারো হবে না। আমি আপনার ব্যক্তি স্বার্থে নয়, আপনার পরিবার, রাজত্ব কিংবা শাসন কার্যের স্বার্থে নয় ইসলামের স্বার্থে মুসলিম বিশ্বের মর্যাদার স্বার্থে আপনাকে আরো কিছুদিন জীবিত ও সক্ষম দেখতে চাই সুলতান!

জন্মমৃত্যু কোন মানুষের হাতে নয়, শাইখুল আসফান্দ! বললেন সুলতান মাহমূদ। আমাকে দুনিয়াতে আরো বহু কাজ করতে হবে। মুসলিম বিশ্বের প্রতি কতিপয় কেউটে সাপ উঁকি ঝুকি মারছে। হিন্দুস্তানের কালনাগিনী গুলোকেও আমার বিনাশ করতে হবে। এতোগুলো আক্রমণের পরও হিন্দুস্তানের কালনাগিনীগুলোকে নিঃশেষ করা সম্ভব হয়নি। সোমনাথ অভিযানে গিয়ে আমি হিন্দুস্তানের উপকূলীয় এলাকায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময়কার মুসলমানদের উত্তরসূরীদের দেখেছি।

হিন্দু শাসকরা তাদের জীবন সংকীর্ণ করে ফেলেছিল। তার পরও তারা এখনও নিজেদের আরবী ভাষাভাষী হিসেবে অক্ষুণ্ন রেখেছে। আমার একান্ত কর্তব্য তাদের জীবনযাত্রাকে নির্বিঘ্ন করা এবং হিন্দুদের দুঃশাসন থেকে তাদের উদ্ধার করা। আমার আরো বহু কাজ করতে হবে শাইখুল আসফান্দ!

'আমি যদি আমার দায়িত্বপালন না করি তাহলে ইসলামের অবিস্মরণীয় সিপাহ্ সালারের অপমৃত্যুর দায় আমার কাঁধে চাপবে সুলতান! আমি আল্লাহর কাছেও তো কোন জবাব দিতে পারবো না সুলতান! বললেন চিকিৎসক।

আর কেউ না দেখলেও আল্লাহ ঠিকই দেখছেন শাইখ! আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আমার অসুখের ব্যাপারটি গোপন রাখবেন। কারণ আমার শত্রুরা যদি আমার অসুখের খবর জেনে ফেলে, তাহলে তারা আমার মৃত্যুর জন্য আমার মোকাবেলা না করে অপেক্ষা করতে শুরু করবে, আমি ওদের সাক্ষাত পাবো না।

আমার লাশ যখন দাফনের জন্যে নেয়া হবে, তখন ওরা আমার রাজ্যে আক্রমণ করে বসবে। এমন দুর্যোগ মুহূর্তে আমার ছেলেদের পক্ষে হয়তো ওদের প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। শাইখুল আসফান্দ! আপনি কি দেখছেন না, সেলজুকীরা আবারো কী রকম ভয়ংকর হয়ে উঠছে? ওরা এখন গযনীর জন্যে হুমকিতে পরিণত হয়েছে।

আমি সবই দেখছি সুলতান! বললেন শাইখুল আসফান্দ!

আমাকে আরো একবার হিন্দুস্তান যেতে হবে, চিকিৎসকের উদ্দেশ্যে বললেন সুলতান। আমি যখন হিন্দুস্তান থেকে ফিরছিলাম তখন পথিমধ্যে জাঠ নামের একটি জনগোষ্ঠী আমার সেনাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি করেছে। আমার সেনাদের পক্ষে তখন দৃঢ়ভাবে লড়াই করার মতো সামর্থ ছিলো না। এই দুর্বলতা আন্দাজ করে জাঠ দস্যুরা গেরিলা আক্রমণ করে আমার বহু সহযোদ্ধাকে হত্যা করেছে। তবুও সাহস করে আমার সেনারা ওদের কয়েকজনকে ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আমি জেনে নিয়েছি জাঠ জনগোষ্ঠীর জীবন যাপন রীতি পদ্ধতি ও সামরিক শক্তি। ধৃতরা জানিয়েছে, জাঠ জনগোষ্ঠী সোমনাথের শিবমূর্তির পূজারী। এরা খুবই লড়াকু ও সংখ্যায় বিপুল। এরা এতোটাই শক্তির অধিকারী, ইচ্ছা করলে আশেপাশের যে কোন মহারাজার ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। তাছাড়া এরা মুসলমানদের জঘন্য শত্রু। এই ভয়ংকর শত্রুদের শায়েস্তা করতে আমাকে আরেকবার হিন্দুস্তানে যেতেই হবে শাইখুল আসফান্দ! আমি যদি এই বেয়াড়া জনগোষ্ঠীর কোমড় ভেঙ্গে না দেই; তা হলে এরা আবার অন্য কোন জায়গায় শিবমূর্তি দাঁড় করিয়ে দেবে, আর মুসলমানদের ধরে ধরে শিবমূর্তির পায়ে বলি দিতে থাকবে।

আপনি একটু বিশ্রাম নিন সুলতান! আমি আপনাকে ওষুধ দেবো।

শুধু দাওয়া ওষুধ) নয় দু'আও করুন শাইখুল আসফান্দ! এখন দাওয়ার চেয়ে দু'আ আমার বেশী প্রয়োজন। বললেন সুলতান মাহমূদ।

ওষুধ পত্র দিয়ে চিকিৎসক চলে যাওয়া পর সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন সুলতানের স্ত্রী ও তার কন্যা।

চিকিৎসক কি বলে গেলেন? আপনি আমাদেরকে কক্ষ থেকে বের করে দিলেন কেন? এমন কি গোপন কথাছিলো চিকিৎসকের সাথে? এক নাগাড়ে প্রশ্ন কয়টি সুলতানের দিকে ছুড়ে দিলেন তার স্ত্রী।

'হু'! চিকিৎসক বললেন, আরাম করুন। দায়িত্ব কর্তব্যের কথা ভুলে যান। বললেন সুলতান।

চিকিৎসক যদি আপনাকে বিশ্রামের কথা বলে থাকেন, তাতে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। মায়ের কণ্ঠ থেমে যেতেই বললেন সুলতানের কন্যা। কন্যার উদ্দেশ্যে সুলতান বললেন, চিকিৎসক বলেছে আমার শরীর নাকি খুব ভেঙে পড়েছে, বিশ্রাম নিতে হবে।

শাইখুল আসফান্দ যেভাবে বিশ্রাম নিতে বলেছেন, আপনার উচিত সেভাবেই বিশ্রাম নেয়া। বললেন সুলতানের বেগম। আমার ছেলেরা আপনার দায়িত্ব ঠিকই পালন করতে পারবে।

তা পারবে বৈকি বেগম! কিন্তু সেলজুকীদেরকে এরা শায়েস্তা করতে পারবে না। হিন্দুস্তানের জাঠদের মাথা গুড়িয়ে দেয়াও এদের জন্যে কঠিন হবে বেগম! মরার আগে এই দু'টি কাজ করেই আমাকে মরতে হবে।

ঐতিহাসিক আলবিরুনী লিখেছেন, সত্যিকার অর্থেই তখন সুলতান মাহমূদের শরীর ভেঙে গিয়েছিল। দৃশ্যত তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তিনি ক্লান্ত অসুস্থ। কিন্তু তিনি শরীরের তোয়াক্কা না করে চিকিৎসক চলে যাওয়ার পর বিশ্রাম না নিয়ে সেনাকর্মকর্তাদের ডেকে পাঠালেন এবং জরুরী নির্দেশনা দিয়ে বললেন, আগামীকাল সূর্য উঠার আগেই আমি গযনীর জামে মসজিদ ও আমার বাড়ীর সদর দরজার পথে সোমনাথ থেকে আনা শিবমূর্তির টুকরো এভাবে দেখতে চাই; যাতে মানুষ এগুলো মাড়িয়ে যাতায়াত করে এবং মক্কা ও মদীনার জন্যে দু'টি টুকরো আগামীকালই পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় দিনই সুলতান মাহমূদ হিন্দুস্তানের জাঠ উপজাতির বিরুদ্ধে সেনাভিযানে প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে সেনাদের নির্দেশ দিলেন। সেই সাথে সৈন্য ঘাটতি পূরণে নতুন সেনা ভর্তির নির্দেশ দিয়ে তাদেরকে কঠোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চৌকস যোদ্ধায় পরিণত করার দিক নির্দেশনা দিলেন।

সুলতান মাহমূদ চিকিৎসকের সতর্কবাণীর পরোয়া না করে, অবসর ও বিশ্রাম নেয়ার কোন তোয়াক্কা না করে নতুন সেনা ভর্তি ও প্রশিক্ষণের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। সেই সাথে সরকারী প্রশাসনিক কর্মকান্ডে আত্মনিয়োগ করলেন। অপর দিকে লাহোর ও মুলতানের গভর্নরের কাছে জাঠদের সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানোর জন্যে পয়গাম পাঠালেন।

সময় দ্রুত গড়িয়ে যেতে লাগলো। ইতোমধ্যে লাহোর ও মুলতান থেকে জাঠদের রিপোর্ট আসতে শুরু করলো। রিপোর্টে বলা হয়েছে, জাঠ জাতিগোষ্ঠী সিন্ধু অববাহিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ি রয়েছে। এরা জাতি হিসেবে লড়াকু এবং দুঃসাহসী। এদের সংখ্যা বিপুল। এরা সাধারণত ঝটিকা আক্রমণ, রাতের বেলায় চোরাগুপ্তা হামলা এবং নদী ও সাগরে দস্যিবৃত্তি করে। এরা নৌপথে লড়াইয়ে খুবই পটু।

তখনকার দিনে সিন্ধু নদী ছিলো খুবই চওড়া। নদীর মাঝে বহু চর ছিলো। যেগুলোর অবস্থা ছিলো অনেকটা দ্বীপের মতো। এসব দ্বীপ সদৃশ চরাঞ্চলগুলোতে ঘনজঙ্গলে বসবাস করতো হাজার হাজার জাঠ। সুলতান মাহমূদের কাছে খবর এলো, দিন দিন জাঠ জনগোষ্ঠী হিন্দুস্তানের মুসলমানদের জন্যে সমস্যারূপে আবির্ভূত হচ্ছে। এরা বংশানুক্রমে সোমনাথের পূজারী হওয়ায় নিরীহ হিন্দুস্তানী মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে সোমনাথের প্রতিশোধ নিতে তৎপর।

এসময় হিন্দুস্তানের লাহোর মুলতান ও বর্তমান পাঞ্জাবের গোটা অংশই ছিলো গযনী সালতানাতের দখলে। এবং কাশ্মীর থেকে কন্নৌজ পর্যন্ত গোটা এলাকা ছিলো গযনী সালতানাতের বিজিত এলাকা। এবং এ অঞ্চলের সকল রাজা মহারাজাই সুলতান মাহমূদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

মূলত হিন্দুস্তানের মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যেই সুলতান মাহমূদ সম্ভাব্য হুমকি জাঠদের শক্তি খর্ব করতে চাচ্ছিলেন, যাতে ওরা মুসলমানদের জন্যে হুমকি হয়ে না উঠতে পারে এবং পুনর্বার সোমনাথ মন্দির নির্মাণ কিংবা শিবমূর্তির পূজার আয়োজন জোরদার না হয়।

১০২৬ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সুলতানের কাছে খবর পৌঁছলো জাঠ জনগোষ্ঠী গযনীর মোকাবেলায় যুদ্ধ ঘোষণার জন্যে বিশাল রণপ্রস্তুতি শুরু করেছে। জাঠদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে, স্থানীয় এক মুসলমান গযনীর পক্ষে গোয়েন্দাগিরী করতে গিয়ে জাঠদের হাতে গ্রেফতার হয়। পরবর্তীতে সে ফেরার হয়ে ফিরে এসে সুলতানকে জানায়, জাঠদের খবর নেয়ার জন্যে একজন ভবঘুরে হিসেবে ছদ্মবেশে আমি ওদের এলাকার অনেক ভেতরে যাওয়ার জন্যে একদিন একটি ছোট নৌকায় সওয়ার হই। কিন্তু আমি ঝড় তুফান কিংবা বিরূপ পরিস্থিতিতে কিভাবে নৌকা সামলাতে হয় তা জানতাম না। আমি যখন নৌকায় সওয়ার হই তখন নদী ছিলো শান্ত, তেমন ঢেউ ছিলো না। স্রোতের টানও আমি বেশী বুঝতে পারিনি। যেই নৌকায় আরোহণ করে নদীতে ভেসেছি স্রোতের টানে নৌকা ভেসে যেতে লাগলো।

আমি যতোই চেষ্টা করছি কূলে নৌকা ভেড়াতে, নৌকা আরো নদীর গভীরে যেতে লাগলো। ঠিক সেই সময় আকাশ অন্ধকার করে এলো প্রবল ঝড় বৃষ্টি। আমি নৌকাকে সামলাতে পারলাম না। নৌকা ঢেউ ও স্রোতের দ্বিমুখী নাচনে হঠাৎ উল্টে গেলো। আমি পানিতে হাবু ডুবু খেয়ে কোন মতে ভাসমান নৌকা আঁকড়ে থাকলাম। স্রোতের টান ও ঢেউ এর ধাক্কায় একসময় একটি দ্বীপ চড়ে গিয়ে আমার নৌকা আঁছড়ে পড়লো। আমি কোন মতে শরীরটাকে টেনে ডাঙ্গায় উঠালাম ঠিকই কিন্তু অচেনা অজানা বিজন জঙ্গল দেখে আমার দেহের অবশিষ্ট শক্তিও নিঃশেষ হয়ে গেলো।

একসময় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন দেখি আমি জাঠদের একটি ঝুপড়িতে শুয়ে আছি। আমার কাছে দুজন জাঠ মহিলা বসা ছিলো। হুঁশ ফিরতেই যুবতী মহিলা জানতে চাইলো তুমি কে? কোত্থেকে এসেছো? পানিতে পড়েছো কিভাবে? সে মহিলাদের কাছে নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে কথা বললো। কিন্তু জাঠ পুরুষরা যখন তার সাথে কথা বললো তখন তাদের কাছে এই গোয়েন্দার কথাবার্তা সন্দেহজনক মনে হলো। ফলে তারা বললো, তুই যদি তোর সত্যিকার পরিচয় না বলিস, তাহলে তোকে সাগরে ফেলে দেবো। এই বলে জাঠদের কয়েকজন তাকে ধরে সাগরে ফেলে আসার জন্যে কাধে উঠিয়ে নিলো। জীবন ভয়ে সে তখন তার আসল পরিচয় বলে দিলো। কিন্তু জাঠরা এতে সন্তুষ্ট হতে পারলো না। তাকে বন্দি করে রাখলো এবং অধিকতর তথ্য বলার জন্য উৎপীড়ন করতে শুরু করলো। এক পর্যায়ে সে

বলে দিলো, আমি গযনীর গোয়েন্দা। গযনী সরকার তোমাদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অচিরেই তারা হামলা করবে।

কিন্তু তাতেও জাঠদের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেলো না সে। তাকে নজরবন্দি করে রাখলো। জাঠরা তার কাছ থেকে জানতে চাইতো গযনী বাহিনীর লড়াই করার কৌশল কি? এরা কিভাবে লড়াই করে। ডাঙ্গায় না পানিতে বেশী পটু ইত্যাদি। বন্দি গোয়েন্দা জাঠদের আস্থা অর্জনের জন্য গযনী বাহিনীর রণকৌশল, তাদের রণ প্রস্তুতি সম্পর্কে আরো বেশী করে তথ্য সরবরাহ করতে লাগলো। এক পর্যায়ে তার থাকা খাওয়ার সুবিধা কিছুটা বাড়ালেও তাকে সম্পূর্ণ নজর বন্দি থেকে মুক্তি দিলো না।

যে যুবতী মহিলা প্রথম দিন তার পাশে বসা ছিলো, সে ছিলো এক জাঠ সর্দারের স্ত্রী। প্রথম দিন থেকেই এই মহিলা বন্দি গোয়েন্দার প্রতি একটু বেশী অনুরাগ দেখাচ্ছিল। জাঠরা যখন বন্দির প্রতি কিছুটা প্রসন্ন হয়ে তাকে স্বাভাবিক খাবার দাবার ও বন্ধনহীন চলাফেরার সুবিধা দিলো, তখন এই যুবতী মহিলা তার সাথে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করলো। অল্প দিনের মধ্যেই বন্দি গোয়েন্দা ও যুবতীর মধ্যে গড়ে উঠলো হৃদ্যতা। একদিন সুবিধা পেয়ে মহিলা বললো, আমার স্বামী একজন জাঠ সর্দার। এই বুড়ো শয়তানটার সাথে ঘর করার চেয়ে মৃত্যু ভালো। আমার ইচ্ছা করে যদি কোথাও পালিয়ে যেতে পারতাম তাহলে চলে যেতাম।

সুযোগ পেয়ে বন্দি গোয়েন্দা বললো, তুমি যদি এখান থেকে আমার পালানোর ব্যবস্থা করতে পারো, তবে আমি তোমাকে সাথে নিয়ে মুলতান চলে যাবো। আর সেখানে গেলে তোমাকে বন্দিনী হয়ে থাকতে হবে না। রাজরানী হয়ে থাকবে।

বন্দির মুখে একথা শুনে মহিলা তাকে জানালো, তোমার আগেও এক মুসলমানকে এরা গ্রেফতার করেছিলো। তার কাছ থেকেই এরা জানতে পারে গযনীর মুসলমানরা জাঠদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ খবর পাওয়ার পর থেকেই জাঠরা যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। শত শত নৌকা তৈরীর কাজ শুরু হয়। কিন্তু সেই গোয়েন্দা তাদের অনেক তথ্য জানানোর পরও তারা তাকে মুক্তি দেয়নি, হত্যা করে সাগরে ফেলে দেয়।

এক চাঁদনী রাতে নদীতে ভাটা পড়েছে। কোন বাতাস নেই, ঢেউ নেই, শান্ত পরিবেশ। সেই সর্দার পত্নী অতি সন্তর্পণে বন্দি গোয়েন্দার কাছে এসে বললো,

যদি পালাতে চাও তাহলে তাড়াতাড়ি আমার সাথে এসো। যুবতী মহিলা গোয়েন্দাকে ঘর থেকে বের করে একটি জঙ্গলাকীর্ণ পথে নদী তীরে নিয়ে এসে একটি ছোট্ট নৌকায় বসিয়ে নৌকার বাঁধন খুলে পানিতে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে বললো, তাড়াতাড়ি বৈঠা হাতে নিয়ে পানিতে চাপ দাও। মহিলা নিজে নৌকার হাল ধরলো এবং দ্রুত নৌকা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো।

তারা নদীর তীর থেকে কিছুটা ভেতরে যেতে না যেতেই নদী তীরে অনেকগুলো মশালের দৌড়ঝাপ শুরু হয়ে গেলো। চাঁদনী রাতের আলোয় জাঠদের বুঝতে অসুবিধা হলো না, সর্দার পত্নীই বন্দীকে নিয়ে পালানোর জন্যে নৌকায় উঠেছে। জাঠরা তাদের লক্ষ করে হুমকি দিলো, যদি বাঁচতে চাও ফিরে এসো। কিন্তু তারা হুমকি শুনে আরো প্রাণপণে নৌকা চালানোর জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো। জাঠরা যখন দেখলো, তাদের ফেরার সম্ভাবনা নেই, তখন ওদের লক্ষ করে তীর বৃষ্টি শুরু করলো। হিংস্র ও জংলী জাতি হওয়ার কারণে জাঠরা ছিলো তীরন্দাজীতে পটু। ওদের প্রথম তীরটিই এসে বিদ্ধ হলো সর্দার পত্নীর গায়ে। সে আর্তচিৎকার দিয়ে নৌকায় পড়ে গেলো। অবস্থা বেগতিক দেখে গোয়েন্দা নৌকার তলায় শুয়ে পড়লো এবং জীবনের আশা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিলো। গোয়েন্দাকেও পড়ে যেতে দেখে এবং পানির স্রোতে নৌকা ভাসতে দেখে জাঠরা নিশ্চিত হলো ওরা উভয়েই তীরবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেছে। ফলে শুধু নৌকা ধরার জন্য তাদের কেউ আর রাতের অন্ধকারে পানিতে ভাসতে চাইলো না।

নদীতে স্রোত ছিলো তীব্র। দেখতে দেখতে নৌকা জাঠদের আয়ত্বের বাইরে চলে গেলো এবং অদৃশ্য হয়ে গেলো! অনেকক্ষণ পর গোয়েন্দা যখন বুঝলো, আর কোন তীর নৌকায় আঘাতের শব্দ হচ্ছে না তখন সে আস্তে করে মাথা তুলে চারপাশটা দেখে নিলো। না, দৃষ্টি সীমার মধ্যে কোন বিপদের আশংকা নেই। তখন সে বৈঠা বেয়ে নৌকাকে বিপরীত তীরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুরু করে দিলো।

অনেক ভাটিতে গিয়ে বিপরীত তীরে নৌকা ভেড়াতে সক্ষম হলো গোয়েন্দা। তার শরীরে একাধিক তীরের আঘাত লেগেছে কিন্তু কোনটাই বিদ্ধ হয়নি। রক্তক্ষরণ ও অস্বাভাবিক অবস্থায় নৌকা চালানোয় তার শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু তীরে উঠে থামেনি সে। রাতের অন্ধকারেই সে মুলতানের পথ ধরলো এবং কোথাও বিশ্রাম না নিয়ে একটানা হেঁটে বহু কষ্টে আধামরা

অবস্থায় কোনমতে মুলতান পৌঁছলো। মুলতান পৌঁছেই সে গযনীর কর্মকর্তাদের জানালো তার ইতিবৃত্ত। এ খবর গযনী পৌঁছালে সুলতান মাহমূদ মুলতানের গভর্নরকে নির্দেশ দিলেন, 'আপনি দ্রুত কুড়িজন করে সৈন্য ধারণ ক্ষমতার একটি নৌবহর তৈরি করুন। খাওয়ারিজম শাহীর বিরুদ্ধে জিউন নদীর নৌ যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় বিশেষ ধরনের রণতরী তৈরী করার জন্যে একটি বিশেষ ডিজাইন উদ্ভাবন করে ছিলেন। সুলতান মাহমূদ সেই ডিজাইন মতো রণতরী তৈরীর কারিগর ও কয়েকজন অভিজ্ঞ মাল্লাহ এবং একজন কর্মকর্তাকে নৌকা তৈরির কাজ তদারকীর জন্যে মুলতান পাঠিয়ে দিলেন সুলতান।

১০২৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে সুলতানের কাছে খবর এলো, আপনার নির্দেশ অনুযায়ী এক হাজার রণতরী তৈরী হয়ে গেছে। তা ছাড়া জাঠদের রণ প্রস্তুতি এবং তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যও রিপোর্ট আকারে সুলতানের কাছে পৌঁছে গেলো। সুলতান মাহমূদ সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়, তিনি ধনরত্ন লুটতরাজ করার জন্যে বারবার হিন্দুস্তান আক্রমণ করেছেন। কিন্তু এই অভিযোগের অসাড়তা প্রমাণের জন্য জাঠদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তার সর্বশেষ অভিযানই যথেষ্ট। কেননা জাঠদের কোন স্থায়ী বসতি ছিলো না। ছিলো না কোন রাজ-রাজত্ব রাজধানী কিংবা দুর্গ ধনাগার।

মূলত জাঠরা ছিলো একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর যাযাবর উপজাতি। যারা সেলজুকীদের মতোই পয়সার বিনিময়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজার পক্ষে প্রতিপক্ষকে ঘায়েলের কাজে ব্যবহৃত হতো। শিবমূর্তির পূজারী এই উপজাতি জনগোষ্ঠীর লোকগুলো সেলজুকীদের মতোই গযনী সালতানাত এবং হিন্দুস্তানের মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্যে হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যখন ব্যাপক দমন পীড়ন ও নির্মূল অভিযানে লিপ্ত হয় তখন বাধ্য হয়েই হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সুরক্ষার জন্যে সুলতান মাহমূদ জাঠ দমন অভিযানের সংকল্প করেন।

৪১৮ হিজরী সন মোতাকে ১০২৭ সালের মার্চ মাসের শেষ ভাগে সুলতান মাহমূদ গযনী থেকে জাঠদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। মুলতান পৌঁছে তিনি জানতে পারেন, এক হাজার চারশ ষাটটি রণতরী তার নির্দেশনা মতো তৈরি করা হয়েছে। সুলতান সফরের ক্লান্তি উপেক্ষা করে তখনি রণ তরীগুলো পর্যবেক্ষণ করার জন্যে নদী তীরে চলে গেলেন। তিনি নদী তীরে গিয়ে সরাসরি একটি রণতরীতে আরোহণ করে মাল্লাদের তা চালাতে বললেন। মাল্লাদের

রণতরী চালানোর কৌশল ও অভিজ্ঞতা দেখে তিনি কুড়িজন করে তীরন্দাজ ও বর্শাধারী সৈন্যকে একেকটি নৌকায় আরোহণ করিয়ে সবগুলো নৌকা নদী.তে ভাসিয়ে যুদ্ধের মহড়া দিতে নির্দেশ দিলেন। সৈন্যরা পরম উৎসাহে মনোমুগ্ধকর নৌ মহড়া দেখালো। মাল্লারা নৌকাগুলোকে তাদের অপার কৌশলে নানা দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত ও প্রত্যাঘাতের অবস্থা সুলতানকে দেখালো। সুলতান নৌ-মহড়া দেখে মুগ্ধ হলেন এবং মহড়া সমাপ্ত করে সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করে আরো অধিকতর সামরিক দিক-নির্দেশনা দিলেন।

যেদিন সুলতান মুলতান পৌঁছলেন, সে দিনই জাঠদের অবস্থা জানার জন্যে গুপ্তচর পাঠিয়ে দেয়া হলো। অবশ্য সুলতানের নৌ-মহড়া এবং মুলতান আগমনের খবর জাঠদের কাছে গোপন রইলো না। কারণ তখন মুলতানেও ছিলো বিপুল হিন্দুর বসতি। এরা যথারীতি তাদের জ্ঞাতি জাঠদের কাছে সুলতানের নৌ প্রস্তুতির খবর পৌছে দিলো। অবশ্য জাঠরা এর বহু আগেই সুলতানের জাঠবিরোধী অভিযান প্রস্তুতির খবর পেয়ে গিয়েছিলো। তা ধৃত ও মুক্তিপ্রাপ্ত সুলতানের মুসলিম গোয়েন্দার জবানী থেকেই জানা গিয়েছিলো। পরবর্তীতে আরো জানা গেছে, জাঠরা তাদের বিরুদ্ধে গযনী সুলতানের অভিযানের খবর পেয়ে অন্তত চার হাজার বিশেষ ধরনের নৌকা তৈরী করেছিলো। জাঠদের ধারণা ছিলো জাঠবিরোধী অভিযানে নদীপথের বিভিন্ন বাধা থাকার কারণে গযনী বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে স্থলযুদ্ধ করতে বাহন হিসেবে নৌকা ব্যবহার করবে। ফলে গযনী বাহিনীকে তারা ডাঙায় উঠার আগে নদীতেই প্রতিরোধ করবে এবং নদীতেই সবার সলিল সমাধি ঘটাবে।

গোয়েন্দারা জানিয়ে ছিলো, জাঠ জনগোষ্ঠী তাদের স্ত্রী সন্তানসহ নদীর চরাঞ্চলের দ্বীপগুলোয় গিয়ে আস্তানা গেড়ে ছিলো এবং যুদ্ধের জন্যে তৈরী হচ্ছিলো। তখন নদীর চরাঞ্চল ছাড়া মূল ভূখণ্ডে জাঠ জনগোষ্ঠীর কোন লোকজন ছিলো না।

এ খবর পেয়ে সুলতান মাহমূদ তার সেনাপতিদের নির্দেশ দেন, পরিণতি যাই হোক, আমাদেরকে নদীতে ওদের মোকাবেলা করতে হবে অধিকাংশ ইন্ডিয়ান ও ইংরেজ ঐতিহাসিকের কাছে সুলতান মাহমূদের জাঠ বিরোধী নৌ যুদ্ধ তেমন গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু যারা সেই সময়কার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সার্বিক ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করেছেন, তাদের বর্ণনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, জাঠদের বিরুদ্ধে পরিচালিত গযনী বাহিনীর নৌ যুদ্ধ ছিলো গযনী বাহিনীর

সামরিক উৎকর্ষ ও নৈপুণ্যের অন্যতম নিদর্শন। অবশ্য অধিকাংশ ঐতিহাসিকের বর্ণনায় ঠিক কোন জায়গায় এই যুদ্ধ হয়েছিলো তা সবিশদ বলা হয়নি। কিন্তু মানচিত্র গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, চন্নাব নদীর তীরে মুলতান শহর অবস্থিত। এর ভাটিতে এক জায়গায় ঝিলম নদী ও রাবী নদী গিয়ে চন্নাব নদীর সাথে মিলিত হয়ে বিশাল মোহনার সৃষ্টি করেছে। এরপর আরো কয়েকটি নদী এই নদীর সাথে মিলিত হয়ে সবগুলোর সম্মিলিত স্রোতধারা গিয়ে সিন্ধু নদীতে পড়েছে।

আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে ছোট বড় কোন নদীতেই কোন বাধ ড্যাম সেতু তথা কোন প্রতিবন্ধকতা ছিলো না। ফলে স্রোতের পানি বন্ধনহীন ভাবে সব কিছু ভাসিয়ে নিতো। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায়, তখনকার সিন্ধুনদীর আকার ছিলো আরো বিশাল। এবং নদীর মাঝে প্রায় জায়গাই চর জেগে উঠেছিলো, যেগুলো ধারণ করেছিলো ছোট দ্বীপের আকার।

ঠিক কোন তারিখে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাস এ সম্পর্কে নীরব। জানা যায়, প্রায় চৌদ্দশ নৌযান নিয়ে মুলতান থেকে সুলতান মাহমূদের কাফেলা জাঠদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে। ঐতিহাসিক আবুল কাসিম ফারিশতা লিখেছেন, গযনী বাহিনীর নৌযানগুলো ছিলো খুব শক্ত। তদুপরি এগুলোর চারপাশে বর্শার মতো ধারালো লোহার পাত সেঁটে দেয়া হয়েছিলো। যাতে সাধারণ কাঠের নৌকা আঘাত করলে এগুলোর কোন ক্ষতি না হয় এবং কাঠের নৌকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পানি থেকে নৌকায় কেউ যাতে আরোহণ করতে না পারে এজন্যও গযনীর নৌযানগুলোতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা রাখা হয়েছিলো। তাছাড়া প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে এই নৌ যুদ্ধেই প্রথম সুলতান মাহমূদ আগুনের ঢিল ব্যবহার করেছেন।

মূলত তখনকার দিনে সেগুলো ছিলো জ্বালানী ভর্তি মাটির ঘটি; যাকে বর্তমানের হ্যান্ড গ্রেনেডের সাথে তুলনা করা যায়। মুলতান থেকে জাঠদের অবস্থান ছিলো ভাটিতে। ফলে গযনী বাহিনীর নৌযানগুলো স্রোতের টানে বিনা কষ্টেই ভাটির দিকে ভেসে যাচ্ছিল। প্রতিটি নৌযান ছিলো সমদূরত্বে। মাঝে ছিলো সুলতান মাহমূদের নৌকা। তা ছাড়া দ্রুত খবর পৌছানোর জন্য কিছু নৌকা ছিলো সংবাদবাহক। এগুলো ছিলো দ্রুতগামী এবং তাতে মাল্লাও ছিলো বেশী।

পঞ্চনদের মিলনস্থল পেরিয়ে কিছুটা এগুতেই জাঠদের নৌবহর দেখা গেলো। জাঠদের নৌকাগুলো ছিলো অর্ধবৃত্তাকারে রাখা। তাদের নৌযানের

সংখ্যা এতোটাই বিশাল ছিলো যে, দেখে মনে হচ্ছিল পানি নয় শুধু নৌকা আর নৌকা। যেন বিশাল এলাকা জুড়ে নৌকার মেলা বসেছে। সুলতান মাহমূদ এক সারিতে আসা নৌকাগুলোর গতি থামিয়ে সবগুলোকে পাশাপাশি এক সারিতে স্থাপন করলেন, যাতে জাঠরা তাদেরকে ঘেরাও এর মধ্যে ফেলতে না পারে।

প্রথমে জাঠরা গযনী বাহিনীর দিকে তীর ছুঁড়ে আক্রমণের সূচনা করলো। এরপর সুলতান মাহমূদ আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। তিনি প্রতিটি নৌযানের মধ্যে পর্যাপ্ত জায়গা ফাঁকা রাখলেন, যাতে প্রতিটি নৌযান প্রয়োজনে ঘুরতে এবং অগ্রপশ্চাত হতে পারে। এক্ষেত্রে নদীর স্রোত ছিলো গযনী বাহিনীর পক্ষে কারণ তাদেরকে আক্রমণের জন্যে তেমন কষ্ট করতে হচ্ছিল না। কিন্তু জাঠদেরকে আক্রমণ করতে হতো স্রোতের বিপরীতে নৌকা বেয়ে। যাতে প্রচুর জনবল নিয়োগ করতে হতো। ফলে আক্রমণ প্রতি আক্রমণের জন্যে জাঠরা ততোটা সুবিধা পাচ্ছিল না।

এক পর্যায়ে সুলতান মাহমূদ পূর্ণ শক্তিতে জাঠদের প্রতি তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। জাঠদের তীর ছিলো গযনীর তীরের চেয়ে আরো বেশী সর্বনাসী।

গযনী সৈন্যরা 'আল্লাহু আকবার' বলে বীর বি'ক্রমে হামলে পড়লো জাঠদের উপর। জাঠরাও তাদের ভাষায় চিৎকার দিচ্ছিল কিন্তু তাদের ভাষার চিৎকারের মধ্যে বাস্তবে উদ্দীপনামূলক কিছু ছিলো না। তবে তারা ছিলো লড়াকু ও নির্ভিক। দেখতে দেখতে অল্পক্ষণের মধ্যে উভয় বাহিনীর নৌযানের মধ্যে শুরু হলো সংঘর্ষ। গযনীর সৈন্যরা হঠাৎ করে তীরের পাশাপাশি জাঠদের নৌকার দিকে ছুড়তে শুরু করলো অগ্নিবাহি জ্বালানী ভর্তি ঘটি সদৃশ বোমা। এসব ঘটি নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি নৌযানে আগুন ছড়িয়ে পড়ছিলো এবং মানুষ আসবাব নৌকাসহ সবকিছুকেই গ্রাস করছিলো আগুন  প্রাণ বাঁচাতে নদীতে ঝাপিয়ে পড়ছিলো জাঠযোদ্ধারা কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত এই অগ্নি বোমার আঘাতেও জাঠরা হতোদ্যম হলো না। তারা পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে মুসলমানদের নৌকায় আরোহণ করার চেষ্টা করছিল কিন্তু আরোহণ করতে গিয়ে তারা গযনী বাহিনীর নৌযানের বহিরাবরণে সেঁটে রাখা ধারালো ইস্পাতের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল আর উপর থেকে গযনীর তীরন্দাজ ও বর্শাধারীরা তাদের বর্শা ও বল্লম বিদ্ধ করে পানিতে ডুবিয়ে দিচ্ছিলো।

জাঠদের রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছিল নদীর পানি কিন্তু তবুও তারা দমার পাত্র ছিলো না। জাঠদের চার হাজার নৌকার বিশাল বহরে গযনী বাহিনীর চৌদ্দশ নৌকা হারিয়ে গিয়েছিলো, দৃশতঃ গঠন শৈলী ভিন্নতর না হলে জাঠদের নৌকার ভীড়ের মধ্যে গযনী বাহিনীকে খুঁজে বের করাই মুশকিল হতো।

নৌকার সাথে নৌকার সংঘর্ষ ঘটিয়ে নৌকা উল্টে দেয়ার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিলো গযনী সেনাদের। তারা এই কৌশল ব্যবহার করে কয়েকটি জাঠতরী উল্টে দিয়েছিলো কিন্তু জাঠদের তাতে কিছুই হলো না। দেখে মনে হচ্ছিলো এরা যেন পানির কীট। এরা উল্টে যাওয়া নৌকার নীচ থেকে ডুব দিয়ে দূরে ভেসে উঠে প্রতিপক্ষের নৌযানে আরোহণের চেষ্টা করছিলো। জাঠরা প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে একটা নতুন চাল দিলো। তারা দৃশ্যত পলায়নপর এমন ভাব বোঝানোর জন্য বহু নৌকা তীরে ভিড়িয়ে ডাঙায় নেমে গেলো। এবং কিছুটা ঘুরে নদীরকূল থেকে মুসলমানদের উপর তীর আক্রমণের কৌশল নিলো। কিন্তু জাঠদের এই কৌশলে কোন ফলোদয় হলো না। তাদের সম্ভাব্য এমন পরিস্থিতি মোকাবেলার ব্যবস্থা সুলতান আগেই করে রেখেছিলেন। তিনি রাতের অন্ধকারে দুই ইউনিট তীরন্দাজকে ডাঙায় নামিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন তীর থেকে দূরে ঘনজঙ্গল ও ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে। জাঠরা ওদিকে গেলে অজ্ঞাতস্থান থেকে তীর মেরে ইহলিলা সাঙ্গ করে দিতে। জাঠরা মোটেও জানতো না নৌযানের বাইরেও গযনীর সেনারা ডাঙায় লুকিয়ে থাকতে পারে। যেই না তারা ডাঙায় উঠে পথঘুরে মুসলমানদের উপর আক্রমণের চেষ্টা করলো অমনিতেই তারা গযনীর তীরন্দাজদের অজ্ঞাত তীর বিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থাকলো। ফলে ফলাফল দাঁড়ালো, যেসব জাঠ ডাঙায় গিয়েছিলো এদের পক্ষে আর আক্রমণে ফিরে আসা সম্ভব হলো না। এদিকে নদীতে জাঠদের সবচেয়ে বেশী সমস্যা তৈরী করেছিলো গযনী বাহিনীর অগ্নিবোমা। অগ্নিবোমায় যেসব নৌযানে আগুন জ্বলে উঠেছিলো গযনীর মাল্লারা সেইসব জ্বলন্ত নৌকার দিকে অন্য জাঠ নৌকাগুলোকে ধাক্কা দিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছিলো ফলে একটির আগুন ছড়িয়ে পড়ছিলো আরেকটিতে।

কোন মানুষই পুড়ে মরতে চায় না। জাঠরা অগ্নিদগ্ধ হওয়া থেকে বাঁচার জন্য নদীতে ঝাপিয়ে পড়তো আর মুসলমানদের নৌকায় আরোহণের চেষ্টা করতে গিয়ে তাদের তীরবর্শা বিদ্ধ হয়ে নদীতে হাবুডুবু খেয়ে তলিয়ে যেতো। আর ডাঙায় গযনীর তীরন্দাজদের অজ্ঞাত তীরে বেঘুরে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছিলো

আবেগতাড়িত লড়াকু জাঠরা। তাদের শক্তি সামর্থ সাহস সবকিছুই ছিলো কিন্তু সুলতান মাহমূদের কৌশলের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছিলো জাঠদের দুঃসাহস বীরত্ব। সময় যতোই গড়াতে লাগলো সিন্ধুনদীর পানি জাঠদের রক্তে লাল হতে শুরু করলো। আহত জাঠরা পানিতে তরফাতে তরফাতে হাবুডুবু খেয়ে তলিয়ে যেতে লাগলো। সুলতান মাহমূদ তার মাল্লাদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা তরীগুলোকে তীরের কাছাকাছি রাখবে। এই নির্দেশের ফলে গযনীর মাল্লারা যখন তাদের তরীগুলোকে তীরের দিকে চাপাতে শুরু করলো যুদ্ধরত জাঠরা চাপে পড়ে গযনী বাহিনীর ঘেরাও-এর মধ্যে পড়ে এক জায়গায় আটকে গেলো। তারা না পারছিলো ডাঙায় উঠতে না পারছিলো গযনী সেনাদের উপর চড়াও হতে।

এর কিছুক্ষণ পরেই জাঠদের অবস্থা এমন হলো যে, তারা প্রতিরোধ যুদ্ধ চালানোর সামর্থও হারিয়ে ফেললো। যারা তখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলো তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। কারণ তাদেরকে সুবিন্যস্তভাবে যুদ্ধ করানোর মতো নেতৃস্থানীয় কেউ অবশিষ্ট ছিলো না। ফলে বেশীক্ষণ আর জাঠদের পক্ষে দৃঢ়ভাবে গযনী বাহিনীর মোকাবেলা করা সম্ভব হলো না। তারা বিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ভেবে অনেকেই নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে তীরে উঠে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছিলো, কিন্তু তীরে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো মৃত্যু। কারণ আগে থেকেই গযনীর সেনারা তীরের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কব্জায় নিয়ে নিয়েছিলো। যারাই তীরে উঠে ছিলো তাদের পক্ষে আর বেঁচে থাকা সম্ভব হলো না।

এক পর্যায়ে যখন নৌকা নিয়ে পালাতে শুরু করলো জাঠরা তখন গযনী বাহিনী তাদের পিছু ধাওয়া করতে লাগলো। এবং যখনই তারা কোন চর বা দ্বীপে উঠতে চেষ্টা করেছে গযনীর সেনারা সেই চরে অগ্নিবোমা নিক্ষেপ করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এভাবে চর ও দ্বীপের যেসব ঝুপড়িতে জাঠদের স্ত্রী সন্তানরা অবস্থান করছিলো সেগুলোও বোমার আগুনে পুড়তে লাগলো। আর নারী শিশুরা আর্তচিৎকার করে বাঁচার জন্যে পানিতে ঝাপিয়ে পড়লো কিন্তু তাদের আশ্রয় কিংবা বাঁচানোর মতো কোন সক্ষম জাঠ অবশিষ্ট ছিলো না। যেসব জাঠ প্রাণ ভয়ে ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে ছিলো এদেরকেও ধরে ধরে গযনীর সেনারা নদীতে নয়তো নৌকায় নিক্ষেপ করছিলো। যেসব নারী শিশু বেঁচে ছিলো এরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেলো। বস্তুত সংঘবদ্ধ জাঠ জনগোষ্ঠী

বলে আর অবশিষ্ট কিছুই রইলো না। জাঠরা অতি আত্মবিশ্বাসে কচুকাটা হয়ে গেলো।

১০২৭ সালের জুলাই মাসে সুলতান মাহমূদ জাঠদের নিমূর্ল করে গযনী ফিরলেন। এবার চিকিৎসক তাকে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কারণ তখন অসুস্থতা ও দুর্বলতার ছাপ সুলতানের চেহারায় ফুটে উঠেছিলো। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এবার সুলতান যখন দ্বীপাঞ্চলে জাঠদের সাথে যুদ্ধ করতে গেলেন তখন চর দ্বীপের ম্যালেরিয়াবাহী মশা তার শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর সংক্রমণ ঘটায়। কিন্তু যুদ্ধে থাকার কারণে তিনি তার অসুস্থতার কথা সফরসঙ্গী চিকিৎসকদের বলেননি।

তিনি গযনী ফিরে এলে দীর্ঘদিনের ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপে তার বুকে ব্যথা শুরু হয়ে গেলো। এক পর্যায়ে দেখা গেলো তার পাকস্থলীর কার্যকারিতাও রহিত হওয়ার উপক্রম হয়ে গেছে।

সুলতানের বয়স তখন ৫৭ বছর। এর মধ্যে ৪০ বছর তার কেটেছে যুদ্ধ ময়দান কিংবা রণ প্রস্তুতি কিংবা যুদ্ধ সফরে। এর মধ্যে যতটুকু সময় তিনি গযনী থেকেছেন তখন ব্যস্ত থেকেছেন শাসনযন্ত্র, সেনাবাহিনীর ঘাটতি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিয়ে। তাছাড়া চতুর্মুখী প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করে অভিষ্ট লক্ষে উপনীত হওয়ার পাহাড়সম দুশ্চিন্তা তাকে সারাক্ষণ পেরেশান করে রাখতো। সুলতানের আশংকাজনক শারীরিক অবনতি দেখে তার একান্ত চিকিৎসক একদিন উজির ও প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ, সেনাপতি আরসালান জাযেব ও সেনাপতি আবুল হাসানকে একত্রিত করে বললেন–

সুলতান তার মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বিষয়টি কাউকে না জানানোর জন্যে আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন, কিন্তু এখন তার শারীরিক অবস্থা এতোটাই অবনতি ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে যে, না জানানোটাকে আমি খেয়ানত মনে করছি। কারণ সুলতান মাহমূদ এর সুস্থতা শুধু তার পরিবার পরিজন স্ত্রী সন্তানের ব্যাপার নয়।

সুলতান মাহমূদ মুসলিম উম্মাহর জন্য অমূল্য সম্পদ। আপনারা জানেন, মুহাম্মদ বিন কাসিমের বহু বছর পর গযনী একজন সুলতান মাহমূদ জন্ম দিয়েছে কিন্তু ততো দিনে হিন্দুস্তান আবারো মূর্তি পূজার অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিলো এবং বিন কাসিমের জ্বালানো ইসলামের আলো বিলীন হয়ে পড়েছিলো। এখন সেই ক্ষণজন্মা সুলতান মাহমূদও যাওয়ার পথে। না জানি তিনি চলে গেলে

আবার ইসলামের আলো নিষ্প্রভ হতে শুরু করে কি-না। কে জানে! আবার কখন আরেকজন বিন কাসিম আসবে আবার কখন আরেকজন সুলতান মাহমূদ আসবে। কে জানে আবার ইসলাম ও মুসলমানরা কাফেবদের রক্ত চক্ষুর শিকার হয়ে পড়ে কি-না?

কি হয়েছে সুলতানের? জানতে চাইলেন উজির।

সুলতানের যক্ষ্মা হয়েছে! সেই সাথে তার হৃদযন্ত্র ও পাকস্থলিও বিগড়ে গেছে। এটা আজ নয়, আমি তিন বছর আগেই এই রোগ সনাক্ত করেছি, তাকে সতর্ক ও সচেতন হওয়ার অনুরোধ করেছি। বিশ্রাম ও ঠিকমতো ওষুধ সেবনের পরামর্শ দিয়েছি কিন্তু তিনি কাজের চাপে দায়িত্বের ব্যস্ততায় নিজের শরীরের প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। শরীরের যতটুকু বিশ্রাম ও যত্ন নেয়ার দরকার ছিলো তারপক্ষে মোটেও তা করা সম্ভব হয়নি। বরঞ্চ বলা চলে নিজের ভেতরে তিনি রোগ লালন করেছেন।

চিকিৎসক শাইখুল আসফান্দ বলেন, আমাদের সুলতান বড় বড় শক্তিধরকে পরাজিত করেছেন অবশেষে মৃত্যুকেও কাবু করে ফেলেছিলেন। কারণ যতো দিন থেকে তিনি এই অসুখে আক্রান্ত সুলতান ছাড়া যে কোন মানুষ হলে এতো দিনে নির্ঘাত মৃত্যু বরণ করতো কিন্তু সুলতানের দেহকোষকে এই মরণব্যাধি ভেঙে দেয়ার পরও তিনি আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে একের পর এক যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন, যদিও রোগ তার দেহের প্রতিরোধ শক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিচ্ছিলো। সুলতান প্রমাণ করেছেন স্থির লক্ষবস্তু, অবিচল আত্মবিশ্বাস, দৃঢ় সংকল্প এবং উদ্দেশ্য মহান ও পবিত্র হলে শরীর অক্ষম হলেও আত্মশক্তি দিয়ে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।

বস্তুত সুলতানকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অচলই বলা যায়। আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ! যে কোন মূল্যে আপনারা সুলতানকে সবকিছু থেকে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেহের প্রতি মনোযোগী ও চিকিৎসার প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্যে রাজি করান। এটা শুধু সুলতানের পরিবারের প্রতি নয়, গোটা মুসলিম দুনিয়ার প্রতি খুবই কল্যাণকর হবে। সুলতানের সুস্থতা হিন্দুস্তানের মুসলমানদের জন্যেও রহমত বয়ে আনবে। যারা শতশত বছর পর নিজের অতীত ঐতিহ্য ফিরে পেয়েছে এবং হিন্দুদের নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত হয়ে মাথা উঁচু করে স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম করতে পারছে। সুলতানের শারীরিক অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তার বিছানা থেকেই উঠা উচিত নয়।

রোগ ও অসুস্থতা সুলতান মাহমূদকে শয্যাশায়ী করতে পারলো না। কারণ তার উজির ও সেনাপতিগণ শুধু তার আজ্ঞাবহ ছিলেন না, ছিলেন তার বন্ধুও। তারা যেমন ছিলেন তার সহকর্মী তেমনই ছিলেন তার বহু গোপন রহস্য ও ভেদের বাহক। একদল নিবেদিত প্রাণ সহকর্মী যোদ্ধা এবং জীবনত্যাগী সঙ্গীর বদৌলতেই তিনি নতুন নতুন ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তার সহযোদ্ধারা বিন্দুমাত্র তার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাননি। আনুগত্যে নির্দেশ পালনে সামান্য ক্রটি করেন নি। জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও সুলতান সহকর্মী ও উপদেষ্টাদের পরামর্শে বদল করেছেন। তাদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে সম্মান করেছেন।

কিন্তু তারাই যখন সুলতানকে অসুস্থতাজনিত কারণে বিশ্রাম ও চিকিৎসার প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিলেন, তখন হেসে সকলের পরামর্শই তিনি উড়িয়ে দিলেন। তিনি তার ছেলেদের ডেকে বললেন, আমার মধ্যে যে শক্তি আছে তা আল্লাহ তোমাদের মধ্যেও দিয়েছেন। সেই সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোল, ইচ্ছাশক্তি ও লক্ষ উদ্দেশ্যকে পবিত্র রাখো। শুধু আল্লাহর সাহায্য কামনা করো এবং কুরআনকেই জীবনের পাথেয় এবং দিক নির্দেশক বানাও। তাহলে আত্মশক্তিতে তোমরা বলীয়ান হতে পারবে।

সুলতান মাহমূদের পরিবার এবং তার সহকর্মী ও কর্মকর্তাগণ যখন তার অসুস্থতা নিয়ে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় নিপতিত ঠিক সেই সময় সুলতান মাহমূদ শারীরিক এই দুরবস্থা উপেক্ষা করে নতুন এক রণক্ষেত্রে রওয়ানা হলেন। সেই রণক্ষেত্র ছিলো অবশিষ্ট সেলজুকী জনগোষ্ঠী। এরা সংগঠিত হয়ে আবারো গযনী সালতানাতের প্রতি হুমকি হয়ে উঠেছিলো এবং গযনী সালতানাতের প্রতি নানা ধরনের হুঁশিয়ারীও উচ্চারণ করেছিলো। সেলজুকীদের শেষবারের মতো পদানত করে সুলতান মাহমূদ ইস্পাহান ও রায় এলাকাকে গযনী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করলেন এবং তার ছেলে মাসউদকে বিজিত এলাকার শাসক নিযুক্ত করলেন।

অবশেষে তিনি হাওয়া বদল করতে বলখ চলে গেলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর পক্ষে পূর্ণ বিশ্রাম নেয়া সম্ভব হলো না। রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকলেন এবং বিভিন্ন প্রদেশ সফর করলেন। এভাবে ১০২৯ সালের শীত ও গ্রীষ্মকাল তিনি বলখেই কাটালেন। এক পর্যায়ে এখানকার আবহাওয়াও তার প্রতিকূল হয়ে উঠলো। আসলে তখন দুনিয়ার আবহাওয়াই তার জন্যে অসহ্য হয়ে উঠেছিলো।

একদিন তিনি বলখ ছেড়ে গযনী চলে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। কর্মকর্তারা তাকে বিশেষ বাহনে গযনী নিয়ে এলেন। কিন্তু গযনী পৌঁছেই তিনি জ্ঞান হারালেন। সুলতানের একান্ত চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা করলেন। চিকিৎসকের দু'চোখ গড়িয়ে অঝোরধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তিনি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন সুলতান। সুলতান কিছু একটা বলার জন্যে তার হাত উপরে উঠালেন কিন্তু হাত উচিয়ে রাখতে পারলেন না। হাত অসাড় হয়ে তার বুকে আঁচড়ে পড়লো। অন্তিম অবস্থা দেখে তাঁর স্ত্রী ডাকলেন, ছেলেরা আব্বা আব্বা করে বহু ডাকলো কিন্তু সুলতানের পক্ষে সাড়া দেয়া সম্ভব হলো না। তখন শুধু তার শ্বাসটুকুই অব্যাহত ছিলো কথা বলার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো।

এমতাবস্থায় শহরের সবচেয়ে সুকণ্ঠের অধিকারী হাফেযদেরকে তার শিয়রের কাছে কুরআন তেলাওয়াতের জন্যে বসিয়ে দেয়া হলো। কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের সময় মাঝে মধ্যেই সুলতানের শরীর দুলে উঠছিলো এবং তার ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠছিলো। তাতে বুঝা যাচ্ছিলো, কুরআনের ভাষা তিনি শুনছিলেন এবং অনুধাবন করতে পারছিলেন। তেলাওয়াত শুরুর আগে তার শরীর কিছুটা নীলাভ ও বিবর্ণরূপ ধারণ করেছিল কিন্তু তেলাওয়াতের সাথে সাথে তা কমে আসে এবং একটা মায়াবী ও আলোকিত ভাব তার সারা দেহে ফুটে উঠে।

যে ক্ষণজন্মা অমিততেজী জগৎশ্রেষ্ঠ বীর অসংখ্য বীর পাহলোয়ানকে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন, অক্ষয় অজেয় পাথুরে খোদাদের যিনি টুকরো টুকরো করে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করেছিলেন, সেই দিগ্বিজয়ী বীর পুরুষ এখন স্থবির নিশ্চল। তাঁর দেহে একটু নড়াচড়া করার সামর্থও নেই।

১০৩০ সালের ৩০ এপ্রিল মোতাবেক ৪২১ হিজরী সনের ২৩ রবিউচ্ছানী বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটায় শেষবারের মতো ইতিহাসের এই বীরপুরুষের ঠোঁটে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে উঠে এবং তখনই তিনি শেষবারের মতো নিঃশ্বাস ত্যাগ করে দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নেন।

মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে চিকিৎসক ডুকরে কেঁদে উঠেন। মুসলিম ইতিহাসে মূর্তি সংহারী নামে খ্যাত সুলতান মাহমূদকে সেই রাতের ইশার নামাযের পর

মশালের আলোয় তার প্রিয় বাগান ফিরোজীবাগে দাফন করা হয়। এই বাগানে প্রায়ই তিনি বিশ্রাম করতেন, পায়চারী করতেন।

দাফনের পর সুলতান মাহমূদের ছেলেরা তার পিতার কবরকে কেন্দ্র করে বিশাল স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু এই কবরস্থানের প্রতি সাধারণ মানুষ ও পরবর্তীকালের মুসলিম বিদ্বেষীরা বহু অন্যায় ও অত্যাচার করেছে। অতি ভক্তরা বরকতের উদ্দেশ্যে তার কবরের মাটি ও স্থাপনার চৌকাঠ কেটে নিতে শুরু করে। ফলে বাধ্য হয়ে তার কবরটির চিহ্ন মুছে দিয়ে সেখানে আরো বহু কবর তৈরী করা হয়।

গযনীর মুসলিম সালতানাত নিঃশেষ হয়ে যখন এলাকাটি ইংরেজদের কবলে চলে যায়, তখন ইতিহাসের নিষ্ঠুর ও মুসলিম বিদ্বেষী ইংরেজ লর্ড মৃত সুলতান মাহমূদের সাথে সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম আচরণ করেন। তিনি তার কবরে নির্মিত স্থাপনার প্রধান দরজাটি খুলে হিন্দুস্তানে নিয়ে আসেন। ইংরেজ লর্ড-এর ধারণা ছিল সুলতান মাহমূদ এই দরজাটি হিন্দুস্তানের সোমনাথ মন্দির থেকে নিয়েছিলেন। গযনী শহর থেকে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত ফিরোজীবাগের সেই ঐতিহাসিক কবরস্থানের আজ আর কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নেই। জায়গাটি একটি পরিত্যক্ত ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। কবর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও যতো দিন পৃথিবীর বুকে সূর্য উঠবে, মানুষ থাকবে, মুসলমান থাকবে ততোদিন অসংখ্য অগণিত মুসলমান সুলতানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে, আর মক্কা ও মদীনায় তার প্রেরিত শিবমূর্তির অবশিষ্ট টুকরোগুলো স্মরণ করিয়ে দেবে সুলতান মাহমূদ ইসলামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। অম্লান তাঁর কীর্তি, অনিঃশেষ তাঁর ঈমানী চেতনা। আজো তাঁর চেতনা ঈমানের দীপ্তি ছড়ায়। আল্লাহ আখেরাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আমীন!

**সমাপ্ত**

naJmul haider-01911031184 ▪ THE LIGHT

VAROT OVIJAN : 5 ISBN 984-70109-0000-3 SET